রবিজীবনী

প্রশান্তকুমার পাল

রবিজীবনী

প্রশান্তকুমার পাল

রবিজীবনী

পঞ্চম খণ্ড

১৩০৮-১৩১৪

শ্রীমতী মনীষা পাল
কল্যাণীয়াসু

আমাদের প্রকাশিত
এই লেখকের অন্যান্য বই

রবিজীবনী ১ম (১২৬৮-১২৮৪)
রবিজীবনী ২য় (১২৮৫-১২৯১)
রবিজীবনী ৩য় (১২৯২-১৩০০)
রবিজীবনী ৪র্থ (১৩০১-১৩০৭)
রবিজীবনী ৫ম (১৩০৮-১৩১৪)
রবিজীবনী ৬ষ্ঠ (১৩১৫-১৩২০)
রবিজীবনী ৭ম (১৩২১-১৩২৬)
রবিজীবনী ৮ম (১৩২৭-১৩২৯)
রবিজীবনী ৯ম (১৩৩০-১৩৩২)

মুখবন্ধ

রবিজীবনীর পঞ্চম খণ্ড প্রকাশিত হল। ১৩০৮ থেকে ১৩১৪ বঙ্গাব্দ— রবীন্দ্রজীবনের একচল্লিশ থেকে সাতচল্লিশ এই সাতটি বৎসর বর্তমান খণ্ডের উপজীব্য।

রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিজীবন ও রাষ্ট্রীয় জীবন উভয় দিক থেকেই এই সময় অত্যন্ত ঘটনাবহুল। পূর্বসূরীদের রচনা থেকে বহুল সাহায্য নিলেও ইতিহাসের অনেক গ্রন্থি মোচন করতে হয়েছে প্রাথমিক উপকরণের সাহায্যে। ফলে তথ্য-সন্নিবেশ ও বিশ্লেষণের বাহুল্যে স্বভাবতই গ্রন্থটির আকার বৃদ্ধি ঘটেছে। আশা করব, প্রচলিত মতের আনুগত্য না করে সুধী পাঠকেরা পরিবেশিত তথ্য ও বিশ্লেষণের তাৎপর্যটি অনুধাবন করবার চেষ্টা করবেন।

তথ্য আহরণে শান্তিনিকেতনের রবীন্দ্রভবন সংগ্রহশালা ও সংগীতভবন গ্রন্থাগার এবং কলকাতার জাতীয় গ্রন্থাগারের সংবাদপত্র শাখা, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ ও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার থেকে সর্বাধিক সাহায্য পেয়েছি। প্রতিষ্ঠানগুলির কর্তৃপক্ষ ও কর্মীদের কাছে এজন্য কৃতজ্ঞ। বন্ধুবর অনাথনাথ দাস কয়েকটি দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ ও পত্রিকা ব্যবহার করার সুযোগ দিয়েছেন। প্রিয়বন্ধু অমল সেনগুপ্ত সুদূর হাজারিবাগ থেকে প্রয়োজনমতো তথ্য সরবরাহ করেছেন। অগ্রজপ্রতিম অধ্যাপক ড প্রতাপ মুখোপাধ্যায়ও অনেক দুষ্প্রাপ্য তথ্য জানিয়েছেন। সহকর্মী অধ্যাপক ড রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য ও ড সরোজ দত্তের সঙ্গে কোনো-কোনো বিষয়ে আলোচনা করে উপকৃত হয়েছি। ড বিশ্বনাথ রায়ের অপ্রকাশিত গবেষণা-গ্রন্থ রবীন্দ্রনাথ ও প্রাচীন বাংলা সাহিত্য পাঠ করেও কিছু কিছু তথ্য সংগ্রহ করেছি। রবীন্দ্রভবনের ভারপ্রাপ্ত অধ্যাপক শঙ্খ ঘোষ যথারীতি পাণ্ডুলিপিটি পড়ে দেখেছেন ও উপযুক্ত সংশোধনের পরামর্শ দিয়েছেন। এঁদের সকলের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাই।

আমার কন্যা কল্যাণীয়া শ্রাবণী ও শ্যামলী প্রুফ-সংশোধনে সাহায্য করেছে। পুত্র সুমন্ত্র পাণ্ডুলিপির কিয়দংশ কপি করেছে। শ্রাবণী ও আমার স্ত্রী মনীষা 'নির্দেশিকা' -প্রস্তুতেও আমার সহকারিণী। তাদের কল্যাণ কামনা করি।

১ বৈশাখ ১৩৯৭

৩৬/১ পদ্মপুকুর রোড

ফিঙাপাড়া। ২৪ পরগণা ৭৪৩১২৬

প্রশান্তকুমার পাল

বিষয়সূচী

পাঠ-নির্দেশ

এই গ্রন্থ-রচনায় রবীন্দ্রনাথ-লিখিত পুস্তকের ক্ষেত্রে সাধারণভাবে বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ কর্তৃক প্রকাশিত রবীন্দ্র রচনাবলীর বিভিন্ন খণ্ড ব্যবহৃত হয়েছে। বিভিন্ন সংস্করণে পৃষ্ঠাঙ্কের সামান্য ব্যতিক্রম হয়ে থাকতে পারে, কিন্তু তা সত্ত্বেও পাঠকের পক্ষে উদ্ধৃতি বা উল্লেখের মূল খুঁজে পেতে খুব বেশি অসুবিধা হবে না ভেবে সংস্করণ বা মুদ্রণ-তারিখ নির্দেশিত হয় নি। অন্যান্য গ্রন্থের ক্ষেত্রে উল্লেখপঞ্জীতে প্রথম উল্লেখের স্থানে তৃতীয় বন্ধনীর মধ্যে প্রকাশ-সন দেওয়া হয়েছে। দণ্ড চিহ্নের পরের সংখ্যাটি পৃষ্ঠাঙ্ক-সূচক।

গ্রন্থের মূল পাঠে তৃতীয় বন্ধনীর অন্তর্গত তারিখগুলি সাধারণত পুরোনো পঞ্জিকা বা Ephimeris অবলম্বনে নির্ধারিত। চিঠির ক্ষেত্রে তারকা-চিহ্নিত তারিখগুলি খাম বা পোস্টকার্ডের উপরে প্রদত্ত ডাকঘরের মোহর থেকে সংগৃহীত। উদ্ধৃতির মধ্যে তৃতীয় বন্ধনীর মধ্যস্থ শব্দ বা শব্দগুলি আমরা যোগ করেছি। মূলের বানান সাধারণত অপরিবর্তিত রাখা হয়েছে। লেখা বা ছাপা ভুল বানানের প্রতি '[যদ্দৃষ্টং]' শব্দ-যোগে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছি। [?]-চিহ্ন সংশয়-সূচক। উদ্ধৃতি ছাড়া অন্যত্র খৃস্টাব্দ সর্বদাই ইন্দো-আরবীয় হরফে [1, 2, 3…ইত্যাদি] লিখিত, 'শক'-শব্দটির ব্যবহার না থাকলে বাংলা হরফে লেখা অব্দগুলিকে বঙ্গাব্দ বুঝতে হবে।

শব্দ-সংক্ষেপণ

'পূর্ব ও পশ্চিম', সমাজ ১২।২৬৬ : রবীন্দ্র-রচনাবলী ১২শ খণ্ডের অন্তর্ভুক্ত 'সমাজ' গ্রন্থের অন্তর্গত 'পূর্ব ও পশ্চিম' প্রবন্ধ, পৃ ২৬৬।

চিঠিপত্র ৮।১৮৭, পত্র ১৫৭ : চিঠিপত্র ৮ম খণ্ডের অন্তর্ভুক্ত ১৫৭-সংখ্যক পত্র, পৃ ১৮৭।

ঔপনিষদ ব্রহ্ম অ-২।২০৯ : রবীন্দ্র-রচনাবলী অচলিত সংগ্রহ ২য় খণ্ডের অন্তর্ভুক্ত 'ঔপনিষদ ব্রহ্ম' গ্রন্থ, পৃ ২০৯

পূরবী ২ [প.ব. ১৩৮৯]। ৭০৮-১২ : পশ্চিমবঙ্গ সরকার-প্রকাশিত রবীন্দ্র-রচনাবলী ২য় খণ্ডের অন্তর্ভুক্ত 'পূরবী' গ্রন্থ, পৃ ৭০৮ থেকে ৭১২।

'পিতৃস্মৃতি', মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ [১৩৭৫]। ১৫২ : ১৩৭৫ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত 'মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ' গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত 'পিতৃস্মৃতি' প্রবন্ধ, পৃ ১৫২।

বি.ভা.প. : বিশ্বভারতী পত্রিকা।

দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, সা-সা-চ ৩।৪৫।১০ : সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা ৩য় খণ্ড ৪৫ সংখ্যক দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর' গ্রন্থের পৃ ১০।

দেশ, সাহিত্য ১৩৮৭।১১ : 'দেশ' পত্রিকার ১৩৮৭ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত সাহিত্য-সংখ্যার পৃ ১১।

অগ্র° : অগ্রহায়ণ।

তত্ত্ব° : তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা।

গীত : গীতবিতান।

স্বর : স্বরবিতান।

গবেষণা-গ্রন্থমালা : রবীন্দ্রসংগীত-গবেষণা-গ্রন্থমালা, প্রফুল্লকুমার দাস-রচিত।

ত্রিবেণী সংগম : রবীন্দ্রসংগীতের ত্রিবেণীসংগম, ইন্দিরা দেবী-রচিত।

রবিজীবনী

পঞ্চম খণ্ড

একচত্বারিংশ অধ্যায়

১৩০৮ [1901-02] ১৮২৩ শক ॥ রবীন্দ্রজীবনের একচত্বারিংশ বৎসর

১৩০৭ বঙ্গাব্দের শেষ মাসটি রবীন্দ্রনাথ মাধুরীলতার বিবাহ, ভারতী ও নবপর্যায় বঙ্গদর্শন-এর লেখা প্রভৃতির চিন্তায় বিব্রত ছিলেন। ১৩০৭ বঙ্গাব্দের শ্রাবণ মাসে কবি বিহারীলাল চক্রবর্তীর তৃতীয় পুত্র কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উজ্জ্বল ছাত্র ও বর্তমানে মজঃফরপুরের কোর্টে ওকালতি ব্যবসায়ে রত শরৎকুমারের সঙ্গে মাধুরীলতার বিবাহ-সম্বন্ধ আনেন বিহারীলালের প্রতিবেশী প্রিয়নাথ সেন। আশা ও নিরাশার আলোছায়ায় কয়েকটি মাস অতিবাহিত হবার পর সম্বন্ধটি মোটামুটি পরিণতির পথে অগ্রসর হয়ে বিশ হাজার টাকা পণের দাবিতে থমকে যায়। দরাদরির সুবিধার জন্য প্রিয়নাথ তাঁকে কলকাতায় আসতে লিখলে কিছু ইতস্তত করার পর রবীন্দ্রনাথ লেখেন :

> তোমারি জিত। কলকাতায় চল্লুম। ৩১শে চৈত্র শনিবার [13 Apr 1901] অপরাহ্নে পৌঁছব। রবিবার প্রাতে নববর্ষের উপাসনা—যোড়াসাঁকোয় তোমার সঙ্গে সেদিন সকালে দেখা হবে ত?[১]

দেখা ও আলোচনা নিশ্চয়ই হয়েছিল নববর্ষের [রবি 14 Apr] সকালে। রবীন্দ্রনাথ এর পরেও ৩, ৪, ৫ ও ৯ বৈশাখ নিমতলায় মথুর সেন গার্ডেন'স লেনে প্রিয়নাথের বাড়ি যাতায়াত করেছেন। এই সময়ে তিনি শরকুমারের জ্যেষ্ঠ ও মধ্যম ভ্রাতা অবিনাশ ও হৃষীকেশ [ঋষিবর] চক্রবর্তীর সঙ্গেও পণ নিয়ে কথাবার্তা বলেন। আনুষঙ্গিক চিঠিপত্র থেকে জানা যায়, পাত্রপক্ষ বিশ হাজার টাকা পণের দাবি ত্যাগ করে দশ হাজারেই রাজি হন—কিন্তু দাবি করেন, বিবাহের অন্তত তিন দিন পূর্বে পণের টাকা মিটিয়ে দিতে হবে। মহর্ষি-পরিবারে কন্যার বিবাহে অল্পবিস্তর পণ প্রায় সকল পাত্রকেই দিতে হয়েছে, কিন্তু এই পণ বা যৌতুক প্রতিটি ক্ষেত্রেই মহর্ষি স্বয়ং দিয়েছেন বিবাহের আশীর্বাদী-স্বরূপ। আর সমাজের অন্যত্র যাই হোক, মহর্ষির মতো ধনী ও মানী ব্যক্তির সঙ্গে আর্থিক লেনদেনে অপরপক্ষের প্রতারিত হওয়ার আশঙ্কা অমূলক ছিল। সুতরাং বর্তমান অপমানজনক প্রস্তাবে রবীন্দ্রনাথের পক্ষে অসম্মত হওয়াই স্বাভাবিক ছিল, কিন্তু কন্যাদায় থেকে উদ্ধার পাওয়ার অত্যাগ্রহে তিনি এই প্রস্তাবে রাজি হয়ে যান। ঠাকুর কোম্পানির জন্য ঋণভারগ্রস্ত রবীন্দ্রনাথের নিজের থেকে পণের টাকা দেওয়ার সামর্থ্য থাকার কথা নয়; তাই প্রিয়নাথ সম্ভবত অন্য কোথাও থেকে ধার করে টাকা মিটিয়ে দেবার আশ্বাস দেন, কিন্তু এই কথা পিতাকে জানাতে নিষেধ করেন। কিন্তু পিতৃভক্ত রবীন্দ্রনাথের পক্ষে কথাটি গোপন করা সম্ভব হয় নি এবং স্বভাবতই মহর্ষি তাতে অপমানিত বোধ করেন। এই তিক্ত ইতিহাস তিনি ভাবী জামাতা শরৎকুমারের কাছেও ব্যক্ত করেন, হয়তো তাঁর আশা ছিল

শরৎকুমারের হস্তক্ষেপে তিনি এই জটিলতা থেকে মুক্তি পাবেন। ১১ বৈশাখ [বুধ 24 Apr] শিলাইদহ থেকে তিনি লেখেন :

আমাদের পারিবারিক প্রথা অনুসারে বিবাহের দুই একদিন পূর্ব্বে জামাতাকে ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষা গ্রহণ করিতে হয়। সেদিন অবিনাশ যখন প্রিয়বাবুর বাড়িতে প্রস্তাব করিলেন যে দীক্ষার দিনেই বিবাহের পূর্ব্বে যৌতুক দিতে হইবে তখন আমি কোন চিন্তা না করিয়া সম্মতি দিয়াছিলাম। সেইরাত্রে পিতৃদেবকে যখন সে কথা জ্ঞাপন করিলাম তখন তিনি অত্যন্ত বিস্ময় প্রকাশ করিয়া কহিলেন—"বরকন্যাকে আশীর্ব্বাদ স্বরূপেই যৌতুক দিতে হয়—কিন্তু বিবাহের পূর্ব্বেই যৌতুক চাহিবার কি কারণ? আমার প্রতি কি বিশ্বাস নাই?"

তাঁহার নিকট কোন সদুত্তর দিতে পারিলাম না এবং এই প্রস্তাবের মধ্যে আমার পিতার প্রতি যে একটি অশ্রদ্ধা ও অসম্মান আছে তাহা তৎক্ষণাৎ আমার মনে প্রতিভাত হইল।[২]

এই পত্র পাঠাবার দিনদুয়েক পরেই তিনি এর অসমীচীনতা বুঝতে পারেন ও সম্ভবত ১৩ বৈশাখ. [শুক্র 26 Apr] কাজটিকে 'মূঢ়তা নং ২' বলে অভিহিত করে প্রথম মূঢ়তা সম্পর্কে প্রিয়নাথকে লেখেন :

প্রথমে আমি সম্মতি দিয়েছিলুম তার কারণ আমি মূঢ়। সে জন্যে আমাকে যত খুসি গাল দিতে পার। যে সম্মতি দেবার অধিকার আমার নেই সে সম্মতি যদি ভ্রমক্রমে দিয়ে ফেলি তবে সেই অবিবেচনার জন্য মূঢ়তার অপবাদ আমি চিরকাল বহন করিতে প্রস্তুত থাক্ব কিন্তু তাই বলে এ রকম অপমান ভার আমাদের পরিবারের মাথার উপরে তুলে দিতে পারব না।[৩]

রবীন্দ্রনাথের মূল পত্রটি পাওয়া যায় নি, শরৎকুমারের 26 Apr-এর পত্রের উত্তরে প্রিয়নাথ 28 Apr [রবি ১৫ বৈশাখ] তাঁকে ইংরেজিতে যে ঠিটি লেখেন[৪] তাতেই উক্ত পত্রাংশ উদ্ধৃত হয়েছে। এই পত্র থেকে জানা যায়, শরৎকুমারের কাছে প্রস্তাবটি উত্থাপিত হওয়ামাত্রই মাতার অনুমতিসাপেক্ষে তিনি এই বিবাহে সম্মতি দান করেন—সম্ভবত রবীন্দ্রনাথের জামাতা হবার সৌভাগ্য তাঁর আকাঙ্ক্ষিত ছিল, মাধুরীলতার ছবিও তিনি দেখে থাকতে পারেন।

প্রিয়নাথ রবীন্দ্রনাথকেও চিঠি লিখে সমাধানের একটি পথের আভাস দেন। তাঁর চিঠিটি রক্ষিত হয়নি, কিন্তু ১৫ বৈশাখে লেখা রবীন্দ্রনাথের উত্তর থেকে বিষয়টির ইঙ্গিত মেলে :

তুমি যদি ওদের সঙ্গে প্রাইভেট্ কোন বন্দোবস্ত কর এবং বর্ত্তমান সঙ্কট কাটাতে পার সে কথা আমার জানবার কি কোন দরকার আছে? তুমি যদি ওদের ধার দাও এবং ঋণ শোধ করে নাও তাতে আমার আপত্তি করবার কোন অধিকারমাত্র নেই। এ সম্বন্ধে আমাদের কোন প্রকার সংশ্রব না থাক্লেই হল।[৫]

শরৎকুমার রবীন্দ্রনাথের চিঠির উত্তর দেন। প্রত্যুত্তরে তিনি ১৭ বৈশাখ [মঙ্গল 30 Apr] তাঁকে লেখেন :

তোমার পত্রখানি পাইয়া আনন্দিত হইয়াছি। চিঠিখানি সর্ব্বতোভাবে তোমার উপযুক্ত হইয়াছে। তোমার গুরুজনদের প্রতি বিদ্রোহাচরণ করিয়া যে তুমি বিবাহে সম্মতি দিবে এরূপ ইচ্ছা আমার নাই—তাঁহাদের প্রতি তোমার শ্রদ্ধা ও নির্ভর দেখিয়া তোমার প্রতি আমার শ্রদ্ধা অনেক বাড়িয়াছে।[৬]

সম্ভবত এইদিনই তিনি প্রিয়নাথকে লেখেন : 'আজ শরতের পত্র পাইয়াছি। পত্রখানি সুন্দর কিন্তু strictly private বলিয়া তোমাকে দেখাইতে পারিলাম না। শরৎ ভাইদের মতের বিরুদ্ধে কিছু করিতে চায় না এবং বাবামশায়ও বিবাহের পূর্ব্বে যৌতুক দিবেন না স্থিরপ্রতিজ্ঞ—অতএব তুমি এই সঙ্কটের যদি কোন সুপথ থাকে অবলম্বন করিয়ো-আমাদের পক্ষ হইতে আমি ত কোন সুযোগ ভাবিয়া পাই না।'[৭] বিহারীলাল ও দ্বিজেন্দ্রনাথের প্রিয়বন্ধু কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য (1840-1932] সম্ভবত জামিনদার হয়ে এই সংকটের নিরসন করেন—কিন্তু সে কিছুকাল পরের কথা।

মাধুরীলতার বিবাহের ব্যাপারেই রবীন্দ্রনাথ কলকাতায় এলেও অন্যান্য কাজেও তাঁকে ব্যস্ত থাকতে হয়েছে—কলকাতার বিভিন্ন প্রান্তে ঘোরাঘুরি তো ছিলই। ক্যাশবহি থেকে জানা যায়, তিনি ১ বৈশাখ কর্নওয়ালিশ স্ট্রীট, ২ বৈশাখ সংগীতসমাজ, ৩ বৈশাখ 'হেদুয়াতলা' ও বালিগঞ্জ, ৫ বৈশাখ ঝামাপুকুর, ৬ বৈশাখ বালিগঞ্জ ও 'মোহিনী বাবুর আফিষ যাইবার ও আসিবার' [এই খরচটি সরকারী ক্যাশবহির), ৭ বৈশাখ 'হেদুয়াতালাও', ৮ বৈশাখ বালিগঞ্জ এবং ৯ বৈশাখ হেদুয়াতলাও ও সংগীতসমাজে যাতায়াত করেছেন—নিমতলায় প্রিয়নাথ সেনের বাড়ি যাতায়াতের হিসাব তো আমরা আগেই দিয়েছি। ১০ বৈশাখ [মঙ্গল 23 Apr] তিনি শিলাইদহে ফিরে যান। এর মধ্যে প্রায় প্রতিদিন তাঁর পুত্র শিলাইদহে প্রেরিত হয়েছে, ৮ বৈশাখ [রবি 21 Apr] তিনি ত্রিপুরায় পত্র লেখেন সম্ভবত ত্রিপুরারাজ রাধাকিশোর মাণিক্যকে।

শৈলেশচন্দ্র ও শ্রীশচন্দ্র মজুমদার নবপর্যায় বঙ্গদর্শন-এর সম্পাদনার দায়িত্বভার গ্রহণের জন্য রবীন্দ্রনাথকে দীর্ঘদিন অনুরোধ-উপরোধ করে যাচ্ছিলেন, পূর্ববর্তী অধ্যায়ে আমরা এ-বিষয়ে কিছু চিঠিপত্র উদ্ধৃত করেছি। তিনি কলকাতায় আসার পর শৈলেশচন্দ্রের আক্রমণ বহুগুণিত হয়েছিল একথা স্বচ্ছন্দেই অনুমান করা যায়। শেষ পর্যন্ত অবশ্য তাঁকে অনিচ্ছাস্বত্ত্বেও রাজি হতে হয়েছে। পরে তিনি এ সম্পর্কে লিখেছেন : 'আমার নাম যোজনা করা হল, তাতে আমার প্রসন্ন মনের সমর্থন ছিল না। কোনো পূর্বতন খ্যাতির উত্তরাধিকার গ্রহণ করা সংকটের অবস্থা, আমার মনে এ সম্বন্ধে যথেষ্ট সংকোচ ছিল। কিন্তু আমার মনে উপরোধ-অনুরোধের দ্বন্দ্ব যেখানেই ঘটেছে সেখানে প্রায়ই আমি জয়লাভ করতে পারিনি, এবারেও তাই হল।[৮]

এই দ্বিধাদ্বন্দ্বের কথাই সম্ভবত তিনি ৮ বৈশাখের পত্রে* রাধাকিশোরকে লিখেছিলেন, রাধাকিশোর ১৪ বৈশাখ (শনি 27 Apr] উৎসাহ দিয়ে বঙ্গদর্শন-এর ব্যাপারে সর্বপ্রকার সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দেন।[৯]

বেঙ্গল লাইব্রেরির ক্যাটালগ অনুযায়ী নবপর্যায় বঙ্গদর্শন-এর প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয় 15 May [বুধ ১ জ্যৈষ্ঠ]। এর আগে *The Bengalee* পত্রিকার 18 Apr [বৃহ ৫ বৈশাখ], 29 Apr [সোম ১৬ বৈশাখ] প্রভৃতি সংখ্যায় 'to be published from the end of Bysakh next' উল্লেখ করে গ্রাহক হবার আহ্বান জানিয়ে যে বিজ্ঞাপন মুদ্রিত হয়, তাতে 'A highly interesting novel by Babu Ravindra Nath Tagore, will appear from the first month' ঘোষিত হলেও সম্পাদক হিসেবে তাঁর নাম উল্লিখিত হয়নি; প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে : 'No attempt will be wanting to make the new series worthy of the old.'

প্রথম সংখ্যায় রবীন্দ্রনাথের অনেকগুলি রচনা মুদ্রিত হয় :

১-৪ সূচনা

৫-৭ 'প্রার্থনা'

৫ ১/শতাব্দীর সূর্য্য আজি রক্তমেঘমাঝে দ্র নৈবেদ্য ৮।৫১-৫২, ৬৪ নং

৫ ২/পতিত ভারতে তুমি কোন্ জাগরণে দ্র ঐ ৮।৫১, ৬৩ নং

৫ ৩/এই পশ্চিমের কোণে রক্ত-রাগ-রেখা দ্র ঐ ৮।৫৩, ৬৬ নং

৫ ৪/সে উদার প্রত্যুষের প্রথম অরুণ দ্র ঐ ৮।৫৪, ৬৮ নং

৬ ৫/ওরে মৌন মূক, কেন আছিস নীরবে দ্র ঐ ৮।৫৬, ৭১ নং

৬ ৬/শক্তি-দম্ভ স্বার্থলোভ মারীর মতন দ্র ঐ ৮।৬৯-৭০, ৯২ নং

৬ ৭/কোরো না কোরো না লজ্জা, হে ভারতবাসি দ্র ঐ ৮।৭০, ৯৩ নং

৬ ৮/ হে ভারত, নৃপতিরে শিখায়েছ তুমি দ্র ঐ ৮।৭০-৭১, ৯৪ নং

৭ ৯/হে ভারত, তব শিক্ষা দিয়েছে যে ধন, দ্র ঐ ৮।৭১, ৯৫ নং

৭ ১০/অন্তরের সে সম্পদ ফেলেছি হারায়ে দ্র ঐ ৮।৭২, ৯৬ নং

৭ ১১/চিত্ত যেথা ভয়শূন্য, উচ্চ যেথা শির, দ্র ঐ ৮।৫৬-৫৭, ৭২ নং

৭ ১২/তোমার ন্যায়ের দণ্ড প্রত্যেকের করে দ্র ঐ ৮।৫৫, ৭০ নং

১৪-২৪ 'চোখের বালি' ১-৪ দ্র চোখের বালি ৩।২৮৫-৯৮

২৫-৩০ 'ব্যাধি ও প্রতিকার' দ্র সমাজ-পরিশিষ্ট, ১২।৪৮৯-৯৬

৪৯-৫৪ 'সাহিত্য প্রসঙ্গ (ক) আলোচনা। (রচনাসম্বন্ধে জুবেয়ারের বচন)' দ্র আধুনিক সাহিত্য ৯।৫২০-২৫ ['জুবেয়ার']

৬০-৬৬ (ঘ) মাসিক-সাহিত্য-সমালোচনা ৬০-৬১ ভারতী। বৈশাখ; ৬১-৬২ নব্যভারত। চৈত্র; ৬২-৬৩ সাহিত্য। ফাল্গুন ৬৩-৬৪ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা। ফাল্গুন; ৬৪-৬৫ প্রদীপ। চৈত্র ৬৫ সাহিত্যসংহিতা। চৈত্র; ৬৬ প্রবাসী। বৈশাখ

এ ছাড়াও ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়ের 'হিন্দুজাতির একনিষ্ঠতা' [পৃ ৮-১৩] প্রবন্ধের সূচনাতেই 'হে সকল ঈশ্বরের পরম ঈশ্বর' [দ্র নৈবেদ্য ৮৪৭-৪৮, ৫৭ নং] সনেটটি উদ্ধৃত হয়।

নৈবেদ্য ও চোখের বালি ছাড়া বাকি সমস্ত রচনাই সম্ভবত বৈশাখ মাসের শেষার্ধে লেখা—যা রবীন্দ্রনাথের বিপুল রচনাশক্তির উদাহরণ।

বঙ্কিমচন্দ্রের সম্পাদনায় বা অভিভাবকত্বে বঙ্গদর্শন একটানা চলে নি, তার বিভিন্ন পর্যায়ে তিনি বঙ্গদর্শন-এর প্রয়োজনীয়তা ও স্থায়িত্ববিধানের উদ্দেশ্যে যে-সমস্ত উক্তি করেছিলেন, তার কিয়দংশের উদ্ধৃতি দিয়ে পত্রিকাটির পুনরুজ্জীবনের কারণটি ব্যাখ্যা করে রবীন্দ্রনাথ 'সূচনা'য় লিখেছেন :'যে নামকে বঙ্কিমচন্দ্র গৌরবান্বিত করিয়া গিয়াছেন, সে নামের মধ্যে সেই স্বর্গীয় প্রতিভার একটি শক্তি রহিয়া গিয়াছে। সেই শক্তি এখনও বঙ্গদেশ ও বঙ্গসাহিত্যের ব্যবহারে লাগিবে, সেই শক্তিকে আমরা বিনাশ হইতে দিতে পারি না। কিন্তু এইজন্যই পরবর্তী সম্পাদকের দায়িত্বও কঠিন—'বঙ্গদর্শনের নামে পাঠকের প্রত্যাশা বাড়িয়া উঠিবে সন্দেহ নাই, এবং সেই প্রত্যাশার বেগে সম্পাদককেও সর্বদা সচেষ্ট সচেতন থাকিতে হইবে। সম্পাদক এ কথা ভুলিতে পারিবেন না যে, বঙ্গদর্শনের নামের মধ্যে বঙ্কিম স্বয়ং উপস্থিত থাকিয়া তাঁহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া আছেন—সেই বঙ্কিমের কঠিন আদর্শ ও কঠোর বিচার তাঁহাকে সর্বপ্রকার শৈথিল্য হইতে রক্ষা করিবে। অবশ্য বঙ্কিমচন্দ্রের সময় ও বর্তমান সময়ের বাংলা সাহিত্যের পার্থক্য যথেষ্ট। বঙ্কিমের সময়ে বাঙালি লেখক ও পাঠকের সংখ্যা কম থাকায় সেই সঙ্কীর্ণ খাতের মধ্যে বঙ্কিম আপন প্রবল প্রতিভা প্রবাহিত করিয়া সাহিত্যের স্রোতঃপথকে গভীর ও ক্রমশঃ প্রশস্ত করিয়া তুলিয়াছিলেন। তখনকার সেই নিঝর-ধারাটি বঙ্কিমের ব্যক্তিগত প্রবাহের দ্বারা পরিপূর্ণ ছিল; তিনিই তাহাকে গতি দিয়াছিলেন এবং তিনিই তাহার দিক নির্দেশ করিয়াছিলেন। কিন্তু পরবর্তী কালে লেখক ও পাঠকের সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় এবং বিচিত্ররুচি পাঠকের চিত্তাকর্ষণের দায় থাকায় প্রতিভার সেই ব্যক্তিগত প্রভাবের প্রবল স্বাদ উপভোগ করার প্রত্যাশা ত্যাগ করতে

হয়। বিপুলসংখ্যক মাসিক ও সাপ্তাহিক পত্রের ভিড় থেকে শ্রেষ্ঠ লেখকদের আকর্ষণ করে আনাও শক্ত। পূর্বতন বঙ্গদর্শন-এর লেখক সাহিত্যাচার্য অক্ষয়চন্দ্র সরকার বা চন্দ্রনাথ বসুর মতো লেখকদের রচনা স্ব-সম্পাদিত পত্রিকায় আহ্বান করাও রবীন্দ্রনাথের পক্ষে কঠিন। তাই তিনি লিখেছেন : 'এখনকার সম্পাদকের একমাত্র চেষ্টা হইবে, বর্তমান বঙ্গচিত্তের শ্রেষ্ঠ আদর্শকে উপযুক্তভাবে এই পত্রে প্রতিফলিত করা। কাজটা কঠিন। কারণ ক্ষেত্র বিস্তীর্ণ হওয়াতে, চিরস্থায়ী সত্যের সহিত বিচিত্র-মৃগতৃষ্ণিকার প্রভেদ নির্ণয় করা দুরূহ হইয়াছে।···· কিন্তু আমরা একান্ত মনে আশা করি, বঙ্গদর্শন এই সকল সাময়িক কলকোলাহল হইতে নিজেকে সুদূরে রক্ষা করিয়া সাহিত্যের আদর্শকে নিত্যকালের অচল শিখরের উপর প্রতিষ্ঠিত করিবে।···· আমরা যখন বঙ্গদর্শনকৈ আশ্রয় করিয়া সাহিত্য-ক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়াছি, তখন আমরা কঠিন বিচার প্রার্থনা করি। ভীরুতা, রুচিভ্রংশ, সত্যের অপলাপ এবং সর্বপ্রকার। সাহিত্যনীতির শৈথিল্য, আমাদের পক্ষে অমার্জনীয়। আশা করি, সতর্ক পাঠকগণ আমাদিগকে সেই ধ্রুবপথে স্থির রাখিবেন এবং সতর্ক লেখকগণ সেই দুর্গমপথে আমাদিগকে চালনা করিবেন।

রবীন্দ্রনাথ যে কঠিন বিচার প্রার্থনা করেছিলেন, তা পূর্ণ করেন সুরেশচন্দ্র সমাজপতি মাঘ (পৃ ৬৩৩-৪১] ও ফাল্গুন [পৃ ৬৯৭-৭০৪]-সংখ্যা সাহিত্য-তে প্রকাশিত 'নব বঙ্গ-দর্শন 'উল্লেখ' ও 'আলোচনা'-শীর্ষক দুটি দীর্ঘ প্রবন্ধে। সুরেশচন্দ্রের প্রধান আপত্তি ছিল বঙ্গদর্শন-এর পুনরুজ্জীবনে, শ্রীশচন্দ্র মজুমদারের পত্রিকাটির উপর অধিকার সম্পর্কেও তিনি সন্দেহ প্রকাশ করেছেন।* 'মাসিক সাহিত্য সমালোচনা'র চিরানুসৃত রীতি ভঙ্গ করে নবপর্যায় বঙ্গদর্শন সম্পর্কে দীর্ঘ নীরবতা রক্ষার পরে তিনি সমালোচনার তীব্র বিষোদগার করেছেন এই দুটি রচনায়।[১০] এর মধ্যে সর্বাধিক কৌতুককর অংশ চোখের বালি সম্পর্কে তাঁর মন্তব্য :

ইহার প্লট এবং নায়িকার নাম ও চরিত্রটি অপরের লিখিত ও অব্যবহিত পূর্ব্বে প্রকাশিত এবং রবি বাবুর বঙ্গদর্শনের এই প্রথম সংখ্যাতেই সমালোচিত একটি নবেলেরও নয়—'টেলে'র [পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত 'উমা'] প্লট ও নায়ক নায়িকা চরিত্রের অবিকল অনুকৃতি;সর্বত্রই একই আত্মায় উভয়ের একই রূপ গতি, এবং স্থানে স্থানে, এমন কি, একই শরীরে স্থিতি! সরলভাবেই বলিতেছি, রবি বাবু অজ্ঞাতে এই গলিতপঙ্কময় প্রমাদে পড়িয়া থাকিবেন।···· চোখের বালি সম্বন্ধে আমরা যাহা কিছু বলিলাম, তাহা উহার আলোচনাকালে আমরা অক্ষরে অক্ষরেই দেখাইয়া দিব, এবং তৎকালে উক্ত বিস্ময়কর রহস্যের আমরা যে মীমাংসা করিয়াছি, তাহাও সবিস্তারে বলিব। তখনই তিনি সম্ভবতঃ বুঝিতে পারিবেন যে, আমরা তাহার সরল ও বেদনা-হীন কঠি, সমালোচক হইলেও, তাহার শত্রু ও নিন্দুক নহি'।[১১]

—অবশ্য এই প্রতিশ্রুতি সুরেশচন্দ্র রাখতে পারেননি, সম্ভবত বিনোদিনী বা চোখের বালি উপন্যাসের পরিকল্পনা কতদিনের পুরনো তা প্রিয়নাথ সেন তাঁকে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন! তবে এর পরেও বৈশাখ ১৩১০ পর্যন্ত দীর্ঘকাল রবীন্দ্র-সম্পাদিত বঙ্গদর্শন-কে সুরেশচন্দ্র 'মাসিক সাহিত্য সমালোচনা'র যোগ্য মনে করেননি। কৌতুকের বিষয়, চোখের বালি সম্পর্কে স্বয়ং পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় স্ব-সম্পাদিত রঙ্গালয় [১৩ বৈশাখ ১৩০৯সংখ্যা]-এ লিখেছেন :

···"চোখের বালি" অনেকের ঘোট চোখের বালি হইলেও আমাদের নয়ন-অঞ্জন স্বরূপ হইতেছে। মনুষ্য-হৃদয়ের এমন সূক্ষ্ম ব্যবচ্ছেদ বাঙ্গালার অন্য কোন উপন্যাসে আমরা দেখিতে পাই না। "যার খাই, তারই পাল মজাই"—এই মন্ত্রে দীক্ষিত কোন এক লেখক, কোন এক মাসিক পত্রে "বঙ্গদর্শনের" যথেষ্ট নিন্দা ও গ্লানি করিয়াছেন। যেখানে 'ঠাকুরই' সর্বস্ব, সেখানে কোন এক ঠাকুরের দাস [? ঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায়] অপবাদের ধূলি উড়াইলে, দীনের ঠাকুরের খর-কর-ধার ম্লান হইবে না।

রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী ৮ আশ্বিন ১৩০৬ [রবি 24 Sep 1899] সাবিত্রী লাইব্রেরির বাৎসরিক অধিবেশনে 'সামাজিক ব্যাধি ও তাহার প্রতিকার' শীর্ষক একটি দীর্ঘ প্রবন্ধ পাঠ করেন; প্রবন্ধটি ঐ বৎসর আশ্বিন [পৃ

৩৩৭-৫৩] ও কার্তিক [পৃ ৩৯৭-৪১৭]সংখ্যা সাহিত্য-তে মুদ্রিত হয়—পুস্তিকাকারেও প্রকাশিত হয় প্রবন্ধটি। এই পুস্তিকা অবলম্বনে রবীন্দ্রনাথ ব্যাধি ও প্রতিকার' প্রবন্ধটি রচনা করেন। আত্মানুসন্ধান ও আত্মশক্তিতে উদ্বুদ্ধ হওয়ার পূর্বপ্রচারিত মতের পুনরুক্তি এখানেও আছে, কিন্তু নূতন কথাটি হল উনিশ শতকীয় আদর্শ ও আশাবাদের অবসানের ঘোষণা। ফরাসীবিদ্রোহ, দাসত্ববারণচেষ্টা এবং ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রত্যূষকালীন ইংরেজি কাব্যসাহিত্য বিলাতি সভ্যতাকে যে ভাবের ফেনায় ফেনিল করিয়া তুলিয়াছিল, তখনও তাহা মরে নাই—যে-সভ্যতা জাতিবর্ণনির্বিচারে সমস্ত মনুষ্যত্বকে বরণ করিতে প্রস্তুত আছে, এমনই একটা আশ্বাসবাণী ঘোষণা করিতেছিল।/আমাদের তাহাতে তাক লাগিয়া গিয়াছিল।' রামেন্দ্রসুন্দরের প্রবন্ধে এই মোহমুক্তির কারণ হিসেবে প্রদর্শিত হয়েছে ইংরেজিশিক্ষিত বেকারের সংখ্যাবৃদ্ধি, উচ্চশিক্ষার বিস্তারে রাজশক্তির অনীহা হেতু উক্ত শিক্ষার ব্যয়বাহুল্য, বৈজ্ঞানিক ও টেকনিক্যাল শিক্ষার অপ্রতুলতা, স্বাধীন মতপ্রকাশের কণ্ঠরোধের জন্য পেনাল কোডের নবতম ধারা ইত্যাদি। রবীন্দ্রনাথের মোহমুক্তি ঘটেছে য়ুরোপীয় জাতীয়তাবাদ ও ঔপনিবেশিকতাবাদের বীভৎস আত্মপ্রকাশ লক্ষ্য করে। বর্তমান প্রবন্ধে এই বক্তব্যটি তিনি অবশ্য উত্থাপন করেননি, কিন্তু যথার্থ ভারতীয় প্রকৃতিটি বুঝে নেওয়ার চেষ্টায় তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস প্রকাশ করে লিখেছেন : 'প্রাচীন ভারতে যে-আদর্শ ছিল তাহা ক্ষণভঙ্গুর নহে; বিলাতে গেলে তাহা নষ্ট হয় না, বাণিজ্যে প্রবৃত্ত হইলে তাহা বিকৃত হয় না, বর্তমান-কালোপযোগী কর্মে নিযুক্ত হইতে গেলে তাহা অনাবশ্যক হইয়া উঠে না।····· মনুর সময়ে যাহা সাময়িক আমাদের সময়ে তাহা অসাময়িক, মনুর সময়ে যাহা চিরন্তন, আমাদের সময়েও তাহা চিরন্তন।' ভারতবর্ষীয় আদর্শের মধ্যে সেই চিরন্তনতার সন্ধান বঙ্গদর্শন-এ প্রকাশিত রবীন্দ্রনাথের অনেকগুলি প্রবন্ধের অন্যতম লক্ষ্য।

ম্যাথু আর্নল্ডের প্রবন্ধে ফরাসি ভাবুক জুবেয়ারের* পরিচয় পেয়ে রবীন্দ্রনাথ তাঁর ভাবনার সঙ্গে বাঙালি পাঠকের পরিচয়-সাধনের উদ্দেশ্যে 'রচনাসম্বন্ধে জুবেয়ারের বচন' সংকলন ও ব্যাখ্যা করেন। ড শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় সংগত কারণেই এই প্রসঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্রের 'নব্য লেখকদের প্রতি উপদেশ' প্রবন্ধটির কথা স্মরণ করে লিখেছেন : 'বঙ্কিম সাহিত্য-সম্রাটের মত ফতোয়া জারি করিয়াছেন ও তাঁহার নির্দেশ সাহিত্যের নীতি ও লোককল্যাণমূলক দিকেরই সহিত সংশ্লিষ্ট।'[১২] রবীন্দ্রনাথ হয়তো এরই বিপরীতক্রমে জুবেয়ারের বচন সংকলন করেছেন। সমালোচনা-সম্পর্কে তিনি জুবেয়ারের যে বচনগুলি উদ্ধৃত করেছেন, রবীন্দ্র-সমালোচকেরা সেগুলি মনে রাখলে বাংলা সাহিত্যজগতের অনেক কালিমা অপ্রকাশিত থাকত। এ-প্রসঙ্গে জুবেয়ারের একটি বচন উদ্ধৃত করা যেতে পারে : 'রুচি লইয়া সমালোচকদের উন্মত্ত উৎসাহ, তাহাদের আক্রোশ-উত্তেজনা-উত্তাপ হাস্যকর। কাব্যসম্বন্ধে তাহারা এমনভাবে লেখে, কেবল ধর্মনীতি সম্বন্ধেই যাহা শোভা পায়। সাহিত্য মনোরাজ্যের আচার অনুসারেই চলা উচিত; রোষের উদ্দীপনা, পিত্তের দাহ সেখানে অসংগত।'

আমাদের বিশ্বাস, স্বাক্ষর-বিহীন হলেও 'মাসিক সাহিত্য সমালোচনা'গুলি রবীন্দ্রনাথেরই রচনা। বস্তুত, রবীন্দ্র-সম্পাদিত সাধনা ও ভারতী-র সঙ্গে বঙ্গদর্শন-এর একটি অন্যতম পার্থক্য হল তাঁর নিজের রচনা ছাড়া বাকি সব রচনাই লেখকের স্বাক্ষর-যুক্ত—যদিও মাসিক ও বার্ষিক সূচীতে কারোরই নাম প্রকাশিত হয়নি। এটি একটি পরোক্ষ প্রমাণ, প্রত্যক্ষ প্রমাণ সমালোচনাগুলির মধ্যেই পাওয়া যাবে।

ভারতী-র বৈশাখ-সংখ্যায় প্রকাশিত রাজেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'ছট্-পরব্ ও চকচন্দা' প্রবন্ধ [পৃ ৭৯-৮৮] সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন :

ছট্‌পরব ও চক্‌চন্দা বেহারে প্রচলিত দুটি মেয়েলি ব্রতের বিবরণ। লোকসাধারণের মধ্যে প্রচলিত এই সকল পরব ও ব্রতকথা ভারতের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশ হইতে সংগ্রহ করা বিশেষ আবশ্যক। ইহাদের ভিতরকার মনস্তত্ত্ব ও ইতিহাস, বৈচিত্র্য ও ঐক্য, রস এবং রহস্য আলোচনা করিবার পরম বিষয়। শ্রীযুক্ত অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায় গুটিকয়েক বাঙ্গলা ব্রত সংগ্রহ করিয়া একটি ছোট গ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছেন—কিন্তু তাহা যথেষ্ট নহে। সাহিত্য পরিষদ্‌ যদি এই সংগ্রহ কার্য্যকে অযোগ্য জ্ঞান না করেন তবে বাঙ্গলার ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশ হইতে ব্রতকথা সংকলন করিয়া একটি প্রকৃত কাজের পত্তন করিতে পারেন। বিজ্ঞান পিপাসুগণ সমুদ্র বেলা হইতে শামুক গুগ্‌লি নুড়ি কুড়াইয়াও সঞ্চয় করেন, আর লোকহৃদয়ের সমুদ্রবেলায় এই যে চিত্রবিচিত্র পদার্থ সকল উৎক্ষিপ্ত হইয়াছে এগুলি কি বিজ্ঞমণ্ডলীর উপেক্ষার যোগ্য? সাহিত্য পরিষদ্‌ একবার শিশু ভুলানো ছড়া সংগ্রহ করিবার উপক্রম করিয়া অতি সত্বর তাহা হইতে নিবৃত্ত হইয়াছিলেন; আশা করি, এ সকল কার্য্য গাম্ভীর্য্যের হানিজনক বলিয়া তাঁহারা লজ্জিত হন নাই!

—অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায়ের 'মেয়েলি ব্রত' [১৩০৩] গ্রন্থ ও 'ছেলেভুলানো ছড়া' সংগ্রহের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ নিজেই যুক্ত ছিলেন, শেষ বাক্যাংশটিতে হেমচন্দ্র বিদ্যারত্নের সমালোচনার প্রতি কটাক্ষ দুর্লক্ষ্য নয়।

এই সংখ্যায় প্রকাশিত সখারাম গণেশ দেউস্করের 'ঐতিহাসিক পত্রাবলী' [পৃ ৬২-৭১] প্রবন্ধের অন্তর্গত পত্রগুলি সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন :

প্রধান লক্ষ্যের বিষয় এই যে মারাঠা রাজ্যকালে পত্র ব্যবহারের ভাষা মারাঠী এবং রাজপুরুষদিগের পদবী সংস্কৃত নীতিশাস্ত্র হইতে গৃহীত। ইহা হইতে শিবাজির প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায়। স্বজাতিকে সর্ব্বতোভাবে স্বাধীন করাই তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল। কেবল রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা নহে, ভাষার স্বাধীনতা, আচারের স্বাধীনতা, মনের স্বাধীনতা তাঁহাদের আকাঙক্ষার বিষয় ছিল। যাবনিক বন্যার প্রবল প্লাবন হইতে স্বজাতিকে তাঁহারা প্রাচীন মহত্ত্বের তীরে তুলিয়া লইবার চেষ্টা করিতেছিলেন। তাঁহাদের রাজত্ব যে একটা খাপছাড়া ভুঁইফোঁড়া আকস্মিক উৎপাত, এরূপ ভাবনা তাঁহাদের পক্ষে অশান্তিকর—সেই জন্য তাঁহারা সর্ব্বপ্রযত্নে প্রাচীন স্বজাতীর মহৎ আদর্শের সহিত আপনাদিগকে আবদ্ধ করিয়া একটি ধ্রুব প্রতিষ্ঠার উপর আপন গৌরব স্থাপন করিতে প্রয়াসী হইয়াছিলেন। প্রভুত্ব লাভের চেষ্টা মারাঠী ইতিহাসের প্রধান গৌরব নহে, কিন্তু এই নববীর সম্প্রদায়ের মধ্যে একটি বৃহৎ ভাবের অভ্যুত্থান, স্বজাতীয় আদর্শলাভের জন্য জাগ্রত হৃদয়ের প্রবল আবেগ—ইহাই শ্রদ্ধার সহিত লক্ষ্য করিবার বিষয়।

—শিবাজির প্রতি রবীন্দ্রনাথের আন্তরিক শ্রদ্ধা ছিল—লক্ষণীয়, শিবাজির আদর্শের পরিপ্রেক্ষিতে রবীন্দ্রনাথ সমকালীন ভারতীয়দের জাতীয় গৌরব প্রতিষ্ঠার জন্য একই ধরনের আদর্শ ও কার্যবিধি প্রচার করেছেন তাঁর অন্যান্য প্রবন্ধে। ভাষাতত্ত্বের প্রতি রবীন্দ্রনাথের আকর্ষণ প্রকৃতিগত, তাই বর্তমান প্রসঙ্গেও সেই বিষয়ের অবতারণা করে লিখেছেন : 'আনুষঙ্গিক একটা ছোট কথা বলিয়া লই। "অনুবাদিত" কথাটা বাঙ্গলায় চলিয়া গেছে—আজকাল পণ্ডিতেরা অনূদিত লিখিতে সুরু করিয়াছেন। ভয় হয় পাছে তাঁহারা "সৃজন" কথার জায়গায় "সর্জ্জন" চালাইয়া বসেন।'

ফাল্গুন ১৩০৭-সংখ্যা সাহিত্য-তে মুদ্রিত বিখ্যাত শারীর- ও উদ্ভিদ-তত্ত্ববিদ্‌ [কেশবচন্দ্র সেনের কন্যা মণিকা দেবীর স্বামী] সুবোধচন্দ্র মহলানবিশের [1867-1953] 'জীবতত্ত্বের গুটিকত কথা' [পৃ ৬৪১-৫২] প্রবন্ধ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ লেখেন :

মহলানবিশ মহাশয়ের মত বিশেষজ্ঞ পণ্ডিত বাঙ্গলা লিখিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন ইহা একটি সুসংবাদ। যাহা লিখিয়াছেন তাহা অতিশয় প্রাঞ্জল, তাহার মধ্যে পারিভাষিক বিভীষিকা নাই। বাঙ্গলায় অধিকাংশ বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ এমন ভাবে লিখিত হইয়া থাকে যাহা অবোধ লোকের পক্ষে অরোধ্য এবং জ্ঞানী লোকের পক্ষে অনাবশ্যক। মহলানবিশ মহাশয়ের মত পারদর্শী লোক প্রবৃত্ত হইলে জ্ঞানী অজ্ঞানী উভয়েরই উপযুক্ত করিয়া লিখিতে পারেন। ইংলণ্ডে হক্সলি প্রভৃতি যশস্বী লোকে শিশুদের জন্য বিজ্ঞান প্রাথমিকা লিখিতে কুণ্ঠিত হয় নাই—বাঙ্গালী পাঠকদের সহিত বিজ্ঞানের প্রথমপরিচয়সাধন প্রবন্ধ-লেখক মহাশয়ের ন্যায় সুযোগ্য ব্যক্তির পক্ষেই সমুচিত।

বাংলায় বিজ্ঞান-বিষয়ক রচনাকে রবীন্দ্রনাথ সর্বদাই স্বাগত জানিয়েছেন, পরিভাষা সম্পর্কেও তাঁর উৎসাহ ছিল সীমাহীন। এই অনুচ্ছেদেই তিনি Evolution Theory, Natural selection ও Fossil শব্দের পরিভাষা নিয়ে আলোচনা করেছেন [দ্র বাংলা শব্দতত্ত্ব (১৩৯১)।২১০-১১]। কোন্‌ যুক্তির সাহায্যে বিশ্লেষণ করে তিনি পারিভাষিক শব্দ রচনা করতেন তার একটি বিস্তৃত পরিচয় পাওয়া যায় এই লেখাটিতে। তিনি এ-বিষয়ে

অধ্যাপক মহলানবিশের সঙ্গে আলোচনা করে তাঁর সংশোধিত মত প্রকাশ করেন আষাঢ়-সংখ্যার [পৃ ১৪৭] ‘মাসিক-সাহিত্য-সমালোচনায়’ [দ্র বাংলা শব্দতত্ত্ব। ২১২]।

সাহিত্য-এর উক্ত সংখ্যাতে প্রকাশিত খগেন্দ্রনাথ মিত্রের ‘চরিত্রনীতি’ [পৃ ৬৫৭-৬৬] প্রবন্ধের আলোচনাতেও তিনি Ethics শব্দটি নিয়ে পরিভাষা-গত কিছু বিতর্ক উপস্থাপিত করেন [দ্র বাংলা শব্দতত্ত্ব। ২১১। ‘চরিত্রনীতি’ শব্দের পরিবর্তে ‘চারিত্র’ শব্দের প্রতি তাঁর সমর্থন ‘চারিত্রপূজা’ [১৩১৪] গ্রন্থের নামকরণে প্রতিপন্ন হয়েছে। আলোচনা-প্রসঙ্গে তিনি ‘প্রহরিষ্যন্ প্রিয়ং ব্রূয়াৎ’ ইত্যাদি প্রকীর্ণ শ্লোকটির একটি চমৎকার রূপান্তর ঘটিয়েছেন :

মারিতে মারিতে কহিবে মিষ্ট,
মারিয়া কহিবে আরো!
মাথাটা কাটিয়া কাঁদিয়া উঠিবে
যতটা উচ্চে পারো!

সুবোধচন্দ্র মহলানবিশের বিজ্ঞান-বিষয়ক প্রবন্ধের প্রশংসা করলেও চৈত্র ১৩০৮-সংখ্যা প্রদীপ-এ প্রকাশিত উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর ‘সৃষ্টির বিশালত্ব’ [পৃ ১৪০-৪৬] প্রবন্ধটির সমাদর তিনি করতে পারেননি ভাষাব্যবহারে ত্রুটির পরিপ্রেক্ষিতে :

যে বিষয়টা সাধারণের অপরিচিত ও স্বভাবতই দুরূহ তাহার ভাষাকেও যদি নীরস ও দুর্ব্বোধ করিয়া তোলা যায় তবে নিতান্তই হতাশ হইয়া পড়িতে হয়। অবৈজ্ঞানিক মাসিক পত্রে পাঠকদিগকে যেরূপ ভোজ দিবার রীতি তাহাতে এরূপ কড়া জিনিষ তাহারা আশাই করে না, এমন স্থলে নিঃশঙ্কচিত্ত পাঠকের পাতে এত বড় উপদ্রব নিরীহ জামাতার প্রতি শ্বশুরান্তঃপুরের কঠিন কৌতুকের মত হইয়া পড়ে,—কিন্তু সেরূপ কৌতুক শ্বশুরালয়ে যেমন সহ্য হয় অন্যত্র তেমন হয় না।

এই আলোচনায় তিনি Centripetal ও Centrifugal Force শব্দ-দুটির পরিভাষা হিসেবে কেন্দ্রানুগ ও কেন্দ্রাতিগ শক্তি সুপারিশ করেছেন—উপেন্দ্রকিশোর লিখেছিলেন কেন্দ্রাভিসারিণী ও কেন্দ্রাপগামিনী শক্তি।

ফাল্গুন-সংখ্যা সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা-য় প্রকাশিত নিখিলনাথ রায়ের ‘রাঙ্গামাটি বা কর্ণ সুবর্ণ’ [প ১৯৩-২১৩] প্রবন্ধের সমালোচনাতেও রবীন্দ্রনাথ ভাষাতাত্ত্বিক আলোচনার অবতারণা করেছেন [দ্র বাংলা শব্দতত্ত্ব। ২৯৩-৯৪]। কিন্তু ‘রাঙা ভাঙা’ প্রভৃতি শব্দ ‘ঙ্গ অক্ষর যোগে লেখা নিতান্তই ধ্বনিসঙ্গতি বিরুদ্ধ’ লিখেও রবীন্দ্রনাথ এই সময়ে কেন ‘বাঙ্গলা’ বা ‘বাঙ্গালা’ বানান লিখতেন বোঝা শক্ত।

চৈত্র-সংখ্যা সাহিত্য-সংহিতা-তে বীরেশ্বর পাঁড়ে-রচিত ‘জাতীয় সাহিত্য’ প্রবন্ধে লেখক ‘আধুনিক ভারতবর্ষীয় ভাষাগুলিকে সংস্কৃত ব্যাকরণের নিয়মমত চলিতে উত্তেজনা করিয়াছেন।’ রবীন্দ্রনাথ এই মতের বিরোধিতা করেন [দ্র বাংলা শব্দতত্ত্ব। ২৫০]।

রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়-সম্পাদিত প্রবাসী পত্রিকা এলাহাবাদ থেকে বৈশাখ ১৩০৮-এ প্রকাশিত হয়। পত্রিকাটিকে স্বাগত জানিয়ে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন :

আমাদের প্রবাসী কবি শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ সেনের প্রেমাশ্রুজলে ইহার অভিষেক কার্য্য সুসম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। প্রবাসীও ধন্য, প্রবাসী বাঙ্গালীর কবিও ধন্য! স্বর্গীয় কমলাকান্ত শর্ম্মা লোকান্তর হইতে ইহলোকে এবং বঙ্গের বঙ্গদর্শন হইতে প্রবাসে গেলেন, এ ইন্দ্রজাল কে ঘটাইল? মায়াবী তাঁহার নাম গোপন করিয়া ফাঁকি দিতে পারিবেন না—কবির লেখনী ছাড়া এ যাদু আর কোথায়? যে কবি অশোকমঞ্জরী হইতে তাহার তরুণতা এবং বধূর ভূষণঝঙ্কার হইতে তাহার রহস্য কথাটী চুরি করিয়া লইতে পারেন তিনি যে রাতারাতি বঙ্গদর্শন হইতে তাহার কমলাকান্তটিকে হরণ করিয়া প্রবাসে পালাইবেন ইহাতে আশ্চর্য্য হই না। কিন্তু চোরকে যদি আমাদের বঙ্গদর্শনে বাঁধিতে পারি তবেই তাঁহার উপযুক্ত শাস্তি হইবে।

উল্লেখ্য, 'কবি-ভ্রাতা' দেবেন্দ্রনাথ সেন 'শ্রীকমলাকান্ত শর্ম্মা' ছদ্মনামে প্রবাসী-তে 'প্রয়াগধামে কমলাকান্ত' [পৃ ৪-৫] রসরচনা ও 'আদর্শ কবি' [পৃ ৫-৮] গল্প ধারাবাহিকভাবে লিখতে শুরু করেন; তাঁর স্বনামে 'আবাহন' [পৃ ১-৪] শীর্ষনামে ১৫টি সনেট পত্রিকার সূচনাতেই মুদ্রিত হয়। প্রবাসীর প্রথম সংখ্যার সমালোচনা-শেষে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন :

বস্তুতঃ কাগজের প্রথম সংখ্যা জিনিষটা বড়ই অসহায়। সে নিতান্তই একা; স্থান সংক্ষেপ ও প্রথম আয়োজনের ঝঞ্ঝাটে অল্প নমুনাই সে দেখাইতে পারে—পাঠকদের চক্ষু ভরিয়া দিবার মত পুঁজি তাহার থাকে না। অতএব প্রথম সংখ্যা লইয়া নানা লোকে নানা অভিযোগ উপস্থিত করিলে নিরুত্তর থাকিতে হয়—কালে তাহা আপনি থামিয়া যায় এবং পাঠকেরা আপনাদের কাগজটিকে ভাল করিয়া চিনিয়া লইতে পারেন। আমাদের বিবেচনায় প্রথম সংখ্যাটিকে অত্যুজ্জ্বল করিয়া তুলিলে পরিচয়কে ক্রমশঃ অগ্রসর করিবার পথে ব্যাঘাত ঘটে, সে উপায়ে, ক্রমশঃ পাঠকদের আকাঙ্ক্ষা পূরণ না করিয়া ক্রমশঃই তাঁহাদিগকে হতাশ করিয়া ফাঁকি দিতে বাধ্য হইতে হয়।

—এই লেখাটিকে কি আমরা নবপর্যায় বঙ্গদর্শন-এর প্রথম সংখ্যা সম্পর্কে সম্পাদকের কৈফিয়ৎ হিসেবে গ্রহণ করতে পারি? রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের অনুরোধে রবীন্দ্রনাথ প্রথম সংখ্যা প্রবাসী-র জন্য 'প্রবাসী' [পৃ ২২-২৪; দ্র উৎসর্গ ১০।২৬-২৯, ১৪-সংখ্যক] নামে ১০০ ছত্রের একটি দীর্ঘ কবিতা লিখে দেন। কবিতাটি নৈবেদ্য কাব্যগ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার কথা ছিল [দ্র চিঠিপত্র ৮।১৬২-৬৩], কিন্তু সেই পরিকল্পনা তিনি ত্যাগ করেন।

প্রথম সংখ্যা বঙ্গদর্শন-এর অন্যান্য লেখকেরা হলেন ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়, দীনেশচন্দ্র সেন, নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ও চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়। নৈবেদ্য-এর 'হে সকল ঈশ্বরের পরম ঈশ্বর' [দ্র নৈবেদ্য ৮। ৪৭-৪৮, ৫৭-সংখ্যক] সনেটটিকে শিরোভূষণ করে ব্রহ্মবান্ধব 'হিন্দুজাতির একনিষ্ঠতা' [পৃ ৮-১৩] প্রবন্ধটিতে হিন্দু বর্ণাশ্রম-ধর্মের প্রশংসা করে লেখেন :

একনিষ্ঠচিন্তাপ্রবণতা, বস্তুর বস্তুত্ব দর্শন, কর্ত্তা এবং কার্য্যের পারমার্থিক অভেদানুভূতি, বহুত্বের মায়িকতা জ্ঞানই হিন্দুর হিন্দুত্ব। বেদে ইহার আরম্ভ এবং বেদান্তে পরিণতি। এই আধ্যাত্মিক দর্শন বর্ণাশ্রম ধর্ম্মে প্রকটিত হইয়াছিল। ভিন্নকে অভিন্ন করা, অনেককে একীভূত করা বর্ণবিভাগের উদ্দেশ্য। যে দিন হইতে এই একনিষ্ঠ চিন্তাশীলতার হ্রাস হইতে লাগিল, যে দিন হইতে বর্ণাশ্রমধর্ম্মের ব্যতিক্রম আরম্ভ হইল, সেই দিন হইতে ভারতের অধঃপতন।···· পাশ্চাত্য বিদ্যা লাভ করিয়া আর্য্যসন্তানেরা বহুনিষ্ঠ ও বর্ণাশ্রমবিরোধী হইয়া উঠিয়াছে। যতদিন ঋষিদিগের অভেদদৃষ্টি এবং বর্ণধর্ম্ম পুনরাবির্ভূত না হয় ততদিন ভারতের উত্থান অসম্ভব।

স্ব-বিরোধিতায় পূর্ণ এই রচনার যথার্থ প্রতিবাদ করেছেন সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর আষাঢ়-সংখ্যার 'আলোচনা'-য় [পৃ ১৩০-৩২] :

প্রবল পাশ্চাত্য প্রতিদ্বন্দ্বিতার নিষ্পেষণে আত্মরক্ষার্থে ভারতবর্ষের সকল স্থানীয় হিন্দুদের পরস্পরের সহিত ঘনিষ্ঠতর সম্বন্ধস্থাপন অত্যাবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে। এই নিমিত্ত জাতিগত পূর্ব্ব নিয়মাবলী ক্রমেই অধিক কষ্টদায়ক ও অসুবিধাজনক হইয়া পড়িতেছে। তাহার ফলে অনেকে প্রকাশ্যে বা অপ্রকাশ্যে পাশ্চাত্য রীতিনীতির আশ্রয় লইতে বাধ্য হইতেছে। বিবাহের ক্ষেত্র অযথাভাবে সঙ্কীর্ণ রাখার দরুণ পণগ্রহণ প্রভৃতি নানা কুপ্রথা বঙ্গসমাজে বদ্ধমূল হইবার উপক্রম করিতেছে। এ অবস্থায় পাশ্চাত্যশিক্ষার প্রভাবে বর্ণবিভাগের অক্ষুণ্ণতার যে পরিমাণ ব্যতিক্রম দৃষ্ট হইতেছে, তাহা কি বাঞ্ছনীয় এবং আশাপ্রদ নহে?

কোনোরকম আধ্যাত্মিক কুয়াশা সৃষ্টি না করে বাস্তব অবস্থার যথার্থ পরিপ্রেক্ষিতে আদি ব্রাহ্মসমাজের অন্যতম সম্পাদক হয়েও সুরেন্দ্রনাথ এই প্রশ্ন উত্থাপন করেছিলেন। কিন্তু ব্রহ্মবান্ধবের ব্যক্তিগত প্রভাবে সাময়িকভাবে অভিভূত রবীন্দ্রনাথ বেশ কিছুকাল হিন্দুত্বের এই প্রতিক্রিয়াশীল ধারণার জগতে অবস্থান করেছেন।

রজতজয়ন্তী বর্ষের ভারতী-র প্রথম সংখ্যার [২৫।১] জন্য রবীন্দ্রনাথ সরলা দেবীর কাছ থেকে একটি 'মাঙ্গলিক' লেখবার ফরমাশ পেয়েছিলেন, কিন্তু তিনি সেই অনুরোধ রক্ষা করতে পারেননি। এই সংখ্যায় তাঁর

রচনা তিনটি :

২-৩ 'সাগর সঙ্গম' ['হে পথিক কোনখানে'] দ্র উৎসর্গ-সংযোজন ১০।৭৯

৭২-৭৭ 'চিরকুমার সভা' ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ দ্র প্রজাপতির নির্ব্বন্ধ ৪।৩৪২-৪৬ [১৪শ]

৯৯-১০৮ 'নষ্টনীড়' প্রথম পরিচ্ছেদ দ্র গল্পগুচ্ছ ২২।২০৭-১৪

মাধুরীলতার বিবাহের বিষয়ে কথাবার্তার জন্য কলকাতায় এসে রবীন্দ্রনাথ ১০ বৈশাখ [মঙ্গল 23 Apr] শিলাইদহে ফিরে যান। সেখানে গিয়েও তিনি প্রিয়নাথ সেন ও ভাবী জামাতা শরৎকুমারকে যে-সমস্ত পত্র লিখেছিলেন, সেগুলির কথা আমরা আগেই উল্লেখ করেছি। সংকটজনকভাবে আলোচনা অসমাপ্ত থাকার জন্য রবীন্দ্রনাথ উদ্বিগ্ন থাকলেও তাঁকে অন্য আহ্বানে সাড়া দিতে হয়েছে। সেই কথাই তিনি বসন্তকুমার গুপ্তকে লিখেছেন ১২ বৈশাখ [বৃহ 24 Apr] তারিখে : '২৩শে বৈশাখ ত্রিপুরার মহারাজ দার্জ্জিলিং যাত্রা করিবেন। যুবরাজ ও মধ্যমঠাকুরের অধ্যাপনা সম্বন্ধে পরামর্শ লইবার জন্য আমাকেও বিশেষ করিয়া আহ্বান করিয়াছেন। বৈশাখের শেষভাগে আমাকে যাইতে হইবে।'[১৩]

[এই পত্রের অপ্রকাশিত অংশে ঠাকুর-কোম্পানির ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী নিশিকান্ত সম্পর্কে তিনি লিখেছেন : 'অনেক চেষ্টা করিয়াও নিশিকান্তের কোন পত্র পাওয়া গেল না। আপনার নিকট হইতে সংবাদ পাওয়া যাইবে আশা করিয়াছিলাম—না পাইয়া উদ্বিগ্ন হইয়াছি। অনুগ্রহ করিয়া লিখিবেন।'[১৪] দেনায় আপাদমস্তক নিমজ্জিত রবীন্দ্রনাথ উক্ত নিশিকান্তের কাছ থেকে হৃতসম্পদ পুনরুদ্ধারের আশা ত্যাগ করেননি, কিন্তু বসন্তকুমার তাঁর কাছ থেকে নানাভাবে উপকৃত হয়েও এ-বিষয়ে তাঁকে কিছুমাত্র সাহায্য করেছিলেন বলে জানা যায় না।]

দার্জিলিং যাওয়ার ব্যাপারে রাধাকিশোর রবীন্দ্রনাথের সম্মতির কথা আগেই জেনে গিয়েছিলেন তাঁর ৮ বৈশাখের পত্রে; ১৪ বৈশাখ [শনি 27 Apr] প্রত্যুত্তরে তিনি লেখেন :

> আপনার পত্র পাঠে আপনি দার্জ্জিলিং যাইতে ইচ্ছুক আছেন জানিতে পারিয়া বড় সুখী হইলাম। অনেক দিনের পর এখানকার ঝঞ্ঝাটগুলি এক প্রকার সুবিধা করিয়া লইতে সক্ষম হইয়াছি। এক্ষণে কিছুদিনের জন্য যথাসাধ্য বিশ্রাম লাভের চেষ্টায় আছি। হিমালয়ের মহান্ সৌন্দর্য্যের সহিত আপনার কবিতা ও সঙ্গীত সংযোগে আমার অবসরকালের বিশ্রাম কত যে মধুময় হইবে তাহাই ভাবিয়া উৎসাহিত আছি। আপনার কবিতার খাতা ও দুই একখানা বই সঙ্গে লইবেন। আমিও দু'চারখানা সঙ্গে আনিতেছি।····২৩শে তারিখ সোমবার এখান হইতে যাত্রা করিব। মঙ্গলবার বিকালবেলা অনুমান ৪।টার সময় কুষ্টিয়া ষ্টেশনে পৌঁছিব। তথা হইতে আমরা একত্রে যাইতে পারি। দার্জ্জিলিং-এ আমাদের জন্য যে বাড়ী ভাড়া করা হইয়াছে, তাহাতে আমাদের সকলেরই সঙ্কুলন হইবে।····
>
> পলিটিকেল এজেন্টের পরামর্শে মহিম ও যতীকে তাড়াতাড়ি আজমীর পাঠাইলাম না। ভালই হইয়াছে। আপনার সহিত পরামর্শ করিবার সুবিধা পাইয়াছি।[১৫]

ইংরেজ গবর্মেন্ট দেশীয় রাজ্যের রাজকুমারদের শিক্ষার জন্য আজমীরে মেয়ো কলেজ স্থাপন করে। বিলাতিয়ানায় দীক্ষিত করার এই ধরনের শিক্ষালয়ে দেশীয় রাজপুত্রদের প্রেরণ করার অত্যন্ত বিরোধী ছিলেন রবীন্দ্রনাথ। প্রাচীন ভারতের আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে তিনি রাজকুমারদের ভারতীয় রাজধর্ম শিক্ষা দেওয়ার পক্ষপাতী ছিলেন। ত্রিপুরার মধ্যম রাজকুমার ব্রজেন্দ্রকিশোরের শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্যাশ্রমে ভর্তির ব্যবস্থা প্রায় পাকা হয়ে গিয়েছিল—কিন্তু রাজদরবারের আভ্যন্তরীণ রাজনীতির কারণে রবীন্দ্রনাথের এই ঐকান্তিক ইচ্ছা পূর্ণ হয়নি।

দার্জিলিঙে রবীন্দ্রনাথের স্বল্পকালীন অবস্থানের সময়ে কাব্যচর্চা ছাড়াও তিনি ত্রিপুরার রাজনৈতিক অবস্থা ও রাজকুমারদের শিক্ষা বিষয়ে রাধাকিশোরের সঙ্গে আলোচনা করেন। সত্যরঞ্জন বসু লিখেছেন : 'দার্জ্জিলিংএ কবির সহিত পরামর্শ করিয়া স্থির হইল এ বিষয়ে সঠিক উপদেশ পাওয়া যাইবে কোচবিহারের মহারাজ নৃপেন্দ্রনারায়ণের নিকট হইতে। কোচবিহারের মহারাজাও তখন দার্জ্জিলিংএ। এই দুই দেশীয় নৃপতির মধ্যে ইহার পূর্ব্বে পরিচয় অথবা দেখা সাক্ষাতের সুযোগ হয় নাই। রবীন্দ্রনাথের উদ্যোগেই উভয়ের সাক্ষাৎ হয়।'[১৬]

গ্রীষ্মকালীন রাজধানী দার্জিলিঙে তখন বাংলার লেফটেনান্ট গবর্নর স্যার জন উডবার্ন থেকে আরম্ভ করে কলকাতার ইংরেজ-ভাবাপন্ন বহু নরনারী উপস্থিত ছিলেন। কেশবচন্দ্র সেনের দুই পুত্র করুণাচন্দ্র ও নির্মলচন্দ্রও তখন দার্জিলিঙে। এঁরা রবীন্দ্রনাথের বন্ধুস্থানীয় ছিলেন। এঁদেরই সাহায্যে রবীন্দ্রনাথ দুই রাজার সম্মিলন ঘটান। কিন্তু অসুস্থতা ও মাধুরীলতার বিবাহের আয়োজনের জন্য তাঁকে সম্ভবত ৪ জ্যৈষ্ঠ [শনি 18 May] শিলাইদহে ফিরে আসতে হয়। কুষ্টিয়া থেকে তিনি রাধাকিশোরকে লেখেন :

> কোচবিহারের মহারাজের সহিত মহারাজের কিরূপ সম্মিলন ও পরামর্শ হইল তাহা জানিবার জন্য আমি নিরতিশয় উৎসুক আছি। দুই মহারাজের মধ্যে বন্ধুত্ব হইলে মন্ত্রণাদি দ্বারা উভয়ে বললাভ করিবেন। ইহা মনে করিয়া আমি পরিশেষে উদ্যোগী হইয়াছিলাম এবং করুণা ও নির্ম্মলের সহায়তায় এই অভিলষিত মিলন সংঘটনের উপায় উদ্ভাবন করিতে ছিলাম। এই মিলনে আমি উপস্থিত থাকিতে পারিলে বড়ই আনন্দ লাভ করিতে পারিতাম। আমার নিতান্ত দুর্ভাগ্য, ঠিক সময়টিতে আমাকে চলিয়া আসিতে হইল। রাজকার্য্য সম্বন্ধে গভর্নমেন্টের সহিত কোন গুরুতর আন্দোলন উপস্থিত হইলে নিঃস্বার্থ, নিরপেক্ষ ও মহারাজের সমশ্রেণীর ব্যক্তিদের সহিত পরামর্শযোগে মহারাজের সেই অভাব মোচন হইবে কল্পনা করিয়া আমি আশ্বস্ত হইতেছি।[১৭]

রাধাকিশোর একটি তারিখহীন পত্রে এর উত্তরে লেখেন :

> ...আবার আজ তিনটার সময় L. G.র সহিত দেখা হইবে। ছেলের শিক্ষা বিষয়ে আপনার ও কুচবিহারের মতই L. G. গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহাকে ভাল করিয়া বুঝাইতে হইয়াছিল। তিনি কুচবিহারের কোন ভাল একজন টিউটার নিযুক্তের জন্য পরামর্শ দিতেছেন। তদনুসারে কুচবিহারের মহারাজের নিকট প্রস্তাব করিয়াছি। বোধ হয় তিনি বিলাতে শীঘ্রই চিঠি লিখিবেন।[১৮]

দার্জিলিঙে থাকার সময়ে রবীন্দ্রনাথ এ-বিষয়ে জগদীশচন্দ্রকেও অনুরোধ করেন : 'তোমাকে একটি কাজের ভার দিতে চাই। যুবরাজের জন্য বিলাত হইতে একটি ভাল শিক্ষক নির্ব্বাচন করিয়া পাঠাইতে হইবে। যুবরাজ ত্রিপুরা হইতে দূরে থাকিয়া সম্পূর্ণ তাঁহার শাসনাধীনে শিক্ষালাভ করিবেন। শিক্ষকটি বিজ্ঞানবিৎ হইলেই ভাল হয়।'[১৯] জগদীশচন্দ্র 20 Jul [শনি ৪ শ্রাবণ] উত্তরে লেখেন : 'মহারাজার যে এ দেশ হইতে Tutor লইবার কথা লিখিয়াছিলে তাহা একজন ভাল লোক দেখিয়া দিতে পারি। কিন্তু এক কথা ভাবিয়া দেখিও। আমাদের দেশের ও এ দেশের আচার্য্যের অনেক প্রভেদ। আমাদের দেশীয় গুরু শিষ্যের উন্নতিতেই সন্তুষ্ট—কিন্তু এ দেশ হইতে কাহাকে নিলে তাহার অনেক গৌণ উদ্দেশ্য থাকিবে।'[২০] রবীন্দ্রনাথও তাঁর পত্রে এই ধরনের আশঙ্কা প্রকাশ করেছিলেন। সত্যরঞ্জন বসু লিখেছেন : 'মহারাজ নৃপেন্দ্রনারায়ণের চেষ্টায় Mr. T.R. Williams, M.A. (Oxon) নামক এক বিশিষ্ট শিক্ষাবিৎ বিলাত হইতে নিযুক্ত হইয়া আসিলেন। তিনি তদানীন্তন সরকারী সংস্কার হইতে মুক্ত থাকিয়া রাজকুমারদের শিক্ষা পরিচালনা করিয়াছিলেন।'[২১]

মাধুরীলতার বিবাহ ১৩ জ্যৈষ্ঠ [সোম 27 May] হবে বলে কোনো এক সময়ে ভাবা হয়েছিল। এই নিয়ে বৈশাখ মাসের মাঝামাঝি রবীন্দ্রনাথ ও প্রিয়নাথের মধ্যে যে পত্র-বিনিময় তা রক্ষিত হয়নি। সম্ভবত ২২ বৈশাখ রবীন্দ্রনাথ প্রিয়নাথকে লেখেন : 'টাকা দেওয়া সম্বন্ধে কাল তোমাকে যে প্রশ্ন করেছি তার উত্তর দিয়ো।

১৩ই জ্যৈষ্ঠ ত হওয়া অসম্ভব, অন্য কোন্ তারিখে হতে পারে তুমিই সেটা পাঁজি পুঁথি মিলিয়ে আমাকে ঠিক করে লিখে দাও না।.... বিলম্বে আশঙ্কার কারণ আছে যদি মনে কর তাহলে জ্যৈষ্ঠের ২৮শে তারিখ কৃষ্ণানবমী স্থির করতে হয়। ....ইচ্ছা ছিল দীর্ঘকাল দার্জ্জিলিঙে কাটাব কিন্তু বেলার এই বিবাহের উদ্যোগে চট্পট্ চলে আস্তে হবে।'[২২] ২৬ বৈশাখ [বৃহ 9 May] লেখেন : 'দার্জ্জিলিঙে। খবরাদি পেতে নিতান্ত উৎসুক।'[২৩] ৪ জ্যৈষ্ঠ [শনি 18 May] লেখেন : 'এইমাত্র দার্জ্জিলিং থেকে কুষ্টিয়ায় ফিরে এলুম। হয়ত শিলাইদহে গিয়েই তোমার চিঠিতে সমস্ত অবগত হব।·····২৮শে যদি দিন স্থির হয়, তবে এখনি আমাদের রওনা হতে হবে—নইলে কিছুই গুছিয়ে উঠ্তে পারব না।'[২৪] কোন্ তারিখে কোথা থেকে লেখা বলা শক্ত [হয়তো দার্জিলিং-প্রত্যাগত ত্রিপুরারাজের সঙ্গে দেখা করতে কুষ্টিয়া এসে ৫।৬ জ্যৈষ্ঠে লেখা]—একটি পত্রে এই বিবাহ বিষয়ে তাঁর তীব্র ক্ষোভ ব্যক্ত হয়েছে

উত্তম কথা। আর আমি কিছু বলিব না। বিবাহ জ্যৈষ্ঠের শেষেই স্থির কর। আমি বুধবারে শিলাইদহে যাত্রা করিয়া পরিজনবর্গকে কলিকাতায় লইয়া আসি—বাদবিতণ্ডা মনস্তাপ পরিতাপ যথেষ্ট হইয়া গেছে এখন অশান্তিকে বিশ্রাম দেওয়া যাক। আমাদের বাড়িতে অনেক বিবাহ হইয়া গেছে—আমার কন্যার বিবাহেই প্রত্যেক কথা লইয়া দর দস্তুর হইল ইতঃপূর্ব্বে এমন ব্যাপার আর হয় নাই। এ ক্ষোভ আমার থাকিবে। দশ হাজারের উপর আবার আরো দুই হাজার চাপাইয়া ব্যাপারটাকে আরো কুৎসিত করা হইয়াছে। পরমাত্মীয়কে প্রসন্নমনে দান করিবার সুখ যে আমার আর রহিল না, আমাকে পাক দিয়া মোচড় দিয়া নিংড়াইয়া লওয়া হইল।······এ বিবাহে আমার এবং বেলার মার উভয়েরই মনের মধ্যে একটি ক্ষতরেখা রহিয়া গেল, এমন কি তিনি কন্যার মাতা হইয়াও এ বিবাহে যথেষ্ট উৎসাহী হন নাই। যাহা হউক ভুলিবার চেষ্টা করিব। মঙ্গলকর্ম্ম মঙ্গলের জন্যই হউক![২৫]

রবীন্দ্রনাথের ক্ষোভ প্রশমিত করবার জন্য ও তাঁর কাছ থেকে দুটি টেলিগ্রাম পেয়ে প্রিয়নাথ শিলাইদহে যান ৯ জ্যৈষ্ঠ [বৃহ 23 May] তারিখে। শরৎকুমারের মেজদাদা হৃষীকেশও ওকালতি ব্যবসায়ের জন্য মজঃফরপুরে ছিলেন; 27 May [সোম ১৩ জ্যৈষ্ঠ] প্রিয়নাথ তাঁকে এই খবর জানিয়ে লিখেছেন :

I was at Shelidah (Robi Babu's mofussil home) on Thursday last. I went there as much of my own motion as by reason of two telegraphic communications from him inviting me there to discuss the marriage matter with his wife. He was very much pleased to learn that you had agreed to my proposal about Krishna Kamal Babu and so the only sore point in the matter so far as he is concerned has been removed, thanks to your good nature. ...Robi Babu with all his family is coming down by today's evening mail for the marriage. His wife is dissatisfied with him (this is between you and me) because of his bungling throughout the negotiation and has asked me henceforth to communicate with her personally regarding the marriage.[২৬]

এই পত্র এবং ক্যাশবহির হিসাব অনুযায়ী ১৩ জ্যৈষ্ঠ তারিখেই রবীন্দ্রনাথ সপরিবারে কলকাতায় উপস্থিত হন। পরদিন সকালেই তিনি প্রিয়নাথের সঙ্গে দেখা করেন এবং বিবাহের দিন ১ আষাঢ় [শনি 15 Jun] স্থিরীকৃত হয়। এইদিন [১৪ জ্যৈষ্ঠ : 28 May] প্রিয়নাথ হৃষীকেশ চক্রবর্তীকে লেখেন :

As intimated in my last letter Robi Babu came down to Calcutta with his family by the evening mail yesterday and saw me this morning.at my house. The marriage has been fixed for the first of Ashar. It will be therefore necessary for you and Sarat with your people there to start for Calcutta by the 25th of Jaistha at the latest. ....Robi Babu has asked me to telegraph to you the intimation as to the day of the marriage.... The reason for telegraphing the message is he wants to ask the Maharajas of Tipperah and Natore and to arrange for their being present at the marriage for reasons I will tell you when we meet.[২৭]

১৬ জ্যৈষ্ঠ [বৃহ 30 May] রবীন্দ্রনাথ নাটোরের মহারাজকে চিঠি লেখেন ও 'শ্রীমতী বেলা দেবীর বিবাহের বন্দোবস্তের জন্য বাবু প্রিয়নাথ সেনের বাটী' যাতায়াত করেন। নূতন বাড়িতে তিনি গৃহপ্রবেশ করেন এই দিন। ক্যাশবহির হিসাবে আছে,: 'শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের নূতন বাটীর গৃহ প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে ব্যয়/পণ্ডিত হেমচন্দ্র বিদ্যারত্নের দক্ষিণা ৬ /হেমচন্দ্র চক্রবর্ত্তী ৫ চিন্তামণি চট্টোপাধ্যায় ৫ '—হেমচন্দ্র বিদ্যারত্ন আচার্যের কাজ করেন।

এর পরেই বিবাহের আয়োজন ও নিমন্ত্রণ উপলক্ষে রবীন্দ্রনাথ রোজই ভ্রাম্যমান, চিঠি লেখারও বিরাম নেই। 'প্রিয়নাথ সেনের বাটী' তিনি প্রায় প্রত্যহই গেছেন; এছাড়া ১৮ জ্যৈষ্ঠ বালিগঞ্জ, ১৯ জ্যৈষ্ঠ মোহিনীমোহন চট্টোপাধ্যায়, ২০ জ্যৈষ্ঠ হাইকোর্ট, ২৫ জ্যৈষ্ঠ 'সিয়ালদহ প্রভৃতি স্থানে', ২৯ জ্যৈষ্ঠ বালিগঞ্জ ও বিডন স্ট্রীট, ৩০ জ্যৈষ্ঠ 'থ্যাকার কোং' যাতায়াত করেছেন; চিঠি লিখেছেন বোম্বাইতে জ্যোৎস্নানাথ ঘোষাল, এলাহাবাদে এস. সি. চ্যাটার্জী, নাটোরের মহারাজা, 'বিলাতে ডা° জে. সি. বসুর নিকট ২১ জ্যৈষ্ঠ', দেওঘরে প্রমথনাথ রায়চৌধুরী ও শান্তিনিকেতনে দ্বিপেন্দ্রনাথের কাছে; টেলিগ্রাম করেছেন উটকামণ্ডে নাটোরের মহারাজা, ত্রিপুরার মহারাজা ও শরৎকুমার চক্রবর্তীর কাছে। 4 Jun [মঙ্গল ২১ জ্যৈষ্ঠ] শরৎকুমারকে প্রেরিত জরুরী টেলিগ্রামে ছিল :

Entreat come soon delay uncertainty hampering us Assure you everything will be settled satisfactorily Wire intention.[২৮]

এর কয়েকদিন পরে শরকুমারের উপস্থিতিতে আনুষ্ঠানিক 'পাকাদেখা'র কাজ নিষ্পন্ন হয়। একটি তারিখহীন পত্রে রবীন্দ্রনাথ প্রিয়নাথকে লিখেছেন : 'কাল শরৎরা সন্ধ্যার সময় এসেছিল—দেখাশুনার কাজ হয়ে গেছে।'[২৯] ইন্দিরা দেবী এই ঘটনার স্মৃতিচারণ করে লিখেছেন : 'বেলাকে যখন তার ভবিষ্যৎ শ্বশুরবাড়ির লোকেরা দেখতে আসে তখন রবিকাকার লালবাড়ির বারান্দায় তাঁদের খাওয়ানো হয়। আমরা মেয়ের দল পাশের ছোটো ঘর থেকে খড়খড়ে তুলে তাঁদের উঁকি মেরে দেখেছিলুম। এতদিন পরে স্বীকার করতে দোষ নেই যে, শরৎ চক্রবর্তী অর্থাৎ রবিকাকার মনোনীত জামাইয়ের চেয়েও তাঁর মেজভাই ঋষিবরই দেখতে ভালো ছিল।[৩০]

পাকাদেখার ব্যাপারটিও অবশ্য সহজে ঘটে নি, এ ব্যাপারেও সংসারানভিজ্ঞতার পরিচয় দিয়ে রবীন্দ্রনাথ একটি বিভ্রাট বাধিয়ে বসেন। একটি তারিখহীন পত্রে তিনি প্রিয়নাথকে যা লেখেন তা থেকেই বিষয়টি পরিস্ফুট হয় :

আর একটা বুঝি গলদ করিয়াছি। আজ তোমার পত্র আমার স্ত্রীকে দেখাইলে তিনি তোমার পত্রোদ্ধৃত কন্যা দেখান'র সর্ত্ত পড়িয়া বলিলেন—ইহা বিধিসম্মত নহে, বাড়ীর সকলেই ইহাতে আপত্তি করিবেন এবং আমার পিতা ইহাতে কোনমতেই অভিমত দিবেন না। আমি দেখিতেছি, সাংসারিক কর্ম্মের সম্বন্ধে আমি নিতান্ত গর্দ্দভ এবং অনভিজ্ঞ। সত্য কথা বলিতেছি, এ প্রস্তাবে তুমি যখন কোন সঙ্কোচের কারণ প্রকাশ কর নাই, তখন ইহাতে যে কাহারো বিশেষ আপত্তি হইবে তাহা আমার মনে উদয় হয় নাই।.....বিবাহের পূর্ব্বে কন্যাকে অন্য বাড়িতে দেখাইতে লইয়া যাওয়া যে সর্ব্বপ্রকার শিষ্ট প্রথার বিরুদ্ধ, তাহা আমার গৃহিণী সম্পূর্ণরূপে প্রমাণ করিয়া দিয়াছেন। এরূপ স্থলে আমাদের বাড়িতে পুরুষ অভিভাবক কন্যাগৃহে গিয়া দেখিয়া আসে—এবং চিন্তা করিয়া দেখিলে সেইটেই সঙ্গত প্রথা। আমি বেশ বুঝিতে পারিতেছি, এই কথাটা লইয়া আবার একটা বিপ্লব উপস্থিত হইবে এবং কথার প্রত্যাহার লইয়া তোমাদের কাছে গঞ্জিত হইব। তোমার উপর ছাড়া আর কাহারো উপর আমি রাগ করিতে পারি না। তুমি ত একাধিক জামাতার শ্বশুর, সংসারে তুমি আমার অপেক্ষা অনেক দূরে অগ্রসর হইয়াছ—তুমি কেন এরূপ আচারগর্হিত প্রস্তাবে আপত্তি না করিয়া আমাকে ইহার মধ্যে আকর্ষণ করিয়া আনিলে? দুঃখ এই যে, আমার নিরেট মূর্খতায় কুটুম্বিতার পথ প্রথম সূত্রপাতেই এরূপ সংশয়ে সঙ্কটে সমাকীর্ণ হইয়া উঠিল।....কন্যা দেখান, সর্ব্বত্রই delicate ব্যাপার—অতি বড় কন্যাদায়গ্রস্তও বিবাহের পূর্ব্বে বরের গৃহে কন্যাকে দেখাইতে লইয়া যায় না—বিবাহের যদি কোন কথা না হইত তবে কোন একটা উপলক্ষ্য করিয়া লইয়া যাওয়া তেমন কঠিন হইত না—

কিন্তু এখন কি করিয়া হয়? তুমি বলিবে, তখন স্বীকার করিলে কেন? তাহার উত্তর—আমি নির্ব্বোধ—এ সকল সাংসারিক বিষয়ে আমার অভিজ্ঞতাও নাই, বিবেচনাও অল্প—তখন আমার স্ত্রী কাছে থাকিলে এরূপ ঘটিতে পারিত না। কিন্তু তুমি ত আমার মত নও—তুমি কেন এমন প্রস্তাব তুলিলে?····আমি যদি বিচারে অক্ষম হই তুমি কি আমার হইয়া সঙ্গত অসঙ্গত ন্যায় অন্যায় বিচার করিয়া আমাকে অনর্থক জটিলতা হইতে উদ্ধার করিবে না?[৩১]

—এই সমস্যার শেষ পর্যন্ত সুষ্ঠু সমাধান হয়েছিল, কিন্তু পত্রটির মধ্যে যে রবীন্দ্রনাথের পরিচয় পাওয়া যায় তা পরম উপভোগ্য!

ঠাকুরপরিবারের প্রথানুযায়ী শরৎকুমার ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করেন ২৮ জ্যৈষ্ঠ [মঙ্গল 11 Jun] তারিখে; ক্যাশবহির দুটি হিসাবে আছে : 'বাবু শরচ্চন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের ২৮ জ্যৈষ্ঠ তারিখে দীক্ষা হয়.....৫২।৩' ও 'বাবু শরচ্চন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের দীক্ষা উপলক্ষে ব্যায়/পণ্ডিত প্রিয়নাথ শাস্ত্রীর দক্ষিণা ২০/বাবু হেমচন্দ্র চক্রবর্তীর দক্ষীণা ৫ —শেষোক্ত হিসাবটি থেকে বোঝা যায় দীক্ষানুষ্ঠানে প্রিয়নাথ শাস্ত্রী আচার্যের কাজ করেন।

বিবাহটি হয় ১ আষাঢ় [শনি 15 Jun]। ক্যাশবহির কয়েকটি হিসাব উদ্ধৃত করলে বিবাহ সম্পর্কে অনেকগুলি খবর পাওয়া যাবে : শ্রীমতী বেলা দেবীর শুভ বিবাহ ১৩০৮ সালের ১ আষাঢ় রাত্র ৯টার সময় হয়·····৩৬৬৭ল৯'; '১ আষাঢ়ের খরচ/আচার্য্যের দক্ষীণা গিণি ৩ খানা প্রিয়নাথ শাস্ত্রী ১৫ শম্ভুনাথ গড়গড়ী ১৫ চিন্তামণী চট্টোপাধ্যায় ১৫ পুরোহিতের দক্ষীণা/পণ্ডিত হেমচন্দ্র বিদ্যারত্ন ১৬ হেমচন্দ্র চক্রবর্তী ৫'; 'যৌতুক দিবার ব্যায়/বাবু শরচ্চন্দ্র চক্রবর্ত্তীকে শ্রীযুক্ত কর্ত্তাবাবু মহাশয়ের যৌতুক দিবার গিণি ৬৬৭ থান ১৫ হিঃ ১০০০৫'; '৬ রোজ করেন্সী আপিষ হইতে গিণি বদলাইয়া নোট করিয়া আনার যদুনাথের [চট্টো°] যাতায়াতের গাড়ী ভাড়া'—সবগুলি হিসাবই কিন্তু সরকারী ক্যাশবহির, এই বিপুল ব্যয়ের দায় রবীন্দ্রনাথের ক্ষীণ তহবিলকে স্পর্শ করেনি। রবীন্দ্রনাথ কন্যাকে একটি 'যৌতুক লাইব্রেরি' দিয়েছিলেন—যাতে ইংরেজি, বাংলা ও সংস্কৃত গ্রন্থের একটি সুনির্বাচিত সংগ্রহ অন্তর্ভুক্ত ছিল।

ব্যয়বহুল এই অনুষ্ঠানে রবীন্দ্রনাথের অনেক প্রিয়বন্ধুই উপস্থিত থাকতে পারেননি। এই আশঙ্কা প্রকাশ করে মাসখানেক আগে তিনি দার্জিলিং থেকে জগদীশচন্দ্রকে লেখেন : 'আমি এমনি হতভাগ্য, আমার কোন বন্ধুই বিবাহে উপস্থিত থাকিবেন না। তুমি বিলাতে, লোকেন তথৈবচ, মহারাজ সে-সময় বোধ করি আগরতলায়, নাটোর নীলগিরিতে। আমার গৃহে এই প্রথম বড় কাজ—কিন্তু তোমাদের অভাবে আমার উৎসব নিরানন্দ হইবে।'[৩২]

অবশ্য বন্ধুর জয়সংবাদ তাঁর উৎসবকে পূর্ণ করে তুলেছে। 10 May [শুক্র ২৭ বৈশাখ] লণ্ডনের Royal Institutionএ জগদীশচন্দ্র The Response of Inorganic matter to Mechanical and Electrical Stimulus বিষয়ে যে বক্তৃতা করেন, তার ফলে বৈজ্ঞানিক মহলে আলোড়ন উপস্থিত হয়। *Electrician* পত্রিকায় প্রকাশিত তার বিবরণ-সহ 17 May [শুক্র ৩ জ্যৈষ্ঠ] জগদীশচন্দ্র ও তাঁর পত্নী অবলা বসু যে-দুটি পত্র [দ্র পত্রাবলী। ৭৫-৮০, পত্র ২৭; ঐ। ২১৩-১৪, পত্র ১] প্রেরণ করেন, সেগুলি পেয়ে ২১ জ্যৈষ্ঠ [মঙ্গল 4 Jun] রবীন্দ্রনাথ লেখেন : 'ধন্যোহং কৃতকৃত্যোহং! তোমাদের চিঠি পাইয়া আমি প্রাতঃকাল হইতে নূতন লোকে বিচরণ করিতেছি।······বেলার বিবাহের আর ১০।১১ দিন বাকি আছে। তোমার জয়সংবাদে আমার সেই উৎসব দ্বিগুণতর উৎসবময় হইয়া উঠিয়াছে। আমার সভার মধ্যে তুমি তোমার অদৃশ্য কিরণের আলোক

জ্বালিয়া দিয়াছ।’[৩৩] এই দিন তিনি অবলা বসুকে লেখেন : ‘আমার গর্ব্ব আমি গোপন করিতে পারিতেছি না—আমি সকলকে জয়সংবাদ জানাইয়া বেড়াইতেছি। ত্রিপুরার মহারাজকে কাল টেলিগ্রাফ করিয়া দিয়াছি।’[৩৪] জগদীশচন্দ্র স্বীয় জয়সংবাদ ছাড়া উপহার হিসেবে সম্ভবত Joan of Arc এর জীবনীগ্রন্থ পাঠিয়ে 14 Jun [শুক্র ৩১ জ্যৈষ্ঠ] রবীন্দ্রনাথকে লেখেন :‘তোমার কন্যার শুভবিবাহে উপস্থিত থাকিতে না পারিয়া দুঃখিত হইলাম। আমাদের বহু আশীর্ব্বাদ জানাইবে।/একখানা পুস্তক পাঠাই, তোমার কন্যাকে দিবে। সময় হইলে তুমিও পড়িও।’[৩৫] প্রত্যুত্তরে 3 Jul [বুধ ১৯ আষাঢ়] রবীন্দ্রনাথ লেখেন : ‘আমার কন্যার প্রতি তোমার আশীর্ব্বাদসহ সুন্দর উপহারখানি পাইয়া আনন্দলাভ করিলাম। তোমার হস্তাক্ষরসহ এই গ্রন্থখানি বেলা উপযুক্ত আদর করিয়া পড়িবে ও রাখিবে সন্দেহ নাই।’[৩৬] এই পত্রেই তিনি আক্ষেপ করে লিখেছেন : ‘লোকেন বিলাতে গিয়া এমনি মাতিয়া আছে যে, আমাকে কিম্বা বেলাকে একটা ছত্র চিঠিও লিখিল না।‘

ত্রিপুরারাজ রাধাকিশোরও বিবাহোৎসবে যোগ দিতে পারেননি, ২৮ জ্যৈষ্ঠ [মঙ্গল 11 Jun] তিনি লিখেছেন :

> আমার আন্তরিক ইচ্ছা সত্ত্বেও শ্রীমতী বেলার বিবাহে উপস্থিত থাকিতে পারিলাম না! দার্জ্জিলিং হইতে আসিয়াই মহারাণীর চিকিৎসাকার্য্যে ব্যস্ত আছি। ····শ্রীমান মহিমকে শুভবিবাহ ব্যাপারে পাঠাইতেছি, সে আমার হইয়া উক্ত কার্য্যে যোগদান করিবে।····· আপন প্রিয়তর সন্তানের জন্য ভগবানের নিকট লোকে যেরূপ মঙ্গল কামনা করিয়া থাকেন আমিও উক্ত নব দম্পতির জন্য তাহাই করিতেছি।[৩৭]

প্রাথমিক উদ্বেগ, অশান্তি,ক্ষোভ ইত্যাদির পর শুভকার্য সুসম্পন্ন হওয়াতে রবীন্দ্রনাথের মনও স্বস্তি লাভ করেছে, বিশেষত শরৎকুমারকে যে তাঁর যথেষ্ট ভালো লেগেছে সেকথা জানিয়েছেন জগদীশচন্দ্রকে পূর্বোল্লিখিত 3 Jul [বুধ ১৯ আষাঢ়] শিলাইদহ থেকে লেখা পত্রে : ‘আমার জামাতাটি মনের মত হইয়াছে। সাধারণ বাঙালি ছেলের মত নয়। ঋজুস্বভাব, বিনয়ী অথচ দৃঢ়চরিত্র, পড়াশুনা ও বুদ্ধিচর্চ্চায় অসামান্যতা আছে—আর একটি মহদ্‌গুণ এই দেখিলাম,. বেলাকে তাহার ভাল লাগিয়াছে।’[৩৮] অবশ্য ক'দিন রবীন্দ্রনাথ জামাতাকে পর্যবেক্ষণ কররার সুযোগ পেয়েছিলেন বলা শক্ত, সম্ভবত ফুলশয্যা ইত্যাদি মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানের পরেই শরৎকুমার মাধুরীলতাকে শ্বশুরালয়ে রেখে মজঃফরপুরে গমন করেন। বিবাহানুষ্ঠানের পর রবীন্দ্রনাথও যথারীতি ভ্রাম্যমান—৩ আষাঢ় ‘বালীগঞ্জ প্রভৃতি’, ৪ আষাঢ়, ‘রাজেন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের বাটী', ৫ ও ৬ আষাঢ় তাঁর বালিগঞ্জ যাওয়ার হিসাব ক্যাশবহিতে পাওয়া যায়। ৫ আষাঢ় [বুধ 19 Jun] ‘এণ্ডি পোকার বস্তা সিয়ালদহে পাঠাইবার মুটে ভাড়া’র হিসাব দেখে আশ্চর্য হতে হয়—১৩০৫-০৬ বঙ্গাব্দের অভিজ্ঞতার পরেও রেশমকীট নিয়ে পরীক্ষা করার সাহস ও ধৈর্য তাঁর ছিল? ৭ আষাঢ় ‘বি, এন, শীল দং ইলেকট্রীক লাইট ফিট করার ১ বিল মধ্যে ৫০০্’ পরিশোধের হিসাব থেকে জানা যায়, রবীন্দ্রনাথের লালবাড়িতে ইতিমধ্যেই বৈদ্যুতিক আলো জ্বলে উঠেছে।

দার্জিলিং-ভ্রমণ, মাধুরীলতার বিবাহের ডামাডোল প্রভৃতি কারণে অত্যন্ত ব্যস্ত ও বিব্রত থাকলেও এই সময়ে রবীন্দ্রনাথের লেখার পরিমাণ খুব কম নয়। জ্যৈষ্ঠ-সংখ্যা ভারতী-র [২৫।২] রচনাগুলি অবশ্য পুরোনো :

১১৩-১৪ ‘পিপাসী’

১১৩ (১) ‘দীর্ঘকাল অনাবৃষ্টি, অতি দীর্ঘকাল’ দ্র নৈবেদ্য ৮।৬৬, ৮৬-সংখ্যক

১১৩-১৪ (২) 'আমার এ মানসের কানন কাঙাল' দ্র ঐ ৮।৬৬-৬৭, ৮৭-সংখ্যক

১৪০-৫৯ 'চিরকুমার সভা' চতুর্দশ-পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ দ্র প্রজাপতির নির্বন্ধ ৪।৩৪৭-৬১ [পঞ্চদশ-ষোড়শ পরিচ্ছেদ]

১৮৯-২০৪ 'নষ্টনীড়' দ্বিতীয়-চতুর্থ পরিচ্ছেদ দ্র গল্পগুচ্ছ ২২।২১৪-২৪

'চিরকুমার সভা' এই সংখ্যাতেই সমাপ্ত হয়েছে। ভারতী-র আষাঢ়-সংখ্যায় [পৃ ২৯৫-৩১১] মুদ্রিত হয় 'নষ্ট নীড়'-এর পঞ্চম-অষ্টম পরিচ্ছেদ [দ্র গল্পগুচ্ছ ২২।২২৪-৩৬]।

বঙ্গদর্শন-এর জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ় সংখ্যা স্বতন্ত্রভাবে চিহ্নিত হলেও আষাঢ়ের মাঝামাঝি প্রকাশিত হয় যুগ্মসংখ্যা-রূপে। দার্জিলিং থেকে কুষ্টিয়ায় ফিরে 18 May [শনি ৪ জ্যৈষ্ঠ] রবীন্দ্রনাথ প্রিয়নাথকে লেখেন : 'এর মধ্যে বঙ্গদর্শনের দরখাস্তও পেশ করি। লেখা না পেলে মারা যাব—কারণ, আমি বিচিত্র টানাটানিতে লেখবার সময় করে উঠ্‌তে পারচিনে'[৩৯]—কিন্তু এই যুগ্ম-সংখ্যায় রবীন্দ্র-রচনার সূচীটি খুব ছোটো নয়।

বঙ্গদর্শন, জ্যৈষ্ঠ ১৩০৮ [১/২]:

৬৭-৭৪ 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার আদর্শ' দ্র ভারতবর্ষ ৪|৪১৬-২৪ ['প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য সভ্যতা']

৭৯-৯৪ 'চোখের বালি' ৫-১০ দ্র চোখের বালি ৩।২৯৮-৩১৫

৯৯-১০৫ 'নকলের নাকাল' দ্র সমাজ ১২।২২৯-৩৫

১০৫-০৬ 'কবিচরিত' ['বাহির হইতে দেখ না এমন করে'] দ্র উৎসর্গ ১০।৩৬-৩৮, ২১-সংখ্যক

১০৬ 'কবির বিজ্ঞান' ['আছি আমি বিন্দুরূপে, হে অন্তরযামী'] দ্র ঐ ১০।৩৮, ২২-সংখ্যক

বঙ্গদর্শন, আষাঢ় ১৩০৮ [১।৩]

১০৭-১১ 'সমাজভেদ' দ্র স্বদেশ ১১।৪৮৪-৮৯

১১৮-২৩ 'আচার্য্য জগদীশের জয়বার্ত্তা' দ্র চিঠিপত্র ৬।১০৭-১৫

১২৩-২৪ 'জগদীশ চন্দ্র বসু' ['ভারতের কোন্ বৃদ্ধ ঋষির তরুণ মূর্তি তুমি'] দ্র উৎসর্গ ১০।৪৫-৪৬, ৩০-সংখ্যক

১২৪-২৮ 'কবিজীবনী' দ্র সাহিত্য ৮।৪৫২-৫৫

১৩২-৩৪ 'আলোচনা। (খ) নকলের নাকাল সম্বন্ধে' দ্র সমাজ-পরিশিষ্ট ১২।৪৯৬-৯৮

১৪৩-৪৭ 'মাসিক সাহিত্য সমালোচনা'

১৪৩-৪৪ ভারতী। জ্যৈষ্ঠ; ১৪৪-৪৫ সাহিত্য। চৈত্র; ১৪৫-৪৬ প্রদীপ। বৈশাখ; ১৪৬-৪৭ প্রবাসী। জ্যৈষ্ঠ

১৪৮ 'প্রাকৃত ও সংস্কৃত' দ্র শব্দতত্ত্ব-পরিশিষ্ট ১২।৫৬৩-৬৪

'বর্ত্তমান বঙ্গচিত্তের শ্রেষ্ঠ আদর্শকে উপযুক্তভাবে····প্রতিফলিত করা'র সংকল্প নিয়ে বঙ্গদর্শন-এর সম্পাদনা-ভার গ্রহণ করে রবীন্দ্রনাথ প্রথম থেকেই ভারতীয় ও য়ুরোপীয় সভ্যতার বিশিষ্ট প্রকৃতিটি বুঝে নিয়ে উভয়ের মধ্যে সামঞ্জস্যবিধানের পথনির্দেশ করার প্রয়াস করেছেন। 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য সভ্যতা' প্রবন্ধে য়ুরোপীয় সভ্যতার প্রকৃতি আলোচনা করতে গিয়ে তিনি প্রথমে ফরাসি ঐতিহাসিক ও রাজনীতিক গিজো [Guizot,

Francois, 1787-1874]র মত উদ্ধার করেছেন। গিজো বলেন, প্রাচীন য়ুরোপীয় ও এশীয় সভ্যতাগুলির মধ্যে এক ধরনের একমুখী ভাব দেখতে পাওয়া যায় যা উন্নতির একটি বিশেষ স্তর পর্যন্ত অগ্রসর হয়ে স্থবিরতা প্রাপ্ত হয়েছে; অপরদিকে আধুনিক য়ুরোপীয় সভ্যতা অনন্ত জটিলতা ও সংঘাতের মধ্য দিয়ে সতত সঞ্চরমান হয়েও তার বহু-বিচিত্র চেষ্টা ও স্বাতন্ত্র্যের ভিতর একটি ঐক্যকে প্রকাশ করেছে। রবীন্দ্রনাথের মতে, সেই ঐক্য হল রাষ্ট্রীয় স্বার্থ— 'সেইখানে তাহারা একাগ্র, তাহারা প্রবল, তাহারা নিষ্ঠুর, সেইখানে আঘাত লাগিলেই সমস্ত দেশ একমূর্তি ধারণ করিয়া দণ্ডায়মান হয়।' কিন্তু 'প্রত্যেক জাতির যেমন একটি জাতিধর্ম আছে, তেমনি জাতিধর্মের অতীত একটি শ্রেষ্ঠ ধর্ম আছে, তাহা মানব-সাধারণের।' আর্যসভ্যতা এক সময় আত্মরক্ষার জন্য ব্রাহ্মণ-শূদ্রে দুর্লঙ্ঘ্য ব্যবধান রচনা করেছিল, কিন্তু বর্ণাশ্রম-ধর্মের আকার ধারণ করে যখন তা শূদ্রকে উচ্চ অঙ্গের মনুষ্যত্বচর্চা থেকে বঞ্চিত করল তখন ধর্ম তার প্রতিশোধ নিল। 'শূদ্রকে ব্রাহ্মণ উপরে উঠিতে দেয় নাই, কিন্তু শূদ্র ব্রাহ্মণকে নিচে নামাইল।' ন' বছর পরে এই বক্তব্যকেই তিনি ছন্দে গেঁথেছেন :

> যারে তুমি নীচে ফেল সে তোমারে বাঁধিবে যে নীচে
> পশ্চাতে রেখেছ যারে সে তোমারে পশ্চাতে টানিছে।[৪০]

কিন্তু 'য়ুরোপীয় সভ্যতার মূলভিত্তি রাষ্ট্রীয় স্বার্থ যদি এত অধিক স্ফীতিলাভ করে যে, ধর্মের সীমাকে অতিক্রম করিতে থাকে, তবে বিনাশের ছিদ্র দেখা দিবে এবং সেই পথে শনি প্রবেশ করিবে।' রাষ্ট্রীয় স্বার্থপরতা বিরোধকে ডেকে আনে এবং পৃথিবী নিয়ে 'ঠেলাঠেলি কাড়াকাড়ি'র সময় মিথ্যাচরণ, সত্যভঙ্গ, প্রবঞ্চনা আর লজ্জাজনক বলে মনে হয় না—'এখন গত শতাব্দীর সাম্য-সৌভ্রাত্রের মন্ত্র য়ুরোপের মুখে পরিহাসবাক্য হইয়া উঠিয়াছে।' রাষ্ট্রীয় স্বার্থপরতা যে য়ুরোপের সাহিত্যকেও ক্রমশ অধিকার করছে কিপলিং-এর রচনা তার অন্যতম প্রমাণ। কিন্তু এ ছাড়া একটি বিরোধী ভাবনাও যে সেখানে বর্তমান Feb 1901-সংখ্যা *North American Review* পত্রে প্রকাশিত পরিহাসরসিক Mark Twain [Samuel Langhorne Clemens, 1835-1910]-এর 'To the Person Sitting in Darkness' প্রবন্ধ থেকে দীর্ঘ উদ্ধৃতি দিয়ে রবীন্দ্রনাথ তার উদাহরণ দিয়েছেন।

এই পর্যন্ত আলোচনা তথ্য ও যুক্তির দিক দিয়ে গ্রহণযোগ্য, কিন্তু এর পর তিনি যখন লেখেন :'য়ুরোপে স্বাধীনতাকে যে স্থান দেয়, আমরা মুক্তিকে সেই স্থান দিই। আত্মার স্বাধীনতা ছাড়া অন্য স্বাধীনতার মাহাত্ম্য আমরা মানি না। রিপুর বন্ধনই প্রধান বন্ধন—তাহা ছেদন করিতে পারিলে রাজা-মহারাজার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ পদ লাভ করি'—তখন আমরা বড়ো অসহায় বোধ করি। আত্মিক সমুন্নতির এই আদর্শ ব্যক্তিগত ক্ষেত্রে ভালো, কিন্তু বৃহত্তর পৃথিবীর পরিপ্রেক্ষিতে সমাজ বা দেশ তার দ্বারা কতটুকু উপকৃত হতে পারে সে প্রশ্ন থেকেই যায়।

ব্রিটিশ আমলে দার্জিলিং বাংলা প্রদেশের গ্রীষ্মকালীন রাজধানী হওয়ায় লেফটেনান্ট গবর্নর থেকে আরম্ভ করে বহু উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারীর সঙ্গে অনেক ইংরেজ-ভাবাপন্ন দেশীয় ব্যক্তিও গ্রীষ্মকালে সেখানে ভিড় জমাতেন। বর্তমান বৎসরে বৈশাখের শেষে রাধাকিশোর মাণিক্যের আহ্বানে রবীন্দ্রনাথও সেখানে তাঁর সঙ্গী হয়েছিলেন। সেই 'দুইদিনের জন্য দার্জিলিঙে ভ্রমণ করিতে আসিয়া····বিলাতী-কাপড়-পরা বাঙালি' দেখার অভিজ্ঞতার বিশ্লেষণ 'নকলের নাকাল' প্রবন্ধের বিষয়বস্তু। একদিকে দেবতাত্মা নগাধিরাজ ও অন্যদিকে বিসদৃশ

ইংরেজি কাপড়-পরা বাঙালি তাঁর কাছে একত্রে সাবলাইম ও রিডিক্যুলাসকে উপস্থিত করেছে। প্রবন্ধটির সাধারণভাবে কোনো গুরুত্ব নেই, কারণ ইতিপূর্বে 'কোট বা চাপকান' [দ্র ভারতী, আশ্বিন ১৩০৫।৫০১-১০; সমাজ ১২।২২৩-২৯] প্রবন্ধে তিনি প্রায় একই কথা আলোচনা করেছেন—কিন্তু বঙ্গদর্শন-এ দেশীয় আদর্শের ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে দেশীয় পোশাক সম্পর্কে লেখাও তাঁর পক্ষে জরুরি মনে হয়েছে। তাই যখন তিনি লেখেন : 'ঘিনি সাহেবের অনুকরণ করিয়াছি মনে করিয়া গর্ববোধ করেন তিনি বস্তুত সাহেবির অনুকরণ করিতেছেন। সাহেবির অনুকরণ সহজ, কারণ তাহা বাহ্যিক জড় অংশ; সাহেবের অনুকরণ শক্ত, কারণ তাহা আন্তরিক মনুষ্যত্ব'—তখন তাঁর লক্ষ্যটি বুঝে নিতে ভুল হয় না।

আষাঢ়-সংখ্যায় বিষয়টির পুনরুত্থাপন করে তিনি ব্যাজট্-এর* অভিমত—'সমস্ত জাতি ও সমাজের মধ্যে চিরকাল অনুকরণশক্তি কাজ করিয়া আসিতেছে'—নিয়ে 'আলোচনা' করেছেন। পূর্ব প্রবন্ধে তিনি লিখেছিলেন : "যেটুকু লইলে বাকিটুকুর সহিত বেখাপ হয় না, তাহাকে বলে গ্রহণ করা; যেটুকু লইলে বাকিটুকুর সহিত অসামঞ্জস্য হয়, তাহাকে বলে অনুকরণ করা।' এখানে ব্যাজট্-এর বক্তব্য সম্পর্কে লিখলেন : 'সবলপ্রকৃতি জাতি স্বভাবতই এমন কিছুই গ্রহণ করে না বা দীর্ঘকাল রক্ষা করে না, যাহা তাহার জাতীয় প্রকৃতিকে আঘাত করিতে পারে। দুর্বল জাতির পক্ষে ঠিক উলটা। ····বাহিরের প্রভাব তাহাকে অনেক সময় বিকারের দিকে লইয়া যায়, এইজন্য তাহাকে অতিশয় সাবধানে থাকিতে হয়।' এর পর তিনি মুসলমান আমলের সাজ চাপকান সম্পর্কে যা লিখেছেন, তা ভারতী-র প্রবন্ধেরই প্রতিধ্বনি।

'সমাজভেদ' প্রবন্ধের আপাত-উপলক্ষ Jan 1901-এর *Contemporary Review* পত্রিকায় প্রকাশিত ডাক্তার ডিলন-লিখিত একটি প্রবন্ধ, যাতে চীনাদের উপর য়ুরোপীয়দের অকথ্য অত্যাচার বর্ণিত হয়েছে। মিশনারিদের প্রতি চীনবাসীদের আক্রমণ থেকে এই উৎপাতের সূচনা বলে অভিহিত করে য়ুরোপ এই ঘটনার মধ্যে চীনের বর্বরতা প্রত্যক্ষ করেছে। ঘটনাটির অর্ধশতাধিক বৎসরের প্রাচীন অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক পটভূমিকা রবীন্দ্রনাথের জানা থাকলেও, এখানে তিনি সে-প্রসঙ্গ আলোচনা করেননি, তিনি পাঠকের মনোযোগ আকর্ষণ করেছেন প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সমাজভেদের প্রতি। চীনের রাজ্য চীনের রাজার, সেই রাজ্য কেউ আক্রমণ করলে সাধারণ প্রজার ক্ষতি সামান্য। কিন্তু য়ুরোপের রাজত্ব শুধু রাজার নয়, য়ুরোপীয় সভ্যতার কলেবর সেই রাষ্ট্রতন্ত্রে আঘাত করলে সমস্ত প্রজা প্রাণ দিয়ে সেই আঘাত থেকে আত্মরক্ষার চেষ্টা করে। তাই 'বিবেকানন্দ [রবীন্দ্র-রচনায় এই প্রথম স্বামীজীর উল্লেখ] বিলাতে যদি বেদান্তপ্রচার করেন এবং ধর্মপাল যদি সেখানে ইংরেজ বৌদ্ধসম্প্রদায় স্থাপন করেন, তাহাতে য়ুরোপের গায়ে বাজে না, কারণ য়ুরোপের গা রাষ্ট্রতন্ত্র।' কিন্তু 'প্রাচ্যসভ্যতার কলেবর ধর্ম। ধর্ম বলিতে রিলিজন নহে, সামাজিক কর্তব্যতন্ত্র; তাহার মধ্যে যথাযোগ্যভাবে রিলিজন পলিটিক্স সমস্তই আছে। তাহাতে আঘাত করিলে সমস্ত দেশ ব্যথিত হইয়া উঠে····সেই ধর্মে আঘাত লাগিলে চীন মৃত্যুবেদনা পায় এবং আত্মরক্ষার জন্য নিষ্ঠুর হইয়া উঠে।····তখন চীনসাম্রাজ্য নহে, চীনজাতি জাগ্রত হইয়া উঠে।'

পরিবারপ্রধান ভারতেও তাই বিধবাবিবাহ বৈধ হয়েও সমাজে প্রচলিত হয়নি, কারণ হিন্দুপরিবার বিধবাকে ত্যাগ করে নিজেকে বিক্ষত করতে প্রস্তুত নয়—পরিবারের সঙ্গে একীভূত করার উদ্দেশ্যে হিন্দু বাল্যবিবাহকে শ্রেয়োজ্ঞান করে। এর ক্ষতিকর দিক আছে, কিন্তু হিন্দুর সমাজসংস্থানের দিক থেকে একে বর্বরতা বলা চলে না। অপরপক্ষে য়ুরোপীয় সমাজ-সংস্থানের বৈশিষ্ট্য অনুযায়ীই সেখানে অধিক বয়সে

কুমারীর বিবাহ বা বিধবার পুনর্বিবাহ স্বাভাবিক, সেখানকার প্রথাগুলিকে বিচার করার সময় তার সমাজতন্ত্রের কথা মনে রাখা দরকার।

রবীন্দ্রনাথ তাই পরিশেষে লিখেছেন : 'বস্তুত সভ্যতার ভিন্নতা আছে; সেই বৈচিত্র্যই বিধাতার অভিপ্রেত। এই ভিন্নতার মধ্যে জ্ঞানোজ্জ্বল সহৃদয়তা লইয়া পরস্পর প্রবেশ করিতে পারিলে তবেই এই বৈচিত্র্যের সার্থকতা। যে শিক্ষা ও অভ্যাসে এই প্রবেশের দ্বার রুদ্ধ করিয়া দেয় তাহা বর্বরতার সোপান। তাহাতেই অন্যায় অবিচার নিষ্ঠুরতার সৃষ্টি করিতে থাকে। ····সম্প্রতি য়ুরোপে এই অন্ধ বিদ্বেষ সভ্যতার শান্তিকে কলুষিত করিয়া তুলিয়াছে। ····সেই জন্যই বোয়ারপল্লীতে আগুন লাগিয়াছে, চীনে পাশবতা লজ্জাবরণ পরিত্যাগ করিয়াছে এবং ধর্মপ্রচারকগণের নিষ্ঠুর উক্তিতে ধর্ম উৎপীড়িত হইয়া উঠিতেছে।'

ইংলণ্ডের রাজকবি টেনিসনের [1809-92] মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র Lord Hallam পিতার চিঠিপত্র ও জীবনী *Alfred, Lord Tennyson: A Memoir* [1897] নামে বৃহৎ দুটি খণ্ডে প্রকাশ করেন। তরুণ বয়স থেকে রবীন্দ্রনাথ টেনিসনের কাব্যরসে মুগ্ধ ছিলেন। তাই সাগ্রহে তিনি এই বৃহৎ দু'খণ্ড জীবনী পাঠ করেন। 'কিন্তু কবি কোথায়, কাব্যস্রোত কোন্ গুহা হইতে প্রবাহিত হইতেছে, তাহা তো খুঁজিয়া পাওয়া গেল না। ইহা টেনিসনের জীবনচরিত হইতে পারে, কিন্তু কবির জীবনচরিত নহে।' 'কবিজীবনী' প্রবন্ধটি এই সুরে লেখা। রবীন্দ্রনাথের মতে, সংসারের কঠিন বাধার মধ্য দিয়ে নিজের জীবনকে যিনি সৃজন করে নিয়েছেন সেই কর্মবীরের জীবনী লেখার যোগ্য; দান্তের [বা গ্যেটের] মতো ক্ষণজন্মা কবিগণ যাঁরা কাব্যে এবং জীবনের কর্মে উভয়তই নিজের প্রতিভা বিকশিত করেছেন তাঁদের জীবনীও আকর্ষণীয়, কারণ 'তাঁহাদের কাব্যকে তাঁহাদের জীবনের সহিত একত্র করিয়া দেখিলে তাহার অর্থ বিস্তৃততর, ভাব নিবিড়তর হইয়া উঠে।' কিন্তু টেনিসনের জীবনী সেরূপ নয়, তাঁর কাব্যের মহত্ত্ব তাঁর জীবনের ঘটনার মধ্যে প্রকাশিত হয়নি। পক্ষান্তরে বাল্মীকি বা কালিদাসের জীবনের ঘটনার কথা জানা যায় না, কিন্তু তাঁদের সম্বন্ধে প্রচলিত কিংবদন্তীর মধ্যে উভয় কবির অন্তর্জীবন প্রতিবিম্বিত [অবশ্য রবীন্দ্রনাথের-ই ব্যাখ্যার আলোকে, যে ব্যাখ্যা প্রসঙ্গ অনুযায়ী ভিন্ন ভিন্ন রূপ লাভ করেছে] হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের জীবনী-লেখক হিসেবে আমরা তাঁকে দান্তে বা গ্যেটেরই সমগোত্রীয় বলে মনে করি, টেনিসনের নয়।

টেনিসনের জীবনচরিত পাঠ করা উপলক্ষেই সম্ভবত তিনি 'কবিচরিত' ও 'কবির বিজ্ঞান' কবিতা-দুটি রচনা করেন।

> যে আমি স্বপন-মুরতি গোপনচারী,
> যে আমি আমারে বুঝিতে বুঝাতে নারি,
> আপন গানের কাছেতে আপনি হারি,
>   সেই আমি কবি। কে পারে আমারে ধরিতে।
> মানুষ-আকারে বদ্ধ যে জন ঘরে,
> ভূমিতে লুটায় প্রতি নিমেষের ভরে,
> যাহারে কাঁপায় স্তুতি নিন্দার জ্বরে,
>   কবিরে পাবে না তাহার জীবনচরিতে।

এই কারণেই তিনি 'বঙ্গভাষার লেখক' [১৩১১] গ্রন্থে নিজের জীবনবৃত্তান্ত লেখার জন্য অনুরুদ্ধ হয়ে জীবনবৃত্তান্ত থেকে বৃত্তান্তটা বাদ দিয়ে 'কাব্যের মধ্য দিয়া আমার কাছে আজ আমার জীবনটা যেভাবে প্রকাশ

পাইয়াছে’ তাকেই প্রকাশ করবার চেষ্টা করেছেন।[৪১] উক্ত রচনার শেষে তিনি ‘কবিচরিত’ কবিতার প্রথম ও শেষ স্তবক-দুটি উদ্ধৃত করে দেন।

1898 [১৩০৪]-এ ভারতে পদার্পণের পর সিস্টার নিবেদিতা যে-সমস্ত ব্রাহ্মপরিবারের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠেছিলেন জগদীশচন্দ্রের পরিবার তার মধ্যে অন্যতম। জগদীশচন্দ্রের বিজ্ঞান-প্রতিভা তাঁকে মুগ্ধ করেছিল, সুযোগ পেলেই জগদীশচন্দ্রের বাড়িতে সান্ধ্যভোজন, গল্পগুজব, এমন-কি নাট্যাভিনয়ের কথা তাঁর চিঠি থেকে জানা যায়। কিন্তু এই মহৎ বিজ্ঞানীকে প্রকৃত সাহায্য করার সুযোগ তিনি পেলেন জগদীশচন্দ্রের 1900-01-এ লণ্ডনে বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও বক্তৃতার সময়ে। অসুস্থতার জন্য 12 Dec 1900 [২৭ পৌষ ১৩০৭] তাঁর পেটে অস্ত্রোপচার করা হয়, এই সময়ে নিবেদিতা তাঁর যে সেবা করেন Dr. Bose's Bedside থেকে মিস ম্যাকলাউডকে লেখা 25 Dec-এর চিঠি তার একটি অতি ক্ষুদ্র প্রমাণ। এর পূর্ব থেকেই তিনি জগদীশচন্দ্রের সাহায্যে রবীন্দ্রনাথের গল্প অনুবাদে হাত দিয়েছেন ও বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ রচনায় তাঁকে সাহায্য করতে আরম্ভ করেছেন। অপারেশনের পর স্বাস্থ্যোদ্ধারের জন্য তিনি জগদীশচন্দ্রকে নিয়ে গেছেন তাঁর মায়ের বাড়ি উইম্বল্‌ডনে। সেখানে খাবার ঘরটিকে বিজ্ঞানাগারে পরিণত করে জগদীশচন্দ্র তাঁর কাজ করে গেছেন [দ্র মিস ম্যাকলাউডকে লেখা নিবেদিতার 4 Apr-এর চিঠি]। এর মাসখানেক পরে 10 May [২৭ বৈশাখ] রয়াল ইনস্টিট্যুশনে তাঁর বক্তৃতা—যার সম্পর্কে তিনি 3 May [২০ বৈশাখ] রবীন্দ্রনাথকে লিখেছিলেন : ‘আমার পরীক্ষার আর ৭ দিন বাকী আছে, তখন তোমাদের ধ্বজা এই পশ্চিম জগতে উত্থিত করিতে পারিব কিনা তাহার পরীক্ষা হইবে।’[৪২] 17 May [৩ জ্যৈষ্ঠ]-র চিঠিতে তিনি সংক্ষেপে তাঁর সাফল্যের সংবাদ, পেটেন্টের জন্য প্রলোভন-প্রস্তাব, ছুটি ফুরিয়ে আসার জন্য আশঙ্কা ইত্যাদি জানিয়ে তাঁর বক্তৃতার শেষাংশ পাঠিয়ে লেখেন : ‘দেশে ফিরিলে কিরূপ কার্য্যের সুবিধা হইবে তাহার নমুনা স্বরূপ একখানা চিঠি পাঠাই। উক্ত হতভাগ্য আমার recommendation Research scholarship পাইয়াছিল, তাহার উপর বিশেষ জুলুম।’ জগদীশচন্দ্র *Electrician* পত্রিকাও পাঠান, সেটি পৌঁছতে হয়তো দেরি হয়েছিল, কিন্তু তার আগেই রবীন্দ্রনাথ পেয়ে যান নিবেদিতার পত্রাকারে লিখিত বক্তৃতাসভার বিস্তৃত বর্ণনা [পত্রটি পাওয়া যায়নি]—এইগুলি অবলম্বনে তিনি লেখেন ‘আচার্য্য জগদীশের জয়বার্ত্তা’ প্রবন্ধ। এই বিষয়ে 3 Jul [বুধ ১৯ আষাঢ়] তিনি জগদীশচন্দ্রকে লেখেন : ‘আষাঢ়ের বঙ্গদর্শনে যেটুকু আভাস দিয়াছিলাম তাহা বোধ হয় বৈজ্ঞানিক হিসাবে যথাযথ হয় নাই—তখন ইলেক্‌ট্রিশ্যান্ দেখিতে পাই নাই।’[৪৩] এই পত্রেই তিনি লেখেন : ‘আমি সাহসে ভর করিয়া ইলেক্‌ট্রিশ্যান্ প্রভৃতি হইতে সংগ্রহ করিয়া শ্রাবণের বঙ্গদর্শনের জন্য তোমার নব আবিষ্কার সম্বন্ধে একটা প্রবন্ধ লিখিয়াছি। প্রথমে জগদানন্দকে [শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্যাশ্রমের শিক্ষক বিজ্ঞান-লেখক জগদানন্দ রায়, 1869-1933—বর্তমানে শিলাইদহ কাছারির সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট] লিখিতে দিয়াছিলাম—পছন্দ না হওয়াতে নিজেই লিখিলাম’—প্রবন্ধটির নাম ‘জড় কি সজীব?’ [দ্র বঙ্গদর্শন, শ্রাবণ। ১৪৯-৫১; চিঠিপত্র ৬।১১৬-২০] —এখানে তিনি *Electrician* অবলম্বনে বৈজ্ঞানিক বিষয়টিকে অধিকতর পরিস্ফুট করেন। কিন্তু জগদীশচন্দ্র প্রথম রচনাটি পড়েই খুশি হয়ে 25 Jul [৯ শ্রাবণ] লেখেন : ‘তুমি যে গত মাসে আমার কাযের আভাস বঙ্গদর্শনে লিখিয়াছিলে তাহা অতি সুন্দর হইয়াছে। তুমি যে এত সহজে ও বৈজ্ঞানিক সত্য স্থির রাখিয়া এরূপ সুন্দর করিয়া লিখিতে পার ইহাতে আমি আশ্চর্য্য হইয়াছি।’[৪৪]

জগদীশচন্দ্র ও অবলা বসুর 17 May-র পত্রের উত্তরে ২১ জ্যৈষ্ঠ [মঙ্গল 4 Jun] রবীন্দ্রনাথ যে চিঠি লেখেন, তার কথা আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি। এই পত্রে তিনি লেখেন :

যে ঈশ্বর তোমার দ্বারা ভারতের লজ্জা নিবারণ করিয়াছেন আমি তাঁহার চরণে আমার হৃদয়কে অবনত করিয়া রাখিয়াছি। কোন্ দিক্ দিয়া তিনি আমাদের দেশকে গৌরবান্বিত করিবেন অদ্য আমি তাহার অরুণাভামণ্ডিত পথ দেখিতেছি। তোমার নিকট পূজা প্রেরণ করিবার জন্য আমার অন্তঃকরণ উন্মুখ হইয়া আছে—বন্ধু, আমার পূজা গ্রহণ কর! ···নব্য ভারতের প্রথম ঋষিরূপে জ্ঞানের আলোকশিখায় নূতন হোমাগ্নি প্রজ্বলিত কর।[৪৫]

কবিতাতেও তিনি এই নব্য ঋষিকে বন্দনা করেন ও পত্রটির সঙ্গে বন্ধুকে পাঠিয়ে দেন। 14 Jun [৩১ জ্যৈষ্ঠ] মাধুরীলতাকে আশীর্বাদ ও উপহার পাঠিয়ে 6 Jul [শনি ২২ আষাঢ়] প্রতিশ্রুত দীর্ঘ পত্রে জগদীশচন্দ্র লেখেন : 'তোমার পত্র ও কবিতা পাইয়া আমি কিরূপ উৎসাহিত হইয়াছি জানাইতে পারি না।'[৪৬] কবিতাটি 'জগদীশচন্দ্র বসু' নামে আষাঢ়-সংখ্যা বঙ্গদর্শন-এ মুদ্রিত হয়।

বঙ্গদর্শন-এর জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ় সংখ্যা যুগ্ম-সংখ্যা রূপে প্রকাশিত হয়েছিল বলে 'মাসিক-সাহিত্য-সমালোচনা' আষাঢ় সংখ্যার শেষে একবারই মাত্র মুদ্রিত হয়। জ্যৈষ্ঠ-সংখ্যা ভারতী-র সমালোচনায় রবীন্দ্রনাথ ভাষাতত্ত্ব-মূলক দুটি রচনা সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণের 'ক্ষ-কার' [পৃ ১৩১-৩৯] ও বিহারীলাল গোস্বামীর 'বাঙ্গলা শব্দের দ্বিরুক্তি' [পৃ ২০৪-০৯]কে গ্রহণ করেছেন [দ্র বাংলা শব্দতত্ত্ব। ২৯৪, ৭৬-৭৭ পাদটীকা]। শেষোক্ত প্রবন্ধটি সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা-য় প্রকাশিত রবীন্দ্রনাথের 'বাঙ্গলা শব্দদ্বৈত' প্রবন্ধের শ্রীনিবাস বন্দ্যোপাধ্যায়-কৃত সমালোচনার সমালোচনা।

চৈত্র ১৩০৭-সংখ্যা সাহিত্য-তে মুদ্রিত সখারাম গণেশ দেউস্করের 'মহাপুরুষ রাণাড়ে' [পৃ ৭০৫-১৬] প্রবন্ধ প্রকাশের জন্য সাহিত্য-সম্পাদকের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানিয়ে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন :

বাঙালী স্বাভাবিক-ক্ষুদ্রতাবশত সাধারণত অন্যপ্রদেশীয়দের প্রতি অবজ্ঞাপরায়ণ। দুর্ভাগ্যবশত বর্ত্তমানকালে যে কয়েকজন বাঙালী কর্ম্মক্ষেত্রে কৃতিত্ব প্রদর্শন করিতেছেন, তাঁহারা সকলেই মুখ্যভাবে রাষ্ট্রতন্ত্র লইয়াই ব্যাপৃত। এই কারণে রাষ্ট্রতন্ত্রিগণকেই আমাদের নব্যশিক্ষিত সম্প্রদায় কর্ম্মীর আদর্শ করিয়া লইয়াছেন। সভাস্থলকেই তাঁহারা প্রধান কর্ম্মক্ষেত্র এবং ইংরাজি ভাষায় বাগ্মিতাকেই তাঁহারা জীবনের প্রধান উদ্যোগ বলিয়া গণ্য করিয়াছেন। বঙ্গেতরবাসী শিক্ষিতবর্গের ইংরাজি বাক্যপ্রবাহ ও উচ্চারণের সহিত তাঁহাদের স্ব-প্রদেশীয় আদর্শের তুলনা করিয়া তাঁহারা গর্ব্ব অনুভব করেন ও মনে করেন, বাংলাদেশ ভারতবর্ষের অন্য সকল বিভাগ অপেক্ষা সকলপ্রকারে সার্থকতা লাভ করিয়াছে। বাঙালী নব্যবঙ্গের এই সঙ্কীর্ণ আদর্শকে আঘাত করিয়া নষ্ট করিবার সময় উপস্থিত হইয়াছে। আমাদের ক্ষুদ্র অভিমান আমাদিগকে প্রতিদিন পথভ্রষ্ট করিতেছে।

রাণাড়ের মতো সর্বতোব্যাপী মহত্ত্বের আদর্শ বাংলাদেশেও নেই এই কথা বলে তিনি রামমোহনের সঙ্গে রাণাড়ের তুলনা করে লিখলেন :

রাষ্ট্রতন্ত্রীয় ব্যাপারে রাণাড়ের উদ্যোগ তাঁহার দেশহিতকর উদ্যমের একাংশমাত্র। রাষ্ট্রতন্ত্রে মহাত্মা রামমোহন রায়ও হস্তক্ষেপ করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহাই তাঁহার জীবনের একমাত্র লক্ষ্য ছিল না। পরাধীন দেশে রাষ্ট্রতন্ত্র কোন মহৎ হৃদয়কে কখনই সম্পূর্ণ অধিকার করিতে পারে না। সেখানে তাহার চেষ্টা অত্যন্ত সীমাবদ্ধ এবং সকল সময়ে গৌরবজনক নহে। রাণাড়ের মাহাত্ম, —ধর্ম্ম, সমাজ, লোকশিক্ষা, রাষ্ট্রতন্ত্র,সর্ব্বত্রই আপনাকে প্রচার করিয়াছিল। রামমোহন রায় যেমন সমস্ত নব্যবঙ্গকে আপন মহত্ত্বদীপ্তিতে বিকশিত করিয়াছিলেন, রণাড়ে সেইরূপ সমস্ত নব্যমহারাষ্ট্রকে সর্ব্বাঙ্গীনভাবে পরিপুষ্ট করিতেছিলেন। তিনি নব্যমহারাষ্ট্রকে কেবল বাগ্মিতা, কেবল আবেদনকুশলতা, শিখাইতেছিলেন না, তিনি তাহাকে মানুষ করিতেছিলেন।···· এই মহাপুরুষের বিপুল প্রাজ্ঞতার সহিত গভীর সহৃদয়তা, বিচিত্র কর্ম্মশীলতার সহিত অটল প্রশান্তি, অগাধ বিদ্যাবত্তার সহিত পরিপূর্ণ বিনয় মিশ্রিত হইয়া এবং তাঁহার সমস্ত জ্ঞান, চিন্তা ও চেষ্টার ঊর্ধ্বভাগে একটি নির্ম্মল ও ধ্রুব ধর্ম্মভাবের জ্যোতি বিকীর্ণ হইয়া যে একটি উন্নত উজ্জ্বল উদার আদর্শের সৃষ্টি হইয়াছে, মুখরগর্ব্বিত বাঙালিকে তাহার চরণপ্রান্তে প্রণত হইতে আহ্বান করি।

বৈশাখ-সংখ্যা প্রদীপ-এ হীরেন্দ্রনাথ দত্ত 'রাজবিদ্যা' প্রবন্ধে ব্রহ্মবিদ্যা ভারতে যখন পরাবিদ্যা নামে কথিত ছিল তখন ব্রাহ্মণেরা কখনও কখনও ব্রহ্মবিদ্যা লাভের জন্য ক্ষত্রিয় রাজাদের দ্বারস্থ হতেন বলে এই বিদ্যা

রাজবিদ্যা নামেও অভিহিত হত এইরূপ যে অনুমান করেন, রবীন্দ্রনাথ তা সমর্থন করে লিখেছেন :

ব্রহ্মবিদ্যা ক্ষত্রিয়দিগের মনের মধ্যে স্বভাবতই একটি বিশেষ স্বাতন্ত্র্য লাভ করিয়াছিল, গীতাপাঠে তাহা উপলব্ধি করা যায়। ব্রহ্মবিদ্যা যেমন হলবিশেষে কর্ম্মে অনাসক্তি আনয়ন করিয়াছিল, তেমনি ক্ষত্রিয়ের মধ্যে তাহা কর্ম্মযোগে অভিব্যক্ত হইয়াছিল, গীতা ও মহাভারত পাঠে এইরূপ প্রতীতি হয়। ব্রহ্মবিদ্যা যে কেবল জ্ঞানে ও ধ্যানে সম্পূর্ণতা লাভ করিতে পারে না, ভক্তিতে ও কর্ম্মে তাহার সফলতা, ব্রাহ্মণের উপনিষদে স্থানে স্থানে তাহার আভাস পাওয়া যায়—কিন্তু গীতায় তাহা পরিস্ফুট হইয়াছে। এই সর্ব্বাঙ্গীণ ব্রহ্মবিদ্যাই বোধ করি রাজবিদ্যা।

জগদানন্দ রায় কার্তিক ১৩০৭-সংখ্যা প্রদীপ-এ 'বায়ু-নভোবিদ্যা'-শীর্ষক যে প্রবন্ধ লেখেন, মাঘ ১৩০৭-সংখ্যায় যোগেশচন্দ্র রায় 'আবহ ও চন্দ্র সূর্য্য' প্রবন্ধে তার কয়েকটি পরিভাষা ও অন্যান্য বিষয়ে কটাক্ষ করেন—বৈশাখ ১৩০৮-সংখ্যায় জগদানন্দ তার 'কৈফিয়ৎ' দেন, রবীন্দ্রনাথ সে-সম্পর্কে মত প্রকাশ [দ্র বাংলা শব্দতত্ত্ব। ২১২-১৩] করে লেখেন : 'বাঙলায় বৈজ্ঞানিক পরিভাষা স্থির হয় নাই—অতএব পরিভাষার প্রয়োগ লইয়া আলোচনা কর্ত্তব্য, কিন্তু বিবাদ করা অসঙ্গত।'

জ্যৈষ্ঠ-সংখ্যা প্রবাসী-তে সম্পাদক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় 'শিক্ষার উন্নতি ও তন্নিমিত্ত দান' [পৃ ৭৩-৮০]-শীর্ষক প্রবন্ধে য়ুরোপের সঙ্গে তুলনায় ভারতের শিক্ষালয়ে উপকরণের অভাব সম্পর্কে যে মন্তব্য করেন, রবীন্দ্রনাথ তার যাথার্থ্য স্বীকার করেও লেখেন :

য়ুরোপীয় সভ্যতায় শিক্ষা, খেলা, আমোদ, জীবনযাত্রা, সমস্তই অত্যন্ত বিচিত্র এবং ব্যয়সাধ্য ও শ্রমসাধ্য হইয়া উঠিয়াছে। একখানা তানপুরা কাঁধের উপর ফেলিয়া আমরা গান গাহি;—য়ুরোপের ঘরজোড়া একখানা পিয়ানো যন্ত্রের মূল্যে আমাদের একটা জেলার লোকের গানবাজনা চলিয়া যায়। অথচ আমাদের সঙ্গীত বর্ব্বরসঙ্গীত নহে, তাহা বিচিত্র নিয়মে বদ্ধ, দুরূহ রহস্যে পূর্ণ। উপকরণ সুলভ বলিয়া আসল ব্যাপারটা সস্তা নহে। আজকাল য়ুরোপে নাট্যকলা এত ভূরি আয়োজন, পরিশ্রম ও অর্থব্যয়ের অপেক্ষা করে যে, আমরা তাহা অনুমান করিতে পারি না;—কিন্তু অভিনয় যদি উত্তম এবং নাটকখানি উৎকৃষ্ট হয়, তবে বহুমূল্য পট প্রভৃতিকে উপেক্ষা করিতে শেখা উচিত। য়ুরোপ আজকাল যে পরিমাণে আয়োজন ও অর্থব্যয় করে, তাহার ফললাভ ঠিক সেই পরিমাণের নহে। আমাদের দেশে য়ুরোপের আদর্শ চলিয়াছে, কিন্তু সেই আদর্শ চালনার শক্তি নাই, ভিত্তি নাই। এখন, আমাদের চিন্তার বিষয় এই যে, কি করিলে আমাদের জীবনযাত্রা সরল ও তাহার উপকরণ সুলভ হইবে। আমাদের দেশের টোলে শিক্ষার যেরূপ প্রণালী ছিল, সেই সরল প্রণালীকে আদর্শ করিয়া যদি শিক্ষাবিধানের কোন নিয়ম উদ্ভাবিত হয়, তবে তাহাতে দেশের যথার্থ স্থায়ী উপকার হইবে। আমাদের ধনীরা বিলাতের ধনীর ন্যায় নহে; আমাদের ধন আমাদের পরিবার ও বংশের মধ্যে বদ্ধ; আমাদের ধনীরা সচ্ছল অবস্থায় ধন ব্যয় করিতে পারে, কিন্তু সম্পত্তি ত্যাগ করিতে পারে না; কারণ, আমাদের সমাজের প্রকৃতি অনুসারে সম্পত্তির উপরে গৃহস্থ ধনীর ঠিক স্বাধীনতা নাই। অতএব য়ুরোপে যেমন অজস্র টাকা বিদ্যালয়ে আকৃষ্ট হয়, আমাদের দেশে তেমন হইবার জো নাই। আমাদের বিদ্যালয় আমাদের দেশীয় প্রকৃতির অনুকূল করিয়া যদি প্রতিষ্ঠিত হয়, তবে শিক্ষাকার্য্য দেশে ব্যাপ্ত হইতে পারে, নতুবা গবর্মেন্টের মুখের দিকে তাকাইতে হয়, অথবা ব্যবসাদার বিদ্যা-বণিকের হাতে গিয়া পড়িতে হয়—যত অল্প শিক্ষায় যত অধিক পাস করানো যায়, ইহাই বিদ্যালয়ের উদ্দেশ্য হইয়া উঠে। বিদ্যা-বিস্তারের জন্য দেশের ধনীদের নিকট টাকা চাওয়া হউক, কিন্তু সেই সঙ্গে ভাবিতে হইবে, কি করিলে আমাদের দেশে শিক্ষা উচ্চ অঙ্গের অথচ তাহার উপকরণ যথাসম্ভব সুলভ হইতে পারে!

—রবীন্দ্রনাথ নিজেই সেকথা ভাবছিলেন এবং কয়েক মাসের মধ্যে শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্যাশ্রমের উপকরণবাহুল্য-বর্জিত শিক্ষালয়ের মধ্যে তা বাস্তব মূর্তি পরিগ্রহ করে। শিক্ষার ব্যয়ের কথাও তিনি ভেবেছেন এবং পারিবারিক ধন থেকে সেই অর্থ যে যথাযথ যোগানো যাবে না সে-সম্বন্ধেও তিনি সচেতন ছিলেন। কিন্তু এই সমস্যার সমাধানের পথ তিনি তখনও দেখতে পাননি।

নৈবেদ্য গত বছরের শেষ থেকে আদি ব্রাহ্মসমাজ প্রেসে মুদ্রিত হচ্ছিল, কিন্তু গ্রন্থটি প্রকাশিত হল আষাঢ় মাসের প্রথমে। ৯ আষাঢ় [রবি 23 Jun] রবীন্দ্রনাথের ক্যাশবহিতে 'দপ্তরীর বাটী হইতে নৈবেদ্য বহি এক শত আনার মুটে ভাড়া'র হিসাব পাওয়া যায়। এর আগে রবীন্দ্রনাথ মাধুরীলতাকে দিয়ে নৈবেদ্য-এর কবিতাগুলি কপি করিয়ে বিলেতে জগদীশচন্দ্রের কাছে প্রেরণ করেন। বৈশাখের শেষে দার্জিলিং থেকে পাঠানো চিঠিতে তিনি লিখেছিলেন :'তোমাকে বেলার হাতে কপি-করা একখানি কবিতার খাতা পাঠাইয়াছি, নিশ্চয় পাইয়াছ।'

জগদীশচন্দ্র তার পূর্বেই 3 May [২০ বৈশাখ] তার প্রাপ্তি স্বীকার করে লেখেন : 'তোমার নৈবেদ্য সময়মত আসিয়াছে।' এই পত্রের একটি স্থানে তিনি ৬৩-সংখ্যক কবিতার [দ্র নৈবেদ্য ৮।৫১] ' · মোর কল্পনাতীত। কী তাহার কাজ, ····কোন্ পথ তার পথ' অংশটি উদ্ধৃত করেছেন। উল্লেখ করা বাহুল্য যে, উক্ত 'নৈবেদ্য' মুদ্রিত গ্রন্থ নয়।

গ্রন্থটি মুদ্রণের সমস্ত ব্যয়ভার মহর্ষি বহন করেন বলে দামী কাগজে যথেষ্ট ফাঁকা জায়গা রেখে গ্রন্থটি ছাপা সম্ভব হয়। এর আখ্যাপত্রটি উদ্ধৃত করি :

নৈবেদ্য।/শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।/আদি ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্রে/শ্রীদেবেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য দ্বারা মুদ্রিত।/৫৫নং অপার চিৎপুর রোড।/আষাঢ়, ১৩০৮ সাল।/মূল্য ২ টাকা।

উৎসর্গ-পত্রে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন :

এই কাব্যগ্রন্থ/পরম পূজ্যপাদ পিতৃদেবের/শ্রীচরণকমলে উৎসর্গ/ করিলাম।/আষাঢ়/ ১৩০৮।

পৃষ্ঠাসংখ্যা : ২+২+২০০।

ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় স্ব-সম্পাদিত *The Twentieth Century* পত্রিকার July 1901-সংখ্যায় কাব্যটির একটি বিস্তৃত সমালোচনা লেখেন, এ-প্রসঙ্গে আমরা পরে আলোচনা করব।

মাধুরীলতার বিবাহের পর কয়েকদিন কলকাতায় থেকে ১১ আষাঢ় [মঙ্গল 25 Jun] রবীন্দ্রনাথ রথীন্দ্রনাথকে নিয়ে বিরাহিমপুর পরগণায় অবস্থিত জমিদারির পুণ্যাহ উপলক্ষে শিলাইদহে যাত্রা করেন। ১২ আষাঢ় যথারীতি পুণ্যাহ অনুষ্ঠিত হয়। পরের দিন তিনি মৃণালিনী দেবীকে লিখেছেন :

কাল পুণ্যাহের গোলমালে তোমাকে চিঠি লিখ্‌তে পারিনি। পর্শুদিন বিকেলে শিলাইদহে এসে পৌঁছলুম। শূন্য বাড়ি হাঁ হাঁ করছে। মনে করেছিলুম অনেকদিন নানা গোলমালের পর একলা বাড়ি পেয়ে নির্জ্জনে আরাম বোধ করব। কিন্তু যেখানে বরাবর সকলে মিলে থাকা অভ্যাস, এবং একত্রবাসের নানাবিধ চিহ্ন বর্ত্তমান সেখানে একলা প্রবেশ করতে প্রথমটা কিছুতে মন যায় না। বিশেষতঃ পথশ্রমে শ্রান্ত হয়ে যখন বাড়িতে এলুম তখন বাড়িতে কেউ সেবা করবার, খুসি হবার, আদর করবার লোক পেলুম না। ভারি ফাঁকা বোধ হল। পড়তে চেষ্টা করলুম পড়া হল না। ····কাল বাজনাবাদ্য উপাসনা ইত্যাদি করে পুণ্যাহ হয়ে গেল। সন্ধ্যাবেলায় কাছারিতে একদল কীর্ত্তনওয়ালা এসেছিল। তাদের কীর্ত্তন শুন্‌তে রাত এগারোটা হয়ে গেল। ····সবাই জিজ্ঞাসা করচে মা কবে আস্‌বেন? আমরা আস্বনা শুনে এখানকার আমলারা খুব দমে গিয়েছিল।[৪৭]

এই চিঠির সঙ্গে তিনি মাধুরীলতাকেও একটি চিঠি লিখে ভাবী দাম্পত্যজীবন সম্পর্কে কন্যাকে কিছু উপদেশ দিয়েছিলেন; পত্রটি পাওয়া যায়নি, কিন্তু 29 Jun [শনি ১৫ আষাঢ়] লিখিত মাধুরীলতার উত্তর থেকে উপদেশের প্রকৃতিটি অনুমান করা যায় :

তুমি আমাকে যা যা উপদেশ দিয়েছ আমি তা প্রাণপণে পালন কর্ত্তে চেষ্টা করব। আমার স্বামী যে আমার চেয়ে সকল বিষয় শ্রেষ্ঠ এবং আমি যে তাঁর সমান নই এটা বরাবর মনে রাখব। তাঁর ঘরের শ্রী যাতে বৃদ্ধি পায় যথাসাধ্য তাই করব। এবাড়ীর মেয়ে বলে উনি আমাতে অনেক সদগুণ আশা করেন তাতে যাতে না নিরাশ হন আমি সেই চেষ্টা করব।[৪৮]

মজঃফরপুরে সংসার পাতার ব্যবস্থা করে শরৎকুমার খবর দিলে রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং মাধুরীলতাকে সেখানে রেখে আসবেন, এমন কথা ঠিক হয়েছিল। ১৪ আষাঢ় [শুক্র 28 Jun] তিনি বসন্তকুমার গুপ্তকে লিখেছিলেন :'এখানকার পুণ্যাহ সমাধা হইয়া গেছে—ইতিমধ্যে যদি বেলাকে মজঃফরপুরে পৌঁছিয়া দিবার জন্য ডাক না পড়ে তবে কালিগ্রামের পুণ্যাহ সম্পন্ন করিবার জন্য সেখানে রওনা হইব। সেখানে ২৪শে আষাঢ় দিন স্থির হইয়াছে।'[৪৯] তাঁর কালিগ্রাম যাওয়া হয়নি, কন্যার পতিগৃহে যাত্রার ব্যবস্থা করতে তিনি ২৩ আষাঢ়ের [রবি 7

Jul] আগেই কলকাতায় প্রত্যাবর্তন করেন। মাধুরীলতা উপরে উল্লিখিত চিঠিতে লিখেছেন : 'তুমি কবে আসবে? উনি লিখেছেন যে হপ্তা খানেকের মধ্যে আমার যাবার জন্যে মেজঠাকুরকে লিখবেন।'

এইসময়ে মৃণালিনী দেবীকে লেখা রবীন্দ্রনাথের আরও দুটি চিঠি রক্ষিত হয়েছে—দুটি চিঠিতেই অনাড়ম্বর জীবনযাত্রা ও নির্জনতার শান্তির জন্য তাঁর আকাঙক্ষা ব্যক্ত হয়েছে। একটি চিঠিতে তিনি লিখেছেন :

কোন রকম করে জীবনযাত্রাকে অত্যন্ত সরল করে না আন্‌তে পারলে জীবনে যথার্থ সুখের স্থান পাওয়া যায় না—জিনিষপত্রে গোলেমালে হাঙ্গামহুজ্জতে হিসেবপত্রেই সুখসন্তোষের সমস্ত জায়গা নিঃশেষে অধিকার করে বসে—আরামের চেষ্টাতেই আরাম নষ্ট করে দেয়। বহির্ব্যাপারের চেষ্টাকে লঘু করে দিয়ে মানসিক ব্যাপারের চেষ্টাকে কঠিন করে তোলাই মনুষ্যত্বের সাধনা।···আমার প্রাণের ভিতরটা কেবলি অহর্নিশি ফাঁকার জন্যে ব্যাকুল হয়ে আছে—সে ফাঁকা কেবল আকাশ বাতাস এবং আলোকের নয়—সংসারের ফাঁকা, আয়োজন আস্‌বাবের ফাঁকা, চেষ্টা চিন্তা আড়ম্বরের ফাঁকা—খাওয়া পরা আচার ব্যবহার সমস্ত সরল সংযত পরিমিত পরিচ্ছন্ন—চারিদিকে বেশ সহজ শান্ত স্বল্পতা।'[৫০]

নৈবেদ্য লেখার সময় থেকেই 'দ্রব্যরাশি' 'আড়ম্বর' বর্জন করার আকাঙ্ক্ষা তাঁর অন্তরে ধ্বনিত হতে শুরু করেছিল—শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্যাশ্রমের রিক্ত আয়োজনে তা ফলবতী হয়। এখানে একটি প্রসঙ্গ উল্লেখ করা যেতে পারে। ব্রহ্মচর্যাশ্রমের প্রথম শিক্ষকদের একজন রেবাচাঁদ [অণিমানন্দ] লিখেছেন : 'In the meantime so great was the impression produced by Brahmabandhab on the poet that going home, he ordered tables and chairs out of his room and returned to the ancient Vedic system. Debendranath felt quite differently and the European furniture was brought back.'[৫১] কখন এই ঘটনা ঘটেছিল বলা যায় না, কিন্তু উপরে উদ্ধৃত পত্রে রবীন্দ্রনাথের সমকালীন প্রবণতাটি ধরা পড়েছে।

অপর পত্রটি থেকেও দীর্ঘ উদ্ধৃতি দিতে হবে, কলকাতা ছেড়ে শিলাইদহ হয়ে শান্তিনিকেতনে কর্মভূমি রচনার মানস-পথটির ইঙ্গিত পত্রটিতে রয়েছে :

পুণ্যাহের গোলমাল চুকে যাওয়ার পর থেকে আমি লেখায় হাত দিয়েছি। একবার কোন সুযোগে লেখার মধ্যে পড়তে পারলেই আমি যেন ডাঙ্গায় তোলা মাছ জলে গিয়ে পড়ি। এখন এখানকার নির্জ্জনতা আমাকে সম্পূর্ণ আশ্রয় দান করেছে···নির্জ্জনতায় তোমাদের পীড়া দেয় কেন তা আমি বেশ সহজেই বুঝ্‌তে পারচি—আমার এই ভাব সম্ভোগের অংশ তোমাদের যদি দিতে পারতুম তা হলে আমি ভারি খুসি হতুম, কিন্তু এ জিনিষ কাউকে দান করা যায় না। কলকাতার জনতা ছেড়ে হঠাৎ এখানকার মত শূন্যস্থানের মধ্যে এসে পড়ে প্রথম কিছুদিন নিশ্চয়ই তোমাদের ভাল লাগ্‌বেনা—এবং তার পরে সয়ে গেলেও ভিতরে ভিতরে একটা রুদ্ধ অধৈর্য্য থেকে যাবে। কিন্তু কি করি বল, কলকাতার ভিড়ে আমার জীবনটা নিষ্ফল হয়ে থাকে—···তা ছাড়া সেখানে রথীদের উপযুক্ত শিক্ষা কিছুতেই হয় না—সকলেই কি রকম উড়ু উড়ু করতে থাকে। কাজেই তোমাদের এই নির্ব্বাসন দণ্ড গ্রহণ করতেই হবে। এর পরে যখন সামর্থ্য হবে তখন এর চেয়ে ভাল জায়গা বেছে নিতে হয় ত পারব, কিন্তু কোনকালেই আমি কলকাতায় নিজের সমস্ত শক্তিকে গোর দিয়ে থাক্‌তে পারবনা।[৫২]

বলেন্দ্রনাথের মা প্রফুল্লময়ী দেবী মৃণালিনী দেবী সম্পর্কে লিখেছেন : 'তিনি আত্মীয়-স্বজনদের সঙ্গে লইয়া নানারকম আমোদ-আহ্লাদ করিতে ভালোবাসিতেন।' মাধুরীলতা পূর্বোল্লিখিত 29 Jun-এর পত্রে লিখেছেন : 'কাল মাডাম হেসের সঙ্গে মা দুকুরে দেখা কর্ত্তে গিয়েছিলেন আমিও গিয়েছিলুম তাই তোমাকে লিখতে পারিনি।···কাল আমাদের সকলের মেজমাদের ওখানে নেমন্তন্ন আছে। খুব সকালে যেতে হবে। মা গিয়ে বাগানে রাঁধবেন। রাঁধবার অনেক রকম যোগাড় করতে মা মেজমাকে বলে এসেছেন।' কিংবা তাঁর 1 Jul-এর চিঠি : 'সত্যদাদা আজ কাশি যাচ্ছেন সেই জন্যে নরু বৌঠানদের জন্যে মিষ্টি তৈরী হচ্ছে মাও সেই সঙ্গে তোমাদের আর নাটোরের মহারাজকে কিছু খাবার নিজের হাতে করে পাঠাচ্ছেন। তাই আজ বড় ব্যস্ত আছেন বলে তোমাকে লিখতে পারলেননা আমাকে বললেন লিখতে।' এই ব্যস্ত সামাজিক জীবনই মৃণালিনী দেবীর পছন্দ ছিল, সুতরাং শিলাইদহের নির্জনতা তাঁর ভালো না লাগারই কথা।

মাধুরীলতা শেষোক্ত চিঠিতে পিতাকে একটি ফরমাশ প্রেরণ করেন : 'উনি আজ আমাকে লিখেছেন তোমাকে অনুরোধ করতে যে আর্চারের আঁকা তোমার যে ছবি আছে তার থেকে একটি ফোটোগ্রাফ তুলে ওঁকে দিতে। যদি হয় তো তুমি সত্যদাদাকে একটু লিখে দিও।' কন্যাবৎসল পিতা চিঠি পেয়েই 'মঙ্গলবার' [১৮ আষাঢ় : 2 Jul] প্রেমতোষ বসুকে লেখেন :

আমার ঘরে আর্চার সাহেবের আঁকা যে ছবি আছে—বেলাকে কোলে করিয়া যে ছবি আঁকান হইয়াছিল—শরৎ (আমার জামাতা) সেই ছবির একখানি ফোটোগ্রাফ চাহিয়াছেন। আপনি ইহার ফোটো তুলাইয়া লইতে পারিবেন? ছবিখানি প্যাস্টেলে আঁকা। সুতরাং অসতর্ক হইলে হাত লাগিয়া মুছিয়া যাইতে পারে—এই জন্য যার তার হাতে দিতে ভরসা হয় না।····আপনি যদি সাবধানে এই কাজটি সম্পন্ন করিয়া দেন তবে নবদম্পতির ও নিম্নস্বাক্ষরকারী বান্ধবের কৃতজ্ঞতা অর্জন করিবেন। কেবলমাত্র কৃতজ্ঞতা দিয়াই নিষ্কৃতি লাভ করিবার ইচ্ছা করিতেছি এমন আশঙ্কা করিবেন না। ····বেগার খাটুনি আপনার ললাটের লিখন বলিয়াই আপনাকে এরূপ অনুরোধের দ্বারা বিরক্ত করিতে কুণ্ঠিত হইলাম না।[৫৩]

একই দিনে মহিমচন্দ্র দেববর্মাকে লেখা একটি চিঠিতে দেখা যায় শিলাইদহের নির্জনতার শান্তি কিভাবে ঘুলিয়ে উঠেছে : 'অদ্য সরলার পত্রে দেখিলাম, মোক্ষদাবাবু [যুবরাজ বীরেন্দ্রকিশোর মাণিক্যের শিক্ষক মোক্ষদাকুমার বসু] তাহাকে বলিয়াছেন যে তুমি মোদাবাবুকে জানাইয়াছ যে তোমরা ভারতীকে সাহায্য করিবার প্রস্তাব করিয়াছিলে আমি তাহা অগ্রাহ্য করিয়াছি। এরূপ ঘটনা কবে হইল মনে পড়িতেছে না। মহারাজা আমাকে সরলার পত্র পড়িতে দিয়াছিলেন মাত্র—তখন প্রথম সংখ্যক বঙ্গদর্শন ছাপা প্রায় শেষ হইয়াছে। কিন্তু ভারতীকে সাহায্য করিবার কথা কবে হইয়াছিল জানাইবে।' পত্রের শেষে লিখেছেন : 'বঙ্গদর্শন সম্বন্ধে যদি তোমাদের মনে লেশমাত্র দ্বিধা থাকে আমাকে জানাইতে সঙ্কোচ করিয়ো না—তোমাদের প্রতিশ্রুতি হইতে আমি তোমাদিগকে প্রসন্ন মনে সম্পূর্ণ নিষ্কৃতি দান করিব—আমি মহারাজকে কোন বিষয়ে লেশমাত্র সঙ্কটে ফেলিতে চাই না। তাঁহার সুপ্রসন্ন সৌহার্দ্যই আমি চাই; আর সমস্ত তুচ্ছ জ্ঞান করি।'[৫৪]

ত্রিপুরা রাজ্যে উপযুক্ত শিক্ষক নিযুক্ত করে সেখানকার শিক্ষাব্যবস্থার উন্নতিসাধন রাধাকিশোর মাণিক্যের অন্যতম লক্ষ্য ছিল, শিক্ষক নির্বাচনে তিনি রবীন্দ্রনাথের সাহায্যও প্রার্থনা করেন। বসন্তকুমার গুপ্তকে রবীন্দ্রনাথই সুপারিশ করেন। উল্লিখিত পত্রে তিনি এই বিষয়েই মহিমচন্দ্রকে লেখেন :

লরেন্স আমাকে ছাড়িতে চায় না। আমরা আবার শিলাইদহে ফিরিবার ব্যবস্থা করিতেছি। কলিকাতায় আমার দ্বারা লেখাপড়ার কাজ একেবারেই চলে না। আধুনিক একজন সুলেখক বিজ্ঞানবিদ্ জগদানন্দ রায়ের লেখা পড়িয়া থাকিবে। লোকটির যেমন পড়া-শুনা তেমনি নিরীহ সাধু স্বভাব—কিছুকাল কৃষ্ণনগর স্কুলে গণিত পড়াইয়াছিলেন, যদি ভাল লোক এবং ভাল শিক্ষক চাও ত তাঁহাকে দিতে পারি। কিন্তু তোমাদের আগরতলার অবস্থার মধ্যে পড়িয়া পাছে বেচারার অনিষ্ট হয় এইজন্য আশঙ্কা করি। আপাততঃ রথীকে অঙ্ক শিখাইবার জন্য তাঁহাকে নিযুক্ত করিয়াছি।

লরেন্স ভালো শিক্ষক হলেও মদ্যপানের প্রতি তাঁর তীব্র আসক্তির জন্য রবীন্দ্রনাথ পুত্রকন্যার গৃহশিক্ষক হিসেবে তাঁকে আর রাখতে চাইছিলেন না। কিন্তু চালচুলো-হীন এই ইংরেজ তাঁর আশ্রয় ত্যাগে রাজি ছিলেন না। রবীন্দ্রনাথ একটি পত্রে স্ত্রীকে লিখছেন :

লরেন্স্ আজ সকালে এসে উপস্থিত। বোধ হয় ক'দিন কলকাতায় খুব মদ চালাচ্ছিল। আজ সকালেও আমার কাছ থেকে একটু হুইস্কি চেয়ে খেলে।.ওর দুর্দ্দশা দেখে দুঃখ হয়। এ পর্য্যন্ত কোন চাকরী যোগাড় করতে পারলেনা—ওর কি যে অবস্থা হবে বুঝতে পারচিনে। যখন বল্লে, I am so sorry to miss Mira, আমার মনটা আর্দ্র হল। ও হয়ত জানে আমি মীরাকে ভালবাসি সেইজন্যেই বিশেষ করে তার নাম করলে তবু আমার মনে লাগ্‌ল। হাজার হোক্ আজ সাড়ে তিন বৎসর আমার ছেলেমেয়েদের নিয়ে ছিল।[৫৫]

শান্তিনিকেতনে ব্রহ্মচর্যাশ্রম খোলার পরিকল্পনা নেবার পর রবীন্দ্রনাথ ত্রিপুরায় লরেন্সকে নিয়োগ করার সুপারিশ করে রাধাকিশোরকে ১৮ ভাদ্র [মঙ্গল 3 Sep] লেখেন :

রথীকে এই বিদ্যালয়ে দেওয়া স্থির করিয়াছি এই কারণে রথীর ইংরাজ অধ্যাপক লরেন্স্ সাহেবকে দুঃখের সহিত বিদায় দিতে হইতেছে। শান্তিনিকেতনে ইংরাজ রাখিবার সুবিধা নাই নতুবা তাহাকে রাখিতাম। মহারাজের আগরতলার স্কুলে যদি অল্পবেতনে সুযোগ্য ইংরেজ অধ্যাপক চান তবে এমন লোক আর পাইবেন না। মহিম তাহাকে শিলাইদহে দেখিয়া আসিয়াছেন। ইংরাজি ভাষা ইংরাজের কাছে না শিখিলে কোনমতেই পাকা হয় না। যদি মহারাজ আবশ্যক বোধ করেন তবে জানাইবেন। এখনো সে শিলাইদহে বাস করিতেছে। লোকটি আমাদের হাতে পড়িয়া আহারে ব্যবহারে প্রায় বাঙালীর মত হইয়া গেছে।[৫৬]

—একই দিনে মহিমচন্দ্র দেববর্মাকে লিখিত পত্রে তিনি একই সুপারিশ করেছেন।

রবীন্দ্রনাথ শিলাইদহ থেকে কবে ফিরে এসেছিলেন নিশ্চিত করে বলা না গেলেও, ২৩ আষাঢ় [রবি 7 Jul] তাঁর নিমতলা স্ট্রীটে যাওয়ার হিসাব থেকে বোঝা যায় এর পূর্বেই তিনি প্রত্যাবর্তন করেন। ২৪ বালিগঞ্জ, ২৫ বালিগঞ্জ ও নাটোরের মহারাজার বাড়ি, ২৬ ও ২৯ আষাঢ় তাঁর সুকিয়া স্ট্রীটে যাওয়ার হিসাব পাওয়া যায়।

সম্ভবত ৩০ বা ৩১ আষাঢ় রবীন্দ্রনাথ মাধুরীলতাকে স্বামীগৃহে রেখে আসার জন্য মজঃফরপুর যাত্রা করেন। ৩১ আষাঢ় [সোম 15 Jul] সরকারী ক্যাশবহিতে হিসাব দেখা যায় : 'ব° বাবু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর দং শ্রীমতী বেলা দেবীকে মজঃফরপুর লইয়া যাওয়ার ব্যায় জন্য দেওয়া যায় ৩০৲'। গাড়ি রিজার্ভ করা নিয়ে অসুবিধা ও বেরোবার সময় বৃষ্টিতে যাত্রার সূচনাটি সুখের হয়নি, মৃণালিনী দেবীকে লেখা একটি চিঠিতে এই সংবাদ আছে।

মনীষী ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের পৌত্রী অনুরূপা দেবী [1882-1958] শরৎকুমারের সমব্যবসায়ী বন্ধু শিখরনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ঘরণী-রূপে তখন মজঃফরপুরের বাসিন্দা। তিনি মাধুরীলতার পতিগৃহে আগমন সম্পর্কে লিখেছেন :

বিবাহের অল্প দিন পরেই, মনে হয় মাসখানেকের মধ্যেই মাধুরী মজঃফরপুরে ঘর করিতে আসিল। সেদিনে ও রকমের ঘরবসত আনা কেহ দেখে নাই। তারই আলোচনায় দেশ ভরিয়া উঠিল। বস্ত্রালঙ্কারের অপর্য্যাপ্ততার খ্যাতি, তার অনবদ্য রূপের প্রশংসা, তার সঙ্গে অতিথিরূপে সমাগত তার অসাধারণ ব্যক্তিত্বপূর্ণ পিতার, আর এ সমস্তকেও ছাপাইয়া উঠিল মাধুরীর অনন্যসাধারণ গুণরাশির মাধুর্য্য।

মাধুরীলতার মজঃফরপুরে আগমনের সময়ে অনুরূপা দেবী সেখানে ছিলেন না, লোক-মুখেই তিনি এই বিবরণ পেয়েছিলেন। স্থানীয় মহিলামহলে মাধুরীলতার প্রাথমিক অভ্যর্থনা ও পরবর্তী পরিণতি সম্পর্কে তিনি লিখেছেন :

বড়লোকের মেয়ে, ঠাকুরবাড়ীর মেয়ে দেশে আসিয়াছে;—কৌতূহলী দ্রষ্টৃদের ভীড় যথেষ্ট হইত। পরীক্ষার শেষ ছিল না। উদ্যত রসনা আত্মপর বিবেচনাও করে না। প্রথম প্রথম যথেষ্ট আলোচনা ও সমালোচনা চলিতে ত্রুটি হয় নাই। তাহাকে চোখা চোখা বাক্যবাণে বিদ্ধও যথেষ্ট করা হইয়াছিল। কিন্তু আমি যখন তাহাকে পাইলাম [চৈত্র ১৩০৮], তখন নিতান্ত জবরদস্ত নিন্দুক দু-এক জন মাত্র ছাড়া, শিক্ষিত ও অশিক্ষিত ধনী দরিদ্র পরিবারের প্রত্যেককেই সে জয় করিয়া লইয়াছিল। মাধুরীলতা বলিতে লোকে গলিয়া পড়ে, তার প্রশংসায় সকলে পঞ্চমুখ হয়।[৫৬ক]

অনুরূপা দেবী লিখেছেন, রক্ষণশীল মজঃফরপুরে স্ত্রী-শিক্ষার বিস্তারে মাধুরীলতা অত্যন্ত কার্যকরী ভূমিকা গ্রহণ করেন।

সম্ভবত মজঃফরপুরেই রবীন্দ্রনাথ প্রথম মানপত্র-সহ নাগরিক সংবর্ধনা লাভ করেন। ভাদ্র-সংখ্যা প্রবাসী-তে [পৃ ২০৫] এই সংবাদ প্রকাশিত হয় : 'মজঃফরপুর। মজঃফরপুরের জজ আদালতের উকীল শ্রীযুক্ত অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায় লিখিয়াছেন—"গত ১লা শ্রাবণ কবিবর শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সম্মানার্থ স্থানীয় মুখার্জ্জির সেমিনারিতে একটি সভা আহূত হয়। সেই সভায় এখানকার প্রবাসী বাঙ্গালীদিগের পক্ষ হইতে

কবিবরকে একখানি অভিনন্দন পত্র দেওয়া হয়।'' এরই সঙ্গে সেখানে একটি সাহিত্যসভা স্থাপনের সংবাদ দিয়ে 'প্রধান উদ্যোগিগণের নাম' দেওয়া হয়েছে : বরদাকান্ত রায় এম. বি., রমেশচন্দ্র রায় কাব্যতীর্থ কবিরাজ, বেণীমাধব ভট্টাচার্য ও জ্ঞানেন্দ্রনাথ দেব। রবীন্দ্রভবনে রক্ষিত উক্ত মুদ্রিত অভিনন্দন পত্রের একটি কপিতে অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায়-সহ এই চারজন স্বাক্ষর করেছেন—অপর চারজন স্বাক্ষরকারী হলেন কমলাচরণ মুখোপাধ্যায়, কেশবচন্দ্র বসু, প্যারীমোহন মুখোপাধ্যায় ও প্রভাসচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। দীর্ঘ অভিনন্দন পত্রটি পুলিনবিহারী সেন দেশ সাহিত্য সংখ্যা ১৩৬৫ [পৃ ৯৩-৯৬]-তে 'রবীন্দ্রসংবর্ধনা' শিরোনামে সংকলন করেছেন, আমরা মূল পাঠ থেকে তার কিয়দংশ উদ্ধৃত করছি :

বঙ্গকবীন্দ্র শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের শুভাগমন-উপলক্ষে।

কবিবর!

আপনার এ প্রদেশে শুভাগমন উপলক্ষে আপনার অভ্যর্থনা করিবার জন্য মজঃফরপুর-প্রবাসী বাঙ্গালী আমরা আজ এখানে সমবেত। অল্পদিনের জন্য হইলেও বঙ্গভূমির বরপুত্র, ভারতীর প্রিয়সন্তান আপনাকে আমাদের মধ্যে পাইয়া বাস্তবিকই আমরা আনন্দিত, কৃতার্থ ও ধন্য হইয়াছি, এবং এই সামান্য অভিনন্দনপত্রে আপনার প্রতি আমাদের ক্ষুদ্র হৃদয়ের অকৃত্রিম ভক্তি ও প্রীতি, শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি।····

এখানে বঙ্গ-সাহিত্যানুরাগীর সাহিত্য-পিপাসা মিটাইবার একমাত্র উপকরণই দুই চারিখানা সাময়িক পত্র। তাহার অনেকগুলি আপনারই সম্পাদিত এবং অনেক সময় তাহা আপনারই রচিত সঙ্গীত, কবিতা, প্রবন্ধ এবং গল্পে পূর্ণ। সুতরাং আপনারই রচনা পাঠ করিয়া আমরা আমাদের সাহিত্য-পিপাসা চরিতার্থ করি, এবং যাহা পড়ি তাহাতেই মুগ্ধ হই, এবং আনন্দে বিভোর হই।······সাহিত্যাচার্য্য বঙ্কিম বাবুর পরলোক গমনের পরে, বঙ্গদেশের কাব্য-রাজসিংহাসনের বর্তমান। অধিকারী আপনিই। বাঙ্গালীর হৃদয়রাজ্যে আপনার রাজসিংহাসন প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ·····বঙ্কিম বাবু আপনাকেই তাঁহার রাজাসনের ভাবী অধিকারী স্থির করিয়া নিজকণ্ঠ হইতে জয়মাল্য উন্মোচন পূর্ব্বক আপনারই গলে পরাইয়াছিলেন। সেই দিনই আপনার রাজত্বে অভিষেক হইয়া গিয়াছে।····যে প্রতিভা এই কলগীতি ও কবিতাকলার উৎস, সেই প্রতিভার আধারকে, মূর্ত্তিমান্ সেই দেবোপম কবিকে আপনাদের মধ্যে বিরাজিত দেখিলে, হৃদয়ে যে কি এক অননুভূতপূর্ব্ব, অনির্ব্বচনীয় আনন্দের উদয় হয়, তাহা আমাদের ক্ষীণ ভাষায়, দীন বাক্যে কিরূপে বুঝাইব? ····আমাদের হৃদয়ের উপরে এত আধিপত্য বঙ্কিম বাবু ভিন্ন আর কেহ করিতে পারেন নাই।

···কবিত্ব-প্রবণ বঙ্গে আপনি কবিতার এক অভিনব যুগের সৃষ্টি করিয়াছেন। আপনাকে আদর্শ করিয়া, আপনার অনুসরণ করিয়া, আপনার ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া একশ্রেণী কবির অভ্যুদয় হইয়াছে। আব্রহ্মসিন্ধু পর্য্যন্ত বাঙ্গালী যে কবির কলগীতে দ্রব হইয়া যায় এবং যাঁহার আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া দেশে একদল নবকবির অভ্যুত্থান হয়, সে কবির কি কম গৌরব, কম মহিমা? আপনার কবিতার মধ্যেই সেই গৌরবের, সেই মহিমার কারণ নিহিত আছে।

····আপনার কবিতার মধ্যে আরও কতকগুলি অনন্য সাধারণ গুণ আছে, যাহা বঙ্গের অন্যান্য কবিতে দুষ্প্রাপ্য। তন্মধ্যে প্রধান,—আপনার সুগভীর, সূক্ষ্ম অর্ন্তদৃষ্টি, এবং আপনার মর্ম্মস্পর্শিনী সমবেদনা। বাঙ্গালীজাতি যতই অর্ন্তদৃষ্টিশালী ও সমবেদনা পরায়ণ হইবে, ততই আপনার কবিতার সমাদর বৃদ্ধি পাইবে। আর একটী গুণ,—আপনার কবিতার মধ্যে ক্ষীণ-প্রবাহা মন্থরগতি স্বদেশহিতৈষণার ধারা। বঙ্গদেশে স্বদেশহিতৈষণার উদ্দীপনা পূর্ণ কবিতার অভাব নাই সত্য; কিন্তু সে সকল কবিতার প্রবাহ উদ্দাম,—পদ্মার বন্যার ন্যায়। হঠাৎ তাহা সমস্ত দেশকে প্লাবিত করে, কিন্তু কিয়ৎকাল পরে সেই উদ্দাম বারিরাশি-প্রবাহ অনন্ত সাগরে মিলাইয়া যায়, এবং যে স্থান প্লাবিত হইয়াছিল, তাহার উপর একস্তর কর্দ্দম মাত্র অবশিষ্ট থাকে। কিন্তু আপনার উদ্দীপনা অন্তঃসলিলা ফল্গু ধারার ন্যায় তাহাতে উদ্দামতা নাই, চঞ্চলতা নাই, আবিলতা নাই, তরঙ্গভঙ্গের উৎক্ষেপ নাই, সর্ব্বদা তাহা প্রচ্ছন্নভাবে অন্তর্দ্দেশকে অভিষিক্ত করে।·····আপনার সঙ্গীতাবলীও বাঙ্গালায় এক অপূর্ব্ব যুগের সৃষ্টি করিয়াছে। আপনি অনেক প্রেমসঙ্গীত রচনা করিয়াছেন; কিন্তু তাহার একটীতেও লালসার, কামনার, ভোগপিপাসার গন্ধমাত্র নাই; তাহাতে আছে কেবল, ত্যাগের ভাব, আত্মনিমজ্জনের ভাব, এক অজ্ঞাত অনন্তের প্রতি এক অনন্ত অনুরাগ ও উপাসনার ভাব।··· আর আপনার গদ্য কাব্য সমূহ —তাহাদেরই বা তুলনা কোথায়? "ক্ষুধিত পাষাণে"র ন্যায় চিত্তরঞ্জক অপূর্ব্ব গল্প কোথাও পড়িয়াছি বলিয়া মনে হয় না।···

কবিবর! ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করি তিনি আপনাকে দীর্ঘজীবী করুন, আপনার জীবনকে মধুময় করুন, আপনার প্রতিভাকে নূতন বলে, নূতন তেজে উদ্দীপিত ও উদ্ভাসিত করুন, এবং সেই প্রতিভা আপনার অমৃতময়ী লেখনীর মুখে বঙ্গের কাব্যকাননে সুধার প্রস্রবণ উৎসারিত করুক, এবং বঙ্গসমাজ অমর-কবি-প্রতিভার অমৃতময় ফল আস্বাদন করিয়া ধন্য ও কৃতার্থ হউক।

বঙ্গকবিকুলরবি! আমরা আপনাকে কৃতজ্ঞ ও ভক্তিনম্র-হৃদয়ে সসম্ভ্রমে অভ্যর্থনা করি, এবং বর্ষে বর্ষে আপনাকে অভ্যর্থনা করিবার সুযোগ প্রার্থনা করি।

মজঃফরপুর প্রবাসী আপনার ভক্ত
বাঙ্গালী সম্প্রদায়।

মজঃফরপুর
১লা শ্রাবণ, বঙ্গাব্দ ১৩০৮।

এই লেখায় অভিনন্দনপত্রের গতানুগতিক অতিশয়োক্তি থাকতে পারে, কিন্তু রচয়িতার অর্ন্তদৃষ্টি ও রচনাকুশলতা প্রশংসনীয়। অভিনন্দনের উত্তরে রবীন্দ্রনাথ নিশ্চয়ই কিছু বলেছিলেন, কিন্তু তার অনুলিখিত বা স্মৃতিবাহিত কোনো বিবরণ রক্ষিত হয়েছে বলে জানা যায়নি।

মজঃফরপুর থেকে রবীন্দ্রনাথ কৌতুক করে স্ত্রীকে যে চিঠি লিখেছেন তার মধ্যে এই অভিনন্দন-সভার কোনো উল্লেখ নেই, কিন্তু তাঁর খ্যাতির আকর্ষণে লোকসমাগমের বর্ণনা আছে :

তোমার মেয়েকে জিজ্ঞাসা কোরো জামাইবাড়ি এসে আমি কি রকম সাজসজ্জায় মনোযোগ করেছি। ঢাকাই ধুতি চাদর ছাড়া আর কথা নেই। এখানকার লোকেরা জানে আমি শরতের শ্বশুর, বঙ্গদর্শনের সম্পাদক, ব্রাহ্মসমাজের কর্তৃপক্ষ, জগদ্বিখ্যাত মাননীয় শ্রদ্ধাস্পদ রবি ঠাকুর, আমার বেশভূষা দেখে তাদের চক্ষু স্থির হয়ে গেছে। রোজ সন্ধ্যাবেলায় দলে দলে বাঙালিরা এই অদ্ভুত কৌতুক দেখবার জন্যে সমাগত হচ্চে—শরতের ঘরে আর জায়গা হয় না—মনে করচি ঢাকাইটা ছাড়তে হবে—নইলে লোকের আমদানি বন্ধ করা যাবে না। ····তোমার কথা শুনে আমার এই দুর্গতি হল।···· —আমাদের হিন্দুশাস্ত্রেও লিখ্চে স্ত্রীবুদ্ধি প্রলয়ঙ্করী। বোধ হয় শাস্ত্রকারদের স্ত্রীরা স্বামীদের জোর করে ঢাকাই ধুতি পরাত।*

পত্রের বাকি অংশে কন্যা-জামাতার মনের মিল, জামাতার স্বভাবপ্রকৃতির উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করে রবীন্দ্রনাথ কন্যাবিরহকাতরা স্ত্রীকে সান্ত্বনা দিয়েছেন। পত্রের শেষে লিখেছেন : 'এ চিঠির উত্তর আমাকে দিয়ো না—এখানে আমার চিঠিপত্র কাগজ বই প্রভৃতি পাঠাতে বারণ করে দিয়ো। বোধ হয় আমি পর্শু রওনা হয়ে একবার বোলপুর দেখে আগামী সোমবারের [৬ শ্রাবণ : 22 Jul] মধ্যে বাড়ি পৌঁছব।'

শান্তিনিকেতন থেকে তিনি স্ত্রীকে যে চিঠি লিখেছেন সেটিও মেয়ের কথা ও সান্ত্বনায় পূর্ণ। রেণুকার বিয়ের কথা যে তিনি এখনই ভাবছেন তার কিছু আভাস চিঠিটিতে আছে :

রাণীও যদি বিবাহ করে দূরে যায় তাহলে ওর ভালই হবে। অবশ্য প্রথম বছর দুই আমাদের কাছে থাক্‌বে—কিন্তু তার পরে বয়স হলেই ওকে সম্পূর্ণ ভাবেই দূরে পাঠান ওর মঙ্গলের জন্যই দরকার হবে। আমাদের পরিবারের শিক্ষা রুচি অভ্যাস ভাষা ও ভাব অন্য সমস্ত বাঙালী পরিবার থেকে স্বতন্ত্র—সেইজন্য বিবাহের পর আমাদের মেয়েদের একটু দূরে যাওয়া বিশেষ দরকার।····রাণীর যে রকম প্রকৃতি—বাপের বাড়ি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলেই ও শুধ্‌রে যাবে—আমাদের সঙ্গে নিকট যোগ থাক্‌লে ওর পূর্ব association যাবে না।[৫৭]

এবারে শান্তিনিকেতনে এসে বলেন্দ্রনাথ-পরিকল্পিত ব্রহ্মবিদ্যালয়ের বাড়িটি দেখে রবীন্দ্রনাথের মনে সম্ভবত প্রাচীন ভারতের তপোবনের আদলে ব্রহ্মচর্যাশ্রম প্রতিষ্ঠার সংকল্প জেগে ওঠে। মৃণালিনী দেবীকে লেখা চিঠিতে অবশ্য সেকথা নেই, সেখানে আছে মাধুরীলতার বিবাহের উদ্বেগ-অশান্তির অন্তে মানসিক প্রশান্তির কথা : 'আজ শান্তিনিকেতনে এসে শান্তিসাগরে নিমগ্ন হয়েছি। মাঝে মাঝে এরকম আসা যে কত দরকার তা না এলে দূর থেকে কল্পনা করা যায় না। আমি একলা অনন্ত আকাশ বাতাস এবং আলোকের দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়ে যেন আদিজননীর কোলে স্তনপান করচি।'

৬ শ্রাবণ [সোম 22 Jul] রবীন্দ্রনাথ কলকাতায় প্রত্যাবর্তন করেন।

শ্রাবণ-সংখ্যা বঙ্গদর্শন-এ [১।৪] রবীন্দ্রনাথের রচনা-সূচীটি এইরূপ :

১৪৯-৫১ 'জড় কি সজীব?' দ্র চিঠিপত্র ৬।১১৬-২০

১৫৭-৬৬ 'চোখের বালি' ১১-১৪ দ্র চোখের বালি ৩।৩১৬-২৭

১৭৪-৭৮ 'মেঘদূত' দ্র বিচিত্র প্রবন্ধ ৫|৪৬৪-৬৮ ['নববর্ষা']

১৭৯-৮৪ 'হিন্দুত্ব' দ্র আত্মশক্তি ৩।৫২০-২৫ ['ভারতবর্ষীয় সমাজ']

১৮৮-৯২ 'সাহিত্য-প্রসঙ্গ। নেশন কি? (রেনাঁর মত)' দ্র আত্মশক্তি ৩।৫১৫-১৯

১৯৪-৯৬ 'মাসিক-সাহিত্য-সমালোচনা'

১৯৪-৯৫ সাহিত্য। বৈশাখ; ১৯৫-৯৬ প্রদীপ। জ্যৈষ্ঠ

'মেঘদূত' ['নববর্ষা'] প্রবন্ধটি রবীন্দ্রনাথ লেখেন আষাঢ় মাসে শিলাইদহে। মৃণালিনী দেবীকে লেখা একটি চিঠিতে রচনার পরিবেশটি বর্ণিত হয়েছে :

> সমস্ত আকাশ অন্ধকার করে নিবিড় মেঘ জমে এসে বৃষ্টি আরম্ভ হল—আমার নীচের ঘরের চারিদিকের শার্সি বন্ধ করে এই বর্ষণদৃশ্য উপভোগ করতে করতে তোমাকে চিঠি লিখ্‌চি।…[এখানে] বসে মেঘদূতের উপর একটা প্রবন্ধ লিখ্‌চি। [আমার] প্রবন্ধের উপর আজকের এই নিবিড় বর্ষার দিনের বর্ষণমুখর ঘনান্ধকারটুকু যদি এঁকে রাখ্‌তে পারতুম, যদি আমার শিলাইদহের সবুজ ক্ষেতের উপরকার এই শ্যামল আবির্ভাবটিকে পাঠকদের কাছে চিরকালের জিনিস করে রাখ্‌তে পারতুম তাহলে কেমন হত! …কি অনায়াসেই জলস্থল আকাশের উপর এই নির্জ্জন মাঠের নিভৃত বর্ষার দিনটি—এই কাজকর্ম্মছাড়া মেঘেঢাকা আষাঢ়ের রৌদ্রহীন মধ্যাহ্নটুকু ঘনিয়ে এসেছে—অথচ আমার সেই লেখার মধ্যে তার কোন চিহ্নই রাখ্‌তে পারলুম না—কেউ জান্‌তে পারবেনা কোন্‌দিন কোথায় বসে বসে সুদীর্ঘ অবসরের বেলায় লোকশূন্য বাড়িতে এই কথাগুলো আমি আপনমনে গাঁথছিলুম![৫৮]

বিচিত্র প্রবন্ধ গ্রন্থে সংকলন করার সময়ে রচনাটির প্রথম ছ'টি অনুচ্ছেদ বর্জিত হয়েছে। শেষ অনুচ্ছেদটি ছিল : 'কুমারসম্ভব-শকুন্তলা-সম্বন্ধে এই দুটি প্রশ্ন করিয়া যে উত্তর পাইয়াছি, তাহা পরে লিখিবার ইচ্ছা আছে!' এই উত্তর 'কুমারসম্ভব ও শকুন্তলা' নামে পৌষ-সংখ্যা বঙ্গদর্শন-এ মুদ্রিত হয় [দ্র প্রাচীন সাহিত্য ৫। ৫১০-২১]।

'হিন্দুত্ব' ['ভারতবর্ষীয় সমাজ'] প্রবন্ধটির আগে 'নেশন কি? (রেনাঁর মত)' প্রবন্ধটির আলোচনা করে নেওয়া উচিত, কারণ নেশন কী সেই প্রশ্ন বিচার করার পর রবীন্দ্রনাথ হিন্দুত্ব বা ভারতবর্ষীয় সমাজের প্রকৃতিটি বিশ্লেষণ করতে প্রবৃত্ত হয়েছেন। 'হিন্দুত্ব' প্রবন্ধের পাদটীকাতেও 'সম্পাদক' লিখেছেন : 'সাহিত্যপ্রসঙ্গে "নেশন কি" তৎসম্বন্ধে রেনাঁর মত অনুবাদ করিয়া দেওয়া হইয়াছে—তাহার সহিত মিলাইয়া এই প্রবন্ধ পাঠ করিতে পাঠকদিগকে অনুরোধ করি।'

'নেশন কী' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ ফরাসী পণ্ডিত ও দার্শনিক Ernest Renan [1823-92]-এর বিশ্লেষণ অনুসরণ করে 'নেশন' শব্দের সংজ্ঞা নির্ধারণ করার চেষ্টা করেছেন। বাংলায় 'নেশন' শব্দটির যথার্থ প্রতিশব্দ নেই বলে তিনি প্রথমেই শব্দটিকে অবিকৃত আকারে গ্রহণ করার সুপারিশ করেন। অতঃপর য়ুরোপের বিভিন্ন নেশন গঠনের মৌলিক উপাদানগুলি বিচার করে তিনি দেখিয়েছেন, নেশন জাতি, ভাষা, বৈষয়িক স্বার্থ, ধর্ম ও ভৌগোলিক অবস্থান নিরপেক্ষ একটি মানস পদার্থ; যার মূল উপাদান দুটি—সর্বসাধারণের প্রাচীন স্মৃতিসম্পদ ও একত্রে বাস করবার ইচ্ছা অর্থাৎ 'যে অখণ্ড উত্তরাধিকার হস্তগত হইয়াছে তাহাকে উপযুক্ত ভাবে রক্ষা করিবার ইচ্ছা'। সুতরাং 'অতীতে সকলে মিলিয়া ত্যাগদুঃখ-স্বীকার এবং পুনর্বার সেইজন্য সকলে মিলিয়া প্রস্তুত থাকিবার ভাব হইতে জনসাধারণকে যে একটি একীভূত নিবিড় অভিব্যক্তি দান করে তাহাই নেশন।'

য়ুরোপীয় নেশনগুলিতে বর্ণ ও ধর্মের বিশেষ পার্থক্য না থাকায় একীকরণ সেখানে সহজ হয়েছিল। কিন্তু আর্য ও অনার্যের প্রভেদ এত সুদুস্তর ছিল যে সে বিচ্ছেদ ভোলার উপায় ছিল না। তবু হিন্দুসভ্যতা যে এক অত্যাশ্চর্য প্রকাণ্ড সমাজ রচনা করেছে তার মধ্যে স্থান পায় নি এমন জাত নেই—সকলেই আপন ভাষা, বর্ণ, ধর্ম ও আচার রক্ষা করেও সেই সমাজে সামঞ্জস্য রক্ষা করে বাস করছে। কিন্তু য়ুরোপের নেশন একটি সজীব সত্তা, তাই সেখানে 'অতীত-বর্তমানের মধ্যে নিরন্তর চিত্তের সম্বন্ধ আছে—অখণ্ড কর্মপ্রবাহ চলিয়া আসিতেছে।' অপরপক্ষে হিন্দুসমাজ পূর্বপুরুষের বাঁধা সমাজ-কাঠামোর মধ্যেই আবদ্ধ থাকায় নূতন অবস্থা,

শিক্ষা ও নূতন জাতির সংঘর্ষে যে পরিবর্তন অনিবার্য তা এই সমাজকে বিকৃতির দিকে নিয়ে যাচ্ছে। 'যে সময় হিন্দুসমাজ সজীব ছিল, তখন সমাজের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সমস্ত সমাজকলেবরের স্বার্থকেই নিজের একমাত্র স্বার্থ জ্ঞান করিত। রাজা সমাজেরই অঙ্গ ছিলেন, সমাজ সংরক্ষণ ও চালনার ভার ছিল তাঁহার উপর—ব্রাহ্মণ, সমাজের মধ্যে সমাজধর্ম্মের বিশুদ্ধ আদর্শকে উজ্জ্বল ও চিরস্থায়ী করিয়া রাখিবার জন্য নিযুক্ত ছিলেন—তাঁহাদের ধ্যানজ্ঞান শিক্ষা সাধনা সমস্তই সমাজের সম্পত্তি ছিল। গৃহস্থই সমাজের স্তম্ভ বলিয়া গৃহাশ্রম এমন গৌরবের বলিয়া গণ্য হইত। সেই গৃহকে জ্ঞানে, ধর্ম্মে, ভাবে, কর্ম্মে সমুন্নত রাখিবার জন্য সমাজের বিচিত্রশক্তি বিচিত্র দিকে সচেষ্টভাবে কাজ করিত।' বর্তমানে সেই নিয়ম আছে, কিন্তু সেই চেতনা নেই। পূর্বপুরুষদের সেই নিয়তজাগ্রত মঙ্গলের ভাবটিকে হৃদয়ের মধ্যে গ্রহণ করে নিঃস্বার্থভাবে শিক্ষাদান, স্বাস্থ্যদান, অন্নদান, ধনসম্পদ-দান করলে সেই বিপুল হিন্দুসভ্যতাকে পুনরায় পাওয়া যেতে পারে। 'সমাজের নীচে হইতে উপর পর্যন্ত সকলকে একটি বৃহৎ নিঃস্বার্থ কল্যাণবন্ধনে বাঁধা, ইহাই আমাদের সকল চেষ্টার অপেক্ষা বড় চেষ্টার বিষয়। এই ঐক্যসূত্রেই হিন্দুসম্প্রদায়ের একের সহিত অন্যের এবং বর্তমানের সহিত অতীতের ধর্মযোগ সাধন করিতে হইবে। আমাদের মনুষ্যত্বলাভের এই একমাত্র উপায়।' রাষ্ট্রনীতির চেষ্টা এই সামাজিক ঐক্যসাধনে যতটুকু সাহায্য করে ততটুকুই তার গৌরব বলে রবীন্দ্রনাথ মনে করেন। সেইজন্য তিনি প্রবন্ধটির বর্জিত শেষাংশে কংগ্রেসের বার্ষিক অধিবেশনের সঙ্গে Social Conference অনুষ্ঠিত করার জন্য নানা বাধা ও উপহাস সত্ত্বেও রানাড়ে যে চেষ্টা করেছিলেন সেই প্রয়াসকে অভিনন্দিত করেছেন।

রবীন্দ্রনাথ এই প্রবন্ধে হিন্দুত্বের যে তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা দেন, তারই প্রয়োগমূলক পরামর্শ দিয়েছেন ত্রিপুরার মহারাজা রাধাকিশোর মাণিক্যকে সম্ভবত ৩০ আষাঢ় [রবি 14 Jul] তারিখে লেখা চিঠিতে :

মনুসংহিতা প্রভৃতি স্মৃতি শাস্ত্রে রাজধর্ম্ম সম্বন্ধে যে পরিচ্ছেদ আছে তাহাতে হিন্দুরাজার কর্ত্তব্যের আদর্শ দেওয়া আছে। ঐশ্বর্য্য ও সিংহাসন অধিকার যে রাজার চরম কর্ত্তব্য নহে তাহা সংহিতা হইতে স্পষ্টই বুঝা যায়—আমাদের রাজার রাজত্ব কর্ত্তব্যের অধিকার, ঐশ্বর্যের অধিকার নহে—প্রাচীন বয়সে পুত্রকে রাজ্যভার দিয়া বানপ্রস্থ অবলম্বনের প্রথার দ্বারা তাহা স্পষ্ট বুঝা যায়। জীবনের এক এক ভাগে রাজার কর্ত্তব্য নির্দ্দিষ্ট হইয়া আছে—রাজত্বভার কেবল তাহার প্রকাশ মাত্র। য়ুরোপে রাজত্বই রাজার সমস্ত। প্রাচীন ভারতে ভোগ এবং ক্ষমতার হিসাবে না দেখিয়া রাজত্বকে সামাজিক ও ব্যক্তিগত কর্ত্তব্য হিসাবে দেখা হইত। নিজের ঐশ্বর্য্যকে নহে, পরন্তু সমাজবিহিত ধর্ম্মকে সকল প্রকার আক্রমণ ও ব্যভিচার হইতে রক্ষা করিবার জন্যই রাজা দুর্ভর রাজদণ্ডভার গ্রহণ করিতেন। সম্প্রতি বিদেশী সম্রাট ভারতবর্ষ অধিকার করিয়া আছেন বলিয়াই স্বদেশী সমাজের আদর্শ উন্নত ও সবল করিয়া রাখা দেশীয় রাজন্যবর্গের পক্ষে দ্বিগুণতর কর্ত্তব্য হইয়াছে। এখন হিন্দুসমাজ বাহিরের আক্রমণের দ্বারা জড়ভাবে তাড়িত ও চালিত হইতেছে। কোন্ ধ্বংসের পথে যাইতেছে তাহার স্থিরতা নাই। রাজারা যদি জাগ্রত থাকেন ও দেশের জ্ঞানী মনীষিবর্গকে জাগ্রত করিয়া রাখেন তবেই সচেতনভাবে হিন্দুসমাজ উন্নতির পথে চলিতে পারে। রাজারাই দেশের বুধমণ্ডলীকে রাজসভায় আকর্ষণ করিয়া লইয়া মনুষ্যত্বের হিতসাধনকল্পে সকল প্রকার ধর্ম্মালোচনাকে সজীব করিয়া রাখিবেন—এবং হিতকর প্রথা সযত্নে প্রচলিত করিয়া স্বরাজ্যে এবং চতুর্দ্দিকে সামাজিক উচ্চ আদর্শ প্রবর্ত্তন করিবেন। মহীশূরে কতকটা এরূপভাবে কাজ আরম্ভ হইয়াছে, এবং পরলোকগত বম্বাইবাসী মহাত্মা রাণাড়ের প্রবন্ধাদি পাঠে জানা যায় যে মারাঠি পেশোয়াগণ সমাজের প্রতি বিশেষ মনোযোগী হইয়াছিলেন। শ্রাবণ মাসের আগামী সংখ্যক বঙ্গদর্শনে "হিন্দুত্ব" প্রবন্ধে আমি দেখাইয়াছি সমাজই হিন্দুর হিন্দুত্ব এবং রাজা ব্রাহ্মণ বণিক্ শূদ্র সেই সমাজকেই নানাদিক হইতে অগ্রসর করিয়া দিবার জন্য। এই কারণেই প্রথম বয়সে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যকে ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়া কঠোর শিক্ষায় স্ব স্ব কর্ত্তব্যের আদর্শ গ্রহণ ও পালন করিবার জন্য বহু বৎসর ধরিয়া প্রস্তুত হইতে হইত।[৫৯]

'মাসিক-সাহিত্য-সমালোচনা'য় রবীন্দ্রনাথ বৈশাখ-সংখ্যা সাহিত্য-তে মুদ্রিত রামানন্দ ভারতীর 'হিমারণ্য' [পৃ ১-৯] ও যোগেশচন্দ্র রায়ের 'মাটির বাসন' (পৃ ১৫-২৫] এবং জ্যৈষ্ঠ সংখ্যা প্রদীপ-এ মুদ্রিত নগেন্দ্রনাথ বসুর 'পুরাণতত্ত্ব' [পৃ ২০১-০৬] প্রবন্ধগুলি নিয়ে আলোচনা করেছেন। 'মাটির বাসন' সম্পর্কে তিনি লিখেছেন :

আমরা নূতন নূতন লোহার কল তৈরি করিয়া জগতে বাহবা লইতে পারিতেছি না, তাহা দুঃখের বিষয়, সন্দেহ নাই—কিন্তু তদপেক্ষা ধিক্কারের বিষয় এই যে, হাঁড়িকুঁড়ি, ঢেঁকি, গোরুর গাড়ি, আমাদের নূতন শিক্ষার আন্দোলনে, বুদ্ধিবৃত্তির নূতন অনুশীলনকালেও কোন অংশে উন্নতিলাভ করিল না। পাঁচরকম মাটি লইয়া পরীক্ষা করিয়া পূর্ব্বাপেক্ষা ভাল মৃৎপাত্রের উপাদান আবিষ্কার করা অপূর্ব্ব অসামান্যতার অপেক্ষা করে না। নূতন শিক্ষা আমাদিগকে তেমন করিয়া যদি সজাগ করিত, তবে দেশের হাঁড়িকুঁড়ি হইতে মনুষ্যসমাজ পর্য্যন্ত সকলি তাহার সাক্ষ্য দিত।

'পুরাণতত্ত্ব' সম্বন্ধে তিনি লিখেছেন : 'এইগুলিই প্রাচীনকালের সাহিত্য ছিল। সেই দেশব্যাপ্ত সাহিত্য হইতে কোন অজ্ঞাতনামা মহাকবি মহাভারত গড়িয়া তুলিয়াছিলেন। কিন্তু সেই প্রাচীনতর বিক্ষিপ্ত-বিলুপ্ত সাহিত্যের জন্য আকাঙক্ষা আমাদের মনের মধ্যে রহিয়া গেল। তাহার মধ্যে কত ইতিহাস, ভাষার পরিণাম, কবিত্বের বিকাশ নিহিত ছিল!' বৈদিক কালেও পুরাণের উল্লেখ পাওয়া যায় এবং খ্রীস্টীয় ৫ম ও ৬ষ্ঠ শতাব্দী থেকে ব্রাহ্মণ্যধর্মের পুনঃপ্রভাবে প্রাচীন পুরাণগুলি সংগ্রহ বা প্রচলিত হয় জেনে তিনি লিখেছেন :

ইতিমধ্যে বৈদিককাল হইতে নূতন পৌরাণিক কালের মাঝখানটাতে প্রাচীন সাহিত্যের যে ধারা চলিয়া আসিয়াছিল, তাহা কোথায় বিনষ্ট হইয়া গেল! সে সাহিত্য যে সুমহৎ ছিল, তাহা রামায়ণ-মহাভারত হইতে অনুমান করিতে পারি। বিশ্বসাহিত্যের মধ্যে মহাভারতকে অসঙ্কোচে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ স্থান দেওয়া যায়,—সেই মহাভারতের শ্রেষ্ঠতা আকস্মিক হইতে পারে না। পূর্ব্ববর্ত্তী সাহিত্যে তাহার উপযুক্ত ভিত্তি ছিল। যেমন মঙ্গল ও বৃহস্পতির মধ্যস্থলে কোন একটি গ্রহ না থাকিলে জ্যোতিষিগণের হিসাবে মিলিত না, অবশেষে সেই জায়গায় সাড়ে চার শো খণ্ডগ্রহ আবিষ্কৃত হইয়াছে—তেমনি মহাভারত ও বেদের মধ্যবর্তী স্থানের সাহিত্যহিসাব মিলিতেছে না; সেই স্থানের ছোটবড় সাড়ে চারিশত পুরাণ কি কোন দিন আবিষ্কৃত হইবে? সাহিত্য হিসাবে বর্তমান পুরাণগুলির শ্রেষ্ঠতা নাই। স্পষ্ট বুঝা যায়, সেগুলি প্রয়োজনের অনুরোধে শাস্ত্রকারগণের রচনা—মহাপুরুষদের মহিমায় ভাবাবিষ্ট কবির রচনা নহে। সমাজহিতৈষী রাজগণের আদেশে পণ্ডিতদের দ্বারা সেগুলি সঙ্কলিত।

'মাসিক-সাহিত্য-সমালোচনা'র এইটিই শেষ কিস্তি। সম্ভবত রবীন্দ্রনাথের অনবসরই এর কারণ। সাধনা বা ভারতী-তে এই জাতীয় রচনা শত্রুবৃদ্ধি করেছিল, কিন্তু বঙ্গদর্শন-এ তিনি সাধারণত এমন-সব রচনা আলোচনার জন্য বেছে নেন, যেগুলির তিনি প্রশংসা করতে ও সেই উপলক্ষে নিজের ভাবনা প্রকাশ করতে পারেন। সেদিক দিয়ে এই রচনাগুলি রবীন্দ্রসাহিত্যে স্থায়ী আসন পাবার যোগ্য।

৬ শ্রাবণ [সোম 22 Jul] রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতন থেকে কলকাতায় ফিরে সেই দিনই বালিগঞ্জে যান, পরদিন যান কর্নওয়ালিশ স্ট্রীটে। 25 Jul [বৃহ ৯ শ্রাবণ] তিনি জগদীশচন্দ্রকে লেখেন :

কন্যাকে ইতিমধ্যে স্বামীগৃহে রাখিয়া আসিলাম। পথের মধ্যে কিছুদিন শান্তিনিকেতনে বাস করিয়া আরাম লাভ করিয়াছি। সেখানে একটা নির্জ্জন অধ্যাপনের ব্যবস্থা করিবার চেষ্টায় আছি। দুই একজন ত্যাগ-স্বীকারী ব্রহ্মচারী অধ্যাপকের সন্ধানে ফিরিতেছি।[৬০]

এই 'ত্যাগ-স্বীকারী ব্রহ্মচারী অধ্যাপকের' সন্ধান তিনি পেলেন ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় ও তাঁর ভক্ত-শিষ্য সিন্ধি যুবক রেবাচাঁদের [পুরো নাম রেবাচাঁদ জ্ঞানচাঁদ মখিজানি—পরবর্তীকালে ব্রহ্মচারী অণিমানন্দ নাম গ্রহণ করেন] মধ্যে। রেবাচাঁদ ও একজন শিক্ষার্থীকে নিয়ে ব্রহ্মবান্ধব ইতিপূর্বেই জব্বলপুর শহরের নিকটে নর্মদাতীরে একটি মঠ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। ক্যাথলিক মিশন কর্তৃপক্ষের বিরোধিতায় সেই মঠ উঠে গেলে 1900-এর গোড়ার দিকে তিনি স-শিষ্য কলকাতায় এসে ওঠেন বিডন স্ট্রীটের একটি ভাড়া বাড়িতে। কাছেই ১৮ নং বেথুন রো-তে ছিল ব্রহ্মবান্ধবের এককালীন ছাত্র ও পরম শুভানুধ্যায়ী বন্ধু কার্তিকচন্দ্র নান-এর বাসস্থান। এই বাড়িটি ছিল ব্রহ্মবান্ধবের অন্যতম কর্মক্ষেত্র—16 Jun 1900 [শনি ২ আষাঢ় ১৩০৭] এখান থেকেই ব্রহ্মবান্ধব-সম্পাদিত সাপ্তাহিক *Sophia* প্রকাশিত হয়। এখানে প্রধানত রেবাচাঁদের তত্ত্বাবধানে কার্তিকচন্দ্রের পুত্র সুধীরচন্দ্র নান ও কয়েকটি বালককে নিয়ে একটি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। ব্রহ্মবান্ধবের জীবনীতে অণিমানন্দ লিখেছেন : 'Rewachand a born teacher, could teach Sudhir Nan, Rajen,

Nanda and a few more. Soon a separate building was rented in Simla Bazar Street. It was conducted on the ancient Aryan ideal. The students were charged no fees. The paraphernalia that fill the ordinary schools were conspicuous for their absence. Some six students of respectable families attended the institution.'[৬১] দীপ্তিময় রায় লিখেছেন : 'ক্রমে বিদ্যালয়ের ছাত্র সংখ্যা দাঁড়িয়েছিল কুড়ি জনে। তখন সিমলা বাজার স্ট্রীটে অন্য একটি ভাড়া করা ঘরে বিদ্যালয় স্থানান্তরিত করা হয়েছিল। শিক্ষার্থী বালকদের মধ্যে ছিলেন কার্তিকচন্দ্রের পুত্র সুধীর নান, ব্রহ্মবান্ধবের বন্ধু ও সহপাঠী উপেন্দ্রকৃষ্ণ গুপ্তের কনিষ্ঠ ভাই মণীন্দ্রকৃষ্ণের জ্যেষ্ঠ পুত্র গৌরগোবিন্দ ও মধ্যম ভ্রাতার পুত্র অশোককৃষ্ণ।'[৬২]

আমরা আগের অধ্যায়ে বলেছি, *Sophia* [1 Sep 1900]-য় 'The World Poet of Bengal-শীর্ষক রবীন্দ্র-প্রশস্তি প্রকাশিত হওয়ার পর ব্রহ্মবান্ধব ও রবীন্দ্রনাথের মধ্যে যোগাযোগ গড়ে ওঠে। নৈবেদ্য-কে অবলম্বন করে উভয়ের সম্পর্ক আরো ঘনিষ্ঠ হয়, বৈশাখ-সংখ্যা বঙ্গদর্শন-এ মুদ্রিত ব্রহ্মবান্ধবের 'হিন্দুজাতির একনিষ্ঠতা' প্রবন্ধ নৈবেদ্য-এর একটি কবিতাকে শিরোভূষণ করে প্রকাশিত হল। নৈবেদ্য প্রকাশিত হওয়ার পর একটি কপি পেয়ে তিনি 5 Jul [শুক্র ২১ আষাঢ়] রবীন্দ্রনাথকে একটি দীর্ঘ পত্রে লেখেন :

I owe you an apology for not duly acknowledging receipt of your "Naivedya". I have roughly analysed it and found in it four divisions: (1) personal, (2) human, (3) national and (4) transcendental. I have not been able to discover a single theological flaw in the book. Its Theism is sound to the core. It is an embodiment of the essence of Bhakti made compatible with transcendence. I am tempted to write, not a critique, but certain reflections which may serve as a key to readers not initiated into the mysteries of the Infinite.

I am fated, as it were, to deal in hard metaphysics. Hence, my delight knows no bound when I find the highest truths of philosophy clothed in poetry. In olden times man was ruled by might; now by right. In heaven love will rule, and poetry is the flesh-and-blood countenance of Love. I do not exaggerate when I say that I have never seen-though it must be admitted that my experience is poor—Love, Union & Beauty, so nobly and sweetly expressed as they are—in "Naivedya."[৬৩]

ব্রহ্মবান্ধব ও নগেন্দ্রনাথ গুপ্তের যুগ্ম-সম্পাদনায় The Twentieth Century নামে একটি ইংরেজি মাসিকপত্র Jan 1901 থেকে প্রকাশিত হচ্ছিল। চিঠিতে ব্রহ্মবান্ধব যে ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন, তা তিনি পূর্ণ করলেন পত্রিকাটির July 1901-সংখ্যায় গ্রন্থটির একটি দীর্ঘ সপ্রশংস পরিচিতি লিখে। সংখ্যাটি অবশ্য যথাসময়ে প্রকাশিত হয়নি, ৪ Aug (বৃহ ২৩ শ্রাবণ] তিনি রবীন্দ্রনাথকে প্রবন্ধটির দুটি প্রুফ পাঠিয়ে লেখেন :

I have great pleasure in sending for your perusal two proof sheets of the "Twentieth Century". They contain a few reflections on your Naivedya. I have been only able to give a few hints. I hope they will be helpful in giving people some idea of the thoughts contained in the poem. I have given copious extracts for they will explain your mind better than my observations.[৬৪]

এই আলোচনাটি রবীন্দ্রনাথকে এতই মুগ্ধ করেছিল যে, পরবর্তীকালে ব্রহ্মবান্ধবের প্রসঙ্গমাত্রেই তিনি রচনাটির কথা উল্লেখ করেছেন—এমন-কি এই রচনাসূত্রেই তাঁদের পরিচয় ঘটে এমন ভ্রমাত্মক উক্তিও করেন।[৬৫] সম্ভবত শ্রাবণের শেষে তিনি রচনাটি জগদীশচন্দ্রকে পাঠিয়ে লেখেন :

বিংশ শতাব্দীতে নৈবেদ্যের যে-সমালোচনা বাহির হইয়াছে তোমাকে পাঠাই। নৈবেদ্যকে আমি আমার অন্যান্য বইয়ের মত দেখি না। লোকে যদি বলে কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না বা ভাল হয় নাই তবে তাহাতে আমার হৃদয় স্পর্শ করে না। নৈবেদ্য যাঁহাকে দিয়াছি তিনি যদি উহাকে সার্থক করেন তবে করিবেন—আমি উহা হইতে লোকস্তুতি বা লোকনিন্দার কোন দাবীই রাখি না।[৬৬]

২০/১ মদন মিত্র লেনে অবস্থিত *The Twentieth Century* পত্রিকার অফিস থেকে লিখিত উপরের পত্রটিতে ব্রহ্মবান্ধব লেখেন : I have been thinking of seeing you one of these days but pressure of work comes in the way.' এই সময়ে রেণুকার বিবাহ নিয়ে ব্যস্ত থাকার জন্য রবীন্দ্রনাথও হয়তো তাঁর কাছে যেতে পারেননি; কিন্তু ব্রহ্মচারী অণিমানন্দের লেখা থেকে জানা যায় যে, তিনি বহুবার কার্তিকচন্দ্র নানের বেথুন রো-র বাড়িতে গিয়ে ব্রহ্মবান্ধবের সঙ্গে আলাপ করতেন :

From Jorasanko, Rabindranath would come, by gharry or on foot. "Is Kartik Babu in?" up the stairs to the first floor he went. There on the floor Upadhyay was squatting in garic garb. A chair was brought for the poet. Words were exchanged. They had so many ideals in common. Just then Maharshi was willing to open a school in his estate at Bolepur. Upadhyay's school might be transferred there.....plans were being made.[৬৭]

ব্রহ্মবান্ধবের বিদ্যালয়টি শান্তিনিকেতনে স্থানান্তরিত করার প্রস্তাব সম্ভবত আরো পরে উঠেছিল, কারণ, উপযুক্ত শিক্ষকের অভাবের কথা রবীন্দ্রনাথ জগদীশচন্দ্রকে উল্লিখিত পত্রেও ব্যক্ত করেছেন :

শান্তিনিকেতনে আমি একটি বিদ্যালয় খুলিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিতেছি। সেখানে ঠিক প্রাচীন কালের গুরুগৃহ-বাসের মত সমস্ত নিয়ম। বিলাসিতার নাম-গন্ধ থাকিবে না—ধনী দরিদ্র সকলকেই কঠিন ব্রহ্মচর্য্যে দীক্ষিত হইতে হইবে। উপযুক্ত শিক্ষক কোন মতেই খুঁজিয়া পাইতেছি না। এখনকার কালের বিদ্যা ও তখনকার কালের প্রকৃতি একত্রে পাওয়া যায় না। স্বার্থ-চেষ্টা এবং আড়ম্বর হইতে কোন মহৎ কার্য্যকে বিচ্যুত করিতে গেলে কাহারো মুখরোচক হয় না।[৬৮]

—শেষ বাক্যটি থেকে মনে হয়, তিনি অন্যান্য বাধার সম্মুখীন হচ্ছিলেন; কিন্তু সংকল্পটি যে তাঁর মনে উত্তরোত্তর দৃঢ় হয়ে উঠছে তার আভাস পত্রটিতে রয়েছে।

মাধুরীলতাকে মজঃফরপুরে স্বামীগৃহে পৌঁছে দিয়ে শান্তিনিকেতন হয়ে রবীন্দ্রনাথ কলকাতায় পৌঁছন ৬ শ্রাবণ [সোম 22 Jul]। ১১ শ্রাবণ [শনি 27 Jul] তিনি বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের অষ্টম বর্ষের তৃতীয় মাসিক অধিবেশনে যোগদান করেন। ইতিমধ্যে ২৯ বৈশাখ [রবি 11 May] পরিষদের সপ্তম বার্ষিক অধিবেশনে সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণের প্রস্তাবে ও শিবাপ্রসন্ন ভট্টাচার্যের সমর্থনে সত্যেন্দ্রনাথ সভাপতি-পদে এবং হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, রবীন্দ্রনাথ ও প্রফুল্লচন্দ্র রায় সহ-সভাপতি পদে নির্বাচিত হন। এর আগে রবীন্দ্রনাথ ১৩০১-০৩ বঙ্গাব্দে পরিষদের প্রথম তিনটি বৎসর সহ-সভাপতি ছিলেন। উক্ত মাসিক অধিবেশনের প্রধান কার্যসূচী ছিল হরপ্রসাদ শাস্ত্রী কর্তৃক 'ব্যাকরণ সম্বন্ধীয় প্রবন্ধ পাঠ'। তিনি স্কুলপাঠ্য বাংলা ব্যাকরণের কৃত্রিমতা বিষয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা [দ্র সা·প·প·, ১ম সংখ্যা ১৩০৮।১-৭] করার পর বীরেশ্বর পাঁড়ে প্রবন্ধটির তীব্র সমালোচনা করেন। চারুচন্দ্র ঘোষ ও সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ শাস্ত্রী মহাশয়ের বক্তব্য সমর্থন করলে হীরেন্দ্রনাথ দত্ত যুক্তিজাল বিস্তার করে ব্যাকরণ রচনার উদ্দেশ্যে বিবৃত করেন।

তৎপরে শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় বলিলেন, হীরেন্দ্র বাবু যাহা বলিয়াছেন, প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয়ে তদতিরিক্ত বলিবার আর কিছুই নাই। নিঃশেষ করিয়া সকল কথার উত্তর দিয়াছেন। শাস্ত্রী মহাশয়ের বক্তৃতায় আজ অনেক বিষয় শিক্ষা হইল, সেজন্য আমি তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি। ব্যাকরণ প্রবন্ধ কিরূপ হইবে, এ সন্দেহ আমার ছিল, কৌতুহলী হইয়া আসিয়াছিলাম, কিন্তু এমন মনোজ্ঞ প্রবন্ধ শুনিব, তাহা কল্পনা করিতেও পারি নাই। ভাষা যে আমরা নিজে ইচ্ছা করিলে, গড়িতে পারি, ভাঙ্গিতে পারি, এরূপ নহে। সংস্কৃতের সহিত বাঙ্গালার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ সহজে বুঝা যায়, কিন্তু কোথায় কোথায় কিরূপ পার্থক্য আছে, সেগুলি লক্ষ্য করাই এখন আবশ্যক। তবেই ইহার বর্তমান আকৃতি জানা যাইবে, তবেই ব্যাকরণ গঠনের চেষ্টা হইতে পারিবে। আমারও মনে হয় যে বাঙ্গালা ব্যাকরণ সংস্কৃতমূলক হবে কেন? সংস্কৃত শব্দের বাহুল্য বাঙ্গালায় বেশী বলিয়াই ভাষার গঠনাদিও সংস্কৃত ব্যাকরণানুসারে করিতে হইবে? বাঙ্গালা ভাষার প্রকৃতি কাঠামো যে সম্পূর্ণ তফাত ইহা না বুঝিলে চলিবে কেন?

তবে সংস্কৃত ব্যাকরণ আলোচনা করা আবশ্যক, নতুবা আমরা ঠিক পথে চলিতে পারিব না। আমার আর বক্তব্য নাই; শাস্ত্রী মহাশয়কে আমার ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাইয়া আমি আমার বক্তব্য শেষ করিতেছি।[৬৯]

রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, যোগীন্দ্রনাথ বসু, সুরেশচন্দ্র সমাজপতি ও সভাপতি সত্যেন্দ্রনাথ আলোচ্য বিষয়ে কিছু বলার পর সভাভঙ্গ হয়।

রবীন্দ্রনাথ বহুদিন ধরে বিভিন্ন ভাষাতত্ত্বমূলক প্রবন্ধে প্রকৃত বাংলা ব্যাকরণ রচনার জন্য প্রচার চালিয়ে আসছিলেন। হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর প্রবন্ধে সেই প্রচারের প্রতিধ্বনি শুনে তাঁর খুশি হওয়ার কথা। এই খুশিতেই তিনি 'বাঙলা কৃৎ ও তদ্ধিত' প্রবন্ধ লিখে পরিষদের পঞ্চম মাসিক অধিবেশনে [১২ আশ্বিন : 28 Sep) পাঠ করেন।

১৩ শ্রাবণ [সোম 29 Jul] রবীন্দ্রনাথ বিদ্যাসাগর-মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে বক্তৃতা করেন। এইদিন অপরাহ্ন সাড়ে পাঁচটার সময় ক্লাসিক থিয়েটার গৃহে রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেবের সভাপতিত্বে মন্মথনাথ রায়চৌধুরী, নগেন্দ্রনাথ ঘোষ, কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ, বিপিনচন্দ্র পাল, পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়, অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী, রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতি অনেকে বক্তৃতা করেন। 'রঙ্গালয়' সাপ্তাহিকে [১৭ শ্রাবণ : 2 Aug] এই 'বিদ্যাসাগর সভা'র বর্ণনায় লেখা হয় : 'প্রথমে "বন্দে মাতরং" গীত হইয়া সভার বোধন হইল।…সকলেরই বক্তৃতা সময়োপযোগী ও হৃদয়গ্রাহী হইয়াছিল। রবীন্দ্রবাবুকে গান করিতে অনুরোধ করা হয়, কিন্তু তিনি শোকসভায় সঙ্গীতচর্চ্চায় অনিচ্ছা প্রকাশ করেন।' রবীন্দ্রনাথ নিশ্চয়ই কোনো লিখিত প্রবন্ধ পাঠ করেননি, মৌখিক ভাষণ দিয়েছিলেন।

এছাড়া কলকাতায় রবীন্দ্রনাথের ভ্রাম্যমাণতাও অব্যাহত। ১০ শ্রাবণ শ্যামবাজার আহিরীটোলা ও বিডন স্ট্রীট, ১৩ শ্রাবণ বিডন স্ট্রীট, ১৪ শ্রাবণ বালিগঞ্জ, ১৯ শ্রাবণ ঝামাপুকুর প্রভৃতি স্থানে তাঁর যাতায়াতের হিসাব ক্যাশবহিতে পাওয়া যায়। ১৩ শ্রাবণ বিডন স্ট্রীটে যাওয়া বিদ্যাসাগর-স্মরণসভার কারণে, কিন্তু আমরা জানি না, ১০ শ্রাবণ বিডন স্ট্রীটে যাতায়াতের হিসাব ব্রহ্মবান্ধবের কাছে যাওয়ার সঙ্গে সম্পৃক্ত কিনা। ঝামাপুকুর যাওয়া সম্ভবত রেণুকার বিবাহের সঙ্গে যুক্ত।

ক্ষণিকা-র মুদ্রক প্রেমতোষ বসু যে রেণুকা ও সত্যেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যের বিয়েতে ঘটকালি করেছিলেন, ক্যাশবহিতে তার কিছু প্রমাণ আছে। ৩ ভাদ্র হিসাব লেখা হয় : 'ব° প্রেমতোষ বাবু/উক্ত সত্যেন্দ্র বাবুর পশ্চিম হইতে আসার ও গাত্র হরিদ্রার খরচ জন্য ৯০; ৪ মাঘের হিসাব : উক্ত বাবু মহাশয়ের [সত্যেন্দ্র ভট্টাচার্য] মাতাঠাকুরাণীর ১৩০৮ সালের আশ্বিন, কার্তিক, অগ্রহায়ণ ও পৌষ ৪ মাসের মাসিক ৫০্ হিসাব শোধ গুঃ প্রেমতোষ বসু ২০০্'—এই হিসাব থেকে বিবাহের আনুষঙ্গিক দায়িত্ব কতটা ঠাকুরপরিবারকে গ্রহণ করতে হয়েছিল তারও কিছুটা হদিশ পাওয়া যায়। সত্যেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যের কাকা নরেন্দ্রনাথের সঙ্গে প্রেমতোষ বসুর আলাপ ছিল। সম্ভবত সেই সূত্রেই বিবাহের প্রস্তাবটি উত্থাপিত হয়। রবীন্দ্রনাথ যে শান্তিনিকেতনে বসে রেণুকার বিয়ের কথা ভাবছিলেন, সেকথা আমরা আগেই বলেছি*।

তিনি জগদীশচন্দ্রকে বিবাহের ইতিহাসটি বিবৃত করে লিখেছেন :

হঠাৎ আমার মধ্যমা কন্যা রেণুকার বিবাহ হইয়া গেছে। একটি ডাক্তার বলিল, বিবাহ করিব—আমি বলিলাম, কর। যেদিন কথা তার তিন দিন পরেই বিবাহ সমাধা হইয়া গেল। এখন ছেলেটি তাহার অ্যালোপ্যাথি ডিগ্রির উপর হোমিওপ্যাথিক চূড়া চড়াইবার জন্য আমেরিকা রওনা হইতেছে। বেশী দিন সেখানে থাকিতে হইবে না। ছেলেটি ভাল, বিনয়ী, কৃতী।[৭০]

২১ শ্রাবণ [মঙ্গল 6 Aug] 'শ্রীমতী রেণুকা দেবীর বিবাহ হিঃ মজঃফরপুর ও কুষ্টিয়ায় টেলিগ্রাম করার ব্যয়' হিসাব থেকে বোঝা যায়, বিবাহের কথা ইতিমধ্যেই পাকা হয়ে গেছে। ২৪ শ্রাবণ [শুক্র 9 Aug] হেমেন্দ্রনাথের ষষ্ঠ কন্যা সুনৃতা দেবীর সঙ্গে নন্দলাল ঘোষালের বিবাহের আয়োজন কিছুদিন ধরেই চলছিল। সুতরাং আমেরিকায় গিয়ে পড়াশুনোর খরচ জোগানো ছাড়া সত্যেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যের আপাতত আর কোনো দাবি না থাকায় ঐ তারিখেই বিয়ের বন্দোবস্ত করা খুব শক্ত হয়নি। সুনৃতা দেবীর বিবাহ হয় রাত্রি ন'টায়, রেণুকার বিয়ে হল রাত্রি এগারোটায়—ক্যাশবহি এই সময়ের নির্ঘণ্ট ছাড়াও দুটি বিবাহের জন্য যথাক্রমে ১২৬৫ টাকা ও ৫০০ টাকা খরচ হয়েছিল বলে জানিয়েছে। মহর্ষি যথারীতি যৌতুক দেন : 'শ্রীমতী রেণুকা দেবীর শুভবিবাহে বর শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ বাবুকে শ্রীযুক্ত কর্ত্তাবাবু মহাশয় যৌতুক দেন মোহর ৪ থান ২৪৲ হিঃ ৯৬৲'। রবীন্দ্রনাথ নিজে 'বাবু সত্যেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য মহাশয়ের মাতা ঠাকুরাণীকে দিবার জন্য' ৫০০ টাকা খরচ করেন।

এই বিবাহের সময়ে রেণুকার বয়স মাত্র সাড়ে দশ বৎসর [জন্ম—১১ মাঘ ১২৯৭ শুক্র 23 Jan 1891]। অবাক হতে হয়, রবীন্দ্রনাথ এক সময়ে অকাল বিবাহের বিরুদ্ধে চন্দ্রনাথ বসুর সঙ্গে তর্কযুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছিলেন!

বিবাহের কয়েক দিন পর থেকেই জামাতাকে বিদেশে প্রেরণের আয়োজন শুরু হয়ে যায়। ৫ ভাদ্র [বুধ 21 Aug] 'বিলাত গমন জন্য জাহাজের ভাড়া কাপড় ইত্যাদি তৈয়ারির ব্যায় জন্য' সরকারী ক্যাশ থেকে রবীন্দ্রনাথের হাতে ৩০০০ টাকা দেওয়া হয়। সত্যেন্দ্রনাথ কবে বিলাতযাত্রা করেন জানা যায়নি, কিন্তু ১০ ভাদ্র [সোম 26 Aug]'তাঁর জাহাজের টিকিট কাটার হিসাব পাওয়া যায়, ১৩ ভাদ্র 'উক্ত বাবু মহাশয়ের সার্টিফিকেট ফেলিয়া যাওয়ায় তাহা পাঠান ব্যায়'-এর হিসাব রয়েছে—সুতরাং অন্তর্বর্তী কোনো সময়ে তিনি আমেরিকার পথে ইংলণ্ডের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। রবীন্দ্রনাথ একটি তারিখ-হীন পত্রে মহিমচন্দ্র দেববর্মাকে এ-বিষয়ে লিখেছেন : 'কাল আমার জামাতাকে আমেরিকায় রওয়ানা করিয়া দিতেছি, তাই অত্যন্ত ব্যস্ত আছি।'[৭১]

এই-সব গোলমালের জন্য ভাদ্র-সংখ্যা [১।৫] বঙ্গদর্শন-এ রবীন্দ্র রচনার সংখ্যা নিতান্তই কম :

১৯৭-২০৮ 'চোখের বালি' ১৫-১৭ দু চোখের বালি ৩।৩২৭-৪১

২১৭-২০ 'কেকাধ্বনি' দ্র বিচিত্র প্রবন্ধ ৫।৪৫৩-৫৭

'কেকাধ্বনি' প্রবন্ধটি সম্ভবত আষাঢ় মাসে লিখিত 'মেঘদূত' ['নববর্ষা'] প্রবন্ধের সমসাময়িক রচনা।

বঙ্গদর্শন-কে সাহায্য করার জন্য মহারাজ রাধাকিশোর মাণিক্য রবীন্দ্রনাথকে যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, মহারাজার পারিষদবর্গ সে-বিষয়টিকে কিভাবে ঘুলিয়ে তুলছিল এবং এই প্রসঙ্গে মহিমচন্দ্র দেববর্মাকে লেখা রবীন্দ্রনাথের ক্ষোভের কথা আমরা পূর্বে উল্লেখ করেছি। কন্যার বিবাহ-দিনে তিনি রাধাকিশোরকেও লিখলেন :

> মহারাজের সহিত আমি এমন কোন সম্বন্ধ রাখিতে ইচ্ছা করি না যাহাতে লোকে স্বার্থসিদ্ধির অপবাদ দিতে পারে। আমার সাধ্য যৎসামান্য হইলেও এবং উদ্দেশ্য লোকহিতকর হইলেও, যে কাজ নিজের হাতে লইয়াছি সে সম্বন্ধে মহারাজের নিকট হইতে আর্থিক সহায়তা লইব না ইহা আমি স্থির করিয়াছি। কষ্ট এবং ত্যাগ স্বীকার ব্যতীত কোন মহৎ কর্ম্মের মূল্য থাকে না—আমার যতদূর সাধ্য আছে বঙ্গদর্শন পরিচালনায় তাহার সীমা অতিক্রম করিলেই গৌরব লাভ করিব।[৭২]

এরপর তিনি জগদীশচন্দ্র 20 Jul [৪ শ্রাবণ] তাঁকে যে পত্র লেখেন, তার থেকে বঙ্গদর্শন-সম্পর্কীয় দীর্ঘ অংশ উদ্ধৃত করে পত্রিকাটির আদর্শ ব্যাখ্যা করেছেন।

জগদীশচন্দ্র ১৫ মাসের ডেপুটেশনে ফ্রান্স ও ইংলণ্ডে গিয়েছিলেন; সেই ছুটি এখন শেষ হওয়ার মুখে, অথচ যে-সমস্ত নূতন আবিষ্কারে তিনি হাত দিয়েছিলেন তাদের অনেকগুলিই তখনও অসমাপ্ত। রবীন্দ্রনাথকে লেখা তাঁর অধিকাংশ চিঠিই এই আক্ষেপে পূর্ণ। ব্যবসায়ীদের প্রলোভন বা বিদেশে চাকুরির প্রস্তাব গ্রহণ করলেই তিনি এই সংকট থেকে উদ্ধার পেয়ে আর্থিক ও বৈজ্ঞানিক সমৃদ্ধি লাভ করতে পারতেন—কিন্তু বিশুদ্ধ বিজ্ঞানপ্রীতি ও গভীর স্বদেশপ্রেম তাঁকে এই প্রলোভন থেকে সংযত রেখেছে। সশ্রদ্ধ রবীন্দ্রনাথ এই কারণেই তাঁকে 'ভারতের কোন্ বৃদ্ধ ঋষির তরুণ মূর্তি' বলে অভিনন্দিত করেছিলেন। কিন্তু শুধু বাক্যে নয়, কর্মেও তিনি জগদীশচন্দ্রকে সাহায্য করার চেষ্টা করেছেন। রমেশচন্দ্র দত্ত এ-বিষয়ে লণ্ডন থেকে 16 Jul [৩২ আষাঢ়] পত্র লিখে দু'লাখ টাকার একটি তহবিল সংগ্রহ করার জন্য তাঁকে চেষ্টা করতে বলেন। রবীন্দ্রনাথ জগদীশচন্দ্রের প্রয়োজনের কথা জানতেন এবং এই কাজে দেশবাসীর উদাসীনতার কথাও তাঁর অজ্ঞাত ছিল না। তাঁর প্রধান ভরসা ছিলেন রাধাকিশোর মাণিক্য, তাই তাঁকেই উক্ত পত্রে লিখেছেন :

> জগদীশবাবুর জন্য কিছু করিবার সময় অগ্রসর হইতেছে। তাঁহার বিজ্ঞানালোচনার সঙ্কটকাল উপস্থিত হইয়াছে। তিনি যে উচ্চের দিকে উঠিতেছিলেন পরাধীনতা ও বাহিরের বাধায় তাঁহাকে হঠাৎ নিরস্ত করিলে আমাদের পক্ষে ক্ষোভ ও লজ্জার সীমা থাকিবে না। মহারাজ আপনাকে স্পষ্ট কথা বলি—আমি যদি দুর্ভাগ্যক্রমে পরের অবিবেচনাদোষে ঋণজালে আপাদমস্তক জড়িত হইয়া না থাকিতাম তবে জগদীশবাবুর জন্য আমি কাহারও দ্বারে দণ্ডায়মান হইতাম না, আমি একাকী তাঁহার সমস্ত ভার গ্রহণ করিতাম। দুরবস্থায় পড়িয়া আমার সর্ব্বপ্রধান আক্ষেপ এই যে দেশের হিতকার্যের জন্য পরকে উত্তেজনা করা ছাড়া আমার দ্বারা আর কিছু হইতে পারে না।···জগদীশবাবুর জন্য আমি প্রত্যক্ষভাবে মহারাজের নিকট দরবার করিতে ইচ্ছুক—এজন্য আমি আগরতলায় যাইতে প্রস্তুত। আমি মহিম প্রভৃতি কাহারও প্রতি নির্ভর করিতে পারি না—ক্রমশঃই তাহাদের প্রতি বিশ্বাস হারাইয়াছি। তাঁহারা রাজকার্য্যে পটু হইতে পারেন কিন্তু তাঁহারা মহারাজের ঔদার্যকে সর্ব্বদা আচ্ছন্ন করিয়া আছেন। মহৎ সংকল্প ও উদার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে তাঁহারা মহারাজের উপযুক্ত সহায়কারী বা আজ্ঞাবাহক নহেন। এই কারণে আমি মহারাজের নির্জ্জন খাস্ দরবারের মধ্যে প্রবেশ করিবার প্রত্যাশী—···মহারাজের পরিচরবর্গ নানা কথাই বলিবে, নানা অভিসন্ধি আশঙ্কা করিয়া আমাকে সঙ্কুচিত করিবে, কিন্তু আমি তাহা শিরোধার্য্য করিব।[৭৩]

—পাঠক যদি এই দীর্ঘ উদ্ধৃতিতে বিরক্ত বোধ করেন, তাহলে তাঁদের স্মরণ করিয়ে দেব যে, আরও দীর্ঘ এই পত্রটি রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন কন্যার বিবাহদিবসের ব্যস্ততার মধ্যে। কিন্তু কেবল স্বদেশ ও জগদীশচন্দ্রের কল্যাণ কামনা নয়, রাধাকিশোর ও ত্রিপুরারাজ্যের মঙ্গল ইচ্ছাতেও রবীন্দ্রনাথ কতখানি কার্যকরী ভূমিকা নিতেন তার পরিচয় আছে পত্রটির বর্জিত শেষাংশে :

> জ্ঞান রায়কে লইয়া যে উৎপাতের* সৃষ্টি হইয়াছে তাহাতে বিপক্ষ পক্ষীয়েরা নানা জনরব রচনার সুযোগ পাইয়াছেন। আমার প্রিয়বন্ধু সন্তোষের জমিদার শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ রায়চৌধুরী হিন্দু পেট্রিয়ট পত্রে মহারাজের পক্ষ সমর্থন করিয়া দুইটি প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। মহিমের সহিত আজ তাঁহার আলাপ করাইয়া দিয়াছি। তাঁহার বাটীতে হিন্দু-পেট্রিয়টের সহকারী সম্পাদকের সহিত অদ্য মহিমের সাক্ষাৎ হইবে। মহারাজের বিরুদ্ধপক্ষীয় সুরেন্দ্র বন্দ্যোর সহিত মন্মথবাবুর বিশেষ বন্ধুত্ব . আছে—তৎসত্ত্বেও তিনি ন্যায়ের অনুরোধে মহারাজের পক্ষ গ্রহণ করিয়া সুরেন্দ্রবাবুর বিরাগভাজন হইয়াছেন।

জাতীয় গ্রন্থাগারে এই সময়কার *The Hindoo Patriot*-এর ফাইল নেই, সেইজন্য সংকটের রূপটি ফুটিয়ে তোলা সম্ভব নয়—কিন্তু *The Bengalee*-র 20 Jul [শনি ৪ শ্রাবণ]-সংখ্যার 'Correspondance' বিভাগে E.B.M.-লিখিত 'The Tippera Raj Succession'-শীর্ষক একটি দীর্ঘ পত্র আমরা মুদ্রিত হতে দেখেছি; সংবাদপত্রের উদ্দেশ্যে প্রেরিত চিঠিপত্রে প্রকাশিত 'মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নহেন' বটে, কিন্তু চরম রাধাকিশোর-বিরোধী এই পত্র মুদ্রণে সম্পাদক সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রচ্ছন্ন সমর্থন যে ছিল তা

রবীন্দ্রনাথের উল্লেখ থেকেই জানা যাচ্ছে। রাধাকিশোরের পক্ষে জনমত গঠনে তাঁর কূটনৈতিক প্রয়াসও লক্ষণীয়। প্রাচীন ভারতের আদর্শকে উজ্জীবিত করার যে তাত্ত্বিক প্রয়াস রবীন্দ্রনাথ এই সময়ে নৈবেদ্য-এর কবিতা ও বঙ্গদর্শন-এর গদ্যপ্রবন্ধের মধ্য দিয়ে করেছিলেন, তারই ব্যবহারিক প্রয়োগ তিনি আকাঙ্ক্ষা করেছেন ত্রিপুরারাজ্যের প্রজাকল্যাণমুখী শাসনব্যবস্থা প্রবর্তনে। রাধাকিশোরের ঔদার্য ছিল তাঁর সহায়। অন্তঃপুর ও রাজকুমারদের শিক্ষা নিয়ে তিনি মাথা ঘামিয়েছেন এইজন্যই। রাধাকিশোরের রাজত্বকে নিষ্কণ্টক করার জন্য তাঁর প্রয়াসকে এই আদর্শের পরিপ্রেক্ষিতে দেখতে হবে।

রেণুকার বিবাহ ও জামাতাকে আমেরিকা পাঠানোর ব্যস্ততার ফাঁকে ফাঁকে রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্যাশ্রম প্রতিষ্ঠার আয়োজনেও প্রবৃত্ত ছিলেন। ১০ ভাদ্র [সোম 26 Aug] নাগাদ তিনি মহিমচন্দ্রকে লিখছেন : 'আমাদের বোলপুর আশ্রমের সেই বিদ্যালয়টা স্থাপন করিবার আয়োজনেও ঘুরিয়া বেড়াইতে হইতেছে। সকালে বাহির হইয়াছিলাম। আহার করিয়া আবার এখনি বাহির হইতেছি। গাড়ি দ্বারে উপস্থিত। একটি ভাল অধ্যাপকের খবর পাওয়া গেছে।'[৭৪] এ-সম্পর্কে ১৮ ভাদ্র [মঙ্গল 3 Sep] তিনি রাধাকিশোর মাণিক্যকে বিস্তৃত সংবাদ দিয়ে লিখেছেন

> শান্তিনিকেতন আশ্রমের সঙ্গে একটি বিদ্যালয় স্থাপনের উদ্যোগ করিয়াছি। বিদ্যালয়গৃহ পূর্ব্বেই নির্ম্মাণ হইয়া গেছে—এক্ষণে যোলো জন ছাত্রের বাসোপযোগী একটি বাড়ি তৈরি হইতেছে। যাহাতে শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে ছাত্রদের বুদ্ধি, শরীর ও চরিত্রের উন্নতি হয় সেজন্য বিশেষ চেষ্টান্বিত হইব। বিষয়কর্ম্মের ঝঞ্জাট পরিত্যাগ করিয়া আমি এই বিদ্যালয় লইয়া শান্তিনিকেতনে নিভৃতে জীবনযাপন করিতে ইচ্ছা করিয়াছি। দেশের জন্য যেমন করিয়াই যাহা করিতে যাই গোড়ায় মানুষ দরকার—বালককাল হইতে গুরুগৃহে বাস করিয়া ব্রহ্মচর্য পালনপূর্ব্বক শ্রদ্ধা সংযম ও অবধানের সঙ্গে বিদ্যাশিক্ষা না করিলে কেবল মুখস্থ বিদ্যায় কেহ মানুষ হইতে পারে না। প্রস্তাবিত বিদ্যালয়ে আমার উৎসাহ সেইজন্য। আমার ছেলেদের আমি এই বিদ্যালয়েই শিক্ষাদান করিতে সংকল্প করিয়াছি। খুব ভাল অধ্যাপকের সন্ধান পাওয়া গেছে, অতএব পড়াশুনা ও পরীক্ষা দেওয়ার কোন ব্যাঘাত হইবে না। দুইজন ইংরাজি অধ্যাপক একজন সংস্কৃত পণ্ডিত নিযুক্ত হইবেন—দশ বারোটি মাত্র ছেলেকে পড়াইতে হইবে। সুতরাং অধ্যাপক প্রত্যেক ছেলের প্রতি মন দিবার সময় পাইবেন। তাহা ছাড়া ব্যায়ামচর্চ্চার যথেষ্ট আয়োজন থাকিবে।[৭৫]

কিন্তু এইসব সংকল্প ও আয়োজনের মধ্যেও তিনি উদ্বিগ্ন নীতীন্দ্রনাথের শারীরিক অবস্থার জন্য। ভ্রাতুস্পুত্রদের মধ্যে সুরেন্দ্রনাথ ছাড়া তাঁর সর্বাধিক প্রীতিভাজন ছিলেন বলেন্দ্রনাথ ও নীতীন্দ্রনাথ। বলেন্দ্রনাথের মৃত্যু হয় ৩ ভাদ্র ১৩০৬ তারিখে। গত প্রায় এক বৎসর অসুস্থ অবস্থায় কাটিয়ে এই বছরের ভাদ্র মাসে নীতীন্দ্রনাথও মৃত্যুপথযাত্রী। ঠাকুরপরিবারের অদ্ভুত চিকিৎসাবিধানে অ্যালোপ্যাথি হোমিয়োপ্যাথি ও কবিরাজী চিকিৎসার আশ্চর্য সহাবস্থান দেখা যায়। বিখ্যাত হোমিয়োপ্যাথ ডাঃ প্রতাপচন্দ্র মজুমদার ও কবিরাজ বিজয়রত্ন সেন এতদিন একযোগে নীতীন্দ্রনাথের চিকিৎসা করে এসেছেন। অবস্থা গুরুতর হওয়ায় ১৩ ভাদ্র [বৃহ 29 Aug]'সাহেব ডাক্তার' নীতীন্দ্রনাথের শরীরে অস্ত্রোপচার করেন। তার পরেও হোমিয়োপ্যাথিতে বিশ্বাসী রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং ছোটাছুটি করেছেন ডাঃ প্রতাপচন্দ্র মজুমদারের বাড়ি—ক্যাশবহিতে তাঁর এইরূপ যাতায়াতের হিসাব পাওয়া যায় ভাদ্র মাসের ১৩, ১৪, ১৫ ['রাত্রে ১০টার সময়'], ১৮ ['২ বার প্রতাপ ডাক্তারকে ডাকিতে'], ১৯ ['সন্ধ্যার সময়'] ও ২৬ তারিখে। ১৮ ভাদ্র তিনি মহিমচন্দ্রকে লিখেছেন : 'আমার ভ্রাতুস্পুত্র নীতুর পীড়া অত্যন্ত সংশয়াপন্ন অবস্থায় আসিয়াছে সেইজন্য ক্রমাগত রাত্রি জাগরণে ও দুশ্চিন্তায় শরীর মন ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছে।'[৭৬] এইদিনই তিনি রাধাকিশোরকে লিখেছেন : 'আমার একটি ভ্রাতুষ্পুত্রের সংশয়াপন্ন পীড়া উপস্থিত সেইজন্য একান্তই উদ্বিগ্ন হইয়া আছি। তাহাকে সুস্থ দেখিলেই বোলপুরে চলিয়া যাইব।' নীতীন্দ্রনাথ আর সুস্থ হননি, '২৭ ভাদ্র বৃহস্পতিবার রাত্র ২টার সময়' [13 Sep] তাঁর মৃত্যু

হয়। ৬ আশ্বিন [রবি 22 Sep] তাঁর আদ্যশ্রাদ্ধের জন্য অপেক্ষা না করে রবীন্দ্রনাথ শোকাহত পরিবারকে সঙ্গে নিয়ে ৩ আশ্বিন [বৃহ 19 Sep] শান্তিনিকেতনে গমন করেন।

কিন্তু শান্তিনিকেতনে তিনি বেশি দিন থাকতে পারলেন না, ১২ আশ্বিন [শনি 28 Sep] তাঁকে কলকাতায় প্রত্যাবর্তন করতে হল। এইদিন তিনি বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের অষ্টম বর্ষের পঞ্চম মাসিক অধিবেশনে সত্যেন্দ্রনাথের সভাপতিত্বে 'বাঙলা কৃৎ ও তদ্ধিত' [দ্র সা. প. প. ৮ম ভাগ ৩য় সংখ্যা। ১৩৭-৫০; শব্দতত্ত্ব ১২৩৮২-৯৬] প্রবন্ধ পাঠ করেন। প্রবন্ধ পাঠের পূর্বে তিনি সভ্যশ্রেণীভুক্তির জন্য 'শ্রীযুক্ত শিবধন বিদ্যার্ণব, বোলপুর'-এর নাম প্রস্তাব করলে ব্যোমকেশ মুস্তফী তা সমর্থন করেন।' - এর পূর্বে ৪ আশ্বিন (শুক্র 20 sep] পরিষদের সহকারী সম্পাদক ব্যোমকেশ মুস্তফী কার্যনির্বাহক সমিতির সভ্যদের মতামতের জন্য একটি পত্র পাঠান :

আগামী ১২ই আশ্বিন ৬ষ্ঠ মাসিক অধিবেশনের দিন স্থির আছে।…শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সহকারী সভাপতি মহাশয় বাঙ্গালা তদ্ধিত ও কৃদন্ত প্রত্যয় সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ শ্রীযুক্ত রামেন্দ্র সুন্দর ত্রিবেদী মহাশয়ের নিকট পাঠাইয়াছেন। তিনি ঐ দিন মফস্বল হইতে আসিয়া সভায় পাঠ করিতে চাহেন। রামেন্দ্র বাবুর ইচ্ছা এই প্রবন্ধ ঐ দিন পাঠ্যরূপে নির্দ্দিষ্ট হউক। আপনাদের মতামত প্রকাশ করিবেন।[৭৭]

—আট জন সভ্য প্রবন্ধপাঠের প্রস্তাবে সম্মতি জানান।

প্রবন্ধের প্রথমেই রবীন্দ্রনাথ বলেন : 'আমি বৈয়াকরণ নহি। অনুরাগবশত বাংলাশব্দ লইয়া অনেক দিন ধরিয়া অনেক নাড়াচাড়া করিয়াছি; কখনো কখনো বাংলার দুটা-একটা ভাষাতত্ত্ব মাথায় আসিয়াছে; কিন্তু ব্যাকরণব্যবসায়ী নহি বলিয়া সেগুলিকে যথাযোগ্য পরিভাষার সাহায্যে সাজাইয়া লিপিবদ্ধ করিতে সাহসী হই নাই।' উৎকৃষ্ট বাংলা অভিধান তখনো প্রকাশিত হয়নি, তাই 'নিজের অসহায় স্মৃতিশক্তি'র উপর তাঁকে নির্ভর করতে হয়েছে—'আমি কেবল বিষয়টার সূত্রপাত করিবার ভার লইলাম, তাহা সম্পূর্ণ করিবার ভার সুধীসাধারণের উপর।' এরপর তিনি 'যে-সকল কৃৎতদ্ধিতের সাহায্যে বাংলা বিশেষ্য ও বিশেষণ পদের সৃষ্টি হয়' সেগুলি নিয়ে আলোচনা করেছেন, ক্রিয়াপদ সম্বন্ধে বারান্তরে আলোচনার ইচ্ছা প্রকাশ করলেও সেই ইচ্ছা পূরণ করেননি।

রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধ পাঠের পর ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর স্বভাবসিদ্ধ কৌতুকের ভঙ্গিতে প্রবন্ধের কিছু বক্তব্য নিয়ে আলোচনা করেন। ব্যোমকেশ মুস্তফী রবীন্দ্রনাথের সংগ্রহাতিরিক্ত আরও কয়েকটি প্রত্যয়ের উদাহরণ দিয়ে একটি প্রবন্ধ পাঠ করতে গেলে সভাপতি 'রাত্রির আধিক্য প্রযুক্ত' তা স্থগিত রাখতে বলেন।* সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ বাংলা ভাষার স্বতন্ত্র অভিধান ও ব্যাকরণ রচনার প্রয়োজনীয়তা সমর্থন করে বলেন : 'শাস্ত্রী মহাশয় ও রবীন্দ্র বাবু বাঙ্গালা ভাষার প্রকৃতি নির্ণয়ে যেরূপ পরিশ্রম করিতেছেন, তাহাতে তাঁহাদিগকে বাঙ্গালা ভাষার পাণিনি বলিলেই হয়।' হরপ্রসাদ শাস্ত্রী বলেন : 'রবীন্দ্রবাবুর প্রবন্ধে আজ আমার আনন্দ শত গুণ বর্ধিত হইয়াছে। এক মাস পূর্ব্বে আমি এ বিষয়ের আলোচনা আরম্ভ করি, রবীন্দ্র বাবুর মত লোকে যে এত শীঘ্র সহায়তা করিবেন সে আশা করি নাই। আরও অনেকে প্রস্তুত হইতেছেন।'[৭৮] তিনি 'রবীন্দ্র বাবুর প্রবন্ধ ব্যাকরণ নহে।…রবীন্দ্র বাবু প্রত্যয়াদির রূপ বাঁধিয়া দেন নাই, প্রত্যয় পরে শব্দ গঠনের নিয়ম লেখেন নাই, বিধিনিষেধের কোন ব্যবস্থা করেন নাই' বলা সত্ত্বেও শরচ্চন্দ্র শাস্ত্রী অগ্র°-সংখ্যা ভারতী-তে 'নূতন বাঙ্গালা ব্যাকরণ' [পৃ ১৭২-৯১] প্রবন্ধে হরপ্রসাদ ও রবীন্দ্রনাথ উভয়কেই সমালোচনা করেন। এই বিতর্ক আরও বহুদূর গড়িয়েছিল, প্রসঙ্গটি যথাস্থানে আলোচিত হবে।

এইদিন 'শনিবার রাত্রি' [১২ আশ্বিন : 28 Sep] রবীন্দ্রনাথ বসন্তকুমার গুপ্তকে লেখেন :

সোমবার প্রাতে শিলাইদহে রওনা হইতেছি। শীঘ্রই ফিরিয়া আসিব। আপনাকে অধিক কি আর বলিব রথীকে সর্ব্বতোভাবে দেখিবেন। আপনাকে স্পষ্টই বলিয়া রাখিতেছি পণ্ডিত মশায়ের moral influence আমি শ্রেয়স্কর মনে করি না।......জগদানন্দের খবরের জন্য উৎসুক আছি। [৭৯]

—বোলপুরে প্রেরিত এই পত্র থেকে জানা যায়, বসন্তকুমারকে সাময়িকভাবে তিনি রথীন্দ্রনাথের শিক্ষকরূপে নিয়োগ করেছিলেন। এইরূপ একজন সাময়িক গৃহশিক্ষকের সংবাদ জানা যায় ১৮ ভাদ্রের [3 Sep]ক্যাশবহি থেকে :'ব° মণিন্দ্র নাথ মাষ্টার/দং রথীন্দ্র বাবুকে এখানে একদিন পড়াইবার জন্য বেতন ১০্'। চিঠির শেষ বাক্যটির তাৎপর্য বোঝা শক্ত, শিলাইদহ কাছারির সুপারিন্টেন্ডেন্ট জগদানন্দ রায়কে ইতিমধ্যেই কি রথীন্দ্রনাথের গণিতশিক্ষার কাজে নিয়োগ করা হয়েছিল?

১৪ আশ্বিন [সোম 30 Sep] রবীন্দ্রনাথ শিলাইদহ যাত্রা করেন। সেখান থেকে 'বৃহস্পতিবার' জামাতা সত্যেন্দ্রনাথের খুল্লতাত নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যকে লেখেন :

আপনার সহৃদয় সৌজন্যে আমি প্রথম হইতেই আকৃষ্ট হইয়াছি এবং ইহা নিশ্চয়ই জানিবেন আপনি যখনই আসিবেন আপনার সহিত আলাপ করিয়া আমি সুখী হইব। আমার হাতে কাজ অল্প নহে—কিন্তু কলিকাতায় যতদিন থাকি কাজের আশা রাখি না, হাল ছাড়িয়া "মরিয়া" হইয়া বসিয়া থাকি—অতএব কাজের বিঘ্ন হইতে পারে বলিয়া কুণ্ঠিত হইবেন না।....সত্যেন্দ্র এডেন হইতে পত্র দিয়াছিল তাহার পরে আর কোন খবর না পাইয়া আমরা উৎকণ্ঠিত আছি। আপনারা খবর পাইলে জানাইবেন।'[৮০]

জামাতার খবর অবশ্য জগদীশচন্দ্র ও প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের কাছ থেকে রবীন্দ্রনাথ পেয়েছেন। আমেরিকার উদ্দেশ্যে যাত্রা করলেও সত্যেন্দ্রনাথ লণ্ডনেই পড়াশোনা করতে থাকেন। 8 Nov [শুক্র ২২ কার্তিক] প্রভাতকুমার রবীন্দ্রনাথের চিঠির উত্তরে সত্যেন্দ্র সম্বন্ধে অনেক সংবাদ দেন, দুদিন পরে Ealing-এ জগদীশচন্দ্রের কাছে নিয়ে যাওয়ার কথাও লেখেন।[৮১] জগদীশচন্দ্রও একই দিনে লেখেন : 'তোমার জামাতাকে এই রবিবার দিন দেখা করিতে নিমন্ত্রণ করিয়াছি।'[৮২] 12 Feb 1902 [বুধ ৩০ মাঘ] লিখেছেন : 'তোমার জামাতাকে আমার বেশ লাগিয়াছে। বিনয়ী ও বুদ্ধিমান।'[৮৩] 27 Dec [শুক্র ১২ পৌষ] প্রভাতকুমার আরও সংবাদ দিয়ে লিখেছেন : 'General literatureটা সত্যেন্দ্রবাবু তত চর্চা করেননি। দেশে ফিরে যে সমাজে চলাফেরা করবেন, সে সমাজে ওটা যে বিশেষ দরকার—সে hint আমি তাঁকে দিয়েছি। আপনি তাঁকে এ বিষয়ে detailed উপদেশ দিলে বোধ হয় তাঁর পক্ষে সাহায্য হয়।'[৮৪] রবীন্দ্রভবনে রক্ষিত প্রভাতকুমারের লেখা 20 Feb 1902 [বৃহ ৮ ফাল্গুন] তারিখের শেষ চিঠিতেও সত্যেন্দ্রনাথের প্রসঙ্গ আছে। ২৫ বৈশাখ ১৩০৯ [বৃহ 8 May 1902] রবীন্দ্রনাথ উক্ত নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যকে লেখেন : 'সত্যেনেরচিঠি পাইয়াছি। সে I.M.S. পরীক্ষা দেয় ইহা আমার অভিপ্রেত নহে। কারণ তাহা হইলে তাহাকে সাহেব হইতেই হইবে। আমি তাহাকে চক্ষু বা কর্ণ বা কোন একটা বিষয়ে specialist হইয়া আসিতে বলিয়াছি।'[৮৫] এর কোনোটাই হয়ে আসা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়নি—১৩০৯ বঙ্গাব্দের আশ্বিন মাসের শেষে তিনি কলকাতায় ফিরে আসেন।

ভাদ্র মাসের শেষ দিনটিতে [৩১ ভাদ্র সোম 16 Sep] রবীন্দ্রসাহিত্যের ইতিহাসে একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটল। ব্রাহ্মনেতা বিপিনচন্দ্র পাল [1858-1932] ব্রিটিশ অ্যাণ্ড ফরেন ইউনিটারিয়ান অ্যাসোসিয়েশন-প্রদত্ত ম্যানচেস্টার বৃত্তি লাভ করে অক্সফোর্ডের নিউ ম্যানচেস্টার কলেজে তুলনামূলক ধর্মতত্ত্ব পাঠ করার জন্য

21 Sep 1898 [৬ আশ্বিন ১৩০৫] ইংলণ্ড যাত্রা করেন। এক বৎসর পরে তিনি বৃত্তি ত্যাগ করে একেশ্বরবাদী ও মাদকনিবারণী প্রচারে ইংলণ্ড ও আমেরিকা ভ্রমণান্তে দেশে ফিরে আসেন। সাংবাদিকতার জগতে তাঁর অভিজ্ঞতা ছিল প্রচুর। এই অভিজ্ঞতা সম্বল করে তিনি *New India* নামক একটি ইংরেজি সাপ্তাহিক পত্রিকা সম্পাদনে ব্রতী হলেন। 'A Weekly Record and Review of Modern Thought & Life' পরিচয় বহন করে পত্রিকাটির প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয় 12 Aug 1901 [সোম ২৭ শ্রাবণ] তারিখে। প্রধানত রাজনৈতিক ও সামাজিক বিষয়ের আলোচনা পত্রিকাটির লক্ষ্য হলেও প্রথমাবধি সাংস্কৃতিক ও সাহিত্যিক দিকটি সেখানে উপেক্ষিত হয়নি; 26 Aug [১০ ভাদ্র] ও 2 Sep [১৭ ভাদ্র]-এর তৃতীয় ও চতুর্থ সংখ্যায় 'Our Original Story' শিরোনামে 'H.D.B.'-লিখিত দুটি ছোটগল্প মুদ্রিত হয়। এর পর 16 Sep [সোম ৩১ ভাদ্র]-এর ষষ্ঠ সংখ্যাতেই সেই ঐতিহাসিক ঘটনাটি ঘটল। পত্রিকাটির 83-84 পৃষ্ঠায় রবীন্দ্রনাথের 'সুভা' [প্রথম প্রকাশ : সাধনা, মাঘ ১২৯৯ দ্র গল্পগুচ্ছ ১৭।২৩৬-৪২] গল্পটির ইংরেজি অনুবাদ মুদ্রিত হয়। আমরা জানি, ইতিপূর্বেই Nov 1900 [অগ্র° ১৩০৭]-এ জগদীশচন্দ্রের সহায়তায় নিবেদিতা 'কাবুলিওয়ালা', 'ছুটি' ও 'দানপ্রতিদান' গল্প তিনটি ইংরেজিতে অনুবাদ করেছিলেন—কিন্তু ইংলণ্ডের পত্রিকা-সম্পাদকদের অসহযোগিতায় সেগুলি মুদ্রিত হবার সুযোগ পায়নি। 'Jatindra M. Bagchi' [কবি যতীন্দ্রমোহন বাগচি, 1878-1948]-অনূদিত 'Subha' সেই মর্যাদা লাভ করল। New India-তে রবীন্দ্রনাথের গল্পের ইংরেজি অনুবাদ প্রকাশের বিষয়টির প্রতি আমাদের দৃষ্টি প্রথম আকর্ষণ করেন সমীর রায়চৌধুরী তাঁর 'রবীন্দ্র ছোটগল্পের প্রথম ইংরেজী অনুবাদ' [দ্র আজকাল, 18 Dec1984] প্রবন্ধে। কিন্তু তিনি ইতিহাসটির সূচনা করেন 4 Nov [সোম ১৮ কার্তিক]-এর একাদশ সংখ্যায় মুদ্রিত নাম-হীন অনুবাদকের দ্বারা অনূদিত রবীন্দ্রনাথের 'বিচারক' গল্পটির অনুবাদ 'The Judge' থেকে। কিন্তু 'সুভা'র অনুবাদটি তাঁর দৃষ্টি এড়িয়ে গিয়েছিল। সুতরাং এখন আমরা স্বচ্ছন্দে Subha-কেই রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্পের প্রথম মুদ্রিত ইংরেজি অনুবাদ বলে ঘোষণা করতে পারি। আশ্চর্যের ব্যাপার, 'বিপিনচন্দ্র পাল : জীবন, সাহিত্য ও সাধনা' [১৩৮০ : 1973]-র গবেষক ড শিবদাস চক্রবর্তীও বিপিনচন্দ্রের এই ঐতিহাসিক কীর্তির প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেননি। রবীন্দ্রানুরাগী কবি যতীন্দ্রমোহন বাগচিও তাঁর এই বিশিষ্ট ভূমিকা সম্পর্কে তাঁর রবীন্দ্র-বিষয়ক স্মৃতিকথা 'রবীন্দ্রনাথ ও যুগসাহিত্য' [২য় সং : ১৩৫৬]-তেও সম্পূর্ণ নীরবতা অবলম্বন করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ *New India* পত্রিকার পাঠক ও বিপিনচন্দ্রের বন্ধুস্থানীয় ছিলেন, সুতরাং এই অনুবাদ প্রকাশের ব্যাপারটি তাঁর অজানা থাকার কথা নয়। তবু, তিনি এমন-কি জগদীশচন্দ্রকেও এই খবরটি দেননি—যিনি রবীন্দ্র-রচনা বিদেশীদের কাছে প্রচারের ব্যাপারে প্রথম আগ্রহ প্রকাশ করেন। কিন্তু তিনি সম্ভবত আগস্ট মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহের গোড়ায় [শ্রাবণের শেষে] জগদীশচন্দ্রকেই জানিয়েছেন : 'সেদিন সরস্বতী নামক এক হিন্দি কাগজে দেখিলাম, আমার "মুক্তির উপায়" [প্রথম প্রকাশ : সাধনা, চৈত্র ১২৯৮ দ্র গল্পগুচ্ছ ১৬।৩২৯-৩৭] নামক ছোটগল্পটি তর্জ্জমা করিয়াছে। হিন্দিতে পড়িতে বেশ লাগিল—রস কিছুই নষ্ট হয় নাই।'[৮৬] এই সংবাদটিও ঐতিহাসিক। অন্য কোনো ভারতীয় ভাষায় রবীন্দ্ররচনা অনুবাদের সূত্র অনুসরণ করা হয়নি, সেই ইতিহাস সংকলিত হলে উল্লিখিত অনুবাদটি একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করতে পারে। অন্তত Subha-র আগে এই হিন্দি অনুবাদটি প্রকাশিত হয়েছিল, তা স্পষ্টই বোঝা যায়।

New India পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথের আরও চারটি ছোটগল্পের ইংরেজি অনুবাদ প্রকাশের কথা সমীর রায়চৌধুরী উল্লেখ করেছেন। কালানুক্রমিকতার ব্যতিক্রম করে প্রসঙ্গটি আমরা এখানেই আলোচনা করে নিচ্ছি।

'সুভা' গল্পটির যতীন্দ্রমোহন বাগচি-কৃত ইংরেজি অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছিল 16 Sep [সোম ৩১ ভাদ্র] *New India*-র ষষ্ঠ সংখ্যায়। 4 Nov [সোম ১৮ কার্তিক] একাদশ সংখ্যায় প্রকাশিত হল 'বিচারক' [প্রথম প্রকাশ : সাধনা, পৌষ ১৩০১, দ্র গল্পগুচ্ছ ১৯।২৪৮-৫৫] গল্পের অনুবাদ 'The Judge'। অনুবাদকের নাম প্রকাশিত হয় নি দেখে সমীর রায়চৌধুরী অনুমান করেছেন, হয়তো সম্পাদক বিপিনচন্দ্র পালই গল্পটি অনুবাদ করেন। বস্তুত সম্পাদকের রচনা বিনা-স্বাক্ষরে প্রকাশিত হওয়া তখনকার সাধারণ রীতি ছিল। 172-73 পৃষ্ঠায় গল্পটির প্রথম দুটি পরিচ্ছেদ মাত্র মুদ্রিত হয়, অবশিষ্টাংশ প্রকাশিত হয় 11 Nov [সোম ২৫ কার্তিক] দ্বাদশ সংখ্যার 188-90 পৃষ্ঠায়। এই অনুবাদটির অন্য একটি ঐতিহাসিক মূল্য আছে। রুশ রবীন্দ্রতত্ত্ববিদ অধ্যাপক Dr. A.P. Gnatyuk-Danil'chuk জানিয়েছেন, Nov 1913-এ নোবেল প্রাইজ-প্রাপ্তি-জনিত বিশ্বখ্যাতি লাভের পূর্বেই *Russkie Vedomosti* [Russian News] পত্রিকার লণ্ডন-স্থিত সংবাদদাতা I.v. Shklovsky *Slovo* [The Words] পত্রিকায় Sud'ya নামে 'বিচারক' গল্পটির রুশ অনুবাদ প্রকাশ করেন। তিনি দাবি করেছেন, এইটিই রুশ ভাষাতে তো বটেই, পাশ্চাত্যে রবীন্দ্র-গল্পের প্রথম অনুবাদ এবং যেহেতু তখনও 'বিচারক' গল্পটির ইংরেজি অনুবাদ অন্যত্র প্রকাশিত হয়নি, সেইজন্য *New India*-য় প্রকাশিত ইংরেজি অনুবাদ অবলম্বনেই Shklovsky রুশ অনুবাদটি প্রস্তুত করেন।[৮৭]

New India-র 18 Nov [সোম ২ অগ্র°]-এর ত্রয়োদশ সংখ্যার 204-06 পৃষ্ঠায় 'জীবিত ও মৃত' [প্রথম প্রকাশ : সাধনা, শ্রাবণ ১২৯৯, দ্র গল্পগুচ্ছ ১৭।১৮১-৯৩] গল্পটির 'Alive and Dead'-শীর্ষক ইংরেজি অনুবাদটির প্রথমাংশ মুদ্রিত হয়, এটি শেষ হয় 25 Nov [সোম ৯ অগ্র°]-এর চতুর্দশ সংখ্যার 219-20 পৃষ্ঠায়। এই গল্পটির সঙ্গেও অনুবাদকের নাম প্রকাশিত হয়নি।

'কাবুলিওয়ালা' [প্রথম প্রকাশ : সাধনা, অগ্র° ১২৯৯, দ্র গল্পগুচ্ছ ১৭।২২০-২৮] গল্পটির G. Sarma-কৃত অনুবাদের প্রথমাংশ 'The Kabuli' নামে মুদ্রিত হয় পত্রিকাটির 31 Mar 1902 [সোম ১৭ চৈত্র]-এর ৩২শ সংখ্যায় [pp. 507-08], শেষাংশ প্রকাশিত হয় 14 Apr [সোম ১ বৈশাখ ১৩০৯]-এর ৩৪শ সংখ্যার 539-40 পৃষ্ঠায়। উল্লেখ্য, গল্পটি ইতিপূর্বেই নিবেদিতা অনুবাদ করেছিলেন, কিন্তু সেটি প্রকাশিত হয় তাঁর মৃত্যুর পর The Modern Review-এর Jan 1912 [pp. . 50-56]-সংখ্যায়।

'J. Bagchi B.A.' [যতীন্দ্রমোহন বাগচি] 'কঙ্কাল' [প্রথম প্রকাশ : সাধনা, ফাল্গুন ১২৯৮, দ্র গল্পগুচ্ছ ১৬। ৩২১-২৮] গল্পটি অনুবাদ করেন 'Kankala (The Skeleton)' নামে, এটি প্রকাশিত হয় 19 May 1902 [সোম ৫ জ্যৈষ্ঠ ১৩০৯]-এর ৩৯শ সংখ্যায় [pp. 619-20]।

উল্লেখ্য, কলকাতার জাতীয় গ্রন্থাগারে রক্ষিত *New India*-র ফাইলে 23 Dec 1901 থেকে 24 Mar 1902 পর্যন্ত চৌদ্দটি সংখ্যা নেই, সুতরাং এই সংখ্যাগুলিতে রবীন্দ্রনাথের গল্পের অনুবাদ প্রকাশিত হলে [যা হওয়া খুবই সম্ভব] তার হদিশ পাওয়া শক্ত। কঙ্কাল'-এর পরেও পত্রিকাটিতে ইংরেজি ছোটগল্প মুদ্রিত হয়েছে, কিন্তু তার সবগুলিই বিদেশী পত্রিকা থেকে সংকলিত।

বঙ্গদর্শন আশ্বিন ১৩০৮-সংখ্যা প্রকাশিত হয় ১ আশ্বিন (মঙ্গল 17 Sep] তারিখে। এই সংখ্যায় রবীন্দ্রনাথের রচনা মাত্র দুটি :

২৪৫-৪৯ 'বিরোধমূলক আদর্শ' দ্র সমূহ-পরিশিষ্ট ১০।৫৯২-৯৬

২৬০-৭০ 'চোখের বালি' ১৮-২০ দ্র চোখের বালি ৩।৩৪১-৫২।

য়ুরোপীয় রাষ্ট্রতন্ত্র বা ন্যাশনালিজম সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ তাঁর বিরূপতা অনেক রচনাতেই প্রকাশ করছিলেন, 'বিরোধমূলক আদর্শ'ও তার ব্যতিক্রম নয়। 'য়ুরোপের বিদ্যালয়ে যে ইতিহাস শিক্ষা দেওয়া হয় তাহাতে অন্য দেশের প্রতি বিরোধ প্রকাশ করিয়া নিজেদের দেশের গৌরব ঘোষণা করা হয়।' সেখানে এরই নাম প্যাট্রিয়টিজম্। এই বোধকে জাগ্রত করার জন্যই একদিকে মিথ্যা বা ভ্রমের দ্বারা নিজেদের নিজের কাছে বড়ো করে তুলতে হয়, অপরপক্ষে অন্যকে ক্ষুদ্র করে দেখতে ও দেখাতে হয়। কিন্তু এর মূলে আছে স্বার্থ, আর 'স্বার্থের বিরোধ অবশ্যম্ভাবী, এবং স্বার্থের সংঘাতে মানুষকে অন্ধ করিবেই। ইংরেজ যদি সুদূর এশিয়ায় কোনোপ্রকার সুযোগ ঘটাইতে পারে ফ্রান্স তখনই সচকিত হইয়া ভাবিতে থাকিবে, ইংরেজের বলবৃদ্ধি হইতেছে। প্রত্যক্ষ সংঘাত না হইলেও পরস্পরের সমৃদ্ধিতেও পরস্পরের চিত্তকে বিষাক্ত করে। এক নেশনের প্রবলত্ব অন্য নেশনের পক্ষে সর্বদাই আশঙ্কাজনক। এ স্থলে বিরোধ বিদ্বেষ অন্ধতা মিথ্যাপবাদ সত্যগোপন, এ-সমস্ত না ঘটিয়া থাকিতে পারে না।' কিন্তু প্রাচ্য সমাজের আদর্শ বিদ্বেষ অসত্য হিংসাকে পরিহার করা—নেশন অনেক সময় ধর্মকে উপেক্ষা বা উপহাস করে বাহুবলকে ন্যায়ধর্ম অপেক্ষা বড়ো বলে ঘোষণা করে, কিন্তু সমাজের পক্ষে তা সম্ভব নয় 'কারণ ধর্মই তাহার একমাত্র অবলম্বন, স্বার্থকে সর্বদা সংযত করাই তাহার আত্মরক্ষার একমাত্র উপায়। রবীন্দ্রনাথ মনে করেন, ন্যাশনাল স্বার্থের আদর্শকে বড়ো করে ভারতীয়দের পক্ষে 'য়ুরোপের মহাকায় স্বার্থদানব'-এর সঙ্গে লড়াই করা সম্ভব নয়-—'আমরা লড়াই করিতে পারি জ্ঞানে, ধর্মে। সেখানে আমাদের পৈতৃক মূলধন আছে····সেখানে যে মহত্ত্বের উপাদান আছে, তাহা সকল মহত্ত্বের উচ্চে।' এই আদর্শভূমি থেকেই তিনি য়ুরোপের ন্যাশনাল আদর্শের মধ্যে যে বিনষ্টির বীজ লক্ষ্য করেছেন, প্রথম ও দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ইতিহাসের পরিপ্রেক্ষিতে তা দিব্যদৃষ্টির তুল্য।

১৪ আশ্বিন [সোম 30 Sep] রবীন্দ্রনাথ কয়েকদিনের জন্য শিলাইদহে গিয়েছিলেন, সেখান থেকে কলকাতায় ফিরে আসেন ২১ আশ্বিন [সোম 7 Oct] তারিখে। কলকাতায় তাঁর গতিবিধির হিসাব না থাকায় মনে হয় অনতিবিলম্বেই তিনি শান্তিনিকেতন রওনা হন। তাঁর স্ত্রী-পুত্র-কন্যারা তখন সেখানেই। তাছাড়া বিদ্যালয় স্থাপনের প্রাথমিক কাজকর্মও যে চলছিল, তা জানা যায় ২৮ আশ্বিনের [সোম 14 Oct] হিসাবে : 'ব° আশুতোষ রায়চৌধুরী দং উক্ত বিদ্যালয়ের দ্বিতল গৃহ নির্ম্মাণ জন্য দেওয়া যায় ২০০্'—হিসাবটি সরকারী ক্যাশবহির।

বর্তমান বৎসরে দুর্গাপূজা হয় কার্তিক মাসে—২ কার্তিক (শনি 19 Oct] ছিল মহাসপ্তমী। কিছুদিন ধরেই ত্রিপুরা যাওয়ার পরিকল্পনা করছিলেন রবীন্দ্রনাথ। ১৮ ভাদ্র [3 Sep] তিনি রাধাকিশোর মাণিক্যকে লিখেছিলেন : 'এখন ভাদ্রের বর্ষায় ত্রিপুরার জলবায়ু প্রীতিকর হইবে না অতএব মহারাজের পরামর্শ অনুসারে পূজার পরে যাওয়াই স্থির করিলাম।' পরে মহিমচন্দ্র দেববর্মাকে একটি তারিখ-হীন পত্রে জানান : 'পূজার সময় তোমাদের ওখানে যাইব কল্পনা ছিল। কিন্তু সে সময়ে বেলা ও আমার জামাতা এখানে আসিবে—

তাহাদের ফেলিয়া যাইতে পারিব না। অতএব যদি যাওয়া স্থির করি আর কোন সময়ে যাইব।’[৮৮] বস্তুত কয়েকদিন আগেই ‘রবিবার’ [২০ আশ্বিন : 6 Oct] মাধুরীলতা তাঁকে লেখেন :

যাবার সময়ই তাহলে আমরা বোলপুরে নাবা ঠিক করলুম।···১১ই কাছারী বন্ধ হবে। যদি হাতে বেশী কাজ না থাকে তো উনি তার দিন চারেক আগে যাওয়া ঠিক করবেন। বোলপুর অমন সুন্দর জায়গা, ওঁর ভাল লাগবারই কথা। আমার তো যাবার জন্য মনটা ছটফট করছে।···লরেন্স্ বেচারীকে ছাড়ানো হয়েছে শুনে কষ্ট হচ্ছে। সে তার পোকাগুলি ছেড়ে যে থাকতে পারবে বোধ হয়না।···বিদ্যার্ণব মহাশয়ের সূক্ষ্মকায়টি অসুস্থ হবার মতন নয় সুতরাং সংস্কৃতে ফাঁকি দেওয়া রথীর হবেনা। পড়তে বসলে রথীর মুখখানা কিরকম হয়ে আসে আমার মনে পড়ে একটু হাসি পাচ্ছে। পড়বার নামেই বেচারার ঘুম পায়। এবার দেখছি বোলপুরে কিছু পরিবর্তন দেখব। ইস্কুলের বাড়ী কোনখানে হয়েছে? স্কুল বসলে বেড়াবার অসুবিধে হবে না?[৮৯]

সুতরাং পতিগৃহপ্রত্যাগত কন্যা ও জামাতার সঙ্গে সম্মিলনে শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রনাথ ও তাঁর পরিবারবর্গের কয়েকটি দিন ভালোই কেটেছিল।

বঙ্গদর্শন-এর কার্তিক ও অগ্রহায়ণ সংখ্যা যুগ্ম-সংখ্যা রূপে পূজার পূর্বেই প্রকাশিত হয়। এই যুগ্ম-সংখ্যাতেও রবীন্দ্র-রচনা মাত্র দুটি :

৩২৫-৪৮ ‘চোখের বালি’ ২১-২৫ দ্র চোখের বালি ৩।৩৫২-৭৮

৩৮১-৯৬ ‘বশীকরণ’ দ্র ব্যঙ্গকৌতুক ৭।৩৬৫-৮৪

এর মধ্যে ‘চোখের বালি’ কার্তিক-চিহ্নিত ও ‘বশীকরণ’ অগ্রহায়ণ-চিহ্নিত অংশে মুদ্রিত হয়েছিল।

পাঁচ অঙ্কের ক্ষুদ্র প্রহসন ‘বশীকরণ’ ভারত সংগীত-সমাজের উপরোধে রচিত হয়েছিল কিনা বলার মতো তথ্য আমাদের হাতে নেই, কিন্তু এইরূপ বাইরের তাগিদ ছাড়া রবীন্দ্রনাথের পক্ষে এই ধরনের প্রহসন লিখতে প্রবৃত্ত হওয়া স্বাভাবিক নয় বলেই মনে হয়।

প্রহসনটিতে দুটি গান আছে—চতুর্থ অঙ্কের অন্তর্ভুক্ত নিরুপমার গান ‘আমি কী বলে করিব নিবেদন’ [দ্র ৭।৩৭৪] ও পঞ্চম অঙ্কের অন্তর্ভুক্ত রমণীগণের গান ‘এবার সখী, সোনার মৃগ দেয় বুঝি দেয় ধরা’ [দ্র ৭।৩৮১]। এর মধ্যে প্রথম গানটি কিছুটা পাঠান্তর-সহ সিন্ধু বারোয়াঁ-ঝাঁপতাল সুর-তালে বর্তমান বৎসরের মাঘোৎসবে গীত হয়। বহুকাল পরে নৃত্যনাট্য চিত্রাঙ্গদা [১৩৪২]-য় গানটির প্রথম দুটি ছত্র ‘আমি তোমারে করিব নিবেদন/আমার হৃদয় প্রাণ মন’ আকারে রূপান্তরিত হয়ে ব্যবহৃত হয়েছে।

ত্রিপুরা যাত্রার উদ্দেশ্যে রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতন থেকে কলকাতা আসেন সম্ভবত ৭ কার্তিক [বৃহ 24 Oct] তারিখে। এই দিনই তিনি মির্জাপুর স্ট্রীটে প্রিয়নাথ শাস্ত্রীর বাড়ি যান। প্রিয়নাথ শাস্ত্রী শান্তিনিকেতন আশ্রমের অন্যতম ট্রাস্টী ছিলেন, হয়তো ব্রহ্মচর্যাশ্রম সম্পর্কে কিছু আলোচনার জন্যই তাঁর বাড়ি যাওয়ার দরকার হয়েছিল।

রবীন্দ্রনাথ অনেক দিন ধরেই ত্রিপুরা যাওয়ার কথা ভাবছিলেন, একথা আমরা আগেই বলেছি। তাঁর সেখানে যাওয়ার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল ত্রিপুরারাজের কাছে জগদীশচন্দ্রের জন্য অর্থসাহায্য প্রার্থনা। জগদীশচন্দ্রের প্রতিভা ও গবেষণার প্রতি রাধাকিশোর মাণিক্যের শ্রদ্ধা ও উৎসাহ ছিল সুপ্রচুর। প্রথমাবধিই তাঁকে সাহায্য করার ব্যাপারে তিনি আগ্রহ বোধ করেছেন। রবীন্দ্রনাথও জগদীশচন্দ্রের গবেষণার অগ্রগতি ও প্রয়োজন সম্পর্কে রাধাকিশোরকে সর্বদা অবহিত রেখেছেন। কলকাতাতেও বিভিন্ন উপলক্ষে তাঁর সঙ্গে

রবীন্দ্রনাথের যোগাযোগ ঘটত। সুতরাং কেবল অর্থসাহায্য প্রার্থনার জন্য তাঁর ত্রিপুরা যাওয়ার দরকার ছিল না। কিন্তু ত্রিপুরারাজের পারিষদবর্গ মাঝে মাঝে তাঁর ঔদার্যকে সংকুচিত করার চেষ্টা করতেন। ১৮ শ্রাবণ রবীন্দ্রনাথ ত্রিপুরার মধ্যম রাজকুমারকে লিখেছিলেন : 'লক্ষ্মীবান পুরুষেরা নিজে সদাশয় হইলেও ক্ষুদ্রচেতা ব্যক্তিদের দ্বারা এমন পরিবেষ্টিত যে ইচ্ছা করিলেও তাঁহাদের শুভ প্রচেষ্টা ব্যর্থ হইয়া যায়।' এ-বিষয়ে ২৪ শ্রাবণ রবীন্দ্রনাথ রাধাকিশোরকে যা লিখেছিলেন তা আমরা পূর্বেই উদ্ধৃত করেছি। তাই ত্রিপুরায় গিয়ে এই পারিষদবর্গকে প্রত্যক্ষভাবে প্রভাবিত করা হয়তো তাঁর লক্ষ্য ছিল। সম্ভবত আশ্বিনের শেষে একটি পত্রে তিনি জগদীশচন্দ্রকে লিখছেন : 'আজ মিস্ নোব্‌লের চিঠিতে তোমার কথা পড়িয়া অত্যন্ত আনন্দ পাইয়াছি।....ত্রিপুরার মহারাজ কাল আমার কাছে একটি কর্ম্মচারী পাঠাইয়াছেন। তোমার সম্বন্ধে আমার সঙ্গে বিস্তারিত আলাপ করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন। আমি আর দিন দশ বারো পরে ত্রিপুরায় গিয়া মহারাজের সঙ্গে দেখা করিব।'[৯০]

রবীন্দ্রনাথ কবে ত্রিপুরায় গিয়েছিলেন তার তারিখটি নির্ধারণ করা যায়নি। তবে ৭ কার্তিকের অব্যবহিত পরেই তিনি সেখানে গিয়েছিলেন বলে মনে করা যায়। প্রধানত মধ্যম রাজকুমার ব্রজেন্দ্রকিশোর দেববর্মার ও অন্যান্যদের স্মৃতিচারণ থেকে রবীন্দ্রনাথের এইবারের আগরতলায় অবস্থানের বিবরণ সংকলন করেছেন। সত্যরঞ্জন বসু :

রাজবাড়ীর পশ্চিমের দীঘির উত্তর-পশ্চিম কোণায় জুড়িবাংলা (জোড়াবাংলা)—পাশাপাশি দুইটি বাংলা ঘর পূর্ব্বদুয়ারী।···সেবার (১৩০৮) কবি আসিয়া জুড়িবাংলায় আছেন। সন্ধ্যায় রোজই দস্তুরমত মজলিশ মিলিত। কবির কথা শুনিবার আগ্রহ সকলকেই পাইয়া বসিল। দেশীয় রাজাদের.... সাহায্যে দেশকে কি ভাবে গড়া যায়—এইসব কথা ব্রজেন্দ্রকিশোরের মনে গভীর রেখাপাত করিয়াছিল। কোনো সময়ে শেলী, ব্রাউনিং ইত্যাদি কবির কাব্য পাঠ করিয়া কবি উন্মাদনার সঙ্গে সেগুলি তর্জ্জমা করিয়া মহারাজকুমারকে শুনাইতেন....মাঝে মাঝে কবি তাঁহার নূতন লেখাও তাঁহাদের শুনাইতেন।·····কোনো কোনো দিন ব্রজেন্দ্রকিশোর খুব নিরিবিলি আসিয়া দেখিয়াছেন—অতি প্রত্যুষে কি আবেগময় সুরে প্রার্থনা সঙ্গীত গাহিয়া চলিয়াছেন অর্গ্যান বাজাইয়া।···নিমীলিত নেত্রে অর্গ্যানের সুরে সুর মিলাইয়া "বল দাও মোরে বল দাও" কবি কি আবেগেই গাহিতেছেন····

প্রায়ই সন্ধ্যার সময় বুদ্ধির খেলার কৌশল কবি আবিষ্কার করিতেন যাহা বালসুলভ চপলতাকে স্তিমিত করিয়া দিত।····উপস্থিত একজনকে দেশের খুব নামজাদা কাহারও নাম মনে মনে স্থির করিতে কবি বলিতেন। আর অন্য সকলে নানাপ্রকার গুণ উল্লেখ করিয়া সেই সব গুণ ব্যক্তিটির আছে কিনা প্রশ্ন করিত। এই পদ্ধতিতে ক্রমশঃ সেই ব্যক্তিটি এবং তাঁহার বিশেষত্বগুলিও ধরা পড়িত। ইহাতে চিন্তাশক্তির প্রসারতা ও বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সম্বন্ধে অনেক কিছু জানা যাইত···.।

কোনো কোনো দিন খেলা পালটাইত। একঘরে হরেকরকম জিনিষ সাজাইয়া রাখা হইত। উপস্থিত বালকদের একে একে যাইয়া নির্দ্ধারিত সময়ের মধ্যেই ঘর হইতে বাহিরে আসিয়া প্রত্যেকে কি কি জিনিষ দেখিল তাহাই কাগজে লিখিত। কবি সবগুলি পরীক্ষা করিয়া স্বল্প সময়ে কাহার পর্য্যবেক্ষণ ক্ষমতা অধিক তাহাই নির্দ্ধারণ করিয়া দেখাইতেন।···.

এক সন্ধ্যায় কবিকে তাঁহার বিশ্রাম ভবনে গান বাজনায় সম্বর্দ্ধনার কথা স্থির হইয়াছে। স্কুলে ভাল গান গাহিত দুই বালক—কালাচাঁদ দেববর্মা ও প্রফুল্লকুমার মজুমদার। তাহারা যতিবাবুর [যতীন্দ্রনাথ বসু] কাছে দুইটি গান অভ্যাস করিল—কবিরই রচিত—"রাজ অধিরাজ তব ভালে জয় মালা" ও "অয়ি ভুবন মনোমোহিনী"—সঙ্গত করিলেন পাখোয়াজ ও খোলে কলেজের অধ্যক্ষ কুঞ্জলাল নাগ মহাশয়।....ছেলেদের গানের পর মহারাজ বীরচন্দ্র রচিত ও সুর সংযোজিত "জয় জগত বন্দিনি হরি হৃদয় রঙ্গিণি, ব্রজরমণী মুকুটমণি রাধিকে—শ্রীরাধিকে" গানটি গাইলেন বীরচন্দ্রের দরবারের রামকানাই শীল।···ইহার পর দীর্ঘ আলাপ ও সুরে সেতার বাজাইয়া শুনাইলেন প্রসন্নকুমার ঠাকুর।[৯১]

ব্রজেন্দ্রকিশোর সত্যরঞ্জন বসুকে একটি পত্রে জানিয়েছিলেন : 'একজন গোস্বামীকেও সঙ্গে আনিয়াছিলেন, নাম স্মরণ নাই, পাঠ ইত্যাদি করাইয়াছিলেন।' ইনি হয়তো বিভিন্ন বৈষ্ণবগ্রন্থের সম্পাদক অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী [১২৭৪-১৩৫৩]*—তাঁর কয়েকটি গ্রন্থের জন্য ত্রিপুরা থেকে কিছু টাকা প্রাপ্য ছিল—রবীন্দ্রনাথ তাঁর হয়ে মহিমচন্দ্র দেববর্মাকে বারবার লিখে ব্যর্থকাম হয়ে হয়তো তাঁকে নিয়েই ত্রিপুরায় গিয়েছিলেন।

রবীন্দ্রনাথের প্রধান উদ্দেশ্যও সফল হয়েছিল। আগরতলা থেকে তিনি জগদীশচন্দ্রকে লিখছেন :

আমি তোমার কাজেই ত্রিপুরায় আসিয়াছি। এইখানে মহারাজের অতিথি হইয়া কয়েক দিন আছি। তোমার প্রতি তাঁহার কিরূপ শ্রদ্ধা তাহা ত জানই—সুতরাং তাঁহার কাছে আমার প্রার্থনা জানাইতে কিছুমাত্র সঙ্কোচ অনুভব করিতে হয় নাই। তিনি শীঘ্রই বোধ হয় দুই এক মেলের মধ্যেই তোমাকে দশ হাজার টাকা পাঠাইয়া দিবেন। সে টাকা আমার নামেই তোমাকে পাঠাইব। এই বৎসরের মধ্যেই তিনি আরো দশ হাজার পাঠাইতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন।····প্রাসাদ নির্ম্মাণ প্রভৃতি বহুব্যয়সাধ্য কার্য্যে সম্প্রতি মহারাজ জড়িত আছেন নতুবা তিনি স্বেচ্ছাপ্রবৃত্ত হইয়া তোমাকে পঞ্চাশ হাজার পর্যন্ত সাহায্য করিতে পারিতেন। তাঁহার এই উৎসাহে তিনি আমার হৃদয় আরো দৃঢ়তররূপে আকর্ষণ করিয়াছেন—স্বাভাবিক ঔদার্য্যের এমন উজ্জ্বল আদর্শ আমি আর দেখি নাই।[৯২]

ত্রিপুরার মধ্যম রাজকুমার ব্রজেন্দ্রকিশোরকে ব্রহ্মচর্যাশ্রমের ছাত্র শ্রেণীভুক্ত করে আশ্রমের মর্যাদাবৃদ্ধি ও প্রাচীন ভারতীয় আদর্শে ক্ষত্রিয় রাজকুমারকে শিক্ষিত করে দেশীয় রাজ্যের ক্ষেত্রে একটি দৃষ্টান্ত স্থাপন করার ইচ্ছাও হয়তো রবীন্দ্রনাথের অন্তরে ছিল। কয়েক মাস পূর্বেই ১৮ শ্রাবণ [শনি 3 Aug] তিনি ব্রজেন্দ্রকিশোরকে লিখেছিলেন :

তোমার অধ্যয়নের সুব্যবস্থার জন্য আমার পক্ষে চেষ্টার ত্রুটি হইবে না। শুনিলাম সম্প্রতি ত্রিপুরায় একটা গোযোগ বাধিয়াছে—সেইজন্য আমি এ সময়ে মহারাজের কাছে কোন প্রস্তাব করিলাম না। যতীকে বলিয়া দিবে সেখানকার বিপ্লব শান্তি হইলে আমাকে যেন সংবাদ দেয়। মহারাজ যদি বা আমাদের প্রস্তাবে সম্মত হন তথাপি পারিষদবর্গ যদি সম্মান ও ব্যয়বাহুল্যের দোহাই দিয়া আপত্তি প্রকাশ করে তবে কি দাঁড়াইবে বলা কঠিন।[৯৩]

অবস্থা শেষ পর্যন্ত সেইরকমই দাঁড়িয়েছিল, কিন্তু বর্তমানে তিনি রাধাকিশোরের আগ্রহে ও সম্মতিক্রমেই ব্রজেন্দ্রকিশোরকে নিয়ে আগরতলা থেকে প্রথমে শিলাইদহে এবং পরে কলকাতায় ও শান্তিনিকেতনে গিয়েছিলেন। সম্ভবত ১৮ কার্তিক [সোম 4 Nov] তাঁরা কলকাতায় আসেন, ক্যাশবহির হিসাবে 'ত্রিপুরার মহারাজকুমার বাহাদুরের এবাটীতে শুভ আগমন উপলক্ষে ব্যায় ১৮ হইতে ২৫ কার্ত্তিক [সোম 11 Nov] পর্য্যন্ত আহারাদির ব্যায়'-এর উল্লেখ দেখা যায়।

কিন্তু ত্রিপুরা থেকে তাঁরা প্রথম গিয়েছিলেন শিলাইদহে। ৩ অগ্র° (মঙ্গল 19 Nov] রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায়কে লিখেছেন : 'আমি ত্রিপুরা হইতে শিলাইদহ, সেখান হইতে কলিকাতা (একদিনের জন্য), কলিকাতা হইতে বোলপুর, বোলপুর হইতে পুনরায় কলিকাতা, এবং সেখান হইতে পুনশ্চ বোলপুরে আসিয়াছি।····ত্রিপুরার মহারাজের অতিথিরূপে যথেষ্ট সমাদরে ছিলাম। সেখান হইতে ত্রিপুরার মধ্যম রাজকুমার আমার সঙ্গে শিলাইদহে ও বোলপুরে বেড়াইতে আসিয়াছিলেন। তাঁহাকে স্বস্থানে রওনা করিয়া দিয়া আমি বোলপুরে ফিরিয়া আসিয়াছি।[৯৪] এই চিঠি থেকেই প্রকৃত ভ্রমণসূচীটি নির্ধারণ করা যায়। 'রবীন্দ্রনাথ ও ত্রিপুরা' গ্রন্থে প্রদত্ত ভ্রমণসূচীটি যথার্থ নয় এবং স্মৃতিচারণ সূত্রে সেখানে অনেক বিস্মৃতিচারণেরও অবতারণা হয়েছে, বিশেষত শিলাইদহে 'কবি-গৃহিণীর যত্ন ও আদর'-এর কথা।[৯৫] 'কবি-গৃহিণীর যত্ন ও আদর' ব্রজেন্দ্রকিশোর পেয়েছিলেন—কিন্তু শিলাইদহে নয়, শান্তিনিকেতনে।

ব্রজেন্দ্রকিশোরের শিলাইদহের অভিজ্ঞতা সম্পর্কে সত্যরঞ্জন বসু লিখেছেন :

কবি রাজার ছেলেকে লইয়া জমিদারীতে আসিয়াছেন, তাঁর সম্মানের দিকটাও রক্ষা করিতে ভুলেন নাই। একরকম সভা করিয়াই একদিন মহারাজকুমারকে নিয়া সেখানে পৃথক আসনে উপবেশন করাইলেন। ব্রজেন্দ্রকিশোর সঙ্কোচে আড়ষ্ট—অথচ কবির অভিপ্রায়কে লঙ্ঘনও করিতে পারিতেছেন না। বলিলেন, "কয়েকজন কর্ম্মচারী মস্ত বড় এক থালায় অনেকগুলো টাকা এনে আমার সামনে ধরলো। আমাকে তাদের সম্মাননা প্রদর্শনে কি করা উচিত ভেবে না পেয়ে জিজ্ঞাসু বয়ানে কবির দিকে চাইতেই তিনি বলে উঠ্‌লেন—তোমার ভাবনা নেই, আমিই সব ব্যবস্থা

করছি।”…কলিকাতায় ফিরিয়াই সেই সব টাকায় দোকানে দোকানে কবি নিজে বাছাই করিয়া অনেকগুলি বই কিনিয়া দিলেন। আর বিশেষ করিয়া বই পড়ার উপযযাগিতা কি তাহাও বেশ করিয়া বুঝাইয়া দিলেন।[৯৬]

ব্রজেন্দ্রকিশোরকে নিয়ে রবীন্দ্রনাথ মাত্র একদিন কলকাতায় থাকেন। সত্যরঞ্জন বসু লিখেছেন :

জোড়াসাঁকো বাড়ীতে মহর্ষিদেবের কাছে কবি তাঁহাকে লইয়া রাধাকিশোর মাণিক্যের সহিত আলোচনার সম্যক কথা বিবৃত করিলেন। অভিজাত মন মহারাজকুমারের, তিনি বলিলেন—“অভ্যাস বশতঃ, মহর্ষির পদধূলি না লইয়া, হাত জোড় করেই প্রণাম সমাধা করলাম। মহর্ষিদেব আমার মাথায় ও শরীরে হাত বুলিয়ে আশীর্ব্বাদ করে খুবই আনন্দ প্রকাশ করলেন ব্রহ্মবিদ্যালয়ে যোগদান করার কথা জেনে। যখন তাঁর কাছ থেকে ফিরে আসি—তাঁর সেই সৌম্য মূর্ত্তির কাছে আপ্না থেকেই যেন মাথা অবনত হতে চাইল। আমি মাটিতে মাথা রেখে পদধূলি গ্রহণ করলাম।…”[৯৭]

কলকাতা থেকে রবীন্দ্রনাথ ব্রজেন্দ্রকিশোরকে শান্তিনিকেতনে নিয়ে আসেন। এখানেই ব্রজেন্দ্রকিশোর ‘কবি-পত্নীর যত্ন ও আদর’ লাভ করেছিলেন। তাঁর মৃত্যুর পর ১৮ অগ্র° ১৩০৯ [4 Dec 1902] রবীন্দ্রনাথ ব্রজেন্দ্রকিশোরকে লেখেন : ‘তুমি অল্পদিন এখানে থাকিয়াই তাঁহার স্নেহপ্রবণ হৃদয়ের পরিচয় পাইয়াছ। তাঁহার স্বভাব মাতৃভাবে পূর্ণ ছিল এবং তিনি তোমাকে আপন সন্তানের চক্ষেই দেখিয়াছিলেন। এখানকার বিদ্যালয়ে তুমি আসিবে এবং তাঁহার যত্ন শুশ্রুষার অধীনে থাকিবে ইহার জন্য তিনি ঔৎসুক্যের সহিত প্রতীক্ষা করিয়াছিলেন। তুমি তাঁহার কাছে থাকিলে কখনো মাতার অভাব এক মুহূর্তের জন্যও অনুভব করিতে পারিতে না ইহা নিঃসন্দেহ।’[৯৮]

ব্রজেন্দ্রকিশোরকে নিয়ে শান্তিনিকেতনে যাওয়ার সময় ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় প্রভৃতি রবীন্দ্রনাথের সঙ্গী হন। ক্যাশবহিতে আছে : ‘শান্তিনিকেতনে কার্তিক মাসে ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় ও ত্রিপুরার মহারাজকুমার প্রভৃতি গমন করায় তথাকার খরচ’ ১৭৪ টাকা সাড়ে পাঁচ আনা। অণিমানন্দ লিখেছেন :

One fine morning Kartik, Rabindranath and Upadhyay went to Bolepur to inspect the place. The wide open space of the immense sloping plateau must have appealed to Upadhyay. He always loved open space and vast spreading trees.[৯৯]

তাঁরা সম্ভবত ২৫ কার্তিক [সোম 11 Nov] কলকাতায় ফিরে আসেন। ব্রজেন্দ্রকিশোরকে ত্রিপুরায় পাঠিয়ে রবীন্দ্রনাথ কয়েকদিন কলকাতায় থাকেন। ২৬ কার্তিক তাঁর ‘বালিগঞ্জ হইতে আসার’, ২৮ হেদুয়াতলা হইতে বিদ্যার্ণবের বাসা’ ও ২৯ কার্তিক ‘গোলতলাও’ যাতায়াতের হিসাব ক্যাশবহিতে পাওয়া যায়। ৩০ কার্তিক [শনি 16 Nov] তিনি শান্তিনিকেতনে প্রত্যাবর্তন করেন। যাত্রার প্রাক্কালে [যদিও তারিখ দিয়েছেন, ১ অগ্র°] তিনি মহিমচন্দ্র দেববর্মাকে লেখেন :

নানা কাজে অত্যন্ত ব্যস্ত ছিলাম। স্কুলের বন্দোবস্ত লইয়াও অনেক সময় গেছে। আমাদের বিদ্যালয়ে শিল্প ও বিজ্ঞান শিক্ষারও একটা ব্যবস্থা করা যাইতেছে। কেমিস্ট্রি ও ফিজিক্যাল্ সায়ান্সে এম্ এ পাস করা একটি সুযোগ্য লোক পাওয়া গেছে। তিনি নানা প্রকার শিল্পকার্য্যেও দক্ষ। তাঁহার অধীনে ছেলেদের শিক্ষা পরীক্ষা ও আমাদের জন্য একটি ছোটখাট workshop খোলা যাইবে।….

পিতাঠাকুর রাজকুমারের আগমন সংকল্পে অত্যন্ত উৎসাহিত হইয়া উঠিয়াছেন। তিনি এ কয়দিন প্রত্যহ প্রাতে এই বিদ্যালয় লইয়া আমার সঙ্গে আলোচনা করিয়াছেন। পাছে শীঘ্র বিদ্যালয়ের কার্য্য আরম্ভ না হইলে তাঁহার জীবিতকাল অতিক্রান্ত হয় এই তাঁহার আশঙ্কা। এই কাজটিকে তিনি তাঁহার জীবনের শেষ কার্য্যরূপে দেখিয়া যাইতে চান। মহারাজ তাঁহার এই কাজে আত্মীয়ভাবে যোগ দিয়াছেন বলিয়া তিনি অন্তরের সহিত তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিতেছেন।

জগদীশবাবুর সেই টাকাটা সুরেনকে ১৯ নং স্টোর রোড্ বালিগঞ্জের ঠিকানায় অবিলম্বে পাঠাইয়া দিয়ো। সে বিলাতে যথাস্থানে পাঠাইবার বন্দোবস্ত করিয়া দিবে। এই কাজে তোমরা অসাবধানবশতঃ দেরি করিয়ো না। যত সময় যাইবে ততই জগদীশবাবু বিপন্ন হইবেন এবং তাঁহার কার্য্যে ব্যাঘাত হইবে।

আমি আজ এখনই বোলপুরে রওনা হইতেছি। সকালের প্যাসেঞ্জারে ছাড়িব। এখন ভোর সাড়ে চারটে। আলো জ্বালিয়া তোমাকে লিখিতেছি।

পরের দিন ১ অগ্র° [রবি 17 Nov] তিনি কুমার ব্রজেন্দ্রকিশোরকে লিখেছেন :

অত্যন্ত ব্যস্ত ছিলাম বলিয়া তোমাকে পত্র লিখিতে পারি নাই। কাল শান্তিনিকেতনে আসিয়াছি—কলিকাতা হইতে সর্দ্দিকাশি সঙ্গে আনিয়াছি—এখানে আসিয়া আরোগ্য লাভ করিতে বিলম্ব হইবে না আশা করিতেছি। মহারাজকে পত্র লিখিয়াছি—তোমার এখানে আসিতে কোন বাধা হইবে না বলিয়াই ভরসা করি। রথী তোমার জন্য আগ্রহে প্রতীক্ষা করিতেছে। আসিবার সময় তোমার যন্ত্রাদি অর্থাৎ Carpentry, Pretwork প্রভৃতি হাতিয়ার সঙ্গে আনিয়ো। বাইসিকল্ ও ঘরে পড়িবার বই প্রভৃতিও আনিতে পার।···তুমি আসিলেই আমি বিদ্যালয়ের কাজ আরম্ভ করিয়া দিব। অগ্রহায়ণ মাস উত্তীর্ণ হইতে দিয়ো না।[১০১]

বঙ্গদর্শন-এর অগ্র°-সংখ্যা কার্তিক-সংখ্যার সঙ্গে যুগ্মভাবে প্রকাশিত হয়। অগ্র°-সংখ্যা ভারতী [২৫।৭] অবশ্য স্বতন্ত্র ভাবেই প্রকাশিত হয়, এই সংখ্যায় রবীন্দ্রনাথের বড়োগল্প 'নষ্টনীড়'-এর প্রকাশ সমাপ্ত হল। বৈশাখ থেকে গল্পটি ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হতে শুরু করে, আষাঢ় থেকে ভারতী-তে রবীন্দ্রনাথের একতম রচনা 'নষ্টনীড়'। আমরা আষাঢ়-সংখ্যা পর্যন্ত ভারতী-তে রচনাটি প্রকাশের বিবরণ দিয়ে এসেছি, এখানে অবশিষ্ট সংখ্যার বিবরণ সংকলিত হল :

শ্রাবণ। ৪০৩-০৯ নবম ও দশম পরিচ্ছেদ দ্র গল্পগুচ্ছ ২২।২৩৬-৪১

ভাদ্র। ৫২৫-৩২ একাদশ ও দ্বাদশ পরিচ্ছেদ দ্র ঐ ২২।২৪২-৪৭

আশ্বিন। ৫৬২-৬৫ ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ দ্র ঐ ২২।২৪৮-৫০

কার্তিক। ১০৫-১২ চতুর্দশ-ষোড়শ পরিচ্ছেদ দ্র ঐ ২২।২৫০-৫৬

অগ্র°। ১৯১-২০০ সপ্তদশ-বিংশ পরিচ্ছেদ দ্র ঐ ২২।২৫৭-৬৩

জগদীশচন্দ্র গল্পটির প্রথম কিস্তি পড়ে 22 May [বুধ ৮ জ্যৈষ্ঠ] লেখেন :'বৈশাখের ভারতীতে তোমার গল্পটি অতি সুন্দর হইয়াছে। তুমি কি এক ভয়ানক পরিণাম প্রস্তুত করিতেছ জানি না।[১০২] সুরেশচন্দ্র সমাজপতি জ্যৈষ্ঠ-সংখ্যার কিস্তি সম্বন্ধে লেখেন : 'রবীন্দ্র বাবুর "নষ্টনীড়" ও "চোখের বালি" অনেকটা এক খাতে চলিতেছে। উভয়ের স্বাতন্ত্র্য বড় সূক্ষ্ম।—যাক্, —সমাপ্তির পূর্ব্বে বিসর্জ্জনের বাজনা বাজাইবার কাহারও অধিকার নাই।'[১০৩] এর পরেও তিনি দুটি কিস্তির উল্লেখ করেছেন, কিন্তু কোনো মন্তব্য করেননি।

প্রায় সম্পূর্ণ কার্তিক মাসটি রবীন্দ্রনাথের ঘোরাঘুরিতেই কাটে, সেইজন্য অগ্রহায়ণের শুরুতেই তিনি রচনাকার্যে মনোনিবেশ করেন। ৩ অগ্র° [মঙ্গল 19 Nov] তিনি পূর্বোল্লিখিত পত্রে ঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায়কে লিখছেন : 'দীর্ঘকাল গোলেমালে কাটিয়াছে, এখন আর সম্পাদকের কাজে একদিনও অবহেলা করিবার সময় নাই। সুতরাং আজ প্রাতেই লিখিতে বসিয়াছি, কিন্তু সায়াহ্নের গাড়ীতে কয়েকজন অতিথি আসিবার কথা আছে। তাঁহারা যে কয়দিন থাকেন লিখিতে সময় পাইব না।'[১০৪]

চোখের বালি-র কিস্তি ছাড়া এই সময়ে তিনি লেখেন 'কুমারসম্ভব ও শকুন্তলা' এবং 'বাংলা ব্যাকরণ' প্রবন্ধ। শ্রাবণ-সংখ্যায় মুদ্রিত 'মেঘদূত' প্রবন্ধের শেষেই তিনি কুমারসম্ভব ও শকুন্তলা সম্পর্কে লেখার ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন, সেই অভিপ্রায় এত দিনে পূর্ণ হল। মজুমদার লাইব্রেরিকে কেন্দ্র করে একটি সাহিত্যিক আড্ডা জমে উঠেছিল, আনুষ্ঠানিকভাবে তার নাম দেওয়া হয় 'আলোচনাসমিতি'। রবীন্দ্রনাথ অগ্রহায়ণের শেষার্ধে কলকাতায় গিয়ে এই আলোচনাসমিতির প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে ২৩ অগ্র° [সোম 9 Dec] প্রবন্ধটি পাঠ

করেন। মজুমদার লাইব্রেরি তার অব্যবহিত পূর্বে কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীটের ২০৯ নম্বর বাড়ি থেকে সরে এসে ২০ নম্বর বাড়িতে অধিষ্ঠিত হয়েছে।

'বাংলা ব্যাকরণ' প্রবন্ধটি লিখিত হয় অগ্র°-সংখ্যা ভারতী-তে মুদ্রিত শরচ্চন্দ্র শাস্ত্রীর 'নূতন বাঙ্গালা ব্যাকরণ' (পৃ ১৭২-৯১) প্রবন্ধটির প্রত্যুত্তর হিসেবে। উক্ত প্রবন্ধে লেখক রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য-পরিষদে পঠিত প্রবন্ধ 'বাংলা কৃৎ ও তদ্ধিত'-এর বিরূপ সমালোচনা করেন, প্রসঙ্গক্রমে তিনি হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর ইতিপূর্বে পঠিত বাংলা ব্যাকরণ প্রবন্ধটি সম্পর্কেও কটাক্ষ করেন। শরচ্চন্দ্র শাস্ত্রীর প্রবন্ধটি যখন লেখা ও প্রকাশিত হয় তখনও রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধটি-সহ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা প্রকাশিত হয়নি, কোনো উপায়ে তার প্রফটি সংগ্রহ করে প্রতিবাদটি লিখিত হয়। এই কারণেই ঘটনাটি উল্লেখ করে রবীন্দ্রনাথ এই প্রবন্ধে কিছু বিদ্রূপ ও পরিহাসের আশ্রয় নিয়েছিলেন। ২৪ অগ্র° [মঙ্গল 10 Dec] বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সপ্তম মাসিক অধিবেশনে তিনি এই রচনাটি পাঠ করলে স্বভাবতই বিরুদ্ধগোষ্ঠীর তীব্র প্রতিবাদের সম্মুখীন হন। কিন্তু এ-সব প্রসঙ্গ যথাস্থানে আলোচিত হবে।

১৫ অগ্র° [রবি 1 Dec] রবীন্দ্রনাথ নববিধান সমাজের অন্যতম যুবনেতা প্রমথলাল সেনকে। [1866-1930] একটি চিঠি লেখেন। প্রমথলাল কেশবচন্দ্র সেনের অগ্রজ নবীনচন্দ্রের পুত্র। কেশবচন্দ্রের প্রভাবে পরিবর্ধিত ধর্মপ্রাণ প্রমথলাল তরুণ বয়সেই তাঁর দাদা নন্দলাল, ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় [ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়], সাধু হীরানন্দ প্রভৃতির সঙ্গে 1883-এ প্রতিষ্ঠিত Eagle's Nest-এর সভ্য ছিলেন। পরে তিনি, বিনয়েন্দ্রনাথ সেন ও মোহিতচন্দ্র সেন নববিধান সমাজের অন্যান্য উৎসাহী যুবকদের সঙ্গে প্রতাপচন্দ্র মজুমদারকে মধ্যমণি করে Prayer Meeting Band নামে একটি গোষ্ঠী গড়ে তোলেন। ব্রিটিশ ইউনিটেরিয়ান অ্যাসোসিয়েশন কর্তৃক প্রদত্ত ম্যানচেস্টার বৃত্তির তিনিই প্রথম প্রাপক [1895]। কোন্ সূত্রে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ গড়ে উঠেছিল বলা শক্ত, কিন্তু আলোচ্য সময়ে Prayer Meeting Trio প্রমথলাল, বিনয়েন্দ্রনাথ ও মোহিতচন্দ্র তিনজনের সঙ্গেই রবীন্দ্রনাথের পত্রালাপের নমুনা পাওয়া যায়। মোহিতচন্দ্র নগেন্দ্রনাথ গুপ্তের দূর-সম্পর্কীয় ভ্রাতা ও ব্রহ্মবান্ধবের Twentieth Century পত্রিকার লেখক ছিলেন। এই সূত্রেও যোগাযোগটি গড়ে উঠতে পারে। বেণীমাধব দাস লিখেছেন, প্রতাপচন্দ্র মজুমদারের সূত্রে তাঁরা সম্মিলিত হয়েছিলেন :

> Pratapchandra was a great personality and Rabindranath also was attracted by him and the Poet used to come to his house —the 'Peace Cottage'. ···One remembers with pleasure, the afternoon when some of the Prayer Meeting Band were gathered round Rishi Pratapchandra, listening with rapt attention to his slow mellow voice pouring out his deep spiritual thoughts in poetic language, all his own. Suddenly there was a gentle stir amongst us,"Ah! Rabi Babu is coming. Rabi Babu is here."··· Round about the Rishi, a tie sprang up between the Poet and Prayer Meeting 'Trio', which gradually grew stronger in time.[১০৫]

দার্শনিক ব্রজেন্দ্রনাথ শীলও [1864-1938] এঁদের সূত্রেই রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে পরিচিত ও ঘনিষ্ঠ হন। রবীন্দ্রনাথ উক্ত পত্রে প্রমথলালকে লিখেছেন :

> সম্প্রতি আমি কুমারসম্ভব ও শকুন্তলার সমালোচনা লিখিতে নিযুক্ত আছি—ইহার মধ্যে প্রসঙ্গক্রমে সাহিত্য ও সমাজ সম্বন্ধে ভারতবর্ষের আদর্শ কি ছিল কতকটা আলোচনা করা যাইবে। এবারকার বঙ্গদর্শনে শিক্ষা সম্বন্ধে কোন লেখা দিবার অবসর হইবেনা। বোধহয় পরের বারে যাইবে। বস্তুত আমার এই বিদ্যালয় লইয়া আমি অধিক গোল করিতে চাই না। এখানে অল্পই ছাত্র পড়িবে; আমাদের নিজেদের যতদূর সাধ্য কাজ করিয়া যাইব। বাহিরের তীব্রদৃষ্টি Evil eyeএর মত কাজ করে—ইহাতে শিশু অনুষ্ঠানকে আঘাত করিতে থাকে। কাজের আরম্ভে যথেষ্ট শান্তি ও

কিয়ৎ পরিমাণে গোপনতা না হইলে নয়। একটুখানি শক্ত হইয়া উঠিলে তাহার পরে সমস্ত সংসারের কাছে জবাবদিহি করিবার সময় আসে। আমি কোন মৃত প্রাচীন ব্যাপারকে মন্ত্রবলে জীবিত করিবার ইচ্ছা করি না; অতীতকে ফিরান আমার কর্ম্ম নহে; যাহা প্রচ্ছন্নরূপে অথচ প্রবলরূপে বর্তমান, যাহা মৃত নহে, যাহা আমাদের ভারতবর্ষের প্রকৃতিগত, তাহাকে আমার কার্য্যের সহায় করিতে চাই; অন্ধভাবে তাহাকে অস্বীকার করিয়া চলিতে চেষ্টা করি বলিয়াই বারম্বার আমাদের প্রারব্ধ অনুষ্ঠান নষ্ট হইয়া যায়। অন্যদেশের বর্তমান ইতিহাসকেই আমরা বর্তমান কাল বলিয়া গণ্য করি—ভুলিয়া যাই তাহা ভারতবর্ষের পক্ষে বর্তমান নহে। বরঞ্চ ভারতবর্ষের অতীতকে পুনর্জ্জীবিত করা সম্ভব তবু অন্যদেশের ঐতিহাসিক কালকে ভারতবর্ষের মধ্যে সঞ্চার করা সম্ভব নহে—এরূপ চেষ্টায় বিকার ও বিনাশের সূত্রপাত হইতে পারে, নূতন জীবনের নহে। ব্রজেন্দ্রবাবু বিনয়েন্দ্রবাবুদের সঙ্গে এ সকল কথার ভালরূপ আলোচনা করিবার ইচ্ছা ছিল—কোনও দিন সুযোগ ঘটিতেও পারে।

আমার যে কোন লেখা আপনারা তর্জ্জমা করিয়া দিতে পারেন। আমি বর্তমানে শিক্ষা সম্বন্ধে যে আলোচনা করিব আপনাদের মত লোক যদি তাহার অনুবাদের ভার লন তবে আমার পক্ষে আনন্দের কারণ হইবে।[১০৬]

—শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্যাশ্রম স্থাপনের অন্তর্নিহিত প্রেরণা ও লক্ষ্যটি এত সংক্ষেপে হয়তো আর কোথাও ব্যক্ত হয়নি, পুরোনো কালের প্রতি মোহ এই বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার মূলে এমন বিরূপ সমালোচনার প্রচ্ছন্ন উত্তর পত্রটিতে রয়েছে। অনুবাদের প্রসঙ্গটিও উল্লেখযোগ্য, প্রমথলালের অনুবাদের সূত্রেই ইংরেজ শিল্পী উইলিয়াম রোটেনস্টাইন [William Rothenstein, 1872.1945] ও অন্যান্য ভারতবন্ধু ইংরেজরা রবীন্দ্রনাথের সম্পর্কে কৌতূহলী হন। অবশ্য আলোচ্য সময়ে রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাবিষয়ক রচনা প্রমথলাল অনুবাদ করেছিলেন কিনা আমাদের জানা নেই।

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, নববিধান সাজের মুখপত্র *The Unity and Minister*-এর 13 Oct 1901 [বৃহ ১৪ কার্তিক]-সংখ্যায় 'Pilgrimage to Shantiniketan of Bolpur'-শীর্ষক একটি রচনায় প্রস্তাবিত ব্রহ্মচর্যাশ্রম সম্পর্কে লেখা হয় : "The latest addition is a Brahmavidyalaya or a school for imparting secular and religious education to students in the national style. A boarding house will be opened and there shall be accomodation for 12 students who would learn Sanskrit and Brahmacharya according to the Vedic idea. English, Mathematics, History&c. up to the Entrance course, will also be taught.'[১০৬ক] কে এটি লিখেছিলেন জানি না, কিন্তু বোঝা যায় তিনি প্রকাশের কিছুদিন আগেই শান্তিনিকেতন ভ্রমণ করে এসেছেন।

শান্তিনিকেতন থেকে রবীন্দ্রনাথ কলকাতায় আসেন ১৮ অগ্র° [বুধ 4 Dec]—'১৮ অগ্রহায়ণ হাবড়ার ষ্টেসন হইতে বিপিন চাকর শ্রীযুক্ত রবীন্দ্র বাবু মহাশয়ের জিনিসপত্র লইয়া আসার গাড়ী ভাড়া' হিসাব থেকে তারিখটি নির্ধারণ করা হয়েছে।

তিনি কলকাতায় আসছেন একথা ব্রহ্মবান্ধব জানতেন না, তাই তিনি 5 Dec [বৃহ ১৯ অগ্র°] তাঁকে ৩৯ সিমলা স্ট্রীট থেকে একটি দীর্ঘ পত্র লেখেন সমস্ত খবর জানিয়ে :

I have not heard from you for a week or so. Hope the building is progressing. My constant prayer is that the noble idea of restoring the ancient national locus standi may be carried out to a crowning success. How incapacitated am I not, because of my love towards One who is the concrete manifestation of Divine Compassion, to stand by your side and fight out the battle and shed the blood of life drop by drop, if necessary. ...I should confess that I was not very particular about friends in the beginning. It seems now that Thanwardas is very dear and so is Chittatosh Babu. I hope Thanwardas will make up the deficiency by quality. I should not have been so hastly in regard to Chittatosh Babu. But your complaint that there was no provision for technical education fired me up. I wish I could have got Thanwardas cheaper but bargaining any more would

have been stultifying our position. All this I confess to let you know that I am always ready to receive your unreserved advice.[১০৭]

ব্রহ্মবান্ধবের এই প্রচেষ্টা সফল হয়নি—থানওয়ারদাস বা চিত্ততোষ বসু কেউই ব্রহ্মচর্যাশ্রমের শিক্ষকতা গ্রহণ করেননি। কিছুদিন পরে রবীন্দ্রনাথ একটি পত্রে ব্রহ্মবান্ধবকে লিখেছেন :

থাবরদাস [?] সম্বন্ধে আমার মনে কিছুকাল হইতে অত্যন্ত দ্বিধা জন্মিয়াছিল—বিধাতা গর্ডিয়ান্ পাশ ছেদন করিয়া সেই দ্বিধা মোচন করিলেন। মনোরঞ্জনবাবুকে আমাদের বিদ্যালয়ে বদ্ধ করিতে পারিলে আমি বিশেষ আনন্দ লাভ করিব। তিনি আইনে পাস হউন বা না হউন্ একবৎসর এখানে কাজ করিয়া যান্ তাহাতে আমার অনেক সাহায্য হইবে। কারণ, তিনি অভিজ্ঞ শিক্ষক, বিদ্যালয় ব্যাপারে তাঁহার কাছ হইতে আমি অনেক তথ্য লাভ করিতে পারিব। প্রথম হইতেই আমি তাঁহার প্রতি লুব্ধ দৃষ্টিক্ষেপ করিতেছিলাম—সেইজন্যই আশঙ্কা হইতেছে তিনি আইনের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারিবেন না।

আমরা বৃথা তাড়াতাড়ি যোঝাযুঝি করিয়া মরি—বিধাতাপুরুষ অন্তরালে বসিয়া নিঃশব্দে সমস্ত ব্যবস্থা করিয়া দিতেছেন।····

আপনি একবার আসিয়া সমস্ত পাকা ব্যবস্থা করিয়া দিয়া যান। বিদ্যালয়ের আরম্ভে সেটা বিশেষ দরকার।/শৈলেশদের বলিবেন অবিলম্বে তিনটা Black board (মাঝারি সাইজ) এখানে পাঠাইয়া দেয়।[১০৮]

পত্রটি সম্ভবত ৭ই পৌষের পূর্বে লেখা। পত্রে উল্লিখিত 'মনোরঞ্জনবাবু' হচ্ছেন মনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় [1871-1950], ব্রহ্মবান্ধবের ভ্রাতুস্পুত্র। কয়েকমাস পরে তিনি ব্রহ্মচর্যাশ্রমের শিক্ষকপদে যোগদান করেন।

২০ অগ্র° [শুক্র 6 Dec] রবীন্দ্রনাথের শ্যামবাজার যাওয়ার হিসাব ক্যাশবহিতে পাওয়া যায়। তিনি সম্ভবত বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের কার্যালয়ে গিয়েছিলেন। পরিষদের হস্তলিখিত 'কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির বিবরণী লিপিবদ্ধ করিবার খাতা'য় সপ্তম অধিবেশনের বিবরণে লেখা হয় :

গত ২০ অগ্রহায়ণ শুক্রবার (১৩০৮) ৬ ডিসেম্বর (১৯০১) কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির অধিবেশন বিজ্ঞাপন পাঠাইয়া নির্ব্বাহ করা হয়। নিম্নে তদ্বিবরণ লিখিত হইল। শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের অনুরোধে ঐরূপ ব্যবস্থা করা হইয়াছিল।

বিজ্ঞাপন

সহকারী সভাপতি শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় আগামী মঙ্গলবার ২৪শে অগ্রহায়ণ বাঙ্গালা ভাষা ও ব্যাকরণ সম্বন্ধে একটী প্রবন্ধ পাঠ করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করায় ঐ দিন পরিষদের ৭ম মাসিক অধিবেশন করিবার প্রস্তাব করা যাইতেছে। এ বিষয়ে আপনাদের মতামত জানাইয়া বাধিত করিবেন।....ইতি তারিখ ২০ অগ্রহায়ণ/শ্রী রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী/সম্পাদক

'সম্মত' বলে স্বাক্ষর করেন হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, মৃণালকান্তি ঘোষ, নগেন্দ্রনাথ বসু, নরেন্দ্রনাথ মিত্র, সুরেশচন্দ্র সমাজপতি, অমৃতকৃষ্ণ মল্লিক, শরৎকুমার রায়, গোবিন্দলাল দত্ত, হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, ললিতচন্দ্র মিত্র, চারুচন্দ্র ঘোষ ও হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ—এঁরা সবাই কার্যনির্বাহক সমিতির সদস্য। বিজ্ঞাপন ও সম্মতি-স্বাক্ষর-সংবলিত কাগজটি মূল খাতায় সেঁটে দেওয়া হয়েছে। মাত্র কয়েকদিন আগে ১৫ অগ্র° [রবি 1 Dec] পরিষদের ষষ্ঠ মাসিক অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়েছিল। বোঝা যায়, রবীন্দ্রনাথের নিবন্ধে এত তাড়াতাড়ি পরবর্তী অধিবেশনের আয়োজন করা হয়—পরিষৎ-পত্রিকা-র তৃতীয় সংখ্যায় তাঁর 'বাংলা কৃৎ ও তদ্ধিত' প্রবন্ধটি প্রকাশিত হওয়ার পূর্বেই তিনি বর্তমান প্রবন্ধটি পড়ে নিতে চেয়েছিলেন।

এর আগেই তিনি ২৩ অগ্র° [সোম 9 Dec] আলোচনাসমিতির প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে 'কুমারসম্ভব ও শকুন্তলা' প্রবন্ধটি পাঠ করেন। পৌষ-সংখ্যা বঙ্গদর্শন-এ প্রবন্ধটি [পৃ ৪২৩-৩৪; দ্র প্রাচীন সাহিত্য ৫।৫১০-২১] 'গত ২৩শে অগ্রহায়ণ মজুমদার লাইব্রেরীর অন্তর্গত আলোচনাসমিতির প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে পঠিত' পাদটীকা-সহ মুদ্রিত হয়। রবীন্দ্রনাথ পরেও আলোচনাসমিতির বিভিন্ন অধিবেশনে নূতন ও পুরাতন রচনা পাঠ করে শোনান।

পরের দিন ২৪ অগ্র° [মঙ্গল 10 Dec] সন্ধ্যায় তিনি বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের অষ্টম বর্ষের সপ্তম অধিবেশনে 'বাঙ্গালা ভাষা ও ব্যাকরণ' নামক প্রবন্ধ ['বাংলা ব্যাকরণ'] সত্যেন্দ্রনাথের সভাপতিত্বে পাঠ করেন। সত্তর জনের বেশি শ্রোতার মধ্যে নাটোরের মহারাজ জগদিন্দ্রনাথ, সুরেন্দ্রনাথ, প্রমথ চৌধুরী, ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়, হেমচন্দ্র মল্লিক, দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, দীনেশচন্দ্র সেন, যতীন্দ্রনাথ বসু, অক্ষয়কুমার বড়াল, চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি উপস্থিত ছিলেন। রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধটি পৌষ-সংখ্যা বঙ্গদর্শন-এ (পৃ ৪৪৫-৫৮; দ্র শব্দতত্ত্ব-পরিশিষ্ট ১২।৫৬৪-৭৮] মুদ্রিত হয়। এখানেও তিনি প্রকৃত বাংলা ব্যাকরণের পক্ষ সমর্থন করে লিখেছেন : 'প্রত্যেক ভাষার নিজের একটা ছাঁচ আছে। উপকরণ যেখান হইতেই সে সংগ্রহ করুক, নিজের ছাঁচে ঢালিয়া সে তাহাকে আপনার সুবিধামতো বানাইয়া লয়। সেই ছাঁচটাই তাহার প্রকৃতিগত, সেই ছাঁচেই তাহার পরিচয়।··· ভাষার সেই প্রকৃতিগত ছাঁচটা বাহির করাই ব্যাকরণকারের কাজ।' তথ্যের পরিবেশনে ও বিশ্লেষণে নিপুণতা ছাড়াও পরিহাসরসে সিক্ত রচনাটি সাহিত্য হিসেবেও সুপাঠ্য। প্রবন্ধপাঠের পর বলাইচাঁদ গোস্বামী, প্রমথ চৌধুরী, ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ, শরচ্চন্দ্র শাস্ত্রী, বীরেশ্বর পাঁড়ে প্রভৃতি অনেকেই আলোচনা ও বিতর্কে অংশ গ্রহণ করেন। প্রধান বিরোধী শরচ্চন্দ্র শাস্ত্রী বলেন :

রবীন্দ্র বাবু ভারতীতে প্রকাশিত আমার প্রবন্ধের প্রতিবাদ করিতে গিয়া প্রতিবাদ করেন নাই। তাঁহার উদ্দেশ্য তিরস্কার বিদ্রুপ করা, তাহা যথেষ্ট হইয়াছে। ইহার উত্তর যে হয় না তাহা নহে, তবে আমি এখন কিছু বলিব না, আমি আমার বক্তব্য লিখিয়াই বলিব। তিনিও যদি তাঁহার প্রবন্ধে গাম্ভীর্য্য রক্ষা করিয়া তাঁহার বক্তব্যগুলি বলিতেন, তবে আপত্তি ছিল না।······ রবীন্দ্র বাবুর এ সকল উপহাস অন্যায় স্থলে অন্যায়রূপে প্রযুক্ত হইয়াছে।

বীরেশ্বর পাঁড়ে বলেন : 'আজকারপ্রবন্ধে বিচারে লক্ষ্য নাই যাহা ইচ্ছা তাহাই বলিয়া যাওয়া হইতেছে..আজ যে প্রবন্ধ শুনিলাম, ইহা সত্য নির্ণয়ের বক্তৃতা নহে। আগাগোড়া বিদ্রুপ আর শ্লেষ।' আলোচনার শেষে রবীন্দ্রনাথ দীর্ঘ কৈফিয়ৎ [দ্র অষ্টম বার্ষিক কার্যবিবরণ ১৩০৮।৩।৷০-৩৷।ল০; গ্রন্থপরিচয় ১২।৬৩৩-৩৫] দিয়ে বলেন : 'আমি যাহা বলিয়াছি তাহা যে অপরিবর্তনীয়, তাহাই যে সর্বথা গ্রাহ্য, এ-কথা যেন কেহ মনে না করেন। আমি উপকরণ সংগ্রহ করিয়া দিতেছি, আপনারা দেশের পণ্ডিতবর্গ তাহার ব্যবহার করুন, বাংলাব্যাকরণ কিরূপ হইবে তাহা স্থির করুন।'

২৮ পৌষ [রবি 12 Jan 1902]পরিষদের অষ্টম মাসিক অধিবেশনে শরচ্চন্দ্র শাস্ত্রী 'ব্যাকরণ ও বাঙ্গালা ভাষা' [দ্র ভারতী, ফাল্গুন। ৪৬১-৯১] প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথের বক্তব্যের প্রত্যুত্তর দেন। রবীন্দ্রনাথ অবশ্য সেই সভায় উপস্থিত ছিলেন না, তিনি তখন শান্তিনিকেতনে। এই প্রবন্ধ সম্পর্কে ১৬ ফাল্গুন [শুক্র 28 Feb] তিনি দীনেশচন্দ্র সেনকে লেখেন :

পাছে কলহের দুষ্ট সরস্বতী ঘাড়ে চাপিয়া বসে সেইজন্য শরৎ শাস্ত্রীর লেখা আমি পড়িই নাই। তাহা ছাড়া আমি জানি হীরেন্দ্রবাবু যখন গাণ্ডীব ধরিয়াছেন তখন পরাজয়ের আশঙ্কামাত্র নাই। যুদ্ধক্ষেত্র হইতে দূরে বসিয়া হীরেন্দ্রবাবুর প্রতি আমার অন্তরের কৃতজ্ঞতা ধাবিত হইতেছে। তিনি যেরূপ অকাট্য যুক্তি ও অসাধারণ নৈপুণ্যের সহিত বাংলা ব্যাকরণের পক্ষ সমর্থন করিতে পারিবেন আমি সেরূপ কখনই পারিব না এই জন্য তাঁহাকে অগ্রবর্তী করিয়া আমি নেপথ্যে সরিয়া আসিয়া অতি উত্তম কাজ করিয়াছি।[১০৮ক]

২৫ অগ্র° [বুধ 11 Dec] রবীন্দ্রনাথ যান বালিগঞ্জে, ২৭ অগ্র° [শুক্র 13 Dec] 'শ্রীযুক্ত রবীন্দ্র বাবু মহাশয়ের বোলপুর বিদ্যালয়ের কার্য্যের জন্য গোলপুকুর' যাতায়াতের হিসাব পাওয়া যায়—'শ্রীযুক্ত রবীন্দ্র বাবুর দ্রব্যাদি লইয়া ২৭ অগ্রহায়ণ হাবড়ার ষ্টেসনে যাওয়ার গাড়ীভাড়া' থেকে জানা যায় তিনি এইদিনই শান্তিনিকেতনে প্রত্যাবর্তন করেছেন।

পৌষ-সংখ্যা বঙ্গদর্শন-এ রবীন্দ্রনাথের তিনটি রচনা মুদ্রিত হয় :

৩৯৭-৪০৭ 'চোখের বালি' ২৬-২৮ দ্র চোখের বালি ৩।৩৭৬-৮৯ [২৫-২৭]

৪২৩-৩৪ 'কুমারসম্ভব ও শকুন্তলা' দ্র প্রাচীন সাহিত্য ৫।৫১০-২১

৪৪৫-৫৮ 'বাংলা ব্যাকরণ' দ্র শব্দতত্ত্ব-পরিশিষ্ট ১২।৫৬৪-৭৮

নৈবেদ্য রচনার সময় থেকে রবীন্দ্রনাথ প্রাচীন ভারতের অধ্যাত্ম ও সমাজজীবনকে যে আদর্শায়িত দৃষ্টিতে ব্যাখ্যা করছিলেন, 'কুমারসম্ভব ও শকুন্তলা' প্রবন্ধে তা রসবিচারে প্রযুক্ত হয়েছে। কিন্তু 'এখানে তত্ত্বের সঙ্গে রসের কোন বিরোধ নাই, বরং তত্ত্ব রসের উৎসেরই সন্ধান দিয়াছে।'[১০৯] কালিদাস একান্তই সৌন্দর্যসম্ভোগের কবি এই লোকপ্রচলিত মতের বিরোধিতা করে নীতি ও কল্যাণবোধই তাঁর কাব্যনাটকের ভিত্তিভূমি এই তত্ত্ব নিপুণ রসবিশ্লেষণের সাহায্যে প্রতিপন্ন করেছেন রবীন্দ্রনাথ। 'যে প্রেমের কোনো বন্ধন নাই, কোনো নিয়ম নাই, যাহা অকস্মাৎ নরনারীকে অভিভূত করিয়া সংযমদুর্গের ভগ্নপ্রাকারের উপর আপনার জয়ধ্বজা নিখাত করে, কালিদাস তাহার শক্তি স্বীকার করিয়াছেন, কিন্তু তাহার কাছে আত্মসমর্পণ করেন নাই। তিনি দেখাইয়াছেন, যে অন্ধ প্রেমসম্ভোগ আমাদিগকে স্বাধিকারপ্রমত্ত করে তাহা ভর্তৃশাপের দ্বারা খণ্ডিত, ঋষিশাপের দ্বারা প্রতিহত ও দেবরোষের দ্বারা ভস্মসাৎ হইয়া থাকে।......যে উন্মত্ত প্রেম প্রিয়জনকে ছাড়া আর-সমস্তই বিস্মৃত হয় তাহা সমস্ত বিশ্বনীতিকে আপনার প্রতিকূল করিয়া তোলে, সেইজন্যই সে প্রেম অল্পদিনের মধ্যেই দুর্ভর হইয়া উঠে, সকলের বিরুদ্ধে আপনাকে আপনি সে আর বহন করিতে পারে না। যে আত্মসংবৃত প্রেম সমস্ত সংসারের অনুকূল, যাহা আপনার চারি দিকের ছোটো এবং বড়ো আত্মীয় এবং পর, কাহাকেও ভোলে না, যাহা প্রিয়জনকে কেন্দ্রস্থলে রাখিয়া বিশ্বপরিধির মধ্যে নিজের মঙ্গলমাধুর্য বিকীর্ণ করে, তাহার ধ্রুবত্বে দেবে মানবে কেহ আঘাত করে না, আঘাত করিলেও সে তাহাতে বিচলিত হয় না।' মেঘদূত সম্পর্কে আলোচনা-প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ কুমারসম্ভব ও শকুন্তলা বিষয়ে লেখার ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন, এখানে তিনি তিনটি গ্রন্থকেই একসূত্রে গ্রথিত করেছেন।

৭ পৌষ [রবি 22 Dec] শান্তিনিকেতনে একাদশ সাম্বৎসরিক উৎসবের প্রাতঃকালীন উপাসনার পর শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্যাশ্রমের উদ্বোধন হয়। ব্রহ্মবান্ধব, রেবাচাঁদ প্রভৃতি শিক্ষকগণের সঙ্গে তাঁদের কলকাতার ছাত্রগণ ও অন্যান্য অতিথি এই উপলক্ষে শান্তিনিকেতনে যান, তাঁদের জন্য ৪ পৌষ গাড়ি রিজার্ভ কার হিসাব পাওয়া যায়। সত্যপ্রসাদ, দিনেন্দ্রনাথ ও গায়ক বিহারীলাল চট্টোপাধ্যায় যে সেখানে গিয়েছিলেন, ক্যাশবহিতেই সেই খবর রয়েছে। 'বীরভূমের ম্যাজিস্ট্রেটের আগমন উপলক্ষে ব্যায় ১৯৪॥ল০'—এই বিপুল ব্যয় ব্রহ্মচর্যাশ্রমের অনাড়ম্বর জীবনযাত্রার আদর্শের সম্পূর্ণ বিরোধী। একাদশ সাম্বৎসরিক উপলক্ষে মোট ব্যয়ের পরিমাণ ৩০৬০॥০!

হেমচন্দ্র বিদ্যারত্ন অসুস্থতার জন্য এবারের উৎসবে যোগ দিতে পারেননি; তিনি জনৈক প্রত্যক্ষদর্শীর কাছে শুনে যে প্রতিবেদন রচনা করেন, তাতে লেখেন : 'আমরা [মেলার] এই জনতা ভেদ করিয়া ব্রহ্মবিদ্যালয়ে প্রবেশ করিলাম। তথায় অতি অপূর্ব্ব দৃশ্য। কতকগুলি বালক ক্ষৌম বস্ত্র পরিধান করিয়া বিনীত ভাবে উপবিষ্ট হইয়াছে।···দেখিলাম সর্ব্ব প্রথমে ভক্তিভাজন শ্রীযুক্ত বাবু সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর বিদ্যালয় সম্বন্ধে কিছু বলিলেন। পরে শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মানবকদিগকে নিম্নোক্ত প্রকারে ব্রহ্মচর্যে দীক্ষিত করিলেন।' এরপর

বৈদিক মন্ত্র সহযোগে দীক্ষানুষ্ঠানটি বিবৃত হয়েছে।[১১০] দীক্ষানুষ্ঠানের পর রবীন্দ্রনাথ ছাত্রদের উপদেশ দেন।[১১১] দীক্ষায় তিনি বলেছিলেন, 'শ্রেয়ান্ বস্যসোহসানি স্বাহা' 'আমি যেন ধনবান্ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর হই'—উপদেশেও তিনি সত্যের তপস্যায় শ্রেষ্ঠ ও বহিরঙ্গে দীন ব্রাহ্মণের মহিমা এবং বর্ণাশ্রম ধর্মে স্থিত সকল সম্প্রদায়ের জীবনযাত্রার রূপটি সহজ ভাষায় বালকদের বুঝিয়ে বললেন :

'সেই তখনকার ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্যেরা যে-শিক্ষা যে-ব্রত অবলম্বন করে বড়ো হয়ে উঠেছিলেন, বীর হয়ে উঠেছিলেন, সেই শিক্ষা সেই ব্রত গ্রহণ করবার জন্যেই তোমাদের এই নির্জন আশ্রমের মধ্যে আমি আহ্বান করেছি। তোমরা আমার কাছে এসেছ—আমি সেই প্রাচীন ঋষিদের সত্যবাক্য তাঁদের উজ্জ্বল চরিত মনের মধ্যে সর্বদা ধারণ করে রেখে তোমাদের সেই মহাপুরুষদের পথে চালনা করতে চেষ্টা করব—আমাদের ব্রতপতি ঈশ্বর আমাকে সেই বল সেই ক্ষমতা দান করুন। যদি আমাদের চেষ্টা সফল হয় তবে তোমরা প্রত্যেকে বীর পুরুষ হয়ে উঠবে—তোমরা ভয়ে কাতর হবে না, দুঃখে বিচলিত হবে , ক্ষতিতে ম্রিয়মাণ হবে না, ধনের গর্বে স্ফীত হবে না; মৃত্যুকে গ্রাহ্য করবে না, সত্যকে জানতে চাইবে, মিথ্যাকে মন থেকে কাজ থেকে দূর করে দেবে, সর্বদা জগতের সকল স্থানেই মনে এবং বাইরে এক ঈশ্বর আছেন এইটে নিশ্চয় জেনে আনন্দমনে সকল দুষ্কর্ম থেকে নিবৃত্ত থাকবে।···তা হলে তোমাদের দ্বারা ভারতবর্ষ আবার উজ্জ্বল হয়ে উঠবে—তোমরা যেখানে থাকবে সেইখানেই মঙ্গল হবে, তোমরা সকলের ভালো করবে এবং তোমাদের দেখে সকলে ভালো হবে।

সত্যব্রত, অভয়ব্রত, পুণ্যব্রত, মঙ্গলব্রত এবং সর্বোপরি ব্রহ্মব্রতে ব্রহ্মচারীদের দীক্ষিত করে গায়ত্রীমন্ত্রের দ্বারা ঈশ্বরকে প্রত্যহ অন্তত একবার চিন্তা করার উপদেশ দিয়ে 'বক্তা গায়ত্রী মন্ত্র ব্যাখ্যা করিয়া ছাত্রদিগকে বুঝাইয়া দিলেন।'

সায়ংকালীন উপাসনায় রবীন্দ্রনাথ, চিন্তামণি চট্টোপাধ্যায় ও শম্ভুনাথ গড়গড়ি বেদি গ্রহণ করেন। চিন্তামণিবাবুর উদ্বোধনের পর রবীন্দ্রনাথ যে 'উপদেশ' দেন 'তাহা সময়ান্তরে প্রকাশিত হইবে' বলে তত্ত্ববোধিনী-তে জানানো হয়। আমাদের অনুমান, মাঘোৎসবের প্রাতঃকালীন উপাসনায় তিনি 'প্রাচীন ভারতের "এক"'-শীর্ষক যে প্রবন্ধ [দ্র তত্ত্ব°, ফাল্গুন। ১৫৬-৬২; ধর্ম ১৩।৩৬৪-৭১] পাঠ করেন, এটি সেই একই প্রবন্ধ। ১৩০৬ ও ১৩০৭ বঙ্গাব্দেও তিনি এইরূপই করেছিলেন।

শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্যাশ্রমের প্রথম ছাত্র কারা বা কয়জন তা নিয়ে সংশয় আছে। প্রথম ছাত্রদের একজন রথীন্দ্রনাথ [বয়স ১৩ বছর] লিখেছেন : 'ছাত্র জোটানো বাবার এক সমস্যা হল।···বাবা কলকাতায় গিয়ে ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় মহাশয়কে ছাত্র সংগ্রহ করে দিতে অনুরোধ জানালেন। তিনি তাঁর পরিচিত পরিবার থেকে চারটি ছেলেকে পাঠিয়ে দিলেন। এইটুকু শুধু মনে পড়ে, তাদের মধ্যে দুজন কলকাতার ব্যবসায়ী নান পরিবারের ছেলে। আমাকে ধরলে পাঁচজন হয়।'[১১২] রবীন্দ্রজীবনী-কার তালিকা দিয়েছেন : '১. গৌরগোবিন্দ গুপ্ত (পরে রংপুর কলেজের দর্শনশাস্ত্রের অধ্যাপক) ২. অশোককুমার গুপ্ত (ঐ পরিবারেরই সন্তান) ৩. যোগানন্দ মিত্র (দর্শনশাস্ত্রের অধ্যাপক অম্বিকাচরণ মিত্রের···ভ্রাতুষ্পুত্র) ৪. সুধীরচন্দ্র নান (কলিকাতার ব্যবসায়ী কার্তিকচন্দ্র নানের পুত্র) ৫. গিরীন ভট্টাচার্য ৬. রাজেন্দ্রনাথ দে (সুধীরচন্দ্র নানের পিসতুতো ভাই) ৭. প্রেমকুমার গুপ্ত (অশোককুমার গুপ্তের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা) ৮. রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর ৯. শমীন্দ্রনাথ ঠাকুর ১০. সন্তোষচন্দ্র মজুমদার (কয়েকদিন পরে আসেন)।'[১১৩] গৌরগোবিন্দ গুপ্তের একটি পত্র-প্রবন্ধ [?] থেকে তথ্য সংগ্রহ করে দীপ্তিময় রায় যে তালিকা দিয়েছেন, তাতে আছেন : ১. গৌরগোবিন্দ গুপ্ত ২. অশোককৃষ্ণ গুপ্ত ৩. গিরিন ভট্টাচার্য (বঙ্গবাসী পত্রের সম্পাদক যোগেন্দ্রনাথ বসুর গুরুপুত্র) ৪. যোগানন্দ মিত্র ৫. সুধীরচন্দ্র নান ৬. রথীন্দ্রনাথ ৭. শমীন্দ্রনাথ[১১৪]—এই তালিকাও রথীন্দ্রনাথ-কথিত পাঁচজনের হিসাবে স্থূলতর। তবে এঁদের মধ্যে রথীন্দ্রনাথ, গৌরগোবিন্দ ও সুধীরচন্দ্র যে প্রথম পাঁচজনের অন্যতম ছিলেন এ-নিয়ে দ্বিমত নেই।

দীপ্তিময় রায় জানিয়েছেন, রাজেন্দ্রনাথ দে ও প্রেমকুমার গুপ্ত ব্রহ্মবান্ধবের চেষ্টায় অল্পদিনের মধ্যেই ছাত্রগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত হন। অশোককুমার ও অশোককৃষ্ণ সম্ভবত একই ব্যক্তি। হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন : 'রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর, গৌরগোবিন্দ গুপ্ত, প্রেমকুমার গুপ্ত, অশোককুমার গুপ্ত, সুধীরচন্দ্র নান—এই পাঁচ জন তখন আশ্রমের ছাত্র।'[১১৪ক] আমাদের মনে হয়, এই তালিকাটিই সঠিক।

শিক্ষকদের মধ্যে রেবাচাঁদ ও শিবধন বিদ্যার্ণবকে নিয়ে কোনো সংশয় নেই। ১০ মাঘ 'ব° জগদানন্দ রায় দং উহার অগ্রহায়ণ মাহার বেতন শোধ…৫০্' হিসাব থেকে জানা যায়, অগ্রহায়ণের গোড়া থেকেই গণিত ও বিজ্ঞান-শিক্ষক জগদানন্দ রায় শান্তিনিকেতনে গিয়ে রথীন্দ্রনাথের শিক্ষার দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন। ২২ পৌষ [সোম 6 Jan 1902] 'স্কুলের খরচ—শশীভূষণ রায়চৌধুরীকে অগ্রীম বেতন ২৫্' হিসাব থেকে একজন নূতন শিক্ষকের নিয়োগের সংবাদ জানা যায়। দীপ্তিময় রায় লিখেছেন : 'পরবর্তীকালে গৌরগোবিন্দ গুপ্ত বলেছেন যে প্রথমদিকে বিদ্যালয়ে তাঁদের শিক্ষকমণ্ডলীর মধ্যে ছিলেন ব্রহ্মচারী অণিমানন্দ (রেবাচাঁদ), শিবধন বিদ্যার্ণব, মনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়, শশিভূষণ রায়চৌধুরী, সুবোধ মজুমদার ও জগদানন্দ রায় প্রভৃতি'[১১৫]—এঁদের মধ্যে মনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় ও সুবোধচন্দ্র মজুমদার অপেক্ষাকৃত পরবর্তী কালে এসেছিলেন।

ব্রহ্মবান্ধব নিয়মিত শিক্ষাকার্যে অংশগ্রহণ করেননি। তিনি মাঝে মাঝে কলকাতা থেকে এসে নিয়মশৃঙ্খলা পর্যবেক্ষণ করে রবীন্দ্রনাথকে পরামর্শাদি দিতেন। রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন : 'শান্তিনিকেতন আশ্রমে বিদ্যায়তন প্রতিষ্ঠায় তাঁকেই আমার প্রথম সহযোগী পাই। এই উপলক্ষ্যে কতদিন আশ্রমের সংলগ্ন গ্রামপথে পদচারণ করতে করতে তিনি আমার সঙ্গে আলোচনাকালে যে-সকল দুরূহ তত্ত্বের গ্রন্থিমোচন করতেন আজও তা মনে করে বিস্মিত হই।'[১১৬] অসাধারণ দৈহিক শক্তির অধিকারী ছিলেন ব্রহ্মবান্ধব, তাল-ঠোকা এক পাঞ্জাবি পালোয়ানকে এই বাঙালি সন্ন্যাসী কুস্তিতে পরাজিত করেছিলেন, সেকথা গর্বের সঙ্গে উল্লেখ করেছেন রথীন্দ্রনাথ।[১১৭] তিনিই রবীন্দ্রনাথকে আশ্রমপ্রধান হিসেবে 'গুরুদেব' আখ্যা দেন, যা ধীরে ধীরে আশ্রমের সঙ্গে সম্পর্কিত ও অসম্পর্কিত নরনারীর মুখে মুখে বিস্তৃতি লাভ করায় অনেক স্পর্শকাতর রবীন্দ্র-সমালোচককে পীড়িত করেছে। প্রাক্তনদের স্মৃতিকথায় অন্যান্য শিক্ষক 'মশায়' নামে অভিহিত।

জগদানন্দ রায় শিলাইদহের জমিদারি সেরেস্তায় কাজ করতেন, তাঁর সাংসারিক অভাবমোচনের জন্য রবীন্দ্রনাথই তাঁকে এই পদে নিযুক্ত করেন। কিন্তু তাঁকে এই অযোগ্য আসনে বন্দী করে রাখতে আমার মনে বেদনা দিতে লাগল। আমি তাঁকে শান্তিনিকেতনে অধ্যাপনার কাজে আমন্ত্রণ করলুম। যদিও এই কার্যে আয়ের পরিমাণ অল্প ছিল তবুও আনন্দের পরিমাণ তাঁর পক্ষে ছিল প্রচুর। তার কারণ শিক্ষাদানে তাঁর স্বভাবের ছিল অকৃত্রিম তৃপ্তি। ছাত্রদের কাছে সর্বতোভাবে আত্মদানে তাঁর একটুও কৃপণতা ছিল না। সুগভীর করুণা ছিল বালকদের প্রতি। শাস্তি উপলক্ষেও তাদের প্রতি লেশমাত্র নির্মমতা তিনি সহ্য করতে পারতেন না।'[১১৮] রথীন্দ্রনাথ তাঁর 'গল্পচ্ছলে সরস করে বিজ্ঞানের কথা বলার আশ্চর্য ক্ষমতা'র উল্লেখ করেছেন।

রেবাচাঁদ সম্পর্কে রথীন্দ্রনাথ লিখেছেন : 'রেবাচাঁদ মাস্টারমশাই নিতান্ত সাধুপ্রকৃতির ছিলেন, ইংরেজি খুব ভালো পড়াতে পারতেন, কিন্তু কড়া নিয়ম পালনের পক্ষপাতী ছিলেন। তিনি ভালো ক্রিকেট খেলোয়াড় ছিলেন, ক্রিকেট খেলার নিয়ম তিনি সর্বত্র সব কাজে পালন করাতে চাইতেন। বাবা ঐরকম কঠোরতা পছন্দ করতেন না।'[১১৯]

ব্রহ্মচর্যাশ্রমের উপকরণ-বিরল জীবনযাত্রা এমনিতেই কঠোর ছিল। বলেন্দ্রনাথ-প্রস্তাবিত ব্রহ্মবিদ্যালয়ের বাড়িটিই তখন একমাত্র সম্বল। একতলাটিকে তিন ভাগে বিভক্ত করে এক ভাগ শিক্ষকদের বাসস্থান, এক ভাগ পাঠচর্চা ও আর এক ভাগ উভয় কার্যেই ব্যবহৃত হত। ভোর সওয়া পাঁচটায় ঘুম থেকে উঠে ছাত্রেরা ঘর ঝাঁট দিয়ে, প্রাতঃকৃত্য [পাকা পায়খানা না থাকায় তারা 'মাঠে' যেত, সর্ববিধ সুবিধা থাকা সত্ত্বেও ঐতিহ্যবাহী পাঠভবনের বর্তমান ছাত্রদলও কৃত্যটিকে "মাঠ করা' নামে অভিহিত করে] করে ভুবনডাঙার বাঁধে যেত স্নান করতে। ছাত্রদের মধ্যে ব্রাহ্মণদের জন্য সাদা, বৈদ্য ও কায়স্থদের জন্য লাল ও বৈশ্যদের জন্য হলুদ আলখাল্লা জাতীয় পোশাক নির্ধারিত ছিল। অনতিপরে বর্ণভেদ ঘুচিয়ে সকলের জন্যই গৈরিক আলখাল্লা নির্ধারিত হয়, রথীন্দ্রনাথ লিখেছেন : "গৈরিক রঙের আলখাল্লা সর্বদাই পরে থাকতে হত, তাতে আমরা খুশি ছিলুম—আলখাল্লার নীচে যেমন ছেঁড়া বা নোংরা পোশাক থাক-না-কেন, বাইরে থেকে ধরতে পারা যেত না।'[১২০] পোশাক পরে ছাত্রেরা এক-একটি গাছের নীচে সংস্কৃত মন্ত্র সহযোগে উপাসনা করে হালুয়া-জাতীয় খাবার দিয়ে প্রাতরাশ সারত। আধঘণ্টা মাটি কুপিয়ে ক্লাশ শুরু হত ছাত্র ও শিক্ষকদের সমবেত উপাসনার পর। দশটায় পড়া শেষ হলে পছন্দমতো খেলা, হারমোনিয়ম বাজিয়ে গান করা বা গল্পের বই পড়ার পর সাড়ে এগারোটায় নিরামিষ মধ্যাহ্নভোজন—ব্রাহ্মণ বালকেরা বসত স্বতন্ত্র শ্রেণীতে। সাড়ে বারোটায় আর-এক দফা ক্লাশ শুরু হয়ে তিনটের সময় পনেরো মিনিট বিশ্রাম দিয়ে শেষ হত সাড়ে চারটেয়। এরপর খেলাধুলো, রথীন্দ্রনাথ লিখেছেন : 'ফুটবল খেলতে সবচেয়ে কম খরচ, তাই অন্য কোনো খেলার সরঞ্জাম ছিল না। ফুটবল খেলতেই আমাদের নেশা জন্মে গিয়েছিল। একবার নাটোরের মহারাজা আশ্রমে বেড়াতে এসে নানাপ্রকার খেলার প্রচুর সরঞ্জাম দিয়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু তৎসত্ত্বেও ফুটবল কেউ ছাড়তে চাইল না।'[১২১] সাড়ে ছ'টায় পুনরায় উপাসনা হত, সন্ধ্যাটি কাটত গানে-গল্পে ও রবীন্দ্রনাথ কর্তৃক উদ্ভাবিত নানাধরনের ক্রীড়া-বিনোদনে। সান্ধ্যভোজনের পর রাত্রি ন'টায় শয্যাগ্রহণ।

তপোবনের আদর্শে প্রতিষ্ঠিত এই বিদ্যালয়ে প্রথম দিকে শিক্ষা ও থাকা-খাওয়ার জন্য ছাত্রদের কাছ থেকে কোনো অর্থ নেওয়া হত না। শান্তিনিকেতন ট্রাস্টডীডে বিদ্যালয়ের জন্য অর্থ বরাদ্দ ছিল, সেই হিসাবে প্রতি মাসে ২০০ টাকা ব্রহ্মচর্যাশ্রমকে দেওয়া হয়েছে—গৃহনির্মাণ ইত্যাদি বাবদও মহর্ষির দাক্ষিণ্যে বিভিন্ন সময়ে কম-বেশি অর্থব্যয়ের দৃষ্টান্ত বিরল নয়। কিন্তু এর অতিরিক্ত সমস্ত খরচ জোগাতে হয়েছে রবীন্দ্রনাথকে, যাঁর নিজের সম্বল ছিল যৎসামান্য। রথীন্দ্রনাথ তাঁর মায়ের সম্বন্ধে লিখেছেন : 'যখনই বিশেষ প্রয়োজন হয়েছে, নিজের অলংকার একে একে বিক্রি করে বাবাকে টাকা দিয়েছেন। শেষপর্যন্ত হাতে সামান্য কয়েকগাছা চুড়ি ও গলায় একটি চেন ছাড়া তাঁর কোনো গয়না অবশিষ্ট ছিল না। মা পেয়েছিলেন প্রচুর, বিবাহের যৌতুক ছাড়াও শাশুড়ির পুরানো আমলের ভারী গয়না ছিল অনেক। শান্তিনিকেতনের বিদ্যালয়ের খরচ জোগাতে সব অন্তর্ধান হল। বাবার নিজের যা-কিছু মূল্যবান সম্পত্তি ছিল তা আগেই তিনি বেচে দিয়েছিলেন।'[১২২] বিয়েতে যৌতুক-পাওয়া সোনার ঘড়ি এই কারণেই তিনি শরৎকুমারী চৌধুরানীকে বিক্রি করেছিলেন, সেইটিই শরকুমারী রথীন্দ্রনাথের বিবাহে যৌতুক আকারে ফিরিয়ে দেন—রথীন্দ্রনাথই সেকথা আমাদের জানিয়েছেন।[১২৩] শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্যাশ্রমের হিসাবের খাতাগুলি পাওয়া গেলে এই কৃচ্ছ্রসাধনের ইতিহাসটি জীবন্ত হয়ে উঠতে পারত, কিন্তু যে-কোনো কারণেই হোক, আজ সেগুলির আর অস্তিত্ব নেই।

শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্যাশ্রম উদ্বোধনের পরের দিন ৮ পৌষ [সোম 23 Dec] রবীন্দ্রনাথ কলকাতায় 'আসেন। এই দিনই তিনি বিডন স্ট্রীট ও কাঁসারিপাড়া' যাতায়াত করেন। 1896-এর পর এই বছর কলকাতায় কংগ্রেসের সপ্তদশ বার্ষিক অধিবেশন হয় 26-28 Dec (বৃহ-শনি ১১-১৩ পৌষ] বিডন স্কোয়ারে। 13 Jul [শনি ২৯ আষাঢ়] অ্যালবার্ট হলে মতিলাল ঘোষের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত একটি জনসভায় নাটোরের মহারাজা জগদিন্দ্রনাথকে সভাপতি করে যে অভ্যর্থনা সমিতি গঠিত হয় ঠাকুর পরিবারের অনেকের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথও তার সদস্য ছিলেন।[১২৪] কংগ্রেসের বর্তমান বৎসরের সভাপতি দীনশা ইদুলজি ওয়াচা [Dinshaw Edulji wacha, 1844-1936] ৯ পৌষ [মঙ্গল 24 Dec] সকাল সাড়ে ন'টার সময়ে কলকাতায় পৌঁছন। তাঁকে স্বাগত জানানোর উদ্দেশ্যে অভ্যর্থনা সমিতির প্রত্যেক সদস্যকে হাওড়া স্টেশনে উপস্থিত থাকার জন্য দৈনিক পত্রিকাগুলিতে জরুরী বিজ্ঞপ্তি ['Urgent Notice'] প্রচার করা হয়। তাছাড়া এদিন সন্ধ্যায় বিডন স্কোয়ারে কংগ্রেস মণ্ডপের পাশে বিশাল ভারতীয় শিল্পপ্রদর্শনীর উদ্বোধন হয়। এই সব অনুষ্ঠানে যোগ দেবার জন্যই রবীন্দ্রনাথ কলকাতায় চলে আসেন।

সরলা দেবীর লেখা 'অতীত গৌরব বাহিনী মম বাণী/গাও আজি হিন্দুস্থান' গানটি দিয়ে 26 Dec [বৃহ ১১ পৌষ] কংগ্রেসের সপ্তদশ বার্ষিক অধিবেশনের উদ্বোধন হয়। এবারে সংগীত-পরিচালনার দায়িত্ব নিয়েছিল জ্যোতিরিন্দ্রনাথের নেতৃত্বে ভারত-সংগীত-সমাজ।* সরলা দেবী তাঁর আত্মকথায় লিখেছেন : 'রবীন্দ্রনাথ নিজে এর সমজদার হয়ে গাওয়ানর ভার নিলেন'[১২৫]—এই তথ্য কতখানি গ্রহণযোগ্য আমাদের জানা নেই। তৃতীয় দিনের অধিবেশনের সূচনায় সরলা দেবীর নেতৃত্বে ৫৬ জন বিভিন্ন দেশীয় গায়কের দ্বারা গানটি পুনরায় গীত হয়।

১৪ পৌষ [রবি 29 Dec] সন্ধ্যায় বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের উদ্যোগে অ্যালবার্ট হলে কংগ্রেস উপলক্ষে আগত প্রতিনিধিদের মনোরঞ্জনের উদ্দেশ্যে একটি সভার আয়োজন করা হয়। বহু বিশিষ্ট ব্যক্তির উপস্থিতিতে গান, আবৃত্তি, নাট্যাভিনয় ইত্যাদির আয়োজন ছিল সুপ্রচুর [দ্র প্রাসঙ্গিক তথ্য : ৩]। এরই মধ্যে সভার শুরুতে ও সমাপ্তিতে রবীন্দ্রনাথের ভূমিকা ছিল মুখ্য। অমৃতবাজার পত্রিকা [2 Jan 1902: ১৯ পৌষ] লেখে : The proceedings commenced with the concert under Babu Nani Lal Neogi, and a song from the renowned poet and singer, Babu Rabindra Nath Tagore.' অনুষ্ঠান-শেষে রবীন্দ্রনাথ দুটি গান পরিবেশন করেন : 'Lastly Babu Rabindra Nath Tagore sang the famous national anthem *Bande Mataram* and another of his own composition which sent a thrill of sensation through all who heard them.' উদ্বোধনী সংগীতটিও সম্ভবত রবীন্দ্রনাথের লেখা দেশপ্রেমমূলক গান, কিন্তু কোন্ দুটি স্বরচিত গান তিনি পরিবেশন করেছিলেন বিবরণে তার উল্লেখ নেই—তাঁর কণ্ঠে 'বন্দেমাতরম্' গান গাওয়ার কথা সংবাদপত্রের বিবরণে আমরা এই প্রথম উল্লেখিত হতে দেখছি।

কলকাতায় এলেই বিভিন্ন প্রয়োজনে রবীন্দ্রনাথকে নানা জায়গায় যাতায়াত করতে হয়, এবারেও তার ব্যতিক্রম হয়নি। তিনি ১০ পৌষ [বুধ 25 Dec] বালিগঞ্জ, ১৪ পৌষ [রবি 29 Dec] 'পটলডাঙ্গা' ও বালিগঞ্জ, ১৫ পৌষ বিডন স্ট্রীট এবং ১৭ পৌষ ক্রীক রো যাতায়াত করেন। ১৭ পৌষ [বুধ 1 Jan 1902] ইংরেজি নববর্ষের দিন তিনি শান্তিনিকেতনে ফিরে যান।

সেখানে গিয়ে বিদ্যালয়ের কাজের সঙ্গে তাঁকে মাঘঘাৎসবের জন্য গান রচনাতেও ব্যাপৃত হতে হয়েছে। ২৬ পৌষ [শুক্র 10 Jan] সরকারী ক্যাশবহির হিসাবে দেখি : '১১ মাঘের হিসাবে দং কাঙ্গালীচরণ সেন বোলপুর রবীন্দ্রবাবুর নিকট যাতায়াতের ....৫/বলাই মান্না গায়কের আসাযাওয়ার গাড়ীভাড়া:·····৫'—এই গায়কদ্বয় নিশ্চয়ই মাঘোৎসবের জন্য নবরচিত গানগুলি শিখে আসার জন্য সেখানে গিয়েছিলেন। সরলা দেবী এবার গান শেখানো ও রিহার্সাল দেওয়ার দায়িত্বে ছিলেন—১, ৪, ৫ ও ৬ মাঘ '১১ মাঘের হিসাবে' তাঁর বালিগঞ্জ থেকে জোড়াসাঁকো যাতায়াতের হিসাব পাওয়া যায়। তা সত্ত্বেও সম্ভবত রবীন্দ্রনাথের উপস্থিতির প্রয়োজনে ৫ ও ৬ মাঘ তাঁকে উপর্যুপরি দুটি টেলিগ্রাম করা হয়--তিনি কলকাতায় আসেন ৭ মাঘ [সোম 20 Jan]। মাঘোৎসবে গীত এই গানগুলি হল :

[১] রামকেলি-তেওরা। মোরে ডাকি লয়ে যাও মুক্তদ্বারে দ্র তত্ত্ব°, ফাল্গুন। ১৬২-৬৩; গীত ১।১৫৩; স্বর ২৭।

[২] ভৈরবী-একতালা। বল দাও মোরে বল দাও, প্রাণে দাও মোর শকতি দ্র তত্ত্ব°, ফাল্গুন। ১৬৩; গীত ১। ৫১; স্বর ২৭। সত্যরঞ্জন বসু তাঁর 'ত্রিপুরায় রবীন্দ্র-স্মৃতি' প্রবন্ধে ব্রজেন্দ্রকিশোর দেববর্মার স্মৃতিচারণ অনুসারে লিখেছেন যে, রবীন্দ্রনাথ কার্তিক মাসের মাঝামাঝি ত্রিপুরায় অবস্থানকালে 'নিমীলিত নেত্রে অর্গ্যানের সুরে সুর মিলাইয়া' এই গানটি গেয়েছিলেন।[১২৬] সুতরাং স্মৃতি ব্রজেন্দ্রকিশোরকে প্রতারণা না করলে সিদ্ধান্ত করতে হয় যে, গানটি উক্ত সময়ে বা তার পূর্বে রচিত হয়েছিল।

এই দুটি গান আদি ব্রাহ্মসমাজগৃহে প্রাতঃকালীন উপাসনায় গীত হয়েছিল; বাকি গানগুলি গাওয়া হয় সায়ংকালীন উপাসনায় মহর্ষিভবনে :

[৩] ভূপনারায়ণ-একতালা। মোরা সত্যের পরে মন দ্র তত্ত্ব°, ফাল্গুন। ১৬৩-৬৪; গীত ২।৫৬১-৬২; স্বর ৫৫। গানটি 'ব্রহ্মচর্যাশ্রম বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাকালে রচিত ও গীত' হয় বলে অনুমিত হয়েছে।[১২৭]

[৪] কেদারা-তেওরা। আমার বিচার তুমি কর দ্র তত্ত্ব°, ফাল্গুন। ১৬৯; গীত ১।৫১-৫২; স্বর ২৬। পূরবী-একতালা সুর-তালে রচিত গানটির একটি অন্য রূপ 'দিনের বিচার কর' [দ্র গীত ২।৬১৫] ১৩০৬ বঙ্গাব্দের মাঘঘাৎসবে গীত হয়। ঈষৎ ভিন্ন পাঠে বর্ত্তমান গানটি 'নিবেদন' শিরোনামে মাঘ-ফাল্গুন [১।১-২]-সংখ্যা সমালোচনী-তে [পৃ ২] মুদ্রিত হয়েছিল। তত্ত্ববোধিনীর পাঠটিই গীত-রূপে প্রচলিত।

[৫] মল্লার-কাওয়ালি। সফল কর হে প্রভু আজি সভা দ্র তত্ত্ব°, ফাল্গুন। ১৬৯; গীত ১।১২৮; স্বর ৪।

[৬] সিন্ধু বারোয়াঁ-ঝাঁপতাল। আমি কি বলে করিব নিবেদন দ্র তত্ত্ব°, ফাল্গুন। ১৬৯; গীত ১।১৮৮-৮৯; স্বর ২২। অগ্র°-সংখ্যা বঙ্গদর্শন-এ 'বশীকরণ' নাটিকায় কাফি-ঝাঁপতাল সুর-তাল নির্দেশ-সহ [পৃ ৩৮৮-৮৯] ইতিপূর্বেই প্রকাশিত।

[৭] পরজ-কাওয়ালি। ডাক মোরে আজি এ নিশীথে দ্র তত্ত্ব°, ফাল্গুন। ১৬৯; গীত ১।১২০; স্বর ৪; মূল গান : ক্যা করুঁ ন মানেরী সখীরী দ্র গবেষণা-গ্রন্থমালা ৩।৭৬-৭৭। হয়তো যে-গায়কদ্বয় শান্তিনিকেতনে গিয়েছিলেন তাঁদেরই কারও কাছ থেকে মূল গান ও সুরটি পেয়ে রবীন্দ্রনাথ সেটিকে ভেঙে ব্রহ্মসংগীতটি রচনা করেন। শান্তিনিকেতন-বাসী হওয়ার পর ওস্তাদি গান শোনার সুযোগ কমে যাওয়ার ফলে এই সময় থেকে তাঁর ভাঙা গানের সংখ্যা হ্রাসমান।

[৮] কীর্তন। আমি জেনে শুনে তবু ভুলে আছি [আখর-সহ] দ্র তত্ত্ব°, ফাল্গুন। ১৬৯-৭০; গীত ৩।৮৪৭-৪৮; স্বর ২৪। আখর-বিহীন গানটি প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল বেহাগ-একতালা সুর-তাল নির্দেশ-সহ পৌষ ১৮০৬ শক [১২৯১]-সংখ্যা তত্ত্ববোধিনী-তে—বর্তমান বৎসরে এটি আখর-সহযোগে গীত হয়।

আর-একটি গানও সম্ভবত এই সময়ের রচনা, সেটি হল ভৈরবী-একতালা সুর-তালে রচিত ‘ওগো দেবতা আমার পাষাণ দেবতা’ [দ্র গীত ৩।৮৫৩; স্বরলিপি নেই।—এটি ‘গান’ শিরোনামে মাঘ-ফাল্গুন [পৃ ২৭]-সংখ্যা সমালোচনী-তে মুদ্রিত হয়।

‘সমালোচনী’ মজুমদার লাইব্রেরি থেকে প্রকাশিত হবার কথা ছিল অগ্রহায়ণের শেষে–25 Nov [সোম ৯ অগ্র°]-এর *New India* পত্রিকার বিজ্ঞাপনে প্রকাশ :

SAMALOCHANEE, A popular monthly containing poems, short stories, sketches, criticisms from the pen of such illustrious writers as Babu Robindranath Tagore &c., is published under management of Majumdar Library from the end of Agrahayan.

কিন্তু পত্রিকাটি ঘোষণা অনুসারে অগ্রহায়ণ মাসে প্রকাশিত হয়নি, তবে রবীন্দ্রনাথের গান দুটি যদি তাঁরা পূর্বেই সংগ্রহ করে থাকেন তাহলে তাদের রচনাকাল আরও পূর্ববর্তী বলে মনে করতে হবে।

মাঘ-সংখ্যা বঙ্গদর্শন-এর ৪৬২-৭৩ পৃষ্ঠায় ‘চোখের বালি’ উপন্যাসের ২৯শ পরিচ্ছেদ [দ্র চোখের বালি ৩। ৩৯১-৪০৩] ছাড়া রবীন্দ্রনাথের আর কোনো রচনা মুদ্রিত হয়নি। বিদ্যালয়-সংক্রান্ত ব্যস্ততাই হয়তো এর কারণ।

আমরা আগেই বলেছি, রবীন্দ্রনাথ মাঘোৎসব উপলক্ষে ৭ মাঘ [সোম 20 Jan] শান্তিনিকেতন থেকে কলকাতা আসেন। মৃণালিনী দেবী, রথীন্দ্রনাথ প্রভৃতিও শিবধন বিদ্যার্ণবের সঙ্গে এই উপলক্ষে কলকাতায় আসেন, তাঁরা ফিরে যান ১৪ মাঘ [সোম 27 Jan]।

১১ মাঘ [শুক্র 24 Jan] দ্বিসপ্ততিতম সাম্বৎসরিক ব্রাহ্মসমাজ অনুষ্ঠিত হয়। এই দিন আদি ব্রাহ্মসমাজগৃহে প্রাতঃকালীন উপাসনায় ‘স্বাধ্যায়ান্ত উপাসনা সমাপ্ত হইলে শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় বেদীর সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া নিম্নোক্ত উপদেশ পাঠ করিলেন।’ ‘প্রাচীন ভারতের “একঃ”’-শীর্ষক এই ভাষণটি ফাল্গুন-সংখ্যা তত্ত্ববোধিনী [পৃ ১৫৬-৬২] ও বঙ্গদর্শন-এ [পৃ ৫২৬-৩৩] মুদ্রিত হয় [দ্র ধর্ম ১৩। ৩৬৪-৭১]। আমাদের অনুমান, প্রবন্ধটি তিনি ইতিপূর্বেই শান্তিনিকেতনের একাদশ সাম্বৎসরিকের সায়ংকালীন উপাসনায় ‘উপদেশ’ হিসেবে পাঠ করেছিলেন। উপনিষদের বাণী-খচিত এই ভাষণে তিনি শেষ পর্যন্ত সেই একই কথা বললেন, যা বঙ্গদর্শন-পর্বের বিভিন্ন রচনার মধ্য দিয়ে ব্যক্ত করে আসছেন :

আমরা কেবল যুদ্ধবিগ্রহ-যন্ত্রতন্ত্র বাণিজ্যব্যবসায়ের দ্বারা নহে, আমরা সুকঠিন সুনির্মল সন্তোষবলিষ্ঠ ব্রহ্মচর্যের দ্বারা মহিমান্বিত হইয়া উঠিতে চাহি। আমরা রাজত্ব চাই না, প্রভুত্ব চাই না, ঐশ্বর্য চাই না, প্রত্যহ একবার ভূর্ভুবঃস্বর্লোকের মধ্যে তোমার মহাসভাতলে একাকী দণ্ডায়মান হইবার অধিকার চাই। তাহা হইলে আর আমাদের অপমান নাই, অধীনতা নাই, দারিদ্র নাই।....আমাদের চতুর্দিকে সভ্যতাভিমানী বিজ্ঞানমদমত্ত বাহুবলগর্বিত স্বার্থনিষ্ঠুর জাতিরা যাহা লইয়া অহরহ নখদন্ত শাণিত করিতেছে, পরস্পরের প্রতি সতর্করুষ্ট কটাক্ষ নিক্ষেপ করিতেছে, পৃথিবীকে আতঙ্কে কম্পান্বিত ও ভ্রাতৃশোণিতপাতে পঙ্কিল করিয়া তুলিতেছে, সেই-সকল কাম্যবস্তু এবং সেই পরিস্ফীত আত্মাভিমানের দ্বারা তাহারা কখনোই অমর হইবে না—তাহাদের যন্ত্রতন্ত্র, তাহাদের বিজ্ঞান, তাহাদের পর্বতপ্রমাণ উপকরণ তাহাদিগকে রক্ষা করিতে পারিবে না। তাহাদের সেই বলমত্ততা ধনমত্ততা, সেই উপকরণবহুলতার প্রতি ভারতবর্ষের যেন লোভ না জন্মে।

১১ মাঘের উৎসবের পর রবীন্দ্রনাথ দু'দিন কলকাতায় থাকেন, ১২ মাঘ তিনি হেদুয়া ও কর্নওয়ালিশ স্ট্রীটে যান, শেষোক্ত স্থানে তিনি ১৩ মাঘেও গিয়েছেন। ১৪ মাঘ [সোম 27 Jan] তিনি জমিদারীর কাজে শিলাইদহে যান, জমিদারী ক্যাশবহিতে এই যাতায়াতের হিসাব পাওয়া যায়। কয়েকদিন পরেই তিনি কলকাতায় ফিরে এসেছেন, ১৭ মাঘ [বৃহ 30 Jan] গিয়েছেন বালিগঞ্জে। পারিবারিক কাজেই যেহেতু তাঁকে কলকাতায় আসতে হয়েছিল, তাই সরকারী খরচেই তিনি শান্তিনিকেতনে ফিরে গেছেন ১৮ মাঘ [শুক্র 31 Jan] তারিখে।

নববিধান সমাজের Prayer Band Trio প্রমথলাল বিনয়েন্দ্রনাথ ও মোহিতচন্দ্র সেনের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের একটি হার্দ্য সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল, একথা আমরা পূর্বেই বলেছি। এঁরা নববিধানের তরুণগোষ্ঠীর মধ্যে রবীন্দ্রানুরাগ সঞ্চার করতে সমর্থ হন। বেণীমাধব দাস উল্লেখ করেছেন :

In 1901, the younger group of the Prayer Meeting and the Fraternal Hcine, successfully staged Rabindranath's 'Bisarjan' at the courtyard of the Prachar Ashram. Col. Satyendra Nath Mukherjee, Dr. Hemanta Kumar Chatterjee, Dr. Banka Behari Chowdhury, Prafulla Roy Chowdhury, Dwijendra Nath Sen, Haralal Roy, Ashutosh Roy were the main actors. Rajendra Nath Sen and Haridas Chatterjee were the principal actors behind the scenes.[১২৮]

বিনয়েন্দ্রনাথ ও মোহিতচন্দ্র উভয়েই ছিলেন দর্শনের অধ্যাপক, তাই রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁদের বন্ধুত্ব একটি বিশেষ মাত্রা লাভ করেছিল। মোহিতচন্দ্র তাঁর সদ্যোপ্রকাশিত দর্শনের পাঠ্যপুস্তক *The Elements of Moral Philosophy* রবীন্দ্রনাথকে পাঠালে তিনি ২৮ পৌষ [রবি 12 Jan] তাঁকে লেখেন :

আমি দার্শনিক বই প্রায় পড়ি নাই—ভয় হয় পাছে যাহাকে সহজ বলিয়া জানি তাহার কঠিন স্বরূপ দেখিয়া আতঙ্ক জন্মে। সমস্ত প্রকৃতি দিয়া যাহাকে অনুভব করা যায় তাহাকে কেবল মাথা দিয়া দেখিতে গেলে অনেক অংশ হাঁ হাঁ করে—তাহার সকল স্থানে সমান আলোকপাত হয় না—ধর্ম্ম, ধর্ম্মনীতির মূলে যে বিশ্বব্যাপী স্বয়ম্ভু আনন্দ আছে তাহাকে প্রমাণের মধ্যে কেমন করিয়া আনা যায় এবং তাহাকে বাদ দিয়া ধর্ম্মকে দেখিতে গেলে সহস্র বিরোধের মধ্যে উত্তীর্ণ হইতে হয়।···—পাছে সেখানকার উল্টাদিকের গলিতে গলিতে ঘুরিয়া বেড়াইতে হয় এই ভাবনায় ফিলজফির সিষ্টেমগুলি দেখিলে আমার ভয় হয়। এই আতঙ্ক আমার প্রকৃতিগত—মূলজ্ঞানকে মাতৃস্তন্যের মত শোষণ করিয়া লইবার জন্য আমার আকাঙ্ক্ষা—তাহাকে চারিদিক হইতে আহরণ করিয়া লইতে আমার রুচি হয় না।..কিন্তু আপনার বইখানি আমি পড়িবই—চারিত্রশাস্ত্রে এই গ্রন্থই আমার প্রথম প্রবেশিকা হইবে। আমার অন্তঃকরণ আপনাকে আত্মীয় বলিয়া জানিয়াছে। অতএব আপনার প্রসারিত হস্ত অবলম্বন করিয়া কোনো নূতন পথে প্রবেশ করিতে তাহার কোনো সঙ্কোচ নাই।/আপনি ইংরাজি ভাষায় পত্র লিখিয়া কুণ্ঠিত হইয়াছেন। কিন্তু হৃদয়ের ভাষা মাতৃভাষা অপেক্ষাও অন্তরতর—অতএব সে ভাষা ইংরাজিতেই পাই আর বাংলাতেই পাই তাহাকে মূল্যবান্ বলিয়াই জানি।[১২৯]

বিনয়েন্দ্রনাথও তাঁর *Intellectual Ideal* গ্রন্থটি প্রকাশিত হলে রবীন্দ্রনাথকে প্রেরণ করেন। বেদান্ত-বিষয়ে তিনি 'The Intellectual Ideals of Upanishads' 'The Vedantic Philosophy' ও 'Sankaracharya's Doctrine of Liberation'-শীর্ষক যে তিনটি বক্তৃতা করেন তারই সমাহার এই গ্রন্থ্। গ্রন্থটি পেয়েই রবীন্দ্রনাথ ২৩ মাঘ [বুধ 5 Feb]* শান্তিনিকেতন থেকে প্রাপ্তিস্বীকার করেন ও উপহার-স্বরূপ 'পঞ্চভূত' বইটি তাঁকে পাঠিয়ে দেন। গ্রন্থটি পাঠ করে ১২ ফাল্গুন [সোম 24 Feb] তিনি লিখেছেন :

পড়িয়া আপনার প্রতি যেমন কৃতজ্ঞতা অনুভব করিয়াছি তেমনি লজ্জা বোধ করিলাম। পঞ্চভূতে আমি নানাবিধ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিয়াছি, অথচ সে সকল কথা বলিবার কোন অধিকার লাভ করি নাই।···আপনার বইখানি আমাকে অত্যন্ত সুগভীরভাবে আকর্ষণ করিয়াছে। আপনি যদি কেবল দার্শনিকের মত লিখিতেন তবে আমি আনন্দ ও শিক্ষা হইতে বঞ্চিত হইতাম কারণ দর্শনশাস্ত্রে আমি অনভিজ্ঞ। জ্ঞানের কথাকে আপনি কল্পনার দ্বারা দীপ্যমান করিয়া তুলিয়াছেন। আপনি যে বেদান্তের মধ্যে কেবল পথ করিয়া চলিয়াছেন তাহা নহে, প্রদীপও ধরিয়াছেন।···ইহাতে আপনার সঙ্গ আমার কাছে বড় লোভনীয় হইয়া উঠিয়াছে।

১ ফাল্গুন [বৃহ 13 Feb] মোহিতচন্দ্র সেন ব্রহ্মচর্যাশ্রমের ছাত্রদের পরীক্ষা করার জন্য শান্তিনিকেতনে আসেন। তাঁর উদ্দিষ্ট মঙ্গলকর্মের সঙ্গে বাইরের বোদ্ধা ও হৃদয়বান ব্যক্তিদের এইরূপ যোগসূত্র রচনা করা রবীন্দ্রনাথের প্রার্থনীয় ছিল। তাই মুগ্ধ ও কৃতজ্ঞ হয়ে তিনি উল্লিখিত পত্রে লেখেন :

শুভদৈবক্রমে মোহিতবাবুর সহিত আমার আলাপ হইয়াছে—আলাপের চেয়ে অনেক বেশি হইয়াছে বলিতে পারি। তিনি আমাকে আপনাদের সকলের দিকেই আকর্ষণ করিয়া লইয়াছেন। তাঁহার সহিত সম্বন্ধেই আপনাদের সকলের সহিত আমার সম্বন্ধ হইয়াছে—সেই সম্বন্ধ পাকা করিবার জন্য আমি সুযোগের অপেক্ষা করিতেছিলাম। আপনাদিগকে আমার প্রয়োজন আছে। আমাদের দেশে ভাবুকশ্রেণী বিরল—জ্ঞানের সঙ্গে ভাবের সঙ্গে একেবারে নাড়ীর সম্পর্ক এমন লোক অল্প বলিয়া আমার মানসপ্রকৃতি যেন ক্ষুধিত হইয়া থাকে। ভাবকে মানুষের মধ্য হইতে গতিবিশিষ্ট সজীব প্রত্যক্ষ আকারে গ্রহণ করিবার যে ক্ষুধা তাহা বাতি জ্বালিয়া কোণে বসিয়া লাইব্রেরির মধ্যে নিজেকে জীর্ণ করিয়া কিছুতেই তৃপ্ত হয় না। ১৩০

রবীন্দ্রনাথের মনে এই ক্ষুধা কীভাবে জাগ্রত হয়ে থাকত, তা অনেক আগে 6 Apr 1893 [২৫ চৈত্র ১২৯৯] তারিখে ইন্দিরা দেবীকে লিখিত একটি পত্রে জানিয়েছিলেন [দ্র ছিন্নপত্রাবলী। ১৯৭, পত্র ৯০]। কিন্তু কঠিনত্বক ফলের মত তাঁর স্বভাবের বহিরাবরণে বাধাপ্রাপ্ত হয়ে অনেক বন্ধুত্বকামীও তাঁর প্রতি বিরূপ হয়েছেন, তাই সতর্ক করে দিয়ে ২৮ ফাল্গুন [বুধ 12 Mar] তিনি বিনয়েন্দ্রনাথকে লিখেছেন :

নিজেকে বাইরে এনে দান করবার জন্যে আমার একটিমাত্র বড় দরজা আছে সেটি হচ্ছে লেখা—আর কিছুতে আমি যেন নিজেকে প্রকাশ করতে পারিনে। অনেকে সেটাতে আমার অহঙ্কারের লক্ষণ কল্পনা করেন, কিন্তু অন্তর্যামী জানেন সেটা আমার দীনতা, অক্ষমতা। আমাকে আকর্ষণ করে বাইরে টেনে নেবার জন্যে আমি আমার বন্ধুদের প্রতিই সম্পূর্ণ নির্ভর করে থাকি—নিজেকে বাইরে প্রয়োগ করতে পারিনে।···আমার ভয় হয় কাছে এলে পাছে আমার পরিচয় না পান—পাছে আমাকে সুদূরবর্ত্তী বলে মনে করেন।..কিন্তু যদি আমাকে নিতান্তই সহজভাবে গ্রহণ করেন তবেই আপনাদের প্রীতিতে আমি নিজেকে পরিপূর্ণতর জ্ঞান করব।[১৩১]

নিজেকে পরিপূর্ণতর করার আগ্রহ অপরপক্ষেও ছিল। মোহিতচন্দ্র সস্ত্রীক শান্তিনিকেতনে গিয়েছিলেন এই খবর তিনি, তাঁর পত্নী ও রবীন্দ্রনাথ কটকে প্রমথলাল সেনকে লিখে জানান—তিনটি চিঠিই এক দিনে প্রমথলালের কাছে পৌঁছয়। উত্তরে তিনি উপদেশ দিয়ে মোহিতচন্দ্রকে লেখেন :

রবীন্দ্রবাবুর সঙ্গে তোমার পরিচয়টা বেশ ভাল রকম হয়, আমার ইচ্ছে। তাঁর প্রতিভা ও চরিত্রের ভেতর যে সব ভক্তিভাবোদ্দীপক গুণ আছে, তোমার সঙ্গে থেকে তার উৎকর্ষ সাধিত হয়, আর তোমার চরিত্রে ভক্তির অভাবে যে সকল ভাল ভাল ভাব নষ্ট হয়ে যাচ্ছে—তা তাঁর সঙ্গে থেকে বেশ হৃষ্টপুষ্ট হয়—এই আমার প্রার্থনা।···তিনি এখন তোমার বিশেষ সহায়। তাঁর জীবনের উদ্দেশ্য সাধনে তুমিও তাঁর বিশেষ সহায়। এ কথাটা তিনি যেমন বুঝেছেন, তুমি তেমন বোঝনি। তাই আমার তোমাকে এত কথা লেখা। তিনি লিখেছেন, “আপনাদিগকে বন্ধুরূপে পাইয়া, নিজেকে লাভবান মনে করি।” আমাদের কথাটা উল্টে দিতে হবে।···রবীন্দ্রবাবুর সঙ্গে এক হয়ে, একটা বিশেষ কাজে লেগে গেলে—তোমার জীবন ফলবান হবে।[১৩২]

মোহিতচন্দ্র এই পরামর্শ গ্রহণ করেছিলেন এবং প্রমথলালের আশাও পূর্ণ হয়েছিল—রবীন্দ্রনাথের কাব্যগ্রন্থ সম্পাদনে ও ব্রহ্মচর্যাশ্রমের সেবায় মোহিতচন্দ্র অসামান্য কৃতিত্ব ও আত্মোৎসর্গের পরিচয় দিয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথও তাঁর কথা স্মরণ করেছেন বিভিন্ন উপলক্ষে।

রবীন্দ্রনাথ পুনরায় কলকাতায় আসেন ২৭ মাঘ [রবি 9 Feb] তারিখে। এ-বিষয়ে ২৬ মাঘ তিনি রাধাকিশোর মাণিক্যকে লেখেন :

মহারাজের শীঘ্র আগমন প্রত্যাশায় কিছুকাল কলিকাতায় কাটাইয়াছিলাম—কিন্তু আমার অনুপস্থিতিতে এখানকার বিদ্যালয়ের কাজের ব্যাঘাত ঘটিতে থাকে বলিয়া আমাকে শান্তিনিকেতনে চলিয়া আসিতে হইল। গতকল্য মহিমের টেলিগ্রামে মহারাজের আগমন সংবাদ পাইলাম। আগামীকল্য রবিবারে প্রাতের গাড়িতে কলিকাতায় রওনা হইব। সোমবার সকালে ৯/১০ সময় মহারাজের অবকাশ থাকিলে আমি সাক্ষাৎ করিব।

বুধবারেই আমাকে ফিরিবার উদ্যোগ করিতে হইবে। কারণ বৃহস্পতিবারে কলিকাতা হইতে অধ্যাপক মোহিতচন্দ্র সেন মহাশয় আসিয়া বিদ্যালয়ের বালকদিগকে পরীক্ষা করিবেন।[১৩৩]

রবীন্দ্রনাথ পরের দিনই কলকাতায় আসেন এবং সম্ভবত সেইদিনই বালিগঞ্জে গিয়ে ত্রিপুরারাজের সঙ্গে দেখা করেন। রাজ্য রাজনীতির চক্রে পড়ে রাধাকিশোর প্রতিশ্রুতিমতো মধ্যমপুত্রকে শান্তিনিকেতনের বিদ্যালয়ে ভর্তি করতে পারেননি, কিন্তু অন্যভাবে তিনি বিদ্যালয়কে সাহায্য করেন।

আরো অনেকে বিদ্যালয়কে সাহায্য করেছিলেন, তা জানা যায় ২৫ মাঘ [শুক্র 7 Feb] কোনো অজ্ঞাত ব্যক্তিকে লেখা রবীন্দ্রনাথের চিঠিতে :

আপনার প্রেরিত দান এই মাত্র পাইয়া কত খুসি হইলাম বলিতে পারি না। এই পঞ্চাশটি টাকার সঙ্গে আপনার যে প্রীতি ও শ্রদ্ধা দিয়াছেন তাহা আমার হৃদয়ভাণ্ডারে সঞ্চিত হইল। রাজা মহারাজেরা অনুগ্রহ করিয়া মনোরথ পূরণ করিলেও বন্ধুত্বের আনুকূল্যের মত তাহা এমন মধুর বোধ হয় না—আপনি হৃদয়ের সহিত দিয়াছেন, আমি আপনাকে হৃদয় প্রত্যর্পণ করিতেছি।···একবার অবকাশমত শান্তিনিকেতনে আসিবেন, তাহা হইলে বুঝিতে পারিবেন কেবল যে বন্ধুকে সহায়তা করিলেন তাহা নহে দেশের মঙ্গলকর্ম্মে যোগদান করিলেন।/শান্তিনিকেতনের ছাতিমতলায় একদিন দস্যুতা হইত জানেন বোধ হয়। আজকাল আমিই প্রধান দস্যু সাজিয়া এখানে বসিয়া আছি, যেরূপ গতিক দেখিতেছি তাহাতে রাজামহারাজরা পালাইয়া রক্ষা পাইবেন, কেবল বিশ্বস্ত বন্ধুদেরই পালাইবার রাস্তা নাই।[১৩৪]

কিন্তু সব-কিছুই যে ঠিকঠাক চলছিল না, তার কিছুটা আভাস আছে কলকাতা থেকে বসন্তকুমার গুপ্তকে লেখা একটি তারিখ-হীন চিঠিতে :

বাবা মহাশয়ের সঙ্গে স্কুল সম্বন্ধে কথা হইল। তিনি শান্তিনিকেতনে অতিথিদের থাকা সম্বন্ধে চিন্তিত হইয়াছেন। আমরাই নীচে উপরে বাহিরে সমস্ত স্থান জুড়িয়া থাকিব ইহা বোধ করি তাঁহার ভাল লাগে নাই। অথচ অতি শীঘ্রই আরো মাস্টারের আমদানি হইবে।···দিপু শীঘ্র শান্তিনিকেতনে যাইবেন তখন স্থানের টানাটানি দেখিলে তাঁহার হয় ত বিরক্তি বোধ হইবে এই সকল চিন্তা করিয়া আমি উদ্বিগ্ন হইয়াছি। বোধ হয় স্থানের অকুলান লইয়া এখানে আলোচনা হইয়াছে।*

দ্বিপেন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতন আশ্রমের অন্যতম ট্রাস্টী ছিলেন; কিন্তু শান্তিনিকেতন বাড়িতে সপরিবারে স্থায়ীভাবে বাস করার অধিকার তাঁরও ছিল না—অথচ তিনি তাই-ই করেছেন। এই নিয়ে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর কিছু মন-কষাকষি ছিল—এই চিঠিটিতে তার ইঙ্গিত কিঞ্চিৎ অলক্ষ্য হলেও পরে তা অনেকটা স্পষ্টভাবেই ব্যক্ত হয়েছে। এই পারিবারিক সংকট থেকে মুক্তির জন্য রবীন্দ্রনাথকে ট্রাস্টের অন্তর্গত কুড়ি বিঘা জমির বাইরে জায়গা সংগ্রহ করে বসবাসের বাড়ি তৈরি করতে হয়।

পাঁচ জন ছাত্রকে নিয়ে ব্রহ্মচর্যাশ্রম শুরু হলেও মাসখানেকের মধ্যেই ছাত্রসংখ্যা বেড়ে যায়। প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় লণ্ডন থেকে 20 Feb [বৃহ ৮ ফাল্গুন] রবীন্দ্রনাথকে লেখেন : 'কয়েক সপ্তাহ হল আপনার চিঠি পেয়েছি—আপনি শান্তিনিকেতনে শান্তি উপভোগ করছেন জেনে তখনি তখনি আর আপনাকে আক্রমণ করিনি।···ছেলে আর বাড়ল? এ চিঠিতে বলেছিলেন গুটিবারো ছেলে হয়েছে।'[১৩৫] রবীন্দ্রনাথের পত্রটি নিশ্চয়ই মাঘ মাসের প্রথমে লেখা! এই বর্ধিত ছাত্রসংখ্যার জন্য অতিরিক্ত শিক্ষক ও বাসস্থানের প্রয়োজন হওয়া স্বাভাবিক। সেইজন্যই বোর্ডিংঘর নির্মাণেরও আয়োজন হয়েছে; ২৭ ফাল্গুন [মঙ্গল 11 Mar] সরকারী ক্যাশবহির হিসাব : 'ব° বাবু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর দং ব্রহ্মবিদ্যালয়ের বোর্ডিংঘর তৈয়ারির হিসাবে দেওয়া যায় ৩০০৲ /ব° আশুতোষ রায়চৌধুরী দং উক্ত গৃহের টালী প্রভৃতি ক্রয়ের মূল্য দেওয়া যায় ১৮০৲'—এই বাড়িটিই 'আদিকুটীর' বা 'প্রাক্কুটীর' নামে পরিচিত ছিল। এই প্রসঙ্গে ভাগিনেয় সত্যপ্রসাদকে একটি তারিখ-হীন পত্রে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন :

এখানকার বিদ্যালয়ের যে ঘর হচ্চে তার ছাদের জন্যে টালি এবং ফ্রেমের কাঠ ও জান্‌লা দরজা কেনবার জন্যে আশুকে নগদ টাকা দিলে সে শীঘ্র কিনে এনে কাজ সারতে পারবে। নইলে বৃষ্টির সময় আস্‌চে, মাটির দেয়াল ধুয়ে গেলে বিস্তর লোকসান পড়বে—····

আমাদের বি, পাইন্‌ টেলিগ্রাফ আপিসে কাজ করে—সুরেন বলিছল, টেলিগ্রাফ আপিসের কর্ম্মচারীরা খুব সস্তায় বাইসিক্‌ল্‌ আনাতে পারে। রথী একটা বাইসিক্লের জন্যে ভারি ব্যাকুল হয়ে পড়েছে—[১৩৬]

—পত্রটি যে এই সময়েই লিখিত বাইসাইকেলের উল্লেখই তার প্রমাণ, ৩ চৈত্র [সোম 17 Mar] রবীন্দ্রনাথের ক্যাশবহিতে 'বাইসিকেল ক্রয় জন্য ২৬' টাকা ব্যয়ের হিসাব পাওয়া যায়।

কিন্তু পত্রটির মূল্য অন্য কারণে। উদ্ধৃত অংশটির পরে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন :

এতদিন অতিথি ছিল বলে সময় পাই নি—আজ শান্তার জন্যে উত্তর লিখে পাঠালুম।

খেয়েছ যে শালগম   না করিয়া কাল-গম
এই আমি বহুভাগ্য মানি,
তার পরে মিঠি মিঠি   লিখেছ স্নেহের চিঠি
তার মূল্য কি আছে না জানি!

—২৪ ছত্রের এই ছড়াটি তিনি লেখেন সত্যপ্রসাদের 'রবিবার'-এ লেখা নিম্নোধৃত পত্রটির উপরোধ মেনে :

মধ্যে বড়মামা [দ্বিজেন্দ্রনাথ] শান্তাকে [সত্যপ্রসাদের কন্যা] কবিতায় এক চিঠি লিখেছিলেন। শান্তার ইচ্ছে তোমাকে দিয়ে কবিতায় তার এক মজার উত্তর লিখে পাঠায়। কবিতাটা পাঠাচ্চি, সময় পাও ত একটু লিখে পাঠিও।

—এর পর তিনি দ্বিজেন্দ্রনাথের ১৪ ছত্রের ছড়াটি লিখে পাঠান : 'সালগম পাইয়া আমি হর্ষে আটখানা/গান করিলাম সুরু তোম্‌ তা না না না ॥'

রবীন্দ্রনাথ-লিখিত ছড়াটির প্রত্যুত্তরে দ্বিজেন্দ্রনাথ 'বাড়াবাড়ি ভাল নয়, সালগমই ভাল'-শীর্ষক ২২ ছত্রের আর একটি ছড়া লেখেন—'সালগম-সংবাদ' শিরোনামে এই তিনটি ছড়া ভাদ্র ১৩০৯-সংখ্যা ভারতী-তে [পৃ ৪৬৭-৭০] মুদ্রিত হয়। রবীন্দ্রনাথ-কৃত ছড়াটি 'প্রহাসিনী' [১৩৪৫] কাব্যের পরিবর্ধিত নূতন সংস্করণ' [১৩৯১]-এ [পৃ ৭২-৭৩] অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

২৭ মাঘ [রবি 9 Feb] কলকাতায় গিয়ে রবীন্দ্রনাথ ত্রিপুরার মহারাজের সঙ্গে দেখা করেন, ২৮ মাঘ তিনি যান সুকিয়া স্ট্রীটে এবং ২৯ মাঘ কর্নওয়ালিশ স্ট্রীট ও 'কাঁসারিপাড়া'য়। ৩০ মাঘ [বুধ 12 Feb] তিনি ফিরে যান শান্তিনিকেতনে। কিন্তু তার আগে বালিগঞ্জে গিয়ে 'লোকেনের নববধূ' মেবেল পালিতকেও দেখে আসেন। জ্ঞানদানন্দিনী দেবী তাঁর 'বিলাতের কথা'য় লিখেছেন : 'দেশের লোকের মধ্যে Mabel Dutt (পরে ওঁর বন্ধু তারকনাথ পালিতের বউ হন) বেশ সুন্দরী ছিলেন। তার বাপ ক্ষেত্র দত্ত মেম বিয়ে করেছিলেন। মাঝে মাঝে আমাদের ওখানে আসতেন।···মেবল আমার ছেলেদের চেয়ে বয়সে কিছু বড় ছিল ও তাদের শোবার সময় গল্প বলত।'[১৩৭] রবীন্দ্রনাথ প্রথমবার বিলাত গিয়ে এঁকে দেখেছিলেন। প্রভাতকুমার 27 Dec [শুক্র ১২ পৌষ] লণ্ডন থেকে লেখেন :'লোকেন পশু সবধূ বিলেত ছাড়বেন। লোকেনের বধূকে আপনার বোধ হয় মনে আছে। তিনি যখন বালিকা তখন তাঁকে আপনি বাঙ্গলা শেখাবার চেষ্টা করেছিলেন। Mabel বলেন, সে সময় নাকি Tennyson আপনি খুব পড়তেন।'[১৩৮]

কলকাতায় গিয়ে এই-সব সামাজিকতা করা সত্ত্বেও তিনি প্রিয়নাথ সেনের সঙ্গে দেখা করেননি বলে প্রিয়নাথ অভিমান প্রকাশ করলে রবীন্দ্রনাথ 22 Feb [শনি ১০ ফাল্গুন] লেখেন :

কলকাতায় গিয়ে আমি দুই একটা কাজে যোগ দিই সত্য এবং গতবারে লোকেনের নববধূকে দেখ্‌তে গিয়েছিলেম সেও ঠিক কিন্তু আমি পূর্ব্ববৎ আর বন্ধুত্বচর্চ্চার অবসর পাইনে।...আমার ব্যক্তিগত সুখদুঃখ যশ অপযশকে আমি আর লালন করতে চাইনে—আমি বহুল পরিমাণে নির্জ্জন অবকাশ এবং মঙ্গলকর্ম্মের বৃহৎ ক্ষেত্র চাই—এখন প্রধানত এই কর্ম্মসূত্রেই পৃথিবীর সকলের সঙ্গে আমার যোগ—এখন আমার নিজের জন্যে কাউকে আমি বিশেষ করে চাইনে।[১৩৯]

তাঁর এই সময়কার পত্রের এইটিই প্রধান সুর। প্রভাতকুমারকেও তিনি লিখেছিলেন 'আমি আমার পূর্ব্বসংসার থেকে একরকম বেরিয়ে এসেছি'—তাও এই মনোভাব থেকে। পারিবারিক ও ব্যক্তিগত বিষয়কর্মের ঝঞ্ঝাটের মধ্যে থেকেও তাঁর সৌন্দর্যরসচর্চা বিঘ্নিত হয়নি, কিন্তু ঈশ্বরমুখী মঙ্গলকর্মে লিপ্ত হওয়ার আকাঙ্ক্ষা সেই জগৎ থেকে, অন্তত বর্তমান সময়ে, তাঁকে অনেকটা সরিয়ে এনেছে তাতে কোন সন্দেহ নেই। অবশ্য প্রিয়নাথ সম্পর্কে নৈর্ব্যক্তিকতা তিনি বেশিদিন রক্ষা করতে পারেননি, পূর্বতন বিষয়কর্মের দায়েই তাঁকে আবার প্রিয়নাথের শরণাপন্ন হতে হয়েছে।

মোতিচাঁদ নাখতার নামক এক মাড়োয়ারি রত্নব্যবসায়ী মহাজনের কাছ থেকে 25 Aug 1899 [৯ ভাদ্র ১৩০৬] তারিখে ঠাকুর কোম্পানির দেনা শোধের জন্য বার্ষিক শতকরা ৭ টাকা সুদে তিনি চল্লিশ হাজার টাকা ধার করেছিলেন, একথা আমরা যথাস্থানে উল্লেখ করেছি। হঠাৎ মহাজনের কাছ থেকে তাগিদ এল 15 Apr [২ বৈশাখ ১৩০৯]-এর মধ্যে টাকা মিটিয়ে দেবার জন্য। প্রিয়নাথের মাধ্যমে উক্ত ঋণ সংগৃহীত হয়েছিল। সেইজন্য রবীন্দ্রনাথ ২০ চৈত্র [বৃহ 3 Apr] একটি সংক্ষিপ্ত পত্রে প্রিয়নাথকে বিষয়টি জানিয়ে দু'দিন পরে তাঁকে অনুরোধ করেছেন : 'তুমি যদি অন্যত্র হইতে সহজে ৪০ অথবা পঞ্চাশ হাজার টাকা আমাকে সংগ্রহ করিয়া দিতে পার তাহা হইলে মুক্তি পাই।'[১৪০] ব্যারিস্টার তারকনাথ পালিতের কাছ থেকে পঞ্চাশ হাজার টাকা ঋণ সংগ্রহের ব্যবস্থা সুরেন্দ্রনাথ করেছিলেন, কিন্তু কোম্পানির কাগজ ভাঙানো ইত্যাদি কারণে সেই টাকা পেতে দেরি হওয়ার সম্ভাবনা থাকায় রবীন্দ্রনাথ প্রিয়নাথকে অন্তর্বর্তী ব্যবস্থা করার জন্য অনুরোধ করেন। অন্য জায়গা থেকে ঋণ সংগ্রহের প্রয়োজন সম্ভবত হয়নি, প্রিয়নাথই মহাজনের সঙ্গে কিছু সাময়িক বন্দোবস্ত করতে সমর্থ হয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথের পরবর্তী কয়েকটি পত্রে এই প্রসঙ্গটি বারবার এসেছে, কিন্তু তিনি যে নিজেকে কিছুটা উদ্বেগ-অশান্তির উর্ধ্বে রাখতে পেরেছেন তাও খুবই স্পষ্ট ৮ বৈশাখ ১৩০৯ [সোম 21 Apr]-এর চিঠিতে :

এত বৈষয়িক ঝঞ্ঝাট ও বিঘ্নের মধ্যেও ঈশ্বর আমাকে সর্ব্বদাই শান্তি প্রেরণ করচেন—অবসাদে আমাকে অভিভূত করে ফেলে নি—সকলপ্রকার সম্ভবপর দুঃখ দৈন্য বিপদ নৈরাশ্যের জন্যে আমাকে অনেকটা সবল ও শান্তভাবে প্রস্তুত করে রাখচেন এজন্যে আমি আমার বর্ত্তমান সময়কে দুঃসময় বলে জ্ঞান করিনে।[১৪১]

বিদ্যালয়ের নববর্ষ উৎসবে তিনি প্রিয়নাথকে আমন্ত্রণও জানিয়েছেন, কিন্তু 'যদি বিদ্যালয় সম্বন্ধে তোমার কৌতূহল থাকে তবে তাহা মিটাইবার এই উপযুক্ত সময়'—রবীন্দ্রপ্রতিভার এই নবতম বিবর্তনের প্রতি প্রিয়নাথের অনাগ্রহেরই ইঙ্গিত, তিনি কোনোদিন শান্তিনিকেতনে যাননি। সাহিত্যরস আস্বাদনের ভোজে তিনি রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে একই পংক্তিতে আসন গ্রহণ করেছিলেন, কিন্তু অন্যত্র তিনি বর্ণভেদ অনুভব করেছেন। পরবর্তী কালে প্রিয়নাথকে লিখিত রবীন্দ্রনাথের পত্রসংখ্যা লক্ষণীয়ভাবে ক্ষীণকায়—সংরক্ষণের অভাব নয়, উভয়ের পত্রবিনিময়ের ক্ষেত্রই সংকুচিত হয়ে এসেছিল।

ফাল্গুন-সংখ্যা বঙ্গদর্শন-এ [১।১১] রবীন্দ্র-রচনার সংখ্যা দুটি :

৫০৩-১৩ 'চোখের বালি' ৩০-৩৩ দ্র চোখের বালি ৩।৪০৩-১২ [৩০-৩২]

৫২৬-৩৩ 'প্রাচীন ভারতের "একঃ"' দ্র ধর্ম ১৩।৩৬৪-৭১

চোখের বালি-র পত্রিকায় প্রকাশিত ৩২শ পরিচ্ছেদটি গ্রন্থে সম্পূর্ণ বর্জিত হয়েছে। 'প্রাচীন ভারতের একঃ' প্রবন্ধটি তত্ত্ববোধিনী-র ফাল্গুন-সংখ্যাতেও [পৃ ১৫৬-৬২] মুদ্রিত হয়েছিল।

সমালোচনী, মাঘ-ফাল্গুন ১৩০৮ [১।১-২] :

২ 'নিবেদন' ['আমার বিচার তুমি কর, তব'] দ্র গীত ১।৫১-৫২

২৭ 'গান'/ভৈরবী-একতালা/'ওগো দেবতা আমার পাষাণ দেবতা' দ্র গীত ৩।৮৫৩

৭২-৭৪ 'জাল কুমারসম্ভব'

অগ্রহায়ণ মাসে প্রকাশিত হবে বলে বিজ্ঞাপিত হওয়া সত্ত্বেও পত্রিকাটি যুগ্মসংখ্যা-রূপে ফাল্গুনের শেষে প্রকাশিত হয়। রবীন্দ্রনাথের গান-দুটি সম্পর্কে আমরা আগেই আলোচনা করেছি। দ্বিতীয় গানটি স্বাক্ষরিত, কিন্তু প্রথম গানটির রচয়িতার নাম সূচীপত্রেও উল্লেখিত হয়নি।

'জাল কুমারসম্ভব' রচনাটিও অস্বাক্ষরিত, কিন্তু বন্ধুবর অনাথনাথ দাসের সৌজন্যে সূচীপত্র-সংবলিত একখণ্ড পত্রিকা দেখার সৌভাগ্যবশত রচনাটিকে রবীন্দ্রনাথ-রচিত বলে নিঃসন্দেহে চিহ্নিত করা সম্ভব হল।

রবীন্দ্রনাথ ২৩ অগ্রহায়ণ আলোচনাসমিতির প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে 'কুমারসম্ভব ও শকুন্তলা' প্রবন্ধটি পাঠ করেন—আমাদের অনুমান, এই প্রবন্ধটির প্রসঙ্গক্রমে বর্তমান রচনাটি লিখিত হয়। কালিদাসের কুমারসম্ভব কাব্যের প্রচলিত সংস্করণে সতেরোটি সর্গ থাকলেও রবীন্দ্রনাথ প্রথম সাতটি সর্গকেই [অর্থাৎ হরগৌরীর বিবাহবর্ণনা পর্যন্ত] কালিদাসের লেখা বলে মনে করতেন। সেইজন্যই তিনি 'কুমারসম্ভবগান' [দ্র চৈতালি ৫।৫৩-৫৪] কবিতায় লিখেছিলেন :

> যবে অবশেষে
> ব্যাকুল শরমখানি নয়ননিমেষে
> নামিল নীরবে, কবি, চাহি দেবীপানে
> সহসা থামিলে তুমি অসমাপ্ত গানে।

এই ধারণা থেকেই তিনি 'কুমারসম্ভব ও শকুন্তলা' প্রবন্ধে লেখেন : 'মহাভারতের সমস্ত কর্ম যেমন মহাপ্রস্থানে শেষ হইয়াছে, তেমনি কুমারসম্ভবের সমস্ত প্রেমের বেগ মঙ্গল-মিলনেই পরিসমাপ্ত।...সমস্ত বিশ্ব এই শুভমিলনের নিমন্ত্রণে প্রসন্নমুখে যোগদান করিয়া ইহাকে সুসম্পন্ন করিয়া দিল।/ সপ্তম সর্গে সেই বিশ্বব্যাপী উৎসব। এই বিবাহ-উৎসবেই কুমারসম্ভবের উপসংহার।'

কিন্তু এই ব্যাখ্যা রসগ্রাহীর ব্যাখ্যা, তা প্রমাণ-ঋদ্ধ নয়। সেই কারণেই রবীন্দ্রনাথ বর্তমান প্রবন্ধে প্রমাণের অবতারণা করে লেখেন : 'কালিদাসের কাব্যের মধ্যে মুদ্রাদোষ দেখা যায় না। এমন কোন ভঙ্গিমা নাই, যাহাকে রচনাগত অভ্যাসদোষ বলা যাইতে পারে। /কিন্তু অষ্টম হইতে সপ্তদশ সর্গের মধ্যে একপ্রকার প্রশ্নাশ্রিত ভঙ্গী বারংবার দেখা যায়, যাহা প্রথম সাত সর্গের মধ্যে দুর্লভ।' এর পর তিনি বিভিন্ন সর্গ থেকে ন'টি শ্লোকাংশ উদ্ধৃত করে লিখলেন :

কাব্যে উপমা-তুলনা দ্বারা ভাবকে পরিস্ফুট ও পাঠকের কল্পনাকে উত্তেজিত করা হইয়া থাকে, কিন্তু বারংবার এমন অনাবশ্যক প্রশ্নের খোঁচা মারিয়া পাঠককে ব্যস্ত করিয়া তোলা কালিদাসে কোথাও ত দেখি নাই। কুমারসম্ভবের প্রথম সাত সর্গের মধ্যে এমন মূঢ়ের মত প্রশ্ন একটিও কেহ বাহির করিতে পারিবেন না।..মা ছেলেকে দেখিয়া খুসি হইলেন, ইহার পরে যদি কোন কবি প্রশ্নস্বরূপে পুনর্ব্বার লেখেন, কোন্ মা ছেলেকে দেখিয়া খুসি না হন্? তবে তিনি কালিদাসের সিংহচর্ম্ম পরিয়া আসিলেও কণ্ঠস্বরেই ধরা পড়েন।

উল্লেখ্য, সজনীকান্ত দাস কার্তিক ১৩৪৮-সংখ্যা শনিবারের চিঠি-তে রচনাটি '১৩০৮ বঙ্গাব্দে একটি অধুনাবিস্মৃত মাসিকপত্রে প্রকাশিত' মন্তব্য-সহ পুনর্মুদ্রিত করেছিলেন [পৃ ১৫/১৬]। তিনি আশা করেছিলেন, "প্রাচীন সাহিত্যে'র পরবর্ত্তী সংস্করণে ইহা যথাস্থানে সন্নিবিষ্ট হইবে"—তাঁর সেই আশা এখনও পূর্ণ হয়নি।

বালক, সাধনা ও ভারতী পত্রিকা হাতে আসার পর রবীন্দ্রনাথের লেখনী যেমন অজস্রধারে উৎসারিত হয়ে উঠেছিল, বঙ্গদর্শন-এর বেলায় তেমন হয়নি। সম্পাদনায় সহযোগী শৈলেশচন্দ্র মজুমদার তাঁর পুস্তক বিক্রয় ও প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান মজুমদার লাইব্রেরিকে কেন্দ্র করে ও নিজস্ব স্বভাবঔদার্যে একটি সাহিত্যগোষ্ঠী গড়ে তুলেছিলেন, অন্যান্য লেখকদের সঙ্গেও তাঁর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। ফলে কেবল পত্রিকার কলেবর পূরনের তাগিদে আগে রবীন্দ্রনাথকে যেমন বিচিত্র বিষয়ে লিখতে হত, বর্তমানে তার প্রয়োজন অনেক কম ছিল। তাছাড়া সময়াভাবে তিনি আরব্ধ 'আলোচনা' ও 'মাসিক-সাহিত্য-সমালোচনা' শীর্ষক নিয়মিত বিভাগ দুটি বন্ধ করে দেন। ব্রহ্মচর্যাশ্রমের পরিকল্পনা ও পরিচালনার দায়িত্বও রচনারিক্ততার অন্যতম কারণ। কিন্তু নবপর্যায় বঙ্গদর্শন-এর প্রধান আকর্ষণ চোখের বালি-র ক্ষেত্রে নিয়মিত যোগান অব্যাহত রাখা অনিবার্য ছিল। উপন্যাসটির প্রথমাংশ তিনি একটানা অনেকদূর পর্যন্ত লিখে রেখেছিলেন, সেইজন্য কোনো অসুবিধা হয়নি। কিন্তু যে-মুহূর্তে সেই যোগানে টান পড়েছে তখনই তাঁকে চঞ্চল হয়ে উঠতে হয়েছে। ১৬ ফাল্গুন [শুক্র 28 Feb] তিনি দীনেশচন্দ্র সেনকে লিখছেন :

আমার মুস্কিল হইয়াছে এই যে, চৈত্রের পর্য্যন্ত চোখের বালি লেখা ছিল তাহার পরে আর আলস্যের ভিড়ে এবং নানা অকাজের তাড়নায় লিখিয়া উঠিতে পারি নাই। আর বিলম্ব করিতে সাহস হয় না। আজই লিখিতে বসিয়াছিলাম—ঠিক দুটি লাইন যখন লিখিয়াছি এমন সময় আপনার চিঠি পাইলাম।

দীনেশচন্দ্রের বঙ্গভাষা ও সাহিত্য গ্রন্থের প্রথম সংস্করণ [2 Dec 1896] প্রকাশিত হওয়ার পর রবীন্দ্রনাথ স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে তাঁকে সাধুবাদ জানান ও ১৩০৫ বঙ্গাব্দের স্ব-সম্পাদিত ভারতী-তে এই গ্রন্থটি অবলম্বনে কয়েকটি ভাষাতত্ত্বমূলক প্রবন্ধ রচনা করেন। গ্রন্থটির দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয় 5 Oct 1901 [শনি ১৯ আশ্বিন] তারিখে। সমালোচনার জন্য দীনেশচন্দ্র তাগিদ দিলে রবীন্দ্রনাথ উক্ত পত্রে লেখেন :

গতকল্য অপরাহ্নে আপনার বইখানি পাঠিকা সম্প্রদায়ের লুব্ধ হস্ত হইতে উদ্ধার করিয়া আমার টেবিলের উপর রাখিয়াছি—সেখান হইতে সে আমার প্রতি মাঝে মাঝে ভর্ৎসনা কটাক্ষপাত করিতেছে—কিন্তু অসমাপ্ত কর্ত্তব্যের অঙ্কুশাঘাতে আমার লেখনীকে অন্য পথে ছুটিতে হইতেছে। একটু অপেক্ষা করুন। গল্পটিকে কিছুদূর অগ্রসর করিয়াই সর্ব্বপ্রথমে আপনাকে লইয়া পড়িব ইহাতে সংশয় করিবেন না।[১৪২]

এই সমালোচনা তিনি লেখেন জ্যৈষ্ঠ ১৩০৯-এ শিলাইদহে, ঐ মাসেই আলোচনাসমিতির একটি অধিবেশনে পাঠ করার পর শ্রাবণ ১৩০৯-সংখ্যা বঙ্গদর্শন-এ সেটি মুদ্রিত হয়।

ব্রহ্মচর্যাশ্রম প্রতিষ্ঠিত হওয়ার এক মাসের মধ্যেই সেখানকার ছাত্রসংখ্যা বেড়ে পাঁচ থেকে 'গুটি বারো'তে দাঁড়িয়েছিল, সেকথা আমরা বলেছি। এদের কয়েকজনকে সংগ্রহ করেছিলেন ব্রহ্মবান্ধব। কিন্তু অন্যেরাও যে এই বিদ্যালয়ে পুত্রকে প্রেরণ করার জন্য আগ্রহ বোধ করছিলেন, তার পরিচয় আছে দীনেশচন্দ্রকে লেখা রবীন্দ্রনাথের ২৬ চৈত্র [বুধ 9 Apr] তারিখের চিঠিতে। নববর্ষের উৎসবে আমন্ত্রণ জানিয়ে তিনি লিখেছেন :

'ছেলে লওয়া সম্বন্ধে আমাদের নিয়ম এই যে, দশ বৎসরের অধিক বয়স্ক ছেলেদের আমরা বিদ্যালয়ে লই না। কারণ ছোট ছেলেদের সহিত বড় ছেলেদের মিশিতে দেওয়া নিরাপদ নহে। আপনার ছেলেটির বয়স যদি অধিক না হয় তবে তাহাকে একবার দেখিতে ইচ্ছা করি।[১৪৩]

এই নিয়ম সর্বত্র ও সর্বথা অনুসৃত হয়নি। স্বয়ং রথীন্দ্রনাথেরই বয়স ছিল তেরো বছর, শ্রীশচন্দ্র মজুমদারের পুত্র সন্তোষচন্দ্র [1884-1926] যোলো বছর বয়সে কিছুদিন পরে বিদ্যালয়ে ভর্তি হন। ছাত্রদের বয়সের সীমা বৃদ্ধি বা হ্রাস নিয়ে একধরনের দ্বিধা ব্রহ্মচর্যাশ্রমের প্রাথমিক ইতিহাসে দেখা যায়। যাই হোক্, দীনেশচন্দ্রের পুত্র অরুণচন্দ্রকে বিদ্যালয়ে ভর্তি করা হয়েছিল।

বঙ্কিমচন্দ্রের সহযোগী লেখক অক্ষয়চন্দ্র সরকার রবীন্দ্রপ্রতিভাকে প্রথমাবধিই স্নেহের ছলে ব্যঙ্গবিদ্রুপ করে এসেছেন। তবু নিতান্ত শৈশবে মাতৃহারা কনিষ্ঠ পুত্র অচ্যুতচন্দ্রের [জন্ম : ১৭ শ্রাবণ ১২৯৭ :1 Aug 1890] শিক্ষাক্ষেত্র হিসেবে তিনি নির্বাচন করেছেন রবীন্দ্রনাথের ব্রহ্মচর্যাশ্রমকে। তারও আগে তারক নামের চুঁচুড়ার একটি বালককে তিনি বিদ্যালয়ের ছাত্র হিসেবে প্রেরণ করেছিলেন।

কিন্তু ত্রিপুরার মধ্যম রাজকুমার ব্রজেন্দ্রকিশোর দেববর্মাকে ছাত্ররূপে না পাওয়ার বেদনা রবীন্দ্রনাথ ভুলতে পারেননি। কুমিল্লার ইংরেজ-পরিচালিত বিদ্যালয়ে তাঁকে ভর্তি করানো হয়েছে জেনে 'শুক্রবার'-চিহ্নিত তারিখহীন পত্রে তিনি লিখেছেন :

কুমিল্লায় তোমাকে প্রবেশ করান হইয়াছে শুনিয়া দুঃখিত হইলাম। ইহা যে তোমার পক্ষে কষ্টকর হইবে তাহা আমি বেশ বুঝিতে পারিতেছি। এই বিজাতীয় বর্বরগুলার অশিষ্ট ঔদ্ধত্য এবং কদর্য্য আচার অত্যন্ত পীড়াদায়ক। বিশেষতঃ তাহারা আমাদিগকে চায় না আমাদিগকে অবজ্ঞা করে, অথচ আমরা তাহাদের পশ্চাতে ঘুরিয়া বেড়াই ইহাই আমাদের পক্ষে অবমানকর। আমাদের সমস্ত জাতিকে যাহারা ঘৃণা করে আমাকে তাহারা সম্মান করিবে কি করিয়া, এবং করিলেই বা তাহা আমি গ্রহণ করিব কেন? অপমানিত জাতির পক্ষে এই সাহেবের সোহাগ লইবার চেষ্টা—এমন লজ্জাকর দৃশ্য আর কিছুই হইতে পারে না। যাহা হউক তুমি সহ্য করিয়া থাক—এবং মনে মনে আপনার স্বাতন্ত্র্য রক্ষা কর—এরূপ হইলে প্রতিকূল অবস্থার মধ্যেও তুমি নিজের তেজ রক্ষা করিতে পারিবে।···ঈশ্বর তোমাকে বিজাতির মোহ হইতে সর্ব্বদা রক্ষা করুন।[১৪৪]

ত্রিপুরা রাজ্য প্রাচীন ভারতীয় আদর্শে প্রজাকল্যাণমূলক হয়ে উঠুক, এই বাসনায় তিনি ত্রিপুরারাজ রাধাকিশোরমাণিক্য ও ক্ষত্রিয় রাজকুমার ব্রজেন্দ্রকিশোরকে এইধরনের পরামর্শ ও উপদেশ দিয়েছেন। ২৪ চৈত্র [সোম 7 Apr] ব্রজেন্দ্রকিশোরকে লিখিত একটি পত্রে তিনি পূর্ব উপদেশের পুনরাবৃত্তি করে লিখেছেন :

আমার বিদ্যালয়ে তোমার হয়ত না আসাই ভাল। কারণ আমি নিভৃতে লোকের আলোচনার বাহিরে আমার কাজ করিতে চাই। তুমি এখানে আসিলে সহস্র কথার সৃষ্টি হইয়া হট্টগোলের মধ্যে পড়িতে হইবে; তাহাতে আমার কাজের শান্তি নষ্ট হইবার সম্ভাবনা।

রবীন্দ্রনাথ অবশ্য ব্রজেন্দ্রকিশোরের মঙ্গলকামনায় কখনও বিরত হননি। এমন-কি এক স্ত্রী বর্তমানে তাঁর দ্বিতীয় স্ত্রী গ্রহণের প্রস্তাবও প্রথানুগত্যের অজুহাতে তিনি সমর্থন করে গেছেন!

বঙ্গদর্শন-এর চৈত্র-সংখ্যাতে [১।১২] রবীন্দ্রনাথের দুটি রচনা মুদ্রিত হয় :

৫৫৫-৭০ 'বারোয়ারি মঙ্গল' দ্র ভারতবর্ষ ৪।৪২৪-৪০

৫৭৬-৮৮ 'চোখের বালি' ৩৪-৩৭ দ্র চোখের বালি ৩।৪১২-২৬ [৩৩-৩৬]

জনসাধারণের কাছ থেকে চাঁদা তুলে মৃত মনীষীর মূর্তিস্থাপনের বিজাতীয় 'মার্বল পাথরের পিণ্ডদানপ্রথা'র বিরোধিতা করে লিখিত 'বারোয়ারি-মঙ্গল' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ প্রকারান্তরে বঙ্গদর্শন-এ প্রচারিত ভারতীয় সামাজিক আদর্শেরই জয়গান করেছেন। এই আদর্শে প্রত্যেক গৃহীই আপন সাধ্য অনুসারে মঙ্গলব্রত গ্রহণ করে

এবং গ্রহীতার অপেক্ষা দাতাই নিজেকে অধিকতর কৃতার্থ বলে মনে করে। এই কারণেই 'ভারতবর্ষে অধ্যাপক সমাজের নিকট হইতে ব্রাহ্মণের প্রাপ্য দানদক্ষিণা গ্রহণ করিয়া থাকেন, কিন্তু অধ্যাপনার বেতন শোধ করিয়া দিয়া আমাদের সমাজ তাঁহাদিগকে অপমান করে না।' কারণ 'মঙ্গলকর্ম যিনি করিবেন, তিনি নিজের মঙ্গলের জন্যই করিবেন, ইহাই ভারতবর্ষের আদর্শ। কোনো বাহ্যমূল্য লইতে গেলেই মঙ্গলের মূল্য কমিয়া যায়।' প্রসঙ্গক্রমে অন্যান্য ব্যাপারেও য়ুরোপীয় আদর্শের শ্রেষ্ঠত্ব মেনে নিতে রবীন্দ্রনাথ অস্বীকার করেছেন : 'প্রতিযোগিতার উত্তরোত্তর প্রশ্রয়ে ইংলণ্ড-ফ্রান্স-জর্মনি-রাশিয়া-আমেরিকাকে ক্রমশ কিরূপ উগ্র হিংস্রতার দিকে টানিয়া লইয়া যাইতেছে, কিরূপ প্রচণ্ড সংঘাতের মুখে দাঁড় করাইয়াছে, সভ্যনীতিকে কিরূপ বিপর্যস্ত করিয়া দিতেছে, তাহা দেখিলে প্রতিযোগিতাপ্রধান সভ্যতাকেই চরম সভ্যতা বলিতে কোনোমতেই প্রবৃত্তি হয় না। বল বুদ্ধি ও ঐশ্বর্য মনুষ্যত্বের একটা অঙ্গ হইতে পারে, কিন্তু শান্তি, সামঞ্জস্য এবং মঙ্গলও কি তদপেক্ষা উচ্চতর অঙ্গ নহে?

সঙ্গীত-প্রকাশিকা, চৈত্র ১৩০৮ [১।৭] :

৭৯-৮০ ছায়ানট-একতালা। হে সখা মম হৃদয়ে রহ! স্বরলিপিকার কাঙালীচরণ সেন।

ভারত-সংগীত-সমাজের উদ্যোগে সংগীত-গ্রন্থাদির অনুবাদ এবং প্রাচীন ও আধুনিক গীতগুলির স্বরলিপি প্রকাশের উদ্দেশ্য নিয়ে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের সম্পাদনায় 'সঙ্গীত-প্রকাশিকা মাসিক পত্রিকা রূপে আশ্বিন ১৩০৮ থেকে প্রকাশিত হতে থাকে। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, কাঙালীচরণ সেন, ইন্দিরা দেবী প্রভৃতি স্বরলিপিকার দ্বারা কৃত বহু রবীন্দ্রসংগীতের স্বরলিপি এই পত্রিকায় মুদ্রিত হয়।

২৯ মাঘ [মঙ্গল 11 Feb] রবীন্দ্রনাথ কলকাতা থেকে শান্তিনিকেতনে গিয়েছিলেন। পুরো ফাল্গুন মাস ও চৈত্রের প্রথম সপ্তাহটি সেখানে কাটিয়ে তিনি আবার কলকাতায় আসেন দোলপূর্ণিমার দিন ১০ চৈত্র [সোম 24 Mar] তারিখে—তাঁর 'ঐ রোজ হাবড়ার ষ্টেসন হইতে আসার' হিসাব পাওয়া যায়। এই দিনই তিনি 'হেদুয়াতলা' যান, সম্ভবত ব্রহ্মবান্ধবের সঙ্গে দেখা করা তাঁর উদ্দেশ্য ছিল। পরের দিন ১১ চৈত্র তিনি যান বিডন স্ট্রীট। এছাড়া তাঁর আর কোথাও যাওয়া-আসার হিসাব পাওয়া যায় না, সুতরাং এযাত্রায় তিনি কলকাতায় কতদিন ছিলেন বলা সম্ভব নয়। সুরেন্দ্রনাথের বিবাহ-সংক্রান্ত কিছু কথাবার্তা এই সময়ে চলছিল, ১২ চৈত্র 'শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রবাবুর বিবাহ সংক্রান্ত পত্র লইয়া দরয়ানের বালীগঞ্জ' যাতায়াতের হিসাব পাওয়া যায়। এই কথাবার্তায় রবীন্দ্রনাথও যোগ দিয়ে থাকতে পারেন।

সম্ভবত এইবারেই জাপানী মনীষী কাউন্ট ওকাকুরা কাকুজো [Okakura Kakuzo, 1862-1913]র সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়। কয়েকদিন পরে ৩ বৈশাখ ১৩০৯ [বুধ 16 Apr 1902] তিনি অবলা বসুকে লিখেছেন : 'নিবেদিতার কল্যাণে একটি জাপানীর সহিত আমার বন্ধুতা হইয়াছে'[১৪৫]—এই 'জাপানী'ই হচ্ছেন কাউন্ট ওকাকুরা। জাপানের প্রসিদ্ধ সামুরাই-বংশোদ্ভূত ওকাকুরা অল্প বয়স থেকেই ঐতিহ্যানুগত শিল্পের অনুরাগী। জাপানের ইম্পিরিয়াল আর্ট কমিশনের সদস্যরূপে 1886-এ তিনি য়ুরোপ ও আমেরিকা ভ্রমণ করেন। ফিরে এলে তাঁকে টোকিয়োর 'নিউ আর্ট স্কুল'-এর অধ্যক্ষ করা হয়, কিন্তু উক্ত প্রতিষ্ঠানে য়ুরোপীয় রীতি অনুসরণের জন্য চাপ এলে 1897-এ পদত্যাগ করে তিনি কয়েকজন তরুণ শিল্পীকে নিয়ে 'নিপ্পন বিজিৎসু [Bijitsu-in] বা 'হল অব ফাইন আর্টস' প্রতিষ্ঠা করেন। ইম্পিরিয়াল আর্কিওলজিক্যাল কমিশনের প্রধান হিসেবেও তিনি

যথেষ্ট ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন।[১৪৬] স্বামী বিবেকানন্দের আমেরিকান শিষ্যা মিস ম্যাকলাউড জাপানে গেলে ওকাকুরা তাঁর সঙ্গে পরিচিত হন। ওকাকুরার বিখ্যাত বই *Ideals of the East*-এর প্রাথমিক খসড়া মিস ম্যাকলাউডের সাহায্যে প্রণীত হয়। সাংস্কৃতিক দিক দিয়ে এশিয়ার একত্ব প্রতিপাদন এই গ্রন্থের প্রধান লক্ষ্য ছিল।

আমেরিকা ও য়ুরোপে এশিয়ার মর্যাদাবৃদ্ধিকারী হিন্দু-সন্ন্যাসী স্বামী বিবেকানন্দকে জাপানে নিয়ে যাওয়ার জন্য অনেকেই আগ্রহী ছিলেন। Jun 1901-এ ওকাকুরা স্বামীজীকে আমন্ত্রণ জানিয়ে পাথেয় বাবদ ৩০০ টাকা পাঠিয়ে দেন। মঠের কাজ ও স্বাস্থ্যের জন্য স্বামীজীর যাওয়া হয়নি। মিস ম্যাকলাউডের সঙ্গে ওকাকুরা ও তরুণ ব্রহ্মচারী হোরি সান 7 Dec1901 [শনি ২১ অগ্র°] জাপান ত্যাগ করে কলম্বো, মাদ্রাজ ও কটক হয়ে কলকাতা পৌঁছন 6 Jan 1902 [সোম ২২ পৌষ] তারিখে। এইদিনই সন্ধ্যাতে তাঁরা বেলুড় মঠে গিয়ে স্বামীজীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন।[১৪৭]

ওকাকুরার সঙ্গে নিবেদিতার পরিচয় হয় সম্ভবত Mar 1902-এর গোড়ায়। তিনি স্বামীজীর সঙ্গে য়ুরোপ যাত্রা করেন 20 Jun 1899 [৬ আষাঢ় ১৩০৬], রমেশচন্দ্র দত্ত ও মিসেস ওলি বুলের সঙ্গে কলকাতায় ফিরে আসেন 5 Feb 1902 [বুধ ২৩ মাঘ] তারিখে*—তখন ওকাকুরা উত্তর ভারতের বিভিন্ন শিল্পতীর্থ ভ্রমণ করছেন। স্বামীজীর ইংরেজি জীবনী থেকে জানা যায়, ওকাকুরা 9 Mar [রবি ২৫ ফাল্গুন] বেলুড় মঠে গিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করেন অর্থাৎ এর মধ্যেই তিনি ভ্রমণ শেষ করে কলকাতায় ফিরে এসেছেন। এর পর তিনি মিস ম্যাকলাউডের অতিথিরূপে চৌরঙ্গির আমেরিকান কনসুলেটে বাস করতে থাকেন।

মিসেস ওলি বুল ওকাকুরার সম্মানে কনসুলেট ভবনে একটি পার্টি দেন। এই পার্টিতেই নিবেদিতার আগ্রহে সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর ওকাকুরার সঙ্গে পরিচিত হন ও প্রায় তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। দীর্ঘকাল পরে *The Visvabharati Quarterly*-র Aug 1936 [pp. 65-72]-সংখ্যায় সুরেন্দ্রনাথ ওকাকুরা বিষয়ে তাঁর স্মৃতি লিপিবদ্ধ করতে গিয়ে এই সাক্ষাৎকারের বিবরণ দিয়েছেন। কিন্তু সম্ভবত রাজনৈতিক কারণে সুরেন্দ্রনাথ সেখানে অনেক-কিছুই গোপন করেছেন। ফলে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে ওকাকুরার পরিচয়ের বিবরণ সেখানে অনুপস্থিত। অবনীন্দ্রনাথ বলেছেন, তিনি উপস্থিত ছিলেন এই পার্টিতে : 'প্রথম তাঁর [নিবেদিতা] সঙ্গে আমার দেখা হয় আমেরিকান কনসলের বাড়িতে। ওকাকুরাকে রিসেপ্‌শন দিয়েছিল, তাতে নিবেদিতাও এসেছিলেন।'[১৪৮] রবীন্দ্রনাথও হয়তো এই পার্টিতেই ওকাকুরার সঙ্গে পরিচিত হন। পার্টির তারিখটি জানা গেলে এ-সম্পর্কে নিশ্চিত সিদ্ধান্ত করা যেত।

রবীন্দ্রনাথ ওকাকুরাকে শান্তিনিকেতনে যাওয়ার আমন্ত্রণ জানান এবং ওকাকুরা সেই আমন্ত্রণ গ্রহণ করেন। বিষয়টি জানা যায় সরকারী ক্যাশবহির দুটি হিসাব থেকে; ২৬ চৈত্র [বুধ 9 Apr]-এর হিসাব : 'শ্রীযুক্ত সত্যবাবু মহাশয় জাপানী ভদ্রলোকের শান্তিনিকেতন গমনের বিশয় জানিবার জন্য শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্র বাবুর নিকট বালীগঞ্জ যাতায়াতের' ও ২৯ চৈত্র [শনি 12 Apr] তারিখের হিসাব : '২ জন জাপানী বড় লোক শান্তিনিকেতনে শুভগমন উপলক্ষে ব্যায় শোধ..১০১ ⁄ ৩'—সমারোহপূর্ণ এই সফরে ওকাকুরার সহযাত্রী ছিলেন জাপানের একটি বৌদ্ধমঠের অধ্যক্ষ রেভারেণ্ড ওডা [Rev. Oda], প্রস্তাবিত ধর্মসভায় যোগ দেবার জন্য স্বামীজীকে অনুরোধ করার জন্য যিনি কলকাতায় আসেন 2 Apr [বুধ ১৯ চৈত্র] তারিখে। এরা সম্ভবত

উক্ত ২৯ চৈত্র শান্তিনিকেতন থেকে প্রত্যাবর্তন করে জোড়াসাঁকোয় মহর্ষির সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন, সঙ্গে নিবেদিতাও ছিলেন—ঐ তারিখের হিসাব : 'দং মিস্ নোবল প্রভৃতি শ্রীযুক্ত কর্ত্তাবাবু মহাশয়ের সহিত সাক্ষাত করিতে আসায় উহাদের আহারের ব্যায়….২ ০'।

ওকাকুরার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের এই বন্ধুত্ব গভীর ও দীর্ঘস্থায়ী হয়েছিল। কিছুদিন পরেই তিনি শ্রীশচন্দ্র মজুমদারকে অনুরোধ করেছেন বুদ্ধগয়ায় ওকাকুরার জন্য জমি সংগ্রহ করে দিতে, 1913-এ আমেরিকায় গিয়ে বোস্টনে তাঁর সঙ্গে দেখা করেন, 1916-এ জাপানভ্রমণের সময়ে ওকাকুরার বাড়ি গিয়ে তাঁর স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেছিলেন।

আমরা আগেই বলেছি, রবীন্দ্রনাথ কবে কলকাতা থেকে ফিরে এসেছিলেন তা জানা যায়নি। কিন্তু ফিরে এসেই ঋণশোধের জন্য মোতিচাঁদ নাখতারের অ্যাটর্নির তাগিদে বিব্রত হয়ে পড়েছেন, সেই খবর পাওয়া যায় প্রিয়নাথ সেনকে লেখা ২০ চৈত্রের [বৃহ 3 Apr] পত্রে। এইটি নিয়ে উপর্যুপরি তাঁকে লেখা চারটি পত্রে একই বিষয় প্রকারান্তরে আবির্ভূত, সে-প্রসঙ্গ পূর্বে আলোচিত হয়েছে। অন্য সংবাদ আছে সম্ভবত ২২ চৈত্রে [শনি 5 Apr] লেখা একটি তারিখহীন পত্রে :'বিদ্যালয়ে আমাকে ছয় ঘণ্টা কাজ করিতে হয়—বাকি সময়টায় আগামী নববর্ষের জন্য একটা লেখা লিখিতে হইতেছে—সে লেখা আজকালের মধ্যে শেষ করা চাইই।'[১৪৯] বস্তুত নববর্ষের জন্য একটি নয়, দুটি লেখা তাঁকে লিখতে হয়েছিল—একটি তিনি পাঠ করেন মন্দিরে প্রাতঃকালীন উপাসনায় ['নববর্ষ' দ্র ধর্ম ১৩।৩৮৬-৯২] ও অপরটি পঠিত হয় 'শান্তিনিকেতনে ছাত্রসমাজে' ['নববর্ষ' দ্র ভারতবর্ষ ৪।৩৬৭-৭৭]। আরও একটি রচনা তাঁকে লিখতে হল বর্ষশেষের দিন মন্দিরে সায়ংকালীন উপাসনায় পাঠ করার জন্য, এটি জ্যৈষ্ঠ ১৮২৪ শক [১৩০৯]-সংখ্যা তত্ত্ববোধিনী-তে [পৃ ২২-২৪] 'শান্তিনিকেতনে বর্ষশেষ' ['বর্ষশেষ' দ্র ধর্ম ১৩।৩৮৪-৮৬] শিরোনামে মুদ্রিত হয়। আমরা জানি, রবীন্দ্রনাথ ১২৯১ বঙ্গাব্দের বর্ষশেষ সন্ধ্যায় আদি ব্রাহ্মসমাজে একটি রচনা পাঠ করেছিলেন—কিন্তু সেটি ছিল 'বীরভূম অঞ্চলে দুর্ভিক্ষপীড়িত লোকদিগের সাহায্যার্থ' দান সংগ্রহের জন্য অনুষ্ঠিত সভা [দ্র রবিজীবনী ২। ৩০৫-০৭]'। কিন্তু বর্ষশেষের উপাসনায় রবীন্দ্রনাথ রচনা পাঠ করলেন এই বৎসরেই প্রথম। পরে শান্তিনিকেতনে উপস্থিত থাকলে এই ধরনের আনুষ্ঠানিক উপাসনায় তিনি নিয়মিত ভাষণ দান করেছেন।

প্রিয়নাথকে লেখা ২২ চৈত্রের চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ তাঁকে নববর্ষের উৎসবে যোগ দেবার জন্য আহ্বান জানিয়েছেন : বর্ষশেষের দিন যদি শান্তিনিকেতনে আসিয়া বর্ষারম্ভের দিন এখানে যাপন করিতে পার তবে বিশেষ আনন্দিত হইব। আমাদের বিদ্যালয়ে সেদিন নববর্ষের উৎসব হইবে।'[১৫০] আর একটি পত্রে তাঁকে লিখছেন : 'শৈলেশ [চন্দ্র মজুমদার] কিম্বা তাদের কেউ নববর্ষ উপলক্ষ্যে নিশ্চয় এখানে আস্‌বে—তুমি তাদের আশ্রয় করে অনায়াসে যাত্রা করতে পার।…যদি প্রাণপণ চেষ্টায় প্রমথবাবুকে [কবি প্রমথনাথ রায়চৌধুরী] ধরে আন্‌তে পার তাহলে বেশ হয়।'[১৫১] এই উপলক্ষে তিনি আরও অনেককে আহ্বান করেন। দীনেশচন্দ্র সেনকে ২৬ চৈত্র [বুধ 9 Apr] লিখেছেন : 'আগামী ১লা বৈশাখে শান্তিনিকেতনের বিদ্যালয়ে নববর্ষের উৎসব হইবে —আপনার ছেলেটিকে লইয়া যদি সংক্রান্তি অথবা তাহার পূর্ব্বদিনে আসেন এবং উৎসবে যোগদান করেন ত আনন্দিত হইব।'[১৫২] দীনেশচন্দ্রের আর্থিক অবস্থা তাঁর জানা ছিল, তাই লিখেছেন : 'পাথেয়ের ভার সম্পূর্ণ আমার উপর দিবেন—আহূতের পাথেয় আহ্বানকার দেয় ইহাই আমাদের দেশের সনাতন প্রথা—অতএব এ

সম্বন্ধে আপনি যদি বিলাতী কায়দার অনুসরণ করেন তবে দুঃখিত হইব।' ক্ষণিকা-র মুদ্রক প্রেমতোষ বসুকে রবীন্দ্রনাথ ২৫ চৈত্রে লিখেছেন :

> ১লা বৈশাখে এখানে সভ্রাতৃক আসিতেছেন ত? দ্বিধা করিবেন না। ১লা বৈশাখের অন্তত আগের দিন না আসিলে চলিবে না। চিত্ততোষবাবুকে প্রেস চালাইবার ভার দিয়া পশ্চাতে ফেলিয়া আসিবেন না। নরেন্দ্রবাবুকেও বহন করিয়া আনিবার চেষ্টা করিবেন।...কেবল বিছানাটা সঙ্গে আনিবেন। একটা মশারি যদি না আনেন ত বুঝিতে পারিবেন আনিবার দরকার ছিল।[১৫৩]

প্রিয়নাথ বা দীনেশচন্দ্র এই উৎসবে আসেননি, কিন্তু 'কলিকাতা হইতে সেদিন অনেক কলেজের ছাত্র এবং মোহিতবাবু প্রভৃতি অধ্যাপকদল এখানে উপস্থিত ছিলেন।'[১৫৪]

সাধারণ রঙ্গমঞ্চে 'রাজা বসন্ত রায়' নাটকের অভিনয় বর্তমান বৎসরেও কয়েকবার হয়েছে। মিনার্ভা থিয়েটারে নাটকটি ১৫ জ্যৈষ্ঠ [বুধ 29 May], ২২ জ্যৈষ্ঠ [বুধ 5 Jun], ২৩ আষাঢ় [রবি 7 Jul] ও ১৫ শ্রাবণ [বুধ 31 Jul] অভিনীত হয়। ৫ পৌষ [শুক্র 20 Dec] বঙ্গবাসী কলেজের ছাত্ররা কোরিন্থিয়ান থিয়েটারে 'রাজা ও রানী' নাটকটি মঞ্চস্থ করে। অমৃতবাজার পত্রিকা [25 Dec] লেখে : The party did admirably well on the occasion, and the songs were most charmingly melodious. The songs of Sachindra Nath kept the audience spell bound.'

প্রাসঙ্গিক তথ্য : ১

মহর্ষির প্রপৌত্র দিনেন্দ্রনাথের বিবাহ মহাসমারোহে অনুষ্ঠিত হয়েছিল ২৩ মাঘ ১৩০৬ [সোম 5 Feb 1900] রজনীমোহন চট্টোপাধ্যায় ও সুনয়নী দেবীর অপ্রাপ্তবয়স্কা কন্যা বীণাপানির সঙ্গে [দ্র রবিজীবনী ৪।২৭০]। কন্যা ঋতুমতী হলে ঠাকুরপরিবারের রীতি-অনুযায়ী 'দ্বিতীয় বিবাহ' বা ফুলশয্যা অনুষ্ঠিত হয় বর্তমান বৎসরের ১২ বৈশাখ [বৃহ 25 Apr] তারিখে—এই অনুষ্ঠানেও সমারোহের ভাব হয়নি, মোট খরচ ৪৭৪ ৩। কিন্তু এঁদের দাম্পত্যজীবন দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। এই বৎসরেই ১৮ চৈত্র [মঙ্গল 1 Apr 1902] ডিপথেরিয়া রোগে[১৫৫] বীণাপানি দেবীর মৃত্যু হয়।

সম্ভবত এই চৈত্র মাসেই অবনীন্দ্রনাথের তৃতীয়া কন্যা শোভা বা তপসীর প্লেগের আক্রমণে মৃত্যু হয়। ডাক্তার ছোটো ছেলেমেয়েদের অন্যত্র সরিয়ে দেবার নির্দেশ দিলে তাদের সাময়িকভাবে রবীন্দ্রনাথের লালবাড়িতে পাঠানো হয়, এমন কথা গগনেন্দ্রনাথের কন্যা পূর্ণিমা দেবী [চট্টোপাধ্যায়] লিখেছেন।[১৫৫] সরকারী ক্যাশবহিতে ১৮. আষাঢ় ১৩০৯ তারিখে একটি হিসাব দেখা যায় : 'শ্রীযুক্ত গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় স্বপরিবারে শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রবাবু মহাশয়ের বাটীতে গত চৈত্র মাসে কএকদিন অবস্থিতি করায় ইলেকট্রিক আলো জ্বালার ব্যয় ১২'—এই হিসাবই আমাদের উক্ত অনুমানের কারণ।

দ্বিজেন্দ্রনাথের তৃতীয় পুত্র নীতীন্দ্রনাথ [1867-1900] গত বৎসরের কার্তিক মাস থেকে গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েন। ইনি রবীন্দ্রনাথ ও মৃণালিনী দেবীর অত্যন্ত প্রিয়পাত্র ছিলেন—তাঁদের পুত্রকন্যাদের সঙ্গেও এঁর সম্পর্ক ছিল অতি ঘনিষ্ঠ। তাই এঁর অসুস্থতায় রবীন্দ্রনাথ দিনের পর দিন রাত জেগে কীভাবে সেবা

করেছিলেন, তার কিছু বিবরণ পূর্ববর্তী অধ্যায়ে প্রদত্ত হয়েছে। কিন্তু সমস্ত প্রয়াস ব্যর্থ করে এঁর মৃত্যু হয় ২৭ ভাদ্র [বৃহ 13 Sep] রাত্রি ২টার সময়। নীতীন্দ্রনাথের আদ্যশ্রাদ্ধ হয় ৬ আশ্বিন [রবি 22 Sep]।

দ্বিজেন্দ্রনাথের চতুর্থ পুত্র সুধীন্দ্রনাথের প্রথম পুত্র সৌম্যেন্দ্রনাথের জন্ম হয় ২২ আশ্বিন [মঙ্গল ৪ Oct]। সৌম্যেন্দ্রনাথ লিখেছেন : 'আমার দাদা দিনেন্দ্রনাথের পরে আমি বাড়ির প্রথম ছেলে চার-পাঁচ বোনের পরে। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ আমার নামকরণ করেছিলেন।'[১৫৬] কিন্তু তাঁর পূর্বেই অরুণেন্দ্রনাথের একটি পুত্র জন্মগ্রহণ করে, ৮ মাঘ [মঙ্গল 21 Jan 1902] এই পুত্রটির মৃত্যু হয়।

রবীন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠা কন্যা মাধুরীলতা [বেলা]র সঙ্গে বিহারীলাল চক্রবর্তীর তৃতীয় পুত্র শরৎকুমারের বিবাহ হয় ১ আষাঢ় [শনি 15 Jun] রাত্রি ৯টার সময়ে। দীর্ঘদিন নানা উত্থানপতনের ভিতর দিয়ে এই বিবাহের কথাবার্তা এগিয়েছিল, রবীন্দ্রনাথের জীবন-কথা অংশে তার বিস্তৃত বিবরণ দেওয়া হয়েছে। ঠাকুরপরিবারের রীতি অনুযায়ী শরৎকুমার ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষিত হন ২৮ জ্যৈষ্ঠ [মঙ্গল 11 Jun]। এই বিবাহ উপলক্ষে রবীন্দ্রনাথ শিলাইদহ থেকে সপরিবারে চলে আসেন, তাঁর 'নূতন বাটী' বা 'লালবাড়ি'তে গৃহপ্রবেশ অনুষ্ঠান হয় ১৬ জ্যৈষ্ঠ [বৃহ 30 May] তারিখে।

মাধুরীলতার বিবাহের মাত্র এক মাস চব্বিশ দিন পরে ২৪ শ্রাবণ [শুক্র 9 Aug] রবীন্দ্রনাথের মাত্র সাড়ে দশ বছরের মধ্যমা কন্যা রেণুকার বিবাহ হয় এল এম. এফ. ডাক্তার সত্যেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যের সঙ্গে। উচ্চশিক্ষার জন্য বিলেত পাঠাবার প্রতিশ্রুতিকেই পণ হিসাবে গ্রহণ করে সত্যেন্দ্রনাথ এই বিবাহ করেন, তাই বিবাহের খরচ ন্যূনতম হয়েছিল। কিন্তু অব্যবস্থিতচিত্ত সত্যেন্দ্রনাথ উচ্চশিক্ষা সমাপ্ত করতে পারেননি, পরে একটি বোঝার মতো দীর্ঘদিন রবীন্দ্রনাথ তাঁকে বহন করতে বাধ্য হন।

একই দিনে হেমেন্দ্রনাথের ষষ্ঠ কন্যা সুনৃতা দেবীর বিবাহ হয় নন্দলাল ঘোষালের সঙ্গে। এই বিবাহের আয়োজন অবশ্য কিছুকাল আগে থেকেই চলছিল। ক্যাশবহিতে দেখি : 'শ্রীমতী সুনৃতা দেবীর শুভ বিবাহে বরকে কর্ত্তাবাবু মহাশয়ের যৌতুক দিবার ব্যায় গিণি ২৬৭ থান ১৫ হিঃ ৪০০৲'—সেখানে সত্যেন্দ্রনাথকে যৌতুক দেওয়া হয় মাত্র ৪টি গিণি; অবশ্য তাঁর বিলাতযাত্রা, সেখানে অবস্থানকালীন মাসিক খরচ, প্রত্যাবর্তনের ব্যয়, ফিরে আসার পর ডিস্পেনসারি স্থাপনের ব্যয় প্রভৃতি সমস্ত খরচ সরকারী ক্যাশ থেকেই করা হয়েছিল। হেমেন্দ্রনাথের গুণান্বিতা কন্যাদের মধ্যে সুনৃতার ভূমিকা খুবই ম্লান—তাঁর স্বামীও বিশেষ কোনো পরিচয় রাখতে পারেননি। এঁর বোন সুষমা গুণী মেয়ে ছিলেন—ব্যারিস্টার যোগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে তাঁর বিবাহ এর আগেই ২৪ ফাল্গুন ১৩০৭ [বুধ 7 Mar 1900] তারিখে নিষ্পন্ন হয়েছিল।

এর কয়েকদিন পরেই ২৯ শ্রাবণ [বুধ 14 Aug] দ্বিজেন্দ্রনাথের কনিষ্ঠ জামাতা রমণীমোহন চট্টোপাধ্যায়ের জ্যেষ্ঠা কন্যা মুরলার সঙ্গে প্রেমাংশু চক্রবর্তীর বিবাহ হয়।

ঠাকুরপরিবারে আরও একটি বিবাহের সূচনা হয় এই বৎসরে। হেমেন্দ্রনাথের কনিষ্ঠ পুত্র ঋতেন্দ্রনাথের ভাবী বধূ অলকা দেবীকে আশীর্বাদ করা হয় ৮ ফাল্গুন [মঙ্গল 19 Feb]; বিবাহটি হয় ২৩ শ্রাবণ ১৩০৯ [শুক্র ৪ Aug] তারিখে। এই পরিবারের রীতি অনুযায়ী সত্যেন্দ্রনাথের একমাত্র জীবিত পুত্র সুরেন্দ্রনাথের বিবাহের বয়স পার হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু বিবাহে সুরেন্দ্রনাথের আপত্তি ছিল। রবীন্দ্রনাথের গাজিপুর-বাসের [১২৯৫] সময়ে এক 'সরকারী ঠাকুরদাদা' ও তাঁর সুন্দর মেয়ের সঙ্গে পরিচয়ের কথা ইন্দিরা দেবী তাঁর অপ্রকাশিত স্মৃতিকথায় উল্লেখ করেন [দ্র রবিজীবনী ৩।৯৭], তিনি লিখেছেন :'সেই মেয়ের সুন্দর মেয়ের সঙ্গে....

বহুকাল পরে আমার মা তাঁর ছেলের বিয়ে দেবার চেষ্টায় তাকে দিনকতক বাড়ীতে এনে রেখেছিলেন; কিন্তু তখন আমার দাদার বিয়ে না করবার ভীষণ পণ কিছুতে টলাতে না পেরে আবার তাকে জিনিষপত্র উপহার দিয়ে কাঁদতে২ বিদায় দিলেন।' বর্তমান বৎসরে ১৬ ফাল্গুন [28 Feb] 'সত্যবাবু মহাশয় শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্র বাবুর বিবাহ জন্য বালীগঞ্জ হইতে আসিবার' বা ১২ চৈত্র [26 Mar] 'সুরেন্দ্রবাবুর বিবাহ সংক্রান্ত পত্র লইয়া দরয়ানের বালীগঞ্জ যাতায়াত' হিসাবগুলি হয়তো উক্ত প্রয়াসের অন্তর্গত। প্রিয়নাথ শাস্ত্রীর কন্যা সংজ্ঞা দেবীর সঙ্গে সুরেন্দ্রনাথের বিবাহ হয় ২১ আষাঢ় ১৩১০ [সোম 6 Jul 1903] তারিখে।

গগনেন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠা কন্যা সুনন্দিনী দেবীর [৯] বিবাহ হয় অগ্রহায়ণ মাসে প্রভাতনাথ চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে। ফাল্গুন মাসে অবনীন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠা কন্যা উমা [নেলী] দেবীর বিয়ে হয় নির্মলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে। উভয়েই দ্বারকানাথ ঠাকুরের ভাগিনেয়-পরিবারের সন্তান।

প্রাসঙ্গিক তথ্য : ২

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ৮৫ বৎসর বয়সে পদার্পণ করেন ৩ জ্যৈষ্ঠ [শুক্র 17 May]। কয়েক বৎসর ধরে এই দিনটি গোষ্ঠী-নির্বিশেষে ব্রাহ্মদের কাছে উৎসবের দিন বলে পরিগণিত হচ্ছিল। বর্তমান বৎসরেও তার অন্যথা হয়নি। তত্ত্ববোধিনী-তে লেখা হয় : 'মহর্ষির প্রতি ব্রাহ্মসাধারণের যে অকৃত্রিম অনুরাগ শ্রদ্ধা ও ভক্তি আছে, মহর্ষির বাটীর প্রশস্ত প্রাঙ্গণে তাহারই নিদর্শন স্বরূপ বিগত ৩রা জ্যৈষ্ঠ বৈকালে সকল সম্প্রদায় ভুক্ত প্রায় ৩০০ শত ব্রাহ্মের সমাগম হয়।···অপরাহ্ন ঠিক ৬টার সময় অর্চ্চনা হইয়া উপাসনা আরম্ভ হইল। শ্রদ্ধাস্পদ প্রিয়নাথ শাস্ত্রী উপাসনার ভার লইয়া ছিলেন। উপাসনা সমাপ্ত হইলে ভক্তিভাজন শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর স্বাভাবিক ওজস্বিতার সহিত মহর্ষি জীবনের সহিত উপনিষদ্ধর্ম্মের যে গুঢ় -যোগ তাহার কারণ অতি নিপুণতার সহিত বুঝাইয়া দিলেন।'[১৫৭] ত্রৈলোক্যনাথ সান্যাল ও শিবনাথ শাস্ত্রীর সংক্ষিপ্ত বক্তৃতা ও প্রার্থনার পর 'সঙ্গীত হইয়া সভা ভঙ্গ হইল।' তত্ত্ববোধিনী-র আষাঢ় সংখ্যায় হেমেন্দ্রনাথ সিংহ-স্বাক্ষরিত একটি ইংরেজি বিজ্ঞপ্তিতে 'Life and Teachings of Maharshi Devendra Nath Tagore, Pradhan Acharya of the Brahmo Samaj' বিষয়ে একটি বাংলা প্রবন্ধ রচনার জন্য তিনশো টাকার 'শান্তিনিকেতন পুরস্কার' ঘোষিত হয়; প্রবন্ধটি পরবর্তী ৭ পৌষের উৎসবে কোনো ভক্তশিষ্য কর্তৃক পঠিত হওয়ার কথা ছিল—বিচারক ছিলেন উমেশচন্দ্র দত্ত, ত্রৈলোক্যনাথ সান্যাল ও যোগীন্দ্রনাথ বসু। ৫ অগ্রহায়ণের মধ্যে প্রবন্ধটি পাঠাবার নির্দেশ থাকলেও মাঘ-সংখ্যাতেও বিজ্ঞপ্তিটি মুদ্রিত হয়। এইরূপ কোনো প্রবন্ধ-পাঠ বা পুরস্কারদানের সংবাদ আমরা পরবর্তী কোনো সংখ্যাতেও পাইনি।

মহর্ষির দীক্ষাদিন ৭ পৌষ স্মরণে শান্তিনিকেতনে ব্রহ্মোৎসব ও মেলার সূত্রপাত হয়েছিল ১২৯৮ বঙ্গাব্দ [1891] থেকে। প্রধানত সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের উদ্যোগে ১৩০৬ বঙ্গাব্দ [1899] থেকে দিনটি কলকাতাতেও পালিত হতে থাকে। বর্তমান বৎসর 'সুমঙ্গল ৭ই পৌষের [রবি 22 Dec 1901] অরুণোদয় বেলায় সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের উষাকীর্ত্তন-সম্প্রদায় ত্রিতাপ-নিবারণ সুমধুর ব্রহ্মনাম কীর্ত্তন করিতে করিতে পুণ্যশ্লোক পূজ্যপাদ শ্রীমন্মহর্ষিদেবের সফলা পুণ্যদীক্ষার বাৎসরিক অভিনন্দনের জন্য তাঁহার যোড়াসাঁকোর ভবনে উপস্থিত হন।

যথারীতি অভ্যর্থিত হইয়া তাঁহারা ভবনস্থ ব্রহ্মোপাসনা-মন্দিরে উপবিষ্ট হইলে ব্রহ্মনিষ্ঠ শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় উপাসনা ও সময়োপযোগী উপদেশাদি প্রদান করেন। তৎপরে সেই মহর্ষিদর্শনাভিলাষী ভক্তদল তৃতীয় তলে গিয়া শ্রীমন্মহর্ষিদেবের নিকট উপবিষ্ট হইলে'[১৫৮] তিনি তাঁদের উপদেশ প্রদান করেন। এইদিন অপরাহ্নে মহিলাসমাজে আচার্য দ্বিজেন্দ্রনাথ 'সত্যমেব জয়তে'-শীর্ষক একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন।

এইদিন শান্তিনিকেতনে একাদশ সাম্বৎসরিক ব্রহ্মোৎসব সাড়ম্বরে উদ্‌যাপিত হয়। প্রাতে 'অখিল ব্রহ্মাণ্ডপতি' বন্দন-গীত গাইতে গাইতে সকলে ব্রহ্মমন্দিরে প্রবেশ করলে প্রিয়নাথ শাস্ত্রী, চিন্তামণি চট্টোপাধ্যায় ও শম্ভুনাথ গড়গড়ি বেদি গ্রহণ করেন। প্রিয়নাথ শাস্ত্রীর উদ্বোধনের পরে 'সাধ্যায়ান্ত উপাসনা সমাপ্ত ও সঙ্গীত হইলে অনাথ দীন দরিদ্রদিগের জন্য প্রভূত অন্নবস্ত্র উৎসর্গ করা হইল।' 'দয়াময় দীনবন্ধু, চাহ করুণা-নয়নে' ও 'সহে না বিড়ম্বনা, (আর) এ আত্মবঞ্চনা' প্রভৃতি সংকীর্তন হয়, 'এবারে আমাদিগের সঙ্কীর্ত্তনের সহিত স্থানীয় কয়েক সম্প্রদায় যোগ দিয়াছিল।' 'কর তাঁর নাম গান' সংগীতের সঙ্গে সকলে ছাতিমতলা প্রদক্ষিণ করেন। মেলায় 'খুব জনতা। বেশ ক্রয় বিক্রয় চলিতেছে। বাউল সম্প্রদায় স্থানে স্থানে নৃত্য গীত করিতেছে।'

এর পরে ব্রহ্মচর্যাশ্রমের উদ্বোধন হয়, তার বিবরণ আমরা জীবন-কথা অংশে দিয়েছি। সায়ংকালীন উপাসনায় রবীন্দ্রনাথ, চিন্তামণি চট্টোপাধ্যায় ও শম্ভুনাথ গড়গড়ি বেদি গ্রহণ করেন। চিন্তামণি চট্টোপাধ্যায় উদ্বোধন ও রবীন্দ্রনাথ উপদেশ পাঠ করেন। 'পরে সঙ্গীত হইয়া সভাভঙ্গ হইল এবং মহান চটচটা শব্দে বহ্ন্যুৎসব আরম্ভ হইল।'[১৫৯]

১১ মাঘ [শুক্র 24 Jan, 1902] দ্বিসপ্ততিতম সাম্বৎসরিক ব্রাহ্মসমাজে আদি ব্রাহ্মসমাজ গৃহে প্রাতঃকালীন উপাসনায় 'দেহজ্ঞান ব্রহ্মজ্ঞান' সমবেত এই বন্দনা গীতের পর প্রিয়নাথ শাস্ত্রী, শম্ভুনাথ গড়গড়ি ও চিন্তামণি চট্টোপাধ্যায় বেদিগ্রহণ করেন। প্রিয়নাথ শাস্ত্রীর উদ্বোধন ও স্বাধ্যায়ান্ত উপাসনার পর রবীন্দ্রনাথ বেদির সম্মুখে দাঁড়িয়ে প্রাচীন ভারতের "একঃ"-শীর্ষক ভাষণটি পাঠ করেন। সায়ংকালে মহর্ষিভবনে সান্ধ্য উপাসনায় দ্বিজেন্দ্রনাথ, চিন্তামণি চট্টোপাধ্যায় ও শম্ভুনাথ গড়গড়ি বেদিগ্রহণ করেন। দ্বিজেন্দ্রনাথ উদ্বোধন ও উপদেশ পাঠ করেন। সকাল-সন্ধ্যা মিলিয়ে আটটি ব্রহ্মসংগীত গীত হয়—সবগুলিই রবীন্দ্রনাথ রচিত। সান্ধ্য-উপাসনায় 'তমীশ্বরাণাং পরমং মহেশ্বরং' বেদগানটি গীত হয়—এর সুরটিও রবীন্দ্রনাথের দেওয়া দ্র ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ২ [১৩৫৯]।

প্রাসঙ্গিক তথ্য : ৩

22 Jan 1901 [মঙ্গল ৯ মাঘ ১৩০৭] রানী ভিক্টোরিয়ার মৃত্যু হলে তাঁর পুত্র সপ্তম এডওয়ার্ড নাম নিয়ে সিংহাসনে অভিষিক্ত হন। রাজতন্ত্রে ঘটনাটি স্বাভাবিক, কিন্তু মাতৃভক্ত ভারতবাসী 'ভারত-সম্রাজ্ঞী' ভিক্টোরিয়ার জন্য যে আবেগ বোধ করত, তাদের রাজভক্তি অটুট রেখেও 'ভারত-সম্রাট' সপ্তম এডওয়ার্ডের জন্য সেই আবেগ অনুভব করেনি। কার্জন ভারতের ভাইসরয় হিসেবে কার্যভার গ্রহণ করেছিলেন 3 Jan 1899 [২০ পৌষ ১৩০৫], কিন্তু তাঁর দাম্ভিক দুর্মুখ দুরাচারী রূপটি ফুটে ওঠার জন্য সময়ের দরকার ছিল—তার বিকাশ শুরু হল বিংশ শতাব্দীর সূচনাতেই। Oct 1899-এ দক্ষিণ আফ্রিকায় বুয়র-যুদ্ধ আরম্ভ হয়েছিল,

ব্রিটিশদের অত্যাচারে জর্জরিত হয়ে বুয়ররা শান্তির আবেদন জানায় বর্তমান বৎসরের শেষে 23 Mar 1902 [৯ চৈত্র]—কিন্তু বুয়রদের বীরত্ব ইংরেজ সেনাবাহিনীর মহিমায় কিঞ্চিৎ কলঙ্কলেপন করে। এর ফলে ভারতেও ইংরেজদের প্রায় দেড়শত বৎসরব্যাপী অপ্রতিহত ক্ষমতাদম্ভের সম্ভ্রমহানি ঘটে। এর পরের প্রায় অর্ধশতাব্দী ভারতবাসী লড়াই করেছে স্বরাজ-সাধনায়। ইতিহাস কখনও কখনও এমনই সুস্পষ্টভাবে বাঁক ফেরে।

কার্জন ইতিপূর্বেই কলকাতা ম্যুনিসিপ্যাল কর্পোরেশনে নির্বাচিত দেশীয় প্রতিনিধিদের ক্ষমতা হ্রাস করে জনসাধারণের বিরাগভাজন হয়েছিলেন। এর পর তিনি বিশ্ববিদ্যালয়গুলিকে অধিকতর সরকারী কর্তৃত্বে আনার প্রয়াসে লিপ্ত হলেন। এই উদ্দেশ্যে তিনি সর্বস্তরের শিক্ষার উন্নতিবিধানের জন্য কেবলমাত্র সরকারী প্রতিনিধিদের নিয়ে 1 Sep 1901 [১৬ ভাদ্র]-এ সিমলায় শিক্ষা-বিষয়ক আলোচনা-সভার [Educational Conference] আয়োজন করলেন। সভার সুপারিশক্রমে 27 Jan 1902 [সোম ১৪ মাঘ] কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলার T. Raleigh-র সভাপতিত্বে Indian Universities Commission নিযুক্ত হল 'to inquire into the condition and prospects of the Universities established in British India; to consider and report upon any proposals which have been, or may be, made for improving their constitution and working and to recommend to the Governor-General in Council such measures as may tend to elevate the standard of University teaching and to promote the advancement of learning.' সৈয়দ হোসেন বিলগ্রামী ও নবাব ইমাদ-উল-মুল্‌ক ছাড়া কমিশনের আর চারজন সদস্যই ইংরেজ; সুতরাং কমিশনের উদ্দেশ্য বোঝা শক্ত নয়। স্বভাবতই দেশে প্রতিবাদের ঝড় উঠেছে, যার জন্য শেষে ড গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়কে সদস্য নিয়োগ করা হয় 12 Feb তারিখে।

এর ক'দিন পরে 14 Feb [শুক্র ২ ফাল্গুন] কার্জন 'ঘোষণা' [Proclamation]করলেন : 'it is my intention to hold at Delhi, on the first day of January 1903, an Imperial Durbar for the purpose of celebrating in His Majesty's Indian dominions this solemn and auspicious of event.... লর্ড লিটন ভিক্টোরিয়াকে 'ভারত-সম্রাজ্ঞী' ঘোষণার জন্য 1 Jan 1877 দিল্লিতে 'দরবার' করেন [দ্র রবিজীবনী ১।৩১৭-১৮], তাঁরই মানসিক উত্তরাধিকারী কার্জন তাঁর মতো স্ব-মহিমা বিকীর্ণ করার উদ্দেশ্যে দরবারের আয়োজন করেন ভারতবাসীর টাকায়। জাঁকজমকটিকে সুসম্পূর্ণ করার জন্য তিনি পূর্বসূরীর চেয়ে ছ'মাস বেশি সময় নিয়েছিলেন, এটাও লক্ষণীয়।

পরের দিন 15 Feb [শনি ৩ ফাল্গুন] কার্জন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলার হিসেবে সমাবর্তনে ভাষণ দেন। ছাত্রদের নানাবিধ উপদেশ দিয়ে তিনি সাংবাদিকতার কর্মগ্রহণে অভিলাষীদের সতর্ক করে বলেন : '...the first of these that I would ask you young man to avoid is the insidious tendency to exaggeration. If I were asked to sum up in a single word the most notable characteristic of the East-physical, intellectual and moral—as compared with the West, the word exaggeration or extravagance is the one that I should employ. It is particularly patent on the surface of the Native Press.'[১৬০] স্বভাবতই দেশীয় সংবাদপত্রগুলি কার্জনের এই উক্তির প্রতিবাদে মুখর হয়ে ওঠে। রবীন্দ্রনাথ দরবার-ঘোষণা ও সমাবর্তন-ভাষণের যথাযোগ্য প্রত্যুত্তর রচনা করেন 'অত্যুক্তি' [দ্র বঙ্গদর্শন,

কার্তিক ১৩০৯।৩৭৬-৯১; ভারতবর্ষ ৪।৪৪১-৫৫] প্রবন্ধে, লেখাটি রচনার অনেক পরে প্রকাশিত হয়। সত্যবাদিতার আদর্শের ক্ষেত্রে প্রাচ্যের চেয়ে পাশ্চাত্য উন্নততর, 11 Feb 1905-এর সমাবর্তন-ভাষণে কার্জনের এই দম্ভোক্তিকে ড রমেশচন্দ্র মজুমদার খুব আপত্তিজনক মনে করেননি,[১৬১] কিন্তু 'অত্যুক্তি' প্রবন্ধেই রবীন্দ্রনাথ Herbert Spencer-এর Facts and Comments গ্রন্থ থেকে বুয়র-যুদ্ধের সময়ে ইংরেজ সাংবাদিকদের রাশি রাশি মিথ্যার বেসাতির দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত করেছিলেন।

দীনশা ইদুলজি ওয়াচা [Dinshaw Edulji Wacha, 1844-1936]-র সভাপতিত্বে কলকাতায় কংগ্রেসের সপ্তদশ অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয় 26-28 Dec 1901 [বৃহ-শনি ১১-১৩ পৌষ]। এবারে বিডন স্কোয়ারে মূল অধিবেশনের জন্য নির্মিত মণ্ডপের পাশে প্রায় কুড়ি হাজার বর্গফুট জায়গা নিয়ে ভারতীয় শিল্পপ্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়। নির্ধারিত সভাপতি মৈমনসিংহের মহারাজা সূর্যকান্ত আচার্যচৌধুরীর অসুস্থতার জন্য মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন 24 Dec [মঙ্গল ৯ পৌষ] সন্ধ্যায়। সরলা দেবীর নেত্রীত্বে সমবেত কণ্ঠে গীত অতুলপ্রসাদ সেনের 'উঠ গো ভারত-লক্ষ্মী, উঠ আদি-জগত-জন-পূজ্যা' গানটি দিয়ে সভা শুরু হয়। ভারতীয় শিল্পের এত বড় প্রদর্শনী এর আগে আর কোথাও হয়নি। ব্যারিস্টার যোগেশচন্দ্র চৌধুরীর কর্মকৃতিত্বের অন্যতম স্বাক্ষর এই প্রদর্শনীটি।

কংগ্রেসের মনোনীত সভাপতি ওয়াচা 24 Dec সকালে হাওড়া স্টেশনে উপস্থিত হলে অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি নাটোরের মহারাজা জগদিন্দ্রনাথ রায় ও রবীন্দ্রনাথ-সহ সমিতির অন্য সদস্যেরা তাঁকে স্বাগত জানান।

26 Dec [বৃহ ১১ পৌষ] দুপুর আড়াইটার সময় ভারত সংগীতসমাজের পরিচালনায় বিভিন্ন ভাষাভাষী অর্ধশতাধিক গায়ক সমবেত কণ্ঠে সরলা দেবী-রচিত 'অতীত গৌরব বাহিনী মম বাণী/গাও আজি হিন্দুস্থান' গানটি গেয়ে কংগ্রেস-অধিবেশনের উদ্বোধন করেন। আগের দিনের [25 Dec] বেঙ্গলী পত্রিকা এ-বিষয়ে লেখে : "SING HINDUSTHAN.... the patriotic song to be sung to the opening of the Congress proceedings is being actively rehearsed by about 50 musicians, representing all classes and creeds of vast continent of India....specially composed for the occasion by that gifted lady, Miss Sarala Ghosal.' গানটি তৃতীয় দিনের [28 Dec শনি ১৩ পৌষ] অধিবেশনের সূচনাতেও সরলা দেবীর প্রত্যক্ষ পরিচালনায় গীত হয়।[১৬২] দ্বিতীয় দিনের অধিবেশন শুরু হয় জ্যোতিরিন্দ্রনাথের 'ভারতীয় রাষ্ট্র-সঙ্গীত' মিশ্র শঙ্করা-কাওয়ালি সুর-তালে গীত 'চল্‌রে চল্ সবে ভারত-সন্তান' গানটি দিয়ে—অমৃতবাজার পত্রিকা [26 Dec] ও বেঙ্গলী [28 Dec]-তে গানটির সমিল ইংরেজি অনুবাদ মুদ্রিত হয়। দ্বিতীয় অধিবেশনের একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা, মনোরঞ্জন গুহঠাকুরতা মিঃ মুধলকরের একটি প্রস্তাব সমর্থন করতে গিয়ে বাংলায় বক্তৃতা করেন। দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতীয়দের অধিকার-রক্ষায় সংগ্রামরত ব্যারিস্টার মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী কংগ্রেসের এই অধিবেশনে যোগদান করেন। উপস্থিত প্রতিনিধি-সংখ্যা ৮৯৬।

কংগ্রেসের অধিবেশন শেষ হলে 29 Dec [রবি ১৪ পৌষ] সন্ধ্যায় বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের উদ্যোগে অ্যালবার্ট হলে প্রতিনিধিদের মনোরঞ্জনের জন্য একটি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, দ্বিজেন্দ্রলাল রায় প্রভৃতির সঙ্গে কংগ্রেসের বিশিষ্ট নেতৃবৃন্দ এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। 'The arrival of Sri Bal Gangadhar Tilak was the scene of quite an

enthusiastic ovation.' ননীলাল নিয়োগীর পরিচালনায় ঐকতান-বাদন ও রবীন্দ্রনাথের গান দিয়ে অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। পরিষদ-সভাপতি সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর স্যার এডুইন আর্নল্ডের Mumtazmahal's Dagger কবিতাটি আবৃত্তি করেন। 'Kumar Pramatha Nath Roy Choudhuri then regaled the audience with a sweet song, as national in its spirit as the first one from Babu Rabindra Nath, recalling the Souls of India to their duty towards their long suffering mother-country.' কিরণচন্দ্র দত্ত 'অভিমন্যুবধ' ও শতাবধানী শ্রীরাম শাস্ত্রী বৈদিক পুরুষ সূক্ত পাঠ করেন। মহেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় জয়দেব ও বিদ্যাপতির গান এবং রজনীকান্ত সেন দ্বিজেন্দ্রলালের হাসির গান গেয়ে শোনান। অর্ধেন্দুশেখর মুস্তফী কৌতুকাভিনয় পরিবেশন করেন। ভবানীপুর বীণাপাণি সমিতি মৃচ্ছকটিক নাটকের পঞ্চম অঙ্কের চারটি দৃশ্য অভিনয় করে। শেষে রবীন্দ্রনাথ নিজের রচিত একটি গান ও 'বন্দে মাতরম্' গেয়ে শোনান, "Which sent a thrill of sensation through all who heard them.'[১৬৩]

কুচবিহারের মহারাজা-কর্তৃক পদক ও প্রশংসাপত্র বিতরণের পর ভারতীয় শিল্পপ্রদর্শনীর সমাপ্তি ঘটে 3 Jan 1902 [শুক্র ১৯ পৌষ] তারিখে।

এই সময়ে বিখ্যাত জাপানী শিল্পশাস্ত্রী কাউন্ট ওকাকুরা কাকুজো [1862-1913]র কলকাতা আগমন বাংলাদেশে নানা কারণে একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। এঁর পরিচয় আমরা রবীন্দ্রনাথের জীবনকথা অংশে দিয়েছি, সুতরাং পুনরাবৃত্তির প্রয়োজন নেই। তিনি 6 Jan 1902 [সোম ২২ পৌষ] কলকাতায় আসেন স্বামী বিবেকানন্দকে জাপানের একটি ধর্মসভায় নিয়ে যাওয়ার ঘোষিত উদ্দেশ্য নিয়ে। স্বাস্থ্যের কারণে স্বামীজীর জাপান যাওয়া হয়নি এবং সাত মাস পরেই [4 Jul: ২০ আষাঢ়] তাঁর মৃত্যু হয়। অবশ্য তার আগে তিনি ওকাকুরাকে সঙ্গে করে বুদ্ধগয়া, কাশী প্রভৃতি তীর্থস্থান দেখিয়ে আনেন! ওকাকুরা বুদ্ধগয়ায় এক সপ্তাহ ছিলেন। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল, সেখানে জাপানী তীর্থযাত্রীদের জন্য একটি আবাস নির্মাণের জন্য ২।৩ বিঘা জমি সংগ্রহ করা; লর্ড কার্জন এব্যাপারে সহানুভূতি দেখালেও বুদ্ধগয়ার শৈব মহান্তের বিরোধিতায় তাঁর আশা পূর্ণ হয়নি। গয়ার ল্যাণ্ড অ্যাকুজিশান অফিসার শ্রীশচন্দ্র মজুমদারের সহায়তা রবীন্দ্রনাথও প্রার্থনা করেছিলেন, কিন্তু সফল হননি।

ওকাকুরা 'Asia is One' বাণীর প্রবক্তা ছিলেন। ভারতে আসার আগে মিস ম্যাকলাউড যখন জাপানে ছিলেন, তখন তাঁর সহায়তায় ওকাকুরা *Ideals of the East* গ্রন্থের খসড়া প্রস্তুত করেন। তাঁর হয়তো কিছু রাজনৈতিক উদ্দেশ্যও ছিল, যার সম্বন্ধে মিস ম্যাকলাউড য়ুরোপে নিবেদিতাকে অবহিত করেছিলেন। মিসেস ওলি বুলের সঙ্গে নিবেদিতা কলকাতায় ফিরে আসেন 5 Feb [বুধ ২৩ মাঘ], ওকাকুরা তখন বুদ্ধগয়া ইত্যাদি ভ্রমণ করছেন। নিবেদিতা তাঁর সঙ্গে দেখা করার জন্য ব্যগ্র ছিলেন, তাঁদের দেখা হয় সম্ভবত মার্চের দ্বিতীয় সপ্তাহের গোড়ায় [ওকাকুরা বেলুড় মঠে 9 Mar স্বামীজীর সঙ্গে দেখা করেন]। নিবেদিতা তখন মিসেস বুলের অতিথি হয়ে চৌরঙ্গির আমেরিকান কনসুলেটে বাস করছেন, ওকাকুরাও সেখানে আশ্রয় নেন। নিবেদিতা তাঁর বাঙালি বন্ধুদের সঙ্গে ওকাকুরার পরিচয় করিয়ে দেবার জন্য একটি পার্টির আয়োজন করেন—অন্তত সুরেন্দ্রনাথ ও অবনীন্দ্রনাথ [এবং রবীন্দ্রনাথ] এই পার্টিতে উপস্থিত ছিলেন একথা নিশ্চিত করে বলা যায় [রবীন্দ্রনাথ উপস্থিত থাকলে পার্টির তারিখ 24/25 Mar হওয়া সম্ভব, আলোচ্য সময়ে তিনি এই দু'দিন মাত্র কলকাতায় ছিলেন]। সুরেন্দ্রনাথ ওকাকুরার শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন, কিছুদিনের মধ্যে ওকাকুরা বালিগঞ্জে

সুরেন্দ্রনাথের বাড়িতে উঠে যান। রবীন্দ্রনাথের আমন্ত্রণে তাঁর ও রেভারেণ্ড ওডা-র শান্তিনিকেতনে যাওয়ার ব্যবস্থা করতে ২৬ চৈত্র [বুধ 9 Apr] সত্যপ্রসাদ সুরেন্দ্রনাথের কাছেই যান, ২৯ চৈত্র [শনি 12 Apr] তাঁরা নিবেদিতাকে সঙ্গে নিয়ে মহর্ষির সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। ধনগোপাল মুখোপাধ্যায় রম্যাঁ রলাঁকে বলেন, "বিবেকানন্দ তাঁকে [ওকাকুরাকে] বলেছিলেন, 'এখানে আমার সঙ্গে আপনার কিছুই করণীয় নেই। এখানে তো সর্বস্ব ত্যাগ। রবীন্দ্রনাথের সন্ধানে যান। তিনি এখনো জীবনের মধ্যে আছেন।' ওকাকুরা রবীন্দ্রনাথের সন্ধানে গিয়েছিলেন।"[১৬৪]

কিন্তু ওকাকুরা রবীন্দ্রনাথের কাছে যতটা গিয়েছিলেন, রবীন্দ্রনাথ ও ঠাকুর পরিবারের অনেকে তাঁর দিকে এগিয়েছিলেন অনেক বেশি। সৌন্দর্যময়, অথচ সরল জাপানী জীবনযাত্রার আদর্শ তাঁর মধ্যে প্রত্যক্ষ করেছিলেন তাঁরা। এর ফলে জোড়াসাঁকো বাড়ির আসবাব ও গৃহসজ্জায় আমূল পরিবর্তন ঘটে যায়। অবনীন্দ্রনাথ ও গগনেন্দ্রনাথের সঙ্গে পরিচয়ের পর ওকাকুরা দেশে ফিরে টাইকান য়োকোয়ামা [Taikan Yokoyama, 1868-1958] ও হিসিদা সুনসো [Hisida Sunso] নামে দু'জন জাপানী শিল্পীকে জোড়াসাঁকোতে পাঠিয়ে দেন—নব্য বাংলার চিত্রকলায় এই দুই শিল্পীর প্রভাব যথেষ্ট। রবীন্দ্রনাথের ব্রহ্মচর্যাশ্রমের জন্য তিনি কুসুমতো সান নামে একজন দারুশিল্পী ও জুজুৎসু-শিক্ষার জন্য সানো সান-কে পাঠিয়ে দেন। এঁরা কেবল শান্তিনিকেতনে আবদ্ধ ছিলেন না, কুসুমতো ত্রিপুরার আর্টিজান স্কুলে এবং তারকনাথ পালিতের Bengal Technical Institute-এও শিক্ষা দেন।

কিন্তু ওকাকুরার সর্বাধিক প্রভাব ছিল নিবেদিতা ও সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুরের মাধ্যমে বাংলার বিপ্লবীমনোভাবাপন্ন যুবসমাজের উপর। প্রথম আলাপেই তিনি সুরেন্দ্রনাথকে প্রশ্ন করেছিলেন, দেশের জন্য তিনি কী করতে চান এবং তার পরেই এদেশের তরুণদের নৈরাশ্যের ভাবে তাঁর হতাশা ব্যক্ত করেন। বাগ্‌বিতণ্ডার অন্তে তাঁর কাকার মুণ্ডহীন উপবিষ্ট ধড় থেকে ফিন্‌কি-দিয়ে-ওঠা রক্তের দৃশ্য বর্ণনা করে তিনি সুরেন্দ্রনাথকে তাতিয়ে তুলেছিলেন, রবীন্দ্রনাথকে উদ্বুদ্ধ করেছিলেন যোশিদা তোরাজিবোর দেশকে-জানার কাহিনী বলে। ওকাকুরা সুরেন্দ্রনাথকে নিয়ে ভারত-পরিক্রমা করেন। এই ভ্রমণের রাজনৈতিক তাৎপর্য কতটা ছিল বলা শক্ত [মিস ম্যাকলাউডকে লেখা নিবেদিতার চিঠির উচ্ছ্বাস অংশ বাদ দিলেও মনে হয় যথেষ্টই ছিল], কিন্তু দেশকে-জানার উদ্দেশ্য কিছুটা নিশ্চয়ই সিদ্ধ হয়েছিল। সুরেন্দ্রনাথ বৈপ্লবিক কর্মের প্রথম সারির সৈনিক ছিলেন না, কিন্তু রসদ-সরবরাহকারীদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন একথা অনেকের স্মৃতিচারণ থেকে জানা যায়। ব্যায়ামচর্চা ও সমাজসেবার প্রত্যক্ষ উদ্দেশ্য নিয়ে যে অনুশীলন সমিতি এই সময়ে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, সুরেন্দ্রনাথ তার কোষাধ্যক্ষ ছিলেন।

প্রাসঙ্গিক তথ্য : ৪

একটি সম্প্রসারণশীল প্রতিষ্ঠানের সূচনাপর্বটি অনেক সময়েই অস্পষ্ট, ফলে পরবর্তীকালে বিতর্ক ও ভুল-বোঝাবুঝির সৃষ্টি হওয়া বিচিত্র নয়—এর সঙ্গে কোনো সম্প্রদায় বা ব্যক্তিবিশেষের অবদানকে অতিকৃত করার

প্রয়াস যুক্ত হলে ইতিহাসের বিকৃতিও অপরিহার্য হয়ে পড়ে। শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্যাশ্রমের ইতিহাসও এর ব্যতিক্রম নয়। এইরূপ একটি বিতর্ক এক সময়ে দেখা দিয়েছিল, এখানে তার আলোচনা অপ্রাসঙ্গিক হবে না।

1933-তে লণ্ডন থেকে প্রকাশিত *Renascent India* গ্রন্থে Dr. Zacharias লেখেন, ব্রহ্মবান্ধব ও তাঁর শিষ্য অণিমানন্দ 1901-এ কলকাতায় উচ্চবর্ণের হিন্দুদের প্রাচীন ভারতীয় আদর্শে শিক্ষাদানের জন্য যে বিদ্যালয় স্থাপন করেন কয়েকমাস পরে রবীন্দ্রনাথ তাঁদের সঙ্গে যুক্ত হন। রবীন্দ্রনাথের অনুরোধে বিদ্যালয়টি শান্তিনিকেতনে স্থানান্তরিত হয়, যা পরে বিশ্বভারতী-তে পরিণত হয়েছে। তাঁদের আশ্রম ত্যাগ করা সম্পর্কে অণিমানন্দের কথা উল্লেখ করে ড জ্যাকারিয়াস লেখেন যে, যথাক্রমে কবি ও ছাত্রদের উপর অতিরিক্ত প্রভাব থাকার জন্য ব্রহ্মবান্ধব ও অণিমানন্দকে আশ্রম ত্যাগ করতে হয়। এই লেখা পড়ে প্রবাসী ও *The Modern Review*-সম্পাদক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় পত্রে ও মৌখিকভাবে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে যোগাযোগ করেন এবং তাঁর প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেন শ্রাবণ ১৩৪০-সংখ্যা [পৃ ৫৭৬-৭৭] প্রবাসী-র 'বিবিধ প্রসঙ্গ' ['শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ের উৎপত্তি'] ও Aug 1933-সংখ্যা [pp. 225-26] *The Modern Review*-র 'Notes' ['Untrue Statements About Santiniketan']-এ। প্রবাসী-তে তিনি একটি অতিরিক্ত তথ্য দেন :"কয়েক বৎসর পূর্ব্বে অধুনালুপ্ত 'ক্যাথলিক হেরাল্ড অব্ ইণ্ডিয়া' নামক রোমান ক্যাথলিকদের কাগজে লিখিত হয়, যে, উহা ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় স্থাপন করেন।" রামানন্দের পত্রের উত্তরে রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিগত সচিব অমিয়চন্দ্র চক্রবর্তী লেখেন :

রবীন্দ্রনাথ সংক্ষেপে এই কথা জানাইতে বলিলেন যে, শান্তিনিকেতন আশ্রম প্রতিষ্ঠিত হইবার পর উপাধ্যায় ব্রহ্মবান্ধবের সহিত তাঁহার কলিকাতায় সাক্ষাৎ হয়। উপাধ্যায় কিছু দিন ধরিয়া রবীন্দ্রনাথের 'নৈবেদ্য' ও অন্যান্য গ্রন্থ সম্বন্ধে নানা পত্রিকায় অতি নিপুণ বিচক্ষণ সমালোচনা প্রকাশ করিতেছিলেন। তাহা পাঠ করিয়া রবীন্দ্রনাথ পূর্ব্বেই তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হন। রবীন্দ্রনাথের সহিত যখন উপাধ্যায়ের কলিকাতায় সাক্ষাৎ হয় তখন তিনি কবির নিকট প্রস্তাব করেন যে, তিনি এবং তাঁহার এক বন্ধু (অণিমানন্দ) কবির আশ্রমে যোগ দিতে ইচ্ছুক, যেহেতু আশ্রমের কাজ সম্বন্ধে তাঁহাদের পূর্ব্বের অভিজ্ঞতা আছে এবং দুই জনেই শান্তিনিকেতন আশ্রমের আদর্শ এবং কর্ম্ম সম্বন্ধে বিশেষ শ্রদ্ধাবান। রবীন্দ্রনাথ তাঁহাদের দুই জনকে বিশেষ আনন্দের সহিত আহ্বান করেন। অণিমানন্দকে তিনি জানিতেন না। যতদিন তাঁহারা শান্তিনিকেতনে ছিলেন কর্ম্মব্যবস্থার দিক হইতে এবং অন্যান্য নানা বিষয়ে তাঁহাদের সাহায্য বিশেষ কুশলপ্রদ হইয়াছিল।

The Modern Review-তে রামানন্দ লেখেন :

The fact is, as we have learnt from a recent conversation on the subject with the Poet, Rabindranath became acquainted with Brahmabandhav long after he (the Poet) had obtained the consent of his father, the Maharshi, to establish at Santiniketan a school, ...for training students according to the spiritualideals of the Upanishads as understood and interpreted by the Maharshi and the Adi Brahmo Samaj, and after its work had actually commenced on a very small scale. ...Far from joining the Calcutta school said to have been founded by Brahmabandhav and Animananda (the latter the Poet did not know at that time), Rabindranath did not even know of its existence. ...Brahmabandhav left the school of his own accord. As for Animananda, he had to leave, not because he had too much influence over the boys but because of a different reason which the Poet has told us of. This, however, both he and ourselves are unwilling to divulge unless compelled to.

স্পষ্টতই এই বিবরণ ত্রুটিপূর্ণ। সেইজন্য রবীন্দ্রনাথকে পূর্বকথা স্মরণ করিয়ে দেওয়ার জন্য ব্রহ্মবান্ধবের ছাত্র ও সহচর কার্তিকচন্দ্র নান 6 Aug 1933 [রবি ২১ শ্রাবণ ১৩৪০] তাঁকে একটি পত্র লেখেন। *Sophia* ও *Twentieth Century* পত্রিকায় ব্রহ্মবান্ধবের সমালোচনার কথা উল্লেখ করে কার্তিকচন্দ্র লেখেন :

…সেই সময়ে বা কিছু পরে তাঁহার সহিত আপনার সাক্ষাৎকালে আপনি তাঁহাকে ও আমাদের শান্তিনিকেতনে যাইবার জন্য নিমন্ত্রণ করিয়া যান। ইহার কিছুদিন পরেই উপাধ্যায় মহাশয়, আমার এক আত্মীয়, আমি ও আমার পুত্র সুধীর ২।১ দিনের জন্য বোলপুরে আপনার অতিথি হই। তখন শান্তিনিকেতনে ব্রহ্মচর্যাশ্রম ছিল না। উপাধ্যায় মহাশয় ব্রহ্মচর্যাশ্রমের প্রস্তাব উত্থাপন করিলে আপনি বলেন আপনারও ঠিক সেইরূপ

অভিপ্রায় অনেকদিন ধরিয়া আছে কিন্তু কার্যে পরিণত হয় নাই। আপনাদের মিলিত উৎসাহে তখনই বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা সুরু হয়।....কলিকাতায় ফিরিয়া উপাধ্যায় মহাশয়ের ছাত্র সংগ্রহ করিতে বিলম্ব হইল না—কারণ সিমলা স্ট্রীটে তখন তাঁহার একটি বিদ্যালয় ছিল—সেইটি ভাঙ্গিয়া দিলেন ও আমার পুত্র সুধীর, ভাগিনেয় রাজেন ও তাঁহার বন্ধুপুত্র গোরা, কালা, নন্দ ও আরও গুটিকতক ছাত্র লইয়া উপাধ্যায় মহাশয় ও আমি বোলপুর গেলাম। উপাধ্যায় মহাশয়ের শিষ্য রেবাচাঁদ (এখন অণিমানন্দ) ২।১ দিন পরে আরও কয়েকটি ছাত্র লইয়া উপস্থিত হইল। আপনিও ওদিকে ২।৩ জন শিক্ষক আরও জনকয়েক ছাত্র ও অন্য সমস্ত ব্যবস্থা ঠিক করিয়া রাখিয়া দিলেন ও রেবাচাঁদ পৌঁছিবামাত্র তাহাকে প্রধান শিক্ষকের ভার অর্পণ করিলেন। উপাধ্যায় মহাশয়েরই প্রস্তাবে সম্মত হইয়া আপনি তখন বর্ণাশ্রমের ভিত্তির উপর আশ্রমটি গঠিত করেন। ছাত্রদের বর্ণ হিসাবে প্রাতঃসন্ধ্যার নিমিত্ত সাদা, বেগুনি, লাল ও হরিদ্রা রং-এর পট্টবস্ত্রের ব্যবস্থা হয় ও আপনিই তাহাদের "গুরুদেব" পদে অধিষ্ঠিত হন। সকলকেই গায়ত্রী পাঠের ও বৈদিক মন্ত্র উচ্চারণের অধিকার দেওয়া হয়। শান্তিনিকেতনের একপ্রান্তে একটি মাত্র তিন কক্ষ পাকা গৃহে আশ্রম প্রথম স্থাপিত হয়। আমিও কিছুদিন শান্তিনিকেতনে অবস্থান করিয়াছিলাম। আপনার হয়ত মনে থাকিতে পারে মীরা ও সমীকে যৎকিঞ্চিৎ চিত্রবিদ্যা শিখাতাম, তবে তাহারা আশ্রমের সহিত সংশ্লিষ্ট ছিল না।····আমার বক্তব্য এই যে আপনাদের দুইজনের মিলিত প্রচেষ্টায় ব্রহ্মচর্যাশ্রমের প্রথম উৎপত্তি হয়। উপাধ্যায় মহাশয়ের কলিকাতার বিদ্যালয়ে আপনি যোগদান করিয়াছিলেন তাহা ভিত্তিহীন ও আপনার প্রতিষ্ঠিত আশ্রমে উপাধ্যায় যোগ দেন তাহাও ঠিক নহে।[১৬৫]

রবীন্দ্রনাথ এই চিঠি পেয়ে 8 Aug [মঙ্গল ২৩ শ্রাবণ] কার্তিকচন্দ্রকে লেখেন : 'তোমার চিঠি পেয়ে অনেকদিনের অনেক কথা মনে পড়ে গেল। তোমার বক্তব্য সম্বন্ধে আমার যা বক্তব্য আছে তা যথাসময়ে কাগজপত্রে দেখতে পাবে।' এর মধ্যে মডার্ন রিভিয়্যু-তে প্রকাশিত মন্তব্যটির প্রতিও কার্তিকচন্দ্রের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। রেবাচাঁদ বা অণিমানন্দের বিদ্যালয় ত্যাগ সম্পর্কে তিনি 16 Aug [বুধ ৩১ শ্রাবণ] রবীন্দ্রনাথকে লেখেন :

আপনার নিশ্চয়ই স্মরণ আছে যে বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার মাস কতক পরেই মহর্ষি শান্তিনিকেতনে খৃষ্টীয়ানদের উপস্থিতিতে আপত্তি জানান—এ কথা জানিতে পারিয়া স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া উপাধ্যায় মহাশয় রেবাচাঁদকে লইয়া আশ্রম হইতে চলিয়া আসিবার সঙ্কল্প করেন। ইহাতে আপনি বড়ই উতলা হইয়া পড়েন কিন্তু উপাধ্যায় মহাশয় আপনাকে আশ্বাস দিয়া বলেন যে দূরে থাকিয়াই যতদুর সাধ্য আপনাকে সাহায্য করিবেন ও কলিকাতায় একটী বিদ্যালয় স্থাপন করিয়া আপনার আশ্রমের জন্যই নিম্নবয়স্ক ছাত্রদের গড়িয়া তুলিবেন।[১৬৬]

রবীন্দ্রনাথ তাঁর প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্যাশ্রমের সূচনাপর্বটি বিবৃত করে একটি দীর্ঘ প্রবন্ধ লেখেন ও সেটি 'আশ্রম বিদ্যালয়ের সূচনা' [দ্র আশ্রমের রূপ ও বিকাশ ২৭।৩২৬-৪০] নামে আশ্বিন ১৩৪০-সংখ্যা [পৃ ৭৩৭-৪৫] প্রবাসী-তে মুদ্রিত হয়। এই প্রবন্ধে শান্তিনিকেতন আশ্রম বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা ও প্রাথমিক পরিচালনায় তিনি ব্রহ্মবান্ধব ও রেবাচাঁদের অবদানকে যথাযোগ্য স্বীকৃতি দিয়ে পাদটীকায় লিখেছেন :

কেহ কেহ এমন কথা লিখেছেন যে উপাধ্যায় ও রেবাচাঁদ খৃস্টান ছিলেন, তাই নিয়ে পিতৃদেব আপত্তি করেছিলেন। এ কথা সত্য নয়। আমি নিজে জানি এই কথা তুলে আমাদের কোনো আত্মীয় তাঁর কাছে অভিযোগ করেছিলেন। তিনি কেবল এই কথাটি বলেছিলেন, তোমরা কিছু ভেবো না। ওখানকার জন্যে কোন ভয় নেই। আমি ওখানে শান্তং শিবমদ্বৈতমের প্রতিষ্ঠা করে এসেছি।

উপাধ্যায় ও রেবাচাঁদের বিদ্যালয় ত্যাগের কারণ সম্পর্কে এই টীকা অবশ্য কোনো আলোকপাত করে না। এক্ষেত্রে কার্তিকচন্দ্র নানের প্রদর্শিত কারণ অধিকতর গ্রহণযোগ্য বলে মনে হয়। খৃস্টধর্ম সম্পর্কে মহর্ষি ও আদি ব্রাহ্মসমাজের বিরূপতা কোনো গোপন ব্যাপার ছিল না, ক্যাথলিক ব্রহ্মবান্ধব ও রেবাচাঁদ সম্পর্কে বিরূপ মনোভাব পোষণ করাও তাঁদের পক্ষে স্বাভাবিক ছিল। বিদ্যালয়ের প্রথম ছাত্রগোষ্ঠীর অন্যতম অধ্যাপক গৌরগোবিন্দ গুপ্ত একটি ঘটনার উল্লেখ করেছেন, সেটি তাৎপর্যপূর্ণ। একবার শান্তিনিকেতন পরিদর্শনকালে অধ্যাপক মোহিতচন্দ্র সেন ছাত্রদের একটি বাঁধানো সচিত্র বাইবেল উপহার দিয়ে যান। বড়ো বড়ো অক্ষরে ইংরেজিতে লেখা ও পাতায়-পাতায় ছবি দেওয়া বইটির প্রতি আকৃষ্ট হয়ে গৌরগোবিন্দ প্রায়ই সেটি নাড়াচাড়া করতেন দেখে খুশি হয়ে রেবাচাঁদ সরল ইংরেজিতে ছবিগুলির অর্থ তাঁকে বুঝিয়ে দিতে থাকেন। এতে বিদ্যালয়ের কোনো-কোনো শিক্ষক রেবাচাঁদের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে সন্দিগ্ধ হয়ে ওঠেন। এই সন্দেহের কথা ব্রহ্মবান্ধবের কর্ণগোচর হলে তিনি রেবাচাঁদকে ফিরে আসতে বলেন ও নিজেও ব্রহ্মচর্যাশ্রমের সঙ্গে সম্পর্ক

ত্যাগ করেন।[১৬৭] রবীন্দ্রনাথ অবশ্য খৃস্টধর্ম ও খৃস্টানদের সম্পর্কে সাম্প্রদায়িক মনোভাব পোষণ করতেন না। তিনি মহর্ষির জীবৎকালেই 6 Aug 1904 [২১ শ্রাবণ ১৩১১] রেবাচাঁদকে মাসিক ত্রিশ টাকা বেতনে জোড়াসাঁকোয় গৃহশিক্ষক নিযুক্ত করেছেন ও তাঁর ক্যাশবহিতে Jan 1905-এর শেষ পর্যন্ত বেতন মেটানোর হিসাব পাওয়া যায়। সুতরাং রবীন্দ্রনাথ নন, অন্যের প্রতিক্রিয়ার জন্যই ব্রহ্মবান্ধব ও রেবাচাঁদকে ব্রহ্মচর্যাশ্রম ত্যাগ করতে হয়েছিল। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, আদি ব্রাহ্মসমাজের অন্যতম উপাচার্য সংস্কৃত পণ্ডিত শিবধন বিদ্যার্ণবও প্রায় একই সময়ে বিদ্যালয়ের কর্ম ত্যাগ করেন।

অধ্যাপক জিতেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায় 2 May 1909 [১৯ বৈশাখ ১৩১৬] তারিখে শান্তিনিকেতনে গিয়ে নানা বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে দীর্ঘ আলোচনা করেন ও তার প্রতিবেদন 'শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রনাথ' শিরোনামে 'সুপ্রভাত' পত্রিকার শ্রাবণ ও ভাদ্র সংখ্যায় প্রকাশ করেন। ব্রহ্মচর্যাশ্রমের প্রতিষ্ঠা প্রসঙ্গে তিনি লিখেছেন :

> এই সময় পরলোকগত ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় মহাশয় তাঁহাকে বিশেষ আশা ও উৎসাহ দেন ও সাহায্য করেন। উপাধ্যায়জি নিজে বহুদিন সিন্ধুপ্রদেশে শিক্ষা কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। তিনি তাঁহার শিষ্য ও বন্ধু রেওয়া চাঁদের সঙ্গে বোলপুরে আসিয়া মহা উৎসাহের সহিত অধ্যাপনা কার্য্য আরম্ভ করিয়া দিলেন। কাজ বেশ চলিতে লাগিল; কিন্তু একটি নূতন বিপদের কারণ উপস্থিত হইল। উপাধ্যায় মহাশয় তখন গোঁড়া খ্রীষ্টান ছিলেন। রবি বাবু বলিলেন—"এই বোলপুরের মাঠে কতদিন তাঁহার সঙ্গে আমার তুমুল তর্ক হইয়া গিয়াছে। যাহা হউক, তাঁহার খৃষ্টান থাকার কথা এখানের (অর্থাৎ শান্তি নিকেতনের নিকটবর্ত্তী স্থানের) লোকেরা জান্‌তেন; ও জেনে তাঁরা একটু বিচলিত হ'য়ে পড়লেন। তাঁরা ভাব্‌লেন বুঝিবা শান্তি নিকেতন একটা খৃষ্টানদের আড্ডা হ'য়ে পড়ে; এবং এই ভাবনাটা তাঁদের মনে বড় আঘাত দিল। শান্তি নিকেতন সম্বন্ধে চারিদিকের লোকের চিরপোষিত ধারণার এমন একটা ব্যতিক্রম হবে এটা আমাদের পরিবারের অনেকেরও ভাল লাগল না। একজন খৃষ্টান শিক্ষকের হাতে ছেলেদের ভার পড়বে, ইহাতে অভিভাবকদের মধ্যেও অনেকে চঞ্চল হ'য়ে পড়লেন। কথাটা বাবার কানে উঠিল, এবং তাঁর আদেশে ও অভিভাবকদের অনুরোধে উপাধ্যায় মহাশয়ের সঙ্গে স্কুলের সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হইল। আমি আবার একলা পড়িলাম।" [সুপ্রভাত, শ্রাবণ ১৩১৬।৩৬-৩৭]

ব্রহ্মচর্যাশ্রম প্রতিষ্ঠার ভাবনা রবীন্দ্রনাথের মনে যখনই আসুক-না কেন, সেটি সংকল্পে পরিণত হয় মাধুরীলতাকে মজঃফরপুরে পতিগৃহে পৌঁছে দিয়ে ফিরে আসার পথে শান্তিনিকেতনে কয়েকদিন যাত্রাবিরতি করার সময়ে শ্রাবণের প্রথমে। ৬ শ্রাবণ [সোম 22 Jul] কলকাতায় ফিরে 25 Jul [বৃহ ৯ শ্রাবণ] তিনি জগদীশচন্দ্রকে লিখেছেন : 'সেখানে একটা নির্জ্জন অধ্যাপনের ব্যবস্থা করিবার চেষ্টায় আছি। দুই একজন ত্যাগ স্বীকারী ব্রহ্মচারী অধ্যাপকের সন্ধানে ফিরিতেছি।' ব্রহ্মবান্ধবই তাঁকে রেবাচাঁদের কথা বলেন। ধীরে ধীরে নানা জনের পরামর্শে ও উৎসাহে পরিকল্পনাটি স্ফীত হয়ে শিল্প ও বিজ্ঞান শেখানোর workshop স্থাপন করা পর্যন্ত পৌঁছয়, ত্রিপুরার মধ্যম রাজকুমার ব্রজেন্দ্রকিশোর দেববর্মাকে ছাত্ররূপে পাওয়ার সম্ভাবনা রবীন্দ্রনাথকে আরও উত্তেজিত করে তোলে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ৭ পৌষ [রবি 22 Dec] খুবই ক্ষুদ্রাকারে ব্রহ্মচর্যাশ্রমের উদ্বোধন হল। তখন নিয়মিত শিক্ষক তিন জন—রেবাচাঁদ, জগদানন্দ রায় ও শিবধন বিদ্যার্ণব, ছাত্র পাঁচ জন—রথীন্দ্রনাথ, গৌরগোবিন্দ গুপ্ত, প্রেমকুমার গুপ্ত, অশোককুমার গুপ্ত ও সুধীরচন্দ্র নান। অল্প ক'দিন পরেই শশিভূষণ রায়চৌধুরী নামক একজন নূতন শিক্ষক নিযুক্ত হন—ইনি অনুশীলন সমিতির সঙ্গে যুক্ত বিশিষ্ট সমাজকর্মী তেঘরিয়ার শশী চৌধুরী কিনা জানা নেই—কিন্তু তিনি সম্ভবত দীর্ঘকাল স্থায়ী হননি। রাজেন্দ্রনাথ দে, যোগানন্দ মিত্র, গিরীন্দ্র ভট্টাচার্য, সন্তোষচন্দ্র মজুমদার প্রভৃতি আরও সাত জন ছাত্র মাঘ মাসের গোড়াতেই ভর্তি হয়ে যায়। এই বিষয়ে প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের পত্র আমরা আগেই উদ্ধৃত করেছি। তারক নামের একটি ছাত্রকে চুঁচুড়া থেকে অক্ষয়চন্দ্র সরকার পাঠিয়েছিলেন, তাঁর পদবী জানা যায়নি।

ব্রহ্মবান্ধবের জ্ঞাতিভ্রাতা মনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় [1871-1950] বৎসরের শেষদিকে [Mar 1902] শিক্ষক হিসেবে ব্রহ্মচর্যাশ্রমে যোগ দিয়েছিলেন। মনোরঞ্জনবাবু মাত্র এক বৎসর বিদ্যালয়ে ছিলেন,—কিন্তু রথীন্দ্রনাথ ও সন্তোষচন্দ্রকে এক বৎসরের কম সময়ে এন্ট্রান্স পরীক্ষার উপযোগী করে তোলার জন্য রবীন্দ্রনাথ আজীবন তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ ছিলেন। শ্রীশচন্দ্র মজুমদারের খুল্লতাত সুবোধচন্দ্র মজুমদার [? 1878-6 Jan 1930] Jan 1902-তেই বিদ্যালয়ে যোগ দেন—উচ্চাকাঙ্ক্ষী এই মানুষটি বিদ্যালয়ের শিক্ষক হয়ে থাকাতে তৃপ্তি বোধ করেননি, তাই তাঁর আসা-যাওয়া অব্যাহত ছিল। কিন্তু বিদ্যালয়ের শৈশবাস্থায় তাঁদের পরিচর্যা যথেষ্ট কার্যকর হয়েছিল।

উল্লেখপঞ্জী

১ চিঠিপত্র ৮ [১৩৭০]। ১৮৫, পত্র ১৫৩

২ দেশ, সাহিত্য ১৩৮৭। ১১-১২ [লিপিচিত্র]

৩ ঐ। ১৩

৪ ঐ ঐ। ১২-১৪

৫ চিঠিপত্র ৮।২২৪, সংযোজন পত্র ১৩

৬ দেশ, সাহিত্য ১৩৮৭।১৪ [লিপিচিত্র]

৭ চিঠিপত্র ৮।২২৫, সংযোজন পত্র ১৪

৮ 'সূচনা', চোখের বালি ৩।২৮৩

৯ দ্র রবীন্দ্রনাথ ও ত্রিপুরা [১৩৯৩]। ৩২৬

১০ দ্র নন্দরানী চৌধুরী : সাময়িকপত্রে রবীন্দ্রপ্রসঙ্গ : সাহিত্য [১৩৭৭]। ১১০-২৯

১১ সাহিত্য, ফাল্গুন। ৭০৩

১২ রবীন্দ্র-সৃষ্টি-সমীক্ষা ২ [১৩৭৬]। ৩০

১৩ রবীন্দ্রনাথ ও ত্রিপুরা। ৩৬২

১৪ রবীন্দ্রভবনে রক্ষিত মূল পত্র

১৫ রবীন্দ্রনাথ ও ত্রিপুরা। ৩২৫-২৬

১৬ 'ত্রিপুরায় রবীন্দ্র-স্মৃতি' : রবীন্দ্রনাথ ও ত্রিপুরা। ৩১-৩২

১৭ মহিমচন্দ্র দেববর্মা : দেশীয় রাজ্য [১৩৩৪]। ২১৫

১৮ রবীন্দ্রনাথ ও ত্রিপুরা। ৩২৬

১৯ চিঠিপত্র ৬ [1957]। ২৪, পত্র ১০

২০ পত্রাবলী [1958]। ৯৯, পত্র ৩২

২১ রবীন্দ্রনাথ ও ত্রিপুরা। ৩৩

২২ চিঠিপত্র ৮।১৮৭, পত্র ১৫৬

২৩ ঐ ৮।১৮৮, পত্র ১৫৭

২৪ ঐ ৮।১৮৯, পত্র ১৫৮

২৫ মাসিক বসুমতী, পৌষ ১৩৬৫। ৩৬৪

২৬ দেশ, সাহিত্য ১৩৮৭।১৫

২৭ ঐ। ১৬

২৮ ঐ। ১৬

২৯ চিঠিপত্র ৮।২২৬, সংযোজন পত্র ১৫

৩০ রবীন্দ্রস্মৃতি [১৩৮০]। ৫৭

৩১ মাসিক বসুমতী, পৌষ ১৩৬৫। ৩৬৪-৬৫

৩২ চিঠিপত্র ৬।২৩, পত্র ১০

৩৩ ঐ ৬।২৯, পত্র ১২

৩৪ ঐ ৬।৮১, পত্র ১

৩৫ পত্রাবলী। ৮৫, পত্র ২৯

৩৬ চিঠিপত্র ৬৩০, পত্র ১৩

৩৭ রবীন্দ্রনাথ ও ত্রিপুরা। ৩২৭

৩৮ চিঠিপত্র ৬।৩০, পত্র ১৩

৩৯ ঐ ৮।১৮৯, পত্র ১৫৮

৪০ গীতাঞ্জলি ১১।৮৬, ১০৮-সংখ্যক [২০ আষাঢ় ১৩১৭]

৪১ দ্র আত্মপরিচয় ২৭।১৮৯-২০৬

৪২ পত্রাবলী। ৭১, পত্র ২৬

৪৩ চিঠিপত্র ৬।৩১, পত্র ১৩

৪৪ পত্রাবলী। ১০২, পত্র ৩৩

৪৫ চিঠিপত্র ৬।২৮, পত্র ১২

৪৬ পত্রাবলী। ৮৬, পত্র ৩০

৪৭ চিঠিপত্র ১ [১৩৭২]। ৫৪-৫৫, পত্র ২৭

৪৮ পূর্ণানন্দ চট্টোপাধ্যায়-সম্পাদিত মাধুরীলতার চিঠি [১৩৮৪]। ৫০, পত্র ১৮

৪৯ রবীন্দ্রনাথ ও ত্রিপুরা। ৩৬৩

৫০ চিঠিপত্র ১।৫৮, পত্র ২৯

৫১ *The Blade: Life and Work of Brahmananda Upadhyay* [n.d.], p. 94

৫২ চিঠিপত্র ১।৫৯, পত্র ৩০

৫৩ আনন্দবাজার পত্রিকা, ২৫ বৈশাখ ১৩৬৮। ঞ

৫৪ রবীন্দ্রনাথ ও ত্রিপুরা। ৩৪৭

৫৫ চিঠিপত্র ১।৬১, পত্র ৩১

৫৬ রবীন্দ্রভবনে রক্ষিত মূল পত্র

৫৬ক 'মাধুরীলতা', প্রবাসী, পৌষ ১৩৪৮। ৩৩১

৫৭ চিঠিপত্র ১।৬৭-৬৮, পত্র ৩৪

৫৮ ঐ ১।৬০, পত্র ৩০

৫৯ রবীন্দ্রনাথ ও ত্রিপুরা। ৩০৭-০৮

৬০ চিঠিপত্র ৬।৩৩, পত্র ১৪

৬১ *The Blade*, p. 93

৬২ শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্য বিদ্যালয়, রবীন্দ্রনাথ ও গৌরগোবিন্দ গুপ্ত [১৩৯৩]। ১৪

৬৩ বি·ভা·প·, কার্তিক-পৌষ ১৩৬৮। ১৯৫-৯৬

৬৪ ঐ। ১৯৬

৬৫ দ্র 'আভাস', চার অধ্যায়-গ্রন্থপরিচয় ১৩।৫৪১

৬৬ চিঠিপত্র ৬।৩৬, পত্র ১৬

৬৭ *The Blade*, pp. 93-94

৬৮ চিঠিপত্র ৬।৩৬, পত্র ১৬

৬৯ বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের কার্য্যবিবরণ ১৩০৮। ১।ল০ -১।ল০

৭০ চিঠিপত্র ৬।৩৭, পত্র ১৬

৭১ রবীন্দ্রনাথ ও ত্রিপুরা। ৩৪৬

৭২ ঐ। ৩০৮

৭৩ ঐ। ৩০৯

৭৪ ঐ। ৩৪৬

৭৫ রবীন্দ্রভবনে রক্ষিত মূল পত্র

৭৬ রবীন্দ্রনাথ ও ত্রিপুরা। ৩৪৬

৭৭ কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির বিবরণী লিপিবদ্ধ করিবার খাতা [ব·সা·প·]

৭৮ দ্র বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের কার্য্যবিবরণ ১৩০৮। ২।ল০-২।।০

৭৯ রবীন্দ্রভবনে রক্ষিত মূল পত্র

৮০ দেশ, সাহিত্য ১৩৯৪। ১৩, পত্র ১

৮১ দ্র দেশ, সাহিত্য ১৩৭৫।১৭০, পত্র ৫৪

৮২ পত্রাবলী। ১১৪-১৫, পত্র ৩৮

৮৩ ঐ। ১২২, পত্র ৪১

৮৪ দেশ, সাহিত্য ১৩৭৫।১৭০, পত্র ৫৫

৮৫ ঐ ১৩৯৫।১৩, পত্র ২

৮৬ চিঠিপত্র ৬।৩৭, পত্র ১৬

৮৭ দ্র *Tagore, India and Soviet Union: A Dream Fulfilled* [1986], pp. 99, 104-05, Notes 1 & 10

৮৮ রবীন্দ্রনাথ ও ত্রিপুরা। ৩৪৮

৮৯ মাধুরীলতার চিঠি। ৫১, পত্র ১৯

৯০ চিঠিপত্র ৬৩৮, পত্র ১৭

৯১ 'ত্রিপুরায় রবীন্দ্র-স্মৃতি' : রবীন্দ্রনাথ ও ত্রিপুরা। ৫৬-৫৮

৯২ চিঠিপত্র ৬।৪০, পত্র ১৮

৯৩ রবীন্দ্রনাথ ও ত্রিপুরা। ৩২৯

৯৪ ভারতবর্ষ, বৈশাখ ১৩২৪।৭৫৪, পত্র ৫

৯৫ দ্র 'ত্রিপুরায় রবীন্দ্র-স্মৃতি' : রবীন্দ্রনাথ ও ত্রিপুরা।

৯৬ ঐ। ৫৯

৯৭ ঐ। ৫৮

৯৮ রবীন্দ্রনাথ ও ত্রিপুরা। ৩৩৩

৯৯ *The Blade*, p. 94

১০০ রবীন্দ্রনাথ ও ত্রিপুরা। ৩৪৫

১০১ ঐ। ৩২৯

১০২ পত্রাবলী। ৮২, পত্র ২৮

১০৩ সাহিত্য, আষাঢ়। ১৯১

১০৪ ভারতবর্ষ, বৈশাখ ১৩২৪।৭৫৪-৫৫, পত্র ৫

১০৫ Beni Madhab Das: *Pilgrimage through Prayer* [? 1963], pp. 15-16

১০৬ রবীন্দ্রভবনে রক্ষিত লিপিচিত্র [photocopy]

১০৬ক তত্ত্ব° ফাল্গুন/41-এ উদ্ধৃত

১০৭ বি·ভা·প·, কার্তিক-পৌষ ১৩৬৮।১৯৭

১০৮ রবীন্দ্রভবনে রক্ষিত মূল পত্র

১০৮ক চিঠিপত্র ১০ [১৩৭৪]। ৩, পত্র ৩

১০৯ ড শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় : রবীন্দ্র-সৃষ্টি-সমীক্ষা ২ [১৩৭৬]।৪৩

১১০ দ্র তত্ত্ব°, মাঘ। ১৪৫-৪৭; প্রণতি মুখোপাধ্যায় : শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্যাশ্রম [১৩৭৯]।৬৯-৭২

১১১ দ্র ঐ। ১৪৭-৫০; শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্যাশ্রম ২৭।৪৩১-৩৫

১১২ পিতৃস্মৃতি [১৩৭৮]।৬১

১১৩ রবীন্দ্রজীবনী ২।৫০, পাদটীকা ২

১১৪ দ্র শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্য বিদ্যালয়, রবীন্দ্রনাথ ও গৌরগোবিন্দ গুপ্ত। ২০

১১৪ক হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় : রবীন্দ্রনাথের কথা [১৩৫৩] ১৩

১১৫ শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্য বিদ্যালয়, রবীন্দ্রনাথ ও গৌরগোবিন্দ গুপ্ত। ২৭

১১৬ 'আভাস', চার অধ্যায়-গ্রন্থপরিচয় ১৩।৫৪২

১১৭ দ্র পিতৃস্মৃতি। ৬২-৬৩

১১৮ আশ্রমের রূপ ও বিকাশ ২৭।৩২৪

১১৯ পিতৃস্মৃতি। ৬৪

১২০ ঐ। ৬৪

১২১ ঐ। ৬৬

১২২ ঐ। ৮০

১২৩ দ্র ঐ।১৪

১২৪ দ্র *The Bengalee*, 14 Jul 1901 [রবি ৩০ আষাঢ়]

১২৫ জীবনের ঝরাপাতা [১৩৮২]।১৩২

১২৬ দ্র রবীন্দ্রনাথ ও ত্রিপুরা। ৫৬

১২৭ দ্র প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় : গীতবিতান : কালানুক্রমিক সূচী ১ [১৩৮০]।১১৭

১২৮ *Pligrimage through Prayer*, p. 7

১২৯ বি.ভা.প., মাঘ ১৩৪৯।৪৫০-৫১

১৩০ ঐ, কার্তিক-পৌষ ১৩৫৮।৫৯-৬০

১৩১ ঐ। ৬০-৬১

১৩২ *Pilgrimage through Prayer*, pp. 7-8

১৩৩ রবীন্দ্রভবনে রক্ষিত মূল পত্র

১৩৪ সজনীকান্ত দাস : 'রবীন্দ্রনাথ : জীবন ও সাহিত্য' [সুবর্ণরেখা সং, ১৩৯৫]। ৯২-৯৩

১৩৫ দেশ, সাহিত্য ১৩৭৫।১৭১, পত্র ৫৬

১৩৬ রবীন্দ্রভবনে রক্ষিত মূল পত্র

১৩৭ পুরাতনী [১৩৬৪]।৪২

১৩৮ দেশ, সাহিত্য ১৩৭৫।১৭১, পত্র ৫৫

১৩৯ চিঠিপত্র ৮।১৯১, পত্র ১৬১

১৪০ ঐ ৮।১৯৫, পত্র ১৬৪

১৪১ ঐ ৮।১৯৮, পত্র ১৬৭

১৪২ চিঠিপত্র ১০।২-৩, পত্র ৩

১৪৩ ঐ ১০।৪, পত্র ৪

১৪৪ রবীন্দ্রনাথ ও ত্রিপুরা। ৩২৮

১৪৫ চিঠিপত্র ৬।৮২, পত্র ২

১৪৬ দ্র শঙ্করীপ্রসাদ বসু : লোকমাতা নিবেদিতা ২ [১৩৯৪]।৮৬-৮৭

১৪৭ দ্র Life of Swami Vivekananda, Vol. II [1981], p. 619

১৪৮ জোড়াসাঁকোর ধারে [১৩৭৮]।১৩৪

১৪৯ চিঠিপত্র ৮।১৯৫, পত্র ১৬৪

১৫০ চিঠিপত্র ৮।১৯৬, পত্র ১৬৪

১৫১ ঐ ৮।১৯৭, পত্র ১৬৬

১৫২ ঐ ১০।৪, পত্র ৪

১৫৩ রবীন্দ্রভবনে রক্ষিত প্রতিলিপি

১৫৪ চিঠিপত্র ৬।৮২, পত্র ২ [অবলা বসুকে লিখিত]

১৫৫ দ্র পূর্ণিমা চট্টোপাধ্যায় : ঠাকুর বাড়ির গগনঠাকুর [১৩৮১]।১৬, ৪৮-৪৯

১৫৬ সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর : যাত্রী [১৩৮২]।২

১৫৭ তত্ত্ব°, জ্যৈষ্ঠ। ২৮

১৫৮ ঐ।১৩৭

১৫৯ ঐ।১৪১-৫১

১৬০ The Amrita Bazar Patrika, 17 Feb 1902

১৬১ দ্র বাংলা দেশের ইতিহাস ৪ [১৩৮২]।১৭-১৮

১৬২ *The Bengalee*, 29 Dec 1901

১৬৩ *The Amrita Bazar Patrika*, 2 Jan 1902

১৬৪ অবন্তীকুমার সান্যাল-অনূদিত ‘ভারতবর্ষ : দিন-পঞ্জী’ [1976]। ১৬৭

১৬৫ হরিদাস ও উমা মখোপাধ্যায় : উপাধ্যায় ব্রহ্মবান্ধব ও ভারতীয় জাতীয়তাবাদ [1961]। ১৫১-৫২

১৬৬ ঐ। ১৬০

১৬৭ দ্র শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্য বিদ্যালয়, রবীন্দ্রনাথ ও গৌরগোবিন্দ গুপ্ত। ৩৪-৩৫

---

* ৬ বৈশাখ শুক্র 19 Apr] 'রঙ্গালয়' সাপ্তাহিকের 'সাহিত্য-প্রসঙ্গ'তে লেখা হয় : 'আমরা শুনিলাম "বঙ্গদর্শনের" সম্পাদন ভার বাবু নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত লইতেছেন।'

* এ-বিষয়ে 'রঙ্গালয়' পত্রিকার ১০ জ্যৈষ্ঠ [24 May]-সংখ্যায় লেখা হয়েছে : 'জনরব এই যে, "বঙ্গদর্শন" প্রকাশ করিবার অনুমতি বঙ্কিমবাবুর বিধবা সহধর্ম্মিণীর নিকট হইতে লওয়া হয় নাই। তিনি নাকি, উকীলের চিঠি দিয়াছেন বা অতি সত্বরই দিবেন। আমাদের বক্তব্য ও প্রার্থনা এই—যত শীঘ্র সম্ভব, এ ঘৃণিত প্রসঙ্গের একটা শেষ হওয়া উচিত। বঙ্কিমবাবুর স্ত্রীর অনুমতি লইলেই, যদি সকল গোল মেটে, তাহাতে বর্তমান "বঙ্গদর্শনের" কর্তৃপক্ষগণ গয়ংগচ্ছ করিতেছেন কেন? আর আমাদের মাতৃস্বরূপিণী, স্বর্গীয় বঙ্কিমচন্দ্রের সহধর্মিণীর উদ্দেশে আমরা একটী কথা বলিতে চাই। "বঙ্গদর্শন" পুনঃ প্রকাশে তাঁর লাভ বৈ লোসান নাই। স্বর্গগত স্বামীর স্মৃতি,—"বঙ্গদর্শনের" পত্রে ছত্রে ছত্রে জড়িত থাকিবে,—তাহাতে তাঁহার ক্ষতি কি?' পত্রিকাটি ২৪ জ্যৈষ্ঠ [7 Jun]পুনরায়। লেখে : অনেকেই অকারণে ইহার সাধ্যমত বিরুদ্ধচারণ করিতেছেন। আমরা অনুসন্ধানে যতদূর জানিয়াছি বা বুঝিয়াছি, তাহাতে আমাদের স্থির বিশ্বাস যে, বঙ্গদর্শনের এই নবপর্যায় সকলপ্রকার প্রতিকূলভাব অতিক্রম করিয়া আপনার সত্তা রক্ষায় সমর্থ হইবে।

* Joubert, Joseph [1754-1824] *pensee*-writer, noted for his devotion to literature and the fitness of his judgement.... In 1938 Chateaubriand edited a selection from his notebooks (*Recueil des pensées*. re-edited and augmented in 1842 by Pierre de Raynal-*Pensées. Maxims, Essais et Correspondance*). Joubert is said to have cared more for perfection than for fame. He produced no sustained piece of writing but his meditations on life, literature, philosophy, ethics, education, & c., place him in the front rank of *pensée*-writers. —*The Oxford Companion to French Literature* [1969], p. 374

* BAGEHOT, WALTER [1826-77], ...editor of the 'Economist' from 1860 till his death. ...His 'Physics and Politics' (1876) is an application of the principles of natural selection and inheritance to political society.—*The Oxford Companion to English Literature* [1969], p. 58.

* চিঠিপত্র ১।৬৪, পত্র ৩৩। এই পত্রের তারিখ 16 Jul [মঙ্গল ৩২ আষাঢ়] অনুমান করা হয়েছে, কিন্তু আমাদের মনে হয় তা ঠিক নয়। মজঃফরপুরে কয়েকদিন থাকার পরেই এই চিঠি লেখা সম্ভব।

* রবীন্দ্রনাথ ২৫ চৈত্র [8 Apr 1902] প্রেমতোষ বসুকে শান্তিনিকেতনে নববর্ষের উৎসবে যোগদানের জন্য আহ্বান জানিয়ে লেখেন : 'নরেন্দ্রবাবুকেও বহন করিয়া আনিবার চেষ্টা করিবেন।'

* মহারাজ রাধাকিশোর কোনো কারণে ব্যারিস্টার জ্ঞানেন্দ্রনাথ রায়কে আটক রাখার হুকুম দিলে এই গোলমাল শুরু হয়। 'বঙ্গালয়' পত্রিকা [৩১ শ্রাবণ] লেখে : 'রাজা নিজের ইচ্ছায় কাজ করিয়াছিলেন বলিয়াই ম্যানেজার ম্যাক্‌মিন এবং দেওয়ান উমাকান্ত পদত্যাগের সংকল্প করিয়াছেন।'

* এই রচনাটির একটি সংশোধিত ও পরিবর্ধিত রূপ সাহিত্য-পরিষদ-পত্রিকা-র অষ্টম বর্ষ চতুর্থ সংখ্যায় [পৃ ২২৯-৪০] মুদ্রিত হয়; এ-সম্পর্কে 'সম্পাদকীয় মন্তব্য' [পৃ ২৪১-৪৩] লেখেন 'পত্রিকা-সম্পাদক' রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী।

* ৩ কার্তিক-সংখ্যা রঙ্গালয়-এ লেখা হয়েছে : 'বর্ত্তমান ত্রিপুরাধীশ্বর শ্রীল শ্রীযুক্ত রাধাকিশোর দেববর্ম্মামাণিক্য বাহাদুর অতুল কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয়ের শ্রীচৈতন্য ভাগবতের ৫০ খানি রাজসংস্করণ গ্রন্থ ক্রয় করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত তিনি উক্ত গোস্বামী মহাশয় সম্পাদিত লঘু ভাগবতামৃতের পঞ্চাশ খানি গ্রন্থ ক্রয় করিয়াছেন।'

* 'Those who are desirous of joining the Chorus to be sung at the opening of the Congress will please meet this afternoon at 3 P.M. at the Sangit Samaj Jyotirindra Nath Tagore Sunday 15th December 1901.' —*The Bengalee*, 15 Dec.

* রবীন্দ্রনাথ পত্রে ২৪ মাঘ [6 Feb] তারিখ লিখলেও রবীন্দ্রভবনে রক্ষিত মূল পত্রে দেখা যায় এটি 6 Feb কলকাতায় পৌঁছেছে। সেই সময়ে সাধারণত শান্তিনিকেতন থেকে কলকাতায় পত্র পৌঁছতে এক দিন লাগত।

* রবীন্দ্রনাথ : জীবন ও সাহিত্য। ৮৮, পত্র ৪: সজনীকান্ত দাস পত্রটি শিলাইদহ থেকে লেখা অনুমান করেছেন, কিন্তু তা ঠিক নয়—পত্রে উল্লিখিত 'আমার এখানকার বাড়ি' বলতে রবীন্দ্রনাথ জোড়াসাঁকোর লাল বাড়িটিকে বুঝিয়েছিলেন।

* অমৃতবাজার পত্রিকা 4 Feb খবর দেয় : Mr. R.C. Dutt...is expected to arrive here on Wednesday the 5th instant by the *S.S. Mombassa*.

দ্বা চ ত্বা রিং শ অ ধ্যা য়

১৩০৯ [1902-03] ১৮২৪ শক ॥ রবীন্দ্রজীবনের দ্বাচত্বারিংশ বৎসর

শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্যাশ্রমে প্রথম বৎসরের নববর্ষ উৎসবটি সমারোহ সহকারে অনুষ্ঠিত হল ১ বৈশাখ [সোম 14 Apr 1902]। বিভিন্ন বন্ধুজনকে এই উপলক্ষে রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনে আহ্বান করেছেন, একথা আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি। সকলেই না হলেও অনেকে যে এই অনুষ্ঠানে যোগ দিয়েছিলেন, সেকথা জানিয়েছেন জগদানন্দ রায় :

প্রথম বৎসরের উৎসবে রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, হীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয় প্রভৃতি অনেক অতিথি আসিয়াছিলেন। শ্রদ্ধাস্পদ মোহিতচন্দ্র সেন বোধ করি সেই উৎসবেই আশ্রমে প্রথম আসিয়াছিলেন [এই কথাটি অবশ্য ঠিক নয়, ছাত্রদের পরীক্ষা করার জন্য তিনি ইতিপূর্বেই শান্তিনিকেতনে এসেছিলেন]। বেশ মনে পড়ে লাইব্রেরির মাঝের বড় ঘরটিতে সকলে বসিয়া গল্প করিতেছিলেন এবং পাশের ঘরে জলযোগের আয়োজন হইতেছিল। গুরুদেব 'আমারে কর তোমার বীণা' গানটি গাহিলেন; সকলে অবাক হইয়া শুনিতে লাগিলেন। তার পরে পশ্চিমে মেঘ করিয়া কালবৈশাখীর ঝড় আসিল। মোহিতবাবু এবং আরো অনেকে ঘর ছাড়িয়া সম্মুখের মাঠে দাঁড়াইলেন। মোহিতবাবু ঝড়ের প্রতিকূলে যে প্রকারে দৌড়াইতেছিলেন তাহার ছবি এখনো চোখে ভাসিতেছে।[১]

শৈলেশচন্দ্র মজুমদার, প্রেমতোষ বসু প্রভৃতি রবীন্দ্রানুরাগী যুবকেরাও সম্ভবত এই উপলক্ষে শান্তিনিকেতনে গিয়েছিলেন। জগদানন্দ রায় লিখেছেন, তাঁরা কেউই বর্ষশেষের রাত্রে ঘুমোননি, 'কেহ ঘুমাইতে চেষ্টা করিলে তাহাকে জাগাইয়া রাখিতাম। সমস্ত রাত্রি মাঠে ঘুরিয়া গোলমালে কাটানো যাইত। তার পরে যখন রাত্রি চারিটার সময়ে মন্দির হইতে মৃদঙ্গের শব্দ এবং রাধিকা গোস্বামী মহাশয়ের প্রভাতী রাগিণীর সুর কানে আসিত, তখন মন্দিরে গিয়া উপস্থিত হইতাম। তার পরে সূর্যোদয়ের সঙ্গে আরম্ভ হইত গুরুদেবের উপদেশ।'

এবারে নববর্ষে রবীন্দ্রনাথ দুটি ভাষণ দেন। প্রাতঃকালীন উপাসনায় তিনি যা বলেছিলেন, তা 'শান্তিনিকেতনে নববর্ষ' নামে জ্যৈষ্ঠ-সংখ্যা [পৃ ২৪-২৯] তত্ত্ববোধিনী-তে মুদ্রিত হয় [দ্র ধর্ম ১৩।৩৮৬-৯২, 'নববর্ষ']। ব্রহ্মের নিত্যবিরাজমান আনন্দের অনুভূতি যদি অন্তরে উপভোগ করা যায়—'তবে সংসারের কোনো বাহ্য ঘটনাকে আমার চেয়ে প্রবলতর মনে করিয়া অভিভূত হইব না—কারণ ঘটনাবলী তাহার সুখদুঃখ বিরহমিলন লাভক্ষতি জন্মমৃত্যু লইয়া আমাদিগকে ক্ষণে ক্ষণে স্পর্শ করে ও অপসারিত হইয়া যায়। বৃহত্তম বিপদই বা কতদিনের, মহত্তম দুঃখই বা কতখানি, দুঃসহতম বিচ্ছেদই বা আমাদের কতটুকু হরণ করে—তাঁহার আনন্দ থাকে; দুঃখ সেই আনন্দেরই রহস্য, মৃত্যু সেই আনন্দেরই রহস্য'—এইটিই নববর্ষের ভাষণের মূল কথা।

ভাষণটি কয়েকদিন পূর্বে লেখা—কিন্তু নববর্ষের দিনই তাঁর অন্তরে যে ভাবনার উদয় হয়েছিল, সেকথা বলেছেন বহুদিন পরে আমেরিকা থেকে জাহাজে ইংলণ্ডে আসার সময়ে ১ বৈশাখ ১৩২০ [সোম 14 Apr 1913] তারিখে সহযাত্রীদের কাছে; কালীমোহন ঘোষ তাঁর জবানীতে লিখেছেন :

প্রতি নববর্ষে আমি সমগ্র বৎসরের একটা আভাস পাই। রথীর মার যে বৎসর মৃত্যু হয়, সেবার নববর্ষ উৎসব জমেছিল। উপাধ্যায় [? গৌরগোবিন্দ] প্রভৃতি নববিধানের সব উপস্থিত ছিলেন। কিন্তু আমার মনে কেমন একটা ভাব হল। আমি বুঝলুম যেন এ বৎসরে একটা মৃত্যু আছে। আমি রথীর মাকে ঘরে গিয়ে বললুম যে, এ বৎসর একটা মৃত্যু আসছে। একটা মৃত্যুর চেহারা সম্মুখে রেখে আমাদের চল্‌তে হবে, প্রস্তুত হতে হবে। তারপর তাঁর মৃত্যুর কিছু পূর্বে শিলাইদহ থেকে তাঁকে যে পত্র* লিখেছিলুম, পড়ে দেখি সেই পত্রেও মৃত্যুর আভাস তাঁকে জানিয়েছিলুম।[২]

মৃত্যুর ছায়ায় প্রায় দেড় বৎসর তাঁকে কাটাতে হয়েছিল, তবু তারই মধ্য থেকে সান্ত্বনা ও আশ্বাস খুঁজে নেওয়ার জন্য তাঁর চেষ্টার বিরাম ছিল না।

রবীন্দ্রনাথ ছাত্রদের কাছেও এইদিন একটি বক্তৃতা করেন, এটি 'নববর্ষ' নামে বৈশাখ-সংখ্যা বঙ্গদর্শন-এ [পৃ ৩১-৪৩] ও 'নববর্ষের চিন্তা' নামে ধারাবাহিকভাবে তত্ত্ববোধিনী-র আষাঢ়, শ্রাবণ ও ভাদ্র সংখ্যায় মুদ্রিত হয় [দ্র ভারতবর্ষ ৪।৩৬৭-৭৭, 'নববর্ষ']। প্রবন্ধটি তিনি ছাত্রসমাজে পাঠ করলেন বটে, কিন্তু এর বক্তব্য বৃহত্তর জনসমাজকে লক্ষ্য করে পরিবেশিত—বঙ্গদর্শন-এ যে প্রাচীন ভারতীয় আদর্শ তিনি প্রচার করছিলেন তার সঙ্গে এক সুরে বাঁধা। য়ুরোপীয় আদর্শে কর্মের গৌরব অত্যন্ত বেশি—য়ুরোপে লাগাম-পরা অবস্থায় মরা একটা গৌরবের কথা। কিন্তু এই কর্মনাগরদোলার ঘূর্ণিনেশা যখন একটা জাতিকে পেয়ে বসে তখন পৃথিবীতে শান্তি থাকে না :

তখন দুর্গম হিমালয়শিখরে যে লোমশ ছাগ এতকাল নিরুদ্বেগে জীবন বহন করিয়া আসিতেছে, তাহারা অকস্মাৎ শিকারির গুলিতে প্রাণত্যাগ করিতে থাকে; বিশ্বস্ত-চিত্ত সীল এবং পেঙ্গুয়িন পক্ষী এতকাল জনশূন্য তুষারমেরুর মধ্যে নির্বিরোধে প্রাণধারণ করিবার সুখটুকু ভোগ করিয়া আসিতেছিল,—অকলঙ্ক শুভ্র নীহার হঠাৎ সেই নিরীহ প্রাণীদের রক্তে রঞ্জিত হইয়া উঠে। কোথা হইতে বণিকের কামান শিল্পনিপুণ প্রাচীন চীনের কণ্ঠের মধ্যে অহিফিনের পিণ্ড বর্ষণ করিতে থাকে, এবং আফ্রিকার নিভৃত অরণ্যসমাচ্ছন্ন কৃষ্ণত্ব সভ্যতার বজ্রে বিদীর্ণ হইয়া আর্তস্বরে প্রাণত্যাগ করে।

কিন্তু 'এখানে আশ্রমে নির্জন প্রকৃতির মধ্যে স্তব্ধ হইয়া বসিলে অন্তরের মধ্যে স্পষ্ট উপলব্ধি হয় যে, হওয়াটাই জগতের চরম আদর্শ, করাটা নহে। প্রকৃতিতে কর্মের সীমা নাই, কিন্তু সেই কর্মটাকে অন্তরালে রাখিয়া সে আপনাকে হওয়ার মধ্যে প্রকাশ করে।' ভারতবর্ষও মানুষকে লঙ্ঘন করে কর্মকে বড়ো করে তোলেনি, ফলের আকাঙ্ক্ষাকে লঘু করে ফেললে কর্মের উপরেও মানুষ নিজেকে প্রকাশ করবার অবকাশ পায়। বিদেশের সংঘাতে ভারতবর্ষের এই স্তব্ধতা, এই একাকিত্ব ক্ষুন্ন হয়ে তার শক্তিক্ষয় হচ্ছে। 'এই একাকিত্বের অধিকার বৃহৎ অধিকার। ইহা উপার্জন করিতে হয়। ইহা লাভ করা, রক্ষা করা দুরূহ।' বহু শতাব্দী ধরে বিদেশীরা যখন ভারতবর্ষকে উন্মত্ত বরাহের মতো বিদীর্ণ করছিল, এই একাকিত্বই তখন তাকে রক্ষা করেছে, কেউ তার মর্মস্থানে আঘাত করতে পারেনি। 'য়ুরোপ ভোগে একাকী, কর্মে দলবদ্ধ। ভারতবর্ষ তাহার বিপরীত। ভারতবর্ষ ভাগ করিয়া ভোগ করে, কর্ম করে একাকী। য়ুরোপের ধনসম্পদ, আরাম-সুখ নিজের—কিন্তু তাহার দানধ্যান, স্কুলকলেজ, ধর্মচর্চা, বাণিজ্যব্যবসায়, সমস্ত দল বাঁধিয়া। আমাদের সুখসম্পত্তি একলার নহে—আমাদের দানধ্যান অধ্যাপন,…আমাদের কর্তব্য একলার'।

বাণিজ্যব্যবসায়ে মূলধন একত্রিত ও প্রকাণ্ড করে তুলে 'তাহার আওতায় ছোটো ছোটো সামর্থ্যগুলিকে বলপূর্বক নিষ্ফল করিয়া তোলা' রবীন্দ্রনাথ শ্রেয়স্কর মনে করেননি। তাঁর মতে, ভারতবর্ষের বস্ত্রশিল্পের অবনতির কারণ তাঁতিদের সমবায়ের অভাব নয় তাদের যন্ত্রের উন্নতির অভাব। কিছুদিন আগে জাপানী মনীষী ওকাকুরার সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়, সম্ভবত তাঁরই বক্তব্য উদ্ধৃত করে তিনি বললেন :

একটি শিক্ষিত জাপানি বলেন, "তোমরা বহুব্যয়সাধ্য বিদেশী কল লইয়া বড়ো কারবার ফাঁদিতে চেষ্টা করিয়ো না। আমরা জার্মানি হইতে একটা বিশেষ কল আনাইয়া অবশেষে কিছুদিনেই সস্তা কাঠে তাহার সুলভ ও সরল প্রতিকৃতি করিয়া শিল্পিসম্প্রদায়ের ঘরে ঘরে তাহা প্রচারিত করিয়া দিয়াছি—ইহাতে কাজের উন্নতি হইয়াছে, সকলে আহারও পাইতেছে।" এইরূপে যন্ত্রতন্ত্রকে অত্যন্ত সরল ও সহজ করিয়া কাজকে সকলের আয়ত্ত করা, অন্নকে সকলের পক্ষে সুলভ করা প্রাচ্য আদর্শ।

রবীন্দ্রনাথ কিন্তু এখানে মান্ধাতা আমলের যন্ত্রপাতি নিয়ে দিনগত পাপক্ষয় করার কথা বললেন না, উন্নত যন্ত্রপাতিকে উদ্ভাবনী শক্তির সাহায্যে সরল ও সুলভ করে যন্ত্রজীবীদের কাছে পৌঁছে দেবার প্রয়োজনীয়তার দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন। কিন্তু তা না করে আমোদ, শিক্ষা বা হিতকর্মকে জটিল ও দুঃসাধ্য করে তুললে অগত্যা সম্প্রদায়ের হাতে ধরা দিতে হয়, তাতে কর্মের আয়োজন ও উত্তেজনা উত্তরোত্তর বৃহৎ হয়ে উঠে মানুষকে আচ্ছন্ন করে ফেলে। 'প্রতিযগিতার নিষ্ঠুর তাড়নায় কর্মজীবীরা যন্ত্রের অধম হয়। বাহির হইতে সভ্যতার বৃহৎ আয়োজন দেখিয়া স্তম্ভিত হই—তাহার তলদেশে যে নিদারুণ নরমেধযজ্ঞ অহোরাত্র অনুষ্ঠিত হইতেছে তাহা গোপনে থাকে। কিন্তু বিধাতার কাছে তাহা গোপন নহে—মাঝে মাঝে সামাজিক ভূমিকম্পে তাহার পরিণামের সংবাদ পাওয়া যায়।' এই সূত্রে রবীন্দ্রনাথ যা বললেন, তার সঙ্গে দীর্ঘকাল পরে রচিত রক্তকরবী [আশ্বিন ১৩৩১-সংখ্যা প্রবাসী-তে প্রথম প্রকাশিত] নাটকের সাদৃশ্য দেখলে চমকিত হতে হয় :

এই সকল কৃষ্ণধূমশ্বসিত দানবীয় কারখানাগুলার ভিতরে বাহিরে চারিদিকে মানুষগুলাকে যে-ভাবে তাল পাকাইয়া থাকিতে হয়, তাহাতে তাহাদের নির্জনত্বের সহজ অধিকার, একাকিত্বের আব্রুটুকু, থাকে না।....এইরূপে নিজের সঙ্গ নিজের কাছে অত্যন্ত অনভ্যস্ত হইয়া পড়াতে, কাজের একটু ফাঁক হইলেই মদ খাইয়া প্রমোদে মাতিয়া বলপূর্বক নিজের হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইবার চেষ্টা ঘটে।

ভারতবর্ষ বর্ণাশ্রমধর্মের দ্বারা কর্মবিভাগ করে নিয়েছে বলে নিজ নিজ কর্ম করে যাওয়ার মধ্যে সন্তোষের অবকাশ আছে। কিন্তু যুরোপের শ্রমজীবী মানুষ প্রাণপণে কাজ করে গেলেও কর্মের মর্যাদার অভাবে সর্বদাই দীনতায় ঈর্ষায় ব্যর্থপ্রয়াসে অস্থির। এরই ব্যাপ্তিতে একদল আধুনিক স্ত্রীলোক স্ত্রীলোক হয়েছে বলেই লজ্জাবোধ করে—গর্ভধারণ করা, স্বামী-সন্তানের সেবা করা তারা কুণ্ঠার বিষয় জ্ঞান করে; 'সেইজন্য সক্ষম অক্ষম সকলেই সর্বশ্রেষ্ঠ হইবার জন্য সমাজে প্রভূত নিষ্ফলতা, অন্তহীন বৃথাকর্ম ও আত্মঘাতী উদ্যমের সৃষ্টি করিতে থাকে।' প্রকারান্তরে ঘর ঝাঁট দেওয়া, জল আনা, বাটনা বাটা, আত্মীয়-অতিথিদের সেবাশেষে নিজে আহার করা যুরোপের চক্ষে অত্যাচার ও অপমান, 'কিন্তু আমাদের পক্ষে ইহা গৃহলক্ষ্মীর উন্নত অধিকার—ইহাতেই তাহার পুণ্য, তাহার সম্মান।....আমাদের লক্ষ্মীগণ যতই সেবার কর্মে ব্রতী হন, তুচ্ছ কর্মসকলকে পুণ্যকর্ম বলিয়া সম্পন্ন করেন, অসামান্যতাহীন স্বামীকে দেবতা বলিয়া ভক্তি করেন, ততই তাঁহারা শ্রীসৌন্দর্যে পবিত্রতায় মণ্ডিত হইয়া উঠেন—তাঁহাদের পুণ্যজ্যোতিতে চতুর্দিক হইতে ইতরতা অভিভূত হইয়া পলায়ন করে।'

নববর্ষের চিন্তা ছাত্রদের কাছে ব্যক্ত করার কারণ প্রকাশিত হয়েছে এই বাক্যগুলিতে :

ভারতবর্ষের এই একাকী থাকিয়া কাজ করিবার ব্রতকে যদি আমরা প্রত্যেকে গ্রহণ করি, তবে এবারকার নববর্ষ আশিস্-বর্ষণে ও কল্যাণ-শস্যে পরিপূর্ণ হইবে। দল বাঁধিবার, টাকা জুটাইবার ও সংকল্পকে স্ফীত করিবার জন্য সুচিরকাল অপেক্ষা না করিয়া যে যেখানে, আপনার গ্রামে, প্রান্তরে,

পল্লীতে, গৃহে, স্থিরশান্তচিত্তে ধৈর্যের সহিত—সন্তোষের সহিত, পুণ্যকর্ম মঙ্গলকর্ম সাধন করিতে আরম্ভ করি; আড়ম্বরের অভাবে ক্ষুব্ধ না হইয়া, দরিদ্র আয়োজনে কুণ্ঠিত না হইয়া, দেশীয় ভাবে লজ্জিত না হইয়া, কুটিরে থাকিয়া, মাটিতে বসিয়া, উত্তরীয় পরিয়া সহজভাবে কর্মে প্রবৃত্ত হই; ধর্মের সহিত কর্মকে, কর্মের সহিত শান্তিকে জড়িত করিয়া রাখি; চাতকপক্ষীর ন্যায় বিদেশীর করতালিবর্ষণের দিকে উর্ধ্বমুখে তাকাইয়া না থাকি; তবে ভারতবর্ষের ভিতরকার যথার্থ বলে আমরা বলী হইব।

—রবীন্দ্রনাথের নিজের সাধনাও এই পর্বে ছিল একলা চলার সাধনা, আকাঙ্ক্ষা ছিল দু'চারজন ত্যাগব্রতী সাধকের জন্য। ছাত্রদেরও তিনি এই ব্রতেই দীক্ষিত করতে চেয়েছেন। 'শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমের ছাত্রবর্গের জন্য রচিত' 'নববর্ষের দীক্ষা' ['নব বৎসরে করিলাম পণ/লব স্বদেশের দীক্ষা] কবিতাটিতে [দ্র মুকুল, বৈশাখ। ৪-৫; উৎসর্গ-সংযোজন ১০।৯০-৯১] এই চিন্তা কাব্য রূপ গ্রহণ করেছে। তাঁর এই নূতন পরীক্ষায় যাকে ছাত্ররূপে বিশেষ করে চেয়েছিলেন, সেই ক্ষত্রিয় রাজকুমার ব্রজেন্দ্রকিশোরকে ৭ বৈশাখ [রবি 20 Apr] তিনি যে চিঠি লেখেন তার সঙ্গে মিলিয়ে পড়লে তাঁর নববর্ষের চিন্তার পরিপূর্ণ রূপটি পাওয়া যায় :

ভারতবর্ষে যথার্থ ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় সমাজের অভাব হইয়াছে—দুর্গতিতে আক্রান্ত হইয়া আমরা সকলে মিলিয়াই শূদ্র হইয়া পড়িয়াছি। এই দুই সমাজকে উদ্ধার করিতে পারিলেই—ভারতবর্ষ পুনরায় সংজ্ঞা লাভ করিতে পারিবে। আমি ব্রাহ্মণ আদর্শকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিবার সংকল্প হৃদয়ে লইয়া যথাসাধ্য চেষ্টায় প্রবৃত্ত হইয়াছি। তুমি ক্ষত্রিয় আদর্শকে নিজের মধ্যে অনুভব করিয়া সেই আদর্শকে ক্ষত্রিয় সমাজে প্রচার করিবার সংকল্প হৃদয়ে পোষণ করিয়ো। ব্রাহ্মণের শান্ত সমাহিত সাত্ত্বিক ভাবকে তোমরা বরণ করিলে চলিবে না। বলবীর্য্য তেজ সমাজে কে রক্ষা করিবে? সেই ক্ষাত্রতেজ ক্ষাত্রবীর্য্য না থাকিলে ব্রাহ্মণের প্রতিষ্ঠা কোথায়? ব্রাহ্মণের শান্তি কাহার অটল বলের উপরে নিজেকে রক্ষা করিবে? সমাজে ধর্ম্মের উচ্চতম আদর্শকে সর্ব্বপ্রকার অত্যাচার ও বিঘ্ন হইতে সুরক্ষিত করিয়া, আশ্রয় দিবার জন্যই ক্ষাত্রতেজের মাহাত্ম্য। স্বেচ্ছাচার, বিলাস, দুর্নীতি, ক্ষমতার অপব্যবহার, পারিষদগণের চাটুবাক্যে শূন্য অহঙ্কারে পরিস্ফীত হইয়া থাকা সুমহৎ ক্ষাত্রধর্ম নহে। এইরূপে আমাদের ক্ষত্রিয়দের তেজ নষ্ট, বুদ্ধি ভ্রষ্ট, চরিত্রবল চূর্ণ হইয়া তাহারা অবনতির পঙ্কের মধ্যে ডুবিয়া রহিয়াছে এবং সর্বপ্রকার অবমাননায় অসাড় হইয়া কেবল কলুষিত প্রমোদে উন্মত্ত হইয়াছে। যাহারা সমস্ত সমাজের আশ্রয় ছিল তাহারা আজ পশুর মত হীনতা ও অবমাননায় লুণ্ঠিত হইয়া দিন যাপন করিতেছে। ইহা অপেক্ষা কি মৃত্যু শ্রেয় নহে?[৩]

—পরিশেষে তিনি ব্রজেন্দ্রকিশোরকে ক্ষাত্রমাহাত্ম্যে উদ্বুদ্ধ হয়ে ওঠার আহ্বান জানিয়ে 'পুনশ্চ'-তে। লিখেছেন : "বৈশাখের বঙ্গদর্শনে আমার 'নববর্ষ' প্রবন্ধটি পড়িয়া দেখিয়ো। তাহা ব্রাহ্মণের মনের কথা। তাহা ক্ষত্রিয়ের জন্য লিখি নাই। তথাপি তাহাতে চিন্তার বিষয় পাইবে।"

'নববর্ষের গান' ['হে ভারত আজি নবীনবর্ষে' দ্র উৎসর্গ-সংযোজন ১০।৮৮-৮৯, পাঠান্তর :'হে ভারত, আজি তোমারি সভায়' দ্র গীত ৩।৮২১-২২] জ্যৈষ্ঠ-সংখ্যা বঙ্গদর্শন-এ [পৃ ৬১-৬২] মুদ্রিত হয়। রবীন্দ্রজীবনী-কার লিখেছেন : 'অনুমান গানটি ১৩০৯ সালের নববর্ষ উপলক্ষ্যে রচিত ও গীত'[৪]।

বৈশাখ মাসে বিভিন্ন পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথের অনেকগুলি রচনা প্রকাশিত হয় :

সমালোচনী, প্রথম বর্ষ। ১৩০৮। ৩য়, ৪র্থ সংখ্যা [চৈত্র-বৈশাখ] :

১৬৪ 'অন্তিম প্রেম' ['ওরে পদ্মা, ওরে মোর রাক্ষসী প্রেয়সী'] দ্র উৎসর্গ-সংযোজন ১০।৮৬

এই সনেটটি হয়তো চৈতালি-পর্বের পুরোনো পাণ্ডুলিপি ঘেঁটে উদ্ধার করা হয়েছিল।

প্রবাসী, বৈশাখ ১৩০৯ [২।১] :

৩৩-৩৪ 'প্রবাসের প্রেম' ['সে ত সেদিনের কথা, বাক্যহীন যবে'] দ্র উৎসর্গ ১০।৭৪-৭৫, ৪৮-সংখ্যক

যুগ্ম-সনেটের আকারে লিখিত কবিতাটি প্রবাসী-তে স্বতন্ত্র সংখ্যা-চিহ্নিত হয়ে মুদ্রিত হয়। এটি সম্ভবত ফরমায়েশি কবিতা, পত্রিকাটির দ্বিতীয় বর্ষের প্রথম সংখ্যাটিকে তাঁর রচনাসমৃদ্ধ করার জন্য সম্পাদক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের অনুরোধে রচিত। উল্লেখ্য, প্রবাসী-র প্রথম বর্ষের প্রথম সংখ্যাটির জন্যও রবীন্দ্রনাথ 'প্রবাসী'-শীর্ষক একটি কবিতা পাঠিয়ে দেন।

বঙ্গদর্শন, বৈশাখ ১৩০৯ [২।১]:

৯-২০ 'চোখের বালি' ৩৮-৪০ দ্র চোখের বালি ৩।৪২৪-৩৬ [৩৭-৩৯]

৩১-৪৩ 'নববর্ষ' দ্র ভারতবর্ষ ৪।৩৬৭-৭৭

সঙ্গীত-প্রকাশিকা, বৈশাখ ১৩০৯ [১।৮] :

৮৫-৮৬ ইমন-কল্যাণ—তেওরা। মহাবিশ্বে মহাকাশে স্বরলিপি : কাঙ্গালীচরণ সেন দ্র স্বর ৪

৮৬-৮৭ তিলক কামোদ—তেওরা। মহানন্দে হের গো সবে ঐ ঐ দ্র ঐ

৮৭-৮৮ মিশ্র জয়জয়ন্তী—একতালা। তুমি বন্ধু, তুমি নাথ ঐ ঐ দ্র ঐ

৮৮-৮৯ মিশ্র বাহার—কাওয়ালি। জীবনে আজ কি প্রথম এল স্বরলিপি : অনুল্লেখিত দ্র স্বর ৪৮

'মায়ার খেলা' থেকে গৃহীত শেষ গানটির স্বরলিপি-কার সম্ভবত সম্পাদক জ্যোতিরিন্দ্রনাথ।

মুকুল, বৈশাখ ১৩০৯ [৮।১]:

৪-৫ 'নববর্ষের দীক্ষা।/(মিশ ঝিঁঝিট—একতালা।)' ['নব বৎসরে করিলাম পণ'] দ্র উৎসর্গ সংযোজন ১০|৯০-৯১

'শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচয্যাশ্রমের ছাত্রবর্গের জন্য রচিত' পাদটীকাসহ কবিতাটি মুদ্রিত হয়।

এ ছাড়া তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা-র বৈশাখ ১৮২৪ শক-সংখ্যায় [pp. 3-6] রবীন্দ্রনাথের 'ঔপনিষদ ব্রহ্ম' গ্রন্থের ইংরেজি অনুবাদ 'The God of Upanishads'-এর দ্বিতীয় কিস্তি [৭-১৫ অনুচ্ছেদের অনুবাদ] মুদ্রিত হয়। প্রথম কিস্তিটি মুদ্রিত হয়েছিল পৌষ ১৮২৩ শক [১৩০৮]সংখ্যায়।

কলকাতার সেরেস্তার কাজ দেখাশোনার ভার ছিল সত্যপ্রসাদের উপর, রবীন্দ্রনাথের কর্তৃত্ব ছিল সমগ্র বৈষয়িক ব্যাপারে। অবশ্য দেবেন্দ্রনাথের জীবৎকালে তাঁর অনুমতি ছাড়া কোনো বড়ো কাজ করা সম্ভব ছিল না; কিন্তু তাঁর শেষ উইল করার পর পরিবারের অনেকেই বিক্ষুব্ধ ছিলেন, পারস্পরিক দোষারোপও চলত নিশ্চয়ই। রবীন্দ্রনাথ যে নিজেকে বৈষয়িক ব্যাপার থেকে ক্রমশ সরিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করছিলেন, তার বাস্তব কারণ নিহিত ছিল এখানেই। এই পরিপ্রেক্ষিতে সত্যপ্রসাদও যখন তাঁর কর্মে ইস্তফা দিতে চাইলেন, তখন বিব্রত রবীন্দ্রনাথ ৫ বৈশাখ [* 18 Apr শুক্র] তাঁকে লিখেছেন :

> তোমার চিঠি পেয়ে যথার্থই মনটা বড় ব্যথিত হল। বিষয়কর্ম্মের যে শ্রান্তি ও লাঞ্ছনা তা আমি হাড়ে হাড়ে অনুভব করেছি—সংসারের কন্টকপথ থেকে দূরে এসে আমি নিষ্কৃতি পেয়েছি। তুমি যে শান্তির জন্যে লালায়িত হয়ে চিঠি লিখেছ সে ভাবটা আমি মনের মধ্যে বেশ বুঝতে পারছি। তোমার ক্রন্দন আমার হৃদয়ের মধ্যে প্রবেশ করেছে।
>
> কিন্তু তুমি অবসর নিলে সমস্ত কাজ অচল হয়ে উঠবে।··আমাকে আবার দৌড়দৌড়ি করে মরতে হবে—আর ত সে পারব না।···তোমাকে এ ভারটুকু স্বীকার না করে নিলে আমি ত কোন উপায় দেখি নে। আমাদের সংসারের ভার তোমার উপরে থাকাই ঠিক—কারণ তুমি আত্মীয় অথচ আমাদের সংসারের ফলভোগী নও। আমাদের নিজেদের মধ্যে যে কেউ কাজ দেখবে তাকেই অন্যেরা অবিশ্বাস ও ঈর্ষ্যা করবে, মনে করবে সে গোপনে নিজেরই সুবিধা করে নিচ্ছে। সম্পূর্ণ বাইরের লোক হলে সে নানা মনিবের নানা উপদ্রবে অস্থির হয়ে দুদিনও টিকতে পারবে না। এই সমস্ত বিবেচনায় তোমাকে ধৈর্য্য অবলম্বন করে এ কাজ স্বীকার করতেই হবে নইলে আর কোন সদুপায়ই আমি দেখিনে।[৫]

—এই চিঠির পরিপ্রেক্ষিতে সুভো ঠাকুরেরর কুরুচিপূর্ণ গ্রন্থ 'বিস্মৃতি চারণা' [দ্র দেশ, শারদীয় ১৩৯১। ৪১-৭২]-য় প্রকাশিত ঘৃণ্য মানসিকতার পটভূমিটি বোঝা শক্ত হয় না।

মোতিচাঁদ নাখতারের ঋণ শোধের জন্য অন্য জায়গা থেকে টাকা সংগ্রহ করতে রবীন্দ্রনাথ প্রিয়নাথ সেনকে অনুরোধ করেছিলেন। বিষয়কর্মে অরুচির কথা তাঁকেও লিখেছেন ৮ বৈশাখের [সোম 21 Apr] পত্রে, অন্যান্য প্রসঙ্গও পত্রটিতে আছে :

আমার শরীর অসুস্থ ছিল—তা ছাড়া বিদ্যালয়ের দুই শিক্ষক ছুটিতে অনুপস্থিত—তাঁদের কাজ আমি চালাচ্চি বলে সময় পাইনে—তাছাড়া বিষয়কর্ম্মের কথা স্মরণ হলেই মনটা কর্ম্মের অযোগ্য হয়ে পড়ে বলে আমি সুরেনের উপর ভর দিয়ে চুপ করে ব'সে আছি।…লেখাপড়া সম্পন্ন করবার জন্যে আমার যাওয়া কি নিতান্ত দরকার হবে? আমার এখানে কোন কোন ভদ্রলোক কাজ করবার জন্যে আসবেন, তাঁরা আমার বিদ্যালয়কে তাঁদের এক মাসের সময় দান করবেন—তাঁদের উপস্থিতিকালে আমি অবর্ত্তমান থাকলে আতিথ্য ও শিষ্টতার ব্যাঘাত ঘটে।[৬]

এই চিঠি থেকে মনে হয়, সাধারণ বিদ্যালয়ের মতো গ্রীষ্মবকাশ ও পূজাবকাশ দেবার পরিকল্পনা রবীন্দ্রনাথের প্রথমে ছিল না। রথীন্দ্রনাথকে এক বছরের মধ্যে এন্ট্রান্স পরীক্ষার উপযোগী করে তোলার বাস্তব ভাবনাও তাঁর মনে থাকতে পারে। ব্রহ্মবান্ধবের জ্ঞাতিভ্রাতা মনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় ইতিমধ্যেই শিক্ষক হিসেরে যোগ দেন, মোহিতচন্দ্র সেন বা তাঁর মতো কোনো-কোনো শিক্ষাব্রতী তাঁদের কর্মস্থলে গ্রীষ্মবকাশের সুযোগে হয়তো ব্রহ্মচর্যাশ্রমে পড়াবার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। কিন্তু প্রচলিত রীতির ব্যতিক্রম ঘটানো শক্ত, তাছাড়া রাঢ়ের প্রচণ্ড গ্রীষ্মতাপও ছিল—তাই দেখা যায়, কিছুদিনের মধ্যে রবীন্দ্রনাথও ছুটি ঘোষণা করে দিতে বাধ্য হয়েছেন। ২১ বৈশাখ [রবি 4 May] তিনি অক্ষয়চন্দ্র সরকারকে লিখেছেন : 'তারককে সোমবারে পাঠাইবার কথা ছিল। কিন্তু মনোরঞ্জনবাবু শনিবারে চুঁচুড়ায় গেলেন বলিয়া তাঁহার সঙ্গে পাঠানোই কর্ত্তব্য বোধ করিলাম।'[৭]

দীনেশচন্দ্র সেন তাঁর 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণের সমালোচনা ও পুত্র অরুণচন্দ্রকে ব্রহ্মচর্যাশ্রমে ভর্তি করার জন্য রবীন্দ্রনাথকে তাগিদ দিচ্ছিলেন, একথা আমরা বলেছি। এই সময়ে তিনি শান্তিনিকেতনের নিকটবর্তী কোনো স্থানে বাসা ভাড়া করে সপরিবারে বাস করবেন এমন জল্পনার কথা জানান। চোখের বালি-র শেষাংশ নিয়ে তিনি কৌতূহলও ব্যক্ত করেন। রবীন্দ্রনাথ প্রত্যুত্তরে ১৩ বৈশাখে [শনি 26 Apr] তাঁকে স্টেশনের কাছে ১০।১২ টাকায় একটি বাসার ব্যবস্থা করে দেবার আশ্বাস দিয়ে লেখেন : 'আপনি একবার আমার এলাকার মধ্যে আসিয়া পড়িলে তাহার পরে যে কাণ্ডটা করা যাইবে সে আমার মনেই আছে। তাই বলিয়া বিনোদিনীর রহস্যনিকেতনে আপনাকে অকালে প্রবেশ করিতে দেওয়া আমার সম্পাদকধর্ম্মসঙ্গত হইবে কিনা তাহা এখনো স্থির করিয়া উঠিতে পারিতেছি না।'[৮] দীনেশচন্দ্র লিখেছেন : ''কিন্তু 'চোখের বালি' তিনি কিস্তিতে কিস্তিতে বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত হইবার পূর্বে আমাকে পড়িয়া শুনাইয়াছিলেন, বিনোদিনীর রহস্যনিকেতনে আমাকে প্রবেশাধিকার দিয়াছিলেন।''[৯] অবশ্য শান্তিনিকেতন-অঞ্চলে তাঁর বাস করার সুযোগ ঘটেনি। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ তাঁর সান্নিধ্য কামনা করছিলেন; ২০ বৈশাখ [শনি 3 May] তিনি লেখেন :

আপনার চিঠি পাইয়া আনন্দিত হইলাম এখন সাক্ষাৎকারের আনন্দ প্রত্যাশা করিয়া আছি। আমার পিতৃদেবের জন্মোৎসব উপলক্ষ্যে আমাকে ১লা জ্যৈষ্ঠ নাগাদ একবার কলিকাতায় যাইতে হইবে। ফিরিবার সময় আপনাকে সবলে আকর্ষণ করিয়া আনিলে কিরূপ হয়? আপনার ছেলেটিকে সস্নেহে গ্রহণ ও সযত্নে শিক্ষাদান করিব সে সম্বন্ধে আপনি চিন্তা করিবেন না—পনেরো দিনের মধ্যেই সে এখানে এমনি জমিয়া যাইবে যে বাড়ি যাইবার নাম করিবে না। এখান হইতে যে সকল ছাত্র ঘরে ফেরে তাহার অশ্রুজল না ফেলিয়া যায় না।[১০]

এই দিনই তিনি তারক নামক ছাত্রটিকে চুঁচুড়ায় প্রেরণ করেছিলেন, সুতরাং এই অভিজ্ঞতা হয়তো তিনি সদ্যই লাভ করেছিলেন।

২৫ বৈশাখ [বৃহ ৪ May] রবীন্দ্রনাথ ৪২ বৎসর বয়সে পদার্পণ করলেন। এইদিন কলকাতা থেকে তাঁর জন্মদিনে শুভেচ্ছা জানানোর জন্য অনেকে শান্তিনিকেতনে উপস্থিত হন। জামাতা সত্যেন্দ্রনাথের খুল্লতাত নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যকে তিনি সেইদিনই লেখেন :

আজ ঠিক জন্মদিনের প্রভাতে আপনার প্রীতিপূর্ণ পত্র পাইয়া বড় আনন্দ লাভ করিলাম—ঈশ্বরের অনেক প্রসাদ অযাচিত পাইয়াছি তাহার মধ্যে আপনাদের প্রতি একটি। ঈশ্বর যদি আমাকে এমন গুণ দিয়া থাকেন যাহাতে পরিচিত অপরিচিত অনেক হৃদয়ের মধ্যে আমি অবারিত অধিকার লাভ করিয়া থাকি তবে আমি ধন্য।

আজ অনেকে কলিকাতা হইতে এখানে আসিয়াছেন তাঁহাদের আতিথ্যে আমি ব্যাপৃত আছি।[১১]

একে ঠিক জন্মোৎসব বলা যায় না, কিন্তু রবীন্দ্রনাথের জন্মদিন উপলক্ষে শান্তিনিকেতনে এই বন্ধুসমাগমের একটি ঐতিহাসিক মূল্য আছে।

দীনেশচন্দ্রকে লেখা চিঠি অনুযায়ী রবীন্দ্রনাথ হয়তো ১ জ্যৈষ্ঠই [বৃহ 15 May]কলকাতায় এসেছিলেন, কিন্তু তাঁর গতিবিধির বিবরণ মেলে ৩ জ্যৈষ্ঠ থেকে। এইদিন বিকেলে তিন ব্রাহ্মসমাজ মিলে মহর্ষির ষড়শীতিতম জন্মোৎসব পালন করে। কিন্তু প্রকাশিত বিবরণে রবীন্দ্রনাথের বিশেষ কোনো ভূমিকার কথা জানা যায় না। একই দিনে তিনি বালিগঞ্জে যাতায়াত করেন ও বরিশালে দেবকুমার রায়চৌধুরীর কাছে একটি টেলিগ্রাম পাঠান। তারকনাথ পালিতের কাছ থেকে যে ঋণসংগ্রহের চেষ্টা চলছিল তার পরিপ্রেক্ষিতে বালিগঞ্জ যাতায়াতের উদ্দেশ্যটি বোঝা যায়, কিন্তু ব্রিশালে টেলিগ্রাম করার কারণটি অজ্ঞাত।

রবীন্দ্রনাথ এইবারে ৬ জ্যৈষ্ঠ [সোম 19 May] পর্যন্ত কলকাতায় থাকেন। সম্ভবত ৫ জ্যৈষ্ঠ তিনি দীনেশচন্দ্রকে লেখেন : ‘কাল সমস্ত দিন বালিগঞ্জে এক আত্মীয় হইতে আর এক আত্মীয়ের ঘরে কাটিবে। পরশু প্রত্যুষে পদ্মাতীর অভিমুখে দৌড় মারিব। ফিরিয়া আসিয়া নিশ্চয় আপনার সঙ্গে দেখা করিব, ইতিমধ্যে আপনার বইখানি যতটা পারি পড়িয়া লইব।’[১২] ৬ জ্যৈষ্ঠ তাঁর বালিগঞ্জ যাতায়াতের হিসাব পাওয়া যায়, ৪ জ্যৈষ্ঠও তিনি বালিগঞ্জ ও ‘গোলতলা’ যান, ৫ জ্যৈষ্ঠ যান বিডন স্ট্রীট ও কর্নওয়ালিশ স্ট্রীট। ৪ তারিখে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের অষ্টম বার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়, এই অনুষ্ঠানে তিনি উপস্থিত ছিলেন কিনা জানা যায় না।

লক্ষণীয়, এবারেও তিনি প্রিয়নাথ সেনের সঙ্গে দেখা করেননি। এই নিয়ে প্রিয়নাথ অনুযোগ করলে 30 May [বৃহ ১৫ জ্যৈষ্ঠ] শিলাইদহ থেকে তাঁকে লেখেন :

আমি যে তিন চার দিন কলকাতায় ছিলুম এক মুহূর্ত অবসর পাই নি। সেই মোতিচাঁদের টাকার বন্দোবস্ত করতে আমাকে ক্রমাগতই যোড়াসাঁকো থেকে বালিগঞ্জে আনাগোনা করতে হয়েছে। তোমার ওখানে যাব বলে নিশ্চয় স্থির করেছিলাম কিন্তু কিছুতেই হয়ে ওঠেনি। শরীরটা অত্যন্ত ভেঙে পড়াতে কিছুদিন বিশ্রাম করবার জন্যে শিলাইদহে এসেছি কিন্তু এখানে এসেও শরীরটা শুধ্‌রে ওঠ্‌বার লক্ষণ দেখ্‌চি নে। তার উপরে এখানকার জমিদারী কাজেও জড়িয়ে পড়েছি।····

এই সমস্ত উপদ্রবের মধ্যে বঙ্গদর্শন এক মুহূর্ত স্কন্ধ ছাড়ে নি। এই অল্প দিন হল চোখের বালি সমস্তটা শেষ করে শৈলেশের হাতে দিয়েছি। কিন্তু রক্তবীজকে বধ করাই সম্পাদকের কাজ—একটা চুকিয়ে আর একটাকে আক্রমণ করতে হয়—ফের আর একটা গল্প লিখ্‌তে হবে। যাই হোক্‌ আপাতত আশ্বিন মাস পর্য্যন্ত চোখের বালিই আসর অধিকার করে থাক্‌বে।[১৩]

চোখের বালি বঙ্গদর্শন-এর কার্তিক-সংখ্যায় শেষ হয়, পরবর্তী উপন্যাস নৌকাডুবি বৈশাখ ১৩১০-সংখ্যা থেকে প্রকাশিত হতে থাকে।

শিলাইদহে এসে রবীন্দ্রনাথের লেখার কাজ দ্রুত অগ্রসর হয়েছে। চোখের বালি আগেই শেষ হয়েছিল, এখানে এসে লেখেন কয়েকটি প্রবন্ধ। কন্যার অসুস্থতার জন্য পনেরো দিনের ছুটি নিয়ে ব্রহ্মচর্যাশ্রমের শিক্ষক মনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় চুঁচুড়ায় চলে এসেছিলেন, প্রয়োজনে অতিরিক্ত ছুটির আশ্বাস দিয়ে ১১ জ্যৈষ্ঠ [রবি 25 May] তাঁকে লিখেছেন : 'পরিবর্ত্তন আবশ্যক বোধ করিতেছিলাম। এখানে আসিয়া শরীর কিছু যেন ভাল আছে অন্তত মন নিরুদ্বেগ থাকাতে অনেক কাজ করিতে পারিতেছি।'[১৪]

দীনেশচন্দ্র সেনের বঙ্গভাষা ও সাহিত্য গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয় 5 Oct 1901 [১৯ আশ্বিন ১৩০৮] তারিখে, বইটি সমালোচনা করবেন বলে রবীন্দ্রনাথ অনেকদিন ধরেই প্রতিশ্রুত ছিলেন, সেই প্রতিশ্রুতি রক্ষা হল শিলাইদহে এসে। ১২ জ্যৈষ্ঠ [সোম 26 May] তিনি দীনেশচন্দ্রকে লেখেন :

> সজ্জনের বাক্য লঙ্ঘন হয় নাই—সূর্য্যও পূর্ব্বদিকে উঠিতেছে আপনার সমালোচনাও শেষ করিয়াছি, মস্ত হইয়াছে—বঙ্গদর্শনের এক ফর্ম্মারও অধিক হইবে। এটা আলোচনা সমিতিতে পড়িবার ইচ্ছা করিতেছি ইহাতে আলোচনাযোগ্য অনেক কথার অবতারণ করিয়াছি।[১৫]

সত্যই এই প্রবন্ধে তিনি অনেক নূতন কথার অবতারণা করেন। গ্রন্থটির প্রথম সংস্করণের আলোচনায় তিনি প্রধানত ভাষাতত্ত্বের ইঙ্গিতগুলিই গ্রহণ করেছিলেন, দ্বিতীয় সংস্করণে তাঁর দৃষ্টি পড়েছে মধ্যযুগের বাংলাসাহিত্যে ধর্মদ্বন্দ্বের অভিব্যক্তির দিকে। বক্তব্যটিকে ভারতীয় ইতিহাসে আর্য-অনার্যের দ্বন্দ্ব ও জাতি-সমন্বয়ের স্তরপরম্পরার পটভূমিকায় স্থাপন করায় তা বৃহত্তর তাৎপর্যে মণ্ডিত হয়েছে, যা বস্তুত সমালোচ্য গ্রন্থে নেই। গদ্যগ্রন্থাবলী-র অন্তর্গত সাহিত্য [১৩১৪] গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত করার সময়ে রবীন্দ্রনাথ প্রবন্ধটির একটি বড়ো অংশ পরিত্যাগ করেন, রবীন্দ্র-রচনাবলী-র 'গ্রন্থপরিচয়' অংশে তা সংকলিত হয়েছে [দ্র ৮।৫৩০-৩২]। এখানেও অবশ্য সমস্ত পরিত্যক্ত অনুচ্ছেদগুলি নেই, যার একটির মধ্যে তিনি ভারতের পশ্চিমাঞ্চলে রাম-কথার আপেক্ষিক প্রাধান্যের বিষয়ে মন্তব্য করেছিলেন :

> পশ্চিমে রামচরিত্র লোকের হৃদয় অধিকার করিয়া লইয়াছে। সেই চরিত্রে ভাবের উচ্ছাসমাত্র নহে, তাহাতে কর্ত্তব্যের আদর্শ আছে। সেই চরিতকাব্যে পিতৃসত্যপালনের জন্য রামের নির্বাসনগ্রহণ, ভ্রাতার জন্য লক্ষ্মণের আত্মত্যাগ, স্বামীর জন্য সীতার বনবাসস্বীকার, প্রভুর প্রতি হনুমানের অচলা ভক্তি, ধর্ম্মের জন্য ভরতের স্বার্থত্যাগ, এ সমস্তই বীর্য্যের আদর্শ, কর্ত্তব্যের আদর্শ। এই আদর্শের সৌন্দর্য্য যাহাদিগকে মুগ্ধ করিয়াছে, তাহারা নিষ্ঠালাভ করিয়াছে, কর্ত্তব্যসাধনে বললাভ করিয়াছে, ধর্মের জন্য তাহারা প্রাণ দিতে পারে।[১৬]

উল্লেখ্য, ফাল্গুন-চৈত্র ১৩০৫-সংখ্যা ভারতী-তে মুদ্রিত 'গ্রাম্য সাহিত্য' প্রবন্ধের অনুরূপ একটি অংশ তিনি গ্রন্থে পরিত্যাগ করেছিলেন। পরবর্তীকালে এই বিষয়ে তাঁর মত পরিবর্তিত হয়েছিল বলে তিনি এগুলি বর্জন করেন, এমন কথা মনে হয় না। তবু একই ধরনের বক্তব্য সংবলিত দুটি অংশ কেন পরিত্যক্ত হল, সেকথা ভেবে দেখবার মতো।

সম্ভবত এই সমালোচনা-মূলক প্রবন্ধ রচনা উপলক্ষেই বৃহত্তর ভারতেতিহাসের প্রতি রবীন্দ্রনাথের মন আকৃষ্ট হয়েছে, এরই ফলে ভারতবর্ষের ইতিহাস' [দ্র বঙ্গদর্শন, আষাঢ়। ২২১-৩৬; ভারতবর্ষ ৪।৩৭৭-৮৭] প্রবন্ধ রচিত হয়, এটিও 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য'-এর মতো 'গত জ্যৈষ্ঠমাসে মজুমদার লাইব্রেরির সংসৃষ্ট আলোচনা সমিতিতে বঙ্গদর্শন-সম্পাদক-কর্ত্তৃক পঠিত'। ইংরেজের রচিত ভারতবর্ষের ইতিহাসে ভারতবর্ষকে পাওয়া যায় না, এই বক্তব্যটিকেই রবীন্দ্রনাথ প্রবন্ধটির মধ্যে ব্যক্ত করেছেন। য়ুরোপীয় সভ্যতা যে ঐক্যকে

আশ্রয় করেছে তা বিরোধমূলক, ফলে বহিঃশক্তির আক্রমণ ও রাজারাজড়ার যুদ্ধের ভিত্তিতে ইংরেজ ভারতবর্ষের ইতিহাস গড়ে তোলার চেষ্টা করেছে। কিন্তু এই যুদ্ধবিগ্রহ ভারতবর্ষীয় সভ্যতার প্রাণ নয়, রবীন্দ্রনাথের মতে, 'ভারতবর্ষের চিরদিনই একমাত্র চেষ্টা দেখিতেছি প্রভেদের মধ্যে ঐক্যস্থাপন করা, নানা পথকে একই লক্ষ্যের অভিমুখীন করিয়া দেওয়া এবং বহুর মধ্যে এককে নিঃসংশয়রূপে অন্তরতররূপে উপলব্ধি করা—বাহিরে যে-সকল পার্থক্য প্রতীয়মান হয় তাহাকে নষ্ট না করিয়া তাহার ভিতরকার নিগূঢ় যোগকে অধিকার করা।' ভারতবর্ষের সমাজ ও ধর্মনীতি এই মিলনমূলক ঐক্যের আদর্শকে গ্রহণ করে গড়ে উঠেছে।

কিন্তু বিদেশী শিক্ষা এই আদর্শকে উপলব্ধি করার পথে প্রধান অন্তরায়। 'বিদেশী শিক্ষক কোনমতেই শিক্ষাকে আমাদের অনুকূল করিতে পারে না। একে ত তাহারা আমাদিগকে জানেই না, তাহার পরে আমাদের প্রতি তাহাদের অবজ্ঞার সীমা নাই। দম্ভে যে মূঢ়তা আনে, তাহার মত প্রবল মূঢ়তা আর নাই—সভ্যতার উৎকট দম্ভে আমাদের পাশ্চাত্য অধ্যাপকেরা নিজেদের সংস্কার ছাড়া অন্য সংস্কারের সভ্যতা একেবারে দেখিতে পান না···বিশেষত আজকাল হঠাৎ ইংলণ্ডে উচ্চশ্রেণীর ভাবুকলোকের একেবারে অভাব ঘটাতে ইংরাজের জাতীয় মদমত্ততা সর্বপ্রকার সদ্বিবেচনা ও মঙ্গলের বন্ধন একেবারে উল্লঙ্ঘন করিতে উদ্যত হইয়াছে'।[১৭] ইংরেজের ছেলেদের ক্ষেত্রে এরূপ নয়, তাদের চতুর্দিকবর্তী স্বদেশীসমাজ স্বদেশীশিক্ষাকে সম্পূর্ণরূপে আপন করে নেওয়ার জন্য আনুকূল্য করে, শিক্ষাপ্রণালী ও অধ্যাপকগণও তার অনুকূল। সুতরাং নিজের দেশের জন্য রবীন্দ্রনাথ ব্যবস্থাপত্র দিয়েছেন : 'এই বিদেশী শিক্ষাধিক্কারের হাত হইতে স্বজাতিকে মুক্তি দিতে হইলে শিক্ষার ভার আমাদের নিজের হাতে লইতে হইবে এবং যাহাতে শিশুকাল হইতে ছেলেরা স্বদেশীয় ভাবে, স্বদেশী প্রণালীতে, স্বদেশের সহিত হৃদয়মনের যোগ রক্ষা করিয়া, স্বদেশের বায়ু ও আলোক প্রবেশের দ্বার উন্মুক্ত রাখিয়া শিক্ষা পাইতে পারে, তাহার জন্য আমাদিগকে একান্ত প্রযত্নে চেষ্টা করিতে হইবে।' জাতীয় ভিত্তিতে 'জাতীয় শিক্ষা পরিষদ' প্রতিষ্ঠার [২৯ শ্রাবণ ১৩১৩:14 Aug 1906] অনেক আগেই রবীন্দ্রনাথ এই উদ্দেশ্যে শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্যাশ্রম স্থাপন করেছিলেন।

গদ্যগ্রন্থাবলী-র অন্তর্গত 'ভারতবর্ষ' [15 Feb 1906:৩ ফাল্গুন ১৩১২] গ্রন্থে মুদ্রণের সময়ে প্রবন্ধটির অনেক অংশ বর্জিত হয়। বিদ্যালয় ও পারিবারিক অর্থাভাবের সঙ্গে সামঞ্জস্যসাধনের উদ্দেশ্যে গ্রন্থাকারে প্রকাশের সময়ে প্রবন্ধগুলি সংক্ষেপিত হয়েছে বলে আমাদের বিশ্বাস, বস্তুত এই বর্জিত অংশগুলিতেও অনেক গভীর চিন্তা ব্যক্ত হয়েছে যা অবশ্যই সংকলনযোগ্য। একটু অংশ উদ্ধৃত করি :

> আমরা কন্‌গ্রেস্ করিতেছি, মনে করিতেছি যেন আমরা লড়াই করিতেছি; ভিক্ষাপত্রে সই করিতে একত্র হইয়াছি, মনে করিতেছি আমরা পার্লামেন্ট করিতেছি; যথেচ্ছাচার করিতেছি, মনে করিতেছি আমরা সমাজ-সংস্কারক; পরের সমস্ত সংস্কার অন্ধভাবে গ্রহণ করাকেই বলিতেছি ঔদার্য্য, নিজের সমস্ত সংস্কার অন্ধভাবে ত্যাগ করাকেই বলিতেছি কুসংস্কারমুক্তি।····সেই দেশবিদ্রোহ সর্বাঙ্গে এবং সকল মনে বহন করিয়া আমরা কন্‌গ্রেস্ করি,—ভাষায়, ভাবনায়, ভঙ্গীতে সেই দেশবিদ্রোহের ধ্বজা উড়াইয়া আমরা দেশের কাজ করিতেছি বলিয়া স্পর্দ্ধা করিয়া থাকি।[১৮]

'ব্রাহ্মণ' [দ্র বঙ্গদর্শন, আষাঢ়। ১৩৬-৪৯; ভারতবর্ষ ৪।৩৮৭-৪০২] ও 'চীনেম্যানের চিঠি' [দ্র বঙ্গদর্শন, আষাঢ়। ১৫১-৬২; ভারতবর্ষ ৪|৪০২-১৬] প্রবন্ধ-দুটিও এই সময়ে লেখা—দুটি প্রবন্ধই "সম্পাদক কর্তৃক মজুমদার লাইব্রেরির সংসৃষ্ট 'আলোচনা সমিতির' বিশেষ অধিবেশনে পঠিত" হয়েছিল।

রবীন্দ্রজীবনী-কার লিখেছেন, 'ব্রাহ্মণ' প্রবন্ধটি রবীন্দ্রনাথ Y.M.C.A.-র ওভারটুন হলে পাঠ করেন। কোনো মহারাষ্ট্রী ব্রাহ্মণকে তাঁর ইংরেজ প্রভু পাদুকাঘাত করায় তার বিচার হাইকোর্ট পর্যন্ত গড়ায় এবং শেষ বিচারক ব্যাপারটিকে তুচ্ছ বলে উড়িয়ে দিলে দেশী সাময়িকপত্রে এই নিয়ে তুমুল আন্দোলন উপস্থিত হয়। এই ঘটনাটি 'ব্রাহ্মণ' প্রবন্ধ রচনার প্রধান উপলক্ষ হলেও রবীন্দ্রনাথ এই সুযোগে প্রাচীন ভারতীয় আদর্শের আধুনিক প্রয়োগ সম্বন্ধে তাঁর মতামত পুনরায় ব্যক্ত করলেন। ৭ বৈশাখ তিনি ব্রজেন্দ্রকিশোরকে যে লিখেছিলেন, 'আমি ব্রাহ্মণ আদর্শকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিবার সংকল্প হৃদয়ে লইয়া যথাসাধ্য চেষ্টায় প্রবৃত্ত হইয়াছি'—এই প্রবন্ধে সেই চেষ্টা লক্ষ্য করা যায়। ভারতবর্ষে সমাজতন্ত্রের যে বিশেষ স্থান ছিল, সেই সমাজের আদর্শকে রক্ষা করবার ও বিধিবিধান স্মরণ করিয়ে দেবার ভার ছিল ব্রাহ্মণের উপর—'জীবনযাত্রাকে সরল ও বিশুদ্ধ করিয়া, অভাবকে সংক্ষিপ্ত করিয়া, অধ্যয়ন-অধ্যাপন যজনযাজনকেই ব্রত করিয়া দেশের উচ্চতম আদর্শকে সমস্ত দোকানদারির কলুষস্পর্শ হইতে রক্ষা করিয়া' ব্রাহ্মণ এক সময়ে সমগ্র সমাজের কাছ থেকে পৃষ্ঠপোষকতা ও সম্মান লাভ করে এসেছে। কিন্তু আজকের ব্রাহ্মণ এই উচ্চ আদর্শ থেকে স্খলিত হওয়ার জন্যই উল্লিখিত অবমাননার সম্মুখীন হয়েছে। অথচ সমাজের সংহতি ও আদর্শকে অক্ষুন্ন রাখার জন্য ব্রাহ্মণের প্রয়োজন আছে, পার্থিব সুখভোগের ঐকান্তিক আকাঙক্ষা পরিত্যাগ করে সমাজের প্রয়োজনসিদ্ধির জন্য আত্মনিয়োগ করলে সমাজও অবশ্যই তার কর্তব্য পালন করবে।

পশ্চাদ্‌মুখীতার জন্য রবীন্দ্রনাথের এই প্রবন্ধ বিভিন্ন শ্রেণীর সমালোচকদের দ্বারা নিন্দিত হয়েছে। কিন্তু সম্ভবত প্রবন্ধটির প্রকৃত তাৎপর্য অনুধাবন করতে না পারাই এই নিন্দার কারণ। 'ব্রাহ্মণ' বলতে আমরা সচরাচর হিন্দুসমাজের যে বিশেষ শ্রেণী বা বর্ণের কথা ভাবি, রবীন্দ্রনাথ তার চেয়ে কিছু বৃহত্তর অর্থে শব্দটি প্রয়োগ করতে চেয়েছেন। সেইজন্যই তিনি যখন লেখেন, 'য়ুরোপেওঅবিশ্রাম কর্মালোড়নের মাঝে মাঝে এক-এক জন মনীষী উঠিয়া ঘূর্ণগতির উন্মত্ত নেশার মধ্যে স্থিতির আদর্শ লক্ষ্যের আদর্শ পরিণতির আদর্শ ধরিয়া থাকেন। কিন্তু দুই দণ্ড দাঁড়াইয়া শুনিবে কে? সম্মিলিত প্রকাণ্ড স্বার্থের প্রচণ্ড বেগকে এই প্রকারের দুই-এক জন লোক তর্জনী উঠাইয়া রুখিবেন কী'করিয়া।'—তখন তিনি বৃহত্তর অর্থে 'ব্রাহ্মণ'কেই বুঝিয়ে থাকেন। ভারতবর্ষীয় সমাজের ক্ষেত্রেও তিনি ব্রাহ্মণকে এই বৃহত্তর তাৎপর্যে গ্রহণ করে লিখেছেন :

> বর্তমান সমাজেরও যদি একটা মাথার দরকার থাকে, সেই মাথাকে যদি উন্নত করিতে হয় এবং সেই মাথাকে যদি ব্রাহ্মণ বলিয়া গণ্য করা যায়, তবে তাহার স্কন্ধকে ও গ্রীবাকে একেবারে মাটির সমান করিয়া রাখিলে চলিবে না। সমাজ উন্নত না হইলে তাহার মাথা উন্নত হয় না, এবং সমাজকে সর্বপ্রযত্নে উন্নত করিয়া রাখাই সেই মাথার কাজ।

—এই মাথার কাজের ক্ষেত্রে অর্থাৎ অবিশ্রাম গতির মধ্যে স্থিতি রক্ষার কাজে তিনি তথাকথিত ব্রাহ্মণের সঙ্গে অব্রাহ্মণের ভূমিকাও স্বীকার করেছেন।

জগদীশচন্দ্র 21 Mar 1902 [৭ চৈত্র ১৩০৮] লণ্ডন থেকে রবীন্দ্রনাথকে লেখেন : 'তোমার জন্য John Chinaman পাঠাইতেছি। পড়িয়া দেখিও আমরা স্বর্ণ ফেলিয়া ইয়োরোপীয় ভস্ম লেপন করিতেছি।'[১৯] এই *Letters of John Chinaman* গ্রন্থটি কেম্‌ব্রিজের কিংস কলেজ ও লণ্ডন স্কুল অব ইকনমিক্‌সের অধ্যাপক Goldsworthy Lowes Dickinson [1862-1932] কর্তৃক রচিত, Rhodes Scholar রূপে চীনভ্রমণের সময়ে নিজের নাম গোপন করে ইংরেজি-শিক্ষিত জনৈক চৈনিকের জবানীতে তিনি এই পত্র-প্রবন্ধগুলি রচনা করেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁর প্রকৃত পরিচয় না জেনে চৈনিক দৃষ্টিতে য়ুরোপীয় সভ্যতার সমালোচনা রূপেই গ্রন্থটিকে গ্রহণ

করেছেন এবং বাঙালি পাঠকের জন্য পুস্তকের বিষয়বস্তুর সংক্ষিপ্তসার রচনা করেছেন 'চীনেম্যানের চিঠি' প্রবন্ধে। বছরখানেক পূর্বে 'সমাজভেদ' [দ্র বঙ্গদর্শন, আষাঢ় ১৩০৮।১০৭-১১; স্বদেশ ১১।৪৮৪-৮৯] প্রবন্ধে তিনি চীনে য়ুরোপীয় সাম্রাজ্যবাদীদের অত্যাচার প্রসঙ্গে প্রাচ্যসভ্যতার সমাজমূলক প্রকৃতির স্বরূপ বিশ্লেষণ করেছিলেন। তারপরে 'Asia is One' বাণীর প্রবক্তা জাপানী মনীষী কাকুজো ওকাকুরার সঙ্গে পরিচয়ের মাধ্যমে প্রাচ্যের এই ঐতিহ্যময় ভূভাগের সভ্যতার বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে তাঁর ধারণা আরও পুষ্টি লাভ করে। এই অবস্থায় বর্তমান গ্রন্থটি পড়ে তিনি স্বতই মুগ্ধ হয়েছেন :'এই ছোটো বইখানি পড়িয়া আমরা বিশেষ আনন্দ ও বল পাইয়াছি। ইহা হইতে দেখিয়াছি, এশিয়ার ভিন্ন ভিন্ন জাতির মধ্যে একটি গভীর ও বৃহৎ ঐক্য আছে। চীনের সঙ্গে ভারতবর্ষের প্রাণের মিল দেখিয়া আমাদের প্রাণ যেন বাড়িয়া যায়। এই মিলটিকে স্পষ্ট করার জন্যই তিনি গ্রন্থটি থেকে চীনের সমাজনীতি, অর্থনীতি ও রাষ্ট্রনীতির বর্ণনার বিস্তৃত অংশ অনুবাদ করে দিয়েছেন। অবশ্য প্রবন্ধের শেষে সামাজিক সার্থকতার লক্ষ্যের দিক দিয়ে তিনি ভারতীয় আদর্শের শ্রেষ্ঠত্বের কথাই ব্যক্ত করেছেন। উল্লেখ্য, সুরেন্দ্রনাথ [ঠাকুর] একই মাসের ভারতী-তে 'প্রাচী ও প্রতীচী' [পৃ ২৯০-৯৭] নামক প্রবন্ধে গ্রন্থটির বিস্তৃত অংশ অনুবাদ করে দেন, তিনিও 'এটিকে একটি প্রাজ্ঞ চীনদেশীয় ভদ্রলোকের পত্রাকারে লিখিত কতকগুলি প্রবন্ধ' বলে মনে করেছিলেন। এই ভুল আরও অনেকের মতো নিবেদিতাও করেছেন—কিন্তু তাঁর ভুল ভাঙতে দেরি হয়নি, 2 Jul [১৮ আষাঢ়] তিনি মিস ম্যাকলাউডকে লেখেন : 'We are all broken hearted to think John Chinaman was English.'[২০] তিনি আরও জানিয়েছেন : ওকাকুরা তাঁর *The Ideals of the East* গ্রন্থে এ-বিষয়ে অনেকটা লিখে ফেলেছেন।

সুতরাং 'জন চায়নাম্যান'-এর প্রকৃত পরিচয় শেষ পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথেরও অজ্ঞাত ছিল না—1912-এ ইংলণ্ড ভ্রমণের সময়ে তিনি কেম্ব্রিজে অধ্যাপক ডিকিন্সনের বাড়িতে দুদিন [13-14 Jul] অবস্থান করেন। তিনি লিখেছেন :

> সে বইখানি ['জন চীনাম্যানের পত্র'] যখন প্রথম বাহির হয় তখন আমাদের দেশে প্রাচ্যদেশাভিমানের একটা প্রবল হাওয়া দিয়াছিল। সমস্ত য়ুরোপের চিত্ত যেমন একই সভ্যতাসূত্রের চারি দিকে দানা বাঁধিয়াছে তেমনি করিয়া একদিন সমস্ত এসিয়া এক সভ্যতার বৃন্তের উপর একটি শতদলপদ্ম হইয়া বিশ্ববিধাতার চরণতলে নৈবেদ্যরূপে জাগিয়া উঠিবে, এই কল্পনা ও কামনা আমাদিগকে মাতাইয়া তুলিতেছিল। সেই সময়ে এই 'চীনাম্যানের পত্র' বইখানি অবলম্বন করিয়া আমি এক মস্ত প্রবন্ধ লিখিয়া সভায় পাঠ করিয়াছিলাম। তখন জানিতাম, সে বইখানি সত্যই চীনাম্যানের লেখা। যিনি লেখক তাঁহাকে দেখিলাম; তিনি চীনাম্যান নহেন তাহাতে সন্দেহ নাই; কিন্তু, তিনি ভাবুক, অতএব তিনি সকল দেশের মানুষ।[২১]

Jan 1913-এ অধ্যাপক ডিকিনসন জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ি ও শান্তিনিকেতন পরিদর্শন করেন।

উল্লেখ্য, 'চীনেম্যানের চিঠি' প্রবন্ধটি অবলম্বন করে পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় [1866-1923] রবীন্দ্র- ও বঙ্গদর্শন-বিরোধিতায় অবতীর্ণ হন। ক্লাসিক থিয়েটারের স্বত্বাধিকারী অমরেন্দ্রনাথ দত্তের পরিচালনায় 'রঙ্গালয়' নামক যে সাপ্তাহিক প্রকাশিত হয় [প্রথম প্রকাশ : ১৮ ফাল্গুন ১৩০৭ শুক্র 1 Mar 1901], পাঁচকড়ি ছিলেন তার বেতনভোগী সম্পাদক; বৎসরাধিকাল পরিচালনার পর অমরেন্দ্রনাথ পত্রিকাটির স্বত্ব 22 May 1902 [৮ জ্যৈষ্ঠ ১৩০৯] পাঁচকড়িকে প্রদান করেন। ১৭ জ্যৈষ্ঠ-সংখ্যায় পাঁচকড়ি লেখেন : 'চাকুরে সম্পাদক হইয়া আমাকে অনেক অপকর্ম্ম করিতে হইয়াছে। তজ্জন্য আমি যথেষ্ট সন্তপ্ত, তজ্জন্য আমাকে যথেষ্ট প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইয়াছে।' সেই সন্তাপ ও প্রায়শ্চিত্ত কিছুদিনের মধ্যেই শুরু হল বঙ্গদর্শন-ও রবীন্দ্র-বিদূষণের আকারে।

৭ আষাঢ় [শনি 21 Jun]-সংখ্যায় হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'হায় কি হলো' কবিতার অনুকরণে একটি দীর্ঘ 'প্রাপ্ত' কবিতা মুদ্রিত হল:

…হায় কি হ'লো! বঙ্কিম ম'লো, হা বঙ্গদর্শন!
নবপর্য্যায়ে কেন [তুমি] দিলে দরশন।
বঙ্কিমের পদে "রবি" করে সম্পাদকী,
চাঁদের আলো নিবে যেন জ্বলিছে জোনাকী।…
ঠাকুর বাড়ীর "দ্বীজেন্দ্রনাথ" দার্শনিক বলে,
"সার সত্যের আলোচনা"য় ভাষার বাঁধন খুলে।
"দিচ্ছি" "নিচ্ছি" "খাচ্ছি" "গেছে" প্রভৃতি কথায়,
বাঙ্গালার কাঁচা সোণায় তামার খাদ মিশায়
"শ্রীশচন্দ্র" রাখিতেছে বঙ্গদর্শন মান,
"বঙ্কিম প্রসঙ্গ" কথা অমৃত সমান।…

পরবর্তী ১৪ আষাঢ়-সংখ্যাতেই পুরো এক পৃষ্ঠা জুড়ে "চীনেম্যানের চিঠি" প্রবন্ধ থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে "বঙ্গদর্শন" ও রবীন্দ্রনাথ শিরোনামায় লেখা হল :

রবিবাবু যে ভাষা লিখিতে আরম্ভ করিয়াছেন, তাহাত দিনে দিনে আমাদের বিদ্যার বাহিরে গিয়া পড়িতেছে। প্রথমতঃ তিনি ভাষার শিষ্ট ও সাধু পরিচ্ছদ ছাড়াইয়া অশিষ্ট ও অপ্রচলিত পরিচ্ছদ দিতেছেন।….রবিবাবু "গেছে" লেখেন, কিন্তু "করিয়াছি", "বলিয়াছি"ও লেখেন।…আলালের, হুতোমের, পঞ্চানন্দের, মুসলমান-পীরের কথার, সঙ্গে সঙ্গে, চন্দ্রশেখরের ও বঙ্কিমচন্দ্রের, অক্ষয়চন্দ্রের ও অক্ষয়কুমারের, এই কয় প্রকারের বাঙ্গালার ভুনি খিচুড়ী রাঁধিয়া তাহাতে ইংরেজী ঢঙ্গের, ইংরেজী নকলনবীশের উৎকটতার পলাণ্ডুগৃঞ্জনরস ঢালিয়া দিলে, যে অপূর্ব্ব পদার্থ হয়, চিনেম্যানের লিখিত ইংরেজী চিঠিকে বাঙ্গালায় ভাষান্তরিত করিয়া রবিবাবু তাহারই কতকটা নমুনা দিয়াছেন।…বঙ্গদর্শন বাঙ্গালীর, বঙ্গদর্শন বঙ্কিমের,—সেই বঙ্গদর্শনে হনলুলুর বাঙ্গালা মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইলে, অনেকেরই ক্ষোভের কারণ হয়।

কিন্তু চোখের বালি সম্পর্কে পূর্বাপেক্ষা কিছু কম হলেও পাঁচকড়ি মোটামুটি সপ্রশংস মনোভাব বজায় রেখেছেন। '"চোখের বালি।"/বিধবা বিনোদিনী' শিরোনামে ৩ জ্যৈষ্ঠ ও ১০ জ্যৈষ্ঠ ১৩১০-সংখ্যায় তিনি দীর্ঘ একটি সমালোচনা লেখেন। ৩ জ্যৈষ্ঠ-সংখ্যাটি আমরা দেখিনি, এই সংখ্যায় রবীন্দ্রনাথকে 'সিদ্ধ লম্পট' আখ্যা দিয়ে তিনি অনেকের 'রোষের ভাগী হয়ে ক্ষমা প্রার্থনা করে লিখেছেন :'রবিবাবুর কবিতা-প্রতিভা প্রভাবে আদি রসের সকল তথ্যই, তপঃসিদ্ধ-মস্তিষ্ক-প্রতিভাত সাধন-তত্ত্বের উন্মেষের ন্যায়, প্রস্ফুরিত ও প্রকাশিত হইয়াছে, তাই তিনি সিদ্ধ লম্পট।' সমালোচনা-শেষে তাঁর সিদ্ধান্ত : 'চোখের বালির দোষ অনেক; কেন না গুণও অনেক। রবিবাবু প্রকৃত প্রতিভার পরিচয় দিয়াছেন বটে; কিন্তু আমাদের রুচির উপযোগী হয় নাই। ইংরেজী নভেল বাঙ্গালা ভাষায় লেখা হইয়াছে। But it is a Master piece.'

রবীন্দ্রনাথ লিখিত বা মৌখিক ভাবে পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পর্কে কোথাও মন্তব্য করেছেন বলে জানা যায় না। কিন্তু দীনেশচন্দ্র সেন তাঁর 'শ্লেষ ও বাক্চাতুরী'র উদাহরণ হিসেবে লিখেছেন :

কোন এক লোকের নাম ছিল—কয়েকটি কড়ি, বোধহয় তিনকড়ি টিনকড়ি হইবে, সেই ব্যক্তির মতামত লইয়া কথা হইতেছিল, কেহ কেহ তাহার মতটির উপর বেশী মূল্য দিতেছিলেন। রবিবাবু বলিলেন, "উহার বাপ মায়ের চাইতেও. কি আপনারা উহাকে বেশী জানেন? তাঁহারা তো উহার প্রকৃত মূল্য ধার্য করিয়া রাখিয়াছেন।'[২১ক]

—এখানে দীনেশচন্দ্র আলোচ্য ব্যক্তির নাম না করলেও, আমাদের অনুমান, পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়কে লক্ষ্য করে উক্ত মন্তব্য করা হয়েছিল।

রবীন্দ্রনাথ শিলাইদহ থেকে সম্ভবত ১৮ জ্যৈষ্ঠ [রবি 1 Jun] কলকাতায় ফিরে আসেন, এই দিন তাঁর 'গোলতলা' যাওয়ার হিসাব পাওয়া যায়। এবারে অন্তত ২৫ জ্যৈষ্ঠ [রবি ৪ Jun] পর্যন্ত তিনি কলকাতায় ছিলেন, সেটি জানা যায় ক্যাশবহিতে তাঁর বিভিন্ন স্থানে যাওয়ার হিসাব থেকে। ১৯ জ্যৈষ্ঠ বালিগঞ্জ, ২০ জ্যৈষ্ঠ নিমতলা ও 'সঙ্গীত সমাজ প্রভৃতি', ২১ জ্যৈষ্ঠ পুনশ্চ সংগীত সমাজ, ২২শে কর্নওয়ালিশ স্ট্রীট, ২৪শে বালিগঞ্জ এবং ২৫ জ্যৈষ্ঠ গোলতলা যাওয়ার বিবরণ থেকে বোঝা যায়, তিনি কলকাতায় রীতিমত ব্যস্ত জীবন যাপন করেন—যার মধ্যে মজুমদার লাইব্রেরির সংসৃষ্ট আলোচনা সমিতির অধিবেশনে একাধিক প্রবন্ধ পাঠ করাও আছে। প্রিয়নাথ সেনের অভিমান দূর করার জন্য তিনি নিমতলা স্ট্রীটেও গিয়েছিলেন। আর যান বালিগঞ্জে, উত্তর-পশ্চিম ভারত মায়াবতী প্রভৃতি পরিভ্রমণান্তে ওকাকুরা তখন সুরেন্দ্রনাথের আতিথ্যে বসবাস করছেন। ওকাকুরার সঙ্গে হোরি নামে প্রায় পঁচিশ বৎসর বয়স্ক এক তরুণ বৌদ্ধ পুরোহিত সংস্কৃত ভাষা শিক্ষার জন্য ভারতে আসেন। বুদ্ধগয়া বারাণসী প্রভৃতি কয়েকটি স্থানে ভ্রমণ করা ছাড়া তিনি এতদিন বেলুড় মঠে অবস্থান করে সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা করছিলেন। কিন্তু সেখানে তাঁর স্বাস্থ্য ভালো না থাকায় সুরেন্দ্রনাথ 10 Jun [মঙ্গল ২৭ জ্যৈষ্ঠ] তাঁকে শান্তিনিকেতনে রেখে আসেন।[২২] রবীন্দ্রনাথ তার আগের দিন শান্তিনিকেতনে ফিরে যান, সম্ভবত কলকাতায় সাক্ষাৎকালে ওকাকুরার সঙ্গে এ-বিষয়ে তাঁর আলোচনা হয়েছিল।

হোরিকে শান্তিনিকেতনে ছাত্র হিসেবে পেয়ে রবীন্দ্রনাথ স্বভাবতই খুশি হয়েছিলেন, বিশ্বকে একটি নীড়ের মধ্যে সংহত করার যে স্বপ্ন তিনি পরবর্তীকালে দেখেছিলেন তার সূচনা এইভাবেই হল। ৬ আষাঢ় [শুক্র 20 Jun] তিনি সংবাদটি দিয়ে জগদীশচন্দ্রকে লিখেছেন :

আমার শান্তিনিকেতনের বিদ্যালয়ে একটি জাপানী ছাত্র সংস্কৃত শিখিবার জন্য আসিয়াছে। ছেলেটি বড় ভাল। সে বেশ আমাদের আপনার লোক হইয়া আসিয়াছে। তোমার বন্ধু মীরা প্রত্যহ তাহাকে এক পেয়ালা ফুল দিয়া বশ করিয়া লইয়াছে। তাহার কাছ হইতে দুটো একটা করিয়া জাপানী কথাও শিখিয়া লইতেছে।[২৩]

১৬ শ্রাবণ [শুক্র 1 Aug] ব্রজেন্দ্রকিশোর দেববর্মাকে লেখা বিবরণটি দীর্ঘতর :

আমার এখানে একটি জাপানী ছাত্র সংস্কৃত শিক্ষা করিবার জন্য আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে। তাহার নাম হোরি—নিজেকে সে চিদানন্দ নাম দিয়াছে। বড় নম্র শান্ত প্রকৃতি—তাহার অধ্যবসায় দেখিলে আশ্চর্য্য হইতে হয়। স্বদেশ ও স্বজনবর্গকে পরিত্যাগ করিয়া এই দূরদেশের প্রান্তে মাঠের মধ্যে একাকী সংস্কৃত ভাষা অধ্যয়নের কঠোর চেষ্টা বড় বিস্ময়কর। তাহার সৌম্যমূর্ত্তি ও বিনীত ব্যবহারে এখানকার ভৃত্যেরাও মুগ্ধ হইয়াছে। বৌদ্ধ শাস্ত্র মূল সংস্কৃত গ্রন্থে অধ্যয়ন করাই তাহার উদ্দেশ্য। সংস্কৃত শিখিতে তাহার সুদীর্ঘকাল লাগিবে। কারণ সংস্কৃত শব্দ সে উচ্চারণই করিতে পারে না—বার বার বিফল হইয়াও সে হতোদ্যম হয় না। মধ্যে তাহার শরীর অসুস্থ হইয়াছিল কিন্তু তাহার উৎসাহ হ্রাস হয় নাই।[২৪]

হোরির শিক্ষা ও স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য তাঁর চেষ্টার ত্রুটি ছিল না। সম্ভবত ১১ শ্রাবণ [রবি 27 Jul] তিনি মনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়কে লিখেছেন : 'আপনারা কোনরূপ বন্দোবস্ত করিয়া হোরিকে এক ঘণ্টা করিয়া স্বতন্ত্র ভাবে ইংরাজি পড়াইবার ব্যবস্থা করিতে পারিবেন না কি?'[২৫] মৃণালিনী দেবীর মৃত্যুকালীন অসুস্থতার উদ্বেগের মধ্যে বিদ্যালয়ের সুষ্ঠু কর্মপরিচালনার উদ্দেশ্যে ২৭ কার্তিক [13 Nov] তিনি কুঞ্জলাল ঘোষকে যে দীর্ঘ পত্র লেখেন, তাতে 'জাপানী ছাত্র হোরির আহারাদি ও সর্বপ্রকার স্বচ্ছতার জন্য' তাঁকে ব্যক্তিগতভাবে মনোযোগী হবার নির্দেশ দেওয়া ছাড়াও লিখেছেন :

জাপানী ছাত্র হোরির সেবাভার রথী প্রভৃতি কোনো বিশেষ ছাত্রের উপর দিবেন। এনট্রেন্স পরীক্ষার ব্যস্ততায় আপাতত তাহার যদি একান্ত সময়াভাব ঘটে তবে আর কোনো ছাত্রের উপর অথবা পালা করিয়া বয়স্ক ছাত্রদের উপর দিবেন। তাহারা যেন যথাসময়ে স্বহস্তে হোরিকে

পরিবেশন করে। প্রাতঃকালে তাহার বিছানা ঠিক করিয়া দেয়—যথাসময়ে তাহার তত্ত্ব লইতে থাকে—নাবার ঘরে ভৃত্যেরা তাহার আবশ্যকমত জল দিয়াছে কি না পর্যবেক্ষণ করে। প্রথম দুই-একদিন রথীর দ্বারা এই কাজ করাইলে অন্য ছাত্রেরা কোনোপ্রকার সংকোচ অনুভব করিবে না।[২৬]

—অথচ সাধারণভাবে বিদ্যালয়ের ছাত্রেরা [রথীন্দ্রনাথ-সহ] এইসব কাজের ব্যাপারে স্বাবলম্বী ছিল।

জগদীশচন্দ্র য়ুরোপ থেকে ফিরে শান্তিনিকেতনে হোরির সঙ্গে পরিচিত হন। এর ফলে তিনি যে বৃহৎ কর্মযজ্ঞের স্বপ্ন দেখতে শুরু করেন তার অনেকটাই হোরিকে কেন্দ্র করে। 1 Jan 1903 [১৭ পৌষ] তিনি রবীন্দ্রনাথকে লিখেছেন :

এখন একজন একটি সংস্কৃত ও ইংরাজীবিদ্ ছাত্র সন্ধান করিয়া ৬ মাস Asiatic Societyতে বুদ্ধধর্ম্ম সম্বন্ধে Tibet-এর mss ও অন্যান্য লিপি যাহা আছে তাহা অভ্যস্ত করিতে হইবে। তার পর তোমার Mr. Horyকে সঙ্গে করিয়া তিনি চীন দেশের ও জাপানের নানা বিহারে বাঙ্গলা ও দেবনাগরী পুথির কপি করিবেন; এ সম্বন্ধে হোরির মত করাইতে হইবে। তাহার খরচ আমাদিগকে দিতে হইবে। এরূপ মহৎ কার্য্যে হোরীর সহানুভূতি পাইতে পার।[২৭]

এইসব পরিকল্পনা অবশ্য ফলপ্রসূ হয়নি, হোরি কিছুদিনের মধ্যেই শান্তিনিকেতন ত্যাগ করেন। সম্ভবত ১০ মাঘ [শনি 24 Jan 1903] তারিখে মনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়কে একটি পত্রে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন : 'মীরার পড়াশুনা বোধহয় পূর্ব্ববৎ চলিতেছে। হোরি চলিয়া আসায় আপনাদের অনেকটা অবকাশ ঘটিবে।'[২৮] রবীন্দ্রভারতী সোসাইটি সংগ্রহ-ভুক্ত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ-অঙ্কিত স্কেচের তালিকায় [২১৩৫সংখ্যক] দেখা যায়, তিনি 20 Feb 1903 [শুক্র ৮ ফাল্গুন] বালিগঞ্জ স্টোর রোডে সত্যেন্দ্রনাথের বাড়িতে 'Yoshinori Hori (Sri Chidananda)'-এর একটি ছবি এঁকেছেন। কয়েকমাস পরে একটি দুর্ঘটনায় তাঁর মৃত্যু হয়। নিবেদিতা 15 Dec 1903 [মঙ্গল ২৯ অগ্র° ১৩১০] মিস ম্যাকলাউডকে লিখেছেন : 'A Japanese turned up from Tokio, a Mr. Ito, and Hori went off with him to travel over India. On the journey, he scratched his finger in a railway carriage somewhere in the Punjaub, and the wound turned to lockjaw, and then, on the way from Lahore to Calcutta, he died. It was last week bet. 6th and 12th Dec.'[২৮ক]

জ্যৈষ্ঠ ১৩০৯-এ রবীন্দ্রনাথের নিম্নলিখিত রচনাগুলি বিভিন্ন পত্রিকায় মুদ্রিত হয় :

বঙ্গদর্শন, জ্যৈষ্ঠ ১৩০৯ [২।২] :

৬১-৬২ 'নববর্ষের গান' ['হে ভারত আজি নবীনবর্ষে'] দ্র উৎসর্গ ১০।৮৮-৮৯ [সংযজন : ১২]

৭১-৮২ 'চোখের বালি' ৪১-৪২ দ্র চোখের বালি ৩।৪৩৮-৫১ [৪০-৪১]

তত্ত্ববোধিনী, জ্যৈষ্ঠ ১৮২৪ শক [৭০৬ সংখ্যা] :

২২-২৪ 'শান্তিনিকেতনে বর্ষশেষ' দ্র ধর্ম ১৩।৩৮৪-৮৬ ['বর্ষশেষ']

২৪-২৯ 'শান্তিনিকেতনে নববর্ষ' দ্র ধর্ম ১৩।৩৮৬-৯২ ['নববর্ষ']

10-12 'The God of Upanishads'

ঔপনিষদ ব্রহ্ম গ্রন্থের ১৬-২৭ অনুচ্ছেদগুলির ['অতএব পরমাত্মাকে যে কেবল জ্ঞানের দ্বারা... মৃত্যু হইতে উত্তীর্ণ হইয়া ব্রহ্মলাভের দ্বারা অমৃত প্রাপ্ত হন' দ্র অ-২।২০৩-০৬] অনুবাদ এই সংখ্যায় মুদ্রিত হয়।

সঙ্গীত-প্রকাশিকা, জ্যৈষ্ঠ ১৩০৯ [১।৯] :

১০০-০২ খাম্বাজ-একতালা। তোমারি গেহে পালিছ স্নেহে দ্র স্বর ৪

গানটি ১৩০৬ বঙ্গাব্দের মাঘোৎসবে গীত হয়েছিল। স্বরলিপিটি কাঙালীচরণ সেন-কৃত।

২৬ জ্যৈষ্ঠ [সোম 9 Jun] শান্তিনিকেতনে ফিরে রবীন্দ্রনাথ প্রায় এক মাস সেখানে বাস করেন। বৎসরের সূচনা থেকেই অস্বাস্থ্য ও একধরনের অনির্দেশ্য মানসিক অশান্তি তাঁকে পীড়ন করছিল; অস্বাস্থ্যের কথা অনেককে লেখা চিঠিতে আছে, মানসিক অশান্তির কথা লিখেছিলেন রাধাকিশোর মাণিক্যকে সম্ভবত ২৪ জ্যৈষ্ঠ [শনি 7 Jun] একটি পত্রে [পত্রটি পাওয়া যায় নি, ঐ দিনে ক্যাশবহির হিসাব : 'ত্রিপুরারমহারাজার নিকট বম্বে আম্র পাঠান ব্যয় ৫ল০ /ঐ পত্র ল০ ']—যেটির উল্লেখ করেছেন ২৪ শ্রাবণে [শনি 9 Aug]: 'মহারাজকে পূর্বেই লিখিয়াছি কিছুকাল হইতে আমি অত্যন্ত ক্লান্ত ও পীড়িত ছিলাম—যেন একটি অদৃশ্য অমঙ্গল আমার সহিত অহরহ লড়াই করিয়া আমাকে ভুলুণ্ঠিত ও পিষ্ট করিতেছিল' [২৯] ইত্যাদি। প্রকারান্তরে সেই কথাই লিখেছেন ৬ আষাঢ় [শুক্র 20 Jun] জগদীশচন্দ্রকে :

এক এক সময় বিদ্যুতের মত আমার মনে হয় যে সব কাজকে আমরা অত্যন্ত বেশি মনে করি—বক্তৃতা করি, লিখি, হাঁসফাঁস করিয়া বেড়াই, দেশ উদ্ধার করিবার ফিকির করি—এ সমস্তই বাজে কাজ। জীবনটা ইহাতে কেবল খণ্ডিত বিচ্ছিন্ন অসম্পূর্ণ হইয়া যায়। প্রেমই নিত্য, শান্তিই চিরন্তন। দুঃখ এই যে, মানুষকে ক্ষণিক ক্ষোভ সাময়িক অশান্তি কাটাইয়া এই নিত্য পরিণামের দিকে অগ্রসর হইতে হয়।···সম্পূর্ণতা কেবল মরীচিকার মত আগে আগে চলে তাহার পথের আর শেষ নাই।..সমস্ত বিশ্বজগটা একটা পাক—কেবলি ঘুরিতেছে—ঘোরাই যেন তাহার পরিণাম —মানবলোকও একটা পাক—কেবলি ঘুরিয়া চলিতেছে তাহার পরিণাম কোথায়?·...প্রেমে যেন এই পাকের মধ্যেও একটুখানি স্থিতি ও পরিপূর্ণতার আভাস পাওয়া যায়।[৩০]

বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ-প্রকাশিত সুলভ সংস্করণ রবীন্দ্র-রচনাবলী-র পঞ্চম খণ্ডের [পৌষ ১৩৯৪] গ্রন্থপরিচয়-এ এই পত্রটির সঙ্গে উৎসর্গ কাব্যগ্রন্থের ১৫-সংখ্যক কবিতার ['আকাশ-সিন্ধু-মাঝে এক ঠাঁই' দ্র উৎসর্গ ১০।৩০-৩১] একটি সম্পর্ক থাকতে পারে বলে ইঙ্গিত করা হয়েছে [পৃ ৭৯৮]। এটি যথাযথ বলে মনে হয়। এমনও হতে পারে, রবীন্দ্রনাথ কবিতাটি লিখে উক্ত পত্রের সঙ্গেই প্রেরণ করেন, যদিও 18 Jul [২ শ্রাবণ] তারিখে লেখা জগদীশচন্দ্রের উত্তরে এরূপ কোনো উল্লেখ নেই।

উল্লিখিত চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ আরও লিখেছিলেন : 'তুমিজর্ম্মনি আমেরিকায় তোমার জয়পতাকা নিখাত করিয়া আসিয়ো। তাড়াতাড়ি করিয়ো না। আমি বোধ হয় দুই এক মাসের মধ্যেই তোমাকে কিছু সাহায্য করিতে পারিব—তাহার ব্যবস্থা করিয়াছি।' এই 'ব্যবস্থা' অনতিকাল পরেই কার্যকরী হয়েছিল; ১৫ শ্রাবণ [বৃহ 31 Jul] রবীন্দ্রনাথের ক্যাবহির হিসাব :'ব° জগদীশ চন্দ্র বসু দং ত্রিপুরার মহারাজের দত্ত আমানতী টাকা বিলাতে পাঠান যায় গুঃ বাবু সত্যপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায় ৫০০০্ ঐ টাকার ড্রাপ্ট পাঠান রেজেষ্টারি ব্যায়ল০'। ২৪ শ্রাবণ [শনি 9 Aug] তিনি রাধাকিশোর মাণিক্যকে কৃতজ্ঞতা জানিয়ে লেখেন : 'জগদীশকে মহারাজ যে পাঁচ হাজার টাকা সাহায্য প্রেরণ করিয়াছেন তাহার জন্য আমার হৃদয় কৃতজ্ঞতায় অভিষিক্ত হইয়াছে। মহারাজের উদার মহত্ত্ব বারম্বার অনুভব করিয়াছি, তাহা চিরকাল মনে রহিবে, মুখে প্রকাশ করিব কি করিয়া?'

আষাঢ় ১৩০৯-এ নিম্নলিখিত রবীন্দ্র-রচনাগুলি বিভিন্ন সাময়িকপত্রে প্রকাশিত হয় :

তত্ত্ববোধিনী, আষাঢ় ১৮২৪ শক [৭০৭ সংখ্যা] :

৪০-৪৬ 'নববর্ষের চিন্তা' দ্র ভারতবর্ষ ৪।৩৬৭-৭১ ['নববর্ষ']

প্রবন্ধটি নববর্ষের দিন শান্তিনিকেতনে ছাত্রসমাজে পঠিত ও বৈশাখ ১৩০৯-সংখ্যা বঙ্গদর্শন-এ সম্পূর্ণ মুদ্রিত হয়। তত্ত্ববোধিনী-তে বর্তমান সংখ্যা থেকে ধারাবাহিক তিনটি কিস্তিতে প্রবন্ধটি ছাপা হয়েছে।

বঙ্গদর্শন, আষাঢ় ১৩০৯ [২।৩] :

১২০-৩২ 'চোখের বালি' ৪৩-৪৫ দ্র চোখের বালি ৩।৪৫১-৬৪ [৪২-৪৪]

১৩৬-৪৯ 'ব্রাহ্মণ' দ্র ভারতবর্ষ ৪।৩৮৭-৪০২

১৫১-৬২ 'চীনেম্যানের চিঠি' দ্র ঐ ৪।৪০২-১৬

শেষোক্ত দুটি প্রবন্ধ জ্যৈষ্ঠ মাসে আলোচনা সমিতিতে পঠিত হয়েছিল।

সঙ্গীত-প্রকাশিকা, আষাঢ় ১৩০৯ [১।১০] :

১১১-১৩ ইমন কল্যাণ-তেওরা। তোমারি রাগিণী জীবন-কুঞ্জে দ্র স্বর ৪

১১৩-১৪ তিলক কামোদ-ঝাঁপতাল। মধুর রূপে বিরাজো দ্র ঐ ৪

১১৮-১৯ ছায়ানট-চৌতাল। তোমারি সেবক করহে দ্র ঐ ৪

এই তিনটি গান যথাক্রমে ১৩০৭, ১৩০৬ ও ১৩০৫ বঙ্গাব্দের মাঘোৎসবে গীত হয়। তিনটিরই স্বরলিপিকার কাঙালীচরণ সেন।

২০ আষাঢ় [শুক্র 4 Jul] রাত্রি ৯টার সময়ে মাত্র উনচল্লিশ বৎসর বয়সে স্বামী বিবেকানন্দের দেহাবসান হয়। মোটামুটি দশ বছরের কর্মতৎপরতায় তিনি জাতীয় জীবনে যে গভীর প্রভাব রেখে যান আজ শতাব্দীর শেষ প্রান্তেও তা সমভাবে ক্রিয়াশীল। কিন্তু রবীন্দ্ররচনায় এই অকালমৃত্যু বিষয়ে কোনো তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া লক্ষিত না হলেও কয়েকদিন পরে ২৮ আষাঢ় [শনি 12 Jul] ভবানীপুরে সাউথ সুবার্বন স্কুলে অনুষ্ঠিত একটি শোকসভায় সভাপতির ভাষণে রবীন্দ্রনাথ তাঁর শোকার্ঘ্য নিবেদন করেন। *The Bengalee*-র 15 Jul-সংখ্যায় সভার বিবরণ দিয়ে লেখা হয় :

On Saturday last the Excelsior Union of Bhowanipur held a meeting to do honour to the memory of the Late Swami Vivekananda. There was a large gathering of the students of the locality in the spacious hall of the South Suburban School, and Babu Rabindranath Tagore presided. ….At the request of the Secretary Sister Nivedita explained to the meeting of the secret of the Swami's success in the Western world and emphasized in her own inimitable way that absolutely fearless patriotism which was the most striking feature of the great Swamiji's character, bringing into strong contrast the ague fits by which the average Bengali is convulsed at the least imaginings of any danger into which his country's cause may lead him. The President having summed up the Swamiji's work and teachings on much the same lines in Bengali, the meeting was brought to a close.[৩১]

সভাটির প্রধান উদ্যোক্তা সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় [1884-1966] লিখেছেন : 'এই সময়ে বিবেকানন্দ স্বামীজী পরলোকগমন করেন। Excelsior Union থেকে আমরা করলুম শোক-সভার আয়োজন। স্থির হলো, সে-সভায় স্বামীজীর সম্বন্ধে প্রবন্ধ পড়বেন ভগ্নী নিবেদিতা এবং সভাপতিত্ব করবার জন্য মণিলাল [গঙ্গোপাধ্যায়] এবং আমি গেলুম রবীন্দ্রনাথের কাছে; তাঁকে ধরলুম—সভাপতি হতে হবে। তিনি সম্মত হলেন। এবং এ-সভার অধিবেশন হয়েছিল ভবানীপুরে সাবান স্কুলের হলে।'[৩১ক]

কয়েক বছর পরে ২৮ শ্রাবণ ১৩১৫ [12 Aug 1908] সাধারণ ব্রাহ্মসমাজে অনুষ্ঠিত আর একটি ছাত্রসভাতেও তিনি এই অকালপ্রয়াত মনীষীকে স্মরণ করেছেন :

অল্পদিন পূর্বে বাংলাদেশে যে-মহাত্মার মৃত্যু হইয়াছে, সেই বিবেকানন্দও পূর্ব ও পশ্চিমকে দক্ষিণে ও বামে রাখিয়া মাঝখানে দাঁড়াইতে পারিয়াছিলেন। ভারতবর্ষের ইতিহাসের মধ্যে পাশ্চাত্যকে অস্বীকার করিয়া ভারতবর্ষকে সংকীর্ণ সংস্কারের মধ্যে চিরকালের জন্য সংকুচিত করা তাঁহার জীবনের উপদেশ নহে। গ্রহণ করিবার, মিলন করিবার, সৃজন করিবার প্রতিভাই তাঁহার ছিল। তিনি ভারতবর্ষের সাধনাকে পশ্চিমে ও পশ্চিমের সাধনাকে ভারতবর্ষে দিবার ও লইবার পথ রচনার জন্য নিজের জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন।[৩২]

ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় ব্রহ্মচর্যাশ্রম সম্বন্ধে পরামর্শাদির জন্য মাঝেমাঝে শান্তিনিকেতনে আসতেন, একথা আমরা পূর্বেই বলেছি। এইরূপ কয়েকদিন শান্তিনিকেতনে কাটিয়ে ২১ আষাঢ় কলকাতায় ফিরেই তিনি বিবেকানন্দের মৃত্যুসংবাদ শ্রবণ করেন। ২২ বৈশাখ ১৩১৪ তিনি.'স্বরাজ' পত্রিকায় লেখেন : 'দিন কয়েকের জন্য আমি বোলপুরের আশ্রমে বেড়াইতে গিয়াছিলাম। ফিরিয়া আসিয়া যৈমন হাবড়া ইষ্টিশানে পা দিলাম অমনি কে বলিল—কাল স্বামী বিবেকানন্দ মানবলীলা সম্বরণ করিয়াছেন। শুনিবা মাত্র আমার বুকের মাঝে···ঠিক যেন একখানা ছুরি বিধিয়া গেল।'[৩৩] খৃস্টীয় সন্ন্যাসী ব্রহ্মবান্ধবের বৈদান্তিক সন্ন্যাসীতে রূপান্তরের পিছনে স্বামীজীর মৃত্যুর কার্যকরী ভূমিকা ছিল। এর ঠিক তিন মাস পরে তিনি 'বিবেকানন্দের ফিরিঙ্গিজয় ব্রত উদ্‌যাপন' করার উদ্দেশ্যে বেদান্তপ্রচারের জন্য ইংলণ্ড যাত্রা করেন। কেম্‌ব্রিজে হিন্দুদর্শন পড়ানোর জন্য একটি অধ্যাপক পদ সৃষ্টির নিস্ফল প্রয়াসে তাঁর অনেক শক্তি ব্যয়িত হয়। রবীন্দ্রনাথও এই ব্যাপারে তাঁকে সাহায্য করতে এগিয়ে এসেছিলেন।

কিন্তু বর্তমান সময়ে ব্রহ্মবান্ধবের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সম্পর্ক কিঞ্চিৎ জটিল হয়ে পড়েছিল। খৃস্টান ব্রহ্মবান্ধব ও রেবাচাঁদের সঙ্গে শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্যাশ্রমের সম্পর্ক অনেকেই ভালো চোখে দেখতেন না, এ কথা আমরা আগেই বলেছি। এ নিয়ে যে গুঞ্জন ওঠে সেইটি কর্ণগোচর হলে ব্রহ্মবান্ধব ও রেবাচাঁদ আশ্রম ত্যাগ করতে মনস্থ করেন। সম্ভবত এই বিষয়ে কথাবার্তা বলার জন্যই ব্রহ্মবান্ধব শান্তিনিকেতনে এসেছিলেন। এর কিছুদিন বাদেই 'রবিবার' [?১১ শ্রাবণ :27 Jul]রবীন্দ্রনাথ মনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়কে লেখেন :

রেবাচাঁদ আর ফিরিবেন না। ····অবিনাশ বসু নামক Kinder Gartenওয়ালা একটি শিক্ষক পয়লা অগষ্ট হইতে কাজ আরম্ভ করিবেন। আপাততঃ আপনারা সকলে ভাগ করিয়া কাজ করিবেন—দেখিবেন ছোট ছেলেদের মধ্যে কোন প্রকার উচ্ছৃঙ্খলতা না দেখা দেয়—যথা সময়ে সমস্ত কার্য্য যথানিয়মে সম্পন্ন হয় সেদিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখিবেন।[৩৪]

ব্রহ্মবান্ধব ও রেবাচাঁদের সঙ্গে তাঁদের সংগৃহীত কয়েকজন ছাত্রও ব্রহ্মচর্যাশ্রম ত্যাগ করে। প্রতিষ্ঠার পর সাত মাস না যেতেই বিদ্যালয়ের একটি পর্ব শেষ হয়ে গেল। রেবাচাঁদের কঠোর নিয়মানুবর্তিতা সর্বাংশে রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাদর্শের অনুসারী ছিল না, 'বাবা ঐরকম কঠোরতা পছন্দ করতেন না' একথা রথীন্দ্রনাথই আমাদের জানিয়েছেন। অজিতকুমার চক্রবর্তী অনুরূপ অভিযোগ জানিয়েছেন ব্রহ্মবান্ধব সম্পর্কে :

তিনি নিজের জোরে নিজের মতে নিজের শাসনেই এই ব্রহ্মচর্যাশ্রমকে গড়িয়া তুলিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন—সত্যকে যে পরিমাণে তাহার আপন কাজ করিবার অবসর দেওয়া উচিত, অন্যকে যে পরিমাণে স্বাধীনতা দিলে বিদ্যালয়ের কাজ যথার্থ আন্তরিক সাধনার কাজ হইয়া উঠিতে পারে, তিনি নিজের প্রবল ইচ্ছাবৃত্তি-বশত সে পরিমাণে ধৈর্য অবলম্বন করিতে পারেন নাই। যদিচ তিনি তখন রাষ্ট্রনৈতিক বিষয়ে লেশমাত্র আগ্রহ প্রকাশ করিতেন না তথাপি তাঁহার প্রকৃতির মধ্যে সেই প্রচণ্ড ছিল যাহা মঙ্গলশঙ্খ ও সৌন্দর্যপদ্মকে বাদ দিয়া কেবল গদার আঘাত ও চক্রের চক্রান্ত দ্বারাই সিদ্ধি লাভ করাকে সম্ভবপর বলিয়া কল্পনা করিত। সুতরাং শান্তিনিকেতন-আশ্রমের সহিত তাঁহার যোগ অতি অল্প কালেই বিচ্ছিন্ন হইয়া গেল।[৩৫]

কিন্তু ব্রহ্মচর্যাশ্রমের সব শিক্ষকই আদর্শবাদী ও ত্যাগব্রতী ছিলেন না—রবীন্দ্রনাথের আকর্ষণে আগত প্রকৃত শিক্ষক কয়েকজন ছাড়া অনেকেই এসেছিলেন উপযুক্ত কর্মসংস্থানের অভাবে বা আকাঙ্ক্ষিত জীবনোপায় প্রাপ্তির পূর্ববর্তী সময়টুকু কাটিয়ে যাওয়ার জন্য—যাঁরা রবীন্দ্রনাথের আকর্ষণে এসেছিলেন তাঁদের মধ্যেও প্রিয়পাত্র হওয়ার জন্য রেষারেষি কম ছিল না। এই বিচিত্র স্বার্থের মধ্যে সামঞ্জস্য ও শিশু প্রতিষ্ঠানের সাবালকত্ব প্রাপ্তির জন্য তাই কিছু পরিমাণ কঠোর নিয়মশৃঙ্খলা অপরিহার্য ছিল—বিশেষত নানাপ্রকার সাংসারিক ও সাংস্কৃতিক প্রয়োজনে রবীন্দ্রনাথকে যেখানে প্রায়শই শান্তিনিকেতনের বাইরে থাকতে হত। তাছাড়া কিছুদিনের মধ্যে স্ত্রী ও কন্যার অসুস্থতা ও মৃত্যুতে তিনি বিপর্যস্ত হয়ে পড়েন। এই অবস্থায় তিনি বিদ্যালয়ের কার্যপরিচালনার জন্য বিবিধ ব্যবস্থা ও নীতিনিয়ম প্রবর্তনের পরীক্ষা করে গেছেন। এর সঙ্গে ছিল বিদ্যালয়ের চিরসঙ্গী অথার্ভাব। অর্থাৎ বলা যায়, নিছক মঙ্গলেচ্ছার প্রাণশক্তিতেই ব্রহ্মচর্যাশ্রমের অস্তিত্বরক্ষা সম্ভব হয়েছিল।

আষাঢ়ের শেষে রবীন্দ্রনাথ কলকাতায় আসেন। ২৭ আষাঢ় [শুক্র 11 Jul] তিনি বিডন স্ট্রীট ও কর্নওয়ালিশ স্ট্রীটে যান। ২৮ আষাঢ় তিনি যান বালিগঞ্জে। আমরা আগেই বলেছি, এই দিন তিনি সাউথ সুবার্বন স্কুলে বিবেকানন্দ স্মরণসভায় সভাপতিত্ব করেন। ২৯ আষাঢ় রবীন্দ্রনাথকে 'গোলপুকুর' বা গোলদিঘি যেতে দেখা যায়। ৩০ আষাঢ় [সোম 14 Jul] তিনি পুনরায় কর্নওয়ালিশ স্ট্রীটে যান। এরপর তিনি শিলাইদহ হয়ে বোটে পতিসর যাত্রা করেন।

যদুনাথ চট্টোপাধ্যায় মহর্ষির এস্টেটের সদর কাছারিতে খাজাঞ্চির পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তাঁর মামাতো ভাই বঙ্গীয় শব্দকোষ-প্রণেতা হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের [1867-1959] জন্য একটি কর্ম প্রার্থনা করলে রবীন্দ্রনাথ তাঁকে পতিসর কাছারিতে নিয়োগ করেন। এই নিয়োগ অনুসারে হরিচরণ 'বাংলা সন ১৩০৯ সালের শ্রাবণে' পতিসরে কাজে যোগ দেন। হরিচরণ লিখেছেন : 'আষাঢ়ের শেষে তিনি রবীন্দ্রনাথ] জমীদারীর কার্য্য দেখিবার জন্য শিলাইদহ জমীদারীতে এবং পরে কালীগ্রামে বোটে আসেন।' কাছারির সমস্ত কর্মচারীর সঙ্গে হরিচরণও বোটে গিয়ে জমিদারবাবুকে দর্শন করে ফিরে আসেন। অনতিকাল পরে রবীন্দ্রনাথ তাঁকে ডেকে পাঠান। হরিচরণ লিখেছেন :

> তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি দিনের বেলায় এখানে কি কর? আমি বলিলাম—জমিদারীর যে জরীপ হয়েছে তাহার চিঠা লইয়া আমীনের সংগে কাজ করি। তখন তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, রাত্রে কি কর? আমি বলিলাম—কিছুক্ষণ সংস্কৃতের আলোচনা করি। আমি সংস্কৃতে অনুবাদের একখানি বই লিখেছি। রাত্রে তাহার প্রেস-কপি লিখি। তিনি শুনে বললেন তোমার সেই বইখানি আনো। আমি বাসা থেকে এনে বইটি তাঁকে দিলাম। তিনি তাহা দেখিয়া ফিরিয়ে দিলেন কিছু—বলিলেন না। আমি নমস্কার করিয়া চলিয়া আসিলাম।
>
> ইহার পরে তিনি শান্তিনিকেতনে এসে পতিসরের ম্যানেজার বাবুকে পত্রে জানালেন: 'শৈলেশ, তোমার সংস্কৃতজ্ঞ কর্মচারীকে এইখানে পাঠাইয়া দাও'। শৈলেশ বাবু আমাকে তাহা জানাইয়া বলিলেন : আপনি কি সেখানে যেতে চান? আমি বললাম হ্যাঁ এই পথই আমার জীবনের পথ। সংসারের তাড়নায় আমি যা পেয়েছি তাই আপাততঃ গ্রহণ করেছি। কিন্তু বিদ্যালোচনা ও অধ্যাপনা আমার জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য, আমি যাবো। শৈলেশ বাবু আমাকে প্রস্তুত হতে বললেন।[৩৬]

রবীন্দ্রনাথ নিশ্চয়ই যদুনাথ চট্টোপাধ্যায়ের কাছে হরিচরণের সংস্কৃতের অনুবাদ গ্রন্থের কথা শুনেছিলেন, পাণ্ডুলিপি দেখে তাঁর দক্ষতা বিষয়ে নিঃসন্দেহ হন। ইতিপূর্বে তিনি জগদানন্দ রায়কে শিলাইদহ কাছারি থেকে সরিয়ে এনে বিদ্যালয়ে অঙ্ক ও বিজ্ঞান শিক্ষাদানে নিযুক্ত করেছিলেন, হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে আনলেন

পতিসর কাছারি থেকে। দুজনেই নিজ নিজ ক্ষেত্রে কৃতিত্ব প্রদর্শন করেছেন। বঙ্গীয় শব্দকোষ [১৩১২-৫২]-এর সংকলক হিসেবে হরিচরণ ধৈর্য নিষ্ঠা ও শ্রমের প্রতীকে পরিণত হয়েছেন।

পতিসর থেকে কলকাতায় এসে রবীন্দ্রনাথ সঙ্গে সঙ্গেই শান্তিনিকেতনে ফিরতে পারেননি। ৭ শ্রাবণ [বুধ 23 Jul] ও পরবর্তী দুটি দিন তাঁকে মজুমদার লাইব্রেরিতে যেতে দেখা যায়। ১১ শ্রাবণ [রবি 27 Jul] তিনি যান কর্নওয়ালিশ স্ট্রীটে, হয়তো সংগীতসমাজে, কয়েকদিন আগে ৩ শ্রাবণ তাঁর নিজস্ব ক্যাশ থেকে সমাজের জুন-জুলাই মাসের চাঁদা চার টাকা মিটিয়ে দেওয়া হয়েছে। সম্ভবত এইদিনই ['রবিবার'] তিনি মনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়কে লেখেন : 'আমাকেআজ রাত্রেই পুরী যাইতে হইবে। সেখানে আমার জমি আছে তাহা লইয়া ম্যাজিস্ট্রেট গোল করিতেছে তাহা নিষ্পত্তি করিয়া আসিতে হইবে।'[৩৭]

পাঠকের স্মরণ আছে, পুরীর সমুদ্রতীরবর্তী জমি য়ুরোপীয় ও নেটিভ কোয়ার্টারে ভাগ করে ম্যাজিস্ট্রেট A. Garrett রবীন্দ্রনাথকে তাঁর জমির স্বত্ব ত্যাগ করার জন্য নির্দেশ দেন [দ্র রবিজীবনী ৪।২৯৬], সেই ঘটনা আশ্বিন ১৩০৭ [Sep 1900]-এর পূর্বের। এ বিষয়ে ব্যারিস্টার তারকনাথ পালিতের সঙ্গে পরামর্শের কথা আমরা পূর্বে উল্লেখ করেছি। বর্তমানে বিষয়টি পুনরায় উত্থাপিত হলে রবীন্দ্রনাথ নিজেই তার মীমাংসা করার জন্য পুরীতে যান; তার আগে রাজনৈতিক চাপ সৃষ্টির জন্য ম্যাজিস্ট্রেট ও কালেক্টর গ্যারেটের পত্রটি তুলে দেন বিপিনচন্দ্র পালের হাতে, তিনি স্ব-সম্পাদিত *New India* সাপ্তাহিকের 31 Jul [বৃহ ১৫ শ্রাবণ]-সংখ্যায় 'The Colour-Conflict in India' [p. 774]-শীর্ষক প্রবন্ধে পত্রটি মুদ্রিত করে ব্যঙ্গাত্মক মন্তব্য করেন। রবীন্দ্রনাথ কী ব্যবস্থা অবলম্বন করেছিলেন আমাদের জানা নেই, কিন্তু জমিটি তাঁর অধিকারেই থেকে গিয়েছিল। পক্ষান্তরে পুরীর রাজার সঙ্গে দুর্ব্যবহার করার অভিযোগে বাংলার লেফটেনান্ট গবর্নর গ্যারেটের পদাবনতি ঘটিয়ে তাঁকে মজঃফরপুরে বদলি করেন।

শ্রাবণ-সংখ্যা বঙ্গদর্শন [২।৪] প্রকাশিত হয় কিঞ্চিৎ বিলম্বে, বেঙ্গল লাইব্রেরির ক্যাটালগ অনুযায়ী প্রকাশের তারিখ 1 Aug [শুক্র ১৬ শ্রাবণ]। এই সংখ্যায় রবীন্দ্রনাথের রচনা দুটি :

১৬৫-৭৯ 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' দ্র সাহিত্য ৮।৪৩২-৪৬

১৯০-২০২ 'চোখের বালি' ৪৬-৪৯ দ্র চোখের বালি ৩।৪৬৪-৭৯ [৪৫-৪৮]

আগেই বলেছি, দীনেশচন্দ্র সেনের গ্রন্থ-সমালোচনা 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' প্রবন্ধটি রবীন্দ্রনাথ জ্যৈষ্ঠ মাসে মজুমদার লাইব্রেরির অন্তর্গত আলোচনা সমিতিতে পাঠ করেন।

তত্ত্ববোধিনী, শ্রাবণ ১৮২৪ শক [৭০৮ সংখ্যা] :

৫৬-৫৮ 'নববর্ষের চিন্তা' দ্র ভারতবর্ষ ৪।৩৭১-৭৫ ['নববর্ষ']

16 'The God of Upanishads'

ঔপনিষদ ব্রহ্ম গ্রন্থের ২৮-৩০ অনুচ্ছেদগুলির ['ইহাই সংসারের মূলমন্ত্র···তাহা একজাতীয় স্বার্থপ্রতা' দ্র অ-২।২০৬-০৭] ইংরেজি অনুবাদ এই সংখ্যায় মুদ্রিত হয়।

সঙ্গীত-প্রকাশিকা, শ্রাবণ ১৩০৯ [১।১১] :

১৩৩-৩৬ ভৈরবী-ঝাঁপতাল। জানি হে যবে প্রভাত হবে দ্র স্বর ৪

গানটি ১৩০৬ বঙ্গাব্দের মাঘোৎসবে গীত হয়েছিল। স্বরলিপিটি কাঙালীচরণ সেন-কৃত।

পুরী থেকে রবীন্দ্রনাথ কবে কলকাতা ফিরে আসেন জানা নেই। তবে ১৬ শ্রাবণ [শুক্র 1Aug]* তিনি শান্তিনিকেতন থেকে ব্রজেন্দ্রকিশোর দেববর্মাকে একটি পত্র লেখেন, এ থেকে জানা যায় তিনি ইতিমধ্যেই শান্তিনিকেতনে ফিরে গেছেন। এখান থেকে তিনি হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে পাঠিয়ে দেওয়ার জন্য কালীগ্রামের ম্যানেজার শৈলেশচন্দ্র মজুমদারকে পত্র লেখেন। অনতিকাল পরে হরিচরণ শান্তিনিকেতনে এসে ব্রহ্মচর্যাশ্রমের সংস্কৃতশিক্ষকের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তিনি লিখেছেন :

কবি তখন অতিথিশালার…উপরতলায় থাকিতেন। আমি এসেছি জেনেই তিনি নীচে এলেন এবং আমাকে বললেন: এসো, এই বলে তিনি অগ্রসর হলেন। আমিও সংগে সংগে আশ্রমে চলে এলাম। আশ্রমের ম্যানেজার ছিলেন কালীপ্রসন্ন লাহিড়ী। তিনি তাঁকে বললেন : এর থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা করে দিন।….আমি যখন ব্রহ্মচর্য্য আশ্রমে যোগ দিলাম তখন অধ্যাপক ছিলেন মনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় ইংরাজীর, জগদানন্দ রায় গণিত ও বিজ্ঞান, সুবোধ মজুমদার ইংরাজী ও ইতিহাসের ও নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য বাংলার অধ্যাপক ছিলেন। আমি আসিয়া সংস্কৃতের অধ্যাপনা গ্রহণ করিলাম।

এই সময় ছাত্রসংখ্যা ১০-১২টি। রথীন্দ্রনাথ, সন্তোষ মজুমদার তখন প্রবেশিকাবর্গের ছাত্র। ছাত্রদের সংস্কৃত পড়ার কোন নির্দিষ্ট বই ছিল না। সেই জন্য কবি আমাকে ছেলেদের সংস্কৃত পাঠ্যপুস্তক লিখবার আদেশ দেন এবং ৬-৭ পাতার খাতা দিয়ে আমাকে বললেন—এই খাতায় শেখানোর যেরূপ ব্যবস্থা আছে সেই অনুসারে বই লেখার চেষ্টা করবেন। আমি সেই প্রণালী অনুসারে সংস্কৃত-প্রবেশ লিখে তিন খণ্ডে শেষ করলাম।[৩৮]

রবীন্দ্রনাথ এর আগে স্ব-প্রণীত শিক্ষাপ্রণালী অনুসারে সংস্কৃত শিক্ষা নামে অন্তত চারটি খণ্ড লিখে হেমচন্দ্র বিদ্যারত্ন ও শিবধন বিদ্যার্ণবের সম্পাদনায় প্রকাশ করেছিলেন, সেকথা আমরা পূর্বেই বলেছি [দ্র রবিজীবনী ৪।১১২]। ব্রহ্মচর্যাশ্রমে সংস্কৃত শিক্ষার জন্যও রবীন্দ্রনাথ গ্রন্থ রচনায় প্রবৃত্ত হন এবং নয়টি পৃষ্ঠায় সংস্কৃত প্রবেশ-এর বারোটি পাঠ রচনা করেন। রবীন্দ্রভবনে এই পাণ্ডুলিপিটি আছে [Ms. 233]। হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় সংস্কৃতশিক্ষার দায়িত্ব গ্রহণ করলে রবীন্দ্রনাথ পাণ্ডুলিপিটি তাঁকে দেন। এটি পড়ে হরিচরণ তাঁর মন্তব্য পাঁচটি পৃষ্ঠায় লিপিবদ্ধ করে রবীন্দ্রনাথকে দেখালে তিনি উক্ত মন্তব্য-সংবলিত প্রথম পৃষ্ঠার উপর লিখে দেন : 'এই সংশোধন দৃষ্টে পরিবর্তন করিয়া লইয়া একটা খাতায় কপি করিয়া লইবে—পো[শ] পুনঃসংশোধনের মা[র্জ্জিন] রাখিয়ো—এবং ইহা অ[বলম্বন] করিয়া ছেলেদের প[ড়া] চালাইয়ো'। এই নির্দেশ অনুযায়ী সংস্কারসাধন ও আরও বারোটি পাঠ লিখে হরিচরণ 'সংস্কৃত প্রবেশ প্রথম ভাগ সমাপ্ত করেন ও ৫২ পৃষ্ঠার গ্রন্থটি সংস্কৃত প্রবেশ।/প্রথম ভাগ/শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর/ সম্পাদিত।/ ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম/ শান্তিনিকেতন/বোলপুর।' আখ্যাপত্র-সহ 1904-এ প্রকাশিত হয়। রবীন্দ্রনাথের খসড়া পাণ্ডুলিপি ও হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মন্তব্য আনুষঙ্গিক তথ্যসমৃদ্ধ হয়ে রবীন্দ্রবীক্ষা সংকলন ১৫ [শ্রাবণ ১৩৯৩]-তে মুদ্রিত হয়েছে।

শ্রীশচন্দ্র মজুমদারের ভ্রাতা শৈলেশচন্দ্র রবীন্দ্রনাথের প্রিয়পাত্র ছিলেন। রবীন্দ্রনাথই তাঁকে কালীগ্রাম পরগণার পতিসর কাছারির ম্যানেজার নিযুক্ত করেন, শৈলেশচন্দ্র-পরিচালিত মজুমদার লাইব্রেরির তিনি অন্যতম পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। শৈলেশচন্দ্র সাহিত্য রচনাও করতেন, রবীন্দ্রনাথ সে ব্যাপারেও তাঁকে উৎসাহ দিয়েছেন। তাই শৈলেশচন্দ্রের গল্প-সংকলন 'চিত্র-বিচিত্র' মুদ্রিত হলে তিনি একটি আবেগপূর্ণ উৎসর্গ-পত্র লিখে গ্রন্থটি রবীন্দ্রনাথকে উৎসর্গ করেন ১৫ শ্রাবণ [বৃহ 31 Jul] তারিখে :

যিনি আমার সংসারে আশ্রয়, জীবনের আদর্শ,/শিক্ষায় গুরু স্নেহে সহোদর, আমার সেই—/গুরুদেব/ শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর/ মহাশয়ের শ্রীচরণকমলে/ভক্তি, প্রীতি ও কৃতজ্ঞতার নিদর্শনস্বরূপ এই/অকিঞ্চিৎকর গ্রন্থ উৎসর্গ করিলাম।

তাঁর রচনায় রবীন্দ্রনাথ কতখানি হস্তক্ষেপ করতেন তারও স্বীকৃতি দিয়েছেন শৈলেশচন্দ্র এই গ্রন্থে :

এ গ্রন্থের অন্যতম চিত্র 'ব্যারিষ্টার' সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ বক্তব্য আছে। এ চিত্রটি যেভাবে লিখিত হইয়াছিল, 'ভারতী'তে ঠিক সেভাবে প্রকাশিত হয় নাই। ভারতীর তখনকার সম্পাদক পূজনীয় শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় কিঞ্চিৎ সংক্ষিপ্ত ও পরিবর্তিত আকারে সেটি ভারতীতে প্রকাশ করেন। ব্যারিষ্টারের চাল চলন ও ঘরের কথা আমার চেয়ে তাঁর জানিবার সুবিধা অনেক বেশী। তাঁহার সুনিপুণ হস্তে আমার 'ব্যারিষ্টারে'র অসম্পূর্ণতা বোধ হয় কতক অপগত হইয়াছিল। আজ আমার সে কৃতজ্ঞতা প্রকাশের উপযুক্ত অবসর।[৩৯]

'ব্যারিষ্টার' গল্পটি প্রকাশিত হয় ভারতী-র আষাঢ় ১৩০৫ (পৃ ২৫৮-৬৬]-সংখ্যায়, গল্পটির সঙ্গে বা বার্ষিক সূচীতে লেখকের নাম মুদ্রিত হয়নি। রবীন্দ্র-সম্পাদিত সাময়িক পত্রে মুদ্রিত অন্য-কোনো লেখকের কিছু-কিছু অস্বাক্ষরিত রচনা রবীন্দ্রনাথের লেখা বলে ভ্রম হয়, এই গল্পটি তাদের মধ্যে অন্যতম।

২৩ শ্রাবণ [শুক্র ৪ Aug] রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতন থেকে কলকাতায় আসেন। পরদিন ২৪ শ্রাবণ তিনি রাধাকিশোর মাণিক্যকে লেখেন :

মহারাজা শীঘ্র কলিকাতায় আসিবেন সংবাদ পাইয়া পত্র না লিখিয়া সাক্ষাতের প্রতীক্ষায় ছিলাম। গতকাল বোলপুর হইতে এখানে আসিয়া পৌঁছিয়াছি। আজ প্রাতঃকালে পার্কষ্ট ীটে যাইবার উদ্যোগ করিতেছি এমন সময় যতী আসিয়া উপস্থিত। তাঁহার কাছ হইতে সমস্ত সংবাদ অবগত হইলাম।

এই দীর্ঘ পত্রের কিছু-কিছু অংশ আমরা আগেই উদ্ধৃত করেছি। সেখানে জগদীশচন্দ্রকে অর্থসাহায্য করার জন্য কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন ছাড়া নিজের অস্বাস্থ্যের কথাও আছে। সেই কথা দিয়েই পত্রটি শেষ হয়েছে :

আমি আগামীকল্য কুষ্টিয়া অভিমুখে যাত্রা করিয়া কয়েকদিন বোটে ভ্রমণ করিয়া আসিব। বিরলতা ও বিশ্রামের জন্য হৃদয় ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছে। দাবদাহের ত্রস্ত হরিণ যেমন জলের মধ্যে লাফাইয়া পড়ে আমি তেমনি পদ্মার গর্ভে ঝাঁপ দিলাম। পদ্মার শীতল ক্রোড় আমার চিরপরিচিত।[৪০]

অবশ্য তার আগে ২৪ শ্রাবণেই তিনি নিমতলা স্ট্রীটে গিয়ে প্রিয়নাথ সেনের সঙ্গে দেখা করেন। কোনো বৈষয়িক প্রয়োজন ছিল না, এর মধ্যে তারকনাথ পালিতের কাছ থেকে তিনি ও সুরেন্দ্রনাথ যুগ্মভাবে পঞ্চাশ হাজার টাকার ঋণ সংগ্রহ করেছেন—১৮ আষাঢ় (বুধ 2 Jul] তারিখের খরচ : 'ব° টি, পালিত স্কয়ার দং উহার জুন মাসের নিজ অংশের সুদ শোধ····১৪৫ ⁄ ৪', এর পর প্রতি মাসেই উক্ত পরিমাণ অর্থ সুদ হিসেবে মিটিয়ে দেওয়া হয়েছে। তবু স্বল্প অবকাশের মধ্যেও তিনি সময় করে প্রিয়নাথের কাছে গিয়েছেন, এর আগে তাঁর অভিমানগর্ভ পত্র পেয়ে রবীন্দ্রনাথ একাধিকবার বিব্রত হয়েছিলেন।

২৫ শ্রাবণ [রবি 10 Aug] তিনি শিলাইদহ যাওয়ার পথে কুষ্টিয়া পৌঁছন। তাঁর শ্যালক নগেন্দ্রনাথ রায়চৌধুরী তখন ঠাকুর এস্টেটের কাজ নিয়ে মা দাক্ষায়ণী দেবী ও স্ত্রী নলিনীবালাকে নিয়ে সেখানে বাস করছেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁদের বাসাতেই যাত্রাবিরতি করেন। সেখানকার বিস্তারিত বিবরণ দিয়ে এইদিনই তিনি মৃণালিনী দেবীকে লিখেছেন :

কুষ্টিয়ায় এসে পৌঁচেছি। পৌঁছে একটা বিষয়ে বড় হতাস হয়ে পড়েছি। এখানে শালাকে দেখলুম কিন্তু আমার শালাজটিকে দেখলুম না। তাকে গতকল্য কাশিতে তার মাতৃসন্নিধানে পাঠিয়ে দিয়ে কুষ্টিয়া নগরী অত্যন্ত নিশ্চিন্ত হয়ে আছে।···তোমার মার বাতের মতো হয়ে কষ্ট পাচ্ছেন।

শিলাইদহে ভাল ছিলেন কুষ্টিয়ায় এসে তাঁকে বাতে ধরেছে। ...আজ খাওয়াটা বড় গুরুতর হয়েছে। তোমার মা কোনমতেই ছাড়লেন না—অনেকদিন পরে পীড়াপীড়ি করে মাছের ঝোল খাইয়ে দিলেন। মুখে কিন্তু তার আস্বাদ আদবে ভাল লাগ্‌লনা।[৪১]

শান্তিনিকেতন অতিথিশালায় ও ব্রহ্মচর্যাশ্রমে নিরামিষ ভোজনই প্রচলিত ছিল, রবীন্দ্রনাথ নিজেও সেই নির্দেশ মেনে চলতেন। সেইজন্যই অনেকদিন পরে মাছের স্বাদ তাঁর ভালো লাগেনি। কিন্তু আমিষভোজন ত্যাগ করার ফলেই তিনি এই সময়ে অস্বাস্থ্যে পীড়িত হচ্ছিলেন কিনা জানা নেই। ভবিষ্যতেও তিনি বারবার অস্বাস্থ্যের পীড়নে আমিষ গ্রহণে বাধ্য হয়েছেন, এমন দৃষ্টান্তের অভাব নেই।

এইদিনই বিকেলের স্টীমারে রবীন্দ্রনাথ শিলাইদহে আসেন। এখান থেকে স্ত্রীকে লিখেছেন : 'শিলাইদহে এসে মনটা কেমন ব্যাকুল হয়। যাকে ছেড়ে যেতে হবে তাকেই বেশি সুন্দর দেখায় এই আমাদের মোহ। শিলাইদহের সঙ্গে সুখ এবং দুঃখ দুয়েরই স্মৃতি জড়িত—কিন্তু সুখটাই বড় হয়ে দেখা দেয়।...পুরাতন বন্ধু শিলাইদহ এই চিঠির সঙ্গে তোমাকে তার কয়েকটা বাব্‌লা পাঠাচ্ছে।' 'রথীর পড়ার যাতে কিছুমাত্র অনিয়ম না হয়' সেই দিকে বিশেষ করে দৃষ্টি রাখার কথা তিনি আগের চিঠিতে লিখেছিলেন। ব্রহ্মচর্যাশ্রমের ছাত্রাবাসে খাওয়া-পরার যে কষ্ট রথীন্দ্রনাথকে ভোগ করতে হত, তাতে মৃণালিনী দেবীর মাতৃহৃদয় পীড়িত হয়েছে। ছুটির দিনে নিজের হাতে রেঁধে পুত্র-সহ আশ্রমের ছাত্রদের খাইয়ে তিনি পরিতৃপ্তি বোধ করতেন, একথা রথীন্দ্রনাথই আমাদের জানিয়েছেন। স্ত্রীর এই দুঃখের কথা রবীন্দ্রনাথ জানতেন। তাই তিনি এই চিঠির শেষে তাঁকে নিজের আদর্শে উদ্বুদ্ধ করার প্রয়াসে লিখেছেন :

রথীকে আমি উচ্চতর জীবনের জন্য আমি প্রস্তুত করতে চাই—সুতরাং নিয়ম সংযম এবং কৃচ্ছ্রসাধন করতেই হবে—যতই দৃঢ়তার সঙ্গে লেশমাত্র লঙ্ঘন না করে সে নিজের ব্রত সাধন করবে ততই সে মানুষের মত মানুষ হয়ে উঠবে। আমরা ত বাল্যকাল থেকে কেবল নিজের ইচ্ছা চরিতার্থ করার দিকেই মন দিয়েছি—তার ফল হয়েছে বড় ideaর চেয়ে, পরমার্থের চেয়ে, মনুষ্যত্বের চেয়ে, এমন কি প্রেম এবং মঙ্গলের চেয়েও আমাদের ক্ষুদ্রতম ইচ্ছাগুলোকেই আমরা বড় দেখি—কোনমতেই কারো জন্যেই কিছুর জন্যেই তাকে অল্পমাত্রও পরাস্ত হতে দিতে পারি নে—কাজের ক্ষতি করে ব্রত নষ্ট করে প্রিয়জনদের মনে গুরুতর আঘাত দিয়েও আমাদের অতি তুচ্ছ ইচ্ছাগুলোকে লেশমাত্র খর্ব্ব করতে পারিনে। নিজের ইচ্ছাকেই এইরূপ জয়ী হতে দেওয়া এটা বস্তুত নিজেকেই পরাস্ত করা, নিজের উচ্চতন মনুষ্যত্বকে নিজের দীনতার কাছে বলি দান দেওয়া—এতে যথার্থ সুখ নেই কেবল গর্ব্বমাত্র আছে। আমাদের যা হয়েছে বোধ হয় তার আর প্রতিকার নেই—এখন ছেলেদের নিজের হাত থেকে মঙ্গলের হাতে ঈশ্বরের হাতে সমর্পণ করতে চাই—তিনি এদের ঐশ্বর্য্যের গর্ব্ব, ইচ্ছার তেজ, প্রবৃত্তির বেগ, দশের আকর্ষণ অপহরণ করে মঙ্গলের ভাবে এবং সুকঠিন বীর্য্যে ভূষিত করে তুলুন।..এতেও যদি নিস্ফল হই তবে আমার সমস্ত জীবন নিস্ফল হল বলে জান্‌ব।[৪২]

ব্রহ্মচর্যাশ্রমের ব্যয়সঙ্কুলানের জন্য শিলাইদহের খাসজমিতে উৎপন্ন মুগ কলাই ছোলা প্রভৃতি পাঠানোর কথাও এই চিঠিতে আছে। এখানে বাস করার সময়ে অর্থকরী ফসল ফলাবার যে আয়োজন তিনি করেছিলেন এগুলি তারই উৎপাদন, এতদিনে বৃহত্তর প্রয়োজনে ব্যবহৃত হল। ব্রহ্মচর্যাশ্রমের শিক্ষার অঙ্গ হিসেবে বাগান করার সঙ্গে সঙ্গে তরকারী উৎপাদনে ছাত্রদের উৎসাহ দেওয়া হয়েছে।

শিলাইদহ থেকে রবীন্দ্রনাথ বোটে করে পতিসর রওনা হন। পথের অনেক বিঘ্ন কাটিয়ে পতিসর পৌঁছনোর কথা বিস্তারিতভাবে একটি পত্রে লিখে স্ত্রীকে জানিয়েছেন। মৃণালিনী দেবীকে লেখা তাঁর যে চিঠিগুলি রক্ষিত হয়েছে এইটিই তার শেষতম। এবারে জমিদারির কাজে নয়, স্বাস্থ্যোদ্ধারের জন্যই তিনি ভ্রমণে বেরিয়েছিলেন; উপকার যে হয়েছে সে-কথা লিখেছেন স্ত্রীকে : 'এ ক'দিন জলের মধ্যে পরিপূর্ণ শান্তির মধ্যে সম্পূর্ণ নির্জ্জনতার মধ্যে নিঃশব্দে বাস করে আমার শরীরের অনেক উপকার হয়েছে। আমি বুঝেছি আমার হতভাগা ভাঙা শরীরটা শোধরাতে গেলে একলা জলের উপর আত্মসমর্পণ করা ছাড়া আমার আর অন্য উপায় নেই।'[৪৩] কিন্তু বেশিদিন পতিসরে থাকা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়নি, এই চিঠিতেই লিখেছেন : 'এখানে

এসেই খবর পেলুম আস্‌চে সোমবারেই আমাকে হাইকোর্টে হাজ্‌রি দিতে যেতে হবে—সুতরাং কালই আমাকে ছাড়তে হবে।' রবীন্দ্রনাথ ১ ভাদ্রের [রবি 17 Aug] মধ্যে কলকাতায় ফিরে এসেছিলেন—২, ৩, ৪, ৫ ও ৬ ভাদ্র তাঁর হাইকোর্টে যাতায়াতের হিসাব ক্যাশবহিতে পাওয়া যায়। কোন্ মামলায় তিনি 'জুরিতে আবদ্ধ' হয়ে ছিলেন, হাইকোর্টের পুরোনো কাগজপত্রের মধ্যে তার বিবরণ আত্মগোপন করে রয়েছে।

৬ ভাদ্র [শুক্র 22 Aug] য়ুনিভার্সিটি কমিশনের সুপারিশগুলির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানানোর জন্য রাজা পিয়ারীমোহন মুখোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে টাউন হলে একটি বিরাট সভা হয়। ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের সংস্কারসাধনের অজুহাতে লর্ড কার্জন 27 Jan 1902 [সোম ১৪ মাঘ ১৩০৮] T. Raleigh-সভাপতিত্বে Indian Universities' Commission গঠন করেন। সৈয়দ হোসেন বিলগ্রামী ও নবাব ইমদ-উল-মুল্‌ক্ ছাড়া কমিশনের অপর চারজন সদস্য ছিলেন ইংরেজ। দেশবাসীর বিক্ষোভের ফলে ড গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় অপর ভারতীয় সদস্য নিযুক্ত হন। ঐ বছর জুন মাসে কমিশন ড গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রতিবাদী মন্তব্য-সহ তাঁদের রিপোর্ট জমা দিলে সমগ্র ভারতে প্রতিবাদ ধ্বনিত হয়ে ওঠে। বিশ্ববিদ্যালয়গুলি এতদিন যেসব স্বাধিকার ভোগ করে আসছিল কমিশন তা সংকুচিত করে সরকারী আধিপত্যবৃদ্ধির জন্য সুপারিশ করে; শিক্ষার মান বৃদ্ধির অজুহাতে পাশমার্ক-বৃদ্ধি ও বেতনবৃদ্ধির দ্বারা শিক্ষার সংকোচনও গরিষ্ঠ সদস্যদের সুপারিশের অন্তর্ভুক্ত ছিল। স্বভাবতই দেশীয় পত্রিকাগুলি সম্পাদকীয় নিবন্ধে ও দেশবাসী জনসভার মাধ্যমে এই সুপারিশের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ধ্বনিত করে। উক্ত বিশাল সভাটি এর মধ্যে অন্যতম। রবীন্দ্রনাথ এদিন কলকাতায় থাকায় এই সভায় উপস্থিতি তাঁর পক্ষে স্বাভাবিক ছিল—কিন্তু সংবাদপত্রের প্রতিবেদনে তাঁর উপস্থিতির উল্লেখ দেখা যায় না, এবিষয়ে তাঁর কোনো লেখাও প্রকাশিত হয়নি। অবশ্য ভারতীয় শিক্ষাদর্শ সম্পর্কে তিনি এ সময়ে যে ধারণা পোষণ করছিলেন, সেদিক দিয়ে স্বাধিকারের এই লড়াই তাঁর কাছে গুরুত্বপূর্ণ ছিল না। কিছুদিন পরে তিনি এই প্রসঙ্গে যা লিখেছিলেন, তাকে তাঁর বর্তমান মনোভাবের প্রতিধ্বনি বলেও মনে করা যায় : 'গবমেন্ট-প্রতিষ্ঠিত সেনেটে সিণ্ডিকেটে বাঙালি থাকিলেই যে বিদ্যাশিক্ষার ভার আমাদের নিজের হাতে রহিল, তাহা আমি মনে করি না।....আমরা গর্মেন্টের সম্মতির অধীনে যখন বাহ্যস্বাতন্ত্র্যের একটা বিড়ম্বনা লাভ করি, তখনই আমাদের বিপদ সব চেয়ে বেশি। তখন প্রসাদলব্ধ সেই মিথ্যা স্বাতন্ত্র্যের মূল্য যাহা দিতে হয়, তাহাতে মাথা বিকাইয়া যায়। বিশেষত দেশীলোককে দিয়াই দেশের মঙ্গল দলন করা গবর্মেন্টের পক্ষে কিছুমাত্র কঠিন নহে, নইলে এ দেশের দুর্গতি কিসের'।[৪৪] বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলাভাষাচর্চ্চা-বৃদ্ধির জন্য আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, বঙ্কিমচন্দ্র, আনন্দমোহন বসু, ড গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী প্রমুখের চেষ্টা কয়েকজন ইংরেজের সমর্থন লাভ করলেও বাঙালিরাই তার বিরোধিতা করেছিলেন [দ্র রবিজীবনী ৩।২৩৮-৩৯], বর্তমান প্রসঙ্গে আমরা সেকথা স্মরণ করতে পারি।

ভাদ্র মাসে বিভিন্ন সাময়িকপত্রে রবীন্দ্রনাথের নিম্নলিখিত রচনাগুলি মুদ্রিত হয় :

তত্ত্ববোধিনী, ভাদ্র ১৮২৪ শক [৭০৯ সংখ্যা] :

৭০-৭২ 'নববর্ষের চিন্তা' দ্র ভারতবর্ষ ৪।৩৭৫-৭৭ ['নববর্ষ']

20 'The God of Upanishads'

ঔপনিষদ ব্রহ্ম গ্রন্থের ৩১-৩২ অনুচ্ছেদ-দুটির ['সকল স্বার্থপরতার চূড়ান্ত···সুরক্ষিত হইয়া সুদৃঢ় হইয়া উঠে' দ্র অ-২।২০৭]. ইংরেজি অনুবাদ এই সংখ্যায় মুদ্রিত হয়। 'নববর্ষের চিন্তা' প্রবন্ধের এইটিই শেষ কিস্তি।

ভারতী, ভাদ্র ১৩০৯ [২৬।৫] :

৪৬৮-৬৯ 'সালগম-সংবাদ/নাতিনীর পত্র' দ্র প্রহাসিনী [১৩৯১]। ৭২-৭৩

সত্যপ্রসাদের কন্যা শান্তাকে লিখিত 'দাদামহাশয়' দ্বিজেন্দ্রনাথের কবিতা-পত্রের প্রত্যুত্তরে নাতিনীর জবানীতে রবীন্দ্রনাথ এটি লেখেন, পূর্ববর্তী অধ্যায়ে আমরা বিষয়টি আলোচনা করেছি।

বঙ্গদর্শন, ভাদ্র ১৩০৯ [২।৫] :

২২১-৩৬ 'ভারতবর্ষের ইতিহাস' দ্র ভারতবর্ষ ৪।৩৭৭-৮৭

২৩৬-৪৬ 'চোখের বালি' ৫০-৫২ দ্র চোখের বালি ৩।৪৭৯-৯০ [৪৯-৫১]

২৫৫-৫৮ 'মরণ' ['অত চুপি চুপি কেন কথা কও'] দ্র উৎসর্গ ১০।৭১-৭৪ [৪৫ সংখ্যক]

'ভারতবর্ষের ইতিহাস' প্রবন্ধটি জ্যৈষ্ঠ মাসে আলোচনা সমিতিতে পঠিত হয়। এটির সম্পর্কে আমরা পূর্বেই আলোচনা করেছি।

'মরণ' কবিতাটির রচনা-তারিখ নেই, পাণ্ডুলিপিও পাওয়া যায় না—সম্ভবত সাম্প্রতিক অস্বাস্থ্যের পটভূমিকায় সমসাময়িক কালেই রচিত হয়।

সমালোচনী, ভাদ্র ১৩০৯ [১।৮] :

৩৩১-৩৬ 'মায়ার খেলা।/গীতিনাট্য।/মিশ্র পিলু—একতালা।/মোরা জলে স্থলে নানা ছলে মায়াজাল গাঁথি দ্র স্বর ৪৮

স্বরলিপিকারের নাম অনুল্লেখিত।।

সঙ্গীত-প্রকাশিকা, ভাদ্র ১৩০৯ [১।১২] :

১৪৬-৫০ ধুন-ঠুংরি। অন্ধ জনে দেহ আলো দ্র স্বর ২৭

১২৯২ বঙ্গাব্দের মাঘোৎসবে গীত গানটির স্বরলিপিকার কাঙালীচরণ সেন।

হাইকোর্টের দায়িত্ব শেষ হবার পরেই রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনে ফিরে আসেন। এই সময়ে লেখা তাঁর চিঠিপত্রের সংখ্যা লক্ষণীয়ভাবে কম, ফলে তাঁর জীবনবৃত্ত লেখার উপকরণও যথেষ্ট নয়। ১৬ ভাদ্র [সোম 1 Sep] তিনি অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়কে লিখেছেন : 'আজকাল চিঠি লেখা আমার বিরল হইয়া আসিতেছে ইহা হইতে বুঝিবেন আমার বয়স হইয়াছে।' অক্ষয়কুমারের সঙ্গে তাঁর বন্ধুত্বের কথা আমরা পূর্বেই বলেছি। তাঁর ঐতিহাসিক প্রতিভার প্রতি তিনি সশ্রদ্ধ ছিলেন, তাঁর বিভিন্ন ঐতিহাসিক প্রবন্ধকে ভারতী-র মতো বঙ্গদর্শন-এর পাতাতেও সাদরে স্থান দিয়েছেন। এই প্রবন্ধগুলি সম্পর্কে তিনি লিখেছেন :

> আপনার লেখাগুলি যে আমার মনের মত হইতেছে তাহা আপনাকে জানাই নাই তাহার কারণ আমি নিশ্চয় জানি যে তাহা আপনি নিশ্চয় জানেন।····আমি বঙ্গদর্শন হাতে লইয়া অবধি বলিতেছি, ভারতবর্ষের পরিচয় লাভ করিতে হইবে ইহাই ভারতবাসীর সর্বপ্রধান কাজ। সেই পরিচয় লাভে আপনি আমাদের সহায়তা করিয়া আসিতেছেন। গতমাসের 'যবন' [বঙ্গদর্শন, ভাদ্র। ২৪৬-৫৪] প্রবন্ধে ভারতবর্ষের পরিধি যে কিরূপ বিস্তৃত ছিল তাহা আপনি দেখাইয়াছেন। য়ুরোপ জয় করিতে জানে কিন্তু ভারতবর্ষ গ্রহণ করিতে পারিত, একসময়ে ভারতবর্ষ বিনা সৈন্যবলে এশিয়ার অধিকাংশই আপনার করিয়া লইয়াছিল। আপনার 'যবন' প্রবন্ধে তাহারই আভাস পাইয়া আমি অত্যন্ত আনন্দলাভ করিয়াছি। এখন আমাদের প্রাণ

নাই বলিয়া গ্রহণশক্তি নাই এখন আমরা কেবল বিশ্বের সহিত আমাদের সম্বন্ধ ছিন্ন করিয়া উত্তরোত্তর কৃশ হইতেছি। আবার যখন আমরা সকলকে আকর্ষণ করিয়া লইতে পারিব, যবন যখন আমাদের সমাজের অন্তর্গত হইবে, তখনই ভারতবর্ষ আপনার চিরদিনের শক্তিকে সার্থক করিবে।[৪৫]

সংস্কৃত নাটক থেকে ইতিহাসের উপকরণ সংগ্রহ করে অক্ষয়কুমার প্রবাসী-তে 'ঐতিহাসিক যৎকিঞ্চিৎ' নামক যে প্রবন্ধাবলী লিখছিলেন, রবীন্দ্রনাথ তার উচ্চ প্রশংসা করে লিখলেন : 'আপনি ওকালতিটা ছাড়ুন। চুপচাপ বসিয়া পড়ুন। মাঠের কোণে আসিয়া একটি কুটীর বাঁধুন। তারপরে হবিষ্যান্ন খাইয়া খাগড়ার কলম ধরিয়া তালপাতে ভারতবর্ষের ইতিহাসকথা লিপিবদ্ধ করুন, ত্রিশ কোটি নরনারীর আশীর্বাদভাজন হইবেন।' পরবর্তীকালে বিশ্বের গুণিজনকে তিনি শান্তিনিকেতনে আহ্বান করেছিলেন, সেই স্বপ্ন তিনি ছোটো আকারে এখনই দেখতে শুরু করেছেন।

কয়েকদিন পরে ২৭ ভাদ্র [শুক্র 12 Sep] কবি ভাষাতাত্ত্বিক ও নৃতত্ত্ববিদ্ বিজয়চন্দ্র মজুমদারকে [1861-1942] লেখা একটি পত্রে রবীন্দ্রনাথ অক্ষয়কুমারের এই প্রবন্ধাবলীর উল্লেখ করেন। উভয়ের মধ্যে সম্ভবত এইটিই প্রথম পত্রালাপ। বঙ্গদর্শন-এ প্রকাশিত 'ভারতবর্ষের ইতিহাস' প্রবন্ধ পড়ে বিজয়চন্দ্র প্রত্নতত্ত্ব সম্পর্কে তাঁর উৎসাহ ব্যক্ত করলে রবীন্দ্রনাথ লেখেন :

প্রত্নতত্ত্ব সম্বন্ধে আমি নিতান্ত আনাড়ি। প্রাচীন বই পড়িবার সময় হঠাৎ যদি কোন বিশেষ তথ্য নজরে পড়িয়া যায় তবে সেটা লইয়া মনে মনে এবং কখনও প্রসঙ্গ ক্রমে প্রবন্ধে আলোচনা করিয়া থাকি—তাহা হইতে আমার গবেষণা সম্বন্ধে লোকের ভ্রান্ত ধারণা হইবার সম্ভাবনা দেখিতেছি—সেজন্য আমি কুণ্ঠিত।···প্রাচীন সাহিত্য হইতে ভারতবর্ষের প্রকৃত ইতিহাস সঙ্কলনের প্রতি আমার যথেষ্ট ঔৎসুক্য আছে। আমার নিজের সাধ্য নাই। যোগ্য ব্যক্তিরা এই বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিবেন সেই প্রত্যাশায় উৎকণ্ঠিত হইয়া বসিয়া আছি।[৪৬]

এই উৎকণ্ঠা নিয়ে তিনি নিজে সংস্কৃত সাহিত্য থেকে ভারতবর্ষের সামাজিক ইতিহাস আহরণের চেষ্টা করেছেন এবং অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়, দীনেশচন্দ্র সেন, সখারাম গণেশ দেউস্কর প্রভৃতি গবেষকদের নানা দিক দিয়ে উৎসাহ দিয়েছেন। কিছুদিনের মধ্যে বিজয়চন্দ্র মজুমদারও বঙ্গদর্শন-এর নিয়মিত লেখক হয়ে উঠেছেন—তাঁর 'যযাতিকেশরী', 'শিবপূজা', 'বিষ্ণুমাহাত্ম্য', 'মৃচ্ছকটিক' প্রভৃতি পাণ্ডিত্যপূর্ণ প্রবন্ধ পত্রিকাটিতে মুদ্রিত হয়েছে।

১৯ ভাদ্র [বৃহ 4 Sep] রবীন্দ্রনাথকে আবার কলকাতায় আসতে হল। কারণটি লেখা হয়েছে 'সরকারী ক্যাশের খতিয়ান'-এর ২৫ ভাদ্রের হিসাবে : 'ত্রিপুরার মহারাজা শ্রীযুক্ত কর্ত্তাবাবু মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিবেন সংবাদে বাবু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের শান্তিনিকেতন হইতে আসা যাওয়ার ব্যয়····৩০্'। ১৯ ভাদ্র তিনি যান পার্ক স্ট্রীট ও বালিগঞ্জে, ২০ বালিগঞ্জ, ২২ লাউডন স্ট্রীট ও মেছুয়াবাজার, ২৩ জোড়া গিজা ও 'হোগলকুড়িয়া'—২৫ ভাদ্র [বুধ 10 sep] তিনি শান্তিনিকেতনে প্রত্যাবর্তন করেন।

স্বামী বিবেকানন্দকে জাপানে নিয়ে যাওয়ার ঘোষিত উদ্দেশ্য নিয়ে ওকাকুরা ভারতে এসেছিলেন, স্বামীজীর অসুস্থতা ও ব্যস্ততার জন্য তাঁর সেই পরিকল্পনা সফল হয়নি। 'Asia is One' বাণীর প্রবক্তা ওকাকুরার গোপন রাজনৈতিক উদ্দেশ্যও ছিল—নিবেদিতা ও সুরেন্দ্রনাথ এ বিষয়ে তাঁর সহযোগী ছিলেন। ভারতের প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় শিল্পকলার প্রত্যক্ষ পরিচয় লাভের উদ্দেশ্যে ওকাকুরা সুরেন্দ্রনাথকে সঙ্গে নিয়ে ১৭ শ্রাবণ [শনি 2 Aug] ভারত ভ্রমণে বহির্গত হন।[৪৭] নালান্দা, বোম্বাই, আবু পাহাড়, অমৃতসরের স্বর্ণমন্দির, তাজমহল, আকবরের সমাধি, ফতেপুর সিক্রি ইত্যাদি পরিদর্শন করে তাঁরা সেপ্টেম্বরের গোড়ায় কলকাতায় ফিরে আসেন। 4 Sep [বৃহ ১৯ ভাদ্র] নিবেদিতা মিস্ ম্যাকলাউডকে লিখেছেন : 'He and Suren have seen

India and returned. What have they not done? Everything. We can see our way now.'[৪৮] নিবেদিতার পত্র থেকে জানা যায়, এই ভ্রমণের রাজনৈতিক উদ্দেশ্যও ছিল। ওকাকুরা এই ভ্রমণে বুদ্ধগয়াতেও গিয়েছিলেন। বুদ্ধগয়া বৌদ্ধদের তীর্থস্থান হলেও শৈব মহান্তের মালিকানাধীন ছিল। ওকাকুরা চাইছিলেন জাপানী বৌদ্ধ তীর্থযাত্রীদের জন্য সেখানে একটি অতিথিনিবাস তৈরী করতে। শ্রীশচন্দ্র মজুমদার তখন ছিলেন পালামৌ জেলার ল্যাণ্ড অ্যাকুইজিশান অফিসার। রবীন্দ্রনাথ কলকাতায় এসে ওকাকুরার উদ্দেশ্যসাধনে বিঘ্নের কথা শুনে রবিবার [? ২২ ভাদ্র : 7 Sep] শ্রীশচন্দ্রকে লিখলেন :

ইতিমধ্যে ওকাকুরা ও সুরেন গয়ায় গিয়েছিলেন। তুমি সুদূরে আছ শুনে তাঁহারা তোমার ঠিকানা করে উঠতে পারেন নি। ইতিমধ্যে মোহন্ত বেঁকে দাঁড়িয়েছে। সে বলে গবর্মেন্টের অনুমতি ব্যতীত সে জমি দিতে পারে না। তুমি তাকে একটু বিশেষ রকম তাগিদ দিতে পারনা? ওকাকুরা বলচে অকৃতকার্য হয়ে জাপানে ফিরে যেতে হলে তাকে অত্যন্ত লজ্জিত হতে হবে। নিতান্ত মৃদুভাবে না বলে মোহান্তকে একটু চেপে ধরনা![৪৯]

শ্রীশচন্দ্র সম্ভবত বিশেষ কিছু করে উঠতে পারেননি, এই কাজে ব্যর্থ হয়ে ওকাকুরা ২১ আশ্বিন [মঙ্গল 7 Oct] জাপান যাত্রা করেন। তার পূর্ব দিন জ্যোতিরিন্দ্রনাথ বালিগঞ্জের বাড়িতে ওকাকুরার একটি রেখাচিত্র অঙ্কন করেন। তিনি দেশে ফিরে টাইকান [Taikan Yokoyama, 1868-1958] ও হিসিদা [Hisida Sunso]নামক দু'জন জাপানী শিল্পীকে কলকাতায় প্রেরণ করেন। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ 28 Feb 1903 [শনি ১৬ ফাল্গুন] বালিগঞ্জে এদের যে রেখাচিত্র আঁকেন দুজনেই তাতে স্বাক্ষর করেছেন, হিসিদা নাম লিখেছেন ইংরেজি ও বাংলায়।[৫০] পরবর্তীকালে চিত্রকলায় 'বেঙ্গল স্কুল' বলে যে রীতি প্রবর্তিত হয় তাতে এই দুই জাপানী শিল্পীর অবদান সুপ্রচুর। অবনীন্দ্রনাথ 'জোড়াসাঁকোর ধারে'তে এঁদের কথা বলেছেন।

ভাদ্রের শেষে মৃণালিনী দেবী শান্তিনিকেতনে অসুস্থ হয়ে পড়েন। তাঁর অসুস্থতার প্রকৃতি সম্পর্কে অনেক জল্পনা আছে। হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন : ' ···বিদ্যালয়ের শিক্ষাপদ্ধতি অক্ষুন্নভাবে রক্ষা করার নিমিত্ত মৃণালিনী দেবী কঠোর পরিশ্রম করিয়াছিলেন। ইহার তীব্র আঘাত তাঁহার অনভ্যস্ত শরীর সহ্য করিতে পারিল না। ফলে স্বাস্থ্যভঙ্গ দেখা দিল এবং ক্রমে সাংঘাতিক রোগে পরিণত হইল।'[৫১] রথীন্দ্রনাথ লিখেছেন : 'শান্তিনিকেতনে কয়েক মাস থাকার পর মায়ের শরীর খারাপ হতে থাকল।····আমার এখন সন্দেহ হয় তাঁর অ্যাপেণ্ডিসাইটিস হয়েছিল। তখন এ বিষয়ে বিশেষ কিছু জানা ছিল না, অপারেশনের প্রণালীও আবিষ্কৃত হয় নি।'[৫২] রবীন্দ্রজীবনী-কার তাঁর গ্রন্থের প্রাথমিক সংস্করণগুলিতে ঘটনাটি সাধারণভাবে উল্লেখ করলেও শেষতম সংস্করণে [পরিবর্ধিত চতুর্থ সংস্করণ চৈত্র ১৩৮৩] লিখেছেন : 'মৃণালিনী দেবী শ্রাবণ মাসের কোনো সময়ে হঠাৎ অসুস্থ হইয়া পড়িলেন। হেমলতা ঠাকুরের মুখে শুনিয়াছিলাম মৃণালিনী দেবী বোলপুরের মুন্সেফবাবুর বাড়িতে বর্ষাকালে কোনো নিমন্ত্রণ রক্ষায় গিয়াছিলেন; সেখানে পড়িয়া যান ও আঘাত পান, তখন তিনি অন্তঃসত্ত্বা। বোলপুরে ব্যাধি উপশমের সম্ভাবনা না হওয়ায় পূজাবকাশ আরম্ভ হইলে মৃণালিনী দেবীকে কলিকাতায় স্থানান্তরিত করা হয়।'[৫৩] এবিষয়ে আর-কোনো নির্ভরযোগ্য তথ্য না পাওয়ায় আমরা মন্তব্য-প্রকাশে বিরত রইলাম।

রবীন্দ্রনাথের ক্যাশবহিতে এই সময়ে 'শ্রীমতী ছোট বধূ ঠাকুরাণীর জন্য ঔষধ ক্রয়'-এর প্রথম যে হিসাব পাওয়া যায় তা ২৭ ভাদ্রের [শুক্র 12 Sep], আর-একটি হিসাবে ঔষধটি 'অজির্ণের ঔষধ' বলে উল্লিখিত হয়েছে—রবীন্দ্রনাথ তখন শান্তিনিকেতনে। এরপর ২ আশ্বিন [বৃহ 18 Sep]'বোলপুরের আশ্বিন মাসের খরচ

২৩৮৲' টাকা পাঠানো হয়েছে 'শ্রীমতী ছোটবধূঠাকুরাণী'র নামেই। রবীন্দ্রনাথ কলকাতায় আসেন ৫ আশ্বিন [রবি 21 Sep], এই দিন তিনি বালিগঞ্জ ও কর্নওয়ালিশ স্ট্রীটে যাতায়াত করেন। ৬ আশ্বিন সংগীত সমাজ, ৭ বিডন স্ট্রীট ও 'গোলপুকুর', ৮ সংগীতসমাজ ও ৯ আশ্বিন তাঁর বিডন স্ট্রীট যাওয়ার হিসাব পাওয়া যায়। ৯ আশ্বিনই 'শ্রীমতী ছোট বধূ ঠাকুরাণীর জন্য ঔষধ ক্রয়'-এর দ্বিতীয় হিসাব মেলে। আমাদের অনুমান, মৃণালিনী দেবী তখনও শান্তিনিকেতনেই ছিলেন, কলকাতায় বিখ্যাত হোমিয়োপ্যাথ ডাঃ ডি. এন. রায় [এঁর বাড়ি ছিল বিডন স্ট্রীটে] প্রভৃতি চিকিৎসকের সঙ্গে পরামর্শ করে ওষুধ কিনে রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতন প্রেরণ করেছেন ও ব্রহ্মচর্যাশ্রমের কর্মাধ্যক্ষ ও চিকিৎসক ডাঃ কালীপ্রসন্ন লাহিড়ী নির্দেশ অনুযায়ী চিকিৎসা করতেন। কিন্তু চিকিৎসায় বিশেষ ফল না হওয়ায় মৃণালিনী দেবীকে কলকাতায় নিয়ে আসা হল। রথীন্দ্রনাথ লিখেছেন :

…বাবা তখন কলকাতায়, দাদা দ্বিপেন্দ্রনাথকে লিখলেন মাকে নিয়ে কলকাতায় আসতে। বোলপুর থেকে কলকাতায় মাকে নিয়ে সেই যে যাওয়া—আমার কাছে চিরস্মরণীয় হয়ে রয়েছে একটি সামান্য কারণে। মা শুয়ে আছেন, আমি তাঁর পাশে বসে জানলা দিয়ে একদৃষ্টে দেখছি—কত তালগাছের শ্রেণী, কত বুনো খেজুরের ঝোপ, কত বাঁশঝাড়ে ঘেরা গ্রামের পর গ্রাম, কখনো চোখে পড়ল মস্তবড়ো মহিষের পিঠে নির্ভয়ে বসে আছে এক বাচ্চা ছেলে—এইসব গ্রাম্য দৃশ্য চোখের সামনে দিয়ে সিনেমার ছবির মতো চলে যাচ্ছে। একসময়ে নজরে পড়ল জনশূন্য মাঠের মাঝে ভাঙা-পাড় অর্ধেক বোজা একটি পুকুর—তার যেটুকু জল আছে, ঢেকে গেছে অসংখ্য শাদা পদ্মফুলে। দেখে এত ভালো লাগল, মাকে ডেকে দেখালুম।[৫৪]

ভ্রাতা নগেন্দ্রনাথ রায়চৌধুরীর অভিভাবকত্বে পুত্রকন্যাদের নিয়ে মৃণালিনী দেবী কলকাতায় আসেন ১১ আশ্বিন [শনি 27 Sep]; এইদিন রবীন্দ্রনাথের ক্যাশবহির হিসাব : 'জায়/বোলপুর হইতে মেয়েরা ও খোকাবাবু দিগের আশায় খরচ গুঃ নগেন্দ্র বাবু ৪০৲'।

রবীন্দ্রনাথ তখন অবশ্য নিজস্ব বৃত্তে ভ্রাম্যমাণ—১২ আশ্বিন তিনি গেছেন মজুমদার লাইব্রেরি ও বালিগঞ্জে [বৈকালে], ১৩ আশ্বিন তাঁর 'বৌবাজার হইতে আসিবার' হিসাব পাওয়া যায়। শেষোক্ত হিসাবটির একটু বিশেষ তাৎপর্য আছে। হিন্দুমেলার যুগ থেকে ঠাকুরপরিবার দেশীয় শিল্পাদিকে উৎসাহ দান করে এসেছে। বয়ঃপ্রাপ্ত হওয়ার পর রবীন্দ্রনাথও এই প্রয়াসের সঙ্গে যুক্ত হন—1896 [১৩০৩]-এ প্রতিষ্ঠিত স্বদেশী ভাণ্ডার লিমিটেডের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগের কথা আমরা পূর্বেই বলেছি [দ্র রবিজীবনী ৪।১৫৪]। বর্তমানে একই আদর্শে ৬২ বৌবাজার স্ট্রীটে ইণ্ডিয়ান স্টোর্স লিমিটেড নামে একটি প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয়, যার প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন আশুতোষ চৌধুরীর ভ্রাতা ব্যারিস্টার যোগেশচন্দ্র চৌধুরী।* প্রচণ্ড অর্থাভাবের মধ্যেও রবীন্দ্রনাথ যে এই প্রতিষ্ঠানকে সাহায্য করতে এগিয়ে এসেছেন তার প্রমাণ আছে তাঁর ক্যাশবহির ১৩ আশ্বিনের [সোম 29 Sep] হিসাবে : 'ইণ্ডিয়ান এষ্টোর্স কোং খাতা-১০০০৲ /ব° উক্ত কোম্পানী দং দশ শেয়ার ক্রয়ের মূল্য এক কালীন শোধ দেওয়া যায় গুঃ বাবু যোগেশচন্দ্র চৌধুরী ১০০০৲'।

এইদিনই নাটোরের মহারাজা জগদিন্দ্রনাথ রায়কে সঙ্গে নিয়ে রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনে যান। 'নাটোরের মহারাজার শান্তিনিকেতন শুভাগমন উপলক্ষে ব্যায় ১৩ না° ২০ আশ্বিন' ৩৬৫ টাকা সাড়ে ছ'আনা হিসাবটি সরকারী ক্যাশবহির। শান্তিনিকেতনে মহারাজাকে রাজোচিত সংবর্ধনা দেওয়া হয়েছিল। হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন :

জগদিন্দ্রনাথ একবার আশ্রমে এসেছিলেন। সেই সময় পণ্ডিত শিবধন বিদ্যার্ণব এখানে এসে প্রশস্তি-শ্লোক রচনা ক'রে বালকদের দ্বারা গান করিয়ে তাঁর অভ্যর্থনা করেছিলেন।….এখানে আশ্রমবাসীরাও একদিন তাঁর আতিথ্য গ্রহণ করেছিলেন। তিনি বালকদের খেলার জন্যে বল ইত্যাদি অনেক সামগ্রী পুরস্কার দিয়েছিলেন; এগুলি অনেকদিন আশ্রমের ভাণ্ডারে ছিল, দেখেছি।[৫৫]

রথীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনে খেলাধূলার আয়োজনের বর্ণনা দিতে গিয়ে লিখেছেন : 'ফুটবল খেলতে সবচেয়ে কম খরচ, তাই অন্য কোনো খেলার সরঞ্জাম ছিল না। ফুটবল খেলতেই আমাদের নেশা জন্মে গিয়েছিল। একবার নাটোরের মহারাজা আশ্রমে বেড়াতে এসে নানারকম খেলার প্রচুর সরঞ্জাম দিয়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু তৎসত্ত্বেও ফুটবল কেউ ছাড়তে চাইল না।'[৫৬] রবীন্দ্রনাথের ক্যাশবহিতে বহুবার ফুটবল কিনে দেওয়ার হিসেব পাওয়া যায়।

নাটোরের মহারাজার শান্তিনিকেতন ভ্রমণ পূর্বনির্ধারিত ছিল, এজন্য মৃণালিনী দেবীর অসুস্থতা সত্ত্বেও রবীন্দ্রনাথ তাঁকে সঙ্গ দিয়েছিলেন। হয়তো শান্তিনিকেতন পরিদর্শনের জন্য তিনিই মহারাজকে আমন্ত্রণ জানিয়ে থাকবেন। কিন্তু ২০ আশ্বিন জগদিন্দ্রনাথ ফিরে গেলেও রবীন্দ্রনাথ তাঁর সঙ্গে ফেরেননি। তিনি শমীন্দ্রনাথকেও তাঁর সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিলেন। জগদীশচন্দ্র বসুর দেশে প্রত্যাবর্তনের তারিখ জানতে পেরে ২৬ আশ্বিন [রবি 12 Oct] পুত্র-সহ কলকাতায় ফিরে আসেন।

এর মধ্যে তাঁর মধ্যম জামাতা সত্যেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য ১৪ আশ্বিন [মঙ্গল 30 Sep] কলকাতায় পৌঁছন। রবীন্দ্রজীবনী-কার লিখেছেন : 'মৃণালিনী দেবী যখন বুঝিলেন যে তাঁহার সময় ফুরাইয়া আসিতেছে, তখন তিনি জেদ করিয়া জামাতা সত্যেন্দ্রনাথকে আমেরিকা হইতে ফিরাইয়া আনেন এবং রেণুকার ফুলসজ্জা-উৎসব সম্পন্ন করেন'[৫৭]—এই বক্তব্য তথ্য-সমর্থিত নয়। হোমিয়োপ্যাথি শিক্ষার জন্য আমেরিকা যাওয়ার কথা হলেও সত্যেন্দ্রনাথ সেখানে যাননি, ইংলণ্ডে থেকে উচ্চতর চিকিৎসা-শাস্ত্র অধ্যয়ন করছিলেন। সরকারী ক্যাশ থেকে নিয়মিত প্রতি মাসে ১০ পাউণ্ড [তখনকার বিনিময়মূল্য অনুযায়ী মোটামুটি, ১৫২] বিলাতে তাঁর কাছে পাঠানো হয়েছে—৭ জ্যৈষ্ঠ [21 May] উক্ত মাসের খরচের সঙ্গে পোশাক তৈরির জন্য অতিরিক্ত ৩ পাউণ্ড পাঠানো হয়। এইভাবে ৩ আষাঢ় [16 Jun] উক্ত মাসের খরচ পাঠিয়ে দেবার পর ৩০ আষাঢ়. [সোম 14 Jul] সরকারী ক্যাশের খতিয়ানে সত্যেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য খাতে হিসাব লেখা হয় : 'দং উঁহার বিলাত হইতে আগমন করার ব্যায় জন্য পাঠান যায় বিঃ থমস্ কুক এণ্ড সন্স ব্যাঙ্কের ৭৫ পাউণ্ড টেলিগ্রাফ পাঠান হয়….১১৫৮।০'। মীরা দেবী লিখেছেন : 'আমাদের ভগিনীপতি সত্যবাবু অত্যন্ত সাদাসিধে মানুষ ছিলেন। মধ্যবিত্ত গৃহস্থ-পরিবারে মানুষ হয়েছিলেন, তাই বিদেশে গিয়ে তাদের আদবকায়দা তাঁর ভালো লাগল না। বাবা যখন সত্যবাবুর কাছে তাঁর চলে আসার কারণ শুনলেন তখন তার জন্য বিরক্ত হন নি; বরং সত্যবাবুর জন্য একটা মায়া হল, সফল হয়ে আসতে পারলেন না বলে।'[৫৮] মীরা দেবীর বয়স তখন আট বছরেরও কম, সুতরাং এই 'স্মৃতি'র অনেকটাই 'শ্রুতি'-নির্ভর—তাই বর্ণনায় খুঁটিনাটি বিষয়ে কিছু ত্রুটি থাকলেও মূল বক্তব্যটি গ্রহণযোগ্য। সত্যেন্দ্রনাথ তাঁর অসুবিধার কথা নিশ্চয়ই রবীন্দ্রনাথকে জানিয়েছিলেন এবং তাঁর নির্দেশেই ৩০ আষাঢ় জাহাজভাড়া বিলাতে পাঠানো হয়েছিল—কিন্তু এর সঙ্গে মৃণালিনী দেবীর জেদের কোনো সম্পর্ক ছিল না।

সত্যেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য যখন ফিরে এলেন, তখন রেণুকার বয়স এগারো বছর আট মাস। বাল্যবিবাহের পর কন্যা ঋতুমতী হলে ঠাকুরপরিবারে 'দ্বিতীয় বিবাহ' বা ফুলশয্যা হত। সত্যেন্দ্রনাথ ফিরে এলে রেণুকার ফুলশয্যা হল ১৯ আশ্বিন [রবি 5 Oct] —সরকারী ক্যাশবহির খতিয়ানে এই প্রসঙ্গে হিসাব লিখিত হয়েছে : 'শ্রীমতী রেণুকা দেবীর শুভবিবাহের ফুলশয্যা ১৩০৯ সালের ১৯ আশ্বিন হয়….৭৪৷৷ ৩'। মায়ের অসুখের

খবর পেয়ে মাধুরীলতা কলকাতায় আসেন ১৬ আশ্বিন [বৃহ 2 Oct]; তিনি মঙ্গলবার' [২১ আশ্বিন : 6 Oct]. ছোটবোন মীরার চিঠির* নীচে পিতাকে লেখেন :

আমরা বৃহস্পতিবার এখানে এসে পৌঁচেছি কিন্তু রাণীর "ফুলশয্যা"র গোলমালে তোমাকে লিখতে পারিনি। তোমরা কবে এখানে আসবে? খোকাও গিয়েছে শুনে বড় আশ্চর্য্য বোধ হচ্ছে। মাকে এসে বড় কাহিল দেখছি এখন একটু ভাল আছেন।[৫৯]

মৃণালিনী দেবী ভালো ছিলেন না, ডাঃ ডি. এন. চট্টোপাধ্যায় ও ডাঃ ডি. এন. রায় প্রভৃতির আনাগোনা এবং ঔষধ ক্রয় অব্যাহত ছিল।

য়ুরোপে বিজ্ঞান-জয়যাত্রা সমাপ্ত করে জগদীশচন্দ্র সস্ত্রীক বোম্বাই পৌঁছন ২৫ আশ্বিন [শনি 11 Oct]। ইতিপূর্বে 5 Sep [শুক্র ২০ ভাদ্র] তাঁর জয়বার্তা জানিয়ে তিনি রবীন্দ্রনাথকে লেখেন :

এই চিঠি পাইবার পক্ষান্তে তোমাদের মধ্যে [আমাকে] দেখিতে পাইবে। ১৯এ সেপ্ট রওনা হইব, কলিকাতা ৫ই কি ৬ই অক্টোবর পৌঁছিব। বোম্বাই হইতে তোমাকে telegraph করিব। তোমার সহিত যেন অগৌণে দেখা হয়।

দুই বৎসরের পর তোমাদের সহিত দেখা হইবে। তোমাদের শুভ ইচ্ছা আমাকে সর্ব্বদা সঞ্জীবিত রাখিয়াছে। তোমাদের শুভ ইচ্ছা যদি কিয়ৎ পরিমাণে পূরণ করিয়া থাকি তাহা হইলে সুখী হইব।[৬০]

তিনি পত্র শেষ করেছেন একটি পুনশ্চ দিয়ে : 'অনেকগুলি নূতন কবিতা ও গল্প ফরমাইস রহিল'। কিন্তু পত্নীর অসুস্থতার জন্য তিনি যথাসময়ে রওনা হতে পারেননি, 19 Sep [শুক্র ৩ আশ্বিন]-এর পত্রে লেখেন : 'আমরা ১১ই অক্টোবর কলিকাতা পৌছিব'।[৬১] কিন্তু এই সূচীও রক্ষিত হয়নি, তাঁরা 11 Oct বোম্বাই পৌঁছন। রবীন্দ্রনাথকে টেলিগ্রামে নিশ্চয়ই এই খবর দিয়েছিলেন, 13 Oct [সোম ২৭ আশ্বিন] হাওড়া স্টেশনে অভ্যর্থনাকারী বিশিষ্ট ব্যক্তিদের পুরোভাগে তিনি রবীন্দ্রনাথকে দেখতে পান—'২৭ আশ্বিন জগদীশ বসুর জন্য হাবড়ার ষ্টেসনের' গাড়িভাড়ার হিসাব অবশ্যম্ভাবী ঘটনাটিকে প্রমাণ-ঋদ্ধ করে। দীর্ঘ দু-বছরের ব্যবধানের পর দুই বন্ধু—কবি ও বিজ্ঞানী—আবার মিলিত হলেন; বিজ্ঞান-সাধক এখন বিশ্ববন্দিত, সাহিত্য-সাধকের বিশ্বখ্যাতি তখনও এক দশক দূরে।

এই দিন বিকেলে রবীন্দ্রনাথ 'গোলতলা' যান, ২৯ বালিগঞ্জ, ৩০ আশ্বিন [বৃহ 16 Oct] তাঁর বিডন স্ট্রীট যাতায়াতের ও 'বৌবাজার হইতে আসার' হিসাব পাওয়া যায়। ব্রহ্মচর্যাশ্রমে এই বছর পূজার ছুটি দেওয়া হয়েছিল, রথীন্দ্রনাথ তাই কলকাতায় থেকে পিতার মতো বিভিন্ন জায়গায় যাতায়াত করেছেন—স্কুলের অন্যান্য কয়েকজন ছাত্রের সঙ্গে তিনি শান্তিনিকেতনে ফিরে যান ৫ কার্তিক [বুধ 22 Oct] তারিখে। স্বামীর পূজাবকাশে কলকাতায় এসে মাসখানেক কাটিয়ে মাধুরীলতা মজঃফরপুরে ফিরে যান ১২ কার্তিক [বুধ 29 Oct] কালীপূজার আগের দিন। ভ্রাতৃদ্বিতীয়া [১৬ কার্তিক রবি 2 Nov]র কথা তিনি মনে রেখেছিলেন, এই দিনই 'মা° বেলা দেবী দং ভাইফোঁটার খরচ জন্য আইসে ২০̮'। ঠাকুরপরিবারে এইসব হিন্দুপ্রথা নিষ্ঠার সঙ্গে পালিত হত; 'বাবু শরচ্চন্দ্র চক্রবর্তী মহাশয়ের জন্য জামাই ষষ্ঠির ধুতি চাদর ক্রয় ১১̮ বেলা দেবীর শাটী ক্রয় ৫ ।৷০ '—এইরূপ হিসাবও রবীন্দ্রনাথের ক্যাশবহিতে পাওয়া যায়। কিন্তু ব্যয়ের অঙ্ক দেখে আধুনিক শ্বশুরগণ দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলতে পারেন! অবশ্য তাঁরা আশ্বস্ত হতে পারেন এই জেনে যে, রবীন্দ্রনাথের জামাতাগণ অন্যান্য ক্ষেত্রে তাঁকে দোহন করার কোনো সুযোগের অপব্যবহার করেননি!

আশ্বিন মাসে রবীন্দ্রনাথের নিম্নলিখিত রচনাগুলি বিভিন্ন সাময়িকপত্রে মুদ্রিত হয় :

বঙ্গদর্শন, আশ্বিন ১৩০৯ [২।৬] :

২৭১-৭৫ 'বাজে কথা' দ্র বিচিত্র প্রবন্ধ ৫।৪৫৭-৬০

২৭৫-৯০ 'শকুন্তলা' দ্র প্রাচীন সাহিত্য ৫।৫২১-৩৭

২৯০-৯৩ 'শুক্লসন্ধ্যা' ['শূন্য ছিল মন'] দ্র উৎসর্গ ১০।৩৮-৪১ [২৩-সংখ্যক]

৩১৮-২৫ 'চোখের বালি' ৫৩ দ্র চোখের বালি ৩।৪৯১-৯৮ [৫২]

গদ্যগ্রন্থাবলী ১ম ভাগ [বৈশাখ ১৩১৪]-রূপে 'বিচিত্র প্রবন্ধ' যখন প্রকাশিত হয়, তখন রবীন্দ্রনাথ সূচনায় লেখেন : "এই গ্রন্থের পরিচয় আছে 'বাজে কথা' প্রবন্ধে। অর্থাৎ ইহার যদি কোনো মূল্য থাকে তাহা বিষয়বস্তুগৌরবে নয়, রচনারসসম্ভোগে।" তরুণ বয়সে ভারতী-তে রবীন্দ্রনাথ ভাবুকতামূলক রচনা লিখতে শুরু করেছিলেন, তাঁর বিবিধ প্রসঙ্গ [১২৯০] ও আলোচনা [১২৯২] গ্রন্থে এই রচনাগুলির অধিকাংশ সংকলিত হয়েছিল। এইগুলির মধ্যে ভাবালুতার যে আধিক্য ছিল, বর্তমান পর্বের রচনাগুলি তা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত—সূক্ষ্ম ভাবকল্পনা ও পরিণত মননের সংযোগে এগুলি বাংলা প্রবন্ধসাহিত্যে একটি নূতন ধারার সূত্রপাত করেছে। এই শ্রেণীর প্রবন্ধের গঠনরীতি যেন লঘু ভঙ্গিতে বিশ্লেষিত হয়েছে 'বাজে কথা' রচনাটিতে। পত্রিকায় প্রকাশিত রচনাটির অনেকগুলি অনুচ্ছেদ গ্রন্থে বর্জিত, তার মধ্যে বররুচির 'ইতরপাপফলানি যথেচ্ছয়া' শ্লোকটির একটি পদ্যানুবাদ ছিল, সেটি 'রূপান্তর' [১৩৭২] গ্রন্থের ৮১ পৃষ্ঠায় সংকলিত হয়েছে।

'শকুন্তলা' প্রবন্ধটি 'আলোচনাসমিতির অধিবেশনে পঠিত'। কালিদাসের অভিজ্ঞানশকুন্তল নাটক সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ ইতিপূর্বেই 'কুমারসম্ভব ও শকুন্তলা' [বঙ্গদর্শন, পৌষ ১৩০৮।৪২৩-৩৪] প্রবন্ধে আলোচনা করেছিলেন, সেখানে কালিদাসের কাব্য ও নাটকের অন্তর্নিহিত সত্যটি দুটি গ্রন্থের একত্র আলোচনার দ্বারা তিনি প্রতিপন্ন করেন। বর্তমান প্রবন্ধটি সেক্ষেত্রে কিছুটা বহির্মুখী, বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর 'শকুন্তলা, মিরন্দা এবং দেস্‌দিমোনা' [বঙ্গদর্শন, বৈশাখ ১২৮২] প্রবন্ধে তিনটি চরিত্রের যে তুলনামূলক সমালোচনা করেছিলেন কিছুটা তারই প্রতিবাদে রচিত। প্রতিবাদের চেহারাটি গ্রন্থে সংকলিত প্রবন্ধে স্পষ্ট নয়, পত্রিকায় মুদ্রিত উক্ত অনুচ্ছেদগুলি গ্রন্থে বর্জিত হয়েছে। এর মধ্যে সমালোচনার পদ্ধতি সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের বক্তব্যটি মূল্যবান :

> আমাদের সমালোচকেরা অনেকসময় নাটক-নভেল হইতে তাহার নায়ক বা নায়িকাকে বিচ্ছিন্ন করিয়া লইয়া অত্যন্ত বিস্তারিতভাবে তাহাদের উৎকর্ষ-অপকর্ষ বিচার করিয়া থাকেন। আসামীকে কাঠগড়ার মধ্যে দাঁড় করাইয়া যে বিচার, সে বিচার কাব্যের নহে। তাহা রাজার বিচার, শাস্ত্রের বিচার, জ্ঞানের বিচার বা ধর্ম্মনীতির বিচার হইতে পারে, কিন্তু সাহিত্যের বিচার নহে। কাব্যের নায়িকা, কে লজ্জা বেশি করিয়াছে বা কম করিয়াছে, কে আত্মত্যাগ বেশি দেখাইয়াছে বা কম দেখাইয়াছে, কাহার মুখের কথাগুলি চুনিয়া লইয়া বিদ্যালয়ের নীতিবোধ দুইখণ্ড সঙ্কলিত হইতে পারে এবং কাহার কথায় কেবল একখণ্ডমাত্র হয়, এ সমস্ত আলোচনা অধিকাংশস্থলেই অনর্থক। সমস্ত কাব্য তাহার দেশ-কাল-পাত্র লইয়া তাহার ব্যক্ত ও অনতিব্যক্ত ভাবে, ভঙ্গীতে ও ভাষায় যে কথা মুখ্যত ও গৌণত প্রকাশ করিতে থাকে, তাহাকে অবিচ্ছিন্নভাবে গ্রহণ করিতে পারিলে তবেই তাহার যথার্থ রসগ্রহণ করা হয়। শ্রেষ্ঠকাব্য, বিশেষত নাটক, অন্তঃপুর-বিশেষ,—সে আপনার সৌন্দর্য্যলক্ষ্মীকে বাহিরে আসিতে দেয় না।
>
> ....যখন এ কথা বলি যে, দেখা যাক শকুন্তলা ভাল কি মিরান্দা ভাল, তখন আমরা কাব্যের ধনকে কাব্যের অধিকার হইতে বাহির করিয়া আনি। কারণ, শকুন্তলা ত অভিজ্ঞানশকুন্তল-কাব্য নহে, সে ত কাব্যের উপাদানমাত্র। স্বতন্ত্র করিয়া দেখিলে তাহার ভালমন্দের আদর্শও স্বতন্ত্র হইয়া দাঁড়ায়। কাব্যের ভিতরে তাহার যে শ্রেষ্ঠত্ব, কাব্যের বাহিরে তাহার সে শ্রেষ্ঠত্ব কোথায়?[৬২]

সমালোচনার এই আদর্শ ব্যাখ্যা করে রবীন্দ্রনাথ গ্যেটের অভিজ্ঞানশকুন্তল নাটক সম্পর্কে epigram-সদৃশ শ্লোকটি অবলম্বনে নাটকটির ব্যাখ্যায় প্রবৃত্ত হয়েছেন। বৈসাদৃশ্যের সাহায্যে দুটি নাটকের, এবং মূলত

শকুন্তলার, বৈশিষ্ট্য পরিষ্কার করে বোঝানোর উদ্দেশ্যে তিনি শেকস্‌পীয়রের *Tempest* নাটক সম্পর্কে আলোচনা করেছেন, কিন্তু স্পষ্টতই তিনি বঙ্কিমচন্দ্রের আলোচনাপদ্ধতি গ্রহণ করেননি।

প্রবন্ধটি সমকালীন পাঠককে মুগ্ধ করেছিল। তাই প্রকাশের অব্যবহিত পরেই বৃহত্তর প্রচারের উদ্দেশ্যে এটির ইংরেজি অনুবাদ বিপিনচন্দ্র পাল-সম্পাদিত *New India* পত্রিকার 11 Dec [No. 15, p. 234] B 18 Dec (No. 16, pp. 248-49)-সংখ্যায় 'THE SAKUNTALA./A REVIEW./ By Babu Rabindranath Tagore/(Translated from the *Banga Darsan.*)' শিরোনামায় দুটি কিস্তিতে মুদ্রিত হয়, অনুবাদকের নাম অবশ্য উল্লেখিত হয়নি। পরবর্তীকালে যদুনাথ সরকার 'SAKUNTALA: ITS INNER MEANING' [দ্র *The Modern Review*, Feb 1911, pp. 171.75] নামে এটি পুনশ্চ অনুবাদ করেন।

'শুক্লসন্ধ্যা' কবিতাটির পাণ্ডুলিপি পাওয়া যায়নি, রচনা-কাল ও -স্থান অজ্ঞাত।

সমালোচনী, আশ্বিন ১৩০৯ [১।৯] :

৩৫৯-৬০ 'অস্ফুট' ['কুঁড়ির ভিতরে কাঁদিছে গন্ধ অন্ধ হয়ে'] দ্র উৎসর্গ ১০।১৮-১৯ [৯-সংখ্যক]

এই কবিতাটি কাব্যগ্রন্থ প্রথম ভাগ প্রথম খণ্ড [১৩১০]-এর অন্তর্গত 'হৃদয়-অরণ্য' বিভাগের প্রবেশক রূপে ব্যবহৃত হয়েছে। সত্যপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়-কর্তৃক প্রকাশিত 'কাব্য গ্রন্থাবলী'তে কবিতাগ্রন্থগুলি প্রকাশিত হয়েছিল কালানুক্রমিকভাবে, কিন্তু মোহিতচন্দ্র সেন-সম্পাদিত বহু খণ্ডে বিভক্ত 'কাব্যগ্রন্থ'তে কবিতাগুলি সজ্জিত হয় ভাবানুক্রমে বিভক্ত কয়েকটি বিশেষ শ্রেণীতে। এই সজ্জায় বিভিন্ন বয়সে লিখিত কয়েকটি কবিতা একত্রিত হওয়ায় রবীন্দ্রনাথ প্রবেশক-কবিতা রচনা করে সেই শ্রেণীর কবিতার মর্মবাণী নির্দেশের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। মোহিতচন্দ্র সেন কাব্যগ্রন্থ-এর সম্পাদক হলেও প্রাথমিক শ্রেণীবিন্যাস রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব এবং আমাদের অনুমান, মোহিতচন্দ্রের সাহায্য ও পরামর্শ ছাড়াই তিনি অন্তত প্রথম ভাগ প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ডের পাণ্ডুলিপির খসড়া প্রস্তুত করেছিলেন। আমাদের অনুমানের সপক্ষে আমরা মৃণালিনী দেবীর শ্রাদ্ধে'র কয়েকদিন পরে মোহিতচন্দ্রকে লেখা তাঁর একটি তারিখ-হীন পত্রের কিয়দংশ উদ্ধৃত করতে পারি : 'গ্রন্থাবলী নূতন আকারে বাহির করিবার জন্য অন্তরের মধ্যে জানি না কেন তাড়া আসিতেছে। তাহা ছাপাখানায় পাঠাইয়াছি।'[৬৩] পত্নীর স্বাস্থ্যের জন্য উদ্বিগ্ন ও সেবাশুশ্রূষায় ব্যস্ত থাকার জন্য কার্তিক মাসে এই পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করা রবীন্দ্রনাথের পক্ষে সম্ভব ছিল না—সুতরাং অন্তত 'হৃদয়-অরণ্য' বিভাগের প্রবেশক-কবিতাটি রচনা ও বিষয়বিন্যস্ত 'কাব্যগ্রন্থ' প্রকাশের পরিকল্পনা তৎপূর্বের, একথা স্বীকার করতে হবে।

[আশ্বিন-সংখ্যা সমালোচনী-র ৩৬১-৭৫ পৃষ্ঠায় সতীশচন্দ্র রায়-কৃত 'ক্ষণিকা' কাব্যের সমালোচনা মুদ্রিত হয়।]

সঙ্গীত-প্রকাশিকা, আশ্বিন ১৩০৯ [২।১] :

৭-৯ (মায়ার খেলা হইতে) কাফি-একতালা। কাছে আছে দেখিতে না পাও দ্র স্বর ৪৮

গানটির স্বরলিপিকার সম্পাদক জ্যোতিরিন্দ্রনাথ স্বয়ং।

বঙ্গদর্শন-এর কার্তিক-সংখ্যা প্রকাশিত হয় 21 Oct [মঙ্গল ৪ কার্তিক]; এই সংখ্যায় ও অন্যান্য সাময়িকপত্রে রবীন্দ্রনাথের নিম্নলিখিত রচনাগুলি প্রকাশিত হয় :

বঙ্গদর্শন, কার্তিক ১৩০৯ [২।৭] :

৩৪৩-৪৬ 'মাভৈঃ' দ্র বিচিত্র প্রবন্ধ ৫।৪৪১-৪৪

৩৬০-৭২ 'চোখের বালি' ৫৪-৫৫ দ্র চোখের বালি ৩।৪৯৮-৫১২ [৫৩-৫৫]

৩৭৬-৯১ 'অত্যুক্তি' দ্র ভারতবর্ষ ৪।৪৪১-৫৫

৩৯৫-৯৭ 'মন্দ্র' দ্র আধুনিক সাহিত্য ৯।৪৮৯-৯০

৩৯৭-৯৯ 'আলোচনা। রাষ্ট্রনীতি ও ধর্মনীতি' দ্র সমূহ-পরিশিষ্ট ১০।৫৯৭-৯৯

চোখের বালি উপন্যাস এই সংখ্যায় শেষ হল। উপন্যাসটি গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় বৎসরের শেষদিকে 5 Apr 1903 [রবি ২২ চৈত্র]। গ্রন্থপ্রকাশের সময়ে রবীন্দ্রনাথ সাময়িকপত্রে প্রকাশিত পাঠের অনেক অংশ বর্জন করেন, কোনো-কোনো পরিচ্ছেদও বর্জিত হয়েছে।

'মাভৈঃ'-এর মতো সুলভ আদর্শবাদের দ্বারা পিচ্ছিল, চিন্তার শৃঙ্খলাবিহীন, দুর্বল একটি রচনা লিখে রবীন্দ্রনাথ সেটিকে বঙ্গদর্শন-এ প্রকাশযোগ্য বলে কী করে বিবেচনা করলেন, এ প্রশ্ন সহজেই উঠতে পারে। মনে হয়, উদ্বেগপীড়িত মনের অসুস্থ শিথিল ভাবনাপ্রবাহ থেকে রচনাটির উদ্ভব। নইলে সরলা দেবী-কর্তৃক প্রতাপাদিত্য-উৎসব প্রবর্তন-কালে যে-প্রতাপাদিত্যের বীরত্বমহিমা রবীন্দ্রনাথ অস্বীকার করেছিলেন, তাঁর সম্পর্কেই এখানে লিখতে পারতেন না :

> প্রতাপাদিত্য, সীতারাম, সিংহলবিজয়ী বিজয়সিংহ, তোমাদের স্মৃতি ধারাবিহীন জলের মত বাংলার ইতিহাসমরুর মধ্যে কোথায় শুকাইয়া গেছে! আমাদের প্রাণের পিপাসা মিটাইবার জন্য তাহা আমাদের হৃদয়ের ভিতর পর্য্যন্ত আসিয়া পৌঁছিতে পারে নাই। তোমাদের রক্তপূত চরিত-ধারাজলে বাঙালিজাতির অভিষেকক্রিয়া সম্পন্ন হইতে পারিল না। কারণ, তোমরা বিচ্ছিন্ন—এই দীনরক্তের দেশে তোমরা স্রোত বহাইয়া গেলে না! এখন আমাদিগকে কিসে গৌরব দিবে![৬৪]

—'বিচিত্র প্রবন্ধ' গ্রন্থে সংকলনের সময়ে রবীন্দ্রনাথ অনুচ্ছেদটি বর্জন করেছিলেন। সম্পূর্ণ প্রবন্ধটি বর্জিত হলে আরো ভালো হত, যেখানে উৎকৃষ্টতর অনেক রচনা গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত হয়নি! তবে 'বিচিত্র প্রবন্ধ' থেকে সরিয়ে প্রবন্ধটিকে যদি 'আত্মশক্তি' বা 'ভারতবর্ষ' প্রভৃতির মতো কোনো গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত করে ভাবা যায়, তাহলে সমকালীন রাজনৈতিক পটভূমিকায় একটি বিশেষ তাৎপর্য লাভ করে। বস্তুত এইসময়ে রবীন্দ্রনাথ যে রাজনীতি বিষয়ে চিন্তা করছিলেন, বঙ্গদর্শন-এর একই সংখ্যায় প্রকাশিত 'অত্যুক্তি' বা 'রাষ্ট্রনীতি ও ধর্ম্মনীতি' তার সাক্ষ্য দেবে।

'অত্যুক্তি' প্রবন্ধটি 'দিল্লি-দরবারের উদ্‌যোগকালে লিখিত'। সম্রাট সপ্তম এডওয়ার্ডের রাজ্যাভিষেক উপলক্ষে ব্রিটিশমহিমা প্রচারের উদ্দেশ্যে আত্মম্ভরী সাম্রাজ্যবাদী ভাইসরয় লর্ড কার্জন 1 Jan 1903 [বৃহ ১৭ পৌষ] তারিখে দিল্লিতে রাজকীয় দরবার অনুষ্ঠিত করার মনোবাসনা জানিয়ে বিজ্ঞপ্তি ['Proclamation'] জারি করেন 14 Feb 1902 [২ ফাল্গুন ১৩০৮]। এর পরের দিন 15 Feb [শনি ৩ ফাল্গুন] কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তনে চ্যান্সেলার হিসেবে ভাষণ দিতে গিয়ে কার্জন ছাত্রদের বলেন : 'If I were asked to sum up in a single word the most notable characteristic of the East—physical, intellectual and moral—as compared with the West, the word exaggeration or extravagance is the one that I should employ.' রবীন্দ্রনাথ কার্জনের এই উক্তির পরিপ্রেক্ষিতে দিল্লি-দরবারের উদ্‌যোগকে বিচার করে 'অত্যুক্তি' প্রবন্ধ লেখেন। কার্জন প্রাচ্যদেশীয় অত্যুক্তি সম্পর্কে যে অভিযোগ করেন তা মেনে নিয়ে রবীন্দ্রনাথ পাশ্চাত্য অত্যুক্তির প্রসঙ্গ উত্থাপন করেছেন। প্রাচ্যবাসীর অত্যুক্তি ও আতিশয্য তাদের স্বভাবের ঔদার্য-বশত, পাশ্চাত্য

অত্যুক্তি মেকি জিনিস। মোগলসম্রাট দিল্লিতে দরবার বসাতেন, সামন্তরাজারা তাঁর যথার্থ সহায় হয়ে দরবারে সসম্মান আসন গ্রহণ করতেন—কিন্তু বর্তমানে সেই সম্রাটই যখন প্রকৃত ক্ষমতা থেকে বঞ্চিত তখন 'হঠাৎ এক দিন ইংরেজ সম্রাটের নায়েব, পরিত্যক্তমহিমা দিল্লিতে সেলাম কুড়াইবার জন্য রাজাদিগকে তলব দিলেন, নিজের ভুলুণ্ঠিত পোশাকের প্রান্ত শিখ ও রাজপুত রাজকুমারদের দ্বারা বহন করাইয়া লইলেন, আকস্মিক উপদ্রবের মতো এক দিন একটা সমারোহের আগ্নেয় উচ্ছ্বাস উদ্গীরিত হইয়া উঠিল'—শূন্যতাকে বাস্তবের সাজ পরানোই পাশ্চাত্য অত্যুক্তি।

প্রায় পঁচিশ বছর পরে ড শচীন্দ্রনাথ সেন-রচিত *Political Philosophy of Rabindranath* গ্রন্থের আলোচনা-প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ বর্তমান প্রবন্ধটির পটভূমি ও তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেছিলেন :

> কার্জন লাটের হুকুমে দিল্লির দরবারের উদ্যোগ হল। তখন রাজশাসনের তর্জন স্বীকার করেও আমি তাকে তীব্র ভাষায় আক্রমণ করেছিলুম। ....ইংরেজের সঙ্গে ভারতবাসীর রাষ্ট্রিক সম্বন্ধের বেদনা ও অপমানটা যে কোথায় আমার সেই লেখায় কতকটা প্রকাশ করেছি। আমি এই বলতে চেয়েছিলুম, দরবার জিনিসটা প্রাচ্য; পাশ্চাত্য কর্তৃপক্ষ যখন সেটা ব্যবহার করেন তখন তার যেটা শূন্যের দিক সেইটিকেই জাহির করেন, যেটা পূর্ণের দিক সেটাকে নয়।[৬৫]

গ্রন্থে সংকলিত হবার সময়ে প্রবন্ধটির অনেক অংশ বর্জিত হয়। সমকালীন ঘটনাবলীর নিখুঁত বর্ণনা দিয়ে একদিকে ভারতীয়দের প্রতি ইংরেজ শাসকের নিষ্ঠুর বঞ্চনা এবং অপরদিকে ব্যবসায়িক ও রাজনৈতিক স্বার্থে বুয়র যুদ্ধ সম্পর্কে মিথ্যা কাহিনী-রচনার মাধ্যমে স্বদেশবাসীকে প্রতারণার নগ্ন রূপটি এই অংশগুলিতে রবীন্দ্রনাথ সাংবাদিক-সুলভ যাথার্থ্যের সঙ্গে চিত্রিত করেছেন। নিতান্তই সাময়িকতাদুষ্ট ভেবে তিনি হয়তো এই অনুচ্ছেদগুলি বর্জন করেছিলেন, কিন্তু এর ফলে প্রবন্ধটির জোর অনেকটা কমে গেছে একথা স্বীকার করতেই হবে।

এলাহাবাদের ধনী ব্যবসায়ী সোমেশ্বর দাস স্বত্বরক্ষার কারণে তাঁর ইংরেজ ভাড়াটিয়াকে ফুল গাছের টব স্থানান্তরিত করতে বাধা দিলে দেশীয় মানুষের স্পর্ধা দমন করার জন্য ইংরেজ জজ বার্কিট তাঁকে ছয় মাসের কারাদণ্ড দেন—এই ঘটনাটিকে লক্ষ্য করে রবীন্দ্রনাথ 'রাষ্ট্রনীতি ও ধর্মনীতি' প্রবন্ধটি রচনা করেন। প্রথম বর্ষ বঙ্গদর্শন-এ তিনি 'আলোচনা' নামে একটি বিভাগ রেখেছিলেন—মুদ্রিত রচনা সম্পর্কে অপর ব্যক্তিকে মন্তব্যপ্রকাশের সুযোগ দেওয়া এই বিভাগের লক্ষ্য ছিল; কিন্তু কয়েকটি সংখ্যার পরেই বিভাগটি বন্ধ হয়ে যায়। সম্ভবত বিষয়টি সম্পর্কে বিতর্ক আহ্বান করেই তিনি বর্তমান রচনাটি 'আলোচনা' বিভাগে বিন্যস্ত করেছিলেন, কিন্তু অপর কেউ সেই আহ্বানে সাড়া দেননি।

এই রচনাটি নানা দিক দিয়ে 'অত্যুক্তি' প্রবন্ধের সঙ্গে যুক্ত। সেখানে তিনি একটি বর্জিত অংশে Herbert Spencer-এর নূতন-প্রকাশিত গ্রন্থ *Facts and Comments*-এর 'State Education' প্রবন্ধ থেকে বুয়র যুদ্ধ সম্পর্কে মিথ্যা ও বিকৃত সংবাদ পরিবেশনের মাধ্যমে ধর্মবুদ্ধির উপর ব্যবসায়বুদ্ধির প্রতিষ্ঠার সম্পর্কে তথ্য পরিবেশন করেছিলেন। বর্তমান রচনায় তার উল্লেখ করে রবীন্দ্রনাথ দেখিয়েছেন, রাষ্ট্রনৈতিক প্রয়োজন কিভাবে ন্যায়বিচারের ধর্মনীতিকেও বিকৃত করেছে। এই বিকৃতি ইংরেজদের পক্ষে কত ক্ষতিকর তার বিচার রবীন্দ্রনাথ বিভিন্ন প্রবন্ধে করেছেন, কিন্তু এখানে তিনি আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন স্বদেশবাসী সম্পর্কে : 'ভয়ের কারণ এই যে, আমাদের মন হইতে ধ্রুবধর্মে বিশ্বাস শিথিল, সত্যের আদর্শ বিকৃত হইয়া যাইতেছে। আমরাও প্রয়োজনকে সকলের উচ্চে স্থান দিতে উদ্যত হইয়াছি। আমরাও বুঝিতেছি, পোলিটিকাল উদ্দেশ্যসাধনে

ধর্মবুদ্ধিতে দ্বিধা অনুভব করা অনাবশ্যক।' রাজনীতির এই ইংরেজি প্যাটার্ন স্বাধীন ভারতে কী বিষময় ফল প্রসব করছে তা আমরা প্রতিনিয়তই দেখতে পাচ্ছি। রবীন্দ্র-চিন্তার বর্তমান প্রাসঙ্গিকতা এই দিক দিয়ে বিচার্য।

'মন্দ্র' দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের পঞ্চম কাব্যগ্রন্থ 'মন্দ্র' [19 Sep: ৩ আশ্বিন]-এর সমালোচনা। রবীন্দ্রনাথ ইতিপূর্বে তাঁর 'আর্য্যগাথা' ও 'আষাঢ়ে' কাব্যের সমালোচনা করে দ্বিজেন্দ্রলালের প্রতিভার বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে বাঙালি পাঠকের পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন, বর্তমান আলোচনাটিতে সেই বৃত্ত সম্পূর্ণ হল। এরপরে দ্বিজেন্দ্রলাল প্রধানত নাট্যকার, রবীন্দ্রনাথ অন্তত লিখিতভাবে তাঁর নাটক সম্পর্কে মন্তব্য করেননি।

অন্য দুটি কাব্য সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ কিছু-কিছু ত্রুটি নির্দেশ করেছিলেন, কিন্তু 'মন্দ্র' সম্পর্কে তিনি একান্তই প্রশংসামুখর। শব্দনির্বাচন, ছন্দোরচনা, অলঙ্কারোক্ত নয়টি রসের একত্রিত ভাববিন্যাসের মধ্যে কবির যে সাহস ও আত্মবিশ্বাস প্রকাশ পেয়েছে, সেই কুণ্ঠাহীন পৌরুষে রবীন্দ্রনাথ মুগ্ধ হয়েছেন। দ্বিজেন্দ্রলালের কাব্যভাষা সম্পর্কে তাঁর মন্তব্য: 'দ্বিজেন্দ্রলালবাবু বাংলা কাব্যভাষার একটি বিশেষ শক্তি দেখাইয়া দিলেন। তাহা ইহার গতিশক্তি। ইহা যে কেমন দ্রুতবেগে, কেমন অনায়াসে তরল হইতে গভীর ভাষায়, ভাব হইতে ভাবান্তরে চলিতে পারে, ইহার গতি যে কেবলমাত্র মৃদুমন্থর আবেশভারাক্রান্ত নহে, তাহা কবি দেখাইয়াছেন।'

আলোচনার শেষে রবীন্দ্রনাথ 'কুসুমে কন্টক' ও 'রাধার প্রতি কৃষ্ণ' কবিতা দুটি সম্পর্কে তাঁর অনুযোগ জানিয়েছেন, কিন্তু গ্রন্থে সেই অংশটি বাদ দেন। 'আধুনিক সাহিত্য' [১৩১৪] গ্রন্থ প্রকাশের পূর্বেই দ্বিজেন্দ্রলালের সঙ্গে তাঁর মনোমালিন্য দেখা দেয়, বর্জনের কারণ সেইটিই। 'আর্যগাথা' ও 'আষাঢ়ে' সমালোচনার বিরূপ অংশ তিনি এই কারণেই গ্রন্থে বর্জন করেছিলেন। বর্তমান প্রবন্ধের বর্জিত অনুচ্ছেদগুলি 'গ্রন্থপরিচয়'-এ সংকলিত হয়েছে [দ্র ৯।৫৬৩]

তত্ত্ববোধিনী, কার্তিক ১৮২৪ শক [৭১১ সংখ্যা] :

27 'The God of Upanishads'

ঔপনিষদ ব্রহ্ম গ্রন্থের ৩৩-৩৬ অনুচ্ছেদগুলির ['বৃক্ষে যে ফল থাকে····সংসারের কর্ম্মকে ব্রহ্মের কর্ম্ম বলিয়াই জানে' দ্র অ-২।২০৭-০৯] ইংরেজি অনুবাদ এই সংখ্যায় মুদ্রিত হয়।

সমালোচনী, কার্তিক ১৩০৯ [১।১০] :

৪০৮-০৯ 'বাদক' ['হে রাজন্‌, তুমি আমারে'] দ্র উৎসর্গ ১০।৩৪-৩৫ [১৯-সংখ্যক]

৪০৫-০৭ স্বরলিপি।/মায়ার খেলা।/দ্বিতীয় দৃশ্য। ইমনকল্যাণ-একতালা।

পথহারা তুমি পথিক যেন গো

'বাদক' কবিতাটি কাব্যগ্রন্থ ১ম ভাগ ২য় খণ্ডের অন্তর্গত 'লোকালয়' বিভাগের 'প্রবেশক' রূপে রচিত হয়। গানটির স্বরলিপিকার সম্ভবত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, তিনিই আশ্বিন-সংখ্যা সঙ্গীত-প্রকাশিকা-য় মায়ার খেলা-র আর-একটি গানের স্বরলিপি করেন।

সঙ্গীত-প্রকাশিকা, কার্তিক ১৩০৯ [২।২] :

২৮-৩০ কাফি-চৌতাল। আছ অন্তরে চিরদিন দ্র স্বর ২২

৩০-৩২ আনন্দ ভৈরবী-কাওয়ালি। এস হে গৃহদেবতা দ্র স্বর ২৭

দুটি গানেরই স্বরলিপিকার কাঙালীচরণ সেন।

রবীন্দ্রনাথ ২৬ আশ্বিন [রবি 12 Oct] শান্তিনিকেতন থেকে কলকাতায় আসেন জগদীশচন্দ্রকে অভ্যর্থনার জন্য। পূজাবকাশের পর বিদ্যালয় খুললে আবার ফিরে যাবেন এমন বাসনা হয়তো তাঁর মনে ছিল, কিন্তু মৃণালিনী দেবীর অসুস্থতা ক্রমশ গুরুতর হয়ে ওঠায় সেই আশা পূর্ণ হয়নি। রথীন্দ্রনাথের টেস্ট পরীক্ষা এগিয়ে আসছে তার জন্য চিন্তা, পূজাবকাশে বাড়িতে গিয়ে নানা কারণে কয়েকজন শিক্ষক ফিরে আসেননি তার জন্য চিন্তা, নূতন শিক্ষক কয়েকজন নিযুক্ত হয়েছেন তাঁদের সঠিকভাবে কাজে লাগানোর চিন্তা এবং তাঁর দীর্ঘ অনুপস্থিতিতে বিদ্যালয়ের কর্মপরিচালনা বিষয়ে চিন্তা তাঁকে পুরো কার্তিক মাসটি ব্যতিব্যস্ত করে রেখেছে। সম্ভবত ১০ কার্তিক [27 Oct] 'সোমবার' তিনি মনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়কে লিখেছেন :

[রবীন্দ্রনাথ] সিংহ তাহার বাড়িতে কালীপূজার দিনে [১৩ কার্তিক বৃহ 30 Oct] রথী ও প্রেম[ানন্দ] সিংহকে লইয়া যাইবার জন্য ধরাধরি করিতেছে। এ প্রস্তাবে আমার উৎসাহ নাই। রথীর পড়াশুনার মধ্যে সম্প্রতি কোন প্রকার অনিয়ম ঘটিতে দিতে ইচ্ছা করি না....সুবোধ [চন্দ্র মজুমদার] এখনো আসিয়া পৌঁছিল না শুনিয়া দুঃখিত হইলাম। সুবোধের সঙ্গে অচ্যুতের [অক্ষয়চন্দ্র সরকারের পুত্র অচ্যুতচন্দ্র] ফিরিবার কথা ছিল তাহার কিরূপ ব্যবস্থা হইল জানি না। এবারে ছাত্রদিগকে যাহাতে ভূগোল পড়ান হয় সেদিকে দৃষ্টি রাখিতে বলিবেন। ভূগোল সম্বন্ধে আমাদের বিদ্যালয়ের ছাত্রদের অনভিজ্ঞতা অদ্ভুত ও হাস্যকর।

আশা করি রথী সন্তোষের পড়াশুনা অব্যাঘাতে চলিতেছে। নরেন্দ্র[নাথ] ভট্টাচার্য তাহাদিগকে জিয়োমেট্রি পড়াইতেছেন কিন্তু অ্যালজেব্রা ও পাটীগণিত বোধ হয় বন্ধ আছে।

....আমি যে কবে বোলপুরে ফিরিতে পারিব কিছুই বলিতে পারি না। ডাক্তার [কালীপ্রসন্ন লাহিড়ি] ছুটি চাহিতে ছিলেন—কিন্তু এখন আমার অনুপস্থিতিতে তাঁহাকে কোনক্রমেই ছুটি দেওয়া চলে না—এই জন্য তাঁহার বিশেষ আগ্রহ সত্ত্বেও দিতে পারিলাম না।[৬৬]

পূজাবকাশের পর বিদ্যালয় তখন মাত্র কয়েকদিন হল খুলেছে, অব্যবস্থার সম্পূর্ণ চিত্রটি তখনও তাঁর কাছে স্পষ্ট হয়নি। সেইটি জানার পর 'বৃহস্পতিবার' [২০ কার্তিক : 6 Nov] তিনি মনোরঞ্জনবাবুকে লিখেছেন :

জগদানন্দ রেমিটেন্ট্ জ্বরে শয্যাগত। সুবোধ তাহার কন্যার পীড়ায় আবদ্ধ। এই সকল আশঙ্কাতেই আমি পূজার সময় বিদ্যালয় বন্ধ রাখিতে অত্যন্ত অনিচ্ছুক ছিলাম। যাহা হউক, এখন কি করিয়া সেখানকার কাজ চলিবে ভাবিয়া পাইতেছি না। পণ্ডিতমহাশয় [হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়] নানা অনুনয় করিয়া স্বদেশ হইতে তাঁহার পরিজনদের কলিকাতায় আনিতে গেছেন। সপ্তাহের মধ্যে ফিরিবার কথা আছে—কিন্তু আমার মনে সে সম্বন্ধে সন্দেহ আছে।....এন্ট্রেন্স্ ক্লাসের অঙ্কের কি গতি হইবে? রেমিটেন্ট্ জ্বর সারিতে কতদিন লাগিবে এবং তাহার পরে বললাভ করিতেও কতদিন বিলম্ব হইবে কিছুই বলা যায় না....আমি ঠিকা লোকের চেষ্টায় রহিলাম কিন্তু উভয়ের বেতন বহন করা আমার পক্ষে অসাধ্য হইবে—অতএব জগদানন্দ যে পর্য্যন্ত না আরাম হন ও পূরা কাজ করি বললাভ করেন ততদিন তাঁহাকে ক্ষতি স্বীকার করিতেই হইবে। ইতিমধ্যে আপনারা মিলিয়া, রথীদের অঙ্কচর্চ্চার যাহাতে ব্যাঘাত না হয় সে চেষ্টা করিবেন।[৬৭]

তিন টাকা বেতনের ভৃত্যের ক্ষেত্রেও ঠাকুরপরিবারে যতদিন কাজ ততদিন বেতনদানের প্রথা প্রচলিত ছিল, সুতরাং জগদানন্দের বেতন সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের মনোভাবে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই—কিন্তু সম্ভবত এই অপ্রিয় কাজ তাঁকে করতে হয়নি। সুবোধচন্দ্র শমীন্দ্রনাথকে নিয়ে ২৭ কার্তিক [বৃহ 13 Nov] শান্তিনিকেতনে যান, ক্যাশবহিতে তার হিসাব আছে—তার কয়েকদিন পরে লেখা একটি চিঠিতে মনোরঞ্জনবাবু, সুবোধচন্দ্র ও জগদানন্দের উপর বিদ্যালয়ের কর্তৃত্বভার দেওয়া দেখে মনে হয়, জগদানন্দ ইতিমধ্যেই কাজে যোগ দিয়েছেন।

এরই মধ্যে শিবনাথ শাস্ত্রীর জামাতা কুঞ্জলাল ঘোষ ব্রহ্মচর্যাশ্রমের আদর্শে আকৃষ্ট হয়ে বিদ্যালয়ে যোগ দিতে ইচ্ছুক হলে রবীন্দ্রনাথ তাঁকে কার্যসম্পাদক পদে নিয়োগ করেন। এঁর সম্পর্কে কার্তিকের শেষে লেখা

একটি তারিখ-হীন পত্রে তিনি মনোরঞ্জনবাবুকে লিখেছেন :

কুঞ্জবাবু শীঘ্রই বোলপুরে যাইবেন। আশা করিতেছি তাঁহার নিকট হইতে নানাবিষয়ে সাহায্য পাইবেন। অধ্যাপনকার্য্যেও তিনি আপনাদের সহায় হইতে পারিবেন। আন্তরিক শ্রদ্ধার সহিত তিনি এই কার্যে ব্রতী হইতে উদ্যত হইয়াছেন। ইঁহার সম্বন্ধে যত লোকের নিকট হইতে সন্ধান লইয়াছি সকলেই একবাক্যে ইঁহার প্রশংসা করিয়াছেন।

বিদ্যালয়ের উদ্দেশ্য ও কার্যপ্রণালী সম্বন্ধে আমি বিস্তারিত করিয়া ইঁহাকে লিখিয়া দিলাম। সেই লেখা আপনারা পড়িয়া দেখিবেন—যাহাতে তদনুসারে ইনি চলিতে পারেন আপনারা ইঁহাকে সেইরূপ সাহায্য করিবেন।

বিদ্যালয়ের কর্ত্তৃত্বভার আমি আপনাদের তিন জনের উপর দিলাম—আপনি জগদানন্দ ও সুবোধ। এই অধ্যক্ষসমিতির সভাপতি আপনি ও কার্য্যসম্পাদক কুঞ্জবাবু। হিসাবপত্র তিনি আপনাদের দ্বারা পাশ করাইয়া লইবেন এবং সকল কাজেই আপনাদের নির্দ্দেশমত চলিবেন। এ সম্বন্ধে বিস্তৃত নিয়মাবলী তাঁহাকে লিখিয়া দিয়াছি আপনারা তাহা দেখিয়া লইবেন। নিয়মগুলির যেরূপ পরিবর্তন ইচ্ছা করেন আমাকে জানাইতে সঙ্কোচ করিবেন না।[৬৮]

২৭ কার্তিক [বৃহ 13 Nov] তারিখে জোড়াসাঁকো থেকে কুঞ্জলাল ঘোষকে কুড়িটি পৃষ্ঠায় লেখা একটি দীর্ঘ পত্রে এই 'বিস্তৃত নিয়মাবলী' লিখিত হয়। ব্রহ্মবিদ্যালয়ের পরিকল্পনা গ্রহণের সময়ে বলেন্দ্রনাথ একটি খসড়া নিয়মাবলী প্রণয়ন করেছিলেন [দ্র রবিজীবনী ৪।২২৭-২৮]। ব্রহ্মচর্যাশ্রম প্রতিষ্ঠার পর সাধারণভাবে রবীন্দ্রনাথই কার্যপরিচালনার দায়িত্বে ছিলেন, পরীক্ষানিরীক্ষার মধ্য দিয়ে কার্যবিধি গড়ে উঠেছিল—সুতরাং স্বতন্ত্রভাবে নিয়মাবলী প্রণয়নের প্রয়োজন হয়নি, আর 'প্রধানত নিয়মের সাহায্যেই বিদ্যালয়-চালনার প্রতি…বিশেষ আস্থা' তাঁর ছিল না। কিন্তু বর্তমানে পারিবারিক বিপর্যয়ের পরিপ্রেক্ষিতে বিদ্যালয় থেকে দীর্ঘকাল দূরে থাকার আশঙ্কা দেখা দেওয়ায় রবীন্দ্রনাথ 'বিস্তৃত নিয়মাবলী' প্রণয়নের প্রয়োজন অনুভব করেছেন। এটি প্রত্যক্ষভাবে কুঞ্জলাল ঘোষকে সম্বোধন করে লেখা হলেও বিদ্যালয়ের সমস্ত শিক্ষক যে তাঁর লক্ষ্য ছিলেন, মনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়কে লেখা পূর্বোল্লিখিত পত্রই তার প্রমাণ। সেদিক দিয়ে এই পত্রই শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্যাশ্রমের প্রথম সংবিধান [Constitution]। সংবিধানের ভূমিকা [Preamble]র মতোই রবীন্দ্রনাথ পত্রের প্রথমে বিদ্যালয়ের আদর্শ ও লক্ষ্য বর্ণনা করেছেন, পরে দিয়েছেন কার্যপরিচালনার সূত্রসমূহ [Articles]। বিভিন্ন পত্রে ও প্রবন্ধে দীর্ঘদিন ধরে তিনি শান্তিনিকেতনের আদর্শ ব্যাখ্যা করেছেন, কিন্তু স্ত্রীর মৃত্যুর মাত্র এগারো দিন আগে 'নানা উদ্‌বেগের মধ্যে' তিনি কুঞ্জলাল ঘোষের মতো নবদীক্ষিতের কাছে যেভাবে গায়ত্রীমন্ত্রের তাৎপর্য থেকে আরম্ভ করে বিলাস ও ধনাভিমান ত্যাগের আদর্শ বিবৃত করেছেন তা এককথায় অতুলনীয়। পাঠককে মনোযোগ ও শ্রদ্ধার সঙ্গে এই পত্রটি[৬৯] পড়ে নিতে অনুরোধ করি।

মৃণালিনী দেবীর অসুস্থতার সঙ্গে কার্তিক মাসের গোড়াতে রেণুকার অসুস্থতাও যুক্ত হল। ৩ কার্তিক [সোম 20 Oct] শ্রীমতী রেণুকা দেবীর জন্য থর্ম্মমিটার ও ঔষধ ক্রয় ৩ ০ 'হিসাব থেকে অসুখের সূচনাকালটি অনুমান করা যায়। কয়েকদিন পরে ১০ কার্তিক [সোম 27 Oct] রবীন্দ্রনাথ মনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়কে লিখেছেন : 'আমিএখানে রোগতাপ লইয়া অত্যন্ত উন্মনা আছি। আমার স্ত্রীর রোগ এখন সারিবার দিকে গিয়াছে বলা যায় না। রেণুকার এখনো sore throat চলিতেছে—মীরা কাল জ্বরে পড়িয়াছে।'[৭০] রেণুকার এই sore throat যক্ষ্মারোগেরই পূর্বাভাস—রোগের প্রকৃতিটি চিনে নিতে দেরি হয়েছে; আর যথাসময়ে ধরা পড়লেও খুব লাভ ছিল না, এই ব্যাধির মহৌষধ অ্যান্টিবায়োটিক আবিষ্কার হতে তখনও অনেক দেরি।

রেণুকার স্বাস্থ্য কোনদিনই ভালো ছিল না, তাঁর যে ফটোগ্রাফ দেখা যায় তাতে অন্য ভাইবোনের তুলনায় তাঁকে শীর্ণ বলেই মনে হয়। তাঁর জেদও ছিল প্রচণ্ড। সাজগোজ ভালোবাসতেন না একেবারে। মীরা দেবী লিখেছেন : 'সবমেয়ে সংসার করবার মন নিয়ে জন্মায় না। রানীদি ছিলেন সেই ধরনের মেয়ে। বাবা যদি রানীদিকে অল্প বয়সে বিয়ে না দিয়ে লেখাপড়া করাতেন তা হলে বোধ হয় ভালো করতেন। রানীদিকে বেশির ভাগ সময় বই পড়তে দেখতুম। গল্পগুজব খুব কমই করতেন।'[৭১] তিনি আরও লিখেছেন : 'সত্যবাবু অকৃতকার্য হয়ে ফিরে এলেন বলে রানীদির মনটা খুব ভেঙে গিয়েছিল।···সত্যবাবুর ফিরে আসা নিয়ে মেয়েমহলে খুব সমালোচনা শুরু হল।···কিছুদিন আগে থাকতে রানীদির অল্প অল্প জ্বর হচ্ছিল, কিন্তু কাউকে কিছু বলেন নি। বোধ হয় বাঁচার ইচ্ছা ছিল না। সত্যবাবু বাবার এতগুলো টাকা নষ্ট ক'রে এলেন, কিছু শিখে এলেন না, ব'লে ওঁর মনটা খুব ভেঙে গিয়েছিল।'[৭২] মীরা দেবীর বয়স তখন নয় বৎসর, সুতরাং 'স্মৃতি'র চেয়ে 'শ্রুতি'র উপাদানই এতে বেশি—কিন্তু ঘটনার পারম্পর্য ও রেণুকার স্বভাববৈশিষ্ট্য বিবেচনা করলে এই ব্যাখ্যার উপর নির্ভর করা যায়।

অকাল-প্রত্যাগত জামাইকে নিয়ে রবীন্দ্রনাথের সমস্যাও কম ছিল না। সরকারী ক্যাশ থেকে হলেও সত্যেন্দ্রনাথের বিলাতপ্রবাসের সময়ে বিভিন্ন অঙ্কের মাসোহারা তাঁকে পাঠাতে হয়েছে, সত্যেন্দ্রনাথের মায়ের জন্য মাসোহারা নির্দিষ্ট ছিল পঞ্চাশ টাকা। দেশে ফিরে আসার পর মাসিক দেড়শত টাকা করে তিনি পেয়েছেন [শ্বশুরেরই সমান], কলকাতার বিভিন্ন জায়গায় ভ্রমণের জন্য গাড়িভাড়া মেটানো হয়েছে রবীন্দ্রনাথের ক্যাশ থেকে। তদুপরি 'উঁহার ডিস্পেন্‌সারির দ্রব্যাদি ক্রয় জন্য ২০০৻' ১০ কার্তিক [27 Oct] মেটানো হয়েছে সরকারি তহবিল থেকে। চিকিৎসাব্যবসায়ে তিনি কৃতিত্ব দেখাতে পারেননি, শেষ পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথ তাঁকে শান্তিনিকেতনে নিয়ে গেছেন বিদ্যালয়ের দায়িত্ব দিয়ে। সেই দায়িত্ব তিনি কতটা পালন করেছিলেন তা আমরা যথাস্থানে দেখতে পাব।

মৃণালিনী দেবীর শরীর ক্রমশ খারাপের দিকে যাচ্ছিল, ১২ কার্তিক [বুধ 29 Oct] বেডপ্যান, স্টম্যাক টিউব ইত্যাদি কেনা থেকে বোঝা যায়। ডাঃ ডি·এন·চট্টোপাধ্যায় [অ্যালোপ্যাথ], ডাঃ জে·এন· মজুমদার ও ডাঃ ডি. এন. রায় [হোমিয়োপ্যাথ]—বিশেষত শেষোক্ত চিকিৎসকের আনাগোনা ক্রমশই বেড়ে উঠেছে। রথীন্দ্রনাথ লিখেছেন : 'অ্যালোপ্যাথ ডাক্তাররা কী অসুখ ধরতে না পারায় বাবা হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা করাতে লাগলেন। তখনকার দিনে প্রসিদ্ধ ডাক্তাররা—প্রতাপ মজুমদার, ডি. এন· রায় প্রভৃতি সর্বদাই বাড়িতে আসতে থাকলেন। তাঁরা সকলেই বাবাকে সমীহ করতেন, এমন-কি হোমিওপ্যাথি চিকিৎসাবিদ্যায় তাঁদের সমকক্ষ মনে করতেন। মায়ের চিকিৎসা সম্বন্ধে বাবার সঙ্গে পরামর্শ করেই তাঁরা ব্যবস্থা দিতেন। এঁদের চিকিৎসা ও বাবার অক্লান্ত সেবা সত্ত্বেও মা সুস্থ হলেন না।'[৭৩] ইন্দিরা দেবী অবশ্য প্রায় অভিযোগের সুরে লিখেছেন : 'কাকিমার শেষ অসুখে এক হোমিয়োপ্যাথি ধরে রইলেন ও কোনো চিকিৎসা বদল করলেন না বলে কোনো কোনো বিশিষ্ট বন্ধুকে আক্ষেপ করতে শুনেছি।'[৭৪]

মৃণালিনী দেবীর শেষ শয্যা পাতা হয়েছিল রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব লালবাড়ির দোতলায়। দোতলার লম্বা ঘরটিকে আলমারির পার্টিশন দিয়ে তিনটি ঘরে পরিণত করা হয়েছিল। মীরা দেবী লিখেছেন : 'একটা ঘরে আমরা থাকতুম। সব চেয়ে শেষের পশ্চিমের ঘরে মাকে রাখা হল নিরিবিলি হবে বলে। আমাদের বাড়ির

সামনে গগনদাদাদের বিরাট অট্টালিকা থাকাতে নতুন বাড়ির কোনো ঘরে হাওয়া খেলত না। সে বাড়িতে তখন বৈদ্যুতিক পাখা ছিল না, তাই একমাত্র তালপাতার পাখা দিয়ে বাতাস করা ছাড়া গতি ছিল না। ঐ বাতাসহীন ঘরে অসুস্থ শরীরে মা না জানি কত কষ্ট পেয়েছেন। কিন্তু বড়োবউঠান হেমলতা দেবীর কাছে শুনেছি যে বাবা মার পাশে বসে সারা রাত তালপাখা নিয়ে বাতাস করতেন।'[৭৫]

কিন্তু তালপাখা নিয়ে বাতাস করা ছাড়া, কলকাতায় থাকলেই রবীন্দ্রনাথ যা করতেন, বিভিন্ন জায়গায় তাঁর সেই ভ্রাম্যমানতাও অব্যাহত ছিল। কার্তিক মাসের ৫, ৯, ১০, ১১, ১৭ তারিখে কর্নওয়ালিশ স্ট্রীট, ৪ বউবাজার, ৮ সুকিয়া স্ট্রীট, ১৩ বাদুড়বাগান ও পার্শিবাগান, ১৬ রায়বাগান ও 'গোলতলা', ১৯ সুকিয়া স্ট্রীট ও রাজাবাগান, ২০ পার্শিবাগান ও 'যোড়াপুকুর', ২১, ২২, ২৩ বিডন স্ট্রীট, ২৬ ও ২৭ তাঁর 'গোলতলা' যাওয়ার হিসাব পাওয়া যায়। পার্শিবাগানে তিনি গিয়েছিলেন অবশ্যই জগদীশচন্দ্র বসুর সঙ্গে দেখা করতে, কর্নওয়ালিশ স্ট্রীট ও বিডন স্ট্রীটে থাকতেন যথাক্রমে ডাঃ প্রতাপচন্দ্র ও ডাঃ জিতেন্দ্রলাল মজুমদার এবং ডাঃ ডি. এন· রায়—এই দুই জায়গায় চিকিৎসা বিষয়ে পরামর্শের জন্যও গিয়ে থাকতে পারেন, কিন্তু বাকি জায়গাগুলিতে যাতায়াতের কারণ উদ্ধার করা শক্ত। ২৯ ও ৩০ কার্তিক [রবি 16 Nov] এবং ১, ২ ও ৩ অগ্র° স্পষ্টতই 'ডাক্তার বাটী বিডন স্ট্রীট যাতায়াতের' হিসাব রয়েছে—৩ অগ্র° [বুধ 19 Nov] একই উদ্দেশ্যে 'জা[মা]ইবাবু' ও 'সুপ্রকাশবাবুর' যাতায়াতের হিসাব পাওয়া যায়। বোঝা যায়, কার্তিক মাসের শেষ দুটি দিন থেকে মৃণালিনী দেবীর শারীরিক অবস্থা খুবই সংকটজনক হয়ে পড়েছে। মনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়কে রবীন্দ্রনাথ সেকথা লিখেছেন এই সময়ে লেখা একটি তারিখহীন পত্রে : 'এখানে আমার উদ্বেগের কারণ দূর হয় নাই। যদিও স্ত্রীর অন্যান্য উপসর্গ শান্ত হইয়াছে তথাপি দুর্ব্বলতা এত অতিমাত্রায় বাড়িয়াছে যে আশঙ্কার কারণ হইয়া দাঁড়াইয়াছে।'[৭৬] এর মধ্যে ২৭ কার্তিক [বৃহ 13 Nov] সুবোধচন্দ্র মজুমদারের সঙ্গে শমীন্দ্রনাথকে শান্তিনিকেতনে পাঠিয়ে দিয়ে তিনি স্ত্রীর মনঃপীড়ার কারণ হয়েছেন। হেমলতা দেবী লিখেছেন : আচ্ছন্ন অবস্থায় কবি-পত্নী অনেক বার বলতেন, "আমাকে বলেন ঘুমাও ঘুমাও, শমীকে রেখে এলেন বিদ্যালয়ে, আমি কি ঘুমাতে পারি তাকে ছেড়ে! বোঝেন না সেটা!"[৭৭]

হেমলতা দেবী আরও লিখেছেন : 'প্রায় দু-মাস তিনি শয্যাশায়ী ছিলেন; ভাড়া-করা নার্সদের হাতে পত্নীর শুশ্রুষার ভার কবি এক দিনের জন্যও দেন নাই।····ভাড়াটে শুশ্রূষাকারিণীর প্রচলন তখন ঘরে ঘরে; কবির ঘরে তার ব্যত্যয় ঘটল প্রথম।'[৭৮] এই উক্তির কিঞ্চিৎ সংশোধন আবশ্যক। পরবর্তীকালে মীরা দেবী বা প্রতিমা দেবীর অসুস্থতার সময়ে সেবাশুশ্রুষার ভার যেমন সম্পূর্ণত নার্সদের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছিল, তেমন না হলেও, মৃণালিনী দেবীর শেষ অবস্থাতে নার্স ও দাইকে আহ্বান জানানো হয়েছে :'গোলাপ মহিনী সরকার (নর্স) দং উহার ৩০ কার্ত্তিকের ফি ২্', 'দাই আসার গাড়ী ভাড়া ৩০ কার্ত্তিকের ১্' ও মৃণালিনী দেবীর চিকিৎসার ব্যয়ের মোট হিসাবে 'নর্সের ফি ২৬্' থেকে বোঝা যায় তাঁর শেষ দিনগুলিতে 'ভাড়াটে শুশ্রূষাকারিণী'র প্রয়োজন হয়েছিল।

মায়ের অবস্থা আশঙ্কাজনক হয়ে ওঠায় পুত্রদের শান্তিনিকেতন থেকে নিয়ে আসা হল ১ অগ্র° [সোম 17 Nov]। দিনে দিনে মৃণালিনী দেবীর শারীরিক অবস্থার অবনতি ঘটতে লাগল। রথীন্দ্রনাথ লিখেছেন :

মৃত্যুর আগের দিন [৬ অগ্র° শনি 22 Nov] বাবা আমাকে মায়ের ঘরে নিয়ে গিয়ে শয্যাপার্শ্বে তাঁর কাছে বসতে বললেন। তখন তাঁর বাক্‌রোধ হয়েছে। আমাকে দেখে চোখ দিয়ে কেবল নীরবে অশ্রুধারা বইতে লাগল। মায়ের সঙ্গে আমার সেই শেষ দেখা। আমাদের ভাইবোনদের সকলকে

সে রাত্রে বাবা পুরানো বাড়ির তেতলায় শুতে পাঠিয়ে দিলেন। একটি অনির্দিষ্ট আশঙ্কার মধ্যে আমাদের সারা রাত জেগে কাটল। ভোরবেলায় অন্ধকার থাকতে বারান্দায় গিয়ে লালবাড়ির দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইলুম। সমস্ত বাড়িটা অন্ধকারে ঢাকা, নিস্তব্ধ, নিঝুম; কোনো সাড়াশব্দ নেই সেখানে। আমরা তখনি বুঝতে পারলুম আমাদের মা আর নেই, তাঁকে নিয়ে যাওয়া হয়েছে।[৮০]

—আশ্চর্য লাগে, শেষযাত্রায় জ্যেষ্ঠপুত্র রথীন্দ্রনাথকেও নিয়ে যাওয়া হয়নি। পুত্রের হাতের আগুন মাতা পাননি, ঘটনাচক্রে পিতাও তা থেকে বঞ্চিত হয়েছিলেন!

মৃণালিনী দেবীর বিবাহ হয়েছিল দশ বছর বয়সে ২৪ অগ্র° ১২৯০ [রবি 9 Dec 1883] তারিখে, সতেরো-দিন-কম উনিশ বছর দাম্পত্যজীবন যাপনের পর মাত্র ঊনত্রিশ বৎসর বয়সে ৭ অগ্র° ১৩০৯ [রবি 29 Nov 1902] রাত্রে তাঁর জীবনাবসান ঘটল। মাত্র ২৮ টাকা ২ পয়সা ব্যয়ে তাঁর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া হয়েছে সাদাসিধে ভাবে।

তাঁর মৃত্যুর পরের কাহিনী লিখেছেন হেমলতা দেবী:

রাত্রে আমার স্বামী এসে বললেন, "খুড়ীর মৃত্যু হয়েছে, কাকামশাই একলা ছাদে চলে গেছেন, বারণ করেছেন কাউকে কাছে যেতে।' প্রায় সারারাত কবি ছাদে পায়চারি ক'রে কাটিয়েছেন শোনা গেল। কবির পিতা মহর্ষিদেব তখন জীবিত। পুত্রের পত্নী-বিয়োগের সংবাদে তিনি বলেন, "রবির জন্য আমি চিন্তা করি না, লেখাপড়া নিজের রচনা নিয়ে সে দিন কাটাতে পারবে। ছোট ছেলেমেয়েগুলির জন্যই দুঃখ হয়।"[৮০]

পরের দিন রবীন্দ্রনাথকে সমবেদনা জানাতে স্বভাবতই অনেকে এসেছেন। রথীন্দ্রনাথ লিখেছেন : "বাবা সকলের সঙ্গেই শান্তভাবে অসম্ভব ধৈর্যের সঙ্গে কথা বলে গেলেন, কিন্তু কী কষ্টে যে আত্মসংবরণ করে তিনি ছিলেন তা আমরা বুঝতে পারছিলুম।….যখন সকলে চলে গেল, বাবা আমাকে ডেকে নিয়ে মায়ের সর্বদা-ব্যবহৃত চটিজুতো জোড়াটি আমার হাতে দিয়ে কেবলমাত্র বললেন, 'এটা তোর কাছে রেখে দিস, তোকে দিলুম।' এই দুটি কথা বলেই নীরবে তাঁর ঘরে চলে গেলেন।"[৮১]

এই ব্যবহার রবীন্দ্রনাথের স্বভাববৈশিষ্ট্যের সঙ্গে সংগতিপূর্ণ। যে-কোনো ধরনের ব্যক্তিগত আবেগ প্রকাশে তাঁর কুণ্ঠা অপরিসীম, তা সুখ বা দুঃখ যাই হোক না কেন—তাঁর কবিতাও এর ব্যতিক্রম নয়। জীবনে মৃত্যুশোকের দুঃখ তিনি এত বেশি পেয়েছেন যে এই স্বভাব ছাড়া কর্মক্ষম থাকা তাঁর পক্ষে কঠিন হত। 'সুখং বা যদি বা দুঃখং প্রিয়ং বা যদি বাপ্রিয়ম্।/ প্রাপ্তং প্রাপ্তমুপাসীত হৃদয়েনাপরাজিতা' ['সুখ বা হোক্ দুখ বা হোক্/প্রিয় বা অপ্রিয়/অপরাজিত হৃদয়ে সব/বরণ করি নিয়ো'—স্মৃতি। ৪৪] মহাভারতের শান্তিপর্বের এই প্রিয় শ্লোকটি তিনি অন্তত ছ'টি পত্রে উদ্ধৃত করেছেন।[৮৩] প্রিয়নাথ সেনকে লেখা একটি পত্রে তিনি শ্লোকটি উদ্ধৃত করে লিখেছিলেন : "এই মন্ত্রটি আমি সর্ব্বদাই মনে রাখিতে চেষ্টা করি—কোনও ফল পাই নাই তাহা বলিতে পারি না। সংসারে যখন সুখ পাই তখন দুঃখের আবির্ভাবে বিস্মিত হইবার কোন কারণ নাই। যত রকম দুঃখ ও অপ্রিয় সংসারে সম্ভবপর আমি সমস্তই মাঝে মাঝে মনে মনে প্রত্যাশা করিয়া মনকে সকল অবস্থার জন্য সম্পূর্ণ প্রস্তুত রাখিতে চেষ্টা করি।'[৮৩] এটি নিছক কথার-কথা ছিল না। ১৮ অগ্র° [বৃহ 4 Dec] তিনি ব্রজেন্দ্রকিশোর দেবমাণিক্যকে লিখেছেন : 'ঈশ্বর আমাকে যে শোক দিয়াছেন সেই শোককে তিনি নিষ্ফল করিবেন না—তিনি আমাকে এই শোকের দ্বার দিয়া মঙ্গলের পথে উত্তীর্ণ করিয়া দিবেন'[৮৪]—প্রায় একই কথা লিখেছেন মোহিতচন্দ্র সেনকে : 'ঈশ্বর আমার শোককে নিষ্ফল করিবেন না। তিনি আমার পরম ক্ষতিকেও সার্থক করিবেন তাহা আমার হৃদয়ের মধ্যে অনুভব করিয়াছি। তিনি আমাকে আমার শিক্ষালয়ের এক শ্রেণী হইতে আর এক শ্রেণীতে উত্তীর্ণ করিলেন।'[৮৫] বর্তমান বৎসরে নববর্ষের দিনে মৃত্যুর আভাস পেয়ে মৃত্যুর

চেহারা সম্মুখে রেখে চলার জন্য প্রস্তুত থাকার কথা তিনি স্ত্রীকে জানিয়েছিলেন। ভাগ্যের পরিহাসে স্ত্রীর মৃত্যু দিয়ে সেই প্রস্তুতির প্রথম পর্ব শেষ হল। ঘরণীকে কর্মসঙ্গিনী রূপে পেতে শুরু করেছিলেন তিনি, সূচনাতেই সমাপ্তির রেখা টানা হয়ে গেল। পরবর্তীকালে তাঁর মুখে স্ত্রীর কথা বেশি শোনা যায়নি, কিন্তু যখনই প্রসঙ্গ এসেছে এই আক্ষেপ ধ্বনিত হয়েছে বারবার। এই কারণে বিদ্যালয়ের মঙ্গলের সঙ্গে স্ত্রীর স্মৃতি যুক্ত করে দেবার অভিপ্রায়ে ১৩ অগ্র° [শনি 29 Nov] তিনি হীরেন্দ্রনাথ দত্তকে লিখেছেন :

আপনার সহিত আমার অনেকটা পরিচয় হইয়াছে বলিয়া বিশ্বাস জন্মিয়াছে। সেইজন্য সঙ্কোচ পরিহারপূর্বক আপনার কাছে একটি ভিক্ষা লইয়া উপস্থিত হইলাম। শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্যাশ্রমে কয়েকটি দরিদ্র বালককে বিনা বেতনে পড়াইয়া থাকি। তাহাদের ব্যয়ভার আমরা বান্ধবদের মধ্যে পরস্পর ভাগ করিয়া লইবার জন্য উদ্যত হইয়াছি। একটি বালকের ভার আপনি যদি গ্রহণ করেন তবে উপকৃত হইব। হিসাব করিয়া দেখা গেছে প্রত্যেক বালকের খাইখরচের জন্য মাসে প্রায় ১৫ টাকা অর্থাৎ বৎসরে ১৮০ টাকা লাগে। প্রতি বর্ষে অগ্রহায়ণ মাসে এই ১৮০ টাকা বার্ষিক দান পাইবার জন্য আমি সুহৃদগণের দ্বারে সমাগত। আপনাকে বলিতে সঙ্কোচ করিব না আমার পরলোকগত পত্নীর কল্যাণকামনার সঙ্গে আমি এই ভিক্ষাব্রত জড়িত করিয়াছি।[৮৬]

অনুমান করা যেতে পারে, এইরূপ আরও চিঠি তিনি অন্যান্য বন্ধুবান্ধবকে প্রেরণ করেছিলেন। ভিক্ষাব্রত কতটুকু সফল হয়েছিল বলা শক্ত; কারণ কয়েকদিন পরে ২২ অগ্র° [সোম 8 Dec] তিনি একই ব্যক্তিকে লিখেছেন : 'আমিআপনাকে যে পত্র পাঠাইয়াছিলাম যদি তাহার প্রয়োজন না থাকে তবে এই লোক মারফৎ ফেরৎ পাঠাইবেন।' পত্রটি অবশ্য প্রাপকের কাছে থেকে গিয়েছিল।

মায়ের সংকটজনক শারীরিক অবস্থার কথা জেনে মাধুরীলতা আবার কলকাতায় চলে আসেন। ভিন্নগোত্রীয়া বিবাহিতা কন্যা হবিষ্য ও চতুর্থী শ্রাদ্ধ করেন—ক্যাশবহিতে এর খরচ লেখা হয় ২২ ল ৩। জ্যেষ্ঠপুত্র হিসেবে রথীন্দ্রনাথ হবিষ্য ও শ্রাদ্ধ করেন, তার মোট ব্যয় ১৬১ ল ৯—শ্রাদ্ধ হয় সম্ভবত ১৬ অগ্র° [মঙ্গল 2 Dec]। এই অনুষ্ঠানেও সমারোহের অভাব ছিল।

স্ত্রীর মৃত্যুর পর রবীন্দ্রনাথকে প্রথম বাইরে যেতে দেখা যায় ১১ অগ্র° [বৃহ 27 Nov]—এই দিন তিনি পার্শিবাগানে জগদীশচন্দ্রের বাড়ি যান। বন্ধুর সহৃদয়তা তাঁর দরকার ছিল, তাই আবার সেখানে যান ১৯ ও ২১ অগ্র°। এছাড়া ১৫ই মানিকতলা, ১৬ই চীনাবাজার, ১৭ই ও ২০শে বালিগঞ্জ, ১৮ই সুকিয়া স্ট্রীট ও গোলদিঘি যাতায়াতের হিসাব ক্যাশবহিতে পাওয়া যায়। ২১ অগ্র° [রবি 7 Dec] দীনেশচন্দ্র সেন এসেছিলেন তাঁর সঙ্গে দেখা করতে, তাঁর ফিরে যাওয়ার খরচ দেওয়া হয় রবীন্দ্রনাথের ক্যাশ থেকে।

স্ত্রীর মৃত্যুতে রবীন্দ্রনাথের একটি উদ্বেগের অবসান হলেও বিদ্যালয় সম্পর্কে তাঁর উদ্বেগ অব্যাহত ছিল। মনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে অধ্যক্ষ-সমিতি গড়ে ও কুঞ্জলাল ঘোষকে কার্য-সম্পাদক নিযুক্ত করে তিনি ভেবেছিলেন বিদ্যালয় এবার সুপরিচালিত হবে। কিন্তু সংকট দেখা দিল অন্য দিক দিয়ে। রবীন্দ্রনাথ চেয়েছিলেন বিদ্যালয়কে ভিতর থেকে জাগিয়ে তুলতে, যাঁরা কর্মপরিচালনার দায়িত্বে ছিলেন তাঁরা বাইরের জিনিসের উপর গুরুত্ব দিলেন বেশি। রবীন্দ্রনাথ নির্দেশ দিয়েছিলেন : 'ছাত্রগণ অধ্যাপকদিগকে প্রত্যহ প্রণাম করিবে' —বর্ণভেদের সংস্কারে বিরোধ শুরু হল এইখান থেকেই। ছাত্রেরা আপত্তি তুলেছিল কিনা জানা যায় না, কিন্তু ব্রাহ্মণ ছাত্রদের পক্ষে অব্রাহ্মণ অধ্যাপক কুঞ্জলাল ঘোষকে প্রণাম করা সংগত কিনা এই সংশয় জানিয়ে মনোরঞ্জনবাবু রবীন্দ্রনাথকে পত্র লেখেন। ছাত্রদের আহারের সময়ে 'ব্রাহ্মণ পরিবেশক না হইলে আপত্তিজনক হইতে পারে' এ-সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ সচেতন ছিলেন, কিন্তু অধ্যাপককে ছাত্রদের প্রণাম করা

সংকটের বিষয় হতে পারে একথা তিনি ভাবতে পারেননি। অধ্যাপকদের 'কোনো অনুশাসনের কৃত্রিম শক্তির দ্বারা····পুণ্যকর্মে বাহ্যিকভাবে প্রবৃত্ত' করার ইচ্ছা তাঁর ছিল না, তাই এই অবস্থায় তিনি আপোষের পথ নিয়ে ১৯ অগ্র° [শুক্র 5 Dec] লিখলেন :

প্রণাম সম্বন্ধে আপনার মনে যে দ্বিধা উপস্থিত হইয়াছে তাহা উড়াইয়া দিবার নহে। যাহা হিন্দু সমাজ বিরোধী তাহাকে এ বিদ্যালয়ে স্থান দেওয়া চলিবেনা। সংহিতায় যেরূপ উপদেশ আছে ছাত্ররা তদনুসারে ব্রাহ্মণ অধ্যাপকদিগকে পাদস্পর্শপূর্ব্বক প্রণাম ও অন্যান্য অধ্যাপকদিগকে নমস্কার করিবে এই নিয়ম প্রচলিত করাই বিধেয়। সর্ব্বাপেক্ষা ভাল হয় যদি কুঞ্জবাবুকে নিয়মিত অধ্যাপনার কার্য্য হইতে নিষ্কৃতি দেওয়া যায়। তিনি যদি আহারাদির তত্ত্বাবধানেই বিশেষরূপে নিযুক্ত থাকেন তবে ছাত্রদের সহিত তাঁহার গুরুশিষ্য সম্বন্ধ থাকে না। ব্রাহ্মণেতর ছাত্রেরা কি অব্রাহ্মণ গুরুর পাদস্পর্শ করিতে পারে না?[৮৭]

এই পত্রেই তিনি সোমবার [২২ অগ্র° : 8 Dec] প্রাতের মেলট্রেনে বোলপুর যাওয়ার কথা লিখেছেন। সেইদিন পুত্র-কন্যা-জামাতা প্রভৃতিকে নিয়ে তিনি শান্তিনিকেতনে পৌঁছন। এবারে তাঁর পুত্রকন্যার দায়িত্ব নিয়ে এলেন মৃণালিনী দেবীর পিসিমার সপত্নী রাজলক্ষ্মী দেবী। তিনি এর আগে থাকতেই এই পরিবার-ভুক্ত হয়েছিলেন। মীরা দেবী শান্তিনিকেতনে মায়ের স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে লিখেছেন : 'সরু এক ফালি বারান্দায় একটা তোলা উনুন নিয়ে মা বসে রান্না করছেন আর তাঁর পিসিমা রাজলক্ষ্মী-দিদিমা তরকারি কুটতে কুটতে গল্প করছেন।'[৮৮] আর-একটি স্মৃতি মনে পড়েছে তাঁর : 'শান্তিনিকেতন-বাড়ির দোতলার গাড়ি-বারান্দার ছাতে একটা টেবিল ল্যাম্প জ্বলছে, মার হাতে একটা ইংরেজি নভেল, তার থেকে বাংলায় অনুবাদ করে দিদিমাকে পড়ে শোনাচ্ছেন।' হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন :

মৃণালিনী দেবী যখন শয্যাগত, সেই সময়ে তাঁহার পিসীমার সপত্নী রাজলক্ষ্মী দেবী তাঁহাকে দেখিতে কলিকাতায় আসিয়াছিলেন। সপত্নী হইলেও মৃণালিনী দেবীর প্রতি আপন পিসীমার মতই তাঁহার অকৃত্রিম স্নেহ ছিল। সেই সময় ভাইঝি তাঁহাকে বলিয়াছিলেন—"পিসীমা, আমি শয্যাগত, ছেলেমেয়েদের বড় কষ্ট হচ্ছে। তাদের দেখাশুনা করার কেউ নেই, তাদের ভার নিলে নিশ্চিন্ত হইতে পারি।" পিসীমা ভাইঝির কথা রক্ষা করিয়াছিলেন, সেই দিন হইতেই তিনি সংসারে থাকিয়া শিশুদের রক্ষণাবেক্ষণের ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন। শান্তিনিকেতনে কবির নূতন বাড়ীতে সংসারের ভার লইয়া তিনি শিশুদের প্রতিপালন করিয়াছেন দেখিয়াছি। মীরা শমী তখন শিশু।[৮৯]

বস্তুত কলকাতাতেই তিনি রবীন্দ্রনাথের সংসারের ভার গ্রহণ করেছিলেন; ২২ কার্তিক [শুক্র 7 Nov]-এর হিসাব : 'সংসার খরচ খাতা ব° শ্রীমতী পিসিমাতা ঠাকুরাণী দং কার্ত্তিক মাসের খরচ জন্য ৫০'। পরে এইভাবে শান্তিনিকেতনেও টাকা পাঠানো হয়েছে।

শান্তিনিকেতন অতিথিশালায় রবীন্দ্রনাথের সপরিবারে বাস করা নিয়ে দ্বিপেন্দ্রনাথের অসন্তুষ্টির কথা রবীন্দ্রনাথ বসন্তকুমার গুপ্তকে লেখা একটি পত্রে জানিয়েছিলেন।[৯০] এই কারণে তিনি ট্রাস্টডীড-ভুক্ত জমির বাইরে দক্ষিণ-পূর্ব প্রান্তে খড়ের চাল দিয়ে একটি বাড়ি তৈরি করান—'নতুন বাড়ি' নামে অভিহিত এই বাড়িটি এখনও একই চেহারায় বর্তমান। রাজলক্ষ্মী দেবী এইখানেই সংসার পাতেন। রবীন্দ্রনাথ অবশ্য এই বাড়িতে থাকেননি—আদি ব্রহ্মবিদ্যালয় বাড়ির (বর্তমান পাঠভবন অফিস] 'পূর্ব কুটীরে কবির লেখাপড়ার সাজসরঞ্জাম থাকিত। লেখাপড়ার কাজ এইখানে চলিত, থাকিতেন তিনি অতিথিশালার দ্বিতলে।'[৯১]

কাদম্বরী দেবীর মৃত্যুশোকে তরুণ রবীন্দ্রনাথ কী গভীরভাবে আলোড়িত হয়েছিলেন, জীবনস্মৃতি-তে তিনি নিজেই তার সাক্ষ্য রেখে গিয়েছেন। কিন্তু মৃত্যুকে অনন্তের পটভূমিকায় দেখে সান্ত্বনার উৎসটি নিজের মধ্যেই নিযুক্ত করার প্রয়াসের শুরু তখন থেকেই : 'যাহাকে ধরিয়াছিলাম তাহাকে ছাড়িতেই হইল, এইটাকে ক্ষতির

দিক দিয়া দেখিয়া যেমন বেদনা পাইলাম তেমনি সেইক্ষণেই ইহাকে মুক্তির দিক দিয়া দেখিয়া একটা উদার শান্তি বোধ করিলাম। সংসারের বিশ্বব্যাপী অতি বিপুল ভার জীবনমৃত্যুর হরণপূরণে আপনাকে আপনি সহজেই নিয়মিত করিয়া চারিদিকে কেবলই প্রবাহিত হইয়া চলিয়াছে, সে-ভার বদ্ধ হইয়া কাহাকেও কোনোখানে চাপিয়া রাখিয়া দিবে না—একেশ্বর জীবনের দৌরাত্ম্য কাহাকেও বহন করিতে হইবে না—এই কথাটা একটা আশ্চর্য নূতন সত্যের মতো আমি সেদিন যেন প্রথম উপলব্ধি করিয়াছিলাম।'[৯২] তারপর অভিজ্ঞা দেবী, বলেন্দ্রনাথ, নীতীন্দ্রনাথের মতো অত্যন্ত প্রিয়জনের মৃত্যুর অভিঘাতে এই উপলব্ধি ক্রমশই গভীরতর হয়েছে। সেইজন্য কাদম্বরী দেবীর মৃত্যুতে সাময়িকভাবে হলেও তাঁর মধ্যে যে 'একটা সৃষ্টিছাড়া রকমের মনের ভাব ও বাহিরের আচরণ' দেখা দিয়েছিল, পরবর্তী মৃত্যুগুলিতে সেরূপ কিছু দেখা যায়নি, মৃণালিনী দেবীর মৃত্যুও তার ব্যতিক্রম নয়। নাবালক সন্তানদের লালনপালনের বাস্তব সমস্যার ভার ও আনুষঙ্গিক চিন্তার পীড়ন এরপর তাঁকে একাই বহন করতে হয়েছে, কিন্তু তাঁর স্বাভাবিক জীবনযাত্রার বৈলক্ষণ্য ঘটেছে সামান্যই। এরই মধ্যে রচিত হল 'স্মরণ' কবিতাগুচ্ছ—তাঁর পত্নীবিয়োগশোকের সুস্পষ্ট বহিঃপ্রকাশ। স্মরণ'-এ সাতাশটি কবিতা আছে—পাণ্ডুলিপির সহায়তায় তার মধ্যে উনিশটির রচনা-তারিখ নির্ণয় করা সম্ভব হয়েছে। বাকি যে আটটি রচনার তারিখ নেই, তার মধ্যে ছ'টি মুদ্রিত হয় অগ্র°-সংখ্যা বঙ্গদর্শন-এ; বেঙ্গল লাইব্রেরির তালিকানুসারে সংখ্যাটি প্রকাশিত হয় 13 Dec [শনি ২৭ অগ্র°]—সুতরাং কবিতাগুলি এর আগেই ২২ অগ্র° [সোম ৪ Dec] শান্তিনিকেতন যাত্রার আগে কলকাতায় লেখা। কবিতাগুলি হল : (১) 'প্রতীক্ষা' ['প্রেম এসেছিল, চলে গেল সে যে খুলি দ্বার'], (২) 'শেষ কথা' ['তখন নিশীথ রাত্রি; গেলে ঘর হতে'], (৩) 'প্রার্থনা' ['আমার ঘরেতে আর নাই সে যে নাই'], (৪) 'আহ্বান' ['ঘরে যবে ছিলে মোরে ডেকেছিল যবে'], (৫) 'পরিচয়' ['যত দিন কাছে ছিলে বলল কী উপায়ে'] এবং (৬) 'মিলন' ['মিলন সম্পূর্ণ আজি হল তোমা-সনে']। ঘটনার অব্যবহিত পরে রচিত বলে কবিতাগুলির মধ্যে স্ত্রীবিয়োগজনিত বেদনার অভিঘাত অনেক প্রত্যক্ষ। রথীন্দ্রনাথের স্মৃতিকথা থেকে আমরা জানি, মৃত্যুর আগের দিনই মৃণালিনী দেবীর বাক্‌রোধ হয়েছিল—তাঁর নির্বাক জীবনাবসানের পর রবীন্দ্রনাথ সারারাত ছাদে পায়চারি করে কাটান এই তথ্য জানিয়েছেন হেমলতা দেবী। এরই প্রত্যক্ষ রূপায়ণ দেখা যায় 'শেষ কথা' কবিতায় :

তখন নিশীথরাত্রি; গেলে ঘর হতে
যে পথে চল নি কভু সে অজানা পথে।
যাবার বেলায় কোনো বলিলে না কথা,
লইয়া গেলে না কারো বিদায়বারতা।
সুপ্তিমগ্ন বিশ্ব-মাঝে বাহিরিলে একা—
অন্ধকারে খুঁজিলাম, না পেলাম দেখা।
মঙ্গলমুরতি সেই চিরপরিচিত
অগণ্য তারার মাঝে কোথা অন্তর্হিত!

—এমন-কি 'বিশ বৎসরের তব সুখদুঃখভার' প্রায় আঙ্কিক যাথার্থ্যে উপস্থাপিত হয়েছে কবিতাটিতে।

এর সঙ্গে উল্লেখ্য শান্তিনিকেতনে ২ পৌষে [বুধ 17 Dec] রচিত স্মরণ গ্রন্থের ১৪-সংখ্যক কবিতাটি :

দেখিলাম খানকয় পুরাতন চিঠি—
স্নেহমুগ্ধ জীবনের চিহ্ন দু-চারিটি
স্মৃতির খেলেনা-ক'টি বহু যত্নভরে

গোপনে সঞ্চয় করি রেখেছিলে ঘরে।

—এইগুলি হল চিঠিপত্র প্রথম খণ্ডে [১৩৪৯] সংকলিত স্ত্রীকে লেখা রবীন্দ্রনাথের ৩৬টি চিঠি, যা মৃণালিনী দেবী সযত্নে রক্ষা করেছিলেন। চিঠির ভিতর থেকেই ইঙ্গিত মেলে এই সংখ্যা আরও বিপুল ছিল, যে-কোনো কারণেই হোক সেগুলি রক্ষিত হয়নি। আর পত্রে মৃণালিনী দেবীর স্বামীসম্ভাষণের একটিও আমাদের হাতে পৌঁছয়নি, কন্যা মাধুরীলতার পত্রের পাদপূরক দুটি মাত্র নিদর্শন মানুষী অবহেলার উপর জয়ী হয়েছে—তার মধ্যে একটি তো একান্তই বৈষয়িক।

আমরা আগেই বলেছি, অগ্রহায়ণ-সংখ্যা বঙ্গদর্শন প্রকাশিত হয় মাসের শেষ দিকে 13 Dec [শনি ২৭ অগ্র°]। স্ত্রীবিয়োগে রচিত ছ'টি কবিতা সমেত এই সংখ্যায় রবীন্দ্রনাথের মোট রচনা দশটি :

৪০১-০২ 'মুক্তপাখীর প্রতি' দ্র উৎসর্গ ১০।৪৬-৪৭ [৩১]

৪০৩-০৬ 'পরনিন্দা' দ্র বিচিত্র প্রবন্ধ ৫।৪৬৯-৭২

৪৩৩ 'দুর্ভাগা' দ্র উৎসর্গ ১০।৬৪-৬৫ [৪১]

৪৪০ 'প্রতীক্ষা' দ্র স্মরণ ৮।৮২-৮৩ [৩]

৪৪৪-৪৫ 'পথিক' দ্র উৎসর্গ ১০।৬৫-৬৬ [৪২]

৪৪৯-৫০ 'শেষ কথা' দ্র স্মরণ ৮।৮৩-৮৪ [৪]

৪৫৪ 'প্রার্থনা' দ্র ঐ ৮।৮৪ [৫]

৪৫৫ 'আহ্বান' দ্র ঐ ৮।৮৫ [৬]

৪৫৫-৫৬ 'পরিচয়' দ্র ঐ ৮।৮৫-৮৬ [৭]

৪৫৬ 'মিলন' দ্র ঐ ৮।৮৬ [৮]

'স্মরণ' কবিতাগুচ্ছের উল্লেখ আমরা আগেই করেছি, এগুলি ২২ অগ্রহায়ণের [সোম ৪ Dec] পূর্বে রচিত। উৎসর্গ কাব্যগ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত উক্ত তিনটি কবিতা [এবং 'নারী', 'বিশ্বদোল' ও 'যাত্রিণী'] সম্পর্কে রবীন্দ্রজীবনী-কার লিখেছেন :"পাঠকগণকে এই কবিতা-কয়টিকে 'স্মরণ' সনেটগুচ্ছের রসদৃষ্টি হইতে বিচার করিতে বলিতেছি; তাঁহারা দেখিবেন যে এগুলি সম্পূর্ণভাবে ঐ কবিতাগুচ্ছেরই সুরে বাঁধা, কিন্তু বিচিত্র ছন্দের মধ্যে লীলায়িত হইতে পাইয়া নূতন রূপ লইয়াছে।"[৯৩] আমরা অবশ্য এ-বিষয়ে ভিন্নমত পোষণ করি। ভাবের দিক থেকে শ্রেণীবিন্যাস করে কাব্যগ্রন্থ প্রকাশের আয়োজনে রবীন্দ্রনাথ ইতিমধ্যেই ব্রতী হয়েছিলেন ও প্রতিটি বিভাগের জন্য নূতন প্রবেশক-কবিতা লিখছিলেন, একথা আমরা পূর্বেই বলেছি। এর আগে এরূপ কয়েকটি কবিতা আশ্বিন ও কার্তিক সংখ্যা বঙ্গদর্শন ও সমালোচনী-তে মুদ্রিত হয়েছিল। বর্তমান সংখ্যায় মুদ্রিত কেবল 'দুর্ভাগা' ['পথের পথিক করেছ আমায়'] কবিতাটি 'হতভাগ্য' [কাব্যগ্রন্থ, তৃতীয় ভাগ] বিভাগের প্রবেশক হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে বটে, কিন্তু অন্য কবিতা দুটিও একই উদ্দেশ্যে বা অনুপ্রেরণায় রচিত বলেই মনে হয়। এদের মধ্যে 'মুক্তপাখীর প্রতি' ['আজিকে গহন কালিমা লেগেছে গগনে, ওগো'] 'রূপক' বিভাগে কাব্যগ্রন্থ, পঞ্চম ভাগ] ও 'পথিক' ['আলো নাই, দিন শেষ হল, ওরে'] 'হতভাগ্য' বিভাগে সংকলিত হয়।

'পরনিন্দা' 'বাজে কথা'রই মতো লঘু রচনা এবং সম্ভবত একই সময়ে রচিত। এ যেন দূরবীণের উলটো দিক দিয়ে দেখা। সমাজে নিন্দুক ব্যক্তি সর্বত্রই নিন্দনীয়, কিন্তু রবীন্দ্রনাথ এই সুপ্রাচীন মানববৃত্তির মাহাত্ম্য কীর্তন করেছেন। পৃথিবী-বেষ্টনকারী লবণসমুদ্রের মতো পরনিন্দা সমাজকে পচন বা বিকার থেকে রক্ষা করে, অভাবিত যুক্তিসমন্বয়ে রবীন্দ্রনাথ এই প্রবন্ধে তা প্রমাণ করে ছেড়েছেন। এই সময়ের অন্যান্য প্রবন্ধের মতো গ্রন্থে সংকলনের সময়ে তিনি বর্তমান রচনাটির কিছু অংশ পরিত্যাগ ও পরিবর্তন করেন। এইরূপ একটি মূল অংশ উদ্ধৃত করি : 'একটা ভাল কবিতা লিখিলাম, তাহার নিন্দুক সমালোচক কেহ নাই, ভাল কাব্যের পক্ষে এমন মর্মান্তিক অনাদর কি হইতে পারে'—পাঠক যদি পরিবর্তনগুলি মিলিয়ে দেখেন, পরনিন্দার মাহাত্ম্য সহজেই বুঝতে পারবেন!

তত্ত্ববোধিনী, অগ্র° ১৮২৪ শক [৭১২ সংখ্যা]

35-36 'The God of Upanishads'

ঔপনিষদ ব্রহ্ম গ্রন্থের ৩৭শ ও ৩৮শ অনুচ্ছেদের প্রথমাংশের ['আর্য্যধর্ম্মের বিশুদ্ধ আদর্শ হইতে যাঁহারা····সর্ব্বাংশে দূর হইয়া যায়।' দ্র অ-২।২০৯-১০] ইংরেজি অনুবাদ এই সংখ্যায় প্রকাশিত হয়।

রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনে এসে ২৮ অগ্র°* [রবি 14 Dec] দীনেশচন্দ্র সেনকে একটি পত্রে লেখেন :

ঈশ্বর আমাকে যে শোক দিয়াছেন তাহা যদি নিরর্থক হয় তবে এমন বিড়ম্বনা আর কি হইতে পারে! ইহা আমি মাথা নীচু করিয়া গ্রহণ করিলাম। যিনি আপন জীবনের দ্বারা আমাকে নিয়ত সহায়বান করিয়া রাখিয়াছিলেন তিনি মৃত্যুর দ্বারাও আমার জীবনের অবশিষ্টকালকে সার্থক করিবেন। তাঁহার কল্যাণী স্মৃতি আমার সমস্ত কল্যাণ কর্ম্মের নিত্যসহায় হইয়া আমাকে বলদান করিবে।

পরের দিন থেকে স্মরণ-এর যে অবশিষ্ট কবিতাগুচ্ছ লেখা শুরু হল, তার অনেকগুলির মূল সুর এই পত্রের মধ্যে ধরা পড়েছে। অনেকদিন পরে আবার মজুমদার-পুঁথি নামক বিখ্যাত পকেট-বুক তাঁর কবিতারচনার বাহন হল, এরপর বহুদিন এটি তাঁর সঙ্গী হয়ে থেকেছে। স্মরণ-এর ১৯টি কবিতার পাণ্ডুলিপি এই খাতায় আছে। কোনো-কোনো শিরোনাম পাণ্ডুলিপিতেই রয়েছে, অন্যগুলি বঙ্গদর্শন-এ প্রকাশের সময়ে প্রদত্ত।

এই পর্বে রচিত প্রথম কবিতা ২৯ অগ্র° [সোম 15 Dec] তারিখে রচিত 'সার্থকতা' ['তুমি মোর জীবনের মাঝে' দ্র বঙ্গদর্শন, মাঘ। ৫৬৭-৬৮;স্মরণ ৮।৮৯-৯০, ১৩-সংখ্যক]; শিরোনামটি পাণ্ডুলিপিতেই আছে।

১ পৌষ [মঙ্গল 16 Dec] রচিত হল 'সম্ভোগ' ['ভালো তুমি বেসেছিলে এই শ্যাম ধরা' দ্র বঙ্গদর্শন, ফাল্গুন। ৬১২-১৩; স্মরণ ৮।১০০-০১, ২৭-সংখ্যক]; এই শিরোনামটিও পাণ্ডুলিপিতে দেওয়া। বিচিত্র পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে কবিতাটি গড়ে উঠেছে।

২ পৌষ [বুধ 17 Dec] রচিত হল দুটি কবিতা—'সঞ্চয়' ['দেখিলাম খানকয় পুরাতন চিঠি' দ্র বঙ্গদর্শন, মাঘ। ৫৬৮; স্মরণ ৮।৯০-৯১, ১৪সংখ্যক] ও 'রচনা' ['এ সংসারে একদিন নববধূবেশে' দ্র বঙ্গদর্শন, মাঘ। ৫৬৮-৬৯; স্মরণ ৮।৯১, ১৫-সংখ্যক]।

৩ পৌষের [বৃহ 18 Dec] রচনা 'সন্ধান' ['স্বল্প-আয়ু এ জীবনে যে-কয়টি আনন্দিত দিন' দ্র বঙ্গদর্শন, মাঘ। ৫৬৯; স্মরণ ৮।৯১-৯২, ১৬সংখ্যক]।

৪ পৌষে [শুক্র 19 Dec] রচিত কবিতার সংখ্যা তিনটি :

'তোমার সকল কথা বল নাই, পার নি বলিতে' দ্র বঙ্গদর্শন, মাঘ। ৫৬৫ ['কথা']; স্মরণ ৮।৮৭ [১০]
'নব পরিণয়'/'মৃত্যুর নেপথ্য হতে আরবার এলে তুমি ফিরে' দ্র বঙ্গদর্শন, মাঘ। ৫৬৬; স্মরণ ৮।৮৮ [১১]
'লক্ষ্মীসরস্বতী'/'হে লক্ষ্মী, তোমার আজি নাই অন্তঃপুর' দ্র বঙ্গদর্শন, মাঘ। ৫৬৫; স্মরণ ৮।৮৬-৮৭ [৯]
—কবিতাগুলি পাণ্ডুলিপিতে লিখিত ক্রম অনুসারে তালিকাবদ্ধ। প্রথম কবিতাটির পাণ্ডুলিপিতে নামকরণ হয়নি।

৫ পৌষ [শনি 20 Dec] রচিত হয় 'পূর্ণতা' ['আপনার মাঝে আমি করি অনুভব' দ্র বঙ্গদর্শন, মাঘ। ৫৬৬; স্মরণ ৮।৮৮-৮৯, ১২-সংখ্যক] কবিতাটি।

৬ পৌষ [রবি 21 Dec] রচিত হল 'অশোক' ['বজ্র যথা বর্ষণেরে আনে অগ্রসরি' দ্র বঙ্গদর্শন, মাঘ। ৫৬৯-৭০; স্মরণ ৮।৯২, ১৭-সংখ্যক]। ৭ পৌষ [সোম 22 Dec] শান্তিনিকেতনে দ্বাদশ সাম্বৎসরিক ব্রহ্মোৎসবের ব্যস্ততা ও গোলমালের মধ্যেও রবীন্দ্রনাথ লিখলেন 'সংসার সাজায়ে তুমি আছিলে রমণী' কবিতাটি [দ্র বঙ্গদর্শন, মাঘ। ৫৭০, 'জীবনলক্ষ্মী'; স্মরণ ৮।৯৩, ১৮-সংখ্যক]। এক সময়ে 'এক একটি কবিতা প্রত্যহ····কোন এক অবসরে লিখে ফেলে····অন্তর্যামীকে নিবেদন করে' নৈবেদ্য-এর কবিতাগুলি লেখা হয়েছিল, এখনও তেমনি প্রত্যহ এক বা একাধিক কবিতা লিখে তিনি পত্নীর স্মৃতির উদ্দেশে নিবেদন করে দিয়েছেন। ৭ পৌষের পরে অবশ্য প্রাত্যহিক কবিতা ক্রমশই নৈমিত্তিক হয়ে এসেছে।

এই বৎসর শান্তিনিকেতনে মহাসমারোহে ব্রহ্মোৎসব পালিত হয়। রবীন্দ্রনাথ মোহিতচন্দ্র সেনকে কিছুদিন আগে লিখেছিলেন : 'এবার ৭ই পৌষে বোধ করি বোলপুরে আপনার সাক্ষাৎ পাইব'—এই সাক্ষাৎ হয়েছিল কিনা জানা নেই, কিন্তু সত্যপ্রসাদ, ঋতেন্দ্রনাথ প্রভৃতি আত্মীয় এবং রাধিকাপ্রসাদ গোস্বামী, শ্যামসুন্দর মিশ্র, অক্ষয়কুমার মজুমদার, কাঙালীচরণ সেন প্রভৃতি গায়কগণ এই উপলক্ষে শান্তিনিকেতনে গিয়েছিলেন, ক্যাশবহির হিসাব থেকে তা জানা যায়। তত্ত্ববোধিনী-র বিবরণেও লেখা হয়েছে : 'এবারে শান্তিনিকেতনের ব্রহ্মোৎসবে অনেক সম্ভ্রান্ত লোক উপস্থিত হইয়াছিলেন।'[৯৪] রবীন্দ্রনাথ-রচিত ব্রহ্মসংগীত ছাড়া কোনো ব্রহ্মোৎসবই সুসম্পন্ন হত না, কিন্তু তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা-য় অনুল্লেখ-হেতু তাঁর কোন্ গানগুলি গাওয়া হয়েছিল বলার উপায় নেই—প্রতি বৎসর 'গানের কাগজ' ছাপা হত, সেগুলি পাওয়া গেলে অনেক তথ্যের ঘাটতি পূরণ করা যেত।

'রাত্রিকালের উপাসনায় শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর একটী সুমধুর বক্তৃতা করিয়া লোকের চিত্ত আর্দ্র করিয়াছিলেন।'[৯৫] এই বক্তৃতাটি হল 'ধর্মের সরল আদর্শ' [বঙ্গদর্শন, মাঘ। ৫২৮-৩৮; ধর্ম ১৩। ৩৫৩-৬৩], বঙ্গদর্শন-এর বার্ষিক সূচীর পাদটীকায় '৭ই পৌষ বোলপুর শান্তিনিকেতনে সম্পাদককর্তৃক পঠিত' মন্তব্য-সহ প্রবন্ধটি উল্লিখিত হয়েছে। এই প্রবন্ধটিই তিনি মহর্ষিভবনে মাঘোৎসবের রাত্রিকালীন উপাসনায় বেদী থেকে কিঞ্চিৎ পরিবর্তিত আকারে পাঠ করেন [দ্র তত্ত্ব০, ফাল্গুন। ১৬৬-৭৩]। প্রবন্ধটির বিষয়বস্তু তার নামের মতোই সরল। গৃহকোণে একটি প্রদীপ জ্বালতে গেলে কত কী আয়োজন করতে হয় অথচ তার দ্বারা বিপুল অন্ধকারের সামান্য অংশই দূরীভূত হয়, কিন্তু বিশ্বপ্রকাশক প্রভাতালোক স্বতঃ-প্রকাশ—তাকে পাবার জন্য জাগরণই যথেষ্ট। ধর্মও তাই—'তাহাকে পাইবার জন্য কেবল চাহিলেই হইল', কেবল হৃদয়কে উন্মীলিত করিলেই হইল। কিন্তু তন্ত্রে-মন্ত্রে, ক্রিয়াকর্মে, জটিল মতবাদ ও ঘটনায় ধর্মকে এমন জটিল করে

তোলা হয়েছে যে 'মানুষের সেই স্বকৃত অন্ধকারময় জটিলতার মধ্যে প্রত্যহ এক-একজন অধ্যবসায়ী এক-এক নূতন পথ কাটিয়া নব নব সম্প্রদায়ের সৃষ্টি করিতেছে। সেই ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায় ও মতবাদের সংঘর্ষে জগতে বিরোধ-বিদ্বেষ অশান্তি-অমঙ্গলের আর সীমা নাই।' রবীন্দ্রনাথের মতে, ভারতবর্ষের ঔপনিষদিক ধর্ম এই জটিলতাকে পরিহার করে সরল পথকে অবলম্বন করেছে। গায়ত্রী মন্ত্র ব্যাখ্যা করে তিনি দেখিয়েছেন, কিভাবে বাইরের জগৎ ও অন্তরের ধী এই মন্ত্রের দ্বারা সম্মিলিত হয়ে যিনি এদের প্রেরণ করছেন তাঁর দিকে ধাবিত হয়। এই আলোচনায় তিনি সুন্দরভাবে চিত্রা কাব্যের 'পূর্ণিমা' কবিতার ছিন্নপত্রাবলী-তে বর্ণিত [পৃ ৫১১-১২, পত্র ২৫০] পটভূমিকাটি বিবৃত করেছেন।

পৌষ উৎসবের কয়েকদিন পরে ১১ পৌষ [শুক্র 26 Dec] রবীন্দ্রনাথ লিখলেন 'জাগো রে জাগো রে চিত্ত জাগো রে' কবিতা [দ্র বঙ্গদর্শন, ফাল্গুন। ৫৩৭-৭৪, 'জাগরণ'; স্মরণ ৮।৯৮-৯৯, ২৫-সংখ্যক]। ৭ পৌষ পর্যন্ত লিখিত স্মরণ-এর কবিতা মাঘ-সংখ্যা বঙ্গদর্শন-এ মুদ্রিত হয়েছিল, পরবর্তী কবিতাগুলি স্থান পেয়েছে ফাল্গুন-সংখ্যায়। সম্ভবত শৈলেশচন্দ্র মজুমদার উৎসবে এসেছিলেন, তিনিই ৭ পৌষের ভাষণ-সহ কবিতাগুলি বঙ্গদর্শন-এর জন্য নিয়ে যান।

উক্ত কবিতাটি মজুমদার-পুঁথিতে লেখার আগে রবীন্দ্রনাথ একটি কবিতা লিখতে গিয়ে শব্দ ও ছন্দ পরিবর্তন করতে করতে দুটি স্তবক লিখেই থেমে যান, পরে সমস্তটিকে বর্জন করেন। অসমাপ্ত কবিতাটি হল :

> এক বরষার রাত্রে এ আমার অশ্রুসরোবর
> কূল ছাপাইয়া কোথা গেছে চলি দিক্ দিগন্তর।
> প্রভাতে উঠিয়া দেখি
> মাঝে ফুটিয়াছে একি
> শূন্যবনে একমাত্র শতদল সম্পূর্ণ সুন্দর!
> সমস্ত আকাশ আজি অনিমেষ তারি মুখপরে
> নিস্তব্ধ চাহিয়া আছে সুগভীর প্রশান্ত আদরে।
> বাতাস থামিয়া আছে
> সুদূর তীরের কাছে—
> বিহঙ্গ গাহে না গান জানি না কি বিস্ময়ের ভরে।

—স্পষ্টতই মৃণালিনী দেবীর শোকেই অশ্রুসরোবর উন্মথিত হয়ে সান্ত্বনার শতদল-রূপে কবিতাটিতে প্রস্ফুটিত হতে চেয়েছিল, কিন্তু ভাষা ও ছন্দ ঠিক রূপটি ফুটিয়ে তুলতে পারেনি। কিন্তু দীর্ঘদিন পরে ১৪ শ্রাবণ ১৩১২ [রবি 30 Jul 1905] ভাবটি 'প্রভাতে' [দ্র খেয়া ১০।১০৮-১০] কবিতার মধ্যে পূর্ণবিকশিত হয়েছে।[৯৬]

১৪ পৌষ [সোম 29 Dec] রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন 'সন্ধ্যাদীপ' ['জ্বালো ওগো, জ্বালো ওগো, সন্ধ্যাদীপ জ্বালো' দ্র বঙ্গদর্শন, ফাল্গুন। ৬০৩; স্মরণ ৮।৯৭, ২৩-সংখ্যক] কবিতাটি। পাণ্ডুলিপিতে কবিতার নামকরণ হয়নি। বস্তুত ৭ পৌষ থেকে রচিত স্মরণ-এর কোনো কবিতারই পাণ্ডুলিপিতে নামকরণ করা হয়নি।

১৬ পৌষের [বুধ 31 Dec]কবিতা 'প্রেম' ['বহুরে যা এক করে, বিচিত্রেরে করে যা সরস' দ্র বঙ্গদর্শন, ফাল্গুন। ৫৮৮; স্মরণ ৮।৯৫-৯৬, ২১সংখ্যক]।

3 Jan 1903 [শনি ১৯ পৌষ] লিখিত কবিতাটি ['গোধূলি নিঃশব্দে আসি আপন অঞ্চলে ঢাকে যথা' দ্র বঙ্গদর্শন, ফাল্গুন। ৬০৩, 'গোধূলি'; স্মরণ ৮।৯৭-৯৮, ২৪-সংখ্যক] অনেক কাটাকুটির মধ্য দিয়ে গড়ে উঠেছে।

কবিতাটি আরও দীর্ঘ করে লেখার পরিকল্পনা ছিল, কিন্তু শেষ পর্যন্ত সনেটের আকারেই কবির শিল্পীমন সন্তুষ্ট হয়েছে। শেষের বর্জিত ছত্রগুলি হল :

> তোমার বিচ্ছেদ সাথে আমি আজ পেতেছি আলয়
> যতদিন যায় তত পাই তার গাঢ় পরিচয়।
> চিনি তার কণ্ঠস্বর শুনি তার বিশ্বময় বাণী,
> হৃদয়ে জানিতে পাই পরশি রয়েছে তার পাণি!
> কত যে গোপন পথ জানে
> সে আমারে লয়ে যায় বিশ্বের মর্ম্মের মাঝখানে
> যেথা সর্ব্বগতি স্তব্ধ

—এই অসম্পূর্ণ আকারে ছত্রগুলি পরিত্যক্ত হয়েছে।

২৩ পৌষের [বুধ 7 Jan] কবিতাটিও ['আজিকে তুমি ঘুমাও, আমি জাগিয়া রব দুয়ারে' দ্র বঙ্গদর্শন, ফাল্গুন। ৫৯৩, 'পূজা'; স্মরণ ৮।৯৯-১০০, ২৬-সংখ্যক] গ্রহণ-বর্জনের মধ্য দিয়ে গড়ে উঠেছে।

১ মাঘ [বৃহ 15 Jan] স্মরণ-এর কবিতার পালা সমাপ্ত হয়। সেই শেষ তিনটি কবিতা হল :

২৫ পৌষ [শুক্র 9 Jan] 'পাগল বসন্তদিন কতবার অতিথির বেশে' দ্র বঙ্গদর্শন, ফাল্গুন। ৫৮২, 'বসন্ত'; স্মরণ ৮।৯৩-৯৪ [১৯]

২৮ পৌষ [সোম 12 Jan] 'এসো বসন্ত, এসো আজ তুমি' দ্র বঙ্গদর্শন, ফাল্গুন। ৫৮৭-৮৮, 'উৎসব'; স্মরণ ৮।৯৪-৯৫ [২০]

১ মাঘ [বৃহ 15 Jan] 'যে ভাবে রমণীরূপে আপন মাধুরী' দ্র বঙ্গদর্শন, ফাল্গুন। ৬২১, 'দ্বৈতরহস্য'; স্মরণ ৮।৯৬ [২২]

ড শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় স্মরণ-এর কবিতাগুলির সুন্দর রসগ্রাহী আলোচনা করেছেন, আগ্রহী পাঠক আলোচনাটি পড়ে নিতে পারেন [দ্র রবীন্দ্র-সৃষ্টি-সমীক্ষা ২।১৬৬-৭৩]। এই কবিতাগুলি পত্নীর পুণ্যস্মৃতির উদ্দেশে প্রত্যক্ষভাবে নিবেদিত—কিন্তু এর পরে বহু কবিতায় মৃণালিনী দেবীর অন্তঃসঞ্চারী উপস্থিতি অনুভব করা যায়।

বেঙ্গল লাইব্রেরির ক্যাটালগ অনুযায়ী পৌষ-সংখ্যা বঙ্গদর্শন [২৯] প্রকাশিত হয় 30 Dec মেঙ্গল ১৫ পৌষ]। এই সংখ্যায় রবীন্দ্রনাথের রচনা চারটি। আমাদের অনুমান, সবগুলি রচনাই পূর্ব-লিখিত :

৪৫৭-৫৮ 'স্বদেশ' ['হে বিশ্বদেব, মোর কাছে তুমি'] দ্র উৎসর্গ ১০।৩১-৩৩, [১৬]

৪৫৮-৬২ 'রঙ্গমঞ্চে' দ্র বিচিত্র প্রবন্ধ ৫।৪৪৯-৫৩

৪৬৮-৭০ 'নারী' ['সাঙ্গ হয়েছে রণ'] দ্র উৎসর্গ ১০।৬৭-৬৮ [৪৩]

৪৭৭-৭৮ 'বিশ্বদোল' ['চিরকাল একি লীলা গো'] দ্র উৎসর্গ ১০।৫৮-৬০ [৩৮]

'স্বদেশ', 'নারী' ও 'বিশ্বদোল' যথাক্রমে কাব্যগ্রন্থ-এর 'স্বদেশ' [৪র্থ ভাগ], 'নারী' [২য় ভাগ ১ম খণ্ড] ও 'মরণ' [৬ষ্ঠ ভাগ] বিভাগের প্রবেশক-কবিতা। আমরা আগেই বলেছি, এই প্রবেশকগুলি রবীন্দ্রনাথ ইতিপূর্ব্বেই কাব্যগ্রন্থ-এর বিষয়-বিভাগের সময়েই লিখে রেখেছিলেন।

রবীন্দ্রনাথ নিজে সুদক্ষ অভিনেতা ও নাট্য-প্রযোজক ছিলেন, সুতরাং রঙ্গমঞ্চ বিষয়ে তাঁর বক্তব্যের গুরুত্ব আছে। ভরতের নাট্যশাস্ত্রে রঙ্গমঞ্চের বর্ণনায় দৃশ্যপটের বর্ণনা না থাকাতে কোনো ক্ষতি হয়নি এই মত প্রকাশ করে তিনি প্রবন্ধটি শুরু করেছেন। এমন-কি দৃশ্যকাব্য নিজেকে সার্থক করার জন্য অভিনয়ের মুখাপেক্ষী তিনি একথাও স্বীকার করেননি : 'সাহিত্য পাঠ করিবার সময় আমরা সকলেই মনে মনে অভিনয় করিয়া থাকি; সে অভিনয়ে যে কাব্যের সৌন্দর্য খোলে না সে কাব্য কোনো কবিকে যশস্বী করে নাই।' অভিনেতা অভিনয়ের জন্য অবশ্যই নাটকের উপর নির্ভরশীল, কিন্তু তার জন্য দর্শকের কল্পনাশক্তিকে উদ্রিক্ত না করে দৃশ্যপটের সাহায্য নেওয়াকে অভিনেতার অক্ষমতা বলে মনে করে তিনি লিখেছেন : 'আমাদের দেশের যাত্রা আমার ওইজন্য ভালো লাগে। যাত্রার অভিনয়ে দর্শক ও অভিনেতার মধ্যে একটা গুরুতর ব্যবধান নাই। পরস্পরের বিশ্বাস ও আনুকূল্যের প্রতি নির্ভর করিয়া কাজটা বেশ সহৃদয়তার সহিত সুসম্পন্ন হইয়া উঠে। কাব্যরস, যেটা আসল জিনিস, সেইটেই অভিনয়ের সাহায্যে ফোয়ারার মতো চারি দিকে দর্শকদের পুলকিত চিত্তের উপর ছড়াইয়া পড়ে।' শকুন্তলার মতো প্রাচীন ভারতীয় নাটকেও এই রীতিই অনুসৃত হয়েছে। কিন্তু য়ুরোপীয় আদর্শ ভিন্ন। 'অত্যুক্তি' প্রবন্ধে বাস্তবের ছলনা সৃষ্টির ছেলেখেলার প্রতি ব্রিটিশ জাতির আকর্ষণের অনেকগুলি উদাহরণ দিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ, এখানে সেই প্রবন্ধটির উল্লেখ করে তিনি লিখলেন : 'বিলাতের স্টেজে শুদ্ধমাত্র এই খেলার জন্য যে বাজে খরচ হয়, ভারতবর্ষের কত অভ্রভেদী দুর্ভিক্ষ তাহার মধ্যে তলাইয়া যাইতে পারে।' অবশ্য কেবল ব্যয়বাহুল্য হ্রাসের জন্যই নয়, অভিনয় ও কাব্যরসকে মর্যাদা দেওয়ার জন্যই তিনি লিখেছেন : 'বাগানকে যে অবিকল বাগান আঁকিয়াই খাড়া করিতে হইবে এবং স্ত্রীচরিত্র অকৃত্রিম স্ত্রীলোককে দিয়াই অভিনয় করাইতে হইবে, এইরূপ অত্যন্ত স্থূল বিলাতি বর্বরতা পরিহার করিবার সময় আসিয়াছে।' এক সময়ে বাল্মীকিপ্রতিভা অভিনয়ে মঞ্চমায়া সৃষ্টির জন্য ঠাকুরবাড়ির বাগানের বটগাছ অর্ধেক হয়ে গিয়েছিল, কিন্তু শান্তিনিকেতন পর্বের অভিনয় দৃশ্যপটকে বর্জন করেছে। কিন্তু ড শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় যে লিখেছেন : 'স্ত্রীলোকের চরিত্র পুরুষের দ্বারা অভিনয় করাইবার দুঃসাহসিকতা রবীন্দ্রনাথও দেখাইতে পারেন নাই'[৯৭]—তাঁর তথ্যজ্ঞানের পরিচায়ক নয়। সংগীতসমাজে 'বিসর্জন' ও 'গোড়ায় গলদ' অভিনয়ে পুরুষেরাই স্ত্রী-ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন, শান্তিনিকেতনেও দীর্ঘকাল স্ত্রী-চরিত্রে পুরুষেরাই অভিনয় করেন।

বঙ্গদর্শন-এর বর্তমান সংখ্যায় 'সৎপাত্র' নামে একটি স্বাক্ষর-হীন গল্প মুদ্রিত হয় [পৃ ৪৯০-৯৪], বার্ষিক সূচীতেও লেখকের নাম প্রকাশিত হয়নি। ড সুকুমার সেন তাঁর 'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস' তৃতীয় খণ্ডে [১৩৫৩] লিখেছিলেন : "স্বসম্পাদিত নব পর্যায় বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত রবীন্দ্রনাথের তিনটি ছোটগল্পের মধ্যে প্রথম হইতেছে 'সৎপাত্র'।···কেন বলিতে পারি না, সৎপাত্র গল্পগুচ্ছে আদৌ সংগৃহীত হয় নাই।" বিষয়টি সম্পর্কে প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ পুলিনবিহারী সেনকে একটি পত্রে লেখেন যে, ইণ্ডিয়ান প্রেসের কাছ থেকে রবীন্দ্রনাথের বই প্রকাশের দায়িত্ব কিনে নেওয়ার পর গল্পগুচ্ছ-এর বিশ্বভারতী-সংস্করণ প্রকাশ করার জন্য গল্পের তালিকা প্রস্তুত করতে গিয়ে তিনি দেখেন 'পুত্রযজ্ঞ' ও 'সৎপাত্র' গল্প দুটি বাদ পড়েছে। গল্পগুলি পড়ে তাঁর ধারণা হয়েছিল এগুলি রবীন্দ্রনাথের লেখা। 'সৎপাত্র' সম্পর্কে তিনি লিখেছেন:

খানিকক্ষণ চুপ ক'রে থেকে কবি বললেন—'সৎপাত্র' গল্পটা ঠিক আমার বলা চলে না। আমি ওটাতে কিছু কলম চালিয়েছি বটে, কিন্তু ওটা আসলে বেলা নিজেই লিখেছিল। ওর আখ্যানভাগ কাঠামো সব ওর নিজের। ওর ক্ষমতা ছিল, কিন্তু লিখত না। আমার কাছে খাতাটা দিল, বলল, একটু দেখে দাও। আমি লেখাটা কিছু বদলিয়ে দিয়েছিলুম—কিন্তু আসলে গল্পটা ওরই লেখা। ওটা আমার লেখা বলে নেওয়া চলবে না। ওটা বাদ দাও।"

কবির স্পষ্ট নির্দেশ অনুযায়ী 'সৎপাত্র' গল্পটি কবির রচনাবলীর অন্তর্গত করা হয়নি।[৯৮]

এরপর বিষয়টিতে ইতি টানাই উচিত ছিল, তৎসত্ত্বেও ড সেন তাঁর গ্রন্থের পরবর্তী সংস্করণের [চতুর্থ সং ১৩৭৬।৩৪২] পাদটীকায় লিখেছেন : 'কিন্তু রচনায় রবীন্দ্রনাথের হাত যে চৌদ্দ আনার কম নয়, তাহা বোঝা যায় মাধুরীলতা দেবীর পরবর্তী কালে প্রকাশিত গল্পগুলি হইতে, যদিচ সেখানে রবীন্দ্রনাথের সংশোধন আছে বলিয়া মনে করিবার কারণ আছে।' 'রবীন্দ্রনাথের গদ্যশিল্প' শীর্ষক একটি প্রবন্ধে এই টীকাটির উল্লেখ করে ড সেন নির্দ্বিধায় গল্পটি রবীন্দ্রনাথের বলে গ্রহণ করেছেন এবং 'গল্পটি সাধারণ পাঠকের অপ্রাপ্য বলে 'পরিশিষ্টে' বঙ্গদর্শন-এর পৃষ্ঠাগুলির প্রতিলিপি ছেপে দিয়েছেন।[৯৯] কিন্তু যে গল্প নিজের লেখা বলে গ্রহণ করতে রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং অস্বীকৃতি জানিয়েছেন, সেটি নিয়ে এতখানি জেদ অযৌক্তিক মনে হয়। এই গল্পের নাটকীয়তা মাধুরীলতা-রচিত অন্যান্য গল্পগুলিতেও আছে,[১০০] আর বাংলা গদ্যভাষার উপর তাঁর নিজস্ব অধিকারের সুস্পষ্ট প্রমাণ আছে রবীন্দ্রভবনে রক্ষিত মাধুরীলতার গল্পের খাতায়, একটি অপ্রকাশিত গল্পে শব্দব্যবহারে তাঁর খুঁতখুতুনি সচেতন শিল্পবোধের পরিচায়ক। ড সেন মাধুরীলতার বিবাহের পর জামাতার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের মনোমালিন্যের ছাপ 'সৎপাত্র' গল্পে পড়েছে বলে মনে করেছেন। কিন্তু এই মনোমালিন্য 1913-এর ব্যাপার, বর্তমানে তাঁদের সম্পর্ক অত্যন্ত মধুর ছিল।

সঙ্গীত-প্রকাশিকা, পৌষ ১৩০৯ [২।৪] :

৬১-৬২ ইমন কল্যাণ—একতালা। হৃদয়শশী হৃদিগগনে দ্র স্বর ৪

৬৩ সিন্দুড়া-কাওয়ালি। জরজর প্রাণে নাথ দ্র স্বর ২২

দুটি গানেরই স্বরলিপি কাঙালীচরণ সেনের কৃত।

শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রনাথ শুধু স্মরণ-এর কবিতা লেখা নিয়েই ব্যাপৃত ছিলেন না, তাঁর অবর্তমানে বিদ্যালয়ের কাজকর্মে যে বিশৃঙ্খলা দেখা দিয়েছিল তার সুব্যবস্থা করাতেও তাঁকে ব্যস্ত থাকতে হয়েছে। মনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়, জগদানন্দ রায় ও সুবোধচন্দ্র মজুমদারকে নিয়ে অধ্যক্ষসমিতি ও কুঞ্জলাল ঘোষকে কার্যাধ্যক্ষ নিয়োগ করে তিনি বিস্তৃত নিয়মাবলী রচনা করে দিয়েছিলেন, কিন্তু তাঁর প্রধান নির্ভর ছিল শিক্ষকদের শুভপ্রেরণার উপর। কিন্তু বাঙালিদের মধ্যে ঠিক এই জিনিসটিরই অভাব থাকাতে তুচ্ছ বিষয় নিয়ে সংঘর্ষ হচ্ছিল। অর্থাভাবের জন্য ছাত্রদের কাছ থেকে থাকাখাওয়ার জন্য ১৫ টাকা করে বেতন নেওয়ার ব্যবস্থা হয়েছিল। সেখানেও অভিভাবকদের কার্পণ্য কী ধরনের বিরক্তি সৃষ্টি করে তার নিদর্শন আছে অক্ষয়চন্দ্র সরকারকে লেখা ২৫ পৌষের [শুক্র 9 Jan] পত্রে :

আপনি যে ভাব হইতে অচ্যুতের অনুপস্থিতিকালের দেয় বাদ দিয়াছেন তাহা আমার পক্ষে ক্লেশকর হইয়াছে। কর্ম্মবিধি অনুসারেও ইহা বৈধ হয় নাই। আপনি জানেন আমার পক্ষে এ বিদ্যালয় ব্যবসায় নহে—আমি যাহা পাই তাহা অপেক্ষা অনেক বেশি ব্যয় করিতে হয়—অতএব আমার দিক্ হইতে যখন হিসাব করিয়া কোন কাজ করা হয় নাই তখন আপনার দিক হইতে এমন কঠিন হিসাব প্রত্যাশা করি নাই।·····এ বিদ্যালয়কে স্থায়িত্ব দিতে হইলে ইহাকে কর্ম্মের নিয়মে বাঁধা আবশ্যক আমার বন্ধুরা এ কথা আমাকে বার বার বলিয়াছেন—এবং আমিও ইহা দেখিলাম যে, আমি যে ভাবেই চলিতে ইচ্ছা করি, যাঁহাদের সহিত এ বিদ্যালয়ের সংশ্রব তাঁহারা সকলে সে ভাবে চলিতে চাহেন না সুতরাং সমস্ত অসুবিধা ও ক্ষতি একা আমাকেই বহন করিতে হয়—অপর পক্ষেরা লেশমাত্র ত্যাগ স্বীকারে প্রস্তুত নহেন।····অতএব বেতন সম্বন্ধে আমি অন্যান্য বিদ্যালয়ের সাধারণ নিয়ম দৃঢ়ভাবেই রক্ষা করিতে ইচ্ছা করি। অর্থাৎ প্রতি মাসের ১০ই তারিখের মধ্যে সেই মাসের বেতন প্রত্যাশা করিব—দশ

দিনের পর হইতে প্রত্যহ এক আনা দণ্ড গ্রহণ করা হইবে—সেই মাস পূর্ণ হইলেও বেতন না পাইলে পর মাসের ১৫ই তারিখ পর্যন্ত অপেক্ষা করিয়া ছাত্রকে বিদ্যালয় হইতে বিদায় করিতে বাধ্য হইব। ছুটির সময়কার বেতন বাদ পড়িবে না।[১০১]

জমিদারি পরিচালনা করতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ নিশ্চয়ই লোকব্যবহারে অভিজ্ঞ হয়েছিলেন, কিন্তু স্কুল-পরিচালনার অপরীক্ষিত ক্ষেত্রে তাঁর সেই অভিজ্ঞতা কাজ দেয়নি—তাই ক্রমশই নিয়মের বন্ধন কঠোর করতে হয়েছে। এইজন্যই আবার অধ্যক্ষসমিতি তুলে দিয়ে মধ্যম জামাতা সত্যেন্দ্রনাথের হস্তে অধ্যক্ষতার দায়িত্ব অর্পণ করেছেন। ২৯ পৌষ [মঙ্গল 13 Jan] তিনি মনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়কে লিখছেন :

····কয়েকদিন নিয়ম রচনায় ব্যস্ত ছিলাম। সকল বিষয়েই পাকাপাকি নিয়ম না করিলে ক্রমশঃ শৈথিল্যের দিকে যাইবে—বিশেষত আমার অনুপস্থিতিকালে বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইতে পারে। আমি শ্রীমান সত্যেন্দ্রনাথকে সকল বিষয়ে বিস্তারিত উপদেশ দিয়া অধ্যক্ষতার ভার দিয়াছি—তিনি যেরূপ বিধান করিয়া দিবেন তাহাই সকলে সম্পূর্ণভাবে মানিয়া চলিলে শৃঙ্খলা রক্ষা হইবে। এখন হইতে প্রত্যেকের প্রত্যেক কাজ বিশেষভাবে নির্দিষ্ট করিয়া দেওয়া হইল।[১০২]

তিনি ভেবেছিলেন, আত্মীয়ের উপর ভার দিলে তিনি দায়িত্ব নিয়ে কাজ করবেন—কিন্তু জামাতার চরিত্রের কর্মশৈথিল্য সম্পর্কে তখনও তিনি যথেষ্টপরিমাণে অবহিত হতে পারেননি, অল্পদিন পরেই তাঁকে অন্য ব্যবস্থা করতে হয়েছিল।

পৌষ উৎসবের কিছুদিন পরেই জগদীশচন্দ্র বসু ও হেমচন্দ্র মল্লিক আশ্রম পরিদর্শনে আসেন। জগদীশচন্দ্রের আসার সংবাদ তাঁর চিঠিতেই পাওয়া যায়, হেমচন্দ্র মল্লিকের ভ্রমণের খবর 'বাবু হেমচন্দ্র মল্লিক ও জগদীশ বসুর দিগের জন্য ফলতরকারি পাঠান ব্যায়' ক্যাশবহির এই হিসাব থেকে জানতে পারি। জগদীশচন্দ্র এই প্রথম শান্তিনিকেতনে এলেন। জায়গাটি দেখে ও বিদ্যালয় সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের স্বপ্নের কথা জেনে তিনিও উৎসাহিত হন। কলকাতায় ফিরে 1 Jan [বৃহ ১৭ পৌষ] তিনি লেখেন :

····এখানে আসিয়া বুঝিতেছি আরও কয়দিন থাকিলে ভাল হইত।

এ কয়দিন যেরূপ মনের ও শারীরিক শান্তিতে ছিলাম তাহা সর্ব্বদাই মনে হইতেছে।

তোমার স্কুলের কথা সর্ব্বদাই ভাবিতেছি। যতই ভাবি ততই ভবিষ্যতে ইহা হইতে যে এক জাতীয় মহাবিদ্যালয় উৎপন্ন হইবে তাহার প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস হইতেছে। এ সম্বন্ধে অনেক কথা আছে, আসিলে হইবে।[১০৩]

অনেক পরিকল্পনার কথা ভেবেছিলেন জগদীশচন্দ্র, কিন্তু সমকালে সেগুলি সার্থক হয়নি। তবে তাঁর ভবিষ্যদ্বাণী বৃহত্তরভাবে সফল হয়েছিল, বিশ্বভারতীতে বিশ্ববিদ্যাচর্চার কেন্দ্র স্থাপিত হয়।

রথীন্দ্রনাথ ও সন্তোষচন্দ্র মজুমদার ছিলেন বিদ্যালয়ের এন্ট্রান্স ক্লাসের ছাত্র। যেহেতু বিদ্যালয়টি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদিত ছিল না, সেহেতু তাঁদের 'প্রাইভেট' ছাত্র-রূপে পরীক্ষা দিতে হয়। এইরূপ ছাত্রদের Test পরীক্ষা দেওয়ার জন্য বিভিন্ন জেলা-সদরে পরীক্ষাকেন্দ্র স্থাপিত হত। কৃষ্ণনগরে জগদানন্দ রায়ের বাসস্থান আছে বলে রথীন্দ্রনাথদের জন্য সেখানকার পরীক্ষাকেন্দ্র নির্বাচন করে রবীন্দ্রনাথ মনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়কে কার্তিকের শেষে লিখেছিলেন : 'রথীদের কৃষ্ণনগরে পরীক্ষা দেওয়াই স্থির করিবেন।' এই কারণে মনোরঞ্জন, জগদানন্দ, রথীন্দ্রনাথ ও সন্তোষচন্দ্র ভৃত্য বিপিনকে সঙ্গে করে ২৫ পৌষ [শুক্র 9 Jan] কলকাতায় আসেন ও পরদিন 'গোয়াড়ী কৃষ্ণনগর টেষ্ট পরীক্ষা দিতে' গমন করেন। ২৯ পৌষ [মঙ্গল 13 Jan] রবীন্দ্রনাথ মনোরঞ্জনকে লেখেন : 'আপনারা কৃষ্ণনগরে স্বাস্থ্যকর স্থান পাইয়াছেন শুনিয়া খুসি হইলাম। জগদানন্দের যত্নে নিশ্চয়ই সেখানে আপনাদের কোন অভাব নাই—বোধহয় আহারাদি সম্বন্ধে নিতান্ত তপস্বীর ন্যায় আপনাদিগকে কাল যাপন করিতে হইতেছে না।'[১০৪]

মাঘোৎসব উপলক্ষে রবীন্দ্রনাথকেও কলকাতায় যেতে হয় ২ মাঘ [শুক্র 16 Jan] তারিখে। ২৯ পৌষেই তিনি দীনেশচন্দ্র সেনকে লেখেন : 'আমি আগামী শুক্রবারে কলিকাতায় যাইব। এগারই মাঘের কাজ সারিয়া আবার ফিরিব—সেই সময়েই হয় ত আপনার ও কবিরাজ মহাশয়ের এখানে আসা সুবিধাকর হইবে। গিয়া আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিব।'[১০৫] দীনেশচন্দ্র এই বছরের গোড়া থেকেই শান্তিনিকেতনের নিকটবর্তী কোনো স্থানে বাড়ি ভাড়া করে সপরিবারে বাস করার সংকল্প জানিয়ে আসছিলেন এবং রবীন্দ্রনাথ এই প্রস্তাবে আগ্রহী হয়ে ভুবনডাঙায় পরশুরাম পণ্ডিতের বাড়িটি তাঁর জন্য ভাড়া নেবার ব্যবস্থা পর্যন্ত করে ফেলেছিলেন—কিন্তু দীনেশচন্দ্রের আসা হয়নি। অবশ্য তাঁর পুত্র অরুণচন্দ্র ইতিমধ্যেই ব্রহ্মচর্যাশ্রমের ছাত্রশ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত হয়েছেন।

২ মাঘ সকালের মেলট্রেনে কলকাতায় এসে রবীন্দ্রনাথ সেইদিনই 'গোলতলা' যান, পরদিন যান গোলতলা ও বালিগঞ্জ। ৪, ৫, ৬, ৮, ৯ ও ১০ মাঘ তাঁর বালিগঞ্জ যাতায়াতের হিসাব পাওয়া যায়। সরলা দেবী কয়েক বৎসর ধরে মাঘোৎসবে সংগীত-পরিচালনার দায়িত্ব নিয়েছিলেন—এই কারণেও রবীন্দ্রনাথ বালিগঞ্জ গিয়ে থাকতে পারেন।

রথীন্দ্রনাথ ৫ মাঘ [সোম 19 Jan] এন্ট্রান্স পরীক্ষার ফী ১০ টাকা জমা দেন। খবরটি দিয়ে ৮ মাঘ [বৃহ 22 Jan] রবীন্দ্রনাথ মনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়কে লেখেন :

> গত সোমবারে রথী ইনস্পেক্টার আপিসে গিয়া তাহার দরখাস্ত সহি করিয়া আসিয়াছে।....ইতিমধ্যে কেবল দুই তিন দিনের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া তাহাকে উৎসবের আমোদ হইতে বঞ্চিত করিলাম না। এখানে তাহারা সময়ের অপব্যয় করিতেছে না—যত্ন করিয়া সংস্কৃত পড়িতেছে—বিদ্যার্ণব প্রতিদিন তিন চার ঘণ্টা তাহাদিগকে সংস্কৃত পাঠে নিবিষ্ট রাখিয়াছেন। তাহারা ১২ই মাঘে নিশ্চয়ই আমার সঙ্গে বোলপুরে ফিরিবে এবং তাহার পর হইতে কোন কারণেই তাহাদের পাঠের ব্যাঘাত হইবে না।[১০৬]

মাঘের শেষ সপ্তাহে দু'তিন মাসের জন্য ভ্রমণে বেরোবার কথা রবীন্দ্রনাথ চিন্তা করছিলেন, এইজন্য 'সর্ব্বপ্রকার বিশৃঙ্খলা নিবারণের জন্য····নিয়ম দৃঢ়বদ্ধ' করে তিনি জামাতা সত্যেন্দ্রনাথের উপর অধ্যক্ষতার দায়িত্ব দিয়ে এসেছিলেন। উল্লিখিত পত্রে এই বিষয়টি রয়েছে, আরও ব্যাখ্যা করে লিখেছেন সম্ভবত ১০ মাঘে [শনি 24 Jan] লেখা পত্রে :

> আমাকে দীর্ঘকালের জন্য অনুপস্থিত থাকিতে হইবে এই জন্যই বিশেষরূপে একজনের উপরেই সমস্ত কর্ত্তৃত্বভার স্থাপন করিয়া যাইতে হইল····। ক্লাসে পড়াইবার সময় অধ্যাপকগণ ছাত্রদিগকে যথোচিত সংযত করিয়া রাখিবেন তাহাতে কোন বাধা নাই, ক্লাসের বাহিরে তাহাদের উপর কর্ত্তৃত্ব একজনের উপরে থাকাই সঙ্গত—নতুবা কার্য্যপ্রণালীর ঐক্যরক্ষা হয় না। ব্যক্তিগত প্রকৃতি ও সংস্কার স্বভাবতই বিভিন্ন—সেই জন্য বৃহৎ কার্য্যে নিয়মের সাহায্যেই ঐক্য স্থাপিত হয়। সকলেই অধীন থাকিলে অধ্যাপকদের মধ্যে বাদ বিরোধের কোন সম্ভাবনা থাকে না। কর্ত্তব্যবিধির সহিত পরস্পর সৌহার্দ্দ্যের কোন সংঘাত হওয়া উচিত নহে।[১০৭]

কিন্তু ব্যক্তিত্বের সংঘাত ঔচিত্য বিচার করে না, তাই এক মাসের মধ্যেই অসুস্থতার অজুহাতে মনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় বিদ্যালয় ত্যাগ করেন।

অন্য সমস্যাও ছিল। রেণুকার স্বাস্থ্য শান্তিনিকেতনেও ভালো না থাকাতে তাঁকে কলকাতায় নিয়ে আসা হয়। উক্ত ১০ মাঘের চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন : 'রেণুকা কলিকাতায় আসিয়াছে। ডাক্তারদের সহিত পরামর্শ করিয়া তাহার সম্বন্ধে ব্যবস্থা করা লইয়া ব্যস্ত আছি।' এই দিনই তাঁর নিজস্ব ক্যাশবহিতে 'ব° ডা° ডি, এন, রায় দং শ্রীমতী রেণুকা দেবীর পীড়ার চিকিৎসার জন্য ফি ৮৲' হিসাব দেখা যায়।

এই সব গোলমালের মধ্যেও তিনি ১০ মাঘ লিখলেন দীর্ঘ একটি কবিতা— 'আমাদের এই পল্লিখানি পাহাড় দিয়ে ঘেরা' [দ্র বঙ্গদর্শন, চৈত্র। ৬৩৫-৩৭, 'ঝর্ণাতলা'; উৎসর্গ ১০।৬৯-৭১, ৪৪-সংখ্যক]।

মজুমদার-পুঁথিতে লেখা কবিতাটিতে আরও চারটি স্তবক ছিল। কাব্যগ্রন্থ-তে কবিতাটি রূপক বিভাগে স্থান পায়, বস্তুত রূপকের আড়ালে স্মরণ-এর বিয়োগব্যথা এখানে অন্য ধরনের সান্ত্বনা খুঁজতে চেষ্টা করেছে। ড শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন : 'রূপকের মধ্যবর্তিতায় আঘাতের তীব্রতার মধ্যে একটি কোমলতা-সঞ্চার, রূঢ় বাস্তবের উপর কল্পনার একটি দূরত্ব-প্রক্ষেপের আর্ত প্রয়াস শোকগাথার প্রখর স্বরূপকে কতকটা মন্দীভূত ও আবৃত করিয়াছে।···· 'স্মরণ'-এর প্রশান্তি সবটাই যে অকৃত্রিম নয় এবং অপ্রশমিত শোকের উদ্বৃত্ত অংশ যে নানা ছল-চাতুরীতে, নানা অস্বীকৃত পরোক্ষ উপায়ে মুক্তিপথ খুঁজিতেছে তাহা এই কবিতায় প্রমাণিত হয়।'[১০৮]

১১ মাঘ [রবি 25 Jan] ত্রিসপ্ততিতম সাম্বৎসরিক ব্রাহ্মসমাজ উপলক্ষে প্রাতে আদি ব্রাহ্মসমাজ গৃহে ও সন্ধ্যায় মহর্ষিভবনে নূতন-পুরাতন মিলিয়ে রবীন্দ্রনাথ রচিত মোট ২৩টি ব্রহ্মসংগীত গীত হয়। গান-নির্বাচনে রবীন্দ্রনাথের সমকালীন মানসিকতাই প্রতিফলিত, মৃণালিনী দেবীর অকালমৃত্যু-জনিত সন্তাপ অধিকাংশ গানেই ধ্বনিত হয়েছে। প্রাতঃকালীন অধিবেশনে গীত গানের সংখ্যা ন'টি :

[১] ললিত-সুরফাঁক্তা। পান্থ এখন কেন অলসিত অঙ্গ

[২] রামকেলি-একতালা। স্বপন যদি ভাঙ্গিলে রজনী প্রভাতে দ্র তত্ত্ব°, ফাল্গুন। ১৬৩; গীত ১।১১৮; গানটির সুর রক্ষিত থাকলেও তার স্বরলিপি এতাবৎ প্রকাশিত হয়নি। মূল গান : কহেন তুম জাবত দ্র ত্রিবেণীসংগম। ৩৪। মজুমদার-পুঁথিতে গানটির পাণ্ডুলিপি আছে, কিন্তু মূল গানটি সেখানে লেখা নেই।

[৩] আসাবরি-ঝাঁপতাল। মনোমোহন গহন যামিনী শেষে দ্র তত্ত্ব°, ফাল্গুন। ১৬৩; গীত ১।১১৯; স্বর ২৭; গানটি অবশ্যই হিন্দি-ভাঙা।

[৪] ললিত বিভাস-একতালা। আছে দুঃখ, আছে মৃত্যু, বিরহদহন লাগে দ্র তত্ত্ব°, ফাল্গুন। ১৬৩; গীত ১। ১০৮, স্বর ২৭। এই গানটিরও পাণ্ডুলিপি মজুমদার-পুঁথিতে আছে।

[৫] সর্ফর্দা-আড়া। দুঃখরাতে হে নাথ কে ডাকিলে দ্র তত্ত্ব°, ফাল্গুন। ১৬৩; গীত ১।১১১৯; স্বর ৬০; মূল গান : রঙ্গরাতি মাতিয়া আবে পিয়া দ্র গবেষণা-গ্রন্থমালা ৩।৭১-৭২। মজুমদার-পুঁথিতে মূল গানটি [ঈষৎ পাঠান্তরে] লিখে রবীন্দ্রনাথ তার নীচে বাংলা গানটি রচনা করেছেন।

[৬] ভৈরবী-সুরফাঁক্তা। আনন্দ তুমি স্বামী, মঙ্গল তুমি দ্র তত্ত্ব°, ফাল্গুন। ১৬৩; গীত ১।১০৪-০৫; স্বর ২৭। মূল গান : ওঙ্কার মহাদেব দ্র ত্রিবেণীসংগম। ২১।২৮ ভাদ্র ১৩০৪ [12 Sep 1897]-এর পূর্বে রবীন্দ্রনাথ মজুমদার-পুঁথিতে ৮ ছত্রের মূল গানটি লিখে কেবল প্রথম ছত্রটিতে বাংলা কথা বসিয়েছিলেন : 'আনন্দ উষাকালে মঙ্গল রবি' [দ্র রবিজীবনী ৪।১৫১]। বর্তমানে গানটি সম্পূর্ণ ভাঙা হল। লক্ষণীয়, প্রথম ছত্রটির পাঠ পরিবর্তিত হয়েছে।

[৭] ভৈরবী-একতালা। সংসার যবে মন কেড়ে লয়

[৮] সিন্ধু ভৈরবী-ঝাঁপতাল। যদি এ আমার হৃদয়দুয়ার

[৯] ভৈরবী-ঠুংরি। তোমার পতাকা যারে দাও

মহর্ষিভবনে সায়ংকালীন অধিবেশনে 'ভক্তিভাজন আচার্য্য শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও পণ্ডিত শিবধন বিদ্যার্ণব বেদিগ্রহণ' করেন। মাঘোৎসবে রবীন্দ্রনাথ ইতিপূর্বে প্রবন্ধপাঠ

করলেও এই প্রথম বেদিতে আসন গ্রহণ করলেন। ‘পরে স্বাধ্যায়ান্ত উপাসনা সমাপ্ত হইলে শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এই উপদেশ দিলেন।’ ‘উপদেশ’টি [দ্র তত্ত্ব°, ফাল্গুন। ১৬৬-৭৩] হল তাঁর পৌষ উৎসবে প্রদত্ত ‘ধর্মের সরল আদর্শ’ ভাষণটির সংক্ষেপিত ও পরিবর্তিত রূপ। এই অধিবেশনে গীত রবীন্দ্রনাথ-রচিত ব্রহ্মসংগীতের সংখ্যা চৌদ্দটি :

[১০] পূরবী-একতালা। ঘাটে বসে আছি আনমনা

[১১] ইমন কল্যাণ-ঝাঁপতাল। সংসারে তুমি রাখিলে মোরে

[১২] ছায়ানট-একতালা। অল্প লইয়া থাকি তাই মোর

[১৩] তিলক কামোদ-সুরফাঁক্তা। শান্তি কর বরিষণ নীরব ধারে

[১৪] সুরট-চৌতাল। এ ভারতে রাখ নিত্য প্রভু দ্র তত্ত্ব°, ফাল্গুন। ১৭৪; গীত ১।২৬১; স্বর ৪; মূল গান : যে বতিয়াঁ মেরে চিত চঢ়ি নিশ দিন কালীনাম রটত রহে দ্র গবেষণা-গ্রন্থমালা ৩।১২-১৪। এই গানটির পাণ্ডুলিপি মজুমদার-পুঁথিতে নেই।

[১৫] সুরট মল্লার-একাদশী। দুয়ারে দাও মোরে রাখিয়া দ্র তত্ত্ব°, ফাল্গুন। ১৭৪; গীত ১।৫৩-৫৪; স্বর ৪। গানটি মজুমদার-পুঁথিতে লেখা।

[১৬] আড়ানা-একতালা। মন্দিরে মম কে আসিলে হে দ্র তত্ত্ব°, ফাল্গুন। ১৭৪; গীত ১।১৮২; স্বর ৪; মূল গান : সুন্দর লাগোরী হৈঁ পিয়রবা দ্র গবেষণা-গ্রন্থমালা ৩।৮৭—রবীন্দ্রনাথ মজুমদার-পুঁথিতে ‘সুন্দর লগো হায় পিয়বা’ ইত্যাদি পাঠ লিখে প্রতি ছত্রের উপরে কথা বসিয়েছেন।

[১৭] বাহার-সুরফাঁক্তা। বাজাও তুমি কবি তোমার সঙ্গীত দ্র তত্ত্ব°, ফাল্গুন। ১৭৪; গীত ১।১১৮; স্বর ৪; মূল গান : ‘আয়ে ঋতুপতি বসন্তরাজ’ দ্র গবেষণা-গ্রন্থমালা ৩।২৮।

[১৮] কাফি-সুরফাঁক্তা। শূন্য হাতে ফিরি হে নাথ পথে পথে দ্র তত্ত্ব°, ফাল্গুন। ১৭৪-৭৫; গীত ১।১৬৪-৬৫; স্বর ৪; মূল গান :‘রুম ঝুম বরখে আজু বাদরওয়া’ দ্র গবেষণা-গ্রন্থমালা ৩।৩৫। যদুভট্টের কাছে এই গান শুনে বহুপূর্বেই গানটি ভেঙে দ্বিজেন্দ্রনাথ ‘দীন হীন ভকতে, নাথ, কর দয়া’ ও জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঝাঁপতালে ‘তুমি এ ভরসা মম অকূল পাথারে’ গান দুটি রচনা করেন [১২৭৯]।

[১৯] সাহানা-নবতাল। নিবিড় ঘন আঁধারে জ্বলিছে ধ্রুবতারা’ দ্র তত্ত্ব°, ফাল্গুন। ১৭৫; গীত ১।৮০; স্বর ৪। মজুমদার-পুঁথিতে গানটির পাণ্ডুলিপি আছে।

[২০] শঙ্করা-চৌতাল। আমারে কর জীবনদান দ্র তত্ত্ব°, ফাল্গুন। ১৭৫; গীত ৩।৮৪৬; স্বর ৪; মূল গান: ‘ইয়া জগ ঝুট জানরে মন’ দ্র গবেষণা-গ্রন্থমালা ৩।১১।

[২১] বেহাগ-কাওয়ালি। তোমার অসীমে প্রাণ মন লয়ে

[২২] পরজ-রূপকড়া। গভীর রজনী নামিল হৃদয়ে দ্র তত্ত্ব°, ফাল্গুন। ১৭৫; গীত ১।১১১; স্বর ৪। মজুমদার-পুঁথিতে বিচিত্র পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে গানটির পূর্ণাঙ্গ রূপ নির্মিত হয়ে উঠেছে। ‘অসীম মঙ্গলে মিলিল মাধুরী’ ইত্যাদি সঞ্চারী ও আভোগ অংশ আগে লিখে পরে রচিত হয়েছে স্থায়ী ও অন্তরা, স্থায়ীতেও প্রথমে পাঠ ছিল ‘মধুর সন্ধ্যা নামিল হৃদয়ে’। গান রচনার এই বিচিত্র রীতি রবীন্দ্রসংগীতের ইতিহাসে খুব বেশি নেই।

[২৩] ঝিঁঝিট-ঠুংরি। শান্ত হ'রে মম চিত্ত নিরাকুল।

মজুমদার-পুঁথিতে 'গভীর রজনী নামিল হৃদয়ে' গানটির পরে 'হসি হাসি গারোয়া লগাবে, কুনুইয়া মোকো' ইত্যাদি ৪ ছত্রের একটি হিন্দি গান সম্পূর্ণ লিখে প্রতিটি ছত্রের উপরে বাংলা কথা বসিয়ে রবীন্দ্রনাথ 'মন প্রাণ কাড়িয়া লও হে হৃদয় স্বামী' [দ্র গীত ৩।৮৫৭] গানটি রচনা করেন। গানটির একটি পাঠান্তরও তিনি লেখেন :

> মনপ্রাণ কাড়িয়া তরাও হে অমৃত স্রোতে
> কাড়িয়া লহগো তারে বিষাদ বিকার হতে।
> সকল সুখ দাও তোমার প্রেম সুখে
> কর ছিন্ন তারে জীবনের জাল হতে।

—কিন্তু সম্ভবত এই পাঠ পছন্দ না হওয়ায় তিনি এটি কেটে দেন এবং হয়তো এই কারণেই গানটি এই বছরের মাঘোৎসবে গাওয়া হয়নি, সুরটিও হারিয়ে গেছে।

শান্তিদেব ঘোষ 'আছে দুঃখ আছে মৃত্যু', 'দুঃখ রাতে, হে নাথ, কে ডাকিলে', 'আনন্দ তুমি স্বামী', 'নিবিড় ঘন আঁধারে', 'গভীর রজনী নামিল হৃদয়ে' প্রভৃতি গানে রবীন্দ্রনাথের স্ত্রীবিয়োগব্যথা অনুভব করেছেন।[১০৯] পূর্বরচিত নৈবেদ্য থেকে ও অন্যান্য কয়েকটি বেদনাবিধুর গান নির্বাচিত করে রবীন্দ্রনাথ এ বৎসরের মাঘোৎসবে একটি শোকের আবহ সৃষ্টি করতে চেয়েছিলেন তা খুবই স্পষ্ট।

কিন্তু এর মধ্যে তাঁর স্রষ্টামানসটিও কার্যকরী ছিল। শান্তিদেব ঘোষ লিখেছেন : "এই তালিকার 'দুয়ারে দাও মোরে রাখিয়া' এবং 'নিবিড় ঘন আঁধারে', তালের দিক হতে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য গান। কারণ, গান দুটির তাল সম্পূর্ণ নতুন এবং গুরুদেবেরই নিজস্ব সৃষ্টি। প্রথম গানের তালের নাম দেওয়া হয়েছে 'একাদশী', তালটি পুরো ১১ মাত্রার এবং ৩।২।২।৪ মাত্রা-ভাগে বিভক্ত। দ্বিতীয়টির নাম 'নবতাল'—মোট ৯টি মাত্রায় বিভক্ত, এর মাত্রা ভাগ হলো ৩।২।২।২। নতুন তালে নিজের গান রচনার চেষ্টা এর পূর্বে গুরুদেব আর করেননি। 'গভীর রজনী' গানটিতে অপ্রচলিত 'রূপকড়া' তালটি গুরুদেব এবারেই প্রথম ব্যবহার করলেন।"[১১০]

রবীন্দ্রনাথ ১০ মাঘ [শনি 24 Jan] মনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়কে লিখেছিলেন : 'আমি ১২ই মাঘ মেলে যাইব।····আমার সঙ্গে কয়েকটি ছাত্র যাইবে। তাহার মধ্যে A. M. Bose-এর ছেলে একটি।'[১১১] তাঁর 'শান্তিনিকেতন····.যাইবার ব্যয় ৬০্' হিসাব থেকে বোঝা যায়, অনেকেই তাঁর সঙ্গে গিয়েছিলেন। কিন্তু আনন্দমোহন বসুর কনিষ্ঠ পুত্র ও জগদীশচন্দ্রের ভাগিনেয় অরবিন্দমোহন বসু [1895-1977] এবারে তাঁর সঙ্গে যাননি, তিনি রবীন্দ্রনাথের সঙ্গেই শান্তিনিকেতনে যান ২৩ মাঘ [শুক্র 6 Feb]।

রবীন্দ্রনাথ ১২ মাঘ [সোম 26 Jan] শান্তিনিকেতন গেলেও এক সপ্তাহ পরেই ১৯ মাঘ [সোম 2 Feb] সরস্বতীপূজার দিন তাঁকে আবার কলকাতায় আসতে হল। এই দিনে ভারত সংগীতসমাজে 'সারস্বত সম্মিলন' অনুষ্ঠিত হত। বর্তমান বৎসরে এই উৎসবে জগদীশচন্দ্রের সফল পাশ্চাত্য-সফর ও C.I.E [Companion of Indian Empire] উপাধিলাভ উপলক্ষে তাঁকে সংবর্ধনা জানানোর আয়োজন হয়। রবীন্দ্রনাথ বন্ধুর এই সংবর্ধনা উপলক্ষেই কলকাতা আসেন। এই অনুষ্ঠানের জন্য তিনি 'জয় তব হোক জয়' [দ্র গীত ৩।৮৬১] গানটি রচনা করেন। অবশ্য গানটি সভায় গীত হয়েছিল কিনা বলা যায় না, সংবাদপত্রে প্রকাশিত বিবরণে এই

গানের কোনো উল্লেখ নেই। গানটির সুরও রক্ষিত হয়নি। ১৯ মাঘ রবীন্দ্রনাথের 'হাবড়ার ষ্টেসন হইতে আসার' এবং 'গোলতলা ও পার্সীবাগান' যাতায়াতের হিসাব পাওয়া যায়, পার্শিবাগান যাওয়া জগদীশচন্দ্রের সংবর্ধনার সঙ্গে সম্পর্কিত।

কুচবিহারের মহারাজা নৃপেন্দ্রনারায়ণের সভাপতিত্বে ভারত সংগীতসমাজের ভবনে বিকেল সাড়ে চারটের সময় সভা আরম্ভ হয়। 'The courtyard, the gate, the corridor and the rooms of the upper storey were very tastefully decorated. …A large shamiana was put up and seats were provided for in the courtyard and corridor.'[১১২] হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ লিখেছেন : 'এই সারস্বত সম্মিলনে রবীন্দ্রনাথের গান —/"কমল বনের মধুপরাজি এস হে কমল ভবনে",/বর্ত্তমান লেখকের রচিত একটি গীত প্রভৃতি গীত হয়'।[১১৩] সভাপতির ভাষণ ও অর্ঘ্যদানের পর 'Babu Robindra Nath Tagore then addressed the meeting in Bengali.' বিবিধ অনুষ্ঠান ও ভূরিভোজনের পর সভা ভঙ্গ হয়।

২০ মাঘ [মঙ্গল 3 Feb] আশুতোষ চৌধুরীর মধ্যমভ্রাতা যোগেশচন্দ্রের সঙ্গে সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জির তৃতীয়া কন্যা সরসীবালার বিবাহানুষ্ঠানে রবীন্দ্রনাথ উপস্থিত ছিলেন। এছাড়াও এই বিবাহে তাঁর কিছু অতিরিক্ত ভূমিকার কথা উল্লিখিত হয়েছে সংবাদপত্রের প্রতিবেদনে : 'The bridegroom was picturesquely dressed in deep Parsian blue gold bordered Benares dhoti, chudder and silk shirt, specially made at Benares under the instructions of Babu Rabindra Nath Tagore.'[১১৪] ২৩ মাঘ [শুক্র 6 Feb] রাত্রে আশুতোষ চৌধুরীর ৭৬ লোয়ার সার্কুলার রোডের বাড়িতে এই উপলক্ষে যে প্রীতিভোজ হয়, রবীন্দ্রনাথ সম্ভবত তাতে উপস্থিত ছিলেন না, '২৩ মাঘ খোদ বাবু মহাশয় ও জগদীশবাবুর ভাগনের বোলপুর যাওয়ার ব্যয়' হিসাব থেকে তা মনে হয়। এর আগে ২১ মাঘ তাঁর 'বালিগঞ্জ হইতে আসিবার' ও 'রাজার বাজার যাওয়ার' হিসাব পাওয়া যায়—শেষোক্ত হিসাবটি সম্ভবত জগদীশচন্দ্রের সঙ্গে সাক্ষাৎ-সম্পর্কিত।

কিন্তু এইসব ব্যস্ততার মধ্যে রবীন্দ্রনাথ নিজের মধ্যে একটি পরিবর্তন অনুভব করছিলেন, সেই মনোভাবটি প্রকাশ পেয়েছে মোহিতচন্দ্র সেনকে শান্তিনিকেতন থেকে লেখা ২৫ মাঘের [রবি 8 Feb] পত্রে :

> পাকা ফলের আঁটির মত আজকাল আমি নিজেকে আমার চারিদিক হইতে স্বতন্ত্র করিয়া অনুভব করিবার চেষ্টা করিতেছি। জীবনের সমস্ত ঘটনাবলী ও সুখদুঃখের সমস্ত পরিবেষ্টন হইতে আমি নিজেকে একেবারে আস্ত বাহির করিয়া লইব এই আমার ইচ্ছা। আমাদের এই সংসার-জরায়ুবেষ্টনের বাহিরে যে এক অগোচর অপরূপ জগৎ আলোকে প্লাবিত হইয়া আছে তাহারই মধ্যে ভূমিষ্ঠ হইবার জন্য উৎসুক হইয়াছি। জড় জগতে জড় শরীর লইয়া জন্মিয়াছি—অধ্যাত্মজগতে আর একটা জন্মলাভ করিতে হইবে তাহা অনুভব করিতেছি।····বেদনার দ্বারা সেই আগামী জন্মলাভের দিকে অগ্রসর হইয়াছি—এখন মাঝে মাঝে সে লোকের অপরিস্ফুট পরিচয় যেন পাই—তাহা যে অদূর, তাহা যে সত্য, তাহা যে অসীম রহস্যে পূর্ণ—সংসার যে নিয়ত সেইখান হইতেই, তাহার কুক্ষিস্থ আমাদের জন্য রস আকর্ষণ করিতেছে—এবং সেখানে জন্মদান না করিলে সংসার যে আমাদের পক্ষে ব্যর্থ তাহা নিশ্চয় অনুভব করিতেছি। এখন আমি প্রত্যক্ষ আমাকে এবং প্রত্যক্ষ জগৎকে প্রায়ই আমার বাহিরে দেখিতেছি।[১১৫]

রবীন্দ্রনাথের সমকালীন মানসিকতা বোঝার পক্ষে পত্রটি অত্যন্ত মূল্যবান। স্ত্রীর মৃত্যু এবং কন্যা রেণুকা ও নিজের অসুস্থতা বৃহত্তর সংসার থেকে তাঁকে সত্যই কিছুটা স্বতন্ত্র করে তুলেছিল। ঈশ্বরবিশ্বাসী পারিবারিক আবহাওয়ায় পরিবর্ধিত হওয়ার ফলে এই সময়ে তাঁর পক্ষে অধ্যাত্মজগতে নবজন্মলাভের আকাঙ্ক্ষা পোষণ করাও স্বাভাবিক। আমরা জানি, কয়েকমাস আগে থেকে তিনি কাব্যগ্রন্থ সম্পাদনায় ব্রতী। এই গ্রন্থ কাব্যগ্রন্থাবলী [১৩০৩]-র মতো শুধু এতাবৎ-প্রকাশিত কবিতাপুস্তকগুলিকে কালানুক্রমিকভাবে সাজিয়ে

নেওয়া ছিল না। পক্ষান্তরে কবিকে যেসব বিচিত্র অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে যেতে হয় তাদের 'যাত্রা' 'হৃদয়ারণ্য' 'নিষ্ক্রমণ' প্রভৃতি শ্রেণীতে বিভক্ত করে বিশেষ বিশেষ শ্রেণীর কবিতাগুলিকে বেছে নেওয়ার তাগিদে স্বরচিত কাব্যসাগর মন্থন করতে হয়েছিল তাঁকে কাব্যগ্রন্থ সম্পাদনার জন্য। ফলে নিজের 'সুদীর্ঘকালের কবিতা লেখার ধারাটাকে পশ্চাৎ' ফিরে দেখার সুযোগে তাঁর জীবনদেবতার অভিপ্রায়টি স্পষ্ট হয়ে উঠেছে তাঁর কাছে। এর সঙ্গে নিজের দুর্ভাগ্যপীড়িত বাস্তব জীবনের সংগতিবিধানের অভিপ্রায় থেকে ৫ ফাল্গুন [মঙ্গল 17. Feb] তিনি মোহিতচন্দ্রকেই লিখেছেন :

আমাদের প্রত্যেকের জীবনদেবতা বিশ্বদেবতার সহিত আমাদের মিলনসাধনের চেষ্টা করিতেছে—নানা ঘটনা নানা সুখদুঃখসূত্রে সে সেই মিলনপাশ বয়ন করিতেছে—মাঝে মাঝে ছিন্ন হইয়া যায় আবার সে জোড়া দেয়, মাঝে মাঝে জটা পড়িয়া যায় আবার সে ধীরে ধীরে মোচন করিতে থাকে—আমার সেই চির সহিষ্ণু চিরন্তন সহচরটির সহিত—এই সূর্য্যালোকে, এই সমীরণে, এই আকাশের নীলিমা ও ধরাতলের শ্যামলতার মাঝখানে, এই জনতাপূর্ণ বিচিত্রকলরবমুখর মানবসভাপ্রাঙ্গণে ও এই জীবনেই যেন আমার শুভ পরিণয় সম্পূর্ণভাবে সমাধা হইয়া যায়—আমি যেন তাহাকে প্রত্যক্ষভাবে চিনি ও তাহার দক্ষিণ করতলে আমার দক্ষিণ হস্ত সমর্পণ করি—সে আমাকে যেখানে বহন করিয়া লইয়া যাইবে সেখানে নির্ভয়ে আনন্দের সঙ্গে যেন যাই—তাহাকে পদে পদে বাধা দিয়া আমাদের মহাযাত্রাকে যেন ব্যাঘাতদুঃখে নিয়ত পীড়িত না করিয়া তুলি।····সে আছে, সে আমাকে ভালবাসে, তাহার ভালবাসার দ্বারাই ঈশ্বরের ভালবাসা আমি লাভ করিতেছি—জগতে যেমন পিতাকে মাতাকে বন্ধুকে প্রিয়াকে পাইয়াছি—তাহারা যেমন জগতের দিক্ হইতে ঈশ্বরের দিকে আমাকে কল্যাণসূত্রে বাঁধিতেছে—তেমনি আমার জীবনের দেবতা আমার অতিজগতের সহচর একটি অপূর্ব নিত্য প্রেমের সূত্রে ঈশ্বরের সহিত আমার একটি পরম রহস্যময় আধ্যাত্মিক মিলনের সেতু রচনা করিতেছে।[১১৬]

এই আধ্যাত্মিক আকূতি খেয়া-র মধ্য দিয়ে গীতাঞ্জলি প্রমুখ কাব্যত্রয়ীতে পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়েছে।

বঙ্গদর্শন-এর মাঘ-সংখ্যা [২।১০] ঐ মাসে প্রকাশিত না হয়ে পরের মাসের গোড়ায় প্রকাশিত হয়; বেঙ্গল লাইব্রেরির ক্যাটালগ অনুযায়ী এর প্রকাশের তারিখ 15 Feb [রবি ৩ ফাল্গুন]। অবশ্য পরবর্তী সংখ্যাটির প্রকাশের তারিখ মাত্র তিন দিন পরে 18 Feb [বুধ ৬ ফাল্গুন]। মনে হয়, দুটি সংখ্যা মুদ্রণের কাজ এক সঙ্গেই চলছিল।

বঙ্গদর্শন, মাঘ ১৩০৯ [২।১০] :

৫১১-১৪ 'পনেরো-আনা' দ্র বিচিত্র প্রবন্ধ ৫।৪৬০-৬৪

৫২৮-৩৮ 'ধর্ম্মের সরল আদর্শ' দ্র ধর্ম ১৩।৩৫৩-৬৩

৫৬৫ 'লক্ষ্মী-সরস্বতী' দ্র স্মরণ ৮।৮৬-৮৭ [৯]; ৫৬৫ 'কথা' দ্র ঐ ৮।৮৭ [১০]; ৫৬৬ 'নব পরিণয়' দ্র ঐ ৮। ৮৮ [১১]; ৫৬৬ 'পূর্ণতা' দ্র ঐ ৮।৮৮-৮৯ [১২]; ৫৬৭-৬৮ 'সার্থকতা' দ্র ঐ ৮।৮৯-৯০ [১৩]; ৫৬৮ 'সঞ্চয়' দ্র ঐ ৮।৯০-৯১ [১৪]; ৫৬৮-৬৯ 'রচনা' দ্র ঐ ৮।৯১ [১৫]; ৫৬৯ 'সন্ধান' দ্র ঐ ৮।৯১-৯২ [১৬]; ৫৬৯-৭০ 'অশোক' দ্র ঐ ৮।৯২ [১৭]; ৫৭০ 'জীবনলক্ষ্মী' দ্র ঐ ৮।৯৩ [১৮]

'পনেরো-আনা' 'বাজে কথা'-র সমগোত্রীয় প্রবন্ধ, দুটিতে যেন একই ভাবনা প্রবাহিত হয়ে এসেছে। সংসারে কাজের কথার বাহুল্য হলে যেমন জীবন নীরস হয়ে আসে, তেমনি এক-আনা পরিমাণ মহৎ মানুষের আধিক্য ঘটলে তাঁদের স্মরণস্তম্ভের জায়গা করে দেওয়ার জন্য পৃথিবীতে পনেরো-আনা সাধারণ মানুষের বাসযোগ্য জমির অভাব ঘটে। সেইজন্য জগতে এক-আনা আবশ্যকের তুলনায় পনেরো-আনা অনাবশ্যকের বাহুল্য দেখা যায়, তাতেই বিধাতার ঐশ্বর্য সপ্রমাণিত হয়। তাই 'আমরা সাধারণ পনেরো-আনা, আমরা নিজেদের যেন হেয় বলিয়া না জ্ঞান করি। আমরাই সংসারের গতি। পৃথিবীতে, মানুষের হৃদয়ে আমাদের

জীবনস্বত্ব। আমরা কিছুতেই দখল রাখি না, আঁক্‌ড়িয়া থাকি না, আমরা চলিয়া যাই।....আমরা বিপুল সংসারের বিচিত্র তরঙ্গলীলার অঙ্গ; আমাদের ছোটোখাটো হাসিকৌতুকেই সমস্ত জনপ্রবাহ ঝল্‌মল্‌ করিতেছে; আমাদের ছোটোখাটো আলাপে বিলাপে সমস্ত সমাজ মুখরিত হইয়া আছে।' বাতাসে জ্বলনধর্মী অক্সিজেনের সঙ্গে স্থির শান্ত নাইট্রোজেনের অনুপাত আবশ্যক এক-আনা ও অনাবশ্যক পনেরো-আনার মধ্যেও রক্ষা করা কাম্য, অন্যথায় 'জগতে আর কল্যাণ নাই, তখন যাহাদের অদৃষ্টে মরণ আছে তাহাদিগকে মরিবার জন্য প্রস্তুত হইতে হইবে।'

সঙ্গীত-প্রকাশিকা, মাঘ ১৩০৯ [২।৫] :

৭৫-৭৭ খট্‌-ঝাঁপতাল। সদা থাক আনন্দে দ্র স্বর ৪

৭৭-৮০ ভৈরবী-একতালা। বল দাও মোরে বল দাও ঐ স্বর ২৭

স্বরলিপিগুলি কাঙালীচরণ সেন-কৃত।

বঙ্গদর্শন, ফাল্গুন ১৩০৯ [২।১১]:

৫৭৩-৭৪ 'জাগরণ' দ্র স্মরণ ৮।৯৮-৯৯ [২৫]; ৫৮২ 'বসন্ত' দ্র ঐ ৮।৯৩-৯৪ [১৯]; ৫৮৭-৮৮ 'উৎসব' দ্র ঐ ৮।৯৪-৯৫ [২০]; ৫৮৮ 'প্রেম' দ্র ঐ ৮।৯৫-৯৬ [২১]; ৫৯৩ 'পূজা' দ্র ঐ ৮।৯৯-১০০ [২৬]; ৬০৩ 'সন্ধ্যাদীপ' দ্র ঐ ৮।৯৭ [২৩]; ৬০৩ 'গোধূলি' দ্র ঐ ৮।৯৭-৯৮ [২৪]; ৬১২-১৩ 'সম্ভোগ' দ্র ঐ ৮।১০০-০১ [২৭]; ৬২১ 'দ্বৈতরহস্য' দ্র ঐ ৮।৯৬ [২২]

৬১৩-২১ 'দর্পহরণ' দ্র গল্পগুচ্ছ ২২।২৬৩-৭৩

নষ্টনীড়-কে ছোটো উপন্যাস বা বড়োগল্প বলা উচিত, সুতরাং তাকে বাদ দিলে রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প শেষ প্রকাশিত হয়েছিল, আশ্বিন ১৩০৭-এ— 'ফেল' ও 'শুভদৃষ্টি'। এর দু'বছরেরও বেশি পরে 'দর্পহরণ' প্রকাশিত হল। কার্তিক ১৩০৯ পর্যন্ত 'চোখের বালি' পত্রিকার আসর দখল করে রেখেছিল, তাই 'রক্তবীজকে বধ করাই সম্পাদকের কাজ—একটা চুকিয়ে আর একটাকে আক্রমণ করতে হয়' একথা মাথায় থাকলেও তিনি কাগজে-কলমে এই কর্তব্য পালন করতে চেষ্টিত হননি। এরপর পারিবারিক বিপর্যয়ের ঝড়ে কিছুদিন তাঁর মানসিক স্থৈর্য বিচলিত হয়েছিল, ফলে সাহিত্য-রচনার কাজ একেবারে বন্ধ না হলেও গল্পলেখার অবসর তিনি পাননি —মাধুরীলতার গল্প 'সৎপাত্র' ঈষৎ সংশোধনান্তর পৌষ-সংখ্যায় প্রকাশ করে তিনি গল্পরসপিপাসু পাঠককে সন্তুষ্ট রাখার চেষ্টা করেছেন। ইতিমধ্যে স্বদেশ-প্রত্যাবর্তনোন্মুখ জগদীশচন্দ্রের 5 Sep [২০ ভাদ্র]-এর চিঠি মারফৎ তিনি 'অনেকগুলি নূতন কবিতা ও গল্প ফরমাইস'[১১৭] হিসেবে পেয়েছেন। জগদীশচন্দ্র ও হেমচন্দ্র মল্লিক পৌষ-উৎসবের পর বড়দিনের ছুটিতে এসে কয়েকদিন শান্তিনিকেতনে কাটিয়ে যান। আমাদের ধারণা, তখনই রবীন্দ্রনাথ বন্ধুদের মনোরঞ্জনার্থ 'দর্পহরণ ও 'মাল্যদান' [এবং হয়তো 'কর্মফল']-এর কাহিনী তাঁদের শুনিয়ে থাকবেন, পরে উপযুক্ত অবসরে সেগুলি লিখে ফেলেন। পাঠকদের স্মরণ থাকতে পারে, জগদীশচন্দ্রেরই গল্প-পিপাসা মেটাবার জন্য 'সদর ও অন্দর' 'উদ্ধার' 'দুর্বুদ্ধি' 'ফেল' ইত্যাদি গল্প রচিত হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথ এইসময়ে কিছুদিন গল্পরচনার আবহাওয়ায় বাস করেছিলেন। ১০ মাঘ তিনি মনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়কে লেখেন : 'আপনাদের গল্পগুলি শুনা যাইবে। আমি পণ্ডিতমহাশয় [? শিবধন বিদ্যার্ণব] ও সতীশ [চন্দ্র রায়]কে গুটি কয়েক প্লট দিয়া গল্প লিখাইয়াছি।'[১১৮] সতীশচন্দ্র রায়ের লেখা গল্প 'রাজকন্যা'

বৈশাখ, ১৩১০-সংখ্যা বঙ্গদর্শন-এ মুদ্রিত হয়েছিল। 'দর্পহরণ' গল্পটির একটি উল্লেখ্য বিষয় এই যে, এর প্রধান পুরুষচরিত্রের নাম 'হরিশ্চন্দ্র হালদার' —এই বাল্যবন্ধুটি ঠাকুরপরিবারের উপগ্রহ-বিশেষ ছিলেন, মাসোহারা হিসাবে না হলেও নানা উপলক্ষে রবীন্দ্রনাথ এঁকে অর্থসাহায্য করেছেন। শান্তিনিকেতনেও তাঁর গতায়াত ছিল; রথীন্দ্রনাথ তাঁর স্মৃতিকথায় লিখেছেন, এই বৎসরের শীতকালেই শান্তিনিকেতনে 'বিসর্জন' অভিনয়কালে হ.চ.হ. কলকাতা থেকে এসে 'সীন' এঁকে দিয়েছিলেন[১১৯] —রবীন্দ্রনাথের 'রঙ্গমঞ্চ' প্রবন্ধের শিক্ষা এই বালকদের প্রভাবিত করতে পারেনি। উক্ত অভিনয়ের কথা আমরা স্বতন্ত্রভাবে আলোচনা করব।

তত্ত্ববোধিনী, ফাল্গুন ১৮২৪ শক [৭১৫ সংখ্যা] :

40 'The God of Upanishads'

ঔপনিষদ ব্রহ্ম গ্রন্থের ৩৮শ অনুচ্ছেদের সামান্য অংশের ['এই জন্যই উপনিষদে আছে···প্রয়োজন ছিল না' দ্র অ-২।২১০] ইংরেজি অনুবাদ এই সংখ্যায় মুদ্রিত হয়।

প্রবাসী, মাঘ-ফাল্গুন [২।১০-১১] :

৩৩৩ 'সুদূর' ['আমি চঞ্চল হে'] দ্র উৎসর্গ ১০।১৭-১৮ [৮]

কবিতাটি কাব্যগ্রন্থ ১ম ভাগ ১ম খণ্ডের অন্তর্গত 'বিশ্ব বিভাগের প্রবেশক হিসেবে রচিত হয়েছিল।

[এই সংখ্যায় প্রকাশিত বাঁকিপুরের অমৃতলাল গুপ্ত-লিখিত 'সেকালের ও একালের যাত্রা' (পৃ ৩৫২-৫৫) প্রবন্ধে সত্যেন্দ্রনাথের পার্ক স্ট্রীট-স্থ ভাড়াবাড়িতে 'বিসর্জন' নাটকের প্রথম অভিনয়ের মূল্যবান স্মৃতিচারণ আছে। দুঃখের বিষয়, প্রবন্ধকার অভিনয়টির সময় নির্দিষ্ট করে বলেননি।]

সঙ্গীত-প্রকাশিকা, ফাল্গুন ১৩০৯ [২।৬] :

৯৫-৯৬ দেশ কাওয়ালি। প্রভু খেলেছি অনেক খেলা দ্র স্বর ২২

কাঙালীচরণ সেন গানটির স্বরলিপি করেন।

রথীন্দ্রনাথ লিখেছেন :

> ১৯০২ সালের শীতকালে আশ্রমে 'বিসর্জন' অভিনীত হয়। তখন আমাদের না ছিল স্টেজ, না পোশাক-পরিচ্ছদ বা অন্যান্য সাজসরঞ্জাম। উৎসাহ দিয়ে আমরা এই-সমস্ত অভাব পূরণ করে নিয়েছিলাম। তখন ছাত্রসংখ্যা ছিল খুবই কম, তাই সন্তোষচন্দ্র মজুমদার, নয়নমোহন চট্টোপাধ্যায় [দ্বিজেন্দ্রনাথের জামাতা মোহিনীমোহনের দ্বিতীয় পুত্র] ও আমি—এই তিনজনকে একাধারে প্রধান উদ্যোক্তা, প্রযোজক ও কুশীলবরূপে অবতীর্ণ হতে হল। এনট্রান্স পরীক্ষা তখন নিকটবর্তী, তবু নিয়মিত আমাদের মহড়া চলল। আমাদের অধ্যাপকেরা আতঙ্কিত হয়ে বাবার কাছে দরবার করলেন যে, অভিনয়ের পরিকল্পনা যদি অগৌণে বাতিল না করা হয় তা হলে পরীক্ষায় পাস করার আশা সুদূরপরাহত। বাবা কিন্তু এঁদের কথায় কান দিলেন না।[১২০]

রথীন্দ্রনাথ '১৯০২ সালের শীতকালে'র মতো অনির্দিষ্ট একটি সময়ের কথা উল্লেখ করেছেন ও তাঁর স্মৃতিকথা ছাড়া অন্য কারোর লেখায় বা চিঠিপত্রে এই অভিনয়ের প্রসঙ্গ না থাকায় ঠিক কখন অভিনয়টি হয়েছিল বলা শক্ত। সম্ভবত কার্তিক মাসে পুজোর ছুটির পর বিদ্যালয়ে এসে ছাত্রত্রয়ী অভিনয়ের আয়োজনে প্রবৃত্ত হন ও মৃণালিনী দেবীর মৃত্যু ইত্যাদি সংকট পেরিয়ে পৌষোৎসবের আগে বা পরে—হয়তো-বা পরেই —অভিনয় হয়েছিল, এমন ভেবে নেওয়া যেতে পারে। তাহলে মহড়া ও এন্ট্রান্স পরীক্ষার পূর্বে পাঠ-প্রস্তুতির প্রয়োজনীয় অবসর উভয়ের মধ্যে সামঞ্জস্যবিধান সম্ভব হয়। রবীন্দ্রনাথ অভিনয়ে বাধা দেননি বটে, কিন্তু

পুত্রের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার প্রস্তুতির ব্যাপারে তিনি কোনো অবহেলাও সহ্য করতে রাজি ছিলেন না, ইতিপূর্বে উদ্ধৃত মনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়কে লেখা কয়েকটি পত্রে তার প্রমাণ আছে।

তখনও নাট্যঘর নির্মিত হয়নি, তাই বিদ্যালয়-গৃহের পিছনে খাবারঘরে কতকগুলি ভাঙা চৌকি জুড়ে রঙ্গমঞ্চ প্রস্তুত হয়। কলকাতা থেকে আগত শিল্পী হ.চ.হ. [হরিশ্চন্দ্র হালদার] 'সীন' এঁকে দিলেন, কতকগুলি খাট দাঁড় করিয়ে তাদের গায়ে পেরেক মেরে 'সীন' খাটানোও হল। রথীন্দ্রনাথ লিখেছেন :

এমনি সব ছেলেমানুষি সত্ত্বেও অভিনয় উতরেছিল খুব ভালো ।....নক্ষত্রমাণিক্যের অভিনয় নয়ন করেছিল চমৎকার।....রঘুপতির ভূমিকায় জগদানন্দবাবুর অপূর্ব অভিনয় দেখে বাবা বুঝেছিলেন এ ব্যক্তিটি লাখে এক। এর পর যখনই কোনো অভিনয় হত, জগদানন্দবাবুকে ছাড়া হত না। [১২১]

কিন্তু জগদানন্দ রায় তাঁর স্মৃতিকথায় বিদ্যালয়ের এই প্রথম অভিনয়ের কোনো উল্লেখ করেননি। তাঁর বর্ণিত প্রথম অভিনয় শেক্‌সপীয়রের *A Midsummer Night's Dream*, যা আর কিছুদিন পরে 1903-এর গ্রীষ্মাবকাশে অভিনীত হয়েছিল। নয়নমোহনের অভিনয় সম্পর্কে রথীন্দ্রনাথ অন্যত্র লিখেছেন : 'Nayan was splendid as নক্ষত্রমাণিক্য....His mannerism in the soliloquy "দুই কানে যেন দুই টিয়া পাখী" was perfect of its kind.[১২২] দুটি ছাড়া অন্য চরিত্রের অভিনেতাদের সম্পর্কে তিনি কোনো তথ্য দেননি।

রথীন্দ্রনাথকে এন্ট্রান্স পরীক্ষার জন্য তৈরি করে দেওয়ার দায়িত্ব নিয়ে মনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় ব্রহ্মচর্যাশ্রমের শিক্ষকতায় যোগ দেন। কিন্তু উক্ত পরীক্ষা আরম্ভ হওয়ার আগেই তিনি কর্মভার পরিত্যাগ করেন। রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতন থেকে ১৩ ফাল্গুন [বুধ 25 Feb] তাঁকে লেখেন :

বোলপুরে শান্তিনিকেতন ব্রহ্মবিদ্যালয়ের প্রায় আরম্ভ হইতেই আপনি এখানকার প্রধান অধ্যাপকের পদ গ্রহণ করিয়াছেন।····এখানে আপনার স্বাস্থ্য ভাল থাকিল না সুতরাং আপনার বিদায় গ্রহণে আমি প্রতিবন্ধক হইতে পারি না····এখানকার এণ্ট্রেন্স ক্লাসের দুটি ছাত্রকে আপনি যেরূপ যত্ন ও দক্ষতা সহকারে প্রস্তুত করিয়া দিয়াছেন তাহাতে আপনার নিকট প্রভূত কৃতজ্ঞতা স্বীকার না করিয়া থাকিতে পারি না। শ্রীমান্ রথীন্দ্র ও সন্তোষ এ বৎসর এণ্ট্রেন্স্ দিতে পারিবে এরূপ আশার কোন কারণ ছিল না—আপনি রথীন্দ্রকে এক বৎসরে ও সন্তোষকে এই কয়েক মাসে এণ্ট্রেন্স্ পরীক্ষার যেরূপ যোগ্য করিয়া তুলিয়াছেন তাহা আমার পক্ষে আশাতীত—ইহাতে অধ্যাপন সম্বন্ধে আপনার নিষ্ঠা ও নৈপুণ্যের প্রতি আমার একান্ত আস্থা জন্মিয়াছে।····যদি কখনো আমার সর্ব্বপ্রকার সুযোগ ঘটে তবে পুনরায় আপনাকে আমার সহায়রূপে পাইব এ আশা আমি মন হইতে দূর করি নাই।[১২৩]

দ্বিজেন্দ্রনাথও একটি চিঠিতে লিখেছেন : 'আপনি ছাড়িয়া পলাইলেন?····আপনার শরীর বোলপুরে ভাল থাকে না যখন–তখন কাজেই আমার সুখ বন্ধ; নহিলে আমি আপনাকে ছাড়িতাম না—যেমন করিয়া হউক, আপনাকে ফিরাইয়া আনিতাম।'[১২৪] এই দুটি চিঠি থেকে বোঝা যায়, শান্তিনিকেতনে স্বাস্থ্য ভালো থাকছে না এই কারণ দেখিয়ে মনোরঞ্জন রথীন্দ্রনাথের এন্ট্রান্স পরীক্ষা আরম্ভ হওয়ার পূর্বেই বিদ্যালয়ের কার্যভার ত্যাগ করেন। ঠাকুর পরিবারে প্রচলিত রীতি অনুযায়ী ব্রহ্মচর্যাশ্রমেও সম্ভবত বাংলা মাস অনুসারে হিসাবপত্র রাখা হত। সেইজন্য মনে হয়, মনোরঞ্জন বোধহয় ফাল্গুন মাসেও কিছুদিন কাজ করেছিলেন। ১ জ্যৈষ্ঠ ১৩১০ [শুক্র 15 May 1903] তাঁকে আলমোড়া থেকে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন : "মনে হইতেছে আমি বোলপুর হইতে যাত্রা করিবার পূর্ব্বে কুঞ্জবাবুর কাছ হইতে শুনিয়া আসিয়াছি যে তিনি আপনার প্রাপ্য টাকা শোধ করিয়া দিয়াছেন।'[১২৫] সেটি হয়তো এই অতিরিক্ত কয়দিনের বেতন। কিন্তু এর পরেও তিনি ১০ জ্যৈষ্ঠ [রবি 24 May] যে লিখেছেন : 'যে একশত টাকা আপনার প্রাপ্য আছে সে আমি নিজেই দিব—সে সম্বন্ধে আপনি

নিশ্চিন্ত থাকিবেন'[১২৬]—সে-সম্পর্কে কিছু বলা শক্ত, মনোরঞ্জন নিশ্চয়ই ১০০ টাকার বেশি বেতন পেতেন না।

অসুস্থতার অজুহাতে বিদ্যালয় ত্যাগ করলেও তা যে সত্য ছিল না সেটি জানা যায় রবীন্দ্রনাথের ২ আশ্বিন ১৩১০ (শনি 19 Sep 1903]-এর পত্র থেকে : 'আপনি লিখিয়াছেন আমারই অন্যায় ও দুর্ব্বলতা আপনার কর্ম্ম পরিত্যাগের কারণ।'[১২৭] মনোরঞ্জন এই 'অন্যায় ও দুর্ব্বলতা' দেখেছিলেন সত্যেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য ও কুঞ্জলাল ঘোষের উপর যথাক্রমে অধ্যক্ষতা ও কর্মপরিচালনার ভার দেওয়ার জন্য। বিশেষভাবে কুঞ্জলাল ঘোষের সঙ্গেই তাঁর বিরোধ বেশি ছিল তা জানা যায় রবীন্দ্রনাথের আর-একটি পত্র [১৯ জ্যৈষ্ঠ ১৩১০ মঙ্গল 2 Jun 1903) থেকে : '....কুঞ্জবাবুর প্রতি আপনার চিত্ত যেরূপ একান্ত বিমুখ হইয়াছে তাহাতে তাঁহার সংক্রান্ত কোন আলোচনা আপনার কাছে করা আমি অকর্ত্তব্য জ্ঞান করি। তিনি আপনার প্রতি অন্যায় করিয়াছেন এ কথা বলিয়া অগ্নিতে আহুতি দেওয়াও উচিত নহে, করেন নাই বলিয়াও আপনাকে পীড়ন করা অনাবশ্যক।' এর মূল হয়তো রবীন্দ্রনাথের ২৯ পৌষের পত্র, যাতে রবীন্দ্রনাথ অর্থাভাবে মনোরঞ্জনবাবুর ঘর তৈরি করা স্থগিত রেখেও প্রতিশ্রুতি রক্ষার জন্য প্রস্তাবিত ল্যাবরেটরি ঘরে কুঞ্জবাবুর সপরিজনে থাকার ব্যবস্থা করতে চেয়েছিলেন।[১২৮]

এইরূপ ছোটখাটো স্বার্থ, ব্যক্তিত্বের সংঘাত, রবীন্দ্রনাথের সান্নিধ্য ও বিশ্বাস অর্জনে আপেক্ষিক অসাফল্য ইত্যাদি বিচিত্র কারণে শান্তিনিকেতনে বহুবার কর্মত্যাগ ঘটেছে। উচ্চ বেতনের প্রলোভনে অন্যত্র কর্মানুসন্ধানের চেষ্টা তো ছিলই। তবু মনোরঞ্জনবাবুর প্রতি রবীন্দ্রনাথের শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতাবোধ কোনোদিনই হ্রাস পায়নি। ওকালতি-ব্যবসায়ে তাঁকে সুপ্রতিষ্ঠিত করার জন্য তিনি পরামর্শ ও সহায়তা দানে কার্পণ্য করেননি, বিদ্যালয়ের দায়িত্ব পুনর্গ্রহণের জন্য অনুরোধও জানিয়েছেন বারবার। এরপর মনোরঞ্জন মাঝে মাঝে শান্তিনিকেতনে এসে কয়েকদিন কাটিয়ে গেছেন, রবীন্দ্রনাথের জীবৎকাল পর্যন্ত তাঁদের পত্রালাপ অব্যাহত ছিল।

রথীন্দ্রনাথের এন্ট্রান্স পরীক্ষা আরম্ভ হয় ১৮ ফাল্গুন [সোম 2 Mar]। এই উপলক্ষে তিনি ১৩ ফাল্গুন [বুধ 25 Feb] কলকাতায় আসেন। রবীন্দ্রনাথ এই খবর দিয়ে সম্ভবত এইদিন প্রিয়নাথ সেনকে লেখেন :

> রেণুকার অসুখ নিয়ে আমি আজকাল ব্যস্ত হয়ে আছি। দীর্ঘকাল থেকে তার জ্বর কিছুতেই উপশম হচ্চেনা—সঙ্গে কাশিও আছে। বোলপুরে তার কোন উপকার হল না—এখন কোন স্বাস্থ্যকর জায়গায় বায়ু পরিবর্ত্তনের উপযোগী একটা বাড়ির সন্ধানে আছি।····সাঁওতাল পরগণা, ছোটনাগপুর প্রভৃতি অঞ্চলের মধ্যে বাড়ি খুঁজচি—এখনো পাইনি—যাই হোক শীঘ্রই কোথাও যেতেই হবে।····রথী পরীক্ষা দিতে কলকাতায় গেছে। রেণুকাকে কোথাও নিয়ে যাবার উপলক্ষ্যে আমাকেও বোধ হয় এর মধ্যে যেতে হবে।[১২৯]

এই উপলক্ষে রবীন্দ্রনাথ কলকাতায় আসেন ১৭ ফাল্গুন [রবি 1 Mar]। এই দিন তিনি বালিগঞ্জ যান, ১৮ ও ১৯ ফাল্গুন যান পার্শিবাগানে জগদীশচন্দ্রের কাছে, প্রিয়নাথ সেনের সঙ্গে দেখা করেন ২০ ফাল্গুন। রথীন্দ্রনাথের পরীক্ষা শেষ হয় ২১ ফাল্গুন [বৃহ 5 Mar]। এর দু'দিন বাদে ২৩ ফাল্গুন রবীন্দ্রনাথ জগদীশচন্দ্রের ভাগিনেয় অরবিন্দমোহনকে নিয়ে শান্তিনিকেতনে ফিরে যান।

'বায়ু পরিবর্ত্তনের জন্য····হাজারিবাগ প্রভৃতি কোন স্বাস্থ্যকর স্থানে' যাওয়ার সম্ভাবনার কথা রবীন্দ্রনাথ ১ ফাল্গুন [শুক্র 13 Feb] লিখেছিলেন ব্রজেন্দ্রকিশোর দেববর্মাকে। কলকাতায় থাকার সময়ে তিনি হাজারিবাগে কালীকৃষ্ণ ঠাকুরের বাগানবাড়িটি কয়েকমাসের জন্য সংগ্রহ করেন। শান্তিনিকেতনে এসেই তিনি ২৬ ফাল্গুন

[মঙ্গল 10 Mar] মোহিতচন্দ্র সেনকে খবরটি দিয়ে লিখছেন : 'আগামী বৃহস্পতিবারে হাজারিবাগে যাত্রা করিতেছি। যদি ছুটীর সময় আপনাকে সেখানে দেখিতে পাই ত বড় আনন্দিত হইব।' এর পরে তিনি লিখেছেন : 'আপনার দান যে আমাদের পক্ষে কি অমূল্য হইয়াছে তাহা আপনাকে কেমন করিয়া জানাইব? ধনীর দানে আমাদের বাহ্য অভাব মোচন হইত মাত্র, কিন্তু আপনার দানে আমাদের বল ও নিষ্ঠা বাড়িয়া গেছে। আমরা সকলেই আত্মসমর্পণের জন্য অধিকতর প্রস্তুত হইয়া উঠিয়াছি—এখন আর কোনো ভারকে ভার বলিয়া বোধ করিতেছি না।'[১৩০]

এই ঘটনাটি রবীন্দ্রনাথকে এতই অভিভূত করেছিল যে, আশ্রম বিদ্যালয় সম্পর্কে যখনই তিনি কিছু বলেছেন তখনই ঘটনাটির উল্লেখ না করে পারেননি। মোহিতচন্দ্রের মৃত্যুর [২৬ জ্যৈষ্ঠ ১৩১৩ : 9 Jun 1906] পর বঙ্গদর্শন-এ একটি প্রবন্ধে তিনি ঘটনাটির বিস্তৃত বিবরণ দিয়ে লিখেছেন :

একদিন কলিকাতা হইতে চিঠি পাইলাম, আমার কাছে তাঁহার একটু বিশেষ প্রয়োজন আছে, তিনি বোলপুরে আসিতে চান। সন্ধ্যার গাড়িতে আসিলেন। আহারে বসিবার পূর্ব্বে·····নিভৃতে আসিয়া কুণ্ঠিতভাবে কহিলেন—"আমি মনে করিয়াছিলাম, এবারে পরীক্ষকের পারিশ্রমিক যাহা পাইব, তাহা নিজে রাখিব না। এই বিদ্যালয়ে আমি নিজে যখন খাটিবার সুযোগ পাইতেছি না, তখন আমার সাধ্যমত কিছু দান করিয়া আমি তৃপ্তিলাভ করিতে ইচ্ছা করি।" এই বলিয়া সলজ্জভাবে আমার হাতে একখানি নোট গুঁজিয়া দিলেন। নোট খুলিয়া দেখিলাম, হাজারটাকা।

এই হাজারটাকার মত দুর্লভ দুর্ম্মূল্য হাজারটাকা ইহার পূর্ব্বে এবং পরে আমার হাতে আর পড়ে নাই। টাকায় যাহা পাওয়া যায় না, এই হাজারটাকায় তাহা পাইলাম। আমার সমস্ত বিদ্যালয় একটা নূতন শক্তির আনন্দে সজীব হইয়া উঠিল। বিশ্বের মঙ্গলশক্তি যে কিরূপ অভাবনীয়রূপে কাজ করে, তাহা এমনিই আমাদের কাছে প্রত্যক্ষ হইল যে, আমাদের মাথার উপর হইতে বিঘ্নবাধার ভার লঘু হইয়া গেল।[১৩১]

[অধ্যাপক ড প্রতাপচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের সৌজন্যে আমরা এই দানের অন্তরালবর্তী একটি বিবরণ জানার সুযোগ লাভ করেছি। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের Minutes [p. 83] থেকে জানা যায়, 1902-এর ফার্স্ট আর্টস পরীক্ষার ইংরেজি উত্তরপত্র দেখার পারিশ্রমিক হিসেবে মোহিতচন্দ্র ৬৫০ টাকা আয় করেন অর্থাৎ হাজার টাকার বাকি ৩৫০ টাকা তিনি পূরণ করেছিলেন নিজের দীন সঞ্চয় থেকে!]

এছাড়া এই সময়ে রবীন্দ্রনাথ বিদ্যালয়ের জন্য আর-একটি দান লাভ করেন। কবি সতীশচন্দ্র রায় [1882-1904] আক্ষরিকভাবেই বিদ্যালয়ের জন্য নিজেকে উৎসর্গ করে দেন। বরিশালের উজিরপুর গ্রামের চন্দ্রদ্বীপের রাজবংশোদ্ভুত অখিলচন্দ্র রায়ের জ্যেষ্ঠপুত্র সতীশচন্দ্র বরিশাল ব্রজমোহন কলেজ থেকে এফ. এ. পাশ করার পর জেনারেল অ্যাসেম্বলি'জ ইনস্টিট্যুশনে ইংরেজি, সংস্কৃত ও দর্শনশাস্ত্রে ট্রিপ্‌ল্ অনার্স নিয়ে* পড়ার সময়ে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে পরিচিত হন। রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, অজিতকুমার চক্রবর্তী [1886-1918] বন্ধু সতীশচন্দ্রকে তাঁর সঙ্গে পরিচিত করিয়ে দেন। 'তার পূর্বে তাঁর একটি কবিতার খাতা অজিত আমাকে পড়বার জন্যে দিয়েছিলেন। পাতায় পাতায় খোলসা করেই জানাতে হয়েছে আমার মত। সব কথা অনুকূল ছিল না। আর কেউ হলে এমন বিস্তারিত বিশ্লেষণে প্রবৃত্ত হতুম না। সতীশের লেখা পড়ে বুঝেছিলুম তাঁর অল্প বয়সের রচনায় অসামান্যতা অনুজ্জ্বলভাবে প্রচ্ছন্ন। যাঁর ক্ষমতা নিঃসন্দিগ্ধ, দুটো একটা মিষ্ট কথায় তাঁকে বিদায় করা তাঁর অসম্মাননা।'[১৩২] আলাপের পর তাঁর 'সহজ অন্তরঙ্গতার সহিত সাহিত্যের মধ্যে আপনার সমস্ত অন্তঃকরণকে প্রেরণ করিবার ক্ষমতা' দেখে রবীন্দ্রনাথ তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হন। ব্রাউনিঙের কবিতা সতীশচন্দ্রের বিশেষ আকর্ষণের বিষয় ছিল। ব্রাউনিঙের 'Love among the Ruins'-এর অনুবাদ 'ভগ্ননগরে প্রেমসম্মিলন' বঙ্গদর্শন-এ [চৈত্র ১৩০৮।৫৯৮-৬০১] তাঁর প্রথম প্রকাশিত কবিতা। এরপর তাঁর ব্রাউনিঙের কবিতার অনুবাদ বা আলোচনা প্রায়ই বঙ্গদর্শন বা সমালোচনী-তে মুদ্রিত হয়েছে।

রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন : 'আমারমনের মধ্যে তখন আশ্রমের সংকল্পটা সব সময়েই ছিল মুখর হয়ে। কথাপ্রসঙ্গে তার একটা ভবিষ্যৎ ছবি আমি এঁদের সামনে উৎসাহের সঙ্গে উজ্জ্বল করে ধরেছিলুম।····একদিন সতীশ এসে বললেন, যদি আমাকে গ্রহণ করেন আমি যোগ দিতে চাই আপনার কাজে।' রবীন্দ্রনাথ প্রথমে রাজি হননি। সতীশচন্দ্রের দারিদ্র্যপীড়িত সংসার তাঁর বি· এ· পাশ করে উপার্জনক্ষম হওয়ার আশায় ছিল। তখনকার প্রথানুযায়ী অল্পবয়সে বিবাহও হয়েছিল তাঁর। কিন্তু বি. এ. পাশ করলেই সংসারের বন্ধন তাঁকে চেপে ধরবে এই আশঙ্কায় পরীক্ষা না দিয়ে তিনি ব্রহ্মচর্যাশ্রমের কাজে যোগ দিলেন সম্ভবত মনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিদ্যালয় ত্যাগের সঙ্গে সঙ্গেই। তিনি বেতন নিতে অস্বীকার করলেও রবীন্দ্রনাথ গোপনে তাঁর পিতার কাছে যথাসাধ্য মাসিক বৃত্তি পাঠিয়ে দিতেন। ব্রহ্মবান্ধব প্রাচীন ভারতের আদর্শে আশ্রমপ্রধান রবীন্দ্রনাথকে 'গুরুদেব' আখ্যা দিয়েছিলেন, কিন্তু সেই সম্বোধন বেশিদিন চলেনি। সতীশচন্দ্রই এই সম্বোধনটিতে প্রাণপ্রতিষ্ঠা করলেন। তিনি বন্ধু অজিতকুমারকে একটি তারিখহীন পত্রে লেখেন :

···· 'গুরুদেবের' রচনা ঠিক প্রকৃতির মত। আমি এই প্রান্তর পারে অদ্ভুত শালবনে বেড়াইয়া প্রকৃতির যে হৃদয়হর মুখ দেখিতে পাই উঁহার লেখার ভিতরেও তাহাই দেখিতে পাই। 'গুরুদেব' বলিয়াছি—কারণ কি জান? এই দেখ চারিদিকে দুপুরের রৌদ্র নিঃশব্দে পড়িয়া আসিতেছে—এই সময়ের এমনি একটি করুণ দৃষ্টি আছে তাহা বুঝানো যায় না—·...এই সময়ে কেবলমাত্র গভীর অনুরাগগুলিই হৃদয়ের মধ্যে বসিয়া থাকে—কত শালবন মনে পড়িতেছে—আর মনে পড়িতেছে। অন্তর-বাহির-সুন্দর আমার ললাটের দেবতা রবিবাবুকে। সেইজন্য ইচ্ছা হইতেছে উঁহাকে নানা মধুর নামে জ্ঞাপিত করি, তাই ইটি উটি বলিয়া শেষে 'গুরুদেব' বলিলাম···।[১৩৩]

হরণ-পূরণের পালা মানবজীবনে যেমন, বিদ্যালয়ের জীবনেও তেমনই সমানে চলেছে—তার প্রাণশক্তির পরিচয় সেখানেই। রবীন্দ্রনাথ এর মধ্যে ঈশ্বরের আশীর্বাদ লক্ষ্য করেছেন। ৭ চৈত্র [শনি 21 Mar] হাজারিবাগ থেকে একটি দীর্ঘ পত্রে তিনি ব্রজেন্দ্রকিশোর দেববর্মাকে লেখেন :

ঈশ্বর আমার অনুষ্ঠিত কর্ম্মকে প্রত্যহ অযাচিতভাবে সার্থক করিতেছেন। ...শুনিয়া আশ্চর্য্য হইবে একটি বিদ্যালয়ের শিক্ষক ১৫০্ টাকা মাত্র বেতন পান—কলিকাতায় বাসা ভাড়া করিয়া তাঁহাকে পরিবার প্রতিপালন করিতে হয়—তিনি একদিন বোলপুরে আসিয়া নিঃশব্দে আমাকে ১০০০ একসহস্র টাকা দিয়া গেলেন। ঈশ্বর অক্ষমকে দিয়াই নিজের কার্য্য আশ্চর্য্যরূপে অভাবনীয়রূপে সম্পন্ন করান, ইহাতেই তাঁহার মহিমা প্রকাশ পায়। এই ঘটনার পর হইতে আমি ভিক্ষার ঝুলি ফেলিয়া দিয়া নিজের প্রাণপণ যত্নে প্রভুর কাজ বলিয়া আমার কর্ত্তব্য পালন করিতেছি। পূর্ব্বে ভয় হইত খরচ কুলাইবে কি করিয়া—এখন আর ভয় করি না। ছেলেদের থাকিবার ঘর বাড়াইয়া দিয়াছি—ইংরাজী শিখাইবার জন্য ইংরেজ অধ্যাপক রাখিয়াছি কারখানার উপযোগী একটি বড় ঘর বানাইতেছি—একজন বন্ধু আমাকে Engine ও অন্যান্য যন্ত্র দিবেন কথা দিয়াছেন। এত ব্যয় যে কি করিয়া করিলাম ও কি সাহসে করিতেছি তাহা নিজেই জানি না—কিন্তু ঈশ্বর আশ্চর্য্য উপায়ে আমার অভাব পূরণ করিয়া দিবেন।[১৩৪]

১৯ চৈত্র [বৃহ 2 Apr] দীনেশচন্দ্র সেনকে তিনি উক্ত ইংরেজ অধ্যাপকের কথায় লিখেছেন : 'ইংরাজি-শিক্ষা দিবার জন্য একজন ইংরাজ শিক্ষক রাখিয়াছি কিন্তু তাহার কাজ দেখিয়া আসিতে পারি নাই সেজন্য মন উদ্বিগ্ন আছে।'[১৩৫] এই ইংরেজ নিশ্চয়ই লরেন্স নন, কারণ লরেন্সের শিক্ষাপদ্ধতি তাঁর জানা ছিল। এই অনামা ইংরেজই শান্তিনিকেতনের প্রথম য়ুরোপীয় অধ্যাপক।

মোহিতচন্দ্রকে লেখা ২৬ ফাল্গুনের পত্র অনুযায়ী রবীন্দ্রনাথ সদলবলে ২৮ ফাল্গুন [বৃহ 12 Mar] হাজারিবাগ রওনা হন। পিসিমা রাজলক্ষ্মী দেবী, শ্যালক নগেন্দ্রনাথ রায়চৌধুরী, তাঁর স্ত্রী নলিনীবালা, রেণুকা, মীরা ও শমীন্দ্রকে নিয়ে দলটি বেশ বড়োই ছিল। আগেই বলেছি, হাজারিবাগে তাঁরা কালীকৃষ্ণ ঠাকুরের বাগানবাড়িতে আশ্রয় নেন। অমল সেনগুপ্ত লিখেছেন : 'এখন যেখানে শহরের বড় ডাকঘর, তারই সংলগ্ন ছিল কালীকৃষ্ণ ঠাকুরের বাগান বাড়ী।····এবার রবীন্দ্রনাথকে ঘিরে হাজারীবাগের সাহিত্যলিপ্সু বিদ্বৎ সমাজ

চঞ্চল হয়ে উঠল। শোনা যায় স্থানীয় গিরীন্দ্র গুপ্ত মশাইয়ের বাড়ীতে সংগীত ও আবৃত্তির আসর বসেছিল।'[১৩৬] এর আগে চৈত্র ১২৯১ [Apr 1885]-এ ইন্দিরা দেবী, সুরেন্দ্রনাথ ও অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরীকে নিয়ে রবীন্দ্রনাথ একবার হাজারিবাগে এসেছিলেন [দ্র রবিজীবনী ২।৩০৮-০৯], সেবারে ওঠেন কাছারির নিকটে অবস্থিত ডাকবাঙলোয়। হাজারিবাগে যাওয়া তখন কষ্টসাধ্য ছিল, এবারেও সহজ হয়নি। মধুপুর থেকে ছোটগাড়িতে গিরিডি গিয়ে মানুষ-ঠেলা পুশ্‌পশে সুদীর্ঘ পথ অতিক্রম করতে হয়েছিল।

হাজারিবাগে গিয়েই রবীন্দ্রনাথ ইনফ্লুয়েঞ্জায় শয্যাগত হন। 17 Mar [মঙ্গল ৩ চৈত্র] পোস্টমার্ক দেওয়া একটি চিঠিতে তিনি মোহিতচন্দ্রকে লেখেন : 'এখানে এসে জ্বরে পড়েচি—যত শীঘ্র পারি ঝেড়ে ওঠবার চেষ্টায় আছি—কিন্তু আপাতত অনেকগুলো লেপ কম্বল আমাকে বিছানার সঙ্গে বেঁধে রেখেছে।'[১৩৭] ১৪ চৈত্র [শনি 28 Mar] মনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়কে লেখা পত্রটির বর্ণনা আরও করুণ : 'এখানে আসিয়া অবধি আমাদের অবস্থা শোচনীয় হইয়া উঠিয়াছে। ৮।৯ দিন আমি জ্বরে পড়িয়াছিলাম। উঠিয়াছি কিন্তু কাশী ও দুর্ব্বলতা যায় নাই। তার পরে শমী পড়িয়াছিল, কাল হইতে তাহার জ্বর নাই—কাশী আছে। আজ মীরা পড়িয়াছে। নগেন্দ্রের স্ত্রী জ্বরে পড়িয়াছিল। পিসিমার শরীর অসুস্থ। চাকরদের অনেকেই শয্যাগত। রেণুকার প্রত্যহ ১০২° জ্বর আসিতেছে। কোনদিকেই আশাজনক কিছুই দেখি না।····আমার মনটা পালাই পালাই করিতেছে।'[১৩৮]

এ ধরনের বিপত্তিতে তিনি তখন মোটামুটি অভ্যস্ত হয়ে গেছেন, কিন্তু ব্যথিত হয়েছেন জামাতা সত্যেন্দ্রনাথের আচরণে। রবীন্দ্রনাথ তাঁর উপর অনেক পরিমাণে নির্ভর করে ব্রহ্মচর্যাশ্রমের অধ্যক্ষতার দায়িত্ব দিয়ে এসেছিলেন, তিনি সেই দায়িত্বের মর্যাদা না রেখে পাঞ্জাবভ্রমণে বহির্গত হন। ২১ চৈত্র [শনি 4 Apr] রবীন্দ্রনাথ তাঁর খুল্লতাত নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যকে যে পত্র লেখেন তা মানসিক তিক্ততায় পূর্ণ :

আমাকে সত্য এ পর্য্যন্ত কোনও খবর দেয় নাই। কুঞ্জবাবুর নিকট হইতে তাহার ভ্রমণের সংবাদ পাই। সম্প্রতি সত্যপ্রসাদকে যে চিঠি লিখিয়াছে আপনাকে পাঠাইলাম। টাকা আমাকেই দিতে হইবে অথচ সত্যপ্রসাদের নিকট প্রার্থনার বিশেষ সৌন্দর্য্য কিছু বুঝা গেল না। সত্যেন্দ্রর উপর আমার রুগ্ন সংসারের কথঞ্চিত ভার দিয়া এই ভগ্নাবশেষ শরীরটার যথাসম্ভব সংস্কারের জন্য কাশ্মীরে যাইবার সঙ্কল্প ছিল।····সত্যেন্দ্র আমার ভার লাঘব না করিয়া পরম দুঃখ সময়ে আমার ভার বৃদ্ধি করিয়াছে—তাহার সমস্ত কর্ত্তব্যও সে আমার স্কন্ধে নিক্ষেপ করিয়া গেছে। কিন্তু মনুষ্যত্বকে যে ব্যক্তি স্বেচ্ছায় নির্লজ্জভাবে বিসর্জন দিয়া বসিয়াছে এইটুকুতে তাহার কোনও উপকারের সম্ভাবনা নাই আমারই সকল দিকে ক্ষতি। ····সত্যেন্দ্র যদি কলিকাতায় আসেন ও যদি তিনি ডাক্তার ডি· এন· রায়ের সহযোগী রূপে কাজ করিয়া হোমিওপ্যাথি অভ্যাস করেন তবে জোড়াসাঁকোয় অথবা আপনাদের কাহারও কাছে থাকিয়া তাহা করিতে পারেন। কিছুকাল এইভাবে কাজ করিলে কাহারও গলগ্রহ হইয়া থাকিবার আশঙ্কা তিনি মন হইতে দূর করিতে পারেন। কিন্তু কাজও করিব না অথচ অন্যের নিকট হইতে আবশ্যক মত ধনসম্পত্তি গ্রহণ করিব অথচ অন্যের কোনও প্রকার সাহায্য না করিয়া তাহার উদ্বেগ ও ভার বৃদ্ধি করিব এ ব্যবস্থায় কোনও কালেই তিনি লেশমাত্র আত্মপ্রসাদ লাভ করিবেন না। বিদ্যালয়ের কাজে যখন তিনি আত্মসমর্পণ করিয়াছিলেন তখন তিনি নিজেকে লজ্জা হইতে রক্ষা করিবার পথে গিয়াছিলেন কিন্তু তাহাও যখন তিনি অসাধ্য বলিয়া পরিত্যাগ করিলেন অথচ জীবিকা উপার্জ্জনও তাঁহার পক্ষে ক্লেশকর তখন আমরা আর কি করিতে পারি—ঈশ্বর তাঁহাকে শুভবুদ্ধি দিন।[১৩৯]

—এই চিঠি লেখার দিনই কলকাতা থেকে লাহোরে সত্যেন্দ্রনাথের কাছে ৫০ টাকা পাঠানো হয়।

নিজের ও পুত্রকন্যার অসুস্থতা, উক্ত ধরনের মানসিক বিরক্তি ইত্যাদি সত্ত্বেও হাজারিবাগে রবীন্দ্রনাথ সুযোগ পেলেই কবিতা রচনা করেছেন। কাব্যগ্রন্থ প্রকাশের আয়োজন শুরু হওয়ার পর থেকে প্রথমত বিষয়-বিভাগ অনুযায়ী 'প্রবেশক' কবিতা লিখতে তিনি প্রবৃত্ত হয়েছিলেন, পরে সেই প্রবৃত্তিই তাঁকে নূতন কবিতা রচনায় উদ্বুদ্ধ করেছে। ১১ চৈত্র [বুধ 25 Mar] তিনি মোহিতচন্দ্র সেনকে লিখেছেন :'পর্শু আমার জ্বর ছেড়েছে

—কাল থেকে আমি গুটি তিনেক কবিতা লিখে ফেলেছি।····এখানে এখন পরিপূর্ণ বসন্ত। আমার পূর্ব্বদিকের জানলা খোলা, —সম্মুখে তরঙ্গায়িত চষা মাঠ দিক্‌প্রান্তে নীল পাহাড়ে গিয়ে মিলেছে। এখানকার বার্ত্তা কলকাতার সেই রথঘর্ঘরিত গলির মধ্যে কেমন করে গিয়ে পৌঁছবে?····এখানকার আকাশ ও বাতাসের খানিকটা দিয়ে যদি কবিতা ক'টা মোড়ক করে বুকপোষ্ট করে দিতে পারতুম তাহলে কতকটা ঠিক অবস্থায় গিয়ে পৌঁছত। আপাততঃ কেবল উপরে লিখে দিচ্ছি Glass with care।'[১৪০]

সম্ভবত এই সময়ে তিনি বাড়ি বদল করেন। কালীকৃষ্ণ ঠাকুরের বাগানবাড়িতে উঠে তিনি ও পরিবারের অনেকে অসুস্থ হয়ে পড়েন, বাড়ি বদলের সেইটিই হয়তো কারণ। একটি তারিখহীন পত্রে তিনি শ্রীশচন্দ্র মজুমদারকে লেখেন : 'গিরীন্দ্রবাবু আমাদের যত্নে আচ্ছন্ন করে রেখেচেন। তিনি এ পর্য্যন্ত আমাদের কোন অভাব ঘটতে দেন নি—আমরা তাঁরই বাড়িতে আছি। কালীকৃষ্ণ ঠাকুরের বাগান বাড়িটা অত্যন্ত অন্ধকার। এখানে এসে যেন কারামুক্ত হয়েছি।'[১৪০ক]

এই 'গিরীন্দ্রবাবু'র পরিচয় আমাদের লিখে পাঠিয়েছেন অমল সেনগুপ্ত :

রায়বাহাদুর গিরীন্দ্রকুমার গুপ্ত ছিলেন হাজারিবাগের সরকারী উকিল, স্থানীয় বাঙালিসমাজে লব্ধপ্রতিষ্ঠ ব্যক্তিত্ব। গিরীন্দ্রবাবু শুধু ধনশালীই ছিলেন না, দানশীল এবং অত্যন্ত সামাজিক ছিলেন। বিভিন্ন জনকল্যাণমূলক কর্মের সঙ্গে তাঁর আন্তরিক যোগ ছিল। গিরীন্দ্র গুপ্তের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের যোগাযোগ শ্রীশচন্দ্র মজুমদারেরই সূত্রে। শ্রীশচন্দ্র হাজারিবাগের তৎকালীন মহকুমা-সদর গিরিডিতে কর্মরত ছিলেন বলেই নয়, হাজারিবাগের সঙ্গে তাঁর আত্মীয়তাসূত্রেও সংযোগ ছিল। শ্রীশচন্দ্রের শ্যালিকা হেমনলিনী দেবী [নৌকাডুবি-তে নায়িকা-চরিত্রে রবীন্দ্রনাথ এঁরই নাম ব্যবহার করেন] এবং তাঁর স্বামী হৃষীকেশ (দাশ) গুপ্ত ছিলেন হাজারিবাগের প্রাচীন অধিবাসী। এই দাশগুপ্ত-দম্পতির গৃহের সন্নিহিত ছিল গিরীন্দ্রকুমার গুপ্তের বাড়ি (জ্যেষ্ঠ অক্ষয়কুমার এবং তাঁর যৌথগৃহ)। এঁদের মধ্যে আত্মীয়তার সূত্র ছিল। এই গৃহে রবীন্দ্রনাথ সে যাত্রা বেশ কিছুদিন ছিলেন।

হাজারিবাগে রবীন্দ্রনাথ পাঁচটি কবিতা লেখেন, পাঁচটিই মজুমদার-পুঁথিতে লেখা, তারিখগুলি পাণ্ডুলিপি থেকে পাওয়া গেছে। কবিতাগুলি হল :

১০ চৈত্র [মঙ্গল 24 Mar] 'মন্ত্রে সে যে পূত' দ্র উৎসর্গ ১০।৬২-৬৪ [৪০]; বঙ্গদর্শন, জ্যৈষ্ঠ ১৩১০।৭৯-৮১ ['যাত্রিণী']

পাণ্ডুলিপিতে দেখা যায়, কবিতার রূপটি গড়ে তুলতে কবিকে অনেক পরিশ্রম করতে হয়েছে; একটি স্তবক সম্পূর্ণ বর্জিত, তৃতীয় স্তবকটি পরে লিখে জুড়ে দেওয়া হয়। পত্নীর বিয়োগব্যথা কবিতাটিতে সুস্পষ্ট। কাব্যগ্রন্থ প্রথম ভাগ দ্বিতীয় খণ্ডে কবিতাটি 'সোনার তরী' বিভাগে সংকলিত হয়েছে।

১১ চৈত্র [বুধ 25 Mar] 'ভোরের পাখি ডাকে কোথায়' দ্র উৎসর্গ ১০।৭-৯ [১]; বঙ্গদর্শন, বৈশাখ ১৩১০। ১-৩ ['ভোরের পাখী']

১১ চৈত্র 'না জানি কারে দেখিয়াছি' দ্র উৎসর্গ ১০।২২-২৩ [১১]; বঙ্গদর্শন, ভাদ্র ১৩১০।২১০-১২ ['চিঠি']

দুটি কবিতাই কাব্যগ্রন্থ পঞ্চম ভাগে 'রূপক' বিভাগে সংকলিত হয়।

১২ চৈত্র [বৃহ: 26 Mar] 'ওরে আমার কর্মহারা' দ্র উৎসর্গ ১০।৫২-৫৪ [৩৫]; বঙ্গদর্শন, বৈশাখ ১৩১০। ১৪-১৬ ['চৈত্রের গান']

এই কবিতাটি মোহিতচন্দ্রকে পাঠিয়ে রবীন্দ্রনাথ লেখেন :

আজ আর একটি লিখেছি। এটা প্রকৃতি গাথায় বসিয়ে দেওয়া চলে। যদি সেটা ছাপা হয়ে থাকে তাহলে আপনার যেখানে খুসি দেবেন। গ্রন্থাবলী কি পর্য্যন্ত হলো আমি তার কিছুই জানিনে। ফর্ম্মা চারেকের ফাইল পেয়েছিলেম—তার পরে আমার বরাদ্দ বন্ধ। আমার প্রতি নিতান্ত

নিঃসম্পর্ক লোকের মত ব্যবহার করা হচ্চে—⋯কোনো দেশের কোনো প্রকাশক গ্রন্থকারের প্রতি এরকম নিষ্ঠুর আইন চালায় না।⋯আপনি যদি শৈলেশকে ডেকে তার শৈলের মত অচল চিত্তকে আমার দুঃখে একটু বিচলিত করতে পারেন তাহলে আপনি আমার কৃতজ্ঞতাভাজন হবেন।[১৪১]

রবীন্দ্রনাথের নির্দেশ অনুযায়ী কবিতাটি কাব্যগ্রন্থ তৃতীয় ভাগের অন্তর্গত 'প্রকৃতিগাথা' বিভাগের অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল। পাণ্ডুলিপিতে দেখা যায়, চতুর্থ স্তবকটি ['গাছের পাতা যেমন কাঁপে⋯'] দিয়ে কবিতাটির সূচনা হয়েছিল, পরিবর্তনটি সেখানেই নির্দেশিত হয়। হাজারিবাগের বসন্তপ্রকৃতি এই কবিতাটিতেই সর্বাধিক স্পর্শযোগ্য।

১৬ চৈত্র [সোম 13 Mar] 'আমার খোলা জানালাতে' দ্র উৎসর্গ ১০।৫৫-৫৭ [৩৬]; বঙ্গদর্শন, জ্যৈষ্ঠ ১৩১০। ৬২-৬৪ ['সন্ধ্যা']

হাজারিবাগে রচিত প্রথম কবিতাটির মতো এই শেষ কবিতাটিও অনেক কাটাকুটি ও স্তবকের পুনর্বিন্যাস প্রভৃতির মধ্য দিয়ে গড়ে উঠেছে, এটিও পত্নীর স্মৃতিসুরভিত। একটি বর্জিত স্তবক উদ্ধার করে দিই :

আমার তপ্ত ভালের পরে যদি তুমি ক্ষণেক তরে
রাখ তোমার স্নিগ্ধ কোমল কর
চক্ষু রেখে আমার চোখে অবসন্ন সন্ধ্যালোকে
বারেক যদি চাহ মুখের পর
যদি অলস দখিনবায়ে ক্ষণে ক্ষণে অবশ কায়ে
ঢাকা পড়ি তোমার নীলাঞ্চলে
যদি তোমার প্রদীপখানি ঘরের কোণে দেহ আনি
চরণ দুটি রাখ গৃহের তলে

—স্তবকটি এরূপ অসমাপ্ত অবস্থায় পরিত্যক্ত ও বর্জন-চিহ্নাঙ্কিত।

শুধু কবিতা রচনা নয়, নৌকাডুবি উপন্যাস রচনারও সূত্রপাত হাজারিবাগে। ১১ চৈত্র রবীন্দ্রনাথ মোহিতচন্দ্রকে লিখেছিলেন : "এখন থেকে বঙ্গদর্শনের প্রতি মনোযোগ দিতে হবে। একটা গল্প না ধরলে পাঠকরা ইঁট্‌পাট্‌কেল ছুঁড়তে আরম্ভ করবে।' দশ দিন পরে ২১ চৈত্র [শনি 4 Apr] শ্রীশচন্দ্র মজুমদারকে লিখছেন : 'বৈশাখের বঙ্গদর্শনের জন্য একটা বড় গল্পের প্রথমাংশ লিখিয়া পাঠাইতেছি।'[১৪২] অর্থাৎ এরই মধ্যে তিনি নৌকাডুবি উপন্যাসের প্রথম চারটি [মুদ্রিত গ্রন্থে তিনটি] পরিচ্ছেদ লিখে শেষ করেন। বঙ্গদর্শন-এর বৈশাখ ১৩১০ [৩।১]-সংখ্যায় এই অংশ মুদ্রিত হয়, দীর্ঘ সওয়া দু'বছর পর আষাঢ় ১৩১২ [৫।৩]-সংখ্যায় উপন্যাসটি সমাপ্ত হয়—নানারকম পারিবারিক দুর্যোগ সত্ত্বেও একটি কিস্তিরও খেলাপ হয়নি।

উপন্যাসটি লেখার প্রেরণা তাঁর অন্তরে ছিল না—নিছক বঙ্গদর্শন-এর পাঠকদের গল্পরসের চাহিদা মেটানোর জন্য তাঁকে এই উপন্যাস শুরু করতে হয়েছিল। উপন্যাসটির আকার বা কাহিনীর পরিণতি সম্পর্কে সম্ভবত তাঁর কোনো ধারণা ছিল না, তাই প্রথম কিস্তিটিকে তিনি 'একটা বড় গল্পের প্রথমাংশ' বলে অভিহিত করেছিলেন। বহুকাল পরে [অগ্র° ১৩৪৭] রবীন্দ্র-রচনাবলী পঞ্চম খণ্ডে নৌকাডুবি-র 'সূচনা'-য় তিনি লেখেন :

প্রকাশক জানতে চেয়েছেন নৌকাডুবি লিখতে গেলুম কী জন্যে।⋯বাইরের খবরটা দেওয়া যেতে পারে, সে হল প্রকাশকের তাগিদ। ⋯প্রকাশকের ফরমাশকে প্রেরণা বললে বেশি বলা হয়। অথচ তা ছাড়া বলব কী? গল্পটায় পেয়ে-বসা আর প্রকাশকে পেয়ে-বসা সম্পূর্ণ আলাদা কথা। বলা বাহুল্য ভিতরের দিকে গল্পের তাড়া ছিল না। গল্প লেখার পেয়াদা যখন দরজা ছাড়ে না তখন দায়ে পড়ে ভাবতে হল কী লিখি। সময়ের দাবি বদলে গেছে। একালে গল্পের কৌতূহলটা হয়ে উঠেছে মনোবিকলনমূলক। ঘটনা-গ্রন্থন হয়ে পড়েছে গৌণ। তাই অস্বাভাবিক অবস্থায় মনের রহস্য সন্ধান করে নায়ক-নায়িকার জীবনে প্রকাণ্ড একটা ভুলের দম লাগিয়ে দেওয়া হয়েছিল—অত্যন্ত নিষ্ঠুর কিন্তু ঔৎসুক্যজনক। এর চরম

সাইকলজির প্রশ্ন হচ্ছে এই যে, স্বামীর সম্বন্ধের নিত্যতা নিয়ে যে সংস্কার আমাদের দেশের সাধারণ মেয়েদের মনে আছে তার মূল এত গভীর কি না যাতে অজ্ঞানজনিত প্রথম ভালোবাসার জালকে ধিক্কারের সঙ্গে সে ছিন্ন করতে পারে।

রবীন্দ্রনাথ নৌকাডুবি-তে গল্পের মাহাত্ম্য ও মনোবিশ্লেষণের নিপুণতা নিয়ে কোনো প্রশংসা দাবী করেননি, 'যে অংশে বর্ণনায় এবং বেদনায় কবিত্বের স্পর্শ লেগেছে' সেই অংশটুকু কবির খ্যাতি বাঁচিয়ে রাখতে পারে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেছেন। বস্তুত গাজিপুরে প্রথম যৌবনের কয়েকটি মাসের সুখস্মৃতির কিছু অনুষঙ্গ নৌকাডুবি-র একটি বড়ো অংশ অধিকার করে আছে, সেই অংশের রমণীয়তা অনস্বীকার্য।

সাহিত্যচর্চার কাজ মোটামুটি চললেও বিদ্যালয় সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের দুশ্চিন্তা অব্যাহত ছিল। কুঞ্জলাল ঘোষ ও সতীশচন্দ্র রায়ের সঙ্গে তাঁর যে চিঠিপত্রে যোগাযোগ ছিল সতীশচন্দ্রের ২৩ চৈত্রের [সোম 5 Apr] পত্রে তার উল্লেখ আছে। সতীশচন্দ্রের এই পত্রটি খুবই মূল্যবান। ব্রহ্মচর্যাশ্রমের আদর্শ ও শিক্ষাপদ্ধতিকে অন্তরের সঙ্গে গ্রহণ করে কার্যক্ষেত্রে কীভাবে তিনি প্রয়োগ করছিলেন তার বিবরণ পত্রটিতে আছে :

····ছাত্রগণ সাহিত্য রসে একটু মগ্ন হইয়াছে। ইহারা মাইকেল অপেক্ষা হেমবাবুর কবিতাকে ভাল বলে। আমি ক্লাসে পড়াইবার সময়ে কোন সমান ভাবের লেখা পাইলেই যাহাদের সঙ্গে সমান সেই অন্য কবিদের লেখা পড়িয়া শুনাই। মাইকেলের মেঘনাদের ২ সর্গ ইহাদের পড়া হইয়া গিয়াছে। ২য় সর্গে শিবের যোগভঙ্গের পালাটি আমি বাদ দিবার কোন দরকার বোধ করি নাই। মদন রতি প্রভৃতি সম্বন্ধে ইহাদিগকে সঙ্কোচজনক ভাব পোষণ করিতে না দিয়া, আগে হইতেই উহাদের সম্বন্ধে এমন একটা ভাব জন্মাইয়া দিলাম যে ভবিষ্যতে কখনো কাব্যের মধ্যে মদনের নাম পাওয়া [গেলে] ইহারা সঙ্কোচবোধ না করে। আজ ছাত্রদের প্রথম সর্গ সম্বন্ধে পরীক্ষা গ্রহণ করিতেছি। ভাবের সৌন্দর্যবোধ পরীক্ষার দিকে নজর রাখিয়াই প্রশ্ন দিয়াছি। ভাষার আয়ত্ত সম্বন্ধে বেশি কিছু দিই নাই।

ছাত্রগণকে আমি যথাসাধ্য বড় ভাবের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করিবার চেষ্টা করিতেছি। তাহাদের একাগ্রতা সাধনের জন্য আমি একটি পথ অবলম্বন করিয়াছি, সে এই—গায়ত্রী ত চিন্তা করিতে বলিয়াছি তা ছাড়া উহাদিগকে আপনার কথা ভাবিতে বলিয়া দিয়াছি। কেহ কেহ ঐ কথা অবলম্বন করিয়াছেও।····

সন্ধ্যাবেলায় ছেলেরা recitation অভ্যাস করে—এই-ই বেশীর ভাগ—কখনো কখনো debating কিম্বা পড়া হয়।[১৪৩]

রবীন্দ্রনাথের পড়ানোর পদ্ধতি ছিল এইরকমই। সেইজন্য সতীশচন্দ্রের শিক্ষকতা সম্পর্কে তিনি সশ্রদ্ধভাবে লিখতে পেরেছেন: 'কেজো সীমার মধ্যে বদ্ধ সংকীর্ণ নৈপুণ্য ছিল না তাঁর মাস্টারিতে। সাহিত্যের তিনি রসজ্ঞ সাধক ছিলেন, সেইজন্যে তিনি যা পাঠ দিতেন তা জমা করবার নয়, তা হজম করবার, তা হয়ে উঠত ছেলেদের মনের খাদ্য। তিনি দিতেন তাদের মনকে অবগাহন-স্নান, তার গভীরতা অত্যাবশ্যকের চেয়ে অনেক বেশি।'[১৪৪]

রবীন্দ্রনাথ ২১ চৈত্র [শনি 4 Apr] শ্রীশচন্দ্র মজুমদারকে লিখেছিলেন : 'আমিবোধ হয় আর দিন চার পাঁচের মধ্যেই বোলপুরে যাইতেছি। ....রেণুকাকে তাহার মাতুলের তত্ত্বাবধানে এখানে রাখিয়া আমি বোলপুরে যাইতে চাই—বিদ্যালয়ের জন্য উদ্বিগ্ন আছি।'[১৪৫] দু'দিন পরে ২৩ চৈত্র মোহিতচন্দ্রকে লিখলেন : 'পর্শু বোলপুর অভিমুখে যাত্রা করিতেছি।····আমার কলিকাতায় যাইবার সম্ভাবনা আছে।'[১৪৬] এই পত্র অনুসারে মনে হয়, তিনি ২৫ চৈত্র [বুধ ৪ Apr] হাজারিবাগ থেকে শান্তিনিকেতনের উদ্দেশ্যে রওনা হন।

২১ চৈত্র রবীন্দ্রনাথ নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যকে লিখেছিলেন : 'রেণুকার শরীর এখানে একটু ভালর দিকে গেছে। এখানে একজন M.D. উপাধিধারী লেডি ডাক্তার আছেন তিনি অনেকক্ষণ বহু যত্নে পরীক্ষা করিয়া বলিয়াছেন রেণুকার lungsএর কোন দোষ নাই। পূর্ব্বের চেয়ে এখানে তাহার জ্বর প্রায় এক ডিগ্রী কমিয়াছে।' কিন্তু এ শুধু সান্ত্বনার কথা। ডাক্তার যে হাজারিবাগের বদলে আলমোরার মতো কোনো জায়গায় নিয়ে গিয়ে

রাখলে রেণুকার উপকার হতে পারে এমন পরামর্শই দিয়েছিলেন, ২৮ চৈত্র [শনি 11 Apr] 'শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রবাবু মহাশয়ের লেখা মত শ্রীমতী রেণুকা দেবীর থাকিবার জন্য আলমোরার বাটীর বন্দবস্ত নিমিত্ত শ্রীযুক্ত সত্যবাবু মহাশয়ের বাবু জগদীশ বসুর বাটী যাতায়াতের গাড়ী ভাড়া'র হিসাব থেকে তা বোঝা যায়। মাসখানেকের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ রেণুকাকে নিয়ে আলমোরা রওনা হন।

রথীন্দ্রনাথ এন্ট্রান্স পরীক্ষার পর দিদি মাধুরীলতার কাছে মজঃফরপুরে বেড়াতে যান। তাঁর পড়াশুনোর পরবর্তী ব্যবস্থা নিয়েও রবীন্দ্রনাথের চিন্তা ছিল। একটি তারিখ-হীন পত্রে [? ভাদ্র ১৩০৯] তিনি শ্রীশচন্দ্রকে লিখেছিলেন :'এন্ট্রেন্স পাস করিয়েই রথীকে আমি জাপানে mining অথবা আর কোন Practical বিষয় শিখতে পাঠাব। আমার উদ্দেশ্য এই যে, শিখে এসে সে শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ে ঐ সকল বিষয়ে শিক্ষাদান করতে পারবে। সন্তোষকে পাঠাওনা। বেশি খরচ নয়—মাসে ৬০ টাকা মাত্র। তুমি যে কোন বিষয়ে তাকে পারদর্শী করতে চাও সেখানে তারই সুবিধা আছে।'[১৪৭] ২১ চৈত্র তিনি লিখলেন : 'রথীকে কোথায় রাখিয়া এফ, এ দেওয়াইব তাহাই চিন্তা করিতেছিলাম। বোলপুর বিদ্যালয়ে শিক্ষকতায় রাখিয়া প্রাইভেট পরীক্ষা দেওয়াইবার কোন বাধা আছে কিনা খবর লইবার জন্য কিছুকাল হইতে সুবোধকে বলিতেছি এখনো তাহার কোন উত্তর পাই নাই। যদি বোলপুরে রাখিয়া প্রাইভেট পরীক্ষা দেওয়াইবার কোন বাধা না থাকে তবে আমি নিশ্চিন্ত হইব নতুবা কি কর্ত্তব্য তাহা ভাবিয়া স্থির করিতে হইবে। অবশ্য সন্তোষ রথীর সঙ্গেই পড়িবে।' তিন বছর পরে তাঁদের দুজনকেই আমেরিকায় কৃষি ও গোপালন-বিদ্যা শিক্ষার জন্য পাঠানো হয়। তার আগে শান্তিনিকেতনেই তাঁদের জন্যই বিশেষ শিক্ষার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। ১৪ বৈশাখ ১৩১০ [সোম 27 Apr] রবীন্দ্রনাথ মনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়কে সর্বশেষ সিদ্ধান্তটি জানিয়েছেন : 'এখানে তাহার পড়াশুনার সুব্যবস্থা করিয়া দেওয়া গেছে। ডিগ্রির প্রতি লোভ পরিত্যাগ করিয়াছি—রথীর যাহাতে শিক্ষা সম্পূর্ণ হয় সেইদিকেই দৃষ্টি রাখা যাইতেছে।'[১৪৮]

এবারেও নিশ্চয়ই ৩০ চৈত্র [সোম 13 Apr] সন্ধ্যায় ছাত্র-শিক্ষকদের নিয়ে রবীন্দ্রনাথ মন্দিরে বর্ষশেষের উপাসনা করেন। কিন্তু রেণুকার অসুস্থতাজনিত উদ্বেগে আগের বছরের মতো রবীন্দ্রনাথ কোনো লিখিত ভাষণ দেননি। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা-তে শান্তিনিকেতনে বর্ষশেষ ও নববর্ষ উপাসনা সম্পর্কে কোনো ভাষণ বা সংবাদ মুদ্রিত হয়নি। রবীন্দ্র-জীবনী-কার রবীন্দ্রনাথের বর্ষশেষ ও নববর্ষের ভাষণ হিসেবে 'ধর্ম' গ্রন্থের যে রচনা-দুটির কথা উল্লেখ করেছেন,[১৪৯] সে দুটি বস্তুত পূর্ব-বৎসরে প্রদত্ত হয়েছিল।

রবীন্দ্রনাথের চোখের বালি উপন্যাস গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় বর্ষশেষ হবার কিছুদিন পূর্বে, বেঙ্গল লাইব্রেরির ক্যাটালগ অনুসারে প্রকাশের তারিখ 5 Apr 1903 [রবি ২২ চৈত্র]। ক্রাউন ৮ পেজী ৩৩৮ পৃষ্ঠার এই গ্রন্থটির মুদ্রণসংখ্যা ১০০০। গ্রন্থটির আখ্যাপত্র ও অন্যান্য বিবরণ :

[আখ্যাপত্র] : চোখের বালি।/শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর/প্রণীত।/ মজুমদার লাইব্রেরি।/১৩০৯।

[পরপৃষ্ঠায়] : শ্রীসুবোধচন্দ্র মজুমদার, বি, এ, ম্যানেজার, মজুমদার লাইব্রেরি, ২০ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

সংস্করণটি আমরা দেখিনি, তাই স্বপন মজুমদার-কৃত 'রবীন্দ্রগ্রন্থসূচি/প্রথম খণ্ড। প্রথম পর্ব' [১৩৯৫] থেকে [পৃ ১৯৩-৯৪] কিছু তথ্য সংকলন করে দিচ্ছি। ১৭ নন্দকুমার চৌধুরী ২য় লেন-এ অবস্থিত কালিকা যন্ত্র

থেকে শ্রীশরচ্চন্দ্র চক্রবর্তী দ্বারা গ্রন্থটি মুদ্রিত হয়, মূল্য দু'টাকা চার আনা। পৃষ্ঠাসংখ্যা : আখ্যাপত্র [২] + অর্ধ-নামপত্র [২] + ৩৩৮।

চৈত্র-সংখ্যা বঙ্গদর্শন [২।১২] প্রকাশিত হয় 1 Apr [বুধ ১৮ চৈত্র]। এই সংখ্যায় রবীন্দ্রনাথের রচনা-সংখ্যা তিনটি :

৬৩১-৩৫ 'বসন্তযাপন' দ্র বিচিত্র প্রবন্ধ ৫।৪৭২-৭৬

৬৩৫-৩৭ 'ঝর্ণাতলা' ['আমাদের এই পল্লিখানি'] দ্র উৎসর্গ ১০।৬৯-৭১ [৪৪]

৬৬৪-৭৫ 'মাল্যদান' দ্র গল্পগুচ্ছ ২২।২৭৩-৮৬

'বসন্তযাপন' প্রবন্ধটি ফাল্গুন মাসের মাঝামাঝি লেখা তার ইঙ্গিত রচনাটির মধ্যেই আছে :'হাতের কাছে পঞ্জিকা নাই; অনুমানে বোধ হইতেছে, আজ ফাল্গুনের প্রায় পনেরোই কি যোলোই হইবে—বসন্তলক্ষ্মী আজ যোড়শী কিশোরী।' তবু প্রতি সপ্তাহে খবরের কাগজ প্রকাশিত হচ্ছে ও তাই নিয়েই তোকজন ব্যস্ত রবীন্দ্রনাথের এই আক্ষেপ রচনাটির সর্বাঙ্গে ব্যাপ্ত। অভিব্যক্তির ইতিহাসে মানুষের একটা অংশ গাছপালার সঙ্গে যুক্ত, সুতরাং ঋতুপরিবর্তনে প্রকৃতিতে যে নূতন রস উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে তাকে অন্তরের মধ্যে উপলব্ধি করাতেই মানবজীবনের সার্থকতা। প্রকৃতির সঙ্গে বিচ্ছেদে নয়, তার সঙ্গে নিগূঢ় আত্মীয়তার অনুভবেই মানবের শ্রেষ্ঠত্ব। 'পূরা মানুষ হইতে হইলে তাহাকে সবই হইতে হইবে'।

প্রবন্ধটি পত্রিকায় প্রকাশের আগেই প্রকৃতিপ্রেমী সতীশচন্দ্র রায় এটি পাঠ করেছিলেন। অজিতকুমার চক্রবর্তীকে লেখা একটি পত্রে তাঁর উচ্ছ্বাস গোপন থাকেনি : 'শ্রীযুক্ত রবিবাবু একটু পরমসুন্দর prose লিখিয়াছেন। রবিবাবু proseএ কলম ধরিয়াছেন এবার আমরা বাঙ্গলার আর এক চমৎকার কবিত্বমন্দিরের সিংহদ্বার খুলিব।'[১৫০]

'মাল্যদান', আমরা অনুমান করেছি, জগদীশচন্দ্রের গল্প-শোনার আকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ করার উদ্দেশ্যে দ্রুত-রচিত, সেইজন্য এই গল্পে অসম্ভাবিত ঘটনাপুঞ্জ কল্পনার খামখেয়ালিতে তড়িৎগতিতে প্রবাহিত হয়ে এক পূর্বপ্রস্তুতিহীন পরিণতি লাভ করেছে। গল্পটির লিখিত-রূপ সম্ভবত 'বসন্তযাপন' প্রবন্ধ রচনার সমকালীন, ফাল্গুন-মধ্যাহ্নের বাসন্তী মায়া গল্পটির সর্বত্র কবিত্বরস সঞ্চার করে দিয়েছে।

তত্ত্ববোধিনী, চৈত্র ১৮২৪ শক [৭১৬ সংখ্যা] :

43 'The God of Upanishads'

ঔপনিষদ ব্রহ্ম গ্রন্থের ৩৮শ অনুচ্ছেদের শেষাংশ ও ৩৯-৪০ অনুচ্ছেদের ['বিশ্বস্যৈকং পরিবেষ্টিতায়ং····তাহা স্বতোবিরোধী' দ্র অ-২।২১০-১২] ইংরেজি অনুবাদ এই সংখ্যায় মুদ্রিত হয়।

সঙ্গীত-প্রকাশিকা, চৈত্র ১৩১০ [২।৭] :

১১২-১৫ ইমন কল্যাণ-ঝাঁপতাল। সংসারে তুমি রাখিলে মোরে দ্র স্বর ৪

১১৫-১৬ আড়ানা-একতাল। মন্দিরে মম কে আসিলে হে দ্র স্বর ৪

গান দুটির স্বরলিপি করেন কাঙালীচরণ সেন।

প্রাসঙ্গিক তথ্য : ১

বর্তমান বৎসরে জোড়াসাঁকো ঠাকুরপরিবারের সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ঘটনা নিশ্চয়ই ৭ অগ্রহায়ণ [রবি 23 Nov] রাত্রে 'ছোটবধূঠাকুরাণী' মৃণালিনী দেবীর মৃত্যু। পরিবারের ছোটবড়ো সকলেই তাঁকে ভালোবাসতেন, সুতরাং তাঁর অকালমৃত্যুতে সকলেই ব্যথিত হয়েছিলেন একথা সহজেই বলা যেতে পারে। ক্যাশবহিতে দেখা যায়, ডাক্তারের ফী ২৪২, নার্সের ফী ২৬ প্রভৃতি নিয়ে তাঁর চিকিৎসার মোট খরচ ৪৭০ টাকা সাড়ে চৌদ্দ আনা। রবীন্দ্রনাথ হোমিয়োপ্যাথি চিকিৎসার উপর শেষপর্যন্ত নির্ভর করে ছিলেন বলেই ব্যয়ের পরিমাণ এত কম, কিন্তু এই কারণেই তাঁর বিরুদ্ধে অনুযোগ করা হয়েছিল তা আমরা ইন্দিরা দেবীর স্মৃতিকথা থেকে জানতে পারি।

বিবাহিতা জ্যেষ্ঠা কন্যা হিসেবে মায়ের মৃত্যুতে মাধুরীলতা হবিষ্য ও ১০ অগ্র° [বুধ 26 Nov] চতুর্থী শ্রাদ্ধ করেন, জ্যেষ্ঠ পুত্র রথীন্দ্রনাথ হবিষ্য ও ১৬ অগ্র° [মঙ্গল 2 Dec] শ্রাদ্ধ করেন, মোট ব্যয় ২৫২ টাকা সাড়ে ১৩ আনা।

এর কিছুদিন পরে রবীন্দ্রনাথের মামাতো ভাই বিমানেন্দ্রনাথ রায়ের মৃত্যু হয়; তারিখটি জানা যায়নি, ২১ পৌষ [সোম 5 Jan 1903] 'বাবু বিমানেন্দ্রনাথ রায়ের মৃত্যু হওয়ায় অন্তেষ্টি ক্রীয়ার ব্যয়····আদ্যশ্রাদ্ধের ব্যয়····' ক্যাশবহির এই হিসাব থেকে ঘটনাটি জানা যায়। বিমানেন্দ্র রবীন্দ্রনাথের খুব অনুগত ছিলেন, শিলাইদহে থাকার সময়ে তাঁর পুত্রকন্যারাও 'বিমানকাকা'কে খুব পছন্দ করতেন 'মাধুরীলতার চিঠি'তে তার উল্লেখ আছে।

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ শ্রাবণ মাসে হঠাৎ খুব অসুস্থ হয়ে পড়েন। তাঁর বয়স এখন ৮৬ বৎসর, সুতরাং তাঁর সামান্য অসুস্থতাই পরিবারের পক্ষে আশঙ্কাজনক। ৫ শ্রাবণ [সোম 21 Jul]-এর একটি হিসাব এই উদ্বেগকে খানিকটা ধরে রেখেছে : 'শ্রীযুক্ত কর্ত্তাবাবু মহাশয়ের পীড়ার খপর দিতে বালীগঞ্জ বেনেপুকুর প্রভৃতি স্থানে যাতায়াতের ও ডাক্তারদিগকে আনিবার ও উঁহাদের আসাযাওয়ার প্রভৃতি গাড়ীভাড়া····'। আশ্চর্য জীবনীশক্তির অধিকারী ছিলেন তিনি, তাই এই সংকটও তিনি কাটিয়ে ওঠেন। রবীন্দ্রনাথ টেলিগ্রাম পেয়ে শিলাইদহ থেকে এসে শ্রীশচন্দ্র মজুমদারকে লিখেছেন : 'বাবামশায়ের হঠাৎ জ্বর হওয়াতে টেলিগ্রাম পেয়েই আজ এখানে এসেছি। কাল সকলেরই ভয় হয়েছিল কিন্তু আশ্চর্য্য এই যে আজ সকালেই তিনি ভাল বোধ করচেন এবং অন্যান্য দিনের মত ছাতে গিয়ে উপাসনাদি নিত্যকৃত্য সমাপন করেছেন। ওঁর শরীরের প্রাণশক্তি দেখলে আশ্চর্য্য হতে হয়। ইংরাজ ডাক্তাররা বলে ওঁর বয়সে এ রকম নাড়ি তারা কখনো দেখেনি।'[১৫১]

মহর্ষি-পরিবারে এই বৎসর অনেকগুলি শুভানুষ্ঠান হয়। ৩০ আষাঢ় [সোম 14 Jul] সুধীন্দ্রনাথের প্রথম পুত্র সৌম্যেন্দ্রনাথের [জন্ম : Oct 1901] ও নলিনী দেবীর প্রথমা কন্যা সুরমার অন্নপ্রাশন হয়। ১০০০৷৷ল০ ব্যয় দেখে সমারোহের পরিমাণটি বোঝা যায়। রবীন্দ্রনাথ কলকাতায় ছিলেন, তিনি ৪্ টাকা যৌতুক দেন।

২২ শ্রাবণ [বৃহ 7 Aug] বর্ণকুমারী দেবীর দুই পুত্র সরোজনাথ ও প্রমোদনাথের বিবাহ হয় যথাক্রমে তরুবালা ও সুধীরাবালা দুই বোনের সঙ্গে।

পরের দিন ২৩ শ্রাবণ [শুক্র 8 Aug] হেমেন্দ্রনাথের কনিষ্ঠ পুত্র ঋতেন্দ্রনাথের সঙ্গে রমানাথ ঠাকুরের দৌহিত্র অমিয়নাথ মুখোপাধ্যায়ের তৃতীয়া কন্যা অলকা দেবীর বিবাহ হয়। এঁর জ্যেষ্ঠা ভগিনীকে বিবাহ করেছিলেন হিতেন্দ্রনাথ।

দিনেন্দ্রনাথের দ্বিতীয় বিবাহ হয় ৩০ শ্রাবণ [শুক্র 15 Aug] ক্ষেত্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের কন্যা কমলা দেবীর সঙ্গে। রবীন্দ্রনাথের স্নেহভাগিনী এই 'নাতবউ' শান্তিনিকেতনের সামাজিক জীবনের অনেকখানি অধিকার করে ছিলেন।

রবীন্দ্রনাথের দ্বিতীয়া কন্যা রেণুকার বিবাহ হয়েছিল সাড়ে দশ বৎসর বয়সে ২৪ শ্রাবণ ১৩০৮ তারিখে, বিয়ের কয়েকদিন পরে তাঁর স্বামী সত্যেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য ইংলণ্ড রওনা হন। তিনি অকালে ফিরে আসার পর রেণুকার 'দ্বিতীয় বিবাহ' বা ফুলশয্যা হয় ১৯ আশ্বিন [রবি 5 Oct]। এর কিছুদিন পরেই তাঁর জ্বর ও কাশি শুরু হয়। রবীন্দ্রনাথ প্রথমে তাঁর ক্ষেত্রেও সর্বরোগহর হোমিয়োপ্যাথিক দাওয়াইয়ের ব্যবস্থা করেছিলেন। ইন্দিরা দেবী লিখেছেন : 'ক্রমশ যখন রানীর অসুখ ধরা পড়ল তখন শুনেছি নাটোরের মহারাজা তাকে মধুপুরে নিয়ে যান। অমলা দাসের পরিচর্যা আর হাওয়াবদলের গুণে তার বেশ উপকার হয়েছিল।'[১৫২] অমলা দাসের সঙ্গে ইন্দিরা দেবীর রীতিমত পত্রবিনিময় হত, সুতরাং 'শুনেছি' কথাটির অর্থ বোঝা শক্ত। জগদীশচন্দ্র অবশ্য রেণুকার জন্য অন্যবিধ চিকিৎসার ব্যবস্থা করে দেন। 17 Mar [৩ চৈত্র] তিনি লেখেন : 'আজ ওজোনের কল ডাকে পাঠাই। একদিকে যেদুটি তার দেখিতেছ তাহার সঙ্গে রূমকর্ফ কয়েল্ লাগাইও। মুখ দিয়া আস্তে আস্তে বাতাস নিতে হইবে, অথবা এক নাসিকারন্ধ্র বন্ধ করিয়া অন্য দ্বারা শ্বাস টানিতে হইবে। ইহাতে ওজোন অধিক পরিমাণে হইবে।'[১৫৩] তিনি ছবি এঁকে প্রয়োগ-পদ্ধতিও বুঝিয়ে দেন।

সত্যেন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠপুত্র সুরেন্দ্রনাথ এই বৎসর ত্রিশ বৎসর পূর্ণ করলেন। তাঁর বিবাহ নিয়ে কথাবার্তা কিছুদিন ধরেই চলছিল। বর্তমান বৎসরেও ২৪ আষাঢ় [8 Jul] 'শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রবাবুর বিবাহের কথাবার্ত্তার জন্য শ্রীমতী মেজবধুঠাকুরাণীর আহ্বানে শ্রীযুক্ত সত্যবাবু মহাশয়ের বালীগঞ্জ যাতায়াতের' হিসাব পাওয়া যায়। ইন্দিরা দেবী লিখেছেন : 'একটি ভালো ঘরের মেয়ে, দেখতে মন্দ না, ম্যাট্রিক পাস, তার সঙ্গে বন্ধুবান্ধবের মধ্যস্থতায় সুরেনের বিয়ে একরকম ঠিকই হয়েছিল। এমন-কি, আমরা কজনে বরপক্ষ-স্বরূপ তাদের ওখানে নিমন্ত্রিত হয়ে জলযোগ পর্যন্ত করে এসেছিলুম। কিন্তু কন্যাপক্ষের একজন নিকট আত্মীয়, খুব বিখ্যাত কৌঁসুলীর মত নিতে যাওয়ায় তিনি বললেন যে, আদি ব্রাহ্মসমাজের বিবাহ-পদ্ধতি আইনসিদ্ধ কি না সন্দেহ। তাই বিয়ে ফেঁসে গেল।'[১৫৩ক] এই প্রশ্ন ওঠায় সম্ভবত ঠাকুরপরিবারের পক্ষ থেকেও আদি ব্রাহ্মসমাজের বিবাহ-পদ্ধতির আইনগত বৈধতা যাচাই করে নেওয়া হয়েছিল। ২৪ চৈত্র [মঙ্গল 7 Apr] সরকারী ক্যাশবহিতে একটি হিসাব দেখা যায় :'বঃ মর্গেন এণ্ড কো° দং শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রবাবু মহাশয়/বিবাহের অপিনিয়ন তাহার ব্যয় ২০০্'—হিসাবটি হয়তো উল্লিখিত সমস্যার সঙ্গে সম্পর্কিত।

আমরা জানি, রবীন্দ্রনাথ ও সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর কোম্পানির দেনা শোধের জন্য মোতিচাঁদ নাখতারের কাছ থেকে চল্লিশ হাজার টাকা ধার করেন বার্ষিক শতকরা সাত টাকা সুদে। সেই ঋণ পরিশোধ করা হয় তারকনাথ পালিতের কাছ থেকে একই সুদে পঞ্চাশ হাজার টাকা ধার করে। কিন্তু এছাড়াও সত্যেন্দ্রনাথ পৈতৃক জমিদারির এক-তৃতীয়াংশ [এই অংশ তখনও তাঁর নিজের নয়] বন্ধক রেখে বার্ষিক শতকরা ছ'টাকা সুদে

তারকনাথ পালিতের কাছ থেকেই এক লক্ষ টাকা ধার করেন 6 Sep [শনি ২১ ভাদ্র] তারিখে।[১৫৪] সত্যেন্দ্রনাথ ও সুরেন্দ্রনাথ এই সময় থেকেই একটি অর্থনৈতিক বিষচক্রে জড়িয়ে পড়েন—টাকা ধার করে তাঁদের অন্য ঋণ শোধ করতে হয়েছে, যার পরিণতি হয় সুরেন্দ্রনাথের 'দেউলিয়া' ঘোষণায়।

দেবেন্দ্রনাথের সঙ্গে গগনেন্দ্রনাথদের সম্পত্তি-বিভাগের আপোষ মামলার সূত্রপাত হয়েছিল 1897-এ। এর অবসানে ১ কার্তিক [শনি 18 Oct] গগনেন্দ্রনাথ-প্রমুখ তিন ভাই দেবেন্দ্রনাথের কাছে এজমালি জমিদারি ও অন্যান্য স্থাবর সম্পত্তির পার্টিশন এবং এক হাজার টাকা প্রার্থনা করেন। 14 Sep 1903 [সোম ২৮ ভাদ্র ১৩১০] তাঁরা দ্বিপেন্দ্রনাথের কাছ থেকে এক হাজার টাকার একটি চেক গ্রহণ করেন।[১৫৫] তখন থেকেই দ্বারকানাথের সম্পত্তি আইনত বিভক্ত হয়ে যায়।

প্রাসঙ্গিক তথ্য : ২

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের ৮৬তম জন্মোৎসব পালনের জন্য ৩ জ্যৈষ্ঠ [শনি 17 May] 'ব্রাহ্মসাধারণ তাঁহার গৃহপ্রাঙ্গণে অপরাহ্ন ৫ ঘটিকার সময়ে সমাগত হইলে ভক্তিভাজন আচার্য্য শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর ব্রহ্মোপাসনা করিয়া.... বক্তৃতা করেন।'[১৫৬] ত্রৈলোক্যনাথ সান্যালের প্রার্থনা ও শিবনাথ শাস্ত্রীর ভাষণ হয়। উপাধ্যায় গৌরগোবিন্দ রায় 'ভক্ত্যুপহার' রচনা ও মুদ্রিত করে বিতরণ করেন।

৭ পৌষ [সোম 23 Dec] শান্তিনিকেতনে দ্বাদশ সাম্বৎসরিক ব্রহ্মোৎসব 'অনেক সম্ভ্রান্ত লোক'-এর উপস্থিতিতে মহাসমারোহে অনুষ্ঠিত হয়। এই অনুষ্ঠানের মোট ব্যয় ৩৭৪৯ টাকা ১০ আনা থেকে সমারোহের প্রকৃতিটি বোঝা যায়। প্রাতঃকালীন উপাসনায় চিন্তামণি চট্টোপাধ্যায় উদ্বোধন করেন। 'প্রাতঃকালীন উপাসনার পর ত্রৈলোক্য [সান্যাল] বাবু দলবলসহ কীর্ত্তন করিতে ২ সপ্তপর্ণমূলে যান এবং তথায় বিশেষ উৎসাহের সহিত কীর্ত্তন করেন।····যাত্রা হইয়াছিল।'[১৫৭] রাত্রিকালীন উপাসনায় রবীন্দ্রনাথ 'ধর্মের সরল আদর্শ' প্রবন্ধটি পাঠ করেন, একথা আমরা পূর্বেই বলেছি।

কলকাতায় মহর্ষির দীক্ষাদিন পালন করা শুরু হয়েছিল। কিন্তু 'এইবার ৬ই পৌষের নিশীথ রাত্রি হইতে অবিশ্রাম ধারাসম্পাত হইতে লাগিল,··এমন সময়ে [৭ পৌষ প্রাতে] ধর্ম্মপ্রাণ শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় শারীরিক অসুস্থতা সত্ত্বেও এই দুর্দ্দিনে যথাসময়ে উপস্থিত হইয়া তাঁহার চিরপরিচিত নিষ্ঠার মর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখিলেন।'[১৫৭]

১১ মাঘ [রবি 25 Jan] ত্রিসপ্ততিতম সাম্বৎসরিক ব্রাহ্মসমাজ উপলক্ষে প্রাতে আদি ব্রাহ্মসমাজ গৃহে প্রিয়নাথ শাস্ত্রী, শম্ভুনাথ গড়গড়ি ও চিন্তামণি চট্টোপাধ্যায় বেদি গ্রহণ করেন। 'রাত্রিতে শ্রীমন্মহর্ষি দেবের গৃহপ্রাঙ্গণ আলোকমালায় উজ্জ্বল ও লোকে পরিপূর্ণ হইলে বেদগান হইতে লাগিল।' দ্বিজেন্দ্রনাথ, রবীন্দ্রনাথ ও শিবধন বিদ্যার্ণব বেদি গ্রহণ করেন। মাঘোৎসবে রবীন্দ্রনাথের এই প্রথম বেদিগ্রহণ; তিনি এখানেও 'ধর্মের সরল আদর্শ' প্রবন্ধটির একটি সংক্ষিপ্ত ও ঈষৎ পরিবর্তিত রূপ পাঠ করেন।

২০ আষাঢ় [শুক্র 4 Jul] রাত্রি ৯টার সময়ে মাত্র উনচল্লিশ বৎসর ছ'মাস বয়সে স্বামী বিবেকানন্দ দেহত্যাগ করেন। 1893-তে আমেরিকায় Parliament of Religions সভায় তিনি যে বিশ্বখ্যাতি লাভ

করেছিলেন, তার পরবর্তী দশ বছরের কঠোর পরিশ্রম তাঁর অকালমৃত্যুর কারণ। কিন্তু এই দশ বছরে তিনি রামকৃষ্ণ মিশন ও বেদান্ত আন্দোলনকে যে সুনিশ্চিত প্রতিষ্ঠা দান করেছিলেন তার প্রভাব আজও ক্রিয়াশীল। সমকালীন যুবমনে তিনি যে আগুন জ্বালিয়ে দিয়েছিলেন, কিছুদিনের মধ্যেই তা ভারতের মুক্তিসংগ্রামে চরমপন্থী বিপ্লব-আন্দোলনে অন্যতম প্রেরণা হিসেবে কাজ করতে থাকে। অধ্যাপক শঙ্করীপ্রসাদ বসু তাঁর 'বিবেকানন্দ ও সমকালীন ভারতবর্ষ' গ্রন্থের সপ্তম খণ্ডে [১৩৯৪] বিবেকানন্দের বিচিত্রমুখী ও দীর্ঘকালব্যাপী প্রভাবের প্রকৃতি নিয়ে আলোচনা করেছেন।

স্বামীজী প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে কিছু রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের সঙ্গে যুক্ত থাকলেও রামকৃষ্ণ মিশন ও বেলুড় মঠকে রাজনৈতিক সংযোগ থেকে দূরে রাখতে চেয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর আইরিশ-বংশোদ্ভূত শিষ্যা নিবেদিতা কাউন্ট ওকাকুরার সহযোগে বিশেষভাবেই ব্রিটিশ-বিরোধী রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়েন। ফলে স্বামীজীর মৃত্যুর পক্ষকাল পরে 19 Jul [শনি ৩ শ্রাবণ] *Amrita Bazar Patrika*-য় বেলুড় মঠ কর্তৃপক্ষের সঙ্গে নিবেদিতার সম্পর্কচ্ছেদের কথা ঘোষিত হয় : 'That her work shall henceforth be regarded as free and entirely independent of their sanction or authority.'[১৫৮] এরপর নিবেদিতা কেবল বালিকাবিদ্যালয় পরিচালনার মধ্যে নিজেকে আবদ্ধ রাখতে পারেননি। 24 Jul [৮ শ্রাবণ] তিনি মিস ম্যাকলাউডকে লিখেছেন : 'OnlyI think my task is to awake a nation, not to influence a few women.'[১৫৯] অবশ্য স্বামীজীর বাণী প্রচারেও তিনি আলস্য দেখাননি।

ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়ের উপর বিবেকানন্দের মৃত্যুর প্রতিক্রিয়া কিরূপ হয়েছিল, তা আমরা আগেই বলেছি। ২১ আষাঢ় [শনি 5 Jul].শান্তিনিকেতন থেকে ফিরে হাওড়া স্টেশনেই তিনি স্বামীজীর মৃত্যুসংবাদ শোনেন, তাঁর 'ফিরিঙ্গিজয় ব্রত' উদ্‌যাপনের জন্য 'সেই হাবড়া ইষ্টিশানে স্থির করিলাম, বিলাতে গিয়া বেদান্তের প্রতিষ্ঠা করিব।' ব্রহ্মবান্ধব সংকল্পসিদ্ধির জন্য অপেক্ষায় বিশ্বাসী ছিলেন না, মাত্র সাতাশটি টাকা সম্বল করে তিনি কলকাতা ত্যাগ করেন ও পথে বন্ধুদের কাছ থেকে কিছু অর্থসংগ্রহ করে 5 Oct [রবি ১৯ আশ্বিন] বোম্বাই থেকে জেনোয়া-গামী জাহাজে চড়েন। 4 Nov [মঙ্গল ১৮ কার্তিক] তিনি প্রায় নিঃসম্বল অবস্থায় লণ্ডনে পৌঁছন। মনোরঞ্জন গুহ লিখেছেন, হিন্দু ধর্মতত্ত্ব বিষয়ে তিনি Dec 1902-তে অক্সফোর্ডে চারটি এবং Mar 1903-তে কেমব্রিজে তিনটি বক্তৃতা দেন; 'কেমব্রিজে ব্রহ্মবান্ধবের বক্তৃতার এমন প্রভাব হল যে, সেখানকার বড় বড় প্রফেসররা মিলে একটা কমিটি তৈরী করে ফেললেন, যার উদ্দেশ্য হল কেম্‌ব্রিজে [প্রকৃতপক্ষে অক্সফোর্ডে] হিন্দু দর্শনের অধ্যাপনার জন্য একটি স্থায়ী পদ সৃষ্টি করা। ব্রহ্মবান্ধবকে এই কমিটির ভারতীয় সেক্রেটারি নিযুক্ত করা হল—তাঁর কাজ হবে ভারতবর্ষ থেকে একজন উপযুক্ত অধ্যাপক পাঠানো এবং তাঁর তিন বছরের মাইনে বাবদ এক হাজার পাউণ্ড সংগ্রহ করে দেওয়া।'[১৬০] এবিষয়ে ব্রহ্মবান্ধব রবীন্দ্রনাথের সঙ্গেও পত্রালাপ করেন। রবীন্দ্রনাথ জগদীশচন্দ্রের মারফৎ য়ুরোপে ভারতের জয়ধ্বজা স্থাপনের জন্য কী করেছিলেন তা আমরা জানি। একই উদ্দেশ্যে তিনি ব্রহ্মবান্ধবকেও সাহায্য করতে অগ্রসর হয়েছেন। ২৬ ফাল্গুন [10 Mar] তিনি মোহিতচন্দ্র সেনকে লিখেছেন : 'উপাধ্যায় মহাশয়ের শেষ পত্রখানি এই সঙ্গে পাঠাইতেছি। যদি অবকাশ পান তবে পত্রখানি জগদীশকে লইয়া দেখাইবেন তিনি খুসি হইবেন। ভারতবর্ষের যথার্থভাবে আত্মপরিচয় দিবার সময় আসিয়াছে। এখন তাহাকে আর সঙ্কুচিত হইয়া থাকিলে চলিবে না।'[১৬১]

ব্রহ্মবান্ধবের পত্রটি পাওয়া যায়নি, কিন্তু রবীন্দ্রনাথ তার উত্তর দিয়েছিলেন, সেই ‘kind and sympathetic letter’ পেয়ে ব্রহ্মবান্ধব 9 Apr [বৃহ ২৬ চৈত্র] অক্সফোর্ড থেকে একটি দীর্ঘ পত্রে উক্ত কমিটির সম্পর্কে বিভিন্ন তথ্য জানিয়ে লিখেছেন: ‘To start a Hindu lecturership exactly on the old lines of Brahmacharya in proud Oxford will be, no doubt, a grand movement towards the triumph of Hinduism.’[১৬২] কন্যা রেণুকাকে নিয়ে এইসময়ে রবীন্দ্রনাথ খুবই বিব্রত [ব্রহ্মবান্ধবের পত্রেও প্রসঙ্গটি আছে], তবু তিনি এ নিয়ে বিভিন্ন ব্যক্তির সঙ্গে যোগাযোগ করেন। নিবেদিতা হয়তো বিলেতের কোনো পত্রিকায় ব্রহ্মবান্ধব সম্পর্কে লেখার জন্য নিজে বা জগদীশচন্দ্র মারফৎ তাঁর কাছে তথ্যাদি চেয়ে পাঠান—রবীন্দ্রনাথ মোহিতচন্দ্রের উপর দায়িত্বটি দিয়ে সম্ভবত ২০ বৈশাখ ১৩১০ [রবি 3 May 1903] তাঁকে লেখেন : ‘উপাধ্যায়ের সম্বন্ধে বক্তব্য একটু সত্বর লিখে আমাকে হাজারিবাগের ঠিকানায় পাঠাবেন। Miss Noble বোধ হয় ব্যস্ত হয়েচেন। আগামী মেলে পাঠাতে পারলেই ভাল হত। বিস্তারিত জীবনীর কি প্রয়োজন আছে?’[১৬৩] ব্রহ্মবান্ধব সম্ভবত ১৮ শ্রাবণ ১৩১০ [সোম 3 Aug] কলকাতায় ফিরে আসেন। রবীন্দ্রনাথ এই দিনই* মোহিতচন্দ্রকে লেখেন : ‘উপাধ্যায় মশায় কি ফিরেছেন? তিনি একবার আলমোড়ায় যদি বেড়াতে আসেন তাহলে তাঁর দিগ্বিজয়ী কাহিনী একবার ভাল করে শুনে নিই।’[১৬৪] প্রত্যুত্তরে মোহিতচন্দ্র ২২ শ্রাবণ [শুক্র 7 Aug] লেখেন : ‘উপাধ্যায় ফিরে এসেছেন—তাঁকে আপনার নিমন্ত্রণ জানাব। বেশ মোটাসোটা গোল চেহারা নিয়ে ফিরে এসেছেন—সোমবার যেদিন এলেন সেইদিনই তাঁর সঙ্গে দেখা হয় ও আমরা জগদীশবাবুর বাড়ীতে যাই।····বোধ হয় জানুয়ারী মাসে আবার বিলাত যাবেন।’[১৬৫] ব্রজেন্দ্রনাথ শীলকে অধ্যাপক করে পাঠানোর সিদ্ধান্ত হয়। জগদীশচন্দ্র প্রথমে এ ব্যাপারে উৎসাহী ছিলেন, তিনি 10 Aug [২৫ শ্রাবণ] রবীন্দ্রনাথকে লেখেন : ‘পরশুদিন উপাধ্যায় মহাশয়ের সহিত আলাপাদি করিবার জন্য আমি বন্ধুবর্গকে নিমন্ত্রণ করিয়াছি।’[১৬৬] কিন্তু কয়েকদিনের মধ্যেই তিনি বিরক্ত হয়ে 18 Aug [১ ভাদ্র] লেখেন : ‘এখানে কোন কাজে ১০ জনের এক মত নাই। তবুও যতদূর পারিয়াছি এ জন্য চেষ্টা করিয়াছি। কিন্তু তোমাকে বলিতে কি, আমার দশ কাজে যাইতে কোন অভিরুচি নাই।’[১৬৭] অন্যেরাও শেষপর্যন্ত জগদীশচন্দ্রের পথই অবলম্বন করেন। ব্রহ্মবান্ধবের ‘ফিরিঙ্গিজয়ব্রত’ও ভিন্নপথাবলম্বী হয়।

প্রাসঙ্গিক তথ্য : ৩

ওকাকুরা-নিবেদিতা-সুরেন্দ্রনাথের যে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড গতবৎসর আরম্ভ হয়েছিল তা বর্তমান বৎসরেও অব্যাহত থেকেছে। কিন্তু তাঁরা ফলবান কোনো কাজ করেছিলেন কিনা তা আজও অজ্ঞাত। ওকাকুরা ও সুরেন্দ্রনাথ এবিষয়ে একেবারেই নীরব ছিলেন—যা-কিছু খবর তা পাওয়া যায় নিবেদিতার পত্রাবলীতে—কিন্তু সন্ধ্যাভাষায় লেখা সেই পত্রগুলি রহস্য-রোমাঞ্চের আবহ সৃষ্টিতে যতটা সার্থক, তথ্য বা কার্যকরী প্রমাণের দিক দিয়ে ততটা মূল্যবান নয়। বস্তুত 1907 পর্যন্ত বাংলা তথা ভারতের বৈপ্লবিক কর্মকাণ্ড একদিকে মুখরতা ও অন্যদিকে ফিস্‌ফিস্-গোপনীয়তার ছেলেমানুষি দ্বারা আক্রান্ত—বহ্বারম্ভ শেষ পর্যন্ত লঘুক্রিয়ায় পর্যবসিত হয়েছিল।

কলকাতার জাতীয় কংগ্রেস অধিবেশনে সরলা দেবী রচিত 'অতীত গৌরব বাহিনী মম বাণী/গাও আজি হিন্দুস্থান' গানটি গীত ও প্রশংসিত হবার পর তাঁর জনসংযোগের উৎসাহ বেড়ে যায়। জ্ঞানদানন্দিনী দেবীর সামাজিক বিপ্লবাত্মক কর্মকাণ্ডের পর সরলা দেবীই ঠাকুরপরিবারে নারীস্বাতন্ত্র্যের জয়ধ্বজা উত্তোলন করেন—রক্ষণশীল দেবেন্দ্রনাথের দৌহিত্রী বিদেশে চাকরি করতে যাচ্ছেন, এর বৈপ্লবিক তাৎপর্য আজকের দিনে অনুভব করাও কঠিন।

সরলা দেবীর রাজনৈতিক কাজকর্ম আরম্ভ হয় ভারতী-কে কেন্দ্র করে। ১৩০৮ বঙ্গাব্দেই তাঁর দ্বারা সম্পাদিত ভারতী-তে রমেশচন্দ্র দত্ত 'ভারতীয় দুর্ভিক্ষ : তাহার কারণ ও প্রতিকার' [আষাঢ়], 'বৃটিশ-শাসনে ভারতীয় শিল্পের অবনতি' [শ্রাবণ], বঙ্গদেশে রাজস্ব বন্দোবস্ত : ওয়ারেন হেষ্টিংসের শাসনকাল' [পৌষ], 'ভারতের অর্থনৈতিক সমস্যা' [ফাল্গুন], 'ভূমিকর আন্দোলনের ফলাফল' [বৈশাখ, আষাঢ় ১৩০৯] প্রভৃতি প্রবন্ধ লিখে দেশীয় পাঠকের অসন্তোষ বৃদ্ধি করছিলেন। জ্ঞানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও পরেশনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ও নিয়মিত রাজনৈতিক প্রবন্ধ লিখতেন। সরলা দেবী নিজে ১৩০৯ বঙ্গাব্দে নিয়মিত লিখে চললেন 'বাঙ্গালী পাড়ায়' (বৈশাখ], 'নেটিভ-পীড়ন' [আশ্বিন], 'সাদা কাজীর বিচার' [কার্তিক], 'খোকার ভাত' [অগ্র°], 'সাহেবজাতির কুটুম্ব-বাৎসল্য' [পৌষ], 'অপূর্ব্ব বিচার-কৌশল' [ফাল্গুন], বিলাতী ঘুসি বনাম দেশী কিল' [আষাঢ় ১৩১০] প্রভৃতি স্বাক্ষর-হীন রচনা। তিনি তাঁর আত্মজীবনীতে এইসব কাহিনী এলোমেলো করে লিখেছেন, ফলে ঘটনাপ্রবাহটি স্পষ্ট রূপ নিতে পারেনি—কিন্তু একটু সাজিয়ে নিলেই গণজাগরণে তাঁর ভূমিকাটির রেখাচিত্রণ করা যায়। এর মধ্যে ২৩ আশ্বিন [বৃহ 9 Oct] দুর্গাষ্টমীর দিনে তিনি 'বীরাষ্টমী' উৎসবের প্রবর্তন করলেন। *New India*-র 30 Oct 1902-সংখ্যায় [p. 132] লেখা হয়:

> The "Bir-Astami".... The movement started last Astami day by Miss Sarala Ghosal,....lead to the institution of a national sporting day,⋯.She gathered a number of young people on this day, and gave a performance in mock sword-play, which, for a first attempt, was eminently successful,.... It is a peculiarity of British character to respect only those who are able to beat them down in any fair competition. ⋯ইত্যাদি।

পত্রিকাটি সরলা দেবীর উদ্দেশ্য ঠিকই অনুধাবন করতে পেরেছিল।

সরলা দেবী-প্রবর্তিত এই ব্যায়াম-প্রদর্শনী আরও অনেকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। 8 Apr 1903 [বুধ ২৫ চৈত্র] নাটোরের মহারাজা জগদিন্দ্রনাথ রায়ের সভাপতিত্বে বহরমপুরে বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মেলন শুরু হয়। এর আগেই বেঙ্গলী-তে [31 Mar] লেখা হয় : 'Babu Boikuntho Nath Sen of Berhampore has taken up Miss Ghosal's suggestion about the Olympic games and is organising a display of national sports such as sword-play, lathi, wrestling, etc. in connection with the ensuing Conference.'অধিবেশন শেষ হওয়ার পর 11 Apr [শনি ২৮ চৈত্র] বহরমপুরে এই 'Olympic Games' হয় : ' ⋯.Among others a team from Serampore under the lead of Prof. Mamtaz [Murtaza] was sent here at the instance of Miss Ghosal.'[১৬৮]

ইতিমধ্যে বরোদার অশ্বারোহী বাহিনী থেকে গায়কোয়াড়ের দেহরক্ষী বাহিনীতে উন্নীত যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় [1877-1930] অরবিন্দ ঘোষের পরিচয়পত্র নিয়ে সরলা দেবীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছেন। ভারতী-র ১৩০৯ বঙ্গাব্দের আশ্বিন ও কার্তিক সংখ্যায় তাঁর লেখা 'ইতালীর নবজীবন' এবং পৌষ-সংখ্যায় 'ক্রমশঃ'-

চিহ্নিত 'উত্তর ইতালীর উদ্ধার' রচনার প্রকাশ তাঁদের সংযোগের সময়-নির্দেশক। সরলা দেবী তাঁকে অনুশীলন সমিতির সভাপতি ব্যারিস্টার প্রমথনাথ মিত্রের [1853-1910] সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেন।

অনুশীলন সমিতির প্রতিষ্ঠাকালটি নিয়ে সংশয় আছে। ড ভূপেন্দ্রনাথ দত্তের 'ভারতের দ্বিতীয় স্বাধীনতার সংগ্রাম' গ্রন্থের পরিশিষ্টে প্রদত্ত সমিতির প্রতিষ্ঠাতা নামে কথিত সতীশচন্দ্র বসুর [1876-1948] বিবৃতিতে [নবভারত সংস্করণ : Oct 1983, পৃ ১৭৯-৮৯] কোনো তারিখ না থাকলেও অধ্যাপক শঙ্করীপ্রসাদ বসু 'বিবেকানন্দ ও সমকালীন ভারতবর্ষ' ষষ্ঠ খণ্ডে [অগ্র° ১৩৯২] 24 Mar 1902 [সোম ১০ চৈত্র ১৩০৮ দোলপূর্ণিমার দিন] তারিখটি উল্লেখ করেছেন,* কিন্তু তিনিই আবার 'নিবেদিতা লোকমাতা দ্বিতীয় খণ্ডে [বৈশাখ ১৩৯৪] সমিতির প্রতিষ্ঠাকাল নিয়ে বিতর্ক উপস্থিত করে '১৯০২-এর শেষের দিকে'র প্রতি তাঁর সমর্থন জানিয়েছেন।[১৬৯] আমাদের সমর্থন, প্রথমোক্ত সময়টির প্রতি। সতীশচন্দ্র বসু লেখেন, তিনি [২১] মদন মিত্র লেনে একটি 'ছোট লাঠিখেলার ক্লাব' স্থাপন করলে তাঁর অনুরোধে নিউ ইণ্ডিয়ান স্কুলের হেডমাস্টার নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য 'বঙ্কিম বাবুর সাহিত্য হইতে গৃহীত' 'অনুশীলন সমিতি' নামকরণ করেন। তেঘরিয়ার শশিভূষণ রায়চৌধুরী সতীশচন্দ্রকে ব্যারিস্টার আশুতোষ চৌধুরীর কাছে নিয়ে গেলে তিনি পরিচয়পত্র দিয়ে প্রমথনাথ মিত্রের সঙ্গে যোগাযোগ করিয়ে দেন। 'তাঁহাকে সব কথা বলিলে তিনি excited হইয়া আমাকে জাপটাইয়া ধরিলেন; পরে তিনি ক্লাবের Commander-in-chief হইলেন। সাতদিন বাদে তিনি আমাকে ডাকিয়া বলিলেন, "বরোদা হইতে একটা দল আসিয়াছে—তোমাদের উদ্দেশ্য অনুযায়ী উদ্দেশ্য তাহাদেরও। সর্ব্বপ্রকার training তাহারা দিবে। তাহাদের সহিত তোমাদের amalgamate করিতে হইবে।" আমরাও রাজী হইলাম।·····তাহার ফলে যে দল গঠিত হইল তাহার সভাপতি হইলেন প্রমথনাথ মিত্র, সহকারী সভাপতি হইলেন চিত্তরঞ্জন দাস ও অরবিন্দ ঘোষ, কোষাধ্যক্ষ সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর। এই সঙ্গে দলে আসিলেন অশ্বিনীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ও সুরেন্দ্রনাথ হালদার (চিত্তরঞ্জনের শ্যালক) ব্যারিষ্টারদ্বয়। সভ্যদের ঘোড়ায় চড়া অভ্যাস করার জন্য হালদার মহাশয় একটি ছোট ঘোড়া এই সঙ্গে দলকে দান করিয়াছিলেন। এই সঙ্গে একটি ব্যায়ামের আখড়া [১০৮] আপার সার্কুলার রোডে স্থাপিত হইল। বরোদা হইতে আগত যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বলিলেন, "মদন মিত্রের লেনের আখড়া পৃথকভাবে থাকুক। আমাদের অল্প বয়সের সভ্যেরা মদনমিত্রের লেনের আখড়ায় থাকুক, আর বয়স্ক সভ্যেরা যতীন বাবুর নেতৃত্বে আপার সার্কুলার রোডের আখড়ায় ব্যায়াম অভ্যাস করুক।"'[১৭০] সতীশচন্দ্রের 'সাতদিন বাদে' কথাটি অত্যন্ত অস্পষ্ট হলেও নিশ্চয়ই আশ্বিন ১৩০৯-এর পূর্ববর্তী, এর আগেই যতীন্দ্রনাথ বরোদা থেকে এসে অশ্বারোহণ ও যুদ্ধবিদ্যা শিক্ষা দেওয়া ছাড়াও মাৎসিনির আত্মচরিত অবলম্বনে ইতালির নবজীবন লাভের কাহিনী আখড়ার সভ্যদের কাছে বর্ণনা করছিলেন। আর অরবিন্দের সহকারী সভাপতিত্বের ব্যাপারটিও বেশ গোলমেলে, আলোচ্য সময়ে ওকাকুরা কলকাতাতেই রয়েছেন ও নিবেদিতা বরোদায় গিয়ে অরবিন্দের সঙ্গে কথাবার্তাও বলেননি। পশ্চিম ভারতে বক্তৃতা-সফরের সময়ে নিবেদিতা বরোদায় যান 20 Oct 1902 [সোম ৩ কার্তিক]। স্টেশনে অরবিন্দ তাঁকে অভ্যর্থনা জানান; তিনি স্বীকার করেছেন, রাজনীতি বিষয়ে তাঁদের কথা হয়েছিল—কিন্তু 1906-এ জাতীয় শিক্ষাপরিষদের অধ্যক্ষপদ গ্রহণের আগে তাঁদের মধ্যে আর সাক্ষাৎ হয়নি।

ওকাকুরা ভারত ত্যাগ করেন 7 Oct [মঙ্গল ২১ আশ্বিন], নিবেদিতা তখন নাগপুরে। এক মাস পরে 7 Nov [শুক্র ২১ কার্তিক] কলকাতায় ফিরে তিনি পুনরায় দাক্ষিণাত্য-সফরে বেরোন 4 Dec [সোম ২২

অগ্র°]। মাঝখানে এক মাস মাত্র তিনি কলকাতায় ছিলেন, কিন্তু তার মধ্যেই সরলা দেবী-সহ বালিগঞ্জ-গোষ্ঠী সম্পর্কে তাঁর মোহভঙ্গ হয়; 21 Dec [রবি ৬ পৌষ] তিনি মাদ্রাজ থেকে মিস ম্যাকলাউডকে লিখলেন : 'To tell you the truth, I am disillusioned about the whole Balligunge connection. Sarola is now installed as Vicegerent of the Mother. She writes to me and calls on Dr. Bose, to organise us, in her army. Her paper is said to be doing great service, preaching Kali-worship and the rest. Meanwhile I find not one soul amongst them to risk his own valuable neck. .... I *fear* Nigu's [Okakura's] time has been wasted. ....But it is odd to see how my anxiety to keep my boys from touch sight or taste of the group explain to me all Swamiji's irritability about my own connection.'[১৭১] শাসকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে যে-কোনো আন্দোলনে, গুপ্ত আন্দোলনে তো অবশ্যই, যেখানে ঐক্যের প্রয়োজন সবচেয়ে বেশি—সেখানে প্রাধান্য বিস্তারের লড়াইয়ে এইরূপ খেয়োখেয়ি জাতীয় আন্দোলনকে প্রতিটি পর্যায়ে পঙ্গু করে রেখেছে। অরবিন্দ-ভ্রাতা বারীন্দ্রকুমার রঙ্গমঞ্চে আবির্ভূত হওয়ার পর এই নোংরামি কোন্ পর্যায়ে গিয়েছিল তা আমরা যথাসময়ে দেখতে পাব। ওকাকুরা সম্পর্কেও নিবেদিতার মোহভঙ্গ হতে দেরি হয়নি। অধ্যাপক শঙ্করীপ্রসাদ বসু এর অন্যান্য কারণের সঙ্গে লিখেছেন : 'পরবর্তীকালে দেখা যায়, তিনি ঠাকুরবাড়ির এক কন্যার প্রেমে হাবুডুবু খেয়েছেন'[১৭২] —অধ্যাপক বসু 'কন্যা'টির নাম করেননি বা কোনো ব্যাখ্যাত্মক টীকাও দেননি। মনে হয়, তিনি আশুতোষ চৌধুরীর ভাগিনেয়ী কবি প্রিয়ম্বদা দেবীকে 1912-13-এ লেখা ওকাকুরার পত্রগুলির কথা উল্লেখ করতে চেয়েছেন [দ্র *Visva-Bharati Quarterly*, Autumn 1955], কিন্তু পত্রগুলি পড়ে কি 'প্রেমে হাবুডুবু' খাওয়ার কথা মনে হয়?

কলকাতায় অনুশীলন সমিতির মতো একই সময়ে মেদিনীপুরেও একটি গুপ্তসমিতি গড়ে ওঠার কথা লিখেছেন হেমচন্দ্র দাস কানুনগো [1871-1950]। বুয়র যুদ্ধে ইংরেজের প্রাথমিক পরাজয়ে তাদের অপরাজেয়তা সম্পর্কে একশ্রেণীর বাঙালির মধ্যে যে সংশয় সৃষ্টি করেছিল, তারই দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে ইংরেজ-বিতারণের উদ্দেশ্যে জ্ঞানেন্দ্রনাথ বসুর নেতৃত্বে তাঁর ভাই সত্যেন্দ্রনাথ [1882-1908], হেমচন্দ্র প্রভৃতিকে নিয়ে বুয়র-যুদ্ধ শেষ [1 Jun রবি ১৮ জ্যৈষ্ঠ] হওয়ার মুখে মেদিনীপুরে এই সমিতি গড়ে ওঠে। জ্ঞানেন্দ্রনাথ রাজনারায়ণ বসুর ভ্রাতুষ্পুত্র, সুতরাং অরবিন্দকে তিনি বাল্যকাল থেকেই জানতেন। সম্ভবত সেই সূত্রে খবর পেয়ে যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কলকাতা থেকে মেদিনীপুরে এসে দলটির সঙ্গে যোগাযোগ করেন। তিনি বরোদা থেকে কলকাতায় এসে যা বলেছিলেন অর্থাৎ 'বাংলাদেশ ছাড়া ভারতের সর্বত্র সিক্রেট সোসাইটী হয়ে গেছে', সেই গল্প এখানেও বলেন।[১৭৩] এছাড়াও কীধরনের 'আষাঢ়ে গল্প' 1903-04-এ স্বয়ং অরবিন্দ ও তাঁর ভ্রাতা গুপ্তসমিতির সদস্যদের বলতেন, ড ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত তার সাক্ষ্য দিয়েছেন।[১৭৪] অরবিন্দ ও বারীন্দ্র সম্ভবত 1902-এর পুজোর ছুটিতে মেদিনীপুরে এসে সদস্যদের বন্দুক ছোঁড়া শিক্ষা দেন—"'ক' বাবু ও বারীণের বন্দুক ধরবার কায়দা ও তাক দেখে তখন মনে হয়েছিল—তাঁদের সেই প্রথম হাতেখড়ি।"[১৭৫] হেমচন্দ্র কানুনগো লিখেছেন, 1902-এর শেষে অরবিন্দ একা এসে তাঁদের কয়েকজনকে তরবারি ও গীতা হাতে দিয়ে দীক্ষিত করেন। সঞ্জীবনী সভা ছিল নিছক 'উত্তেজনার আগুন পোহানো', কিন্তু বিপ্লব সম্পর্কে

কেবল তাত্ত্বিক জ্ঞান সম্বল করে আগুন নিয়ে খেলার পরিণতি কী তা এঁরা তলিয়ে বুঝেছিলেন বলে মনে হয় না।

কার্জন T. Raleigh-র নেতৃত্বে Indian Universities' Commission নিয়োগ করেন 27 Jan 1902 [১৪ মাঘ ১৩০৮] তারিখে। ভারতের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় পরিদর্শন করে ও বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ্‌দের সাক্ষ্য নিয়ে কমিশন তাঁদের রিপোর্ট পেশ করেন 9 Jun [সোম ২৬ জ্যৈষ্ঠ] তারিখে; পরে নিযুক্ত সদস্য ড গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় স্বতন্ত্র প্রতিবাদী মন্তব্য পেশ করেন। কার্জনের efficiency-র তত্ব মেনে সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যেরা সেনেটের সদস্য-সংখ্যা কমিয়ে ও মনোনীত ইংরেজ সদস্যসংখ্যা বৃদ্ধি করে বিশ্ববিদ্যালয়ে সরকারী প্রাধান্য বিস্তারের সুযোগ করে দেন; বেসরকারী কলেজে আইন-পড়ানো বন্ধ করা, দ্বিতীয় শ্রেণীর কলেজগুলির অবলুপ্তি, শিক্ষার মানোন্নয়নের উদ্দেশ্যে পাশ মার্ক ও বেতন বৃদ্ধি, সিণ্ডিকেটের হাতে স্কুল-কলেজের স্বীকৃতিদান [affiliation] ও প্রত্যাহারের অপার ক্ষমতাদান প্রভৃতি সুপারিশও ছিল। আগস্টের গোড়ায় এই রিপোর্ট সংবাদপত্রে প্রকাশিত হলে দেশ জুড়ে বিক্ষোভ উপস্থিত হয়। 22 Aug [শুক্র ৬ ভাদ্র] রাজা পিয়ারীমোহন মুখোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে টাউন হলে অনুষ্ঠিত একটি বিরাট সভায় সুপারিশগুলি ধিকৃত হয়। এই বছর আমেদাবাদ কংগ্রেসে সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সভাপতির ভাষণের বৃহদংশ অধিকার করেছিল এই রিপোর্টের সমালোচনা, যাকে তিনি সুকৌশলে 'a political manifesto in an academic guise' বলে অভিহিত করেন। কিন্তু উদ্ধত অবিবেকী কার্জন উচ্চশিক্ষিতদের প্রতিবাদে কান দেবার লোক ছিলেন না, সামান্য সংশোধনান্তর Indian Universities' Act পাশ হয় 1904-এ। প্রধানত কমিশনের রিপোর্টের প্রতিক্রিয়ায় সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় বর্তমান বৎসরের জুলাই মাসে 'ডন সোসাইটি' স্থাপন করেন। ড অমলেশ ত্রিপাঠী লিখেছেন : 'ঐ সময়ে উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে যে সব গলদ ছিল সেগুলো দূর করে তাকে জাতীয়তাবাদী ভাবধারায় উদ্দীপিত করার জন্য যে শিক্ষা-ব্যবস্থা গড়ে তোলার প্রচেষ্টা হয়েছিল, 'ডন সোসাইটি'কে তারই প্রথম পদক্ষেপ বলে মনে করা যেতে পারে।'[১৭৬] বঙ্গভঙ্গের আঘাতে তা জাতীয় শিক্ষাপরিষদে [National Council of Education] পরিণতি লাভ করে।

যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ একসময়ে মাৎসিনি, গ্যারিবল্ডি ও নেপোলিয়নের মতো য়ুরোপীয় বীরদের কাহিনী বাংলায় বিবৃত করে বাঙালি তরুণদের বীরত্বের আদর্শে উদ্বুদ্ধ করতে চেয়েছিলেন। বালগঙ্গাধর টিলক সেখানে স্বদেশীয় বীর শিবাজীকে প্রতিষ্ঠিত করে 15 Apr 1896 [বুধ ৪ বৈশাখ ১৩০৩] শিবাজী-উৎসবের সূচনা করেন। সখারাম গণেশ দেউস্করের প্রচেষ্টায় বাংলাদেশে এই উৎসব প্রবর্তিত হল বর্তমান বৎসরে ৭ আষাঢ় [শনি 21 Jun] তারিখে। অমৃতবাজার পত্রিকায় [21 Jun] বিজ্ঞপ্তিটি মুদ্রিত হয়: 'A monster meeting to commemorate the Sivaji Festival in Calcutta will be held in Classic Theatre, Beadon Street, today at 5 P.M. Babu Narendra Nath Sen will preside.' 'কলিকাতার ১৩০৯ সালের শিবাজী মহোৎসব উপলক্ষে রচিত' দেউস্করের 'শিবাজীর মহত্ত্ব' প্রবন্ধটি ২০ পৃষ্ঠার পুস্তিকাকারে পরবৎসরের উৎসবে বিনামূল্যে বিতারিত হয়। এই উপলক্ষে গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী 'আজি গাও গাও গাও—খুলে মন প্রাণ' গানটি রচনা করেন ও সেটি উক্ত অনুষ্ঠানে 'ঐকতানে গীত' হয়।

সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে আমেদাবাদে জাতীয় কংগ্রেসের অষ্টাদশ অধিবেশন হয় 23-26 Dec [সোম বৃহ ৭-১০ পৌষ]। দিল্লি দরবারে উপস্থিত থাকার সুযোগ করে দেবার জন্য অধিবেশনের সময়

এগিয়ে আনা সত্ত্বেও প্রতিনিধি-সংখ্যা কমে দাঁড়ায় ৪৭১। এখানেও একটি শিল্পপ্রদর্শনী আয়োজিত হয়েছিল, বরোদার গায়কোয়াড় তার উদ্বোধন করেন।

দিল্লি-দরবারের সঙ্গেও একটি শিল্পপ্রদর্শনী ছিল, কার্জন সেটির উদ্বোধন করেন 30 Dec [মঙ্গল ১৫ পৌষ]। এরপর ইংরেজি নববর্ষের প্রথম দিনটিতে [বৃহ ১৭ পৌষ] কার্জনের সাধের দরবার বসে—দেশীয় রাজন্যবর্গের অপরিমিত অর্থব্যয় ঘটিয়ে সর্বাপেক্ষা কম খরচে সর্বাধিক জাঁকজমকের উদাহরণ সৃষ্টির গর্ব করেছেন সম্রাটের এই 'নায়েব'।

১৯ মাঘ [সোম 2 Feb] সরস্বতীপূজার দিন ভারত সংগীতসমাজ তাঁদের সারস্বত সম্মিলনে স্বদেশ-প্রত্যাবৃত জগদীশচন্দ্রকে সংবর্ধিত করেন। কুচবিহারের মহারাজ নৃপেন্দ্রনারায়ণের সভাপতিত্বে বিকেল সাড়ে চারটেয় সমাজভবনে এই সভা হয়। হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ অনুষ্ঠানটির একটি বিবরণ দিয়েছেন [দ্র মাসিক বসুমতী, জ্যৈষ্ঠ ১৩৬০।২৩৮-৩৯], তার কিছু অংশ আমরা আগেই উদ্ধৃত করেছি। কিন্তু সমকালীন *The Bengalee* [7 Feb]-তে প্রদত্ত বিবরণের সঙ্গে তার কিছু পার্থক্য আছে বলে আমরা ঐতিহাসিক কারণে পত্রিকার সংবাদগুলি সংকলন করে দিচ্ছি। মঞ্চে সভাপতি ও জগদীশচন্দ্র উপবিষ্ট হলে জ্ঞানদাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় সংস্কৃতে সরস্বতী-বন্দনা করেন, পরে নগেন্দ্রনাথ মল্লিক একটি সংস্কৃত জাতীয় সংগীত [? বন্দেমাতরম্] গেয়ে শোনান। মহামহোপাধ্যায় হরিশ্চন্দ্র কাব্যরত্ন সংস্কৃতে জগদীশচন্দ্রকে আশীর্বাদ করে মালা পরিয়ে দিলে তিনি তাঁর পদধূলি গ্রহণ করেন। অতঃপর কাব্যরত্ন মহাশয় একটি সংস্কৃতভাষায় রচিত অভিনন্দনপত্র পাঠ করে সেটি জগদীশচন্দ্রের হাতে তুলে দেন। অধ্যাপককে অভিনন্দিত করে একটি জাতীয়সংগীত গাওয়া হয়। সভাপতি বিভিন্ন বিদেশী পত্রিকায় প্রকাশিত জগদীশচন্দ্রের প্রশস্তি পাঠ করে তাঁকে চন্দনচর্চিত করে একজোড়া শাল উপহার দেন। রবীন্দ্রনাথ বাংলায় একটি ভাষণ দেওয়ার পর জগদীশচন্দ্র সংক্ষেপে সময়োপযোগী কয়েকটি কথা বলেন। কয়েকটি গান হওয়ার পর সভাপতিকে ধন্যবাদ দিয়ে সভা শেষ হয়। পরে টি. সি. চন্দের নেতৃত্বে হিন্দু মিউজিক্যাল অ্যাসোসিয়েশন ঐকতানবাদন পরিবেশন করেন। সকলকে ভূরিভোজে আপ্যায়িত করা হয়।

প্রাসঙ্গিক তথ্য : ৪

বৎসরের প্রথমে ব্রহ্মচর্যাশ্রমের শিক্ষকদের মধ্যে ছিলেন রেবাচাঁদ, মনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়, জগদানন্দ রায়, সুবোধচন্দ্র মজুমদার ও শিবধন বিদ্যার্ণব। শশিভূষণ রায়চৌধুরী কবে কর্মত্যাগ করেন জানা নেই।

খৃস্টান শিক্ষক রেবাচাঁদকে নিয়ে যে গোলমাল হয়েছিল, তার কথা আমরা আগের অধ্যায়ে বলেছি। এরই প্রতিক্রিয়ায় তিনি গ্রীষ্মাবকাশের পর আর বিদ্যালয়ের কাজে যোগ দেননি। 'রবিবার' [? ১১ শ্রাবণ : 27 Jul] রবীন্দ্রনাথ মনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়কে লিখছেন :'রেবাচাঁদ আর ফিরিবেন না। সুবোধ আজ রাত্রে বোলপুরে যাইতেছে। অবিনাশ বসু নামক Kinder Gartenওয়ালা একটি শিক্ষক পয়লা অগস্ট হইতে কাজ আরম্ভ করিবেন।'[১৭৭] 'কিণ্ডার গার্টেন সম্বন্ধে খুব উৎসাহী' অবিনাশ বসু ও তাঁর স্ত্রীর কাছে জোড়াসাঁকোয় রথীন্দ্রনাথ

ও মাধুরীলতা একসময়ে পড়তেন [দ্র রবিজীবনী ৪।৯২], এবারে তিনি কতদিন স্থায়ী হয়েছিলেন বলা যায় না। ১২ শ্রাবণ রবীন্দ্রনাথের ক্যাশবহিতে 'অবিনাশ বসু মাষ্টারকে দেওয়ার বাবদ ৩৮' হিসাব দেখা যায়।

কবি নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যও বাংলা-শিক্ষক হয়ে এই বৎসর কোনো এক সময়ে কাজে যোগ দেন। তিনি সুবোধচন্দ্র মজুমদারের মতো 'আসা-যাওয়া' দলের লোক ছিলেন। ২৯ পৌষ [13 Jan 1903] মনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়কে রবীন্দ্রনাথ লিখছেন : 'নরেন্দ্রনাথ কাল টেলিগ্রাম পাইয়া চলিয়া গেছেন। বোধ করি কাজ পাইয়াছেন।'[১৭৮] এর পর 'পুনঃপ্রবেশের প্রত্যাশায় মাঝে মাঝে উঁকি ঝুঁকি' দিয়ে তিনি দীর্ঘতর কালের জন্য ফিরে আসেন মাঘ ১৩১০-এ সাময়িকভাবে বিদ্যালয় শিলাইদহে স্থানান্তরিত হওয়ার সময়ে।

রেবাচাঁদের বিরুদ্ধে যাঁরা মহর্ষির কাছে অভিযোগ করেন তাঁদের অন্যতম ছিলেন সংস্কৃত পণ্ডিত শিবধন বিদ্যার্ণব। রবীন্দ্রনাথ ব্যাপারটি পছন্দ করেননি, 'পণ্ডিত মহাশয়ের moral influence' ও তিনি রথীন্দ্রনাথের পক্ষে শ্রেয়স্কর মনে করতেন না। এর ফলে কিছুদিনের মধ্যেই তাঁকে বিদায় নিতে হয়। অবশ্য এই বছর মাঝে মাঝেই তিনি শান্তিনিকেতনে যাতায়াত করেছেন। নাটোরের মহারাজা জগদিন্দ্রনাথ রায় ১৩ আশ্বিন [29 Sep] যখন শান্তিনিকেতন পরিদর্শনে যান তখন শিবধন বিদ্যার্ণব 'প্রশস্তি-শ্লোক রচনা ক'রে বালকদের দ্বারা গান' করিয়েছিলেন।

তাঁর জায়গায় রবীন্দ্রনাথ পতিসর কাছারির আমীনের সহকারী হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে নিয়োগ করেন। শ্রাবণের শেষে তিনি ব্রহ্মচর্যাশ্রমে যোগ দেন।

শিবনাথ শাস্ত্রীর জামাতা কুঞ্জলাল ঘোষকে রবীন্দ্রনাথ শিক্ষক ও কার্যসম্পাদক পদে নিয়োগ করেন কার্তিক মাসের শেষে। একটি বিস্তৃত পত্রে তিনি আশ্রমের আদর্শ ও কার্যপ্রণালী তাঁকে লিখে দেন ২৭ কার্তিক [বৃহ 13 Nov] তারিখে। রবীন্দ্রনাথ এঁর উপর খুবই নির্ভর করেছিলেন, কিন্তু আশ্রমের শিক্ষকেরা—বিশেষত মনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়—এঁকে পছন্দ করেননি। কিছুদিনের মধ্যেই ব্রাহ্মণ ছাত্রদের অব্রাহ্মণ শিক্ষককে প্রণাম করা নিয়ে একটি গোলমাল পাকিয়ে ওঠে। নিয়মিত অধ্যাপনার কাজ থেকে তাঁকে অব্যাহতি দিয়ে রবীন্দ্রনাথ আপোষ করলেন বটে, কিন্তু আদিকুটীরের পূর্বদিকে প্রস্তাবিত ল্যাবরেটরি ঘরটি মনোরঞ্জনবাবুর পরিবর্তে কুঞ্জলাল ঘোষকে সপরিজনে থাকার জন্য ছেড়ে দেওয়াতে তিনি অসন্তুষ্ট হন। এর উপর জামাতা সত্যেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যের উপর অধ্যক্ষতার দায়িত্ব অর্পণ করাতে তিনি অসুস্থতার অজুহাতে বিদ্যালয় ত্যাগ করেন। রথীন্দ্রনাথকে এন্ট্রান্স পরীক্ষার জন্য তৈরি করে দেওয়ার উদ্দেশ্যে রবীন্দ্রনাথ মনোরঞ্জনবাবুকে নিয়োগ করেছিলেন—2 Mar 1903 [সোম ১৮ ফাল্গুন] এন্ট্রান্স পরীক্ষা আরম্ভ হওয়ার আগেই তিনি কর্মত্যাগ করেন—কিন্তু ইতিমধ্যেই কৃষ্ণনগরে টেস্ট পরীক্ষা দিয়ে রথীন্দ্রনাথ ও সন্তোষচন্দ্র উত্তীর্ণ হয়েছেন ও এন্ট্রান্স পরীক্ষার প্রস্তুতি সমাপ্তপ্রায়, সুতরাং চাপ সৃষ্টির কৌশল সিদ্ধ হয়নি। কিন্তু তাঁর বিদ্যা ও শিক্ষণপদ্ধতি রবীন্দ্রনাথের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করেছিল—কৃতজ্ঞতা তো ছিলই—তাই পরে তিনি বারবার তাঁকে বিদ্যালয়ে কর্মগ্রহণের জন্য আহ্বান করেছিলেন, তাঁকে ওকালতি কর্মে প্রতিষ্ঠিত করার জন্যও চেষ্টার ত্রুটি করেননি। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের Calender অনুসারে পনেরো বছর এক মাস বয়সে রথীন্দ্রনাথ [Roll Cal., P.14] প্রথম বিভাগে ও আঠারো বছর এক মাস বয়সে সন্তোষচন্দ্র [Roll Cal., P. 18] দ্বিতীয় বিভাগে প্রাইভেট ছাত্র-রূপে এন্ট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন।

এই পরীক্ষার পূর্বেই রথীন্দ্রনাথ ও সন্তোষচন্দ্র ছাত্র-শিক্ষকদের নিয়ে শান্তিনিকেতনে 'বিসর্জন' অভিনয় করেন। পৌষমেলায় যাত্রাভিনয় প্রতি বৎসরের অনুষ্ঠানের অঙ্গ ছিল, ব্রহ্মচর্যাশ্রমের ছাত্র-শিক্ষক মিলে মঞ্চাভিনয় এইবারই প্রথম প্রবর্তিত হল। পরের বৎসর নাটকটি পুনরভিনীত হয়।

সম্ভবত মাঘ মাসে সতীশচন্দ্র রায় [1882-1904] বিদ্যালয়ের শিক্ষকপদে যোগদান করেন। এক বছরের মধ্যেই মৃত্যু হওয়ায় তাঁর প্রতিভা পূর্ণবিকশিত হওয়ার সুযোগ পায়নি। আশ্রম বিদ্যালয় সম্পর্কে বলতে বা লিখতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ সর্বত্রই তাঁর নাম উল্লেখ করেছেন, তেমনই শ্রদ্ধার সঙ্গে উল্লেখিত হয়েছে মোহিতচন্দ্র সেনের পরীক্ষার খাতা দেখার পারিশ্রমিক এক হাজার টাকা দানের কথা। স্ত্রীর মৃত্যু, কন্যার মরণান্তিক অসুস্থতা, নির্ভরযোগ্য নিকটাত্মীয়ের বিমুখতা, প্রভৃতি দুর্দৈবের মধ্যে প্রায় সমসাময়িক এই দুটি প্রাপ্তি তাঁকে আশ্বাস জুগিয়েছিল।

রেবাচাঁদ ব্রহ্মচর্যাশ্রম ত্যাগ করায় তাঁর সঙ্গে সুধীরচন্দ্র নান, গৌরগোবিন্দ গুপ্ত প্রভৃতি কয়েকজন ছাত্র বিদ্যালয় ছেড়ে চলে যান। কিন্তু তাঁদের জায়গা শূন্য থাকেনি; দীনেশচন্দ্র সেনের পুত্র অরুণচন্দ্র, অক্ষয়চন্দ্র সরকারের পুত্র অচ্যুতচন্দ্র, মোহিনীমোহন চট্টোপাধ্যায়ের পুত্র নয়নমোহন, অজিতকুমার চক্রবর্তীর ভাই সুজিতকুমার, আনন্দমোহন বসুর পুত্র ও জগদীশচন্দ্রের ভাগিনেয় অরবিন্দমোহন প্রভৃতি অনেকেই সেই স্থান পূর্ণ করেন। ওকাকুরার সহযাত্রী হয়ে হোরি [Yoshinori Hori] নামক যে জাপানী যুবকটি Jan 1902-তে ভারতে এসেছিলেন, তিনি 'শ্রীচিদানন্দ' নাম নিয়ে বেলুড় মঠে সংস্কৃত শিক্ষা করছিলেন। কিন্তু সেখানে তাঁর স্বাস্থ্য ভালো না থাকাতে সুরেন্দ্রনাথ [ঠাকুর] 10 Jun [মঙ্গল ২৭ জ্যৈষ্ঠ) তাঁকে শান্তিনিকেতনে রেখে আসেন। তিনিই শান্তিনিকেতনের প্রথম বিদেশী ছাত্র। সুরেন্দ্রনাথই তাঁর থাকা-খাওয়ার ব্যয় বহন করতেন, তার একটি হিসাব পাওয়া যায় ৩০ আশ্বিন [বৃহ 16 Oct] : "মা° বাবু সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর দং জাপানী সাহেবের আশ্বিন মাসের টাকা পাওয়া যায় ২০৲'। কিন্তু মাঘ মাসের মধ্যেই হোরি শান্তিনিকেতন ত্যাগ করেন। পরের বছর তাঁর মৃত্যু হয়।

ব্রহ্মচর্যাশ্রমের ছাত্র ও শিক্ষকের সংখ্যাবৃদ্ধি ঘটায় তাঁদের বাসস্থান ও আনুষঙ্গিক গৃহ নির্মাণের প্রয়োজন হচ্ছিল। বলেন্দ্রনাথ তাঁর প্রস্তাবিত ব্রহ্মবিদ্যালয়ের জন্য যে একতলা বাড়িটি নির্মাণ করিয়েছিলেন, তার পাশেই ছাত্রদের থাকবার জন্য একটি ঘর তৈরি করা হয়। ১ জ্যৈষ্ঠ [বৃহ 15 May] এই গৃহ-সম্পর্কিত একটি হিসাব দেখা যায় : 'বিদ্যালয়ের গৃহনির্ম্মাণ জন্য করগেট চাদর ও মটকা ক্রয় নিমিত্ত··৬০৲'; ২১ শ্রাবণের [বুধ 6 Aug] একটি হিসাব :'ব্রহ্মবিদ্যালয় তৈয়ারির জন্য পূর্ব্বে ৯৮২৲ টাকা দেওয়া বাদে বাকী শোধ ৬৬০, উড়ে ছুতার মিস্ত্রী ৭২ রজনীকান্ত দে জানালা দরজার কপাট তৈয়ারি ২৮২৲ /১০১৪৲'। ল্যাবরেটরি-ঘর নির্মাণের জন্য রবীন্দ্রনাথ ৮০০ টাকা আলাদা করে রেখেছিলেন, কিন্তু সেই টাকা শিক্ষকদের বাসস্থান তৈরিতেই খরচ হয়ে যায়। নিজের পরিবারের বসবাসের জন্য তিনি আশ্রমের সীমানার বাইরে খড়ের-চাল-দেওয়া একটি বাড়ি তৈরি করিয়েছিলেন—কিন্তু 'নতুন বাড়ি' নামে পরিচিত এই বাড়িতে গৃহপ্রবেশের আগেই মৃণালিনী দেবীর মৃত্যু হয়। তাঁর পিসিমা রাজলক্ষ্মী দেবী রেণুকার মৃত্যুর পর শমীন্দ্রনাথ ও মীরা দেবীকে নিয়ে এই বাড়িতে ওঠেন।

৪২ টাকা ৫ আনা দিয়ে 'শান্তিনিকেতনের জন্য সবৎস গাভি ১টা ক্রয়' করা হয়েছিল ৭ জ্যৈষ্ঠ তারিখে, কিন্তু যে-কোনো কারণেই হোক সেই গাভি ফিরিয়ে দেওয়া হয় ৩১ শ্রাবণে। শান্তিনিকেতনে দুধের সমস্যা দীর্ঘদিন ছিল। 'আশ্রম আছে অথচ ধেনুর অভাব ইহা অসঙ্গত' বলে রবীন্দ্রনাথ হাজারিবাগ থেকে গাভী ও

মহিষ নিয়ে যাওয়ার ইচ্ছাও জানিয়েছেন শ্রীশচন্দ্র মজুমদারকে। পরে তাঁরই পুত্র সন্তোষচন্দ্র সেখানে ডেয়ারি স্থাপনের চেষ্টা করে ব্যর্থ হন।

উল্লেখপঞ্জী

১ 'স্মৃতি', বি. ভা.প., মাঘ-চৈত্র ১৩৭৬।৩১৪

২ দেশ, ২৬ বৈশাখ ১৩৪৯

৩ রবীন্দ্রনাথ ও ত্রিপুরা। ৩৩১

৪ গীতবিতান : কালানুক্রমিক সূচী ১।১১৮

৫ রবীন্দ্রভবনে রক্ষিত মূল পত্র

৬ চিঠিপত্র ৮।১৯৮-৯৯, পত্র ১৬৭

৭ রবীন্দ্রবীক্ষা ১০ [পৌষ ১৩৯০]। ৯, পত্র ১

৮ চিঠিপত্র ১০।৫-৬, পত্র ৫

৯ ঘরের কথা ও যুগসাহিত্য [১৩৭৬]। ১৯৪

১০ চিঠিপত্র ১০।৬, পুত্র ৬

১১ দেশ, সাহিত্য ১৩৯৪। ১৩, পত্র ২

১২ চিঠিপত্র ১০।৮, পত্র ৮

১৩ ঐ ৮।২০১, পত্র ১৬৯

১৪ স্মৃতি [1941]। ২২, পত্র ১৯

১৫ চিঠিপত্র ১০।৯, পত্র ৯

১৬ বঙ্গদর্শন, শ্রাবণ। ১৭৬

১৭ ঐ, ভাদ্র। ২৩৩-৩৪

১৮ ঐ, ভাদ্র। ২২৪-২৫

১৯ পত্রাবলী। ১২৭, পত্র ৪২

২০ *Letters of Sister Nivedita*, Vol. I. [1982]p. 476, No. 191

২১ পথের সঞ্চয় ২৬।৫৩৭

২১ক ঘরের কথা ও যুগসাহিত্য। ১৯৪

২২ দ্র *The Life of Swami Vivekananda*, Vol. II [1981], p. 637

২৩ চিঠিপত্র ৬।৪৯, পত্র ২১

২৪ রবীন্দ্রনাথ ও ত্রিপুরা। ৩৩১-৩২

২৫ স্মৃতি। ৮

২৬ শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্যাশ্রম ২৭।৪৪৫

২৭ পত্রাবলী। ১৫০, পত্র ৫২

২৮ স্মৃতি। ১০

২৮ক *Letters of Sister Nivedita*, Vol. II, pp. 594-95, No. 259

২৯ রবীন্দ্রনাথ ও ত্রিপুরা। ৩০৬

৩০ চিঠিপত্র ৬।৪৭-৪৯, পত্র ২১

৩১ *Vivekananda in Indian Newspapers* 1893-1902, Edited by Sankari Prasad Basu & Sunilbehari Ghosh (1969), pp. 269-70

৩১ক সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় : রবীন্দ্র-স্মৃতি [১৩৬৪]। ৪৫-৪৬

৩২ 'পূর্ব ও পশ্চিম', সমাজ ১২।২৬৬

৩৩ ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, "ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় ও 'স্বরাজ'" : বসুমতী, ভাদ্র ১৩৫৭।৭১১

৩৪ স্মৃতি। ৭-৮

৩৫ অজিতকুমার চক্রবর্তী : ব্রহ্মবিদ্যালয় [১৩৫৮]। ১৮

৩৬ 'আমার কথা' : মাসিক বসুমতী, ফাল্গুন ১৩৬৫।৭৩৩

৩৭ স্মৃতি। ৩৭

৩৮ মাসিক বসুমতী, ফাল্গুন ১৩৬৫।৭৩৩

৩৯ প্রতিক্ষণ, শারদীয় ১৩৯৩।২৭

৪০ রবীন্দ্রনাথ ও ত্রিপুরা। ৩০৬-০৭

৪১ চিঠিপত্র ১।৬২-৬৩, পত্র ৩২

৪২ ঐ ১।৭২-৭৩, পত্র ৩৬

৪৩ ঐ ১।৭১, পত্র ৩৫

৪৪ 'শিক্ষা-সংস্কার' : ভাণ্ডার, আষাঢ় ১৩১৩; শিক্ষা ১২।২৯৪

৪৫ বি. ভা. প., মাঘ-চৈত্র ১৩৬৮।২১৫

৪৬ প্রবাসী, বৈশাখ ১৩৫০।১-২

৪৭ দ্র *Letters of Sister Nivedita*, Vol. I. p. 488, No. 199

৪৮ Ibid, Vol. I, p. 500, No. 205

৪৯ বি. ভা.প., শ্রাবণ-আশ্বিন ১৩৭৩।৩

৫০ তথ্যটি সরবরাহ করেছেন শিল্প-ঐতিহাসিক কমল সরকার

৫১ হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় : কবির কথা [১৩৬১]।২২

৫২ পিতৃস্মৃতি। ৮০-৮১

৫৩ রবীন্দ্রজীবনী ২।৫৫
৫৪ পিতৃস্মৃতি। ৮০
৫৫ রবীন্দ্রনাথের কথা। ২৫
৫৬ পিতৃস্মৃতি। ৬৬
৫৭ রবীন্দ্রজীবনী ২।৫৭
৫৮ মীরা দেবী : স্মৃতিকথা [১৩৮২]।১৫
৫৯ মাধুরীলতার চিঠি। ৫২, পত্র ২০
৬০ পত্রাবলী। ১৪৬-৪৭, পত্র ৫০
৬১ ঐ।১৪৮, পত্র ৫১
৬২ বঙ্গদর্শন, আশ্বিন। ২৭৬
৬৩ বি. ভা.প., শ্রাবণ ১৩৪৯।৩৬
৬৪ বঙ্গদর্শন, কার্তিক। ৩১৪
৬৫ 'রবীন্দ্রনাথের রাষ্ট্রনৈতিক মত' : কালান্তর ২৪।৪৩৯-৪০
৬৬ স্মৃতি। ৮-৯
৬৭ ঐ। ১৩
৬৮ ঐ। ১১-১২
৬৯ দ্র শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্যাশ্রম ২৭।৪৩৫-৪৫
৭০ স্মৃতি। ৯
৭১ স্মৃতিকথা। ১০
৭২ ঐ। ১৩
৭৩ পিতৃস্মৃতি। ৮১
৭৪ রবীন্দ্রস্মৃতি। ৬০
৭৫ স্মৃতিকথা। ১৮
৭৬ স্মৃতি। ১১
৭৭ 'সংসারী রবীন্দ্রনাথ' : প্রবাসী, পৌষ ১৩৪৬।৩০৭
৭৮ ঐ। ৩০৬-০৭
৭৯ পিতৃস্মৃতি। ৮১
৮০ প্রবাসী, পৌষ ১৩৪৬।৩০৭
৮১ পিতৃস্মৃতি। ৮১-৮২
৮২ দ্র ড পম্পা মজুমদার : রবীন্দ্রসংস্কৃতির ভারতীয় রূপ ও উৎস [১৩৭৯]।৫৩৪

৮৩ চিঠিপত্র ৮।১০৬-০৭, পত্র ১১৫

৮৪ রবীন্দ্রনাথ ও ত্রিপুরা। ৩৩৩

৮৫ বি. ভা.প., শ্রাবণ ১৩৪৯।৩৬

৮৬ রবীন্দ্র ভাবনা, Apr 1981, পৃ ৬৫

৮৭ স্মৃতি। ১৪-১৫

৮৮ স্মৃতিকথা। ১৭

৮৯ কবির কথা। ২৩

৯০ দ্র রবীন্দ্রনাথ : জীবন ও সাহিত্য। ৮৮, পত্র ৪

৯১ কবির কথা। ৭

৯২ জীবনস্মৃতি। ১৭।৪২৪

৯৩ রবীন্দ্রজীবনী ২।৬১

৯৪ তত্ত্ব°, মাঘ। ১৫৫

৯৫ ঐ।১৫৬

৯৬ দ্র কানাই সামন্ত : 'রবীন্দ্রপ্রতিভার নেপথ্যভূমি', রবীন্দ্রপ্রতিভা [১৩৬৮]।২৭৬-৭৭

৯৭ রবীন্দ্র-সৃষ্টি-সমীক্ষা ২।১৩

৯৮ বি. ভা.প., বৈশাখ-আষাঢ় ১৩৫৫।৩০০

৯৯ দ্র উজ্জ্বলকুমার মজুমদার-সম্পাদিত রাতের তারা দিনের রবি' [১৩৯৫]।৪৬, ৬৩-৬৭

১০০ দ্র পূর্ণানন্দ চট্টোপাধ্যায়-সম্পাদিত 'মাধুরীলতার গল্প' [1980]

১০১ রবীন্দ্রবীক্ষা ১০।৯-১০, পত্র ২

১০২ স্মৃতি। ১৫

১০৩ পত্রাবলী। ১৪৯, পত্র ৫২

১০৪ স্মৃতি। ১৬

১০৫ চিঠিপত্র ১০।১১, পত্র ১২

১০৬ স্মৃতি। ১৭

১০৭ ঐ।১০

১০৮ রবীন্দ্র-সৃষ্টি-সমীক্ষা ২।২০২

১০৯ দ্র শান্তিদেব ঘোষ : রবীন্দ্রসঙ্গীত বিচিত্রা [1983]। ২৩৯

১১০ ঐ। ২৩৭

১১১ স্মৃতি। ১০

১১২ *The Bengalee*, 7 Feb 1903

১১৩ ‘সঙ্গীত সমাজ’ : মাসিক বসুমতী, জ্যৈষ্ঠ ১৩৬০।২৩৮

১১৪ *The Bengalee*, 5 Feb 1903

১১৫ দেশ, সাহিত্য ১৩৭৮।৩৮

১১৬ ঐ। ৩৯

১১৭ পত্রাবলী। ১৪৭, পত্র ৫০

১১৮ স্মৃতি। ১০

১১৯ দ্র পিতৃস্মৃতি। ১৩২

১২০ ঐ। ১৩২

১২১ ঐ। ১৩২-৩৩

১২২ ‘Looking Back’: *Visva-Bharati Quarterly*, Nov 1942-Jan 1943, pp. 39-40

১২৩ স্মৃতি। ২৫-২৬

১২৪ ঐ। ৪

১২৫ ঐ। ২১

১২৬ ঐ। ৪৯

১২৭ ঐ। ২৩

১২৮ দ্র ঐ। ১৬

১২৯ চিঠিপত্র ৮।২০২, পত্র ১৭০

১৩০ বি. ভা.প., মাঘ ১৩৪৯।৪৫১

১৩১ ‘মোহিতচন্দ্র সেন’ : বঙ্গদর্শন, শ্রাবণ ১৩১৩।১৬৭; বিচিত্র প্রবন্ধ [১৩১৪]।৩১৭

১৩২ আশ্রমের রূপ ও বিকাশ ২৭।৩২৩

১৩৩ বি. ভা.প., মাঘ-চৈত্র ১৩৫৪।১৮৭-৮৮

১৩৪ রবীন্দ্রনাথ ও ত্রিপুরা। ৩৩৪

১৩৫ চিঠিপত্র ১০।১২, পত্র ১৩

১৩৬ অমল সেনগুপ্ত : ‘রবীন্দ্রনাথ ও হাজারীবাগ’, ছত্রাক, শারদীয় ১৩৮১।২০

১৩৭ বি ভা প, মাঘ ১৩৪৯।৫২৩

১৩৮ স্মৃতি। ৪১

১৩৯ দেশ, সাহিত্য ১৩৯৪।১৩-১৪, পত্র ৪

১৪০ বি. ভা.প., মাঘ ১৩৪৯।৪৫২-৫৩

১৪০ক রবীন্দ্রবীক্ষা ৪ [১৩৮৪]।৮০

১৪১ ঐ। ৪৫৩-৫৪

১৪২ ঐ, শ্রাবণ-আশ্বিন ১৩৫৮৩

১৪৩ প্রণতি মুখোপাধ্যায় : শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্যাশ্রম [১৩৭৯]। ১৩৫-৩৬

১৪৪ আশ্রমের রূপ ও বিকাশ ২৭।৩২৪

১৪৫ বি. ভা.প., শ্রাবণ-আশ্বিন ১৩৫৮।৩

১৪৬ ঐ, ফাল্গুন ১৩৪৯।৫২২

১৪৭ ঐ, শ্রাবণ-আশ্বিন ১৩৭৩।৪

১৪৮ স্মৃতি। ৩৯-৪০

১৪৯ দ্র রবীন্দ্রজীবনী ২।৭৮, পাদটীকা ২, ৩

১৫০ বি.: ভা.প., মাঘ-চৈত্র ১৩৫৪।১৮৭

১৫১ ঐ, শ্রাবণ-আশ্বিন ১৩৭৩।২

১৫২ রবীন্দ্রস্মৃতি।৫৮

১৫৩ পত্রাবলী। ১৫৪, পত্র ৫৪

১৫৩ক গৌতম চট্টোপাধ্যায় ও সুভাষ চৌধুরী-সম্পাদিত 'সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর শতবার্ষিক সংকলন' [১৩৭৯]। ১২

১৫৪ দ্র *The Calendar* 1956, Part I, University of Calcutta, pp. 88-97

১৫৫ দ্র Tagore Family Papers, No. 77

১৫৬ তত্ত্ব°, আষাঢ়। ৩৩

১৫৭ ঐ, মাঘ। ১৫৫

১৫৮ Pravrajika Atmaprana: *Sister Nivedita* [1977], p. 144

১৫৯ *Letters of Sister Nivedita*, Vol. I., p. 482

১৬০ মনোরঞ্জন গুহ : ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় [১৩৮৩]।৪৪-৪৫

১৬১ দেশ, সাহিত্য ১৩৭৮।৪৯

১৬২ রবীন্দ্রভবনে রক্ষিত মূল পত্র

১৬৩ দেশ, সাহিত্য ১৩৭৮।৫৫

১৬৪ বি ভা প , ফাল্গুন ১৩৪৯।৫২৫

১৬৫ দ্র ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়। ৪৬-৪৭

১৬৬ পত্রাবলী। ১৫৯, পত্র ৫৭

১৬৭ ঐ। ১৬১, পত্র ৫৮

১৬৮ *The Bengalee*, 12 Apr 1903

১৬৯ দ্র শঙ্করীপ্রসাদ বসু : লোকমাতা নিবেদিতা [[১৩৯৪]।৮৫-৮৬

১৭০ দ্র ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত : ভারতের দ্বিতীয় স্বাধীনতার সংগ্রাম [1983]। ১৮১

১৭১ *Letters of Sister Nivedita*, Vol. I., pp. 525-26, No. 219

১৭২ নিবেদিতা লোকমাতা ২।১০৬

১৭৩ দ্র হেমচন্দ্র কানুনগো : বাংলায় বিপ্লব প্রচেষ্টা [১৩৯১]।৬-৭

১৭৪ দ্র ভারতের দ্বিতীয় স্বাধীনতার সংগ্রাম। ৮-৯

১৭৫ বাংলায় বিপ্লব প্রচেষ্টা। ১২

১৭৬ দ্র অমলেশ ত্রিপাঠী : ভারতের মুক্তিসংগ্রামে চরমপন্থী পর্ব [1987]। ১২৫

১৭৭ স্মৃতি। ৭

১৭৮ ঐ। ১৫

---

* স্ত্রীকে লেখা তাঁর মুদ্রিত পত্রাবলীতে আমরা এরূপ কোনো চিঠি খুঁজে পাইনি।

* প্রবাসী, কার্তিক ১৩৪৮।১০-এ ও রবীন্দ্রনাথ ও ত্রিপুরা। ৩৩১-৩২-এ পত্রটির তারিখ ভ্রমক্রমে '১৩ শ্রাবণ' ছাপা হয়েছে; কিন্তু মূল পত্রে '১৬ শ্রাবণ' আছে—রবীন্দ্রনাথের হস্তাক্ষরে '১৬'কে অনেকে '১৩' বলে ভুল করেছেন, ফলে সালের হিসাবে অনেক মারাত্মক ভ্রান্তির সৃষ্টি হয়েছে।

* 'A public meeting will be held at the Bengal Landholders' Association this evening, at 6 P.M. to further consider the question of forming a company to establish Stores of Indian Articles for the supply of our ordinary requirements.'—*Amrita Bazar Patrika*, 5 June 1902.

* পরিণত বয়সে মীরা দেবীর বাগান-প্রীতির কথা বহুবিদিত, শান্তিনিকেতনে তাঁর বাড়ির নাম 'মালঞ্চ'। এই চিঠিতেও তিনি তাঁর প্রীতি ব্যক্ত করেছেন : 'এখানে খুব গরম পড়েছে। আমার বাগানে কি এখোন ফুল ফোটে? আর যদি গাছপালা শুকিয়ে যায় তাহালে মালিদের কাউকে জল দিতে বোল। আর দুই বেলা দেখিতে বোল।'

* এইরূপ আর-একটি চিঠি সজনীকান্ত দাস 'রবীন্দ্রনাথ : জীবন ও সাহিত্য' [পৃ ৯৩]-তে উদ্ধৃত করেছেন : 'ঈশ্বর আমাকে গৃহ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিয়াছেন—এক্ষণে আমাকে ভিক্ষুব্রত গ্রহণ করিতে হইবে। আপনার দ্বারে আমার এই প্রার্থনা যে বোলপুর ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমের একটি ছাত্রের ব্যয়ভার আপনাকে গ্রহণ করিতেই হইবে। অধিক নহে, বৎসরে ১৮০ টাকা। প্রতি বৎসর অগ্রহায়ণ মাসে যদি এই টাকাটি দেন তবে তাহা আমার পরলোকগতা পত্নীর মৃত্যুবার্ষিক মঙ্গলদান বলিয়া আমি তৃপ্তিলাভ করিব এবং তাহাতে ঈশ্বর আপনারও কল্যাণ করিবেন।'

* পত্রটিতে 'শান্তিনিকেতন ১৮ই অগ্রহায়ণ ১৩০৯' তারিখ আছে, এটি অবশ্যই ঠিক নয়—উক্ত তারিখে রবীন্দ্রনাথ কলকাতায় ছিলেন। দ্র চিঠিপত্র ১০।১০-১১, পত্র ১১

* সুধাকান্ত রায়চৌধুরীকে লেখা অনিলবরণ রায়চৌধুরীর 21.5.67 তারিখের পত্র থেকে তথ্যগুলি সংগৃহীত। পত্রটি দ্বীপেশ রায়চৌধুরীর সৌজন্যে প্রাপ্ত।

* বিহার বাংলা অ্যাকাডেমির প্রকাশিতব্য গ্রন্থ অমল সেনগুপ্তের 'রবীন্দ্রনাথ ও বিহার'-এর বেশ কিছু তথ্য আমরা বন্ধুত্বসূত্রে গ্রন্থপ্রকাশের আগেই ব্যবহার করার সুযোগ পেয়েছি।

* রবীন্দ্রনাথ পত্রটির তারিখ লিখেছেন '৪ঠা শ্রাবণ ১৩১০'—কিন্তু সেটি ভুল; এ-সম্পর্কে আলোচনা পরবর্তী অধ্যায়ে আছে।

* দ্র বিবেকানন্দ ও সমকালীন ভারতবর্ষ ৬ [১৩৯২]।১০৪; সুমিত সরকারও এই তারিখটিই দিয়েছেন দ্র The Swadeshi Movement in Bengal—1903-1908 [1977], p.471—তাঁরা তারিখটি পেয়েছেন সম্ভবত জীবনতারা হালদারের 'অনুশীলন সমিতির ইতিহাস' [প্রথম প্রকাশ : ১৩৫৬, ৪র্থ সংস্করণ : ১৩৮৩] গ্রন্থ থেকে।

ত্র য় শ্চ ত্বা রিং শ অ ধ্যা য়

১৩১০ [1903-04] ১৮২৫ শক ॥ রবীন্দ্রজীবনের ত্রয়শ্চত্বারিংশ বৎসর

বিভিন্ন বিশিষ্ট ব্যক্তির উপস্থিতিতে শান্তিনিকেতনে ১৩০৯ বঙ্গাব্দের নববর্ষ উৎসব সমারোহ সহকারে পালিত হয়েছিল। কিন্তু তারই মধ্যে রবীন্দ্রনাথ মৃত্যুর আভাস অনুভব করেছিলেন, যা মর্মান্তিকভাবে সত্য হয়ে উঠেছিল মৃণালিনী দেবীর মৃত্যুতে। বর্তমান বৎসরটি তিনি আরম্ভই করলেন কন্যা রেণুকার কালব্যাধির কালো ছায়ায়। মন্দিরে নববর্ষের উপাসনা নিশ্চয়ই হয়েছিল, কিন্তু রবীন্দ্রনাথ কোনো লিখিত ভাষণ দেননি।

হাজারিবাগে রেণুকার স্বাস্থ্যের উন্নতি হচ্ছিল না বলে তাঁকে আলমোরায় নিয়ে যাবার পরিকল্পনা হয়, একথা আমরা আগেই বলেছি। রবীন্দ্রনাথ তারই আয়োজনে কলকাতায় এলেন ৩ বৈশাখ [বৃহ 16 Apr] তারিখে। ৪ বৈশাখ তিনি মনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়কে লিখেছেন : 'আমি ঘুরপাক খাইয়া বেড়াইতেছি। রেণুকাকে আলমোরায় লইয়া যাইবার বন্দোবস্ত করিতে কলিকাতায় আসিয়াছি। আবার শীঘ্র যাইতে হইবে, আমার শরীর ভাল নহে।....কতদিনে সুস্থির হইয়া বসিব কে জানে।'[১] 'আলমরার বাটীর বন্দবস্ত নিমিত্ত' সত্যপ্রসাদ জগদীশচন্দ্র বসুর বাড়ি গিয়েছিলেন, রবীন্দ্রনাথও ৪ বৈশাখ পার্শিবাগান যাতায়াত করেছেন। ৫ বৈশাখ বালিগঞ্জ ও কর্নওয়ালিশ স্ট্রীট, ৬ বৈশাখ কর্নওয়ালিশ স্ট্রীট, ৮ বৈশাখ বালিগঞ্জ ও ৯ বৈশাখ তাঁর বিডন স্ট্রীটে যাতায়াতের হিসাব ক্যাশবহিতে পাওয়া যায়। কাব্যগ্রন্থ তখন ছাপা চলছিল মজুমদার লাইব্রেরিতে, সেই কারণেই হয়তো কর্নওয়ালিশ স্ট্রীটে যাতায়াত; আলমোরায় অবস্থানকালে শমীন্দ্রনাথ ও মীরা দেবীর থাকার ব্যবস্থা হয় বালিগঞ্জে জ্ঞানদানন্দিনী দেবীর কাছে, সেইজন্য কথাবার্তা বলতে হয়তো তিনি বালিগঞ্জে গিয়েছিলেন; আর বিডন স্ট্রীট যাওয়ার কারণ হয়তো ডাঃ ডি. এন. রায়ের সঙ্গে রেণুকার চিকিৎসা বিষয়ে পরামর্শ করা।

সরকারী তহবিল থেকে রবীন্দ্রনাথকে 'উঁহার বেড়াইবার খরচ জন্য' ১০০০ টাকা দেওয়া হয় ৮ বৈশাখ। এই টাকা নিয়ে তিনি শান্তিনিকেতনে যান ৯ বৈশাখ [বুধ 22 Apr]। প্রচণ্ড গরমের জন্য বিদ্যালয়ে গ্রীষ্মের ছুটি দিয়ে দেওয়া হয় ১৪ বৈশাখ [সোম 27 Apr]। সতীশচন্দ্র রায়ের তত্ত্বাবধানে রথীন্দ্রনাথ ও কয়েকজন ছাত্রকে রেখে ও অন্যান্য ব্যবস্থা করে আলমোরা রওনা হওয়া রবীন্দ্রনাথের সংকল্প ছিল। কিন্তু দুর্গম পথ পেরিয়ে রেণুকাকে সেখানে নিয়ে যাওয়া সম্ভব কিনা এসম্বন্ধে তিনি সম্পূর্ণ দ্বিধামুক্ত হতে পারেননি। তাই ওইদিন তিনি মনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়কে লিখছেন :'এখনো সুস্থির হইতে পারি নাই। রেণুকা হাজারিবাগেই আছে। আলমোরায় তাহাকে এত পথ ভাঙ্গিয়া স্থানান্তরিত করা সম্ভব হইবে না। আমি পরশ্ব হাজারিবাগে যাত্রা

করিব।'[২] ১৫ বৈশাখ তিনি কলকাতায় আসেন। এই দিনই তিনি বালিগঞ্জ যান। পরদিন কর্নওয়ালিশ স্ট্রীট যাওয়া ছাড়া তাঁর 'সন্ধ্যের সময় বালিগঞ্জ হইতে আসার' হিসাব পাওয়া যায়। আগেই বলেছি, শমীন্দ্রনাথ ও মীরা দেবীকে জ্ঞানদানন্দিনী দেবীর তত্ত্বাবধানে রাখার কথা ভাবা হয়েছিল, সেই সংক্রান্ত আলোচনাই হয়তো বালিগঞ্জে যাতায়াতের কারণ। ২০ বৈশাখ 'বালীগঞ্জে কাপড়ের আলমারী পাঠান মুটে ভাড়া'র হিসাব এই অনুমানের সমর্থক।

১৪ বৈশাখ 'পরশ্ব' হাজারিবাগে যাত্রার কথা লিখলেও রবীন্দ্রনাথ ১৭ বৈশাখ [বৃহ 30 Apr] পুনরায় শান্তিনিকেতনে আসেন। রবিবার [২০ বৈশাখ : 3 May] তিনি 'বোলপুর' থেকে মোহিতচন্দ্র সেনকে লেখেন : 'আমি কালই হাজারিবাগ রওনা হচ্চি। রেণুকার শরীর ভাল নেই।....আমি শেষকালে আমার কন্যাকে নিয়ে আলমোরায় যাত্রা করতেই বাধ্য হলুম।'[৩]

২১ বৈশাখ শান্তিনিকেতন থেকে যাত্রা করে হাজারিবাগ, গিরিডি ও মধুপুর হয়ে রেণুকাকে নিয়ে পথে অবর্ণনীয় কষ্ট ভোগ করে তিনি আলমোরা পৌঁছন। আলমোরার Thomson House থেকে 'শুক্রবার' [*8 May: ২৫ বৈশাখ] তাঁর ৪৩-তম জন্মদিনে মোহিতচন্দ্র সেনকে লিখছেন : 'আলমোরায় পৌঁছিলাম। অতি দুর্গম পথ। অনেক কষ্ট দিয়াছে। সৌভাগ্যক্রমে পথে রেণুকা ভাল ছিল। আজ তাহার শরীর ভাল নাই—কিছুদিন বিশ্রামের পর বুঝা যাইবে, জায়গাটি ভাল, বাতাসটি বেশ, বাড়িটি আরামের। চারিদিকে ফল ফুলের বাগান ফলে ফুলে পরিপূর্ণ।'[৪] পথের দুঃখের কথা তিনি বিস্তারিতভাবে লিখেছেন গিরিডির বারগাণ্ডা-নিবাসী সুধাংশুবিকাশ রায় [১২৮২-১৩৬০]কে ২৭ বৈশাখের [রবি 10 May] পত্রে :

সুদীর্ঘ পথে বিচিত্ররকমের দুঃখভোগ করা গেছে। প্রথমত মধুপুর ষ্টেশনে যখন পৌঁছিলাম ষ্টেশনমাষ্টার আশ্বাস দিলেন বম্বাইমেলের সঙ্গে আমাদের গাড়ী জুড়িতেও পারেন। অবশেষে টেলিগ্রাফ করিয়া জানিলেন এত অল্প সময়ের চেষ্টায় তাহা সম্ভবপর হইবে না।

মোগলসরাই যখন পৌঁছান গেল ষ্টেশনমাষ্টার বলিলেন আমাদের গাড়ি মেলে যাইবে না, প্যাসেঞ্জারে জুড়িয়া দিবেন।····যে সময় বেরিলি পৌঁছিবার কথা তাহার বারো ঘণ্টা পরে পৌঁছিলাম। সেখানে একদিনও অপেক্ষা না করিয়া সেইদিনই কাঠগোদামে আসিতে হইল—সেখানে না পাইলাম থাকিবার জায়গা, না পাইলাম আল্‌মোড়া-যাত্রার কুলি—সেই দ্বিপ্রহর রৌদ্রে অনাহারে রেণুকাকে লইয়া এক্কায় চড়িয়া রাণীবাগ নামক এক জায়গায় ডাকবাংলায় গিয়া কোনমতে অপরাহ্নে আহারাদি করা গেল। যাহা হউক্ পথের সমস্ত কষ্ট বর্ণনা করিয়া কি হইবে? কোনপ্রকারে গম্যস্থানে আসিয়া পৌঁছিয়াছি—রেণুকার জ্বর বাড়িয়াছে—কিছুদিন বিশ্রামের পর এখানকার জলবায়ুর ফলাফল বুঝা যাইবে।

জায়গাটি রমণীয়—বাসটি সুশীতল, আমাদের বাড়িটি বৃহৎ, চারদিকের বাগানটি সুন্দর, আমাদের গৃহস্বামীটি অতিথিবৎসল, অতএব ক্ষোভের বিষয় এখন আর কিছুই নাই।[৫]

—শমীন্দ্রনাথের একটি চিঠিতে লিখিত ঠিকানা থেকে জানা যায়, এই গৃহস্বামীর নাম লালা বদ্রি শাহ।

প্রচুর পরিশ্রম ও বিপুল অর্থব্যয়ের পর আলমোরায় এসে রবীন্দ্রনাথ স্বাভাবিকভাবেই আশা করেছেন, এই পরিবর্তনে রেণুকার স্বাস্থ্যের উপকার হবে। ১ জ্যৈষ্ঠ [শুক্র 15 May] তিনি মনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়কে লিখেছেন : 'এত ক্লেশেও রেণুকার বিশেষ অনিষ্ট হয় নাই এবং আশা করিতেছি কিছুদিন বিশ্রাম করিতে পারিলেই সে এখানকার স্বাস্থ্যকর জলবায়ুর পুরা উপকার লাভ করিতে আরম্ভ করিবে।'[৬] এই আশা অবশ্য পূর্ণ হয়নি।

কিন্তু আলমোড়ায় রমণীয় প্রাকৃতিক পরিবেশে রবীন্দ্রনাথের কাব্যরচনার সূত্রপাত হয়েছে। এই পর্বেও মজুমদার-পুথি তাঁর কবিতার বাহন। বৈশাখ মাসে লিখিত কবিতার সংখ্যা দুটি :

২৯ বৈশাখ [মঙ্গল 12 May]'আমি যারো ভালোবাসি সে ছিল এই গাঁয়ে' দ্র উৎসর্গ ১০।৫১-৫২ [৩৪]; বঙ্গদর্শন, আষাঢ়। ১০৭-০৮ ['গ্রাম']

কবিতাটি কাব্যগ্রন্থ দ্বিতীয় ভাগ দ্বিতীয় খণ্ডের অন্তর্গত 'প্রেম' বিভাগের অন্তর্ভুক্ত হয়।

৩০ বৈশাখ [বুধ 13 May]'দেখো চেয়ে গিরির শিরে' দ্র উৎসর্গ ১০।৪৮-৫১ [৩৩]; বঙ্গদর্শন, আষাঢ়। ১৩৬-৩৯ ['মেঘোদয়ে']

কবিতাটি কাব্যগ্রন্থ তৃতীয় ভাগের অন্তর্গত 'প্রকৃতিগাথা' বিভাগের অন্তর্ভুক্ত হয়। ১ জ্যৈষ্ঠ রবীন্দ্রনাথ মনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়কে লেখেন : 'কাল পর্শু বৃষ্টি হইয়া বাতাস বেশ পরিষ্কার হইয়া গেছে—মাঝে মাঝে কুহেলিকার আবরণ সরিয়া গিয়া তুষারশিখরশ্রেণীর আভাস দেখিতে পাওয়া যাইতেছে।'[৭] মেঘ ও বর্ষার এই ভাবাবহ কবির জন্মান্তরীণ স্মৃতিকে উদ্বোধিত করে জীবনদেবতার এক বিচিত্র প্রকাশ রূপে আবির্ভূত হয়েছে। ৩ জ্যৈষ্ঠ [রবি 17 May] রবীন্দ্রনাথ সতীশচন্দ্র রায়কে লিখেছেন : 'আজকাল Myersএর Human Personality and its survival after death নামক বই লইয়া পড়িতে বসিয়াছি। মনস্তত্ত্বের অপরূপ রহস্যের মধ্যে তলাইয়া গেছি। আশ্চর্য্য এই যে, আমার কাব্যের মধ্যে কবিতার ভাষায় আভাসে ইঙ্গিতে নানাস্থানেই আমি এই সকল কথা বলিয়াছি। আমাদের গোচরাতীত চেতনাকে ও ইন্দ্রিয়াতীত জগৎকে আমি নানাভাবে স্পর্শ করিয়াছি এবং তাহাদের বার্ত্তা নানা ছন্দে দিবার চেষ্টা করিয়াছি। অধিকাংশ সময়েই এই প্রয়াস আমার নিজের ইচ্ছাকৃত নহে—আমার অন্তঃপুরবাসিনী "কৌতুকময়ী" আমাকে দিয়া কখন কি লিখাইয়া লইয়াছেন তাহা আমাকে তখন জানিতেও দেন নাই।'[৮] এই অন্তঃপুরবাসিনীর কৌতুক বর্তমান কবিতাতেও অনুভব করা যায়।

বৈশাখ মাসে বিভিন্ন পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথের অনেকগুলি রচনা মুদ্রিত হয় :

বঙ্গদর্শন, বৈশাখ ১৩১০ [৩।১] :

১-৩ 'ভোরের পাখী' ['ভোরের পাখি ডাকে কোথায়'] দ্র উৎসর্গ ১০।৭-৯ [১]

৩-৮ 'রাজকুটুম্ব' দ্র সমূহ-পরিশিষ্ট ১০।৫৯৯-৬০৫

১৪-১৬ 'চৈত্রের গান' ['ওরে আমার কর্মহারা'] দ্র উৎসর্গ ১০।৫২-৫৪ [৩৫]

৩২-৪১ 'নৌকাডুবি' ১-৪ দ্র নৌকাডুবি ৫।১৬৭-৭৩ [১-৩]

'রাজকুটুম্ব' প্রবন্ধটি বস্তুত 'আলোচনা'-শ্রেণীর রচনা, *New India* পত্রিকার 12 Mar 1903 [বৃহ ২৮ ফাল্গুন ১৩০৯]-সংখ্যায় সম্পাদক বিপিনচন্দ্র পাল-কৃত 'European Criminal in India' রচনার উপর মন্তব্য-প্রসঙ্গে লিখিত। একপক্ষে অপরিসীম সহিষ্ণুতা ও অন্যপক্ষে অপরিহত শক্তি সম্মুখীন বলেই য়ুরোপীয় বিচারক স্বশ্রেণীর ক্রিমিনালকে ক্ষমা প্রদর্শন করে, এই বক্তব্য প্রকাশ করতে গিয়ে বিপিনচন্দ্র টিপ্পনী দিয়ে লিখেছিলেন—এরূপ স্থলে আমরাও এমনই করতাম, সুযোগ পেলে এশিয়াবাসী 'রিফাইন্ড' পাশবতায় য়ুরোপীয়কেও জিততে পারত। রবীন্দ্রনাথ তাঁর প্রবন্ধটি লেখেন প্রধানত এই টিপ্পনীটির সমালোচনা করে। তিনি হিন্দুজাতির একান্নবর্তী পারিবারিক বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ করে মন্তব্য করেন, ত্যাগপরতা সংযম মঙ্গলনিষ্ঠা প্রভৃতি মনুষ্যত্বের উচ্চতর গুণের অধিকারী হিন্দুরা কখনোই রিফাইণ্ড ও অকৃত্রিম পাশবিকতাকে

প্রশ্রয় দিত না—'আমাদের স্বভাবের যে গতি, তাহাতে অক্ষমকে আমরা আত্মীয়শ্রেণীভুক্ত করিয়া লইতাম। আমরা ভিক্ষুককে, দুর্বলকে, প্রাচীনকে কখনো অবজ্ঞা করি নাই।' নৌকাডুবি উপন্যাস এই সংখ্যা থেকে প্রকাশিত হতে থাকে। গ্রন্থে পত্রিকার পাঠ বহুল পরিমাণে বর্জিত হয়, ২য় ও ৩য় পরিচ্ছেদের অনেক অংশ বাদ দিয়ে গ্রন্থের ২য় পরিচ্ছেদে পরিণত হয়েছে।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, বৈশাখ ১৮২৫ শক [৭১৭ সংখ্যা] :

3-4 'The God of Upanishads'

ঔপনিষদ ব্রহ্ম গ্রন্থের ৪১-৪২ অনুচ্ছেদের ['কিন্তু সহজ কঠিনের কথা উঠে কেন?····তাঁহার সম্মুখে কৃত এবং তাঁহার উদ্দেশে সমর্পিত হইবে' দ্র অ-২২১২-১৩] ইংরেজি অনুবাদ এই সংখ্যায় মুদ্রিত হয়।

সঙ্গীত-প্রকাশিকা, বৈশাখ ১৩১০ [২।৮] :

১৩০-৩২ পূরবী-একতালা। ঘাটে বসে আছি আনমনা দ্র স্বর ৪

১৩৩ তিলক কামোদ-সুরফাঁক্তা। শান্তি কর বরিষণ নীরব ধারে দ্র ঐ ৪

দুটি গানেরই স্বরলিপি করেন কাঙালীচরণ সেন।

আলমোরায় গিয়েও বিদ্যালয় ও রথীন্দ্রনাথের পড়াশোনার চিন্তা রবীন্দ্রনাথকে ত্যাগ করেনি, বরং দূরত্বহেতু তা বর্ধিত হয়েছে। ১ জ্যৈষ্ঠ তিনি মনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়কে লেখেন : 'রথীর সম্বন্ধে এখনো সম্পূর্ণ কিছু স্থির করি নাই। তবে তাহাকে যখন আমেরিকা বা য়ুরোপে পাঠাইতেই হইবে তখন এফ্‌, এ, পরীক্ষার পড়া পড়াইয়া এই সময়টা নষ্ট করিতে ইচ্ছা হয় না। এই দুই বৎসর তাহাকে যথারীতি শিখাইলে বিদ্যাচর্চ্চার পথে অনেক দূর অগ্রসর করিয়া দেওয়া যায়। সম্মুখে পরীক্ষার উত্তেজনা নাই বলিয়া যে তাহাকে শিথিলভাবে পড়ান হইবে তাহা মনে করিবেন না। যতদূর জানি সে মনোযোগ দিয়া পড়া করিতেছে।'[৯] 'রবিবার' [৩ জ্যৈষ্ঠ : 17 May] তিনি সতীশচন্দ্রকে লিখেছেন : 'আমি নিশ্চয় জানি রথীর অধ্যাপনা কার্য্যে তোমার যত্নের ত্রুটি হইবে না তাই আমি এত নিশ্চিন্ত আছি।····রথীকে সাহিত্যে যথার্থভাবে দীক্ষিত করা সম্বন্ধে তুমি ছাড়া আর কাহারো প্রতি আমি নির্ভর করিতে পারি না। কেবল সাহিত্যে কেন, তুমি তাহাকে মনুষ্যত্বেও অগ্রসর করিতে পারিবে।'[১০] একই দিনে তিনি রথীন্দ্রনাথকেও একটি দীর্ঘ উপদেশপূর্ণ চিঠিতে লেখেন :

আশা করি তোর পড়াশুনা বেশ ভালই চলিতেছে এবং তুই সর্ব্বপ্রকার নিয়ম পালন পূর্ব্বক সংযতভাবে অধ্যয়নে নিযুক্ত আছিস।···আমার ইচ্ছা তুই দিবারাত্রি বিদ্যালয়েই থাকিস। শান্তিনিকেতনের বাড়ীতে তোর যাতায়াত থাকিলে মন বিক্ষিপ্ত হইবে। তুই বিদ্যালয়ের ছাত্র একথা কিছুতেই বিস্মৃত হইবি না। সম্মুখে আপাতত কোন পরীক্ষা দিবার উত্তেজনা নাই বলিয়া যদি স্বাধীনভাবে চলিস্ ও শিথিলভাবে পড়াশুনা করিস্ তবে নিজের পরম ক্ষতি করিবি।····সতীশের কাছে ইংরাজি Compositionএর চর্চ্চা করিস্।····তুই সাহিত্যের অত্যন্ত উপযুক্ত শিক্ষক পাইয়াছিস্—এই অবসরে যদি তোর সাহিত্যে অধিকার ও রসগ্রাহিতা না জন্মে তবে তোর শিক্ষা ব্যর্থ হইবে। স্বত প্রবৃত্ত হইয়া আপনার উন্নতি সাধন ও সকল প্রকার মন্দ হইতে আত্মরক্ষা করিয়া চলিবার বয়স তোর হইয়াছে এখন নিজের ভার তুই নিজে গ্রহণ করিবি এই আমি দেখিতে ইচ্ছা করি। আমার এখন সকল দিক হইতে অবকাশ লইবার সময় হইয়াছে—আমার সংসারের মঙ্গল এখন তোর উপরেই প্রধানত নির্ভর করিবে। তোর দৃষ্টান্ত ও শিক্ষা, তোর চরিত্রবল ও কর্ত্তব্যনিষ্ঠা এখন আমাদের পরিবারকে আশ্রয় দিয়া রক্ষা করিবে।····এ পর্য্যন্ত নানাভাবে আমাদের পরিবারে মহত্ত্বের আদর্শ বিরাজ করিয়া আসিতেছিল আমাদের বাড়ীর এখনকার ছেলেদের মধ্যে তাহা নষ্ট হইবার দিকে যাইতেছে।····আমাদের পরিবারকে এই অধোগতি হইতে রক্ষা করিতে হইবে।[১১]

গ্রীষ্মের ছুটির অধিকাংশ রথীন্দ্রনাথ ও সন্তোষচন্দ্র শান্তিনিকেতনে কাটান, এই দু'মাস তাঁরা সতীশচন্দ্রকে খুব কাছাকাছি পেয়েছিলেন। রথীন্দ্রনাথ তাঁর বাংলা সংস্কৃত ও ইংরেজি সাহিত্যে অসামান্য অধিকারের বর্ণনা দিয়ে লিখেছেন :

দিনের বেলায় লাইব্রেরির এক কোণের ঘরে দরজা-জানালা বন্ধ করে তিনি আমাকে ও সন্তোষকে পড়াতেন কালিদাস ও শেক্''্পীয়র। তাঁর পড়াবার এমন ধরন ছিল, কঠিন সাহিত্য পড়ছি বলেই মনে হত না।····গ্রীষ্মের ছুটির মধ্যে রাত্রে শান্তিনিকেতনের উন্মুক্ত মাঠে বেড়াতে বেরিয়ে কত রাত কেটে যেত শুয়ে শুয়ে সতীশবাবুর কণ্ঠে বাংলাকাব্য শুনতে শুনতে।····তিনি এমনি আত্মহারা হয়ে, ভাবে মাতোয়ারা হয়ে আবৃত্তি করতেন যে, কবিতার অন্তরের রহস্য আমার কাছে উজ্জ্বল হয়ে প্রকাশ পেত, রচনা যতই কঠিন হোক-না কেন তার মর্মার্থ বুঝতে কষ্ট হত না। ·····ছুটির কয়েকটা দিনের মধ্যে সতীশ রায় আমাদের কতখানি-না সাহিত্যরসের খোরাক দিয়েছিলেন, কতখানি-না মনকে জাগিয়ে তুলেছিলেন, মনে করলে অভিভূত হতে হয়। অল্প বয়সের এই একটি কবি ও ভাবুক অল্প দিনের সংস্পর্শে আমাকে চিরজীবন তাঁর কাছে ঋণী করে দিয়ে গেছেন।[১২]

মোহিতচন্দ্রকে রবীন্দ্রনাথ গ্রীষ্মের ছুটি কাটানোর জন্য 'দ্বিগুণিত ত্রিগুণিত' করে আলমোরায় আসার জন্য আহ্বান জানিয়েছিলেন। কাব্যগ্রন্থ-সম্পাদনা, রথীন্দ্রনাথের পাঠ্যসূচী প্রণয়ন ও বিদ্যালয়-পরিচালনার সুব্যবস্থা প্রভৃতি নিয়ে আলোচনা করাও তাঁর উদ্দেশ্য ছিল। মোহিতচন্দ্র এই আহ্বানে সাড়া দেন। সতীশচন্দ্রকে লিখিত উল্লিখিত পত্রে রবীন্দ্রনাথ এই সংবাদ জানিয়েছেন : 'আমার পক্ষে একটা সুখবর আছে। মোহিতবাবু এখানেই আসিতেছেন। আজ রবিবারে [৩ জ্যৈষ্ঠ] তিনি ছাড়িবেন। তাহা হইলে বুধ বৃহস্পতিবারের মধ্যেই তিনি আসিয়া পৌঁছিতে পারিবেন। তাঁহার সঙ্গে নানা কথা আলোচনা করিবার আছে।' মোহিতচন্দ্র দুটি সপ্তাহ আলমোরায় কাটান। সম্ভবত তিনিই খবর নিয়ে আসেন যে, রথীন্দ্রনাথ প্রথম বিভাগে ও সন্তোষচন্দ্র দ্বিতীয় বিভাগে এন্ট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছেন। মোহিতচন্দ্রের সহায়তায় রবীন্দ্রনাথ রথীন্দ্রনাথের পাঠ্যসূচী প্রণয়ন ও পরীক্ষার ব্যবস্থাও করেন। কয়েকজন নূতন শিক্ষক নিয়োগের আয়োজনও করা হয়। এইসব খবর দিয়ে তিনি ১০ জ্যৈষ্ঠ [রবি 24 May] মনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়কে লেখেন :

ইতিমধ্যে শান্তিনিকেতনে রথীর পড়ার যথাসম্ভব ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছি। সুবোধ ত চলিয়া গেছেন—আপাতত শান্তিনিকেতনের বিদ্যালয়ের চারজন শিক্ষক আছেন। আরও তিনজনের আসিবার বন্দোবস্ত করিয়াছি। ইহাদের মধ্যে দুইজন এম্, এ, (বর্তমানে অন্যত্র অধিক বেতনে হেড্‌মাষ্টারি করিতেছেন) ব্রহ্মবিদ্যালয়ে মাসিক পঞ্চাশ টাকা বেতনে কার্য্য লইতে প্রস্তুত হইয়াছেন। ইঁহারা অস্থায়ী হইবেন বলিয়া আশঙ্কা করি না। আর একজন বি,এ, ইনিও কোনো স্কুলে প্রধান গণিত শিক্ষকের পদে নিযুক্ত আছেন। আপাতত এই কয়জন হইলে রথীকে শেখানো ও বিদ্যালয়ের কার্য্যনির্ব্বাহ চলিয়া যাইবে। রথীর ছয়মাসের পাঠ্য আমরা স্থির করিয়া পাঠাইয়াছি। ছয় মাস হইয়া গেলে তাহার রীতিমত পরীক্ষা হইবে। মোহিতবাবু সাহিত্য ইতিহাসে পরীক্ষকতা করিতে সম্মত হইয়াছেন।[১৩]

নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য পৌষ ১৩০৯ [Jan 1903]-এ বৈদ্যবাটিতে কাজ পেয়ে ব্রহ্মচর্যাশ্রম ত্যাগ করেন। বর্তমানে তিনি আবার পুরোনো কাজে ফিরতে উৎসুক ছিলেন। এ-সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন : 'যাঁহারা সেখানকার কাজেই স্থায়ীভাবে আত্মসমর্পণ করিতে প্রস্তুত নহেন তাঁহাদিগকে কিছুদিনের মত রাখিয়া বিদ্যালয়ের ক্ষতি করিতে পারি না।' কিন্তু এই সিদ্ধান্তে তিনি অবিচল থাকতে পারেননি। মনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়কে ফিরে পেতে তিনি তো খুবই আগ্রহী ছিলেন, সুবোধচন্দ্র মজুমদার তাঁর শ্বশুরের চেষ্টায় দিল্লিতে পোস্ট অফিসে কাজ নিয়ে চলে যাওয়ায় বিরক্তি সত্ত্বেও তিনি তাঁকে পুনরায় বিদ্যালয়ে গ্রহণ করেছিলেন, জামাতা সত্যেন্দ্রনাথকেও তিনি পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করেন। বস্তুত শিক্ষকদের নিরন্তর আসাযাওয়া [জগদানন্দ, হরিচরণ প্রভৃতি কিছু ব্যতিক্রম-সহ] ব্রহ্মচর্যাশ্রম ও বিশ্বভারতীর একটি ব্যাধির মতোই ছিল, যার জন্য রবীন্দ্রনাথকে প্রায়শই বিব্রত হতে হয়েছে। অধিক বেতনে 'হেডমাষ্টারি'-করা যে ব্যক্তিকে তিনি নিয়োগ

করেছিলেন, তিনি হলেন রামপুরহাট হাইস্কুলের হেডমাস্টার নগেন্দ্রনারায়ণ রায়। হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় এঁর সম্বন্ধে লিখেছেন : 'তিনিশান্ত-স্বভাব নিরীহ ভদ্রলোক ছিলেন; তাঁর রাগ ছিল না—যতদিন তিনি আশ্রমে ছিলেন, কোন দিনই তাঁর রাগ দেখিনি। তিনি হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা কত্তেন, রোগীর প্রতি তাঁর বিশেষ লক্ষ্য ছিল, তাঁকে ডাকতে হ'তো না, একটু সংবাদ পেলেই তিনি রোগীর কাছে এসে উপস্থিত হ'তেন, ঔষধ দিতেন, সেবাশুশ্রূষার ব্যবস্থা কত্তেন,....ক্ষত রোগীর ব্যাণ্ডেজ নিজেই বাঁধতেন।'[১৪] কিন্তু এঁর শিক্ষাবিধির সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাদর্শের পার্থক্য ছিল সুদুস্তর। এ-সম্পর্কে তিনি নিজেই লিখেছেন :

এক সময়ে নিজের অভিজ্ঞতার খেদে আমার হঠাৎ মনে হল যে, একজন হেডমাস্টারের নেহাৎ দরকার। কে যেন একজন লোকের নাম করে বললে, 'অমুকলোকটি একজন ওস্তাদ শিক্ষক, যাকে তাঁর পাসের সোনার কাঠি ছুঁইয়েছেন সেই পাস হয়ে গেছে।'—তিনি তো এলেন, কিন্তু কয়েক দিন সব দেখেশুনে বললেন, 'ছেলেরা গাছে চড়ে, চেঁচিয়ে কথা কয়, দৌড়য়, এ তো ভালো না।' আমি বললাম, দেখুন, আপনার বয়সে তো কখনো তারা গাছে চড়বে না। এখন একটু চড়তেই দিন না। গাছ যখন ডালপালা মেলেছে তখন সে মানুষকে ডাক দিচ্ছে। ওরা ওতে চড়ে পা ঝুলিয়ে থাকলোই-বা।' তিনি আমার মতিগতি দেখে বিরক্ত হলেন। ....তিনি ছিলেন পাসের ধুরন্ধর পণ্ডিত, ম্যাট্রিকের কর্ণধার। কিন্তু এখানে তাঁর বনল না, তিনি বিদায় নিলেন।[১৫]

শান্তিনিকেতন পত্র-এর ভাদ্র-আশ্বিন ১৩২৯-সংখ্যায় এই লেখা পড়ে মনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় মনে করেছিলেন, তিনিই এই উক্তির লক্ষ্য। রবীন্দ্রনাথ তাঁর অনুযোগের উত্তরে 3 Oct 1922 [১৬ আশ্বিন ১৩২৯] তাঁকে লেখেন : 'আপনি চলে যাবার পরে হিতৈষীবর্গের তাড়নায় আমি বীরভূমের কোনও জেলা ইস্কুল থেকে একটি ভদ্রলোককে তাঁর হেডমাষ্টারি সমেত সমূলে উৎপাটিত করে আমাদের বিদ্যালয়ে রোপণ করেছিলেন। কিন্তু মাটির গুণে এখানে তাঁর শিকড় বস্‌ল না।'[১৬] হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মনে করেছেন, নগেন্দ্রনারায়ণ রায়কে লক্ষ্য করেই উক্তিটি করা হয়েছে।[১৭]

মোহিতচন্দ্রের সঙ্গে বিদ্যালয় সম্পর্কে আলোচনা করে রবীন্দ্রনাথ পুনরায় একটি কমিটি গঠন করলেন। 'মঙ্গলবার' [১৯ জ্যৈষ্ঠ : 2 Jun] তিনি এ-সম্পর্কে মনোরঞ্জনবাবুকে লিখেছেন : 'বিদ্যালয়ের অধ্যাপনবিধি নির্দ্ধারণ ও তত্ত্বাবধানের ভার মোহিতবাবুর উপর দিয়াছি। জগদীশ, মোহিতবাবু এবং দুর্গাদাস গুপ্ত ডাক্তার আপাতত এই তিনজনে কমিটি বাঁধিয়া বিদ্যালয়ের ভার গ্রহণ করিবেন এইরূপ স্থির করা গেল। মোহিতবাবু এখান হইতে কাল রওনা হইয়া প্রথমে বোলপুরে নামিরেন—সেখানে সমস্ত বিধিবদ্ধ করিয়া কলিকাতায় যাইবেন। এই ভাবে চলিলে বিদ্যালয়ের উন্নতি আশা করি।'[১৮] রবীন্দ্রনাথ বিদ্যালয়ের ব্যাপারে ক্রমশই মোহিতচন্দ্রের উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ছেন, এই পত্রাবলী তার অন্যতম প্রমাণ।

কাব্যগ্রন্থ-এর ব্যাপারেও তিনি মোহিতচন্দ্রের উপর নির্ভর করেছেন। আমরা আগেই দেখেছি, রবীন্দ্রনাথ যখন কাব্যগ্রন্থ প্রকাশের সিদ্ধান্ত নেন তখন পরিকল্পনা, বিষয়-বিভাগ, কবিতা-নির্বাচন প্রভৃতি সমস্ত দায়িত্ব তিনি একাই পালন করেছেন। মোহিতচন্দ্র ধীরে ধীরে এই সম্পাদনা-কর্মের সঙ্গে যুক্ত হন, তাঁকে লেখা রবীন্দ্রনাথের চিঠি থেকে তা বোঝা যায়। কবি বিজয়চন্দ্র মজুমদার লিখেছেন : 'কাব্যগ্রন্থের ভূমিকাটি আমাদের স্বর্গীয় বন্ধু মোহিতচন্দ্র সেন মহাশয়ের লেখা; কিন্তু কবিতাগুলি যে একা তাঁহারি দায়িত্বে নানা শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়া নূতন রকমে সন্নিবিষ্ট হইয়াছিল, তাহা নয়। একার্য্যে কবির নিজের হাত ছিল চোদ্দ আনা। একথার আমি নিজে সাক্ষী।'[১৮ক] মোহিতচন্দ্র সেন-রচিত 'ভূমিকা'র খসড়া সম্ভবত আলমোরাতেই রচিত হয়। ইন্দিরা দেবীকে লেখা রবীন্দ্রনাথের দুটি চিঠির [24 Sep 1894 দ্র ছিন্নপত্রাবলী। ৩৩৯ এবং 29 Sep 1894 দ্র ঐ।

৩৪৬] কিয়দংশ এই ভূমিকায় ব্যবহৃত হয়। ইন্দিরা দেবী দুটি বাঁধানো খাতায় তাঁকে লেখা চিঠিগুলি নকল করে রবীন্দ্রনাথকে উপহার দেন। শান্তিনিকেতনে ১৩১০-এর গ্রীষ্মযাপনের সময়ে রথীন্দ্রনাথ এই অনুলিখিত চিঠিগুলি পড়েছিলেন, সেকথা উল্লেখ করেছেন তাঁর স্মৃতিকথায়।[১৯] রবীন্দ্রনাথ ৩ জ্যৈষ্ঠ সতীশচন্দ্র রায়কে লেখেন : 'চিঠির সেই দুখানি খাতা মোম জামা দিয়া মজবুৎ করিয়া মুড়িয়া রেজেষ্ট্রি করিয়া পাঠাইয়ো। কুঞ্জবাবুকে বলিয়া দিলে তিনি বোধ হয় উপযুক্ত ব্যবস্থা করিতে পারিবেন'[২০]—এই পত্রে উক্ত খাতা দুটির কথাই বলা হয়েছে। মোহিতচন্দ্র আলমোরায় আসছেন জেনে খাতাগুলি পাঠিয়ে দেওয়ার নির্দেশের তাৎপর্য সহজেই বোঝা যায়—তিনি কিছু পত্রাংশ ভূমিকায় ব্যবহার করুন রবীন্দ্রনাথের এই ইচ্ছার আভাস আমরা অনুভব করতে পারি। তিনি নিজেও পত্রগুলির ব্যাপক ব্যবহার করেছেন। কিছুদিন পরে বঙ্গবাসী পত্রিকার সহকারী-সম্পাদক হরিমোহন মুখোপাধ্যায়ের অনুরোধে 'বঙ্গভাষার লেখক' [ভাদ্র ১৩১১] গ্রন্থের জন্য তিনি যে আত্মপরিচয় রচনা করেন, তাতে এই খাতা থেকে চারটি চিঠির অংশবিশেষ উদ্ধৃত হয়, পরে গদ্যগ্রন্থাবলী-র অন্তর্গত 'বিচিত্র প্রবন্ধ' [১৩১৪] গ্রন্থে 'জলপথে' 'ঘাটে' ও 'স্থলে' শিরোনামায় এই পত্রাবলীর থেকে ৩৪টি পত্র মুদ্রিত হয়, 'ছিন্নপত্র' [১৩১৯] গ্রন্থে সংকলিত হয় ১৫১ [১৫৩]টি পত্র। রবীন্দ্রনাথের ১৫ শ্রাবণের [31 Jul] পত্রে 'ভূমিকার প্রুফ আপনাকে পাঠিয়েছি—পেয়েছেন ত?'[২১] থেকে জানতে পারি, মোহিতচন্দ্র 'ভূমিকা' লেখার পরও তার প্রুফ রবীন্দ্রনাথকে দিয়ে অনুমোদিত করিয়ে নিতে হয়েছিল।

মোহিতচন্দ্র ২০ জ্যৈষ্ঠ [বুধ 3 Jun] আলমোরা ত্যাগ করেন। তার আগের দিন রবীন্দ্রনাথের বন্ধু হেমচন্দ্র মল্লিক সেখানে আসেন। তিনি অন্য বাড়িতে ওঠেন, কিন্তু তাহলেও অন্যধরনের বন্ধুসমাগমে রবীন্দ্রনাথও খুশি হয়েছিলেন। উভয়ের মানসিক প্রতিক্রিয়ায় অবশ্য পার্থক্য ছিল, কলকাতা-প্রত্যাগত মোহিতচন্দ্রকে তিনি ২৪ জ্যৈষ্ঠ [রবি 7 Jun] লিখেছেন : 'হেমবাবু এখানে খুসিতে আছেন। তিনি এখানে প্রতিবৎসরেই আসিতে চান। প্রান্তর আমার মন ভুলাইয়াছে পর্ব্বতকে আমি এখনো হৃদয় দিতে পারি নাই।'[২২] এর দু'দিন আগে ২২ জ্যৈষ্ঠ [শুক্র 5 Jun] তিনি যে কবিতা লেখেন তাতে নির্জন পার্বত্যভূমির কথা নেই, আছে জনসমুদ্র-মন্থনের কথা ['হে জনসমুদ্র, আমি ভাবিতেছি মনে' দ্র উৎসর্গ-সংযোজন ১০।৮৭-৮৮ (১১); বঙ্গদর্শন, শ্রাবণ। ১৭৭, 'সাগরমন্থন']।

কিন্তু বিদ্যালয়ের সুব্যবস্থা করার চিন্তাই তখন তাঁর সমস্ত মন অধিকার করে আছে। ২৪ জ্যৈষ্ঠ [রবি 7 Jun] তিনি সতীশচন্দ্রকে লেখেন :

> তুমি যে রুটীন্ পাঠাইয়াছ তাহাতে তোমাদের পরিশ্রম অত্যন্ত অধিক দেখা যাইতেছে। এরূপ হইলে পারিয়া উঠিবে না। আর একজন শিক্ষক নিতান্তই চাই।····এঞ্জিনিয়ারিং কলেজের ছাত্র আপাততঃ না পাওয়া যায় ক্ষতি নাই—আর একজন উপযুক্ত অধ্যাপক নহিলে তোমাদের সকল দিকেই ক্ষতি হইবে।····নগেন্দ্রবাবুকে না পাওয়া যায় আর কি কেহ নাই?····যদি অন্য যোগ্য লোক নিতান্ত না পাও তবে অগত্যা নরেন্দ্রনাথকে নিযুক্ত করিতে হইবে।[২৩]

এই তাগিদের অন্যতম কারণ সতীশচন্দ্রের প্রতিভার প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা। তাঁর 'দুয়ো-রাণী' [বঙ্গদর্শন, জ্যৈষ্ঠ। ৬৮-৭২] কবিতা পড়ে তিনি মুগ্ধ হয়েছিলেন। রাজেন্দ্রলাল মিত্রের *The Sanskrit Buddhist Literature of Nepal* গ্রন্থের 223-24 পৃষ্ঠায় বর্ণিত শার্দূলকর্ণাবদানের একটি কাহিনী অবলম্বনে তিনি সতীশচন্দ্রকে একটি কবিতা লিখতে বলেছিলেন, সেটি তিনি বঙ্গদর্শন-এর জন্য পাঠিয়ে দিতে লেখেন [দ্র 'চণ্ডালী' :বঙ্গদর্শন, মাঘ। ৪৪৮-৫৪; উল্লেখ্য, রবীন্দ্রনাথ পরবর্তীকালে এই কাহিনী অবলম্বনে 'চণ্ডালিকা' নাটিকা ও নৃত্যনাট্য চণ্ডালিকা

রচনা করেন]। এইজন্যই তিনি সতীশচন্দ্রকে লেখেন : 'তোমাকে শুদ্ধমাত্র পড়াইবার কাজে নিযুক্ত থাকিলে চলিবে না। তোমাকে পড়িতে ও লিখিতে ও ভাবিতে হইবে। তুমি ঔদার্য্যের আবেগে নিজের মানসশক্তির ভাণ্ডার একেবারে নিঃশেষিত করিতে বসিয়ো না।' উৎসাহ ও প্রেরণা দিয়ে এইভাবেই রবীন্দ্রনাথ অনেকের আন্তরশক্তি উদ্বোধিত করার চেষ্টা করেছেন। তাই নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যের নিষ্ঠাহীনতায় বিরক্ত হলেও তাঁর কবিতা নিয়মিত বঙ্গদর্শন-এ প্রকাশে তিনি কখনও বিরত হননি।

কিন্তু বিদ্যালয়ে নূতন শিক্ষক নিয়োগের কাজটি অত্যন্ত জরুরী ছিল। তাই একই দিনে তিনি মোহিতচন্দ্রকে লিখেছেন : 'আমার মনটা বোলপুরের জন্য সব চেয়ে ছট্‌ফট্‌ করিতেছে। আপনি সেখানে একবার গিয়াছেন খবর পাইলে কতকটা নিশ্চিন্ত হইতে পারিব। এখন সেখানে কেবল পাঁচটিমাত্র অধ্যাপক আছেন তাহাতে কাজ চলা অসম্ভব। আর একজন ভাল অধ্যাপক যতদিন আসিয়া না জুটেন ততদিন কোন স্বেচ্ছাব্রতীকে আকর্ষণ করিয়া আনিতে পারেন।' এই চিঠিতেই তিনি লেখেন : 'একটা S.P.R. [? Santiniketan Public Relations] স্থাপনের উদ্যোগ করিবেন। জগদীশকে দলে পাইতে পারিবেন। দুর্গাদাস বাবু বা আর কোন ডাক্তারকেও টানিবেন।' ডাঃ দুর্গাদাস গুপ্ত বা অন্য কোনো ডাক্তারকে কাজে পাওয়া যায়নি, দ্বিজেন্দ্রনাথের জামাতা রমণীমোহন চট্টোপাধ্যায় Trinity পূর্ণ করেন।

অক্ষয়চন্দ্র সরকার প্রথমাবধি রবীন্দ্রকাব্যের কঠোর সমালোচক ছিলেন, তিনি পুত্র অচ্যুতচন্দ্রকে ব্রহ্মচর্যাশ্রমে ভর্তি করে বিদ্যালয়ের শিক্ষাপদ্ধতিরও সমালোচক রূপে অবতীর্ণ হন। এইরূপ একটি চিঠি পেয়ে রবীন্দ্রনাথ 'নানা ভাবে ও ভাবনায় জড়িত জড়ীভূত' হয়েও ২৬ জ্যৈষ্ঠ [মঙ্গল 9 Jun] অক্ষয়চন্দ্রকে একটি দীর্ঘ পত্র লিখে বিদ্যালয়ের শিক্ষাপদ্ধতি ব্যাখ্যা করেন :

একটা মুস্কিল এই যে বিদ্যালয়ে একভাবে শেখানো হয় পরীক্ষা হয়ত অন্য ভাবে করা হইয়া থাকে। যেমন, আমাদের সংস্কৃত শিক্ষার সঙ্গে উপক্রমণিকার সম্বন্ধ নাই। ছাত্রগণ সম্পূর্ণ ভিন্ন পথ দিয়া যাত্রা করিতেছে সুতরাং হঠাৎ তাহাকে ব্যাকরণের সূত্র অথবা সংজ্ঞা জিজ্ঞাসা করিলে সে না বলিতেও পারে। অথচ তাহারা অন্য দিক্ হইতে যাহা শিখিয়াছে তাহা তাহাদের বয়সের ও শ্রেণীর বালকদের কাছে সাধারণতঃ আশা করা যায় না।

অচ্যুত ইংরাজি বাক্য রচনায় যে অক্ষম তাহা ত বোধ হয় না। তবে আপনাকে ভাবিয়া দেখিতে হইবে অনেক কথা যাহা বাংলায় সহজ তাহা ইংরাজিতে সহজ নহে। যেমন "বেণী পিতামাতার কথা শোনে না"। "কথা শোনা"র ইংরাজি একজন বাঙালী বালক না জানিতেও পারে অথচ তাহা হইতে তাহার নিতান্ত মূর্খতা প্রমাণ হয় না।····যাহার মধ্যে কোন মার পেঁচ নাই, এমনতর বাক্য রচনাপ্রণালীই প্রথম শিক্ষণীয়। দেখিতে হইবে তাহারা বাহ্যবিন্যাসের সাধারণ নিয়মগুলি আয়ত্ত করিতে পারিতেছে কিনা, বিশেষ প্রয়োগগুলি একে একে ক্রমে ক্রমে অভ্যাস হইতে থাকে। ২৪

অক্ষয়চন্দ্র শিক্ষকদের সম্পর্কেও কিছু অভিযোগ করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ জগদানন্দকে 'নিপুণ ও উৎসাহী শিক্ষক' রূপে বর্ণনা করে কুঞ্জলাল ঘোষ সম্পর্কে লিখেছেন : 'তিনিভাবুক লোক নহেন কাজের লোক—সুতরাং ভাবের দিকে বেশি ঝোঁক না দিয়া তিনি কাজের দিকে কড়াক্কড়ী করেন—তাহাতে তিনি লোকের কাছে অপ্রিয় হইয়া পড়েন কিন্তু বিদ্যালয়ের শৃঙ্খলা ও স্থায়িত্বের পক্ষে এরূপ লোকের প্রয়োজন অনুভব করি। আমার সঙ্গেও তাঁহার স্বভাবের ঐক্য নাই—থাকিলে আনন্দ পাইতাম, কাজ পাইতাম না।'

২৪ জ্যৈষ্ঠ রবীন্দ্রনাথ মোহিতচন্দ্রকে লিখেছিলেন : 'প্রান্তর আমার মন ভুলাইয়াছে পর্ব্বতকে আমি এখনো হৃদয় দিতে পারি নাই।' ২৬ জ্যৈষ্ঠ [মঙ্গল 9 Jun] তিনি সেই পর্বতেরই মহিমা ঘোষণা করে দুটি সনেট লিখলেন :

হিমালয়/হে নিস্তব্ধ গিরিরাজ, অভ্রভেদী তোমার সঙ্গীত দ্র উৎসর্গ ১০।৪১-৪২ [২৪]; বঙ্গদর্শন, শ্রাবণ। ১৮৭ [হিমালয়']।

শিলালিপি/আজি হেরিতেছি আমি, হে হিমাদ্রি, গভীর নির্জনে দ্র উৎসর্গ ১০।৪২-৪৩ [২৬]; বঙ্গদর্শন, শ্রাবণ। ১৮৮ ['শিলালিপি']

—হিমালয় বন্দনার এই ধারা তাঁর কাব্যক্ষেত্রে আরও কিছুদিন প্রবাহিত হয়েছে, শান্তিনিকেতনে ও কলকাতায় তিনি একই বিষয়ে আরও চারটি সনেট রচনা করেন।

এর কিছুদিন পূর্বে রবীন্দ্রনাথ দুটি বিবাহ-সংগীত রচনা করেন :

'যে তরণীখানি ভাসালে দুজনে' দ্র গীত ২।৬০৯-১০; স্বর ৫৫; কাব্যগ্রন্থ ৮।৩৩৭, ভূপালি-কাওয়ালি।

'দুজনে যেথায় মিলিছে সেথায়' দ্র গীত ২।৬০৯; স্বরলিপি নেই; কাব্যগ্রন্থ ৮।৩৩৭, সিন্ধুভৈরবী-একতালা।

গান দুটির পাণ্ডুলিপি মজুমদার-পুঁথিতে ১০ মাঘ ১৩০৯ তারিখে জোড়াসাঁকোতে রচিত 'আমাদের এই পল্লিখানি পাহাড় দিয়ে ঘেরা' [দ্র উৎসর্গ ১০।৬৯-৭১] কবিতাটির অব্যবহিত পরের দুটি পৃষ্ঠায় পাওয়া যায়। এর পরের পৃষ্ঠায় আছে একটি কবিরাজী ঔষধের উপকরণের তালিকা ও প্রস্তুতপ্রণালী এবং তার পরের পৃষ্ঠায় লেখা হয়েছে ২২ জ্যৈষ্ঠ ১৩১০ তারিখে আলমোরায় রচিত 'হে জনসমুদ্র আমি ভাবিতেছি মনে' [দ্র উৎসর্গ ১০।৮৭-৮৮] কবিতাটি। কবিরাজী ঔষধটি অবশ্যই রেণুকার জন্য, কিন্তু সেই তথ্য গান-দুটির রচনাকাল নির্ণয়ে সাহায্য করে না। আমরা জানি, রবীন্দ্রনাথের প্রিয় ভ্রাতুষ্পুত্র সুরেন্দ্রনাথের বিবাহের ব্যাপারে কয়েক বৎসর ধরেই কথাবার্তা চলছিল—বিবাহটি অনুষ্ঠিত হয় বর্তমান বৎসরের ২১ আষাঢ় [সোম 6 Jul]। সম্ভবত এই উপলক্ষেই রবীন্দ্রনাথ উক্ত বিবাহ-সংগীত দুটি রচনা করেন এবং ২২ জ্যৈষ্ঠের পূর্বে এগুলি রচিত হয় তা নিঃসন্দেহেই বলা যায়।

জ্যৈষ্ঠ ১৩১০ [৩।২]-সংখ্যা বঙ্গদর্শন প্রকাশিত হয় 23 May [শনি ৯ জ্যৈষ্ঠ]। এই সংখ্যায় রবীন্দ্রনাথের রচনা তিনটি :

৫৫-৬২ 'নৌকাডুবি' ৫-৬ দ্র নৌকাডুবি ৫।১৭৩-৭৬ [৪-৫]

৬২-৬৪ 'সন্ধ্যা' ['আমার খোলা জানালাতে'] দ্র উৎসর্গ ১০।৫৫-৫৭ [৩৬]

৭৯-৮১ 'যাত্রিণী' ['মন্ত্রে সে যে পূত'] দ্র ঐ ১০।৬২-৬৪ [৪০]

সমালোচনী, জ্যৈষ্ঠ ১৩১০ [২।২] :

৬৫ 'গান' ['কি কথা বলিব বলে'] দ্র উৎসর্গ-সংযোজন ১০।৮১ [২]

রচনাটির শিরোনাম 'গান' হলেও, এটি একটি কবিতা—স্পষ্টতই মৃণালিনী দেবীর মৃত্যু-স্মৃতিকে কেন্দ্র করে লেখা।

তত্ত্ববোধিনী, জ্যৈষ্ঠ ১৮২৫ শক [৭১৮ সংখ্যা] :

8 'The God of Upanishads'

ঔপনিষদ ব্রহ্ম গ্রন্থের ৪৩শ অনুচ্ছেদের কিয়দংশের ['কিন্তু সর্ব্বদা সর্ব্বত্র তাঁহার সত্তা উপলব্ধি করিতে হইলে....ব্রহ্মকে দূরে লইয়া দুষ্প্রাপ্য করিয়া দেয়' দ্র অ-২।২১৩-১৪] ইংরেজি অনুবাদ এই সংখ্যায় মুদ্রিত

হয়।

সঙ্গীত-প্রকাশিকা, জ্যৈষ্ঠ ১৩১০ [২।৯] :

১৫০-৫১ আসাবরি-ঝাঁপতাল। মনোমোহন গহন যামিনী শেষে দ্র স্বর ২৭

গানটির স্বরলিপিকার কাঙালীচরণ সেন।

বিদ্যালয়ের সুব্যবস্থার জন্য উদ্বিগ্ন রবীন্দ্রনাথ রেণুকার স্বাস্থ্যের অবস্থা একটু স্থিতিশীল হলেই শান্তিনিকেতনে আসার জন্য ব্যগ্রতা অনুভব করছিলেন—মাতৃহারা কনিষ্ঠ পুত্রকন্যা শমী ও মীরাকে বালিগঞ্জে রেখে এসেছেন, তাদের দেখার আকর্ষণও ছিল। 30 May [শনি ১৬ জ্যৈষ্ঠ] তিনি প্রিয়নাথ সেনকে লিখেছিলেন : 'সংসারের তরণীটি নানাপ্রকার তুফানের উপর ভাসিয়ে দিয়ে চলেছি—কবে একটা বন্দরে টেনে এনে নোঙর ফেলতে পারব জানি নে। ছেলেদের মধ্যে কেউ একদিকে কেউ আর একদিকে, আমার বিদ্যালয় একদিকে এবং আমি আধিব্যাধি নিয়ে অন্য দিকে বিক্ষিপ্ত হয়ে চলেছি। বিচ্ছিন্ন সংসারটাকে এক জায়গায় জমাট করে নিয়ে বসবার জন্যে মন ব্যাকুল হয়েছে।'[২৫] এর পরেই তিনি একটি প্ল্যানচেটচর্চার বিবরণ দিয়েছেন। কিছুদিন আগে তিনি Myers-এর *Human Personality and its survival after death* গ্রন্থ পাঠ করছিলেন। ঠাকুরপরিবারে প্ল্যানচেটের চর্চা ছিল; রবীন্দ্রনাথও কৈশোর থেকে [দ্র মালতী-পুঁথি] প্ল্যানচেটে বসেছেন। স্ত্রীর মৃত্যু, রেণুকার অসুখ ইত্যাদি পারিবারিক দুর্যোগের মধ্যে পথ অনুসন্ধানের তাগিদে তিনি পরলোকের শরণাপন্ন হয়েছেন—হয়তো মৃণালিনী দেবীকেই প্ল্যানচেটে আহ্বান করেছিলেন। 'বাবামশায়ের অসুখ' এই খবর দেওয়ার পর অশরীরী আত্মা জানান, আলমোরার পর তাঁকে কলকাতায় গিয়ে থাকতে হবে। বোলপুরে গিয়ে থাকতে পারবেন না জেনে রবীন্দ্রনাথ বিস্মিত হয়েছিলেন, কিন্তু পরলোকবার্তার এই অংশটুকু সত্য হয়েছিল—রেণুকার মৃত্যু ও তার পরেও কিছুকাল তাঁকে কলকাতায় থাকতে হয়।

কুলির জোগাড় হওয়ামাত্রই শ্যালক নগেন্দ্রনাথের উপর রেণুকার তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব দিয়ে রবীন্দ্রনাথ ২৮ জ্যৈষ্ঠ [বৃহ 11 Jun] আলমোরা ত্যাগ করেন। আগের দিন তিনি ব্রজেন্দ্রকিশোর দেববর্মাকে খবরটি দিয়ে লেখেন : 'বিদ্যালয়ের জন্য সর্ব্বদাই আমার চিত্ত উদ্বিগ্ন আছে। সেইজন্য কাল এখান হইতে কিছু কাজের জন্য আমি রওনা হইতেছি। কলিকাতায় কিছুকাল কাটাইয়া বোলপুর যাইব।'[২৬]

৩১ জ্যৈষ্ঠ [রবি 14 Jun] তাঁর 'হাওড়ার ষ্টেসন হইতে বাটী আসিবার' হিসাব পাওয়া যায়। এইদিনই তিনি বালিগঞ্জে যান, নিশ্চয়ই মীরা ও শমীকে দেখার জন্য। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের দ্বিতীয় মাসিক অধিবেশনে য়ুনিভার্সিটি ইনস্টিট্যুট হলে এইদিন সন্ধ্যা সাড়ে ছ'টায় সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সভাপতিত্বে রায় কালীপ্রসন্ন ঘোষ বাহাদুর 'বঙ্গভাষার ক্রমোন্নতি' বিষয়ে বক্তৃতা দেন। উপস্থিত ব্যক্তিবর্গের তালিকায় রবীন্দ্রনাথেরও নাম দেখা যায়।

এই যাত্রায় তিনি ৩ আষাঢ় পর্যন্ত কলকাতায় থাকেন এবং প্রায় প্রতিদিনই ভ্রাম্যমাণ। ৩২ জ্যৈষ্ঠ [সোম 15 Jun] 'বিডন ষ্ট্রীট প্রভৃতি', ১ আষাঢ় বালিগঞ্জ, ৩ আষাঢ় 'লালদিঘী বালীগঞ্জ পার্সীবাগান প্রভৃতি' স্থানে তাঁর যাতায়াতের হিসাব ক্যাশবহিতে পাওয়া যায়। ৪ আষাঢ় [শুক্র 19 Jun] তিনি ও মোহিতচন্দ্র বিদ্যালয়ের কয়েকটি ছাত্রকে নিয়ে শান্তিনিকেতনে গমন করেন। ছাত্রদের প্রথম দলটি জনৈক রসিক দাসের তত্ত্বাবধানে

শান্তিনিকেতনে যায় ১ আষাঢ় [মঙ্গল 16 Jun]। ছাত্রদের আশ্রমে নিয়ে যাওয়া ও নিয়ে আসার এই দায়িত্ব বহুকাল কর্তৃপক্ষই পালন করেছিলেন।

রবীন্দ্রনাথ এইবার শমীন্দ্রনাথকেও তাঁর সঙ্গে নিয়ে গিয়ে বিদ্যালয়ে ভর্তি করে দেন। শমীন্দ্রনাথ ইতিপূর্বে শান্তিনিকেতনে থাকলেও বিদ্যালয়ের নিয়মিত ছাত্র ছিলেন না। 8 Aug [২৩ শ্রাবণ] পিতাকে লেখা একটি চিঠি থেকে তাঁর ছাত্রজীবনের বিবরণ মেলে।

ত্রিপুরার মধ্যম যুবরাজ ব্রজেন্দ্রকিশোরকে রবীন্দ্রনাথ বিদ্যালয়ের ছাত্র-রূপে পেতে উৎসুক ছিলেন, তাঁর সেই আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হয়নি। এইবার গ্রীষ্মাবকাশের পর ত্রিপুরা থেকে আসা প্রথম ছাত্র ভর্তি হলেন যুবরাজের শিক্ষক মোক্ষদাকুমার বসুর পুত্র সত্যরঞ্জন বসু, তিনি তাঁর 'আশ্রম-স্মৃতি'তে লিখেছেন : 'খুব সম্ভবতঃ ১৩১০ সালে গরমের ছুটির পর একদিন সন্ধ্যার সময় বোলপুর ষ্টেশনে নামি।'[২৭] তাঁর পরে বিদ্যালয়ের ছাত্রসংখ্যার একটি বড়ো অংশ অধিকার করে রেখেছে ত্রিপুরা।

শান্তিনিকেতনেও মজুমদার-পুঁথি রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে ছিল। আলমোরায় তিনি যে হিমালয়-বন্দনার সূত্রপাত করেছিলেন তারই জের টেনে এখানকার প্রান্তরের মধ্যে ৬ আষাঢ় [রবি 21 Jun] লিখলেন একটি কবিতা : 'হে হিমাদ্রি দেবতাত্মা, শৈলে শৈলে আজিও তোমার' [দ্র উৎসর্গ ১০।৪৪ (২৮); বঙ্গদর্শন, শ্রাবণ। ১৮৯ 'হরগৌরী']।

সম্ভবত এই দিনই রেণুকার গুরুতর অসুস্থতার খবর তাঁর কাছে পৌঁছয়, ফলে তিনি সেদিনই কলকাতা রওনা হন। ৭ আষাঢ় বালিগঞ্জ ছাড়া তিনি শোভাবাজার ও বিডন স্ট্রীট যান, ৮ আষাঢ় 'শোভাবাজার ডাক্তার বাটী যাওয়ার' হিসাব পাওয়া যায়। বোঝা যায়, দুটি দিনই তিনি ডাক্তারদের সঙ্গে পরামর্শে ব্যস্ত থাকেন। ৯ আষাঢ় [বুধ 24 Jun] তিনি আলমোরা যাত্রা করেন।

কিন্তু তার আগে জোড়াসাঁকোর বাড়িতে বসেই তিনি হিমালয়ের বন্দনাগান শেষ করে নেন তিনটি সনেটে। তাঁর মানসিক অবস্থা তখন মোটেই কবিতা লেখার পক্ষে অনুকূল ছিল না, কিন্তু যে ভাবোচ্ছ্বাস আলমোরার পাহাড়ে দেখা দিয়েছিল তাকে সম্পূর্ণ মুক্ত না করা পর্যন্ত তিনি মুক্তি পাননি—ছ'টি সনেটের একটি গুচ্ছ একত্রে শ্রাবণ-সংখ্যা বঙ্গদর্শন-এ (পৃ ১৮৭-৯০] প্রকাশিত হয়। কবিতাগুলি হল :

৮ আষাঢ় (মঙ্গল 23 Jun] 'তুমি আছ হিমাচল ভারতের অনন্তসঞ্চিত' দ্র উৎসর্গ ১০।৪৩ [২৭]; বঙ্গদর্শন, শ্রাবণ। ১৮৯ ['তপোমূর্ত্তি']

৯ আষাঢ় [বুধ 24 Jun] 'ক্ষান্তি' ['ক্ষান্ত করিয়াছ তুমি আপনারে, তাই হেরো আজি'] দ্র উৎসর্গ ১০।৪২ [২৫]; বঙ্গদর্শন, শ্রাবণ। ১৮৮

৯ আষাঢ় 'ভারতসমুদ্র তার বাষ্পোচ্ছ্বাস নিঃশ্বসে গগনে' দ্র উৎসর্গ ১০।৪৪-৪৫ [২৯]; বঙ্গদর্শন, শ্রাবণ। ১৯০ ['সঞ্চিত বাণী']।

মজুমদার-পুঁথিতে কবিতা লেখার একটি পর্ব এখানে শেষ হয়েছে। প্রায় এক বছর পরে ২০ জ্যৈষ্ঠ ১৩১১ [2 Jun 1904] তিনি আবার এই খাতাটি গান লেখার জন্য তুলে নেন।

বাংলা সাময়িকপত্র প্রকাশে যে নিয়মানুবর্তিতার অভাব ছিল, সরলা দেবী ভারতী-সম্পাদনার দায়িত্ব নিয়ে সেই অপবাদের স্খালন করেছিলেন। সুরেশচন্দ্র সমাজপতির 'সাহিত্য' কিছুকাল থেকে চূড়ান্তরূপে অসাময়িক,

শ্রাবণ ১৩০৯-সংখ্যা প্রকাশিত হয় মাঘ মাসের শেষে [দ্র *The Bengalee*, 7 Feb 1903]। সেই হিসাবে রবীন্দ্রনাথের গ্রন্থ-প্রকাশে শৈথিল্য দেখালেও বঙ্গদর্শন-এর সহ-সম্পাদক শৈলেশচন্দ্র মজুমদার পত্রিকাটিকে নিয়মিত প্রকাশ করে চলছিলেন। আষাঢ়-সংখ্যা বঙ্গদর্শন [৩৩] তিনি প্রকাশ করেন মাস শুরু হওয়ার আগেই 12 Jun [শুক্র ২৯ জ্যৈষ্ঠ]। এই সংখ্যায় রবীন্দ্রনাথের রচনা তিনটি :

১০৭-০৮ 'গ্রাম' ['আমি যারে ভালবাসি'] দ্র উৎসর্গ ১০ ৫১-৫২ [৩৪]

১২১-৩০ 'নৌকাডুবি' ৭-৯ দ্র নৌকাডুবি ৫।১৭৬-৮৪ [৬-৮]

১৩৬-৩৯ 'মেঘদয়ে' ['দেখ চেয়ে গিরির শিরে'] দ্র উৎসর্গ ১০।৪৮-৫১ [৩৩]

অজিতকুমার চক্রবর্তী বন্ধু সতীশচন্দ্রের সঙ্গে গ্রীষ্মাবকাশের কয়েকটি দিন শান্তিনিকেতনে কাটান। তিনি ফিরে যাবার পরে সতীশচন্দ্র তাঁকে উক্ত শেষ কবিতাটি সম্পর্কে লেখেন : "এবার বঙ্গদর্শনে নব 'মেঘোদয়ে' কবির চিত্ত-বিদূরভূমিতে রত্নশলাকা ফুটিয়া উঠিয়াছে দেখিয়াছ কি? আমাদের চারিদিকে প্রান্তর ঢাকিয়া আকাশ ব্যাপিয়া ইন্দ্রের হাতী মেঘগুলা বৃংহতিধ্বনি করিয়া বেড়াইতেছে, ...ইহার মধ্যে দেখ, আলমোড়ার শৈলশিখর হইতে পরিপূর্ণ গান আসিয়া উপস্থিত।"[২৮]

আষাঢ়-সংখ্যা সমালোচনী [২৩]-তে রবীন্দ্রনাথের কোনো রচনা নেই, কিন্তু বৈশাখ-সংখ্যা বঙ্গদর্শন-এ প্রকাশিত তাঁর 'ভোরের পাখী' কবিতার অমৃতলাল বসু-কৃত একটি সুন্দর 'অনুকৃতিকৌতুক' [Parody] 'রাতের চৌকিদার' [প ৯৪-৯৭] নামে মুদ্রিত হয়; তার প্রথম ছত্রগুলি এইরূপ :

> চৌকিদার হাঁকে ঐ গো—
>   চৌকিদার হাঁকে।
> চোর পালালে খবরদারী
>   জবরদস্ত রাখে॥

তত্ত্ববোধিনী, আষাঢ় ১৮২৫ শক [৭১৯ সংখ্যা] :

11-12 'The God of Upanishads'

ঔপনিষদ ব্রহ্ম গ্রন্থের ৪৩শ অনুচ্ছেদের শেষাংশ থেকে ৫১শ অনুচ্ছেদের ['যদা হ্যেবৈষ এতস্মিন্...তিনি হাঁ, ব্রহ্ম ওঁ' দ্র অ-২।২১৪-১৬] ইংরেজি অনুবাদ এই সংখ্যায় মুদ্রিত হয়।

সঙ্গীত-প্রকাশিকা, আষাঢ় ১৩১০ [২।১০] :

১৬৯-৭০ ভৈরবী-সুরফাঁক্তা। আনন্দ তুমি স্বামী, মঙ্গল তুমি দ্র স্বর ২৭

কাঙালীচরণ সেন গানটির স্বরলিপি করেন।

৯ আষাঢ় [বুধ 24 Jun] রবীন্দ্রনাথ কলকাতা থেকে আলমোরার উদ্দেশে রওনা হন। ১৫ আষাঢ় [মঙ্গল 30 Jun] তিনি জগদীশচন্দ্রকে লেখেন :

> রেণুকার সংশয়াপন্ন অবস্থার টেলিগ্রাফ পাইয়া আমাকে ছুটিয়া আসিতে হইয়াছে। তাহাকে জীবিত দেখিব এরূপ আশামাত্র ছিল না। ডাক্তাররা তাহাকে কেবলই Strychnine ব্রাণ্ডি প্রভৃতি খাওয়াইয়া কোন মতে কৃত্রিম জীবনেসজীব রাখিবার চেষ্টায় ছিল। আমি যেদিন আসিয়া পৌঁছিলাম সেদিন তাহারা রোগীর জীবনের আশা পরিত্যাগ করিয়াছিল। আমি আসিয়াই সমস্ত Stimulants বন্ধ করিয়া দিয়া হোমিয়োপ্যাথি চিকিৎসা করিতেছি। রক্ত ওঠা বন্ধ হইয়া গেছে—কাশি কম, জ্বর কম, পেটের অসুখ কম—বিকারের প্রলাপ বন্ধ হইয়া গেছে—বুকের ব্যথা নাই—বেশ সহজ ভাবে কথাবার্ত্তা কহিতেছে, অনেকটা সবল হইয়াছে—আশা করিতেছি এই ধাক্কাটি কাটিয়া গেল।[২৯]

বিদ্যালয়ের ব্যবস্থা করার জন্যই তিনি আলমোরা ছেড়ে গিয়েছিলেন, কিন্তু রেণুকার সংকটাপন্ন অবস্থার জন্য কাজ অসমাপ্ত রেখেই তাঁকে চলে আসতে হয়। জগদীশচন্দ্র, মোহিতচন্দ্র ও রমণীমোহনের উপর তিনি বিদ্যালয় পরিচালনার ভার অর্পণ করেছিলেন, উক্ত পত্রে জগদীশচন্দ্রকে সনির্বন্ধ অনুরোধ জনিয়েছেন বিদ্যালয়ের নিয়মশৃঙ্খলা অক্ষুন্ন রাখার চেষ্টা করার জন্য। শ্রীশচন্দ্র মজুমদারকে লিখিত একটি পত্রেও তাঁর উদ্বেগের কথা জানিয়ে লিখেছেন : 'তুমি সন্তোষকে লিখিয়া দিয়ো বিদ্যালয়ের ছাত্রদের চরিত্র আচরণ প্রভৃতি সম্বন্ধে সেও যেন সতর্ক দৃষ্টি রাখে।'[৩০]

কুঞ্জলাল ঘোষের কঠোর আচরণ তাঁর বিরুদ্ধে অনেককে ক্ষুব্ধ করে তুলেছিল। বিদ্যালয়ের শৃঙ্খলা ও স্থায়িত্বের জন্য এরূপ লোকের প্রয়োজন বোধ করলেও তাঁর সঙ্গে স্বভাবের অনৈক্য রবীন্দ্রনাথকেও পীড়া দিয়েছে। তাছাড়া কুঞ্জলাল সপরিবারে থাকায় ছাত্রদের প্রতি তিনি সর্বদা দৃষ্টি রাখতে পারছিলেন না। এইসব কারণে রবীন্দ্রনাথকে তাঁকে বিদায়পত্র দেন। খবরটি জেনে 10 Jul [শুক্র ২৫ আষাঢ়] মোহিতচন্দ্র লেখেন : 'কুঞ্জবাবুকে বিদায়পত্র দিয়াছেন শুনিয়া দুঃখিত এবং আশ্বস্ত দুই হলাম।…যা হোক কুঞ্জবাবু শ্রাবণের আরম্ভেই চলে যাবেন এটা সুখবর।'[৩১] নগেন্দ্রনারায়ণ রায় ইতিমধ্যেই 'হেডমাস্টার' পদে নিযুক্ত হয়েছেন, সুতরাং কুঞ্জলাল ঘোষের অভাব তখন তাঁরা অনুভব করছিলেন না।

শ্রাবণ-সংখ্যা বঙ্গদর্শন [৩।৪] প্রকাশিত হয় 16 Jul [বৃহ ৩১ আষাঢ়]। এই সংখ্যা রবীন্দ্রনাথের রচনা সাতটি, তার মধ্যে ছ'টিই হল হিমালয়-বিষয়ক সনেট :

১৫৫-৬৪ 'নৌকাডুবি' ১০-১২ দ্র নৌকাডুবি ৫।১৮৪-৯৩ [৯-১১]

১৭৭ 'সাগরমন্থন' দ্র উৎসর্গ-সংযোজন ১০।৮৭-৮৮ [১১]

১৮৭ 'হিমালয়' দ্র ঐ ১০।৪১-৪২ [২৪]

১৮৮ 'ক্ষান্তি' দ্র ঐ ১০।৪২ [২৫]

১৮৮ 'শিলালিপি' দ্র ঐ ১০।৪২-৪৩ [২৬]

১৮৯ 'হরগৌরী' দ্র ঐ ১৩।৪৪ [১৮]

১৮৯ 'তপোমূর্ত্তি' দ্র ঐ ১০।৪৩ [২৭]

১৯০ 'সঞ্চিতবাণী' দ্র ঐ ১০।৪৪-৪৫ [২৯]

তত্ত্ববোধিনী, শ্রাবণ ১৮২৫ শক [৭২০ সংখ্যা] :

15-16 'The God of Upanishads'

ঔপনিষদ ব্রহ্ম গ্রন্থের ৫২-৫৪শ অনুচ্ছেদগুলির ['আমরা কে কাহাকে স্বীকার করি...·জড় আদর্শকে পরিত্যাগ করিতে হইবে।' দ্র অ-২।২১৬-১৮] ইংরেজি অনুবাদ এই সংখ্যায় প্রকাশিত হয়।

সঙ্গীত-প্রকাশিকা, শ্রাবণ, ১৩১০ [২।১১] :

১৮১-৮৩ ঝিঁঝিট-ঠুংরি। শান্ত হ'রে মম চিত্ত নিরাকুল দ্র স্বর ৪

গানটির স্বরলিপি-কার কাঙালীচরণ সেন।

কাব্যগ্রন্থ-এর সম্পাদক মোহিতচন্দ্রের সঙ্গে আলমোরায় রবীন্দ্রনাথের আলোচনা হয়েছিল—তাঁদের আলোচনার ভিত্তি ছিল সত্যপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়-প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থাবলী [১৩০৩], এই গ্রন্থেরই পৃষ্ঠায় কবিতাগুলি বিভিন্ন শ্রেণীতে চিহ্নিত হয়। এই সময়ে কিছু কবিতা একটি ছাত্রপাঠ্য পুস্তকের জন্য আলাদা করে রাখার কথা হয়েছিল। এই প্রসঙ্গটি অবলম্বনে মোহিতুচন্দ্র 17 Jul [শুক্র ১ শ্রাবণ] একটি নূতন প্রস্তাব উপস্থিত করলেন : 'আমার মনে হয়, সেগুলি এই সংস্করণেই সন্নিবিষ্ট করা ভাল, নইলে গ্রন্থাবলী অসম্পূর্ণ থেকে যায়। এর পরে সম্পূর্ণ গ্রন্থাবলী থেকে বালক-বালিকাদের উপযুক্ত কবিতাগুলি সঙ্কলিত করিলে চলে। …আমার বইয়ে "Children" বলে যে কটা কবিতা নির্দিষ্ট ছিল তা আজ দেখলাম—আমার মনে হয় "শিশু" বা "শৈশব" নাম দিয়ে একটা শ্রেণী করলে হয়—তার একটি ভূমিকা আপনাকে লিখে দিতে হবে।'[৩২] এই বলে তিনি 'শিশু' বিভাগের জন্য কাব্যগ্রন্থাবলী-র পৃষ্ঠা উল্লেখ করে ন'টি কবিতার একটি তালিকা প্রেরণ করেন।

প্রস্তাবটি রবীন্দ্রনাথকে উদ্বুদ্ধ করে তোলে। সংকলনযোগ্য আরও কয়েকটি কবিতার উল্লেখ করে ৪ শ্রাবণ [সোম 20 Jul] তিনি লেখেন : 'গ্রন্থাবলীর যে অংশে ছেলেদের কবিতা বেরবে তার নাম শিশু বা শৈশব না দিয়ে "কিশোর" বা "কুমার" নাম দেবেন। কারণ শিশু অতি ছোট—সব কবিতা ও নামে খাপ খাবে না।'[৩৩] অবশ্য শেষ পর্যন্ত 'শিশু' নামটিই গৃহীত হয় এবং কাব্যগ্রন্থ সপ্তম ভাগ রূপে স্বতন্ত্র খণ্ডে প্রকাশিত হয়।

ভূমিকা বা প্রবেশক লিখতে অনুরুদ্ধ হয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ। এই অনুরোধ রক্ষা করতে গিয়ে তিনি ৫ শ্রাবণ [মঙ্গল 21 Jul] লিখলেন 'তোমার কটি-তটের ধটি' [দ্র শিশু ৯।৯-১০,'খেলা'; বঙ্গদর্শন, ভাদ্র। ২৪৬-৪৮, 'শিশু'] কবিতাটি। সম্ভবত 'খোকা' ['খোকার চোখে যে-ঘুম আসে' দ্র শিশু ৯।১১-১২] কবিতাটিও এইদিনে লেখা। ৮ শ্রাবণ [শুক্র 24 Jul] মোহিতচন্দ্র লিখেছেন : 'এই মাত্র আপনার কবিতা দুটি পেলাম। গোড়ার কবিতাটি ভারি সুন্দর লাগল'[৩৪]—হিসাব করে দেখা যায়, আলমোরায় লেখা রবীন্দ্রনাথের চিঠিপত্র চতুর্থ দিনে কলকাতায় মোহিতচন্দ্রের কাছে পৌঁছেছে। এই হিসাব শিশু-র কবিতাগুলির রচনাকাল-নির্ণয়ে সাহায্য করে।

'শিশু' 'শৈশব' 'কিশোর' বা 'কুমার' বিভাগে [মোহিতচন্দ্র ৮ শ্রাবণের পত্রে 'কিশোর' নামটি পছন্দ করেছিলেন] পূর্ব-প্রকাশিত 'Children'-বিষয়ক কবিতাগুলি একটি নূতন 'প্রবেশক'-সহ 'রূপক' 'কথা' ও 'কাহিনী' বিভাগের সঙ্গে কাব্যগ্রন্থ পঞ্চম ভাগে মুদ্রিত হবে, সম্পাদক এইরকম ভেবেছিলেন। কিন্তু প্রথম দুটি কবিতা লেখা হয়ে যাওয়ার পর অবস্থাটি পরিবর্তিত হল। রবীন্দ্রকাব্যে বারবার দেখা গেছে, তাঁর অন্তরস্থিত ভাবের ইন্ধনকে জ্বালিয়ে তোলার জন্য ভিতর বা বাহিরের তাগিদ রূপে একটি আগুনের ফুলিঙ্গই যথেষ্ট—এখানেও তাই হয়েছে। শিশু-কবিতাগুচ্ছ লেখার শেষ পর্বে রবীন্দ্রনাথ ৩০ শ্রাবণ [শনি 15 Aug] লিখেছেন : 'ছেলেবেলায় আমার মনটা আকাশে পাতালে তেতলার ছাদে একতলার অন্ধকার ঘরে সম্ভব অসম্ভব সব জায়গায় ছড়িয়ে ছিল। আমার প্রকৃতিটা রীতিমত nomad ছিল আর কি (বাংলা ভাষায় পণ্ডিতরা আজকাল যাকে "যাযাবর" বলেন)। তখন সব জায়গার জন্যেই home sickness জন্মাত। একটা কিছু অত্যাশ্চর্যের জন্যে মনের ভিতর থেকে প্রতীক্ষা কিছুতেই ঘুচ্‌ত না। রোজই মনে হত আজ একটা কিছু ঘটতে পারে—সেই প্রত্যাশায় এক একদিন ঘুম থেকে উঠেই হৃদয় পুলকিত হয়ে উঠত।'[৩৫] প্রবেশক-কবিতাটি লিখতে গিয়েই

তাঁর এই শৈশবের মনটি জেগে উঠল। ১৫ শ্রাবণ [শুক্র 31 Jul] 'গোটাদশেক' কবিতা লেখার পরই যে লিখেছিলেন : 'আমিআজকাল শিশুদের মনের ভিতর বাসা করে আছি। তেতালার ছাদের উপর আমার নিজের শৈশব মনে পড়ছে'[৩৬]—সেই মন নিয়ে খেলা করবার প্রবৃত্তি কবিতার সংখ্যা ক্রমশই বাড়িয়ে তুলেছে, 'সমস্ত দুঃখ-দুশ্চিন্তার মধ্যেও…চিত্ত [কে] আনন্দে প্রসারিত' করে দেওয়ার নিগূঢ় আকাঙ্ক্ষাও ভিতরে ভিতরে কাজ করছিল।

শিশু-র কবিতাবলী লেখা হল একটি নূতন পাণ্ডুলিপিতে [Ms. 115]। খাতাটি সম্ভবত রবীন্দ্রনাথের শ্যালক-পত্নী নলিনীবালা রায়চৌধুরীর—1901-এর Calendar দেওয়া A. c. Paul & Co-র The Universal Exercise Book—কাঁচা মেয়েলি হাতে শ্রীমতী নলিনীবালা দেবী, রেণুকা, রাজলক্ষ্মী, অতসীলতা দেবী [মীরা], শমীন্দ্রনাথ, রবীন্দ্রনাথ ও রথীন্দ্রনাথ 'সবার নাম' এতে লেখা আছে। পাণ্ডুলিপিটি রবীন্দ্রনাথ কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্তকে উপহার দেন, সত্যেন্দ্রনাথ খাতার 76 পৃষ্ঠায় তথ্যটি লিখে রেখেছেন : "শিশু নামক কাব্য গ্রন্থের এই পাণ্ডুলিপিখানি পূজনীয় শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় আমাকে আজ দান করিলেন।/ শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্ত/॥ ৩১শে ভাদ্র ১৩১৬ সাল [বৃহ 16 Sep 1909]।।'—প্রতিটি পাতায় 'শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্ত।/৪৬নং মসজিদবাড়ী ষ্ট্রীট, কলিকাতা।' রবার-স্ট্যাম্পের ছাপ দিয়ে তিনি তাঁর স্বত্ব প্রতিষ্ঠিত করেছেন। বিশ্বভারতী পত্রিকা-র শ্রাবণ-আশ্বিন ১৩৭৭-সংখ্যায় 'রবীন্দ্রপাণ্ডুলিপি : শিশু' প্রবন্ধে [পৃ ৭২-৯৫] কানাই সামন্ত পাণ্ডুলিপিটির বিস্তৃত পরিচয় দিয়েছেন। আগ্রহী পাঠক প্রবন্ধটি পাঠ করলে উপকৃত হবেন।

পাণ্ডুলিপিতে রবীন্দ্রনাথ কোনো কবিতাতেই রচনার তারিখ লেখেননি, ফলে সমস্ত রচনা-তারিখই অনুমান-নির্ভর। তবে কবিতাগুলি পর-পর খাতায় লেখা হয়েছে এবং সঙ্গে সঙ্গেই এক বা একাধিক কবিতা নকল করে রবীন্দ্রনাথ পত্র-সহ কলকাতাতে মোহিতচন্দ্রের কাছে প্রেরণ করেছেন—কোনো-কোনো কবিতার শেষাংশ-সহ রবীন্দ্রনাথের চিঠি বা সে-সম্পর্কে মোহিতচন্দ্রের চিঠি পাওয়া গেছে, তাদের থেকেই রচনাকাল অনুমান করা যায়। আমরা আগেই বলেছি, আলমোরা থেকে কলকাতায় বা বিপরীতক্রমে চিঠি পৌঁছেছে পোস্ট করা থেকে চতুর্থ দিনে, এই হিসাবটি কবিতা রচনার তারিখ নির্ধারণে ব্যবহৃত হয়েছে।

পাণ্ডুলিপির একটি হারিয়ে-যাওয়া পাতায় 'খেলা' কবিতাটি লেখা হয়েছিল বলে কানাই সামন্ত মনে করেছেন। পরের দুটি পৃষ্ঠায় আছে'খোকা' কবিতাটি, এটির নামকরণ পাণ্ডুলিপিতেই হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ ৫ শ্রাবণ [মঙ্গল 21 Jul] কবিতা দুটি লিখে মোহিতচন্দ্রকে প্রেরণ করেন। ৮ শ্রাবণ মোহিতচন্দ্র এগুলি পেয়েছিলেন, একথা আমরা পূর্বেই বলেছি।

'রবিবার' [১০ শ্রাবণ : 26 Jul] মোহিতচন্দ্র লিখছেন : 'শিশু বিষয়ক ৫টি কবিতাই পাইয়াছি। কবিতাগুলি বড় ভাল লেগেছে—শৈলেশ কেড়ে নিয়ে গেলেন নইলে মুখস্থ করতাম। আপনার unconscious self আমার কাছে বড় অদ্ভুত [যদ্দৃষ্টং] মনে হচ্ছে। এই দুশ্চিন্তার ভেতর আপনি এত শৈশবলীলা অন্তরে কোথা থেকে পেলেন? কবিতাগুলির নামকরণ সোজা ছিল না—একটির ত নাম দেবার দরকার নেই—সেটি গোড়ার কবিতা—আর একটির নাম "খোকা" আপনিই দিয়েছেন—সুতরাং আমি যে তিনটি রইল তার নাম "নির্লিপ্ত", "শৈশব চাতুরী", "কেন মধুর?" রাখিলাম।'[৩৭] রবীন্দ্রনাথ এই তিনটি কবিতা ৭ শ্রাবণ [বৃহ 23 Jul] প্রেরণ করেন, সুতরাং ৫-৭ শ্রাবণের মধ্যে লেখা। 'শৈশব চাতুরী' কবিতাটির নাম রবীন্দ্রনাথ সংক্ষিপ্ত করে 'চাতুরী' রাখেন।

‘নির্লিপ্ত’ [‘বাছারে মোর বাছা’] দ্র শিশু ৯।১৮-১৯

রবীন্দ্রনাথ পাণ্ডুলিপিতে কবিতাটির নাম ‘পরস্পর’ রেখেছিলেন।

‘কেন মধুর’ [‘রঙিন খেলেনা দিলে ও রাঙা হাতে’] দ্র শিশু ৯।১৯-২০

শৈলেশচন্দ্র কবিতাটির নাম ‘মাধুরী বিনিময়’ রাখতে চেয়েছিলেন, রবীন্দ্রনাথ মোহিতচন্দ্রের দেওয়া নামটিই সমর্থন করে ২৫ শ্রাবণ [সোম 10 Aug] তাঁকে যা লিখেছেন তা তাঁর বিশেষ জীবনদর্শনেরই কথা : ‘খোকাকে যখন আমরা সমস্ত রঙীন, সুন্দর ও মধুর জিনিষ দিয়ে খুসি করি ও খুসি হই—তখনি বুঝতে পারি আমাদের জন্যে জগৎটা কেন এমন রঙীন সুন্দর মধুর হয়েছে। জগতের অস্তিত্বের পক্ষে মাধুর্য্যটা সম্পূর্ণ অতিরিক্ত—ওর কোনো তাৎপর্য্য পাওয়া যায় না—কিন্তু আমাদের সব রকম ভালবাসার উপলক্ষ্যেই সৌন্দর্য্যের বিকাশ আমাদের কাছে চরম আবশ্যক হয়ে ওঠে। ভালবাসা না থাক্‌লে সৌন্দর্য্যের কোন অর্থই থাকে না—মধুর হওয়া মধুর করা প্রেমেরই চেষ্টা, স্নেহেরই আবেগ—ওটা শুদ্ধমাত্র সত্যের প্রয়োজনের বাইরে।’[৩৮]

‘চাতুরী’ [‘আমার খোকা করে গো যদি মনে’] দ্র শিশু ৯।১৭-১৮

সম্ভবত ১৩ শ্রাবণে [বুধ 29 Jul] লেখা একটি চিঠির সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ অন্তত তিনটি কবিতা পাঠান, যেগুলি ৭-১৩ শ্রাবণের মধ্যে লেখা। এই পত্রের উত্তরে মোহিতচন্দ্র ১৭ শ্রাবণ [রবি 2 Aug] নিশ্চয়ই কোনো পত্র লিখেছিলেন, কিন্তু সেটি রক্ষিত না হওয়ায় কবিতার সঠিক সংখ্যা বলা শক্ত। উক্ত তিনটি কবিতা হল :

‘ঘুমচোরা’ [‘কে নিল খোকার ঘুম হরিয়া’] দ্র শিশু ৯।১৩-১৪

‘অপযশ’ [‘বাছা রে, তোর চক্ষে কেন জল’] দ্র শিশু ৯।১৪-১৫; সমালোচনী, অগ্র°। ২৫১-৫২

‘বিচার’ [‘আমার খোকার কত যে দোষ’] দ্র শিশু ৯।১৬

১৫ শ্রাবণ [শুক্র 31 Jul] রবীন্দ্রনাথ মোহিতচন্দ্রকে লেখেন : ‘নামকরণের ভার আপনার উপর। কতগুলো নতুন কবিতা পেলেন? বোধ হয় সবসুদ্ধ গোটাদশেক হবে।’[৩৯] রবীন্দ্রভবনে রক্ষিত মূল পত্রে ‘মাঝি’ কবিতাটির শেষ ২৬ ছত্র পাওয়া যায়, সুতরাং পাণ্ডুলিপির হিসাবে এ-পর্যন্ত লিখিত কবিতার সংখ্যা এগারো। বাকি তিনটি কবিতা হল :

‘ছুটির দিনে’ [‘ঐ দেখো মা, আকাশ ছেয়ে’] দ্র শিশু ৯।৪৩-৪৬

‘রাজার বাড়ি’ [‘আমার রাজার বাড়ি কোথায় কেউ জানে না সে তো’] দ্র শিশু ৯।৩৯

‘মাঝি’ [‘আমার যেতে ইচ্ছে করে’] দ্র শিশু ৯।৪০-৪১

কিন্তু 4 Aug [মঙ্গল ১৯ শ্রাবণ] মোহিতচন্দ্র লেখেন : ‘শিশু খণ্ডে সবেমাত্র ১৪টি নূতন কবিতা পেয়েছি। আরো অনেকগুলি চাই। যে ভূতে আপনাকে শিশু রাজ্যে টেনে নিয়ে গিয়েছে তাকে ধন্যবাদ দিই।’ এর থেকে বোঝা যায় ১৫ শ্রাবণ রবীন্দ্রনাথ আরও তিনটি কবিতা পাঠিয়েছেন :

‘সমব্যথী’ ['যদি খোকা না হয়ে/আমি হতেম কুকুর ছানা’] দ্র শিশু ৯।২৬

‘প্রশ্ন’ [‘মাগো, আমায় ছুটি দিতে বল্‌’] দ্র শিশু ৯।২৫

‘মাস্টারবাবু’ [‘আমি আজ কানাই মাস্টার’] দ্র শিশু ৯।২৮-২৯

১৭ শ্রাবণ [রবি 2 Aug] রবীন্দ্রনাথ কয়েকটি কবিতা পাঠিয়ে নামকরণ করে দেবার অনুরোধ জানিয়ে লিখছেন : ‘এ কবিতাগুলি কোনো মাসিক পত্রে দিয়ে আমি নষ্ট করতে ইচ্ছা করিনে—শৈলেশকে এই কথা,

আপনি বুঝিয়ে বল্‌বেন। বেশ তাজা টাট্‌কা অবস্থায় বইয়েতে বেরবে এই আমার অভিপ্রায়। নইলে মাসিক পত্রের পাঠকদের হাতে হাতে যেখানে সেখানে ঘুরে ঘুরে, অনুকরণকারীদের কলমের মুখে ঠোকর খেয়ে খেয়ে কবিতার জেল্লা সমস্ত চলে যায়। ছেলেদের হাতে যে পুতুল দেব আগে থাকতেই যদি তার রং উঠে কাপড় ছিঁড়ে নাস্তানাবুদ হয়ে যায় তবে সে কি সঙ্গত হবে?'[৪০] সম্ভবত পরের দিনে লেখা আর একটি পত্রের সঙ্গে তিনি 'বিজ্ঞ' কবিতাটি প্রেরণ করেন। পত্রটিতে তিনি ভুল করে তারিখ দিয়েছেন '৪ শ্রাবণ ১৩১০'—কিন্তু তারিখটি যে ভুল তা উক্ত 'বিজ্ঞ' কবিতাটি থেকেই বোঝা যায়, পাণ্ডুলিপিতে ক্রমানুসারে কবিতাটি ১৯-সংখ্যক, সেক্ষেত্রে ৪ শ্রাবণ শিশু-র নূতন কবিতা লেখা শুরুই হয়নি। পত্রটিতে রবীন্দ্রনাথ লিখছেন :'রেণুকা অল্প একটু ভাল আছে—আজ একাদশী। ভুল করেছি। পাঁজি দেখা গেল আজ দশমী। দশমীতে রাণীর অসুখ বাড়ে—আজ ত বিশেষ বাড়ে নি।'[৪১] পঞ্জিকাতে দেখা যায় ১৮ শ্রাবণ [সোম 3 Aug] দশমী ছিল, রবীন্দ্রনাথও. পত্রে 'আজসোমবার' লিখেছেন। পাঁজি মেলাতে গিয়েই রবীন্দ্রনাথ তারিখের গোলমাল করেছেন, ৪ শ্রাবণও দশমী ছিল। তাছাড়া পত্রের শুরুতেই তিনি লিখেছেন : 'কমিটির বিচারার্থে অত্রসহ একটি আবেদনপত্র পাঠাচ্ছি—আপনারা কর্ত্তব্য স্থির করবেন', মোহিতচন্দ্র প্রত্যুত্তরে ২১ শ্রাবণ [বৃহ 6 Aug] লেখেন : 'যে ছাত্রটির আবেদন পাঠিয়েছেন তা আজ পেলাম—শীঘ্রই কমিটির নিকট উপস্থিত করব'—আমরা পূর্বেই বলেছি, চতুর্থ দিনে আলমোরার পত্র কলকাতায় পৌঁছত।

উক্ত পত্রে মোহিতচন্দ্র লিখেছেন : 'শিশু খণ্ডে সবশুদ্ধ ১৯টি নূতন কবিতা পেলাম।' ১৫-১৮ শ্রাবণের মধ্যে লিখিত বাকি পাঁচটি কবিতা হল :

'বিচিত্র সাধ' ['আমি যখন পাঠশালাতে যাই] দ্র শিশু ৯।২৭-২৮

'মাতৃবৎসল' ['মেঘের মধ্যে মাগো যারা থাকে'] দ্র ঐ ৯।৫২-৫৩

'লুকোচুরি' ['আমি যদি দুষ্টুমি ক'রে'] দ্র ঐ ৯।৫৪-৫৫

'নৌকাযাত্রা' ['মধুমাঝির ঐ যে নৌকোখানা'] দ্র ঐ ৯।৪২-৪৩

'বিজ্ঞ' ['খুকি তোমার কিচ্ছু বোঝে না মা'] দ্র ঐ ৯।৩০-৩১

২১ শ্রাবণের চিঠিতে মোহিতচন্দ্র শেষ এগারোটি কবিতার মধ্যে আটটির নামকরণ করেন [তিনি 'আমি যখন পাঠশালাতে যাই' কবিতাটির উল্লেখ করেননি], পরদিন ২২ শ্রাবণ তিনি অপর দুটির নামকরণ করে 'যদি খোকা না হয়ে' কবিতাটির পূর্বপ্রদত্ত নাম 'অনুযোগ' বদলে 'সমব্যথী' রাখেন; তিনি লিখেছেন : "বিজ্ঞ" আর "সমব্যথী" এই দুটি নাম আপনার এক পাঠিকা [মোহিতচন্দ্রের স্ত্রী সুশীলা সেন] দিয়েছেন—আপনি 'খোকা'দের কথা যেমন লিখেছেন 'খুকী'দের কথা তেমন করে লেখেননি—এজন্যে তিনি কিছু ক্ষুন্ন হয়েছেন—দুঃখটা আপনাকে জানিয়ে রাখলাম।'[৪২] রবীন্দ্রনাথ এর প্রত্যুত্তরে ২৫ শ্রাবণ [সোম 10 Aug] লেখেন :

> আপনি বুঝি আমার পাঠিকাকেও খাটিয়ে নিচ্চেন? তিনি যে দুটি নাম দিয়েছেন সে ঠিকই হয়েছে কিন্তু তাঁর নালিশ সম্বন্ধে আমার তরফে দুটি একটি কথা বলবার আছে। আমার এই কবিতাগুলি সবই খোকার নামে—তার একটি প্রধান কারণ এই—যে ব্যক্তি লিখেছে সে আজ চল্লিশ বছর আগে খোকাই ছিল, দুর্ভাগ্যক্রমে খুকী ছিল না। তার সেই খোকাজন্মের অতি প্রাচীন ইতিহাস থেকে যা কিছু উদ্ধার করতে পেরেছে তাই তার লেখনীর সম্বল—খুকীর চিত্ত তার কাছে এত সুস্পষ্ট নয়। তা ছাড়া আর একটি কথা আছে—খোকা এবং খোকার মার মধ্যে যে ঘনিষ্ঠ মধুর সম্বন্ধ সেইটে আমার গৃহস্মৃতির শেষ মাধুরী—তখন খুকী ছিল না—মাতৃশয্যার সিংহাসনে খোকাই তখন চক্রবর্ত্তী সম্রাট্ ছিল—সেই জন্যে লিখ্‌তে গেলেই খোকা এবং খোকার মার ভাবটুকুই সূর্য্যাস্তের পরবর্ত্তী মেঘের মত নানা রঙে রঙিয়ে ওঠে—সেই অস্তমিত মাধুরীর সমস্ত কিরণ এবং বর্ণ আকর্ষণ করে আমার অশ্রুবাষ্প এই রকম খেলচে—তাকে নিবারণ করতে পারিনে।[৪৩]

মৃণালিনী দেবীর স্মৃতি শিশু-র কবিতার একটি সঞ্চারী ভাব সেকথা রবীন্দ্রনাথ ৩১ শ্রাবণের [রবি 16 Aug] পত্রেও স্বীকার করেছেন : 'শিশুকে উপলক্ষ্য করে ছলনাপূর্ব্বক শিশুর মার সঙ্গ পেয়েছিলেম'।

২৩ শ্রাবণ [শনি ৪ Aug] 'এই ত ২২টা হল' বলে রবীন্দ্রনাথ আরও তিনটি কবিতা প্রেরণ করেন। কবিতাগুলি হল :

'খোকার রাজ্য' ['খোকার মনের ঠিক মাঝখানটিতে'] দ্র শিশু ৯।২০-২২

'ভিতরে ও বাহিরে' ['খোকা থাকে জগৎমায়ের/অন্তঃপুরে'] দ্র ঐ ৯।২২-২৫

'ব্যাকুল' ['অমন করে আছিস কেন মাগো'] দ্র ঐ ৯।৩১-৩২

২৮ শ্রাবণ [বৃহ 31 Aug] রবীন্দ্রনাথ লেখেন : 'এডিটরের দায়িত্ব আপনার। যখন থাম্‌তে হবে, বলবেন "বাস্"। আপনি কল চালিয়েছেন—এখন "furiously rush driving" বলে আমার নামে নালিশ করতে পারবেন না। ক্রমে উত্তাপ যত বাড়তে থাকে চাকাও তত ছুটে চলে। যতই লিখ্‌চি নিজের ভিতরে যে বালকাণ্ড আছে তার সঙ্গে পরিচয় ততই বেড়ে যাচ্চে। কিন্তু কোনো একটা জায়গায় ত থামা আবশ্যক—সে সম্বন্ধে কিন্তু আমার একলার প্রতি নির্ভর করে থাকবেন না—রাশ টেনে ধরবেন।'[৪৪] পত্রটিতে 'ছোটোবড়ো' কবিতাটির শেষাংশ রয়েছে, সুতরাং মনে করা যায়, চারটি কবিতা এর সঙ্গে প্রেরিত হয়েছিল :

'বৈজ্ঞানিক' ['যেমনি ওগো গুরু গুরু'] দ্র শিশু ৯।৫০-৫২ :

'জ্যোতিষশাস্ত্র' ['আমি শুধু বলেছিলেম'] দ্র ঐ ৯।৪৯-৫০

'সমালোচক' ['বাবা নাকি বই লেখে সব নিজে'] দ্র ঐ ৯।৩৫-৩৬

'ছোটোবড়ো' ['এখনো তো বড়ো হই নি আমি'] দ্র ঐ ৯।৩২-৩৪

'জ্যোতিষশাস্ত্র' কবিতাটির নামকরণ পাণ্ডুলিপিতেই হয়েছিল। 'ছোটোবড়ো' কবিতাটির শেষে দিদিমা ও খোকার বিবাহ-সংক্রান্ত একটি স্তবক ছিল, মোহিতচন্দ্রের পরামর্শমতো [৩২ শ্রাবণ] রবীন্দ্রনাথ সেটি ও গুরুমশায়-সংক্রান্ত স্তবক-দুটি বাদ দিতে রাজি হয়েছিলেন [৩ ভাদ্র], কিন্তু শেষোক্ত স্তবকগুলি বাদ যায়নি। কবিতাটির প্রথমে লিখিত সূচনা ও ছন্দ পাণ্ডুলিপিতেই পরিবর্তিত হয়।

৩০ শ্রাবণ [শনি 15 Aug] রবীন্দ্রনাথ আরও তিনটি কবিতা পাঠান :

'বনবাস' ['বাবা যদি রামের মতো'] দ্র শিশু ৯।৪৬-৪৯

'বীরপুরুষ' ['মনে করো যেন বিদেশ ঘুরে'] দ্র ঐ ৯।৩৬-৩৮

'দুঃখহারী' ['মনে করো তুমি থাকবে ঘরে'] দ্র ঐ ৯।৫৫-৫৬

পরের দিন ৩১ শ্রাবণ [রবি 16 Aug] তিনি 'বিদায়' ['তবে আমি যাই গো তবে যাই' দ্র শিশু ৯।৫৬-৫৭] কবিতাটি পাঠিয়ে লিখলেন : 'বাস্ আর নয়। পিণ্ডি না দিলে যেমন ভূতের শান্তি হয় না তেমনি শেষের মত একটা ঠিক কিছু না লিখ্‌লে আইডিয়া থাম্‌তে চায় না। ঠিক যেন একটা গড়ানে জায়গায় বেগে নাবার মত—একটা তলা না পেলে দাঁড়াবার জো নেই। বিদায় কবিতায় সেই তলাটা পাওয়া গেল—এখন আমি অন্য বিষয়ে মন দিতে পারব। এখন আমার শিশুটির কাছ থেকে বিদায়।'[৪৫] কিন্তু বিদায় নিতে পারেননি তিনি, পরের দিন লেখেন 'জন্মকথা' ['খোকা মাকে শুধায় ডেকে' দ্র শিশু ৯।৭-৮; সমালোচনী, পৌষ। ২৯৯-৩০০]। শিশু-র শেষ নূতন কবিতা তিনি লেখেন ৬ ভাদ্র [রবি 23 Aug]। কিন্তু তার আগে পরিমার্জনা শুরু করেন

কয়েকটি পুরোনো কবিতার। সম্ভবত ১ ভাদ্র [মঙ্গল 18 Aug] তিনি কড়ি ও কোমল থেকে 'অস্তসখী' কবিতাটি পরিমার্জিত করে পাঠিয়ে লেখেন :

সংসারে যে যাবে এবং যে আসবে, শিশুরা যে তারি মাঝখানকার মধুর বন্ধন—তারা প্রাচীনের কণ্ঠে এক হাত জড়িয়ে রাখে এবং নবীনের হস্তে আর এক হাত সমর্পণ করে—তারা স্নেহের সূত্রে অতীতের এবং আশার সূত্রে ভবিষ্যতের সঙ্গে আবদ্ধ, পূর্ব্বদিক তাদের আশীর্ব্বাদের সঙ্গে অগ্রসর করে এবং পশ্চিম দিক তাদের আশ্বাসের সঙ্গে আহ্বান করে—অস্তোন্মুখকে তারা শেষ সান্ত্বনা এবং উদয়োন্মুখকে তারা নূতন প্রাণ দেয়—এমনি ভাবে মৃত্যু ও নবজীবনের সন্ধিস্থলে প্রফুল্লসুন্দর শ্রীতে অবতীর্ণ হয়ে দুই দিককেই তারা মধুর রশ্মি দ্বারা অভিষিক্ত করে দুয়েরই ললাটে তারা আলোকের টীকা পরিয়ে দেয় এই আভাসটুকুই "অস্তসখী" কবিতায় দেবার চেষ্টা করা গেল—যিনি নেবার চেষ্টা করবেন তিনি বোধ হয় পাবেন।'[৪৬]

'শিশুখণ্ডে পুরাতন ও নূতনের সম্মিলন' ঘটাবার জন্য তিনি কড়ি ও কোমল থেকে 'বিচ্ছেদ' 'উপহার' ও 'পরিচয়' কবিতাগুলি পরিমার্জিত করেন। এই পরিবর্তনগুলি শিশু-র পাণ্ডুলিপিতেই [Ms. 115] করা হয়েছিল।

রেণুকাকে নিয়ে আলমোরা ত্যাগ করার আগের দিন ৬ ভাদ্র [রবি 23 Aug] 'জগৎ পারাবারের তীরে' [দ্র শিশু ৯।৫-৬] কবিতাটি রচনা করে তিনি মোহিতচন্দ্রকে লেখেন : 'আজআলমোরা প্রবাসের শেষদিনে শিশুখণ্ডের কবিতা শেষ করলেম—এইবার বোধ হচ্ছে পজিটিভ্‌লি দি লাষ্ট্! এই কাগজটায় যে নামহীন কবিতাটা লিখে দিলেম সেইটেই বোধ হয় শিশুখণ্ডের সূচনারূপে ব্যবহার হতে পারে।'[৪৭]

আদি ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্রে মুদ্রিত 'শিশু' কাব্যগ্রন্থ ৭ম ভাগ রূপে আখ্যাপত্র 'সন ১৩১০।২ আশ্বিন' [শনি 19 Sep] তারিখ নিয়ে প্রকাশিত হয়। এতে প্রবেশক-সহ ৩২টি নূতন কবিতা ও 'নদী'-সহ ৩০টি পুরোনো কবিতা আছে। গ্রন্থের আখ্যাপত্রটি উদ্ধৃত করছি :

কাব্য-গ্রন্থ/সপ্তম ভাগ।/শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।/শ্রীমোহিত চন্দ্র সেন, এম্, এ,/সম্পাদক।

শিশু।/কলিকাতা/আদি ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্রে শ্রীদেবেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য দ্বারা মুদ্রিত।/৫৫নং অপর চিৎপুর রোড। সন ১৩১০।২ আশ্বিন।

গ্রন্থের শেষ পৃষ্ঠায় :

প্রকাশক, এস্, সি, মজুমদার/মজুমদার লাইব্রেরি/২০ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

পৃষ্ঠাসংখ্যা : ৬ + ২ [প্রবেশক] + ৪ [সূচীপত্র] + ১৭৪ + ৪।

ভাদ্র-সংখ্যা বঙ্গদর্শন [৩।৫] প্রকাশিত হয় মাসের প্রথম দিনেই [মঙ্গল 18 Aug]। এই সংখ্যায় রবীন্দ্রনাথের চারটি রচনা মুদ্রিত হয় :

২০১-১০ 'নৌকাডুবি' ১৩-১৪ দ্র নৌকাডুবি ৫।১৯৪-২০২ [১২-১৩]

২১০-১২ 'চিঠি' ['না জানি কারে দেখিয়াছি'] দ্র উৎসর্গ ১০।২২-২৩ [১১]

২৪৬-৪৮ 'শিশু' ['তোমার কটি-তটের ধটি'] দ্র শিশু ৯।৯-১০ ['খেলা']

২৪৮-৫৪ 'ঘুযাঘুষি' দ্র সমূহ-পরিশিষ্ট ১০।৬০৫-১২

New India পত্রিকায় মুদ্রিত একটি প্রবন্ধের সমালোচনা করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ বৈশাখ-সংখ্যায় প্রকাশিত 'রাজকুটুম্ব' প্রবন্ধে। বিপিনচন্দ্র প্রত্যুত্তরে অভিযোগ করেন, 'এক গালে চড় খাইয়া অন্য গাল ফিরাইয়া দেওয়া যদি-বা আমাদের মত না হয়, অন্তত অশ্রুজলপ্রবাহে আহতগণ্ডের আঘাতবেদনার উপশমচেষ্টাই আমাদের

মতে শ্রেয়।' কিন্তু রবীন্দ্রনাথ তাঁকে স্মরণ করিয়ে দিলেন, সাধনা-য় নাকিকান্নার বিরুদ্ধে তিনিই বারংবার আপত্তি জানিয়েছিলেন। তাই নিছক ভয় থেকে ধৈর্য অবলম্বন করার উপদেশ তিনি দেননি, মনুষ্যত্বের মর্যাদা রক্ষার জন্যই সংযত থাকা আবশ্যক। তিনি উদাহরণ দিয়ে দেখালেন, ব্যক্তি-ইংরেজের প্রতি ব্যবহারকে গোষ্ঠী-ইংরেজ কীভাবে শাসকজাতির প্রেসটিজের সঙ্গে জড়িয়ে দেখে। সুতরাং তার সঙ্গে লড়াই করতে গেলে গোষ্ঠীগতভাবেই প্রস্তুত হওয়া দরকার। কিন্তু আমাদের শিক্ষা ও অভ্যাস স্বভাববর্বরতার অনুকূল নয়। কাজেই প্রয়োজনের তাগিদে অশুভপ্রবৃত্তিকে জাগিয়ে তুললে কাজ শেষ করেই তা অন্তর্হিত হয় না, 'তাহাকে দাসত্বের ছুতায় আহ্বান করিলেও শেষে সে রাজত্ব করিতে চায়।...গুণ্ডাগিরি বল পাইয়া উঠিয়া মনুষ্যত্বকে শোষণ করে—বাহাদুরির নেশা জাগিয়া উঠে।' ইংরেজের অন্যায়ের প্রতিবাদ করে যে-কোনো পরিণতিকে বরণ করাকে তিনি স্বাগত জানিয়েছেন, কিন্তু সতর্ক থাকতে বলেছেন প্রবৃত্তির উন্মোচনের প্রতি। এই ভাবনার উপর দাঁড়িয়ে কয়েক বছর পরে রবীন্দ্রনাথ সন্ত্রাসবাদকে ধিক্কার জানিয়েছিলেন। তখন এবং আজও তাঁর মতের সমালোচনা করা হয় 'অতিরিক্ত নৈতিকতা বা ন্যায়বোধ ও ধর্মভীরুতা' বলে। কিন্তু আজ রাজনৈতিক হত্যাও যেভাবে নাড়ি-ভুঁড়ি-বের-করে-দেওয়া বীভৎসতার রূপ নিয়েছে, তখন রবীন্দ্রনাথের নীতিবোধের যাথার্থ্যের কথা একবার ভেবে দেখা উচিত।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, ভাদ্র ১৮২৫ শক [৭২১ সংখ্যা] :

20 'The God of Upanishads'

ঔপনিষদিক ব্রহ্ম গ্রন্থের ৫৫শ অনুচ্ছেদের কিয়দংশের ['সত্যজ্ঞান দুরূহ, প্রকৃত নিষ্ঠা দুরূহ,...এই সকল ভয় এবং ভার এবং ক্ষুদ্রতা হইতে ব্রহ্মই আমাদের একমাত্র মুক্তি' দ্র অ-২।২১৮-১৯] ইংরেজি অনুবাদ এই সংখ্যায় মুদ্রিত হয়।

সঙ্গীত-প্রকাশিকা, ভাদ্র ১৩১০ [২।১২] :

২০২। মিশ্র রামকেলী-তেওরা। মোরে, ডাকি লয়ে যাও মুক্তদ্বারে দ্র স্বর ২৭

কাঙালীচরণ সেন গানটির স্বরলিপি করেন।

প্রায় সমস্ত শ্রাবণ মাস ও ভাদ্র মাসের প্রথম সপ্তাহ শিশু-র কবিতা রচনায় ব্যাপৃত থাকলেও পরিবার ও বিদ্যালয়ের জন্য রবীন্দ্রনাথকে উদ্বিগ্ন থাকতে হয়েছে। রেণুকার স্বাস্থ্যে কখনও কখনও উন্নতির লক্ষণ দেখা গেলেও তাঁর জীবনীশক্তি ক্রমশই হ্রাস পাচ্ছিল। ৪ শ্রাবণ [20 Jul] রবীন্দ্রনাথ মোহিতচন্দ্রকে লিখেছেন : 'আমার জামাই সত্য এখানে আস্চে—সে এলে আমার ভার অনেকটা লঘু হবে।' সত্যেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য ৭ শ্রাবণ [23 Jul] আলমোরা পৌঁছন। তিনি আসাতে রবীন্দ্রনাথের ভার অবশ্যই কিছুটা লঘু হয়েছিল, শিশু-র এতগুলি কবিতা লেখা সম্ভব হয়েছিল এই কারণেই।

কিন্তু তিন মাস আলমোরায় নির্জনবাসে থাকার পর রেণুকা হাঁফিয়ে উঠেছেন, জীবনীশক্তির হ্রাসে মৃত্যুর আভাসও হয়তো তাঁর কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠছিল—তাই তিনি পরিচিত পরিবেশের মধ্যে ফিরে আসার জন্য ব্যগ্র হয়ে ওঠেন। 'বুধবার' [*19 Aug : ২ ভাদ্র] রবীন্দ্রনাথ মোহিতচন্দ্রকে লিখেছেন : 'রেণুকা এখান হইতে যাইবার জন্য অস্থির হইয়াছে। তাহার শরীরও বিশেষ ভাল নাই। আগামী সোমবারে এখান হইতে বাহির হইব। শুক্রবার নাগাদ কাশীতে পৌঁছিব—সেখানে কয়েকদিন বিশ্রাম করিয়া ভাদ্রমাসের শেষ সপ্তাহে

কলিকাতায় পৌঁছিব অনুমান করিতেছি।'[৪৮] পরের দিন ৩ ভাদ্র শ্রীশচন্দ্র মজুমদারকে একই কথা জানিয়ে ভ্রমণসূচী ঈষৎ পরিবর্তিত করে লিখেছেন : 'মাঝে কাশীতে কয়েকদিন বিশ্রাম করিয়া সম্ভবত তাহার পরের সোমবারেই কলিকাতা পৌঁছিতে পারিব।'[৪৯] পরদিন থেকে যাত্রার আয়োজন শুরু হয়ে যায়। ৭ ভাদ্র [সোম 24 Aug] রবীন্দ্রনাথ আলমোরা ত্যাগ করেন। 'রেণুকা দেবীর গত ১২ ভাদ্র আলমোরা হইতে আগমন কালীন হাবড়ার ষ্টেসন হইতে আনিতে যাইবার ৬ জন বেহারা ও পাল্কীর ভাড়া' হিসাব থেকে জানা যায়, তাঁরা ১২ ভাদ্র [শনি 29 Aug] কলকাতায় ফিরে এসেছিলেন।

এছাড়া একটি 'আকস্মিক ঝঞ্ঝাট'-এর মোকাবিলা করতে হল তাঁকে। বর্তমান বৎসরের ফাল্গুন মাসেই রথীন্দ্রনাথের বিবাহ দেবার জন্য তিনি উদ্যোগী হয়েছেন এইরূপ একটি গুজব শুনে মোহিতচন্দ্র অনুযোগের সুরে রবীন্দ্রনাথকে একটি পত্র লেখেন [পত্রটি রক্ষিত হয়নি]। তদুত্তরে সম্ভবত ৭ শ্রাবণ [বৃহ 23 Jul] তিনি লেখেন : 'ভয় নেই। এখনো অন্তত তিন চার ফাল্গুনমাসে রথীর বিবাহের সম্ভাবনা নেই। জনশ্রুতির ইতিহাস এই আমি বোধ হয় কারো কাছে কোন সময়ে রথীর বিবাহ দিয়ে ছুটি নেবার জন্যে মনের আগ্রহ ব্যক্ত করেছিলেম। সে কথা কন্যার আত্মীয়দের কানে ওঠে—তারা যথেষ্ট পীড়াপীড়ি আরম্ভ করে কিন্তু আমি ইতিপূর্ব্বেই সুস্পষ্ট অসম্মতি প্রকাশ করে চিঠি লিখেছি। শুনলুম তারা অন্যায়পূর্ব্বক রথীর কাছে তার মত জিজ্ঞাসা করতে ছাড়ে নি। বোধহয় তারাই কথাটা চতুর্দ্দিকে ছড়িয়ে দিচ্ছে। এই দেখুন এক আকস্মিক ঝঞ্ঝাট।'[৫০]

রবীন্দ্রনাথের এই ব্যাখ্যা মোহিতচন্দ্রকে আশ্বস্ত করেছিল। 'রবিবার [১০ শ্রাবণ : 26 Jul] তিনি লিখেছেন : 'আজ রথী সম্বন্ধে আমাকে আশ্বস্ত করে আপনি আমার মনকে কতদূর নির্ম্মল ও জাগ্রত করে তুলেছেন তা আমি প্রকাশ করতে পাচ্ছি নে। দুঃস্বপ্নটা আগেই ঝেড়ে ফেলেছিলাম, তবু একটু ঘোর বোধ হয় লেগে ছিল সেটুকু আজ দূর হল। শুধু আমিই এই দুঃস্বপ্নটি দেখি নি, আর আর কেউও দেখেছিলেন'।

কিন্তু প্রকৃত ঘটনাটি কী সে-সম্পর্কে আলোকপাত করা দুরূহ। গগনেন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠা ভগিনী বিনয়িনী দেবী ও শেষেন্দ্রভূষণ চট্টোপাধ্যায়ের বিধবা কন্যা প্রতিমা দেবীর [1893-1969] সঙ্গে রথীন্দ্রনাথের বিবাহ হয় ১৪ মাঘ ১৩১৬ [27 Jan 1910] তারিখে। কথিত আছে, প্রতিমা দেবীর জন্মের পর মৃণালিনী দেবী তাঁকে পুত্রবধূ করার ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন।* রবীন্দ্রনাথের পত্র থেকে অনুমান হয়, তিনিও এই ইচ্ছা অনুমোদন করেছিলেন। কিন্তু এখনই বিবাহ দিতে তাঁর 'সুস্পষ্ট অসম্মতি'র পর কন্যার অভিভাবকগণ হয়তো রথীন্দ্রনাথের আশা ত্যাগ করেন। গগনেন্দ্রনাথের কন্যা পূর্ণিমা চট্টোপাধ্যায় লিখেছেন : 'বিয়ের সময় প্রতিমাদিদির বয়স ছিল মাত্র এগার বছর। আমার ঠিক মনে নেই, বোধহয় বাংলা ১৩১০ সালের মাঝামাঝি প্রতিমাদিদির ফুলশয্যার নিমন্ত্রণ ছিল।[৫১] —এই বছরেরই ফাল্গুন মাসে তাঁরা প্রতিমার বিবাহ দেন। কিন্তু মাসদুয়েকের মধ্যেই গঙ্গায় ডুবে তাঁর প্রথম পক্ষের স্বামী নীলানাথ মুখোপাধ্যায়ের মৃত্যু হয়।

বিদ্যালয়ের শৃঙ্খলাবিধানের জন্য রবীন্দ্রনাথ অসুস্থ কন্যাকে আলমোরায় রেখে ৩১ জ্যৈষ্ঠ কলকাতায় আসেন ও ৪ আষাঢ় শান্তিনিকেতনে যান। কিন্তু রেণুকার গুরুতর অবস্থার কথা জেনে সমস্ত কাজ অসমাপ্ত রেখে তাঁকে দু'দিন পরেই চলে আসতে হয়। ব্রহ্মচর্যাশ্রম তখন শিক্ষকাভাবে পীড়িত—কুঞ্জলাল ঘোষ, জগদানন্দ রায়, হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সতীশচন্দ্র রায় এই চারজন মাত্র তখন নিয়মিত শিক্ষক—

রাজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রধানত কাজকর্ম দেখাশোনা করেন। এই অবস্থায় মোহিতচন্দ্র সেন, জগদীশচন্দ্র বসু ও রমণীমোহন চট্টোপাধ্যায়ের উপর দায়িত্ব দিয়ে রবীন্দ্রনাথকে আলমোরায় চলে আসতে হয়। কুঞ্জলাল ঘোষের প্রতি অনেকেই বিরূপ ছিলেন—রামপুরহাট স্কুলের প্রধান শিক্ষক নগেন্দ্রনারায়ণ রায়ের যোগদানের সম্ভাবনায় আষাঢ়ের শেষ সপ্তাহে কুঞ্জলালকে বিদায়পত্র দেওয়া হয়।

শ্রাবণের শুরুতে নগেন্দ্রনারায়ণ রায় ও বিপিনবিহারী দাসগুপ্ত বিদ্যালয়ের কাজে যোগ দেন। গণিত ও কারিগরী শিক্ষার জন্য শিক্ষক চেয়ে পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়। মোহিতচন্দ্র 10 Jul [২৫ আষাঢ়] জানাচ্ছেন : 'ত্রৈবার্ষিক উত্তীর্ণদের ১৫ খানা আবেদন পেয়েছি। তাদের মধ্যে আমরা শ্রীগোপালচন্দ্র কবিকুসুমকেই মনোনীত করেছি।' 17 Jul [১ শ্রাবণ] তিনি লিখছেন : 'বিপিনবাবু গেল মঙ্গলবারে [২৯ আষাঢ় : 14 Jul] বোলপুরে এসেছেন। কবিকুসুম লিখেছেন যে তিনি ১৫ দিনের নোটিস্ দিতে বাধ্য সুতরাং ১লা আগষ্ট নাগাদ এসে পৌঁছবেন। জগদানন্দের সহপাঠী বন্ধুটি ব্যাধিগ্রস্থ, তিনি আসিতে পারিলেন না।' এই সংকটের সমাধান করার জন্য ৪ শ্রাবণ [20 Jul] রবীন্দ্রনাথ লেখেন : 'যতদিন জগদানন্দের সহকারী কাউকে না পান ততদিন রথী সন্তোষের দ্বারা যথাসম্ভব কাজ চালাবার ব্যবস্থা করে দেবেন।...যোগেশচন্দ্র রায়কে একবার চিঠি লিখে জানুন না তিনি অঙ্ক কতদূর শেখাতে পারেন। Science-এর জন্যে দ্বিতীয় লোক না হলেও আপাতত চলতে পারবে। বরঞ্চ ছোট ছেলেরা হাতের কাজ এবং বড় ছেলেরাই Science শিখুক।'[৫২] যোগীনবাবু নামক একজন বিজ্ঞান-শিক্ষকের জন্য অপেক্ষা করা হচ্ছিল, কিন্তু তিনি শেষ পর্যন্ত যোগদান করেননি। মোহিতচন্দ্র 4 Aug [১৯ শ্রাবণ] খুশি হয়ে জানান : 'কবিকুসুম ১লা আগষ্ট থেকেই এসেছেন। বাস্তবিক এবার শিক্ষকগুলি বড় ভাল হয়েছে। নগেনবাবু খুব কাযের লোক, সব বিষয়ে দৃষ্টি আছে—বিচক্ষণ ও হৃদয়বান্ বলে মনে হয়।..."কবিকুসুমটি"কেও ভাল লাগল। Drawing instruments আর models কতগুলির অর্ডার দেওয়া হয়েছে—কবিকুসুম কলেজ ক্লাসেও ড্রয়িং পড়াবেন। এখন physical laboratoryটা সুচারুরূপে প্রতিষ্ঠিত হলেই হয়।' আবেদনপত্র থেকে বাছাই করে ননীগোপাল ঘোষাল নামক ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে পড়া একজনকে নিয়োগপত্র দেওয়া হয়, তিনি না আসাতে ভবেন্দ্রবাবুকে নিয়োগ করা হয়। [রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনে ফিরে আসার পর ১৮ কার্তিক [4 Nov] ভবেন্দ্রবাবু সম্পর্কে অসন্তোষ জানিয়ে গোপালচন্দ্রকে বিদায়পত্র দেওয়ার কথা লেখেন।[৫৩]] এই-সব সংকটে বিব্রত রবীন্দ্রনাথ সুবোধচন্দ্র মজুমদারকে ৯ শ্রাবণ [শনি 25 Jul] তীব্র ক্ষোভের সঙ্গে লেখেন : 'আসন্ন ঝড়ের মুখেই তুমি বিদ্যালয়কে ছাড়িয়া আসিয়াছিলে। আমি সুদূরে রোগতাপের মধ্যে কেবল চিঠি ও টেলিগ্রামযোগে এই সঙ্কটেব সময়টাকে এক রকমে উত্তীর্ণ করিয়া দিলাম। অন্তত এই সময়ে যদি তুমি থাকিতে তবে আমাকে এত বেশি হাঙ্গাম করিতে হইত না।' অবশ্য এর পরে তিনি গভীর আশ্বাসের সঙ্গে লিখেছেন :

> ঈশ্বর তাহাকে রক্ষা করিয়াছেন। এইরূপ কালে কালে বহুতর বিঘ্ন কাটাইয়াই চলিতে হইবে—শুভানুষ্ঠানের নিয়মই এই—নতুবা সে বল, বেগ ও স্বাস্থ্য লাভ করিতে পারে না। ইহা দেখিয়াছি, বিপ্লবে যতটা ক্ষতি হয়, লাভ তাহা অপেক্ষা অধিক হইয়া থাকে। যাহা হউক এইরূপ আঘাত-পরম্পরায় বিদ্যালয় ক্রমশই প্রসারতা ও পরিণতি লাভ করিতেছে—আমারও ভরসা ক্রমে বাড়িতেছে—বন্ধুরাও ক্রমশ আকৃষ্ট হইতেছেন এবং সেই সময় নিকটবর্ত্তী হইয়া আসিতেছে যখন ইহাকে কেহ উপেক্ষা করিতে পারিবে না।...ইহার বলশালী তেজোময় যৌবন আসন্নপ্রায়, যদি ধৈর্যের সহিত এখন তুমি ইহার সহিত যুক্ত থাকিতে পারিতে তবে গৌরব লাভ করিতে সন্দেহ নাই। এই বিদ্যালয় বাংলাদেশ গঠনের ইতিহাসের একটি অঙ্গ হইবে ইহা মনে করিয়ো—যাঁহারা ইহাতে জীবন-সমর্পণ করিবেন তাঁহাদের জীবন সার্থক হইবে। কিন্তু বিধাতার রণক্ষেত্রে অনেক লোকেই আহত হয়, সকলেই টিকিয়া থাকে না।[৫৪]

—রবীন্দ্রনাথের এই ভবিষ্যদ্‌বাণী শতকরা একশো ভাগ সত্য প্রমাণিত হয়েছে—স্বয়ং সুবোধচন্দ্রের মতো আরও অনেকেই রবীন্দ্র-সান্নিধ্য ও বিদ্যালয়ের সঙ্গে যুক্ত থাকার সুবাদেই ইতিহাসের পাতায় স্থান লাভ করেছেন, অন্যথায় নিতান্ত দুই-এক পুরুষের আত্মীয়স্বজন ছাড়া তাঁদের নাম কারোর মনে থাকত না।

ছাত্র ও শিক্ষকদের নিয়ে অন্য গোলমালও হচ্ছিল। ১০ শ্রাবণ মোহিতচন্দ্র লিখেছেন : 'সম্প্রতি সতীশের একটি পত্রে প্রেমের [প্রেমানন্দ সিংহ] জঘন্য দুষ্কীর্ত্তির সংবাদ পেয়ে মর্ম্মাহত হয়েছি।...প্রেম যে একটা কিছু দুষ্কর্ম্ম করবে এ আশঙ্কা আমার মনে সর্ব্বদাই জাগ্রত ছিল।...এখন আর বিদ্যালয়ে তার স্থান নাই। সে কোথা আছে তার অনুসন্ধান করতে তার অভিভাবককে লিখেছি। তার সংশোধনের আশা আমার নেই—এখন আমাদের বিদ্যালয়ের ছাত্রদের কিসে এই পাপস্পর্শ হইতে দূরে রাখিতে পারি তার জন্যই ব্যস্ত হয়ে উঠেছি।' ১৬ শ্রাবণ [শনি 1 Aug] মোহিতচন্দ্র ও রমণীমোহন শান্তিনিকেতনে যান। 4 Aug তিনি এই খবর দিয়ে লেখেন :

গত সপ্তাহে সেখানে একটি (নেহাত ছোটখাটো নয়) গণ্ডগোল হয়েছিল।...সমর বলে যে নূতন বড় ছেলেটি গিয়েছিল সে মিথ্যাকথা বলাতে বিপিনবাবু তাকে তিরস্কার [যদ্দৃষ্টং] করেন, তাতে সে কড়া জবাব দেয়, হরিচরণবাবুও তাকে নিরস্ত করতে গিয়ে অপমানিত হন্।...তার পর দীনু [দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর] সমরের পক্ষ নিয়ে বিপিনবাবুকে ছাত্রদের সাম্‌নেই অনেক কথা বলে—যেমন "আমার আত্মীয় স্কুল করেছেন আমাকে ত দেখ্‌তে হবে আপনাদের বিরুদ্ধে complaint শুনতে পাচ্ছি, পড়াতে পারেন না ইত্যাদি (শেষ কথাটা বিপিনবাবুকেই বিশেষভাবে লক্ষ্য করে বলা হয়েছিল)।...শনিবার রাত্রে শিক্ষকদের ডেকে নিয়মাবলী পড়লাম—নগেনবাবুকে অধ্যক্ষ করে, ছেলেদের তিরস্কার করবার শাসন করবার সমুদয় ভার তাঁর উপরেই রাখা গেল।...আশঙ্কা ছিল দীনুকে নিয়ে, যাতে সে প্রভুত্ব করতে না পারে সেটা দেখা দরকার ছিল।...দ্বিপুবাবুর ইচ্ছা দীনু এইবার পরীক্ষা দেয়—সে নিয়ে সে syndicate থেকে অনুমতি পাবে কিনা আমাকে সন্ধান করতে অনুরোধ করেন—আমি কালী বাঁড়ুয্যেকে জিজ্ঞাসা করে জেনেছি যে দু'বছর নিয়মমত না পড়লে কেউ শিক্ষক বলে পরীক্ষা দিতে পারে না। সুতরাং দীনুকে বোলপুর থেকে চলে আস্‌তে হবে।

এই চিঠি থেকে বোঝা যায়, কেন রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতন আশ্রম থেকে ব্রহ্মচর্যাশ্রমকে দূরে রাখতে চাইতেন এবং কিছুদিন পরে অন্যত্র জায়গা সংগ্রহ করে বিদ্যালয়কে সেখানে তুলে নিয়ে যেতে ব্যগ্র হয়েছিলেন।

পড়াশুনোর ক্ষেত্রেও কিছু অবহেলা হচ্ছিল। শমীন্দ্রনাথ 'শনিবার' [৯ শ্রাবণ : 25 Jul] লেখেন : 'আগেকার মত আমরা এখনও হ্যান্‌রাইটীং লিখি। আমাদের ক্লাসে ভোলা পটল আমি প্রফুল্ল ক্ষীতীশ ও সুহাস পড়ি। ইংরাজি কোন বই পড়া হয় না। আমাদের অঙ্ক শেখান হয় না। ভূগোল ইতিহাসও পড়া হয় না। বাংলাও পড়া হয় না।' রবীন্দ্রনাথ কনিষ্ঠ পুত্রের এই অভিযোগকে গুরুত্ব দিয়ে মোহিতচন্দ্রকে লেখেন [১৩ শ্রাবণ : 29 Jul] : 'Infant class পড়াশুনো একরকম বন্ধ হয়েই আছে। শমী লিখেছে তারা বাংলা, ইতিহাস, ভূগোল, অঙ্ক কিছুই শিখ্‌চে না। কুঞ্জবাবু থাক্‌তে এ সমস্ত subjectই তিনি তাদের শেখাতেন। আপনাদের একবার শীঘ্রই বোলপুরে যাওয়া দরকার হয়েছে। আমি কেবল চিঠি লিখে কিছুই করে উঠতে পারচি নে।'

ইতিমধ্যে বিদ্যালয়ের ত্রুটিবিচ্যুতি সম্পর্কে অক্ষয়চন্দ্র সরকারের 'মন্তব্য' রবীন্দ্রনাথের হাতে পৌঁছয়। ২৪ শ্রাবণ [রবি 9 Aug] তিনি বিদ্যালয়ে গৃহীত নূতন ব্যবস্থাদির বর্ণনা করে অক্ষয়চন্দ্রকে একটি দীর্ঘ পত্র [দ্র রবীন্দ্রবীক্ষা ১০।১৩-১৫] লেখেন; বিদ্যালয় থেকে দূরে থাকার ফলে নানা অব্যবস্থার জন্য তাঁর উদ্বেগের পরিচয় পত্রটিতে রয়েছে—বিশেষত ক'দিন আগেই [২৬ শ্রাবণ : 11 Aug] মোহিতচন্দ্র লেখেন : 'বিপিনবাবুর ইংরেজী পড়ানয় ছেলেরা সন্তুষ্ট নয়'।

নূতনভাবে বিন্যস্ত কাব্যগ্রন্থ মুদ্রণের দায়িত্ব রবীন্দ্রনাথ মজুমদার লাইব্রেরিকে দেন ১৩০৯ বঙ্গাব্দের আশ্বিন মাসে। স্বত্বাধিকারী শৈলেশচন্দ্র মজুমদার ঢিলাঢালা প্রকৃতির মানুষ ছিলেন, তাছাড়া কালীগ্রামের ম্যানেজারের দায়িত্বও তিনি ত্যাগ করেননি; ফলে স্বভাবতই কাব্যগ্রন্থ মুদ্রণে বিলম্ব ঘটেছে এবং রবীন্দ্রনাথও চঞ্চল হয়েছেন। মোহিতচন্দ্র সম্পাদনার ভার নেবার পর তাঁকে লিখিত অনেকগুলি পত্রেই অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গে মুদ্রণ-বিষয়ে এই চাঞ্চল্যও প্রকাশিত হয়েছে। এই পত্রগুলি থেকে জানা যায়, কাব্যগ্রন্থ বিভিন্ন ছাপাখানায় মুদ্রিত হচ্ছিল। প্রথম ভাগ প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড ২৫ রায়বাগান স্ট্রীটে অবস্থিত সান্যাল অ্যাণ্ড কোম্পানির ভারত মিহির যন্ত্রে, দ্বিতীয় ভাগ প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড, তৃতীয় ভাগ, পঞ্চম ভাগ ও ষষ্ঠ ভাগ ৩/৪ গৌরমোহন মুখার্জি স্ট্রীটে অবস্থিত মেটকাফ প্রেসে এবং চতুর্থ ভাগ, অষ্টম ভাগ ও নবম ভাগ ২০ কর্নওয়ালিশ স্ট্রীটে অবস্থিত মজুমদার লাইব্রেরির নিজস্ব দিনময়ী প্রেসে ছাপা হয়। ২৬ শ্রাবণ [মঙ্গল 11 Aug] মোহিতচন্দ্র লেখেন :'মেটকাফ রূপক কাহিনী খণ্ডটি [পঞ্চম ভাগ] ভাদ্রের ১০ই ১১ই বার করবে বল্‌ছে'; ৩২ শ্রাবণ [সোম 17 Aug] তিনি লিখছেন : 'ছাপার কাজ গেল সপ্তাহে বেশ দ্রুত চলেছে।...জয়সুন্দররাও বোধ হয় শীঘ্র প্রুফ দেবে। কাল প্রেমতোষের সঙ্গে কথা হচ্ছিল—শিশুখণ্ড তাদের প্রেসে ছাপাবার। আপনি কি বলেন?...গুপ্ত মুখার্জি (ডাক্তার দুর্গাদাসবাবুর ছেলে যে প্রেস করেছে) এক খণ্ড ছাপাতে ইচ্ছুক আছে।' এর জবাবে বৃহস্পতিবার [৩ ভাদ্র : 20 Aug] রবীন্দ্রনাথ লেখেন : 'প্রেমতোষবাবুর প্রেসকে আমি বড় ডরাই। ক্ষণিকা ছাপতে তিনি ছমাস করেছিলেন। যদি তিনি অতি শীঘ্র ছাপিয়ে দিতে একেবারে দৃঢ়নিশ্চয় হন—যদি বলেন যে তাঁর কথার কিছুমাত্র নড়চড় হবে না তাহলে আর একবার তাঁর হাতে আত্মসমর্পণ করা যেতে পারে। তাঁর কর্ম্মক্ষমতা সম্বন্ধে আমার বড় বিশ্বাস নেই। যাই হোক চার পাঁচটা প্রেসে ছড়িয়ে দিলে কাজ হয়ত এগোতে পারে। গুপ্তমুখুয্যেদের না হয় একটা ছোট দেখে কিছু দিয়ে দেখতে পারেন।' প্রেমতোষ বসু বা গুপ্তমুখার্জির প্রেসে কোনো খণ্ড ছাপা হয় নি, রবীন্দ্রনাথেরই পূর্বনির্দেশ-মতো 'শিশুখণ্ড' [সপ্তম ভাগ] আদি ব্রাহ্মসমাজ প্রেসে মুদ্রিত হয়।

আমরা পূর্বেই বলেছি, রেণুকাকে নিয়ে রবীন্দ্রনাথ ১২ ভাদ্র [শনি 29 Aug] কলকাতায় পৌঁছন। পথের স্মৃতিচারণ করেছেন তিনি প্রতিমা দেবীর কাছে :

> আলমোড়া থেকে ১০০ মাইল কাটগুদম পর্যন্ত তাকে নিয়ে নামতে হল। অনেক জায়গায় হাঁটতেও হয়েছিল। এই দীর্ঘ রাস্তা শেষ করে ট্রেন ধরলুম। ওষুধপত্র রুগী এবং কয়েকজন আত্মীয়কে গাড়িতে চাপিয়ে দিলুম। আমি রইলুম পাশের কামরায়। পশ্চিমের কোনো এক জায়গায় সকালবেলা গাড়ি থামতে স্টেশনে অল্পক্ষণের জন্য নেবেছিলুম। গ্রহ যখন বিরূপ তখন সবই চলে বিপরীত দিকে। ভুলক্রমে সিটের উপর পার্স ফেলে এসেছিলুম, ফিরে গিয়ে দেখি সেটি অদৃশ্য হয়ে গেছে। ক্ষণকালের জন্য মনটা খুব বিগড়িয়ে গেল। বিতৃষ্ণা জন্মে গেল সংসারটার উপর। কিন্তু নিজেকে সংযত করে ভাবতে লাগলুম, যে পার্স নিয়েছে আমার চেয়ে হয়তো তারই টাকার বেশ প্রয়োজন। আমি না হয় খুবই অসুবিধেয় পড়লুম কিন্তু সেই ব্যক্তি হয়তো যথার্থ অভাবী, হয়তো এই টাকা তার যথার্থ উপকারে লাগল। নিজেকে যখন ঘটনা থেকে বিচ্ছিন্ন করে দ্বিতীয় ব্যক্তি হিসাবে ভাবতে পারলুম তখনি হারানোর দুঃখ থেকে মন মুক্তি পেল।[৫৫]

—দুঃখকে অতিক্রম করার এইটিই পদ্ধতি ছিল রবীন্দ্রনাথের। কয়েক বছর পরে এই অভিজ্ঞতা তিনি 'গোরা' উপন্যাসে [দ্র ৬।৩১০, ৩২শ পরিচ্ছেদ] ভিন্নরূপে পরিবেশন করেছেন।

কলকাতায় আসার পর রেণুকার স্বাস্থ্যের ক্রমশই অবনতি হতে থাকে। ১৩ থেকে ২০ ভাদ্র প্রত্যহই ডাঃ ডি. এন. রায় তাঁকে দেখতে এসেছেন। ১৮ ভাদ্র তাঁকে দেখতে আসেন আর এক বিখ্যাত চিকিৎসক ডাঃ

চন্দ্রশেখর কালী। 'বিনোদিনী দত্ত নর্স উহার ১৬ না° ২৫ ভাদ্র পর্যন্ত ১০ দিনের ফি প্রতিদিন ৪্' ব্যয় থেকে জানা যায় শুশ্রূষাকারিণীও নিয়োগ করা হয়েছিল। গায়ে রোদ লাগানো ভালো বলে চিকিৎসকদের পরামর্শে রেণুকার জন্য জোড়াসাঁকোর লালবাড়ির ত্রিতলে চার দিকে কাঁচ দেওয়া একটি ঘর নির্মাণ করা হয়।

কিন্তু সমস্ত প্রয়াসই ব্যর্থ হল। ১৫ ভাদ্র [মঙ্গল 1 Sep] মীরা দেবী বালিগঞ্জ থেকে দিদিকে দেখতে জোড়াসাঁকোয় আসেন। তিনি লিখেছেন :

রানীদি কলকাতায় এসেছেন শুনে দেখতে গিয়েছিলুম। সে কী জীর্ণশীর্ণ চেহারা ও ম্লান হাসি, আজও তা ভুলতে পারি নি। তাঁর ঠাণ্ডা হাতখানি বাড়িয়ে আমাকে কাছে ডেকে এক বাক্স খেলনা দিলেন—কলকাতায় আসবার সময় লখ্‌নউ স্টেশনে কিনেছিলেন আমার কথা মনে করে।

রানীদির সঙ্গে দেখা করে মেজোমার ওখানে ফিরে গেলুম। তার পর কবে যে বেচারি রোগযন্ত্রণা থেকে মুক্তি পেলেন সেটা আমার জানা নেই। শুনেছি রানীদি যাবার সময় বাবার হাত চেপে ধরে বলেছিলেন, 'বাবা, ওঁ পিতা নোইসি বলো।' হাজারিবাগে যাবার আগে অল্প কিছুদিন আমরা শান্তিনিকেতনে ছিলুম। বাবা রোজ সকালবেলায় ওঁকে নিয়ে বারান্দার এক কোণে বসে উপনিষদ থেকে মন্ত্র পাঠ করে তার মানে বুঝিয়ে দিতেন। এমনি করে ধীরে ধীরে তাঁর মনকে সংসারের বন্ধন থেকে মুক্তি লাভ করবার পথে অনেকটা এগিয়ে দিয়েছিলেন যাতে ছেড়ে যেতে বেশি কষ্ট না পান। এই সময় বাবা যেন রানীদিকে বেশি কাছে টেনে নিয়েছিলেন।[৫৬]

১৯ ভাদ্র [শনি 5 Sep] রথীন্দ্রনাথ ও শমীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতন থেকে আসেন শেষ দেখা দেখতে। এর ন'দিন পরে ২৮ ভাদ্র [সোম 14 Sep] রেণুকার মৃত্যু হয়—ক্যাশবহির হিসাবে লেখা হয় : 'রেণুকা দেবীর ২৮ ভাদ্র মৃত্যু হওয়ায় অন্তেষ্টি ক্রিয়ার ব্যায়' ১৭ টাকা সাড়ে চৌদ্দ আনা। রবীন্দ্রনাথ এইদিনই খবরটি বোলপুরে এবং ফুলতলায় শাশুড়ি দাক্ষায়ণী দেবীকে টেলিগ্রাফ করে জানান—রথীন্দ্রনাথ ভাইকে নিয়ে ইতিমধ্যেই শান্তিনিকেতনে ফিরে গিয়েছিলেন।

এই মৃত্যুকেও রবীন্দ্রনাথ স্বাভাবিক স্থৈর্যের সঙ্গে গ্রহণ করেছিলেন। মাত্র পাঁচদিন পরে ২ আশ্বিন [শনি 19 sep] একটি দীর্ঘ পত্রে সংযতভাবে তাঁর অন্যায় ও দুর্বলতার জন্যই মনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় ব্রহ্মচর্যাশ্রমের কর্ম ত্যাগ করেছেন এই অভিযোগের উত্তর দিয়েছেন তিনি এবং শেষে নিতান্ত খবর দেবার ভঙ্গিতে লিখেছেন : 'কয়েক দিন হইল রেণুকার মৃত্যু হইয়াছে। এখানে আসিয়া অবধি তাহাকে লইয়া একান্ত উদ্বেগে ছিলাম সেইজন্য পত্র লিখিতে পারি নাই—মনে করিয়াছিলাম দেখা হইবে তাহাতেও নিরাশ হইয়াছি।'[৫৭] প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ লিখেছেন : 'তাঁর মেজোমেয়ে মারা যাওয়ার সময়কার কথা নিজেই বললেন।/সে সময় স্বদেশী আন্দোলন চলছে। জাতীয়শিক্ষাপরিষদের ব্যবস্থা নিয়ে দিনের পর দিন আলাপ আলোচনা পরামর্শ। রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মশায় রোজ আসেন। আর রোজই অসুখের খবর নেন। যেদিন মেজো মেয়ে মারা যায় কথাবার্তায় অনেক দেরি হয়ে গেল। যাওয়ার সময় সিঁড়ির কাছে ত্রিবেদী মশায় কবিকে জিজ্ঞাসা করলেন, আজ কেমন আছে? কবি শুধু বললেন, সে মারা গিয়েছে। শুনেছি যে ত্রিবেদী মশায় সেদিন কবির মুখের দিকে তাকিয়ে আর কিছু না বলে চলে গিয়েছিলেন।'[৫৮] রবীন্দ্রনাথ যদি ঠিক এই কথাগুলিই বলে থাকেন, তাহলে নিশ্চয়ই তাঁর স্মৃতিবিভ্রম ঘটেছিল—কারণ স্বদেশী আন্দোলন ও জাতীয় শিক্ষা পরিষদ-সংক্রান্ত আলোচনা-পরামর্শ রেণুকার মৃত্যুর পরবর্তী কালের ঘটনা। কিন্তু কোনো বিষয়ে আলোচনার জন্য আগত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীকে তিনি যদি ওইভাবেই বলে থাকেন তাতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই, উক্ত ২ আশ্বিনের পত্রাংশের সঙ্গে বর্ণিত ঘটনার যথেষ্ট ভাবসাদৃশ্য বর্তমান।

রেণুকার ব্যাধি থেকে রবীন্দ্রনাথ সম্ভবত কোনো সংক্রমণ আশঙ্কা করেছিলেন। ২২ ভাদ্র [মঙ্গল 8 Sep] তারিখে সরকারী ক্যাশবহির একটি হিসাবে দেখা যায় : 'বঃ কলিকাতা স্যানিটারিয়ম দং শ্রীযুক্ত রবীন্দ্র বাবু

মহাশয়ের Electric চিকিৎসার জন্য দেওয়া যায় ১৩৫।০'। বিশেষজ্ঞরা বলতে পারবেন এটি কী ধরনের চিকিৎসা, কিন্তু এর পর দীর্ঘকাল রবীন্দ্রনাথ অসুস্থ থেকেছেন—কেবলমাত্র অন্তর্নিহিত প্রাণশক্তি ও মনের জোর তাঁকে কর্মক্ষম রেখেছে। তাছাড়া এই সময়ে তিনি নিরামিষাশী—উপযুক্ত পুষ্টির অভাব তাঁর স্বাস্থ্যোন্নতির অন্তরায় হয়েছিল।

এই বছর দুর্গাপূজা আরম্ভ হয় ১১ আশ্বিন [সোম 28 Sep]। কিন্তু তার বহুপূর্বেই আশ্বিন ১৩১০ [৩।৬]-সংখ্যা বঙ্গদর্শন প্রকাশিত হয় ৪ Sep [মঙ্গল ২২ ভাদ্র] তারিখে। এই সংখ্যায় রবীন্দ্র-রচনা তিনটি :

২৫৫-৬০ 'ধর্ম্মবোধের দৃষ্টান্ত' দ্র স্বদেশ ১১।৪৮৯-৯৪

২৬১-৭০ 'নৌকাডুবি' ১৫-১৭ দ্র নৌকাডুবি ৫।২০২-১০ [১৪-১৬]

২৮৪-৯০ 'সাহিত্য-সমালোচনা' দ্র সাহিত্য ৮।৩৪৮-৫৪ ['সাহিত্যের বিচারক']

একদা কটকের র‍্যাভেনশ কলেজের অধ্যক্ষ হলোয়ার্ডের মুখে এদেশের অর্ধসভ্য মানুষ প্রাণের মাহাত্ম্য (Sanctity of Life) বোঝে না বলে তাদের হাতে জুরি-বিচারের অধিকার দেওয়া অন্যায় এই অভিমত শুনে রবীন্দ্রনাথ তার প্রতিবাদ করেছিলেন 'অপমানের প্রতিকার' [সাধনা, ভাদ্র ১৩০১] প্রবন্ধে। 'ধর্মবোধের দৃষ্টান্ত' প্রবন্ধে তিনি *Globe*, *Daily News* প্রভৃতি পত্রিকা ও হেনরি স্যাভেজ ল্যাণ্ডারের তিব্বত-ভ্রমণকাহিনী থেকে য়ুরোপীয় ধর্মবোধের আরও দৃষ্টান্ত তুলে মন্তব্য করেছেন : 'ধর্মবোধ পাশ্চাত্য সভ্যতার আভ্যন্তরিক নহে; স্বার্থরক্ষার প্রাকৃতিক নিয়মে তাহা বাহির হইতে অভিব্যক্ত হইয়া উঠিয়াছে। এই জন্য য়ুরোপীয় গণ্ডির বাহিরে তাহা বিকৃত হইতে থাকে। এমন কি, সে গণ্ডির মধ্যেও যেখানে স্বার্থবোধ প্রবল, সেখানে দয়াধর্ম রক্ষা করার চেষ্টাকে য়ুরোপ দুর্বলতা বলিয়া ঘৃণা করিতে আরম্ভ করিয়াছে।' এইজন্যই বুয়রযুদ্ধে বিরুদ্ধপক্ষের সর্বস্ব জ্বালিয়ে দেওয়া এবং তাদের অনাথ শিশু ও স্ত্রীলোকদের বন্দী করার বিরুদ্ধে ইংলণ্ডের কয়েকটি পত্রিকা যখন ধিক্কার দেয়, তখন অন্য পত্রিকাগুলি তাকে sentimentality বলে উপহাস করে। 'এই কারণেই চীনযুদ্ধে য়ুরোপীয় সৈন্যের উপদ্রব বর্বরতারও সীমা লঙ্ঘন করিয়াছিল এবং কংগো-প্রদেশে স্বার্থোন্মত্ত বেলজিয়ামের ব্যবহার পৈশাচিকতায় গিয়া পৌঁছিয়াছে।' অপরপক্ষে ভারতীয় ধর্মাদর্শ অন্তরের সামগ্রী, Sanctity of Life স্বীকার করতে গিয়ে মাংসাহার সে স্বেচ্ছায় পরিত্যাগ করেছে, যুদ্ধেও ধর্মরক্ষা করার জন্য নির্দেশ দিয়েছে। য়ুরোপীয়রা একে ভারতীয়দের বহির্বিষয়ে দুর্বলতা ও বহিঃশত্রুর হাতে পরাজয়ের কারণ বলে অভিহিত করে, কিন্তু রবীন্দ্রনাথ বলেন : 'তথাপি আমরা স্বার্থ ও সুবিধার উপরে ধর্মের আদর্শকে জয়ী করিবার চেষ্টায় যে গৌরবলাভ করিয়াছি তাহা কখনোই ব্যর্থ হইবে না—এক দিন তাহারও দিন আসিবে।'

বস্তুত এই রচনাটি ও এই বৎসর বঙ্গদর্শন-এ প্রকাশিত অপর দুটি প্রবন্ধ 'রাজকুটুম্ব' ও 'ঘুষাঘুষি' রাজনৈতিক সংগ্রামের পদ্ধতি বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের মানস-সংকটের পরিচায়ক। পথে-ঘাটে অফিসে-আদালতে সাধারণ ইংরেজ ও ইংরেজ রাজকর্মচারীগণ দেশীয় ব্যক্তিদের প্রতি যে বর্বর অত্যাচার করছিল, সেই প্রতিকারহীন অপমান সম্বন্ধে তিনিও সচেতন ছিলেন ও বিভিন্ন প্রবন্ধে তার প্রতিবাদ করেছেন। কিন্তু আত্মমর্যাদা রক্ষার্থে মুষ্টিযোগের যাথার্থ্য স্বীকার করেও তার প্রয়োগে তিনি দ্বিধাগ্রস্ত, এ-বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই।

‘সাহিত্য সমালোচনা’ [‘সাহিত্যের বিচারক”] প্রবন্ধটির প্রেরণা সম্ভবত মোহিতচন্দ্র সেন-কৃত কাব্যগ্রন্থ-এর ভূমিকা। আমরা জানি, কাব্যগ্রন্থ-সম্পাদনা ও বিদ্যালয়-পরিচালনা বিষয়ে আলোচনার জন্য মোহিতচন্দ্র জ্যৈষ্ঠ মাসে দিন-পনেরো আলমোরায় কাটান। কলকাতায় ফিরে তিনি ভূমিকাটি লেখেন ও তার প্রুফ রবীন্দ্রনাথকে পাঠিয়ে দেন। রসগ্রাহী বন্ধুর আস্বাদনের মাধ্যমে নিজের কবিতাজগৎকে পরিক্রমা করার এই উপলক্ষ তাঁকে সাহিত্যতত্ত্ব-বিশ্লেষণে প্রবৃত্ত করেছে, এমন অনুমান অযথার্থ নয়। এবং অন্যান্য অনেক ক্ষেত্রে যেমন হয়েছে, এখানেও তেমনই একটি প্রবন্ধ লিখে ফেলার পর তিনি বক্তব্যটিকে সমগ্রভাবে প্রকাশ করার তাগিদে যথাক্রমে ‘সাহিত্যের সামগ্রী’ [বঙ্গদর্শন, কার্তিক] ও ‘সাহিত্যের তাৎপর্য’ [ঐ অগ্র°] প্রবন্ধ-দুটি রচনা করেন। লক্ষণীয়, ‘সাহিত্য’ গ্রন্থে সংকলনের সময়ে তিনি তিনটি প্রবন্ধের ক্রম উল্‌টে দিয়েছেন অর্থাৎ প্রবন্ধগুলি রচনার সময়ে সেগুলি বিষয়ানুক্রমে রচিত হয়নি—একটি ভাবনার সূত্রে আর-একটি ভাবনার আবির্ভাব ঘটেছে—গ্রন্থাকারে প্রকাশের সময়ে তার পারম্পর্যটি বিন্যস্ত হয়। এই তিনটি প্রবন্ধের মধ্য দিয়ে রবীন্দ্রনাথের সমকালীন সাহিত্যবোধটি তত্ত্বের আকারে প্রকাশিত হয়েছে।

রেণুকাকে নিয়ে কলকাতায় আসার পর রবীন্দ্রনাথ প্রধানত গৃহেই আবদ্ধ ছিলেন। ২২ ভাদ্র Electric চিকিৎসার জন্য ক্যালকাটা স্যানাটোরিয়াম যাওয়া ছাড়া ২৫ ভাদ্র [শুক্র 11 Sep] তিনি পটলডাঙায় যাতায়াত করেন। রেণুকার মত্যু হয় ২৮ ভাদ্র, এরপর ৩০ ভাদ্র তিনি মেছুয়াবাজার যান সম্ভবত মোহিতচন্দ্র সেনের সঙ্গে সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে। ২ আশ্বিনও তিনি ‘মহিত বাবুর বাটী’ যান, ৩ আশ্বিন ‘মহিতবাবুর যাইবার’ হিসাব থেকে বোঝা যায় মোহিতচন্দ্রই তাঁর কাছে এসেছিলেন। কাব্যগ্রন্থ ও বিদ্যালয় এই উভয় ব্যাপারেই তখন তিনি মোহিতচন্দ্রের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত—হয়তো সেই কারণেই এই ঘন ঘন যাতায়াত।

বন্ধুত্ব ও বিদ্যালয়ের সূত্রে তখন তিনি জগদীশচন্দ্রের সঙ্গেও যুক্ত। তাই তিনি পার্শিবাগানেও যাতায়াত করেছেন ১, ৩ ও ৪ আশ্বিন। ১ আশ্বিন [শুক্র 18 Sep] সিটি কলেজে ড প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এম. এম. বসু হোমিয়োপ্যাথিক মেডিক্যাল কলেজের পুরস্কার-বিতরণী সভায় জগদীশচন্দ্র ‘The Action of drugs on plants and metal’ বিষয়ে বক্তৃতা করেন,[৫৯] রবীন্দ্রনাথ হয়তো এই সভায় উপস্থিত ছিলেন।

আখ্যাপত্রে মুদ্রিত তারিখ অনুযায়ী কাব্যগ্রন্থ সপ্তম ভাগ ‘শিশু’ নামে প্রকাশিত হয় ২ আশ্বিন [শনি 19 Sep]। বড়ো অক্ষরে শিশু বা কিশোরের উপহার দেওয়ার উপযোগী করে গ্রন্থটি মুদ্রিত হয়।

এই ২ আশ্বিনেই রবীন্দ্রনাথের ক্যাশবহিতে এই হিসাবটি দেখা যায় : ‘মা° হিতবাদী আপিষ দং উক্ত পত্রিকায় উপহার দিবার জন্য পুস্তক ছাপিবার অনুমতী দেওয়ার জন্য মূল্য পাওয়া যায় ১৫০০’। তখনকার দিনে অনেক পত্রিকা বার্ষিক গ্রাহক সংগ্রহের জন্য সাহিত্য বা ধর্মীয় গ্রন্থ বিনামূল্যে বা হ্রাসমূল্যে বিতরণ করত। বিদ্যালয়ের জন্য অর্থসংগ্রহের তাগিদে হিতবাদী-র ধনী কর্তৃপক্ষের কাছে রবীন্দ্রনাথকে আত্মসমর্পণ করতে হয়। গল্প, নাটক, উপন্যাস, গান, প্রবন্ধ ইত্যাদি মিলিয়ে ১২৯০ পৃষ্ঠার এই বিশাল গ্রন্থটি ‘রবীন্দ্র গ্রন্থাবলী’ নামে 29 Aug 1904 [সোম ১৩ ভাদ্র ১৩১১] তারিখে প্রকাশিত হয়। গ্রন্থটি দশ হাজার কপি মুদ্রিত হয়েছিল।

রেণুকার সংকটাপন্ন অবস্থার খবর পেয়ে রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতন থেকে কলকাতা যাত্রা করেন ৬ আষাঢ় [রবি 21 Jun] তারিখে, দীর্ঘ তিন মাস পরে তিনি আবার শান্তিনিকেতনে এলেন ৪ আশ্বিন [সোম 21 Sep] —'রবীন্দ্রবাবু মহাশয় দিগের ৪ আশ্বিন শান্তিনিকেতন গমন...৩৯৷৷লে৯' হিসাব থেকে মনে হয় মোহিতচন্দ্র প্রমুখ কেউ কেউ তাঁর সঙ্গে গিয়েছিলেন। এর পূর্বদিন ৩ আশ্বিন ছিল মহালয়া, সুতরাং পূজার ছুটির আগে ছাত্র-শিক্ষকদের সঙ্গে দেখা করাই ছিল এই যাত্রার উদ্দেশ্য। তাই ৬ আশ্বিনেই [বুধ 23 Sep] তিনি কলকাতায় ফিরে আসেন। এই দিনই তিনি কর্নওয়ালিশ স্ট্রীটে যান। কিন্তু এর পর কয়েকদিন তাঁর গতিবিধির কোনো বিবরণ পাওয়া যায়নি।

বাঙালির ভীরুতা অপবাদ দূর করার জন্য গত বৎসর সরলা দেবী মহাষ্টমীর দিনে বীরাষ্টমী উৎসবের সূচনা করেছিলেন, একথা আমরা আগেই বলেছি। মহারাষ্ট্রের শিবাজী উৎসবের অনুকরণে জাতীয় বীরপূজা প্রবর্তনের জন্য তিনি বর্তমান বৎসর বৈশাখী পূর্ণিমার দিনে [২৭ বৈশাখ রবি 10 May] প্রতাপাদিত্য উৎসব করেন, ৩ আশ্বিন [রবি 20 Sep] করেন উদয়াদিত্য উৎসব। কলকাতার বাইরে থাকার জন্য এই তিনটি উৎসবে রবীন্দ্রনাথ উপস্থিত ছিলেন না। কিন্তু ১২ আশ্বিন [মঙ্গল 29 Sep] মহাষ্টমীর দিনে ২৬ বালিগঞ্জ সার্কুলার রোডে জানকীনাথ ঘোষালের বাড়িতে যে বীরাষ্টমী উৎসব হয়, রবীন্দ্রনাথ তাতে সক্রিয়ভাবে যোগ দেন। *The Bengalee* পত্রিকায় [26 Sep] যে অনুষ্ঠানসূচী মুদ্রিত হয়, তাতে তৃতীয় এবং দ্বাদশ বা সমাপ্তি অনুষ্ঠানটি ছিল : 'Hymn by Babu Ravindra Nath Tagore'। লাঠিখেলা, ছোরাখেলা, তরবারি-চালনা, ব্যায়াম-প্রদর্শন প্রভৃতি বিভিন্ন উপকরণে অনুষ্ঠানটি আকর্ষণীয় হয়েছিল।

১৭ আশ্বিন [রবি 4 Oct] 'বাবু মহাশয়ের নিকট শান্তিনিকেতন পত্র পাঠান টিকিট'-এর হিসাব থেকে জানা যায়, রবীন্দ্রনাথ এর পরেই সেখানে চলে গেছেন। বন্ধু শ্রীশচন্দ্র মজুমদারও সেখানে গিয়েছিলেন। তাঁর দুটি পুত্র সন্তোষচন্দ্র ও সরোজচন্দ্র [ভোলা] ইতিপূর্বেই ছাত্ররূপে ব্রহ্মচর্যাশ্রমে প্রেরিত হয়েছিলেন, শ্রীশচন্দ্রের এইটিই প্রথম শান্তিনিকেতন সফর। খবরটি জানিয়ে ১৯ আশ্বিন [মঙ্গল 6 Oct] রবীন্দ্রনাথ দীনেশচন্দ্র সেনকে লেখেন : 'শ্রীশবাবু আসিয়াছিলেন। নহিলে এতদিনে আপনার প্রশ্নের উত্তর পৌঁছিত। যাহা হউক, আপনি আসিয়া পড়ুন—দ্বিধামাত্র করিবেন না। দুর্য্যোগ চলিতেছে। সঙ্গে সূর্য্যালোক আনিবার চেষ্টা করিবেন।'[৬০] দীনেশচন্দ্র আষাঢ় ১৩১০-সংখ্যা থেকে বঙ্গদর্শন-এ রামায়ণের চরিতাবলী নিয়ে প্রবন্ধ লিখছিলেন। প্রকাশিত ও অপ্রকাশিত প্রবন্ধগুলি রবীন্দ্রনাথকে দিয়ে তিনি তাঁর অভিমত চেয়েছিলেন, প্রকাশিতব্য 'রামায়ণী কথা' গ্রন্থের জন্য তাঁর লেখা একটি ভূমিকাও প্রার্থিত ছিল। ২৮ আশ্বিন [বৃহ 15 Oct] তাঁর অভিমত জানিয়ে রবীন্দ্রনাথ লেখেন : 'আপনার লেখাগুলি ভাল করিয়া পড়িয়া আমার পেন্সিলে লেখা মন্তব্যসহ আপনার কাছে পাঠাইয়া দিয়াছি। আজ দ্বিপেন্দ্রনাথ কলিকাতায় গেলেন তাঁহারই হাতে দিলাম...। লক্ষ্মণ ভরত কৌশল্যা, প্রবন্ধগুলির মধ্যে সর্ব্বোত্তম হইয়াছে। [তাহার] পরে যথাক্রমে সীতা ও [রাম] এবং দশরথ ক্লাসের মধ্যে [সর্ব্ব] নিম্নে।'[৬১] এর পর আরও সূক্ষ্ম আলোচনা করে শেষে লেখেন : 'একটু সময় পাইলেই আমি ভূমিকা লেখায় প্রবৃত্ত হইব।' দীনেশচন্দ্র এই চিঠি থেকেই কিছু অংশ উদ্ধৃত করার ইচ্ছা প্রকাশ করলে ২ কার্তিকের [সোম 19 Oct] পত্রে রবীন্দ্রনাথ সেই অনুমতি প্রদান করেন। ভূমিকাটি লেখা শেষ হয় ৫ পৌষ [রবি 20 Dec] শান্তিনিকেতনে, পরে রচনাটি প্রাচীন সাহিত্য [দ্র ৫।৫০১-০৭] গ্রন্থে সংকলিত হয়েছে।

শান্তিনিকেতনে পূজাবকাশ যাপনের বর্ণনা দিয়ে তিনি মোহিতচন্দ্রকে ২১ আশ্বিন [বৃহ ৪ Oct] লিখছেন : 'আমি বিশ্রাম করিতেছি। বেশি কিছু কাজ নাই—ভিতরের ষ্টীম বন্ধ করিয়া দিয়াছি—কলম আর চলিতেছে না—এক ঘণ্টা ছেলেদের পড়াই তার পরে পড়ি, চুপচাপ করিয়া থাকি, গল্পস্বল্পও করি—এর রকম করিয়া কাটিয়া যায়। কিন্তু শরীরটাকে এখনো ভাঁটার লাইনের উপরে টানিয়া তুলিতে পারি নাই—তাই ঠিক করিয়াছি ইস্কুল খুলিলে পর মাসখানেক বিদ্যালয়ের সমস্ত বন্দোবস্ত পাকা করিয়া দিয়া অগ্রহায়ণের আরম্ভে একবার পদ্মার হস্তে আমার শুশ্রূষার ভার সমর্পণ করিব।'[৬২] এই সময়ে তিনি Tolstoy-এর *A Confession* [1879] বইটি পড়ছেন, তাঁর মতে : 'অনেক কথা চিন্তা করিবার আছে—শাস্ত্রগ্রন্থের চেয়ে জীবনগ্রন্থ হইতে বেশি আলো পাওয়া যায়।'

রবীন্দ্রনাথের নিজের ভাবজীবনও তখন পরিবর্তনের মুখে। স্ত্রী ও কন্যার অকালমৃত্যু, নিজের স্বাস্থ্যের অবনতি, বিদ্যালয়-সংক্রান্ত উদ্বেগ-আশঙ্কা প্রভৃতি তাঁকে আরও অন্তর্মুখী করে তুলছিল। সেই কথাই লিখেছেন মোহিতচন্দ্রকে : 'আমার মনের মধ্যে সমস্ত জিনিসটা আস্তে আস্তে অগ্রসর হইতেছে—জোয়ারের জলের মত আমার চিত্তকে এক এক ধাপ ডুবাইয়া দিতেছে এবং জোয়ারের জলের মত আমার মধ্যে মহাসমুদ্রের অভিঘাত আনিয়া দিতেছে। আমি অনেক কথা আভাসে যেন বুঝিতে পারিতেছি, সে সব কথা আপনার সঙ্গে আলোচনা করিবার জন্য উৎসুক হইয়া আছি। আপনার বন্ধুত্ব আমার অধ্যাত্ম পথের সহায় হইয়া উঠিবে এই আশা প্রবল হইয়াছে।'

স্বল্পকালীন পূজাবকাশের পর বিদ্যালয় আবার খোলে ২৫ আশ্বিন [সোম 12 Oct]। জগদীশচন্দ্রের পত্নী অবলা বসু স্বাস্থ্যোদ্ধারের জন্য তাঁকে দার্জিলিঙে আসার আহ্বান জানিয়েছিলেন। প্রত্যুত্তরে এইদিনই তিনি লেখেন : 'বিদ্যালয় আজ খুলিয়াছে। আমার কাজ আরম্ভ হইল। এ কয়দিন ছুটির সময় কয়েকটি ছেলে ছিল—তাহাদিগকে অল্পস্বল্প পড়াইতেছিলাম—আজ এখানকার শূন্যতা অনেকটা পূর্ণ হইয়া আসিয়াছে। এখন হইতে এই কাজের মধ্যেই আমার বিশ্রাম—এই কাজের মধ্যেই আমার শরীর মনের চিকিৎসা।'[৬৩] এই পত্রেই অরবিন্দমোহনের পড়াশুনা সম্পর্কে তাঁকে আশ্বস্ত করে তিনি লিখেছেন যে, জবরদস্তি করে তিনি দিল্লির হেডমাস্টার পদ থেকে সুবোধচন্দ্র মজুমদারকে আবার বিদ্যালয়ে ফিরিয়ে এনেছেন : 'সুবোধ ইংরাজি ভাল পড়াইত'।

রবীন্দ্রনাথ অবলা বসুকে লিখেছিলেন : 'আমার অবর্ত্তমানে বিদ্যালয়ের যে যে অংশ বিকল হইয়া গিয়াছিল—সেই সমস্ত অংশ আমাকে সংস্কার করিতে হইবে। অধ্যাপক ও ছাত্রদের অন্তরের মধ্যে ভস্ম হইতে আগুনকে জাগাইয়া তুলিতে হইবে—সমস্ত উজ্জ্বল ও সজীব করিতে হইবে। এই সকল কাজের কথা স্মরণ করিলে আমার দুর্ব্বলতা চলিয়া যায়। আমার কাজ অসম্পন্ন থাকিবে না—আমি রণে ভঙ্গ দিব না।' এই সংকল্প নিয়ে তিনি কাজে হাত দিলেন। তাঁর অনুপস্থিতিতে হেডমাস্টার নগেন্দ্রনারায়ণ রায়, বিপিনবিহারী দাসগুপ্ত, গোপালচন্দ্র কবিকুসুম ও ভবেন্দ্রবাবু শিক্ষকরূপে নিয়োজিত হয়েছিলেন। এইবারই প্রথম তিনি তাঁদের কার্যক্ষমতা পর্যালোচনার সুযোগ পেলেন। সকলের কাজে তিনি যে সন্তুষ্ট হননি মোহিতচন্দ্রকে লেখা ১৮ কার্তিকের [বুধ 4 Nov] পত্রই তার প্রমাণ :

গোপালবাবুকে বিদায়পত্র দিয়েছি। তাঁর জায়গায় একটি ড্রয়িং ও সংস্কৃত জানা লোক সন্ধান করে দেখবেন কি? ১৫ টাকা বেতন ও বাসাহার অনেকের পক্ষে লোভনীয় হবে। বিজ্ঞাপন দিয়ে কোন সুবিধে দেখি নে। ভবেন্দ্র বাবু ও গোপালবাবু এই দুটি বিজ্ঞাপনের লোক একেবারেই

অযোগ্য। নিশিকান্ত এলে ভবেন্দ্র বাবুকে বিদায় করে দিতে হবে—আপনি একবার অজিতকে ডেকে জিজ্ঞাসা করবেন নিশিকান্ত কি তাঁর পরীক্ষার পরে নিশ্চয় আস্‌তে পারবেন?[৬৪]

অজিতকুমার চক্রবর্তী ও সতীশচন্দ্র রায়ের বন্ধু নিশিকান্ত সেনকে বিদ্যালয়ে পাবার জন্য রবীন্দ্রনাথ আগ্রহী ছিলেন, কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের এই উজ্জ্বল ছাত্রকে স্বল্পবেতনে নিয়োগ করতে তাঁর দ্বিধাও ছিল। সেইজন্য ২৮ অগ্র° [সোম 14 Dec] শিলাইদহ থেকে তিনি সতীশচন্দ্রকে লিখেছেন :

মাঝে মাঝে এক এক দিন প্রত্যুষে নিদ্রাভঙ্গ হইয়াই নিশিকান্তবাবুর চিন্তা আমার মনে উঠে। আমার আশঙ্কা হইতেছে আমি তাঁহার সম্বন্ধে অত্যন্ত গুরুতর দায়িত্ব গ্রহণ করিতেছি। অজিতের কাছে শুনিয়াছি আত্মীয়দের কাছ হইতে তিনি বিশেষ আঘাত পাইতেছেন। তাঁহার কর্মক্ষেত্র অপেক্ষাকৃত অবাধ, তাঁহার উন্নতির পথ অনেকের চেয়ে সহজ—এমন অবস্থায় তিনি সমস্ত পরিত্যাগ করিয়া আমার বিদ্যালয়ের কাজ গ্রহণ করিতে প্রস্তুত হওয়াতে আমি প্রায়ই অন্তরের মধ্যে একটা উৎকণ্ঠা অনুভব করি। তোমার জন্য আমি ভাবি না—প্রথম হইতেই আপনিই তুমি আমার নিকট আসিয়া পড়িয়াছ—তোমাকে আমি নিরুদ্বেগে অনায়াসে গ্রহণ করিয়াছি। কিন্তু নিশিকান্তবাবুকে আমি তেমন করিয়া জানি না—তিনি আমার আদর্শ জানেন না আমিও তাঁহার আদর্শ জানি না। তুমি আমাকে যাহা দিয়াছ তাহা উৎসর্গ করিয়াছ সেজন্য আমি তোমার কাছে ঋণী নহি—কিন্তু তিনি আমাকে যাহা দিবেন তাহা আমার পক্ষে দান প্রতিগ্রহণ।...বিদ্যালয়ের শিশু অবস্থা—তাহার নিজের বল কিছুই নাই—তোমরাই তাহাকে আশ্রয় দিবে—তোমাদিগকে সে আশ্রয় দিতে পারিবে না—আমার যৌবনের তেজ ও স্বাস্থ্য নাই—অকালে আমার মৃত্যু হওয়াও অসম্ভব নহে;—সমস্ত বিঘ্ন ব্যাঘাত অসম্পূর্ণতা দীনতা আদ্যোপান্ত মনের মধ্যে আলোচনা করিয়া দেখিতে আমি তোমাদের অনুরোধ করি।[৬৫]

নিশিকান্ত সেন শেষ পর্যন্ত বিদ্যালয়ের কাজে যোগ দেননি—কিন্তু আজীবন রবীন্দ্রনাথের প্রতি অনুরক্ত ছিলেন—দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার হিসেবে তিনি বিশ্বভারতী-পর্বে অনেক সহায়তা করেছিলেন।

নিছক ত্যাগের আদর্শে অটল থাকা সতীশচন্দ্রের পক্ষেও সম্ভব হচ্ছিল না, অজিতকুমারকে লেখা কয়েকটি তারিখহীন পত্র থেকে তা প্রতীয়মান হয়। রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, সতীশচন্দ্র বেতন প্রত্যাখ্যান করেছিলেন, কিন্তু সতীশচন্দ্র লিখছেন : 'I do not know if all our teachers are going to be paid a month's salary in advance or no'।[৬৬] বি. এ. পরীক্ষা দেওয়ার কথাও তিনি ভাবছিলেন : 'Will it be possible for me to go in the B. A? Rs. 60/- or 70/-?—but that's a big sum. Who will help me through that?—I am so poor. Let me get up my books however and watch the course of things.'[৬৭] এই বিষয়েই আর একটি পত্র : 'আমি কি এখান হইতে as a teacher পরীক্ষা দিতে পারিব? Fees কতদিন পূর্ব্বে পাঠাইতে হয়? আমি Prose বইগুলি পাইব কি প্রকারে? তুমি যদি C[h]ristmasএ এসো তবে বোধহয় ১০।১৫ দিনে দুটা তিনটা বই পড়া যাইতে পারে। Honours না দেওয়াই একরকম সিদ্ধান্ত করিয়াছি তবে যদি Pass বইগুলি সারিয়া সময় পাই ত দেখিব। বি,এ তৈয়ার করিতে আমার কষ্ট হইতেছে—তবু ছাড়িব না।'[৬৮] আর একটি পত্রে [? পৌষ ১৩১০] তিনি লিখেছেন : 'এখানে সবই ভাল তবু আমার মনটা আজকাল ভাল লাগেনা। এখানে কাহারো সঙ্গে ঠিক গভীর প্রাণের মিল হয় নাই তাই—একা একা থাকিতে হয় বোলপুরের মাঠে বেড়াইয়া বেড়াই।...বাস্তবিক genialityর অভাবে (অবশ্য রবিবাবুর স্নেহ অজস্র—কিন্তু তিনি আজকাল উৎসব নিয়া ব্যস্ত থাকেন)—আজকাল আমার বুকের চারিদিকে যেন সব চাপা পড়িয়া আছে—...আর রবি বাবুর সঙ্গে আলাপ হয় তখনো ভাল লাগে কিন্তু আজকাল তাঁহাকে আমি ঠিক গ্রেপ্তার করিতে পারি না।'[৬৯] —এইটিই ছিল একটি বড়ো সমস্যা—ব্রহ্মচর্যাশ্রম ও বিশ্বভারতীর বিভিন্ন পর্বে আদর্শবাদী বহু নরনারী বরীন্দ্রনাথের সান্নিধ্যকামনায় তাঁর কাজের সঙ্গে নিজেদের যুক্ত করেছেন ও সেই দিক দিয়ে ক্ষোভের কারণ

ঘটলেই শান্তিনিকেতন ত্যাগ করেছেন। অকালমৃত্যু না ঘটলে সতীশচন্দ্রও যে বিদ্যালয় ত্যাগ করতেন না একথা জোর করে বলা শক্ত।

আর্থিক অনটন জন্মলগ্ন থেকেই বিদ্যালয়ের সঙ্গী। ২ কার্তিক [সোম 19 Oct] রবীন্দ্রনাথ দীনেশচন্দ্রকে লেখেন : 'বিদ্যালয়ের আয়ব্যয় লইয়া হাবুডুবু খাইতেছি। অম্বুবাহ মেঘের জন্য চাতকের ন্যায় শুষ্ককণ্ঠ বিদ্যালয় আর কয়েকজন বেতনবর্ষী ছাত্রের জন্য প্রতীক্ষা করিয়া আছে।'[৭০] কেশবচন্দ্র সেনের পরিবারের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতার সুযোগে সুচারু দেবীর স্বামী ময়ূরভঞ্জের মহারাজা রামচন্দ্র ভঞ্জদেবের সঙ্গে তাঁর একটি যোগসূত্র গড়ে উঠেছিল। এই প্রসঙ্গে ১৮ কার্তিক [বুধ 4 Nov] তিনি মোহিতচন্দ্র সেনকে লিখেছেন : 'ময়ূরভঞ্জকে একবার আক্রমণ করব। ভয় হয় পাছে তাঁর সাহায্য দ্বারা আমাদের কাজ আচ্ছন্ন হয়ে যায়। বিদ্যালয়কে কোনমতেই পরাধীন হতে দিলে কল্যাণ হবে না—তা হলেই সে দুর্ব্বল হয়ে অধ্যাত্মপথভ্রষ্ট হয়ে পড়বে।... আমি শান্তিনিকেতনের জাল থেকে বিদ্যালয়কে মুক্ত করে রাজ-ইচ্ছা ও রাজৈশ্বর্য্যের জালে যদি তাকে জড়িত করি তাহলে কি তপ্ত কটাহ হতে জ্বলন্ত চুল্লিতে পড়া হবে না?'[৭১] শান্তিনিকেতন আশ্রমের আওতা থেকে অন্য কোথাও বিদ্যালয় সরিয়ে নিয়ে যাওয়ার কথা রবীন্দ্রনাথ ভাবছিলেন সেকথা আমরা পূর্ব্বেই বলেছি। এই চিঠিতেও লিখছেন : 'যদি আপনার কোন বন্ধু কোন সুবিধামত জায়গার সন্ধান জানেন হয় তাহলে খবর নেবেন। নানাদিকে দৃষ্টি না রাখ্‌লে কৃতকার্য্য হওয়া যাবে না। জগদীশকেও একবার জিজ্ঞাসা করে দেখবেন।'

জগদীশচন্দ্র দার্জিলিং থেকে ফিরে ২৭ কার্তিক [শুক্র 13 Nov] শান্তিনিকেতনে আসেন। রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে তিনি ৩০ কার্তিক [সোম 16 Nov] কলকাতায় প্রত্যাবর্তন করেন।

কার্তিক-সংখ্যা বঙ্গদর্শন [৩।৭] প্রকাশিত হয় 25 Oct [রবি ৮ কার্তিক]। এই সংখ্যায় রবীন্দ্রনাথের দুটি রচনা মুদ্রিত হয় :

৩০৩-১২ 'নৌকাডুবি' ১৯-২০ দ্র নৌকাডুবি ৫।২১০-১৯ [১৭-১৮]

৩১৭-২২ 'সাহিত্যের সামগ্রী' দ্র সাহিত্য ৮।৩৪৩-৪৮

এই সংখ্যায় মুদ্রিত নৌকাডুবি-র পরিচ্ছেদ-সংখ্যা হওয়া উচিত ছিল ১৮-১৯, কিন্তু ভ্রমক্রমে ১৯-২০ ছাপা হয়—এই ভুল পরবর্তী সংখ্যাগুলিতেও সংশোধিত হয়নি।

রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যতত্ত্ব-বিষয়ক সমকালীন প্রথম প্রবন্ধ 'সাহিত্য সমালোচনা' ['সাহিত্যের বিচারক'] প্রকাশিত হয়েছিল আশ্বিন-সংখ্যায়, বর্তমান প্রবন্ধটি তার দ্বিতীয় কিস্তি।

সঙ্গীত-প্রকাশিকা, কার্তিক ১৩১০ [৩।২];

৩৫-৩৬ বেহাগ-কাওয়ালি। তোমার অসীমে প্রাণ মন লয়ে দ্র স্বর ৪

স্বরলিপিকার কাঙালীচরণ সেন।

৩০ কার্তিক [সোম 16 Nov] রবীন্দ্রনাথ জগদীশচন্দ্রের সহযাত্রী হয়ে কলকাতায় আসেন। এইদিনই তিনি পার্শিবাগান ও কর্নওয়ালিশ স্ট্রীটে যাতায়াত করেন। ১ অগ্র° [মঙ্গল 17 Nov] তিনি ঠনঠনিয়ায় মোহিনীমোহন চট্টোপাধ্যায়ের বাড়ি যান, পরের দিন যান পার্শিবাগানে ও হেদুয়ায়। এর পরে রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনে ফিরে যান কিনা সে বিষয়ে আমরা নিশ্চিত নই—তাঁর নিজস্ব ক্যাশবহিতে ১০ অগ্র° [বৃহ 26

Nov] পিপুলপটী ও ১৪ অগ্র° [সোম 30 Nov] 'জগদীশবাবুর বাটী' যাতায়াতের হিসাব পাওয়া যায়, কিন্তু মধ্যবর্তী দিনগুলিতে তাঁর গতিবিধির কোনো খবর নেই। 30 Nov তাঁর জগদীশচন্দ্রের বাড়ি যাওয়ার আনুষ্ঠানিক কারণ থাকতে পারে—এইদিন জগদীশচন্দ্রের ৪৬তম জন্মদিবস।

সম্ভবত এর পরেই রবীন্দ্রনাথ শিলাইদহ রওনা হন। ২১ অগ্র° [সোম 7 Dec] তিনি সেখান থেকে প্রিয়নাথ সেনকে লিখেছেন : 'কলিকাতায় পা দিলেই এমনি একটি গোলমালের মধ্যে পড়িতে হয় যে মনে যা থাকে তা কিছুই করিয়া উঠিতে পাই না। শেষ কালে সময় ফুরাইয়া যায়। কিছুদিন অজ্ঞাতবাসের জন্য মনটা উৎসুক আছে—তাই সমস্ত কর্ম্মের জাল কাটিয়া পদ্মায় ভাসিয়া পড়িয়াছি। কিছুকালের মত ডাকঘরের হাত এড়াইয়া একেবারে নিরুদ্দেশ হইবার ইচ্ছা আছে।...৭ই পৌষে শান্তিনিকেতনের উৎসবে যোগ দিতে পিতৃদেব আদেশ করিয়াছেন অতএব সেই সময়টাতে একবার ফিরিব। হয় ত ৫ই কিম্বা ৬ই প্রাতে কলিকাতায় যাইতে হইবে।'[৭২] ২২ অগ্র° বিজয়চন্দ্র মজুমদারকেও লিখেছেন : 'আবার আমি পলাতক। সম্প্রতি আমি পদ্মানদীর উপর বোটে। বিশ্রাম এবং স্বাস্থ্যের প্রত্যাশায় আসিয়াছি।' বিজয়চন্দ্র তাঁর ঐতিহাসিক প্রবন্ধ 'কৃষ্ণলীলা' পাঠিয়েছেন জেনে তিনি লিখেছেন : 'সম্প্রতি এই পল্লীগ্রামে একটি উৎসবে কীর্ত্তনকারীর মুখে গোষ্ঠীলীলা কীর্ত্তন শুনিয়া আমিও কৃষ্ণলীলার ঐতিহাসিক রহস্য মনে মনে আলোচনা করিতেছিলাম।'[৭৩] এরপর তিনি বৌদ্ধোত্তর যুগে অনার্যদেবতা শিব কালী ও কৃষ্ণের আর্যত্বলাভের রহস্য ব্যাখ্যা করেছেন। ব্যাখ্যাটি ইঙ্গিতমাত্রে পর্যবসিত, কিন্তু ভারতের ধর্ম-বিবর্তনের ইতিহাসে ইঙ্গিতগুলি মূল্যবান। শিলাইদহের যে কীর্তনিয়ার কথা তিনি উল্লেখ করেছেন, সেই শিবু কীর্তনিয়াকে তিনি কিছুকাল পরে জোড়াসাঁকোয় এনে গগনেন্দ্রনাথদের বাড়িতে গান গাইয়েছিলেন।

রবীন্দ্রনাথ ডাকঘরের হাত এড়িয়ে নিরুদ্দেশ হবার ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন ২১ অগ্রহায়ণের পত্রে, কিন্তু ২৪ অগ্র° [বৃহ 10 Dec] তাঁকে কলকাতায় পার্ক স্ট্রীট, বালিগঞ্জ, কর্নওয়ালিশ স্ট্রীট ও পার্শিবাগানে ঘোরাঘুরি করতে দেখা যায়। পরের দিনও তিনি পার্ক স্ট্রীট, পটলডাঙা ও 'সন্ধ্যার সময় পার্শীবাগান' যান। এই দিন রাত্রেই তিনি শিলাইদহ রওনা হন। তাঁর এই আকস্মিক ছুটোছুটির কারণটি জানা যায় সরকারী ক্যাশবহির হিসাব থেকে : 'শ্রীযুক্ত রবীন্দ্র বাবু মহাশয় ত্রিপুরার মহারাজার টেলিগ্রাম পাইয়া সিলাইদহ হইতে কলিকাতায় আসিয়া পুনরায় গমন করেন তাহার ব্যায় ২৫ অগ্রহায়ণের ২৫৲'। ত্রিপুরার মধ্যম রাজকুমার ব্রজেন্দ্রকিশোরের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের পত্রালাপের নিদর্শন থাকলেও ২৪ শ্রাবণ ১৩০৯ [9 Aug 1902]-এর পর রাধাকিশোর মাণিক্যের সঙ্গে তাঁর পত্রবিনিময় বা সাক্ষাৎকারের কোনো বিবরণ পাওয়া যায় না। স্ত্রী ও কন্যার অসুস্থতা ও মৃত্যু নিয়ে রবীন্দ্রনাথ এই সময়কালে যথেষ্ট বিব্রত, তারই মধ্যে আলমোরা থেকে তিনি মহারাজকে একজোড়া চমরীপুচ্ছ পাঠান। দীর্ঘকাল পরে ২৪ ও ২৫ অগ্র° উভয়ের সাক্ষাৎ ঘটল।

কাব্য-গ্রন্থ প্রকাশ নিয়ে রবীন্দ্রনাথের উদ্বেগ ও বিরক্তি তাঁর অনেক পত্রে ব্যক্ত। এই সময়ে এর অনেকগুলি খণ্ড প্রকাশিত হল। বেঙ্গল লাইব্রেরির ক্যাটালগ থেকে জানা যায় 10 Dec [বৃহ ২৪ অগ্র°] গ্রন্থটির প্রথম ভাগের প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড এবং 12 Dec [শনি ২৫ অগ্র°] নবম ভাগের প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশিত হয়। খণ্ডগুলির আখ্যাপত্র ও অন্যান্য বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হল :

কাব্যগ্রন্থ।/প্রথম ভাগ।/প্রথম খণ্ড/শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।/শ্রীমোহিতচন্দ্র সেন এম্, এ,/সম্পাদক। আখ্যাপত্রের পিছনের পৃষ্ঠায় :

প্রকাশক—এস্, সি, মজুমদার।/২০ নং কর্ণওয়ালিস্ স্ট্রীট্, কলিকাতা,/মজুমদার লাইব্রেরী।/কলিকাতা,—২৫ নং রায়বাগান স্ট্রীট্,/ভারতমিহির যন্ত্রে,/সান্যাল এণ্ড কোম্পানি দ্বারা মুদ্রিত।/১৩১০ সন।

'শিশু' ব্যতীত অন্যান্য সমস্ত ভাগগুলিতে মুদ্রাকরের বিবরণ ছাড়া আখ্যাপত্রগুলি একই ধরনের, সুতরাং সেগুলির ক্ষেত্রে কেবল সেই বিবরণটুকুই সংকলিত হবে। প্রথম ভাগ দ্বিতীয় খণ্ডটি উপরোক্ত প্রেসেই মুদ্রিত। দুটি খণ্ডের পৃষ্ঠাসংখ্যা ধারাবাহিক। মুদ্রণসংখ্যা : ১১০০।

প্রথম ভাগ। প্রথম খণ্ড। পৃষ্ঠাসংখ্যা : ২ + ১৫ [ভূমিকা : মোহিতচন্দ্র সেন] + ৪ [সূচী] + ১১৯ + ৩ [বর্ণানুক্রমিক সূচী]। সূচী :

১। যাত্রা। 'কেবল তব মুখের পানে চাহিয়া' [প্রবেশক] ও ২টি কবিতা।

২। হৃদয়ারণ্য। 'কুঁড়ির ভিতরে কাঁদিছে গন্ধ' ও ১২টি কবিতা।

৩। নিষ্ক্রমণ। 'আঁধার আসিতে রজনীর দীপ' ও ৬টি কবিতা।

৪। বিশ্ব। 'আমি চঞ্চল হে' ও ২৪টি কবিতা।

প্রথম ভাগ। দ্বিতীয়খণ্ড। পৃষ্ঠাসংখ্যা : ২ + ৪ [সূচী] + ১৪০ [১২১-২৬০] + ৪ [বর্ণানুক্রমিক সূচী]। সূচী :

৫। সোনার তরী। 'তোমায় চিনি বলে আমি' ও ২২টি কবিতা।

৬। লোকালয়। 'হে রাজন্, তুমি আমারে' ও ৪৫টি কবিতা।

পুলিনবিহারী সেন 'সম্পাদক ও কবি' প্রবন্ধে [দ্র দেশ, সাহিত্য ১৩৭৮। ৫৭-৬৪] মোহিতচন্দ্র সেনের 'ভূমিকা' ও ষষ্ঠ ভাগ পর্যন্ত অধিকাংশ কবিতার বিস্তৃত সূচী সংকলন করেছেন।

কাব্যগ্রন্থ নবম ভাগ 'নাট্য'-এর প্রথম দুটি খণ্ড স্বতন্ত্র প্রেসে ছাপা হলেও পৃষ্ঠাসংখ্যার ধারাবাহিকতা রক্ষা করা হয়েছে।

নাট্য।/নবম ভাগ।/প্রথম খণ্ড/শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।/শ্রীমোহিত চন্দ্র সেন এম্, এ,/সম্পাদক।

...কলিকাতা, ২০ নং কর্নওয়ালিস্ স্ট্রীট্,/দিনময়ী প্রেসে শ্রীঅনুকূলচন্দ্র পারিহাল দ্বারা মুদ্রিত। ১৩১০ সন।

পৃষ্ঠাসংখ্যা : ২ + ২ + ২৫৪; সূচী : সতী, নরকবাস,, গান্ধারীর আবেদন, কর্ণকুন্তী-সংবাদ, বিদায় অভিশাপ, চিত্রাঙ্গদা, লক্ষ্মীর পরীক্ষা।

কাব্য-গ্রন্থ। ৯ম ভাগ।/নাট্য।/২য় খণ্ড।...

...কলিকাতা—৩/৪ গৌরমোহন মুখার্জির স্ট্রীট্,/মেট্‌কাফ্ প্রেসে মুদ্রিত।/১৩১০ সন।

পৃষ্ঠসংখ্যা : ২ + ২ + ২৪৪ [২৫৫-৪৯৮]; সূচী : প্রকৃতির প্রতিশোধ, বিসর্জন, মালিনী।

সমালোচনী পত্রিকার অগ্র° ১৩১০ [২।৮]-সংখ্যায় [পৃ ২৫১] লেখা হয় :

শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের কাব্য-গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে—সুশিক্ষিত ও গভীর চিন্তাশীল সম্পাদক প্রফেসর শ্রীযুক্ত মোহিতচন্দ্র সেন এম. এ. মহাশয় এই কাব্যগ্রন্থের যে উৎকৃষ্ট ভূমিকা লিখিয়াছেন, রবীন্দ্র বাবুর কাব্য বুঝিবার পক্ষে তাহা বিশেষ উপযোগী হইয়াছে। আমরা রবীন্দ্র বাবুর কাব্য-গ্রন্থের শিশুখণ্ড হইতে একটি নূতন কবিতা ও এই ভূমিকা আমাদের সমালোচনীর পাঠক-পাঠিকাদিগকে উপহার দিতেছি।

পাদটীকায় লেখা হয় : 'মূল্য দশটাকা, ২০শে ফাল্গুনের পূর্ব্বে লইলে ৬৷৷০ টাকা। ২০ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট/ মজুমদার লাইব্রেরীতে প্রাপ্তব্য৷৷'

অতঃপর পত্রিকার ২৫১-৫২ পৃষ্ঠায় 'অপযশ' ['বাছারে, তোর চক্ষে কেন জল?' দ্র শিশু ৯।১৪-১৫] মুদ্রিত হয়। পৌষ-সংখ্যাতেও ২৯৯-৩০০ পৃষ্ঠায় 'জন্মকথা' ['খোকা মাকে শুধায় ডেকে' দ্র শিশু ৯।৭-৮] মুদ্রিত হয়েছিল।

অগ্র° ১৩১০-সংখ্যা বঙ্গদর্শন [৩।৮] প্রকাশিত হয় 21 Nov [শনি ৫ অগ্র°]। এই সংখ্যায় রবীন্দ্র-রচনা দুটি:

৩৪৯-৫৮ 'নৌকাডুবি' ২১-২২. দ্র নৌকাডুবি ৫।২১৯-২৯ [১৯-২০]

৩৫৮-৬২ 'সাহিত্যের তাৎপর্য্য' দ্র সাহিত্য। ৮।৩৩৯-৪২

এইটি রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যতত্ত্ব-মূলক সমকালীন তৃতীয় প্রবন্ধ। আমরা আগেই বলেছি, সাহিত্য [১৩১৪] গ্রন্থে সংকলিত হওয়ার সময়ে এইটিকেই প্রথমে স্থান দেওয়া হয়। প্রবন্ধটির অনেক অংশ বর্জন করা হয়েছে।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, অগ্র° ১৮২৫ শক [৭২৪ সংখ্যা] :

30-31 'The God of Upanishads'

ঔপনিষদ ব্রহ্ম গ্রন্থের ৫৫শ অনুচ্ছেদের শেষাংশের ['দিনে রাত্রে সুপ্তিতে জাগরণে অন্তরে বাহিরে... আমাতে তাহাই হৌক্! ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ। হরি ওঁ।' দ্র অ-২।২১৯-২০] ইংরেজি অনুবাদ এই সংখ্যায় মুদ্রিত হয়। অনুবাদটি বর্তমান সংখ্যাতেই সমাপ্ত হল।

২৫ অগ্র° [শুক্র 11 Dec] রবীন্দ্রনাথ শিলাইদহ রওনা হন। ২৮ অগ্র° [সোম 14 Dec] তিনি মনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়কে লেখেন : 'আমি নিরুদ্দেশ হইয়া বাহির হইয়া পড়িয়াছিলাম ভাবিয়াছিলাম ডাকঘরের সঙ্গে কোনো সম্পর্কই রাখিব না—কিন্তু ঠিকটি ঘটিয়া উঠিল না—পোষ্ট্ অফিসের হস্তে আত্মসমর্পণ করিতে হইয়াছে।...এখনি বোট ছাড়িয়া দূরে চরে যাইতেছি—তাই তাড়াতাড়ি এই চিঠি লিখিয়া ডাকে দিলাম। ৭ই পৌষে নিরাশ করিব না। আমি সম্ভবত আগামী রবিবার [৫ পৌষ] মেলে বোলপুর যাইব।'[৭৪]

কিন্তু এবারেও তিনি প্রত্যাশা অনুযায়ী পদ্মার সান্নিধ্যে থাকতে পারেননি—'রবীন্দ্র বাবু মহাশয়ের ১ পৌষ শান্তিনিকেতনে যাইবার ব্যায় ১৫্' সরকারী ক্যাশবহির এই হিসাব থেকে ১ পৌষ [বুধ 16 Dec] তাঁর শান্তিনিকেতনে যাওয়ার কথা জানা যায়।

দীনেশচন্দ্র সেনের 'রামায়ণী কথা' গ্রন্থের ভূমিকা লেখার জন্য রবীন্দ্রনাথ প্রতিশ্রুত ছিলেন। সেই প্রতিশ্রুতি পূর্ণ হল ৫ পৌষ [রবি 20 Dec]। রামায়ণ-মহাভারতকে ভারতবর্ষের চিরকালের ইতিহাস বলে আখ্যাত করে তিনি বলেছেন, রামায়ণে ঘরের কথাকে অত্যন্ত বৃহৎ করে দেখিয়ে মহাকাব্যের উপযুক্ত করে তোলা হয়েছে। রাম-রাবণের যুদ্ধ এই মহাকাব্যের বহিরঙ্গ মাত্র, যুদ্ধঘটনাকে উপলক্ষ করে রাম ও সীতার দাম্পত্যপ্রীতিকেই কবি এখানে উজ্জ্বল করে দেখিয়েছেন। 'পিতার প্রতি পুত্রের বশ্যতা, ভ্রাতার জন্য ভ্রাতার আত্মত্যাগ, পতিপত্নীর মধ্যে পরস্পরের প্রতি নিষ্ঠা ও প্রজার প্রতি রাজার কর্তব্য কতদূর পর্যন্ত যাইতে পারে রামায়ণ তাহাই দেখাইয়াছে।...আমাদের দেশে গার্হস্থ্য আশ্রমের যে অত্যন্ত উচ্চস্থান ছিল, এই কাব্য তাহা

সপ্রমাণ করিতেছে। ...গৃহাশ্রম ভারতবর্ষীয় আর্যসমাজের ভিত্তি। রামায়ণ সেই গৃহাশ্রমের কাব্য।...বাহুবল নহে, জিগীষা নহে, রাষ্ট্রগৌরব নহে, শান্তরসাস্পদ গৃহধর্মকেই রামায়ণ করুণার অশ্রুজলে অভিষিক্ত করিয়া তাহাকে সুমহৎ বীর্যের উপর প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে।'

দীনেশচন্দ্রের গ্রন্থ সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে তিনি কাব্য-সমালোচনার আদর্শ সম্বন্ধে নিজস্ব অভিমত ব্যক্ত করেছেন : 'কবিকথাকে ভক্তের ভাষায় আবৃত্তি করিয়া তিনি আপন ভক্তির চরিতার্থতা সাধন করিয়াছেন। এইরূপ পূজার আবেগ-মিশ্রিত ব্যাখ্যাই আমার মতে প্রকৃত সমালোচনা; এই উপায়েই এক হৃদয়ের ভক্তি আর-এক হৃদয়ে সঞ্চারিত হয়।...যথার্থ সমালোচনা পূজা, সমালোচক পূজারি পুরোহিত, তিনি নিজের অথবা সর্বসাধারণের ভক্তিবিগলিত বিস্ময়কে ব্যক্ত করেন মাত্র।' এই শ্রেণীর সমালোচকদের সম্পর্কে তিনি 'সাহিত্য-সমালোচনা' প্রবন্ধে লিখেছিলেন : 'সারস্বতদিগকে অভ্যর্থনা করিয়া লইবার ভার যাঁহাদের উপর আছে তাঁহারাও নিজে সরস্বতীর সন্তান; তাঁহারা ঘরের লোক, ঘরের লোকের মর্যাদা বোঝেন।'

লেখাটি দীনেশচন্দ্রকে তিনি পাঠান কিছুকাল পরে। ২০ পৌষ [সোম 4 Jan] তাঁকে লিখেছেন : 'শরীর অপটু। মনও বিদ্যালয়ের অর্থচিন্তায় উৎকণ্ঠিত। রামায়ণের ভূমিকা যথেষ্ট মনোযোগের সহিত লিখিতে পারি নাই। সে ক্ষমতা এখন নাই। কবে হইবে অপেক্ষা করিয়া থাকিলে আপনার ক্ষতি হইবে। অতএব অসময়ের এই সামান্য উপহারটুকু লইয়া আমাকে স্মরণে রাখিবেন।'[৭৫] দীনেশচন্দ্র লিখেছেন : '"রামায়ণীকথা'র শুধু ভূমিকা নহে, তাহার প্রত্যেকটি চরিত্র সম্বন্ধে এরূপ সকল মন্তব্য লিখিয়াছিলেন, যাহাতে গ্রন্থকার অত্যন্ত উপকৃত এবং উৎসাহিত হইয়াছিলেন।"[৭৬] আমরা আগেই দেখেছি, দীনেশচন্দ্রের রচনা পেনসিলে লেখা মন্তব্য-সহ রবীন্দ্রনাথ ফেরৎ পাঠিয়েছিলেন, তাঁর ২৮ আশ্বিনের পত্রেও মন্তব্য ও ইঙ্গিতের অভাব নেই।

৭ পৌষ [মঙ্গল 22 Dec] মহাসমারোহে শান্তিনিকেতনে ত্রয়োদশ সাম্বৎসরিক ব্রহ্মোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। বিদ্যালয়ের এই বৎসরের ছাত্র সত্যরঞ্জন বসু তাঁর 'আশ্রম-স্মৃতি'তে লিখেছেন :

> সেবারকার ৭ই পৌষ উৎসব আমি প্রথম উপভোগ করি।...অতিথিভাবে সেবার মোহিত সেন মশায়কে দেখি। সেই অন্ধকার থাক্‌তে উঠে স্নানাদি সেরে সকালে আলখাল্লা পরে লাইন বেঁধে ছাতিমতলায় উপাসনায় যোগদান...গুরুদেবের ভাবগম্ভীর মন্ত্রোচ্চারণ ও ব্যাখ্যা...বালককণ্ঠে সঙ্গীতধ্বনি...।
>
> মন্দিরে ঘণ্টাধ্বনির সঙ্গে সঙ্গে আবার সার বেঁধে আমরা চলেছি। গাছের তলায় তলায় শান্তিনিকেতন দোতলা দালানকে পাশ কাটিয়ে মন্দিরে ঢুকবার আগেই বাইরে গুরুদেবকে পেয়ে এক এক করে প্রণাম সেরে ভিতরে আসন গ্রহণ করলাম।...গুরুদেব আসন অলঙ্কৃত করলে মন্দিরের কীর্ত্তনীয়া—সম্ভবতঃ শ্যামবাবু [শ্যামাশরণ ভট্টাচার্য, 1871-1940] নাম—তানপুরা নিয়ে গাইলেন "কর তার নাম গান" সঙ্গীতটি—সঙ্গত বোধহয় খোলে চল্‌ছিল। যথারীতি উপাসনার মন্ত্রোচ্চারণের পর গুরুদেবের উপদেশবাণী। কিছুই মনে নেই ভাষণের বিষয়বস্তু; কিন্তু ৭ই পৌষ উৎসব কেন পালিত হচ্ছে—এর সার্থকতা আশ্রমজীবনের সঙ্গে কিভাবে জড়িত—এসবও বলেছিলেন, মনে হয়।[৭৭]

তত্ত্ববোধিনী-তে প্রকাশিত বিবরণে অবশ্য সকালবেলার অনুষ্ঠানে রবীন্দ্রনাথের কোনো ভূমিকার কথা উল্লেখিত হয়নি।

সন্ধ্যায় 'শ্রদ্ধাস্পদ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর আচার্য্যের আসন গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহার এক পার্শ্বে শ্রীচিন্তামণি চট্টোপাধ্যায়, অপর পার্শ্বে শ্রীশিবধন বিদ্যার্ণব। উপাসনাদি সমাপ্ত হইলে রবীন্দ্রবাবু...উপদেশ দেন'। এই উপদেশটি তত্ত্ববোধিনী-র মাঘ-সংখ্যায় [পৃ ১৫৬-৫৯] মুদ্রিত হয়, কিন্তু কোনো গ্রন্থে সংকলিত হয়নি। এছাড়া তিনি আর একটি ভাষণও দিয়েছিলেন, সেটি 'দিন ও রাত্রি' নামে মাঘ-সংখ্যা বঙ্গদর্শন-এ [পৃ ৫১১-১৭; দ্র ধর্ম ১৩।৩৪১-৪৮] 'গত ৭ই পৌষ বোলপুর শান্তিনিকেতনের সাংবৎসরিক উৎসব উপলক্ষে বঙ্গদর্শন-সম্পাদক-

কর্ত্তৃক পঠিত' পাদটীকা-সহ মুদ্রিত হয়। এই প্রবন্ধটিই তিনি ১১ মাঘ মহর্ষিভবনে সায়ংকালীন উপাসনায় উপদেশ-রূপে পাঠ করেন [দ্র তত্ত্ব°, ফাল্গুন। ১৭৪-৮০]।

প্রথম উপদেশটিতে রবীন্দ্রনাথ উৎসবের মর্মকথাটি বোঝাতে চেয়েছিলেন। জীবনের বিচিত্র সুখদুঃখে আশানিরাশায় রাগবিরাগে আমরা পরস্পরের থেকে বিচ্ছিন্ন, কিন্তু উৎসব-সভাতলে সেই বিচ্ছিন্নতাকে অন্তরালে রেখে আমরা মিলিত হই—'আমাদের পরস্পরের মধ্যে প্রভেদ যখন প্রচ্ছন্ন হয় এবং ঐক্য যখন প্রস্ফুটিত হইয়া উঠে তখনি আমাদের আনন্দ, আমাদের উৎসব। এই ঐক্য সূত্রটি যতই ব্যাপক যতই সত্য হইবে আমাদের আনন্দ ততই যথার্থ ততই বিপুল এবং আমাদের উৎসবও ততই সার্থক হইতে থাকিবে।' বিষয়কর্মেও আমরা স্বার্থের ঐক্য লাভ করি, গৃহের মধ্যে আত্মীয়সম্বন্ধের ঐক্য অনুভব করি, স্বদেশের পরিধির মধ্যেও ঐক্যের সম্বন্ধ অনুভব করতে চাই—কিন্তু সেখানে আমাদের সমগ্র চিত্ত তাকে সম্পূর্ণ আশ্রয় করতে পারে না, কারণ এই সকল ঐক্যের মধ্যে অখণ্ড সত্য নেই এবং 'সত্য যেখানে খণ্ডিত আমাদের আনন্দও সেখানে খণ্ডিত, এবং সেই খণ্ডতা হইতেই আমাদের যত বিরোধ, যত অন্যায়, যত অত্যাচার—যত কৃত্রিম বিকৃতি, যত অমূলক অহঙ্কার।' কিন্তু আমি বিষয়ী, গৃহী, বিশেষদেশবাসী ছাড়াও আমার মধ্যে একটি বৃহৎ সত্য আছে—আমি মানুষ। 'এই সত্যসূত্রে যখনি আমি সকল মানুষের মধ্যে যথার্থভাবে আপন ঐক্য অনুভব করিতে পারিব, যখন আমি ব্যক্তি, জাতি, সম্প্রদায় ভুলিয়া সমগ্র মানবের মধ্যে আপনাকে ও আপনার মধ্যে সমগ্র মানবকে উপলব্ধি করিতে পারিব তখনই আমার আনন্দ সম্পূর্ণতর ও উৎসব সার্থক হইবে।'

তত্ত্বের দিক থেকে এই বক্তব্যে এমন কিছু বিশেষত্ব নেই, কিন্তু বঙ্গভঙ্গকে কেন্দ্র করে জাতিবিদ্বেষ যেভাবে তীব্রতা লাভ করছিল তার পটভূমিকায় জাতি-সম্প্রদায়-নির্বিশেষে বিশ্বমানবতার যে আদর্শ রবীন্দ্রনাথ এখানে প্রচার করেছেন তার বৈশিষ্ট্য অনস্বীকার্য। এই প্রসঙ্গে আমরা উক্ত আন্দোলনের উত্তাল মুহূর্তে ২৩ আশ্বিন ১৩১২ [9 Oct 1905] তারিখে পশুপতিনাথ বসুর সৌধপ্রাঙ্গণে প্রদত্ত তাঁর 'বিজয়া-সম্মিলন' [দ্র ভারতবর্ষ ৪। ৪৬৮-৭৪] ভাষণটির কথা স্মরণ করতে পারি। এতাবৎ আত্মীয়-বন্ধু মহলে আবদ্ধ একটি চিরপ্রচলিত প্রথা সমাজের সর্বস্তরের মানুষকে আলিঙ্গন করতে উদ্যত হওয়ায় রবীন্দ্রনাথ সেই অনুষ্ঠানকে সার্থক উৎসব বলে অনুভব করেছিলেন। বিশেষ উপলক্ষে লিখিত রচনাটিতে তিনি পূর্ব ও পশ্চিমের বাঙালিকে আহ্বান করেছিলেন, কিছুদিন পরেই তিনি প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মানুষকে ভারতের মিলনতীর্থে আমন্ত্রণ জানান।

সায়ংকালীন উপাসনার পর 'রাত্রে অপেক্ষাকৃত অধিক বয়স্ক ছাত্রগণের বিসর্জ্জন হইতে অভিনয় হয়। অভিনয় হইবার পূর্ব্বে শ্রীযুক্ত অক্ষয় কুমার মৈত্রেয় অভিনয়ের উপকারিতা সম্বন্ধে মন্তব্য প্রকাশ করেন এবং ইহাও বলেন যে, "বেণীসংহার" নাটক ভারতের দুর্দ্দিনের সময়ে জাতীয় জীবনকে বীরত্বের দিকে অনেকটা আহ্বান করিয়াছিল।'[৭৮] গত বৎসর আশ্রমে 'বিসর্জন' অভিনীত হয়েছিল। এইটি দ্বিতীয় অভিনয়। এই অভিনয়ের বিবরণ দিয়েছেন সত্যরঞ্জন বসু :

> মনে আছে, এই ৭ই পৌষ উৎসব উপলক্ষে গুরুদেব ছেলেদের দিয়ে 'বিসর্জ্জন' নাটক করিয়েছিলেন। নাটকটি কাট ছাঁট করে একরকম নতুন করেই গড়া হয়। অপর্ণার অভিনয় অংশ একেবারেই বাদ দিয়ে একমাত্র নারীর ভূমিকা—গুণবতী ছিল। আর বালকের ভূমিকায় 'ধ্রুব' সংযোজন করা হয়। ...অভিনয়ে অংশ গ্রহণ করেছিলেন যতদূর মনে পড়ে—
>
> গোবিন্দ মাণিক্যের ভূমিকায়— সন্তোষদা [সন্তোষচন্দ্র মজুমদার]
> জয়সিংহ রথীদা [রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর]
> রঘুপতি দিনুবাবু [দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর]

নক্ষত্ররায় নয়নদা [নয়নমোহন চট্টোপাধ্যায়]
গুণবতী ব্রহ্মবিহারীদা [ব্রহ্মবিহারী সরকার]

আর আমাকে মাথায় পাগড়ী বেঁধে ধ্রুব সাজিয়ে বলে দেওয়া হলো—"আমায় ডেকেছেন রাজা"—এই আমার পার্ট। অভিনয় ভালই হয়েছিল।[৭৯]

এই দিনই 'মধ্যাহ্নে বিদ্যালয়ের ছোট ছোট বালকগণের বিসর্জ্জনের অংশবিশেষ লইয়া অভিনয় হয়। ইহা দর্শকদিগের অত্যন্ত প্রীতিকর হইয়াছিল।'[৭৯ক]

সত্যরঞ্জন বসু আরও লিখেছেন : 'পরের দিন গুরুদেব ও মোহিতবাবু সহ আশ্রমের শিক্ষক ও ছেলেদের ছবি তোলা হয়। এটিই বোধহয় আশ্রমের সকলের সবচেয়ে পুরানো ফটো।'[৮০] *The Calcutta Municipal Gazette* Tagore Memorial Special Supplement [1941/1986]-এর 73 পৃষ্ঠায় ছবিটি দেখা যাবে, কিন্তু তারিখটি সংশোধন করে নেওয়া দরকার।

মনে হয়, 31 Dec 1903 [১৬ পৌষ]-এর মধ্যে অষ্টম ভাগ ও নবম ভাগ তৃতীয় খণ্ড ছাড়া কাব্যগ্রন্থ-এর সব-ক'টি ভাগ প্রকাশিত হয়ে গিয়েছিল—কারণ ঐ তারিখ পর্যন্ত বেঙ্গল লাইব্রেরি ক্যাটালগের ত্রৈমাসিক বিবরণে অন্য ভাগগুলি অন্তর্ভুক্ত হয়েছে, যদিও প্রকাশক-কর্তৃক প্রত্যেকটি ভাগের প্রকাশের নির্দিষ্ট তারিখ সরবরাহ করা হয়নি। চতুর্থভাগ প্রকাশিত হয় 20 Dec [রবি ৫ পৌষ] :

কাব্য-গ্রন্থ।/চতুর্থ ভাগ।/শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।/শ্রীমোহিত চন্দ্র সেন এম্, এ,/সম্পাদক।

[পরপৃষ্ঠায়:] প্রকাশক—এস্, সি, মজুমদার।/২০ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা,/মজুমদার লাইব্রেরী।/ কলিকাতা, ২০ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্,/দিনময়ী প্রেসে শ্রীঅনুকূলচন্দ্র পারিহাল দ্বারা মুদ্রিত।/১৩১০ সন।

পৃষ্ঠাসংখ্যা : ২ + ২ + ৬ + ১০৪ + ৫; মুদ্রণসংখ্যা : ১১০০। সূচী :

১। সংকল্প 'সেদিন কি তুমি এসেছিলে, ওগো' ও ২৩টি কবিতা।

২। স্বদেশ। 'হে বিশ্বদেব মোর কাছে তুমি' ও ৫১টি কবিতা।

কাব্যগ্রন্থ।/দ্বিতীয় ভাগ।/প্রথম খণ্ড।/...

...কলিকাতা—৩/৪ গৌরমোহন মুখার্জির ষ্ট্রীট্, মেট্‌কাফ্ প্রেসে মুদ্রিত।/১৩১০ সন।

পৃষ্ঠাসংখ্যা : ২ + ২ + ৬ + ২২৪ + ৪; সূচী :

১। নারী। 'সাঙ্গ হয়েছে রণ' ও ১৬টি কবিতা।

২। কল্পনা। 'মোর কিছু ধন আছে' ও ১৫টি কবিতা।

৩। লীলা। 'তোমারে পাছে সহজে বুঝি' ও ১৯টি কবিতা।

৪। কৌতুক। 'আপনারে তুমি করিবে গোপন' ও ১৭টি কবিতা।

কাব্য-গ্রন্থ। দ্বিতীয় ভাগ।/দ্বিতীয় খণ্ড।/...

.../কলিকাতা—৩/৪ গৌরমোহন মুখার্জির ষ্ট্রীট, মেট্‌কাফ্ প্রেসে মুদ্রিত।/১৩১০ সন।

পৃষ্ঠাসংখ্যা : ২ + ২ + ৪ + ১৪৩ [২২৫-৩৬৭] + ৪; সূচী :

৫। যৌবন-স্বপ্ন। 'পাগল হইয়া বনে বনে ফিরি' ও ২৪টি কবিতা।

৬। প্রেম। ‘আকাশ-সিন্ধুমাঝে একঠাঁই’ ও ৪৮টি কবিতা।

কাব্য-গ্রন্থ।/তৃতীয় ভাগ।/...

.../কলিকাতা—৩/৪ গৌরমোহন মুখার্জির ষ্ট্রীট্,/ মেট্‌কাফ্ প্রেসে মুদ্রিত।/১৩১০ সাল।

পৃষ্ঠাসংখ্যা : ২ + ২ + ৪ + ২০৪ + ৪; সূচী :

১। কবিকথা। ‘দুয়ারে তোমার ভিড় করে যারা আছে’ ও ২২টি কবিতা।

২। প্রকৃতি গাথা ‘তোমার বীণায় কত তার আছে’ ও ১৪টি কবিতা।

৩। হতভাগ্য। ‘পথের পথিক করেছ আমায়’ ও ২৪টি কবিতা।

কাব্য-গ্রন্থ।/পঞ্চম ভাগ।/...

.../কলিকাতা, ৩।৪ গৌরমোহন মুখার্জির ষ্ট্রীট, মেট্‌কাফ্ প্রেসে মুদ্রিত।/১৩১০ সন।

পৃষ্ঠাসংখ্যা : ২ + ২ + ১০ + ২৫৯ + ৯; সূচী :

১। রূপক। ‘ধূপ আপনারে মিলাইতে চাহে গন্ধে’ ও ১৫টি কবিতা।

২। কাহিনী। ‘কত কি যে আসে কত কি যে যায়’ ও ৭টি কবিতা।

৩। কথা। ‘কথা কও, কথা কও’ ও ২৪টি কবিতা।

৪। কণিকা। ‘হায় গগন নহিলে তোমারে ধরিবে কেবা’ ও ১১০টি কবিতা।

কাব্য-গ্রন্থ।/ষষ্ঠ ভাগ।/...

.../কলিকাতা—৩/৪ গৌরমোহন মুখার্জির ষ্ট্রীট, মেট্‌কাফ্ প্রেসে মুদ্রিত।/১৩১০ সন।

পৃষ্ঠাসংখ্যা : ২ + ৮ + ১৯৩ + ৬; সূচী :

১। মরণ। ‘চিরকাল একি লীলা গো’ ও ২৬টি কবিতা।

২। নৈবেদ্য। ‘প্রতিদিন তব গাথা’ ও ৫৬টি কবিতা।

৩। জীবনদেবতা। ‘আজ মনে হয় সকলেরি মাঝে’ ও ৯টি কবিতা।

৪। স্মরণ। ২৪টি কবিতা। এই বিভাগে কোনো প্রবেশক কবিতা নেই, তার জায়গায় বড়ো হরফে ‘৭ই অগ্রহায়ণ/১৩০৯।’—মৃণালিনী দেবীর মৃত্যুতারিখটি মুদ্রিত।

রবীন্দ্রনাথের বড়ো গল্প ‘কর্মফল’ স্বতন্ত্র গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় 22 Dec [মঙ্গল ৭ পৌষ]। গ্রন্থটির আখ্যাপত্র:

কর্ম্মফল।/শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর/প্রণীত।/কুন্তলীন অফিস হইতে/শ্রী এইচ বসু কর্ত্তৃক/প্রকাশিত কলিকাতা;/ ১৩১০ সন।/শ্রীপূর্ণচন্দ্র দাস কর্ত্তৃক মুদ্রিত/মূল্য ॥০ আট আনা মাত্র।

‘গ্রন্থকারের নিবেদন’-এ রবীন্দ্রনাথ লেখেন : ‘আমার রচিত এই ক্ষুদ্র গল্পটি গ্রহণ করিয়া কুন্তলীনের স্বত্বাধিকারী শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রমোহন বসু মহাশয় বোলপুর ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমের সাহায্যার্থে তিনশত টাকা দান করিয়াছেন।’

পৃষ্ঠাসংখ্যা : ২ + ২ + ৯২ + গ্রন্থকারের প্রতিকৃতি; মুদ্রণসংখ্যা : ২০০০।

এই গল্প শ্রাবণ ১৩১০-এরও পূর্বে লেখা। ২৩ শ্রাবণ [8 Aug] রবীন্দ্রনাথ মোহিতচন্দ্র সেনকে লিখেছিলেন : ‘আমার কর্ম্মফল গল্পটা কুন্তলীনরা ছাপাচ্চে কি না জানেন? তারা দেখচি শৈলেশকেও হারিয়ে

দেবে।'[৮১] তাঁরা দীর্ঘসূত্রিতায় শৈলেশচন্দ্রকেও পরাজিত করেছিলেন—কাব্যগ্রন্থ-এর অনেকগুলি ভাগ প্রকাশিত হওয়ার পর 'কর্মফল' প্রকাশিত হয়।

24 Dec [বৃহ ৯ পৌষ] পৌষ-সংখ্যা বঙ্গদর্শন [৩।৯] প্রকাশিত হয়। এই সংখ্যায় রবীন্দ্রনাথের রচনা দুটি :

৩৯৭-৪০৭ 'নৌকাডুবি' ২৩-২৫ দ্র নৌকাডুবি ৫।২৩০-৪০ [২১-২৩]

৪০৭-১১ 'মন্দিরের কথা' দ্র ভারতবর্ষ ৪।৪৫৫-৬০ ['মন্দির']

ফাল্গুন ১২৯৯ [Feb 1893]-এ রবীন্দ্রনাথ বলেন্দ্রনাথকে নিয়ে উড়িষ্যায় ভুবনেশ্বর পুরী ও কোনারকের মন্দিরগুলি পরিদর্শন করেছিলেন [দ্র রবিজীবনী ৩।২৫২-৫৪]। এই অভিজ্ঞতাকে বলেন্দ্রনাথ প্রবন্ধ-রচনায় ব্যবহার করলেও তখন রবীন্দ্রনাথ 'দেউল' [দ্র সোনার তরী ৩।৮২-৮৬] কবিতা ছাড়া এই বিষয়ে কিছু লেখেননি—বরং মজুমদার-পুঁথিতে লেখা তাঁর নোটগুলি বলেন্দ্রনাথই ব্যাপকভাবে ব্যবহার করেছিলেন। এতকাল বাদে 'মন্দিরের কথা' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ সেই অভিজ্ঞতাকে স্মরণ করলেন।

এই বিষয়ে কোনো প্রবন্ধ তিনি যদি সেই সময়ে রচনা করতেন তা হয়তো রোম্যান্টিক ভাবকল্পনায় উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠত, কিন্তু বঙ্গদর্শন-এর যুগে লিখিত হওয়ার ফলে ভুবনেশ্বরের মন্দিরের বহিরঙ্গ বিচিত্রতা ও অন্তরঙ্গ 'অনলংকৃত নিভৃত অস্ফুটতা' স্বভাবতই ধর্মীয় ইতিহাসের প্রবহমানতা ও তাঁর সমকালীন অধ্যাত্মদৃষ্টির পরিপ্রেক্ষিতে ব্যাখ্যাত হয়েছে।

সঙ্গীত-প্রকাশিকা, পৌষ ১৩১০ [৩।৪] :

৬৪-৬৭ কীর্ত্তনের সুর—একতালা। ওহে জীবনবল্লভ [আখর-সহ] দ্র স্বর ৪

কাঙালীচরণ সেন গানটির স্বরলিপি করেন।

সমালোচনী, পৌষ ১৩১০ [২।৯] :

২৯৯-৩০০ 'জন্মকথা' ['খোকা মাকে শুধায় ডেকে'] দ্র শিশু ৯।৭-৮

ব্রহ্মচর্যাশ্রমে তখন একমাস শীতের ছুটি দেওয়া হত। ছুটি হলে 'রবিবার' [*3 Jan : ১৯ পৌষ] রবীন্দ্রনাথ মোহিতচন্দ্রকে লিখলেন : 'মঙ্গলবার হয় সকালে নয় বম্বাই মেলে কলকাতায় পৌঁছব। বুধবারে দেখা হবে।' ২১ পৌষ [মঙ্গল 5 Jan]ই তিনি কলকাতায় আসেন। বুধবার মোহিতচন্দ্রের সঙ্গে তাঁর দেখা হয়েছিল নিশ্চয়ই, তাছাড়া ক্যাশবহির হিসাব অনুযায়ী তিনি এইদিন 'পার্শীবাগান ও নাটরের মহারাজার বাটী'ও গিয়েছিলেন। ২৩ পৌষ [বৃহ 7 Jan] তিনি মীরা, শমী, রথীন্দ্রনাথ, সন্তোষচন্দ্র ও বিদ্যালয়ের শিক্ষক সুবোধচন্দ্র মজুমদারকে সঙ্গে নিয়ে শিলাইদহ যাত্রা করেন।

বিদ্যালয়ের প্রাক্তন শিক্ষক মনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় ইতিমধ্যে ওকালতি পরীক্ষা দিয়েছিলেন। তাঁর উত্তীর্ণ হওয়ার সংবাদ শান্তিনিকেতন ঘুরে শিলাইদহে পৌঁছয় ৩০ পৌষ [বৃহ 14 Jan]। রবীন্দ্রনাথ লিখছেন :

> তখন আপনার দুটি ছাত্র রথী ও সন্তোষ এবং অধ্যাপক সুবোধ পদ্মার জলে নামিয়া সাঁতার কাটিতেছিল আমি তীর হইতে তাহাদিগকে সুসংবাদ জানাইলাম। ইহাতে স্নানকারীদের আনন্দআন্দোলনে পদ্মার তরঙ্গচাঞ্চল্য দ্বিগুণ বাড়িয়া উঠিল। সকলেই ভোজের প্রত্যাশা করিতেছে। যদি এখানে উপস্থিত হইয়া আনন্দউৎসব সম্পন্ন করেন তবে পদ্মার টাট্‌কা ইলিষ অত্যন্ত সুলভ মূল্যে পাইবেন।...৯ই মাঘ পর্য্যন্ত আমি এখানে আছি। রথীরা ১৭ই ১৮ই পর্য্যন্ত থাকিবে।...জগদানন্দও আসিবেন এমন কথা আছে—তাহা হইলে আপনাদের সেই বোলপুর মাঠের অধ্যাপক-Trinity একবার

এই পদ্মার উর্ম্মিলীলার মধ্যে মিলিত হইতে পারিবে। মনে রাখিবেন এখানে খেচর ভূচর জলচর ও উভচর কোনো শ্রেণীর খাদ্যই নিষিদ্ধ ও দুর্লভ নহে, সুবোধ প্রত্যহ তাহার প্রমাণ পাইতেছেন।[৮২]

নবীন সাহিত্যিক চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যয় মজুমদার লাইব্রেরির সংশ্লিষ্ট আলোচনা সমিতির সূত্রে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে পরিচিত হয়েছিলেন। বঙ্গদর্শন-এ তাঁর লেখা 'দাবার জন্মকথা' [কার্তিক-অগ্র° ১৩০৮], 'ব্যাকরণ' [কার্তিক ১৩০৯] প্রবন্ধ ও 'বৃদ্ধের স্বপ্নদর্শন' [আষাঢ় ১৩১০, সুকুমারচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ছদ্মনামে প্রকাশিত] কবিতা মুদ্রিত হয়েছিল। তিনি 'স্মৃতিকথা'য় লিখেছেন, তিনি 'নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী' নামক একটি গল্প প্রবাসী-তে পাঠালে সম্পাদক গল্পটি ফেরৎ পাঠান সংক্ষিপ্ত করার নির্দেশ দিয়ে। দীনেশচন্দ্র সেনের পরামর্শে চারুচন্দ্র গল্পটি রবীন্দ্রনাথকে পাঠালে ৩০ পৌষ তিনি লেখেন : 'আপনার গল্প পড়িয়া যে যে পরিবর্ত্তন আবশ্যক তাহা স্থির করিয়া দিতে চেষ্টা করিব। ৯ই মাঘ পর্য্যন্ত আমি শিলাইদহে থাকিব তাহার পরে কলিকাতায় যাইব। সেই সময়ে মুখে আপনাকে সবিস্তারে আলোচনা করিয়া জানাইবার সুবিধা হইবে।'[৮৩] চারুচন্দ্র ব্রহ্মচর্যাশ্রমকে সাহায্য করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, পরে দশ টাকা দান-স্বরূপ পাঠিয়ে রবীন্দ্রনাথের কৃতজ্ঞতা অর্জন করেন।

তিনি আরও কৃতজ্ঞ হয়েছেন বিদ্যালয়ের কাজে মোহিতচন্দ্রের সম্পূর্ণ আত্মনিবেদনের অভিলাষ জানতে পেরে। তাঁদের পরিচয়ের সূচনাপর্বে প্রমথলাল সেন [নালুদা] 22 Feb 1902 [১০ ফাল্গুন ১৩০৮] মোহিতচন্দ্রকে উপদেশ দিয়ে লিখেছিলেন : 'বাস্তবিক তাঁর [রবীন্দ্রনাথের] ভেতর এমন সব ভাব আছে যা তোমার আমার মত লোকের খুব প্রয়োজন। তুমি সেই সব ভাবের ভেতর দিয়ে তাঁর সঙ্গে প্রাণে প্রাণে এক হ'য়ে তোমার জীবনের উদ্দেশ্য সাধনে কৃতসংকল্প হও, আমার মনে হয় তোমার উদ্দেশ্য সাধনে তিনি এখন বিশেষ সহায়। তাঁর জীবনের উদ্দেশ্য সাধনে তুমিও বিশেষ সহায়।...এই সময়ে রবীন্দ্রবাবুর সঙ্গে এক হ'য়ে কোন একটী বিশেষ কার্য্যে নিযুক্ত হ'লে তোমার জীবন ফলবান হবে।'[৮৪] এই উপদেশে ও অন্তরের আকর্ষণে মোহিতচন্দ্র ক্রমশই রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হয়েছেন—বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষসমিতির অন্যতম সদস্য ও কাব্যগ্রন্থ-এর সম্পাদক হিসেবে তিনি রবীন্দ্রনাথের প্রধান সহায়ক রূপে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। এখন তিনি কলকাতার কলেজের সম্মানজনক অধ্যাপক পদ ত্যাগ করে ব্রহ্মচর্যাশ্রমের কাজে আত্মনিয়োগ করতে চাইলেন। তাঁর পত্র পেয়েই রবীন্দ্রনাথ তাঁকে সাদর আহ্বান জানিয়ে লিখলেন :

তবে নির্ঝরের মত বাহির হইয়া পড়িলেন! এবার সমুদ্র মুখে চলা যাক্। এবার সত্যকার কাজে নাবা গেল—আর ঘানির বলদের মত বাঁধিকাজে প্রতিদিন ঘোরা নয়—এখন প্রতিদিন সত্যের মধ্যে সঞ্চরণ করা এবং প্রতিপদে সত্যের পথে অগ্রসর হওয়া যাইবে। আমাদের দুইজনের এই মন্ত্র হইবে—"মাহং ব্রহ্ম নিরাকুর্য্যাং, মা মা ব্রহ্ম নিরাকরোৎ অনিরাকরণমস্তু অনিরাকরণমস্তু।" আমরা পরস্পরকে যেন অবসাদ ও অসত্য হইতে রক্ষা করিতে পারি। ৯ই মাঘ সন্ধ্যার সময় কলিকাতায় পৌঁছিব। কবে আপনার সঙ্গে দেখা হইবে?[৮৫]

রবীন্দ্রনাথ অবশ্য ৯ মাঘ কলকাতায় আসতে পারেননি, ক্যাশবহিতে তাঁর '১০ মাঘ [রবি 24 Jan] শিয়ালদহ ষ্টেসন হইতে আসার' হিসাব পাওয়া যায়।

১১ মাঘ [সোম 25 Jan] চতুঃসপ্ততিতম সাম্বৎসরিক ব্রাহ্মসমাজ উপলক্ষে প্রাতঃকালীন উপাসনায় আদি ব্রাহ্মসমাজ গৃহে রবীন্দ্রনাথ শিবধন বিদ্যার্ণব ও চিন্তামণি চট্টোপাধ্যায়কে নিয়ে বেদিগ্রহণ করেন। 'উপাসনাদি পরিসমাপ্ত হইলে শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এই উপদেশ দিলেন।' উপদেশটি ফাল্গুন-সংখ্যা তত্ত্ববোধিনী-তে [পৃ ১৬৭-৭০] ও 'মনুষ্যত্ব' নামে ফাল্গুন-সংখ্যা বঙ্গদর্শন-এ [পৃ ৫৪৯-৫৩; দ্র ধর্ম ১৩।

৩৪৮-৫২] মুদ্রিত হয়। দুঃখবরণের মধ্যেই মনুষ্যত্বের সার্থকতা—উপদেশটির মধ্যে এই বক্তব্যই পরিস্ফুট হয়েছে।

শিলাইদহ থেকে 'সোমবার' [*18 Jan : ৪ মাঘ] রবীন্দ্রনাথ চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়কে লিখেছিলেন : '১১ই মাঘ প্রাতে ১০টার সময় জোড়াসাঁকো বাটিতে অথবা তাহার পূর্বে আদিব্রাহ্মসমাজে আসিলে আমার সঙ্গে দেখা হইবে।' চারুচন্দ্র জোড়াসাঁকোতেই লালবাড়িতে তাঁর সঙ্গে দেখা করেন। 'নীচে পূর্বদিকের কোণের ঘরে তিনি বসেছিলেন, আর সেখানে ছিলেন—শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন, মোহিতচন্দ্র সেন, প্রিয়নাথ সেন প্রভৃতি।' চারুচন্দ্র জানিয়েছেন, তখন নৌকাডুবি উপন্যাসে কমলা ও হেমনলিনীর মাঝখানে পড়ে রমেশের সমস্যার সমাধান কোন পথে হবে সেই বিষয়ে আলোচনা চলছিল। রবীন্দ্রনাথ বলেন, 'আমি তো তা কিছুই জানি না যে রমেশ কমলা আর হেমনলিনীর মধ্যে পড়ে কি যে কর্‌বে। আমি তো কখনো আগে ভেবে চিন্তে কিছু লিখি না, লিখতে লিখতে যা হয়ে দাঁড়ায়। দেখা যাক শেষে কি হয়।' গণ্ডগোল দেখা দিলে একজনকে মেরে ফেললেই হবে, চারুচন্দ্রের এই পরামর্শ শুনে তিনি বলেন, 'এ বয়সে আর আমাকে স্ত্রীহত্যা করতে বল্‌বেন না।' এই সাক্ষাৎকারে চারুচন্দ্রের নিজস্ব প্রয়োজন অবশ্য মেটেনি, শৈলেশচন্দ্র মজুমদার মারফৎ তাঁর বক্তব্য জানাবেন বলে রবীন্দ্রনাথ তাঁকে বিদায় দেন।[৮৬]

সেদিন সায়ংকালীন উপাসনাতেও রবীন্দ্রনাথ, চিন্তামণি চট্টোপাধ্যায় ও শিবধন বিদ্যার্ণব বেদিগ্রহণ করেন। রবীন্দ্রনাথ উদ্বোধন [দ্র তত্ত্ব°, ফাল্গুন। ১৭৩] করেন ও উপদেশ দেন। আমরা আগেই বলেছি, ৭ই পৌষ সন্ধ্যায় শান্তিনিকেতন মন্দিরে প্রদত্ত ভাষণটিই উপদেশ-রূপে তিনি এখানে পাঠ করেন। প্রবন্ধটি ইতিপূর্বেই মাঘ-সংখ্যা বঙ্গদর্শন-এ প্রকাশিত হয়েছিল। উদ্বোধনী ভাষণটি এখনও কোনো গ্রন্থভুক্ত হয়নি।

সত্যরঞ্জন বসু লিখেছেন : 'সেবার মাঘোৎসবে আমরা চার পাঁচটি ছেলে গিয়েছিলাম কলকাতা মাঘোৎসবে —গান গাইতে।...আচার্য্যের আসনের পেছন দিকে দাঁড়িয়ে অর্গানের সঙ্গে আমাদের গান হয়।...দুঃখের বিষয়, আমরা যেসব গান গেয়েছিলাম তার এক পংক্তিও মনে আস্‌ছে না।'[৮৭] ব্রহ্মচর্যাশ্রমের ছাত্রদের দিয়ে মাঘোৎসবের গান গাওয়ানোর সূত্রপাত এই বৎসরেই, যা নিয়ে পরবর্তীকালে সরলা দেবী ক্ষোভ প্রকাশ করেছিলেন।[৮৮]

তত্ত্ববোধিনী-তে প্রকাশিত বিবরণ অনুসারে এই বৎসর মাঘোৎসবে গীত রবীন্দ্রনাথ-রচিত ব্রহ্মসংগীতের সংখ্যা মাত্র দুটি :

[১] দেশ-মল্লার-কাওয়ালি। আমার এ ঘরে আপনার করে দ্র তত্ত্ব°, ফাল্গুন। ১৮১; গীত ১।৪৮-৪৯; স্বর ২৬। এটি নৈবেদ্য [১৩০৮] গ্রন্থের ২-সংখ্যক কবিতা [দ্র ৮।৮]।

[2] নায়েকী কানাড়া-একতালা। জীবনে আমার যত আনন্দ দ্র তত্ত্ব°, ফাল্গুন। ১৮১; গীত ১।১৯৭; স্বর ২৪। এটিও নৈবেদ্য-এর কবিতা, সংখ্যা ৭ [দ্র ৮।১২]।

উল্লেখ্য, কাব্যগ্রন্থ ৮ম ভাগ 'গান'-এ এই দুটি গান নেই। মনে হয়, উক্ত খণ্ডের পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত হয়ে যাওয়ার পর পাঠের কিঞ্চিৎ পরিবর্তন করে কবিতা-দুটিতে সুরারোপ করা হয়। সঙ্গীত-প্রকাশিকা-র মাঘ সংখ্যাতেই দুটির স্বরলিপি মুদ্রিত হয়, দ্বিতীয়টির স্বরলিপি-কার বিহারীলাল চট্টোপাধ্যায়—প্রথমটির স্বরলিপি-কারের নাম অনুল্লেখিত, সম্ভবত কাঙালীচরণ সেন স্বরলিপি করেছিলেন।

মাঘোৎসবের পরের দিন ১২ মাঘ [মঙ্গল 26 Jan] 'আলোচনাসমিতির বিশেষ অধিবেশনে' সিটি কলেজ হলে রবীন্দ্রনাথ 'ধর্মপ্রচার' [দ্র বঙ্গদর্শন, ফাল্গুন। ৫২১-৩৬; তত্ত্ব°, চৈত্র। ১৮৪-৯৮; ধর্ম ১৩।৩৭৬-৮৩] শীর্ষক একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন। বিপিনচন্দ্র পাল *New India* পত্রিকার 4 Feb [Vol. III, No. 22 pp. 339-40] সংখ্যায় Rabindranath's Note of Warning' শিরোনামায় রচনাটি সম্পর্কে লেখেন: 'In view of this growing unreality of the cry and culture of a large section of the Brahmo Samaj, the note of warning sounded by Babu Rabindranath Tagore, ...seemed to us to have been as opportune as it was, by common consent, most powerful.'

রবীন্দ্রনাথ নিজে আদিব্রাহ্মসমাজভুক্ত ও দীর্ঘকাল ধরে উক্ত সমাজের অন্যতম সম্পাদক থাকলেও, সম্পাদক হিসেবে প্রাথমিক অত্যুৎসাহ দেখানো ছাড়া পরবর্তীকালে তিনি সামাজিক কাজকর্মে খুবই সংকীর্ণ স্থান গ্রহণ করেছিলেন—সেই স্থানটিও তাঁর সৃষ্টিসত্তার সঙ্গে সম্পর্কিত, মাঘোৎসব বা অনুরূপ কোনো উৎসবের জন্য ব্রহ্মসংগীত রচনা গাওয়া ও সংগীত-পরিচালনার মধ্যে সীমাবদ্ধ। পিতার নির্দেশে তিনি যখন থেকে উপাসনায় ভাষণাদি দিয়েছেন, তখনও তাঁর ভাষণে উপনিষদের মন্ত্রব্যাখ্যা ও আত্মোপলব্ধির প্রকাশ ছাড়া প্রথানুসরণের চিহ্ন পর্যন্ত দেখা যায়নি—চিন্তামণি চট্টোপাধ্যায়, শম্ভুনাথ গড়গড়ি প্রমুখ পেশাদার বক্তার সঙ্গে তাঁর পার্থক্য পুরোনো তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার পাতা ওলটালেই ধরা পড়ে। রবীন্দ্রনাথ প্রায় প্রথমাবধিই এ-বিষয়ে সচেতন ছিলেন, ১১ শ্রাবণ ১২৯২ [26 Jul 1885]-এ পঠিত 'সাকার ও নিরাকার উপাসনা' প্রবন্ধে তাই ভাষাকে পূজা করা সম্পর্কে ব্রাহ্মদের সতর্ক করে দিয়েছিলেন [দ্র রবিজীবনী ৩১৩]। একই কারণে 27 Feb 1893 [১৭ ফাল্গুন ১২৯৯] ইন্দিরা দেবীকে লিখেছেন : 'ব্রাহ্মসমাজের সাপ্তাহিক উপাসনায় এই জন্যেই যেতে ইচ্ছে করে না।...এইজন্যে আমি নিজেও বেদীতে উঠে বলতে চাই নে, জানি সে বিষয়ে আমার স্বাভাবিক ক্ষমতা নেই, মনের মধ্যে একটা অনিবার্য আহ্বান নেই—এবং প্রতি বুধবারে নিয়মিত চিন্তামণির বক্তৃতা শুনে আসাও আমার কর্তব্য জ্ঞান করি নে' [দ্র রবিজীবনী ৩।২৫৫]। তাছাড়া ক্ষিতীন্দ্রনাথের সাময়িক উৎসাহ ছাড়া আদি ব্রাহ্মসমাজ সাধারণভাবে প্রচারবিমুখ ছিল, নিজেদের হিন্দুসমাজের অন্তর্ভুক্ত করে ভাবাতে সারাক্ষণ আক্রমণ ও আত্মরক্ষার জন্য কণ্টকিত হয়ে থাকারও দরকার ছিল না। কিন্তু ব্রাহ্মসমাজের অপর দুটি শাখার আচরণ ছিল অন্যরকম—অন্তঃসারশূন্য উপাসনার বাহুল্য, প্রচারের অত্যুৎসাহ এবং নিজেদের মধ্যে ও অপরের সঙ্গে বিরোধের জন্য অস্ত্র শানানো এই দুই শাখাকে সর্বদাই কর্মচঞ্চল করে রাখত। রবীন্দ্রনাথ 'ধর্মপ্রচার' প্রবন্ধে এঁদেরই সম্বোধন করেছিলেন, কিন্তু 'ধর্ম' [১৩১৫] গ্রন্থে প্রবন্ধটির প্রায় অর্ধাংশ পত্যিক্ত হওয়ায় মূল লক্ষ্যটি অস্পষ্ট হয়ে গেছে। এঁদের 'বিশেষচিহ্নধারী ব্রহ্মব্যবসায়ী' ইত্যাদি আখ্যা দিয়ে তিনি লিখেছিলেন :

> ব্রাহ্মসমাজের মধ্যে আজকাল যে অপরিতৃপ্তি, যে অসন্তোষের ভাব সুস্পষ্ট দেখা যাইতেছে, তাহার প্রধান কারণ, ব্রাহ্মসমাজ দীর্ঘকাল ভাঙনের কাজেই বিশেষ লক্ষ্য করিয়াছে, গড়নের কাজে মন দিতে পারে নাই। লড়াইয়ের দিনে বিচ্ছেদবিরোধ, আঘাতপ্রতিঘাতই সর্ব্বপ্রধান হইয়া উঠে—রক্ষণ ও গঠনের জন্য শান্তি ও প্রীতির প্রয়োজন। যতদিন আমরা কেবল সৈন্যের ভাবে, আঘাতকারীর ভাবেই সমাজে থাকিব, ততদিন আমাদের জীবন অনেকটা পরিমাণে কৃত্রিম হইতেই বাধ্য। ততদিন আমাদের চতুর্দ্দিকের সহিত মিলনের সহস্র সূত্রকে অগ্রাহ্য করিয়া অনৈক্যের কেবল দুটি-একটি কারণকেই চোখের সম্মুখে খাড়া করিয়া, তাহাকেই অপরিমিত বৃহৎ করিয়া, আপনাদিগকে চারিদিক্ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া, ক্ষুদ্র করিয়া, জাতীয় প্রাণসঞ্চারের সুমহৎ প্রবাহ হইতে নিজেকে বঞ্চিত করিয়া রাখিতেছি।...যে ব্রহ্মোপাসনার দ্বারা এই বিচ্ছেদবিরোধ প্লাবিত হইয়া একেবারে লুপ্ত হইয়া যাইতে পারে—যে ব্রহ্মোপাসনার দ্বারা সাম্প্রদায়িক বালুতটকে উদ্বেলিত করিয়া দিয়া আমাদের হৃদয়ের উদার প্রবাহ দেশের সর্ব্বত্র অবাধে প্রবাহিত হইতে পারে, আমি ব্রাহ্মসমাজে—ব্রাহ্মসমাজে নহে, আমাদের সমাজে, হিন্দুসমাজে, সেই ব্রহ্মোপাসনা একান্তমনে প্রার্থনা করি।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ-পরিচালিত সিটি কলেজের হলে প্রধানত উক্ত সমাজের সদস্যদের সামনে এই বক্তব্য রাখা কম সাহসের কাজ নয়। অবশ্য তাঁরা এই সমালোচনায় খুশি হননি। *The Indian Messenger* পত্রিকার 3 Apr 1904-সংখ্যায় 'Rabindra Nath Tagore on Mission Work'-শীর্ষক রচনায় রবীন্দ্রনাথের বক্তব্যের কঠোর সমালোচনা করা হয়। সম্পাদকীয় মন্তব্যে ভাষণটিকে 'Misrepresentation from an unexpected quarter' বলে অভিহিত করে লেখক নৌকাডুবি উপন্যাসের প্রসঙ্গ টেনে এনে লিখেছেন : 'We do not feel called upon to pronounce on the merits of the story in general, but we must say that while reading it we have at times been compelled to throw off the paper from our hands. The picture of Brahmo homes and Brahmo young men and women which he draws in it is most unjust and untrue.'[৮৯] প্রবন্ধটি সম্বন্ধে আলোচনার সুযোগ না দেবার জন্য তিনি আলোচনা-সমিতির কর্তাব্যক্তিদেরও সমালোচনা করেন।

কিন্তু সাময়িক লক্ষ্যের অন্তর্গত এইসব বিতর্কিত অংশ বাদ দিয়ে 'ধর্ম' গ্রন্থে প্রবন্ধটির যে অংশ গৃহীত হয়েছে, তার গুরুত্বও কম নয়। বিশেষত বিংশ শতাব্দীর শেষ লগ্নে দেশে ও বিদেশে ধর্মীয় মৌলবাদীদের যে দুঃখজনক অভ্যুত্থান দেখা যাচ্ছে, তাতে রবীন্দ্রনাথের এই প্রবন্ধ বিশেষ এক মাত্রা লাভ করেছে।

বেঙ্গল লাইব্রেরির ক্যাটালগ অনুসারে মাঘ-সংখ্যা বঙ্গদর্শন [৩।১০] প্রকাশিত হয় 10 Jan [রবি ২৬ পৌষ]। এই সংখ্যায় রবীন্দ্রনাথের রচনা দুটি :

৪৫৯-৭১ 'নৌকাডুবি' ২৬-২৮ দ্র নৌকাডুবি ৫।২৪০-৫২ [২৪-২৬]

৫১১-১৭ 'দিন ও রাত্রি' দ্র ধর্ম ১৩।৩৪১-৪৮

'দিন ও রাত্রি' শান্তিনিকেতনের সাংবৎসরিক উৎসবে সায়ংকালীন উপাসনায় প্রদত্ত রবীন্দ্রনাথের ভাষণ।

তত্ত্ববোধিনী, মাঘ ১৮২৫ শক [৭২৬ সংখ্যা] :

১৫৬-৫৯ [শান্তিনিকেতনে ৭ই পৌষের উৎসবে সন্ধ্যার উপাসনায় রবীন্দ্রনাথের উপদেশ]

সঙ্গীত-প্রকাশিকা, মাঘ ১৩১০ [৩।৫] :

৮৫-৮৭ নায়েকী কানেড়া-একতালা। জীবনে আমার যত আনন্দ দ্র স্বর ২৪

৮৭-৮৮ দেশ-মল্লার-কাওয়ালি। আমার এ ঘরে আপনার করে দ্র স্বর ২৬

প্রথম গানটির স্বরলিপিকার বিহারীলাল চট্টোপাধ্যায়; দ্বিতীয়টির স্বরলিপিকারের নাম উল্লেখ করা হয়নি, সম্ভবত কাঙালীচরণ সেন গানটির স্বরলিপি করেন, একথা আমরা আগেই বলেছি।

কলকাতায় থাকলেই রবীন্দ্রনাথকে সাধারণত ভ্রাম্যমাণ দেখা যায়, এবারেও তার ব্যতিক্রম হয়নি। ১২ মাঘ 'পার্শীবাগান হইতে আসা', ১৩ মাঘ বালিগঞ্জ ও 'হেদুয়াতলা', ১৪ ও ১৫ মাঘ পুনশ্চ পার্শিবাগান—তাঁর এবারের ভ্রমণসূচী। বারবার পার্শিবাগান যাওয়া জগদীশচন্দ্রের প্রতি তাঁর অনুরাগের প্রমাণ। তাঁর সঙ্গে বিদ্যালয় বিষয়ে আলোচনাও হয়তো এই যাতায়াতের উদ্দেশ্য ছিল।

এই সময়ে শান্তিনিকেতন থেকে একটি দুঃসংবাদ এসে পৌঁছল। সতীশচন্দ্র রায় ও দিনেন্দ্রনাথ শীতের ছুটিতে বুদ্ধগয়া, আগ্রা প্রভৃতি উত্তরভারতের কয়েকটি স্থান ভ্রমণ করতে বেরিয়েছিলেন। শান্তিনিকেতনে

ফিরেই সতীশচন্দ্র কঠিন বসন্ত রোগে আক্রান্ত হলেন। অনিলবরণ রায়চৌধুরী সুধাকান্ত রায়চৌধুরীকে 21 May 1967-এ একটি পত্রে লিখেছেন, সতীশচন্দ্র 'একটি সহিসের সেবা করতে গিয়ে রোগাক্রান্ত হয়ে তার ঘরেই অসহ্য কষ্টে মারা যান। সহিসটি বেঁচে যায়।' হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় অবশ্য লিখেছেন : 'সতীশবাবু পশ্চিম হইতে বসন্তরোগে আক্রান্ত হইয়া আশ্রমে আসিয়াছিলেন। দিনু বাবু যোড়াসাঁকোর বাটীতে গিয়াছিলেন। রাজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তখন আশ্রমে অধ্যক্ষের কার্য্যে ছিলেন। তিনি সতীশবাবুর চিকিৎসার সেবাশুশ্রূষার যথাসাধ্য ব্যবস্থা করিয়াছিলেন।'[৯০] কিন্তু বুদ্ধগয়া ও আগ্রা থেকে ফিরে সতীশচন্দ্র রবীন্দ্রনাথকে যে আবেগমুগ্ধ চিঠিটি লিখে 'তাজমহল' কবিতাটি ["আমি এই চিঠিতে 'তাজমহল' বলিয়া একটি কবিতা পাঠাইতেছি। এটা এখানে আসিয়া লিখিয়াছি।"] প্রেরণ করেন,[৯১] তার মধ্যে অসুস্থতার কোনো আভাস নেই। মাঘোৎসবে গান গেয়ে শান্তিনিকেতনে ফিরে সত্যরঞ্জন বসু অসুস্থ সতীশচন্দ্রকে দেখেছিলেন। তিনি লিখেছেন : 'শীতের ছুটির পর আশ্রমে গিয়ে শুনুলুম সতীশবাবু বসন্ত রোগে আক্রান্ত।...আশ্রমে কোদে [কোদো] আর কে যেন আছেন—সতীশবাবুর পরিচর্য্যার জন্যে। অত্যন্ত আগ্রহ নিয়ে তাঁকে দেখতে গিয়েছি। বাইরে জানালা দিয়ে দেখা যায়। লেবরেটরী ঘরের মেঝের উপর যেন তিনি ধ্যানমগ্ন হয়ে নীরবে বসে রয়েছেন। আমাকে বেশীক্ষণ দাঁড়াতে দেওয়া হলো না।'[৯২] লাবণ্যলেখা চক্রবর্তী লিখেছেন : 'সতীশচন্দ্র বসন্তরোগে আক্রান্ত হইয়াছেন শুনিয়া অজিতকুমার শান্তিনিকেতন যাত্রা করিতে উদ্যত হন। তাঁহার মনের অবস্থা দেখিয়া তাঁহার জননীও বিপদের মুখে তাঁহাকে ছাড়িয়া দিতে আপত্তি করেন নাই। রবীন্দ্রনাথও এই সঙ্গে যাইবেন এইরূপ স্থির হয়; কিন্তু সময় যে এরূপ আসন্ন তাহা তাঁহারা অনুমান করিতে পারেন নাই—সতীশচন্দ্রের সহিত তাঁহাদের শেষ দেখা হইল না। 'অজিত' 'অজিত' বলিতে বলিতে সতীশচন্দ্র প্রাণত্যাগ করিয়াছেন শুনিয়া অজিতকুমারের বুকে যেন শেল বিদ্ধ হইল।'[৯৩] ১৮ মাঘ [সোম 1 Feb] মাঘীপূর্ণিমার দিনে সতীশচন্দ্রের মৃত্যু হয়।

রবীন্দ্রনাথের বুকেও শেল বিঁধেছিল, কিন্তু আপাতত তিনি বিদ্যালয় ও ছাত্রদের জন্য বেশি উদ্বিগ্ন হয়েছেন। বসন্ত রোগের সংক্রমণের ভয়ে তিনি কিছুদিনের জন্য বিদ্যালয়কে শিলাইদহে স্থানান্তরিত করার সিদ্ধান্ত নিলেন। ১৮ মাঘ তিনি শিলাইদহে যান; সেখানে থেকে 'সোমবার'ই চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়কে লেখেন : 'বিদ্যালয়ের একটি অধ্যাপক সাংঘাতিক পীড়ায় আক্রান্ত বলিয়া আমি সম্প্রতি অত্যন্ত ক্ষুব্ধ চিত্তে আছি।...শিলাইদহে কিছুদিনের জন্য বিদ্যালয় স্থানান্তরিত হইতেছে তাহা লইয়া বিশেষ ব্যস্ত থাকিতে হইয়াছে।'[৯৪]

সত্যরঞ্জন বসু লিখেছেন : 'পরের ট্রেনেই কলকাতা ফিরে এসে শিলাইদহ যাত্রার ব্যবস্থা হলো। কুষ্টিয়া থেকে নৌকো করে শিলাইদহে আসা গেল। কুঠিবাড়ীতে বিদ্যালয়—অধ্যাপক ও ছেলেরা থাকে। গুরুদেব বোটে—নদীতে। বিস্তীর্ণ দীর্ঘ লতাবিতানে আমাদের পাঠের স্থান—খেলার স্থানও বটে।'[৯৫]

মোহিতচন্দ্র সেন বিদ্যালয়ে যোগ দিতে মনস্থ করেছিলেন। 'সতীশের মৃত্যুতে আমার জীবন ও কর্ম্মের মধ্যে আর খানিকটা শূন্যতা বৃদ্ধি হইল' দিয়ে আরম্ভ করে রবীন্দ্রনাথ তাঁকে কুষ্টিয়া হয়ে শিলাইদহে আসার পথঘাটের বর্ণনা একটি তারিখহীন পত্রে নিখুঁতভাবে লিখে দিয়েছেন। মোহিতচন্দ্র সপরিবারে আসবেন বলে তাঁকে এও লিখেছেন : 'যদি মনে করেন রাত্রে আসিলে খুকীর [মোহিতচন্দ্রের কন্যা মীরা] ঠাণ্ডা লাগিবে তবে চাঁদপুর মেলে আসিবেন।' পত্রটি তিনি শেষ করেছেন ছাত্রদের আসার সংবাদ দিয়ে : 'আজ এখনি ওপারে

ছেলেরা আসিয়া পৌঁছিয়াছে—একবার তাহাদের দেখিতে চলিলাম।’[৯৬] এর থেকে মনে হয়, পত্রটি ২০।২১ মাঘে লেখা।

পুনশ্চ আর একটি পত্রে তিনি মোহিতচন্দ্রকে লিখেছেন : ‘যদি ষ্টেশনে গিয়ে কাউকে না দেখতে পান তবে ষ্টেশনমাষ্টার Dee সাহেবকে আমার উল্লেখ করে আপনার পরিচয় দিলে আপনাদের সমস্ত সুবিধাজনক বন্দোবস্ত তিনি করে দেবেন। তিনি Irishman; আমার অত্যন্ত অনুগত। জগদীশ এখানে আসবার সময় তাঁর ওখানেই আহারাদি করে নেন। একথা বলবার তাৎপর্য্য এই যে কুষ্টিয়ায় আপনারা অসহায় নন একথা জেনে রাখ্‌লে অনেকটা সাহস পাবেন।’[৯৭] রথীন্দ্রনাথ তাঁর প্রথমবার শিলাইদহ ভ্রমণের কথা বলতে গিয়ে এঁর সম্বন্ধে লিখেছেন: ‘ষ্টেশনে নামতেই বাবাকে অভ্যর্থনা করলেন একজন ইংরেজ। তাঁর একটি পা ছিল না। তিনিই স্টেশনমাস্টার, পরে জানলুম। বহুকাল ধরে কুষ্টিয়া ষ্টেশনে তিনি ছিলেন—অতিশয় ভদ্র বলে সকলে তাঁকে খাতির করত।’[৯৮] রবীন্দ্রনাথের চিঠি থেকে জানা যাচ্ছে, তিনি আইরিশম্যান ছিলেন।

মোহিতচন্দ্র সম্ভবত ১ ফাল্গুন [শনি 13 Feb] থেকে কাজে যোগ দেন। ৬ ফাল্গুন [বৃহ 18 Feb] রবীন্দ্রনাথ দীনেশচন্দ্র সেনকে জানিয়েছেন : ‘মোহিতবাবু আসিয়া বিদ্যালয়ে অধ্যাপনা ও অন্যান্য অনেক বিষয়ে বিশেষ উন্নতি হইয়াছে।’[৯৯] ৩ চৈত্র রবীন্দ্রনাথের ক্যাশবহির হিসাব : ‘মহিতচন্দ্র সেন ফাল্গুনের বেতন ২০০; রবীন্দ্রনাথ যদিও ভাদ্র ১৩১০ থেকে ১৫০্ টাকার পরিবর্তে ৫১০্ টাকা করে মাসোহারা পাচ্ছিলেন, তবু নিজস্ব তহবিল থেকে মোহিতচন্দ্রকে দু’শ টাকা বেতন দেওয়া তাঁর পক্ষে কষ্টকর ছিল—মোহিতচন্দ্র নিজেই এই অঙ্ক দাবী করেছিলেন কিনা জানা নেই, কিন্তু বিশিষ্ট বন্ধুর সম্মানার্থে অগত্যা এই ব্যয় তাঁকে স্বীকার করতে হয়েছে।

বঙ্গদর্শন-এর ফাল্গুন-সংখ্যায় [৩।১১] রবীন্দ্রনাথের তিনটি রচনা মুদ্রিত হয়। পত্রিকাটি প্রকাশিত হয়েছিল 20 Feb [শনি ৮ ফাল্গুন] :

৫২১-৩৬ ‘ধর্ম্মপ্রচার’ দ্র ধর্ম ১৩।৩৭৬-৮৩

৫৩৯-৪৯ ‘নৌকাডুবি’ ২৯ দ্র নৌকাডুবি ৫।২৫২-৬১ [২৭]

৫৪৯-৫৩ ‘মনুষ্যত্ব’ দ্র ধর্ম ১৩।৩৪৮-৫২

তত্ত্ববোধিনী, ফাল্গুন ১৮২৫ শক [৭২৭ সংখ্যা] :

১৬৭-৭০ [মাঘোৎসবের প্রাতঃকালীন অনুষ্ঠানে উপদেশ] দ্র ধর্ম ১৩।৩৪৮-৫২ [‘মনুষ্যত্ব’]

১৭৩-৭৪ [মাঘোৎসবের সায়ংকালীন অনুষ্ঠানে উদ্বোধন]

১৭৪-৮০ [মাঘোৎসবের সায়ংকালীন অনুষ্ঠানে উপদেশ] দ্র ধর্ম ১৩।৩৪১-৪৮ [‘দিন ও রাত্রি’]

১৮১ দেশ-মল্লার-কাওয়ালি। আমার এ ঘরে আপনার করে দ্র গীত ১।৪৮-৪৯

১৮১ নায়েকী কানাড়া-একতালা। জীবনে আমার যত আনন্দ দ্র গীত ১।১৯৭

কাব্যগ্রন্থ নবম ভাগ তৃতীয় খণ্ড প্রকাশিত হল 20 Feb [শনি ৮ ফাল্গুন]। গ্রন্থটির আখ্যাপত্র :

কাব্য-গ্রন্থ।/৯ম ভাগ।/নাট্য।/৩য় খণ্ড।/শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।/শ্রীমোহিতচন্দ্র সেন এম, এ,/সম্পাদক।

[পরপৃষ্ঠায়] প্রকাশক—এস, সি, মজুমদার।/২০ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা,/মজুমদার লাইব্রেরী।/ কলিকাতা—২০ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্,/দিনময়ী প্রেসে মুদ্রিত।/১৩১০ সন।

পৃষ্ঠাসংখ্যা : ২ + ২ + ১৭০; মুদ্রণসংখ্যা : ১১০০।

এই খণ্ডে কেবল রাজা ও রানী কাব্যনাট্যটি মুদ্রিত হয়।

পূজাবকাশের অল্প পরে অগ্রহায়ণ মাসে ভূপেন্দ্রনাথ সান্যাল বিদ্যালয়ের শিক্ষকপদে যোগ দেন। সত্যরঞ্জন বসু লিখেছেন : 'সেখানে [শিলাইদহে] নতুন অধ্যাপক আস্‌লেন মনে হয় নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য ও নগেন্দ্রনাথ আইচ। নরেনবাবু কবি ও শিল্পী আমাদের বাংলা পড়াতেন, নগেনবাবু ড্রইং শেখাতেন।'[১০০] নরেন্দ্রনাথ অবশ্য পুরোনো শিক্ষক, এটি তাঁর পুনঃপ্রবেশ—কিন্তু বেশিদিন টিঁকতে পারেননি। খুলনা জেলার অধিবাসী, সদ্য ভার্নাকুলার ট্রেনিং-প্রাপ্ত নগেন্দ্রনাথ আইচ [1878-1956] দীর্ঘকাল বিদ্যালয়ের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন।*

সাত্ত্বিক প্রকৃতির ভূপেন্দ্রনাথ সান্যাল রবীন্দ্রনাথের আদর্শে ব্রহ্মচর্যাশ্রমের উপযুক্ত শিক্ষক ছিলেন। তাঁর সেবাপরায়ণতাও বিখ্যাত—ছাত্রদের সন্তানস্নেহে লালন করার বহু ইতিবৃত্ত তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ ছাত্রদের স্মৃতিকথায় পাওয়া যায়। সেই কারণেই তাঁকে নিয়ে রবীন্দ্রনাথ এক নূতন পরীক্ষায় প্রবৃত্ত হন। ব্রহ্মবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার সময়ে তিনি ছাত্রদের ব্রহ্মদীক্ষা দিয়েছিলেন, এবার তিনি প্রাচীন ভারতীয় আদর্শে তাদের ব্রহ্মচর্যে দীক্ষিত করতে চাইলেন। প্রথমে ছাত্রদের মধ্য থেকে তিনজনকে বেছে নিয়ে রবীন্দ্রনাথ, মোহিতচন্দ্র ও ভূপেন্দ্রনাথ আচার্য হয়ে যথাক্রমে সন্তোষচন্দ্র, রথীন্দ্রনাথ ও সরোজচন্দ্র [ভোলা]-কে দীক্ষিত করলেন। ভূপেন্দ্রনাথ লিখেছেন : 'এই তিনটি ব্রহ্মচারীর কার্যকলাপের উপর বিশেষ লক্ষ্য রাখা হইল এবং আমরা তিনজনে প্রায়ই এই তিনটি ছাত্রকে লইয়া ব্রহ্মচর্য সম্বন্ধে বিশেষভাবে উপদেশ দিতে লাগিলাম। ঠিক হইল ইঁহারা তিনজনে আদর্শ জীবনযাপন করিবে এবং তাহারা অন্য সমস্ত ছাত্রদের ক্রিয়াকলাপ পর্যবেক্ষণ করিবে এবং বিদ্যালয়ের আদর্শ যাহাতে ক্ষুণ্ণ না হয়, এজন্য এই তিনজন অন্যান্য ছাত্রদের উপর বিশেষ লক্ষ্য রাখিবে, ও তাহাদিগের সহিত মধ্যে মধ্যে সাধু আলোচনা করিবে। ইহার ফল মন্দ হয় নাই, কিন্তু এ নিয়ম বেশী দিন চলিল না।'[১০১]

রবীন্দ্রনাথ ১৮ ফাল্গুন [মঙ্গল 1 Mar] মনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়কে লিখেছিলেন : 'এখানে বিদ্যালয় তুলিয়া আনিয়া বিশেষ ব্যস্ত হইয়া আছি।...১৫ই জ্যৈষ্ঠ আবার বোলপুরে যাইব। ১৫ই বৈশাখে বিদ্যালয়ের ছুটি—ছুটির একমাসও আমি এইখানে কাটাইব মনে করিতেছি।'[১০২] কিন্তু অনতিকাল পরেই এই পরিকল্পনা বিপর্যস্ত হল। পিতার অসুখের টেলিগ্রাম পেয়ে ২৫ ফাল্গুন [মঙ্গল 8 Mar] তিনি কলকাতায় চলে আসেন। হয়তো বিদ্যালয়কে কলকাতায় এনে বিভিন্ন ধনীব্যক্তির সাহায্যে তাকে বড়ো করে তোলবার কোনো জল্পনা মোহিতচন্দ্র প্রকাশ করে থাকবেন। এ সম্পর্কে 'বুধবার' [?২৬ ফাল্গুন : 9 Mar] রবীন্দ্রনাথ তাঁকে লেখেন : 'বিদ্যালয়ে গিয়ে এবারে খুব আনন্দে ছিলুম। শিক্ষকেরা সকলেই একাগ্র উৎসাহের সঙ্গে কাজ করচেন—ছেলেদের মধ্যে বেশ একটা স্ফূর্ত্তি দেখা দিয়েছে—স্পষ্টই বুঝতে পারলুম এ জিনিষটিকে কলকাতায় উৎপাটিত করে আনা কিছুতেই সম্ভবপর ও শ্রেয়স্কর নয়। এবং এ জিনিসটি যেমন দীন এবং ক্ষুদ্র আছে এই ভাবেই আমি এ'কে রাখতে চাই—এর উপরে অত্যাকাঙক্ষার ভার চাপানো চল্‌বে না।'[১০৩] পিতা সংকটোত্তীর্ণ

হয়েছেন এই সংবাদ দিয়ে 'শুক্রবার' তাঁকে লিখেছেন : 'বিদ্যালয়ের অর্থ সংগ্রহের একটা সুযোগ উপস্থিত হয়েছে—যদি কৃতকার্য্য হই তবে নিশ্চিন্ত হওয়া যেতে পারবে। কিন্তু লোভ করব না। টাকা বেশি হাতে এলে ভাল হবে কি মন্দ হবে বলা যায় না।...টাকা জিনিষটার দোষ এই যে, সে ছোটলোকের মত ঠেলে ঠুলে সকলের চেয়ে বড়ো হয়ে উঠ্‌তে চায় এবং তার খাতিরে তার চেয়ে অনেক বড়ো জিনিষের খাতির রক্ষা করা কঠিন হয়ে ওঠে। ঈশ্বর করুন টাকার কাছে আমাদের যেন মাথা নীচু না করতে হয়।...ময়ূরভঞ্জের দ্বারে, এই কথা ভেবেই, আমি অগ্রসর হইনি।'[১০৪] কার কাছে থেকে তিনি অর্থের প্রতিশ্রুতি পেয়েছিলেন জানা যায় না, কিন্তু তাঁর জীবৎকালে বিদ্যালয় কোনদিনই অর্থাভাব থেকে মুক্তি পায়নি।

এবারে ২ চৈত্র পর্যন্ত তিনি কলকাতায় থাকেন। এর মধ্যে তিনি জগদীশচন্দ্রের বাড়ি গেছেন ২৭, ২৮ ও ৩০ ফাল্গুন এবং ২ চৈত্র। ৩০ ফাল্গুন [রবি 13 Mar] তিনি মোহিনীমোহন চট্টোপাধ্যায়ের বাড়িও যান। এইদিন গগনেন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠপুত্র গেহেন্দ্রনাথের সঙ্গে মৃণালিনী দেবীর বিবাহ হয় মহাসমারোহে। বিখ্যাত পর্তুগীজ বাদক মিঃ লোবোর ব্যাণ্ডপার্টিকে বাজনার দায়িত্ব দেওয়া হয়। পূর্ণিমা চট্টোপাধ্যায় লিখেছেন : 'ব্যাণ্ডে বাংলা গান বাজান হয় দিদিমাকে শোনাবার জন্য।'[১০৫] গানগুলি হল রবীন্দ্রনাথের 'শান্ত হ'রে মম চিত্ত নিরাকুল' ও 'শান্তি কর বরিষণ নীরব ধারে'। রবীন্দ্রনাথ গান-দুটির 'নোটেশন' তৈরি করেন ও ইন্দিরা দেবী তাকে 'হারমোনাইজ' করেন।'[১০৬]

চৈত্র-সংখ্যা বঙ্গদর্শন-এর [৩।১২] প্রকাশ-তারিখ 20 Mar [রবি ৭ চৈত্র]। এই সংখ্যাতে রবীন্দ্রনাথের রচনা দুটি :

৫৬৫-৮০ 'নৌকাডুবি' ৩০-৩২ দ্র নৌকাডুবি ৫।২৬২-৭৪ [২৮-৩০]

৫৯৩-৯৬ 'পরলোকগত সতীশচন্দ্র রায়' দ্র বি. ভা. প., মাঘ-চৈত্র ১৩৫৪।২১৯-২৪

মাত্র ২১ বৎসর বয়সে সতীশচন্দ্র রায়ের মৃত্যু রবীন্দ্রনাথের 'জীবন ও কর্ম্মে আর খানিকটা শূন্যতা বৃদ্ধি' করেছিল। ব্রহ্মবান্ধব ও রেবাচাঁদ রবীন্দ্রনাথের কাজে নিঃস্বার্থভাবে যোগ দিয়েছিলেন, সতীশচন্দ্র সেই কাজে তাঁর জীবন উৎসর্গ করে দেন। অসীম সম্ভাবনাপূর্ণ মহৎ এই জীবনের অপমৃত্যু বেদনাহত চিত্তে তাই প্রায় সারাজীবন রবীন্দ্রনাথ বিভিন্ন প্রসঙ্গে স্মরণ করেছেন। বর্তমান রচনাটি তার মধ্যে প্রথমতম। এইটিকেই কিঞ্চিৎ পরিবর্ধিত করে রবীন্দ্রনাথ সতীশচন্দ্রের 'গুরুদক্ষিণা' [১৩১১] গ্রন্থের ভূমিকা হিসেবে ব্যবহার করেছেন।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, চৈত্র ১৮২৫ শক [৭২৮ সংখ্যা] :

১৮৪-৯৮ 'ধর্ম্মপ্রচার' দ্র ধর্ম ১৩।৩৭৬-৮৩

এটি ফাল্গুন-সংখ্যা বঙ্গদর্শন-এ মুদ্রিত ভাষণটির পুনর্মুদ্রণ।

সঙ্গীত-প্রকাশিকা, চৈত্র ১৩১০ শক [৩।৭] :

১১৭-১৯ ভৈরবী-একতালা। কেন যামিনী না যেতে জাগালে না দ্র স্বর ৫০

১২৫-২৭ রাজ বিজয়-তেওরা। সংশয়-তিমির-মাঝে না হেরি গতি হে দ্র স্বর ৪৫

দুটি গানেরই স্বরলিপি-কারের নাম অনুল্লেখিত।

২ চৈত্রের [মঙ্গল 15 Mar] পর রবীন্দ্রনাথ শিলাইদহে গিয়ে মাসের শেষ পর্যন্ত সেখানে অবস্থান করেন। এই সময়ে তাঁর স্বাস্থ্য ভালো নয়। গত বছর হাজারিবাগে থাকার সময়ে জ্বর হয়ে যে স্বাস্থ্যভঙ্গ হয়েছিল, তার জের চলেছে দীর্ঘদিন। ৯ চৈত্র [মঙ্গল 22 Apr] তিনি দীনেশচন্দ্র সেনকে লিখেছেন : 'আমার শরীর সুস্থ নহে', ১৫ চৈত্র ব্রজেন্দ্রকিশোর দেববর্মাকে লিখেছেন : 'মাঝে কলিকাতায় যাইতে হইয়াছিল—তখন আমার শরীর বড় ভাল ছিল না। এখানে তাহা অপেক্ষা কতকটা সুস্থ বোধ করিতেছি', কিন্তু ২৯ চৈত্র [সোম 11 Apr]-তেই মনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়কে লেখেন : 'আমার শরীর বড় ভাল নয়। রোজই অল্প অল্প জ্বর আসিয়া ক্লান্ত করিয়া ফেলিয়াছে। ডাক্তারের সহিত পরামর্শের জন্য একবার কাল কলিকাতায় যাইব।'[১০৭] পরদিন ৩০ চৈত্র [মঙ্গল 12 Apr] তিনি চিকিৎসার জন্য কলকাতায় আসেন। ৫ বৈশাখ ১৩১১ [রবি 17 Apr] Dr. Harris তাঁকে পরীক্ষা করেন। ডাক্তার তাঁকে বায়ু-পরিবর্তনের পরামর্শ দেন। ১১ বৈশাখ [শনি 23 Apr] তিনি পুত্র-কন্যাদের নিয়ে মজঃফরপুরে জামাতাগৃহে আশ্রয় নেবার জন্য রওনা হন।

ইতিমধ্যে শিলাইদহে বিদ্যালয়ের স্বাস্থ্যও ভালো চলছিল না। ভূপেন্দ্রনাথ সান্যাল লিখেছেন :

আমরা যে ভয়ে শান্তিনিকেতন হইতে সুদূর শিলাইদহে চলিয়া আসিলাম কয়েক মাস পরেই এখানে আবার ছাত্রদের মধ্যে সেই বসন্ত রোগ আসিয়া দেখা দিল। কয়েকটি ছাত্রকে লইয়া আমরা বড় ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িলাম। বাধ্য হইয়া শীঘ্রই বিদ্যালয়ে গ্রীষ্মবকাশ দিয়া বালকদিগকে গৃহে পাঠাইবার ব্যবস্থা ঠিক করিতে হইল। সমস্ত ছাত্র ও শিক্ষকেরা নিজ নিজ গৃহে চলিয়া গেলেন। একটি ছাত্রকে লইয়া আমরা বড় বিপন্ন হইয়া পড়িলাম। বসন্তের সহিত তাহার উদরাময় দেখা দিল। এই বালকটি [?প্রিয়নাথ শাস্ত্রীর পুত্র শমীনাথ শাস্ত্রী] সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের আত্মীয় ছিলেন। সুরেন্দ্রবাবু সেই সময় কাছারীর কাজ দেখিবার জন্য শিলাইদহে উপস্থিত ছিলেন। তিনি আমাদের সহিত এই বালকটির শুশ্রূষায় যোগদান করিলেন। এই সময় সন্তোষের খেলিতে খেলিতে হঠাৎ পায়ে খুব আঘাত লাগিল, সে শয্যাগত হইয়া পড়িয়া রহিল। নগেন্দ্রবাবু রথীন্দ্রনাথ ও আরও কতিপয় ছাত্র সেবাকার্যে বিশেষ সাহায্য করিতে লাগিলেন। রোগীকে আর বেশী দিন এখানে রাখা উচিত মনে হইল না, কলিকাতায় চিকিৎসার জন্য সুরেন্দ্রবাবু বালকটিকে লইয়া গেলেন। আমি ও অন্য ২।১ জন শিক্ষক রুগ্ন বালকদিগকে কলিকাতায় তাহাদের গৃহে পৌঁছাইয়া দিয়া বাড়ি চলিয়া গেলাম।[১০৮]

এটি নিশ্চয়ই ফাল্গুনের শেষ বা চৈত্রের শুরুর ঘটনা। ৯ চৈত্র [মঙ্গল 22 Mar] রবীন্দ্রনাথ মনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়কে লিখেছিলেন : 'সুবোধ ইতিমধ্যে পদ্মাস্রোতে স্নান করিতে গিয়া পা মচকাইয়া পড়িয়াছিল—সেই অবধি নিজের পদসেবায় অহরহ নিযুক্ত আছে। সন্তোষও সপ্তাহ দুয়েক পা ভাঙিয়া চিকিৎসাধীনে আছে। মোহিতবাবুরও সেই অবস্থা। অধ্যাপকদিগকে স্ব-স্ব পদমর্য্যাদা রক্ষার জন্য বিশেষ করিয়া সতর্ক করিয়া দিয়াছি।'[১০৯] রবীন্দ্রনাথ এই পত্রেও আষাঢ়ের আরম্ভ পর্যন্ত শিলাইদহে থাকার কথা লিখেছেন বটে, কিন্তু ছাত্রদের মধ্যে রোগের বিস্তার বন্ধ করার জন্য সম্ভবত কিছুদিনের মধ্যেই বিদ্যালয় ছুটি দিয়ে দিতে হয়।

'শনিবার' [*12 Mar: ২৯ ফাল্গুন] মোহিতচন্দ্রের স্ত্রী সুশীলা দেবীকে রবীন্দ্রনাথ একটি পত্র লিখে বন্ধুর পায়ের জন্য উদ্বেগ প্রকাশ করে লিখেছেন : 'তিনি গুরুপদ গ্রহণ করেই শিষ্যদের দিয়ে পদসেবা করিয়ে নেবার একটি উপায় গ্রহণ করেচেন। কিন্তু এর চেয়ে সুবিধামত একটা উপায় যদি ঠাওরাতে পারতেন তবে ভাল হত।' অবশ্য শুধু ঠাট্টা করেই তিনি এই দীর্ঘ পত্রটি শেষ করেননি, বন্ধুর আরোগ্যের জন্য খুঁটিনাটি নির্দেশ-সহ একটি 'সূক্ষ্ম আয়ুর্ব্বেদের' বিধানও লিখে পাঠিয়েছেন। অন্যথায় মোহিতচন্দ্রকে এবং তাঁর মতো 'অকর্ম্মণ্য কবি'কে বিশ্বাস করতে না পারলে সুশীলা দেবীকেও জোড়াসাঁকো-বাড়িতে থেকে চিকিৎসা করানোর জন্য আহ্বান করেছেন। অন্তরঙ্গ মানুষদের জন্য এইরূপ চিন্তাভাবনা রবীন্দ্রপ্রকৃতির একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

রবীন্দ্রনাথ দেশভ্রমণকেও শিক্ষার অঙ্গ বলে মনে করতেন। পিতার সঙ্গে হিমালয় ও গঙ্গা-পদ্মা ভ্রমণের অভিজ্ঞতা তাঁর মনে ছিল। তাই বালক রথীন্দ্রনাথকেও তিনি মাঝেমাঝেই কুষ্টিয়া-শিলাইদহ, দার্জিলিং-

কার্সিয়াং, শান্তিনিকেতন বা উড়িষ্যায় নিয়ে গেছেন। এখন তিনি স্বাধীনভাবে তাঁকে দেশভ্রমণের সুযোগ করে দিলেন। ২৪ চৈত্র [বুধ 6 Apr] রথীন্দ্রনাথ ও দিনেন্দ্রনাথ শিলাইদহ থেকে কলকাতা ফেরেন ও ২৭ চৈত্র [শনি 9 Apr] তাঁরা দুজনে পুরী যাত্রা করেন। পুরী থেকে ফিরে আসার পর রবীন্দ্রনাথ রামকৃষ্ণ মিশনের সন্ন্যাসী স্বামী সদানন্দের অভিভাবকত্বে তাঁকে বদরিকাশ্রমে প্রেরণ করেন।

প্রাসঙ্গিক তথ্য : ১

রবীন্দ্রনাথের মধ্যমা কন্যা রেণুকার যক্ষ্মারোগের লক্ষণ প্রকাশ পেয়েছিল গত বৎসরের মাঝামাঝি। প্রথমদিকে sore throat ও জ্বরের সাধারণ চিকিৎসার পর হাওয়া-বদলের জন্য তাঁকে নিয়ে যাওয়া হয় মধুপুরে ও হাজারিবাগে—সেখানে বিশেষ উপকার না হওয়ায় বর্তমান বৎসরের গোড়ায় তাঁকে আলমোরা পাহাড়ে নিয়ে গিয়ে রাখা হয়। তখনও যক্ষ্মারোগের অ্যালোপ্যাথিক ওষুধ আবিষ্কৃত হয়নি, তাই রবীন্দ্রনাথ যথারীতি নির্ভর করেছেন হেমিয়োপ্যাথির উপর। কিন্তু কোনোভাবেই রোগের উপশম না হওয়ায় ১২ ভাদ্র [শনি 29 Aug] রবীন্দ্রনাথ সদলবলে কলকাতায় ফিরে আসেন, মায়ের মৃত্যুর প্রায় সাড়ে ন'মাস পরে জোড়াসাঁকোর লালবাড়িতে রেণুকার মৃত্যু হয় ২৮ ভাদ্র [সোম 14 Sep] তারিখে।

হিতেন্দ্রনাথের প্রথম পুত্র ও কনিষ্ঠ সন্তান হৃদিন্দ্রনাথের জন্ম হয় আষাঢ় মাসের গোড়ায়। মহর্ষি-বংশে হেমেন্দ্রনাথের শাখায় জ্যেষ্ঠ পুরুষসন্তান তিনি, সুতরাং তাঁর 'আটকড়িয়া' বা জাতকর্ম এবং অন্নপ্রাশন হয় সমারোহের সঙ্গে—অন্নপ্রাশনের তারিখ ১১ চৈত্র [বৃহ 24 Mar 1904]।

হিতেন্দ্রনাথের বোন সুনৃতা দেবী যমজ সন্তান প্রসব করেন ১০ আষাঢ় [বৃহ 25 Jun], কিন্তু জন্মের পরেই তাদের মৃত্যু হয়। স্মরণ করা যেতে পারে, সুনৃতার বিবাহ হয়েছিল রেণুকার সঙ্গে একই দিনে ২৪ শ্রাবণ ১৩০৮ [শুক্র 9 Aug 1901] তারিখে।

সুরেন্দ্রনাথের বিবাহের জন্য কন্যানুসন্ধানের কয়েকটি ব্যর্থ প্রয়াসের বিবরণ আমরা আগেই দিয়েছি। শেষপর্যন্ত তাঁর বিবাহ হয় প্রিয়নাথ শাস্ত্রীর মধ্যমা কন্যা সংজ্ঞা দেবীর সঙ্গে। ইন্দিরা দেবী লিখেছেন : 'শ্রীমতী সংজ্ঞাদেবী তাঁর ভাইয়ের পৈতেতে আমাদের নিমন্ত্রণ করতে এলেন। গয়না কাপড় পরে সেজেগুজে পাউডার মেখে মেয়েটিকে ভালোই দেখাচ্ছিল। ওঁদের পরিবারের নাকমুখ বেশ টিকলো, কেবল চোখ একটু বসা,...উক্ত মেয়েটিকে দেখে সুহৃৎ [চৌধুরী]...মাকে বললেন, "মেজদিদি, এই ত বেশ মেয়ে হাতের কাছে রয়েছে। একেই বউ করুন না"—এই ভাবের কথা।'[১০৯ক] বিবাহ হয় ২১ আষাঢ় [সোম 6 Jul]। প্রিয়নাথ শাস্ত্রী মহর্ষির শেষজীবনের প্রিয় অনুচর ছিলেন, তাই 'শ্রীযুক্ত কর্ত্তাবাবু মহাশয়ের আদেশ মত' তাঁর কন্যার বিবাহের সমস্ত খরচ সরকারী ক্যাশ থেকে দেওয়া হয়। সত্যেন্দ্রনাথের একমাত্র পুত্রের বিবাহে পাত্রপক্ষেও সমারোহের অভাব হয়নি। ভারত সংগীতসমিতির কাছ থেকে কালীপ্রসন্ন সিংহের বাড়িটি পাঁচ দিনের জন্য ভাড়া নেওয়া হয়—'বঃ জে এফ ম্যাডান দং পাশী থিয়েটার হওয়ায় ৩৩০্' টাকা ব্যয় থেকে সমারোহের প্রকৃতিটি বুঝে নেওয়া যায়। মোট ব্যয়ের পরিমাণ ৫৫৯৮।৷৯। বিবাহের সময় সুরেন্দ্রনাথের বয়স একত্রিশ ও সংজ্ঞা দেবীর বারো।

২৭ আষাঢ় [রবি 12 Jul] হেমেন্দ্রনাথের কনিষ্ঠা কন্যা সুদক্ষিণা দেবীর বিবাহ হয় উত্তরপ্রদেশের 'বুধাওনের অধিবাসী হরদৈ জেলার জমিদার জ্বালাপ্রসাদ পাণ্ডে'র[১১০] সঙ্গে। আন্তঃপ্রাদেশিক ও আন্তঃসামাজিক এই বিবাহটি তখন সংবাদপত্রের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল; *The Indian Mirror* থেকে উদ্ধৃত করে 'Inter-Racial Marriage' শিরোনামায় *The Bengalee* [17 Jul] লেখে :

...a grand-daughter (son's daughter) of Maharshi Devendra Nath Tagore was married to a Hindusthani Satutory Civilian; according to the rites obtaining in the Adi Brahino Samaj. The bridegroom is Mr. Juala Prosad who is a member of the Arya Samaj of Upper India In these days of Congresses and Conferences, such marriages are indeed calculated to strengthen the bonds of nationality in the country; and conduce to the best interests of Indian unity.

—উক্ত বিবাহে ব্যয়ের পরিমাণ ৬৬৯৮ল০।

গগনেন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠ পুত্র গেহেন্দ্রনাথের [1888-1904] সঙ্গে মৃণালিনী দেবীর বিবাহ হয় ৩০ ফাল্গুন [রবি 13 Mar 1904]।[১১১] সমারোহপূর্ণ এই বিবাহের খুঁটিনাটি বিবরণ পাওয়া যাবে পূর্ণিমা দেবী [চট্টোপাধ্যায়]র 'ঠাকুরবাড়ির গগনঠাকুর' [পৃ ৫৯-৭৫] ও মোহনলাল গঙ্গোপাধ্যায়ের 'গগনেন্দ্রনাথ' [পৃ ২৮-৩৬] গ্রন্থে। দুঃখের বিষয়, পরের বছর বৈশাখ মাসেই গেহেন্দ্রনাথের মৃত্যু হয়।

গগনেন্দ্রনাথের বোন বিনয়িনী দেবী ও শেষেন্দ্রভূষণ চট্টোপাধ্যায়ের দ্বিতীয়া কন্যা প্রতিমা দেবীর [1893-1969] সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সেন্ট জেভিয়ার্স স্কুলের সহপাঠী নীরদনাথ মুখোপাধ্যায়ের কনিষ্ঠ পুত্র নীলানাথের বিবাহ হয় ফাল্গুন মাসে। এই বিবাহও দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। পরের বছর বৈশাখ মাসেই গঙ্গায় ডুবে নীলানাথের মৃত্যু হয়। প্রতিমা দেবীর দ্বিতীয় বিবাহ হয় ১৪ মাঘ ১৩১৬ [বৃহ 27 Jan 1910] রবীন্দ্রনাথের পুত্র রথীন্দ্রনাথের সঙ্গে।

প্রাসঙ্গিক তথ্য : ২

৩ জ্যেষ্ঠ [রবি 17 May] মহর্ষির সপ্তাশীতিতম জন্মোৎসব নিশ্চয়ই অন্যান্য বৎসরের মতো তিন ব্রাহ্মসমাজের সদস্যদের উপস্থিতিতে পালিত হয়েছিল, কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, তত্ত্ববোধিনী-তে উৎসবটির কোনো বিবরণ মুদ্রিত হয়নি।

অবশ্য ৭ পৌষ [মঙ্গল 22 Dec] কলকাতায় 'শ্রীমন্মহর্ষিদের দীক্ষাদিন' পালনের বিবরণ যথাযোগ্য মর্যাদায় মুদ্রিত হয় : 'ধর্ম্মপ্রাণ শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র দত্ত প্রভৃতি শ্রদ্ধেয় ব্রাহ্ম বন্ধুগণ এই দিনের পুণ্য প্রত্যূষে পবিত্র ব্রহ্মনাম কীর্ত্তন করিতে করিতে শ্রীমন্মহর্ষিদেবের ভবনে উপস্থিত হন। তথায় সাদরে গৃহীত হইয়া তাঁহারা মহর্ষিদেবের পারিবারিক ব্রহ্মমন্দিরে গিয়া ব্রহ্মোপাসনা করেন, এবং উপাসনা ও সংকীর্ত্তনান্তে শ্রীমন্মহর্ষিদেবের শ্রীচরণদর্শনাভিলাষে সকলে ত্রিতলে উপস্থিত হন। মহর্ষিদেব তাঁহাদিগকে সস্নেহে গ্রহণ করতঃ ব্রহ্মনামে উত্তেজিত হইয়া...অমৃতময় উপদেশ দেন।'

এইদিন শান্তিনিকেতনে এয়োদশ সাম্বৎসরিক ব্রহ্মোৎসবে প্রাতঃকালীন উপাসনায় প্রিয়নাথ শাস্ত্রী, চিন্তামণি চট্টোপাধ্যায় ও শিবধন বিদ্যার্ণব বেদিগ্রহণ করার পর প্রিয়নাথ শাস্ত্রী উদ্বোধন ও ভাষণ পাঠ করেন। 'পরে সত্যেন্দ্র বাবু একটী উপদেশ দেন। তাঁহার উপদেশে বিনয়ের ভাব যথেষ্ট পরিমাণে লক্ষিত হইয়াছিল।'

ত্রৈলোক্যনাথ সান্যাল কীর্তন করতে করতে ছাতিমতলায় যান, 'তাঁহার পশ্চাতে নগ্নপদে বিদ্যালয়ের বালকগণ অনুগমন করাতে একটা অপূর্ব্ব শোভা হইয়াছিল।' সায়ংকালে রবীন্দ্রনাথ উপদেশ দেন, শিবধন বিদ্যার্ণব বক্তৃতা পাঠ করেন ও চিন্তামণি চট্টোপাধ্যায় প্রার্থনা করেন। রবীন্দ্রনাথ 'দিন ও রাত্রি' প্রবন্ধটি এখানে পাঠ করেন, কিন্তু তত্ত্ববোধিনী-র প্রতিবেদনে তার উল্লেখ নেই। দুপুরে বিদ্যালয়ের অল্পবয়স্ক ছাত্রেরা ও রাত্রে অপেক্ষাকৃত বড়ো ছাত্রেরা 'বিসর্জন' অভিনয় করে। মোহিতচন্দ্র সেন, অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় প্রভৃতি অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তি এই উৎসবে উপস্থিত ছিলেন। উৎসব উপলক্ষে মোট ব্যয় হয় ৩৪৪৮ ´৩।

তত্ত্ববোধিনী-র মাঘ-সংখ্যার সঙ্গে একটি স্বতন্ত্র কাগজে যোগেন্দ্রনাথ শিরোমণির স্বাক্ষরে এই বিজ্ঞপ্তিটি মুদ্রিত হয় : 'শ্রীমন্মহর্ষিদেবের/আত্ম-চরিত।/শ্রীযুক্ত পণ্ডিত প্রিয়নাথ শাস্ত্রী কর্ত্তৃক প্রকাশিত।/পূজ্যপাদ শ্রীমন্মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্বরচিত জীবন-চরিত মুদ্রিত হইয়া এতদিন অপ্রকাশিত ছিল। কিন্তু এই গ্রন্থপাঠেচ্ছু অসংখ্য লোকের আগ্রহ দেখিয়া সেই সমাধিমগ্ন অনাসক্ত মহর্ষিদেবের অনুমতি গ্রহণ পূর্ব্বক এখন তাহা সাধারণ্যে প্রকাশিত হইল।...' মহর্ষি তাঁর জীবৎকালে গ্রন্থটি প্রকাশ করতে নিষেধ করেছিলেন, তাই মুদ্রিত হয়েও এতদিন সাধারণ্যে অপ্রকাশিত ছিল। গ্রন্থটি প্রকাশিত হওয়াতে এর পরে মহর্ষি সম্বন্ধে আলোচনা ব্যাপকতর হয়ে ওঠে।

১১ মাঘ [সোম 25 Jan] চতুঃসপ্ততিতম সাম্বৎসরিক ব্রাহ্মসমাজ উপলক্ষে আদি ব্রাহ্মসমাজ গৃহে প্রাতঃকালীন উপাসনায় রবীন্দ্রনাথ শিবধন বিদ্যার্ণব ও চিন্তামণি চট্টোপাধ্যায়কে নিয়ে বেদিগ্রহণ করার পর 'ভক্তিভাজন শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর বেদির সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া' 'ভারতবাসীর প্রতি মহর্ষিদেবের কল্যাণ-বাণী'-শীর্ষক একটি রচনা পাঠ করেন। এর পরে রবীন্দ্রনাথ একটি উপদেশ পাঠ করেন ['মনুষ্যত্ব', দ্র ধর্ম ১৩।৩৪৮-৫২]।

মহর্ষিভবনে সায়ংকালীন উপাসনায় উক্ত তিনজনেই বেদিগ্রহণ করেন। দ্বিজেন্দ্রনাথ এই অনুষ্ঠানেও একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন। রবীন্দ্রনাথ সকলকে উদ্বোধিত করার পর একটি উপদেশ পাঠ করেন।

এই উৎসবে রবীন্দ্রনাথ-রচিত দুটি গান ছাড়া আরও চারটি 'নূতন ব্রহ্মসঙ্গীত' গীত হয় :

সুরট জয়জয়ন্তী-ঝাঁপতাল। বিজন মন-মন্দিরে বিরাজে শিব সুন্দর [জ্যোতিরিন্দ্রনাথ]

বিহঙ্গরা-সুরফাঁকতাল। ব্রহ্মসনাতন, তুমি হে নিখিল-পালন [ঐ]

সিন্দুড়া-চৌতাল। কেন আনিলে গো এ ঘোর সংসারে [ঐ]

কালাংড়া-কাওয়ালি। চিত মন তব পদে করিনু সমর্পণ [?]

রবীন্দ্রনাথ ১২ মাঘ [মঙ্গল 26 Jan] আলোচনা সমিতির বিশেষ অধিবেশনে সিটি কলেজ হলে 'ধর্মপ্রচার' প্রবন্ধটি পাঠ করলে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের মুখপত্রগুলিতে কঠিন সমালোচনা শুরু হয়, একথা আমরা আগেই বলেছি। উক্ত সমাজের প্রধান নেতা শিবনাথ শাস্ত্রী একটি প্রচার অভিযানে বের হবার আগে ২৩ মাঘ [শনি 6 Feb] সমাজমন্দিরে 'ধর্মপ্রচার'-শীর্ষক একটি প্রবন্ধ পাঠ করে রবীন্দ্রনাথের বক্তব্যের প্রতিবাদ করেন।*

প্রাসঙ্গিক তথ্য : ৩

গত বৎসর মহাষ্টমীর দিনে [২৩ আশ্বিন ১৩০৯ : 9 Oct 1902] সরলা দেবী বীরাষ্টমী উৎসবের প্রবর্তন করেছিলেন। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল, একটি উপলক্ষ অবলম্বন করে বাংলাদেশে শক্তিচর্চার প্রসার। এই লক্ষ্য যে সফল হয়েছিল তার প্রমাণ, বহরমপুর প্রাদেশিক সম্মেলনে তাঁর আহ্বানে Olympic Games-এর আয়োজন। বর্তমান বৎসরে তিনি সেই লক্ষ্যকে জাতীয় বীরের পূজানুষ্ঠানে এগিয়ে নিয়ে গেলেন। টিলক মহারাষ্ট্রে 1895-এ শিবাজী-উৎসবের সূচনা করেছিলেন, সখারাম গণেশ দেউস্কর গত বৎসর [৭ আষাঢ় : 21 Jun 1902] কলকাতায় তার প্রবর্তন করেন। সরলা দেবী তাকে পরিবর্তিত করলেন প্রতাপাদিত্য-উৎসবে। তিনি তাঁর আত্মজীবনীতে তারিখটি ১ বৈশাখ বলে উল্লেখ করলেও, বস্তুত উৎসবটি হয়েছিল বৈশাখী পূর্ণিমায় [২৮ বৈশাখ সোম 11 May]—জ্যৈষ্ঠ-সংখ্যা ভারতী-তে মুদ্রিত তাঁর 'বাঙ্গালীর পিতৃধন' [পৃ ১৮৮-৯৫] প্রবন্ধের পাদটীকায় লেখা হয় : 'বিগত বৈশাখী পূর্ণিমায় ভবানীপুর, কালীঘাট, বালিগঞ্জ ও বাগবাজারের বালকসমাজ কর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত প্রতাপাদিত্য-উৎসবে ইহা পঠিত হয়।' প্রবন্ধটির ইংরেজি অনুবাদ "The Heritage of the Bengalee' নামে *The Bengalee*-র 5 Jun [শুক্র ২২ জ্যৈষ্ঠ]-সংখ্যায় মুদ্রিত হয়। এতে সরলা দেবী লিখেছেন, তিনি সত্যচরণ শাস্ত্রী-প্রণীত 'বঙ্গের শেষ স্বাধীন হিন্দু-মহারাজ প্রতাপাদিত্যের জীবনচরিত' [1896] গ্রন্থটির দ্বারা উদ্বুদ্ধ হন। তিনি লিখেছেন, রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'বৌঠাকুরাণীর হাটে' চিত্রিত 'প্রতাপাদিত্যের ঘৃণ্যতা অপলাপ করে আর এক প্রতাপাদিত্যকে দেশের মনে আধিপত্য' করানো পছন্দ করেননি, দীনেশচন্দ্র সেন তাঁকে জানিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথের মতে 'প্রতাপাদিত্য কখনো কোন জাতির hero-worship-এর যোগ্য হতে পারে না'[১১২] কিন্তু রবীন্দ্রনাথ অন্তত এই বৎসরের উৎসবের সময়ে আলমোরায় ছিলেন।

বাংলাদেশে প্রতাপাদিত্য-উৎসবের তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া দেখা গিয়েছিল। ৩০ শ্রাবণ [শনি 15 Aug] স্টারে ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদের 'বঙ্গের প্রতাপ-আদিত্য' নাটক প্রথম অভিনীত হয়ে বিপুল জনপ্রিয়তা লাভ করে। কয়েকদিন পরে ১২ ভাদ্র [শনি 29 Aug] হারাণচন্দ্র রক্ষিতের উপন্যাস 'বঙ্গের শেষবীর'কে নাট্যরূপায়িত করে অমরেন্দ্রনাথ দত্ত ক্লাসিক থিয়েটারে অভিনয় করেন। দুটি নাটকই বহুদিন পূর্ণপ্রেক্ষাগৃহে অভিনীত হয়।

সরলা দেবী এতেও সন্তুষ্ট হননি। প্রতাপাদিত্য-পুত্র উদয়াদিত্যের বীরত্ব স্মরণ করে তিনি উদয়াদিত্য-উৎসবের প্রবর্তন করেন ৩ আশ্বিন [রবি 20 Sep]।* এই দিনের *The Bengalee* পত্রিকায় এই বিজ্ঞপ্তিটি প্রকাশিত হয় : 'Udayaditya-Utsav—To commemorate the death of Prince Udayaditya of Jessore, who at the age of 19 died bravely fighting for his country, a meeting will be held at the Albert Hall to-day at 4-30 P.M.. There will be songs and addresses.' সরলা দেবীর 'কুমার উদয়াদিত্য' প্রবন্ধ ইতিপূর্বেই শ্রাবণ-সংখ্যা [পৃ ৪০৮-১২] ভারতী-তে মুদ্রিত হয়েছিল। এই প্রবন্ধটির ইংরেজি অনুবাদ উক্ত বিজ্ঞপ্তির সঙ্গে মুদ্রিত হয়।

এর কয়েকদিন পরে মহাষ্টমীর দিনে [১২ আশ্বিন মঙ্গল 29 Sep] জানকীনাথ ঘোষালের ২৬ বালিগঞ্জ সার্কুলার রোডের বাড়িতে বীরাষ্টমী উৎসব হয়। বেঙ্গলী-তে [26 Sep] মুদ্রিত বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, অনুষ্ঠানে রবীন্দ্রনাথের স্তোত্রপাঠ ছাড়া পণ্ডিত কালীবিলাস ভট্টাচার্যের আবৃত্তি, ক্যালকাটা জিমন্যাসটিক ক্লাবের ব্যায়াম-প্রদর্শনী, শরৎচন্দ্র চক্রবর্তী ও বিনোদ শেখের লাঠি-খেলা, সখের সঙ্ঘ ও আত্মোন্নতি সভার মুষ্টিযুদ্ধ, সরলা দেবীর স্তোত্রপাঠ, বেঙ্গল জিমনাসিয়াম ও শ্রীরামপুর ফেন্‌সিং ক্লাবের দেশী তরবারি-খেলা, নরেন্দ্রনাথ

চট্টোপাধ্যায় ও বৈদ্যনাথ সেনের ছোরা-খেলা, বীর পূর্বপুরুষদের তর্পণ ও স্বর্ণকুমারী দেবী কর্তৃক পদক বিতরণ অন্তর্ভুক্ত ছিল।

সরলা দেবীর একটি চিঠি 22 May [শুক্র ৮ জ্যৈষ্ঠ]-সংখ্যা বেঙ্গলী-তে 'Lakshmi's Bhandar or Indian Stores for Indian Ladies' শিরোনামায় ছাপা হয়। তাঁর দিদি হিরণ্ময়ী দেবী দুঃস্থ হিন্দু বালিকা ও বিধবাদের জন্য একটি বিদ্যালয় ও শিল্পশিক্ষাশ্রম স্থাপন করেছিলেন। এঁদেরই হস্তশিল্পাদি বিক্রয়ের জন্য ৭ কর্নওয়ালিশ স্ট্রীটে লক্ষ্মীর ভাণ্ডার স্থাপিত হয়। চট্টগ্রামের উৎসাহী যুবক কেদারনাথ দাশগুপ্ত [1878-1942] দীর্ঘকাল প্রতিষ্ঠানটি পরিচালনা করেন।

সরলা দেবী জীবনের ঝরাপাতা-য় এ-সমস্ত ঘটনার দীর্ঘ স্মৃতিচারণ করেছেন। কিন্তু তাঁর বই পড়লে মনে হয় তিনি কালানুক্রম রক্ষার কোনো চেষ্টাই করেননি, এমন-কি ভারতী-র প্রাসঙ্গিক সংখ্যাগুলিও উলটে দেখেননি। ফলে অনৈতিকহাসিকতা, অতিরঞ্জন বা মিথ্যাচারের অভিযোগ তাঁর বিরুদ্ধে আনা সহজ হয়েছে। কিন্তু একটি বাঙালি রমণীর এইসব বিচিত্র কর্মকাণ্ড ও *The Bengalee*-র মতো একটি বহুলপ্রচারিত পত্রিকার আনুকূল্য তাঁর প্রতি জনসাধারণের, বিশেষত তরুণদের, শ্রদ্ধা আকর্ষণ করেছিল তাতে কোনো সন্দেহ নেই। তবে এই খ্যাতি ও প্রতিপত্তি তাঁর শত্রুবৃদ্ধিতেও সহায়তা করছিল, তার কিছু উদাহরণ আগে আমরা দিয়ে এসেছি।

এই মনোভাব অন্যত্রও ছিল। বরোদা থেকে ফিরে এসে যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সার্কুলার রোডে অনুশীলন সমিতির শাখা স্থাপন করে অশ্বারোহণ ও অন্যান্য সামরিক বিদ্যায় যুবকদের দীক্ষিত করছিলেন। অরবিন্দের ভাই বারীন্দ্রকুমার ঘোষ বিচিত্র জীবনযাপনের পর বরোদা থেকে এসে তাঁর সঙ্গে মিলিত হয়ে বৈপ্লবিক গুপ্তসমিতি পরিচালনা করতে থাকেন। অহমিকা ও a adventurism তাঁর চরিত্রের প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল। সরলা দেবীর সঙ্গে বারীন্দ্রকুমারের বিশেষ যোগাযোগ ঘটেছিল বলে জানা যায় না, কিন্তু তাঁর প্রীতিভাজন যতীন্দ্রনাথের সঙ্গে বারীন্দ্রের গোলমাল শীঘ্রই দেখা দিল। বারীন্দ্র নিজেই লিখেছেন : 'Jatindra Nath our first revolutionary leader and myself and Devabrata Bose quarrelled simply because we did not want Jatin with his proud abrupt military temperament to boss the show and brush us aside to a secondary position.'[১১৩] সুতরাং যতীন্দ্রনাথকে দলচ্যুত করার জন্য বারীন্দ্র দুটি অস্ত্র নিক্ষেপ করলেন। সম্ভবত তাঁর প্ররোচনাতেই প্রথম রাজনৈতিক ডাকাতি সংঘটিত হয়। সতীশচন্দ্র বসু লিখেছেন : 'ইতিমধ্যে জনকতক কর্ম্মী কড়োয়ায় [?] রাজনীতিক ডাকাইতি করেন। একজন ফিরিঙ্গিকে ধরিয়া তাহার টাকা ছিনাইয়া লওয়া হয়। তারকেশ্বরে এই প্রকারের প্রচেষ্টা প্রথম হয়।...এই সময়ে যতীন বাবুর বিপক্ষে বারীন নালিশ (charge) আনয়ন করেন। এই চার্জ মিথ্যা ছিল।'[১১৪] চার্জটি ছিল অর্থ আত্মসাৎ করার। সতীশচন্দ্রের পেটে অস্ত্রোপচার হওয়ায় তাঁকে দ্রুত সুস্থ করার জন্য যতীন্দ্রনাথ খাওয়াদাওয়ার ব্যাপারে কিছু বেশি টাকা খরচ করেন। অভিযোগ উঠলে তিনি স্ত্রীর গলার হার দিয়ে ব্যয়িত অর্থ পরিশোধ করতে চান। ঘটনাটি সভাপতি প্রমথনাথ মিত্রকে ক্ষুব্ধ করে। দ্বিতীয় অভিযোগটি আরও মারাত্মক। সার্কুলার রোডের যে-বাসায় সস্ত্রীক যতীন্দ্রনাথ, বারীন্দ্র, অবিনাশচন্দ্র ভট্টাচার্য প্রভৃতি থাকতেন, সেই বাসাতেই যতীন্দ্রনাথের এক বিধবা বোন বাস করতেন। হেমচন্দ্র কানুনগো লিখেছেন : "তার স্বভাব-চরিত্র শুনেছিলাম ভাল ছিল না; তাই 'খ' বাবু তাকে সুমতি দিয়ে সংশোধনের চেষ্টায় ছিলেন।...তাকে নিয়ে একটু আধটু প্রেমের প্রতিদ্বন্দ্বিতা না-কি

চলেছিল। নেতৃত্বের প্রতিদ্বন্দ্বী ‘খ’ বাবুকে ঘায়েল করবার জন্য তাঁর ও ঐ যুবতীর মধ্যকার সম্বন্ধটা দূষিত বলে ‘ক’ বাবুর কাছে বারীণ যথারীতি রিপোর্ট করেছিল। একতরফা বিচারে ‘ক’ বাবু ‘খ’ বাবুকে তাড়িয়ে দিতে হুকুম দিলেন।”[১১৫] অথচ অনুশীলন সমিতির প্রতিষ্ঠাতা সতীশচন্দ্র বসু লিখেছেন: ‘তিনি [যতীন্দ্রনাথ] অতি উচ্চ দরের লোক ছিলেন।’ আমরা আগেই বলেছি, যতীন্দ্রনাথ সরলা দেবীর প্রীতিভাজন ছিলেন। সুতরাং অবিনাশচন্দ্র ভট্টাচার্য-লিখিত ‘পরে সরলাদেবীর কাছে কেহ যাইতেন না’[১১৬] বা ড ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত-লিখিত ‘পরে-সরলাদেবীকে দল হইতে সরাইয়া দেওয়া হয়’[১১৭] কথাগুলির পটভূমি বুঝতে অসুবিধা হয় না। ঘটনাগুলি রবীন্দ্রনাথের চার অধ্যায় [১৩৪১] উপন্যাসের ‘বটু’ চরিত্রটির কথা স্মরণ করিয়ে দেয়—উল্লেখ্য, উপন্যাসটির একটি খসড়ায় নায়িকা ‘এলা’কে বিধবা বলে পরিচিত করা হয়েছিল।

এইসব ঘটনা সম্ভবত বর্তমান বৎসরের মাঝামাঝি সময়ে ঘটেছিল। হেমচন্দ্র লিখেছেন : ‘মনে হয়, ১৯০৩ সালের শেষে একবার কলকাতা গিয়ে দেখলাম, কলকাতার কেন্দ্র, সারকিউলার রোড থেকে গ্রে স্ট্রীটে সরিয়ে নেওয়া হয়েছে। দোতলার ওপর ছোট্ট একটি ঘরের মধ্যে একগাদা কবিরাজি বিজ্ঞাপন, আর আমাদের বারীণ ও তদ্রূপ আর দু-তিনটি যুবক। তার মধ্যে ছিল একজন জাপানী।...তার নাম যেন ‘হোরে’, [হোরি] কি এই রকম একটা কিছু ছিল।’[১১৮] পাঞ্জাব-ভ্রমণে গিয়ে হোরি-র মৃত্যু হয় 6-12 Dec [২০-২৬ অগ্র°]-এর মধ্যে[১১৯] —সুতরাং গ্রে স্ট্রীটের বাসায় হেমচন্দ্র তাঁকে এর আগেই দেখেছিলেন। তাহলে, রাজনৈতিক ডাকাতিতে টিলকের সমর্থন যাচাই করার জন্য সরলা দেবীর পুনা যাওয়ার ঘটনা আরও আগের। [সরলা দেবী লিখেছেন : ‘তখন তিলকের নামে তায়ি মহারাজ সংক্রান্ত ফৌজদারী মামলা চলছে।’[১১৯ক] টিলকের জীবনী থেকে জানা যায়, 24 Aug 1903 সদর আদালতের প্রথম রায়ে টিলকের দেড় বছর সশ্রম কারাদণ্ড ও এক হাজার টাকা জরিমানা হয় এবং 4 Mar 1904 হাইকোর্টের রায়ে তিনি মুক্তি পান[১১৯খ]—সুতরাং সরলা দেবীর সঙ্গে সাক্ষাৎকারের ঘটনাটি সম্ভবত Aug-Sept মাসের কোনো সময়ে ঘটেছিল।] উল্লেখ্য, হেমচন্দ্র-কথিত অনাথা বৃদ্ধার সর্বস্ব লুঠের পরিকল্পনা চার অধ্যায়-এও স্থান লাভ করেছে।

এরই মধ্যে খবর এল, গবর্মেণ্ট চট্টগ্রামকে বাংলা থেকে বিচ্ছিন্ন করে আসামের সঙ্গে যুক্ত করার কথা ভাবছে। *The Bengalee*-র 9 Oct [শুক্র ২২ আশ্বিন]-সংখ্যায় প্রস্তাবটিকে ‘A Retrograde Measure’ নামে অভিহিত করে তীব্র প্রতিবাদ জানানো হয়। ঐতিহাসিকেরা দেখিয়েছেন, বঙ্গভঙ্গের প্রস্তাবটি অনেক পুরোনো; 1866-এ উড়িষ্যার দুর্ভিক্ষের পর স্যার স্ট্যাফোর্ড নর্থকোট বেঙ্গল প্রেসিডেন্সির আয়তন কমানোর পরামর্শ দিয়েছিলেন। 1874-এ বাংলাভাষী শ্রীহট্ট-সহ আসামকে বিচ্ছিন্ন করে চীফ কমিশনার-শাসিত প্রদেশে পরিণত করা হয়। 1896-এ আসামের চীফ কমিশনার উইলিয়ম ওয়ার্ড প্রস্তাব করেন, চট্টগ্রাম ডিভিশন ঢাকা ও মৈমনসিংহ জেলাকে আসামের সঙ্গে যুক্ত করে একটি লেফটেনাণ্ট গবর্নর-শাসিত প্রদেশ গঠন করা হোক—কিন্তু তাঁর উত্তরসূরী স্যার হেনরী কটন ও জনগণের প্রতিবাদে কেবল দক্ষিণ লুসাই পর্বতমালা হস্তান্তর করে প্রস্তাবটি পরিত্যক্ত হয়। 1901-এ মধ্যপ্রদেশের চীফ কমিশনার অ্যানড্রু ফ্রেজার সম্বলপুর-সহ উড়িষ্যাকে মধ্যপ্রদেশের অন্তর্ভুক্ত করে বাংলার সীমানা-পুনর্বিন্যাসের প্রস্তাব করলে ব্যাপারটি কার্জনের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তিনি তাঁর বিখ্যাত ‘Round-and-round’ নোটে [24 May 1902] সমস্ত ব্যাপারটিকে ত্বরান্বিত করার হুকুম দিলেন। ফ্রেজার 28 Mar 1903-এর নোটে ওয়ার্ডের পরিকল্পনাটি উপস্থাপিত করলে কার্জন তাঁর 1 Jun

[১৮ জ্যৈষ্ঠ]-এর নোটে 'একটি প্রজন্মের জন্য ভারতের শাসন-সীমানা নির্দিষ্ট' করে দেওয়ার আশা প্রকাশ করলেন। এরই উপর ভিত্তি করে হোম ডিপার্টমেন্টের সেক্রেটারি রিজ্‌লে [Herbert Risely] বাংলা গবর্মেন্টের চীফ সেক্রেটারি-কে তাঁর বিখ্যাত 3 Dec 1903 [বৃহ ১৭ অগ্র°] তারিখের চিঠিতে 'artificial agitation' এবং 'interested outcry'-এর সম্ভাবনা সত্ত্বেও শাসনতান্ত্রিক নৈপুণ্য ও সুবিধার স্বার্থে সীমানা-পুনর্বিন্যাসের যৌক্তিকতা সমর্থন করলেন। এলাহাবাদের *The Pioneer* পত্রিকায় মুদ্রিত প্রবন্ধ থেকে ইঙ্গিত পেয়ে *The Bengalee* প্রথম প্রতিবাদ-মূলক সম্পাদকীয় প্রকাশ করে 10 Dec [বৃহ ২৪ অগ্র°]। এরপর ইণ্ডিয়া গেজেটে সম্পূর্ণ রিজ্‌লে-পত্রটি প্রকাশিত হলে তুমুল বিক্ষোভ শুরু হয়ে যায়। 'Threatened Partition of Bengal' শিরোনামায় এই সময় প্রায় প্রত্যহ *The Bengalee* পত্রিকায় বাংলার বিভিন্ন স্থানে অনুষ্ঠিত প্রতিবাদসভার খবর ছাপা হতে থাকে। অরাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদও ২৩ মাঘ [শনি 6 Feb 1904] স্টার থিয়েটারে রমেশচন্দ্র দত্তের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এক বিশেষ অধিবেশনে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ক্ষতির আশঙ্কা করে প্রস্তাবটি বিরোধিতা করে। কার্জন স্বভাবতই এইসব চেঁচামেচিতে বিরক্তি বোধ করেছেন : তিনি 17 Feb [বুধ ৫ ফাল্গুন] ভারতসচিব ব্রডরিককে লিখলেন : "বাঙালীরা নিজেদের একটা মহা জাতি মনে করে এবং তারা এমন একটা ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখে যখন দেশ থেকে ইংরেজরা বিতাড়িত হয়েছে এবং জনৈক 'বাবু' কলকাতার লাট-প্রাসাদে অধিষ্ঠিত! এই সুখ-স্বপ্নের প্রতিকূল যে-কোনও ব্যবস্থা তারা নিশ্চয়ই ভীষণভাবে অপছন্দ করবে। আমরা যদি দুর্বলতাবশতঃ তাদের হট্টগোলের কাছে নতি স্বীকার করি তবে কোনও দিনই আর বাংলার আয়তন হ্রাস বা বাংলা ব্যবচ্ছেদ সম্ভব হবে না। (এ পরিকল্পনা গ্রহণ না করলে) আপনি ভারতবর্ষের পূর্ব-সীমান্তে এমন একটা শক্তিকে সংহত ও সুদৃঢ় করবেন যা এখনই প্রচণ্ড, এবং অদূর ভবিষ্যতে যা সুনিশ্চিতভাবেই ক্রমবর্ধমান অশান্তির উৎস হয়ে উঠবে।"[১২০] এরই প্রতিকারের জন্য তিনি 14 Feb [রবি ২ ফাল্গুন] পূর্ববঙ্গ সফরে বহির্গত হয়েছিলেন। এই দেশে স্বার্থপর বিশ্বাসঘাতকের কোনোদিনই অভাব হয়নি, কার্জনও ঢাকার নবাব সলিমুল্লাকে খুঁজে পেলেন ও তাঁকে নামমাত্র সুদে এক লক্ষ পাউণ্ড ঋণ দিয়ে হিন্দু-মুসলমানের বিরোধকে জাগিয়ে তুলে নবজাগ্রত জাতীয়তাবোধকে দুর্বল করার মারাত্মক অস্ত্রে পরিণত করলেন। বলা চলে, এর দ্বারাই পাকিস্তানের বীজ রোপিত হল। বর্তমান বৎসরের সীমানায় হস্তান্তরযোগ্য জেলার তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হয় রংপুর, বগুড়া ও পাবনা [6 Apr : ২৪ চৈত্র]; পাঁচ মাস পরে [13 Sep : ২৮ ভাদ্র ১৩১১] ভারত গবর্মেণ্ট রাজশাহী, দিনাজপুর, মালদহ, জলপাইগুড়ি ও কুচবিহার হস্তান্তরের সুপারিশ করে।[১২১] কিন্তু এগুলি হয়েছিল গোপনে, কার্জন তখন বিলেতে গিয়ে ভারতসচিব ও অন্যান্যদের মন থেকে দ্বিধার কাঁটা তুলে ফেলতে ব্যস্ত। ফলে প্রস্তাবটি পরিত্যক্ত হয়েছে ভেবে জনসাধারণের বিক্ষোভও স্তিমিত হয়ে আসে।

কিন্তু কার্জন অন্যভাবেও বিক্ষোভ জাগিয়ে রাখার ব্যবস্থা করেছিলেন। দীর্ঘ নীরবতার পর তিনি বিশ্ববিদ্যালয় কমিশনের রিপোর্টের উপর ভিত্তি করে সুপ্রীম কাউন্সিলে একটি বিল আনয়ন করেন। ১৯ মাঘ [মঙ্গল 2 Feb] টাউন হলে ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান, ইণ্ডিয়ান ও বেঙ্গল ল্যাণ্ডহোল্ডারস' অ্যাসোসিয়েশনগুলির উদ্যোগে এই বিলের বিরোধিতা করার জন্য একটি সভা আহূত হয়। কিন্তু সমস্ত প্রতিবাদ অগ্রাহ্য করে কার্জন বিলটি আইনে পরিণত করেন।

রাশিয়া ও জাপানের মধ্যে যুদ্ধের সম্ভাবনা কিছুদিন ধরেই দেখা যাচ্ছিল। 8 Feb 1904 [সোম ২৫ মাঘ] রাত্রে জাপানের টর্পেডো বোট পোর্ট আর্থারে রুশ যুদ্ধজাহাজকে আক্রমণ করে যুদ্ধের সূচনা করে। য়ুরোপের মন্ত্রশিষ্য জাপান অনেকদিন ধরেই তার সামরিক শক্তি বৃদ্ধি করছিল। 1894-এ চীন আক্রমণ করে তার হাত-পাকানো শুরু, কোরিয়া ও মাঞ্চুরিয়াও তার লক্ষ্যের মধ্যে ছিল। এই পথে প্রধান বাধা রাশিয়ার সঙ্গে সংঘর্ষ এই কারণেই। কিন্তু পরাধীন ভারত এই যুদ্ধকে দেখল অন্যভাবে। যে রাশিয়ান জুজুর ভয়ে ব্রিটিশের ভারসাম্রাজ্য মাঝেমাঝেই কেঁপে উঠত, একটি এশীয় দেশ তার সঙ্গে সমানে-সমানে যুদ্ধে প্রবৃত্ত—এই ঘটনা ভারতবাসীর অহংবোধকে উজ্জীবিত করেছে। কিছুদিন আগে ওকাকুরার ভারতে উপস্থিতি ও তাঁর *Ideal of the East* গ্রন্থের 'Asia is One' বাণী জাতীয় চেতনার প্রসারণে সাহায্য করেছিল। বিপিনচন্দ্র পালের *New India* [13 Feb]-য় লেখা হয় : 'We look upon this war as what the ancients called a war of *Dharma*...Japan has bravely stood up not only for her own political life, or her own commercial privileges, but for the integrity of the entire Asiatic thought and Asiatic ideal. Every Asiatic race is, therefore, more or less vitally interested in this conflict.' এটি তখন অনেক ভারতীয়েরই মনের কথা, যা কার্জনী কুশাসনের বিরুদ্ধে তাঁদের সংঘবদ্ধ হবার প্রেরণা জুগিয়েছিল।

১ শ্রাবণ [শুক্র 17 Jul] ক্লাসিক থিয়েটারে সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে শিবাজী-উৎসব হয়। এবারের উৎসব খুবই সাফল্যমণ্ডিত হয়। মূল সভায় সুরেন্দ্রনাথ ও বিপিনচন্দ্র পাল বক্তৃতা করেন। জনাধিক্যের জন্য বাইরের প্রশস্ত প্রাঙ্গণে আর-একটি সভা হয়। ড শরৎচন্দ্র মল্লিক, পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়, নিখিলনাথ রায় প্রভৃতি এই সভায় বক্তৃতা করেন। 'কলিকাতার ১৩০৯ সালের শিবাজী মহোৎসব উপলক্ষে রচিত' সখারাম গণেশ দেউস্করের 'শিবাজীর মহত্ব' পুস্তিকাটি সভাস্থলে বিনামূল্যে বিতরিত হয়। সভাটি হওয়ার কথা ছিল ২৫ আষাঢ় [শুক্র 10 Jul], কিছু বক্তার সুবিধা করে দেওয়ার জন্য তারিখটি পরিবর্তিত হয়।

প্রাসঙ্গিক তথ্য : ৪

রেণুকার অসুস্থতার জন্য রবীন্দ্রনাথ গত বৎসরের শেষ থেকে ব্যস্ত থাকায় বিদ্যালয়ে বহুবিধ বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। বৎসরের প্রথমে সতীশচন্দ্র রায়, জগদানন্দ রায়, হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ও রাজেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন নিয়মিত শিক্ষক। সুবোধচন্দ্র মজুমদার তখন বিদ্যালয় ত্যাগ করে শ্বশুরের চেষ্টায় দিল্লিতে পোস্ট অফিসে একটি কর্ম সংগ্রহ করেছেন। এই কারণে ও গ্রীষ্মাধিক্যের জন্য ১৪ বৈশাখ [সোম 27 Apr] বিদ্যালয়ে গ্রীষ্মের ছুটি ঘোষিত হয়। রথীন্দ্রনাথ, সন্তোষচন্দ্র ও দিনেন্দ্রনাথ সতীশচন্দ্রের অভিভাবকত্বে ছুটির সময় শান্তিনিকেতনেই কাটান। বিজ্ঞানী ও কবি সুরেন্দ্রনাথ মৈত্র এই সময়ে আশ্রমে এসেছিলেন। রথীন্দ্রনাথ এই গ্রীষ্মাবকাশের একটি সুন্দর চিত্র এঁকেছেন তাঁর পিতৃস্মৃতি-তে [পৃ ৭১-৭৬]। বিদ্যালয় খোলে ৪ আষাঢ় [শুক্র 19 Jun]।

এর মধ্যে রবীন্দ্রনাথ রেণুকাকে নিয়ে আলমোরায় যান। বিদ্যালয়ে এক হাজার টাকা দান করাতে শ্রদ্ধায় ও প্রীতিতে রবীন্দ্রনাথ মোহিতচন্দ্র সেনকে আকর্ষণ করে এনেছিলেন বিদ্যালয়ের কাজে। মোহিতচন্দ্রও আকৃষ্ট

হয়েছিলেন। ফলে রমণীমোহন চট্টোপাধ্যায় ছাড়া তিনিই এখন বিদ্যালয়ের কাজে রবীন্দ্রনাথের প্রধান সহায়ক। পরামর্শাদির জন্য তিনি আলমোরায় গেছেন, কলকাতা ও শান্তিনিকেতনেও তিনি বিদ্যালয়ের কাজ দেখাশোনা করেছেন।

কুঞ্জলাল ঘোষকে নিয়ে সমস্যা এবৎসরেও ছিল। আষাঢ়ের শেষে তাঁকে বিদায়পত্র দেওয়া হয়। তাঁর স্থানে আসেন রামপুরহাট স্কুলের প্রধান শিক্ষক নগেন্দ্রনারায়ণ রায়। অন্যান্য শিক্ষকের জন্য সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়, নির্বাচনের ভার ছিল মোহিতচন্দ্রের উপর। তিনি কয়েকজনকে মনোনীত করেন, তাঁদের মধ্যে শ্রাবণ মাসে কাজে যোগ দেন বিপিনবিহারী দাশগুপ্ত, গোপালচন্দ্র কবিকুসুম ও জনৈক ভবেন্দ্রবাবু—এঁরা কেউই স্থায়ী হননি, পূজাবকাশের মধ্যেই তাঁদের বিদায় দেওয়া হয়। যোগেশচন্দ্র রায় [বিদ্যানিধি, 1859-1956]কে শিক্ষক হিসাবে নিয়ে আসার ইচ্ছা রবীন্দ্রনাথের ছিল, কিন্তু তা সফল হয়নি। বিশ্ববিদ্যালয়ের উজ্জ্বল ছাত্র নিশিকান্ত সেন বা কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত সম্পর্কেও তাঁর আগ্রহ ছিল, কিন্তু এঁদের পাওয়ার আশাও পূর্ণ হয়নি।

পূজাবকাশের পর [২৫ আশ্বিন বিদ্যালয় খোলে] নূতন শিক্ষক আসেন ভূপেন্দ্রনাথ সান্যাল ও নগেন্দ্রনাথ আইচ, সুবোধচন্দ্র মজুমদার ও নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য পুনর্নিয়োজিত হন।

শীতের ছুটির মধ্যে বসন্তরোগে সতীশচন্দ্র রায়ের মৃত্যু হয় ১৮ মাঘ [সোম 1 Feb 1904] মাঘী পূর্ণিমার দিনে। সংক্রমণের আশঙ্কায় বৎসরের অবশিষ্ট কয়েক মাসের জন্য বিদ্যালয় শিলাইদহে স্থানান্তরিত হয়। মোহিতচন্দ্র সেন কলেজের অধ্যাপনা ত্যাগ করে সম্ভবত ১ ফাল্গুন [13 Feb 1904] সেখানে প্রধান শিক্ষকের পদে যোগ দেন।

ছাত্রসংখ্যা এই বৎসরে আরও বেড়েছিল। অরুণচন্দ্র সেন, অচ্যুতচন্দ্র সরকার, নয়নমোহন চট্টোপাধ্যায়, সুজিতকুমার চক্রবর্তী, অরবিন্দমোহন বসু প্রভৃতি আগে থেকেই ছিলেন, গ্রীষ্মাবকাশের পর ত্রিপুরার সত্যরঞ্জন বসু বিদ্যালয়ে যোগ দেন। শমীন্দ্রনাথের ৯ শ্রাবণের [25 Jul] চিঠি থেকে জানা যায়—তিনি, সরোজচন্দ্র মজুমদার [ভোলা], ত্রিগুণানন্দ রায় [পটল], প্রফুল্ল [?], ক্ষিতীশ মুস্তফি ও সুহাস [?] তখন শিশুবিভাগের ছাত্র। তাছাড়া প্রেমানন্দ সিংহ, ব্রহ্মবিহারী সরকার, সমর [?], যতীন্দ্রনাথ পালিত, যোগরঞ্জন গুহ প্রভৃতিরাও ছিলেন।* সত্যরঞ্জন বসু লিখেছেন : 'শিলাইদহে থাকার সময়ে নতুন ছেলেদের মধ্যে আগরতলা থেকে যোগেনদা (গাঙ্গুলী) এসেছিলেন মনে হচ্ছে।'[১২২]

শান্তিনিকেতনের বাড়িঘরের মধ্যে এই বৎসর একটি রান্নাঘর ও রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব বাড়ি 'দেহলি' তৈরি হয়। ৪ বৈশাখ [17 Apr] সরকারী ক্যাশবহিতে দেখি : 'বিদ্যালয়ের রান্নাঘর তৈয়ারির ব্যায় জন্য দেওয়া যায় ১০০৲', ২৮ আশ্বিন [15 Oct] এই বাবদে আরও ২০০৲ টাকা দেওয়া হয়। ১১ অগ্র° [27 Nov] একই ক্যাশবহির হিসাব : 'উঁহার শান্তিনিকেতন বাগানের বাহিরে বাটী তৈয়ারী জন্য...৩০০৲'—এইটিই 'দেহলি' বাড়ি তৈরির সূচনা; ২৬ চৈত্র [8 Apr 1904] রবীন্দ্রনাথের নিজের ক্যাশ থেকে আরও ২০০৲ টাকা দেওয়া হয়। কিন্তু বাড়িটি এই বছরে শেষ হয়নি।

৭ বৈশাখ [20 Apr] সরকারী ক্যাশ থেকে রবীন্দ্রনাথকে 'বিদ্যালয়ের দ্রব্যাদি ক্রয় জন্য হাওলাত' দেওয়া হয় ২০০০৲ টাকা। তিনি দান হিসেবে পেয়েছেন কবি-জমিদার প্রমথনাথ রায়চৌধুরীর কাছ থেকে ১৫০৲ টাকা [১৫ শ্রাবণ] ও সম্ভবত ত্রিপুরার মহারাজার কাছ থেকে ১০০০৲ টাকা [৫ কার্তিক : 20 Oct]।

বিদ্যালয় থেকে একটি পত্রিকা প্রকাশ করার প্রস্তাব করেছিলেন সতীশচন্দ্র রায়। ৯ চৈত্র [মঙ্গল 22 Mar] রবীন্দ্রনাথ মনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়কে লিখেছেন : 'আমাদের বিদ্যালয় হইতে পত্রিকা বাহির করিতে সতীশের অত্যন্ত আগ্রহ ছিল—তাহার কতক কতক লেখাও ছিল। তখন সে আমাকে একপ্রকার রাজি করিয়া তুলিয়াছিল।'[১২৩] রবীন্দ্রনাথ ১৩১৮ বঙ্গাব্দে যখন তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা-র সম্পাদকত্ব গ্রহণ করেন, তখন সেটি ব্রহ্মবিদ্যালয়ের মুখপত্রে পরিণত হয়। কিন্তু তার আগেই মাঘ ১৩১৪ থেকে অজিতকুমার চক্রবর্তীর উৎসাহে বিদ্যালয়ের ছাত্রেরা 'শান্তি' নামে একটি হাতে-লেখা মাসিকপত্র প্রকাশ করতে শুরু করেন। ব্রহ্মচর্যাশ্রমের প্রথম মুখপত্র সেটিই—ঐ সময় থেকে এইটি ও অনুরূপ আরও পত্রিকা আশ্রম-বিদ্যালয়ের চিত্রটি স্ফুটতর করে তুলতে সাহায্য করবে।

উল্লেখপঞ্জী

১ স্মৃতি। ২৮

২ ঐ। ৩৯

৩ রবীন্দ্রভবনে রক্ষিত মূল পত্র

৪ বি. ভা. প., ফাল্গুন ১৩৪৯। ৫২২

৫ রবীন্দ্রবীক্ষা ৯ [শ্রাবণ ১৩৯০]। ৯-১০, পত্র ১

৬ স্মৃতি। ২০

৭ ঐ। ২০-২১

৮ বি. ভা. প., মাঘ-চৈত্র ১৩৫৪।২০৩

৯ স্মৃতি। ২১

১০ বি. ভা. প., মাঘ-চৈত্র ১৩৫৪। ২০২

১১ চিঠিপত্র ২ [১৩৪৯]। ১-৩, পত্র ১

১২ পিতৃস্মৃতি। ৭৩-৭৫

১৩ স্মৃতি। ৪৮

১৪ রবীন্দ্রনাথের কথা। ২৬

১৫ বিশ্বভারতী ২৭। ৩৫৫

১৬ স্মৃতি। ৮৫

১৭ দ্র রবীন্দ্রনাথের কথা। ২৬

১৮ স্মৃতি। ৩০

১৮ক 'কবি রবীন্দ্রনাথ' : প্রবাসী, জ্যৈষ্ঠ ১৩১৬।১২৪

১৯ দ্র পিতৃস্মৃতি। ৮৪-৮৫

২০ বি. ভা. প., মাঘ-চৈত্র ১৩৫৪। ২০৩

২১ ঐ, ফাল্গুন ১৩৪৯। ৫২৯

২২ ঐ। ৫২৪

২৩ ঐ, মাঘ-চৈত্র ১৩৫৫। ১২৬

২৪ রবীন্দ্রবীক্ষা ১০ [পৌষ ১৩৯০]। ১১, পত্র ৩

২৫ চিঠিপত্র ৮। ২০৫, পত্র ১৭৩

২৬ রবীন্দ্রনাথ ও ত্রিপুরা। ৩৩৫

২৭ ঐ। ২৩৬

২৮ বি. ভা. প., মাঘ-চৈত্র ১৩৫৪। ১৮৯

২৯ চিঠিপত্র ৬। ৫০, পত্র ২২

৩০ বি. ভা. প., শ্রাবণ-আশ্বিন ১৩৭৩। ৫

৩১ রবীন্দ্রভবনে রক্ষিত মূল পত্র

৩২ দেশ, সাহিত্য ১৩৭৮।৪৩

৩৩ ঐ। ৪৪

৩৪ ঐ। ৪৪

৩৫ ঐ। ৪০

৩৬ ঐ। ৪৫

৩৭ ঐ। ৪৫

৩৮ ঐ। ৪৬

৩৯ ঐ। ৪৫

৪০ বি. ভা. প., ফাল্গুন ১৩৪৯। ৫৩০-৩১

৪১ ঐ। ৫২৫

৪২ দেশ, সাহিত্য ১৩৭৮।৪৫

৪৩ ঐ। ৪৬

৪৪ ঐ। ৪৬

৪৫ ঐ। ৪৬

৪৬ ঐ। ৪৭

৪৭ ঐ। ৪৮

৪৮ বি. ভা. প., চৈত্র ১৩৪৯। ৫৬৩

৪৯ ঐ, শ্রাবণ-আশ্বিন ১৩৫৮। ৪

৫০ রবীন্দ্রভবনে রক্ষিত মূল পত্র
৫১ ঠাকুরবাড়ির গগনঠাকুর [১৩৮১]। ৭৬
৫২ বি. ভা. প., ফাল্গুন ১৩৪৯। ৫২৭
৫৩ দ্র ঐ, চৈত্র ১৩৪৯। ৫৬৪
৫৪ কথাসাহিত্য, চৈত্র ১৩৬৭।৬৭৭-৭৮
৫৫ প্রতিমা দেবী : স্মৃতিচিত্র [১৩৫৯]। ৫৫
৫৬ স্মৃতিকথা। ১৪-১৫
৫৭ স্মৃতি। ২৫
৫৮ বি. ভা. প., কার্তিক-পৌষ ১৩৫০। ১৪৮-৪৯
৫৯ দ্র *The Bengalee,* 6 Oct 1903
৬০ চিঠিপত্র ১০। ১৪ পত্র ১৪
৬১ ঐ ১০। ১৪, পত্র ১৫
৬২ বি. ভা. প., শ্রাবণ ১৩৪৯। ৩৫-৩৬
৬৩ চিঠিপত্র ৬। ৮৪, পত্র ৩
৬৪ বি. ভা. প., চৈত্র ১৩৪৯। ৫৬৪
৬৫ ঐ, মাঘ-চৈত্র ১৩৫৫। ১২৬-২৭
৬৬ ঐ, মাঘ-চৈত্র ১৩৫৪। ১৯৭
৬৭ ঐ। ১৯৬
৬৮ ঐ। ১৯২
৬৯ ঐ। ১৮১-৮২
৭০ চিঠিপত্র ১০। ১৬, পত্র ১৬
৭১ বি. ভা. প., চৈত্র ১৩৪৯। ৫৬৪
৭২ চিঠিপত্র ৮। ২০৮, পত্র ১৭৫
৭৩ প্রবাসী, বৈশাখ, ১৩৫০। ২
৭৪ স্মৃতি। ৪২
৭৫ চিঠিপত্র ১০। ১৮, পত্র ১৮
৭৬ ঘরের কথা ও যুগসাহিত্য [১৩৭৬]। ১৯৭
৭৭ রবীন্দ্রনাথ ও ত্রিপুরা। ২৪৫-৪৬
৭৮ তত্ত্ব°, মাঘ। ১৬১
৭৯ রবীন্দ্রনাথ ও ত্রিপুরা। ২৪৬-৪৭

৭৯ক তত্ত্ব°, মাঘ। ১৫৩

৮০ ঐ। ২৪৭

৮১ বি. ভা. প., ফাল্গুন ১৩৪৯। ৫৩১

৮২ স্মৃতি। ১৯-২০

৮৩ দেশ, ১৯ মাঘ ১৩৯১। ১৭, পত্র ১

৮৪ নালুদা'র চিঠি ২ [1932]। ২৭, পত্র ১৯

৮৫ দেশ, সাহিত্য ১৩৭৮। ৪১

৮৬ দ্র রবিরশ্মি ২। ৪৮৩-৮৪

৮৭ রবীন্দ্রনাথ ও ত্রিপুরা। ২৪৭

৮৮ দ্র জীবনের ঝরাপাতা। ৭১

৮৯ *The Indian Messenger*, 3Apr 1904, p. 136

৯০ রবীন্দ্রনাথের কথা। ৩৩

৯১ দ্র 'সতীশচন্দ্র রায়' : বিচিত্র প্রবন্ধ [১৩১৪]। ৩১০-১৩

৯২ রবীন্দ্রনাথ ও ত্রিপুরা। ২৪৭

৯৩ 'দুই বন্ধু' : বি. ভা. প., মাঘ-চৈত্র ১৩৫৪। ২০৭-০৮

৯৪ দেশ, ১৯ মাঘ ১৩৯১। ১৭

৯৫ রবীন্দ্রনাথ ও ত্রিপুরা। ২৪৭-৪৮

৯৬ রবীন্দ্রভবনে রক্ষিত মূল পত্র

৯৭ ঐ

৯৮ পিতৃস্মৃতি। ৫০-৫১

৯৯ চিঠিপত্র ১০। ১৯, পত্র ১৯

১০০ রবীন্দ্রনাথ ও ত্রিপুরা। ২৪৮

১০১ 'রবীন্দ্র প্রসঙ্গ' : দেশ, শারদীয় ১৩৪৯। ৪২৫

১০২ স্মৃতি। ৪৬

১০৩ বি. ভা. প., মাঘ ১৩৪৯। ৪৪৮

১০৪ ঐ।. ৪৪৯

১০৫ ঠাকুরবাড়ির গগন ঠাকুর। ৭১

১০৬ দ্র মোহনলাল গঙ্গোপাধ্যায়, 'গগনেন্দ্রনাথ' [১৩৮০]। ৩৩-৩৪

১০৭ স্মৃতি। ৪৭

১০৮ দেশ, শারদীয় ১৩৪৯। ৪২৫

১০৯ স্মৃতি। ৪৭

১০৯ক সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর শতবার্ষিক সংকলন। ১৩

১১০ ড চিত্রা দেব : ঠাকুরবাড়ির অন্দর মহল [১৩৮৭]। ১৪৪

১১১ দ্র কল্যাণাক্ষ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পত্র : দেশ, ১১ ভাদ্র ১৩৭৮। ৩৭৮

১১২ দ্র জীবনের ঝরাপাতা। ১২৯

১১৩ *Dawn of India*, 22 Dec 1933—গিরিজাশঙ্কর রায়চৌধুরী : শ্রীঅরবিন্দ ও বাঙ্গলায় স্বদেশী যুগ। ৩৪৭-এ উদ্ধৃত।

১১৪ ভারতের দ্বিতীয় স্বাধীনতার সংগ্রাম। ১৮২-৮৩

১১৫ বাংলায় বিপ্লব প্রচেষ্টা। ২৪

১১৬ ভারতের দ্বিতীয় স্বাধীনতার সংগ্রাম। ১৯১

১১৭ ঐ। ১০১

১১৮ বাংলায় বিপ্লব প্রচেষ্টা। ২২

১১৯ দ্র *Letters of Sister Nivedita*, Vol. II, pp. 594-95, No. 259

১১৯ক জীবনের ঝরাপাতা। ১৮০

১১৯খ দ্র নরহর রঘুনাথ ফাটক : লোকমান্য [1972]

১২০ ড অমলেশ ত্রিপাঠী : ভারতের মুক্তিসংগ্রামে চরমপন্থী পর্ব [1987]। ১০৩

১২১ দ্র Dr. Sumit Sarkar : *The Swadeshi Movement in Bengal 1903-08* [1977], p. 11

১২২ রবীন্দ্রনাথ ও ত্রিপুরা। ২৪৮

১২৩ স্মৃতি। ৪৬

---

* শান্তিদেব ঘোষ লিখেছেন : 'তবেজানা যায় যে, গুরুদেবের অত্যন্ত স্নেহের ভ্রাতুষ্পুত্র সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুরের বিবাহের দিন ছিল ১৪ই আষাঢ়, ১৩১০ সাল।' —রবীন্দ্রসঙ্গীত বিচিত্রা [1983]। ২৩৯; কিন্তু আমরা ক্যাশবহির হিসাবে পাই : 'শ্রীযুক্ত বাবু সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের ১৩১০ সালের ২১ আষাঢ় তারিখে শুভবিবাহ হয় তাহার ব্যায়….৫৫৯।৯'।

* অমিয়া বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন : 'প্রতিমা দেবীর নিকট শুনি—তাঁর তিন-চার বৎসর বয়সের সময় থেকেই রবীন্দ্রনাথের স্ত্রী মৃণালিনী দেবী তাঁর চেহারায় মুগ্ধ হয়ে বলতেন, "এই সুন্দর মেয়েটিকে আমি পুত্রবধূ করব। আশা করি ছোট্‌দিদি—গুণেন্দ্রনাথের স্ত্রী—তাঁর নাতনীটিকে আমায় দেবেন।"—মহিলাদের স্মৃতিতে রবীন্দ্রনাথ [১৩৭১]। ৭৪

* চারুচন্দ্র '১৩১২ সালে' লিখেছেন, সেটি ঠিক নয় দ্র রবিরশ্মি ২।৪৮৩

* 'On the eve of his departure on a mission tour, Pandit Siva Nath Sastri will deliver a lectuure on *Dharmaprachar*...in the Sadharan Brahmo Samaj Mandir at 5-30 P.M. to-day.'—*The Bengalee*, 6 Feb 1904.

* অগ্র°-সংখ্যা ভারতী-তে [পৃ ৭৮২-৮৩] মুদ্রিত বিজয়চন্দ্র মজুমদারের 'উদয়াদিত্য' কবিতার পাদটীকায় লেখা হয়: 'বিগত ৪ঠা আশ্বিন বঙ্গের বালকগণ কর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত "উদয়াদিত্য-পুষ্পাঞ্জলি" উৎসব উপলক্ষ্যে রচিত ও গীত।' সরলা দেবী লিখেছেন, সভাটি অ্যালফ্রেড থিয়েটারে অনুষ্ঠিত হয়।

১৪৬ পৃষ্ঠার পাদটীকা :

রবীন্দ্রনাথের মাতুল ও শ্বশুরবাড়ি—খুলনা জেলার দক্ষিণডিহি গ্রামে নগেন্দ্রনাথ আইচের জন্ম [১২৮৫]। 1901-এ তিনি কলকাতা ট্রেনিং স্কুল থেকে ফ্রী-হ্যাণ্ড ও মডেল-ড্রয়িঙের প্রাথমিক পরীক্ষায় পাশ করে গবর্মেন্ট আর্টস্কুলের প্রিন্সিপ্যাল হ্যাভেলের সার্টিফিকেট লাভ করে ভার্নাকুলার মাস্টারশিপ পরীক্ষার ক্লাশ পর্যন্ত ড্রয়িং-শিক্ষাদানের অধিকার লাভ করেছিলেন। তিনি বাংলা ক্লাশও নিতেন। দ্র ড পঞ্চানন মণ্ডল : ভারতশিল্পী নন্দলাল ১ [১৩৮৯]। ৫২৯-৩০

১৬৪ পৃষ্ঠার পাদটীকা :

* গোপালচন্দ্র কবিকুসুমের বাড়ি ছিল যশোহর জেলার মনোখালি গ্রামে। তিনি খুব সুরসিক লোক ছিলেন। দ্র ড পঞ্চানন মণ্ডল : ভারতশিল্পী নন্দলাল ১ [১৩৮৯]। ৫২৯

চ তু শ্চ ত্বা রিং শ   অ ধ্যা য়

১৩১১ [1904-05] ১৮২৬ শক ॥ রবীন্দ্রজীবনের চতুশ্চত্বারিংশ বৎসর

ব্রহ্মচর্যাশ্রম প্রতিষ্ঠার পর তৃতীয় বৎসরেই ১ বৈশাখ [বুধ 13 Apr 1904] শান্তিনিকেতনে নববর্ষের উপাসনা রবীন্দ্রনাথ করতে পারলেন না—তিনি নিজে অসুস্থ শরীরে এইদিন কলকাতায়, ছাত্র ও শিক্ষকগণ নিজ নিজ বাড়িতে। বিদ্যালয়ের শিক্ষক-ছাত্রদের নিয়ে ব্রহ্মোপাসনার মাধ্যমে নববর্ষকে অভ্যর্থনা করে নেবার জন্য তিনি উৎসুক হয়ে থাকতেন—পরবর্তীকালে অসুস্থ শরীরেও তিনি উপাসনায় যোগ দিয়েছেন, বিদেশে অবস্থানের জন্য কিংবা অন্য কোনো কারণে উপস্থিত থাকতে না পারলে পত্রে সেজন্য আক্ষেপ প্রকাশ করেছেন। বর্তমান বৎসরে আমরা অবশ্য এধরনের কোনো চিঠি পাইনি।

রোজ অল্প অল্প জ্বর হওয়াতে দুর্বল হয়ে পড়ছেন বলে চিকিৎসকের সঙ্গে পরামর্শ করবেন, একথা তিনি মনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়কে লিখেছিলেন। ৫ বৈশাখ [রবি 17 Apr] ক্যাশবহির হিসাবে দেখা যায় : 'বঃ ডা° হ্যারিশ সাহেব দং শ্রীযুক্ত রবীন্দ্র বাবু মহাশয়কে একজামিন করিতে আসার ফি ১৬্'। Dr. Harris নিশ্চয়ই তাঁকে বায়ুপরিবর্তনের পরামর্শ দিয়েছিলেন, ১১ বৈশাখ [শনি 23 Apr] তিনি মজঃফরপুর যাত্রা করেন। কবিরাজী ঔষধও তিনি ব্যবহার করেছেন ও উপকার পেয়েছেন। একটি তারিখহীন [১০ বৈশাখ : 22 Apr] চিঠিতে প্রিয়নাথ সেনকে জানিয়েছেন : 'সেই ঔষধটায় উপকার হয়েছে—বটব্যালের কাছ থেকে আর একটা বড় শিশিতে সেই ঔষধ তৈরি করে আমাকে পাঠিয়ো।'[১] ১৬ বৈশাখ [বৃহ 28 Apr] মজঃফরপুর থেকে তাঁকে লিখেছেন : 'এখানে আসিয়া ভাল আছি। তাহার একটা কারণ কুঁড়েমি—আর একটা সূক্ষ্ম আয়ুর্ব্বেদ। ঔষধগুলার নাম করিতে পারিলাম না পাছে বৃদ্ধ বয়সে জনসমাজে কলঙ্ক রটনা হয়।'[২]

কলকাতায় অবস্থানকালে রবীন্দ্রনাথ ১, ৩, ৫ ও ৭ বৈশাখ জগদীশচন্দ্রের বাড়ি গিয়েছিলেন। সেখানে নিশ্চয়ই নিবেদিতার সঙ্গে তাঁর দেখা হয়েছিল এবং তাঁরই সাহায্যে স্বামী সদানন্দের নেতৃত্বে বদরিকাশ্রম-যাত্রী দলটিতে রথীন্দ্রনাথ ও দিনেন্দ্রনাথের অন্তর্ভুক্তির বিষয়টি পাকা করে ফেলেন। রথীন্দ্রনাথ বিস্মৃতিবশত তাঁর স্মৃতি-কথায় যদিও ভ্রমণের কাল ও কিছু খুঁটিনাটি বিষয়ে ভুল তথ্য পরিবেশন করেছেন, তবু অন্যান্য ব্যাপারে তাঁর বিবরণ যথাযথ বলেই মনে হয়। তিনি লিখেছেন: 'একদিন আচার্য জগদীশচন্দ্রের বাড়িতে ভগিনী নিবেদিতার সঙ্গে বাবার দেখা হল। নিবেদিতা তখন ভারতবর্ষের তীর্থস্থানগুলির মাহাত্ম্য সম্বন্ধে ভাবছিলেন। তাঁর অত্যন্ত আগ্রহ—আমাদের দেশের ছেলেরা যেন দলে দলে হিমালয়ের পাহাড়ে পদব্রজে বেড়াতে যায়, বিশেষত তীর্থগুলি দেখে আসে। নিবেদিতা চুপ করে বসে থাকার পাত্রী ছিলেন না; যখন যা মনে আসত তখন

তা কাজে পরিণত করার চেষ্টা করতেন। বেলুড়-মঠের কয়েকজন স্বামীজীকে ধরলেন হিমালয়-ভ্রমণের দল যোগাড় করতে। বাবা যেই নিবেদিতার কাছ থেকে শুনলেন, কয়েক দিনের মধ্যেই প্রথম দলটিকে নিয়ে সদানন্দস্বামী কেদার-বদরী রওনা হবেন, তখনি তাঁর ইচ্ছা হল আমাকেও তাঁদের সঙ্গে পাঠান।...গেরুয়া বসন, ঘাড়ে কম্বল, পায়ে ভারী মিলিটারি বুটজুতো—এই অদ্ভুত বেশে আমরা ট্রেনে চাপলুম ও দু-দিন বাদে কাঠগুদামে নামলুম। হরিদ্বারের পথ দিয়েই তীর্থযাত্রীরা সাধারণত কেদারনাথে যায়, কিন্তু সেই রাস্তায় খুব ভিড় হয় বলে স্বামীজী আলমোড়ার পথ দিয়ে যাবেন স্থির করেছিলেন।'[৩]

দলটি ২১ বৈশাখ [মঙ্গল 3 May] কলকাতা থেকে রওনা হয়। নিবেদিতা 4 May মিস ম্যাকলাউডকে লেখেন : 'Dear Sadananda has taken half a dozen boys to the Hills for a walk. They started yesterday.'[৪] রথীন্দ্রনাথ লিখেছেন, স্বামী সদানন্দ, অমূল্য মহারাজ [স্বামী শংকরানন্দ], কলকাতার কয়েকটি ব্যবসায়ী-ঘরের ছেলে প্রভৃতি সহ দলে পনেরো-যোলোজন ছিলেন। কিন্তু তিনি নিজে কলকাতা থেকে তাঁদের সহযাত্রী হননি। ৯ বৈশাখ পুরী থেকে ফিরে দু'দিন বাদে তিনি পিতার সঙ্গে মজঃফরপুর যান। ১৯ বৈশাখ [রবি 1 May] দিনেন্দ্রনাথ মজঃফরপুর গিয়ে ['বঃ বাবু রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর দং উঁহার বদ্রিকাশ্রম গমনের ব্যায় জন্য পাঠান যায় গুঃ বাবু দীনেন্দ্র নাথ ঠাকুর ৫০্'] ও তাঁর সঙ্গে মিলিত হন ও উভয়ে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে কাশী গিয়ে মূল দলটিতে যোগ দেন।

রবীন্দ্রনাথ কলকাতায় থাকার সময়ে আরও কিছু ব্যাপারে ব্যস্ত ছিলেন। শৈলেশচন্দ্র মজুমদার কিঞ্চিৎ অলস স্বভাবের মানুষ ছিলেন, ব্যবসায়বুদ্ধিও তাঁর প্রখর ছিল না—ফলে তাঁর দ্বারা প্রতিষ্ঠিত মজুমদার লাইব্রেরির অবস্থা সংকটপূর্ণ হয়ে পড়ে। তাঁর প্রতি ব্যক্তিগত প্রীতি ছাড়াও মজুমদার লাইব্রেরির সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের কিছু আর্থিক স্বার্থও জড়িত ছিল। তিনি শৈলেশচন্দ্রকে এক হাজার টাকা মূলধনী ঋণ দিয়েছিলেন —তাছাড়া গল্পগুচ্ছ, চোখের বালি ও কাব্যগ্রন্থ-এর প্রকাশক হওয়া ছাড়াও মজুমদার লাইব্রেরি রবীন্দ্রনাথের সমস্ত গ্রন্থের প্রধান বিক্রেতা ছিল, যার আয় তিনি ব্রহ্মচর্যাশ্রমকে দান করেছিলেন। ফলে আর্থিক সংকটে বিব্রত শৈলেশচন্দ্র মজুমদার লাইব্রেরি জনৈক নগেন্দ্রবাবুকে [? নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত] বিক্রয় করে দিতে চাইলে রবীন্দ্রনাথও এর সঙ্গে জড়িত হয়ে পড়েন। এই সময়ে দীনেশচন্দ্র সেনকে লেখা তাঁর সবগুলি পত্রেই বিষয়টি এসেছে। ১১ বৈশাখ [শনি 23 Apr] মজঃফরপুর যাত্রার প্রাক্কালে তিনি লিখেছেন : 'শৈলেশ বলে তাহার liability প্রায় ১২।১৩ হাজার হইবে। Assets অন্তত হাজার পনেরো টাকার আছে। যে টাকার সুদ খাটিতেছে অর্থাৎ যাহা আশু পরিশোধ করা কর্ত্তব্য তাহার পরিমাণ ৬।৬॥ হাজার। বাকি টাকা ক্রমশঃ শুধিলে চলিবে ইত্যাদি।'[৫] ১৬ বৈশাখের [বৃহ 28 Apr] পত্রেও বিষয়টি উত্থাপন করে তিনি লিখেছেন : 'অবশ্য নগেন্দ্রবাবু যদি এই কারবার গ্রহণ করেন তবে এই কোম্পানির সহিত আমার সম্বন্ধ পূর্ব্ববৎ থাকিবে—আমার সমস্ত গ্রন্থ ইঁহাদেরই হাতে রাখিব এবং সুবিধামত termsএই রাখিব। আপনি বোধহয় জানেন আমার সমস্ত গ্রন্থের স্বত্ব আমি বোলপুর বিদ্যালয়কে দিয়াছি—অথচ অর্থাভাবে আমি ভিক্ষাবৃত্তি করিয়া ফিরিতেছি—কাজের লোকের হাতে পড়িলে এ দুর্দ্দশা হইত না এই জন্য এবং দুর্ভাগা শৈলেশের আসন্ন দুর্গতি স্মরণ করিয়া আমি কিছু ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছি।'[৬] উক্ত নগেন্দ্রবাবুর সঙ্গে তাঁর এবিষয়ে পত্রালাপ ও কাশী যাতায়াতের সময়ে বাঁকিপুর স্টেশনে 'চকিতের মত' দেখাও হয়েছিল। ২১ বৈশাখ [মঙ্গল 3 May] তিনি দীনেশচন্দ্রকে লিখেছেন : 'এই

মজুমদার লাইব্রেরির জাল ছিন্ন করিতে পারিলে আমি কতকটা সুস্থ হইতে পারিব। আপনি আমার এই যে উদ্ধার ব্রত গ্রহণ করিয়াছেন তাহাতে কৃতকার্য্য হউন্ বা না হউন্ আমার কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়া থাকিবেন।'[৭] দীনেশচন্দ্র কৃতকার্য হতে পারেননি, এলাহাবাদের ইণ্ডিয়ান প্রেসের স্বত্বাধিকারী চিন্তামণি ঘোষ রবীন্দ্র-গ্রন্থের মুদ্রণ ও বিক্রয়ের দায়িত্ব না নেওয়া পর্যন্ত [14 Jul 1908 : ৩০ আষাঢ় ১৩১৫] রবীন্দ্রনাথ মজুমদার লাইব্রেরির জালেই আবদ্ধ ছিলেন।

মজুমদার লাইব্রেরির ভাগ্যবিপর্যয়ের সঙ্গে সঙ্গে এখান থেকে প্রকাশিত রবীন্দ্রনাথ-সম্পাদিত নবপর্যায় বঙ্গদর্শন-এর সম্পর্কেও চিন্তার কারণ দেখা দিয়েছিল। শৈলেশচন্দ্র মজুমদার পত্রিকাটির ঘোষিত সহ-সম্পাদক [রবীন্দ্রনাথের ভাষায়, 'দুঃসহ-সম্পাদক] হলেও এখন রবীন্দ্রনাথ দীনেশচন্দ্রের উপর অধিকমাত্রায় নির্ভরশীল হয়েছেন; একটি 'বঙ্গদর্শন সমিতি' স্থাপন করে দীনেশচন্দ্রকে তার সেক্রেটারি করেন। ১১ বৈশাখের পত্রেই লেখেন; 'বঙ্গদর্শন সমিতির কথা [শৈলেশকে] বলিয়াছি। যতীও [যতীন্দ্রনাথ বসু] ছিলেন। আগামী রবিবারেই প্রথম অধিবেশন আহ্বান করিবেন—আপনি সেক্রেটারি।' ২১ বৈশাখ তিনি ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন শৈলেশচন্দ্র 'সমিতির কার্য্য বিবরণ' পাঠাননি বলে। দীনেশচন্দ্র লিখেছেন : "রবিবাবুর উদ্যোগে 'বঙ্গদর্শন' চালাইবার জন্য ও সাহিত্য চর্চার নিমিত্ত আমরা মজুমদার লাইব্রেরীর উপরে একটি সমিতি প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলাম। রবিবাবু যখন অনুপস্থিত থাকিতেন, তখন এই আড্ডায় যতীনবাবু অনেক সময় তাঁহার কীর্তন ও কথকতার নকল শুনাইয়া আমাদিগকে হাসাইতেন।"[৮] চতুর্থ বর্ষ বঙ্গদর্শন-এ রবীন্দ্রনাথ 'সাময়িক প্রসঙ্গ' ও 'সাহিত্য প্রসঙ্গ' নামে দুটি নূতন বিভাগের প্রবর্তন করেন এবং নিজে প্রথমটির দায়িত্ব নেন ও দীনেশচন্দ্রের উপর দ্বিতীয়টির ভার অর্পণ করেন। দীনেশচন্দ্রের লেখার সুবিধার জন্য তিনি অনেক বিদেশী পত্রিকা সংগ্রহ করে দিয়েছিলেন। কিন্তু দুটি বিভাগই বেশি দিন চলেনি—'সাময়িক প্রসঙ্গ' তিনটি ও 'সাহিত্য প্রসঙ্গ' দুটি সংখ্যায় প্রকাশের পরই বন্ধ হয়ে যায়। অর্থোপার্জনের জন্য দীনেশচন্দ্রকে প্রায় ভাড়াটে লেখকের ভূমিকা গ্রহণ করতে হত—তিনি সরলা দেবী-সম্পাদিত ভারতী-র কাজে অধিকতর মনোযোগ দেন। রাসসুন্দরী দেবীর আত্মকথা 'আমার জীবন' [১৩০৫] সমালোচনার ভার রবীন্দ্রনাথ দীনেশচন্দ্রের উপর অর্পণ করেন [দ্র পত্র ৯ চৈত্র ১৩১০—চিঠিপত্র ১০।১৯], কিন্তু দীনেশচন্দ্র গ্রন্থটির সমালোচনা করেন শ্রাবণ ১৩১১-সংখ্যা ভারতী-তে।

ত্রিপুরার মহারাজা রাধাকিশোর মাণিক্য বঙ্গদর্শন প্রকাশের প্রথম পর্বে পত্রিকাটিকে অর্থসাহায্য করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু রবীন্দ্রনাথই তখন রাজ-পারিষদদের চক্রান্ত আশঙ্কা করে সেই সাহায্য গ্রহণ করেননি। বর্তমানে তিনি সম্ভবত এবিষয়ে মহারাজকে কিছু লিখে থাকবেন। প্রত্যুত্তরে রাধাকিশোর যা লেখেন তিনি ১১ বৈশাখ [শনি 23 Apr] দীনেশচন্দ্রকে লিখিত পত্রে তা উদ্ধৃত করেন : 'মহারাজ আজ লিখিয়াছেন—"বঙ্গদর্শন ও বোলপুর বিদ্যালয়ের জন্য কতক সাহায্য করিবার ব্যবস্থা করিয়াছি। বর্তমান বৈশাখ হইতে মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে...৫০ টাকা আপনার কর্ম্মচারীর নামে মানি অর্ডার করা হইবে"। অতএব নিশ্চিন্ত থাকিবেন।'[৯] নিশ্চিন্ত অবশ্য থাকা যায়নি। ২৯ বৈশাখ [বুধ 11 May]ই তাঁকে লিখতে হয়েছে : 'ত্রিপুরা হইতে নিয়মমত টাকা আসা দেখিতেছি সন্দেহস্থল। একবার মহিম ঠাকুরকে আপনি দুঃখ নিবেদন করিবেন। যদি দুই চারিদিনের মধ্যে আসিয়া থাকে জোড়াসাঁকোয় খবর লইয়া জানিবেন।'[১০] কিন্তু ত্রিপুরার টাকা কয়েকদিন পরেই এসে গিয়েছিল। ৬ জ্যৈষ্ঠ [বৃহ 19 May] রবীন্দ্রনাথের ক্যাশবহিতে দেখা যায় : 'আগরতলা ত্রিপুরা হইতে মণিঅর্ডার যোগে

আইসে ১৫০্'; সেইদিনই টাকাটি বণ্টন করা হয় : বিদ্যালয় ৫০্ এবং 'বঙ্গদর্শনে লেখার দরুণ সাহায্য' বৈশাখ মাসের বাবদে দীনেশচন্দ্রকে ২৫্, ও যতীন্দ্রনাথ বসুকে ৭৫্ টাকা দেওয়া হয়। এরপর এইরূপ হিসাবের সাক্ষাৎ প্রতিমাসেই পাওয়া যায়। এই হিসাব থেকে জানা যায়, বঙ্গদর্শনের জন্য মহারাজ প্রতি মাসে—৫০ টাকা নয়—১০০ টাকা করে সাহায্য করেছেন, যা দীনেশচন্দ্র ও যতীন্দ্রনাথের মধ্যে বিভিন্ন হারে বণ্টিত হয়েছে। যতীন্দ্রনাথ বঙ্গদর্শন-এর জন্য কোন্ কাজ করতেন জানা নেই, কিন্তু তিনিই অর্থের সিংহভাগ লাভ করতেন। হিসাবটির অপর অংশ থেকে জানা যায়, মহারাজ ব্রহ্মচর্যাশ্রমের জন্য মাসে ৫০ টাকা করে সাহায্য বরাদ্দ করেছেন এবং সেই সাহায্য এই সময় থেকেই আসতে শুরু করে।

বৈশাখ-সংখ্যা বঙ্গদর্শন [৪।১] প্রকাশিত হয় 25 Apr [সোম ১৩ বৈশাখ]। এই সংখ্যায় রবীন্দ্রনাথের রচনা একটি মাত্র :

৪৫-৫৫ 'নৌকাডুবি' ৩৩-৩৪ দ্র নৌকাডুবি ৫।২৭৪-৮৬ [৩১-৩২]

সঙ্গীত-প্রকাশিকা, বৈশাখ ১৩১১ [৩।৮] :

no১৩৭-৪০ সিন্ধু ভৈরবী-রূপক। কেন বাজাও কাঁকন কণকণ দ্র স্বর ১৩

স্বরলিপিকারের নাম উল্লিখিত হয়নি।

আমরা আগেই বলেছি, রবীন্দ্রনাথ রথীন্দ্রনাথ, শমীন্দ্রনাথ ও মীরাকে নিয়ে ১১ বৈশাখ [শনি 23 Apr] মাধুরীলতার পতিগৃহ মজঃফরপুর যাত্রা করেন। কন্যাকে স্বামীর ঘরে পৌঁছে দেওয়ার জন্য তিনি আষাঢ় ১৩০৮-এর শেষে মজঃফরপুরে এসেছিলেন, এইটি তাঁর দ্বিতীয়বার আগমন। শমী ও মীরা অবশ্য এইবারই প্রথম এখানে এলেন। মীরা দেবী তাঁর স্মৃতিকথায় লিখেছেন : 'শরৎবাবুদের বাড়িটা ছিল দু-মহল; মাঝখানে উঠান। সামনের দিকের মহলে দিদিরা থাকতেন, পিছন দিকের মহলে শরৎবাবুর দাদা হৃষীকেশবাবু ও তাঁর স্ত্রী থাকতেন।...দিদিদের মহলে তিনখানা ঘর ছিল। দু পাশে দুটি শোবার ঘর আর মাঝেরটি ছিল বসবার। প্রথম ঘরটি ছিল দিদিদের শোবার ঘর।...রাত্তিরে শুতে যাবার আগে হল্‌ঘরে বসে শরৎবাবুর সঙ্গে দিদি সংস্কৃত কাব্য নাটক পড়তেন—কখনো মেঘদূত, কখনো বা শকুন্তলা। শরৎবাবুর সংস্কৃত সাহিত্যে খুব অনুরাগ ছিল। যতক্ষণ-না আমার ঘুম আসত শরৎবাবুর গম্ভীর গলায় সংস্কৃত শ্লোকের ধ্বনি, মানে না বুঝলেও শুনতে খুব ভালো লাগত।'[১১] শেষে বর্ণিত বিষয়টি অবশ্য পরবর্তীকালের ঘটনা।

মজঃফরপুরে গিয়ে রবীন্দ্রনাথের কিঞ্চিৎ স্বাস্থ্যোন্নতি হয়, রচনাকার্যও মন্দ ছিল না।১৬ বৈশাখ [বৃহ 28 Apr] তিনি দীনেশচন্দ্রকে লিখেছেন : 'এখানে আমার শরীর ভালোই আছে—ইতিমধ্যে আর জ্বর আসে নাই। চুপচাপ করিয়া কেদারা হেলান্ দিয়া পড়িয়া আছি—অল্পস্বল্প লিখিতেছি, যথাসাধ্য খাইতেছি—ইহাতে জ্বর আসিবার কথা নয়।/আমি "বঙ্গবিভাগ" লইয়া বঙ্গদর্শনে একটা সাময়িক প্রসঙ্গ লিখিয়াছি।'[১১] ২১ বৈশাখ [মঙ্গল 3 May] লিখেছেন : 'আমি য়ুনিভার্সিটি বিল লইয়া আষাঢ়ের সাময়িক প্রসঙ্গ লিখিয়াছি এবং আষাঢ়ের নৌকাডুবিও আজ শেষ করা গেল।'[১২]

এরপরেই তাঁকে সত্যপ্রসাদের কন্যা শান্তার বিবাহোপলক্ষে কাশী যেতে হল। প্যারীলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে শান্তার বিবাহ হয় ২৩ বৈশাখ [বৃহ 5 May]। রথীন্দ্রনাথ ও দিনেন্দ্রনাথ কেদারবদরী-অভিমুখী যাত্রীদলে

যোগ দেবার উদ্দেশ্যে ২১ বৈশাখ [মঙ্গল 3 May] তাঁর সঙ্গে কাশী আসেন, একথা আমরা আগেই বলেছি।

উল্লেখ্য, তাঁর স্বাস্থ্যোদ্ধারকল্পে মজঃফরপুর আসা, বিবাহোপলক্ষে কাশী যাওয়া প্রভৃতি সংবাদ সুরেশচন্দ্র সমাজপতি-সম্পাদিত সাহিত্য পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। চৈত্র ১৩১০-সংখ্যায় [পৃ ৭৬৩] 'বিবিধ' বিভাগে লেখা হয়: 'শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় অসুস্থ হইয়া মজঃফরপুরে গিয়াছিলেন। এখন পূর্ব্বাপেক্ষা অনেকটা সুস্থ হইয়াছেন। আমাদের আন্তরিক কামনা, কবিবর সত্বর সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করুন। রবীন্দ্র বাবু সম্প্রতি বিবাহের নিমন্ত্রণ উপলক্ষে কাশীধামে গিয়াছেন।' [বৈশাখ ১৩১১-এর শেষ সপ্তাহের বিবরণ চৈত্র ১৩১০-সংখ্যায় মুদ্রিত হওয়া দেখে বোঝা যায়, সাহিত্য-এর প্রকাশ তখন কতটা অনিয়মিত হয়ে পড়েছে।] রবীন্দ্র-বিরোধী সাহিত্য পত্রিকায় এই ধরনের সংবাদ প্রকাশ আমাদের আশ্চর্য করে। কিন্তু আরও আশ্চর্যজনক সংবাদ মুদ্রিত হয়েছে 8 May [রবি ২৬ বৈশাখ]-এর সাপ্তাহিক ঢাকাপ্রকাশ [পৃ ৪] পত্রিকায় : 'শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহোদয় বিষম জ্বররোগে আক্রান্ত হইয়াছেন। বায়ু পরিবর্ত্তনের জন্য তিনি মজঃফরপুরে গিয়েছেন। শুনিয়া সুখী হইলাম তাঁহার কল্যাণকামনা করিয়া গ্রহযোগ ও হোমাদি হইতেছে। স্বামী শিবনারায়ণ পরমহংস হোম করিতেছেন।' এই সংবাদের সত্যাসত্য নির্ণয় করা আমাদের সাধ্যাতীত।

কাশী যাতায়াতে রবীন্দ্রনাথের শরীর একটু খারাপ হয়। ২৯ বৈশাখ [বুধ 11 May] তিনি দীনেশচন্দ্রকে লিখেছেন : 'মধ্যে কাশী ভ্রমণ করিতে গিয়া ভাল করি নাই—শরীরটা আবার কিছু ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছে। তবু কলম ছাড়ি নাই একটু আধটু লেখা চলিতেছে—আষাঢ় মাসের নৌকাডুবি এবং সাময়িক প্রসঙ্গ পূর্ব্বেই পাঠাইয়াছি। আজ প্রার্থনা বলিয়া একটা প্রবন্ধ পাঠানো গেল। ইহাতে আষাঢ় মাসের খোরাক চলিবে।'[১৩]

তাঁর মধ্যম জামাতা সত্যেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য শ্রাবণ ১৩১০-এ বিদ্যালয় ত্যাগ করে রেণুকার শুশ্রূষার জন্য আলমোরা গিয়েছিলেন, কিন্তু তার পর আর বিদ্যালয়ের কাজে যোগ দেননি। এতদিন পরে ১৭ বৈশাখ [শুক্র 29 Apr] রবীন্দ্রনাথকে একটি পত্র লিখে তিনি পুনরায় শিক্ষকপদে নিযুক্তি প্রার্থনা করেন। রবীন্দ্রনাথ পত্রটির পিছনেই মোহিতচন্দ্রকে লেখেন : 'সত্য যদি বিদ্যালয়ের কাজে নিষ্ঠার সহিত যোগ দেয় তবে আমাদের অনেকটা সাহায্য হইবে। নগেন্দ্রবাবুর ঠিকানা জানেন কি? লাভপুরের সেই ড্রয়িং শিক্ষককে পাওয়া যাইবে কি না তাহা তিনি আমাদের জানাইলেন না। ছুটির পর শিক্ষকদের কিরূপ ব্যবস্থা হইবে। সতীশের কাকা কলিকাতায় আসিয়াছেন তাঁহারা সম্ভবত জোড়াসাঁকোর বাড়িতেই আছেন...তিনি সংস্কৃত বাংলা প্রভৃতি কি রকম পড়াইতে পারিবেন জানা আবশ্যক। প্রিয়বাবুর ছেলেরও ত যাইবার কথা আছে।...সত্যর দ্বারা অঙ্ক শেখাইবার কাজ বেশ চলে—তাহা ছাড়া Physiology প্রভৃতি বিদ্যা শিখাইবার বিশেষ সুযোগ হয়।...সত্য যদি কাজে যোগ দেয় তাহা হইলে রাজেন্দ্রবাবুকে প্রয়োজন না হইতে পারে।...নীলরতনবাবু বিদ্যালয়ের জন্য Skeleton জোগাড় করিয়া দিবেন বলিয়াছিলেন।...সুরেন্দ্র মৈত্র মশায় ত আপনার প্রতিবেশী—তাঁর সঙ্গে যন্ত্রতন্ত্র ও বিজ্ঞানশিক্ষা ও শিক্ষক সম্বন্ধে একবার ভালো করিয়া আলোচনা করিয়া দেখিবেন।'[১৪] এই পত্রে অজস্র উপদেশ-নির্দেশ আছে, একটু আশার সুরও অশ্রুত নয়—কিন্তু কাশী থেকে ফিরে এসে ২৮ বৈশাখ [মঙ্গল 10 May] যে চিঠি লিখেছেন তাতে শারীরিক ক্লান্তির সঙ্গে মানসিক অবসাদও প্রকাশ পেয়েছে : 'সত্যেন্দ্র সম্বন্ধে বেশি আশান্বিত হওয়া কিছু নয়। সে লিখেছে শরীর সুস্থ হলেই সে আপনার ওখানে যাবে—হয়ত যাবে এবং বোলপুরেও যাওয়া অসম্ভব নয় কিন্তু মানুষের প্রকৃতি সহজে বদলায় না—ও যে সেখানে

দীর্ঘকাল টিঁকে থাক্‌বে এ আমি কিছুতেই বিশ্বাস করি নে।/প্রিয় বাবুর বাড়ি গিয়ে তাঁর ছেলের সম্বন্ধে সব কথা যথাসম্ভব স্পষ্ট করে নেবেন। আমার বিশ্বাস সেও দিন কতক বোলপুরে থেকে অস্বাস্থ্য ও অসুবিধা উপলক্ষ্য করে চলে আসবে। আপনার জানা লোক কেউ আছে? যাকে আপনি চালনা করতে পারেন? ক্রমে ক্রমে শিক্ষক সংস্কার করতেই হবে।'[১৫]

নিজের পুত্রকন্যাকে সংস্কৃত শেখানোর জন্য রবীন্দ্রনাথ 'সংস্কৃত শিক্ষা' গ্রন্থ প্রণয়ন করেছিলেন, 'ইংরাজি সোপান' লেখা হয় ব্রহ্মচর্যাশ্রমের ছাত্রদের জন্য। গ্রন্থের পরিকল্পনাটি রবীন্দ্রনাথের, শিক্ষাপদ্ধতিও তাঁরই উদ্ভাবিত। প্রথমে পাঠ্যগ্রন্থটি মনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় লিখবেন এমন ঠিক হয়েছিল। কার্তিক ১৩০৯-এ রবীন্দ্রনাথ তাঁকে লিখেছিলেন : 'আপনার Reader অগ্রসর হইয়াছে শুনিয়া বড়ই খুসি হইলাম। কপি করিয়া আমাকে পাঠাইলে আমার মন্তব্য জানাইতে চেষ্টা করিব।'[১৬] এই প্রয়াস সম্পূর্ণ হয়নি, তাই রবীন্দ্রনাথ নিজেই দায়িত্ব গ্রহণ করেন। পৌষ ১৩১০-এ তিনি সুবোধচন্দ্র মজুমদারকে লিখেছেন : 'কই—সেই ইংরাজী রীডার কপি করিয়া পাঠাইলে না? আমি ত কাল [শিলাইদহ] যাত্রা করিতেছি। ইতিমধ্যে পাঠাইলে ছাপার বন্দোবস্ত করিতে পারিতাম। মোহিতবাবুকে বলিয়া গেলাম—তাঁহাকে পাঠাইলে তিনি প্রেসে দিয়া দেখিয়া শুনিয়া ছাপাইবেন। বিলম্ব করিয়ো না।'[১৭] মোহিতচন্দ্রের তত্ত্বাবধানেই গ্রন্থটি মুদ্রিত হয় ও বেঙ্গল লাইব্রেরির ক্যাটালগ অনুযায়ী রবীন্দ্রনাথের ৪৪তম জন্মদিবসে 7 May 1904 [শনি ২৫ বৈশাখ] গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়। বেঙ্গল লাইব্রেরির বিবরণটি আগে উদ্ধৃত করি: 'Inraji Sopan. Stepping-stone to English. Part I./Mohit Chandra Sen/86, College Street, Calcutta/L. M. Gupta; the Brahmacharyyasram./May 7/Dy. 12 mo; 41/Ist; 200/p./0 3 0/...' আখ্যাপত্রটি হল :

ইংরাজি সোপান।/ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম,/বোলপুর।/মূল্য।ল ছয় আনা।

রবীন্দ্র-রচনাবলী অচলিত সংগ্রহ দ্বিতীয় খণ্ডের 'গ্রন্থপরিচয়'-এ গ্রন্থটি সম্পর্কে লেখা হয়েছে : 'বেঙ্গল লাইব্রেরির পুস্তক তালিকা হইতে জানা যায়, প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হয় ৭ মে ১৯০৪, পৃষ্ঠাসংখ্যা ২৪ + ৪১; দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশিত হয় ১৫ জুন ১৯০৬, পৃষ্ঠাসংখ্যা ৩৮ + ৪৪। দুই খণ্ডেরই মলাটের চতুর্থ পৃষ্ঠায় মুদ্রাকরের নাম-ঠিকানা এইরূপ দেওয়া আছে—

Printed by K. C. Aich, at the Commercial Press

27, Hourtokee Bagan Lane, Calcutta.

সতর্ক পাঠক এই বিবরণ ও আখ্যাপত্রের সঙ্গে বেঙ্গল লাইব্রেরির ক্যাটালগে মুদ্রিত বিবরণের কিছু পার্থক্য লক্ষ্য করবেন। আখ্যাপত্রে বা অন্যত্র গ্রন্থটির সম্পাদক হিসেবে মোহিতচন্দ্র সেনের নাম নেই, গ্রন্থটির মূল্য ছয় আনা—কিন্তু ক্যাটালগে উল্লিখিত মূল্য তিন আনা, পৃষ্ঠাসংখ্যা ৪১; ক্যাটালগে মুদ্রাকরের নাম এল. এম. গুপ্ত ও ঠিকানা ৮৬ কলেজ স্ট্রীট। আরো একটি সমস্যা আছে। ২৮ বৈশাখ [মঙ্গল 10 May] ইংরাজি সোপান দ্বিতীয় ভাগের পাণ্ডুলিপি পাঠিয়ে রবীন্দ্রনাথ মোহিতচন্দ্রকে লিখছেন : 'ইংরাজি সোপান প্রথম ভাগে subject predicate সম্বন্ধে শিক্ষকদের প্রতি যে উপদেশ দেওয়া হয়েছে আমার বোধ হচ্চে শিশু পাঠকদের পক্ষে সেটা ঠিক উপযোগী হয় নি—ওটা শমীর মত ছেলেকে বোঝানো শক্ত। ইংরাজি সোপান ১ম ভাগ খুব ছোট ছেলেদের জন্যেই ত'[১৮]—কিন্তু গ্রন্থে এরূপ কোনো উপদেশ নেই। এই কারণেই আমাদের অনুমান,

ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস অচলিত-সংগ্রহ দ্বিতীয় খণ্ডে ইংরাজি সোপান-এর যে সংস্করণটি মুদ্রিত করেছেন সেটি প্রথম সংস্করণ নয়।

ইংরেজি সোপান প্রথম খণ্ডের দুটি ভাগ—(১) উপক্রমণিকা, পৃ 1-24, (২) ইংরাজি সোপান প্রথম ভাগ পৃ ১-৪১। লেখক হিসেবে এই গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথের নাম নেই। তিনি 'বিশেষ দ্রষ্টব্য'তে লিখেছেন :

> ইংরাজি-সোপান বোলপুর ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমের জন্য রচিত হইয়াছিল। এ পর্য্যন্ত সাধারণের নিকট প্রকাশ করা হয় নাই। কয়েক বৎসর বোলপুর বিদ্যালয়ে এই প্রণালীতে শিক্ষা দিয়া যেরূপ ফললাভ করা গিয়াছে তাহাতে অসঙ্কোচে এই গ্রন্থ সর্ব্বসমক্ষে উপস্থিত করিতে সাহসী হইয়াছি।... ইহার সাহায্যে অল্প দিনেই শিক্ষার্থিগণ ইংরাজি ভাষাশিক্ষায় দ্রুত অগ্রসর হইতে পারিবেন ইহা আমাদের জানা কথা।
>
> এই গ্রন্থের আরম্ভে যে অংশ সন্নিবেশিত হইয়াছে তাহা নিয়মিত পাঠের অন্তর্গত নহে। ছাত্রগণ যখন অক্ষরপরিচয়ে প্রবৃত্ত তখনই ইংরাজি ভাষার সহিত তাহাদের পরিচয়সাধন এই অংশের উদ্দেশ্য। ইহা ভাষাশিক্ষার ড্রিল।...
>
> ইংরাজি-সোপানের উপস্বত্ব বোলপুর ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমে দান করা হইয়াছে। যদি এই গ্রন্থ অপরাপর বিদ্যালয়ে প্রচলিত ও সাধারণের নিকট আদৃত হয় তবে তদ্দ্বারা বোলপুর বিদ্যালয় সাহায্য লাভ করিবে।

কুচবিহারের ভিক্টোরিয়া কলেজের অধ্যক্ষ ব্রজেন্দ্রনাথ শীল [1864-1938] বইটি পড়ে রবীন্দ্রনাথকে লেখেন : 'আমি যতদূর জানি, এইরূপ পুস্তক বাঙ্গালায় এই প্রথম মুদ্রিত হইল। ইহার প্রণালী অত্যন্ত সুসঙ্গত—Otto, Ollendorf ও Saner প্রভৃতি ভাষাশিক্ষাপুস্তক-প্রণেতাগণ এই প্রণালী কিয়ৎপরিমাণে অবলম্বন করিয়াই কৃতকার্য্য হইয়াছেন। আপনার উদ্ভাবনীশক্তির নিকট বঙ্গদেশ চিরঋণী, এই ইংরাজিশিক্ষা বিষয়েও আপনি পথপ্রদর্শকের কার্য্য করিয়াছেন।' ব্রজেন্দ্রনাথের এই দীর্ঘ পত্রটি 'মন্তব্য' শিরোনামে ইংরাজি সোপান দ্বিতীয় খণ্ডে ভূমিকা হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। প্রথম খণ্ডটি মাত্র ২০০ কপি ছাপা হয়েছিল।

প্রথম খণ্ডটি প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই রবীন্দ্রনাথ দ্বিতীয় খণ্ডের পাণ্ডুলিপি মোহিতচন্দ্রকে প্রেরণ করেন। ২৮ বৈশাখের পত্রে এ-বিষয়ে লেখেন : 'ইংরাজি সোপানের কপি পাঠাচ্ছি। একবার revise করে নেবেন। অনেক জায়গায় যথেষ্ট উদাহরণ দেওয়া হয়নি সেগুলি পূরণ করবেন—Adverbsগুলি ঠিক খাপ খায় কিনা দেখে নেবেন। কারণ, প্রথম লেখার পর sentenceগুলি স্থানে স্থানে বদল ও কমিবেশি হয়ে গেছে—adverbগুলির সেই অনুসারে পরিবর্ত্তন হয়নি। পাণ্ডুলিপির যে যে অংশ মার্জ্জিনে এবং ইতস্তত বিক্ষিপ্ত আছে সেগুলিকে যথাস্থানে বিন্যস্ত করে নেবেন।' ইংরাজি সোপান-এর দ্বিতীয় খণ্ডে একত্রে দ্বিতীয় ও তৃতীয় ভাগ ছাপা হয়, বেঙ্গল লাইব্রেরির ক্যাটালগে খণ্ডটির প্রকাশ-তারিখ 15 Jun 1906 [শুক্র ১ আষাঢ় ১৩১৩]। কিন্তু আমাদের মনে হয়, দ্বিতীয় ভাগটি আলাদা ছাপা হয় অনেক আগেই। ১০ আষাঢ় [শুক্র 24 Jun] রবীন্দ্রনাথ মোহিতচন্দ্রকে লিখছেন : 'ইংরাজি সোপান দ্বিতীয় খণ্ড ছাপা হল কি? শিশুদের ইংরাজি শেখাবার নূতন প্রণালীটাও আমাদের ছাপাতে হবে [তবে কি ইংরাজি সোপান প্রথম ভাগ ও উপক্রমণিকা আলাদা ছাপা হয়েছিল? এই তথ্যটি জানা গেলে পূর্ব্বোল্লিখিত সমস্যার একটি সমাধান নির্দেশ করা যায়]।'[১৯] আবার 'বুধবার' [*11 Aug : ২৬ শ্রাবণ] তাঁকে লিখেছেন : 'ইংরাজি সোপান দ্বিতীয় ভাগ আজও না আসাতে ছেলেদের পড়ার অত্যন্ত ক্ষতি হচ্চে। যদি শৈলেশকে ছাপতে দিতেন তবে এর চেয়ে বিলম্ব হত না এবং মূল্যও দিতে হত না—নগদ দামও দেওয়া যাচ্চে অথচ ফলও পাওয়া যাচ্চে না।'[২০] পুনশ্চ ৫ ভাদ্রের [রবি 21 Aug] চিঠি : 'আমাকে ইংরাজি সোপান ২য় ভাগ একখানা পাঠাইয়া দিবেন—কারণ ৩য় ভাগ লিখিতে হইবে।'[২১] এই শেষ চিঠি থেকে বোঝা যায় স্বতন্ত্রভাবে ইংরাজি সোপান দ্বিতীয় ভাগ এরই মধ্যে মুদ্রিত হয়ে গেছে। একটি তারিখহীন চিঠিতে তিনি সুবোধচন্দ্র মজুমদারকে লিখেছেন : 'ইংরেজি সোপান যেন আবার

তোমার জন্য দেরী না হয়—তাগিদ রেখো—তোমার অবশিষ্ট অংশ লেখা শেষ কোরো।'[২২] এই চিঠি নিশ্চয়ই দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশের আগে লেখা।

মজঃফরপুর থেকে রবীন্দ্রনাথ কলকাতায় ফেরেন ৩১ বৈশাখ [শুক্র 13 may]—'হাবড়ার ষ্টেসন হইতে আসার ৩১ বৈশাখের' হিসাব থেকে তারিখটি জানা যায়। এইদিনই তিনি কর্নওয়ালিশ স্ট্রীট ও হাতিবাগান যাতায়াত করেন।

৩ জ্যৈষ্ঠ [সোম 16 May] মহর্ষির ৮৮তম জন্মোৎসব মহাসমারোহে অনুষ্ঠিত হয়। 'মহর্ষিদেবের গৃহপ্রাঙ্গণ লোকে পরিপূর্ণ হইলে শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত বাবু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর আচার্য্যের আসন গ্রহণ করিয়া উপাসনা করেন। উপাসনান্তে তিনি যে বক্তৃতা করেন আগামী মাসে তাহা প্রকাশ করিবার ইচ্ছা রহিল।'[২৩] তাঁর পর ত্রৈলোক্যনাথ সান্যাল, প্রিয়নাথ শাস্ত্রী, উমেশচন্দ্র দত্ত, নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি 'অনেকে মহর্ষি দেবের জন্মোৎসবে স্ব স্ব বক্তব্য ব্যক্ত করিলে কএকটী সঙ্গীত হইয়া সভাভঙ্গ হয়।'

'কএকটী সঙ্গীত'-এর মধ্যে মাত্র একটি তত্ত্ববোধিনী-তে [আষাঢ়। ৪৪] মুদ্রিত হয়; গানটি রবীন্দ্রনাথের : ইমন ভূপালি। ভক্ত করিছে প্রভুর চরণে জীবন সমর্পণ দ্র গীত ১।১২৭; স্বরলিপি নেই। এটি নৈবেদ্য-এর ১৬-সংখ্যক কবিতা [দ্র ৮।১৯-২০], বর্তমান উপলক্ষে সুর দিয়ে গাওয়া হয়েছিল।

রবীন্দ্রনাথের বক্তৃতাটি 'মহর্ষির জন্মোৎসব' নামে জ্যৈষ্ঠ-সংখ্যা 'সমালোচনী' [পৃ ৪২-৫১], আষাঢ়-সংখ্যা ভারতী [পৃ ২১৭-২৬] ও শ্রাবণ-সংখ্যা তত্ত্ববোধিনী-তে [পৃ ৫৩-৫৮] মুদ্রিত হয় [দ্র চারিত্রপূজা ৪।৫২৪-৩০]। পুত্র হয়ে জীবিত পিতার জন্মোৎসবে ভাষণ দেওয়ার মধ্যে যে অস্বস্তি আছে ভারতী-তে প্রকাশ-কালে ভারতী-সম্পাদিকা সরলা দেবী একটি পাদটীকায় তা কাটিয়ে ওঠার চেষ্টা করেছেন : 'এই প্রবন্ধ পূজনীয় শ্রীমৎ দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের জন্মোৎসব উপলক্ষে আহূত আত্মীয় ও সুহৃৎ মণ্ডলীর নিকট পঠিত হয়। সুপ্রতিষ্ঠিত প্রবন্ধলেখক ও তাঁহার পিতৃদেব উভয়েই সাধারণ্যে বিশেষরূপে পরিচিত ও এই প্রবন্ধে ভগবানের সহিত কর্ম্মশীল মানুষের যে নিত্যসম্বন্ধ সূচিত হইয়াছে, তাহাতে বিষয়টি ব্যক্তিগত পারিবারিক ভক্তির গণ্ডী অতিক্রম করিয়া কতক পরিমাণে সর্ব্বজনীন কথার ভিত্তিতে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। এজন্য সাধারণের উদ্দেশ্যে লিখিত না হইলেও এই হিতকর ও সুখপাঠ্য প্রবন্ধটি আমরা সকলের গোচর করা কর্ত্তব্য বিবেচনা করিতেছি।'[২৪] রবীন্দ্রনাথও তাঁর প্রবন্ধের শেষ অনুচ্ছেদে প্রসঙ্গটি উত্থাপন করেছেন। সত্যরঞ্জন বসু লিখেছেন, ১৩১০ বঙ্গাব্দের পৌষোৎসবে প্রাতের উপাসনায় রবীন্দ্রনাথ '৭ই পৌষ উৎসব কেন পালিত হচ্ছে—এর সার্থকতা আশ্রম-জীবনের সঙ্গে কিভাবে জড়িত' এই বিষয়ে কিছু বলেছিলেন।[২৫] নিশ্চয়ই পিতার দীক্ষাদিনের উল্লেখের সূত্রে তাঁর ব্যক্তিজীবনের কথাও ভাষণটিতে উক্ত হয়েছিল, কিন্তু তাঁর সম্বন্ধে এইটিই রবীন্দ্রনাথের প্রথম লিখিত প্রবন্ধ। মহর্ষির আত্মচরিত বহুপূর্বে [১২৯২ : 1885] লিখিত হলেও গ্রন্থাকারে সম্প্রতি [মাঘ ১৩১০] প্রকাশিত হয়। রবীন্দ্রনাথ তাঁর প্রবন্ধে পরোক্ষে সেই জীবনকথার ব্যাপক ব্যবহার করেছেন। তাঁর পরে ত্রৈলোক্যনাথ সান্যাল যে প্রবন্ধ পাঠ করেন [দ্র তত্ত্ব° আষাঢ়। ৩৫-৪৩], তাতেও 'আত্মচরিত' থেকে অনেক উদ্ধৃতি দিয়েছেন।

এই সময়ে ক্যাশবহিতে রবীন্দ্রনাথের গতিবিধির বিবরণ কিঞ্চিৎ অসম্পূর্ণ। ৪ ও ৫ জ্যৈষ্ঠ তাঁকে কর্নওয়ালিশ স্ট্রীটে যেতে দেখা যায়, এর পরের বিবরণ ১২ জ্যৈষ্ঠের [বুধ 25 May] যেদিন তিনি জগদীশচন্দ্র

ও মোহিতচন্দ্রের বাড়ি যাতায়াত করেছেন।

১২ জ্যৈষ্ঠ তাঁর ক্যাশবহিতে একটি উল্লেখযোগ্য হিসাব পাওয়া যায় :'বং, এস্, বি, দাস দং নিউ ইণ্ডিয়ায় সেয়ার ক্রয়ের ১ রসীদ ১৫্'। বিপিনচন্দ্র পালের সম্পাদনায় ইংরেজি সাপ্তাহিক পত্রিকা *New India* প্রথম প্রকাশিত হয় 12 Aug 1901 [সোম ২৫ শ্রাবণ ১৩০৮]। গোড়া থেকেই রবীন্দ্রনাথের গল্প ও প্রবন্ধের ইংরেজি অনুবাদ প্রকাশ করে পত্রিকাটি অবাঙালি পাঠকদের রবীন্দ্র-রচনার সঙ্গে পরিচিত হবার সুযোগ করে দেয়। রবীন্দ্রনাথও যে এই পত্রিকা মন দিয়ে পড়তেন, বঙ্গদর্শন-এ মুদ্রিত তাঁর 'রাজকুটুম্ব' ও 'ঘুষাঘুষি' প্রবন্ধে তার প্রমাণ রয়েছে। নিউ ইণ্ডিয়া-র ১০০ টাকার শেয়ার ক্রয় করে পত্রিকাটিকে সাহায্য করা থেকে বোঝা যায় তিনি পত্রিকাটি সম্বন্ধে সশ্রদ্ধ ছিলেন। টাকা অবশ্য কিস্তিতে দেওয়া হয়।

১৪ জ্যৈষ্ঠ [শুক্র 27 May] রবীন্দ্রনাথ 'পটলডাঙ্গা' যান। এইদিন অপরাহ্ন সাড়ে পাঁচটার সময় পটলডাঙ্গা য়ুনিভার্সিটি ইনস্টিট্যুট হলে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের প্রথম বিশেষ অধিবেশনে হীরেন্দ্রনাথ দত্তের সভাপতিত্বে তিনি 'ভাষার ইঙ্গিত' [দ্র শব্দতত্ত্ব ১২।৩৯৭-৪১০] প্রবন্ধটি পাঠ করেন। তাঁর আরও বহু ভাষাতত্ত্বমূলক প্রবন্ধের মতো এই প্রবন্ধটিতেও বাংলা ভাষার নিজস্ব ব্যাকরণ রচনার প্রয়োজনীয়তার প্রতি তিনি পণ্ডিতদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চেয়েছেন। ভাবপ্রকাশের জন্য ভাষাকে শব্দার্থের সঙ্গে ইঙ্গিতের আশ্রয় নিতে হয় এবং বাংলায় ইঙ্গিত-বাক্যের ব্যবহার অন্য সব ভাষার চেয়ে বেশি, অজস্র উদাহরণ সহযোগে এই তথ্য প্রবন্ধটিতে সপ্রমাণিত হয়েছে। এর মধ্যে ব্যাকরণের সূত্র অনুসন্ধানের চেষ্টাও বর্তমান, কিন্তু তাঁর মূল্য লক্ষ্যটি ব্যক্ত হয়েছে প্রবন্ধের শেষে : 'আমার এই চেষ্টায় কাহারো মনে যদি এরূপ ধারণা হয় যে, প্রাকৃত বাংলা ভাষার নিজের একটি স্বতন্ত্র আকার-প্রকার আছে এবং এই আকৃতি-প্রকৃতির তত্ত্ব নির্ণয় করিয়া শ্রদ্ধার সহিত অধ্যবসায়ের সহিত বাংলা ভাষার ব্যাকরণরচনায় যদি যোগ্য লোকের উৎসাহ বোধ হয়, তাহা হইলে আমার এই বিস্মরণযোগ্য ক্ষণস্থায়ী চেষ্টাসকল সার্থক হইবে।'

এর অব্যবহিত পূর্বেই তিনি লিখেছেন : 'বৈয়াকরণের যে-সকল গুণ ও বিদ্যা থাকা উচিত তাহা আমার নাই, শিশুকাল হইতে স্বভাবতই আমি ব্যাকরণভীরু; কিন্তু বাংলা ভাষাকে তাহার সকলপ্রকার মূর্তিকেই আমি হৃদয়ের সহিত শ্রদ্ধা করি, এইজন্য তাহার সহিত তন্ন তন্ন করিয়া পরিচয়সাধনে আমি ক্লান্তি বোধ করি না।' এই অক্লান্ত পরিশ্রমের পরিচয় আছে শিশু-র পাণ্ডুলিপির [Ms. 115] শেষাংশে সাতটি পৃষ্ঠায় [pp. 77-84] অজস্র বাংলা জোড়াশব্দ সংকলনে—তরিতরকারী, খরচপত্র, ঠাট্টাতামাসা, সোনারুপো, নাকচোখ প্রভৃতি [p. 78], কচাকচ, জিলজিলে থসথসে, দগদগে প্রভৃতি [p.79], টুকিটাকি, কেটেকুটে, ঝড়তুফান, ঝড়ঝাপট, গিন্নিবান্নি, উঁকিঝুঁকি প্রভৃতি [p. 80], মোটা সোটা, ধরে পাকড়ে, রকম সকম প্রভৃতি [p. 81], বেঁধে বুঁধে, চেটে চুটে, চেঁচে পুঁচে, চটেমটে, উড়িয়ে পুড়িয়ে প্রভৃতি [p. 82], আঁটাআঁটি, আড়াআড়ি, আধাআধি, কাছাকাছি প্রভৃতি [p. 83], কাটাকুটি, ছাঁটাছুঁটি, ঠাট্টাঠুট্টি, ঢাকাঢুকি প্রভৃতি [p. 84] অজস্র শব্দ সংকলন করে 'ভাষার ইঙ্গিত' প্রবন্ধটি লেখার জন্য তিনি প্রস্তুত হয়েছেন। শিশু-র পাণ্ডুলিপিতে আছে বলে এগুলি শ্রাবণ-ভাদ্র ১৩১০-এই সংকলিত এরূপ সিদ্ধান্ত করা সর্বাংশে যুক্তিযুক্ত নয়, অনেকদিন ধরেই তিনি এইজাতীয় উপকরণ সংগ্রহে ব্যস্ত ছিলেন একথা সহজেই বলা যেতে পারে।

প্রবন্ধটি পাঠ করার পর সভাস্থলেই সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ, গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ও হীরেন্দ্রনাথ দত্ত আলোচনায় যোগ দেন [দ্র শব্দতত্ত্ব-গ্র. প. ১২।৬৩৬-৩৭]। সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণের বিরোধী বক্তব্য সম্বন্ধে

রবীন্দ্রনাথ প্রত্যুত্তরে বলেন : 'বাংলাভাষার আকৃতি কিরূপ হইলে ভালো হয়, সে সম্বন্ধে আমার মত যে কী, তাহা আমি এ-প্রবন্ধে বলি নাই, বলিতে আসিও নাই। সংস্কৃতভাষার সাহায্য ভিন্ন বাংলাভাষা যে সুসংগতভাবে প্রকাশ করা যায়, তাহা বিশ্বাস করি না। আমার এ-প্রবন্ধ ব্যাকরণমূলক। চলিত কথাগুলির মধ্যে ব্যাকরণের যে-একটি সূক্ষ্ম সূত্র বর্তমান আছে, আমি তাহাই টানিয়া বাহির করিয়া আপনাদের দেখাইতেছি।...কেহ যেন মনে না করেন, আমি এইসকল শব্দ অবাধে যেখানে-সেখানে সাহিত্যে ব্যবহার করিতে চাই।...প্রাদেশিকতা কথিত ভাষায় আছে সত্য, কিন্তু এই প্রাদেশিকতাগুলি কি আলোচ্য নহে। আমারও চেষ্টা আছে এবং পরিষৎ-ও চেষ্টা করিতেছেন। সমস্ত প্রাদেশিক শব্দ সংগ্রহ করিতে পারিলে, ভাষার অভিধানাদি কি পূর্ণাবয়ব হইবে না।...আমার কার্য স্বতন্ত্র নহে, আমি পরিষদের চেষ্টাকেই অগ্রসর করিয়া দিতেছি।...'

ভারতী-র আষাঢ়-সংখ্যায় 'বাঙ্গলা ভাষার ব্যাকরণ' প্রবন্ধে [পৃ ২৯৪-৯৮] দীনেশচন্দ্র সেন এই প্রবন্ধ-পাঠসভার বিস্তৃত-বিবরণ দিয়েছেন। তাঁর সমর্থন সুস্পষ্টভাবে রবীন্দ্রনাথের প্রতি। সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ ভারতী-রই শ্রাবণ [পৃ ৩৮০-৮৮] ও ভাদ্র [পৃ ৪৩৯-৫১]-সংখ্যায় 'বাঙ্গালা ভাষার ব্যাকরণ' প্রবন্ধে নিজের বক্তব্য স্পষ্ট করার প্রয়াস পেয়েছেন।

গ্রীষ্মের ছুটির পর ১৫ জ্যৈষ্ঠ [শনি 28 May] পুনরায় বিদ্যালয় খুলবে বলে স্থির হয়েছিল। এইজন্য সম্ভবত পূর্বোল্লিখিত বক্তৃতার পর রাত্রে রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতন রওনা হন—এইদিন 'খোদ বাবু মহাশয় বোলপুর গমনের জন্য দেওয়া যায় ৫০্' হিসাব ক্যাশবহিতে পাওয়া যায়।

মোহিতচন্দ্র সেন দায়িত্ব নেওয়ার পর বিদ্যালয়ের কলেবর বৃদ্ধি পেল। সত্যরঞ্জন বসু লিখেছেন : 'গরমের ছুটির পর আমরা পুনরায় বোলপুরে বিদ্যালয়ে যোগদান করি। তখন নতুন অনেক ছেলে এলো। এর ভিতর ত্রিপুরা থেকে সোমেনদা [মহিমচন্দ্র দেববর্মার পুত্র সোমেন্দ্রচন্দ্র], উপেনদা [উপেন্দ্রচন্দ্র ভট্টাচার্য], যোগীন [যোগীন্দ্র দেববর্মা], যোগেশ [ভট্টাচার্য], প্রফুল্ল-প্রশান্ত [দেববর্মা] যমজ ভাই, সত্যেন্দ্র [ভট্টাচার্য] প্রভৃতি ক্রমে ক্রমে অনেকেই জুটলেন। মনে হয় ভাগলপুর থেকে বিশুদা [বিশ্বেশ্বর বসু] ও আরো কে কে বড় ছেলেও এসেছিলেন। আমাদের সংখ্যা বেশ বেড়ে গেল।'[২৬]

নূতন শিক্ষকও নিযুক্ত হন। ভূপেন্দ্রনাথ সান্যাল লিখেছেন : 'এই সময় অঙ্ক ও বিজ্ঞানের জন্য একজন ও সংস্কৃত পড়াইবার জন্য আর একজন শিক্ষকের প্রয়োজন হইল। সতীশচন্দ্র রায়ের মৃত্যুতে এবং নরেনবাবু [নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য] চলিয়া যাওয়ায় তাঁহাদের স্থানে আর একটি শিক্ষককে লওয়া হইল। ইঁহার নাম অজিতকুমার চক্রবর্তী।...পূজার ছুটির পর ইঁহাকে রাখা হইল কি এই সময়ে রাখা হইল, আমার এখন আর ঠিক স্মরণ হইতেছে না।'[২৭] সতীশচন্দ্র রায়ের প্রিয়বন্ধু অজিতকুমার চক্রবর্তী [1886-1918] 1904-এ পাশ কোর্সে বি. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে এই বৎসর গ্রীষ্মের ছুটির পরেই বিদ্যালয়ে যোগ দেন। তিনি পূর্বেই বিদ্যালয়ের কাজে আত্মনিয়োগ করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু মায়ের নির্দেশে বি. এ. পাশ করা পর্যন্ত তাঁকে অপেক্ষা করতে হয়। তার পরেই তিনি বন্ধু সতীশচন্দ্রের শূন্যস্থানটি সার্থকভাবে পূর্ণ করেন।

শান্তিনিকেতনে আসার পর রবীন্দ্রনাথের মনে গানের উৎস খুলে গেল। কয়েকদিনের মধ্যেই তিনি ছ'টি গান রচনা করেন; সবগুলিই লেখা হয় মজুমদার-পুঁথিতে। গানগুলি হল :

[১] ২০ জ্যৈষ্ঠ [বৃহ 2 Jun] 'আমার মন তুমি নাথ লবে হ'রে' দ্র গীত ১।৭৯; স্বর ২২; কাব্যগ্রন্থ ৮।৩২৩, ছায়ানট-ঝাঁপতাল।

[২] ২২ জ্যৈষ্ঠ [শনি 4 Jun] 'দাঁড়াও আমার আঁখির আগে' দ্র গীত ১।৪৭; স্বর ২২; কাব্যগ্রন্থ ৮।৩২৮, বেহাগ-তেওরা।

[৩] ২৪ জ্যৈষ্ঠ [সোম 5 Jun] 'আজি যত তারা তব আকাশে' দ্র গীত ১।৩৩; স্বর ২২।; কাব্যগ্রন্থ ৮।৩২৯; লুম-কাওয়ালি। গানটির সূচনা হয়েছিল এই ভাবে :

তোমার আকাশের সকল তারা গুলি
হৃদয় ভরি আজি প্রকাশে
তোমার কাননের সকল ফুল আজি
আমার হৃদয় মাঝে বিকাশে

—ছত্রগুলি প্রায় অপাঠ্য করে কেটে দেওয়া হয়েছে। কাটা অংশগুলি জুড়ে বিচিত্র নকশা তৈরির যে প্রবণতা পরবর্তীকালে বহু রবীন্দ্র-পাণ্ডুলিপিতে দেখা যায়, তার প্রথমটির সাক্ষাৎ মেলে এই গানের পাণ্ডুলিপিতে।

[৪] ২৫ জ্যৈষ্ঠ [মঙ্গল 6 Jun] 'গরব মম হরেছ, প্রভু' দ্র গীত ১।১৪৭; স্বর ২২; কাব্যগ্রন্থ ৮।৩২৫, দেশমল্লার-তেওরা।

[৫] ২৬ জ্যৈষ্ঠ [বুধ 7 Jun] 'সবার মাঝারে তোমারে স্বীকার করিব হে' দ্র গীত ১।১৫২-৫৩; স্বর ২৭; কাব্যগ্রন্থ ৮।৩২৬ ভূপনারায়ণ-একতালা।

[৬] ২৬ জ্যৈষ্ঠ [বুধ 7 Jun] 'যে কেহ মোরে দিয়েছ সুখ' দ্র গীত ১।১৯৬; স্বর ২২; কাব্যগ্রন্থ ৮।৩২৪, কাফি-তেওরা।

উল্লেখ্য, পঞ্চম গানটি ছাড়া অপর গানগুলি ১৩১১ বঙ্গাব্দের মাঘোৎসবে গীত হয়েছিল।

জ্যৈষ্ঠ-সংখ্যা বঙ্গদর্শন [৪।২] প্রকাশিত হয় 15 May [রবি ২ জ্যৈষ্ঠ]। এই সংখ্যায় রবীন্দ্র-রচনা দুটি :
৭১-৮১ 'নৌকাডুবি' ৩৫-৩৭ দ্র নৌকাডুবি ৫।২৮৬-৯৩ [৩৩-৩৫]
৮১-৮৭ 'সাময়িক প্রসঙ্গ। বঙ্গবিভাগ' দ্র সমূহ-পরিশিষ্ট ১০।৬১৩-১৯

লেফটেনাণ্ট গবর্নরের অধীন বাংলাকে বিভক্ত করার উদ্দেশ্যে রিজলে-পেপার প্রকাশিত হয় 3 Dec 1903 [১৭ অগ্র° ১৩১০] তারিখে। সঙ্গে সঙ্গেই বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে ও পত্রপত্রিকায় এই প্রস্তাবের বিরুদ্ধে যে প্রতিবাদ উচ্চারিত হয়, তার কিছু বিবরণ আমরা পূর্ববর্তী অধ্যায়ে দিয়েছি। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের মতো অরাজনৈতিক সংস্থাও ২৩ মাঘ ১৩১০ [শনি 6 Feb] একটি সভায় বঙ্গবিভাগ বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের কী ক্ষতি করবে সে-বিষয়ে আলোচনা করে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ এ-বিষয়ে আশ্চর্য নীরবতা অবলম্বন করেন। ব্যক্তিগত পত্রে বা আলাপে তিনি বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করে থাকতে পারেন, কিন্তু তার কোনো লিখিত প্রমাণ আমাদের হস্তগত হয়নি। কার্জনের য়ুনিভার্সিটি বিল দেশীয় শিক্ষাব্যবস্থার উপর সরকারী আধিপত্য বিস্তার ও শিক্ষাসংকোচনের নীতি গ্রহণ করেছিল বলে তার বিরুদ্ধেও যথেষ্ট প্রতিবাদ ধ্বনিত হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথ সেক্ষেত্রেও নীরব ছিলেন। অথচ সংবাদপত্রের মনোযোগী পাঠক হিসেবে ঘটনাপ্রবাহের গতিপ্রকৃতি তাঁর অজানা ছিল না। কোনো পত্রিকা হাতে থাকলে আগে এর চেয়ে কম গুরুত্বপূর্ণ বিষয়েও। তাঁর প্রতিক্রিয়া

প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ব্যক্ত হয়েছে। কিন্তু বর্তমানে দুটি বিষয়েই তাঁর দীর্ঘ নীরবতা আমাদের আশ্চর্যান্বিত করে। এই নীরবতা ভঙ্গ হল বৈশাখ ১৩১১-তে মজঃফরপুর-প্রবাসে—'বঙ্গবিভাগ' ও 'য়ুনিভার্সিটি বিল' দুটি বিষয়েই তিনি নিজস্ব মত ব্যক্ত করলেন 'সাময়িক প্রসঙ্গ'-এর আকারে। জাতীয় জীবনে সুদূরপ্রসারী প্রভাববিস্তারকারী দুটি প্রস্তাবকে 'সাময়িক'-রূপে চিহ্নিত করা ও 'বঙ্গবিভাগ' প্রবন্ধটিকে ১৩১৫-এর প্রকাশিত 'সমূহ' বা অন্য কোনো গদ্যগ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত না করাও কম আশ্চর্যের নয়।

কিন্তু আত্মশক্তি ও প্রাচীন ভারতের সমন্বয়ধর্মী আদর্শের প্রবক্তা রবীন্দ্রনাথের দিক দিয়ে যুক্তির অভাব ছিল না। তিনি নিজেও লিখেছেন : 'আন্দোলন যখন উত্তাল হইয়া উঠিয়াছিল তখন আমরা কোনো কথা বলি নাই; এখন বলিবার সময় আসিয়াছে।' বস্তুত-প্রস্তাব প্রকাশের পর গবর্মেন্টও দীর্ঘদিন নীরব থাকে, ফলে প্রস্তাবটি হয়তো পরিত্যক্ত হয়েছে ভেবে দেশীয়দের তুমুল আন্দোলন এই সময়ে কিঞ্চিৎ মন্দীভূত হয়ে আসে। রবীন্দ্রনাথও তাই অগ্নিতে ঘৃতাহুতি না দিয়ে বর্তমান সময়টিকেই ঘটনার বিশ্লেষণ ও পথনির্দেশের উপযুক্ত অবসর বলে মনে করেছেন।

এর আগে কংগ্রেস প্রভৃতি রাষ্ট্রনৈতিক সভাস্থলে রাজভক্তির গৌরচন্দ্রিকা করে রাজনীতির সমালোচনার কলাকৌশল অনুসৃত হত—যা রবীন্দ্রনাথের মতে 'দুর্বল ভীরুর স্বভাবসিদ্ধ ছলাকলা' ছাড়া আর কিছু নয়। এর মূলে ছিল প্রাচ্যজাতিসুলভ বিশ্বাসপ্রবণতা—ইংরেজ জাতি ও শাসনের মঙ্গলময়তার প্রতি একান্ত নির্ভরতা। কিন্তু বঙ্গবিভাগ ও শিক্ষাবিধি-সংস্কার সেই বিশ্বাস ও নির্ভরতার মূলে আঘাত করায় এবারকার আন্দোলনে একটি 'অপূর্বত্ব' লক্ষ্য করা গেছে—'এবারকার বক্তৃতাদিতে রাজভক্তির ভড়ং নাই, সামলাইয়া কথা কহিবার প্রয়াস নাই, মনের কথা স্পষ্ট বলিবার একটা চেষ্টা দেখা গিয়াছে।' রবীন্দ্রনাথ এই চেষ্টাকে স্বাগত জানিয়েছেন, কারণ তিনি মনে করেছেন পরের কাছ থেকে সুস্পষ্ট আঘাত পেয়ে পরতন্ত্রতা শিথিল হলে নিজেদের মধ্যে ঐক্য সুদৃঢ় হয়ে উঠবে : 'আমাদের নিজের দিকে যদি সম্পূর্ণ ফিরিয়া দাঁড়াইতে পারি, তবে নৈরাশ্যের লেশমাত্র কারণ দেখি না। বাহিরের কিছুতে আমাদিগকে বিচ্ছিন্ন করিবে এ কথা আমরা কোনোমতেই স্বীকার করিব না। বিচ্ছেদের চেষ্টাতেই আমাদের ঐক্যানুভূতি দ্বিগুণ করিয়া তুলিবে। পূর্বে জড়ভাবে আমরা একত্র ছিলাম, এখন সচেতনভাবে আমরা এক হইব। বাহিরের শক্তি যদি প্রতিকূল হয়, তবেই প্রেমের শক্তি জাগ্রত হইয়া উঠিয়া প্রতিকারচেষ্টায় প্রবৃত্ত হইবে। সেই চেষ্টাই আমাদের যথার্থ লাভ।' ব্রহ্মচর্যাশ্রম প্রতিষ্ঠা করে মনুষ্যত্ব-উদ্বোধনের পরীক্ষাক্ষেত্র রচনা, স্বদেশী সমাজ গঠনের পরিকল্পনা, রাখীবন্ধনের মাধ্যমে অন্তর্নিহিত ঐক্যকে বাহিরে প্রতিষ্ঠাদান, জাতীয় শিক্ষাপরিষদ স্থাপন প্রভৃতি রবীন্দ্রনাথের পূর্ববর্তী ও পরবর্তী কার্যকলাপ এই ভাবসূত্রকেই অনুসরণ করেছে।

'য়ুনিভার্সিটি বিল' প্রবন্ধ 'বঙ্গবিভাগ'-এর অব্যবহিত পরবর্তী রচনা—সুতরাং একই সঙ্গে আলোচনার যোগ্য। অনেক আলোচনা ও আন্দোলনের পরে রচিত বলে এখানেও রবীন্দ্রনাথ খুঁটিনাটি বিষয় পরিহার করে দেশবাসীর ইতিকর্তব্য নির্ধারণে প্রয়াসী হয়েছেন। বিলিতি য়ুনিভার্সিটির ব্যয়বহুল আয়োজন দেশীয় জীবনযাত্রার সঙ্গে সংগতিপূর্ণ নয়, 'আমাদের সমাজ শিক্ষাকে সুলভ করিয়া রাখিয়াছিল—দেশের উচ্চনীচ সকল স্তরেই শিক্ষা নানা সহজ প্রণালীতে প্রবাহিত হইতেছিল।' কিন্তু বিলিতি আদর্শে শিক্ষা যদি দুর্মূল্য হয় তবে ধনী-দরিদ্রের ব্যবধান অত্যন্ত বৃহৎ হয়ে উঠবে। অক্স্ফোর্ড-কেম্ব্রিজে ছাত্র ও অধ্যাপকের মধ্যে ব্যবধান নেই, তাই শিক্ষাদানের জন্য উন্মুখতা ও বিদ্যালাভের জন্য প্রস্তুতি মানসিক সাযুজ্য প্রাপ্ত হয়। কিন্তু এদেশে

পেড্‌লারের মতো বিদেশী শিক্ষা-অধিকর্তার সঙ্গে সেই মানসিক সম্পর্ক স্থাপন করা দুরূহ ও অনিষ্টকর : 'হৃদয়ে হৃদয়ে যেখানে স্পর্শ নাই, যেখানে সুস্পষ্ট বিরোধ ও বিদ্বেষ আছে, সেখানে দৈববিড়ম্বনায় যদি দানপ্রতিদানের সম্বন্ধ স্থাপিত হয় তবে সে-সম্বন্ধ হইতে শুধু নিষ্ফলতা নহে, কুফলতা প্রত্যাশা করা যায়।' তাছাড়া সেই শিক্ষাও কিছু দুরূহ ও দুর্লভ নয়, জাপানের মতো সুযোগ ও আনুকূল্য পেলে তা সহজেই ভারতীয়েরা আয়ত্ত করতে পারত। জগদীশচন্দ্র ও প্রফুল্লচন্দ্রের সাধনা ও সাফল্য তার মহৎ দৃষ্টান্ত। সুতরাং নিজেদের বিদ্যাদানের ব্যবস্থা নিজেদেরই গ্রহণ করার প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করে রবীন্দ্রনাথ লিখলেন : 'এ স্থলে আমাদের একমাত্র কর্তব্য, নিজেরা সচেষ্ট হওয়া; আমাদের দেশে ডাক্তার জগদীশ বসু প্রভৃতির মতো যে-সকল প্রতিভাসম্পন্ন মনস্বী প্রতিকূলতার মধ্যে থাকিয়াও মাথা তুলিয়াছেন, তাঁহাদিগকে মুক্তি দিয়া তাঁহাদের হস্তে দেশের ছেলেদের মানুষ করিয়া তুলিবার স্বাধীন অবকাশ দেওয়া; অবজ্ঞা-অশ্রদ্ধা-অনাদরের হাত হইতে বিদ্যাকে উদ্ধার করিয়া দেবী সরস্বতীর প্রাণপ্রতিষ্ঠা করা; জ্ঞানশিক্ষাকে স্বদেশের জিনিস করিয়া দাঁড় করানো; আমাদের শক্তির সহিত, সাধনার সহিত, প্রকৃতির সহিত তাহাকে অন্তরঙ্গরূপে সংযুক্ত করিয়া তাহাকে স্বভাবের নিয়মে পালন করিয়া তোলা।' শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্যাশ্রমে তিনি নিজস্ব সামর্থ্য ব্যয় করে এই স্বদেশী শিক্ষার ভূমিকা রচনা করেছিলেন, কিছুদিন পরে জাতীয় শিক্ষাপরিষদের কাজে আত্মনিয়োগ করেন এই আদর্শকে মনে রেখে। শুধু তাই নয়, তিনি জোড়াসাঁকোয় নিজের বাড়িটি একটি শিক্ষক-শিক্ষণ বিদ্যালয়ের জন্য নিবেদিতাকে ব্যবহার করতে দিতে চেয়েছিলেন। নিবেদিতা 'Tuesday morning' [5 Jul : ২১ আষাঢ়] মিস ম্যাকলাউডকে লিখেছেন : 'Mr. R. N. Tagore has offered me his beautiful house for a Normal School. But I must have someone else as the centre of that undertaking.'[২৮] জগদীশচন্দ্র 29 Jun [১৫ আষাঢ়] রবীন্দ্রনাথকে লিখেছিলেন : 'Sister নিবেদিতা ও Christine তোমার বাড়ীতে স্কুল খুলিবার জন্য বিশেষরূপে লাগিয়াছেন। তবে ছাত্রী জোগাড় কি করিয়া করিবেন জানি না—আর টাকারও দরকার মনে হয়।'[২৯] হয়তো এই-সব কারণেই বিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠিত হয়নি।

লক্ষণীয়, রবীন্দ্রনাথ নিজেই প্রবন্ধটিকে গ্রন্থভুক্ত করেছেন।

সমালোচনী, জ্যৈষ্ঠ ১৩১১ [৩।২] :

৪২-৫১ 'মহর্ষিদেবের জন্মোৎসব' দ্র চারিত্রপূজা ৪।৫২৪-৩০

সঙ্গীত-প্রকাশিকা, জ্যৈষ্ঠ ১৩১১ [৩।৯] :

১৬০-৬১ ললিত-সুরফাক্তা। পান্থ এখন কেন অলসিত অঙ্গ দ্র স্বর ২৭

কাঙালীচরণ সেন গানটির স্বরলিপি করেন।

মোহিতচন্দ্র সেন বিদ্যালয়ের সর্বাধ্যক্ষ পদ গ্রহণ করায় প্রাত্যহিক কাজকর্ম নিয়ে রবীন্দ্রনাথের ব্যস্ততা কিছু কমেছিল, তাঁর স্বাস্থ্যও বিশেষ অনুকূল ছিল না। তবে পরামর্শ-উপদেশাদির জন্য মোহিতচন্দ্র সর্বদাই তাঁর মুখাপেক্ষী হয়ে থাকতেন। এইজন্য তাঁকে সর্ব-বিষয়ে অধ্যক্ষতা দিয়ে রবীন্দ্রনাথ কলকাতায় চলে আসেন জ্যৈষ্ঠ মাসের শেষে। ক্যাশবহির হিসাবে আছে : '৩১ জ্যৈষ্ঠ [সোম 13 Jun] হাওড়ায় ষ্টেসন হইতে আসার

ব্যয় ১।০'—কিন্তু ৩০ জ্যৈষ্ঠ তারিখ দিয়ে তিনি কলকাতা থেকে মোহিতচন্দ্রকে দুখানা পত্র লেখেন, এতে মনে হয় রবীন্দ্রনাথই তারিখ লিখতে ভুল করেছেন ৩১ জ্যৈষ্ঠ তিনি 'সকালে হেদুয়াতলায়' ও 'বৈকালে বালিগঞ্জ' যাতায়াত করেন।

'আমি নিকটে থাক্‌লে আপনাদের কাজের বিক্ষিপ্ততা হয়' বলে শান্তিনিকেতন থেকে চলে এসেও বিদ্যালয়ের ভাবনাই যে তাঁর মনকে অধিকার করে থাকে, উল্লিখিত দুটি দীর্ঘ পত্রে তার প্রমাণ রয়েছে। এর মধ্যে একটি চিঠির বক্তব্য তিনি হয়তো বহুবার মুখে মোহিতচন্দ্রকে বলেছেন, কিন্তু নিত্য করণীয় বলে লিখিতভাবে জানানোই শ্রেয় মনে করেছেন:

এখন প্রত্যেক ছেলের প্রতি যথাযোগ্য বিধান চিন্তা করে খাতায় টুঁকে নিয়ে সেই রকম যদি নিয়মিতরূপে অমোঘরূপে কর্ত্তে থাকেন তাহলে চিন্তার কারণ কিছুই থাক্‌বে না। একএকদিন একএকটি ছেলেকে ছুটির সময় ১৫ মিনিট করে ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমের ভাবটা ভাল করে বুঝিয়ে দেবেন।...যে কয়টি দলপতি হয়েছে তাদের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে তারা নিয়ত সচেষ্ট থাকে দৃষ্টি রাখ্‌বেন।...

ছেলেদের নিয়মিত সাহিত্যচর্চ্চা প্রয়োজন—তার ব্যবস্থা করবেন। প্রত্যেক ছেলের সঙ্গে প্রত্যেক বিষয়েই অর্থাৎ লেখাপড়া, রসচর্চ্চা, অশনবসন, চরিত্রচর্চ্চা, ভক্তিসাধন প্রভৃতি সব তাতেই আপনি ঘনিষ্ঠ যোগ রাখবেন—আপনি তাদের বিধাতার প্রতিনিধি হবেন। প্রত্যক্ষ আপনার সঙ্গে তাদের সর্ব্বাংশের সম্বন্ধ থাক্‌বে এই আমার ইচ্ছা—বলা সহজ করা কঠিন, তবু এইটেই আমাদের বিদ্যালয়ের একমাত্র আইডিয়াল। হৃদয়ের সাহায্যে ছেলে মানুষ করতে হয় কলের সাহায্যে নয় এইটে আদত কথা—কিয়ৎ পরিমাণে কলের দরকার হয়ে পড়েই কিন্তু সে কল আপনি নন্‌—অন্য শিক্ষকেরা—আপনি যন্ত্রী, আপনি মানুষ।[৩০]

একই দিনে লেখা অন্য চিঠিতেও উপদেশ-নির্দেশ আছে, কিন্তু সেটি ঘটনার সূত্রে লেখা নিতান্ত চিঠি-ই, অন্যটির মতো আদর্শবিধির বর্ণনা নয়। ত্রিপুরার মহারাজার পিতৃব্য নবদ্বীপচন্দ্র তাঁর দুই ছেলেকে বিদ্যালয়ে পাঠাবেন ও আরো দু-চারটি ছেলের যাওয়ার সম্ভাবনা আছে জেনে তিনি অবিলম্বে 'ছেলেদের লম্বা শোবার ঘরের পূর্ব্ব দিকে যে চৌকো ভূখণ্ড আছে' সেখানে পঞ্চাশজনের থাকবার মত ঘর আরম্ভ করে দিতে বলেছেন। আশুতোষ রায়চৌধুরী তখন বিদ্যালয়ের ঘরবাড়ি তৈরির কাজের জন্য ভারপ্রাপ্ত, তাঁকে detailed estimate পাঠাবার নির্দেশটি লক্ষণীয়, বাস্তবজ্ঞানসম্পন্ন একজন কার্যকারিকের সমস্ত গুণই তাতে প্রকাশিত : 'পাকা ইঁটে কাঁচা গাঁথনি—চাল বিলাতী টালির (২ নম্বর), মেজে একফুটের বেশি উঁচু করবার প্রয়োজন নেই।—জানলা দরজা বড় শয়নালয়ের মত (অর্থাৎ যথেষ্ট হাওয়া খেলা চাই)—প্রত্যেক সারে ১৭ জন করে তিন সার ছেলে শুতে পারে এমন চৌকো ঘর করলে ওখানে ধরবে—ঘর বেশি চওড়া হবার আশঙ্কা যদি হয় তবে মাঝে লোহার পোষ্ট্‌ এক সার দিলে জায়গা মরবে না'।[৩১]

এই চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ আরও লিখেছেন : 'বাবামশায় শান্তিনিকেতনে যাবার ইচ্ছা প্রকাশ করেচেন। যদি তাঁর যাওয়া হয় ত বড় ভাল হবে। তিনি এইমাত্র আমাকে ডেকে পাঠালেন বোধহয় এইজন্যই।' মহর্ষির স্বাস্থ্যের যেরূপ অবস্থা ছিল তাতে এরূপ ইচ্ছা অলস আকাঙ্ক্ষামাত্র—তাই তা কার্যকরী হয়নি। কিন্তু জীবনের শেষ-ক'টি দিন শান্তিনিকেতনে অতিবাহিত করবেন এইরূপ সংকল্প নিয়ে তিনি যদি সেখানে যেতেন ব্রহ্মচর্যাশ্রমের অন্তত আর্থিক স্বার্থের দিক দিয়ে তা ফলবান হতে পারত। 'যদি তাঁর যাওয়া হয় ত বড় ভাল হবে'—রবীন্দ্রনাথ হয়তো এইদিক দিয়েই বিষয়টিকে দেখেছিলেন।

৩২ জ্যৈষ্ঠ [মঙ্গল 14 Jun] রবীন্দ্রনাথ 'থ্যাকার কোং দোকানে যাতায়াত' করেছিলেন। মোহিতচন্দ্রকে তিনি যে লিখেছিলেন : 'লাইব্রেরির ব্যবস্থা শীঘ্র করা যাচ্চে।...বইও কিছু কিছু কেনা যাবে'—এই যাতায়াত সেই উদ্দেশ্যেই। কিছুদিন পরে ২০ আষাঢ় [সোম 4 Jul] তিনি বইগুলি সম্পর্কে মজঃফরপুর থেকে মোহিতচন্দ্রকে

লিখেছেন : 'থ্যাকারের দোকান থেকে বই পাঠিয়েছে আনিয়ে নেবেন...কেবল Maeterlinckএর Double Garden নামক বইখানি ফেরৎ দেবেন—থ্যাকারদের লিখে দেবেন এ বই আমি পেয়েছি...। বাকি বইগুলির মধ্যে আর একটি Maeterlinck ও Sacred Books of the East তিনখণ্ড আছে—এগুলি আপাতত লাইব্রেরিতে রেখে ব্যবহার করতে থাকুন।' বোঝা যায়, ছাত্রদের জন্য নয়, শিক্ষকদের জন্যই বইগুলি কেনা হয়েছিল। এইভাবে রবীন্দ্রনাথ শিক্ষকদের জ্ঞানের পরিধি বাড়াবার জন্য অর্থব্যয়ে কার্পণ্য করেননি। তাঁর নিজের বইও পড়া হলে বিদ্যালয়ের লাইব্রেরিতে স্থানলাভ করত। আজও শমীন্দ্র শিশু পাঠাগার, বিশ্বভারতী সেন্ট্রাল লাইব্রেরি বা অন্যান্য বিভাগীয় গ্রন্থাগারে রবীন্দ্রনাথের পড়া বহু গ্রন্থের সাক্ষাৎ মেলে।

আষাঢ় মাসে সাময়িকপত্রে মুদ্রিত রবীন্দ্ররচনার সূচীটি কিছুটা বড়ো। আষাঢ়-সংখ্যা বঙ্গদর্শন [৪।৩] ১ আষাঢ়েই [বুধ 15 Jun] প্রকাশিত হয় :

১১৩-২৫ 'নৌকাডুবি' ৩৮-৪০ দ্র নৌকাডুবি ৫।২৯৩-৩০৩ [৩৬-৩৭]

১৩৩-৩৮ 'প্রার্থনা' দ্র ধর্ম ১৩।৩৭২-৭৬

১৪৫-৫০ 'সাময়িক প্রসঙ্গ। য়ুনিভার্সিটি বিল' দ্র আত্মশক্তি ৩।৫৯৪-৯৯

১৬১-৬২ 'স্বীকার' ['সবার মাঝারে তোমারে স্বীকার করিব হে'] দ্র গীত ১।১৫২-৫৩

২৯ বৈশাখ [11 May] রবীন্দ্রনাথ মজঃফরপুর থেকে 'প্রার্থনা' প্রবন্ধটি দীনেশচন্দ্র সেনকে প্রেরণ করেন। এই ধর্মমূলক প্রবন্ধটি রচনার কোনো বিশেষ উপলক্ষ ছিল কিনা বোঝা দুষ্কর। তবে প্রবন্ধটির সমাপ্তি আমাদের সমকালে রচিত রাজনৈতিক প্রবন্ধগুলির কথা মনে করিয়ে দিতে পারে। কিসের জন্য আমাদের প্রার্থনা সেটি জানতে পারলে সমস্ত মানবের নিত্য আকাঙ্ক্ষার দ্বারা তাকে যাচাই করা প্রয়োজন, একথা বলে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন : 'আমাদের যে-কোনো ইচ্ছা এই সত্য-আলোক-অমৃতের ইচ্ছাকে অতিক্রম করে, তাহাই আমাদের খর্ব করে, তাহাই কেবল আমাকে নহে, সমস্ত মানবকে পশ্চাতের দিকে টানিতে থাকে।...যেমন দেশহিতৈষা। এ-প্রবৃত্তি যদিও আমাদিগকে আত্মত্যাগ ও দুষ্কর তপঃসাধনের দিকে লইয়া যায়, তবু ইহা মানবত্বের গুরুতর-অন্তরায়-স্বরূপ হইয়া উঠিতে পারে। ইহার প্রমাণ আমাদের সম্মুখেই, আমাদের নিকটেই রহিয়াছে। য়ুরোপীয় জাতিরা ইহাকেই তাহাদের চরম লক্ষ্য পরম ধর্ম বলিয়া গ্রহণ করিয়াছে। ইহা প্রতিদিনই সত্যকে আলোককে অমৃতকে য়ুরোপের দৃষ্টি হইতে আড়াল করিতেছে। য়ুরোপের স্বদেশাসক্তিই মানবত্বলাভের ইচ্ছাকে সার্থকতালাভের ইচ্ছাকে প্রবলবেগে প্রতিহত করিতেছে এবং য়ুরোপীয় সভ্যতা অধিকাংশ পৃথিবীর পক্ষে প্রকাণ্ড বিভীষিকা হইয়া উঠিতেছে।...ইহাই বিনাশের পথ—পথ নহে,—ইহাই মৃত্যু।' রবীন্দ্ররচনার মনোযোগী পাঠক এইরূপ বক্তব্য তাঁর জীবনের বিভিন্ন পর্বে দেখতে পাবেন। বর্তমানেও বঙ্গবিভাগের প্রস্তাবকে উপলক্ষ করে যে স্বাদেশিকতার জোয়ার আসছিল, রবীন্দ্রনাথের এই উক্তিকে সে-সম্পর্কে একটি সতর্কবাণী হিসেবেও গণ্য করা যায়।

ভারতী, আষাঢ় ১৩১১ [২৮।৩] :

২১৭-২৬ 'মহর্ষির জন্মোৎসব' দ্র চারিত্রপূজা ৪।৫২৪-৩০

২৬১-৭১ 'ভাষার ইঙ্গিত' [প্রথমাংশ] দ্র শব্দতত্ত্ব ১২।৩৯৭-৪০৪

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, আষাঢ় ১৮২৬ শক [৩৩১ সংখ্যা] :

৪৪ 'সঙ্গীত।/ভক্ত করিছে প্রভুর চরণে জীবন সমর্পণ' দ্র গীত ১।১২৭

সঙ্গীত-প্রকাশিকা, আষাঢ় ১৩১১ [৩।১০] :

টোড়ি-ঝাঁপতাল। দুখের মিলন টুটিবার নয় দ্র স্বর ৪৮

স্বরলিপিকারের নাম অনুল্লেখিত।

আষাঢ়ের প্রথম কয়েকদিন রবীন্দ্রনাথ কলকাতাতেই কাটান। ২ আষাঢ় [বৃহ 16 Jun] তিনি কর্নওয়ালিশ স্ট্রীটে যান, হয়তো মজুমদার লাইব্রেরিতে। ৩ আষাঢ় মজঃফরপুরের পথে বোলপুর যাত্রা করেন তিনি। 'রবিবার' [৫ আষাঢ় : 19 Jun] তিনি দীনেশচন্দ্র সেনকে লিখেছেন : 'বিদ্যালয়ের কাজে আকণ্ঠ নিমগ্ন আছি। পলায়ন ব্যতীত উপায় দেখিনা—অতএব কাল সোমবারে কন্যাগৃহে দৌড়িব।...এখানে আসিয়া সতীশের "গুরুদক্ষিণা" গ্রন্থের একটা সমালোচনা লিখিয়া পাঠাইয়াচি—আর কিছু লিখিবার সময় পাই নাই।'[৩২]

সতীশচন্দ্রের বালকপাঠ্য পুস্তক 'গুরুদক্ষিণা'-র এই সমালোচনা নূতন কোনো রচনা নয়, চৈত্র ১৩১০-সংখ্যা বঙ্গদর্শন-এ 'পরলোকগত সতীশচন্দ্র রায়' নামে তিনি যে শোক-প্রবন্ধ লিখেছিলেন তাতেই কিছু সংযোজন-বর্জনের মাধ্যমে এই সমালোচনা-প্রবন্ধটি প্রস্তুত ও শ্রাবণ-সংখ্যা বঙ্গদর্শন-এ [পৃ ১৬৩-৬৮] মুদ্রিত হয়। এইটিই আবার 'গুরুদক্ষিণা' [আষাঢ় ১৩১১] গ্রন্থের ভূমিকা-রূপে ব্যবহৃত হয়েছে।

বেঙ্গল লাইব্রেরির ক্যাটালগ অনুসারে দীনেশচন্দ্রের উপন্যাস 'তিন বন্ধু' প্রকাশিত হয় 15 Jul [৩১ আষাঢ়]। কিন্তু গ্রন্থটি আগেই প্রকাশিত হয়েছিল। ২১ বৈশাখ রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন : 'আপনার গল্পের বই পাইবার জন্য উৎসুক রহিলাম।' ৫ আষাঢ় বইটি পড়ে লিখলেন : "তিন বন্ধু" সম্বন্ধে আপনাকে যিনি যতই উৎসাহিত করুন আপনার এই বর্তমান পত্রলেখক বন্ধুটি সায় দিতে পারিতেছেন না—আর একখানা ভাল বই আপনাকে লিখিতে হইবে—আপনার ছেলেবেলার কথা, গ্রামের কথা, ঘরের কথা লইয়া একখানা খুবই সত্যকার বই লিখিবেন—তাহা হইলেই প্রায়শ্চিত্ত হইবে।' এইরূপ একটি বই দীনেন্দ্রকুমার রায়ের 'পল্লীচিত্র' প্রকাশিত হয়েছিল 25 May [১২ জ্যৈষ্ঠ], 'পরম শ্রদ্ধাভাজন কবিবর শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় শ্রীকরকমলেষু' বইটি উৎসর্গ করেছিলেন দীনেন্দ্রকুমার। দীনেশচন্দ্রকে লেখবার সময়ে হয়তো এই বইটির কথা রবীন্দ্রনাথের মনে হয়েছিল। দীনেশচন্দ্র 'ঘরের কথা ও যুগসাহিত্য' [25 Jul 1922 : ৯ শ্রাবণ ১৩২৯] লিখে তাঁর আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করেছিলেন।

৬ আষাঢ় [সোম 20 Jun] রবীন্দ্রনাথ পুনরায় কন্যাগৃহ মজঃফরপুরে যান। আষাঢ়-সংখ্যা সাহিত্য [১৫। ৩]-তে 'বিবিধ' বিভাগে এই সংবাদটিও বিজ্ঞাপিত হয় : 'শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এক্ষণে স্বাস্থ্যের অনুরোধে মজঃফরপুরে প্রবাস করিতেছেন।'

বিশ্রাম ও স্বাস্থ্যোদ্ধারের জন্যই তিনি মজঃফরপুরে গিয়েছিলেন, কিন্তু রচনার তাগিদ তাঁকে চুপ করে বসে থাকতে দেয়নি। ১০ আষাঢ় [শুক্র 24 Jun] মোহিতচন্দ্র সেনকে লিখেছেন : 'আমি এখানে যথেষ্ট কুঁড়েমি করেও একটু আধটু সময় পাই—সেই সময়টুকুতে নৌকাডুবি লিখ্‌তে আরম্ভ করেছি। সেটুকু কাজ না করতে পারলে বিশ্রামটা নিষ্কণ্টক হতে পায় না।' প্রিয়নাথ সেনকে 'কাজকর্মের ঘূর্ণাবর্তের বিবরণ দিয়ে ১৪ আষাঢ় [মঙ্গল 28 Jun] লিখেছেন : 'এখানে আসিয়া একটু স্থির হইয়া শ্রাবণ সংখ্যার নৌকাডুবি কাল লিখিয়া

ফেলিতে পারিয়াছি। সমস্ত গোলমালের ভিতরে যেখানেই থাকি ঐ গল্পটার জের টানিয়া বেড়াইতে হয়। কত দিনে নিষ্কৃতি পাইব এখনো নিশ্চয় বুঝিতে পারিতেছি না।'[৩৩]

মজঃফরপুরে থাকার সময়ে তিনি আরও দুটি গদ্যরচনা লেখেন—'পাগল' ও 'সাময়িক প্রসঙ্গ। দেশের কথা'। 'পাগল' প্রবন্ধটির সূচনাতেই মজঃফরপুরের আঞ্চলিক রূপটি বর্ণিত : 'পশ্চিমের একটি ছোটো শহর। সম্মুখে বড়ো রাস্তার পরপ্রান্তে খোড়ো চালগুলোর উপরে পাঁচ-ছয়টা তালগাছ বোবার ইঙ্গিতের মতো আকাশে উঠিয়াছে, এবং পোড়ো বাড়ির ধারে প্রাচীন তেঁতুলগাছ তাহার লঘুচিক্কণ ঘন পল্লবভার সবুজ মেঘের মতো স্তূপে স্তূপে স্ফীত করিয়া রহিয়াছে। চালশূন্য ভাঙা ভিটার উপরে ছাগ-ছানা চরিতেছে। পশচাতে মধ্যাহ্ন-আকাশের দিগন্তরেখা পর্যন্ত বনশ্রেণীর শ্যামলতা।' এই অকিঞ্চিৎকর পরিচিত পরিবেশই হঠাৎ বর্ষার মেঘাবগুণ্ঠন উন্মুক্ত করে তাঁর মনে একটি অপূর্বতা সঞ্চারিত করেছে, 'পাগল' প্রবন্ধ সেই অভাবিত অনন্যেরই বন্দনা। এতে দার্শনিকতা আছে, সুখ ও আনন্দের পার্থক্য বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের বহুকথিত ব্যাখ্যা আছে, রুদ্রের ভীষণ-মধুর রূপের বর্ণনা আছে, কিন্তু রসানুভূতির এক অন্তর্গূঢ় বিস্তারে অত্যন্ত সার্থকভাবে 'বিচিত্র প্রবন্ধ' গ্রন্থের কালানুক্রমিক শেষ রচনার গৌরবও অর্জন করেছে।

দীনেশচন্দ্র সেনের উপর বঙ্গদর্শন-এ 'সাহিত্য প্রসঙ্গ' রচনার দায়িত্ব অর্পিত হয়েছিল। বঙ্গদর্শন-এর জন্য তিনি সখারাম গণেশ দেউস্করের 'দেশের কথা' ১ম ভাগ [16 Jun : ২ আষাঢ়] গ্রন্থটির একটি সমালোচনা লিখে রবীন্দ্রনাথের কাছে প্রেরণ করলে সম্পাদক নিজের মন্তব্যের অন্তর্ভুক্ত করে অভিনব রীতিতে রচনাটি শ্রাবণ-সংখ্যায় প্রকাশ করেন। সখারাম জাতীয় আন্দোলনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন—ডিগবি, দাদাভাই নৌরজী, রমেশচন্দ্র দত্ত প্রমুখ অর্থনীতিবিদ্দের গ্রন্থ থেকে সংখ্যাতত্ত্ব উদ্ধার করে ইংরেজ-শোষণে ভারতীয় শিল্পবাণিজ্যের ধ্বংসোন্মুখ চিত্রটি ফুটিয়ে তুলে আন্দোলনে ইন্ধন জোগানো 'দেশের কথা' গ্রন্থটির প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। রবীন্দ্রনাথ সম্ভবত গ্রন্থটি এই সময়ে পড়েননি, কিন্তু দীনেশচন্দ্রের রচনায় বইটির বিষয়বস্তুর পরিচয় পেয়ে তাঁর বক্তব্য প্রকাশ করেন। পুনঃপুন আন্দোলন করলে গবর্মেণ্ট অবশ্যই আমাদের কথায় কর্ণপাত করবেন, দীনেশচন্দ্রের জবানীতে সখারামের এই বক্তব্যই রবীন্দ্রনাথের আলোচনার বিষয় হয়েছে। তিনি এই আন্দোলনের মধ্যে লাভের দিকটি এই দেখেছেন যে, এর ফলে বিলিতি সভ্যতার মোহ কেটে গিয়ে 'আমাদের দেশ যথার্থভাবে আমাদের হৃদয়কে পাইতেছে। ইহাই পরম লাভ। ধনলাভের চেয়ে ইহা অল্প লাভ নহে।' কিন্তু প্যাট্রিয়টিজম বা স্বাদেশিকতামূলক সভ্যতার সম্পর্কে তিনি যে সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছেন সেটি প্রণিধানযোগ্য, তাঁর দেশীয় বা আন্তর্জাতিক রাজনীতি-চিন্তা পরবর্তীকালেও এই পথ ধরে অগ্রসর হয়েছে। তিনি লিখলেন : 'স্বাদেশিকতার ভাবখানা এই যে, স্বদেশে ঊর্ধ্বে আর কিছুকেই স্বীকার না করা। স্বদেশের লেশমাত্র স্বার্থে যেখানে বাধে না সেইখানেই ধর্ম বল, দয়া বল, আপনার দাবি উত্থাপন করিতে পারে—কিন্তু যেখানে স্বদেশের স্বার্থ লইয়া কথা সেখানে সত্য, দয়া, মঙ্গল সমস্ত নীচে তলাইয়া যায়। স্বদেশীয় স্বার্থপরতাকে ধর্মের স্থান দিলে যে ব্যাপারটা হয় তাহাই প্যাট্রিয়টিজম শব্দের বাচ্য হইয়াছে।' নেশন-তত্ত্বের বিরোধিতা করে ১৩০৮ বঙ্গাব্দের বঙ্গদর্শন-এ তিনি ভারতীয় সমাজ-প্রধান সভ্যতার প্রশস্তি করেছিলেন, কিন্তু এখন ইংরেজ স্বার্থপরতার সংঘাতে দেশীয় স্বার্থপরতা অর্থাৎ নেশান বা 'পোলিটিক্যাল স্বার্থবদ্ধ জনসম্প্রদায়'-এর উদ্ভব অনিবার্য জেনে দেশবাসীকে এবিষয়ে মোহমুক্ত হওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন : 'এ কথা যেন না মনে করি, জাতীয় স্বার্থতন্ত্রই মনুষ্যত্বের চরম লাভ। তাহার উপরেও ধর্মকে রক্ষা করিতে হইবে—মনুষ্যত্বকে

ন্যাশনালত্বের চেয়ে বড়ো বলিয়া জানিতে হইবে। ন্যাশনালত্বের সুবিধার খাতিরে মনুষ্যত্বকে পদে পদে বিকাইয়া দেওয়া, মিথ্যাকে আশ্রয় করা, ছলনাকে আশ্রয় করা, নির্দয়তাকে আশ্রয় করা প্রকৃতপক্ষে ঠকা। সেইরূপ ঠকিতে ঠকিতে অবশেষে একদিন দেখা যাইবে, ন্যাশনালত্ব সুদ্ধ দেউলে হইবার উপক্রম হইয়াছে। কারণ স্বার্থপরতার স্বভাবই এই যে, সে ক্রমশই সংকীর্ণতার দিকে আকর্ষণ করে। তাহার প্রমাণ, বোয়ার যুদ্ধে ইংরেজের তরফের রসদের মধ্যে রাশি রাশি ভেজাল। জাপানের সঙ্গে যুদ্ধে রাশিয়ার পক্ষেও সেইরূপ দেখা গেছে। মনুষ্যত্বের মঙ্গলকে যদি ন্যাশনালত্ব বিকাইয়া দেয়, তবে ন্যাশনালত্বের মঙ্গলকেও একদিন ব্যক্তিগত স্বার্থ বিকাইতে আরম্ভ করিবে। ইহার অন্যথা হইতেই পারে না। প্রাকৃতিক নিয়মই যে অমোঘ, ধর্মের নিয়ম যে অমোঘ নহে, তাহা নয়।' রবীন্দ্রনাথের আশঙ্কা সত্য হয়েছিল। কঠিন আত্মত্যাগ ও নির্ভীক অত্যাচারবরণের পাশাপাশি ক্ষমতা-দ্বন্দ্ব, তুচ্ছ স্বার্থে বিশ্বাসঘাতকতা, রাজকীয় দাক্ষিণ্যের লোভে স্বজাতিদ্রোহিতা, প্রতারণা ইত্যাদি সব রকম পাপ জাতীয় আন্দোলনের ইতিহাসে দেখা গিয়েছে।

মজঃফরপুর-বাসের শেষ পর্বে রবীন্দ্রনাথ দুটি গানও রচনা করেন :

[১] ২৩ আষাঢ় [বৃহ 7 Jul] পিলু/কি সুর বাজে আমার প্রাণে দ্র গীত ২।৩৮৯; স্বর ৩৬; বঙ্গদর্শন, শ্রাবণ। ২১৬, 'বংশীধ্বনি'; কাব্যগ্রন্থ ৮।৩১১, পিলু।

[২] 'শুক্রবার/২৩ শে আষাঢ়' 'তুমি যে আমারে চাও আমি সে জানি' দ্র গীত ১।১২৫-২৬; স্বর ৬০; বঙ্গদর্শন, শ্রাবণ। ২১৫-১৬, 'আমি সে জানি'; কাব্যগ্রন্থ ৮।৩৩০, ভূপালি-কাওয়ালি। মজুমদার-পুঁথিতে লিখিত গানটির নীচে রবীন্দ্রনাথ নিজেই রচনার তারিখ লিখেছেন : 'শুক্রবার/২৩ শে আষাঢ়/১৩১১', কিন্তু ২৩ আষাঢ় শুক্রবার ছিল না, ছিল বৃহস্পতিবার—সেই কারণে 'বার'টিকে সঠিক গণ্য করে আমরা মনে করি, গানটি ২৪ আষাঢ় [শুক্র 8 Jul] লেখা হয়েছিল।

উল্লেখ্য, মজুমদার-পুঁথিতে গান বা কবিতা লেখা এইখানেই শেষ হয়, এর পরে কোনো-এক সময়ে রবীন্দ্রনাথ পাণ্ডুলিপিটি সুবোধচন্দ্র মজুমদারকে দান করেন।

রবীন্দ্রনাথ যেখানেই থাকুন বিদ্যালয়ের ভাবনা তাঁকে কখনোই ত্যাগ করত না। তাই মজঃফরপুরে বিশ্রাম নেবার সময়েও অজিতকুমার চক্রবর্তীকে একটি ও মোহিতচন্দ্র সেনকে যে চারখানি পত্র লিখেছেন, তার সবগুলিতেই বিদ্যালয়ের কথা প্রাধান্য পেয়েছে। বিদ্যালয়ে সতীশচন্দ্রের শূন্যস্থান পূরণ করেছিলেন অজিতকুমার, একই রকম আত্মোৎসর্গের প্রেরণায় তিনি বিদ্যালয়ের কার্যভার গ্রহণ করেন। রবীন্দ্রনাথ এই ধরনের আদর্শবাদী শিক্ষকই চাইতেন, কিন্তু তাঁদের নিয়ে তাঁর কিছু দ্বিধাও ছিল তা প্রকাশ পেয়েছে ১২ আষাঢ়ের [রবি 26 Jun] চিঠিতে :

আমি প্রায়ই মনে মনে ভাবি তোমাদের ত আমি একটা দুরূহ কাজে প্রবৃত্ত করিয়েছি। কিন্তু খাবার যোগাতে পারচি কি? তোমাদের অন্তঃকরণ ত উপবাসী হয়ে নেই? তোমাদের হৃদয়ের মধ্যে রস জোগাচ্ছে কিসে? কাজের ভিতরকার আইডিয়াতে, না আমার সঙ্গে ব্যক্তিগত প্রীতির সম্বন্ধে, না তোমার তরুণ হৃদয়ের স্বাভাবিক আত্মোৎসর্গপরায়ণ শক্তির প্রাচুর্যে? আমি তোমাদের যেটুকু দিতে পারি সেটুকু কি যথেষ্ট? আমি যে নিজেই আমার এই কাজের অভ্যন্তরদেশ থেকে রসাকর্ষণ করবার চেষ্টা করচি।...আমি তোমাকে জানাতে চাই বিশুদ্ধ উৎস যেখানে উৎসারিত হচ্চে সেইখানেই তুমি অঞ্জলি পেতো। আমাদেরও সেইখানেই গতি। নিঃস্বার্থ মঙ্গলই উপায় এবং নিঃস্বার্থ মঙ্গলই লক্ষ্য—পথও সেই, পাথেয়ও সেই, গম্যস্থানও সেই। ভিক্ষুকের মত আর কারো দিকে তাকিয়ো না। আমরা তোমাকে যেটুকু দিতে পারি সেইটুকুর উপরেই যদি নির্ভর কর তাহলে ঠিক জিনিষটি পাবে না, দুদিন বাদেই দুর্বল ও হতাশ হয়ে পড়বে।[৩৪]

অজিতকুমারও দীর্ঘজীবী হননি, কিন্তু তিনি বিদ্যালয়ের সেবা করবার জন্য সতীশচন্দ্রের চেয়ে বেশি সময় পেয়েছিলেন, সাহিত্যচর্চা করে ও সাহিত্যের আবহাওয়া সৃষ্টি করে তিনি রবীন্দ্রনাথকেও ঋণী করে গিয়েছিলেন।

মোহিতচন্দ্রকে লেখা চিঠিগুলি কাজের কথায় পূর্ণ। অক্ষয়কুমার রায় নামক একজন শিক্ষককে মোহিতচন্দ্র নিয়োগ করেছিলেন। এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ ১০ আষাঢ় [শুক্র 24 Jun] লিখেছেন : 'অক্ষয় বাবুকে আশ্রয় দিয়া ভালোই করিয়াছেন—কাজে লাগিবেন। আমাদের বিদ্যালয়ে নানাপ্রকার ফাল্‌তো কাজ আছে—সর্ব্বদাই দুটি একটি ফাল্‌তো লোকের দরকার হয়ে পড়ে। অতএব ওখানে অক্ষয় বাবুর মত ঐ রকম মুসাফের শিক্ষকের যাতায়াত প্রচলিত থাকা ভাল।' লরেন্সও বিদ্যালয়ে কাজ পাবার চেষ্টা করছিলেন, ২০ আষাঢ় [সোম 4 Jul] তাঁর সম্পর্কে লিখেছেন : 'লরেন্সকে জিজ্ঞাসা করবেন বোলপুরেই যদি আবদ্ধ রাখি তা হলে কত টাকা বেতনে সে থাকতে রাজি হয়। তবে যাতায়াতেই অনেকটাকা মাশুল খরচ পড়ে যাবে—তার উপরে বেতন যা দাবী করবে সেটা সবসুদ্ধ জড়িয়ে মন্দ হবে না।' লরেন্স জর্মান ভাষা জানতেন, তাঁকে দিয়ে রথীন্দ্রনাথদের 'জর্ম্মান্ উচ্চারণটা...ভাল করে দোরস্ত' করে নেওয়ার কথা তিনি লিখেছেন—কিন্তু লরেন্স বিদ্যালয়ে যোগ দেননি। ভূপেন্দ্রনাথ সান্যাল তাঁর ভাগলপুরের স্বদেশী দ্রব্যের ব্যবসা নিয়ে বিব্রত হয়ে দুমাসের ছুটি নিয়েছিলেন, তিনি বাল্যবন্ধু পুলিনবিহারী করকে তাঁর স্থানাপন্ন করে যান। অঙ্ক ও বিজ্ঞান শেখাবার জন্য একজন ও সংস্কৃত পড়াবার জন্য একজন শিক্ষকের প্রয়োজন ছিল। ভূপেন্দ্রনাথ লিখেছেন : 'দুটি শিক্ষক বাছিয়া ঠিক করিবার ভার পড়িল আমার উপর। আমি ডাক্তার ঁকানাইলাল গুপ্তকে ও শ্রীমান বিধুশেখর শাস্ত্রীকে ঠিক করিলাম। প্রথমে কানাইবাবুর ডাক পড়িল, তিনি তখন একটি উচ্চ বিদ্যালয়ে দ্বিতীয় শিক্ষকের কার্য করিতেছিলেন, আমি তাঁহাকে সেখানকার কার্যে ইস্তফা দিয়া এখানে আসিবার জন্য অনুরোধ করিলাম। কানাইবাবু যথাসময়ে শান্তিনিকেতনের কার্যে আসিয়া যোগদান করিলেন।'[৩৬] বিধুশেখর (ভট্টাচার্য) শাস্ত্রী [1878-1959] সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ ২০ আষাঢ় [সোম 4 Jul] মোহিতচন্দ্রকে লিখেছেন: 'বিধুশেখরকে আনিয়ে নেবেন—বেতনের অঙ্কটা কিছু বেড়ে গেল—কিন্তু প্রয়োজন যখন আছে তখন কৃপণতা করব না।'[৩৭] বিধুশেখর মাঘ মাসে ব্রহ্মচর্যাশ্রমে যোগ দেন।

ছাত্রদের সর্বাঙ্গীন শিক্ষা সম্বন্ধেও তিনি চিন্তা করছিলেন। ১০ আষাঢ় মোহিতচন্দ্রকে লিখেছেন : ছেলেদের মধ্যে (বিশেষত নূতন ছেলেদের মধ্যে) আমাদের বিদ্যালয়ের ভিতরকার আদর্শটি মুদ্রিত করে দেবার বিশেষ চেষ্টা করবেন। আপনি তাদের নিয়মমত নিজের কাছে ডেকে নিয়ে কথাবার্ত্তা কবেন—তাদের সঙ্গে যোগ রাখ্‌বেন।...ছাত্ররা কি আজকাল পূর্ব্বের মত শিক্ষকদের সেবায় নিযুক্ত হয়েছে? ছাত্রদের সঙ্গে শিক্ষকদের সম্বন্ধ যথাসম্ভব ঘনিষ্ঠ করে দেবেন।' ছাত্রদের পুষ্টিকর খাদ্য ও ব্যায়াম সম্পর্কে তাঁর চিন্তা প্রকাশ পেয়েছে ১৮ আষাঢ়ের পত্রে : 'ছেলেদের মুখরোচক খাবারের জন্যে কিছুমাত্র ভাব্‌তে হয় না যদি তাদের best sauceএর ব্যবস্থা করা যেতে পারে। খুব কসে পরিশ্রম করিয়ে ক্ষুধার মুখে বেশ সাদাসিধা খাবার দিলে সেটা রুচিকর এবং স্বাস্থ্যকর হবেই। পূর্ব্বে ওরা যখন সকালে বিকালে খুব কসে কোদাল পাড়ত তখন খাবার নিয়ে খুঁৎখুঁৎ করত না এবং মোটা রুটি ও ডাল আশ্চর্য্য পরিমাণে খেতে পারত। ওদের শরীর তখন এখানকার চেয়ে ভাল ছিল। আমার তাই মনে হচ্চে সকালে কোনো এক সময়ে অন্ততঃ দশ মিনিট কাল সব ছেলেকে মাটি খুঁড়িয়ে নেওয়া উচিত হবে। যাতে সকলে সেটা রীতিমত করে এবং ফাঁকি না দেয় দেখ্‌বেন। বিকালে যে সব ছেলে

ফুট্‌বল না খেলবে তাদেরও এই রকম ব্যবস্থা করবেন। বৃষ্টি হলেও বাইরে খেলা বা মাটি খোঁড়া বন্ধ রাখ্বেন না। কারণ পরিশ্রম কালে বা বেড়াতে বেড়াতে বৃষ্টিতে ভিজ্‌লে কোনো অসুখ করে না—বরঞ্চ নিয়মিত ব্যায়ামে ব্যাঘাত হলেই অসুখ করে।'[৩৮] ২২ আষাঢ়ের পত্রে লিখেছেন : 'Skipping জিনিসটা অত্যন্ত ভাল।...সুরের সঙ্গে তালে তালে skip করাই হচ্ছে দস্তুর! কোনো এক সময়ে আপনাদের গাইয়েকে দিয়ে দ্রুত তালের গান জুড়ে দিতে পারেন, সেই সময়ে সার বেঁধে ইস্কুলের ছোটোবড়ো সমস্ত ছেলে তালে তালে skip করলে বেশ হয়।'[৩৯] ব্যায়াম সম্পর্কে সেই সময়ে দেশব্যাপী একধরনের সচেতনতা এসেছিল। সরলা দেবী fencing-জানা হরলাল সান্যাল নামক একজনকে ড্রয়িং শিক্ষকের পদের জন্য সুপারিশ করেছিলেন। তাঁকে রাখা হয়নি, কিন্তু কয়েক মাস পরেই জে. স্যানো নামক একজন জাপানী জুজুৎসু-শিক্ষককে বিদ্যালয়ে নিয়োগ করা হয়। ছাত্রদের কারিগরী শিক্ষা দেওয়ার জন্য workshop তৈরি করার বাসনা রবীন্দ্রনাথ বিশেষভাবেই পোষণ করতেন; অর্থ ও যন্ত্রাভাবে তাঁর সেই আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হয়নি, কিন্তু তাঁত-বোনা ও ছুতোরের কাজ শেখানোর ব্যবস্থা হয়, কিছুদিন পরে কুসুমতো-সান নামক একজন দক্ষ জাপানী সূত্রধর বিদ্যালয়ে যোগ দেন।

রথীন্দ্রনাথ ও দিনেন্দ্রনাথ স্বামী সদানন্দের সঙ্গে কেদারনাথ-বদ্রীনাথ তীর্থদর্শনে গিয়েছিলেন, সেকথা আমরা আগেই বলেছি। পুত্রকে কষ্টসহিষ্ণু রূপে গড়ে তোলা রবীন্দ্রনাথের উদ্দেশ্য ছিল। কষ্টসহনের চূড়ান্ত হয়েছিল, তার বর্ণনা আছে পিতৃস্মৃতি-তে [পৃ ৫৪-৫৯]। প্রত্যাগমনের পথে রবীন্দ্রনাথ তাঁদের টেলিগ্রাম করেন মজঃফরপুর হয়ে যেতে। ১৩ আষাঢ় [সোম 27 Jun] তাঁরা মজঃফরপুরে পৌঁছন। রবীন্দ্রনাথ এখানে দিনেন্দ্রনাথকে আগের মাসে রচিত 'সবার মাঝারে তোমাকে স্বীকার করিব হে' গানটি শিখিয়ে দেন। এই গানটি ছাত্রদের শেখানোর ব্যবস্থা করতে বলে তিনি ২২ আষাঢ় মোহিতচন্দ্রকে লেখেন : 'আমি দিনুকে বলে দিয়েছিলুম—ছেলেদের ব্রহ্মসঙ্গীত শেখাতে। ওস্তাদজি ওদের ভাল করে সারেগম সাধিয়ে গলা দোরস্ত করুন কিন্তু গানটা বাজে হিন্দুস্থানী না হয়ে ভাল বাংলা গান হওয়াই উচিত।' শান্তিনিকেতন মন্দিরে গান গাইবার জন্য দু'জন গায়ক নিযুক্ত ছিলেন। এঁদেরই একজনকে রবীন্দ্রনাথ 'ওস্তাদজি' বলে অভিহিত করেছেন। প্রাক্‌কুটীরের উত্তর দেয়ালের জানালার পাশে রাখা টেব্‌ল হারমোনিয়াম বাজিয়ে রবীন্দ্রনাথ ছাত্রদের গান শেখাতেন, হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় তার স্মৃতিচারণ করেছেন।[৪০] দিনেন্দ্রনাথের সংগীতশিক্ষকের ভূমিকা নেওয়ার কথা এই চিঠিতে প্রথম উল্লিখিত হল। রবীন্দ্রনাথের 'সকল নাটের কাণ্ডারী ও সকল গানের ভাণ্ডারী' রূপে তাঁর এই প্রথম আবির্ভাব, এর আগে তিনি ছোটো ছেলেদের বাংলা পড়াতেন।

জামাতার পীড়াপীড়িতে রবীন্দ্রনাথ ৩০ আষাঢ় [বৃহ 14 Jul] পর্যন্ত মজঃফরপুরে থাকবেন এমন সিদ্ধান্ত নিলেও তাঁকে আগেই চলে আসতে হয়। রথীন্দ্রনাথ ১৬ আষাঢ় কলকাতায় এসে পরদিনই শান্তিনিকেতন রওনা হন। ১৮ আষাঢ় [শনি 2 Jul] রবীন্দ্রনাথ মোহিতচন্দ্রকে লিখেছিলেন : 'তীর্থপ্রত্যাগতদের সঙ্গে নিশ্চয় এতক্ষণে দেখাসাক্ষাৎ হয়ে গেছে। খুব গল্প জমেছে বোধ হয়। ওদের একটু আশ্রয় দেবেন। সত্যকে লিখে দিয়েছি ওদের Physiology এবং ambulance সম্বন্ধে অধ্যাপন আরম্ভ করিয়ে দিতে আপনি ওটা ধরিয়ে দেবেন। বোলপুরে থাক্‌তে দিনুর খুব অম্বল ছিল—এবারে পাহাড়ে খুব বেড়িয়ে এবং নিতান্ত শাদাসিধে খাবার খেয়ে সেটা সেরে গেছে।' কিন্তু পাহাড়ে অনিয়ম ও অত্যাচারের প্রতিক্রিয়া সমতলে এসে দেখা দিল, দুজনেই

অসুস্থ হয়ে পড়েন। সেই সংবাদ পেয়ে রবীন্দ্রনাথ মাধুরীলতা-সহ সকলকে নিয়ে শান্তিনিকেতনে আসেন ও ২৭ আষাঢ় [সোম 11 Jul] রথীন্দ্রনাথকে কলকাতায় আনেন চিকিৎসার জন্য—'শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রবাবু মহাশয় ২৭ আষাঢ় তারিখে বোলপুর হইতে শ্রীযুক্ত রথীন্দ্রবাবুকে লইয়া আসায় হাওড়া ষ্টেসন হইতে আসিবার গাড়ীভাড়া'র হিসাব থেকে তথ্যটি জানা যায়। ২৮ আষাঢ় নিমতলায় শ্বশুরবাড়ি যাওয়ার পালকিভাড়া থেকে মাধুরীলতার আসার খবরটি জানতে পারি। জ্বরাক্রান্ত দিনেন্দ্রনাথও কলকাতায় আসেন—২৯, ৩০ ও ৩১ আষাঢ় তাঁর জন্য দিনে দু'বার ডাক্তারকে আসতে হয়। ৪ শ্রাবণ [মঙ্গল *19 Jul] রবীন্দ্রনাথ মনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়কে লেখেন : 'কাল হইতে রথীর জ্বর নাই কিন্তু এখনো সম্পূর্ণ সুস্থ নয়, আজ প্রাতে পিত্ত বমন হইয়াছে।'[৪১] বায়ুপরিবর্তন ও বিশ্রামের জন্য রথীন্দ্রনাথকে গিরিডি পাঠানো হয় ১৪ শ্রাবণ [শুক্র 29 Jul]। কিছুদিন পরে রবীন্দ্রনাথও তাঁকে অনুসরণ করেন।

শ্রাবণ-সংখ্যা বঙ্গদর্শন [৪।৪] 16 Jul [শনি ১ শ্রাবণ] প্রকাশিত হয়। এই সংখ্যায় রবীন্দ্ররচনার সূচীটি বেশ দীর্ঘ :

১৬৩-৬৮ "গুরুদক্ষিণা" (সমালোচনা) দ্র বি. ভা. প, মাঘ-চৈত্র ১৩৫৪।২১৯-২৪

১৭৫-৮৬ 'নৌকাডুবি' ৪১ দ্র নৌকাডুবি ৫।৩০৩-১৩ [৩৮]

২০৫-০৯ 'পাগল' দ্র বিচিত্র প্রবন্ধ ৫।৪৪৪-৪৯

২০৯-১০ 'নমস্কার' ['যে কেহ মোরে দিয়েছে সুখ'] দ্র গীত ১।১৯৬

২১০-১৪ 'সাময়িক প্রসঙ্গ। দেশের কথা' দ্র সমূহ-পরিশিষ্ট ১১।৬১৯-২৩

২১৫-১৬ 'আমি সে জানি' ['তুমি যে আমারে চাও'] দ্র গীত ১।১২৫-২৬

২১৬ 'বংশীধ্বনি' ['কি সুর বাজে আমার প্রাণে'] দ্র ঐ ২।৩৮৯

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, শ্রাবণ ১৮২৬ শক [৭৩২ সংখ্যা] :

৫৩-৫৮ 'মহর্ষির জন্মোৎসব' দ্র চারিত্রপূজা ৪।৫২৪-৩০

ভারতী, শ্রাবণ, ১৩১১ [২৮।৪] :

৩১৩ 'গান' [আজি যত তারা তব আকাশে'] দ্র গীত ১।৩৩

৩৪৮-৫৬ 'ভাষার ইঙ্গিত' [শেষাংশ] দ্র শব্দতত্ত্ব ১২।৪০৪-১০

সঙ্গীত-প্রকাশিকা, শ্রাবণ ১৩১১ [৩।১১] :

২১৪-১৫ পূরবী-কাওয়ালি। শ্রান্ত কেন ওহে পান্থ দ্র স্বর ৪

২১৫-১৭ ইমন ভূপালি-একতালা। তোমার কথা হেথা কেহত বলে না দ্র ঐ ৪

২১৮-১৯ বেহাগড়া-ঝাঁপতাল। দেখ চেখে দেখ ঐ কে আসিছে দ্র ঐ ৪৮

এর মধ্যে দ্বিতীয় গানটির স্বরলিপিকার কাঙালীচরণ সেন, অন্য দুটির ক্ষেত্রে কোনো নাম উল্লেখিত হয়নি।

রবীন্দ্রনাথ সপরিবারে কলকাতায় আসেন ২৭ আষাঢ় [সোম 11 Jul]। এই দিনই তিনি পার্শিবাগানে জগদীশচন্দ্রের সঙ্গে দেখা করতে যান। এরপরেও তিনি সেখানে গেছেন ২৯ ও ৩০ আষাঢ় এবং ৩ শ্রাবণ।

মোহিতচন্দ্র অসুস্থ হয়ে শান্তিনিকেতন থেকে চলে আসেন, তাঁকে দেখতে 'মোহিতবাবুর বাটী' যান ৩১ আষাঢ়। তাঁর 'বালিগঞ্জ হইতে আসার' হিসাব পাওয়া যায় ২ শ্রাবণ [রবি 17 Jul]। রবীন্দ্রনাথ একটি নূতন সামাজিক তথা রাজনৈতিক আন্দোলনের পরিকল্পনা করেছিলেন, এই সমস্ত যাতায়াত হয়তো তারই সঙ্গে যুক্ত।

'বঙ্গবিভাগ', 'য়ুনিভার্সিটি বিল' ও 'দেশের কথা' এই তিনটি 'সাময়িক প্রসঙ্গ' নিয়ে আলোচনায় তিনি যে ঐক্য ও আত্মশক্তির কথা বলেছিলেন, তাকেই তিনি একটি সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনার আকারে প্রকাশ করলেন 'স্বদেশী সমাজ' প্রবন্ধে [দ্র বঙ্গদর্শন, ভাদ্র। ২৩৮-৬৫; আত্মশক্তি ৩।৫২৬-৫২]। এটিও এক অর্থে 'সাময়িক প্রসঙ্গ'—'বাংলাদেশের জলকষ্ট নিবারণ সম্বন্ধে গবর্মেন্টের মন্তব্য প্রকাশিত হইলে পর এই প্রবন্ধ লিখিত হয়'; এটিকে আত্মশক্তি [১৩১২] গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত করে রবীন্দ্রনাথ প্রবন্ধটির গুরুত্বকে স্বীকৃতি দিয়েছিলেন। প্রবন্ধটি অবশ্যই গুরুত্বপূর্ণ —প্রায় একশ বছর পরে বর্তমান কালে জনকল্যাণমুখী স্বাধীন রাষ্ট্রব্যবস্থাতেও এর তাৎপর্য সম্পূর্ণ হারিয়ে যায়নি—বিভিন্ন সাময়িকপত্রে প্রকাশিত তীব্র প্রতিক্রিয়ায় তা ধরা পড়েছে।

রবীন্দ্রনাথ প্রবন্ধটি মজঃফরপুরে অবস্থানকালেই রচনা করেন। দীর্ঘ এই প্রবন্ধে তিনি নূতন কথা বিশেষ কিছু বলেননি, ভারতীয় সমাজ-প্রধান সভ্যতার বৈশিষ্ট্য ও পাশ্চাত্য রাষ্ট্রপ্রধান সভ্যতার সঙ্গে তার পার্থক্য বিষয়ে সাধনা-র যুগ থেকে তিনি যে-সমস্ত কথা লিখে আসছেন প্রবন্ধটির বৃহদংশ তারই পুনরুক্তি। এখানে সেই বক্তব্যকে তিনি জলকষ্ট-সমস্যার পরিপ্রেক্ষিতে কর্মাভিমুখী করে তুলতে চেয়েছেন। শর্করারস যেমন একটি সূত্রকে অবলম্বন করে মিছরির দানায় পরিণত হয়, তেমনি সমাজের বিচ্ছিন্ন শক্তি ও কর্মপ্রয়াসকে সংহত করার জন্য তিনি একজন সমাজপতি মনোনয়নের কথা বলেছেন : 'স্বদেশকে একটি বিশেষ ব্যক্তির মধ্যে আমরা উপলব্ধি করিতে চাই। এমন একটি লোক চাই, যিনি আমাদের সমস্ত সমাজের প্রতিমাস্বরূপ হইবেন। তাঁহাকে অবলম্বন করিয়াই আমরা আমাদের বৃহৎ স্বদেশীয় সমাজকে ভক্তি করিব, সেবা করিব। তাঁহার সঙ্গে যোগ রাখিলেই সমাজের প্রত্যেক ব্যক্তির সঙ্গে আমাদের যোগ রক্ষিত হইবে।' এমন লোক পাওয়া কঠিন যাঁকে সকলেই একবাক্যে মেনে নেবে, একটি ব্যবস্থাতন্ত্র গড়ে না উঠলে নির্বাচন করাই কঠিন ইত্যাদি সমস্যার কথা মনে রেখেও তিনি লিখলেন : 'যদি সমাজপতি-নিয়োগের প্রস্তাব সময়োচিত হয়, যদি রাজা সমাজের অন্তর্গত না হওয়াতে সমাজে অধিনায়কের যথার্থ অভাব ঘটিয়া থাকে, যদি পরজাতির সংঘর্ষে আমরা প্রত্যহ অধিকারচ্যুত হইতেছি বলিয়া সমাজ নিজেকে বাঁধিয়া তুলিয়া উঠিয়া দাঁড়াইবার জন্য ইচ্ছুক হয়, তবে কোনো একটি যোগ্য লোককে দাঁড় করাইয়া তাঁহার অধীনে এক দল লোক যথার্থভাবে কাজে প্রবৃত্ত হইলে এই সমাজ-রাজতন্ত্র দেখিতে দেখিতে প্রস্তুত হইয়া উঠিবে—পূর্ব হইতে হিসাব করিয়া কল্পনা করিয়া আমরা যাহা আশা করিতে না পারিব, তাহাও লাভ করিব—সমাজের অন্তর্নিহিত বুদ্ধি এই ব্যাপারের চালনাভার আপনিই গ্রহণ করিবে।'

রবীন্দ্রনাথ কলকাতায় এসে প্রবন্ধটি জগদীশচন্দ্রকে অবশ্যই শুনিয়েছিলেন, অন্য-কিছু ব্যক্তিকেও তাঁর পরিকল্পনার কথা ব্যক্ত করেন। চৈতন্য লাইব্রেরি অ্যাণ্ড বীডন স্কোয়ার লিটারেরি ক্লাবের উৎসাহী সম্পাদক গৌরহরি সেন ৭ শ্রাবণ [শুক্র 22 Jul] সন্ধ্যা সাড়ে ছ'টার সময় রমেশচন্দ্র দত্তের সভাপতিত্বে মিনার্ভা রঙ্গমঞ্চে চৈতন্য লাইব্রেরির বিশেষ অধিবেশনে রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধ পাঠের আয়োজন করে ফেলেন। স্বদেশী সমাজ গঠনের জন্য আলোচনাসভার ব্যবস্থা হয়তো আগেই হয়েছিল। 'বৃহস্পতিবার' [৬ শ্রাবণ : 21 Jul]

রবীন্দ্রনাথ মোহিতচন্দ্র সেনকে লেখেন : 'কাল বৈকালে আমার প্রবন্ধ পাঠ আছে সেই জন্য নিমন্ত্রণ পরশ্ব শনিবারে পিছাইয়া দেওয়া গেল।...আজ যথাসময়ে ব্রজেন্দ্র[শীল] বাবুকে লইয়া সভাস্থলে আসিবেন—পাপের শেষ রাখিতে নাই—যখন শুরু করিয়াছেন তখন আখেরি পর্য্যন্ত থাকিতে হইবে।'[৪২] এই চিঠি থেকে বোঝা যায়, স্বদেশী সমাজের পরিকল্পনায় অসুস্থ মোহিতচন্দ্রও যুক্ত ছিলেন।

প্রবন্ধের বিষয়বস্তু মুখে মুখে প্রচারিত হওয়ায় জনসাধারণ, বিশেষত কলকাতার ছাত্রসমাজ, এত উন্মত্ত হয়ে পড়ে যে সভাস্থলে ও সভার বাইরে প্রচণ্ড বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হয়—কর্মকর্তা ও পুলিশের সঙ্গে মারামারি, ইঁটপাটকেল ছোঁড়া প্রভৃতি কিছুই বাদ যায় না—'জনতা এত অধিক হইয়াছিল যে, প্রায় এক সহস্র ব্যক্তি সভাগৃহে স্থান না পাইয়া ফিরিয়া গিয়াছিলেন।'

কিন্তু তার আগেও একটি সমস্যা উপস্থিত হয়েছিল। 19 Jul [মঙ্গল ৪ শ্রাবণ] রমেশচন্দ্র দত্ত গৌরহরি সেনের পত্রের উত্তরে লেখেন :

...ধুতি চাদর পরা আমার অভ্যাস আছে। কখন কখন ধুতি চাদর পরিয়া আমি বিবাহের সভায় গিয়া থাকি। কিন্তু সাধারণ লেক্‌চর স্থানে সে বেশে কখনও যাই নাই। শুক্রবার সে বেশে যাইলে স্পষ্টই অনুমিত হইবে যে, রবিবাবুর প্রবন্ধের ভয়ে আমি ঐ বেশটী ধারণ করিয়াছি। লোকে সেরূপ অনুমান করিবে, তাহাতে আমি সম্মত নহি। সুতরাং আমি বড়ই দুঃখিত হইলাম, রবিবাবুর এ কথাটী রাখিতে পারিলাম না। পরিচ্ছদটা অতি সামান্য বিষয়। সম্ভবতঃ রবিবাবু প্রবন্ধ পাঠের সময় সেই কথাটী বাদ দিয়া পড়িতে সম্মত হইবেন।...যদি রবিবাবু পরিচ্ছদ সম্বন্ধীয় কথাগুলি বাদ দিতে সম্মত না হয়েন, তাহা হইলে সভায় আমার না যাওয়াই ভাল। আমার শরীর সুস্থ নহে। আমি এখনও ভাল করিয়া চলিতে পারি না। সেই কথা লিখিয়া আমি শুক্রবার আপনাকে একখানি পত্র লিখিতে পারি। আপনারা সভায় সেই পত্র পাঠ করিয়া গুরুদাস বাবুকে সভাপতি করিয়া কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে পারেন।'[৪৩]

এই পত্র থেকে বোঝা যায়, প্রবন্ধে 'পরবেশ'-সম্পর্কিত অনুচ্ছেদের পরিপ্রেক্ষিতে রবীন্দ্রনাথই গৌরহরি সেন মারফৎ রমেশচন্দ্রকে ধুতিচাদর পরে সভায় আসতে অনুরোধ করেছিলেন। মুদ্রিত প্রবন্ধে এরূপ কোনো বক্তব্য না দেখে মনে হয়, রবীন্দ্রনাথ কথাগুলি বাদ দিতে সম্মত হয়েছিলেন। কিন্তু এই চিঠি থেকেই তাঁর পরিকল্পনার ভবিষ্যৎ বোঝা উচিত ছিল!

'শহরের অনেক গণ্যমান্য লোক'-এর উপস্থিতিতে রবীন্দ্রনাথ দীর্ঘ প্রবন্ধটি পাঠ করেন। 'বিষয়গুলি বিস্তৃতভাবে বলিয়া উপসংহারে প্রবন্ধ-লেখক স্বদেশের পূজার জন্য সকলকে যে কবিত্বপূর্ণ ভাষায় উদ্‌বোধন করিয়াছিলেন তাহা সমবেত শত শত ব্যক্তি চিত্রার্পিতের ন্যায় নীরবে শ্রবণ করিয়াছিলেন।' এর পর গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ও হীরেন্দ্রনাথ দত্ত প্রবন্ধ সম্বন্ধে কিছু মন্তব্য করলে রবীন্দ্রনাথ 'পুনশ্চ বক্তব্য' নিবেদন করতে গিয়ে 'স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহোদয়কে সমাজের অধিনায়কের পদে বরিত করিবার পক্ষে অনেকগুলি সুযুক্তি প্রদর্শন করিলেন।' সভাপতি রমেশচন্দ্র দত্ত বলেন, 'রবীন্দ্রবাবুর প্রবন্ধের ন্যায় উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ তিনি কখনও শুনিয়াছেন বলিয়া তাঁহার স্মরণ নাই।' তিনি আরও বলেন, 'কেবল রাজনীতি বা কেবল সামাজিক বিষয় লইয়া কোনো জাতি উন্নত হয় না।...জাতীয় উন্নতি চতুর্দিক হইতে হইয়া থাকে, শুধু সমাজনীতি বা রাজনীতি লইয়া থাকা একদেশদর্শিতা।...ঐক্য অবলম্বন করিয়া যে-কোনো বিষয়ে কাজ করা যায় তাহাতেই সার্থকতা হইবে। এই সুফল আমাদের রাজার হাতে ততটা নহে যতটা আমাদের হাতে।' রবীন্দ্রনাথ তাঁর পরিবর্ধিত বক্তৃতায় এই মন্তব্য সম্পর্কে আক্ষেপ প্রকাশ করেছিলেন।

তিনি মজঃফরপুর থেকেই অসুস্থ ছিলেন; ২২ আষাঢ় [বুধ 6 Jul] মোহিতচন্দ্রকে লেখেন : 'এবারে এখানে শরীরটা তেমন ভাল নেই। অবশ্য জ্বর নেই—কিন্তু অর্শ প্রভৃতি উপসর্গ যথেষ্ট প্রবল হয়েছে।' অর্শের

উৎপাতের উল্লেখ এই প্রথম পাওয়া গেল, এর পরে প্রায় ন'বছর তিনি এই পীড়ায় কষ্ট পেয়েছেন। বক্তৃতার পর তিনি আরও অসুস্থ হয়ে পড়েন। গোপালদাস শর্মা রায় তাঁর পুত্র জ্যোতিশ্চন্দ্র রায়কে বিদ্যালয়ে ভর্তি করার তাগিদ দিলে রবীন্দ্রনাথ ৯ শ্রাবণ [রবি 24 Jul] লেখেন : 'অসুস্থ অবস্থায় শয্যাগত আছি। আপনার পুত্রের কথা ভুলি নাই।...অস্বাস্থ্যবশত কোনোমতে আপনার পত্রোত্তর দিলাম বলিয়া কিছু মনে না করিয়া আমাকে মার্জ্জনা করিবেন।'[৪৪]

কিন্তু যাঁরা মিনার্ভা রঙ্গমঞ্চে প্রদত্ত বক্তৃতা শুনতে পাননি, তাঁদের অনুরোধে ১৬ শ্রাবণ [রবি 31 Jul] প্রশস্ততর কার্জন রঙ্গমঞ্চে প্রবন্ধটি পুনরায় পাঠ করার জন্য রবীন্দ্রনাথকে রাজি হতে হয়। আগের দিনের বিশৃঙ্খলার জন্য এক শ্রেণীর ছাত্রকে দায়ী করে গৌরহরি সেনের একটি পত্র 28 Jul [বৃহ ১৩ শ্রাবণ]-এর *The Bengalee*-তে মুদ্রিত হলে মৌচাকে ঢিল পড়ে। 30 July থেকে 4 Aug পর্যন্ত বেঙ্গলী-তে অনেকগুলি প্রতিবাদ-পত্র মুদ্রিত হয়, জনৈক J. M. Mitra চৈতন্য লাইব্রেরির দ্বারা আয়োজিত সমস্ত সভা বয়কট ও লাইব্রেরির সদস্যপদ ত্যাগ করার আহ্বান পর্যন্ত জানান। এই চিঠিটি ছেপেই [4 Aug] সম্পাদক উক্ত বিষয়ে চিঠি ছাপানো বন্ধ করে দেন।

প্রবন্ধটি পুনরায় পাঠ করার ঘোষণা বেঙ্গলী-তে মুদ্রিত হয় 29 Jul [শুক্র ১৪ শ্রাবণ] :

Babu Rabindra Nath Tagore's Lecture—A public meeting will be held on Sunday next at 5 P.M. at the Curzon Theatre (Harrison Road) when Babu Rabindra Nath Tagore will again read his paper on the "Swadeshi Samaj." Admission will be by tickets, which can be obtained at Lakhsmir Bhandar, 7, Connwallis Street.

পরের দিনই পত্রিকাটি লেখে : '...that the tickets for admission to the above lecture have already been distributed and that no more tickets are now available at the 'Lakshmir Bhandar.' ভাদ্র-সংখ্যা ভারতী-তে মুদ্রিত 'রবীন্দ্র বাবুর প্রবন্ধ ও তৎসংক্রান্ত সভাদ্বয়ের বিবরণী' [পৃঃ ৪৭৪-৮৭]-তে* লেখা হয় : '১২০০ টিকিট ৪ ঘণ্টার মধ্যে বিতরিত হইয়া গিয়াছিল। বহুসংখ্যক লোককে এবারও ভগ্নমনোরথ হইয়া ফিরিয়া যাইতে হইয়াছিল।'

রবীন্দ্রনাথ দ্বিতীয়বার প্রবন্ধপাঠের আগে সেটিকে পরিবর্ধিত করেন। এই পরিবর্ধিত প্রবন্ধটি ভাদ্র-সংখ্যা বঙ্গদর্শন-এ [পৃ ২৩৮-৬৫] মুদ্রিত এবং পত্রিকাটির সহঃসম্পাদকের দাবী অনুযায়ী 'ভাদ্রের বঙ্গদর্শন হইতে পুনঃপঠিত' হয়। কিন্তু বক্তৃতার দিন একটি পুস্তিকার আকারে প্রবন্ধটি মুদ্রিত ও প্রচারিত হয়েছিল। পুস্তিকাটি আমরা দেখিনি, বেঙ্গল লাইব্রেরির ক্যাটালগ থেকে এর বিবরণটি সংকলিত হল :

Svadesi Samáj Native Society/Ravindra Nath Tagore/20, Cornwallis Street, Calcutta/[Printer] Anukul Chandra Parihal; [Publisher] S. C. Majumdar/July 31/RI. 8VO; [Page] 30/Ist; 2000/P./0 2 0...

এই বিবরণ থেকে জানা যায় দু'আনা দামের ৩০ পৃষ্ঠার এই পুস্তিকাটি ২০০০ কপি ছাপা হয়েছিল। বেঙ্গল লাইব্রেরির ক্যাটালগ অনুসারে বঙ্গদর্শন-এর ভাদ্র-সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছিল 2 Aug [মঙ্গল ১৮ শ্রাবণ]।

এইদিন হীরেন্দ্রনাথ দত্ত সভাপতিত্ব করেন। 'রবীন্দ্রবাবু জ্বর লইয়া সভাস্থলে আসিয়াছিলেন। তিনি দাঁড়াইতে না পারিয়া বসিয়া ধীর সুকণ্ঠে তাঁহার সুন্দর প্রবন্ধটি পুনরায় পাঠ করেন।' প্রবন্ধটি পরিবর্ধিত হয়েছিল। রমেশচন্দ্র দত্তের নাম না করে তিনি তাঁর বক্তব্য সম্পর্কে বলেন :

দেশ যখন একদা জাগ্রত হইয়া 'কন্‌স্টিট্যুশনাল্ অ্যাজিটেশনে'র রেখা ধরিয়া রাজ্যেশ্বরের দ্বারের মুখে ছুটিয়াছিল, তখন সমস্ত শিক্ষিত সমাজের বুদ্ধিবেগ তাহার মধ্যে ছিল। আজ স্পষ্ট দেখা যাইতেছে সেই স্রোতের পথ বাঁক লইবার উপক্রম করিতেছে।...যাঁহারা সাধনাদ্বারা, তপস্যাদ্বারা, ধীশক্তিদ্বারা ইংরাজিশিক্ষিত সমাজের চিত্তকে স্বদেশের কার্যে চালিত করিয়াছেন, স্বদেশের কার্যে একাগ্র করিবার আয়োজন করিয়াছেন, তাঁহাদিগকে আমি ভক্তির সহিত নমস্কার করি। তাঁহারা যে পথে গিয়াছিলেন সে পথে যাত্রা যে ব্যর্থ হইয়াছে, এ আমি কখনোই বলিব না। তখন সমস্ত দেশের ঐক্যের মুখ রাজদ্বারেই ছিল।...এখন সে চিরন্তন সমুদ্রের আহ্বান শুনিয়াছে—এখন সে আত্মশক্তি আত্মচেষ্টার পথে সার্থকতালাভের দিকে অনিবার্যবেগে চলিবে, কোনো-একটা বিশেষ মুষ্টিভিক্ষা বা প্রসাদলাভের দিকে নহে। এই-যে পথের দিক্-পরিবর্তনের লক্ষণ দেখা দিতেছে ইহা কোনো ব্যক্তিবিশেষের কৃতকর্ম নহে—যে চিত্তস্রোত প্রথমে এক দিকে পথ লইয়াছিল ইহা তাহারই কাজ, ইহা নূতন স্রোত নহে...

গতবারে এ প্রবন্ধ যখন আমি পাঠ করিয়াছিলাম, তখন আমার উক্ত কথাটি সকলের কাছে সুস্পষ্ট হয় নাই। প্রতিবাদে এই কথা উঠিয়াছিল যে, দেশে নানা শক্তি নানা লোককে নানা দলকে আশ্রয় করিয়া কাজ করিবে, ইহাই দেশের স্বাস্থ্যের ও উন্নতির লক্ষণ। অতএব কেবলমাত্র সমাজের দিকে দৃষ্টি রাখিলে চলিবে না।

প্রবন্ধপাঠের শেষে এমন কথা যখন উঠিল তখন বুঝিলাম—আমার সমস্ত প্রবন্ধই ব্যর্থ হইয়াছে। আমি এই কথাই বিশেষ করিয়া বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছি যে, বিলাতে যেমনই হউক, আমাদের দেশে সমাজ একটা ক্ষুদ্র ব্যাপার নহে—যুদ্ধবিগ্রহ, কিয়ৎপরিমাণে পাহারার কাজ ও কিঞ্চিৎপরিমাণে বিচারের কাজ ছাড়া দেশের আর-সমস্ত মঙ্গলকার্যই আমাদের সমাজ নিজের হাতে রাখিয়াছিল। ইহাই আমাদের বিশেষত্ব। এইজন্য এই সমাজব্যবস্থার উপরেই আমাদের মনুষ্যত্ব, আমাদের সভ্যতা স্থাপিত এবং এইজন্য এই সমাজকে আমরা চিরদিন সর্বতোভাবে স্বাধীন ও সক্রিয় রাখিতে একান্ত সচেষ্ট ছিলাম। অতএব কে বলিল সমাজের কাজ বলিতে কেবল একটিমাত্র কাজ বুঝাইতেছি?[৪৫]

আগের বক্তৃতায় রবীন্দ্রনাথ 'পুনশ্চ বক্তব্য'তে সমাজপতি হিসেবে গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম সুপারিশ করেছিলেন। এবার তিনি মূল প্রবন্ধের মধ্যেই প্রস্তাবটি অন্তর্ভুক্ত করে বলেন :

যিনি এক দিকে আচার ও নিষ্ঠা-দ্বারা হিন্দুসমাজের অকৃত্রিম শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিয়াছেন, অপর দিকে আধুনিক বিদ্যালয়ের শিক্ষায় যিনি মহৎ গৌরবের অধিকারী; এক দিকে কঠোর দারিদ্র্য যাঁহার অপরিচিত নহে, অন্য দিকে আত্মশক্তির দ্বারা যিনি সমৃদ্ধির মধ্যে উত্তীর্ণ; যাঁহাকে দেশের লোক যেমন সম্মান করে, বিদেশী রাজপুরুষেরা তেমনি শ্রদ্ধা করিয়া থাকে; যিনি কর্তৃপক্ষের বিশ্বাসভাজন, অথচ যিনি আত্মমতের স্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ করেন নাই; নিরপেক্ষ ন্যায়বিচার যাঁহার প্রকৃতিগত ও অভ্যাসগত; নানা বিরোধীপক্ষের বিরোধ-সমন্বয় যাঁহার পক্ষে স্বাভাবিক; যিনি সুযোগ্যতার সহিত রাজার ও প্রকৃতিসাধারণের সম্মাননীয় কর্মভার সমাধা করিয়া বিচিত্র অভিজ্ঞতার দ্বারা ঐশ্বর্যবান অক্ষুব্ধ অবসর লাভ করিয়াছেন; সেই স্বদেশ-বিদেশের-শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত, সেই ধনসম্পদের মধ্যেও অবিচলিত, তপোনিষ্ঠ, ভগবৎপরায়ণ ব্রাহ্মণ শ্রীযুক্ত গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম যদি এইখানে আমি উচ্চারণ করি, তবে অনেক পল্লবিত বর্ণনার অপেক্ষাও সহজে আপনারা বুঝিবেন কিরূপ সমাজকে আমি প্রার্থনীয় ও সম্ভবপর জ্ঞান করিতেছি। বুঝিতে পারিবেন নিজের ব্যক্তিগত সংস্কার, মতামত, আচার-বিচার লইয়া আমি লেশমাত্র আপত্তি তুলিতে চাহি না—আমি আমার সমস্ত দেশের অভাব, দেশের প্রার্থনা অন্তরের মধ্যে একান্তভাবে উপলব্ধি করিয়া নম্রভাবে নমস্কারের সহিত সমাজের শূন্য রাজভবনে এই দ্বিজোত্তমকে মুক্তকণ্ঠে আহ্বান করিতেছি। আপনারা সকলেও সমস্ত ক্ষুদ্রতর্ক ও কর্মহানিকর দ্বিধা, সমস্ত ব্যক্তিগত সংস্কারগত পক্ষপাতিত্ব, পরিহার করিয়া অদ্য সমস্বরে আমার সমর্থন করুন।[৪৬]

প্রবন্ধপাঠের পর সভাপতি হীরেন্দ্রনাথ দত্ত বলেন, '...কেহ কেহ বলেন, রবীন্দ্রবাবু জাতীয় নৈরাশ্যের সংগীত শুনাইয়াছেন। আমার মনে হয়—ইঁহার কথা নব আশার সংগীত।...রবীন্দ্রবাবু দেখাইয়াছেন—পূর্বে যে প্রণালীতে কাজ করা হইত এখন তাহা উপযোগী নহে। বৎসরের মধ্যে তিন দিন মাত্র একত্র হইয়া বাক্যব্যয় করিলে দেশের বিশেষ কোনো কল্যাণ সাধিত হইবে না।...সমস্ত জীবন ব্যয় করিয়া দেশের কাজ করিতে হইবে।...রবীন্দ্রবাবু আশান্বিতভাবে বলিয়াছেন আমাদের অপমৃত্যু ঘটিবে না।' সভাপতিকে ধন্যবাদ দেওয়ার উপলক্ষে বিপিনচন্দ্র পাল বলেন, 'রবিবাবু যে আদর্শ দেখাইয়াছেন তাহা নূতন নহে এবং তাহা পুরাতনও নহে।...গত ২৫ বৎসর যাবৎ দেশে সে সাধনা চলিতেছে রবীন্দ্রবাবুর প্রবন্ধ তাহারই ফল।...জাতীয় উন্নতি এখন আর পরকীয় দান-দ্বারা ঘটিবে না, স্বকীয় সাধনা-দ্বারা অর্জন করিতে হইবে।...রবীন্দ্রবাবু জাতীয় জীবনের যে নূতন আদর্শ দেখাইয়াছেন তাহাই আমাদের পক্ষে একান্ত অবলম্বনীয়।'

সভাভঙ্গের আগে প্রচলিত রীতি ভঙ্গ করে রবীন্দ্রনাথ কয়েকটি কথা বলার অনুমতি নিয়ে পুনশ্চ বলেন : 'আজ সমবেত ব্যক্তিগণকে সাহিত্যরস দেওয়ার জন্য আমি দাঁড়াই নাই। শুধু উদ্দীপনায় কোনো কাজই হয়

না; আগুন জ্বালাইতে হইবে, সঙ্গে সঙ্গে হাঁড়িও চড়াইতে হইবে।...আমরা অনেক সময় কল্পনা-দ্বারাই খুব বেশি পরিমাণে চালিত হই, দেশের কাজ করিতে হইলে মনে ভাবি যেন ধূমধামের সহিত মস্ত একটা অট্টালিকা গড়িতে হইবে, একটা চূড়া প্রস্তুত করিতে হইবে, যেন কোনো-একটা সমারোহব্যাপার—আমাদের চেষ্টা এই ভাবে একটা সুবৃহৎ কল্পনায় পর্যবসিত হইয়া যায়। আমরা যেন প্রত্যেকে নিজ নিজ ক্ষুদ্রভাবে দেশের জন্য কাজ করিতে পারি। আমার প্রস্তাব—প্রত্যেকে নিজেদের গৃহে স্বদেশের জন্য যদি প্রত্যহ কিছু উৎসর্গ করিয়া রাখেন তবে ভবিষ্যতে সেই সঞ্চয় কাজে লাগিবে। তাহা ছাড়া উহা আমাদের একটা চেতনা প্রবুদ্ধ করিয়া রাখিবে।...আমাদের স্বদেশভক্তিও যেন সেইরূপ কোনো সভা-সমিতির তাগিদের প্রতীক্ষা না করিয়া নীরবে আপন কার্য সমাপন করে। স্বদেশের কাজ যেন বৃহৎ বাহ্য অনুষ্ঠানে পরিণত না হয়।'[৪৭]

শুধু প্রবন্ধপাঠ নয়, রবীন্দ্রনাথ কার্যক্ষেত্রেও নেমে পড়েছিলেন। অসুস্থ শরীরে তিনি কত ঘোরাঘুরি করেছেন তার কিছু বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে তাঁর নিজস্ব ক্যাশবহির পাতায়। ১৪ শ্রাবণ [শুক্র 29 Jul] তিনি সকাল-সন্ধ্যা দু'বার গেছেন সুকিয়া স্ট্রীটে, ১৫ শ্রাবণ গিয়েছেন 'বসুপাড়া'য় নিবেদিতার কাছে, ১৭ শ্রাবণ যান নারকেলডাঙায় গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়ি; এছাড়া ১৮ শ্রাবণ শ্যামবাজার ও কর্নওয়ালিস স্ট্রীট, ২০ ও ২১ শ্রাবণ পার্শিবাগান এবং ২২ শ্রাবণ [শনি 6 Aug] পুনশ্চ কর্নওয়ালিস স্ট্রীটে তাঁর যাতায়াতের হিসাব পাওয়া যায়—এর সবগুলি না হলেও অধিকাংশই স্বদেশী সমাজ গঠনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। নিজের বাড়িতে লোকসমাগম তো ছিলই। 'সোমবার' [১৭ শ্রাবণ : 1 Aug] তিনি শ্রীশচন্দ্র মজুমদারকে লিখেছেন : 'বক্তৃতাপাঠ হল—তার বিবরণ নিজের মুখে দেওয়া উচিত নয়। এখন লোকের ভিড় ঠেকাচ্ছি। একটা সমাজ গঠন করবার জন্যে চেষ্টা চল্‌চে—তাই বিষম আটকে পড়েছি। কবে ছুটি পাব জানিনা। শরীর ভাল কি মন্দ তা বিচার করে দেখবারই সময় পাচ্চিনে। কিন্তু পালাবার জন্যে ভিতরে ভিতরে মনটা ছট্‌ফট্ করচে, অথচ যদি পালাই তাহলে ঐখেনেই ইতি। দেশে উদ্যোগী লোক এতই অল্প।'[৪৮]

এই উদ্যোগের একটি নিদর্শন পাওয়া গেছে অমল হোমের সৌজন্যে। স্বদেশী সমাজ-এর সেই মুদ্রিত অনুষ্ঠানপত্রের কিয়দংশ প্রকাশিত হয়েছিল *The Calcutta Municipal Gazette*-এর Tagore Memorial Special Supplement [13 Sep 1941]-এ, সম্পূর্ণ অনুষ্ঠানপত্রটি 'স্বদেশী সমাজ' গ্রন্থে পুনর্মুদ্রিত হয়েছে [পৃ ৫৮-৬৪]। আমরা এই 'সংবিধান'-এর কিছুটা উদ্ধৃত করছি :

পাঠক দয়া করিয়া নিজের অভিপ্রায়মত এই নিয়মাবলী পরিবর্তন পরিবর্ধন ও পরিবর্জন করিয়া জোড়াসাঁকোয় ৬ নং দ্বারকানাথ ঠাকুরের গলিতে শ্রীযুক্ত বাবু গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুরের নিকট পাঠাইয়া দিবেন। ইহা সর্বসাধারণের নিকট প্রকাশ্য নহে। বন্ধুবান্ধবদের মধ্যে যাঁহারা এই কার্যে যোগ দিতে ইচ্ছুক আছেন, তাঁহাদের নাম ও ঠিকানা এই সঙ্গে পাঠাইলে বাধিত হইব।

আমরা স্থির করিয়াছি আমরা কয়েক জনে মিলিয়া একটি সমাজ স্থাপন করিব।

আমাদের নিজের সম্মিলিত চেষ্টায় যথাসাধ্য আমাদের অভাব-মোচন ও কর্তব্য-সাধন আমরা নিজে করিব, আমাদের শাসনভার নিজে গ্রহণ করিব, যে-সকল কর্ম আমাদের স্বদেশীয়ের দ্বারা সাধ্য তাহার জন্য অন্যের সাহায্য লইব না। এই অভিপ্রায়ে আমাদের সমাজের বিধি আমাদের প্রত্যেককে একান্ত বাধ্যভাবে পালন করিতে হইবে। অন্যথা করিলে সমাজবিহিত দণ্ড স্বীকার করিব।

সমাজের অধিনায়ক ও তাহার সহায়কারী সচিবগণকে তাঁহাদের সমাজনির্দিষ্ট অধিকার অনুসারে নির্বিচারে যথাযোগ্য সম্মান করিব।

বাঙালী মাত্রেই এ সমাজে যোগ দিতে পারিবেন।

সাধারণত ২১ বৎসর বয়সের নীচে কাহাকেও গ্রহণ করা হইবে না।

এ সভার সভ্যগণের নিম্নলিখিত বিষয়ে সম্মতি থাকা আবশ্যক।

১। আমাদের সমাজের ও সাধারণত ভারতবর্ষীয় সমাজের কোনো প্রকার সামাজিক বিধিব্যবস্থার জন্য আমরা গবর্মেন্টের শরণাপন্ন হইব না।

২। ইচ্ছাপূর্বক আমরা বিলাতি পরিচ্ছদ ও বিলাতি দ্রব্যাদি ব্যবহার করিব না।

৩। কর্মের অনুরোধ ব্যতীত বাঙালীকে ইংরেজিতে পত্র লিখিব না।

৪। ক্রিয়াকর্মে ইংরেজি খানা, ইংরেজি সাজ, ইংরেজি বাদ্য, মদ্যসেবন এবং আড়ম্বরের উদ্দেশে ইংরেজ-নিমন্ত্রণ বন্ধ করিব। যদি বন্ধুত্ব বা অন্য বিশেষ কারণে ইংরেজ-নিমন্ত্রণ করি, তবে তাহাকে বাঙলা রীতিতে খাওয়াইব।

৫। যতদিন না আমরা নিজে স্বদেশী বিদ্যালয় স্থাপন করি ততদিন যথাসাধ্য স্বদেশীচালিত বিদ্যালয়ে সন্তানদিগকে পড়াইব।

৬। সমাজস্থ ব্যক্তিগণের মধ্যে যদি কোন প্রকার বিরোধ উপস্থিত হয় তবে আদালতে না গিয়া সর্বাগ্রে সমাজনির্দিষ্ট বিচারব্যবস্থা গ্রহণ করিবার চেষ্টা করিব।

৭। স্বদেশী দোকান হইতে আমাদের ব্যবহার্য দ্রব্য ক্রয় করিব।

৮। পরস্পরের মধ্যে মতান্তর ঘটিলেও বাহিরের লোকের নিকট সমাজের বা সামাজিকের নিন্দাজনক কোনো কথা বলিব না।[৪৯]

এই দীর্ঘ সংবিধানে সমাজের কার্যপ্রণালীর খুঁটিনাটি, এমন-কি কর প্রদানের ব্যবস্থাদিও অন্তর্ভুক্ত ছিল।

স্বদেশী সমাজের কাজ কতদূর এগিয়েছিল বলা মুশকিল, কিন্তু রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধ সম্বন্ধে তীব্র প্রতিক্রিয়া দেখা যায়। ২৭ শ্রাবণ [বৃহ 11 Aug] সঞ্জীবনী-তে একটি দীর্ঘ প্রবন্ধ লিখে কৃষ্ণকুমার মিত্র তাঁর বক্তব্যের সমালোচনা করেন : 'রবীন্দ্রবাবুর ন্যায় একজন শিক্ষিত লোকও রাজশক্তি, সমাজশক্তি ও আমাদের সামাজিক অবস্থা সম্বন্ধে অজ্ঞতা প্রকাশ করিতে পারেন, এবং আকাশকুসুম রচনা করিয়া তাহারই পশ্চাতে ধাবিত হইবার জন্য আহ্বান করিতে পারেন, ইহাই আশ্চর্যের বিষয়।'[৪৯ক] ভাদ্র-সংখ্যা ভারতী-র 'সাময়িক কথা'-য় 'আজ্ঞানুবর্তিতা ও ভক্তি' প্রবন্ধে [পৃ ৫০৯-১৪] সরলা দেবী মোটামুটি অনুকূল মনোভাব প্রদর্শন করলেও শ্রাবণ-সংখ্যা প্রবাসী-তে '"স্বদেশী সমাজ"—ব্যাধি ও চিকিৎসা' প্রবন্ধে [পৃ ২২১-৩৬] বিশিষ্ট কংগ্রেসী পৃথ্বীশচন্দ্র রায় [1870-1928] রবীন্দ্রনাথের রাজনৈতিক ও সমাজনৈতিক মতামতকে 'দেশের পক্ষে বিশেষ অনিষ্টকর ও নানা দোষে দুষ্ট' বলে সমালোচনা করেন। অতঃপর বিতর্কটিকে অগ্রসর করে নিয়ে যান অন্যেরা। সমালোচনী-র আশ্বিন-সংখ্যায় 'ব্যাধি ও তাহার প্রতীকার' [পৃ ১৬৬-৭১] প্রবন্ধে যতীন্দ্রমোহন গুপ্ত ও ভারতী-র আশ্বিন-সংখ্যায় জ্যোতিরিন্দ্রনাথ 'আবেদন, না আত্মচেষ্টা?' [পৃ ৫৮৭-৯৮] প্রবন্ধে উক্ত সমালোচনার বিরোধিতা করেন। ভারতী-র কার্তিক-সংখ্যায় 'স্বদেশী সমাজ ব্যাধি ও চিকিৎসা' [পৃ ৭১৯-২৩] প্রবন্ধে পৃথ্বীশচন্দ্র তাঁর পক্ষ সমর্থন করার চেষ্টা করেন। 'স্বদেশী সমাজ' নামক যতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের একটি কঠোর সমালোচনা বৈশাখ ১৩১২-সংখ্যা নব্যভারত-এ [পৃ ২৭-৪৭] মুদ্রিত হয়। পাদটীকায় লেখা হয় : 'এই প্রবন্ধটী প্রকাশ করিতে বঙ্গদর্শনের সম্পাদক মহাশয়কে অনুরোধ করা হইয়াছিল, তিনি ছাপাইতে অস্বীকৃত হওয়ায় ইহা নব্যভারতে প্রকাশিত হইল।' তিনি লেখেন : 'রবীন্দ্রনাথ তাঁহার এই সামাজিক প্রবন্ধ যুক্তির মৌক্তিক হারে গ্রথিত করিতে পারেন নাই। ইহার কাব্যাংশ এত অধিক যে ইহাকে একটি সামাজিক কবিতা বলিলেও চলে।'

বলাইচাঁদ গোস্বামী রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধ সম্পর্কে 'নিজের ব্যক্তিগত কৌতূহলনিবৃত্তির জন্য' নয়, 'হিন্দুসমাজনিষ্ঠ ব্যক্তিমাত্রেরই যে যে স্থানে সংশয় উপস্থিত হইতে পারে' সেগুলি সম্বন্ধে বঙ্গবাসী পত্রিকায় কয়েকটি প্রশ্ন উত্থাপন করেন। রবীন্দ্রনাথ সংক্ষিপ্ত প্রবন্ধাকারে যে উত্তর দেন তো উক্ত পত্রিকাতেই ছাপা হয়। 'কিন্তু "স্বদেশী সমাজ" প্রবন্ধের সহিত এই প্রবন্ধের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। সেজন্য অনেকের আগ্রহে ও অনুরোধে এবং ইহার স্থায়িত্বকল্পে উক্ত "স্বদেশী সমাজ' প্রবন্ধের পরিশিষ্টরূপে' আশ্বিন-সংখ্যা বঙ্গদর্শন-এ [পৃ ৩১২-১৮] মুদ্রিত ও পরে আত্মশক্তি গ্রন্থের [দ্র ৩।৫৫২-৫৮] অন্তর্ভুক্ত হয়। বঙ্গবাসী-র ফাইল বিলুপ্ত তাই বলাইচাঁদ গোস্বামীর প্রশ্নগুলি সঠিকভাবে জানা সম্ভব নয়, বঙ্গদর্শন-এ পুনর্মুদ্রণের ফলে রবীন্দ্ররচনাটি রক্ষা পেয়েছে।

প্রবন্ধটির প্রথমাংশ খানিকটা পুনরুক্তি। হিন্দুসমাজের দোষত্রুটির সংস্কারসাধনে ইংরেজ গবর্মেন্টকে আইন প্রণয়নের দায়িত্ব দিয়ে সমাজের শক্তি ও স্বাধীনতাকে ক্ষুণ্ণ করা হচ্ছে এই অংশে এইটিই নূতন কথা। শেষাংশে গোস্বামী মহাশয়ের দুটি প্রশ্নের উল্লেখ করে উত্তর দেওয়া হয়েছে। মূল প্রবন্ধে বাংলার শহরে ও গ্রামে যেসব মেলা অনুষ্ঠিত হয় সেগুলিকে কুৎসিৎ আমোদের পসরা করে না রেখে 'নূতন নূতন যাত্রা, কীর্তন, কথকতা রচনা করিয়া সঙ্গে বায়োস্কোপ, ম্যাজিকলণ্ঠন, ব্যায়াম ও ভোজবাজির আয়োজন'-এর দ্বারা লোকশিক্ষার সচল প্রদর্শনী করে তোলার পরামর্শ দেওয়া হয়েছিল। বলাইচাঁদ 'নূতন' কথাটির তাৎপর্য জানতে চাইলে রবীন্দ্রনাথ লেখেন : 'আমাদের যাত্রা-কথকতার অনেক শিক্ষা আছে, সে শিক্ষা আমরা ত্যাগ করিতে চাই না, কিন্তু তাহার উপরে নূতন করিয়া আরো-একটি কর্তব্য শিক্ষা দিতে হইবে। দেবতা সাধু পিতা গুরু ভাই ভৃত্যের প্রতি আমাদের কী কর্তব্য, তাঁহাদের জন্য কতদূর ত্যাগ করা যায়, তাহা শিখিব; সেই সঙ্গে সাধারণের প্রতি, দেশের প্রতি আমাদের কী কর্তব্য তাহাও নূতন করিয়া আমাদিগকে গান করিতে হইবে—ইহাতে কি কোনো পক্ষের বিশেষ শঙ্কার কারণ কিছু আছে?' রবীন্দ্রনাথ নিজে বালকবয়সে হিন্দুমেলার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হয়ে জাতীয় ভাবোদ্দীপক কবিতা ও গান পরিবেশন করেছিলেন, পরবর্তীকালে চারণকবি মুকুন্দদাস [1878-1934] স্বদেশী যাত্রা রচনা ও অভিনয় করে দেশাত্মবোধ প্রচার করেন।

বলাইচাঁদ সমুদ্রযাত্রা বিষয়ে যে প্রশ্ন তুলেছিলেন, 'পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিয়া পৃথিবীর পরিচয় হইতে বিমুখ হওয়াকে আমি ধর্ম বলি না' এইটুকু বলে রবীন্দ্রনাথ প্রশ্নটিকে এড়িয়ে গেছেন। তাঁর প্রবন্ধে হিন্দু-মুসলমানের ঐক্যের কথা প্রসঙ্গত এলেও তিনি স্বদেশী সমাজ গঠনের জন্য প্রধানত হিন্দুসমাজের দিকেই লক্ষ্য রেখেছিলেন। সুতরাং এই ধরনের স্পর্শকাতর ও বিতর্কিত সমস্যা এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করাই স্বাভাবিক। তিনি ভাষার ছটায় মুগ্ধ করে তলে তলে হিন্দুসমাজকে একাকার করে দেওয়ার মতলব এঁটেছেন, এমন সন্দেহ বঙ্গবাসী-র কোনো কোনো লেখক প্রকাশ করেছিলেন, সুতরাং তাঁকে অবশ্যই সতর্ক থাকতে হয়েছিল। গোঁড়া হিন্দুসমাজী ও রাজনীতিকদের বিরোধিতার জন্যই সম্ভবত স্বদেশী সমাজ পরিকল্পনার অপমৃত্যু হয়। ২১ ফাল্গুন ১৩২৬ [4 Mar 1920] অধ্যাপক বিপিনবিহারী গুপ্ত গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়কে সমাজের নেতা করার প্রসঙ্গ তুললে রবীন্দ্রনাথ বলেন . 'ভুল করেছিলুম, অন্যায় করেছিলুম; কিন্তু তখন ভেবেছিলুম যে গুরুদাসবাবু হোলেও চলে। আমি বলেছিলুম যে যা-কিছু করতে হবে, তা' সমাজের নিজের ভিতর থেকে করা চাই; অন্যে করে দেবে, অন্যের কাছ থেকে দানস্বরূপ কোনও বর গ্রহণ করতে হবে, তাতে আমাদের মঙ্গল হবে না। একথা বলায় আমি কি দোষ করেছিলুম জানি না; কিন্তু সঞ্জীবনী কাগজে আমার উপর যে অজস্র গালিবর্ষণ হোলো তা'তে আমি অবাক হ'য়ে গেলুম।'[৫০] সঞ্জীবনী-র ফাইলও প্রায় বিলুপ্ত, তাই গালির কারণগুলি জানা সম্ভব নয়—তবু মনে হয়, কংগ্রেসী রাজনীতির দৃষ্টিকোণ থেকে রবীন্দ্রনাথকে সমালোচনা করা হয়েছিল।

এই সমস্ত ব্যস্ততার মধ্যে বিদ্যালয় সম্পর্কে নূতন করে উদ্বিগ্ন হওয়ার কারণ ঘটল। আমরা আগেই বলেছি, মোহিতচন্দ্র অসুস্থ হয়ে আষাঢ়ের শেষে শান্তিনিকেতন থেকে চলে আসেন। কিছুদিনের মধ্যে তাঁর অসুস্থতা গুরুতর হয়ে ওঠে। মনোরমা চট্টোপাধ্যায়কে 29 Jul [শুক্র ১৪ শ্রাবণ]-এ লেখা প্রমথলাল সেনের একটি পত্রে এই অসুস্থতার বিবরণ পাওয়া যায় : 'কাল যে চিঠি লিখেছি তাতে মোহিতের কথা আছে। অসুখ খুবই হ'য়েছিল। গামলা গামলা রক্তবমি, হচ্ছিল। সেটা থেমেছে...এখন খুব দুর্ব্বল, তবে অনেকটা ভাল।...

সেবা শুশ্রূষার কোন ত্রুটি নেই। অল্পে২ ভালই হচ্ছেন। মোহিতের মার নাকি ঐ রকম একবার হয়েছিল। অসুখটায় খুব দুর্ব্বল করে দেয়, কিন্তু dangerous নয়।'[৫১] মোহিতচন্দ্র সাময়িকভাবে সুস্থ হয়ে ওঠেন, কিন্তু বিদ্যালয়ের কাজে যোগ দেওয়া আর সম্ভব হয়নি। রবীন্দ্রনাথ আশা করেছিলেন সুস্থ হয়ে মোহিতচন্দ্র সর্বাধ্যক্ষ পদে যোগ দেবেন, তাই শ্রাবণ ও ভাদ্র মাসের ২০০ টাকা মাসিক বেতন যথাসময়ে মিটিয়ে দিয়েছেন। ২৭ অগ্র° [12 Dec] মোহিতচন্দ্র যখন তাঁকে জানান 'আস্‌ছে মাস থেকে আমার City College-এ কাজ হয়েছে', তখন তাঁকে বকেয়া বেতন হিসেবে ৮০০ টাকা দেন। ব্রহ্মচর্যাশ্রমে যোগ দেওয়ার জন্য মোহিতচন্দ্র কলেজের চাকরি ছেড়ে দিয়েছিলেন, সুতরাং তাঁর ক্ষতিপূরণ করা স্বাভাবিক। কিন্তু অন্য অনেকে এইরূপ চাকরি ছেড়ে আসেন, তাঁদের বিদায় দেওয়ার সময়ে রবীন্দ্রনাথ এই বদান্যতা দেখাতে পারেননি, একথারও উল্লেখ থাকা দরকার।

শ্রাবণের শেষ দিকে রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনে যান। মোহিতচন্দ্র অসুস্থ, ভূপেন্দ্রনাথ সান্যাল ভাগলপুরে তাঁর স্বদেশী দোকানের দেনাপাওনা মেটাতে ব্যস্ত—সুতরাং বিদ্যালয়ের কাজকর্মে চূড়ান্ত অব্যবস্থা দেখা দিয়েছিল। 'বুধবার' [*11 Aug বৃহ ২৭ শ্রাবণ] সেই কথাই লিখেছেন মোহিতচন্দ্রকে : 'বিদ্যালয় নিয়ে ব্যস্ত আছি। অক্ষয় বাবু আজ পর্য্যন্ত অনুপস্থিত, নগেন্দ্র বাবু জ্বরে পড়েছেন। ছাত্ররা শাসনাভাবে উদ্ধত। আমার শরীর অপটু।...আগামী রবিবার গিরিধি পালানো স্থির করেছি—এখানকার কর্ম্ম ও চিন্তাভার সহ্য হবে না।'[৫২] দীনেশচন্দ্র সেনের এই দিনই শান্তিনিকেতনে আসার কথা ছিল, তাঁকেও 'শুক্রবার' [*12 Aug] গিরিডি যাওয়ার কথা লিখেছেন। কিন্তু হাইকোর্টে জুরির দায়িত্ব পালনের আহ্বান আসাতে তাঁকে পরিকল্পনা বদলাতে হল, 'শনিবার' দীনেশচন্দ্রকে লিখলেন : 'সম্ভবত আপনি আজ বোলপুরে রওনা হবেন না—না হলেই ভাল, কারণ জুরির আকর্ষণে কাল রবিবারে আমাকে কলকাতায় যেতেই হচ্চে। যদি এ পত্র সেখানে পান অপরাহ্নে দেখা করবেন।'[৫৩]

৩০ শ্রাবণ [রবি 14 Aug] রবীন্দ্রনাথ কলকাতায় আসেন, ঐ দিনই যান পার্শিবাগানে জগদীশচন্দ্রের কাছে, ৩১ শ্রাবণ যান 'মোহিত বাবুর বাটী', ৩২ শ্রাবণ তাঁর 'লোয়ার সার্কুলার রোড হইতে আসিবার' হিসাব পাওয়া যায়। কিন্তু হাইকোর্টে যাওয়ার কোনো হিসাব নেই, তবে কি অসুস্থতার কারণ দেখিয়ে তিনি জুরির দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি পেয়েছিলেন?

১ ভাদ্র [বুধ 17 Aug] 'শ্রীযুক্ত কর্ত্তাবাবু মহাশয়ের আদেশ মত গিরিডী গমন জন্য' রবীন্দ্রনাথকে সরকারী ক্যাশ থেকে ১০০ টাকা দেওয়া হয়। সম্ভবত এই দিনই তিনি গিরিডি রওনা হন। ভাদ্র-সংখ্যা সাহিত্য-তে 'বিবিধ' [পৃ ৩৩১] বিভাগে খবর দেওয়া হয়েছে : 'শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর স্বাস্থ্যলাভের উদ্দেশে গিরিডিতে গিয়াছেন। রবীন্দ্র বাবু, তাঁহার সুহৃৎ, প্রসিদ্ধ ঔপন্যাসিক শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র মজুমদারের আতিথ্য গ্রহণ করিয়াছেন।'

আমরা আগেই বলেছি, ভাদ্র-সংখ্যা বঙ্গদর্শন [৪।৫] প্রকাশিত হয়েছিল অনেক পূর্বে 2 Aug [মঙ্গল ১৮ শ্রাবণ]। এই সংখ্যায় রবীন্দ্রনাথের রচনা দুটি :

২৩৮-৬৫ 'স্বদেশী সমাজ' দ্র আত্মশক্তি ৩।৫২৬-৫২

২৬৫-৭২ 'নৌকাডুবি' ৪২-৪৩ দ্র নৌকাডুবি ৫।৩১৩-২০ [৩৯-৪০]

সঙ্গীত-প্রকাশিকা, ভাদ্র ১৩১১ [৩/১২] :

২৩০-৩২ মিশ্র কেদারা-একতালা। যাদের চাহিয়া তোমারে ভুলেছি দ্র স্বর ৪

কাঙালীচরণ সেন গানটির স্বরলিপিকার।

বেঙ্গল লাইব্রেরির ক্যাটালগ অনুযায়ী 17 Aug [বুধ ১ ভাদ্র] প্রকাশিত হয় বঙ্গবাসী কার্যালয় থেকে হরিমোহন মুখোপাধ্যায়-সম্পাদিত 'বঙ্গভাষার লেখক। প্রথম ভাগ' নামক মূল্যবান গ্রন্থটি। চার টাকা দামের ১০০৮ পৃষ্ঠার [মুদ্রণসংখ্যা ৪০০০] এই বৃহৎ গ্রন্থটিতে বহু বাঙালি সাহিত্যিকের জীবনী সংকলিত হয়, অনেকে তাঁদের আত্মজীবনীও লিখে দেন। এর মধ্যে 'রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : আত্মকথা' [দ্র আত্মপরিচয় ২৭। ১৮৯-২০৬] মুদ্রিত হয় ৯৬৪-৮৬ পৃষ্ঠায়। রবীন্দ্রনাথ কখন প্রবন্ধটি রচনা করেছিলেন বলা শক্ত। কাব্যগ্রন্থ সংকলন করতে গিয়ে নিজের কাব্যরচনার সুদীর্ঘ ধারার সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়েছিল, এই প্রবন্ধটির মধ্যে সেই আত্মপরিচয়ের অভিজ্ঞতাই ব্যক্ত হয়েছে :

আমার জীবনবৃত্তান্ত লিখিতে আমি অনুরুদ্ধ হইয়াছি। এখানে আমি অনাবশ্যক বিনয় প্রকাশ করিয়া জায়গা জুড়িব না। কিন্তু গোড়াতেই এ কথা বলিতেই হইবে, আত্মজীবনী লিখিবার বিশেষ ক্ষমতা বিশেষ লোকেরই থাকে, আমার তাহা নাই। না থাকিলেও ক্ষতি নাই, আমার জীবনের বিস্তৃত বর্ণনায় কাহারো কোনো লাভ দেখি না।

সেইজন্য এ স্থলে আমার জীবনবৃত্তান্ত হইতে বৃত্তান্তটা বাদ দিলাম। কেবল, কাব্যের মধ্য দিয়া আমার কাছে আজ আমার জীবনটা যেভাবে প্রকাশ পাইয়াছে, তাহাই যথেষ্ট সংক্ষেপে লিখিবার চেষ্টা করিব। ইহাতে যে অহমিকা প্রকাশ পাইবে সেজন্য আমি পাঠকদের কাছে বিশেষ করিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করি।

এরপর তিনি কবিতা ও পুরাতন পত্র থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে নিজের কাব্য ও কবিপ্রকৃতির লক্ষণসমূহ বিচার করেছেন। মোহিতচন্দ্র-রচিত কাব্যগ্রন্থ-এর ভূমিকা এবং এই আত্মকথার বক্তব্য ও লক্ষ্য একই, পূর্বে রচিত হলে স্বচ্ছন্দে উক্ত গ্রন্থের ভূমিকা রূপে প্রবন্ধটিকে ব্যবহার করা যেত।

কিন্তু এই নিরীহ প্রবন্ধটিই কয়েকমাস পরে কবি ও নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলাল রায়কে উত্ত্যক্ত করে তোলে। যথাস্থানে সেই প্রসঙ্গ আলোচিত হবে।

'বঙ্গভাষার লেখক' প্রকাশের কয়েকদিন পরে 'হিতবাদির উপহার' 'রবীন্দ্র গ্রন্থাবলী' প্রকাশিত হয়। গত বছর ২ আশ্বিন [19 Sep 1903] এই বাবদে রবীন্দ্রনাথ ১৫০০ টাকা পেয়েছিলেন। বেঙ্গল লাইব্রেরির ক্যাটালগ অনুযায়ী গ্রন্থটির প্রকাশের তারিখ 29 Aug [সোম ১৩ ভাদ্র], মুদ্রণসংখ্যা ১০০০০, পৃষ্ঠাসংখ্যা ১৩০০ [১২৯০], মূল্য ১ টাকা ২ আনা। গ্রন্থটির আখ্যাপত্র :

হিতবাদির উপহার।/রবীন্দ্র গ্রন্থাবলী।/কলিকাতা।/৭০ নং কলুটোলা ষ্ট্রীট, হিতবাদী-কার্য্যালয় হইতে/ শ্রীঅশ্বিনীকুমার হালদার কর্ত্তৃক/মুদ্রিত ও প্রকাশিত।/১৩১১ সাল।

এই গ্রন্থাবলীতে রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প, উপন্যাস, গদ্য ও কাব্য নাট্য, গান ও প্রবন্ধপুস্তক অন্তর্ভুক্ত হয়। গল্পগুলি সংসার চিত্র [২৩টি গল্প, পৃ ১-১৫৪], সমাজ চিত্র [১৪টি গল্প, পৃ ১৫৫-২৫৭], রঙ্গ চিত্র [চিরকুমার সভা (পৃ ২৫৮-৩৫৬) ও ৪টি গল্প, পৃ ৩৫৬-৮৭] এবং বিচিত্র চিত্র [১৬টি গল্প, পৃ ৩৮৮-৫০৪] এই চারটি ভাগে মুদ্রিত হয়। চিরকুমার সভা এই প্রথম গ্রন্থাকারে মুদ্রিত হল, এখানে ভারতী-র পাঠ অবিকল অনুসৃত হয়েছে। অন্যান্য গ্রন্থগুলি হল : বৌ-ঠাকুরাণীর হাট [পৃ ৫০৫-৬১৬], রাজর্ষি [৬১৭-৭১২], নষ্টনীড় ['উপন্যাস' আখ্যায় প্রথম গ্রন্থাকারে মুদ্রিত পৃ ৭১৩-৫৫], রাজা ও রাণী [পৃ ৭৫৬-৮১২], বিসর্জ্জন [পৃ ৮১৩-৪৯], গোড়ায় গলদ [পৃ ৮৫০-৯০৩], চিত্রাঙ্গদা [পৃ ৯০৪-২০], বিদায়-অভিশাপ [পৃ ৯২১-২৬],

বৈকুণ্ঠের খাতা [পৃ ৯২৭-৪৮], মায়ার খেলা [পৃ ৯৫২-৬৮], গানের বহি [পৃ ৯৬৮-১০৫২], সমালোচনা [পৃ ১০৫৩-১১৩৬, 'কাব্যের উপেক্ষিতা' প্রবন্ধটি নূতন সংযোজিত], আলোচনা [পৃ ১১৩৭-৭১] ও য়ুরোপ-প্রবাসীর পত্র [পৃ ১১৭২-১২৯০]। এই তালিকা থেকে বোঝা যায়, কাব্যগ্রন্থ ও পুস্তিকাগুলি ছাড়াও বিবিধ প্রসঙ্গ, প্রকৃতির প্রতিশোধ, নলিনী, চিঠিপত্র, য়ুরোপযাত্রীর ডায়ারি, পঞ্চভূত এবং চোখের বালি এই গ্রন্থাবলীর অন্তর্ভুক্ত হয়নি।

গিরিডিতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথের স্বাস্থ্য মোটের উপর ভালো ছিল। ৫ ভাদ্র [রবি 21 Aug] মোহিতচন্দ্রকে খবরটি দিয়ে তিনি ওয়ার্কসপের জন্য একজন ওভারসিয়র পাওয়ার সম্ভাবনার কথা লিখেছেন। এই চিঠির শেষে লেখেন: 'বোলপুরে শুনিলাম ২।৩টি ছাত্রের জ্বর হইয়াছে। ছুটি পর্য্যন্ত কাটিয়া গেলে বাঁচা যায়।'[৫৪] বাঁচা যায়নি, এই জ্বরেই বরিশালের বিশিষ্ট জননেতা ও গিরিডির অভ্র-ব্যবসায়ী মনোরঞ্জন গুহঠাকুরতা [1858-1919]র পুত্র বিদ্যালয়ের ছাত্র যোগরঞ্জনের শান্তিনিকেতনে ১০ ভাদ্র [শুক্র 26 Aug] তারিখে মৃত্যু হয়। এই ঘটনার ফলে অনেক অভিভাবক উদ্বিগ্ন হয়ে তাঁদের সন্তানদের বাড়ি নিয়ে যান। অক্ষয়চন্দ্র সরকার যথারীতি এই বিষয়ে রবীন্দ্রনাথকে পত্রাঘাত করেন। যার ফলে তাঁকে কৈফিয়ৎ দিয়ে ২০ ভাদ্র [সোম 5 Sep] রবীন্দ্রনাথ একটি দীর্ঘ পত্র লেখেন :

> শ্রীযুক্ত মনোরঞ্জন গুহ মহাশয়ের পুত্র যোগরঞ্জন পাঁচ দিন জ্বর ভোগ করিয়া বিদ্যালয়ে মারা গিয়াছে। মনোরঞ্জনবাবু তাঁহার পুত্রের মৃত্যুর তিন দিন পূর্ব্বেই সংবাদ পাইয়া সেখানে গিয়াছিলেন। তিনি গিরিডিতেই এখন আছেন। তিনি বারবার আমাকে বলিয়াছেন বিদ্যালয়ে তাঁহার পুত্রের চিকিৎসা ও শুশ্রূষার যেরূপ ব্যবস্থা হইয়াছিল এরূপ বাড়িতে হওয়াও কঠিন। পূজার ছুটির পর তাঁহার অন্য ছেলেটিকেও [দেবরঞ্জন] তিনি বিদ্যালয়ে পাঠাইতে প্রস্তুত আছেন। জ্বর সহসা এত কঠিন হইয়া উঠিবে তাহা ডাক্তাররাও কল্পনা করিতে পারেন নাই—অতএব কেন যে পীড়া এমন সাংঘাতিক হইয়া উঠিল তাহা আমি বলিতে পারি না। বিদ্যালয়ের অন্যতম অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ, এল, এম, এস, ডাক্তার, তিনিও বিস্মিত হইয়াছেন।...পূজার ছুটির পর বিদ্যালয়ের সঙ্গে একটি ডাক্তারখানা ও একজন উপযুক্ত প্রবীণ ডাক্তার নিযুক্ত করিবার চেষ্টা করিতেছি। বোলপুরে অ্যাসিস্টাণ্ট সার্জ্জন আছেন, ছাত্রদের পীড়া কিছু গুরুতর হইলে এখন তাঁহাকেই ডাকা হয়। ইহার বেশি কিছু করা আমার পক্ষে আমার বর্ত্তমান অবস্থায় একেবারে অসাধ্য।
>
> রোগতাপমৃত্যু আমাদের বিদ্যালয়কে একেবারে ক্ষমা করিবে এমন আশা করা যায় না।...ইতিমধ্যে দীনেশবাবু বিদ্যালয়ে গিয়াছিলেন তিনিও লিখিয়াছেন বোলপুরে তিনি উদ্বেগজনক কিছুই দেখেন নাই—অভিভাবকেরা ব্যস্ত হইয়া ছাত্রদের অনিষ্ট করিতেছেন। অবশ্য, আমি অভিভাবকদের দোষ দিই না—উৎকণ্ঠা জন্মিবারই কথা—কিন্তু বিদ্যালয়ের পক্ষে কোনো ত্রুটি না থাকিলেই আমি নিশ্চিন্ত হই।[৫৫]

বিদ্যালয়ের এই সংকটজনক অবস্থায় রবীন্দ্রনাথ বা মোহিতচন্দ্র সেখানে উপস্থিত হয়ে প্রত্যক্ষভাবে সুব্যবস্থা না করে দূরে বিশ্রাম গ্রহণ করছেন, এ নিয়ে হয়তো অক্ষয়চন্দ্রের পত্রে কোনো কটাক্ষ ছিল। ক্ষুব্ধ রবীন্দ্রনাথ প্রত্যুত্তরে লিখেছেন : 'মোহিতবাবু পীড়িত—আমার শরীর এমন অবস্থায় আসিয়াছে যে ইহাকে কাজে জুতিয়া কষাঘাত করিলে এবার এ নিতান্তই শুইয়া পড়িবে। আমি আমার কর্ম্মের উপযুক্ত বল সংগ্রহ করিয়া পূজার পর হইতে স্থায়িভাবে নিজেকে বিদ্যালয়ে প্রতিষ্ঠিত করিবার অভিপ্রায়েই এবারে নানা কর্ম্ম ফেলিয়া এখানে আসিয়াছি—আবার যদি আমাকে ছুটিতে হয় তবে এখানে যেটুকু লাভ করিয়াছি তাহা খোওয়াইব এবং তাহার বেশিও কিছু লোকসান দেওয়া অসম্ভব নহে। আপনাকে বলা বাহুল্য নিজের স্বাস্থ্যকে আমি নিজের জন্য বেশি মনে করি না—যখন দুই একটা কাজের ভার লইয়াছি তখন শরীরটাকে যেমন করিয়া হৌক্ খাড়া করিয়া লইতে হইবে, এই মনে করিয়াই এখানে এখনো অবিচলিত হইয়া বসিয়া আছি। অচুর [অচ্যুতচন্দ্র] সম্বন্ধে আপনার যদি উদ্বেগ জন্মে তবে আশ্চর্য্য হইব না—কারণ, সন্তানস্নেহ আমার অবিদিত

নাই। অধ্যাপনা বা স্বাস্থ্য সম্বন্ধে আপনার যদি দুশ্চিন্তার কারণ ঘটিয়া থাকে তবে অসঙ্কোচে যথাকর্ত্তব্য করিবেন। আপনাকে বারম্বার আশ্বাস দেওয়া আমি সঙ্গত মনে করি না।' এর আগে সতীশচন্দ্রের মৃত্যু হলে যখন বিদ্যালয় শিলাইদহে স্থানান্তরিত করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় তখনও অক্ষয়চন্দ্র নানাধরনের অভিযোগ তুলেছিলেন; রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন : 'যদি অচ্যুতকে শিলাইদহে পাঠাইতে আপত্তি বোধ করেন রমণীকে লিখিয়া পাঠাইবেন।' স্বেচ্ছাবৃত আদর্শের দায় অনেক দুঃখ-কষ্ট-আত্মত্যাগের মধ্য দিয়ে রবীন্দ্রনাথকে আজীবন বহন করতে হয়েছে, সেখানে এই ধরনের সহানুভূতির অভাবে উৎপীড়িত বোধ করা অস্বাভাবিক নয়।

দীনেশচন্দ্র সেনকে একই দিনে লেখা চিঠিতে তিনি এই পত্রের কথা উল্লেখ করেছেন। তাতে তিনি লিখেছেন: 'বিদ্যালয় সম্বন্ধে আমি কিছুমাত্র উদ্বিগ্ন হই নাই। ছুটি দিবার জন্যও তাড়াতাড়ি করি নাই। মোহিতবাবু অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত হইয়া একেবারে হাল-ছাড়া গোছের এক চিঠি আমাকে লিখিয়াছিলেন।... মনোরঞ্জনবাবু এখানেই আছেন—তাঁহার সঙ্গে প্রত্যহই আমার দেখা হয়।'[৫৬]

১৭ ভাদ্র [শুক্র 2 sep] তারিখে এইরূপ একটি সাক্ষাৎকারের বিবরণ রথীন্দ্রনাথ তাঁর ডায়ারিতে লিখে রেখেছিলেন [দ্র পিতৃস্মৃতি। ২৭৩-৭৪]। কিন্তু গ্রন্থে তারিখ আছে—১৭ শ্রাবণ ১৩১০ [২ অগস্ট ১৯০৩—যা অবশ্যই ভুল; রবীন্দ্রনাথ উক্ত তারিখে আলমোরায় ছিলেন, ১৭ শ্রাবণ ১৩১১-তে ছিলেন কলকাতায় তখনও যোগরঞ্জনের মৃত্যু হয়নি। রথীন্দ্রনাথ লিখেছেন : 'মনোরঞ্জনবাবুর ছেলে যোগরঞ্জন শুক্রবার দিন বিদ্যালয়ে মারা গেছে। মনোরঞ্জনবাবু তাঁর ছোটো ছেলে দেবরঞ্জনকে নিয়ে আজ সকালে এসেছেন। আমরা সকলে তাঁর বাড়িতে গেলুম। Spiritualism সম্বন্ধীয় অনেক ঘটনা ও গল্প শোনা গেল।...বিকেলে মনোরঞ্জনবাবু এলেন। বাবার সঙ্গে অন্য কথা হতে হতে ধর্মের কথা উঠল।'[৫৭] এরপর রথীন্দ্রনাথ পিতার কথার অনুলিখন করেছেন। শ্রীশচন্দ্র মজুমদারের বাসার পার্শ্ববর্তী বাংলোতে রবীন্দ্রনাথ থাকতেন। রথীন্দ্রনাথ লিখেছেন : 'সেখানকার বাসিন্দাদের মধ্যে মনোরঞ্জন গুহঠাকুরতা, ভি. রায়, শশিভূষণ বসু প্রভৃতি যখন দেখা করতে আসতেন তখন প্রায়ই নানা বিষয়ে আলোচনা চলত, সহপাঠী সন্তোষচন্দ্র মজুমদার ও আমি ঘরের এক কোণে বসে আবিষ্টমনে শুনতুম ও খাতায় নোট লিখে রাখতুম।' 'মেয়েদের অধিকার' শীর্ষক দ্বিতীয় যে অনুলিখনটি রথীন্দ্রনাথ প্রকাশ করছেন, সেটির তারিখ ২ বৈশাখ ১৩১২ [শনি 15 Apr 1905]—রবীন্দ্রনাথ তখন শান্তিনিকেতনে।

গিরিডিতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথের স্বাস্থ্যের যথেষ্ট উন্নতি হয়েছিল। ২৬ ভাদ্র [রবি 11 Sep] তিনি মোহিতচন্দ্রকে লিখেছেন : 'আমি তদিব্য সুস্থ আছি—এরূপ ঘটনা আমার ইতিহাসে স্মরণীয় দিনের মধ্যে ঘটে নাই।'[৫৮] তিনি স্বাস্থ্যোদ্ধারের জন্য মোহিতচন্দ্রকেও গিরিডিতে আহ্বান করেন, মোহিতচন্দ্র সেই আমন্ত্রণ রক্ষা করেন। এই চিঠিতে তিনি লেখেন : 'আগামী সোমবারে যতী ত্রিপুরার মধ্যম রাজকুমারকে লইয়া এখানে আসিতেছেন—তাঁহাদের জন্য একটি বাড়ি ঠিক করিয়াছি।' যতীন্দ্রনাথ বসু ব্রজেন্দ্রকিশোর দেববর্মাকে নিয়ে গিরিডি যান ২৭ ভাদ্র [সোম 12 Sep]। ব্রজেন্দ্রকিশোর সানন্দে এই ভ্রমণের স্মৃতিচারণ করেছেন :

সারাদিনই বল্‌তে গেলে কবি ইংরাজী বাংলা বইয়ের অংশ বিশেষ পাঠ বা আবৃত্তি করে সকলকেই মুগ্ধ করে রাখতেন। এর ওপর তাঁর গল্প বলার ভঙ্গি ও গান যাঁরা শুনেছেন—তাঁরাই জানেন সে কি অপরূপ এবং মাদকতা মাখানো। আমাদের অবস্থান সময়েই কবির বিখ্যাত "শিবাজী" কবিতা লেখা হয়েছে [কথাটি ঠিক নয়, 'শিবাজী উৎসব' লেখা হয় ১১ ভাদ্র]—আবৃত্তি করে আমাদের সকলকে শুনিয়েছেন ও সেটি বঙ্গদর্শনে ছাপবার জন্য দিয়েছিলেন। ছাপা হয়ে যেদিন এলো—...অমন মাটির মানুষ—কেন এবং কেমন করে হঠাৎ অমন রেগে গেলেন। ব্যাপার হলো, ছাপায় কোথায় একটি 'আ'-কার বেশী পড়ে গিয়েছিলো। বন্ধুবর শ্রীশচন্দ্রকে অনেক কিছু শুনতে হলো—তিনি চুপ।...

...হঠাৎ মোহিত সেন ম'শায় এসে হাজির।...তাঁকে অসময়ে দেখেই কবি কেন যেন সন্দিগ্ধ হলেন। সকলের সঙ্গে খেতে বস্‌লেও কবি নিজে তাঁর গায়ে হাত দিয়ে বল্‌লেন 'সর্ব্বনাশ, জ্বর হয়েছে—কলকাতার বাড়ীতে খেতে দেয়নি বলে এখানে পালিয়ে এসেছেন'—ভাত খেতে দিলেন না—রুগীর পথ্য ব্যবস্থা হলো। কবি বেশ রসিয়ে রসিয়ে মোহিতবাবুর খাওয়ার প্রতি অত্যধিক প্রীতির কথা সকলকে জানিয়ে দিলেন। বেচারা অধ্যাপক মুখ নীচু করে বসে রইলেন, কোনো কথাই বল্‌লেন না।...

কবির সঙ্গে বেড়ানো—গিরিডিতে—আর এক আনন্দ।...পদ-যাত্রাকে তিনিই স-রব করে রাখ্‌তেন। আশে পাশের গাছগাছড়া, মাটির কথা—ফুল-পাতা, পাখী কারো কথা বলতে বাদ দিতেন না—চল্‌তে চল্‌তে।...ছোট হলেও "উশ্রী"-প্রপাতটি সকলকে খুবই আকর্ষণ করে। কবি তার নব-নামকরণ করলেন 'অশ্রু'—তারই বা কত ব্যাখ্যা।[৫৯]

মহারাষ্ট্রীয় সখারাম গণেশ দেউস্কর [1869-1912] টিলকের শিবাজী-উৎসব আন্দোলনকে বাংলাদেশে প্রবর্তিত করেছিলেন। আষাঢ় ১৩১০-এ এই উৎসব উপলক্ষে কলিকাতা শিবাজী-উৎসব-সমিতি তাঁর 'শিবাজী মহত্ত্ব' নামের ২০ পৃষ্ঠার একটি পুস্তিকা মুদ্রিত করে বিনামূল্যে বিতরণ করে। এই বৎসরেও 'শিবাজী দীক্ষা' নামে তিনি একটি প্রবন্ধ লেখেন এবং রবীন্দ্রনাথকে অনুরোধ করেন এই উপলক্ষে একটি কবিতা লিখে দিতে। সাধনা-র যুগ থেকেই তাঁর সঙ্গে রবীন্দ্রনাথে যোগসূত্র গড়ে উঠেছিল, নানা উপলক্ষে তিনি আর্থিক সাহায্যও পেয়েছেন ক্যাশবহিতে তার উল্লেখ পাওয়া যায়। রবীন্দ্রনাথ তাঁর অনুরোধ রক্ষা করে ১১ ভাদ্র [শনি 27 Aug] বিখ্যাত 'শিবাজী-উৎসব' কবিতাটি লিখে দেন। এই দিন তিনি দীনেশচন্দ্র সেনকে লিখেছেন : 'আজ দেউস্কর মহাশয়ের বৈদ্যুত তাড়নায় শিবাজিউৎসব সম্বন্ধে একটা কবিতা লিখিয়া পাঠাইলাম। যদি সুবিধা পান তবে তাহার এক কপি শৈলেশের কাছ হইতে লইয়া দেখিবেন।'[৬০] 'শিবাজীর দীক্ষা' 7 Sep [বুধ ২২ ভাদ্র] প্রকাশিত হয়। সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে শিবাজী উৎসব অনুষ্ঠিত হয় ৩১ ভাদ্র [শুক্র 16 Sep] তারিখে, সেইদিন পুস্তিকাটি বিনামূল্যে বিতরিত হয়। এছাড়াও আশ্বিন-সংখ্যা বঙ্গদর্শন [পৃ ৩১৮-২৩] ও ভারতী-তে [পৃ ৫৮০-৮৬] কবিতাটি পুনর্মুদ্রিত হয়। 27 Sep 1905 [১১ আশ্বিন ১৩১২]-এ প্রকাশিত 'স্বদেশ' গ্রন্থভুক্ত হলেও নানা গ্রহণ-বর্জনের ফলে কবিতাটি বিশ্বভারতী-সংস্করণ রবীন্দ্র-রচনাবলী-তে সংকলিত হয়নি। অবশ্য সঞ্চয়িতা-য় ও শতবার্ষিক বা পশ্চিমবঙ্গ সরকার-প্রকাশিত রবীন্দ্ররচনাবলী-তে কবিতাটি পাওয়া যাবে।

১১ ভাদ্রতেই রবীন্দ্রনাথ দীনেশচন্দ্রকে লেখেন...'এখানে আসিয়া অবধি রচনাকার্য্য যে বিশেষ অগ্রসর হইতেছে তাহা বলিতে পারি না। এখনো আমার কল্পনাশক্তি প্রসুপ্ত আছে।' চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় কাশীতে সাহিত্য-পরিষদের শাখার উদ্বোধন উপলক্ষে রবীন্দ্রনাথকে একটি গান লিখে দেবার অনুরোধ জানালে তিনি *12 Sep [সোম ২৭ ভাদ্র] তাঁকে লেখেন : 'বীণায় ওয়াড় পরাইয়া দেয়ালে লটকাইয়া রাখিয়াছি এখন গানের প্রস্তাব করিবেন না—দোহাই আপনার। একটি সরস্বতীর বন্দনা গান আমার গীত সংগ্রহে দেখিতে পাইবেন—/"মধুর মধুর ধ্বনি বাজে/হৃদয়কমল বন মাঝে।" সেটাতেই যদি কাজ চালাইতে পারেন তবে উত্তম হয়।'[৬১] [চারুচন্দ্র তাঁর স্মৃতিকথায় ঘটনাটি ভুলভাবে উপস্থাপিত করেছেন দ্র রবিরশ্মি ২।৪৮২-৮৩]।

কিন্তু নৌকাডুবি-র কিস্তি বাদ রাখা সম্ভব ছিল না। তাই ২০ ভাদ্র [সোম 5 Sep] দীনেশচন্দ্রকে লিখেছেন: 'এবারে "নৌকাডুবি" লেখা শেষ না করিয়া জলগ্রহণ করিব না। আশ্বিন ও কার্ত্তিক মাসের লেখা শৈলেশের কাছে পাঠাইয়াছি। অঘ্রাণেরটাতে হাত দিয়াছি। মনে হইতেছে মাঘ ফাল্গুন পর্য্যন্ত চলিতেও পারে—হয়ত বা এ বৎসরটা কাটিয়া যাইবে।'[৬২] আষাঢ় ১৩১২-সংখ্যায় নৌকাডুবি সমাপ্ত হয়।

কনিষ্ঠা কন্যা মীরা দেবীর বয়স এখন দশ বছর সাত মাস মাত্র। ২৮ শ্রাবণ [12 Aug] 'শমী মীরাকে পড়ান ও শেলাই শেখানোর জন্য মেম ঠিক' করতে দীনেশচন্দ্রকে তাগিদ দেওয়ার কয়েকদিন পরে ১১ ভাদ্র [শনি 27 Aug] তাঁকে লিখেছেন রবীন্দ্রনাথ : 'মীরার পাত্রসম্বন্ধে মোকাবিলায় আপনার সঙ্গে আলোচনা করিব'! পিতার জীবৎকালে শেষ কন্যাদায় থেকে মুক্ত হওয়ার ইচ্ছাটি খুবই বাস্তবজ্ঞানসম্পন্ন-কিন্তু কন্যার দুর্ভাগ্য বা সৌভাগ্যবশত উক্ত আলোচনা ফলপ্রসূ হয়নি। পিতার মৃত্যুর পর ২৩ বৈশাখ ১৩১২ [6 May 1905] রবীন্দ্রনাথ মোহিতচন্দ্রকে লেখেন : 'লাহোরের পাত্রটির কথা শঙ্কর পণ্ডিত আমার কাছে উত্থাপন করেছিলেন কিন্তু আমি তাতে কর্ণপাত করিনি কোনো পাত্রকে আমি বিলেতে পাঠাতে চাইও নে, পার্ব্বও না, —অতএব ঘোষালের আশা করবেন না।'[৬৩] কিন্তু দু'বছর পরে আমেরিকা পাঠানোর দাবী মেনে নিয়েই তাঁকে জামাতা সংগ্রহ করতে হয়েছিল।

নিবেদিতা, জগদীশচন্দ্র প্রভৃতি কয়েকজন বুদ্ধগয়ায় যাবার পরিকল্পনা করছেন, একথা রবীন্দ্রনাথ সম্ভবত গিরিডিতে থাকার সময়েই জানতে পেরেছিলেন। তিনিও সদলবলে এই ভ্রমণে যোগদান করতে উৎসাহিত হয়ে ওঠেন। শ্রীশচন্দ্র কিছুদিন আগে গয়াতেই ছিলেন। তাই তাঁর মাধ্যমে বুদ্ধগয়ায় থাকার জন্য তাঁবু ইত্যাদির ব্যবস্থা করে তিনি কলকাতায় ফেরার আয়োজন করেন। ত্রিপুরার মহারাজাও তাঁকে আহ্বান করেন কলকাতায় আসার জন্য। ৪ আশ্বিন [মঙ্গল 20 Sep] তিনি মহিমচন্দ্র দেববর্মাকে লেখেন; 'আমরা আগামী শনিবারে সকালের গাড়িতে রওনা হয়ে সন্ধ্যা আটটার সময় কলকাতায় পৌঁছব। রবিবার প্রাতে একবার জোড়াসাঁকোয় এসে আমার সঙ্গে দেখা করতে পারবে?'[৬৪] কিন্তু ক্যাশবহিতে তাঁর 'হাওড়ার ষ্টেসন হইতে আসিবার' হিসাব পাওয়া যায় ৯ আশ্বিন [রবি 25 Sep] তারিখে। ত্রিপুরার মহারাজা প্রতি মাসে ৫০ টাকা করে বিদ্যালয়কে সাহায্য করছিলেন, একথা আমরা আগেই বলেছি। কলকাতায় ফিরে রবীন্দ্রনাথ 'ত্রিপুরার মহারাজা খাতা'য় একটি হাজার টাকার নোট জমা দেন। সম্ভবত ব্রজেন্দ্রকিশোর মারফৎ মহারাজা এই টাকা অতিরিক্ত সাহায্য রূপে প্রেরণ করেছিলেন।

১১ আশ্বিন [মঙ্গল 27 Sep] কাব্যগ্রন্থ-এর অষ্টম ভাগ 'গান' প্রকাশিত হয়। গ্রন্থটির আখ্যাপত্র :

কাব্য-গ্রন্থ।/৮ম ভাগ।/গান।/শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।/শ্রীমোহিতচন্দ্র সেন এম্, এ,/সম্পাদক।

[পরপৃষ্ঠায়] প্রকাশক—এস্, সি, মজুমদার।/২০ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা,/মজুমদার লাইব্রেরী।/ কলিকাতা, ২০ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্,/দিনময়ী প্রেসে শ্রীঅনুকূলচন্দ্র পারিহাল দ্বারা মুদ্রিত।/১৩১০ সন।

পৃষ্ঠাসংখ্যা : ২ + ২ [অর্ধ-নামপত্র : গান।] + ২৬ [বর্ণানুক্রমিক সূচী] + ৩৩৮। মুদ্রণসংখ্যা : ১৪০০।

বিবিধ সঙ্গীত, বাল্মীকি প্রতিভা, জাতীয় সঙ্গীত ও ব্রহ্ম সঙ্গীত চারটি পর্যায়ে বিভক্ত গ্রন্থটিতে ৪৪৩টি গান আছে—ইন্দিরা দেবী-রচিত দুটি গান এবং 'আমার বিচার তুমি করো' ও 'এ ভারতে রাখো নিত্য প্রভু' গান দুটি দু'বার ছাপা হওয়ায়—মোট গানের সংখ্যা ৪৩৯।

আশ্বিন-সংখ্যা প্রবাসী-তে 'বিজ্ঞাপন'-এ লেখা হয় : '...কাব্যগ্রন্থ সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইয়াছে।...মূল্য আপাততঃ দশটাকা ধার্য্য হইয়াছে, পূজার পূর্ব্বে লইলে সাত টাকায় সমগ্র গ্রন্থ পাইবেন। খণ্ডে খণ্ডেও বিক্রয় হয়। মূল্য প্রতি খণ্ড ১ টাকা হইতে দেড় টাকার মধ্যে।/রবীন্দ্রবাবুর শিশু—(বোলকদের জন্য লিখিত কবিতা অনেক উৎকৃষ্ট নূতন কবিতা, ইহাতে আছে) মূল্য ১।০/রবীন্দ্রবাবুর গান ১।০-১॥০'।

আশ্বিন-সংখ্যা বঙ্গদর্শন [৪।৬] প্রকাশিত হয় 19 Sep [সোম ৩ আশ্বিন]। এই সংখ্যায় রবীন্দ্র-রচনা তিনটি :

৩১২-১৮ '"স্বদেশী সমাজ" প্রবন্ধের পরিশিষ্ট' দ্র আত্মশক্তি ৩।৫৫২-৫৮

৩১৮-২৩ 'শিবাজি উৎসব' দ্র পূরবী ২ [প. ব., ১৩৮৯]। ৭০৮-১২

৩২৩-৩৩ 'নৌকাডুবি' ৪৪-৪৫ দ্র নৌকাডুবি ৫।৩২১-২৮ [৪১-৪২]

'স্বদেশী সমাজ'-এর পরিশিষ্টটি ইতিপূর্বে বঙ্গবাসী-তে মুদ্রিত হয়েছিল।

ভারতী, আশ্বিন ১৩১১ [২৮।৬] :

৫৮০-৮৬ 'শিবাজী উৎসব' দ্র পূরবী ২ [প. ব.]। ৭০৮-১২

সঙ্গীত-প্রকাশিকা, আশ্বিন ১৩১১ [৪।১] :

৭-৯ পিলু-খেমটা। এসেছি গো এসেছি (মায়ার খেলা) দ্র স্বর ৪৮

১২-১৪ আসাবরি-কাওয়ালি। অনেক দিয়েছে নাথ দ্র স্বর ৪

২১-২২ ভৈরবী-চৌতাল। কেমনে ফিরিয়া যাও দ্র স্বর ৪

প্রথম গানটির স্বরলিপিকারের নাম উল্লেখ করা হয়নি, অপর দুটি গানের স্বরলিপি করেন কাঙালীচরণ সেন।

ত্রিপুরার মহারাজের আহ্বানে ও বুদ্ধগয়া ভ্রমণের আয়োজনে রবীন্দ্রনাথ ৯ আশ্বিন [রবি 25 Sep কলকাতায় আসেন, একথা আমরা পূর্বেই বলেছি। কিন্তু এখানে এসে মহারাজের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হয়নি। 'বৃহস্পতিবার' [১৩ আশ্বিন : 29 Sep] তিনি সুবোধচন্দ্র মজুমদারকে লেখেন : 'কলকাতায় এসে মহারাজের টেলিগ্রাম পাওয়া গেল যে তিনি মঙ্গলবার ছাড়বেন। মঙ্গলবারে টেলিগ্রাম পেলুম যে সেদিন তিনি আস্‌বেন না—আমি বিরক্ত হয়ে ঠিক করলুম বুধবার রাত্রেই আমি গিরিডি যাব। বুধবারে টেলিগ্রাম পেলুম—am indisposed, shall start after three days, will you kindly wait? কাজেই উত্তর দিতে হল যে shall wait। ইতিমধ্যে পার্টিশনের ব্যাপারে উত্তেজিত হয়ে আমার কাছে প্রত্যহই দলবেদলের লোক আস্‌চে, তারা ধরেছে এই সময়ে আমাদের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে আমাকে টাউনহলে বল্‌তে হবে। এই সমস্ত টানাছেঁড়ার মধ্যে আছি—শরীর যে ভাল আছে তা সত্যের অনুরোধে বল্‌তে পারিনে—কিন্তু ন যযৌ ন তস্থৌ।'[৬৫] একটি তারিখহীন পত্রে শ্রীশচন্দ্রকেও তিনি লিখেছেন: 'কলকাতায় যতকাল আছি তুমি আমার কাছে চিঠিপত্র প্রত্যাশা কোরো না। এখনো আমি লোষ্ট্র াহত মৌচাকের মাছির মত চঞ্চল হয়ে ভন্ ভন্ করে বেড়াচ্ছি। সকাল থেকে লোকের অবসর নেই।'[৬৬] কয়েকদিন পরের আর একটি চিঠি : 'আমার কথা আর বোলোনা। ইংরাজের রাজধানী আমার পোষাবেনা। এরি মধ্যে লোক লেগেছে—মধ্যাহ্নে [যদ্দৃষ্টং] ১টার সময় আহার, রাত্রে দশটার সময় নিষ্কৃতি—একে ঠিক স্বাস্থ্যরক্ষার উপায় বলা চলে না।'[৬৭]

বাড়িতে লোকের আনাগোনার খবর আছে এই চিঠিগুলিতে, বিভিন্ন লোকের বাড়িতে রবীন্দ্রনাথের যাতায়াতের সংবাদ পাওয়া যায় ক্যাশবহিতে। ১১ আশ্বিন [মঙ্গল 27 Sep] তিনি যান বাগবাজার, 'শৈলেশ মজুমদারের বাটী', 'জগদীশবাবুর বাটী', 'বাদুড়বাগান প্রভৃতি'; ১৩ ও ১৪ আশ্বিন পার্শিবাগান, ১৫ আশ্বিন

মজুমদার লাইব্রেরি ও বাগবাজার, ১৬ আশ্বিন হাটখোলা, ১৭ আশ্বিন বাগবাজার, ১৮ আশ্বিন মজুমদার লাইব্রেরি, ১৯ আশ্বিন বাগবাজার ও 'জগদীশ বসুর বাটী হইতে আসার', ২১ আশ্বিন পার্শিবাগান এবং ২২ আশ্বিন 'রমণীবাবুর বাটী'। ২২ আশ্বিনই [শনি ৪ Oct] তিনি সদলবলে বুদ্ধগয়া রওনা হন। এর আগে বহুবার তাঁর বাগবাজার ও পার্শিবাগানে যাওয়ার যে হিসাব পাওয়া যায়, তাতে মনে হয় বুদ্ধগয়ায় যাওয়া বিষয়ে পরামর্শাদি করার জন্য তিনি ঘন ঘন নিবেদিতা ও জগদীশচন্দ্রের কাছে গিয়েছিলেন। শ্রীশচন্দ্র মজুমদারকে তাঁর এই সময়ে লেখা তিনটি চিঠির প্রধান বিষয় বুদ্ধগয়া ভ্রমণ। একটি চিঠিতে লিখেছেন : 'আগামী ৭ই অক্টোবরে রাত্রে গয়াধামে প্রয়াণ করব।...নিবেদিতা যেই শুন্‌লেন আমরা তাঁবুর জোগাড় করে দিব্য আরামে থাকবার চেষ্টায় আছি অমনি বলে উঠলেন Oh, how nice! অর্থাৎ ওঁদের জন্যও তাঁবুর জোগাড় করে দেওয়া আবশ্যক।' এর মধ্যে মহর্ষির শরীর অসুস্থ হয়ে পড়ায় তাঁর যাওয়া কিছুটা অনিশ্চিত হয়ে পড়ে। শ্রীশচন্দ্রকে লিখলেন : 'বুধগয়ায় আমার যাওয়া ঘটে কিনা সন্দেহস্থল। পিতার শরীর অত্যন্ত উদ্বেগজনক হয়ে উঠেছে। যাই হোক্ ছেলেদের নিয়ে তোমরা যেয়ো। সিষ্টার নিবেদিতার ও জগদীশের সংসর্গে ও আলাপ আলোচনায় তাদের বিশেষ উপকার প্রত্যাশা করচি। নিবেদিতা ওদের জন্যে উৎসুক হয়ে আছেন। তিনি ওদের দুজনের ইতিহাস শিক্ষার ভার নিয়েছেন—সেইজন্যে এই উপলক্ষ্যে তিনি ওদের সঙ্গে আলাপ করে নিতে চান। বুধগয়ায় বসে তিনি ওদের ইতিহাসচর্চ্চার ভূমিকাস্থাপন করে দিতে পারবেন। যতী ও লালু [ব্রজেন্দ্রকিশোর দেববর্মা] যাবেন—মহারাজ লালুকে যেতে সম্মতি দিয়েছেন।/তাঁবুর বন্দোবস্ত তুমি করে রেখো। জনসংখ্যা নিম্নলিখিত মত : —জগদীশ, নিবেদিতা, জগদীশজায়া, সিস্টার ক্রিষ্টিন, লালু, যতী, সম্ভবতঃ আমি, তুমি, সন্তোষ ও রথী। সর্ব্বসমেত ৯।১০।' ১৯ আশ্বিন [বুধ 5 Oct] তিনি শ্রীশচন্দ্রকে নির্দ্দিষ্ট ভ্রমণসূচী জানিয়ে লিখেছেন : 'Howrah Kalka Through Passenger নামক যে গাড়িখানা সাড়ে চারটার সময় কলকাতা ছাড়ে ও রাত দেড়টার সময় মধুপুর পৌঁছয়—এবং কৌলে প্রাতঃকালে ছাড়িয়া গয়ায় পৌঁছয় মধ্যাহ্নে—সেই ট্রেনযোগে আমরা ছাড়চি। একটা পূরা গাড়ি রিজার্ভ করার কথা, সুতরাং কিউলে বদল করতে হবেনা। কিন্তু রথীদের পক্ষে সময়টা অসুবিধাজনক হবে না কি?...আমরা শনিবারে ছাড়ব—অতএব সেইদিনই রথীরা আমাদের ধরতে পারে...আমি বোধ হয় গয়াযাত্রায় যোগ দিতে পারব—কর্ত্তার শরীর একটু ভাল আছে।'[৬৮]

যাত্রার প্রাক্কালে সম্ভবত ২০ আশ্বিন [বৃহ 6 Oct] গগনেন্দ্রনাথের গৃহে যাত্রীদলের অনেকে ও কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তি একটি চা-পানসভায় মিলিত হন। ক্যাম্বেল মেডিক্যাল স্কুলের একজন ছাত্র শীতলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় [1879-?] তাঁর অশিক্ষিতপটুত্ব দিয়ে মর্মরপ্রস্তরে একটি লক্ষ্মীমূর্তি প্রস্তুত করেন, দীনেশচন্দ্র সেন তাঁর গুণগ্রাহী হয়ে বহু ধনী ব্যক্তির সঙ্গে ভাস্করের পরিচয় করিয়ে দেন। লক্ষ্মীমূর্তিটির প্রদর্শন এই চা-পানসভার অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল। দীনেশচন্দ্র লিখেছেন : 'কিছুদিন হইল শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের গৃহে টী-পার্টিতে কয়েকজন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। তন্মধ্যে ডাক্তার জগদীশচন্দ্র বসু, শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ষ্টেটসম্যান সপাদক র‍্যাটক্লিফ সাহেব, সিষ্টার নিবেদিতা, সিষ্টার ক্রিষ্টেন প্রভৃতি সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণের নিকট লক্ষ্মীমূর্ত্তিটি উপস্থিত করা হইয়াছিল। তাঁহাদের সকলেই নবীন ভাস্করের অশিক্ষিত পটুতা লক্ষ্য করিয়া বিশেষ প্রীতি প্রকাশ করিয়াছিলেন।'[৬৯] 7 Oct নিবেদিতা দীনেশচন্দ্রকে লেখেন :

In my opinion the marble statuette which you shewed us yesterday is full of promise and power. I had not expected anything half so good. For a first attempt we thought it quite remarkable....Mr. Abanindranath Tagore promised me yesterday

that he would give your friend the benefit of his own experience and advice and I know that Mr. Havell would be glad to do the same. As for myself I need hardly speak.[৭০]

রবীন্দ্রনাথও নিশ্চয়ই প্রশংসা করেছিলেন। এই প্রসঙ্গে আমরা ম্হাত্রের 'To the Temple' ভাস্কর্যটি সম্পর্কে তাঁর দুটি অপূর্ব প্রবন্ধের কথা স্মরণ করতে পারি।

২২ আশ্বিন [শনি ৪ Oct] মহালয়ার বিকেলে রবীন্দ্রনাথ সদলবলে বুদ্ধগয়া রওনা হন। তিনি শ্রীশচন্দ্রকে যে তালিকা দিয়েছিলেন, প্রকৃতপক্ষে যাত্রীদল তার চেয়ে বড় ছিল। ব্রজেন্দ্রকিশোরের স্মৃতি থেকে জানা যায় : 'কলিকাতায় কয়েকদিন অতিবাহিত করিয়া মহারাজকুমার তদীয় শিক্ষক মোক্ষদাকুমার বসুর সহিত বুদ্ধগয়ার পথে কবির সহযাত্রী হইলেন—আশ্বিনের শেষ সপ্তাহে। সঙ্গীদল বেশ বড়—...স্ব-পত্নীক আচার্য্য জগদীশচন্দ্র, ভগিনী নিবেদিতা, ঐতিহাসিক অধ্যাপক যদুনাথ সরকার, আনন্দমোহন বসুর দুই কন্যা, রথীন্দ্রনাথ, সন্তোষ মজুমদার প্রভৃতি। মহিম ঠাকুরও সঙ্গী হইয়াছিলেন তাঁহার মনে হয়। বৌদ্ধদের কি যেন মতদ্বৈধতা হইয়াছিল—তাহারই নিরসনের প্রয়াস এই যাত্রায়—মহারাজকুমারের ইহাই স্মরণে আসিতেছে।'[৭১]

বুদ্ধগয়া বৌদ্ধতীর্থ হলেও কয়েক শতাব্দী ধরে শৈব মহান্তের কর্তৃত্বাধীনে ছিল। সিংহলী বৌদ্ধ অনাগরিক ধর্মপাল এখানে বৌদ্ধকর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করলে তা নিয়ে উভয় পক্ষে সংঘর্ষ উপস্থিত হয়। ওকাকুরা যখন ভারতে এসেছিলেন, তখন জাপান সরকারের আর্থিক সহায়তায় এখানে একটি অতিথিশালা তৈরি করতে চেয়েছিলেন। মোহান্ত প্রথমে জমি দিতে চেয়েও পরে অস্বীকার করেন। শ্রীশচন্দ্র মজুমদারকে লেখা রবীন্দ্রনাথের কয়েকটি পত্রে বিষয়টির উল্লেখ আছে। নিবেদিতা মোহান্তের পক্ষ অবলম্বন করেছিলেন, লর্ড কার্জন নিরপেক্ষ ভূমিকা নিতে চাইলেও বৌদ্ধদের প্রতি তাঁর সমর্থন ছিল [দ্র কার্জনের 18 Jan 1903-এর গোপন মন্তব্য, *Letters of Sister Nivedita*, vol. 2 pp. 605-10]। নিবেদিতা এই ভ্রমণের আয়োজন করেছিলে মোহান্তের সঙ্গে বিশিষ্ট ব্যক্তিদের আলাপের মাধ্যমে তাঁদের প্রভাবিত করতে; 21 Sep [বুধ ৫ আশ্বিন] তিনি মিস ম্যাকলাউডকে লেখেন : 'I am trying to arrange a party for Bodh-Gaya, Oct. 8 to 14th. I shall be so thankful if the leaders of public opinion can be brought into personal contact with the Mohunt.'[৭২] ব্রজেন্দ্রকিশোর তাঁর স্মৃতিকথায় 'মতদ্বৈধতা' বলতে এই প্রসঙ্গটিকে বুঝিয়েছেন।

নিবেদিতার 15 Oct [শনি ২৯ আশ্বিন]-এর পত্রে তীর্থযাত্রী ও ভ্রমণের বিস্তৃত বর্ণনা আছে :

But we have been a party of 20 spending 4 days at Bodh-Gaya—in the Guest-House—and I think it has been an event in all our lives. The Boses were there—and 2 children, 4 in all. The Poet was there with his son and a friend—a prince with his tutor. 3 of my boys, a distinguished cholar and another friend, and Swami Sadananda and his nephew, also Christine. In the mornings we had tea by 6 and then readings—Light of Asia—Web of Indian life etc. Mahunt is like a King. Evenings—we went out after tea—to the Temple and Tree—House of Sujata and so on. We talked History, Nationality, Swamiji, Sri Ramkrishna and the rest.[৭৩]

পাটনা কলেজের ইংরেজির অধ্যাপক প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক যদুনাথ সরকার [1870-1958] আমন্ত্রিত হয়ে এই দলে যোগ দেন। তিনিও অতিথিশালায় আশ্রয় নেওয়ার কথা উল্লেখ করায় মনে হয়, রবীন্দ্রনাথ-

পরিকল্পিত তাঁবুর বন্দোবস্ত করা যায়নি। তিনি 'Sister Nivedita as I knew her' প্রবন্ধে [*Hindusthan Standard*, Puja Annual, 1952] এই ভ্রমণের স্মৃতিচারণ করে লিখেছেন :

There were daily readings from Warren's *Buddhism in Translations* and occasionally Edwin Arnold's *Light of Asia*; some songs and recitations by the Poet, too. In the daytime we strolled through the temple enclosure, or visited the neighbouring villages. In the evening twilight we went to the Bodhi tree and sat in the gloom in silent meditation. There we found a remarkable character. Fuji, a poor Japanese fisherman had by hard austerity for many years, saved money to gratify his life's dream of making a pilgrimage to the spot where the Blessed One had attained to Englightenment. He had at last come here and lived frugally in a room of the pilgrim house. Every evening he would come and sit under the Bodhi Tree praying and chanting the hymn—

Namo namo Buddha Divakaraya,...

It interests me to think that Rabindranath remembered this hymn, and when he wrote his play *Natir Puja* he took care to insert it as Shrimati's prayer. Fuji had given the hint.[৭৪]

চণ্ডালিকা নৃত্যনাট্যেও মন্ত্রটি ব্যবহার করা হয়েছে। উক্ত জাপানী ভক্ত ফুজিকেও রবীন্দ্রনাথ স্মরণ করেছেন ৪ জ্যৈষ্ঠ ১৩৪২ [18 May 1935] শ্রীধর্মরাজিক চৈত্যবিহারে বুদ্ধ-জন্মোৎসবে সভাপতির অভিভাষণে [দ্র বুদ্ধদেব (১৩৬৩)।২-৩]।

রথীন্দ্রনাথ তাঁর ডায়ারিতে এই ভ্রমণের তাৎক্ষণিক বিবরণ লিখে রেখেছিলেন, তার কয়েকটি পৃষ্ঠা রবীন্দ্রভবনে রক্ষিত হয়েছে [Ms. 275-D]। এই ডায়ারি থেকে জানা যায়, তাঁরা ২২ আশ্বিন [শনি ৪ Oct] সন্ধ্যায় গিরিডি ত্যাগ করে পরের দিন বুদ্ধগয়ায় পৌঁছন। সেইদিন সন্ধ্যায় মন্দির দেখে এসে তিনি লিখেছেন : 'অন্ধকারের ভিতর বুদ্ধের মূর্ত্তিটা ভারি impressive বলে মনে হল। বুদ্ধের সেই শান্ত তপোমূর্ত্তি মনকে অভিভূত করে দেয়। আমরা সব দাঁড়িয়ে আছি, এমন সময় একটি জাপানী একটি সাদা থান জড়িয়ে এসে হাঁটু গেড়ে বসল। পালিতে মন্ত্র পড়তে আরম্ভ করল। জাপানীকে সেরকম ভাবে দেখে ভারি আশ্চর্য্য লাগল। কোথায় সেই জাপান, সেখান থেকে একটি fisherman এসে এখানে থেকে সন্ধে সকাল বুদ্ধের আরাধনা করছে।' পরবর্তীকালে তিনি আরও বিস্তৃতভাবে এই অভিজ্ঞতার স্মৃতিচারণ করেন :

তখন অন্ধকার হয়ে এসেছে, মন্দিরের গায়ে গবাক্ষগুলিতে প্রদীপ জ্বেলে দেওয়া হয়েছে। চার দিকে নিস্তব্ধ; তার মধ্যে কানে এল 'ওঁ মণিপদ্মে হুঁ'—বৌদ্ধমন্ত্রের মৃদুগম্ভীর ধ্বনির আবর্তন। কয়েকটি জাপানি তীর্থযাত্রী এই মন্ত্র আবৃত্তি করতে করতে মন্দির প্রদক্ষিণ করছেন; আর প্রতি পদক্ষেপে একটি করে ধূপ জ্বেলে রেখে দিয়ে যাচ্ছেন। কী শান্ত তাঁদের মূর্তি। কী গভীর তাঁদের ভক্তি। ইষ্টপূজার কী অনাড়ম্বর প্রণালী। অনতিপূর্বে মন্দিরের ভিতরে বুদ্ধমূর্তির সামনে মোহান্তের পুরোহিতদের কর্কশ ঢাক ঢোল বাজিয়ে আরতি দেখে এসেছিলুম। আমাদের মনে এই কথাটাই জাগল, ভগবান এঁদের মধ্যে কার পূজা খুশি হয়ে গ্রহণ করলেন?...অনেক রাত পর্যন্ত জগদীশচন্দ্র, ভগিনী নিবেদিতা ও পিতৃদেব বৌদ্ধ ধর্ম ও বৌদ্ধ ইতিহাস নিয়ে নিবিষ্ট মনে আলোচনা করতেন। নিবেদিতা এক-একটি তর্ক তোলেন আর রবীন্দ্রনাথ চেষ্টা করেন তার যথাযোগ্য সমাধানে পৌঁছতে। আমরা অন্যেরা তাঁদের প্রশ্নোত্তর তর্ক-বিতর্ক মুগ্ধ হয়ে শুনে যাই। আমার বিশ্বাস, এই বুদ্ধগয়া-সন্দর্শনের ফলে উত্তরকালে বৌদ্ধ ধর্ম ও সাহিত্যে পিতৃদেবের অন্তরের আকর্ষণ প্রগাঢ় গভীর হয়ে উঠেছিল। শান্তিনিকেতনে ফিরে এসে আমাকে তিনি ধম্মপদ আগাগোড়া মুখস্থ করতে দিয়েছিলেন। পালি পড়াও শুরু হল এবং পিতারই আদেশক্রমে অশ্বঘোষের বুদ্ধচরিত তর্জমার দুঃসাহসে প্রবৃত্ত হলুম।[৭৫]

দুঃখের বিষয়, নিবেদিতা ও রবীন্দ্রনাথের তর্কবিতর্কের বিবরণ কেউ লিপিবদ্ধ করে রাখেননি। বুদ্ধদেব ও বৌদ্ধধর্ম সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের আন্তরিক শ্রদ্ধা ছিল, বিভিন্নমুখী চর্চায় তিনি বৌদ্ধধর্মকে গভীরভাবে বোঝবার চেষ্টা করেছিলেন। সংস্কৃত পণ্ডিত বিধুশেখর শাস্ত্রীকে পালিভাষায় সুপণ্ডিত করে তোলার জন্য তিনি অর্থব্যয়ে কার্পণ্য করেননি। পরবর্তীকালে শান্তিনিকেতনে তিনি তিব্বতী ও চীনা ভাষাচর্চার যে কেন্দ্র গড়ে তোলেন বৌদ্ধ ঐতিহ্যের পুনরুদ্ধার তার অন্যতম লক্ষ্য ছিল। অনাগরিক ধর্মপালের সঙ্গে ঠাকুর-পরিবারের ঘনিষ্ঠ

সম্পর্ক ছিল, ধর্মপাল একাধিকবার মহর্ষির সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। অনুমান করা যায়, বুদ্ধগয়ার মন্দির নিয়ে বৌদ্ধ-হিন্দু বিতর্কে রবীন্দ্রনাথের সহানুভূতি ছিল বৌদ্ধদের প্রতি। রথীন্দ্রনাথ জাপানী ভক্ত ও মোহান্তের পুরোহিতদের ধর্মাচরণের পার্থক্য সম্বন্ধে যে মন্তব্য করেছেন তার অনেকটাই হয়তো পিতার মনোভাবের প্রতিধ্বনি। সুতরাং নিবেদিতা ও রবীন্দ্রনাথের বিতর্ক ঝাঁজালো হয়ে উঠত কিনা জানতে আমাদের কৌতূহল হয়। কয়েকদিন পরে 15 Oct [শনি ২৯ আশ্বিন] নিবেদিতা রাজগীর থেকে মিস্ ম্যাকলাউডকে রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে যা লিখেছেন তাতে তাঁর ঝাঁজ কিছুটা টের পাওয়া যায় :

The Poet, Mr. Tagore, was a perfect guest. He is almost the only Indian man I have ever seen who has nothing of the spoiled child socially about him. He has a *naif* sort of vanity in speech which is so childlike as to be rather touching. But he thinks of others all the time—as no one but a Western hostess could. He sang and chatted day and night—was always ready—either to entertain or be entertained—served Dr. Bose as if he were his mother—struggles all the time between work for the country and the national longing to seek mukti. In short—never was any man so *ridiculously* maligned when suspected of things vulgar and immoral. But for all this, Mr. Tagore is not the type of manhood that appeals to me. He is much more attractive to Christine.[৭৬]

নিবেদিতা সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের মনোভাবের পরিচয় আছে শান্তিনিকেতনে Edward Thompson [1886-1946]-এর সঙ্গে তাঁর একটি সাক্ষাৎকারের প্রতিবেদনে। নিবেদিতা সম্পর্কে প্রশ্ন করে যে জবাব পান সে-সম্পর্কে টমসন লিখেছেন :

'I didn't like her', he said : 'She was so violent'. He added : 'She had a great hatred for me and my work, especially here, and did all she could against me. She was so confident that I was unpatriotic and trucking to modern thought.'[৭৭]

নাবালিকা কন্যাদের বিবাহ দেওয়া, জাতীয় আন্দোলনের গড্ডলিকাপ্রবাহে গা-না-ভাসানো নিবেদিতার অপছন্দের কারণ হতে পারে, কিন্তু 'ঘৃণা' একটি কঠিন শব্দ—উভয়ের সম্পর্কের আনুপূর্বিক ইতিহাস উদঘাটিত না হওয়া পর্যন্ত বিষয়টি বোঝা শক্ত। ভালোমন্দের বিচারে ও ঘোষণায় নিবেদিতা প্রায়শই আবেগের দ্বারা পরিচালিত হতেন, তাই রবীন্দ্রনাথের পক্ষে তাঁকে 'violent' মনে হওয়া অস্বাভাবিক নয়। শুধু এই ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকারে নয়, নিবেদিতার মৃত্যুর পর রবীন্দ্রনাথ যে শোকপ্রবন্ধ লিখেছিলেন তার মধ্যেও তাঁদের প্রকৃতিগত অনৈক্যের কথা তিনি উল্লেখ করেছিলেন : 'তাঁহার প্রবল শক্তি আমি অনুভব করিয়াছিলাম কিন্তু সেই সঙ্গে ইহাও বুঝিয়াছিলাম তাঁহার পথ আমার চলিবার পথ নহে। তাঁহার সর্বতোমুখী প্রতিভা ছিল, সেই সঙ্গে তাঁহার আর-একটি জিনিস ছিল, সেটি তাঁহার যোদ্ধৃত্ব। তাঁহার বল ছিল এবং সেই বল তিনি অন্যের জীবনের উপর একান্ত বেগে প্রয়োগ করিতেন—মনকে পরাভূত করিয়া অধিকার করিয়া লইবার একটা বিপুল উৎসাহ তাঁহার মধ্যে কাজ করিত। যেখানে তাঁহাকে মানিয়া চলা অসম্ভব সেখানে তাঁহার সঙ্গে মিলিয়া চলা কঠিন ছিল। আমি নিজের দিক দিয়া বলিতে পারি তাঁহার সঙ্গে আমার মিলনের নানা অবকাশ ঘটিলেও এক জায়গায় অন্তরের মধ্যে আমি গভীর বাধা অনুভব করিতাম। সে যে ঠিক মতের অনৈক্যের বাধা তাহা নহে, সে যেন একটা বলবান আক্রমণের বাধা।'[৭৭ক]

বেঙ্গলী পত্রিকা থেকে জানা যায়, ২৭ আশ্বিন [বৃহ 13 Oct] নিবেদিতা গয়ায় বিবেকানন্দ ইনস্টিট্যুট প্রতিষ্ঠা করেন। এই বিষয়ে পত্রিকাটিতে [23 Oct] লেখা হয় :

THE VIVEKANANDA INSTITUTE—A Correspondent writes from Gaya : The inaugural meeting of the Vivekananda Institute took place in the 13th instant. The Sister Nivedita spoke most eloquently on the life and teachings of her Guru....She apoke an hour and a half. Dr. J. C. Bose, Professor Jadunath Sarkar, Babu Rabindra Nath Tagore and Sister Christina, another disciple of Vivekananda's, were present besides the gentry and the students of the place.[৭৭খ]

—কিন্তু রথীন্দ্রনাথের ডায়ারি-অনুসারে তারিখটি হল ২৬ আশ্বিন [বুধ 12 Oct]। এইদিন তিনি লিখেছেন : 'আজ বিকেলে বুদ্ধগয়া ছাড়া গেল। নিবেদিতা গয়ায় এসে বক্তৃতা দিলেন। ষ্টেশনে এসে রইলুম।' ২৭ আশ্বিন তিনি লেখেন : 'আজ সকালে গয়া ছাড়লুম। সন্ধ্যে গিরিডি পৌঁছলুম। বাবা সঙ্গে এলেন।' এই ডায়ারি থেকে জানা যায়, ২৫ আশ্বিন [মঙ্গল 11 Oct] ব্রজেন্দ্রকিশোর প্রভৃতি বুদ্ধগয়া ত্যাগ করেন, রথীন্দ্রনাথ তাঁদের সঙ্গে গয়াতে গিয়ে বিষ্ণু-পদচিহ্ন দেখে আসেন।

গিরিডি থেকে একটি তারিখহীন চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ মোহিতচন্দ্রকে লিখেছেন : 'বুধগয়াতে থাকবার সময় যদিও অনেক অনিয়ম সহ্য করতে হয়েছিল তবু সেখানকার বৌদ্ধমন্দির দেখে একথা মনে হয়েছে যে না দেখ্‌লে জীবন অসম্পূর্ণ থাকত।'[৭৮] রথীন্দ্রনাথের উপরে এই ভ্রমণ গভীর প্রভাব বিস্তার করেছিল। তিনি ২ কার্তিক [মঙ্গল 18 Oct] বিজয়াদশমীর দিন ডায়ারিতে লেখেন :

বুদ্ধ—তুমি কি পুণ্যদিবসেই এই পুণ্যভুমির এক রাজপ্রাসাদে তোমার সেই উদার ভাবনা লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলে। কি মহৎবেদনায় বিদ্ধ হইয়া জগতের পরিত্রাণের জন্য বাহির হইয়া ছিলে। কি সুদুঃসহ তপঃসাধন বলে বিশুদ্ধ ধর্ম্মজ্ঞান উপার্জ্জন করিয়া প্রবুদ্ধ হইলে। কি মহৎ ধর্ম্মই প্রচার করিয়াছিলে, যাহার জন্য এখনও সুদূর জাপানের এক ধীবর তোমার পদতলে পুষ্পার্ঘ্য উৎসর্গ করিতে আসিয়াছে।

...বৌদ্ধযুগ ভারতবর্ষের ইতিহাসের মধ্যে একটি প্রধান যুগ। বৌদ্ধযুগই ভারতবর্ষের গৌরব। আশ্চর্য্য এই যুগের বিষয় কেহই অনুসন্ধান করে না।...আমি আজ থেকে ব্রত নিলুম ভারতবর্ষের এই সময়ের লুপ্ত ইতিহাস পৃথিবীর কাছে উদঘাটিত করতে চেষ্টা করব। আমার এই চেষ্টায় যেন ঈশ্বরের আশীর্ব্বাদ থাকে।

রথীন্দ্রনাথের জীবনধারা অন্যখাতে প্রবাহিত হয়, তাই তাঁর ব্রত উদ্‌যাপিত হয়নি—কিন্তু অশ্বঘোষের বুদ্ধচরিত বাংলায় অনুবাদ করে তিনি প্রমাণ করেন যে তাঁর ব্রতধারণের সংকল্প ঘোষণা শূন্যগর্ভ ছিল না।

রথীন্দ্রনাথকে সর্ববিদ্যাবিশারদ করে তোলবার একটা বাসনা রবীন্দ্রনাথের মনে ছিল। তাই তাঁর জন্য বিচিত্র শিক্ষার আয়োজনে তিনি মাথা ঘামিয়েছেন। অসুস্থ মোহিতচন্দ্র স্বাস্থ্যোদ্ধারের জন্য নভেম্বর থেকে জুন মাস পর্যন্ত গিরিডিতে কাটাতে চান জানতে পেরে তিনি খুশি হয়ে উল্লিখিত পত্রে লিখলেন : 'আপনার প্রস্তাব অতি উত্তম। তাহলে জুন মাস পর্য্যন্ত রথী ও সন্তোষ গিরিডিতে থেকেই আপনার কাছে পড়াশুনো করুক্।' মোহিতচন্দ্রের জন্য তিনি বাড়িও দেখেন; ৬ কার্তিক [শনি 22 Oct] তাঁকে লেখেন : 'একটি ছোট বাড়ি অল্প ভাড়ায় পাওয়া যায়। শোনা গেল স্বত্বাধিকারী আপনারি পরিচিত বন্ধু এবং তিনি আপনার জন্যে এই বাড়িটা ঠিকঠাক করতে আদেশ পাঠিয়েছেন অতএব যখন খুসি এসে পড়তে পারেন।'[৭৯] মোহিতচন্দ্র গিরিডি যাবেন, এই আশা নিয়ে কলকাতায় এসে শ্রীশচন্দ্রকেও লিখেছেন : 'মোহিতবাবুরা নবেম্বরের আরম্ভেই যাবেন। তাঁকে পড়াবার কাজে লাগিয়ে দিয়ো।' অন্য শিক্ষার কথাও লিখেছেন তিনি : 'রথীর কুস্তির ব্যবস্থা করেছ কি? ওদের জর্ম্মান মাঝে মাঝে Ehlers সাহেবের কাছে চল্‌চে কি?'[৮০] এই জার্মান শ্রীশচন্দ্রের প্রতিবেশী ছিলেন, তাঁর কাছে জার্মানভাষা শেখার জন্য অন্য চিঠিতেও রবীন্দ্রনাথ আগ্রহ প্রকাশ করেছেন। ২০ আর্তিকের [শনি 5 Nov] চিঠিতে পড়াশুনোর ফিরিস্তি অনেক দীর্ঘ :

যে পর্য্যন্ত না ডেকে পাঠাই রথী সন্তোষদের তোমার কাছে রেখেই পড়িয়ো। তাদের এইটুকু বোলো যেন সমস্ত দিনের কর্ত্তব্যের একটা কালপর্য্যায় ঠিক করে নিয়ে সেই অনুসারে দৃঢ়তার সঙ্গে কাজ করে যায়। সংস্কৃত তর্জ্জমা ও ব্যাকরণটা প্রত্যহই যেন চলে তাছাড়া Buddhist India

পড়ে ইংরেজিতে তার প্রত্যেক অধ্যায়ের একটা সংক্ষেপ মর্ম্ম লেখে। রামায়ণ মহাভারতটা যেন অভিনিবেশ সহকারে অধ্যয়ন পূর্ব্বক তার থেকে উদ্ধারযোগ্য তথ্যগুলি যেন উদ্ধার করে। এবং জার্মানশিক্ষার প্রতিও অবহেলা না করে। Palgrave থেকে ইংরাজি গীতিকবিতাগুলি দুজনে সন্ধ্যাবেলায় যদি আবৃত্তি করে পড়ে ত ভাল হয়—যেগুলো ওদের ভাল লাগবে সেগুলো মুখস্থ করে ফেলতে পারলে ভবিষ্যতে ওদের আনন্দের বিষয় হবে। Light of Asia কাব্যখানি ওদের পড়া হয়েছে কি?[৮১]

মোহিতচন্দ্র অসুস্থতার জন্য স্বাস্থ্যোদ্ধারে দীর্ঘকাল গিরিডি থাকতে চান জেনে রবীন্দ্রনাথকে বিদ্যালয়ের জন্য নূতন ব্যবস্থার কথা চিন্তা করতে হয়েছে। মোহিতচন্দ্র ব্রহ্মচর্যাশ্রমকে রীতিমত স্কুলে পরিণত করতে চেয়ে অনেক বড়ো ছেলেকে ভর্তি করেছিলেন, তার জন্য অধিক সংখ্যায় শিক্ষকেরও প্রয়োজন হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথ নগেন্দ্রনাথ রায়ের পুরোনো শিক্ষাপদ্ধতি পছন্দ করছিলেন না, পুজোর ছুটির আগেই তাঁকে বিদায় দিয়েছিলেন —এখন বড়ো ছেলেদেরও বাদ দিলেন। ৪ কার্তিক [বৃহ 20 Oct] তিনি মনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়কে লিখলেন : 'ছুটির পর হইতে বোলপুর বিদ্যালয়ের আমূল পরিবর্ত্তন করা যাইতেছে। বড় ছেলেদের একেবারে বিদায় করা গেল। নগেন্দ্রবাবু গেলেন—মোহিতবাবুও থাকিবেন না। কেবল মাত্র কুড়িটি অল্প বয়সের ছাত্র স্কুলে রাখিব তাহার অধিক আর লইব না—এন্ট্রেন্স পরীক্ষার দিকে না তাকাইয়া রীতিমত শিক্ষা দিবার চেষ্টা করা যাইবে। বিদ্যালয়ের আরম্ভকালে আপনারা ইহার মধ্যে যে একটি হৃদ্যতা ও শান্তি দেখিয়াছিলেন পুনরায় তাহা ফিরিয়া পাইবার চেষ্টা করিব।'[৮২]

এর কয়েকদিন পরেই রবীন্দ্রনাথ কলকাতা যাত্রা করেন। মজঃফরপুর থেকে আসার সময়ে তিনি মাধুরীলতাকে নিয়ে এসেছিলেন, তার পর থেকে মাধুরীলতা এতদিন কলকাতাতেই ছিলেন। এখন তাঁর মজঃফরপুরে যাওয়ার সময় হল। রবীন্দ্রনাথ ৬ কার্তিক [শনি 22 Oct] মোহিতচন্দ্রকে লিখলেন : 'শরৎ মজঃফরপুর থেকে কলকাতায় এসেছে। সে বেলাকে নিয়ে যাবার পূর্ব্বেই আমি একবার তাদের সঙ্গে দেখা করতে যেতে চাই। তাছাড়া ছুটি ফুরোবার পূর্ব্বে বিদ্যালয়ের জন্য যথাকর্ত্তব্য এই বেলা করে রাখতে হবে।' চিঠিতে কবে কলকাতা যাচ্ছেন সেকথার উল্লেখ নেই, কিন্তু ৮ কার্ত্তিক [সোম 24 Oct] তাঁর 'হাবড়া হইতে আসার' হিসাব পাওয়া যায়।

ভূপেন্দ্রনাথ সান্যালের লেখা থেকে জানা যায়, পুজোর ছুটি আরম্ভ হওয়ার সময়েই রবীন্দ্রনাথ তাঁকে বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষপদে নিয়োগ করেন। তিনি লিখেছেন :

বিদ্যালয়ের ছুটি শুরু হইল, ছাত্র ও শিক্ষকেরা স্ব স্ব গ্রামে চলিয়া গেলেন। রবীন্দ্রনাথ তখন কলিকাতায়, তিনি আমাকে পত্রে জানাইলেন যে, বাড়ি যাইবার পূর্বে আমি যেন কলিকাতায় তাঁহার সহিত দেখা করিয়া যাই। যথাসময়ে আমি জোড়াসাঁকোর বাড়িতে গিয়া উপস্থিত হইলাম। রবীন্দ্রনাথ বলিলেন, "আপনার সহিত অনেক কথা আছে" বলিয়া তিনি আমাকে তাঁহার বসিবার ঘরে লইয়া গেলেন। বিদ্যালয়ের কার্য কিরূপভাবে চালাইলে বর্তমান অবস্থায় সুবিধা হয়—এইরূপ বিষয়ে তাঁহার সহিত অনেক কথাই আলোচনা হইল। তিনি বলিলেন বিদ্যালয়ের যেরূপ ব্যয় বাড়িয়া চলিয়াছে আর অধিক দিন সেরূপভাবে চালানো অসম্ভব।...তিনি আমাকে বলিলেন, "মোহিতবাবু থাকিবেন না, নগেন্দ্রবাবুও থাকিবেন না, এই অবস্থায় বিদ্যালয়ের ভার কাহার উপর দেওয়া যাইবে।" আমি তো ভাবিয়া কূল কিনারা পাইলাম না। তিনি তখন তাঁহার সেই স্বভাবসুন্দর স্মিতমুখে বলিলেন, "বিদ্যালয়ের সমস্ত ভার আপনার উপর চাপাইতে মনস্থ করিয়াছি, আমি অনেক চিন্তা করিয়াই ইহা ঠিক করিয়াছি, আপনি আর 'না' বলিবেন না।" আমি বলিলাম আপনার আদেশ বহন করিতে আমি প্রাণপণে চেষ্টা করিব, কিন্তু এত গুরুতর ভার বহন করিবার আমার যোগ্যতা নাই যে, বিদ্যালয়ে আরও যোগ্যতর ব্যক্তি সব রহিয়াছেন, তাঁহাদের উপর এ ভার দিলে তো ভাল হইত।...আমি তাঁহাকে আবার জানাইলাম, আমি হিসাবপত্র রাখিতে যে বড় অপটু, আমার অযোগ্যতার জন্য বিদ্যালয়ের যদি ক্ষতি হয়। রবীন্দ্রনাথ বলিলেন—কাজে লাগিয়া পড়ুন, আর ওসব ছোটখাটো বিষয়ের জন্য চিন্তা করিবেন না, মাসের শেষে হিসাব মিলাইতে যাহা না পারিবেন, তাহা আমি পুরাইয়া দিব। আমার এখন লোকের দরকার, বিদ্যা আমি কিনিতে পারি, মানুষ কিনিতে পারি না। আমার সম্মতির জন্য তিনি আমার দিকে ব্যাকুলভাবে চাহিয়া রহিলেন। তাঁহার মনোভাব বুঝিয়া আমাকে অগত্যা স্বীকার করিতে হইল।[৮৩]

ভূপেন্দ্রনাথের সাধুপ্রকৃতি, ছাত্রবাৎসল্য, সেবাপরায়ণতা রবীন্দ্রনাথের শ্রদ্ধা অর্জন করেছিল। এই শ্রদ্ধা ভূপেন্দ্রনাথের স্বেচ্ছাবসর নেওয়া পর্যন্ত অক্ষুণ্ণ ছিল।

দীনেশচন্দ্র সেনকে বিদ্যালয়ে নিযুক্ত করার ইচ্ছা রবীন্দ্রনাথ বহুদিন ধরে পোষণ করেছিলেন। 'শুক্রবার [*11 Nov: ২৬ কার্তিক] তিনি মনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়কে জানিয়েছেন : 'দীনেশবাবুকে নিচ্চি।' কিন্তু কয়েকদিন পরে 'বুধবার' [*16 Nov : ১ অগ্র°] স্বয়ং দীনেশচন্দ্রকে লিখেছেন : 'সম্প্রতি বিদ্যালয়ে আমাদের আবশ্যকের অতিরিক্ত অনেক বেশি শিক্ষক সঞ্চিত হয়েছে। অতএব এখন আপনি এখানে আসবার জন্যে প্রস্তুত হবেন না। আমি একটা ব্যবস্থা করে নিয়ে পরে আপনাকে জানাব।'[৮৪] দীনেশচন্দ্র অবশ্য কোনোদিন বিদ্যালয়ের শিক্ষক পদে যোগ দেননি।

কার্তিক-সংখ্যা বঙ্গদর্শন [৪।৭] প্রকাশিত হয় 4 Oct [মঙ্গল ১৮ আশ্বিন]; এই বছর দুর্গাপূজা আরম্ভ হয় ২৯ আশ্বিন [মহালয়া : ২২ আশ্বিন শনি ৪ Oct], পত্রিকার অগ্রিম প্রকাশ হয়তো সেই কারণেই। নৌকাডুবি-র কিস্তি ছাড়া এই সংখ্যায় আর-কোনো রবীন্দ্র-রচনা নেই :

৩৩৫-৪৮ 'নৌকাডুবি' ৪৬-৪৮ দ্র নৌকাডুবি ৫।৩২৮-৩৬ [৪৩-৪৪]

বঙ্গভাষা, কার্তিক ১৩১৪ ত্রিপুরাব্দ [২।৭] :

১৮৩-৯৩ 'গুপ্তধন' দ্র গল্পগুচ্ছ ২২।৩৫৪-৭১

কুমার সুরেন্দ্রচন্দ্র দেববর্মার সম্পাদনায় এই ক্ষুদ্র পত্রিকাটি বৈশাখ ১৩১৩ ত্রিপুরাব্দ [১৩১০ বঙ্গাব্দ] থেকে 'স্বাধীন ত্রিপুরা, আগরতলা রাজধানী হইতে প্রকাশিত' হতে শুরু করে। জগদানন্দ রায়, নিখিলনাথ রায়, সখারাম গণেশ দেউস্কর, দীনেশচন্দ্র সেন, অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়, নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত প্রভৃতি বিখ্যাত লেখকরা এই পত্রিকায় লিখেছেন। দ্বিতীয় বর্ষে পত্রিকাটির প্রকাশ অনিয়মিত হয়ে পড়লেও সম্পাদক বৈশাখ-সংখ্যার জন্য পারিবারিক স্মৃতিলিপি-পুস্তকে লিখিত জ্যোতিরিন্দ্রনাথের 'কাজ ও খেলা' [পৃ ২৭-২৮] রচনাটি আদায় করেছিলেন। ত্রিপুরার অনেক ছাত্র ব্রহ্মচর্যাশ্রমে ভর্তি হয়েছিলেন, সম্ভবত তাঁদেরই সূত্রে সম্পাদক রবীন্দ্রনাথের কাছ থেকে 'গুপ্তধন' গল্পটি সংগ্রহ করেন। হয়তো ছাত্রদের মনোরঞ্জনের জন্যই গল্পটি রচিত হয়েছিল। সন্ধ্যার বিনোদন-পর্বে লাইব্রেরি-ঘরের মেঝেতে বসে রবীন্দ্রনাথের গল্পটি পড়ে শোনানোর স্মৃতিচারণ করেছেন সমসাময়িক ছাত্র সুধীরঞ্জন দাস।[৮৪ক] কিন্তু এতদিন গল্পটি '১৩১৪' বঙ্গাব্দে মুদ্রিত বলে উল্লেখিত হয়ে আসছে, সেটি ভুল—বস্তুত ত্রিপুরাব্দ বঙ্গাব্দ অপেক্ষা তিন বৎসর পূর্ববর্তী এই বিষয়ে সচেতন না থাকায় ভুলটি সংক্রমিত হয়ে রবীন্দ্রনাথের গল্পের কালানুক্রমিক বিন্যাসে বিভ্রান্তি ঘটিয়েছে। [সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গ সরকার-প্রকাশিত রবীন্দ্র-রচনাবলী নবম খণ্ডে (১৩৯৪) ভ্রমটি সংশোধিত হয়েছে।]

প্রতাপনারায়ণ বিশ্বাস 'রবীন্দ্রনাথের রহস্যগল্প' প্রবন্ধে 'গুপ্তধন' গল্পটির সঙ্গে Edgar Allan Poe-র 'Gold Bug' গল্পটির সাদৃশ্য দেখিয়ে লিখেছেন : 'গুপ্তধন গল্পের জন্য রবীন্দ্রনাথ *Gold Bug* থেকে শুধু আবহ বা বিষয়বস্তু সংগ্রহ করেছেন তাই নয়, চরিত্র বা দৃশ্যের বর্ণনায় অনেক জায়গায় আক্ষরিকভাবে পো-র গল্পের অনুবাদ করেছেন, এবং এমন ধারণা করা বোধহয় অসঙ্গত হবে না যে গুপ্তধন লেখার সময় রবীন্দ্রনাথ পো-র *Gold Bug*গল্পটিকে সামনে রেখেছিলেন।'[৮৪খ] অবশ্য উক্ত প্রবন্ধে তিনি যে উদাহরণগুলি দিয়েছেন তার ভিত্তিতে এতটা বোধহয় বলা চলে না। অধ্যাপক বিশ্বাস এই প্রবন্ধেই অন্যত্র লিখেছেন : 'রবীন্দ্রনাথ গুপ্তধন

গল্পের প্রথম অংশে *Gold Bug*-এর কাহিনীর প্রথম অংশের উপাদানগুলি ব্যবহার করেছেন, কিন্তু গল্পটি শেষ করেছেন সম্পূর্ণ অন্যভাবে, একান্ত নিজস্ব মানবিক ভাব ও ভঙ্গীতে।[৮৪গ] আমরাও পূর্বে এইধরনের কথাই বলতে চেয়েছি [দ্র রবিজীবনী ৪।৪৩-৪৫]।

সঙ্গীত-প্রকাশিকা, কার্তিক ১৩১১ [৪।২] :

২৭-২৯ গৌড়সারং-একতালা। দুখের কথা তোমায় বলিব না দ্র স্বর ৪

গানটির স্বরলিপিকার কাঙালীচরণ সেন।

ইংরাজি সোপান-এর দ্বিতীয় খণ্ডের জন্য ব্যস্ত হয়ে রবীন্দ্রনাথ মোহিতচন্দ্র সেনকে তাগিদ দিচ্ছিলেন। স্বতন্ত্রভাবে এই দ্বিতীয় খণ্ডটি প্রকাশিত হয় 28 Oct [শুক্র ১২ কার্তিক]। খণ্ডটি আমরা দেখিনি, তাই বেঙ্গল লাইব্রেরির ক্যাটালগের বিবরণটি উদ্ধার করছি :

Inraji Sopan. Stepping-Stone to English. Part II/Mohit Chandra Sen/86, College Street, Calcutta; Bolepur/L.M. Gupta; the Brahmacharyyasram./Oct 28/Dy. 12 mo; 44/Ist; 200/P./0 3 0.

তিন আনা দামের ৪৪ পৃষ্ঠার এই বইটি প্রথম খণ্ডের মতো মাত্র ২০০ কপি ছাপা হয়েছিল—মোহিতচন্দ্র সেন প্রকাশক ও এল. এম. গুপ্ত মুদ্রাকর। ব্রজেন্দ্রনাথ শীলের পত্রটি ভূমিকা হিসেবে সম্ভবত এই খণ্ডে মুদ্রিত হয়।

রবীন্দ্রনাথ ৮ কার্তিক [সোম 24 Oct] কলকাতা এসে প্রায় কার্তিক মাসের শেষ পর্যন্ত এখানে থাকেন। জামাতা শরৎকুমার চক্রবর্তী পুজোর ছুটির শেষে মাধুরীলতাকে মজঃফরপুরে নিয়ে যেতে আসেন, তাঁদের সঙ্গে দেখা করা তাঁর ঘোষিত উদ্দেশ্য ছিল। রথীন্দ্রনাথ তখন গিরিডিতে, তাঁকেও আসতে বলে পত্র দিলেন শ্রীশচন্দ্রকে: 'রথী যদি সেখান থেকে পয়লা অক্টোবরে [নভেম্বরে] ছাড়ে তাহলে এদের সঙ্গে দেখা করে ৪ঠা যেতে পারবে।...[রথীর] পক্ষে বোধ হয় দিনের গাড়িতে আসাই ভাল হবে। রাত্রে যদি ভিড় হয় ঘুমতে পারবে না—যদি ঠাণ্ডা হয়ত ত অসুখ করতেও পারে।'[৮৫] রথীন্দ্রনাথ এক দিন আগেই ১৫ কার্তিক [সোম 31 Oct] কলকাতায় আসেন। মাধুরীলতারা 4 Nov [শুক্র ১৯ কার্তিক] মজঃফরপুর রওনা হন, ঐ দিন রবীন্দ্রনাথের 'হাবড়ার ষ্টেসনে যাতায়াতের' হিসাব থেকে জানা যায় তিনি কন্যা-জামাতাকে ট্রেনে তুলে দিয়ে আসেন।

ক্যাশবহিতে তাঁর অন্যত্র যাতায়াতের হিসাবও আছে—৮ কার্তিক বৈকালে ও ১০ কার্তিক সুকিয়া স্ট্রীট, ১৩ কার্তিক লালদিঘি, ২১ কার্তিক [রবি 6 Nov] 'রমণীবাবু ও জগদীশবাবুর বাটী', ২২, ২৩, ২৬ ও ২৯ কার্তিক গোলতলা, ২৪ কার্তিক বালিগঞ্জ ও ২৮ কার্তিক লোয়ার সার্কুলার রোড। কলকাতায় তিন সপ্তাহ অবস্থানের তুলনায় রবীন্দ্রনাথের ভ্রমণসূচী সংক্ষিপ্ত হওয়ার কারণ পিতার অসুস্থতা। ১৫ আশ্বিনের আগে লেখা একটি তারিখহীন পত্রে তিনি শ্রীশচন্দ্রকে লিখেছেন : 'বাবামশায়ের শরীরের অবস্থা [অত্যন্ত] দুর্ব্বল—আমার [কোথাও] নড়বার জো নেই—কারণ এখন এখানে সকলেই অনুপস্থিত।' ২০ কার্তিকেও শ্রীশচন্দ্রকে লিখেছেন : 'আমার পিতার শরীর ভাল নয়। এখন আমার কোথাও নড়বার জো নেই।' ২৪ কার্তিক [বুধ 9 Nov] 'শ্রীযুক্ত মেজ বাবু মহাশয়ের নিকট শ্রীযুক্ত কর্ত্তা বাবু মহাশয়ের পীড়ার সংবাদ দিবার টেলিগ্রাম ব্যয়'-এর হিসাব পাওয়া যায়। সম্ভবত এর পরেই সত্যেন্দ্রনাথ ও অনন্যরা এসে যান। 'শুক্রবার' [*11 Nov: ২৬

কার্তিক] রবীন্দ্রনাথ মনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়কে লিখলেন : 'ছুটির পরে একবার বোলপুরে যাবেন কি? সোমবারে [২৯ কার্তিক : 14 Nov] খুলবে। আমি কালই যাচ্চি।'[৮৬] তিনি পরের দিন যেতে পারেননি, দীনেশচন্দ্রের পুত্র অরুণচন্দ্রকে নিয়ে শান্তিনিকেতনে পৌঁছন ৩০ কার্তিক [মঙ্গল 15 Nov]।

বরোদার মহারাজা সয়াজি রাও গায়কোয়াড় দার্জিলিং হয়ে কলকাতা পৌঁছন 9 Nov [বুধ ২৪ কার্তিক]। অবসরপ্রাপ্ত আই. সি. এস. রমেশচন্দ্র দত্তকে মাসিক চার হাজার টাকা বেতনে তাঁর রাজ্যের দেওয়ান পদে নিযুক্ত করায় বাঙালিজাতি তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা অনুভব করছিল। ইতিপূর্বে রাজনারায়ণ বসুর দৌহিত্র অরবিন্দ ঘোষ বরোদা কলেজের উপাধ্যক্ষ নিযুক্ত হওয়ায় বাংলার সঙ্গে বরোদার সংযোগসূত্র স্থাপিত হয়। বিশেষত কার্জনের দিল্লি-দরবারে অন্যান্য দেশীয় রাজাদের নপুংসকোচিত সেলাম-জানানোর পাশে গায়কোয়াড়ের সাহসী করমর্দন দেশবাসীর শ্রদ্ধা অর্জন করেছিল। সুতরাং গায়কোয়াড় কলকাতায় উপস্থিত হলে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তি তাঁর জন্য সংবর্ধনার আয়োজন করেন। ২ অগ্র° [বৃহ 17 Nov] স্বর্ণকুমারী দেবী ও জানকীনাথ ঘোষাল তাঁদের ১৬ বালিগঞ্জ সার্কুলার রোডের বাড়িতে তাঁর সংবর্ধনায় উদ্যান-সম্মিলনীর আয়োজন করেন।[৮৭] সরলা দেবী তখন বরোদা-ফেরৎ বিপ্লবী যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সহযোগিতায় গুপ্ত-সমিতি ইত্যাদি নিয়ে ব্যস্ত, তিনি সংবর্ধনা উপলক্ষে 'গাইকোয়ার মহারাজের অভ্যর্থনা সঙ্গীত' [দ্র ভারতী, অগ্র°। ৮২৫-২৬] রচনা করেন। এই দিনই ৫২-৪ পার্ক স্ট্রীটে বেঙ্গল ল্যাণ্ডহোল্‌ডারস্‌' অ্যাসোসিয়েশন গৃহে বরোদারাজকে সংবর্ধিত করা হয়।[৮৭] আশুতোষ চৌধুরী, নাটোরের মহারাজা প্রভৃতি ছিলেন এই প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা—সম্ভবত তাঁদের অনুরোধেই রবীন্দ্রনাথ 'বঙ্গজননী-মন্দিরাঙ্গন মঙ্গলোজ্জ্বল আজ হে' [দ্র বঙ্গদর্শন, অগ্র°। ৪৩৮, ভূপালি-তেওরা] গানটি লিখে দেন। এই অনুষ্ঠানে তিনি উপস্থিত ছিলেন না—কিন্তু বঙ্গদর্শন-এ সুর-তালের উল্লেখ দেখে বোঝা যায়, তিনি গানটিতে সুর দিয়ে গায়কদের শিখিয়ে দিয়ে যান। বিভিন্ন উপলক্ষে এই গানটির পাঠ পরিবর্তিত করে রবীন্দ্রনাথ 'মাতৃমন্দির পুণ্য অঙ্গন', 'শান্তিমন্দির পুণ্য অঙ্গন' ও 'বিশ্ববিদ্যাতীর্থ-প্রাঙ্গণ' গানগুলি রচনা করেন। শান্তিদেব ঘোষ তাঁর 'রবীন্দ্রসংগীত' গ্রন্থে [১৩৭৬-সংস্করণ, পৃ ২১২-১৩] আনুষঙ্গিক বর্ণনাসহ পাঠান্তরগুলি উদ্ধৃত করেছেন দ্র রবীন্দ্র-রচনাবলী ৪ [প. ব., ১৩৯৪]। ২৬২-৬৩।

পিতার অসুখের সংবাদ পেয়ে রবীন্দ্রনাথ পুনরায় কলকাতায় আসেন ৭ অগ্র° [মঙ্গল 22 Nov] তারিখে। বিশেষ আশঙ্কার কারণ ছিল না, পরদিনই ভূপেন্দ্রনাথকে লিখেছেন : 'পিতৃদেব এখন কথঞ্চিৎ সুস্থ হইয়াছেন।' বিদ্যালয়ের জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা না করেই চলে আসতে হল বলে পত্রটি নানা নির্দেশে পূর্ণ। শীতের সময় ছাত্রদের সুস্থ রাখার জন্য সতর্ক থাকতে বলেছেন। জাপানী হোরি-র পরে ব্রহ্মচর্যাশ্রমের দ্বিতীয় অবাঙালি ছাত্র নারায়ণ কাশীনাথ দেবল—তাঁর বাবা মহারাষ্ট্রীয়, মা ব্রহ্মদেশীয়—কয়েকমাস আগে ভর্তি হয়েছিলেন। এঁর সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন : 'দেবলের কাসির জন্য উদ্বিগ্ন আছি। তাহার বুকে পিঠে গরম সর্ষের তেল মালিস করিয়া দিবেন ও steam bath দেওয়াইবেন। মালিস ও স্নানের সময় যেন ঠাণ্ডা না লাগে।' জগদীশচন্দ্রের ভাগিনেয় অরবিন্দমোহন অত্যধিক আদরে প্রতিপালিত হওয়ায় বিদ্যালয়ের পক্ষে সমস্যার কারণ ছিলেন; তাঁর সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন : 'অরবিন্দ সম্ভবত আজই বোলপুর যাইতেছে। তাহার সম্বন্ধে জগদীশের সঙ্গে অনেক কথাবার্তা হইয়াছে। স্নিগ্ধ ব্যবহার যে ছেলেদের পক্ষে বিশেষ উপকারী তাহাতে সন্দেহ নেই—চেষ্টা দেখিবেন অরবিন্দকে যদি কোমল ব্যবহারে বশ করিতে পারেন—অজিতকেও এইরূপ

বলিয়া দিবেন।' ইংরেজি সোপান-এর দুটি খণ্ড ইতিমধ্যেই প্রকাশিত হয়েছিল, তার উপক্রমণিকা অংশ তখনও পাণ্ডুলিপি আকারে ছিল। সম্ভবত এইটি সম্পর্কেই তিনি ভূপেন্দ্রনাথকে লিখেছেন : 'ইংরেজি কথোপকথন চর্চার যে লেখা সত্যকে দিয়া আসিয়াছি, তাহা যেন প্রত্যহ একবার মধ্যাহ্নে অথবা সায়াহ্নে গল্পে বসিবার পূর্বে ছেলেদের অভ্যাস করা হয়।'[৮৮] উল্লেখ্য, এই 'উপক্রমণিকা' অংশ পরে 'ইংরেজি শ্রুতিশিক্ষা' [? ১৩১৬ : 1909] নামে পরিবর্ধিত হয়।

পিতার শরীর সম্পর্কে উদ্বেগের অবসান হলেও রবীন্দ্রনাথ নিজে জ্বরে পড়েন। 'মঙ্গলবার' [২১ অগ্র° : 6 Dec] ভূপেন্দ্রনাথকে লিখেছেন : 'আমি জ্বরে পড়িয়াছিলাম—জ্বর গিয়া এখন সর্দি কাসিতে ঠেকিয়াছে। সুস্থ হইলেই বোলপুর যাইবার চেষ্টা করিব।'[৮৯] কিন্তু অসুস্থ হলেও বিভিন্ন জায়গায় তাঁর গতায়াত অব্যাহত ছিল —৭ অগ্র° চোরবাগান, ১০ ও ১৩ অগ্র° পার্শিবাগান, ১৭ অগ্র° সুকিয়া স্ট্রীট ও ১৮ অগ্র° লালদিঘি যাতায়াতের হিসাব ক্যাশবহিতে পাওয়া যায়। ২৬ অগ্র° [রবি 11 Dec] তিনি শান্তিনিকেতনে ফিরে যান। 12 Dec মোহিতচন্দ্র তাঁকে লিখেছেন : 'কাল সকালে জোড়াসাঁকোয় গিয়ে শুনলাম আপনি বোলপুরে চলে গিয়েছেন'—প্রত্যুত্তরে ২৮ অগ্র° রবীন্দ্রনাথ লেখেন :'এবারে আমি প্রায় দিন দশেক ধরে ইনফ্লুয়েঞ্জা জ্বরে শয্যাগত হয়ে পড়ে ছিলুম তাই আপনার সঙ্গে দেখা করবার সুযোগ করতে পারি নি। যেদিন একটুমাত্র ভাল বোধ হল সেইদিন প্রাতেই বোলপুরে পালিয়ে এসেছি। এখানে আসবামাত্র আমার শরীরের সমস্ত গ্লানি একেবারে দূর হয়ে গেছে। সর্দ্দিকাশির ভাবটা এখন আর কিছুমাত্র নেই—কেবল অর্শ এখনো নিষ্কৃতি দেয় নি।'[৯০] বস্তুত ১৮ অগ্রহায়ণের পর রবীন্দ্রনাথের যাতায়াতের কোনো বিবরণ পাওয়া যায় না—মনে হয়, এই সময়ে তিনি শয্যাগত ছিলেন।

এরই মধ্যে ক্লাসিক থিয়েটারে চোখের বালি-র নাট্যরূপ অভিনীত হল ১১ অগ্র° [শনি 26 Nov] তারিখে। এই দিনের *The Bengalee*-তে মুদ্রিত বিজ্ঞাপনটি উদ্ধৃত করি :

Grand Gala Night!!
New Five-act Society Drama!!!
Saturday, the 26th Nov., at 9 P.M.
AND
Sunday, afternoon, at 3 P.M.
CLASSIC THEATRE.
68,-*Beadon Steet, Calcutta.*
Saturday, at 9 P.M. Sharp.
Babu Rabindra Nath Tagore's sensational
Novel
CHOKER BALI
Carefully dramatised by Amarendra Nath
Dutt.
Thrilling Romantic Situations.
Dramatic Grandeur in profusion.
New and novel scenery combined with magnificent costumes have been very carefully designed
and prepared at an enormous costs.
Series of sweet and sublime songs.

সুপারিন্টেণ্ডেন্ট এ. সি. রায়, ম্যানেজার এ. এন. দত্ত ও বিজনেস ম্যানেজার ডি. দে-র স্বাক্ষরে এই বিজ্ঞাপন মুদ্রিত হয়। রবিবারের অভিনয়সূচীতে ছিল গিরিশচন্দ্রের বিল্বমঙ্গল, যাতে স্বয়ং গিরিশচন্দ্র সাধকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হন। শিশির বসু লিখেছেন : 'অমরেন্দ্রনাথ, মনোমোহন গোস্বামী ও কুসুমকুমারী যথাক্রমে মহেন্দ্র, বেহারী এবং বিনোদিনী সাজলেন। নাটক চললো না।'[৯১]

উক্ত বিজ্ঞাপনে দেখা যায়, অমরেন্দ্রনাথ চোখের বালি-র নাট্যরূপ দিয়েছিলেন, কিন্তু কার্তিক-সংখ্যা সাহিত্য-তে 'বিবিধ' [পৃ ৪৬০] বিভাগে লেখা হয় :

> সুপ্রসিদ্ধ নাট্যকার শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র ঘোষ রবীন্দ্র বাবুর "চোখের বালি" নাটকাকারে পরিণত করিয়াছেন। ক্লাসিক থিয়েটারে শীঘ্রই "চোখের বালি" অভিনীত হইবে। রঙ্গমঞ্চে বিনোদিনীর বাহার দেখিবার জন্য অনেকে উৎসুক ছিলেন; তাঁহাদের আশা পূর্ণ হইল। কিন্তু "চোখের বালি"র নাটকত্ব কোথায়, বলিতে পারি না। তবে নাটকের তিলতর্পণ-ধৃত ব্যুৎপত্তি এই, ন নাস্তি আটকো যস্মিন্,—যাহাতে কিছুই আটক নাই।

কিন্তু আমরা বেঙ্গলী-র বিজ্ঞাপনে প্রকাশিত তথ্যের উপর অধিক নির্ভরশীল। এর সত্যতা প্রমাণিত হয় রবীন্দ্রনাথকে লেখা স্বয়ং অমরেন্দ্রনাথের ২ অগ্র° ১৩২১ [বুধ 18 Nov 1914]-এর চিঠিতে। তিনি লিখেছেন :

> ..আমার বেশ স্মরণ আছে—(সে প্রায় আজ আট [? দশ] বৎসরের কথা) যখন আমি "চোখের বালি" উপন্যাস নাটকাকারে পরিবর্ত্তিত করিয়া আমার পূর্ব্বপ্রতিষ্ঠিত "ক্লাসিক" থিয়েটারে অভিনয় করি আপনি এক রাত্রে উক্ত অভিনয় দেখিবার জন্য রঙ্গালয়ে পদার্পণ করিয়াছিলেন। অভিনয়ান্তে আমাকে ডাকাইয়া আমার "মহেন্দ্রের" ভূমিকার অভিনয় সম্বন্ধে আমাকে বিশেষ উৎসাহিত করিয়াছিলেন এবং স্নেহপূর্ণবচনে আমাকে উপদেশ দিয়াছিলেন—আপনার আরও দুই একখানি নাটক অভিনয় করিবার জন্য।[৯২]

আশা করি, এই পত্র এ-বিষয়ে সমস্ত বিতর্কের অবসান ঘটাবে। রবীন্দ্রনাথ নিজে ১১ অগ্র° [শনি 26 Nov] উক্ত অভিনয় দেখতে গিয়েছিলেন, এই তথ্যও পত্রটি থেকে অনুমান করা যায়।

শিশির বসুর 'নাটক চললো না' বাক্যটিও যথেষ্ট বিভ্রান্তিকর। নাটকের বা অভিনয়ের দোষে নাটকটি পুনরভিনীত হতে পারেনি, এমন একটি ধারণা উক্ত মন্তব্যটি থেকে সৃষ্টি হতে পারে। বস্তুত ঘটনাটি তা নয়। দুঃসাহসী প্রতিভাবান নট-নাট্যকার, নাট্য ও রঙ্গমঞ্চ পরিচালক অমরেন্দ্রনাথের জীবন কুসুমাস্তীর্ণ ছিল না, মামলা-মকদ্দমায় ও বিশ্বাসঘাতকতায় তাঁকে বিপর্যস্ত করে দেবার অফুরন্ত উৎসাহ তখন অনেকেই দেখিয়েছেন [তাঁর 'গুরু' নট-নাট্যকার গিরিশচন্দ্র ঘোষ তাঁদের অন্যতম ছিলেন]। বর্তমান সময়েও এইরূপ একটি ঘটনা ঘটল। এমারেল্ড থিয়েটারের মালিক ছিলেন ধনকুবের মতিলাল শীলের নাতি গোপাললাল শীল। অপুত্রক অবস্থায় মাত্র ৩৬ বৎসর বয়সে ১১ জ্যৈষ্ঠ ১৩০৯ [রবি 25 May 1902] তাঁর মৃত্যু হলে সম্পত্তি নিয়ে গোলযোগ দেখা দেয়। অমরেন্দ্রনাথ Nov 1903 [কার্তিক ১৩১০]-তে মিনার্ভা থিয়েটারেরও দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন। ফলে দুটি থিয়েটার পরিচালনা করতে গিয়ে ক্লাসিক থিয়েটার নিয়ে তিনি মুশকিলে পড়েন। 18 May 1904 [বুধ ৫ জ্যৈষ্ঠ] তিনি 'Benefit Night' উপলক্ষে গিরিশচন্দ্রের জীবনী ও গান দর্শকদের উপহার দেন। ১৬ ভাদ্র [বৃহ 1 Sep] তিনি দর্শকদের উপহার দেন মধুসূদনের গ্রন্থাবলী; ২২ ভাদ্র [বুধ 7 Sep] ও ২৩ ভাদ্র [বৃহ 8 Sep] উপহার দেন ভারতচন্দ্র, মধুসূদন, গিরিশচন্দ্র, অমরেন্দ্রনাথ, দুর্গাদাস [? দে], অতুলচন্দ্র [? কৃষ্ণ মিত্র]-রচিত গ্রন্থাবলী। কিন্তু এইভাবেও দর্শকদের আকর্ষণ করা যায়নি, ২৩ ভাদ্রের পর পত্রিকায় ক্লাসিকের অভিনয়ের বিজ্ঞাপন নেই। এর পরে ১১ ও ১২ অগ্র° [রবি 27 Nov] ক্লাসিকে অভিনীত হয় যথাক্রমে 'চোখের বালি' এবং বিল্বমঙ্গল' ও 'সংসার'। এর দু'দিন পরে ১৪ অগ্র° [মঙ্গল 29 Nov] বিচারক উড্রফের আদালতে গোপাললাল শীলের এস্টেট কর্তৃক আনীত মামলায় অনাদায়ী ৩৪৪৬ টাকা ভাড়ার দায়ে

অমরেন্দ্রনাথ রঙ্গমঞ্চের অধিকার হারান। সুতরাং 'চোখের বালি' পুনরভিনয়ের সুযোগ ও আগ্রহ এই সময়ে তাঁর থাকার কথা নয়। কিন্তু অদম্য অমরেন্দ্রনাথ ৪ কার্তিক ১৩১২ [শনি 21 Oct 1905] পুনরায় ক্লাসিকে ফিরে এসেছিলেন এবং ১০ অগ্র° [রবি 26 Nov 1905] এই রঙ্গমঞ্চেই 'চোখের বালি' অভিনয় করেন।* ইংরেজি তারিখটি লক্ষণীয়, এক বছর আগে এই তারিখেই নাটকটির প্রথম অভিনয় হয়।

১৮ অগ্র° [শনি 3 Dec] রবীন্দ্রনাথের ক্যাশবহিতে একটি হিসাব দেখা যায় : 'মা° নিকুঞ্জ লাল দত্ত/দং নূতন বহির ১ এডিসন বিক্রয়ের মূল্য পাওয়া যায় গুঃ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ৩০০্'। হিসাবটি সম্পূর্ণ নয়। এর অপর অংশ পাওয়া যায় ১৩ ভাদ্র ১৩১২ [মঙ্গল 29 Aug 1905]-এর বিবরণে :'মা° বসুমতী আপিস/দং নৌকাডুবি বয়ের বাবদ ৫০০্ টাকার বাকী/গুঃ শৈলেশচন্দ্র মজুমদার/কলিকাতা ব্যাঙ্কের এক চেক ২০০্'। এরই পাশে কাৎ করে লেখা কীটদষ্ট একটি টীকা থেকে বিষয়টি স্পষ্ট হয় : 'নিকুঞ্জ বিহারী দত্ত/নৌকাডুবি লইবার/ অভিপ্রায়ে যে ২৫০্ ও/লেখার দরুণ যে [৫০্]/একুনে ৩০০্ টাকা [পাওয়া গিয়াছিল]/তাহা নিকুঞ্জ বাবু [প্রদত্ত] টাকা হইতে [বাদ দেওয়া যায়]'। ১৮ অগ্র° প্রথম যখন টাকা নিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ, তখনও বঙ্গদর্শন-এ নৌকাডুবি সমাপ্ত হয়নি, কিন্তু বসুমতী-র স্বত্বাধিকারী উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের তরফে নিকুঞ্জবিহারী দত্ত ৩০০ টাকা অগ্রিম দিয়ে গ্রন্থটির প্রকাশ-স্বত্ব গ্রহণ করেন। চোখের বালি প্রকাশ করেছিল মজুমদার লাইব্রেরি [5 Apr 1903], এটিরও প্রকাশ-স্বত্ব বসুমতী কর্তৃপক্ষ নেন—সেটি জানা যায় উপেন্দ্রনাথের ২১ অগ্র° ১৩১২ [বৃহ 7 Dec 1905]-র পত্র থেকে :

> আপনার ৯ই অগ্রহায়ণ [শনি 25 Nov] তারিখের অনুমতি পত্র প্রাপ্ত হইলাম। "চোখের বালি" ও "নৌকাডুবি" দুইখানি উপন্যাস নৌকাডুবি প্রকাশের তারিখ হইতে তিন বৎসর কাল আমি বিক্রয় এবং উপহার প্রদান করিবার ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলাম। এই স্বত্ব প্রাপ্ত হইবার জন্য পূর্ব্বে আপনাকে ৫০০্ পাঁচশত টাকা দিয়াছি, বাকী ১৫০০্ দেড় হাজার টাকা আগামী মাঘ মাসে ৫০০্ আগামী বৎসরের বৈশাখ মাসে ৫০০্ শ্রাবণ মাসে ৫০০্ টাকা দিয়া এই দেড়হাজার টাকা পরিশোধ করিব।...
>
> পুঃ উভয় উপন্যাসই আমি একমাত্র বাবু শৈলেশচন্দ্র মজুমদারকে "মজুমদার লাইব্রেরী" কমিশনে বিক্রয় করিতে দিব।[৯৩]

বসুমতী-সংস্করণ নৌকাডুবি প্রকাশিত হয় 2 Sep 1906 [রবি ১৭ ভাদ্র ১৩১৩]। তিন বছরের জন্য একটি সংস্করণের স্বত্ব বিক্রয় হলেও বসুমতী-কর্তৃপক্ষ মুনাফার লোভে আর কোনো টাকা না দিয়ে বিনা অনুমতিতে বই দুটি ছাপিয়ে যেতে থাকলে ভবিষ্যতে রবীন্দ্রনাথকে মামলা করতে হয়।

অগ্র°-সংখ্যা বঙ্গদর্শন [৪।৮] প্রকাশে কিছু দেরি হয়েছিল, বেঙ্গল লাইব্রেরির ক্যাটালগ অনুযায়ী প্রকাশের তারিখ 25 Nov [শুক্র ১০ অগ্র°]। এই সংখ্যায় রবীন্দ্রনাথের দুটি রচনা মুদ্রিত হয় :

৩৯১-৪০৩ 'নৌকাডুবি' ৪৮-৫০ দ্র নৌকাডুবি ৫।৩৩৭-৪৮ [৪৫-৪৬]

৪৩৮ 'বড়োদারাজ গায়কবাড়' ['বঙ্গজননী মন্দিরাঙ্গন'] দ্র র°র° ৪ [প. ব.]। ২৬২

আমরা আগেই বলেছি, 'বঙ্গজননী মন্দিরাঙ্গন' গানটি 'বেঙ্গল ল্যাণ্ডহোল্ডার্স্ অ্যাসোসিয়েশনে বড়োদারাজ গায়কবাড়ের অভ্যর্থনার উপলক্ষ্যে রচিত'; 'সর্ব্বত্র দীর্ঘহ্রস্ব রক্ষা করিয়া পড়িতে হইবে' নির্দেশ-সহ গানটি মুদ্রিত হয়।

সঙ্গীত-প্রকাশিকা, অগ্র° ১৩১১ [৪।৩] :

৫৭-৬০ মিশ্র যোগিয়া-একতালা। নয়ন তোমারে পায় না দেখিতে দ্র স্বর ২৭

৬১-৬৩ কেদারা-ঝাঁপতাল। তুমি ধন্য ধন্য হে, ধন্য তব প্রেম দ্র ঐ ৪

প্রথম গানটির স্বরলিপি করেন কাঙালীচরণ সেন; দ্বিতীয় গানটির স্বরলিপিকারের নাম অনুল্লেখিত থাকলেও মনে হয় কাঙালীচরণই এটিরও স্বরলিপি করেছিলেন, মাঘ মাসে [14[Jan]প্রকাশিত তাঁর ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি প্রথম খণ্ডে গানটির স্বরলিপি আছে [পৃ ২১৫-১৮]।

পৌষ-সংখ্যা বঙ্গদর্শন [৪।৯] প্রকাশিত হয় 25 Dec [রবি ১০ পৌষ]। এই সংখ্যায় রবীন্দ্র-রচনা একটি :

৪৩৯-৫০ 'নৌকাডুবি' ৫১-৫৪ দ্র নৌকাডুবি ৫।৩৪৮-৬১ [৪৭-৫০]

সঙ্গীত-প্রকাশিকা, পৌষ ১৩১১ [৪।৪] :

৮৩-৮৫ ভীমপলশ্রী-একতালা। আমায় ছ'জনায় মিলে পথ দেখায় দ্র স্বর ২২

৮৬-৮৮ আশা-ভৈঁরো-তেওরা। তোমারি নামে নয়ন মেলিনু দ্র ঐ ২২

কাঙালীচরণ সেন দুটি গানেরই স্বরলিপিকার।

রবীন্দ্রনাথ ২৬ অগ্র° [রবি 11 Dec] শান্তিনিকেতনে গিয়েছিলেন। ২৮ অগ্র° তিনি মোহিতচন্দ্র সেনকে যে চিঠি লেখেন তার কিয়দংশ আমরা আগে উদ্ধৃত করেছি, এখানে আরও খানিকটা উদ্ধৃত করি :

এ জায়গাটি আজকাল অত্যন্ত মনোরম হয়ে আছে। শীতের মধুর আলোকের মধ্যে আমি দিব্য নিমগ্ন হয়ে বসে আছি। সকালে বাগানের পূর্ব্বখণ্ডে বেলা দশটা পর্য্যন্ত শালবনের ছায়ারৌদ্রবিচিত্র নির্জন পথে একলা পায়চারি করি—প্রান্তরের উপরকার এই নির্ম্মল নীরব আকাশকে আমার সমস্ত শরীরমন দিয়ে অভ্যর্থনা করি—শীতের দুরন্ত বাতাস এই জ্যোতির্ম্ময় নিস্তব্ধ প্রসন্নতার মধ্যে একটি অক্লান্ত নবীন লীলার ভাবকে বিস্তার করতে থাকে।

আজকাল শিশুছাত্রগুলিকে নিয়ে বিদ্যালয় বেশ শান্তিতে আছে। বড় ছেলের মধ্যে কেবল অক্ষয় এবং যোগেন আছে। অধ্যাপকদের সময়ের তেমন টানাটানি নেই। অধ্যাপক এখন ৯ জন আছেন—ছাত্র ২১ জন।[৯৪]

মোহিতচন্দ্রের 12 Dec-এর যে পত্রের উত্তরে রবীন্দ্রনাথ এই চিঠি লিখেছিলেন, তার পিছনে তিনি উক্ত ৯ জন শিক্ষকের নামের আদ্যক্ষর লিখেছেন : জ [জগদানন্দ রায়], কা [ডাঃ কানাই গুপ্ত], অ [অজিতকুমার চক্রবর্তী], দি [দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর], ভূ [ভূপেন্দ্রনাথ সান্যাল], রা [রাজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়], ন [নগেন্দ্রনাথ আইচ], স [সত্যেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য], কে [?]। সুবোধচন্দ্র মজুমদার গিরিডিতে অসুস্থ হয়ে পড়ে ছিলেন, কিন্তু এই তালিকায় হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম না থাকা বিস্ময়জনক।

এবারে ৭ পৌষ [বৃহ 22 Dec] শান্তিনিকেতনে চতুর্দশ সাম্বৎসরিক ব্রহ্মোৎসব কিছুটা সাদাসিধে ভাবে উদ্যাপিত হয়। তত্ত্ববোধিনী-তে লেখা হয় : 'এই উপলক্ষে স্থানীয় জনসাধারণ উপস্থিত হইয়াছিলেন। ভিন্ন প্রদেশীয় লোকের তাদৃশ সমাগম হয় নাই। এই উৎসবে শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত বাবু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রাতে ও সন্ধ্যায় আচার্য্যের আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার উপদেশ অতিমাত্র মর্ম্মস্পর্শী হইয়াছিল। কি জন্য এই ৭ই পৌষের উৎসব, কেনই বা নানাস্থান হইতে শান্তিনিকেতনে এত লোকসমাগম হয় রবীন্দ্র বাবু শ্রোতৃবর্গের মনে সুমিষ্ট ও সরল ভাষায় তাহা অঙ্কিত করিয়া দিয়াছিলেন।'[৯৫]

রবীন্দ্রনাথ এই উপলক্ষে 'উৎসবের দিন' [দ্র বঙ্গদর্শন, মাঘ। ৫১৩-২০; ধর্ম ১৩।৩৯২-৪০০] প্রবন্ধটি পাঠ করেন। মানুষ যেদিন আপনার মনুষ্যত্বের শক্তিকে বিশেষভাবে স্মরণ করে সেইদিনটিই তার উৎসবের দিন এই কথার পরে তিনি বলেন, 'মানুষের কর্ম যেখানে আপনাকে, আপনার সন্তানকে এবং আপনার দলকেও

অতিক্রম করিয়া গেছে, সেইখানেই আমরা মনুষ্যত্বের পূর্ণশক্তির বিকাশে পরম গৌরব লাভ করিয়াছি।' কয়েকদিন আগে বুদ্ধগয়ায় গিয়ে বুদ্ধের মহিমার যে প্রত্যক্ষ স্পর্শ নিয়ে এসেছেন, সেই অনুভব থেকে তিনি বুদ্ধ-কথিত ব্রহ্মবিহারের কথা ব্যাখ্যা করলেন। O. Frankfurter-এর *Handbook of Pali* [1883] গ্রন্থটি রবীন্দ্রনাথের গ্রন্থসংগ্রহে থাকায় পালিভাষার সঙ্গে তাঁর পরিচয়ের বিষয়টি জানা যায়। 'মাতা যথা নিযং পুত্তং আয়ুসা একপুত্তমনুরক্‌খে' প্রভৃতি সুত্তপিটকের যে তিনটি শ্লোক তিনি এই প্রবন্ধে উদ্ধৃত করেছেন, ড পম্পা মজুমদার জানিয়েছেন, সেগুলি পণ্ডিত ধর্মরাজ বড়ুয়া-সংকলিত 'হস্তসার' [1893] -এ আছে। সম্ভবত এই গ্রন্থটির সঙ্গেও তাঁর পরিচয় হয়েছিল।

৮ পৌষ [শুক্র 23 Dec] রবীন্দ্রনাথ কলকাতায় আসেন। এই দিন তিনি ভবানীপুর যান, কিন্তু অন্যান্য বারের মতো তাঁর আর কোথাও যাওয়াআসার হিসাব পাওয়া যায় না। নিবেদিতার পত্র থেকে জানা যায়, জগদীশচন্দ্র ও অবলা বসুকে নিয়ে রবীন্দ্রনাথ শিলাইদহে পদ্মার উপর বাস করছিলেন, তিনি সেখানে গিয়ে তাঁদের সঙ্গে মিলিত হন। নিবেদিতা 5 Jan 1905 [বৃহ ২১ পৌষ] মিসেস ওলি বুল-কে লেখেন : 'we went to them [Boses'] while they were the guests of the Poet, on the River, and returned on Monday evening, all together' তাঁর এই পত্র থেকে জানা যায়, তিনি [এবং সম্ভবত ক্রিস্টিন] ১৫ পৌষ [শুক্র 30 Dec] শিলাইদহে যান ও ১৮ পৌষ [সোম 2 Jan] রবীন্দ্রনাথ-সহ সকলে কলকাতায় প্রত্যাবর্তন করেন। এবারেও নিবেদিতা রবীন্দ্রনাথের সঙ্গ অপছন্দ করেছেন, তিনি উক্ত পত্রে লেখেন :

With all our trust and regard fot the Poet—and I am graterul to him for having been born! —so tenderly does he love the Bairn [Jagadischandra], and so assiduosly does he serve him!—we are learning now to understand what it was that Swamiji felt about them all. Gradually as we exhausted what we had taken with us on Friday, we both felt the pressure of an atmosphere in which all had become commonplace, an atmosphere in which both Bo [Abala Bose] and the Poet were absolutely happy and in place—but in which the Bairn seemed distorted somehow. By Monday noon, I had nothing left in me to say, either to him or to GOD.[৯৬]

নিবেদিতার এই প্রতিক্রিয়া মনস্তাত্ত্বিক জটিলতার দ্বারা আক্রান্ত, নতুবা রবীন্দ্রনাথের সঙ্গ ক্লান্তিকর একথা তাঁর পরম শত্রুরাও বলতেন না। আমাদের মনে হয়, একটি বিশেষ কারণে নিবেদিতা তাঁর প্রতি বিরক্ত হন। July 1922-তে বিদ্যালয়ের বিদেশী শিক্ষক W. W. Pearson [1881-1923]-এর প্রশ্নের উত্তরে রবীন্দ্রনাথ তাঁকে লেখেন :

You ask me what connection had the writing of *Gora* with Sister Nivedita. She was our guest in Shilida and in trying to improvising a story according to her request I gave her something which came very near to the plot of *Gora*. She was quite angry at the idea of Gora being rejected even by his disciple Sucharita owing to his foreign origin. You won't find it in *Gora* as it stands now—but I introduced it in my story which I told her in order to drive the point deep into her mind.[৯৭]

—একজন আইরিশ মহিলা হয়েও নিবেদিতা যেখানে ভারতবর্ষকে আপন করে নিতে চাইছেন এবং বিশ্বাস করেন এই দেশও তাঁকে আপন বলে মনে করে, সেখানে গোরার বিদেশী জন্মের জন্য তার শিষ্যা ও প্রেমিকা সুচরিতার দ্বারা পরিত্যক্ত হওয়ার কাহিনী তাঁর ভালো না লাগতেই পারে!

১৮ পৌষ [সোম 2 Jan] রবীন্দ্রনাথ শিলাইদহ থেকে কলকাতায় ফিরে এসেছিলেন এর পর তাঁকে ২০ পৌষ বালিগঞ্জ, ২১ পৌষ ইণ্ডিয়ান স্টোর ও ২৩ পৌষ [শনি 7 Jan] সুকিয়া স্ট্রীট যেতে দেখা যায়। ২৩

পৌষ তাঁর 'হাবড়ার ষ্টেসন যাওয়া ও আসার' হিসাব পাওয়া গেলেও মনে হয়, তিনি এই দিন ত্রিপুরার মহারাজা রাধাকিশোর মাণিক্যকে নিয়ে শান্তিনিকেতনে যান। এই অনুমানের কারণ, ২৭ পৌষ সরকারী ক্যাশবহির একটি হিসাব : 'ত্রিপুরার মহারাজ বাহাদুরের ২৩ পৌষ শান্তিনিকেতনে শুভ গমন করেন...২৩৭লত'—ত্রিপুরারাজ শান্তিনিকেতনে যান, অথচ রবীন্দ্রনাথ তাঁকে সঙ্গ দেননি এমন হওয়া সম্ভব নয়। এইটি রাধাকিশোরের দ্বিতীয়বার শান্তিনিকেতন পরিদর্শন। ২৭ পৌষ [বুধ 11 Jan] উক্ত হিসাবটি লেখা হয়, সুতরাং এই দিন বা তার আগেই ত্রিপুরারাজের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ কলকাতায় প্রত্যাবর্তন করেন। এসেই তিনি যথারীতি ভ্রাম্যমাণ—২৮ ও ২৯ পৌষ 'হেদুয়াতলা', ২ মাঘ পটলডাঙা ও বাগবাজার এবং ৩ মাঘ [সোম 16 Jan] তাঁর পার্শিবাগান যাওয়ার হিসাব পাওয়া যায়।

আশ্বিন মাস থেকে মহর্ষি বারবার অসুস্থ হয়ে পড়ছিলেন, একথা আমরা পূর্বেই বলেছি। মাঘ মাসের প্রথম থেকে তিনি আবার গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং ৬ মাঘ [বৃহ 19 Jan] দুপুর ১-৫৫ মিনিটে ৮৮ বৎসর ৮ মাস বয়সে দেহত্যাগ করেন। তাঁর মৃত্যুতে ঠাকুরপরিবারে তো বটেই, বাংলার ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক জীবনে এক বিশাল শূন্যতা সৃষ্টি হল। নিমতলা ঘাট শ্মশানে তাঁর শেষকৃত্যে বিশাল আত্মীয়গোষ্ঠীর সঙ্গে বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষ যোগদান করেন। 20 Jan-এর *The Bengalee* পত্রিকায় কালো বর্ডার-দেওয়া সম্পাদকীয়ের সঙ্গে শেষযাত্রার যে বিবরণ মুদ্রিত হয় তাতে দেখা যায়, রবীন্দ্রনাথের বন্ধুদের মধ্যে জগদীশচন্দ্র, মহিমচন্দ্র দেববর্মা, মোহিতচন্দ্র ও বিনয়েন্দ্রনাথ সেন প্রভৃতি শ্মশানেও উপস্থিত ছিলেন।

মাঘোৎসবের মাত্র পাঁচ দিন আগে মহর্ষির মৃত্যু হওয়ায় ১১ মাঘ [মঙ্গল 24 Jan] আদি ব্রাহ্মসমাজের পঞ্চসপ্ততিতম সাম্বৎসরিক অনুষ্ঠিত হবে না বলে প্রচারিত হলেও শেষ মুহূর্তে এই সিদ্ধান্ত পরিবর্তিত হয়। সায়ংকালে মহর্ষিভবনে 'ব্রহ্মোৎসব হইবে না এ কথা পূর্ব্ব হইতেই প্রচার হয় এ জন্য লোকসমাগম তাদৃশ হয় নাই।' শিবধন বিদ্যার্ণবের উদ্বোধনের পর 'উপাসনা শেষ হইলে শ্রীযুক্ত বাবু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর যে উপদেশ দিয়াছিলেন সময় ক্রমে তাহা প্রকাশ করিবার ইচ্ছা রহিল।'[৯৮] প্রবন্ধটি তত্ত্ববোধিনী-তে মুদ্রিত হয়নি, 'মহর্ষির লোকান্তর গমন' নামে ফাল্গুন-সংখ্যা ভারতী-তে [পৃ ১০১৯-২৮] সেটি প্রকাশিত হয় [দ্র মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ (১৩৭৫)। ২২-৩১]। ব্রহ্মোৎসব বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত কেন পরিবর্তন করা হল তার ব্যাখ্যা করে রবীন্দ্রনাথ বললেন: 'যিনি এই গৃহের স্বামী ছিলেন, তাঁহার মৃত্যুতে এই গৃহের কর্মপ্রবাহ সহসা স্তব্ধ হইতে পারে, সংসারযাত্রায় সমস্ত রথচক্র সহসা অবরুদ্ধ হইতে পারে, পরিজনবর্গের উৎসাহ উল্লাস সহসা ম্লান হইতে পারে—কিন্তু এই গৃহস্বামী যাঁহাকে তাঁহার চিরজীবনের স্বামী বলিয়া বরণ করিয়াছিলেন, তাঁহার উৎসব তো লেশমাত্র ক্ষুণ্ণ হইতে পারে না।' 'ঈশাবাস্যমিদং সর্বং' এই শ্লোকটি মহর্ষির জীবনে যে পরিবর্তন এনেছিল তা বর্ণনা করে তিনি বললেন : 'এই ক্ষুদ্র শ্লোকটি যে দেবেন্দ্রনাথের নিকট তাঁহার সমস্ত ভোগৈশ্বর্যের অপেক্ষা বৃহৎ হইয়া উঠিয়াছিল, তাঁহার জীবনের সেই ঘটনাটি এখন হইতে চিরদিন আমাদের সম্মুখে মুক্তির পথ নির্দেশ করিয়া দিবে, মানুষের ভোগের বন্ধন শিথিল ও তাহার স্বার্থসুখকে লঘু করিতে থাকিবে—ইহা মনুষ্যত্বের ভাণ্ডারে চিরদিনের জন্য সঞ্চিত হইয়া রহিল।'

মাঘোৎসবে প্রাতঃকালীন ও সায়ংকালীন উপাসনায় দশটি ব্রহ্মসংগীত পরিবেশিত হয়, তার মধ্যে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের দুটি ব্যতীত বাকি আটটি গানই রবীন্দ্রনাথের রচিত : ১। শক্তিরূপ হের তাঁর ২। (আমার) মন তুমি নাথ লবে হরে ৩। গরব মম হরেছ প্রভু ৪। নিশীথশয়নে ভেবে রাখি মনে ৫। সকল গর্ব দূর করি

দিব ৬। যে কেহ মোরে দিয়েছে সুখ ৭। দাঁড়াও আমার আঁখির আগে ৮। আজি যত তারা তব আকাশে। এর মধ্যে কেবল প্রথম গানটিই নূতন, যদিও অনেকগুলি গান এর আগে মাঘোৎসবে গীত হয়নি। প্রথম গানটির পরিচয় দেওয়া হল :

ইমন-চৌতাল। শক্তিরূপ হেরো তাঁর দ্র তত্ত্ব, ফাল্গুন। ১৮০-৮১; গীত ১। ১৮০-৮১; স্বর ২২; মূল গান : সপ্তসুর তিনগ্রাম দ্র গবেষণা গ্রন্থমালা ৩।২৬।

১৬ মাঘ [রবি 29 Jan] মহর্ষির শ্রাদ্ধ হয়। 'মহর্ষিদেবের পুত্রগণ দশাহ অশৌচ গ্রহণ করিয়া তাঁহার আদ্যশ্রাদ্ধ করেন।...প্রথমে ব্রাহ্মগণের মধুর সঙ্কীর্ত্তন হয়। পরে শ্রাদ্ধকর্ত্তারা রৌপ্য-যোড়শাদি উৎসর্গ করিলে আচার্য্যেরা ব্রহ্মোপাসনা করেন। উপাসনা শেষ হইলে শ্রীযুক্ত বাবু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর...প্রার্থনা করিয়াছিলেন...।'[৯৯]

রবীন্দ্রনাথের এই প্রার্থনা তত্ত্ববোধিনী [পৃ ১৭১-৭৫] ছাড়াও ফাল্গুন-সংখ্যা বঙ্গদর্শন [পৃ ৫৭১-৭৫] ও চৈত্র-সংখ্যা সমালোচনী [পৃ ৩৬৭-৭৪]-তে মুদ্রিত হয় [দ্র চারিত্রপূজা ৪। ৫৩০-৩৫; মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ। ৩২-৩৮]। মাঘোৎসবের ভাষণটির মতো এই প্রবন্ধেও তিনি পিতার জীবনসাধনার বৈশিষ্ট্যটিকে স্পষ্ট করার চেষ্টা করেছেন। প্রিন্স দ্বারকানাথের পুত্র হিসেবে অতুল বিলাসবৈভবের মধ্যে লালিত হয়েও পিতার মৃত্যুর পর ঋণভারাক্রান্ত পরিবারটিকে তিনি যেভাবে ধর্ম রক্ষা করে শান্তসংযত ধৈর্য ও সাহসের দ্বারা সংকটোত্তীর্ণ করেছিলেন, সেই ইতিহাস স্মরণ করে রবীন্দ্রনাথ বললেন : 'ঘোর সংকটের সময় একদিন তাঁহার সম্মুখে একই কালে শ্রেয়ের পথ ও প্রেয়ের পথ উদ্‌ঘাটিত হইয়াছিল। তখন সর্বস্ব হারাইবার সম্ভাবনা তাঁহার সম্মুখে ছিল—তাঁহার স্ত্রীপুত্র ছিল, তাঁহার মানসম্ভ্রম ছিল—তৎসত্ত্বেও যেদিন তিনি শ্রেয়ের পথ নির্বাচন করিয়া লইলেন সেই মহাদিনের কথা আজ যেন আমরা একবার স্মরণ করিবার চেষ্টা করি, তাহা হইলে আমাদের বিষয়লালসার তীব্রতা শান্ত হইয়া আসিবে এবং সন্তোষের অমৃতে আমাদের হৃদয় অভিষিক্ত হইবে। অর্জনের দ্বারা তিনি যাহা আমাদিগকে দিয়াছেন তাহা আমরা গ্রহণ করিয়াছি; বর্জনের দ্বারা তিনি যাহা আমাদিগকে দিয়াছেন তাহাও যেন গৌরবের সহিত গ্রহণ করিরার যোগ্য আমরা হইতে পারি।' একটি বিশেষ ধর্মসমাজের তিনি প্রধান ছিলেন, কিন্তু তাঁর পরিবারকে তিনি নিয়মের শাসনের দ্বারা বদ্ধ করেননি—'তিনি কোনো বিশেষ মতকে অভ্যাস বা অনুশাসনের দ্বারা আমাদের উপরে স্থাপন করিতে চান নাই—ঈশ্বরকে ধর্মকে স্বাধীনভাবে সন্ধান করিবার পথ তিনি আমাদের সম্মুখে মুক্ত করিয়া দিয়াছেন।' পরিশেষে রবীন্দ্রনাথ মহর্ষির বিভিন্নমুখী কৃতিত্বের উল্লেখ করে লিখেছেন : 'এই পরিবারের মধ্য দিয়া যিনি অচেতন সমাজকে ধর্মজিজ্ঞাসায় সজীব করিয়া দিয়াছেন, যিনি নূতন ইংরেজিশিক্ষার ঔদ্ধত্যের দিনে শিশুবঙ্গভাষাকে বহুযত্নে কৈশোরে উত্তীর্ণ করিয়া দিয়াছেন, যিনি দেশকে তাহার প্রাচীন ঐশ্বর্যের ভাণ্ডার উদ্‌ঘাটিত করিতে প্রবৃত্ত করিয়াছেন, যিনি তাঁহার তপঃপরায়ণ একলক্ষ্য জীবনের দ্বারা আধুনিক বিষয়লুব্ধসমাজে ব্রহ্মনিষ্ঠ গৃহস্থের আদর্শ পুনঃস্থাপিত করিয়া গিয়াছেন, তিনি এই পরিবারকে সমস্ত মনুষ্য-পরিবারের সহিত সংযুক্ত করিয়া দিয়া, ইহার সর্বোচ্চ লাভকে সমস্ত মনুষ্যের লাভ করিয়া দিয়া, ইহার পরম ক্ষতিকে সমস্ত মনুষ্যের ক্ষতি করিয়া দিয়া, আমাদিগকে যে গৌরব দান করিয়াছেন, অন্য সমস্ত ক্ষুদ্র মানমর্যাদা বিস্মৃত হইয়া অদ্য আমরা তাহাই স্মরণ করিব ও একান্ত ভক্তির সহিত তাঁহার নিকট আপনাকে প্রণত করিয়া দিব।'

শ্রাদ্ধ-সভা ভঙ্গ হয় রবীন্দ্রনাথের কালমৃগয়া গীতিনাট্যের 'যাও রে অনন্ত ধামে মোহ মায়া পাসরি' গানটির ঈষৎ পরিবর্তিত রূপ 'যাও রে অনন্ত ধামে দেহতাপ পাসরি' এবং ইন্দিরা দেবী-রচিত 'তাঁরে রেখো রেখো তব পায়' গান-দুটি দিয়ে।

দীনেশচন্দ্র সেন মহিমচন্দ্র দেববর্মাকে লেখেন : 'রবীন্দ্রবাবু মহর্ষির শ্রাদ্ধোপলক্ষে আমাকে ৫০ টাকা সাহায্য পাঠাইয়া দিয়াছেন, আরও কোন কোন দুঃস্থ ব্যক্তিকে এতদুপলক্ষে সাহায্য করা হইয়াছে।'[১০০] মহর্ষি তাঁর পারলৌকিক কার্যের জন্য উইলে দশ হাজার টাকা বরাদ্দ করেছিলেন, উদ্বৃত্ত অর্থ দরিদ্রকে দান করার নির্দেশ ছিল। শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্যাশ্রমকে এই উদ্বৃত্ত থেকে এক হাজার টাকা দেওয়া হয়।

অশৌচকালে রবীন্দ্রনাথের গতিবিধির হিসাব মেলে না, কিন্তু মহর্ষির শ্রাদ্ধের পরদিনই ১৭ মাঘ [সোম 30 Jan] তাঁকে 'জগদীশবাবুর বাটী' যাতায়াত করতে দেখা যায়। এ ছাড়া তাঁর ১৯ মাঘ পার্শিবাগান, ২০ মাঘ বাগবাজার, ২৫ মাঘ 'সিয়ালদহ ও মোহিনীবাবুর বাটী', ২৬ মাঘ 'মোহিনীবাবুর বাটী যাইবার' ও 'পার্শীবাগান যাতায়াতের' এবং ২৯ মাঘ পার্শিবাগান ও চৌরঙ্গি যাতায়াতের হিসাব পাওয়া যায়।

২২ মাঘ [শনি 4 Feb] অপরাহ্ণ ৫টায় 'মাননীয় বিচারপতি শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র প্রভৃতি দ্বাদশ জন সভ্যের অনুরোধ পত্রের অনুসারে 'মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্মরণার্থ সাহিত্য পরিষদের... বিশেষ অধিবেশন জেনারেল এসেম্‌ব্লিজ ইনষ্টিটিউশন হলে আহূত হইয়াছিল। সভাস্থলে প্রায় দুইশত গণ্যমান্য লোক উপস্থিত ছিলেন।' মহামহোপাধ্যায় চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এই শোকসভায় শিবনাথ শাস্ত্রী শোকপ্রস্তাব পাঠ করেন এবং যোগীন্দ্রনাথ বসু ও মোহিতচন্দ্র সেন সমর্থন করেন। দীনেশচন্দ্র সেন ও রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহর্ষি সম্বন্ধে দুটি প্রবন্ধ পাঠ করেন। সভায় উপস্থিত ব্যক্তিবর্গের তালিকায় রবীন্দ্রনাথের নাম দেখা যায়।

৩০ মাঘ [রবি 12 Feb] বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের কার্যনির্বাহক সমিতির নবম অধিবেশনে স্থির হয় : 'মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের ছবির জন্য রামেন্দ্রবাবু, হীরেন্দ্রবাবু, দীনেশবাবু, শৈলেশবাবু ও ব্যোমকেশবাবু আগামী বুধবার [৩ ফাল্গুন : 15 Feb] প্রাতে রবীন্দ্রবাবুর নিকট যাইবেন।' ঠাকুর পরিবারের পক্ষ থেকে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদকে মহর্ষির একটি তৈলচিত্র উপহার দেওয়া হয়।

রাজনারায়ণ বসুর জ্যেষ্ঠপুত্র যোগীন্দ্রনাথ বসু মহর্ষি-প্রণীত ব্রাহ্মধর্মের ব্যাখ্যান গ্রন্থের ইংরেজি অনুবাদ প্রকাশের অনুমতি চাইলে রবীন্দ্রনাথ ২৫ মাঘ [মঙ্গল 7 Feb] তাঁকে লেখেন : 'ব্যাখ্যানের ইংরাজি অনুবাদ তুমি যদি নিজে প্রকাশ কর আমাদের তাহাতে আপত্তি নাই।'[১০১] ইতিপূর্বে ৯ অগ্র° [বৃহ 21 Nov] তিনি মহর্ষির আত্মজীবনীর ইংরেজি অনুবাদ প্রকাশেও সম্মতি দিয়েছিলেন : 'পিতৃদেবের আত্মজীবনীর কিয়দংশ তুমি তর্জ্জমা করিয়া কোনো ইংরাজি কাগজে প্রকাশ করিয়াছ তাহাতে আমার সম্মতি আছে জানিবে।'[১০১] সত্যেন্দ্রনাথ কন্যা ইন্দিরা দেবীর সহায়তায় মহর্ষির আত্মজীবনীর সম্পূর্ণ ইংরেজি অনুবাদ প্রকাশ করেন 1909 [১৩১৫]-এ।

এর মধ্যে ২৩ মাঘ [শনি 5 Feb] রবীন্দ্রনাথ বেলুড়মঠে স্বামী বিবেকানন্দের জন্মোৎসবে যোগ দেন। ফাল্গুন ১৩১১-সংখ্যা উদ্বোধন-এ [পৃ ৮৮] লেখা হয় :

বিগত ৫ই ফেব্রুয়ারী বেলুড়মঠে স্বামী বিবেকানন্দের জন্মোৎসব উপলক্ষে কলিকাতা বিবেকানন্দ সমিতি কর্ত্তৃক এক সভা আহূত হয়। প্রায় ২৫০।৩০০ ছাত্র ও অন্যান্য ভদ্রলোকের সমাগম হয়। জাস্টিস সারদাচরণ মিত্র, অধ্যাপক জগদীশ বসু, কবিবর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রায় চুণিলাল বসু

বাহাদুর, পণ্ডিত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ প্রভৃতি অনেক গণ্যমান্য ব্যক্তি সভাস্থলে উপস্থিত ছিলেন। নিমন্ত্রিত ভদ্রলোকগণের যাতায়াতের সুবিধার জন্য সমিতি একখানি ষ্টিম লঞ্চ জোগাড় করিয়াছিলেন। স্বামী সারদানন্দ সভাপতির আসন গ্রহণ করেন।[১০১ক]

রবীন্দ্রনাথের ভূমিকা সম্ভবত উপস্থিতিতেই সীমাবদ্ধ ছিল। ২২ মাঘ তিনি বাগবাজারে গিয়েছিলেন, তার আগের দিন যান পার্শিবাগানে—অনুমিত হয়—জগদীশচন্দ্র ও নিবেদিতার যোগাযোগেই তাঁর বেলুড়-যাত্রা সংঘটিত হয়েছিল।

কাঙালীচরণ সেন-কৃত ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি প্রথম ভাগ প্রকাশিত হয় 14 Jan 1905 [শনি ১ মাঘ]। জ্যোতিরিন্দ্রনাথকে উৎসর্গীত এই প্রথম ভাগের 'ভূমিকা'য় কাঙালীচরণ লেখেন : '...আমার শুভানুধ্যায়ী "সঞ্জীবনীর" ম্যানেজার শ্রীযুক্ত বাবু দ্বিজেন্দ্রনাথ বসু ও অন্যান্য কতিপয় বন্ধু, ব্রহ্মসঙ্গীতের স্বরলিপি প্রকাশ করিলে উক্ত সঙ্গীত-শিক্ষার্থিগণের সমূহ উপকার হইবে এই বলিয়া বিশেষ উৎসাহ প্রদান করায়, আমার এই শুভ ইচ্ছা ও উদ্দেশ্য আমার প্রতিপালক পরম পূজনীয় শ্রীযুক্ত বাবু জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও দ্বিপেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহোদয়গণের নিকট ব্যক্ত করি। তাহাতে তাঁহারা এবিষয়ে আমকে যথেষ্ট উৎসাহ প্রদানপূর্ব্বক এই গ্রন্থ মুদ্রাঙ্কনের ব্যয়ভার স্বীকার করায় আমি ইহা সাধারণের সমীপে প্রকাশ করিতে সাহসী হইলাম।'

ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি-র দ্বিতীয় ভাগটি [মাঘ ১৩১২] কাঙালীচরণ রবীন্দ্রনাথকে উৎসর্গ করেন।

বর্তমান প্রথম ভাগে ১০১টি গানের স্বরলিপি মুদ্রিত হয়, তার মধ্যে রবীন্দ্রনাথ-রচিত গানের সংখ্যা ৫৭টি। ভারত সঙ্গীতসমাজ-প্রকাশিত ও জ্যোতিরিন্দ্রনাথ-সম্পাদিত সঙ্গীত-প্রকাশিকা পত্রিকার বিভিন্ন সংখ্যায় অধিকাংশ স্বরলিপি মুদ্রিত হয়েছিল।

মাঘ ১৩১১-সংখ্যা বঙ্গদর্শন [৪।১০] প্রকাশিত হয় 25 Jan [বুধ ১২ মাঘ]। এই সংখ্যায় রবীন্দ্রনাথের রচনা দুটি :

৫১৩-২০ 'উৎসবের দিন' দ্র ধর্ম। ১৩।৩৯২-৪০০

৫২৬-৩৭ 'নৌকাডুবি' ৫৫-৫৭ দ্র নৌকাডুবি ৫।৩৬২-৭৪ [৫১-৫২]

সঙ্গীত-প্রকাশিকা, মাঘ ১৩১১ [৪।৫] :

৮৯-৯০ গুজরাটি ভজন-একতালা। এ কি অন্ধকার এ ভারতভূমি দ্র স্বর ৪৭

৯২-৯৪ মাঝ-একতালা। সজনি সজনি রাধিকা লো দ্র ঐ ২১

১০৯-১০ ইমনকল্যাণ-সুরফাঁক্তা। সুন্দর বহে আনন্দ মন্দানিল দ্র ঐ ২৩

শেষ গানটির স্বরলিপি করেন কাঙালীচরণ সেন, প্রথম দুটির স্বরলিপিকারের নাম অনুল্লেখিত।

ফাল্গুন ১৩১১-তে সাময়িক পত্রে প্রকাশিত রবীন্দ্র-রচনার সূচীটিও এখানে দেখে নেওয়া যেতে পারে।

বঙ্গদর্শন, ফাল্গুন ১৩১১ [৪।১১] :

৫৪৮-৫৯ 'নৌকাডুবি' ৫৮-৫৯ দ্র নৌকাডুবি ৫।৩৭৪-৮৬ [৫৩-৫৪]

৫৭১-৭৫ 'প্রার্থনা' দ্র চারিত্রপূজা ৪।৫৩০-৩৪

ভারতী, ফাল্গুন ১৩১১ [২৮।১১] :

১০১৯-২৮ 'মহর্ষির লোকান্তর গমন' দ্র মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ [১৩৭৫]। ২২-৩১

তত্ত্ববোধিনী, ফাল্গুন ১৮২৬ শক [৭৩৯ সংখ্যা] :

১৭১-৭৫ [মহর্ষির আদ্যকৃত্য উপলক্ষে রবীন্দ্রনাথের প্রার্থনা] দ্র চারিত্রপূজা ৪।৫৩০-৩৪

এছাড়া পত্রিকাটির ১৮০-৮৩ পৃষ্ঠার মধ্যে রবীন্দ্রনাথ-রচিত আটটি ব্রহ্মসংগীত মুদ্রিত হয়।

সঙ্গীত-প্রকাশিকা, ফাল্গুন ১৩১১ [৪।৬] :

১১৮-২০ খাম্বাজ-ঝাঁপতাল। নিত্য নব সত্য তব দ্র স্বর ২২

১২০-২২. হাম্বীর-তেওরা। আর কত দূরে আছে সে আনন্দ-ধাম দ্র ঐ ২২

কাঙালীচরণ সেন দুটি গানেরই স্বরলিপি করেন।

দীর্ঘকাল অনুপস্থিতির পর রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনে যান ৬ ফাল্গুন [শনি 18 Feb]। এবারে বেশ কিছুদিন সেখানে থাকলেও সমসাময়িক কোনো পত্র না পাওয়ায় তাঁর জীবনযাত্রার কোনো বিবরণ দেওয়া সম্ভব নয়। পণ্ডিত বিধুশেখর শাস্ত্রীকে সংস্কৃত শিক্ষক হিসেবে বিদ্যালয়ে নিয়োগ করার কথা অনেক আগেই ঠিক হয়েছিল। তিনি ১০ মাঘ কাশী থেকে যাত্রা করে ১১ মাঘ [মঙ্গল 24 Jan] শান্তিনিকেতনে উপস্থিত হন। এবারে বিদ্যালয়ে এসে রবীন্দ্রনাথ তাঁর সঙ্গে পরিচিত হন। বিধুশেখরের পরবর্তী জীবনচর্যার ভূমিকা রবীন্দ্রনাথের সাহায্যে রচিত হয়েছিল। পক্ষান্তরে শান্তিনিকেতনের বহু উৎসব-পরিকল্পনায় বিধুশেখরের সাহায্য অপরিহার্য হয়ে ওঠে।

জাপানী সূত্রধর কুসুমতো সান-কে ছাত্রদের কাঠের কাজ শেখাবার জন্য নিয়োগ করা হয় এই সময়ে। ১৮ ফাল্গুনের [বৃহ 2 Mar] হিসাবে দেখা যায় : 'একজন জাপানী ছুতর মিস্ত্রীকে বোলপুর পাঠান ব্যায় সুরেন্দ্রবাবুর আদেশ মত ২৫৲'—কুসুমতো এইদিনই শান্তিনিকেতনে গিয়েছিলেন। সত্যরঞ্জন বসু এঁর সম্পর্কে লিখেছেন : 'তাঁর কাজের একাগ্রতা ও একক করণ-পদ্ধতি আমাদের খুবই তাঁর দিকে আকৃষ্ট করেছিল। কাজের সময় কথাবার্ত্তা একদম বল্‌তেন না। আমরা ছিলাম তাঁর কাঠের জোগানদার। তাঁকে কুসুমবাবু বলে সকলে ডাকতো। বেশ আলাপী ও সদা হাস্যমুখ। অল্পদিনের মধ্যেই দু'খানা নৌকা তৈরী করলেন। কাঠ-বাঁকানো ও জোড়া দেওয়ার পদ্ধতি নতুন ধরনের। একখানার তলদেশ চেপ্টা—নামকরণ হলো 'চিত্রা' আরেকখানা 'সোনার তরী' শিরতোলা তলদেশ। নৌকার গায়ে নাম লিখ্‌লেন নরেন ভট্টাচার্য্য মশায় রং দিয়ে। ভাসানো হলো বাঁধে।'[১০২] ছাত্রদের ডেস্ক, শেল্‌ফ, আলনা প্রভৃতি তৈরি করতে শেখাতেন তিনি। সুধীরঞ্জন দাস লিখেছেন, জুজুৎসু-শিক্ষক সানো সান্‌ আসার আগে কুসুমতো তাঁদের এই বিদ্যাও শেখাতেন। গৌরগোপাল ঘোষ জুজুৎসুতে বিশেষ পারদর্শী হয়ে উঠেছিলেন।[১০৩]

ইত্যবসরে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ রবীন্দ্রনাথের উপর একটি দায়িত্ব অর্পণ করে। বাংলা গবর্মেণ্ট প্রদেশের প্রাথমিক শিক্ষার অবস্থা পর্যালোচনা করার জন্য চারজন ইংরেজ ও তাঁদেরই অনুগত আই. সি. এস. কৃষ্ণগোবিন্দ গুপ্ত [K. G. Gupta]কে নিয়ে একটি কমিটি গঠন করে। কমিটি প্রাথমিক শিক্ষার সংস্কারকল্পে অনেকগুলি সুপারিশ করে। বাংলা পাঠ্যপুস্তকগুলি অল্পবিস্তর সংস্কৃতায়িত (Sanscritized) ভাষায় রচিত হওয়ায় তা পল্লীবাসী চাষীর সন্তানদের বোধগম্য হয় না বলে কমিটি সুপারিশ করে, একটি আদর্শপাঠ্যপুস্তক সমিতি গড়ে ইংরেজিতে পাঠ্যপুস্তক রচিত হোক এবং সেগুলি সরকারের অনুমোদন পেলে কমিশনার ও স্কুল-

ইন্স্পেক্টরদের সঙ্গে পরামর্শ করে শিক্ষা-অধিকর্তা বইগুলি স্থানীয় প্রচলিত ভাষায় (local vernaculars) তর্জমা করার ব্যবস্থা করবেন। কমিটির মতে, বিহারের উপভাষা ত্রিহুতি, ভোজপুরি ও মৈথিলি এবং বাংলায় উত্তর, পূর্ব, মধ্য ও পশ্চিম অঞ্চলে প্রচলিত উপভাষায় গ্রন্থগুলি তর্জমা করা উচিত। এই উদ্ভট সুপারিশ প্রকাশিত হওয়া মাত্রই স্থানীয় বুদ্ধিজীবীরা এর পিছনে সরকারের কুমতলব বুঝতে পারেন, বেঙ্গলী পত্রিকার সম্পাদকীয়তে একে সরাসরি 'The Partition Movement in Another Form' [25 Feb শনি ১৩ ফাল্গুন] নামে অভিহিত করা হয়। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ এই প্রস্তাবে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ক্ষতি আশঙ্কা করে ৭ ফাল্গুন [রবি 19 Feb] পরিষদের নবম মাসিক অধিবেশনে কুমার শরৎকুমার রায়ের সভাপতিত্বে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করে এবং 'A committee consisting of Sir Gooroodas Banerjee, Sarada Charan Mitra, Babu Rabindra Nath Tagore and four others was appointed to consider and report upon the recent Bengal Government Resolution on Primary Education.'[১০৪] রবীন্দ্রনাথ এর আগের দিনই শান্তিনিকেতনে চলে যান। সুতরাং তাঁর মতামত নিশ্চয়ই পত্রের দ্বারা ব্যক্ত হয়েছিল।

হীরেন্দ্রনাথ দত্ত প্রমুখের প্রস্তাবানুসারে ২১ ফাল্গুন [রবি 5 Mar] বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের দশম মাসিক অধিবেশনে 'বাংলা গভর্মেণ্টের প্রস্তাব সম্বন্ধে সাধারণের মতামত সংগ্রহ ও কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণের জন্য... কলিকাতার গণ্যমান্য ব্যক্তিকে ও প্রধান প্রধান সভার সম্পাদক ও সংবাদপত্রের সম্পাদকদিগকে পরামর্শসভায় আহ্বান' করা হয়। গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এই সভায় স্থির হয়, 'শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়কে কোন প্রকাশ্য স্থলে সাধারণকে আহ্বান করিয়া এতৎ সম্বন্ধে প্রবন্ধ পাঠের জন্য আহ্বান করা হইবে।'

এই সভায় কী প্রস্তাব নেওয়া হবে, রবীন্দ্রনাথকে নিশ্চয়ই আগেই জানিয়ে দেওয়া হয়েছিল। তিনি 'সোমবার' [*6 Mar : ২২ ফাল্গুন] পরিষদের সহ-সম্পাদক ব্যোমকেশ মুস্তাফীকে লেখেন :

> মিনার্ভার চেয়ে কার্জ্জনে বেশি জায়গা আছে। আমার প্রবন্ধটির নাম "সফলতার সদুপায়"। সভাপতি মেজদাদা হইলে কোনোমতেই চলিবে না। বরং নাটোরের মহারাজা ভাল। নতুবা হীরেন্দ্রবাবু, বা ত্রিবেদী মহাশয়, বা দীনেশবাবুকে ধরিবে—আত্মীয়ের মধ্যে কাহাকেও নয়। গুরুদাসবাবুকে উপস্থিত থাকা চাই। ভিড় সামলাইবার একটা সুব্যবস্থা করিয়ো। রবিবার রাত্রে তোমার পত্রের উত্তর দিতে না পারিয়া দুঃখিত হইলাম—সোমবার প্রাতে তোমার পত্র পাইয়াছি।... পুঃ পর্শু বুধবারে সকালের গাড়িতে কলিকাতায় যাইব।[১০৫]

এই চিঠি লেখার সময় 'স্বদেশী সমাজ' প্রবন্ধপাঠের অভিজ্ঞতার কথা নিশ্চয়ই তাঁর মনে হয়েছিল। কিন্তু তাঁর ইচ্ছামতো কার্জন থিয়েটার প্রবন্ধপাঠের আয়োজন করা যায়নি। 11 Mar [শনি ২৭ ফাল্গুন] বেঙ্গলী-তে লেখা হয়: 'At the Minerva Theatre today at 5 P.M. Babu Rabindranath Tagore will read a paper on "The best means of success" with special reference to the recommended changes in the curricula of the Lower Primary education. The meeting is open to the public.' কিন্তু পত্রিকার খবরটি ঠিক নয়। কোনো বিশেষ কারণবশত সভাটি জেনারেল অ্যাসেম্ব্লিজ ইনস্টিটিউশন হলে অনুষ্ঠিত হয়। রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী সভাপতিত্ব করেন।

বাংলা সরকার শেষ পর্যন্ত প্রস্তাবটি প্রত্যাহার করে, তাই চৈত্র-সংখ্যা বঙ্গদর্শন-এ প্রকাশিত প্রবন্ধটি আত্মশক্তি [১৩১২] গ্রন্থে সংকলনের সময়ে 'স্থানে স্থানে বাদ' দেওয়া হয়। এই বর্জিত পাঠের মূল অংশগুলি রবীন্দ্র-রচনাবলী-র 'গ্রন্থপরিচয়' [দ্র ৩।৬৪৪-৪৭]-এ উদ্ধৃত করা হয়েছে। এই অংশে রবীন্দ্রনাথ কমিটির

আপত্তিকর সুপারিশগুলি বর্ণনা করে বলেন : 'চারিজন ইংরেজ ও তাঁদের অনুগত একজন বাঙালি বাংলাদেশের শিক্ষাপ্রণালী ভিত্তিপত্তনে ভাষাবিচ্ছেদ ঘটানোটাকে 'matter of great importance' গুরুতর প্রয়োজনীয় ব্যাপার বলিয়া মনে করেন।...কমিটি বলিতেছেন, ইহাতে চাষীদের উপকার হইবে; কিন্তু... একতলায় এমন উপকার করিতে বসা ঠিক নয়, যাহাতে কিছুদিন পরেই দোতলায় ফাটল ধরিতে আরম্ভ হয়। সেটা দোতলার পক্ষে মন্দ এবং একতলার পক্ষেও ভালো নয়।...ভারতবর্ষে ভাষার বৈচিত্র্য আমাদিগকে যেমন খণ্ডবিখণ্ড করিয়াছে, এমনতরো গিরিমরুর ব্যবধানও করিতে পারে নাই। ইহার উপরেও যেখানে ভাষার যথার্থ বিচ্ছেদ নাই, সেখানেও যদি বিচ্ছেদ সযত্নে তৈরি করিয়া তোলা হয়...তবে—তবে কী আর বলিতে পারি, অন্তত দুই হাত তুলিয়া ব্রিটিশ সরকারকে আশীর্বাদ করিব না।'

প্রবন্ধের অতি-পল্লবিত গ্রন্থভুক্ত অংশে রবীন্দ্রনাথ মোটামুটি 'স্বদেশী সমাজ' প্রবন্ধের মূল বক্তব্যটির পুনরাবৃত্তি করেছেন। এখানে একটি নূতন কথা তিনি বললেন গবর্মেন্টের সঙ্গে সম্পর্ক রক্ষা সম্বন্ধে : 'এ কথা কেহ যেন না বোঝেন, তবে আমি বুঝি গবর্মেন্টের সঙ্গে কোনো সংস্রবই রাখিতে চাই না। সে যে রাগারাগি, সে যে অভিমানের কথা হইল...আমি আরো উল্টা কথাই বলিতেছি। আমি বলিতেছি, গবর্মেন্টের সঙ্গে আমাদের ভদ্ররূপ সম্বন্ধ স্থাপনেরই সদুপায় করা উচিত।...যেখানে বিনিময়ের সম্বন্ধ, দানপ্রতিদানের সম্বন্ধ, সেখানে উভয়েরই মঙ্গল—সেখানে দাবির পরিমাণ স্বভাবতই ন্যায্য হইয়া আসে এবং সকল কথাই আপোসে মিটিবার সম্ভাবনা থাকে। দেশে এরূপ ভদ্র অবস্থা ঘটিবার একমাত্র উপায়, স্বাধীন শক্তিকে দেশের মঙ্গলসাধনের ভিত্তির উপরে সমাজে প্রতিষ্ঠিত করা।...এমন কথা উঠিতে পারে যে, আমরা দেশের কাজ করিতে গেলে প্রবল পক্ষ যদি বাধা দেন। যেখানে দুই পক্ষ আছে এবং দুই পক্ষের সকল স্বার্থ সমান নহে, সেখানে কোনো বাধা পাইব না, ইহা হইতেই পারে না। কিন্তু, তাই বলিয়া সকল কর্মেই হাল ছাড়িয়া দিতে হইবে এমন কোনো কথা নাই। যে ব্যক্তি যথার্থই কাজ করিতে চায় তাহাকে শেষ পর্যন্ত বাধা দেওয়া শক্ত।'

এই প্রবন্ধে রাজনৈতিক আন্দোলনে নিজের অংশগ্রহণ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ যা বলেছেন, তাও যথেষ্ট উল্লেখযোগ্য—অব্যবহিত কাল পরে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সময়ে তিনি যে ভূমিকা নিয়েছিলেন, তার মানসিক পটভূমিকাও এর দ্বারা বুঝে নেওয়া সম্ভব। তিনি বললেন, তাঁর ভাষণের উদ্দেশ্য ইংরেজের সঙ্গে তর্ক করা নয়, বর্তমানে যে সমস্যা দেখা দিয়েছে সেই অবস্থায় দেশবাসীর কর্তব্য কী সে-সম্পর্কে নিজের মনোভাব ব্যক্ত করার সুযোগ পাওয়াটাই তাঁর কাছে মুখ্য—'নহিলে, এই সমস্ত বাদবিবাদের উন্মাদনা, এই-সকল ক্ষণস্থায়ী উত্তেজনার ঘূর্ণিনৃত্যের মধ্যে পাক খাইয়া ফিরতে আমার এক দিনের জন্যও উৎসাহ হয় না। জীবনের প্রদীপটিতে যদি আলোক জ্বালাইতে হয়, তবে সে কি এমন এলোমেলো হাওয়ার মুখে চলে। আমাদের দেশে এখন নিভৃতে চিন্তা ও নিঃশব্দে কাজ করিবার দিন—ক্ষণে ক্ষণে বারংবার নিজের শক্তির অপব্যয় এবং চিত্তের বিক্ষেপ ঘটাইবার এখন সময় নহে।' অল্প পরেই তিনি বললেন : 'আমি নিজের সম্বন্ধে একটা কথা কবুল করিতে চাই। কর্তৃপক্ষ আমাদের প্রতি কোনদিন কিরূপ ব্যবহার করিলেন তাহা লইয়া আমি নিজেকে অতিমাত্র ক্ষুব্ধ হইতে দিই না।' এইজন্য বঙ্গবিভাগের প্রস্তাব ও য়ুনিভার্সিটি বিল নিয়ে জননেতারা যখন অগ্নিময় বাক্যবর্ষণ করছেন, রবীন্দ্রনাথ তখন চুপ করে ছিলেন—বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সময়েও তিনি অন্য ধরনের ভূমিকা গ্রহণ করেন, আমরা যথাসময়ে সে-প্রসঙ্গ আলোচনা করব।

প্রবন্ধ-পাঠের পর রবীন্দ্রনাথ সম্ভবত কলকাতাতেই ছিলেন, কিন্তু অন্যান্যবার তাঁকে যেমন ভ্রমণরত দেখা যায় এবারে ক্যাশবহিতে সেইরূপ কোনো হিসাব দেখা যায় না। হয়তো, প্রবন্ধে তিনি যে গঠনমূলক কাজকর্ম করার সুপারিশ করেছিলেন সে-সম্পর্কে আলোচনা করার জন্য বিশিষ্ট ব্যক্তিরা তাঁর কাছেই আসাযাওয়া করছিলেন। এই বিষয়ে একটি বিবরণ পাওয়া যায় বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের কার্যনির্বাহক সমিতির হস্তলিখিত বিবরণীর খাতায়। ৬ চৈত্র [রবি 19 Mar] উক্ত সমিতির একটি বিশেষ অধিবেশনে তিনি 'নিমন্ত্রিত'-রূপে উপস্থিত থাকেন। এই অধিবেশনে 'আলোচ্য'-সূচীর তৃতীয় দফা ছিল : 'পরিষদের ভবিষ্যৎ উন্নতি ও প্রসারের নিমিত্ত রবীন্দ্রবাবুর কতিপয় প্রস্তাব।' কার্যবিবরণীতে লেখা হয় :

৩। রবীন্দ্র বাবু প্রস্তাব করিলেন, পরিষদের একাদশ বৎসর অতীত হইতে চলিল। এখন কিছু কিছু কাজ হাতে কলমে করা আবশ্যক। ইতিহাস, নৃতত্ত্ব এবং ভাষাতত্ত্ব সম্বন্ধে পরিষৎ স্বাধীনভাবে অনুসন্ধান আরম্ভ করুন। এজন্য ছাত্রগণকে নিযুক্ত উৎসাহিত ও প্রলোভিত করা আবশ্যক। এখন পরীক্ষা দিয়া ছাত্রেরা অবসর পাইবে। এই অবসরে তাহারা স্ব স্ব গ্রামে ঐ সকল বিষয়ের তথ্যসংগ্রহ করুক। পরিষৎ তাহাদিগকে এ বিষয়ে উপদেশ দিয়া কার্য্য করিবার নিমিত্ত পরিচালন করুন। এখন সহরে বিএ, ও এফএ পরীক্ষার্থীরা উপস্থিত আছে, পরিষৎ একদিন তাহাদিগকে আমন্ত্রণ করুন এবং এবিষয়ে তাহাদিগকে বলুন। রবীন্দ্রবাবুর এই প্রস্তাবের উপকারিতা ও উপযোগিতা বুঝিয়া সকলেই ইহার অনুমোদন করিলেন এবং বহু আলোচনার পর স্থির হইল, বিএ ও এফএ পরীক্ষার শেষ দিন ছাত্রগণকে আমন্ত্রণ করিতে হইবে। ঐ দিন রবীন্দ্রবাবু "ছাত্রগণের প্রতি নিবেদন" নামে একটি প্রবন্ধ পাঠ করিবেন এবং হীরেন্দ্রবাবু, রামেন্দ্রবাবু, দীনেশবাবু প্রভৃতিও কিছু কিছু বলিবেন। ছাত্রগণের আনন্দবর্দ্ধনের জন্য সঙ্গীতাদির ব্যবস্থা থাকিবে। হীরেন্দ্রবাবু, নগেন্দ্রবাবু (গুপ্ত), অমূল্যবাবু, রামেন্দ্রবাবু, মন্মথবাবু ও রবীন্দ্রবাবু ছাত্রদিগের জন্য নিয়মাবলী প্রস্তুত করিবেন। ক্লাসিক বা কার্জ্জন থিয়েটারে সভা আহূত হইবে।

এই প্রস্তাব অনুসারে ১৭ চৈত্র [বৃহ 30 Mar] অপরাহ্ন ৬টায় ক্লাসিক থিয়েটারে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের বিশেষ অধিবেশন আহূত হয়। 'থিয়েটার গৃহ সহস্রাধিক ছাত্রে পরিপূর্ণ হইয়াছিল ও সুশৃঙ্খলার সহিত বিশেষ অধিবেশনের কার্য্য সম্পন্ন হইয়াছিল। সভাপতি মহাশয় উপস্থিত হইতে কিঞ্চিৎ বিলম্ব ঘটায় শ্রীযুক্ত ডাক্তার জগদীশচন্দ্র বসু মহাশয় প্রথমে সভাপতির আসন গ্রহণ করেন, পরে সভাপতি মহাশয় [সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর] উপস্থিত হইলে তাঁহাকে আসন ছাড়িয়া দেন।'[১০৬]

মহেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সরস্বতীবন্দনা-বিষয়ক একটি সংস্কৃত গান গেয়ে সূচনা করার পর রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'ছাত্রদের প্রতি সম্ভাষণ'-শীর্ষক দীর্ঘ প্রবন্ধটি [দ্র বঙ্গদর্শন, বৈশাখ ১৩১২।১২-২৭; আত্মশক্তি ৩।৫৭৯-৯৪] পাঠ করেন। তিনি সেই যুগের একজন শ্রেষ্ঠ শিক্ষাবিদ্ ছিলেন। তাই প্রথমেই তিনি প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থার ত্রুটি নির্দেশ করে বললেন : 'জ্ঞানশিক্ষা নিকট হইতে দূরে, পরিচিত হইতে অপরিচিত দিকে গেলেই তাহার ভিত্তি পাকা হইতে পারে। যে বস্তু চতুর্দিকে বিস্তৃত নাই, যে-বস্তু সম্মুখে উপস্থিত নাই, আমাদের জ্ঞানের চর্চা যদি প্রধানত তাহাকে অবলম্বন করিয়াই হইতে থাকে, তবে সে-জ্ঞান দুর্বল হইবেই। যাহা পরিচিত তাহাকে সম্পূর্ণরূপে যথার্থভাবে আয়ত্ত করিতে শিখিলে তবে যাহা অপ্রত্যক্ষ, যাহা অপরিচিত, তাহাকে গ্রহণ করিবার শক্তি জন্মে।' অথচ ইংরেজি পাঠ্যপুস্তক বা তার অনুকরণে রচিত গ্রন্থ মুখস্থ করে দেশীয় ছাত্রেরা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়, ফলে নিজের দেশের সঙ্গেই তাদের পরিচয় হয় না, শিক্ষাও অসম্পূর্ণ থাকে। 'ধারণা যখন অস্পষ্ট ও দুর্বল থাকে তখন উদ্ভাবনাশক্তির আশা করা যায় না। এমন-কি, তখনকার সমস্ত উদ্ভাবনা অবাস্তবিক অদ্ভুত আকার ধারণ করে। এইজন্যই আমরা কেতাবে ইতিহাস শিখিয়াও ঐতিহাসিক বিচার তেমন করিয়া আয়ত্ত করিতে পারি নাই; কেতাবে বিজ্ঞান শিখিয়াও অভূতপূর্ব কাল্পনিকতাকে বিজ্ঞান বলিয়া চালাইয়া থাকি; ধর্ম, সমাজ, এমন-কি, সাহিত্য-সমালোচনাতেও অপ্রমত্ত পরিমাণবোধ রক্ষা করিতে পারি না।' আমাদের দেশহিতৈষা এর প্রমাণ, দেশের লোকের হিতের সঙ্গে এই হিতৈষার যোগ নেই। যোশিদা তোরাজিরো নামক

একজন জাপানী দেশপ্রেমিকের উদাহরণ দিয়ে রবীন্দ্রনাথ বলেন, প্রথমে তিনি পায়ে হেঁটে সমস্ত দেশ ঘুরে আগে দেশকে জেনে পরে ছাত্র পড়ানোয় ব্রতী হন—শেষে দেশের জন্য তিনি প্রাণ বিসর্জন করেন। 'দেশের বাস্তবিক জ্ঞান এবং দেশের বাস্তবিক কাজের উপরে যখন দেশহিতৈষা প্রতিষ্ঠিত হয় তখনই তাহা মাটিতে বদ্ধমূল গাছের মতো ফল দিতে থাকে।'

রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধ বা ভাষণের সমালোচকদের একটি প্রধান অভিযোগ ছিল, তিনি কাজ করার উৎসাহ দিতেন কিন্তু কী কাজ তার নির্দেশ দিতেন না। বর্তমান ভাষণটির ক্ষেত্রে অনুরূপ অনুযোগের সুযোগ ছিল না। বাংলার বিভিন্ন জেলা থেকে আগত পরীক্ষার্থীদের তিনি বলেন, নিজের অঞ্চলে ফিরে গিয়ে সেখানকার উপভাষার উপকরণ, ধর্ম্মসম্প্রদায় ও জনগোষ্ঠীর বিবরণ, ব্রতপার্বণ, গ্রাম্যছড়া, প্রচলিত গান প্রভৃতি সংগ্রহ করে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের আরব্ধ কাজগুলি সম্পূর্ণ করতে। রবীন্দ্রনাথ নিজেই জীবনের বিভিন্ন পর্বে এই কাজগুলি করেছেন ও অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায়, দীনেন্দ্রকুমার রায়, দক্ষিণারঞ্জন মিত্রমজুমদার প্রভৃতিকে উৎসাহিত করেছেন। কিন্তু দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে থাকা ছাত্রগোষ্ঠীকে এই কাজে নিয়োজিত করার সুফল কিছুদিনের মধ্যেই দেখা দিয়েছে—বৃহত্তর বাংলার বিভিন্ন স্থানে শাখা-পরিষৎ স্থাপন করে যে-সব তথ্য ও উপকরণ সংগৃহীত হয় তার ফল আমরা আজও ভোগ করছি। রবীন্দ্রনাথ বললেন, 'শুধু যে দেশকে জানাই চরম লক্ষ্য, তাহা আমি বলি না—যেখানেই হোক-না কেন, মানব-সাধারণের মধ্যে যা-কিছু ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া চলিতেছে তাহা ভালো করিয়া জানারই একটা সার্থকতা আছে। পুঁথি ছাড়িয়া সজীব মানুষকে প্রত্যক্ষ পড়িবার চেষ্টা করাতেই একটা শিক্ষা আছে; তাহাতে শুধু জানা নয়, কিন্তু জানিবার শক্তির এমন একটা বিকাশ হয় যে কোনো ক্লাসের পড়ায় তাহা হইতেই পারে না।' তাঁর নিজের বিদ্যালয়ে পাঠ্যাতিরিক্ত কার্যক্রমের যে সুব্যবস্থা তিনি করেছিলেন, তার কিছু-কিছু পরিচয় আমরা যথাস্থানে পাব। মনকে সব দিক দিয়ে জাগিয়ে তোলাকেই রবীন্দ্রনাথ শিক্ষা বলে মনে করতেন, ব্রহ্মচর্যাশ্রম ও বিশ্বভারতীতে এই উদ্দেশ্য নিয়েই তিনি বহু কার্যক্রম প্রবর্তন করেছিলেন। আমাদের আলোচ্য সময়েও পরিষদের ছাত্রসভ্যেরা কীধরনের কর্মকাণ্ডের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিলেন সমকালীন পত্রপত্রিকায় তার সাক্ষ্য পাওয়া যায়।

প্রবন্ধের শেষাংশে রবীন্দ্রনাথ তাঁর তরুণবয়সের উদ্দীপনাসম্বল দেশহিতৈষিতার হাস্যকরত্বের বিবরণ দিয়েছেন। বলা বাহুল্য, সঞ্জীবনী সভার বালখিল্য কার্যকলাপ ও স্বর্ণকুমারী দেবীর 'স্নেহলতা' উপন্যাসে চিত্রিত তার বিবরণ তাঁর মনে পড়েছিল। এই বর্ণনা অপ্রাসঙ্গিক নয়, কারণ তারই সূত্রে তিনি বলেছেন : 'ভারতমাতা যে হিমালয়ের দুর্গম চূড়ার উপরে শিলাসনে বসিয়া কেবলই করুণ সুরে বীণা বাজাইতেছেন, এ কথা ধ্যান করা নেশা করা মাত্র—কিন্তু, ভারতমাতা যে আমাদের পল্লীতেই পঙ্কশেষ পানাপুকুরের ধারে ম্যালেরিয়াজীর্ণ প্লীহারোগীকে কোলে লইয়া তাহার পথ্যের জন্য আপন শূন্য ভাণ্ডারের দিকে হতাশদৃষ্টিতে চাহিয়া আছেন, ইহা দেখাই যথার্থ দেখা।' জমিদারী পরিদর্শনের সময়ে তিনি এইরূপ অজস্র ভারতমাতাকে প্রত্যক্ষ করেছিলেন। তাঁর গঠনমূলক পরিকল্পনার চেয়ে জননেতারা যখন রাজনৈতিক চাতুর্যের খেলাকেই প্রাধান্য দিলেন, তখন তিনি নিজের জমিদারীতেই গ্রামগঠনের কর্মকাণ্ড শুরু করেন, যার পরিণতি শ্রীনিকেতনে।

রবীন্দ্রনাথের 'প্রবন্ধপাঠের পর শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত পরিষদের প্রতিনিধিস্বরূপে ছাত্রগণকে অভ্যর্থনা করিয়া রবীন্দ্রবাবুর উপদেশমত কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবার জন্য আহ্বান করিলেন। সাহিত্যপরিষৎ একশ্রেণীর ছাত্র সভ্যগ্রহণের প্রস্তাব করিয়াছেন। তাহারা পরিষদের নির্দ্দেশমতো বাঙ্গালার সমাজতত্ত্ব, ভাষাতত্ত্ব, ইতিহাস,

প্রাচীন সাহিত্য প্রভৃতির অনুসন্ধান করিবেন। বাঙ্গালা দেশ সম্বন্ধে যাবতীয় জ্ঞাতব্যের অনুসন্ধানে লোকবল আবশ্যক। অক্সফোর্ড হইতে প্রকাশিত প্রসিদ্ধ ইংরাজি অভিধান সঙ্কলনের জন্য দুই লক্ষ volunteer আবশ্যক হইয়াছিল। এখানেও সেইরূপ লোকবল আবশ্যক। ছাত্রগণ আপাতত পরিষদের সাহায্যার্থে volunteer শ্রেণীতে নিযুক্ত হউন।' অমৃতলাল বসু, বিপিনচন্দ্র পাল ও সভাপতি সত্যেন্দ্রনাথও ছাত্রদের উদ্দেশে সংক্ষিপ্ত ভাষণ দেন। 'শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ বসু কর্ত্তৃক সঙ্গীতের পর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ছাত্রদের পরিতোষের জন্য "আমায় বোল না গাহিতে বোলো না" এই গানটি গাহিলেন।'

এই বক্তৃতাসভার আগে রবীন্দ্রনাথ আরও দুটি অনুষ্ঠানে যোগ দেন। কবি-নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলাল রায় খামখেয়ালী সভা-র উৎসাহী অভ্যাগত-রূপে অনেকগুলি অধিবেশনে যোগ দিয়েছিলেন। বর্তমানে তিনি সেই সভার আদর্শে 'পূর্ণিমা-মিলন' নামে একটি বন্ধুসম্মিলনীর পরিকল্পনা করেন, প্রতিটি পূর্ণিমা তিথিতে এক-এক জনের বাড়িতে সভা বসবে বলে স্থির হয়; সভাটির সংবাদ পত্রিকায় প্রকাশিত হত, সেখানে একে 'পৌর্ণমাসী সভা' নামে অভিহিত করা হয়েছে। প্রথম পৌর্ণমাসী সভা বা পূর্ণিমা-মিলনের আসর বসে দ্বিজেন্দ্রলালের আহ্বানে তাঁর ৫ নম্বর সুকিয়া স্ট্রীটের বাসভবনে দোলপূর্ণিমার সন্ধ্যায় অর্থাৎ ৮ চৈত্র [মঙ্গল 20 Mar] তারিখে। দ্বিজেন্দ্রলালের জীবনীকার দেবকুমার রায়চৌধুরী লিখেছেন :

এই অধিবেশনে কলিকাতার প্রায় সকল নাম-জাদা সাহিত্যসেবীই হাজির হইয়াছিলেন; এবং ইহার অল্প পূর্ব্বে দ্বিজেন্দ্রলালের সহিত রবীবাবুর মননামালিন্যের সূত্রপাত হইয়া থাকিলেও, এক্ষেত্রে কবীন্দ্রও সশরীরে উপস্থিত ছিলেন। সেবার প্রাণ খুলিয়া আলাপ-পরিচয়, গল্পগুজোব, রঙ্গব্যঙ্গ, সঙ্গীতালাপ ও কবিতা-পাঠ প্রভৃতি হয়। এবং সব-শেষে অল্পাধিক পরিমাণে সকলে মিষ্টিমুখ করিয়া, গৃহে ফিরিবার পূর্ব্বে, পরমোল্লাসে "ফাগুনে সে ফাগের খেলা"ও যথারীতি সম্পন্ন করেন। এখেলায় সমাগত সকলেই সাগ্রহে যোগ দিয়াছিলেন, এবং রবীন্দ্রনাথের সেই শুভ্র-সুন্দর পরিচ্ছদও এই ফাগ-রাগে একেবারেই 'লালে-লাল' হইয়া গিয়াছিল।—এ বিষয়ে একটু বক্তব্য আছে। বহুক্ষণ ফাগ-খেলার পর একে একে যখন সকলেই রঞ্জিত হইয়া উঠিলেন তখন দ্বিজেন্দ্রলাল দেখেন—রবিবাবু সে-খেলায় যোগ না দিয়া, একটু পাশ কাটাইয়া, দূর হইতে তখনও বেশ দর্শকভাবেই সে দৃশ্য উপভোগ করিতেছেন,—তাঁহার গায়ে তখনও কেহ ফাগ দেয় নাই। ইহা যেই নজরে পড়া অমনই দ্বিজেন্দ্রলাল মুঠো-মুঠো ফাগ লইয়া রবিবাবুর আপাদমস্তক রঞ্জিত করিয়া দিলেন; এবং তাহাতে রবিবাবু যেন খুবই সন্তুষ্ট হইয়া, তাঁহার সেই স্বভাব-কোমল মধুকণ্ঠে, মৃদু-মৃদু হাসিয়া, অনুরাগ-স্নিগ্ধ স্বরে কহিলেন,—"আজ দ্বিজুবাবু শুধু যে আমাদের হৃদয়-মনোরঞ্জন করেছেন তা নয়,—তিনি আজ আমাদের এই সর্ব্বাঙ্গ-রঞ্জন করে ছাড়লেন।" বলা বাহুল্য—রবিবাবুর সে কথা সকলেই সহাস্যে সমর্থন করিলেন। এই অধিবেশনে রবিবাবু তাঁহার "সে যে আমার জননীরে" নামক করুণ-মধুর সঙ্গীতটি স্বয়ং গান করিয়া সমাগত সকলকে বিমোহিত করেন।[১০৭]

অপর অনুষ্ঠানটির বিবরণ পাওয়া যায় ব্রহ্মচর্যাশ্রমের এককালীন শিক্ষক যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের স্মৃতিকথায়:

১৯০৫ সালের গোড়ার দিকে একদিন কাগজে দেখিলাম শ্রীহট্টের লোকদের এক পারিতোষিক বিতরণী সভায় রবীন্দ্রনাথ সভাপতি হইবেন আর বিপিনচন্দ্র পাল মহাশয় বক্তৃতা করিবেন। এবারে সময়ের অনেক আগে সভায় গেলাম, রবীন্দ্রনাথকে দেখিলাম ও তাঁর মৌখিক বক্তৃতা শুনিলাম। এই সময়ে তিনি প্রায়ই লিখিত প্রবন্ধ পাঠ করিতেন। বক্তৃতার কথায় বা ধরণের মধ্যে রবীন্দ্রনাথোচিত চমৎকারিতা কিছু পাইলাম না। কেবল মনে আছে এই বক্তৃতায় তিনি একজন জাপানী দেশপ্রেমিক যোশিদা তেরোজার কথা উল্লেখ করিয়া বলেন যে, ইনি শুধু হাতে সমস্ত দেশ ঘুরিয়া দেশের পরিচয় লাভ করেন। দেশকে ভালবাসিতে ও দেশের কাজ করিতে হইলে দেশের জ্ঞান থাকা চাই।[১০৮]

পাঠকের মনে পড়তে পারে, 'ছাত্রদের প্রতি সম্ভাষণ' প্রবন্ধেও রবীন্দ্রনাথ যোশিদা তোরাজিরো-র উল্লেখ করে অনুরূপ কথাই বলেছিলেন। সভাটির তারিখ বা অন্যান্য বিবরণ উদ্ধার করা যায়নি।

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের বিশেষ অধিবেশনের দু'দিন পরে ১৯ চৈত্র [শনি 1 Apr] রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনে যান। এখান থেকে লেখা তাঁর সমকালীন চিঠিপত্রের সংখ্যা স্বল্প হওয়ায় তাঁর কার্যকলাপ ও ভাবনাচিন্তার বিবরণ দেওয়া শক্ত। বিদ্যালয়ের অর্থসংকট মোচনের জন্য পুরীর বাড়ি ও জমি বিক্রয়ের জন্য

তিনি এই বৎসরের গোড়া থেকেই সচেষ্ট হয়েছিলেন, ২৬ বৈশাখ রমণীমোহন চট্টোপাধ্যায়কে লেখা তাঁর পত্র থেকে তা জানা যায়।[১০৮ক] সেই চেষ্টা বৎসরের শেষে ফলবতী হওয়ার মুখে। তিনি *11 Apr [মঙ্গল ২৯ চৈত্র] ভাগিনেয় সত্যপ্রসাদকে লেখেন : 'আমার পুরীর বাড়ি বিক্রির বন্দোবস্ত সদা নায়েবকে ডেকে সত্বর করে দিয়ো।[১০৯] এর এক সপ্তাহ পরেই ৫ বৈশাখ ১৩১২ [মঙ্গল 18 Apr 1905] তাঁর ক্যাশবহিতে এই বিক্রয়ের হিসাব পাওয়া যায় : 'মা° কুমার নগেন্দ্রনাথ মল্লিক দং পুরীর সমুদ্র তীরবর্ত্তির জমী ও বাঙ্গালা বিক্রয়ের মূল্য পাওয়া যায়/নোট তিন কেতা গুঃ চরণদাস চট্টোপাধ্যায় ৩০০০৲'। আর এক সপ্তাহ পরে ১২ বৈশাখ এই টাকা 'শ্রীযুক্ত খোদ বাবু মহাশয়ের নিকট' 'শান্তিনিকেতনের বাটী তৈয়ারী দেনা শোধ দিবার জন্য পাঠান' হয়।

মহর্ষির উইলের একজিকিউটার ছিলেন রবীন্দ্রনাথ, দ্বিপেন্দ্রনাথ ও সুরেন্দ্রনাথ। মহর্ষির মৃত্যুর পর তাঁরা উইলের প্রোবেট [Probate] নেবার দরখাস্ত করেন 25 Feb [শনি ১৩ ফাল্গুন], রেজিস্ট্রার W. R. Fink এই দরখাস্ত মঞ্জুর করেন 23 Mar [বৃহ ১০ চৈত্র]। পরের দিনই তাঁরা কার্যপরিচালনার জন্য মধুসূদন দাস, প্রসন্নকুমার চাকী, কুঞ্জবিহারী সরকার, কেদারনাথ অধিকারী ও ত্রৈলোক্যনাথ দাসের অনুকূলে আমমোক্তারনামা [Power of Attorney] প্রদান করেন। মহর্ষির উইল ছিল শর্ত-কণ্টকিত, তার দায় নিতে হয়েছে একজিকিউটরদের। বিভিন্ন আত্মীয়স্বজন ও প্রতিষ্ঠানের মাসোহারা মিটিয়ে বিরাহিমপুর ও কালীগ্রাম পরগণার জমিদারীর লভ্যাংশ বণ্টিত হয়েছে দ্বিজেন্দ্রনাথ, সত্যেন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্রনাথের মধ্যে। এর প্রথম হিসাবটি, যা আমরা পেয়েছি, সেটি ৪ চৈত্রের [শুক্র 17 Mar] : 'মা° ঁমহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের এষ্টেটের একজিকিউটারগণ দং বিরাহিমপুর ও কালীগ্রামের ১৩১১।১২ সালের মুনাফার টাকার মধ্যে নিজ অংশের হিসাবে পাওয়া যায় ১০০০৲'। এর পর থেকে রবীন্দ্রনাথ প্রায় প্রতি মাসেই কম-বেশি ১২৫০৲ থেকে ১৫০০৲ টাকা করে পেয়েছেন। খরচের দায়ও বেড়েছে। একটি দলিলে 8 Mar [বুধ ২৪ ফাল্গুন] সুরেন্দ্রনাথ জোড়াসাঁকো বাড়ির মালিকদের জানিয়েছেন, ১৩১১ বঙ্গাব্দের পর এস্টেট সম্পত্তি থেকে উক্ত বাড়ির জন্য খরচপত্র করা হবে না বলে June 1905 কিস্তির ট্যাক্স ইত্যাদি যেন মালিকরাই বহন করেন।[১১০] একটি ফর্দ দিয়ে ২৮ চৈত্র [সোম 10 Apr] রবীন্দ্রনাথ সম্ভবত সুরেন্দ্রনাথকেই লিখছেন : 'বাটি হেফাজতের জন্য মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের একজিকিউটরগণ আমার প্রাপ্য অংশ হইতে এই হিসাবানুযায়ী প্রতি মাসে (অন্য পৃথক বন্দোবস্তের বিষয় জানান পর্য্যন্ত) ২৪৲ টাকা করিয়া নিতে থাকিবেন, এবং বৈশাখ মাসের অতিরিক্ত ৭ টাকা ['প্লেগনিবারণার্থ'] নিবেন।'[১১১] পরের দিন তিনি সত্যপ্রসাদকে লিখেছেন : 'এবারে আর বিলম্ব না করে তোমার এঞ্জিনিয়ারকে ডেকে পার্টিশান্ দেয়ালগুলো একতলা থেকে তেতালা পর্য্যন্ত তুলিয়ে দাও।...দোতলার ঘরগুলো এইবার তুমি অধিকার করে ব্যবহার করতে থাক। **বাড়ি** apportionment-এর কি হল তার কোনো খবর পাওয়া গেল না।'[১১২] 'দোতলার ঘর' বলতে তিনি লালবাড়ির ঘরগুলিই বুঝিয়েছেন—একতলার ঘরগুলি দেওয়া হয়েছিল সদর কাছারির জন্য, বিনিময়ে তিনি মাসে ১০০ টাকা করে ভাড়া পেয়েছেন।

বঙ্গদর্শন-এর চৈত্র ১৩১১-সংখ্যা [৪।১২] প্রকাশিত হয় 25 Mar [শনি ১২ চৈত্র]। এই সংখ্যায় রবীন্দ্র-রচনা দুটি :

৫৮৫-৯৬ 'নৌকাডুবি' ৬০-৬১ দ্র নৌকাডুবি ৫।৩৮৭-৪০০ [৫৫]

৬২২-৪৯ ‘সফলতার সদুপায়’ দ্র আত্মশক্তি ৩।৫৫৯-৭৮

সমালোচনী, চৈত্র ১৩১১ [৩।১২] :

৩৬৭-৭৪ ‘প্রার্থনা’ দ্র চারিত্রপূজা ৪।৫৩০-৩৪

সঙ্গীত-প্রকাশিকা, চৈত্র ১৩১১ [৪।৭] :

১৩৭-৩৯ ইমন-চৌতাল। শক্তিরূপে হের তাঁর দ স্বর 22

১৩৯-৪১ মিশ্র ছায়ানট-ঝাঁপতাল। (আমার) মন তুমি নাথ লবে হরে দ্র ঐ ২২

দুটি গানেরই স্বরলিপি করেন কাঙালীচরণ সেন।

আগামী বৎসরের বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মেলন ময়মনসিংহ শহরে আরম্ভ হওয়ার কথা ছিল ৯ বৈশাখ ১৩১২ [শনি 22 Apr 1905] তারিখে। এই উপলক্ষে শিল্প ও কৃষি প্রদর্শনীর সঙ্গে একটি সারস্বত সম্মিলনের আয়োজন হয়। 28 Mar [মঙ্গল ১৫ চৈত্র] বেঙ্গলী-র বিশেষ সংবাদদাতা খবর পাঠান : ‘Babu Rabindranath Tagore will preside at the inaugural meeting of the Mymensingh Saraswat Exhibition.’[১১৩] রবীন্দ্রনাথের পত্রে এর স্বীকৃতি আছে, কিন্তু অসুস্থতার জন্য তিনি সম্মিলনে যোগ দিতে পারেননি; ৭ বৈশাখ তিনি রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীকে লেখেন : ‘আমি ময়মনসিংহে নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিয়াছিলাম কিন্তু বিধাতা আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া আমাকে অর্শ রোগ প্রেরণ করিয়াছেন—এবার দেশের জন্য কিছু করা হইল না, ঘরে বসিয়াই প্রচুর রক্তপাত করিতেছি।’[১১৪]

এছাড়া বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের কার্যনির্বাহক সমিতি ২২ চৈত্র [মঙ্গল 4 Apr] সমিতির দশম অধিবেশনে প্রস্তাব নেয় : ‘আগামী বর্ষের কর্ম্মচারি-নিয়োগ সম্বন্ধে পরামর্শের পর স্থির হইল যে সভাপতির পদ গ্রহণের জন্য মাননীয় শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র এম্ এ বি এল্ মহাশয়কে এবং তাঁহার স্থানে সহকারী সভাপতি পদগ্রহণের জন্য শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়কে অনুরোধ করা হইবে।’[১১৫] রবীন্দ্রনাথ ইতিপূর্বেই ১৩০১-০৩ ও ১৩০৮ বঙ্গাব্দে এই পদে ছিলেন। বর্তমান প্রস্তাবটি তিনি গ্রহণ করেন ও ১৩১৬ বঙ্গাব্দ পর্যন্ত পদটি অলংকৃত করেন।

সরলা দেবী ১৩১০ বঙ্গাব্দে [1903] লক্ষ্মীর ভাণ্ডার নামে একটি স্বদেশী দ্রব্যের দোকান খোলেন, একথা আগেই বলা হয়েছে। প্রধানত মেয়েদের জন্য দোকানটি খোলা হলেও সরলা দেবীর রাজনৈতিক সহকারীরা এর সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। এমনই একজন হচ্ছেন চট্টগ্রামের কেদারনাথ দাসগুপ্ত [1878-1942]—9 Jul 1904 [শনি ১১ আষাঢ় ১৩১১] বেঙ্গলী-তে প্রকাশিত বিজ্ঞাপনে তাঁর নাম লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের ম্যানেজার হিসেবে দেখা যায়। রবীন্দ্রনাথের কার্জন থিয়েটারে বক্তৃতা শোনার জন্য প্রবেশপত্র লক্ষ্মীর ভাণ্ডার থেকে বিতরিত হচ্ছে, এও আমরা দেখেছি। এইভাবে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে কেদারনাথের যোগসূত্র স্থাপিত হয়। বৎসরের শেষদিকে কেদারনাথ ‘ভাণ্ডার’ নামে একটি ছোটো মাসিক পত্রিকা প্রকাশের সংকল্প নিয়ে রবীন্দ্রনাথকে অনুরোধ করেন তার সম্পাদক হবার জন্য। রবীন্দ্রনাথ তখন সাহিত্যপত্রিকা বঙ্গদর্শন-এর সম্পাদক হওয়া সত্ত্বেও এই নূতন দায়িত্বও স্বীকার করেন দেশের কর্মোদ্যোগকে ভাষারূপ দেওয়ার জন্য। পত্রিকাটির প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয় বৈশাখ ১৩১২-তে। সম্পাদক রবীন্দ্রনাথ প্রথম সংখ্যার দ্বিতীয় মলাটে ‘লেখকগণের প্রতি’ যে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেন তাতেই পত্রিকাটির উদ্দেশ্য ব্যক্ত হয়েছে :

কোনও ব্যক্তিবিশেষ, সম্প্রদায়বিশেষ বা সম্পাদকের মত প্রচারের উদ্দেশ্যে 'ভাণ্ডার' প্রকাশ করা হইতেছে না। এই পত্রে দেশের মনস্বী কৃতী ব্যক্তিদের মত সম্পূর্ণ অপক্ষপাতের সহিত বাহির করা হইবে; দেশের লোককে সকল মতের সকল দিক বিচার করিবার অবকাশ দেওয়াই 'ভাণ্ডার' প্রকাশের উদ্দেশ্য, এই কথা মনে রাখিয়া লেখকগণ অনুগ্রহ করিয়া অসঙ্কোচে নিজের মত লিপিবদ্ধ করিবেন।[১১৬]

'প্রকাশক' কেদারনাথ দাসগুপ্ত উদ্যোগী ব্যক্তি ছিলেন—প্রতি সংখ্যা ৩২ পৃষ্ঠার হবে ঘোষণা সত্ত্বেও তিনি এত লেখা সংগ্রহ করেন যে, প্রথম সংখ্যাটি ৫৬ পৃষ্ঠার হয়ে দাঁড়ায়। 'প্রশ্নোত্তর' নামে একটি বিভাগ প্রবর্তন করে সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়-কৃত 'আজকালকার পব্লিক্ উদ্‌যোগগুলির সঙ্গে প্রাকৃত সাধারণের যোগরক্ষার উপায় কি?' প্রশ্নের জন্য তিনি সাতজন বিশিষ্ট ব্যক্তির 'উত্তর' সংগ্রহ করেন।

লক্ষ্মীর ভাণ্ডার-এর সঙ্গে 'ভাণ্ডার' পত্রিকার বিশেষ সম্পর্ক ছিল। দোকানটির ঠিকানা ৭ কর্নওয়ালিশ স্ট্রীট ছিল পত্রিকারও ঠিকানা। লক্ষ্মীর ভাণ্ডার-এর বর্তমান ম্যানেজার এ. কে. সেনগুপ্ত বৈশাখ-সংখ্যায় জানান, ঘোষিত তিনটি দ্রব্য উক্ত দোকান থেকে কিনলে মাসে দু'টাকার জিনিসে তিন আনা কমিশন দেওয়া হবে।

রবীন্দ্রনাথের চোখের বালি উপন্যাসের অমরেন্দ্রনাথ দত্ত-কৃত নাট্যরূপ ১১ অগ্র° [শনি 26 Nov] ক্লাসিক থিয়েটারে অভিনীত হয়, একথা আমরা যথাস্থানে উল্লেখ করেছি। এছাড়া তাঁর রাজা ও রানী নাটকটি মিনার্ভা থিয়েটারে অভিনীত হয় ৪ বৈশাখ [শনি 16 Apr], ৬ পৌষ [বুধ 21 Dec] এবং ২৭ পৌষ [বুধ 11 Jan 1905]। শেষ দুটি অভিনয়ের গুরুত্ব আছে এই কারণে যে, তখন মিনার্ভার নাট্য-পরিচালক গিরিশচন্দ্র ঘোষ—যিনি এর আগে বহুবার পরিচালনার দায়িত্ব নিয়েই চালু নাটক রাজা ও রানী-র অভিনয় বন্ধ করে দিয়েছিলেন।

প্রাসঙ্গিক তথ্য : ১

এই বৎসর জোড়াসাঁকো ঠাকুরপরিবারের সর্বপ্রধান ঘটনা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের মৃত্যু। এর আগে বহুবারই আশ্চর্য প্রাণশক্তিতে তিনি মৃত্যুর দ্বার থেকে ফিরে এসেছিলেন। বর্তমান বৎসরেও আশ্বিন মাসে তিনি এইরূপ একটি সংকট কাটিয়ে ওঠেন। পুনরায় মাঘ মাসের গোড়া থেকে তাঁর শারীরিক অবস্থার অবনতি হয় ও ৬ মাঘ [বৃহ 19 Jan 1905] দুপুর ১টা ৫৫ মিনিটে তিনি শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। মহর্ষির জীবনাবসানের একটি জীবন্ত ভাষাচিত্র এঁকেছেন রথীন্দ্রনাথ :

মহর্ষি অসুস্থ শুনে...আত্মীয়রা যে যেখানে ছিলেন সকলেই জোড়াসাঁকোর বাড়িতে এসে পড়লেন। অক্লান্ত সেবাশুশ্রূষা চলতে থাকল। মহর্ষিকে সেবা করা নিয়ে মেয়েদের মধ্যে রেষারেষি ও পরে মন-কষাকষিও চলেছিল। মহর্ষির শারীরিক যন্ত্রণা কোনোকিছুতেই কমল না। সাহেব ডাক্তার এসে অপারেশন করে গেলেন। তাতেও উপকার হল না। রুগ্‌ণ অবস্থাতেও অসহ্য যন্ত্রণা অগ্রাহ্য করে মহর্ষি প্রত্যহ দক্ষিণের বারান্দায় উঠে গিয়ে তাঁর চিরাভ্যস্ত উপাসনার পর অনেকক্ষণ ধ্যানে বসে থাকতেন। ৬ই মাঘ সকালবেলায় তিনি আর উঠতে পারলেন না, ঘরেই বিছানায় শুয়ে রইলেন। বাবা তাঁর কানের কাছে মুখ নিয়ে ক্রমান্বয়ে উপনিষদের মন্ত্রপাঠ করতে লাগলেন। 'অসতো মা সদগময়, তমসো মা জ্যোতির্গময়, মৃত্যোর্মাহমৃতং গময়'—শুনতে শুনতে দুপুরবেলায় তিনি শেষবারের মতো চোখ বন্ধ করলেন। তাঁর মুখে ফুটে উঠেছিল একটি পরম আনন্দ ও পরম শান্তি...।[১১৬ক]

ঠাকুরপরিবারের ক্ষেত্রে তো বটেই, সমগ্র বাংলা দেশের ক্ষেত্রে এই মৃত্যু ইন্দ্রপতন-তুল্য—ধর্মমত-নির্বিশেষে সমসাময়িক সংবাদপত্রগুলি তাঁর মৃত্যুতে শোকোচ্ছ্বাস প্রকাশ করেছে। মৃত্যুর দিনই সন্ধ্যায় আত্মীয়স্বজন ও বিশিষ্ট ব্যক্তিদের উপস্থিতিতে নিমতলা শ্মশানঘাটে তাঁর শেষকৃত্য অনুষ্ঠিত হয়।

দেবেন্দ্রনাথ তাঁর শেষ উইলে স্বাক্ষর করেছিলেন ২৩ ভাদ্র ১৩০৬ [8 Sep 1899] তারিখে। নিজের শ্রাদ্ধের জন্য এই উইলে দশ হাজার টাকার সংস্থান ছিল। তাঁর পুত্রেরা দশাহ অশৌচ পালন করে একাদশ দিবসে ১৬ মাঘ [রবি 29 Jan] শ্রাদ্ধকার্য নিষ্পন্ন করেন। উদ্বৃত্ত অর্থ শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্যাশ্রমে ও বিভিন্ন দুঃস্থ ব্যক্তিকে প্রদান করা হয়।

দেবেন্দ্রনাথ তাঁর উইলের executor নিযুক্ত করেছিলেন পুত্র রবীন্দ্রনাথ এবং পৌত্র দ্বিপেন্দ্রনাথ ও সুরেন্দ্রনাথকে। তাঁর মৃত্যুর দিন থেকে সরকারী ক্যাশবহিতে হিসাব লেখা বন্ধ হয়ে যায়। ৮ মাঘ [শনি 21 Jan] 'খাজাঞ্চি বাড়ির ক্যাশ ৫৫৫৩৷৷৩...বুঝিয়া লইয়া স্বতন্ত্র খাতা একজিকিউটারদিগের নামে খোলে।' একজিকিউটরগণ উইলের প্রোবেট [Probate] নেওয়ার জন্য দরখাস্ত করেন 25 Feb 1905 [শনি ১৩ ফাল্গুন] এবং রেজিস্ট্রার W. R. Fink এই দরখাস্ত মঞ্জুর করেন 23 Mar [বৃহ ১০ চৈত্র] তারিখে। পরের দিন 24 Mar তাঁরা মধুসূদন দাস, প্রসন্নকুমার চাকী, কেদারনাথ অধিকারী প্রভৃতি পাঁচ জন কর্মচারীকে কার্যপরিচালনার জন্য আমমোক্তারনামা প্রদান করেন, একথা আমরা পূর্বেই বলেছি।

কলকাতার অধিবাসীদের পক্ষে দ্বারভাঙার মহারাজার সভাপতিত্বে টাউনহলে মহর্ষির স্মরণসভা হয় ১৯ ফাল্গুন [শুক্র 3 Mar]। গোপালকৃষ্ণ গোখলে, স্টেট্‌স্‌ম্যান-সম্পাদক এস. কে. র‍্যাটক্লিফ, সিস্টার নিবেদিতা প্রভৃতি বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি এই সভায় উপস্থিত ছিলেন।

সত্যপ্রসাদের কন্যা শান্তার সঙ্গে প্যারীলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিবাহ ২৩ বৈশাখ [বৃহ 5 May] সমারোহ-সহকারে কাশীতে অনুষ্ঠিত হয়।

এই বৈশাখ মাসেই গগনেন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠ পুত্র গেহেন্দ্রনাথ এবং তাঁর ভাগিনেয়ী প্রতিমা দেবীর স্বামী নীলানাথ মুখোপাধ্যায়ের মৃত্যু হয়।

নিবেদিতা 19 Apr [মঙ্গল ৭ বৈশাখ] মিস ম্যাকলাউডকে লেখেন : 'We have listening to wicked gossip. Sarola, it is said, would like to marry Mr. Gokhale! Christine thinks it not impossible and takes a very serious view of the matter.'[১১৭] গোখলের সঙ্গে সরলা দেবীর চেয়ে নিবেদিতার ঘনিষ্ঠতাই বেশি ছিল, সুতরাং এই গুজব সাগরপারে পৌঁছে দেওয়ার আগে তিনি সহজেই যাচাই করে নিতে পারতেন! অবশ্য বাঙালি মেয়ের বিবাহের স্বাভাবিক বয়স সরলা দেবী এত আগে পার হয়ে এসেছেন যে, তাঁকে নিয়ে গুজব রটনা করে সহজ ছিল—বিশেষত ঔপন্যাসিক প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে তাঁর বিবাহ-সম্বন্ধ যখন সদ্য ভেঙে গিয়েছে। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এই সম্বন্ধের ইতিবৃত্তটি বর্ণনা করেছেন :

> উভয়ের পরিচয় ক্রমে ঘনিষ্ঠতায় পরিণত হইলে স্থির হয়, সরলা দেবীর মাতুল সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ব্যয়ে প্রভাতকুমার ব্যারিষ্টার হইবার জন্য বিলাত যাত্রা করিবেন এবং পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া দেশে ফিরিলে যথারীতি বিবাহ হইবে।
>
> ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দের ৩রা জানুয়ারি [বৃহ ১৯ পৌষ ১৩০৭] প্রভাতকুমার কাহাকেও কিছু না জানাইয়া বিলাত যাত্রা করেন।...প্রভাতকুমার অত্যন্ত মাতৃভক্ত ছিলেন; পাছে মাতা আপত্তি করিয়া বসেন, এই ভয়ে তিনি তাঁহার নিকটও বিলাতযাত্রার কথা পূর্ব্বাহ্নে ব্যক্ত করেন নাই।
>
> তিন বৎসর পরে, ১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসের শেষে [পৌষ ১৩১০] প্রভাতকুমার ব্যারিষ্টার হইয়া দেশে ফিরিলেন। কিন্তু নতুন করিয়া সংসার পাতা তাঁহার ভাগ্যে আর ঘটিয়া উঠে নাই, তাঁহার মাতা এই বিবাহে সম্মতি দেন নাই।[১১৮]

কিন্তু সরলা দেবীর জীবনে 'প্রজাপতির বার্তা নিয়ে...তাঁর দূত', আরও একবার উঁকি মেরেছিল। 13 Jan 1905 [২৯ পৌষ] 'An International Marriage' **শিরোনামে** *The Bengalee*-***তে এই*** সংবাদটি প্রকাশিত হয় :

The marriage of Miss Sarala Devi Ghosal, B. A., with Dr. Paira Mall of the Punjab, which comes off sometime in February next, is calculated to promote the international cause of India in various ways....Dr. Paira Mall, Chief Medical adviser of the Kapurthala State, is a well-known man in the Punjab. He was with the Japanese troops at Liya-cyang and attended the wounded Russian in Matsuyama Hospital. The Japanese Government had made an exception in his favour by admitting him into the Japanese War Camp as a military Attache—a favour refused to hundreds of foreigners.

সরলা দেবীও জাপানে 'বেঙ্গলী রেডক্রস' পাঠানোর জন্য তোড়জোড় করেছিলেন, হয়তো সেই সূত্রেই ডাঃ পেয়ারা মল-এর সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়েছিল। কিন্তু উক্ত সংবাদ প্রকাশের এক সপ্তাহের মধ্যে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের মৃত্যু হয়, ফলে এ বিবাহ স্থগিত রাখা হয়; সংবাদটি প্রকাশিত হয়েছিল 25 Jan-এর বেঙ্গলী-তে : 'The marriage of Miss Sarala Devi Ghosal with Dr. Paira Mall which was fixed to take place during the current month has been postponed...' এর পর বিবাহ প্রস্তাবটি কেন ভেঙে গিয়েছিল তা আমাদের জানা নেই। ১৯ আশ্বিন ১৩১২ [বৃহ 5 Oct 1905]। আর-একজন পাঞ্জাবী রামভজ দত্তচৌধুরীর সঙ্গে সরলা দেবীর বিবাহ হয়।

প্রাসঙ্গিক তথ্য : ২

আদি ব্রাহ্মসমাজের পক্ষে এ বৎসরের দুটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা হল সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন সিংহ ও সত্যব্রত মুখোপাধ্যায়ের দীক্ষা। এই সমাজ প্রচারবিমুখ মনোভাবের জন্য অনেকদিন থেকেই মহর্ষিপরিবারের মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে পড়েছিল। বিবাহের পূর্বে ভাবী জামাতারা এই ধর্মমতে দীক্ষা গ্রহণ করতেন, সম্প্রদায়ের বিস্তার কেবল এতেই সীমাবদ্ধ ছিল। সেদিক দিয়ে উল্লিখিত ঘটনা দুটি উল্লেখযোগ্য—কিন্তু সেই সংবাদ সম্প্রদায়ের মুখপত্র তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা-য় প্রকাশিত হয়নি, ক্যাশবহি থেকে তথ্যটি উদ্ধার করা গেছে। ৩ বৈশাখের [শুক্র 15 Apr] হিসাবে দেখি : 'শ্রীযুক্ত সত্য বাবু মহাশয়ের, এস, পি, সিংহের দীক্ষা লইবার সংবাদ আনিতে বালীগঞ্জ যাতায়াতের গাড়ীভাড়া'; কলকাতা হাইকোর্টের প্রখ্যাত ব্যারিস্টার প্রথম ভারতীয় অ্যাডভোকেট-জেনারেলের [পরে লর্ড] দীক্ষাগ্রহণ সম্পর্কে সংবাদ এতেই সীমাবদ্ধ। ১৫ পৌষের [শুক্র 30 Dec] হিসাবে আছে : 'দং বাবু সত্যব্রত মুখোপাধ্যায়ের দীক্ষা উপলক্ষে ব্যয়/ফুলের মালা ও সন্দেশ ইত্যাদি জন্য...'—এঁর বিষয়েও আর কোনো খবর নেই।

অবশ্য কাশীতে আদি ব্রাহ্মসমাজ মতে সত্যপ্রসাদের কন্যা শান্তা দেবীর বিবাহ-সংবাদটি তত্ত্ববোধিনী-তে বিশেষ গুরুত্বসহকারে পরিবেশিত হয়েছে : 'এই বিবাহে কয়েকটী বিখ্যাত ব্রাহ্মণ পণ্ডিত নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। ইঁহারা বিবাহসভায় বাদানুবাদের পর একবাক্যে স্থির করেন, আদি ব্রাহ্মসমাজের বিবাহপদ্ধতি সম্পূর্ণ শাস্ত্রানুগত।'[১১৯] পাদটীকায় লেখা হয়, মহামহোপাধ্যায় গঙ্গাধর শাস্ত্রী, জনার্দন শাস্ত্রী, দীননাথ বেদান্তবাগীশ প্রভৃতি ৮।৯ জন পণ্ডিত সভাস্থলে উপস্থিত ছিলেন ও 'আমাদের উপাচার্য্য পণ্ডিত শিবধন বিদ্যার্ণবের সহিত ধর্ম্মশাস্ত্র সম্বন্ধে কথোপকথনান্তর তাঁহারা যজুর্ব্বেদের অংশবিশেষ আবৃত্তি করিয়া ব্রাহ্মবিবাহের বৈধতা পরিদর্শনপূর্ব্বক সাহ্লাদে ও সসম্মানে বিবাহক্ষেত্র পরিত্যাগ করেন।'

৩ জ্যৈষ্ঠ [সোম 16 May] মহর্ষিভবনে তাঁর অষ্টাশীতি বৎসরের জন্মোৎসব পালিত হয়, মহর্ষির জীবৎকালে অনুষ্ঠিত এইটিই শেষ জন্মোৎসব। তিন সমাজের ব্রাহ্মদের উপস্থিতিতে রবীন্দ্রনাথ আচার্যের আসন গ্রহণ করে 'মহর্ষির জন্মোৎসব' [দ্র চারিত্রপূজা ৪।৫২৪-৩০] প্রবন্ধটি পাঠ করেন। ত্রৈলোক্যনাথ সান্যাল, প্রিয়নাথ শাস্ত্রী, উমেশচন্দ্র দত্ত, নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি 'স্ব স্ব বক্তব্য ব্যক্ত করিলে কএকটী সঙ্গীত হইয়া সভাভঙ্গ হয়।' উপাধ্যায় গৌরগোবিন্দ রায় এই উপলক্ষে সংস্কৃত শ্লোক-সমন্বিত 'ভক্ত্যুপহার' মুদ্রিত করে বিতরণ করেন।

৭ পৌষ [বৃহ 22 Dec] শান্তিনিকেতনে চতুর্দশ সাম্বৎসরিক ব্রহ্মোৎসব হয় : 'এই উপলক্ষে স্থানীয় জনসাধারণ উপস্থিত হইয়াছিলেন। ভিন্ন প্রদেশীয় লোকের তাদৃশ সমাগম হয় নাই।' হয়তো মহর্ষির মরণান্তিক অসুস্থতার পটভূমিতে উৎসবের জন্য যথোচিত অয়োজন করা ট্রাস্টীদের পক্ষে সম্ভব হয়নি। রবীন্দ্রনাথ প্রাতে ও সন্ধ্যায় আচার্যের আসন গ্রহণ করে উপদেশ দেন। কিন্তু মাঘ-সংখ্যা তত্ত্ববোধিনী-তে 'প্রাতঃকালের উদ্বোধন' [পৃ ১৫২] ও 'সায়ংকালের উদ্বোধন' [পৃ ১৫২-৫৩]-শীর্ষক যে-দুটি রচনা মুদ্রিত হয়, তাদের ভাষা রবীন্দ্রনাথের নয়। তাঁর সায়ংকালের উপদেশটি 'উৎসবের দিন' নামে মাঘ-সংখ্যা বঙ্গদর্শন-এ মুদ্রিত হয়। উৎসবের মোট ব্যয় ১১১৬।লও।

৬ মাঘ [বৃহ 19 Jan] মহর্ষির মৃত্যু হওয়াতে ১১ মাঘ [মঙ্গল 25 Jan] আদি ব্রাহ্মসমাজের পঞ্চসপ্ততিতম সাম্বৎসরিক অনুষ্ঠিত হবে না বলে বিজ্ঞপ্তি দেওয়া সত্ত্বেও শেষ মুহূর্তে সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করা হয়। আদি ব্রাহ্মসমাজ গৃহে প্রাতঃকালীন উপাসনায় চিন্তামণি চট্টোপাধ্যায় উদ্বোধন ও প্রিয়নাথ শাস্ত্রী উপদেশ প্রদান করেন। মহর্ষিভবনে অনুষ্ঠিত সায়ংকালীন উপাসনায় শিবধন বিদ্যার্ণবের উদ্বোধনের পর রবীন্দ্রনাথ উপদেশ দেন।

মহর্ষিকে তিন ব্রাহ্মসমাজই প্রধান আচার্য রূপে গণ্য করত, তিনিই এদের মধ্যে যোগসূত্র ছিলেন। তাঁর দেহাবসানের পর এই পদ আর কাউকে প্রদান করা হয়নি। আদি ব্রাহ্মসমাজের ট্রাস্টী দ্বিজেন্দ্রনাথ, জানকীনাথ ঘোষাল ও দ্বিপেন্দ্রনাথ ১ ফাল্গুন [সোম 13 Feb] নুতন অধ্যক্ষমণ্ডলী নিয়োগ করেন :

আচার্য ও সভাপতি : দ্বিজেন্দ্রনাথ; উপাচার্য : হেমচন্দ্র বিদ্যারত্ন, প্রিয়নাথ শাস্ত্রী, শিবধন বিদ্যার্ণব, শম্ভুনাথ গড়গড়ি, চিন্তামণি চট্টোপাধ্যায় ও যোগেন্দ্রনাথ শিরোমণি; সম্পাদক : রবীন্দ্রনাথ; সহকারী সম্পাদক : সত্যপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়; প্রচারক ও কর্মাধ্যক্ষ : প্রিয়নাথ শাস্ত্রী; তত্ত্ববোধিনী-সম্পাদক : দ্বিজেন্দ্রনাথ; সহকারী সম্পাদক : হেমচন্দ্র বিদ্যারত্ন; ধনরক্ষক : বিহারীলাল চট্টোপাধ্যায়; গায়ক : রাধিকাপ্রসাদ গোস্বামী ও শ্যামসুন্দর মিশ্র; বাদক : কৃষ্ণধন মুখোপাধ্যায়।

সুরেন্দ্রনাথ এর আগে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে সম্পাদক হিসেবে স্বাক্ষরাদি করছিলেন, উক্ত তারিখ থেকে এই দায়িত্ব আবার একা রবীন্দ্রনাথের উপর অর্পিত হয়েছে।

প্রাসঙ্গিক তথ্য : ৩

সরলা দেবীর রাজনৈতিক কার্যকলাপ এই বৎসরেও অব্যাহত ছিল। ১৭ বৈশাখ [শুক্র 29 Apr] ক্লাসিক থিয়েটারে প্রতাপাদিত্য-উৎসব হল দ্বিতীয় বৎসরের জন্য। অনুষ্ঠানটির বিজ্ঞপ্তি বেঙ্গলী-তে প্রকাশিত হয় পূর্বদিন : 'The Pratapditya Festival will for the second time be celebrated to-morrow at 6 P.M. in the Classic Theatre. We have no doubt that the Bengal Gymnasium, under whose auspices the Pratapaditya anniversary takes place will have a full house.' উদয়াদিত্য-উৎসব হয় কার্জন থিয়েটারে ২৩ আশ্বিন [রবি 9 Oct]। রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী অনুষ্ঠানটিতে সভাপতিত্ব করেন। সরলা দেবী-লিখিত একটি প্রবন্ধ পাঠ করে শোনান নগেন্দ্রনাথ বসু। অনুষ্ঠানসূচীতে প্রকাশ, জ্যোতিরিন্দ্রনাথের একাঙ্ক নাটক 'Do thy Duty' এই উৎসবে অভিনীত হয়[১২০]—কিন্তু জ্যোতিরিন্দ্রনাথের এই নামের কোনো নাটকের কথা আমাদের জানা নেই। ৩০ আশ্বিন [রবি 16 Oct] মহাষ্টমীর দিনে জানকীনাথ ঘোষালের বালিগঞ্জের বাড়িতে যথারীতি বীরাষ্টমী পালিত হয়।

বরোদার গায়কোয়াড় রমেশচন্দ্র দত্তকে চার হাজার টাকা বেতনে তাঁর রাজ্যে মন্ত্রিপদে নিয়োগ করলে রমেশচন্দ্র 20 Aug [৪ ভাদ্র] তারিখে বরোদা যাত্রা করেন। অরবিন্দ ঘোষকে তিনি ইতিপূর্বেই বরোদা কলেজের উপাধ্যক্ষ নিয়োগ করেছিলেন। এগুলিকে তাঁর বাঙালি-প্রীতির নিদর্শন রূপে গ্রহণ করে, তিনি মহারানী-সহ 9 Nov [২৪ কার্তিক] কলকাতায় এলে তাঁকে সংবর্ধনা জানানোর জন্য বিপুল আয়োজন করা হয়। ৫২-৪ পার্ক স্ট্রীট-স্থ বেঙ্গল ল্যাণ্ডহোল্ডারস' অ্যাসোসিয়েশন ভবনে তাঁকে প্রথম সংবর্ধনা জানানো হয়। আমরা আগেই বলেছি, রবীন্দ্রনাথ এই উপলক্ষে 'বঙ্গজননী-মন্দিরাঙ্গন মঙ্গলোজ্জ্বল আজ হে' গানটি রচনা করে গায়কদের শিখিয়ে দিয়ে যান।

এইদিনই তাঁর সংবর্ধনা-উপলক্ষে জানকীনাথ ঘোষাল তাঁর ১৬ নং বালিগঞ্জ সার্কুলার রোডের বাড়িতে একটি উদ্যান-সম্মিলনীর আয়োজন করেন। সরলা দেবী এই উপলক্ষে 'গাইকোয়ার মহারাজের অভ্যর্থনা সঙ্গীত' রচনা করেন। তিনি লিখেছেন : 'তাঁরা যখন এলেন, আমার ক্লাবের ছেলেরা স্ব স্ব অস্ত্র হাতে তাঁদের guard of honour দিলে এবং চা-পানের পর মাঠে তাদের অস্ত্রখেলা প্রদর্শন করলুম। মহারাজকে গল্প করলুম প্রায় ৭।৮ বছর আগে সোলাপুরে তাঁর সভাপতিত্বে মহারাষ্ট্রীয় ক্লাবের খেলা দেখে আমার মনে এই ক্লাব খোলার প্রথম সূচনা হয়েছিল। বাড়ির ভিতরে উঠতে প্রথম ঘরেই জাপানী আর্টিস্টের হাতে আঁকা আমার ফরমাসী কালীর একটি অপূর্ব মূর্তি ছিল...বরোদা-রাজকে আমি কালীর ছবির দিকে নিয়ে গিয়ে ভাল করে দেখতে বললুম।'[১২১] ছবিটি ওকাকুরার পাঠানো জাপানী শিল্পী টাইকানের আঁকা—আশ্বিন ১৩১০-সংখ্যা প্রবাসী-তে 'By the courtesy of Miss Ghosal' স্বীকৃতি-সহ মুদ্রিত হয়েছিল। অপর জাপানী হিসিদা-ও তাঁকে সরস্বতীর একটি ছবি এঁকে দেন, সেটি কার্তিক ১৩১০-সংখ্যা প্রবাসী-তে মুদ্রিত হয়।

গায়কোয়াড়কে ভারত সংগীতসমাজে বিপুলভাবে সংবর্ধিত করা হয় ৪ অগ্র° [শনি 19 Nov] সন্ধ্যায়। স্বাগত-সংগীত, সংস্কৃত স্বাগত-কবিতা আবৃত্তি ইত্যাদির পর মেঘনাদবধ ও রিজিয়া নাটকের নির্বাচিত অংশ অভিনীত হয়।[১২২] [মাসখানেক আগে ৭ কার্তিক কোজাগরী পূর্ণিমার দিন ভারত সংগীতসমাজের 'বিজয়া-সম্মিলন' উপলক্ষে মহাসমারোহে 'মেঘনাদবধ' অভিনীত হয়েছিল।] সরলা দেবী লিখেছেন : 'সেই ধনী ও বিলাসীদের প্রমোদগৃহে বরোদার রাজা গেলেন যখন গান-বাজনার টুঁ শব্দটি শোনা গেল না। সেদিন

গোবরডাঙ্গার জমিদার-প্রমুখ বলশালী পুরুষগণের বলবীর্যের নানাপ্রকার নিদর্শন দেখান হল শুধু'[১২৩] — একথার প্রথমাংশ অবশ্য সত্য নয়।

রাশিয়ার সঙ্গে জাপানের যুদ্ধ এই বৎসরও চলেছে—জাপানীদের বীরত্বের কাহিনীতে সমসাময়িক প্রত্যেকটি পত্রিকাই মুখরিত। যুদ্ধে 'শহীদ' জাপানী সৈন্য ও নাবিকদের বিধবা ও পরিবারের জন্য দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে সাহায্যভাণ্ডার গড়ে তোলা হয়—শুধু 'Bombay Japanese Fund'-এই 31 Aug [১৫ ভাদ্র] পর্যন্ত ৫৪,২৭৪ টাকার উপর সংগৃহীত হয়।[১২৪] এই উপলক্ষে সরলা দেবীর 'বেঙ্গলী রেডক্রস' গঠনের প্রচেষ্টার কথা পূর্বেই বলা হয়েছে, সেই সূত্রে ডাঃ পেয়ারা মল-এর সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয় যা পরিণয়-ঘোষণা পর্যন্ত পৌঁছেছিল।

অ্যাডমিরাল টোগো [Togo Heihachiro]র নেতৃত্বে জাপানী নৌবাহিনী Tsushima প্রণালীর যুদ্ধে রাশিয়ান বাল্টিক নৌবহরকে সম্পূর্ণ ধ্বংস করে; ১৮ পৌষ [2 Jan 1905] পোর্ট আর্থারের পতন ঘোষিত হয় সমস্ত ভারতে আনন্দ হিল্লোল বয়ে গেল। ব্রহ্মবিদ্যালয়ের ছাত্র সত্যরঞ্জন বসু লিখেছেন : 'এই সব শুনে আমাদের বালকমনের প্রথম প্রতিক্রিয়া নকল পোর্ট আর্থার দখল করতে হবে। হলঘরের সোজা একটু দক্ষিণে যে জলশূন্য ডোবাটি ছিল সেটিকে দখল করবে একদল, আর একদল রক্ষা করবে। তুমুল যুদ্ধ চল্‌লো মাটির ঢেলায়। পোর্ট আর্থার দখল হলো—হত না হলেও আহতের সংখ্যা ছিল বেশ। তার জের কয়েকদিন চলেছিল।'[১২৫] রথীন্দ্রনাথও এই উপলক্ষে 'জয়োৎসব' পালনের কথা লিখেছেন পিতৃস্মৃতি-তে [পৃ ৯৭]। পরাধীনতা থেকে মুক্তির স্বপ্ন দেশবাসী শতাব্দীর সূচনাকাল থেকেই দেখতে শুরু করেছিল, এশিয়াবাসীর এই জয় সেই স্বপ্নকে সার্থক করার প্রেরণা জুগিয়েছে।

ওকাকুরা এদেশে আসার [Jan 1901] পর থেকেই জাপানীদের সঙ্গে বাঙালির, বিশেষত ঠাকুরপরিবারের, যোগাযোগ বেড়ে উঠেছিল। তাঁর পাঠানো শিল্পী টাইকান ও হিসিদা এই পরিবারেই আশ্রয় নিয়েছিলেন, তাঁদের শেখানো তুলি-ব্যবহার ও ওয়াশ-পদ্ধতি বাংলার চিত্রকলায় নবযুগের আবির্ভাব ঘটিয়েছিল। এরপর জাপানীদের সঙ্গে যোগাযোগ ক্রমেই বেড়ে উঠেছে। জাপানের রাজবংশের ছেলে প্রিন্স ইতো গত বছরের গোড়ার দিকে কলকাতায় এসেছিলেন, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ বালিগঞ্জে 17 Jul 1903 [১ শ্রাবণ ১৩১০] 'Prof. Ito'-র ছবি আঁকেন; সরলা দেবী এঁর সম্বন্ধে লিখেছেন : 'তিনি সন্ন্যাস গ্রহণ করেছিলেন এবং ভারতবর্ষের তীর্থস্থান দেখে বেড়াচ্ছিলেন।...তাঁর সরল, সাদাসিদে অথচ সবিনয় ভদ্রব্যবহারে সকলে মুগ্ধ হয়েছিলেন।'[১২৬] আর এক জাপানী পণ্ডিত একাই কাওয়াগুচি [Ekai Kawaguchi] এখানে আসেন সম্ভবত 1905-এর গোড়ার দিকে, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ এঁর ছবি আঁকেন 10 Feb 1905 [২৮ মাঘ ১৩১১]। জাপানী সূত্রধর কুসুমতো-সান-ও এই সময়ে আসেন, তাঁকে ব্রহ্মচর্যাশ্রমে শিক্ষকতায় নিয়োগ করা হয় মার্চ মাসের গোড়া থেকে। বহু বাঙালি ছাত্রও যন্ত্রবিদ্যা আয়ত্ত করার জন্য জাপানে যেতে আরম্ভ করেছেন, দেশে স্বদেশী শিল্প-প্রতিষ্ঠায় এঁদের অনেকেরই বিশেষ ভূমিকা রয়েছে।

সখারাম গণেশ দেউস্করের 'দেশের কথা' বইটি প্রকাশিত হয় 16 Jun 1904 [২ আষাঢ়]—দাদাভাই নৌরজী, রমেশচন্দ্র দত্ত ও উইলিয়ম ডিগ্‌বি-র ভারতীয় অর্থনীতি-বিষয়ক গ্রন্থ অবলম্বনে সখারাম ভারতের

দারিদ্র্য ও শিল্প-বাণিজ্যের অবনতির একটি জীবন্ত চরিত্র অঙ্কন করেন। বাংলার জাতীয় আন্দোলনে এই গ্রন্থের একটি বিশেষ ভূমিকা ছিল, সেই কারণে ব্রিটিশ সরকার কয়েক বছর পরে [1910]বইটি বাজেয়াপ্ত করে।

দেশের শিল্প-বাণিজ্যের প্রসারের জন্য যন্ত্রবিদ্যা আয়ত্ত করার কথা তখন অনেকেই ভাবছিলেন। এই উদ্দেশ্যেই ১৭ শ্রাবণ [সোম 1 Aug] জাস্টিস স্টিফেনের সভাপতিত্বে টাউন হলে Association for the Advancement of Scientific and Industrial Education প্রতিষ্ঠার জন্য একটি সভা হয়। ইতিপূর্বে জাপান-প্রত্যাগত মাইনিং ইঞ্জিনিয়ার রমাকান্ত রায়ের প্রস্তাবানুসারে যোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ এই প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা রচনা করেন। উক্ত সভায় রাজা পিয়ারীমোহন মুখোপাধ্যায় সভাপতি, সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন সিংহ কোষাধ্যক্ষ, সীতানাথ রায় ও অশ্বিনীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় যুগ্ম-সম্পাদক নির্বাচিত হন; একটি শক্তিশালী কমিটি গঠিত হয়, যাতে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতি সদস্য ছিলেন।[১২৭] পরে এই আসোসিয়েশনের আনুকূল্যে অনেক বাঙালি ছাত্র বিদেশে কারিগরীবিদ্যা শিক্ষার জন্য প্রেরিত হন।

উক্ত সভার কয়েকদিন আগে ৭ শ্রাবণ [শুক্র 22 Jul] মিনার্ভা রঙ্গমঞ্চে রমেশচন্দ্র দত্তের সভাপতিত্বে রবীন্দ্রনাথ 'স্বদেশী সমাজ' প্রবন্ধটি পাঠ করেন। বঙ্গভঙ্গের প্রস্তাবকে কেন্দ্র করে দেশে যে স্বদেশী-আন্দোলনের সূত্রপাত হয় তা তখনও ভবিষ্যতের গর্ভে, তবু দেশ যে স্বদেশী ভাবধারায় উদ্বুদ্ধ হয়ে উঠেছিল তার প্রমাণ মেলে রবীন্দ্রনাথের বক্তৃতা উপলক্ষে তরুণ ছাত্রদের মাত্রাছাড়া উৎসাহে। অনেকেই প্রবেশাধিকার না পেয়ে ফিরে যেতে বাধ্য হন, অনেকে উদ্যোক্তা চৈতন্য লাইব্রেরির কর্তৃপক্ষ ও শান্তিরক্ষাকারী পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত হন। রবীন্দ্রনাথ ঐক্যবিধানের কথা বলেছিলেন, কিন্তু বেঙ্গলী-তে মুদ্রিত কিছু পত্রে বাঙালির স্বভাবগত বিভেদপ্রবণতার দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়—একজন চৈতন্য লাইব্রেরিকে বয়কট করার আহ্বান জানান। রবীন্দ্রনাথ পরিবর্ধিত আকারে প্রবন্ধটি আবার ১৬ শ্রাবণ [রবি 31 Jul] কার্জন রঙ্গমঞ্চে পাঠ করেন। এদিনও সভায় তিল ধারণের জায়গা ছিল না। পরে 'স্বদেশী সমাজ' প্রতিষ্ঠার আয়োজন হয়, তার 'সংবিধান' পর্যন্ত রচিত ও মুদ্রিত হয়েছিল। এই সমাজের সঙ্গে সম্পর্ক বিষয়ে ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত একটি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য দিয়েছেন :

> অনুমান হয় ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে বারীন্দ্র প্রভৃতি অন্তরঙ্গ কর্ম্মীদের দ্বারা অনুরুদ্ধ হইয়া আমি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়কে একটি পত্র লিখি যে, আমরা ভারতীয় সভার [কংগ্রেস] সহযোগে কর্ম্ম করিতে প্রস্তুত নই। তাঁহার সহিত সংযুক্ত ভাবে কর্ম্ম করিতে চাই। ইহাতে তিনি তাঁহার দ্বারকানাথ ঠাকুর ষ্ট্রীটস্থ বাসায় আমাকে আহ্বান করেন এবং বলেন, "আমার ভ্রাতুষ্পুত্র সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সহিত এই বিষয়ে কথা কও"...। ইহাতে সখারাম বাবু, দেবব্রত বাবু এবং আমি সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুরের বালিগঞ্জের বাড়ীতে যাই। তিনি বলিলেন, রবি বাবু আমায় জিজ্ঞাসা করেন, "ইঁহারা কাহারা?" আমি সব কথা বলি। তিনি বলেন, তিনি বক্তৃতা ও সাহিত্য দ্বারা কার্য্য করিবেন। ইহাতে সখারাম বাবু ব্যঙ্গ করেন—"কবিতা লিখিয়া ভারতোদ্ধার হইবে না।" পরে, এই সহযোগিতার তাগাদার জন্য ৺ব্যোমকেশ মুস্তফীর সহিত সাহিত্য-পরিষদ আফিসে...আমি সাক্ষাৎ করি। তিনি "স্বদেশী সমাজ" পরিকল্পনা লইয়া ব্যস্ত ছিলেন। তিনি বলিলেন, এই কর্ম্মপদ্ধতি এখনও সম্পূর্ণভাবে লিখিত হয় নাই। লিখিত কর্ম্মপদ্ধতির পাণ্ডুলিপির মুদ্রিত প্রুফ তিনি তৎকালে দেখিতেছিলেন এবং বলিলেন, পরিকল্পনা পূর্ণভাবে তৈয়ারী হইলে পরীক্ষা...জন্য একস্থলে তাহা বাস্তবিক কর্ম্মে পরিণত করার চেষ্টা হইবে।...পরে, এই দলের কোন এক মিটিং-এ রবি বাবু আমাদের ডাকিয়াছিলেন। আমি তখন "ভবানী মন্দির" পরিকল্পনার উদ্দেশ্যে বিহারে প্রেরিত হইয়াছিলাম। প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া অন্নদা কবিরাজের কাছ হইতে ইহা শুনিলাম; তিনি এই আহ্বানে এই সভায় গমন করিয়াছিলেন। সভায় নানাদল নানাকথা বলে, রবি বাবু তাঁহার দিকে চাহিয়া বলিলেন, "আপনার কি মত"! কবিরাজ জবাব দেন, "আমরা তর্ক করিতে অক্ষম, কার্য্য দিন্, করিতে প্রস্তুত।" রবি বাবু বলিলেন, "তাহা আমি জানি।"
>
> রবীন্দ্রনাথের "স্বদেশী সমাজ" প্রতিষ্ঠাকল্পের প্রচেষ্টার সহিত বৈপ্লবিক সমিতির সহযোগিতার উদ্যম এই স্থলেই শেষ হয়।[১২৮]

পরে রবীন্দ্রনাথ নিজের জমিদারিতে যখন ব্যক্তিগতভাবে স্বদেশী সমাজের পরিকল্পনাগুলি রূপায়িত করছিলেন, তখন অনেক প্রাক্তন বিপ্লবকর্মী তাঁর সহায়তায় এগিয়ে আসেন।

অনুশীলন সমিতির গুপ্ত কার্যকলাপ ছাড়া একটি প্রকাশ্য রূপ ছিল। 21 Mar 1905 [বুধ ৯ চৈত্র] বেঙ্গলী-তে লেখা হয় : 'Anushilan Samiti—The annual meeting of the above Samiti takes place today.' অনেকের স্মৃতিকথায় দেখা যায়, সমিতির এই প্রকাশ্য অংশের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের যোগাযোগ ছিল।

বর্তমান বৎসরে 'শিবাজী-উৎসব' বিলম্বিত হয়েছিল। 31 Aug বেঙ্গলী-তে লেখা হয় : 'The Sivaji celebration takes place at the Town Hall on Saturday, the 3rd proximo [**১৬ ভাদ্র**] with the usual eclat. Some of the best of Bengal's speakers will take part in the proceedings, and a pamphlet on the "Sivaji cult" in Bengali, by Pandit Sakharam Gonesh Deuskar and a half-tone photo of the great Mahratta hero will be distributed free at the meeting." **কিন্তু এইদিন অনুষ্ঠানটি** হয়নি। সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে উৎসব হয় ৩১ ভাদ্র [শুক্র 16 Sep]। 'মহাপুরুষ-পূজা' সিরিজের দ্বিতীয় গ্রন্থ 'শিবাজীর দীক্ষা' এই উপলক্ষে বিনামূল্যে বিতরিত হয়; আমরা আগেই বলেছি, রবীন্দ্রনাথ এরই অনুষঙ্গে তাঁর বিখ্যাত কবিতা 'শিবাজী-উৎসব' রচনা করেন—কবিতাটি উক্ত ৪০ পৃষ্ঠার গ্রন্থের ২৯-৩৬ পৃষ্ঠায় মুদ্রিত হয়েছিল।

26-28 Dec [সোম-বুধ ১১-১৩ পৌষ] বোম্বাইতে স্যার হেনরী কটনের [sir Henry Cotton] সভাপতিত্বে কংগ্রেসের বিংশতিতম অধিবেশন হয়। কটন আসামের চীফ কমিশনার থাকার সময়ে তাঁর বিরোধিতাতেই বঙ্গভঙ্গের একটি প্রস্তাব পরিত্যক্ত হয়। কংগ্রেস সভাপতির আসন থেকেও তিনি কার্জনের বঙ্গভঙ্গ প্রস্তাবের বিরোধিতা করলেন। বোম্বাইতেই বাংলার প্রতিনিধিরা একটি বৈঠকে মিলিত হয়ে বঙ্গভঙ্গ প্রস্তাব-সম্পর্কে দেশবাসীর কর্তব্য নিয়ে আলোচনার জন্য 10 Jan 1905 [মঙ্গল ২৬ পৌষ] কলকাতার টাউনহলে কটনের সভাপতিত্বে একটি সম্মেলনের আয়োজন করেন।[১২৯] এই উপলক্ষে কটন কলকাতায় এলে কৃতজ্ঞ বাঙালিরা 10 Jan তাঁকে একটি সান্ধ্যভোজে আপ্যায়িত করেন—ঠাকুরপরিবারের অনেকেই ভোজসভায় উপস্থিত ছিলেন। সম্মেলনটি হয় 11 Jan [বুধ ২৭ পৌষ]।

ভারতসচিবকে বঙ্গভঙ্গের ব্যাপারে সম্মত করার জন্য কার্জন ইংলণ্ডে গিয়েছিলেন, তিনি ভারতে ফিরে এলেন নিজের কার্যকাল বৃদ্ধি করে। 10 Feb [শুক্র ২৮ মাঘ] য়ুনিভার্সিটি বিল আইনে পরিণত হল। 11 Feb [শনি ২৯ মাঘ] কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তনে চ্যান্সেলার হিসেবে ভাষণ দিতে গিয়ে কার্জন বললেন : 'The highest ideal of Truth is to a large extent a Western conception....Undoudtedly Truth took a high place in the moral codes of the West before it had been similarly honoured in the East....In your epics truth will often be enrolled as a virtue; but quite as often it is attended with some qualifications, and very often praise is given to successful deception practised with honest aim.' এর শেষ বাক্যটি সত্য সম্বন্ধে বঙ্কিম-রবীন্দ্র-বিতর্কের কথা আমাদের মনে করিয়ে দিতে পারে—কিন্তু কার্জনের মুখে এই উক্তি পূর্বাবধি ক্ষুব্ধ বাঙালিদের ক্ষিপ্ত করে তুলল। নিবেদিতা কার্জনের *Problems of the Far East* গ্রন্থ থেকে তাঁরই মিথ্যা-ভাষণের দৃষ্টান্ত অমৃতবাজার পত্রিকায় [13 Feb] তুলে ধরেন।[১৩০] পত্র-পত্রিকায় সমালোচনা ছাড়াও 10 Mar [শুক্র ২৬ ফাল্গুন] টাউনহলে ড রাসবিহারী ঘোষের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত বিরাট সভায় কার্জনকে ধিক্কৃত করা হয়। সভাটি এক হিসেবে অভূতপূর্ব—ড ঘোষই একমাত্র বক্তা ছিলেন, দুটি প্রস্তাব কোনো বক্তৃতা ছাড়াই উত্থাপিত, সমর্থিত ও পরিপোষিত হয়। একটি প্রস্তাবে ভারত-

সরকারকে অনুরোধ করা হয়েছিল নিন্দাপ্রস্তাবটি ভারতসচিবকে পাঠিয়ে দেওয়ার জন্য, কিন্তু সরকার তা প্রত্যাখ্যান করে।

ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়ের সম্পাদনায় এক পয়সা মূল্যের সান্ধ্য-দৈনিক 'সন্ধ্যা' প্রথম প্রকাশিত হয় ১ পৌষ [শুক্র 16 Dec]। মনোরঞ্জন গুহ লিখেছেন, সন্ধ্যা-র 'সূচনা বিশেষ লোমহর্ষক ছিল না। জাতিকে আত্মস্থ করা, জাতির মনকে স্বদেশাভিমুখী করা, পরানুকরণের প্রবৃত্তি সংযত করা, স্বদেশের সংস্কৃতির প্রতি অনুরাগ বৃদ্ধি করা—প্রধানতঃ এইগুলির উপরেই গোড়ার দিকে বেশি জোর ছিল।'[১৩১] কিন্তু বঙ্গভঙ্গের সিদ্ধান্ত সরকারীভাবে ঘোষিত হওয়ার পর সন্ধ্যা-র সুর বদলে যায়—লৌকিক ভাষা কীভাবে জনচিত্ত উন্মথিত করতে পারে সন্ধ্যা তার প্রথম দৃষ্টান্ত স্থাপন করে।

16 Mar 1905 [বৃহ ৩ চৈত্র] *The Bengalee*তে একটি সংবাদ প্রকাশিত হয় : 'The pictures in the Art Gallery attached to the Government School of Art, Calcutta, are now being offered for sale. It is stated to be the intention of the Government in future to exhibit in Government Galleries only the work of Indian artists.' সংবাদটি একটু বিভ্রান্তিকর, বস্তুত গ্যালারিতে রক্ষিত কেবল য়ুরোপীয় চিত্রগুলি বিক্রয়ের সিদ্ধান্ত হয়েছিল। আর্ট স্কুলের প্রিন্সিপাল E.B. Havell [1861-1934] ছিলেন দেশীয় শিল্পকলার পৃষ্ঠপোষক, তাঁর প্রেরণা নব্যবঙ্গীয় চিত্রকলা আন্দোলনে সর্বাধিক কার্যকরী হয়েছিল। কিন্তু এই সময়ে তাঁর সিদ্ধান্ত কঠোর সমালোচনার সম্মুখীন হয়। তারই পরিপ্রেক্ষিতে জ্যৈষ্ঠ ১৩১২-সংখ্যা ভাণ্ডার-এ 'প্রশ্ন' দেওয়া হয় : 'গবর্মেন্ট-শিল্পবিদ্যালয়ে যে সকল বিলাতিছবি সংগ্রহ করা হইয়াছিল, তাহা সম্প্রতি নিলামে বিক্রয় হইয়া গেছে এবং সেখানে দেশীয় চিত্রশিল্পাদি শিখাইবার আয়োজন হইতেছে—ইহাতে আমাদের লাভ হইবে, কি ক্ষতি হইবে?' 'গবর্মেন্ট' বানান ও 'হইয়া গেছে' প্রয়োগ থেকে আমাদের ধারণা, 'প্রশ্ন'টি রবীন্দ্রনাথের দ্বারা রচিত।

প্রাসঙ্গিক তথ্য : ৪

মোহিতচন্দ্র সেন প্রধানশিক্ষকের দায়িত্ব নিয়ে ব্রহ্মচর্যাশ্রমে যোগ দিয়েছিলেন সম্ভবত ১ ফাল্গুন ১৩১০ [শনি 13 Feb 1904], বিদ্যালয় তখন শিলাইদহে। গ্রীষ্মবকাশের পর ১৫ জ্যৈষ্ঠ [শনি 28 May] বিদ্যালয় খুললে অনেক পরিবর্তনের সূচনা হল। সতীশচন্দ্র রায়ের মৃত্যুর পর তাঁর বন্ধু অজিতকুমার চক্রবর্তী [1886-1918] জেনারেল অ্যাসেমব্লিজ' ইনস্টিটিউশন থেকে পাশকোর্সে বি. এ. পরীক্ষায় [1904] উত্তীর্ণ হয়ে তাঁর শূন্যস্থান পূর্ণ করেন। তিনি লিখেছেন :

> মোহিতবাবু শিক্ষাবিজ্ঞান সম্বন্ধে রাশি রাশি পুস্তক পাঠ করিয়া বিদ্যালয়ের শিক্ষাপ্রণালীর সুব্যবস্থা করিবার কাজে তখন লাগিয়া গিয়াছেন।...এ বিদ্যালয়ে আসিয়া তাঁহার চিন্তার বিষয় ছিল এই যে, য়ুরোপ হইতে প্রাপ্ত বিদ্যাকে আমরা আমাদের জ্ঞানলাভের প্রণালীর ভিতর দিয়া কী উপায়ে পাইব। তিনি পণ্ডিত ছিলেন বলিয়া পুঁথির শিক্ষার খুব ফলাও আয়োজনের দিকে তাঁহার স্বভাবত ঝোঁক ছিল।...তিনি বড়ো ছেলেদের ভর্তি করিতে লাগিলেন এবং অনেক ছেলে ভর্তি করিয়া বিদ্যালয়কে হঠাৎ বড়ো করিবার দিকে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। বয়স্ক ছেলের দল জুটিল, ছাত্রসংখ্যাও কুড়ি-পঁচিশটি হইতে প্রায় পঞ্চান্নটিতে গিয়া ঠেকিল। মোহিতবাবুকেই তখন বিদ্যালয়ের সমস্ত কাজ দেখিতে হইত, হিসাবপত্রও রাখিতে হইত। যিনি চিরকাল দর্শন ও সাহিত্য আলোচনা করিয়া আসিয়াছেন, তাঁহাকে হঠাৎ ভাঁড়ারে রান্নাঘরে অষ্টপ্রহর টানাটানি করিয়া কোনো বিশেষ লাভ হইল না।...সুতরাং দার্শনিক পণ্ডিত এবং উৎকৃষ্ট অধ্যাপকের সঙ্গে সঙ্গে সুদক্ষ ব্যবস্থাপক এবং সুদৃঢ় কর্তা না হইতে পারায় নানা দিকে গোলযোগ

বাধিল। অনেক ছেলে হইল, তাহাদের ব্যবস্থিত করিবার শক্তি ছিল না, অধ্যাপকগণের মধ্যেও যোগবন্ধন দৃঢ় হইল না। বিদ্যালয়ের হঠাৎ-বৃদ্ধিটা একটা অমঙ্গলজনক ব্যাপার হইল।[১৩২]

এই 'হঠাৎ-বৃদ্ধি'র হুজুগে ত্রিপুরার সোমেন্দ্রচন্দ্র দেববর্মা, উপেন্দ্রচন্দ্র ভট্টাচার্য, যোগেশচন্দ্র ভট্টাচার্য; প্রফুল্ল ও প্রশান্ত দেববর্মা, সত্যেন্দ্রচন্দ্র ভট্টাচার্য, ভাগলপুরের বিশ্বেশ্বর বসু প্রভৃতি ছোট-বড়ো ছেলেরা বিদ্যালয়ে ভর্তি হন। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের খুড়তুতো-ভাই সুধীরঞ্জন দাস [1894-1977]ও এইসময়ে ভর্তি হন। এঁর সুখপাঠ্য স্মৃতিকথা 'আমাদের শান্তিনিকেতন'-এ সমকালীন ছাত্র ও শিক্ষকদের অনেকের নাম ও পরিচয় পাওয়া যায়। তাতে জানা যায় অজিতকুমার চক্রবর্তীর ছোটভাই সুশীলকুমার, মনোরঞ্জন গুহঠাকুরতার দুই পুত্র যোগরঞ্জন ও প্রেমরঞ্জন, চন্দননগরের গৌরগোপাল ঘোষ, মহারাষ্ট্রীয় পিতা ও ব্রহ্মদেশীয় মাতার পুত্র নারায়ণ কাশীনাথ দেবল, নরেন্দ্রনাথ খাঁ প্রভৃতি তাঁর কিছুদিন আগে-পরে বিদ্যালয়ে ভর্তি হয়েছিলেন; শিক্ষক ছিলেন মোহিতচন্দ্র সেন, ভূপেন্দ্রনাথ সান্যাল, জগদানন্দ রায়, হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, অজিতকুমার চক্রবর্তী, সত্যেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর, নগেন্দ্রনাথ আইচ [সুধীরঞ্জন লিখেছেন, ইনি বিধুশেখর শাস্ত্রীরও পরে অর্থাৎ মাঘ ১৩১১-র পরে আসেন] ও রাজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—ইনি যুগপৎ শিক্ষক ও কর্মসচিব ছিলেন; অন্যান্য কর্মীরা ছিল কোদো, বিপিন, সতীশ ও চণ্ডী ঠাকুর, সাবু ধোপা, নাপিত গুরুদাস [আব্বাস] ও দ্বারী সর্দার।[১৩৩] রবীন্দ্রনাথের চিঠির সূত্রে জানা যায়, নগেন্দ্রনারায়ণ রায় ও সুবোধচন্দ্র মজুমদারও এই সময়ে শিক্ষকতা করছেন।

বিদ্যালয়ের 'হঠাৎ-বৃদ্ধি' রবীন্দ্রনাথের প্রারম্ভিক পরিকল্পনার বিরোধী হলেও তিনি মোহিতচন্দ্রকে সহায়তা করে গেছেন। ৩০ জ্যৈষ্ঠ [রবি 21 Jun] তিনি মোহিতচন্দ্রকে 'পঞ্চাশ জন থাকার ঘর' প্রস্তুত করার জন্য খুঁটিনাটি বর্ণনা-পূর্ণ যে দীর্ঘ চিঠি লিখেছিলেন, তা আমরা আগেই উদ্ধৃত করেছি।

রথীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্যাশ্রমে ভর্তি হওয়ায় শিলাইদহে তাঁর ইংরেজি শিক্ষক লরেন্সকে বিদায় দেওয়া হয়। তাঁর জন্য অন্যত্র কর্মসংস্থানের চেষ্টা করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ, কিন্তু সফল হয়েছিলেন কিনা জানা যায় না। বর্তমানে তাঁর কথা পুনরায় উল্লেখিত হয়েছে মোহিতচন্দ্রকে লেখা ২০ আষাঢ়ের [4 Jul] পত্রে : 'লরেন্সকে জিজ্ঞাসা করবেন বোলপুরেই যদি আবদ্ধ রাখি তা হলে কত টাকা বেতনে সে থাকতে রাজি হয়। তার যাতায়াতেই অনেকটাকা মাশুল খরচ পড়ে যাবে—তার উপরে বেতন যা দাবী করবে সেটা সবসুদ্ধ জড়িয়ে মন্দ হবে না।'[১৩৪] এই চিঠি থেকে মনে হয়, লরেন্স তখন বিদেশে কোথাও অবস্থান করছেন। কিন্তু ২৩ কার্তিক [8 Nov] রবীন্দ্রনাথের ক্যাশবহিতে 'লরেন্স সাহেবকে দেওয়া ২্' টাকার হিসাব দেখা যায়। অজিতকুমার চক্রবর্তীর 'ব্রহ্মবিদ্যালয়' গ্রন্থে প্রদত্ত ১৩০৯-১১ বঙ্গাব্দের অধ্যাপকগণের তালিকায় 'মিঃ লরেন্স' নামটি আছে। তিনি বিদ্যালয়ে অধ্যাপনার কাজ গ্রহণ করেছিলেন কিনা সে-বিষয়ে আমরা নিঃসন্দেহ নই।

অস্বস্তিকর অবস্থায় বিদ্যালয়ের প্রথম শিক্ষকদের একজন রেবাচাঁদকে বিদায় নিয়ে যেতে হয়। তিনি ৩০ টাকা মাসিক বেতনে জোড়াসাঁকোয় গৃহশিক্ষকতায় নিযুক্ত হন, 6 Aug [শনি ২২ শ্রাবণ] থেকে Jan 1905 পর্যন্ত তাঁকে বেতন দেওয়ার হিসাব পাওয়া যায়। বাল্যবন্ধু হরিশ্চন্দ্র হালদারকে 'ছেলেদের ড্রইং শিক্ষা দিবার জন্য' ৫্ টাকা করে বেতন দেওয়া হয়েছে আশ্বিন থেকে অগ্র° পর্যন্ত। 'অবিনাশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় পণ্ডিত' ২০্ টাকা বেতনে নিযুক্ত হয়েছেন 10 Nov [২৫ কার্তিক], তিনি Jan 1905 পর্যন্ত বেতন পেয়েছেন। কিন্তু এঁরা কাদের শিক্ষা দিতেন বলা শক্ত, রবীন্দ্রনাথের ছেলেমেয়েরা এইসময়ে প্রধানত শান্তিনিকেতনে বা অন্যত্র বাস

করেছেন। ইন্দিরা দেবী লিখেছেন : ‘[সুরেন্দ্রনাথ] বিয়ের পর দিনকতক রেবাচাঁদ বলে স্ত্রীর জন্য এক সিন্ধী মাস্টার রেখেছিলেন।’[১৩৪ক] হয়তো পূর্ব-কৃতজ্ঞতা বশত রেবাচাঁদের বেতন রবীন্দ্রনাথই মিটিয়ে দিয়েছেন।

বিদ্যালয়ে একজন অঙ্ক ও বিজ্ঞান শিক্ষক এবং একজন সংস্কৃত শিক্ষকের প্রয়োজন হওয়াতে ভূপেন্দ্রনাথ সান্যাল ডাঃ কানাইলাল গুপ্ত ও বিধুশেখর [ভট্টাচার্য] শাস্ত্রীকে মনোনীত করেন। কানাইলাল একটি উচ্চবিদ্যালয়ে দ্বিতীয় শিক্ষকের কাজ করছিলেন, ভূপেন্দ্রনাথের আহ্বানে তিনি ব্রহ্মচর্যাশ্রমে যোগ দেন। বিধুশেখর শান্তিনিকেতনে আসেন ১১ মাঘ [মঙ্গল 24 Jan 1905] তারিখে। এখানে আসার অল্পদিন পরে তিনি এন্ট্রান্স পরীক্ষা দিতে কলকাতা যান এবং অনুত্তীর্ণ হন।

ভাগলপুরে ভূপেন্দ্রনাথের একটি স্বদেশী দ্রব্যের দোকান ছিল, প্লেগের আক্রমণের সময়ে দোকানটি ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায় ভূপেন্দ্রনাথ দু'মাসের ছুটি নেন। এই অনুপস্থিতির সময়ে তিনি তাঁর বাল্যবন্ধু, পরবর্তীকালে বঙ্গবাসী কলেজের ইংরেজির অধ্যাপক, পুলিনবিহারী করকে স্থানাপন্ন করে যান, ‘কিন্তু নানা অসুবিধা হওয়ায় তিনি কিছুদিন পরেই চলিয়া যান।’[১৩৫]

মোহিতচন্দ্রও আষাঢ় মাসের শেষে অসুস্থ হয়ে কলকাতায় চলে আসেন। এই অসুস্থতা নিতান্ত অজুহাত ছিল না, তিনি সত্যই কঠিন পীড়ায় আক্রান্ত হয়েছিলেন। অবশ্য বিদ্যালয়ের সমস্ত কাজ দেখা তাঁর পক্ষে কঠিন হয়ে উঠেছিল, বড়ো করে ফাঁদতে গিয়ে তিনি নিজেও জড়িয়ে পড়েছিলেন। তাই অপেক্ষাকৃত সুস্থ হয়ে তিনি Jan 1905 থেকে সিটি কলেজে কর্মগ্রহণ করেন।

বিভ্রান্ত রবীন্দ্রনাথ পুজোর ছুটির শেষে নগেন্দ্রনারায়ণ রায়কে বিদায় দেন ও ভূপেন্দ্রনাথ সান্যালের উপর কর্মপরিচালনার দায়িত্ব অর্পণ করেন। সমস্ত বড়ো ছাত্রকে বিদায় দেওয়া হয়। ২৮ অগ্র° [13 Dec] রবীন্দ্রনাথ মোহিতচন্দ্রকে ৯ জন শিক্ষক ও মাত্র ২১ জন ছাত্র থাকার কথা লিখেছিলেন। এর কিছুকাল পরে ‘জাপানী ছুতর মিস্ত্রী’ কুসুমতো-সান শান্তিনিকেতনে যান ১৮ ফাল্গুন [বৃহ 2 Mar 1905]—‘কুসুমবাবু’র কাছে কাঠের কাজ শেখা ও তাঁর তৈরি ‘সোনার তরী’ ও ‘চিত্রা’ নৌকা ভুবনডাঙার বাঁধে ভাসানোর কথা অনেক প্রাক্তন ছাত্রের স্মৃতিকথায় পাওয়া যায়।

রবীন্দ্রনাথের বাড়ি ‘দেহলি’ গত বৎসর থেকে তৈরি হচ্ছিল, এই বৎসরেও নির্মাণ কার্য অব্যাহত থেকে সম্ভবত অগ্রহায়ণ মাসের মধ্যে সম্পূর্ণ হয়। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ও সত্যপ্রসাদের কাছ থেকে ঋণ নিয়ে বাড়িটি আরম্ভ হয়; ৯ ভাদ্রের [25 Aug] হিসাবে আছে : ‘বঃ বাবু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর দং উঁহার শান্তিনিকেতনের বাটী তৈয়ারীর জন্য দেওয়া যায় গুঃ বাবু জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর পূর্ব্বে উক্ত রবীন্দ্রবাবুকে বাটী তৈয়ারীর হিসাবে দেন তাহা শোধ ৩০০্/গুঃ বাবু সত্যপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায় পুর্ব্বে উক্ত বাবুর বাটী তৈয়ারী হিসাবে দেন তাহা শোধ ২০০্/৫০০্/গুঃ আশুতোষ রায়চৌধুরী দং বোলপুরের বাটী তৈয়ারীর হিসাবে দেওয়া যায়...৫০্/৫০০্’। ১২ পৌষ [28 Dec] ১৫০০্ টাকা হিসাব লিখে বাড়ি তৈরির খরচ মেটানো হয়েছে। পুরো খরচটিই দেওয়া হয়েছে সরকারী তহবিল থেকে। রবীন্দ্রনাথ অনেকদিন এই বাড়িটিতে বাস করেছিলেন।

ভূপেন্দ্রনাথের সেবাপরায়ণতার কথা সমসাময়িক সকলেই উল্লেখ করেছেন। সেই সেবাবৃত্তি ছাত্রদের ছাড়িয়ে অন্যদের প্রতিও বিস্তৃত হয়েছিল। হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন :

> ভূপেন-দার সহিত পরামর্শ করিয়া দরিদ্রদিগের সাহায্যার্থ আশ্রমে একটি দরিদ্রভাণ্ডার প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলাম। ইহা রবীন্দ্রনাথের অভীষ্ট বিষয়ের অন্যতম। শিক্ষকদিগের প্রদত্ত মাসিক চাঁদায়, অতিথি-অভ্যাগতের দানে, কবির সাময়িক অর্থসাহায্যে এই ভাণ্ডার অল্পদিনেই বেশ সমৃদ্ধ

হইয়া উঠিয়াছিল। পাকশালায় প্রত্যহ যে চাউল আসিত, তাহা হইতে দুই সের চাউল ভাণ্ডারের জন্য নির্দ্দিষ্ট ছিল। মন্দিরের ফটকে লৌহ কপাটে ভাণ্ডারের একটি ভিক্ষাপাত্র সংলগ্ন ছিল, তাহার উপরে লিখিত ছিল,—"সব ধর্ম্মমাঝে ত্যাগ-ধর্ম্ম সার ভুবনে।" মন্দিরের দর্শকগণ ও পর্ববিশেষে সমাগত মহাত্মারা এই পাত্রে কিছু কিছু দান করিতেন।...বিদ্যালয়ের চাউল হইতে দরিদ্রদিগকে ভিক্ষা দেওয়া হইত, উদ্বৃত্ত অংশের বিক্রয়লব্ধ অর্থ ভাণ্ডারের হিসাবে জমা হইত। সংগৃহীত অর্থের হিসাবপত্র আমিই রাখিতাম। এই অর্থে কাপড়, চাদর, কম্বল কিনিয়া দরিদ্রকে দেওয়ার ব্যবস্থা ছিল। দরিদ্র ছাত্রের বেতন, পুস্তকের মূল্য, দুঃস্থদিগকে সাহায্যার্থ অর্থ, বিদেশীয় অর্থহীন বিপন্ন ভদ্রলোকের পাথেয় ইত্যাদি এই ভাণ্ডার হইতে দেওয়া হইত।[১৩৬]

রবীন্দ্রনাথের একেবারের দানের হিসাব পাওয়া যায় ২১ অগ্র° [মঙ্গল 6 Dec] : 'বোলপুরে পুয়োর ফাণ্ডে দিবার জন্য গুঃ রবীন্দ্র নাথ সিংহ ১০্।' এইদিন 'মঙ্গলবার' রবীন্দ্রনাথ ভূপেন্দ্রনাথকে লিখেছেন : 'দরিদ্র তহবিলের জন্য দশ টাকা সিংহের হাত দিয়া পাঠাইয়াছি, পাইয়াছেন ত? এবারে ঐ তহবিলের যাহাতে সদ্‌গতি হয় ও হিসাব থাকে তাহা করিবেন—আরবারে অত্যন্ত এলোমেলো ব্যাপার হইয়া গেছে। কাপড়গুলাও নষ্ট না হইয়া যাহাতে কাজে লাগে তাহা করিবেন।'[১৩৭] কিছুদিন পরে এই ভাণ্ডারের সঙ্গে সাঁওতাল পল্লীতে সান্ধ্যবিদ্যালয় ও চিকিৎসাবিধানের ব্যবস্থা করা হয়।

গত বৎসর আশ্রমে শিক্ষক সতীশচন্দ্র রায়ের মৃত্যু হয়েছিল, বর্তমান বৎসরে ১০ ভাদ্র [শুক্র 26 Aug] মনোরঞ্জন গুহঠাকুরতার পুত্র যোগরঞ্জনের মৃত্যু হয় কয়েকদিনের জ্বরে। রবীন্দ্রনাথ তখন গিরিডিতে। ঘটনাটি অভিভাবকদের চঞ্চল করে তুলেছিল, অনেকেই সাময়িকভাবে তাঁদের সন্তানদের বিদ্যালয় থেকে নিয়ে যান।

রথীন্দ্রনাথ এন্ট্রান্স পাশ করার পর কোনো কলেজে ভর্তি না হয়ে শান্তিনিকেতনে থেকেই বিভিন্ন শিক্ষকের তত্ত্বাবধানে উচ্চতর শিক্ষার স্বাধীন পাঠ গ্রহণ করছিলেন এইভাবে তিনি সতীশচন্দ্র রায়ের কাছে শিক্ষা গ্রহণ করেছেন, মোহিতচন্দ্র সেনের কাছে ইংরেজি সাহিত্যের পাঠ গ্রহণের সৌভাগ্যও তাঁর হয়েছিল। এই পাঠের সূত্রে ব্রহ্মচর্যাশ্রমে তৃতীয়বার নাট্যাভিনয়ের আয়োজন হল। এই নাট্যাভিনয়ের কৌতুককর কাহিনী বিবৃত করেছেন রথীন্দ্রনাথ :

শেক্‌স্পীয়রের *A Midsummer Night's Dream* নাটক পড়বার পর মোহিতবাবুর ইচ্ছা হল আমরা এই নাটক অভিনয় করি।...দুঃসাহসে ভর করে আমরা তো তদ্দণ্ডেই উঠে-পড়ে লাগলাম। এই অভিনয়-ব্যাপার থেকে কাউকেই বাদ দেওয়া চলবে না—এরকম স্থির হল। আমাদের গণিত-শিক্ষক জগদানন্দ রায়কে Wall-এর পার্ট দেওয়া হল—কারণ এই পার্টে কথা বলার পাট নেই বললেই চলে।

In this same interlude doth befall that I,...এইটুকু বলেই জগদানন্দবাবু মঞ্চে অন্য যে-সব অভিনেতা ছিলেন তাঁদের দিকে জিজ্ঞাসুভাবে তাকিয়ে রইলেন, যদি তাঁদের কেউ সেই পরের অংশটুকু ধরিয়ে দেন। বেশ একটু সময় কেটে যাবার পর শেষ দিকের কটি কথা তাঁর মনে পড়ে গেল—/And thus have I, wall, my/part discharged so.../এই কথাটুকু উর্ধ্বশ্বাসে বলে যেই-না তিনি দ্রুত প্রস্থান করেছেন—দর্শক-শ্রোতার দল উচ্চহাস্যে ফেটে পড়ল।[১৩৮]

জগদানন্দের এই প্রথম নাট্যাভিনয় যতই কৌতুকাবহ হোক-না-কেন, পরবর্তীকালে কুশলী নটরূপে তিনি খ্যাতি অর্জন করেন।

অভিনয়ানুষ্ঠানটি কখন হয়েছিল, তা বলা মুশকিল। ৯ বৈশাখ পুরী থেকে ফিরে রথীন্দ্রনাথ অনতিবিলম্বে মজঃফরপুর ও হিমালয় ভ্রমণে যাত্রা করেন—ফিরে এসে ১৭ আষাঢ় [শুক্র 1 Jul] শান্তিনিকেতনে যান। ২৭ আষাঢ় [সোম 11 Jul] অসুস্থ রথীন্দ্রনাথকে নিয়ে রবীন্দ্রনাথ কলকাতায় চলে আসেন। এর কয়েকদিন পরেই মোহিতচন্দ্র অসুস্থ হয়ে শান্তিনিকেতন ত্যাগ করেন। সুতরাং ১৮-২৬ আষাঢ়ের [2-10 Jul] মধ্যে কোনোদিন নাটকটি অভিনীত হয়েছিল এইরূপ সিদ্ধান্ত করা ছাড়া গত্যন্তর নেই। রবীন্দ্রনাথ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন না বলেই মনে হয়।

উল্লেখপঞ্জী

১ চিঠিপত্র ৮।২০৯, পত্র ১৭৬

২ ঐ ৮।২১০, পত্র ১৭৭

৩ পিতৃস্মৃতি। ৫৩-৫৪

৪ *Letters of Sister Nivedita*, Vol. II [1982], p. 651, No. 289

৫ চিঠিপত্র ১০।২১, পত্র ২২

৬ ঐ ১০।২২, পত্র ২৩

৭ ঐ ১০।২৩, পত্র ২৪

৮ ঘরের কথা ও যুগসাহিত্য। ২০২

৯ চিঠিপত্র ১০।২১, পত্র ২২

১০ ঐ ১০।২৫, পত্র ২৫

১১ ঐ ১০।২৩, পত্র ২২

১২ ঐ ১০।২৪, পত্র ২৩

১৩ ঐ ১০।২৫, পত্র ২৫

১৪ রবীন্দ্রভবনে রক্ষিত মূল পত্র

১৫ বি. ভা. প., চৈত্র ১৩৪৯।৫৬৫

১৬ স্মৃতি।১২

১৭ কথাসাহিত্য, মাঘ ১৩৬৭।৪৭১

১৮ বি. ভা. প., চৈত্র ১৩৪৯।৫৬৬

১৯ ঐ। ৫৭০

২০ ঐ। ৫৭১

২১ ঐ। ৫৭১

২২ কথাসাহিত্য, শ্রাবণ ১৩৬৮।১১৪৩

২৩ তত্ত্ব°, আষাঢ়। ৩৫

২৪ ভারতী, আষাঢ়। ২১৭

২৫ দ্র 'আশ্রম-স্মৃতি' : রবীন্দ্রনাথ ও ত্রিপুরা। ২৪৫-৪৬

২৬ রবীন্দ্রনাথ ও ত্রিপুরা। ২৪৮

২৭ দেশ, শারদীয় ১৩৪৯।৪২৫

২৮ *Letters of Sister Nivedita*, Vol. II, p. 654, No. 292

২৯ পত্রাবলী। ১৬৬, পত্র ৫৯

৩০ বি. ভা. প., চৈত্র ১৩৪৯। ৫৬৮-৬৯

৩১ ঐ। ৫৬৭

৩২ চিঠিপত্র ১০।২৬, পত্র ২৬

৩৩ ঐ। ৮।২১১, পত্র ১৭৮

৩৪ দেশ, সাহিত্য ১৩৭৬।১৪৩-৪৪

৩৫ বি. ভা. প., চৈত্র ১৩৪৯।৫৬৯

৩৬ দেশ, শারদীয় ১৩৪৯।৪২৫

৩৭ রবীন্দ্রভবনে রক্ষিত মূল পত্র

৩৮ বি. ভা. প., অগ্র° ১৩৪৯।২৯২-৯৩

৩৯ শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ের শিক্ষাদর্শ [১৩৮৮]। ১০৭

৪০ দ্র কবির কথা। ৭

৪১ স্মৃতি। ২৮

৪২ রবীন্দ্রভবনে রক্ষিত মূল পত্র

৪৩ বি. ভা. প., শ্রাবণ-আশ্বিন ১৩৫৫।৪৭

৪৪ রবীন্দ্রভবনে রক্ষিত মূল পত্র

৪৫ স্বদেশী সমাজ [১৩৯৩]। ১০৬-০৭

৪৬ ঐ।১১৫-১৬

৪৭ ঐ। ৫৩-৫৭

৪৮ বি. ভা. প., মাঘ-চৈত্র ১৩৭৩।১৮৫-৮৬

৪৯ স্বদেশী সমাজ [১৩৯৫]। ৫৮-৫৯

৪৯ক দ্র কানাইলাল চট্টোপাধ্যায়-সম্পাদিত ‘সাময়িকপত্রে সমাজচিত্র : সঞ্জীবনী’ [১৩১৫]। ১১৭-৮৫

৫০ রবীন্দ্র-সঙ্গ-প্রসঙ্গ [১৩৯১]। ২৩

৫১ নালুদার চিঠি ৪ [1935]। ১৫০, পত্র ৫

৫২ বি. ভা., প., চৈত্র ১৩৪৯।৫৭১

৫৩ চিঠিপত্র ১০।২৭, পত্র ২৮

৫৪ বি. ভা. প., চৈত্র ১৩৪৯।৫৭১-৭২

৫৫ রবীন্দ্রবীক্ষা ১০।১৬-১৭, পত্র ৬

৫৬ চিঠিপত্র ১০।২৯, পত্র ৩০

৫৭ পিতৃস্মৃতি। ২৭৩

৫৮ বি. ভা., প., চৈত্র ১৩৪৯।৫৭৩

৫৯ রবীন্দ্রনাথ ও ত্রিপুরা। ৬৮-৬৯

৬০ চিঠিপত্র ১০।২৮, পত্র ২৯

৬১ দেশ, ১৯ মাঘ ১৩৯১।১৮, পত্র ৫

৬২ চিঠিপত্র ১০।২৯, পত্র ৩০

৬৩ বি. ভা. প., চৈত্র ১৩৪৯।৫৭৪

৬৪ রবীন্দ্রভবনে রক্ষিত মূল পত্র

৬৫ ঐ

৬৬ বি. ভা. প., শ্রাবণ-আশ্বিন ১৩৭৩।৬

৬৭ ঐ। ৭

৬৮ ঐ।৭

৬৯ 'মর্ম্মর প্রস্তরে লক্ষ্মীমূর্ত্তি' : প্রবাসী, কার্তিক। ৩৯৩-৯৪

৭০ ঐ। ৩৯৪

৭১ রবীন্দ্রনাথ ও ত্রিপুরা। ৬৯

৭২ *Letters of Sister Nivedita*, Vol. II, p. 681, No. 309

৭৩ *Ibid*, p. 685, No. 313

৭৪ চিঠিপত্র ৬।১৬৯-৭০-এ উদ্ধৃত

৭৫ পিতৃস্মৃতি। ২৫৩-৫৪

৭৬ *Letters of Sister Nivedita*, Vol. II, p. 686, No. 313

৭৭ রবীন্দ্রভবনে রক্ষিত প্রতিলিপি

৭৭ক 'ভগিনী নিবেদিতা' : পরিচয় ১৮।৪৮

৭৭খ শঙ্করীপ্রসাদ বসু : 'নিবেদিতার পত্রে রবীন্দ্রনাথ এবং প্রাসঙ্গিক তথ্য' দেশ, ৭ পৌষ ১৩৭৪। ৭৭৩-এ উদ্ধৃত

৭৮ রবীন্দ্রভবনে রক্ষিত মূল পত্র

৭৯ বি. ভা. প., চৈত্র ১৩৪৯।৫৭৩

৮০ ঐ, মাঘ-চৈত্র ১৩৭৩।১৮৫

৮১ ঐ। ১৮৬

৮২ স্মৃতি। ৪৩

৮৩ দেশ, শারদীয় ১৩৪৯।৪২৬

৮৪ চিঠিপত্র ১০।১০, পত্র ১০

৮৪ক দ্র সুধীরঞ্জন দাস : আমাদের শান্তিনিকেতন. [১৩৬৯]। ৪৮

৮৪খ রবীন্দ্রনাথের রহস্যগল্প ও অন্যান্য প্রবন্ধ [1984]। ১৩

৮৪গ ঐ। ১১

৮৫ বি. ভা. প., মাঘ-চৈত্র ১৩৭৩।১৮৫

৮৬ স্মৃতি। ২৭

৮৭ দ্র *The Bengalee*, Nov. 17

৮৮ দেশ, শারদীয় ১৩৪৯। ৪০১-০২, পত্র ২

৮৯ ঐ। ৪০২, পত্র ৩

৯০ রবীন্দ্রভবনে রক্ষিত মূল পত্র

৯১ শিশির বসু : একশ বছরের বাংলা থিয়েটার। ৩০২-০৩

৯২ রবীন্দ্রভবনে রক্ষিত মূল পত্র

৯৩ রবীন্দ্রভবনে রক্ষিত প্রতিলিপি

৯৪ রবীন্দ্রভবনে রক্ষিত মূল পত্র

৯৫ তত্ত্ব°, মাঘ। ১৫১

৯৬ *Letters of Sister Nivedita*, Vol. II, p. 711, No. 326

৯৭ *The Visva-Bharati Quarterly*, Aug-Oct 1943, p. 179

৯৮ তত্ত্ব°, ফাল্গুন। ১৮০

৯৯ ঐ। ১৭১

১০০ বিকচ চৌধুরী : রবীন্দ্র সান্নিধ্যে ত্রিপুরা। ১৭২

১০১ রবীন্দ্রভবনে রক্ষিত মূল পত্র

১০১ক শঙ্করীপ্রসাদ বসু ও অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়-সম্পাদিত বিশ্ববিবেক [১৩৭০]। ৭৯

১০২ রবীন্দ্রনাথ ও ত্রিপুরা। ২৫৩

১০৩ দ্র সুধীরঞ্জন দাস : আমাদের শান্তিনিকেতন। ৪৪

১০৪ *The Bengalee*, 24 Feb 1905

১০৫ রবীন্দ্রভবনে রক্ষিত মূল পত্র

১০৬ বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের একাদশ বার্ষিক কার্য্যবিবরণ। ৩্

১০৭ দেবকুমার রায়চৌধুরী : দ্বিজেন্দ্রলাল [১৩২৪]। ৪৬৭-৬৮

১০৮ ‘রবীন্দ্রনাথ ও শান্তিনিকেতন’ : দেশ, সাহিত্য ১৩৬৬।২১৯

১০৮ক দ্র রবীন্দ্রনাথ : জীবন ও সাহিত্য। ৯৪-৯৫

১০৯ রবীন্দ্রভবনে রক্ষিত মূল পত্র

১১০ দ্র Tagore Family Papers No. 81

১১১ রবীন্দ্রভবনে রক্ষিত 'শচীন্দ্রনাথ অধিকারী-সংগ্রহ'-ভুক্ত মূল পত্র

১১২ রবীন্দ্রভবনে রক্ষিত মূল পত্র

১১৩ *The Bengalee*, 29 Mar 1905

১১৪ দেশ, সাহিত্য ১৩৮৫।১০, পত্র ৫

১১৫ কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির বিবরণী লিপিবদ্ধ করিবার খাতা [ব. সা. প.]

১১৬ সজনীকান্ত দাস : 'ভাণ্ডারের কাণ্ডারী রবীন্দ্রনাথ', রবীন্দ্রনাথ : জীবন ও সাহিত্য। ৫৬

১১৬ক পিতৃস্মৃতি। ৮৭-৮৮

১১৭ *Letters of Sister Nivedita*, vol. II, p. 647, No. 287

১১৮ প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, সা-সা-চ ৫।৫৪ [১৩৭০]। ৭

১১৯ তত্ত্ব°, শ্রাবণ। ৬৫-৬৬

১২০ দ্র *The Bengalee*, 12 Oct 1904

১২১ জীবনের ঝরাপাতা। ১৪৩

১২২ দ্র *The Bengalee*, 20 Nov 1904

১২৩ জীবনের ঝরাপাতা। ১৪৪

১২৪ দ্র *The Bengalee*, 31 Aug 1904

১২৫ রবীন্দ্রনাথ ও ত্রিপুরা। ২৪৯

১২৬ জীবনের ঝরাপাতা। ১৪৯

১২৭ দ্র *The Bengalee*, 2 Aug 1904

১২৮ ভারতের দ্বিতীয় স্বাধীনতার সংগ্রাম। ১৫৭-৫৮

১২৯ দ্র *The Bengalee*, 4 Jan 1905

১৩০ দ্র লোকমাতা নিবেদিতা। ২।২৩৩-৪৩

১৩১ ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়। ৫৮

১৩২ ব্রহ্মবিদ্যালয় [১৩৫৮]। ২৫-২৭

১৩৩ দ্র সুধীরঞ্জন দাস : আমাদের শান্তিনিকেতন [১৩৬৯]। ২৬-৩৫

১৩৪ রবীন্দ্রভবনে রক্ষিত মূল পত্র

১৩৪ক সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর শতবার্ষিক সংকলন। ১৫

১৩৫ 'রবীন্দ্র প্রসঙ্গ' : দেশ, শারদীয় ১৩৪৯।৪২৬

১৩৬ 'রবীন্দ্রপ্রসঙ্গের পরিশিষ্ট' : রবীন্দ্রনাথের কথা। ৩৮-৩৯

১৩৭ দেশ, শারদীয় ১৩৪৯।৪০২, পত্র ৩

১৩৮ পিতৃস্মৃতি। ৭৭-৭৮

* এই প্রবন্ধটির সারসংকলন অন্যান্য বহু মূল্যবান তথ্য-সহ পুলিনবিহারী সেন-সম্পাদিত ‘স্বদেশী সমাজ’ [পৌষ ১৩৬৯] গ্রন্থে প্রকাশিত হয়েছে। আমরা উদ্ধৃতিগুলি এই গ্রন্থের পুনর্মুদ্রিত সংস্করণ [ফাল্গুন ১৩৯৩] থেকে নিয়েছি।

* তারিখগুলি *The Bengalee*-র বিভিন্ন সংখ্যা থেকে সংগৃহীত।

প ঞ্চ চ ত্বা রিং শ অ ধ্যা য়

১৩১২ [1905-06] ১৮২৭ শক ॥ রবীন্দ্রজীবনের পঞ্চচত্বারিংশ বৎসর

বর্তমান বৎসরের ১ বৈশাখ [শুক্র 14 Apr] রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনে ছিলেন, সুতরাং ব্রহ্মচর্যাশ্রমের ছাত্র ও শিক্ষকদের নিয়ে নববর্ষের প্রাতে তিনি মন্দিরে যথারীতি উপাসনা করেছিলেন একথা নিশ্চিতই বলা যেতে পারে—কিন্তু তিনি কোনো লিখিত উপদেশ পাঠ করেননি, তত্ত্ববোধিনী বা বঙ্গদর্শন-এ এরূপ কোনো রচনার সন্ধান মেলে না।

ইন্দিরা দেবী কোনো এক সময়ে ইংরেজ কবি ও নাট্যকার Stephen Phillips [? 1868-1915]-রচিত Marpessa কবিতাটি 'মঞ্জুলা' নামে বাংলায় অমিত্রাক্ষর ছন্দে অনুবাদ করেন। ৭টি রুল-টানা ফুলস্ক্যাপ কাগজের উভয় পৃষ্ঠায় লিখিত পাণ্ডুলিপিটি তিনি রবীন্দ্রনাথকে দেন সংশোধনের উদ্দেশ্যে। কালিতে লেখা ইন্দিরা দেবীর রচনার উপরে পেনসিলে সংশোধন করতে আরম্ভ করে রবীন্দ্রনাথ শেষে পৃষ্ঠার ডানদিকে প্রায় সমস্ত রচনাটি নতুন করে অনুবাদ করেন। রবীন্দ্রভবনে রক্ষিত পাণ্ডুলিপিটির [Ms. 222A] ছত্রসংখ্যা গণনা করলে দেখা যায়, ইন্দিরা দেবী-লিখিত ৪৪৫টি ছত্রের জায়গায় রবীন্দ্রনাথ-লিখিত নূতন ছত্রের সংখ্যা ৩৩৩টি, ছোটখাটো অন্যান্য পরিবর্তন তো আছেই। এই সংশোধিত রচনাটি তিনি একটি রুল-টানা এক্সারসাইজ খাতার ১৯টি পৃষ্ঠায় নকল করেন, কিঞ্চিৎ সংশোধিত ও সংক্ষিপ্ত হয়ে রচনাটি ৩৮৮ ছত্রে সমাপ্ত হয়—রবীন্দ্রনাথ রচনা-শেষে তারিখ লেখেন: '১লা বৈশাখ/১৩১২/শান্তিনিকেতন।' এই লেখাটি ফাল্গুন ১৩১৭-সংখ্যা প্রবাসী-তে [পৃ ৫৩৩-৩৯] 'শ্রী—' স্বাক্ষরে মুদ্রিত হয়। প্রবাসী-র তৎকালীন সহকারী সম্পাদক চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মুদ্রাকরের মসী-লাঞ্ছিত এই পাণ্ডুলিপিটি রক্ষা করেছিলেন। তাঁর পুত্র কনক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে পাণ্ডুলিপিটি দেখে ও রবীন্দ্রভবনে রক্ষিত পাণ্ডুলিপিটির সঙ্গে মিলিয়ে বিস্তৃত পাঠ-পরিচয়-সহ দ্বিতীয় পাণ্ডুলিপিটির সম্পূর্ণ লিপিচিত্র পুলিনবিহারী সেন 'রবীন্দ্রনাথ-কর্তৃক সম্পাদিত রচনা' শিরোনামে ১৩৭৩ বঙ্গাব্দের সাহিত্যসংখ্যা দেশ-এ [পৃ ৩৩-৫১] প্রকাশ করেন। ইন্দিরা দেবীর অনুবাদ ও রবীন্দ্রনাথের সংশোধন-সংবলিত প্রথম পাণ্ডুলিপির প্রথম পৃষ্ঠাটির লিপিচিত্রও উক্ত সংকলনে মুদ্রিত হয়েছে। উভয় পাঠ সযত্নে মিলিয়ে দেখলে পাঠক লক্ষ্য করবেন, রবীন্দ্রনাথ কিভাবে ইন্দিরা দেবীর গদ্যাত্মক অনুবাদটিকে কাব্যগুণান্বিত করে তুলেছেন। গদ্যে ও পদ্যে এরূপ কাজ তিনি জীবনের প্রায় শেষ পর্যন্ত করে গিয়েছেন।

২ বৈশাখ [শনি 15 Apr] রবীন্দ্রনাথ কোনো ব্যক্তির সঙ্গে আলোচনা প্রসঙ্গে 'মেয়েদের অধিকার' সম্বন্ধে যা বলেন, রথীন্দ্রনাথ তার নোট নেন [দ্র পিতৃস্মৃতি। ২৭৪-৭৭]। ভারতীয় ও য়ুরোপীয় দৃষ্টিতে নারীত্বের

আদর্শের পার্থক্য বিষয়ে তিনি যা বলেছেন, তার সঙ্গে য়ুরোপযাত্রীর ডায়ারি-র ভূমিকা অংশের বক্তব্যের বিভিন্নতা নেই। কিন্তু কথোপকথনের প্রারম্ভেই তিনি একটি কৌতূহলজনক স্মৃতির উল্লেখ করেছেন : 'একদিন সন্ধ্যাবেলা দেখলুম একটি মেয়ে উপরের ছাতে চঞ্চলভাবে হেঁটে বেড়াচ্ছে। মাঝে মাঝে উপরের দিকে নুড়ি ছুঁড়ছে—তার মধ্যে কেমন একটা লীলার, একটা চঞ্চলতার ভাব। নীচের বারান্দায় ঠিক সেই মুহূর্তে আরেকটি মেয়ে ধীরভাবে তরিতরকারি কুটছে। এই ছবি দেখে আমার মনে হল যে মেয়েদের মধ্যে দুরকমের ভাব আছে—একটা স্ত্রীর ভাব, আর একটা মার ভাব। একটা মনোহরণ, চিত্তরঞ্জন করার ভাব—অন্যটা মঙ্গলের ভাব।' রবীন্দ্র-রচনায় মেয়েদের এই দুই রূপের কথা প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত আছে। ১৯ বৈশাখ ১৩১৮ [মঙ্গল 2 May 1911] শান্তিনিকেতনে অধ্যাপকদের কাছে নিজের কবিতা নিয়ে আলোচনার সময় 'উর্বশী' কবিতা প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ এই ঘটনাটির উল্লেখ করেন।[১]

বেঙ্গল লাইব্রেরির ক্যাটালগ অনুযায়ী ভাণ্ডার-এর প্রথম সংখ্যা প্রকাশের তারিখ 24 Apr [সোম ১১ বৈশাখ] হলেও রবীন্দ্রনাথ ৭ বৈশাখেই [বৃহ 20 Apr] রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীকে লিখেছেন : 'ভাণ্ডার বাহির হইয়াছে—প্রথম সংখ্যা ছাপার ভুলের ভাণ্ডার হইয়াছে।' এই সংখ্যায় রামেন্দ্রসুন্দরের একটি 'উত্তর' [পৃ। ৩৬-৩৮] ছাপা হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথ তাঁকে অনুরোধ করেন : 'ভাণ্ডারের জন্য কতকগুলি প্রস্তাব ও প্রশ্ন, অমনি এক আধটা প্রবন্ধ ঠিক করিয়া রাখিবেন। এই কাগজটাকে কেজো কাগজ করিতে চাই।'[২] তাঁর যে তিনটি রচনা এই সংখ্যায় মুদ্রিত হয়, সেগুলিও 'কেজো' রচনা :

১-৪ 'সূত্রধরের কথা'

১৩-১৫ 'প্রাইমারী-শিক্ষা' দ্র শিক্ষা-পরিশিষ্ট ১২।৫১২

২৫-২৬ 'প্রস্তাব/স্মৃতিরক্ষা' দ্র সমাজ-পরিশিষ্ট ১২।৪৯৯

'সূত্রধারের কথা'কে সম্পাদকের ভূমিকা বলা যেতে পারে। পত্রিকা প্রকাশের উদ্দেশ্য বর্ণনা করার জন্য প্রকাশকের দ্বারা অনুরুদ্ধ হয়ে তিনি গোড়াতেই পাঠককে আশ্বাস দিয়ে লিখেছেন : 'যদিও আমি সম্পাদক, তবু আমার মনে কোনপ্রকার স্পষ্ট রকমের উদ্দেশ্য নাই। সাধু উদ্দেশ্যের উৎপীড়নে যাহারা পৃথিবীকে এক মুহূর্ত্ত স্থির হইতে দিতেছে না, আমি তাহাদের দলে নাম লিখাইতে প্রস্তুত নই।' নিছক কৌতূহলের জন্য তিনি সম্পাদনার দায়িত্ব স্বীকার করেছেন : 'দেশের যে সকল লোক নানাবিষয়ে নানারকম ভাবনাচিন্তা করিয়া থাকেন, তাঁহারা কি ভাবিতেছেন জানিবার যদি সুযোগ পাওয়া যায়, তবে মনে ঔৎসুক্য না জন্মিয়া থাকিতে পারে না।/আমাদের দেশে তাহা জানিবার ভালরকম সুবিধা নাই। তাহার মূল কারণ, ভাবনাচিন্তার তরঙ্গ তেমন প্রবল নয়। প্রবল হইতেই পারে না; কারণ কাজের সঙ্গে ভাবনার যোগ যেখানে নাই সেখানে কেবলমাত্র সৌখীন ভাবনার তেমন তেজ থাকে না।' ব্যক্তিগত সমৃদ্ধির চিন্তা ছাড়া যাঁরা ভাবনার এক অংশকে সাধারণের কাজেও খাটাতে চেষ্টা করেন, সেখানেও কাজের ভাগ এতই অল্প যে তা দেশের মনকে তেমন করে জাগিয়ে রাখতে পারে না। 'কেবল ফুঁ দিলেই ত আগুন টেঁকে না, কাঠও চাই।' যে-সব দেশে নানা কাজ চলছে সেখানে নানা ভাবনা ও কথা কেমন করে লোকের মনকে জাগিয়ে তোলে সেখানকার পত্রপত্রিকায় তার পরিচয় পাওয়া যায় [রবীন্দ্রনাথ এই সচল ভাবনার সঙ্গে দেশীয় পাঠকদের পরিচয়সাধনের জন্য বিদেশী পত্রিকা থেকে অনুবাদ ও সংকলনের জন্য সর্বদাই সচেষ্ট থেকেছেন, ভাণ্ডার-এও 'সঞ্চয়' নামে এই ধরনের একটি বিভাগ ছিল]।

কিন্তু মন যেখানে এভাবে নিজের শক্তিকে নানাভাবে অনুভব করার সুযোগ পায় না, সেখানে জড়তা ও নিরানন্দ অপরিহার্য। সেইজন্য ‘প্রকাশকের মুখে যখন জানিতে পারিলাম, আমাদের এই কাগজটাতে একটা মানসিক সামাজিকতা স্থাপনের চেষ্টা হইতেছে, দেশের পাঁচ জন ভাবুককে একটা বৈঠকে আমন্ত্রণের উদ্যোগ হইতেছে, তখন কৌতূহলে আমার মন আকৃষ্ট হইল।’ নিজের সম্পাদকীয় অভিজ্ঞতা থেকে তিনি জানেন, বড়ো কাগজের বড়ো লেখা অধিকাংশ সময়েই অন্তরের তাগিদে লেখা নয়—সম্পাদকের তাগিদে বানিয়ে লেখা। সেইজন্য ভাণ্ডারের প্রকাশক ‘মুষ্টিভিক্ষায় বাহির হইয়াছেন। অতিবড় পাষাণহৃদয় লোকও তাঁহাকে নিরাশ করিতে পারিবেন না। মাঝে হইতে পাঁচ দ্বারে কুড়াইয়া এমন একটি সঞ্চয় দাঁড়াইতে পারে, যাহাতে দেশের পুষ্টিসাধনের কাজ সহজে চলিয়া যায়।’ বিভিন্ন চিন্তাশীল মানুষের গতিশীল ভাবনাবাহী ছোটো লেখা প্রকাশই ভাণ্ডার-এর উদ্দেশ্য, তার দ্বারাই পাঠকের মন চিন্তার খোরাক পেতে পারবে—সূচনা প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ এইরূপ আশাই ব্যক্ত করেছেন। লক্ষণীয়, এখানে তাঁর ভূমিকা সম্পাদকের নয়, সূত্রাধারকের—লেখা সংগ্রহ, রচনার সংস্কার ইত্যাদি সম্পাদকীয় কর্তব্য এখানে তিনি পরিহার করেছেন।

প্রাথমিক শিক্ষায় উপভাষা চালানোর অপপ্রয়াস সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ দীর্ঘ আলোচনা করেছিলেন ‘সফলতার সদুপায়’ প্রবন্ধে। ‘প্রাইমারী-শিক্ষা’ রচনায় তিনি বিষয়টিকে অন্য দৃষ্টিকোণ থেকে দেখে বললেন, কমিটির প্রস্তাব কাজে পরিণত হলেও তেমন ভয়ের কারণ নেই। কেননা, চাষা নিজের কাজের ক্ষতি করেও তার ছেলেকে পাঠশালায় পাঠায় তাকে ভদ্রসমাজের সীমানার দিকে অগ্রসর করে দেবার জন্য—যাতে সে ‘চিঠিটা পত্রটা লিখিতে পারে, পড়িতেও পারে, জমিদারের কাছারিতে দাঁড়াইয়া কতকটা ভদ্রছাঁদে মোক্তারি করিতে পারে, গ্রামের মোড়লি করিবার যোগ্য হয়’। তার পরিবর্তে পাঠশালায় গিয়ে সে যদি ‘অভ্যস্ত গ্রাম্যভাষা এবং তাহাদের নিজের ব্যবসায়ের সামান্য দুটো কথা’ শিখে আসে, সেই শিক্ষার প্রতি চাষার অবশ্যই অশ্রদ্ধা হবে। তাছাড়া প্রাইমারি পাশ করে ছাত্রবৃত্তি পড়তে গেলে তাকে যখন সাধুভাষা শিখতে হবেই, তখন চাষা তার ছেলেকে ভদ্রলোকের পাঠশালাতেই পড়াতে চাইবে। এই-সব কারণে রবীন্দ্রনাথ আশা করেছেন : ‘চাষার সদ্‌বুদ্ধি চাষাকে এবং দেশকে শিক্ষা কমিটির গুপ্তবাণ হইতে রক্ষা করিবে।’

‘স্মৃতিরক্ষা’ পত্রিকার ‘প্রস্তাব’ বিভাগের অন্তর্গত। ইতিপূর্বে রবীন্দ্রনাথ ‘শোকসভা’ [দ্র সাধনা, জ্যৈষ্ঠ ১৩০১; আধুনিক সাহিত্য-পরিশিষ্ট ৯।৫২৯-৩৬] ও ‘বারোয়ারি-মঙ্গল’ [দ্র বঙ্গদর্শন, চৈত্র ১৩০৮; ভারতবর্ষ ৪।৪২৪-৪০] প্রবন্ধে বলেছিলেন, বিলিতি কায়দায় বিশিষ্ট ব্যক্তির স্মৃতিরক্ষায় শোকসভা বা মর্মরপ্রস্তরে নির্মিত মূর্তিপ্রতিষ্ঠা দেশীয় প্রথা নয়। শোকসভা বা স্মৃতিসভা সম্পর্কে তাঁর কিঞ্চিৎ সমর্থন ছিল, কারণ এই স্মরণের মাধ্যমে স্মরণীয় ব্যক্তিকে নূতন করে পাওয়া যায়, ‘যত দীর্ঘকাল আমরা মহাত্মাদিগকে পূজা করিব, ততই তাঁহাদের স্মৃতি আমাদের দেশের স্থায়ী ঐশ্বর্যরূপে বর্ধিত হইতে থাকিবে।’ কিন্তু সভা ডেকে চাঁদা তুলে বিলাতের শিল্পীকে দিয়ে অনুরূপ বা বিরূপ একটি মূর্তি প্রতিষ্ঠার পর তাকে ম্যুনিসিপ্যালিটির জিম্মায় ফেলে রাখাকে রবীন্দ্রনাথ মৃত মহাত্মাকে ‘থ্যাঙ্কস্’ দিয়ে বিদায় করা বলে মনে করতেন। তাই তিনি প্রস্তাব করেছেন, জয়দেব মেলার মতো মৃত মনীষীদের নামে মেলা প্রবর্তন করতে, কেননা ‘মেলায় যে-স্মৃতি প্রচারিত হয়, তাহা চিরদিন নবীন, চিরদিন সজীব, এক কাল হইতে অন্য কাল পর্যন্ত ধনী-দরিদ্রে পণ্ডিতে-মূর্খে মিলিয়া তাহাকে বহন করিয়া লইয়া যায়। তাহাকে কেহ ভাঙিতে পারে না, ভুলিতে পারে না। তাহার জন্য কাহাকেও চাঁদার খাতা লইয়া ঘুরিয়া বেড়াইতে হয় না, সে আপনাকে আপনি অতি সহজে রক্ষা করে।’ গত বছর ১৯ ফাল্গুন

[শুক্র 3 Mar] টাউন হলে মহর্ষি স্মরণসভায় মূর্তিস্থাপন ইত্যাদি উপায়ে স্মৃতিরক্ষার প্রস্তাব নেওয়া হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথ এখানে লিখলেন : 'রামমোহন রায়, বিদ্যাসাগর, দেবেন্দ্রনাথের স্মৃতিকে বিদেশী উপায়ে খর্ব না করিয়া, ব্যর্থ না করিয়া, কেবল নগরের কয়েকজন শিক্ষিতলোকের মধ্যে বন্ধ না করিয়া দেশপ্রচলিত সহজ উপায়ে সর্বকালে এবং সর্বসাধারণের মধ্যে ব্যাপ্ত করিবার চেষ্টা করিবেন কি।'

'সঞ্চয়' বিভাগের কোনো-কোনো রচনা রবীন্দ্রনাথের লেখা হতে পারে। অন্তত 'মনস্তত্ত্বমূলক ইতিহাস' [পৃ ৫০-৫২] রচনাটি তাঁর লেখা বলে সন্দেহ হয়। রচনাটির পাদটীকায় লেখা হয়েছে : 'প্রতিষ্ঠান কথাটা আমাকে বানাইতে হইল। ইংরেজী কথাটা "institution"। ইহার কোন বাংলা প্রচলিত প্রতিশব্দ পাইলাম না। যে প্রথা কোন একটা বিশেষ ব্যবস্থাকে অবলম্বন করিয়া দেশে প্রতিষ্ঠালাভ করিয়া যায়, তাহাকে প্রতিষ্ঠান বলিতে দোষ দেখি না। Ceremony শব্দের বাংলা অনুষ্ঠান এবং institution শব্দের বাংলা প্রতিষ্ঠান করা যাইতে পারে।' এইরূপ পরিভাষা-নির্মাণ ও পাদটীকা রবীন্দ্রনাথের পক্ষে স্বাভাবিক [দ্র বাংলা শব্দতত্ত্ব। ২১৩]। মোহিতচন্দ্র সেন জ্যৈষ্ঠ-সংখ্যায় [পৃ ৯৫] প্রশ্নোত্তরে 'প্রতিষ্ঠান' শব্দটি ব্যবহার করে পাদটীকায় লিখেছেন : 'এই কথাটার জন্য আমরা ভাণ্ডারসম্পাদকের নিকট ঋণী রহিলাম।'

বৈশাখ মাসে অন্যান্য সাময়িকপত্রে প্রকাশিত রবীন্দ্র-রচনার সূচীটিও দীর্ঘ।

বঙ্গদর্শন, বৈশাখ ১৩১২ [৫।১] :

১-১২ 'নৌকাডুবি' ৬২-৬৪ দ্র নৌকাডুবি ৫।৪০০-১২ [৫৬-৫৮]

১২-২৭ 'ছাত্রদের প্রতি সম্ভাষণ' দ্র আত্মশক্তি ৩।৫৭৯-৯৪

ছাত্রদের প্রতি সম্ভাষণের ফল ফলতে শুরু করেছিল। মেট্রোপলিটান কলেজ থেকে এফ. এ. পরীক্ষা-দেওয়া ছাত্র মৃগাঙ্কনাথ রায় ২ বৈশাখ রবীন্দ্রনাথকে একটি পত্র পাঠিয়ে পরিষদের সেবায় তাঁর নির্দেশিত পথে কাজ করতে চেয়েছিলেন; রবীন্দ্রনাথ এই পত্রের পিছনে ৭ বৈশাখ [বৃহ 20 Apr] রামেন্দ্রসুন্দরকে লেখেন : 'একটি ছাত্রের আবেদন পরপৃষ্ঠায় দেখিতে পাইবেন। বোধ হয় এমন আরো অনেক ছাত্র আপনার দ্বারে উপস্থিত হইয়াছে।' আবার ১৪ বৈশাখ [বৃহ 27 Apr] তাঁকে লেখেন : 'আমাদের স্কুলে দুটি মাত্র বয়ঃপ্রাপ্ত ছাত্র [রথীন্দ্রনাথ ও সন্তোষচন্দ্র] আছে—তাহাদিগকে আপনার নির্দ্দেশমত পরিষদের কাজে লাগাইয়া দিব। যে সকল ছেলের বয়স বারো বৎসরের অধিক নহে তাহাদের কাছে কিছু প্রত্যাশা করিবেন না। নিতান্ত কচি এবং সম্পূর্ণ ঝুনো এই দুটোকেই বাদ দিবেন।...পরিষদের শৈশব বিভাগের ভার সম্পূর্ণ আপনাকেই লইতে হইবে। ইহাকে লাল ফিতার উদ্বন্ধনে অকালে প্রাণত্যাগ করিতে দিবেন না।'[৩] ছাত্র-সভ্যেরা যথার্থই কাজ করেছিলেন, রবীন্দ্রজীবনের বিভিন্ন পর্বে আমরা তার দৃষ্টান্ত পাব।

সঙ্গীত-প্রকাশিকা, বৈশাখ ১৩১২ [৪।৮] :

১৬০-৬১ মিশ্র রামকেলী-তাল ফের্‌তা। দূরে দাঁড়ায়ে আছে দ্র স্বর ৪৮

১৬২-৬৪ দেশমল্লার-ধামার। গরম মম হরেছ প্রভু দ্র ঐ ২২

১৬৫-৬৭ বাগেশ্রী-তেওরা। নিশীথ শয়নে ভেবে রাখি মনে দ্র ঐ ২২

শেষোক্ত গান দুটির স্বরলিপি করেন কাঙালীচরণ সেন, প্রথম গানটির স্বরলিপিকারের নাম উল্লিখিত হয়নি।

ভারতী, বৈশাখ ১৩১২ [২৯।১] :

৪৭-৫১ 'ইম্পীরিয়লিজ্‌ম্' দ্র রাজা প্রজা। ১০।৪৩১-৩৪

৮০ 'খেয়াল খাতা'/'ভারতীয় খেয়াল' ['আদি অন্ত হারিয়ে ফেলে'] দ্র খেয়া ১০।১২৬-২৭ ['মেঘ']

৯০-৯৩ 'বাঙ্গালাভাষা ও বাঙ্গালী চরিত্র' দ্র বাংলা শব্দতত্ত্ব [১৩৯১]। ৩১১-১৩

আকারে ছোটো 'ইম্পীরিয়লিজ্‌ম্' প্রবন্ধ বক্তব্যের দিক দিয়ে গুরুতর। কার্জন কিছুদিন পূর্ব্বে প্রদত্ত একটি বক্তৃতায় ভারতবর্ষকে ব্রিটিশ ইম্পীরিয়লতন্ত্রের মধ্যে আত্মবিসর্জন করে গৌরবান্বিত হবার জন্য আহ্বান জানিয়েছিলেন, রবীন্দ্রনাথ 'সফলতার সদুপায়' প্রবন্ধে সেই উক্তিকে ধিক্কৃত করেন। কিন্তু সেই প্রবন্ধে উক্ত বক্তব্যের একটি তাৎক্ষণিক উপলক্ষ ছিল, কিন্তু বর্তমান প্রবন্ধে তাঁর লক্ষ্য Imperialism মতবাদটিকেই ধিক্কার দেওয়া। দৃষ্টান্ত দিয়ে তিনি লিখেছেন : 'রাশিয়া ফিন্‌ল্যাণ্ড্-পোল্যাণ্ড্‌কে নিজের বিপুল কলেবরের সহিত একেবারে বেমালুম মিশাইয়া লইবার জন্য যে কী পর্যন্ত চাপ দিতেছে তাহা সকলেই জানেন। এতদূর পর্যন্ত কখনোই সম্ভব হইত না যদি-না রাশিয়া মনে করিত, তাহার অধীন দেশের স্বাভাবিক বৈষম্যগুলি জবরদস্তির সহিত দূর করিয়া দেওয়াই ইম্পীরিয়লিজম্-নামক একটা সর্বাঙ্গীণ বৃহৎ স্বার্থের পক্ষে প্রয়োজনীয়। এই স্বার্থকে রাশিয়া পোল্যাণ্ড্-ফিন্‌ল্যাণ্ডেরও স্বার্থ বলিয়া গণ্য করে।...সেসিল রোড্‌স্ একজন ইম্পীরিয়লবায়ুগ্রস্ত লোক ছিলেন; সেইজন্য দক্ষিণ-আফ্রিকা হইতে বোয়ারদের স্বাতন্ত্র্য লোপ করিবার জন্য তাঁহাদের দলের লোকের কিরূপ আগ্রহ ছিল তাহা সকলেই জানেন।' গ্রীক ঐতিহাসিক থুকিদিদীস [Thucydides,? 471-400 B.C.]-এর রচনা থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে তিনি দেখিয়েছেন, য়ুরোপীয় পলিটিক্সের ভিত্তিই হল সর্বগ্রাসী ইম্পীরিয়লিজ্‌ম্। এরই স্বার্থে ইংরেজ একদিকে ভারতীয়দের তিব্বতে-সোমালিল্যাণ্ড-চীনে যুদ্ধ করতে পাঠায় বা মরিশাসে-ফিজিতে-ব্রিটিশ গায়নায় ফসল উৎপাদনের জন্য সস্তায় মজুর জোগান দেয়, অন্যদিকে নিজেদের নিশ্চিন্ত একাধিপত্যের জন্য তাদের নিরস্ত্র করে ও জাতীয় ঐক্যবোধকে বিশ্লিষ্ট করার জন্য বঙ্গভঙ্গ, সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষ, ভাষাবিচ্ছেদ ইত্যাদি চক্রান্তের আশ্রয় নেয়। ইংরেজ-সভ্যনীতি অনুসারে এগুলি নিশ্চয়ই লজ্জাকর, 'কিন্তু যদি মন্ত্র বলা যায় "ইম্পীরিয়লিজ্‌ম্'—তবে যাহা মনুষ্যের পক্ষে একান্ত লজ্জা তাহা রাষ্ট্রনীতিকতার পক্ষে চূড়ান্ত গৌরব হইয়া উঠিতে পারে।' লক্ষণীয়, রবীন্দ্রনাথের মতো এইরূপ আন্তর্জাতিক চিন্তা সমকালীন ভারতীয় রাজনীতিক বা চিন্তাবিদ্‌দের মধ্যে দুর্লভ, তাঁরা তখন সংকীর্ণ ক্ষেত্রে সফলতার সদুপায় খোঁজায় ব্যস্ত। কিন্তু সাময়িক উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্যও যে দূরপ্রসারী চিন্তার প্রয়োজন একথা বুঝতে আমাদের রাজনীতিকদের অনেক সময় লেগেছে। ফলে স্বপ্নদ্রষ্টা কবি হিসেবে চিন্তাবিদ্ রবীন্দ্রনাথের অখ্যাতি কোনোদিনই ঘোচেনি।

'খেয়াল খাতা' ঊনত্রিংশ-বর্ষীয় ভারতী-র নূতন সংযোজন, রবীন্দ্রনাথের 'বাঙ্গালা ভাষা ও বাঙ্গালী চরিত্র' প্রবন্ধটি 'পারিবারিক স্মৃতিলিপি পুস্তক' থেকে আহরণ করে সরলা দেবী এই বিভাগে প্রকাশ করেন। নানা রঙের কালিতে বিভিন্ন রচনা ছাপিয়ে তিনি বৈচিত্র্য সৃষ্টি করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু রবীন্দ্রনাথ এ-বিষয়ে রামেন্দ্রসুন্দরের কাছে বিরক্তি প্রকাশ করেছেন পূর্বোল্লিখিত ১৪ বৈশাখের পত্রে :

এবারকার ভারতীতে খেয়ালখাতা নামক একটা নির্লজ্জতার সৃষ্টি হইয়াছে সেটাতে আমাদিগকে বড়ই কাতর করিয়াছে। আমাদের বাড়িতে একটি খাতা প্রচলিত ছিল তাহাতে আত্মীয়বন্ধুরা যখন যাহা খুসি লিখিতেন। বেশ বুঝিতেই পারিতেছেন তেমন লেখায় সত্যও থাকে না রচনার সৌন্দর্য্যও থাকিতে পারে না—সরলা হঠাৎ সেগুলিকে পাঠকসমক্ষে তুরী ভেরী দামামার কোলাহল সহকারে প্রকাশ করিয়া দেওয়াতে আমি, বিশেষতঃ বড়দাদা, অত্যন্ত ধিক্কার অনুভব করিতেছি। ভবিষ্যতে এই সমস্ত লেখা প্রকাশ করিতে নিষেধ করিয়া পাঠাইয়াছি তাহা পালিত হইবে কি না জানি না কারণ, আজকাল দোকানদারিই সব চেয়ে নিদারুণ হইয়া দয়াধর্ম্ম গ্রাস করিতে উদ্যত হইয়াছে।

বস্তুত ২২ কার্তিক ১২৯৫ [6 Nov 1888] তারিখে পারিবারিক স্মৃতিলিপি পুস্তক-এ লিখিত 'বাঙ্গালা ভাষা ও বাঙ্গালী চরিত্র' [দ্র রবিজীবনী ৩।১০৩] প্রবন্ধে তিনি বাঙালী চরিত্র সম্পর্কে এমন-কিছু কঠিন কথা লেখেন, যা ১৩১২-এর বাংলাদেশের জাতীয়তাবোধের পরিপ্রেক্ষিতে কিঞ্চিৎ অস্বস্তিকর লাগার কথা। প্রবন্ধটি নিশ্চয়ই তিনি নিজে বেছে দেননি, আর সেই কারণেই সরলা দেবীর উপর রাগ করেছিলেন। 'খেয়াল খাতা' বিভাগ প্রবর্তনের কথা রবীন্দ্রনাথ জানতেন, আর সরলা দেবীর অনুরোধে উক্ত বিভাগের প্রবেশক হিসেবে 'ভারতীয় খেয়াল' ['মেঘ'] কবিতাটি লিখে দেন তা কবিতাটি পড়লেই বোঝা যায়। বৈশাখ-সংখ্যা ভারতী প্রকাশিত হয় 13 Apr 1905 [বৃহ ৩১ চৈত্র ১৩১১], তার আগে রচিত এই কবিতাটি 'খেয়া'-র [শ্রাবণ ১৩১৩] কবিতাগুচ্ছের মধ্যে প্রথমতম।

নিয়মিত জ্বরের আক্রমণ থেকে অব্যাহতি পেলেও রবীন্দ্রনাথ প্রায় এক বছর ধরে অর্শরোগে পীড়িত। পিতার অনেক গুণের সঙ্গে এই রোগটি তিনি পৈতৃক উত্তরাধিকারসূত্রে লাভ করেছিলেন। বিভিন্ন রকমের হোমিয়োপ্যাথি ও কবিরাজি চিকিৎসার পর ইংলণ্ডে গিয়ে 1913 [১৩২০]-এ অপারেশনের দ্বারা তিনি এই রোগ থেকে মুক্ত হন। ময়মনসিংহে অনুষ্ঠিত বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মেলনের সঙ্গে সে সারস্বত-সম্মিলন হওয়ার কথা ছিল, তিনি তার সভাপতি মনোনীত হয়েছিলেন—কিন্তু অর্শের জন্য শেষপর্যন্ত তিনি এই আমন্ত্রণ গ্রহণ করতে পারেননি, এ-সম্পর্কে রামেন্দ্রসুন্দরকে লেখা তাঁর চিঠি আমরা পূর্ববর্তী অধ্যায়ে উদ্ধৃত করেছি। দীর্ঘকাল এই কারণে শান্তিনিকেতনে বিশ্রাম নেওয়ার সংকল্প তাঁর মনে ছিল। ৫ বৈশাখ [মঙ্গল 18 Apr] ব্রজেন্দ্রকিশোর দেববর্মাকে নববর্ষের আশীর্বাদ জানিয়ে তিনি যে চিঠি লিখেছিলেন, তাতেও লেখেন : 'আমার শরীর তেমন ভাল নাই কিন্তু এখান হইতে শীঘ্র কোথাও যাইবার সম্ভাবনা নাই।' কিন্তু দিন-দশেক পরে কলকাতা থেকে কোনো জরুরী আহ্বান আসাতে ১৬ বৈশাখ [শনি 29 Apr] দীনেশচন্দ্র সেনকে লেখেন : 'দুই একদিনের মধ্যেই যাইতেছি।' কী কারণে তাঁকে কলকাতায় যেতে হয়েছিল আমাদের জানা নেই, তবে ক্যাশবহির হিসাব থেকে জানতে পারি তিনি ২০ বৈশাখ [বুধ 3 May] শান্তিনিকেতনে ফিরে এসেছিলেন।

মোহিতচন্দ্র সেন ব্রহ্মচর্যাশ্রমের কার্যত্যাগের পর Jan 1905 থেকে সিটি কলেজে যোগদান করেন। রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনে ফিরে এসে তাঁর চিঠিতে জানতে পারলেন, তিনি কিছুদিনের জন্য সপরিবারে এখানে আসতে চান। এই ধরনের বন্ধুসঙ্গের জন্য রবীন্দ্রনাথের চিত্ত তৃষিত হয়ে থাকত। ২৩ বৈশাখ [শনি 6 May] তাঁকে সাদর আহ্বান জানিয়ে লিখলেন : 'এখানে কিছুদিনের জন্য সপরিজনে আপনার আসা একেবারে অসম্ভব নয় একথা যখন একবার আপনার কলমের মুখ থেকে বেরিয়ে পড়েছে তখন ওটাকে আর ফিরিয়ে নেবেন না —...আমাদের কোনো অসুবিধে হবে না এবং আপনাদেরও অসুবিধে না হয় তার প্রতি দৃষ্টি রাখব। কবে আস্‌বেন অবিলম্বে লিখে পাঠাবেন।...আপনাদের এখানে আসাটা চাই—বড় বড় ঝড়বৃষ্টি প্রতিদিন মাঠে মারা যাচ্ছে—আপনি থাকলে খুসি হতেন।'[৬] *16 May [মঙ্গল ২ জ্যৈষ্ঠ] তাঁকে লিখলেন : 'চিঠি পেয়ে নিশ্চিন্ত হলেম। অর্শের বেদনায় ভুগচি। আগামী সপ্তাহে কবে আসবেন লিখে পাঠাবেন। আমার প্রায় শয্যাগত অবস্থা।'[৭] মোহিতচন্দ্র শেষপর্যন্ত এসেছিলেন কিনা জানা যায়নি, কিন্তু অন্যভাবে তিনি সঙ্গ লাভ করেছিলেন তা জানা যায় ১৯ জ্যৈষ্ঠ [শুক্র 2 Jan] মনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়কে লেখা চিঠিতে : 'আজকাল আমাদের এখানে আলোচনা বেশ জমাট রকম হইয়া থাকে। আমি অধ্যাপকদের লইয়া প্রায় মাসখানেক প্রতিদিন সন্ধ্যার সময় কিছু না কিছু বলা কহা করিয়াছি। তাহার পরে বড়দাদাও কিছুদিন সন্ধ্যার আসর জমাইয়াছিলেন—

আজকাল আবার আমার হাতে পড়িবার উপক্রম করিয়াছে।'[৮] পরবর্তীকালে ক্ষিতিমোহন সেন তাঁর ডায়ারিতে এইরূপ আসরে রবীন্দ্রনাথের আলোচনার অনুলেখন রাখবার চেষ্টা করেছিলেন। রথীন্দ্রনাথের লেখা সমসাময়িক দুটি মাত্র অনুলেখন মুদ্রিত হয়েছে—২ বৈশাখে লেখা 'মেয়েদের অধিকার'-বিষয়ে যে অনুলেখনটির কথা আগে বলা হয়েছে, সেটি হয়তো এইরূপ আসরেই কথিত হয়েছিল। রথীন্দ্রনাথের কাগজপত্রের মধ্যে পিতার আলোচনার আরও দুটি অনুলেখন এখনও পাণ্ডুলিপি-আকারে [দ্র Ms. 275E (iii)] রক্ষিত আছে—তার মধ্যে একদিন 'ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য—আর্য্য—দ্বিজ' ইত্যাদি প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের মৌখিক আলোচনা অনুলিখিত হয়েছে, সেই আলোচনারই অনুবৃত্তি হয় '২৪শে' [? বৈশাখ/জ্যৈষ্ঠ], রথীন্দ্রনাথ লিখেছেন : 'সুবোধবাবুর question সম্পূর্ণ হয় নি—আজ তার উত্তর হল।' আমাদের মনে হয়, এই আলোচনার বিষয়টিই বহুদিন পরে 'সমস্যা' [দ্র প্রবাসী, আষাঢ় ১৩১৫; রাজাপ্রজা ১০।৪৬৮-৮৪] প্রবন্ধে ভিন্ন প্রসঙ্গে রচনা-রূপ লাভ করেছে।

বন্ধুসঙ্গ পাবার আশায় ২৩ বৈশাখ [শনি 6 May] রবীন্দ্রনাথ যেদিন মোহিতচন্দ্রকে সেনকে শান্তিনিকেতনে আসার জন্য আহ্বান জানান, সেইদিনই দ্বিজেন্দ্রলাল রায়কে একটি চিঠি লিখে আর-এক বন্ধুর সঙ্গে বিচ্ছেদটি সম্পূর্ণ করেন। এটি দ্বিজেন্দ্রলালের একটি চিঠির উত্তরে লেখা—সেই চিঠিটি পাওয়া যায়নি, কিন্তু উত্তর থেকেই তার বক্তব্যটি অনুমান করা যায়। রবীন্দ্রনাথের পত্রটি বহুবার উদ্ধৃত হয়েছে, কিন্তু তাঁর সংযম ও ভদ্রতার নিদর্শন হিসেবে আর একবার উদ্ধৃত হলে ক্ষতি নেই :

ওঁ

বোলপুর

প্রিয়বরেষু,

আপনি আমার স্তাবকবৃন্দের মধ্যে ভর্ত্তি হইতে পারিবেন না এ কথাটা এতটা জোরের সঙ্গে কেন যে বল্লেন আমি ভাল বুঝ্‌তে পারলেম না। "আপনার নিন্দুকের দলে আমি যোগ দিতে পারব না" এ কথাও ত আপনি বল্‌তে পারতেন। এ সমস্ত অনাবশ্যক কথা গায়ে পড়ে উত্থাপন করা কি জন্যে?

স্তাবকতা বল্‌তে যদি এই বোঝায় যে নিজের উদ্দেশ্য সাধনের জন্যে পরের স্তুতিবাদ করা তবে একাজ আপনি পারবেন না এমন কথা বলাও আপনার পক্ষে অযোগ্য হয়েছে।

স্তাবকতা বল্‌তে যদি এই বোঝায় বিচারশক্তির দোষে একজন লোকের মন্দকেও ভাল বলা—সে কাজ আপনি পারবেন না এ কথা আপনি জোর করে কি বল্‌বেন? আপনার "মন্দ্র"কে আমি ভাল বলেছিলেম বলে অনেকে আমার বিচারশক্তির প্রতি দোষারোপ করেছিলেন—যদি বস্তুতই আমি সে দোষের ভাগী হই তবে তার উপরে আমার হাত নেই।

স্তাবকতা বল্‌তে যদি এই বোঝায় অন্যের ভালকে ভাল বলা তবে আমার সম্বন্ধে আপনি সে কাজে অক্ষম এ কথা এতটা উগ্রতার সঙ্গে না বল্লেও ক্ষতি হত না।

বোধ হয় আপনার বিশ্বাস আমার একদল স্তাবক আছে—অর্থাৎ যাদের প্রশংসাউক্তির সঙ্গে আপনার মতের মিল হয় না—হয় তাদের বুদ্ধির, নয় তাদের স্বভাবের দোষ দিয়ে আপনি তাদের প্রশংসাবাক্যকে স্তাবকতাশব্দে অভিহিত করেচেন। আপনি তাদের যা মনে করেচেন তারা যদি সত্যই তা হয় তবে নিজেকে তাদের চেয়ে অনেক উঁচুদরের লোক বলে ঘোষণা করা কিছু না হোক্ অনাবশ্যক। ওতে কেবল আপনার অন্তঃকরণের একটা অতিমাত্র উত্তেজিত অবস্থা প্রকাশ হচ্চে।

অপ্রিয় সত্য বলা সম্বন্ধে আপনি কিছু অহঙ্কার প্রকাশ করেছেন। এমন একদল লোক আছেন অপ্রিয় সত্য বলাটা যাঁদের একটা বিশেষ সখ———আমরা কাউকে খাতির করে কিছু বলিনে মুখের উপর স্পষ্ট কথা বলে থাকি এই বলে তাঁরা গায়ে পড়ে গর্ব্ব প্রকাশ করেন। মনের অবস্থাটা এরকম হলে পর সত্য নির্ণয়ের প্রতি তেমন দৃষ্টি থাকে না, ঔদ্ধত্যের আনন্দে অপ্রিয়তাটাকেই যতদূর সম্ভব কচ্‌লে তোলা হয়।

কিন্তু সে আপনার নিজের স্বভাব নিজে বুঝবেন—আপনি আমাকে অপ্রিয় সত্য জানাবার জন্যে যতটা উদ্দীপনা অনুভব করেছেন যতদূর শ্রমস্বীকার ও সময় ব্যয় করেছেন—কোনোদিন প্রিয় সত্য শোনাবার জন্য ততটা উৎসাহ অনুভব ও ক্লেশ বহন করতে যদি না পেরে থাকেন তবে তার ক্ষতি পুরস্কার আপনার অন্তরের মধ্যে থেকেই লাভ করবেন।

এবারে আপনার চিঠি থেকে এই বুঝলুম আমাদের পরিবারের সম্বন্ধে সাধারণের ধারণা যে আমরা অহঙ্কৃত। এর বিপরীত ধারণার কথাও আপনারই ন্যায় ভাল লোকের মুখ থেকে শুনেছি—আপনি বলবেন যাঁর কাছে শুনেছি তিনি স্তাবক—তা যদি হয় তবে যাঁরা নিন্দার কথা বলেন

তাঁরা যে নিন্দুক নন তা কেমন করে বুঝ্‌ব? এর থেকে বস্তুত এই বোঝা যাচ্চে আমাদের পরিবারকে কেউবা একরকম বলেন, কেউবা অন্যরকম বলেন—সকলেই একভাবে একই কথা বলেন না।

দ্বিতীয় নালিশ এই যে, আমাদের বাড়িতে নিজেদের নাটকেরই অভিনয় করা হয়েছে। সেটা আপনার মতে "self advertising"। আপনার বাড়িতে এবং অন্য বাড়িতেও আপনার মুখে আপনারই রচিত গান বিস্তর শুনেছি কিন্তু কোনো দিন সে কাজটাকে "self advertising" বলে গণ্য করিনি। এমনকি, আপনার নিজের শিশুসন্তানগুলিকেও আপনি নিজের গানের দোহারকি বানিয়ে যখন অতিথিদের আপ্যায়িত করেছেন তখনো একমুহূর্ত্তের জন্য আমার এবং আশা করি আর কোনো ভদ্রলোকের মনে আপনার প্রতি এরকম সংশয় উদয় হয়নি—আপনি যখনি কবিতা আবৃত্তি করেছেন তখনি আপনার স্বরচিত কাব্য আপনার মুখ থেকে শুনেছি একবারো তার অন্যথা হয় নি—কিন্তু তাতে আমি প্রত্যেকবারই বিশুদ্ধ আনন্দ লাভ করেছি "disgusted" হই নি। তারপরে আর একটা বলা আবশ্যক, আপনি বোধ হয় জানেন আপনার "বিরহ" সমারোহ সহকারে আমাদের বাড়িতে অভিনীত হয়েছে—এছাড়া আলিবাবা, আবুহোসেনের অভিনয় হয়েছে—কিন্তু হয়েছে, কি না হয়েছে সে তর্ক আমি অনাবশ্যক বোধ করি।

সঙ্গীতসমাজে আমার লেশমাত্র কর্ত্তৃত্ব নেই—এমন কি সেখানে জ্যোতিদাদাও নিজের শান্ত স্বভাবশতই কর্ত্তৃত্ব করতে বিরত। সেখানে অন্যান্য বহুতর নাটকের অভিনয়ের মধ্যে যদি মাঝে মাঝে আমার রচনাও অভিনীত হয়ে থাকে তবে তার থেকে আপনি এইটেই জান্‌বেন সেখানে কর্ত্তৃপক্ষের মধ্যে কেউ কেউ আমার রচনা পছন্দ করে থাকেন—তাঁদের সবাইকে আমার স্তাবক বলে যদি সান্ত্বনা লাভ করেন তবে সে পথ মুক্ত আছে।

নিজের কথা বলামাত্রের মধ্যেই অহমিকা আছে আত্মজীবনী লিখ্‌তে গেলে সেই আত্মকে বাদ দিয়ে লেখা চলে না সেই অনিবার্য্য অহমিকার জন্যই আমি উক্ত লেখার আরম্ভে ক্ষমা প্রার্থনা করেছিলেম—এটাকে ইচ্ছাপূর্ব্বক অহঙ্কার করতে বসে মাপ চাওয়ার বিড়ম্বনা বলে মনে করবেন না।

মেজদাদা আমার রচিত কবিতা আবৃত্তি করে আমাকে advertize করে বেড়িয়েছেন এ কথা আপনারই মুখে শোনা গেল—তার কারণ আপনি অপ্রিয় কথা বলবার ভার নিয়েছেন—আর কারো মুখে শুনি নি তার কারণ এ নয় যে আপনি ছাড়া আর কেউ সত্য বলেন না। আপনি অতি সহজেই এমন কথা মনে করতে পারতেন যে আমার কবিতা তাঁর কাছে পরিচিত এবং প্রিয় সেইজন্যেই তিনি এ কথা ভুলে যান যে আমার কবিতা আবৃত্তি করলে আর কারো মনে বেদনা লাগ্‌তে পারে। আমার কবিতা আবৃত্তি তাঁর পক্ষে অবিবেচনার কাজ হতে পারে কিন্তু যিনি চিরজীবন নিজের মানমর্য্যাদা সমস্তই অতি সহজে সকলের কাছে নত করে রেখেছেন একদিনের জন্যও যাঁকে কেউ অহঙ্কার অনুভব করতে দেখে নি তিনি আমার কবিতা advertize করবার ভার নেবেন এ কথা অশ্রদ্ধেয়। এমন কি, আমার বিশ্বাস, আপনিও জানেন তিনি পারিবারিক আত্মশ্লাঘার জন্য একাজ করেন নি—স্নেহবশত বা পরিচয়বশতই করেচেন—কিন্তু আপনি এমন এক স্থানে ক্ষুণ্ণ হয়েছেন যেখানে আঘাত পেলে শান্তভাবে সত্যগ্রহণের প্রতি লক্ষ্য থাকে না।

আদিব্রাহ্মসমাজে আমাদেরই রচিত গান গাওয়া হয় একথা সত্য নহে—এমন সকল লোকের গান আছে যাহাদের নামও কেহ জানে না এবং ব্রহ্মসঙ্গীত পুস্তকে আমাদের কোন্ গান যে কাহার এ পর্য্যন্ত তাহা advertize করাও হয় নাই—কোনো গানই যে আমাদের তাহা অনুমান ছাড়া জানবার উপায় নাই।

আপনি আমার এবং আমাদের সম্বন্ধে আপনার মনের ভাব অকুণ্ঠিতচিত্তে আমার এবং সর্ব্বসাধারণের সমক্ষে ঘোষণা করতে পারেন আমাকে এই কথা বলে সতর্ক করে দিয়েছেন—ভালই করেছেন—আমার এ বয়সে আমি যদি কোনো শিক্ষা পেয়ে থাকি তবে আশা করি আপনার অপ্রিয় আচরণ আমার পক্ষে দুঃসহ হবে না। ইতি ২৩শে বৈশাখ ১৩১২/ভবদীয়/শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর*

ছয় পৃষ্ঠার এই দীর্ঘ পত্রটি লেখা হলেও ডাকে পাঠানো হয়েছিল কিনা সে-বিষয়ে আমাদের সন্দেহ আছে। দ্বিজেন্দ্রলালের লেখা অনেকগুলি পত্র রবীন্দ্রবনে রক্ষিত হলেও, তাঁকে লেখা রবীন্দ্রনাথের দুটি ছাড়া আর কোনো পত্র এই সংগ্রহে পাওয়া যায় না। উপরে উদ্ধৃত পত্রটি ছাড়া অপরটি হল দ্বিজেন্দ্রলালের কবিতা-পত্রের [২ শ্রাবণ ১৩০৪] পৃষ্ঠায় পেনসিলে লেখা পদ্য-উত্তরটি ['চেয়েছেন মোর রচনা']—যেটি নিশ্চিতই কপি করে তাঁকে পাঠানো হয়েছিল। লিখিত হওয়া সত্ত্বেও রবীন্দ্রনাথের কোনো-কোনো পত্র পাঠানো হয়নি এমন দৃষ্টান্ত অপ্রচুর নয়—সূক্ষ্ম ব্যঙ্গের আধিক্য থাকায় দ্বিতীয় চিন্তায় রবীন্দ্রনাথ বর্তমান পত্রটি না পাঠানোই উচিত মনে করেছেন এমন হওয়া খুবই সম্ভব। দ্বিজেন্দ্রলালের পুত্র দিলীপকুমারও তাঁকে বা তাঁর পিতাকে লেখা কোনো পত্র রবীন্দ্রভবনকে উপহার দেননি।

কিন্তু পাঠানো হোক বা না-হোক, এই পত্রটিতে উভয়ের সম্পর্কের অবনতির নিশ্চিত প্রমাণ পাওয়া যায়। অথচ মাস-দেড়েক আগে দ্বিজেন্দ্রলালের আহ্বানে তাঁর বাড়িতে অনুষ্ঠিত প্রথম পৌর্ণমাসী সভায় রবীন্দ্রনাথ সানন্দে উপস্থিত ছিলেন! দ্বিজেন্দ্রলালের জীবনীকার দেবকুমার রায়চৌধুরী এই মনোমালিন্যের জন্য 'বঙ্গভাষার লেখক' [১৩১১] গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত রবীন্দ্রনাথের 'আত্মকথা'কে দায়ী করেছেন। তিনি লিখেছেন :

গ্রন্থখানি পড়িবার সময়ে, তন্মধ্যে রবীন্দ্রনাথের স্ব-লিখিত আত্মজীবনী দ্বিজেন্দ্রলালের দৃষ্টিপথে পতিত হয়; এবং উহা পড়িয়া তিনি অভাবিতরূপেই বিরক্ত, উত্যক্ত ও উত্তেজিত হইয়া উঠেন। কিন্তু, তৎকালে দ্বিজেন্দ্রলাল এ সম্বন্ধে তাঁহার মনোভাব কাহারও কাছে কিছুমাত্র ব্যক্ত না করিয়া, গোপনে 'খোদ' রবিবাবুকে বিশেষ তীব্র ভাষায় তিরস্কার করিয়া একখানা পত্র লেখেন ও তাহাতে তিনি জানিতে চাহেন যে, যথার্থই সেই আত্মজীবনীর মর্ম্মানুসারে রবিবাবু তাঁহার সকল রচনা সম্পর্কেই Divine inspiration দাবী করেন নাকি; এবং করিলে, বস্তুতঃ তিনি উহার কি ভাবে ব্যাখ্যা করিতে চাহেন। রবিবাবু সে পত্রের উত্তরে বেশ-একটু উগ্রভাবে, অধীর ও অসন্তুষ্ট হইয়া লেখেন যে, যাহা ভাল বুঝিয়াছেন তাহাই তিনি লিখিয়াছেন, তজ্জন্য তিনি কাহারও মতামত গ্রাহ্য করিতে তত উৎসুক নহেন; আর যাঁহারা কোন গূঢ় অভিসন্ধি বা মৎলব লইয়া তাঁহাকে বিরক্ত করিতে আসেন তাঁহাদের কাছে তিনি কোনরূপ কৈফিয়ৎ দিতেও প্রস্তুত নহেন। এ পত্রও দ্বিজেন্দ্রলাল প্রথমটা গোপনই করিয়াছিলেন; কিন্তু শেষে যখন বিচ্ছেদটা 'পাকাপাকি'-রকম দাঁড়াইল তখন বহুদিন পরে তিনি ইহা তাঁহার জনকয়েক বিশেষ অন্তরঙ্গ বন্ধু ও আত্মীয়কে একবার দেখিতে দেন। উত্তরটা পাইয়া আগুনে আহুতি পড়িল মাত্র, ফল মোটেই ভাল হইল না। দ্বিজেন্দ্রলাল এ জবাবে নিরস্ত না হইয়া, আবারও রবীন্দ্রনাথকে আর-একখানা পত্রে স্পষ্ট জানাইলেন যে, তিনি যদি তাঁহার দুর্নীতিমূলক ও লালসাপূর্ণ লেখাগুলি সম্পর্কেও ঐরূপ Inspiration দাবী করিতে লজ্জিত ও সঙ্কুচিত না হন তবে প্রকাশ্যতঃ, সত্যের খাতিরে, তিনিও স্পষ্টভাবে প্রমাণ করিয়া দেখাইতে চেষ্টা করিবেন যে, সে সকল রচনা দৈব শক্তির স্বাভাবিক অপার্থিব অভিব্যক্তি তো নহেই, বরং—ইত্যাদি ইত্যাদি ইত্যাদি। ইহার উত্তরে রবিবাবু আর-কিছু লিখিয়াছিলেন কিনা জানিতে পারি নাই; তবে লিখিয়া থাকিলেও নিশ্চয়ই এমন-কিছু লিখিয়াছিলেন যাহাতে দ্বিজেন্দ্রলাল—নরম হওয়া তো দূরে যাক্,—বরং আরও যেন গরমই হইয়া উঠিলেন। দ্বিজেন্দ্রলাল বলিতেন যে, বন্ধুভাবে, একান্ত গোপনে, তিনি সরলভাবে প্রথমে যে পত্রটা লেখেন, রবিবাবু তদুত্তরে ঐরূপ অসাধু অভিসন্ধির (motive) আরোপ করায় তাঁহার অন্তরে অতি দুঃসহ ও প্রচণ্ড আঘাত লাগিয়াছিল।[৭]

দেবকুমার নিছক বিবৃতিই দিয়েছেন, কোনও পত্রের উদ্ধৃতি বা ঘটনার সময় নির্দেশ করেননি—ফলে পারম্পর্য বুঝতে অসুবিধা হয়। রবীন্দ্রনাথের উল্লিখিত পত্রটি থেকে স্পষ্টই বোঝা যায়, দ্বিজেন্দ্রলাল তাঁর পত্রে রবীন্দ্রনাথকে স্তাবক-পরিবৃত ও আত্মীয়স্বজনের দ্বারা আত্মপ্রচারোন্মুখ বলে বর্ণনা করেছিলেন উদাহরণ-সহযোগে, আত্মকথা-য় অহমিকা প্রকাশের কথা এসেছিল প্রসঙ্গক্রমে। বস্তুত 'বঙ্গভাষার লেখক' গ্রন্থটি দ্বিজেন্দ্রলালেরই অহমিকাকে আহত করেছিল তাঁর জীবনী উক্ত গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত না করে—অথচ বঙ্গবাসী-পরিচালিত জন্মভূমি পত্রিকার কার্তিক ১৩০৪-সংখ্যায় প্রকাশিত তাঁর জীবনী সম্পাদক হরিমোহন মুখোপাধ্যায়ের আয়ত্তেই ছিল। দ্বিজেন্দ্রলালের উত্তেজনার মূল কারণ নিহিত ছিল এখানেই। তাছাড়া তাঁর মানসিকতা জটিলতামুক্ত ছিল না। 17 Mar 1900 [৪ চৈত্র ১৩০৬] তিনি রবীন্দ্রনাথকে লিখেছিলেন [রবিজীবনী ৪।২৬৭-তে পূর্বেই উদ্ধৃত] :

কাল সন্ধ্যায় বালিগঞ্জ অভিমুখে গিয়ে বড় অপ্রতিভ হলাম। কেউ কোথাও নেই। শেষে সস্ত্রীক শকটারোহণে একেবারে পালিতদের বাড়ি গিয়ে উপস্থিত। আমার সঙ্গে কেউ আর কথা কচ্ছে না বড়। কেবল অপমান কর্ব্বার যোগাড়ে আছে।

আপিসের কার্য্যের নিপ্পেষণে বসে' গিইছি। আর ত পেরে উঠিনে।...আপনি ত বেশ সুখে আছেন। আমার ঐ রকম একটা সুবিধা কোরে দিতে পারেন?

শারীরিক অবস্থা আমার নেহাইৎ মন্দ নয়। কিন্তু মানসিক তা আর বোলে কাজ নেই। যেরকম অবস্থা দাঁড়িয়েছে কার ওপর রাগটা ঝাড়ি বুঝে উঠতে পাচ্ছিনে।

জীবিকার ভাবনা-শূন্য জমিদার-পুত্র রবীন্দ্রনাথের সম্পর্কে অনেকেই ঈর্ষাপরায়ণ ছিলেন, যেন এই ভাবনা না থাকলেই তাঁর মতো সাহিত্যিক গণ্ডায় গণ্ডায় গজিয়ে উঠত! আর 'বঙ্গভাষার লেখক' গ্রন্থে দ্বিজেন্দ্রলালের জীবনী অন্তর্ভুক্ত না করে তাঁকে যে 'অপমান' করা হয়েছিল, সেই অবস্থায় 'রাগ ঝাড়বার' জন্য রবীন্দ্রনাথের চেয়ে ভালো পাত্র আর কোথায়-বা পাওয়া যেত! এইজন্য গয়ায় লোকেন্দ্রনাথ পালিতের সঙ্গে তর্কযুদ্ধে তাঁকে বশীভূত করতে না পেরে 'মা' চিত্রাঙ্গদার প্রতি ভক্তি ও শ্রদ্ধায় গদগদ দ্বিজেন্দ্রলাল 'কাব্যে নীতি'র ধ্বজা তুলে মল্লযুদ্ধের আসরে নেমে পড়েন, দর্শকদের মধ্যে বাহবা দেওয়ার লোকের অভাব ছিল না।

বস্তুত রবীন্দ্রনাথ ও দ্বিজেন্দ্রলালের মধ্যে সম্পর্কের অবনতি হতে শুরু করে উপরে উদ্ধৃত পত্রটি লেখার সময় থেকেই। এর কিছু আগে চিচেস্টার থেকে পাশ করা কৃষিতত্ত্ববিদ্ দ্বিজেন্দ্রলালের পরামর্শে প্রচুর অর্থব্যয়ে

রবীন্দ্রনাথ আলু-চাষে প্রবৃত্ত হন, সেই ‘বহুব্যয়সাধ্য ব্যর্থতার প্রহসন’ শেষ হয়েছিল এক-হাত-কাটা রাজবংশী চাষী চামরুর নীরব অট্টহাস্যে, ‘যে ব্যক্তি পাঁচ কাঠা জমির উপযুক্ত বীজ নিয়ে কৃষিতত্ত্ববিদের সকল উপদেশই অগ্রাহ্য করে...প্রচুরতর ফল লাভ করেছিল।’ উভয়ের পত্রালাপ সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে গিয়েছিল কিনা বলা শক্ত, কিন্তু দ্বিজেন্দ্রলালের উল্লিখিত পত্রটির পরবর্তী কোনো পত্র রবীন্দ্রভবনে রক্ষিত নেই।

কেউ কেউ মনে করেছেন, রবীন্দ্রনাথ দ্বিজেন্দ্রলালের নাটকের প্রশংসা করেননি বলেই তিনি বিরূপ হন। রবীন্দ্রনাথও Edward Thompsonকে বলেছিলেন, ‘well, he knew I didn’t admire his dramas & he resented it. I never said a word against them, but he gathered from my silence that I did not think them good.’ কিন্তু যে নাটকগুলির জন্য দ্বিজেন্দ্রলালের জনপ্রিয়তা তার একটিও রবীন্দ্রনাথের ২৩ বৈশাখের পত্রের আগে প্রকাশিত হয়নি। সুতরাং তাঁর অসন্তোষের কারণ এখানে খোঁজা সঙ্গত নয়। তবে ‘বিরহ’ [১৩০৪] প্রহসনটি দ্বিজেন্দ্রলাল রবীন্দ্রনাথকে উৎসর্গ করেছিলেন, যার কোনো প্রতিদান তিনি পাননি —এই কারণে তিনি ন্যায়তই ক্ষুব্ধ হতে পারেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের গ্রন্থোৎসর্গের রীতিটি কিঞ্চিৎ রহস্যময়— বহু গ্রন্থ তিনি উৎসর্গপত্র ছাড়াই প্রকাশিত হতে দিয়েছেন, যেখানে উৎসর্গ করার উপযুক্ত ঘনিষ্ঠ ও বিশিষ্ট ব্যক্তির অভাব ছিল না।

আর একটি বিষয় উল্লেখযোগ্য। ‘সফলতার সদুপায়’ প্রবন্ধ পাঠের পূর্বে রবীন্দ্রনাথ ২২ ফাল্গুন ১৩১১ [6 Mar 1905] ব্যোমকেশ মুস্তাফিকে লেখেন : ‘সভাপতি মেজদাদা হইলে কোনোমতেই চলিবে না।...আত্মীয়ের মধ্যে কাহাকেও নয়।’ এই চিঠি ইঙ্গিত দেয় যে, দ্বিজেন্দ্রলালের কটাক্ষ এব আগেই রবীন্দ্রনাথের গোচরীভূত হয়েছিল।

জ্যৈষ্ঠ ১৩১২-সংখ্যা বঙ্গদর্শন [৫।২] প্রকাশিত হয় 18 May [বৃহ ৪ জ্যৈষ্ঠ]। এই সংখ্যায় রবীন্দ্র-রচনা দুটি :

৫১-৬১ ‘নৌকাডুবি’ ৬৫-৬৬ দ্র নৌকাডুবি ৫।৪১৩-২৪ [৫৯-৬০]

৯১-৯৮ ‘ধম্মপদং’ দ্র ভারতবর্ষ ৪।৪৬০-৬৮

‘ধম্মপদং’ প্রবন্ধটি ‘শ্রীচারুচন্দ্র বসু কর্ত্তৃক সম্পাদিত, প্রণীত ও প্রকাশিত’ ‘ধম্মপদঃ। অর্থাৎ ধম্মপদ নামক পালি গ্রন্থের মূল, অন্বয়, সংস্কৃত ব্যাখ্যা ও বঙ্গানুবাদ’-সংবলিত সদ্যঃপ্রকাশিত গ্রন্থটির সমালোচনা উপলক্ষে লিখিত। সমালোচনার অংশটি অবশ্য দীর্ঘ নয়, সেখানে তিনি অনুবাদককে অনুরোধ জানিয়েছেন : ‘অনুবাদটি মূলের সঙ্গে একেবারে কথায় কথায় মিলাইয়া করিলে ভাল হয়—যেখানে দুর্বোধ হইয়া পড়িবে, সেখানে টীকার সাহায্যে বুঝাইয়া দিলে কোনো ক্ষতি হইবে না। অনুবাদ যদি স্থানে স্থানে ব্যাখ্যার আকার ধারণ করে, তবে অন্যায় হয়—কারণ ব্যাখ্যায় অনুবাদকের ভ্রম থাকিতেও পারে—এইজন্য অনুবাদ ও ব্যাখ্যা স্বতন্ত্র রাখিয়া দিলে পাঠককে বিচার করিবার অবকাশ দেওয়া হয়। মূলের যে-সকল কথার অর্থ সুস্পষ্ট নহে, অনুবাদে তাহা যথাযথ রাখিয়া দেওয়াই কর্তব্য মনে করি।’ তাঁর প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ব্রহ্মচর্যাশ্রম ও বিশ্বভারতীর অনেক শিক্ষক অনুবাদকর্মে রত হয়েছিলেন, অনুবাদের ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের এই আদর্শ তাঁদের সামনে ছিল।

প্রবন্ধটির বাকি দীর্ঘ অংশ তত্ত্বচিন্তা, জ্ঞান কর্ম ও ভক্তি মার্গ-পন্থী বিভিন্ন ধর্মসম্প্রদায়ের তাত্ত্বিক পার্থক্য সত্ত্বেও বাসনাবন্ধন থেকে মুক্তির সাধনায় তাঁদের ঐক্যের রূপটি চমৎকারভাবে তিনি এখানে বিশ্লেষণ করেছেন। স্বয়ং বুদ্ধদেবের উক্তির সংগ্রহ বলে কথিত ধম্মপদের অনেক শ্লোকের সঙ্গে মহাভারত, পঞ্চতন্ত্র, মনুসংহিতা প্রভৃতি গ্রন্থের শ্লোকের সাদৃশ্য সেইজন্যই রবীন্দ্রনাথের কাছে স্বাভাবিক বলে মনে হয়েছে।

ধম্মপদ-এর ৫৩টি শ্লোক রবীন্দ্রনাথ পদ্যে অনুবাদও করেন, এগুলি রূপান্তর [১৩৭২] গ্রন্থের ২৬-৩৮ পৃষ্ঠায় মূল ও পাঠান্তর-সহ সংকলিত হয়েছে। চারুচন্দ্র বসু-সম্পাদিত গ্রন্থের এক খণ্ডের মার্জিনে রবীন্দ্রনাথ এই অনুবাদগুলি করেন। চৈত্র ১৩৪৯-সংখ্যা প্রবাসী-তে নির্মলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এই অনুবাদের কথা উল্লেখ করলে সুবোধচন্দ্র মজুমদারের পুত্র সমীরচন্দ্র পিতার কাগজপত্রের মধ্য থেকে অনুবাদগুলি উদ্ধার করেন। শারদীয়া ১৩৫১-সংখ্যা আনন্দবাজার পত্রিকা-য় অনুবাদগুলির একাংশ ও শ্রাবণ-আশ্বিন ১৩৫৫-সংখ্যা বিশ্বভারতী পত্রিকা-য় সম্পূর্ণ মুদ্রিত হয়। অনুমান করা যায়, বর্তমান সময়েই রবীন্দ্রনাথ অনুবাদগুলি করেছিলেন। রথীন্দ্রনাথ লিখেছেন, বুদ্ধগয়া থেকে ফিরে এসে রবীন্দ্রনাথ তাঁকে ধম্মপদ আগাগোড়া মুখস্থ করতে দিয়েছিলেন। অশ্বঘোষের বুদ্ধচরিত অনুবাদ করার ভার তিনি দিয়েছিলেন রথীন্দ্রনাথ ও সন্তোষচন্দ্রের উপর, রথীন্দ্রনাথ অনুবাদ সম্পূর্ণ করেন ও দীর্ঘকাল পরে [১ম : ১৩৫১, ২য় : ১৩৫৮] তা গ্রন্থাকারে মুদ্রিত হয়। রথীন্দ্রনাথ উক্ত গ্রন্থের 'নিবেদন'-এ লেখেন :

> আমার পিতৃদেবের আদেশে ১৯০৫ সালে বুদ্ধচরিত বাংলাভাষায় তর্জমা করিতে প্রবৃত্ত হই। তখন কেবল কাওয়েল সাহেবের সংস্করণ [1893] প্রকাশিত হইয়াছে। সদ্য আবিষ্কৃত এই কাব্যখানি পড়িয়া তিনি প্রচুর আনন্দ পান ও আমার সহপাঠী সন্তোষচন্দ্র মজুমদার ও আমাকে তর্জমা করিবার জন্য সেই বইখানি দেন। আমাদের দুইজনের তখন ছাত্রাবস্থা, সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্য সম্বন্ধে তখন কাহারো এত অধিকার ছিল না যে সাহস করিয়া এই কাজটি গ্রহণ করি। পিতৃদেবকে নিরুৎসাহিত করিতে ইচ্ছা করিল না—তর্জমা করিতে লাগিয়া গেলাম। প্রথম তিন সর্গ তিনি নিজে সংশোধন করিয়া দিয়াছিলেন। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের কর্তৃপক্ষ আমার পিতৃদেবের নিকট সন্ধান পাইয়া পরিষৎ পত্রিকায় সেই সময় এই বঙ্গানুবাদের বিজ্ঞাপন প্রকাশ করিয়াছিলেন। কিন্তু অনুবাদটি তখন প্রকাশ করার বাধা ঘটিল।

জ্যৈষ্ঠ-সংখ্যা ভাণ্ডার প্রকাশিত হয় 19 May [শুক্র ৫ জ্যৈষ্ঠ]। এই সংখ্যায় রবীন্দ্রনাথের রচনা তিনটি :

৬২-৬৪ 'জলকষ্ট' দ্র স্বদেশী সমাজ [১৩৯৩]। ৬৮-৭০

৬৯-৭২ 'পূর্ব্বপ্রশ্নের অনুবৃত্তি' দ্র শিক্ষা-পরিশিষ্ট ১২।৫১৫-১৭

৭৪-৭৬ 'প্রস্তাব/বিজ্ঞানসভা' দ্র ঐ ১২।৫১৮-১৯

'জলকষ্ট' রচনাটি 'শ্রীমতী কনিষ্ঠা' ছদ্মনামে লিখিত। 'অহেতুক জলকষ্ট' নামে 'শ্রীমতী মধ্যমা'-স্বাক্ষরিত আর-একটি রচনা আষাঢ়-সংখ্যায় [পৃ ১০৯-১১] মুদ্রিত হয়। পুলিনবিহারী সেন যথার্থই অনুমান করেছেন যে, রচনা-দুটি রবীন্দ্রনাথের; তিনি লিখেছেন : "আলোচনার পদ্ধতি হইতে রবীন্দ্রনাথ-সম্পাদিত ১৩০৫ ভাদ্রের ভারতী পত্রে প্রকাশিত 'মুখুজ্জে বনাম বাঁড়ুজ্জে' ও তাহার আলোচনা 'অপর পক্ষের কথা' (১৩০৫ আশ্বিন) প্রবন্ধের কথা অনেকের স্মরণ হইবে"[১০]—এই দুটি রচনাও একই পদ্ধতি অনুসরণ করেছে।

'বাংলাদেশের জলকষ্ট-নিবারণের সম্বন্ধে গবর্ণমেন্টের মন্তব্য' উপলক্ষ করে গতবৎসর 'স্বদেশী সমাজ' প্রবন্ধ লিখিত ও পঠিত হয়। বর্তমান প্রবন্ধটি লিখিত হয়, এক বিধবা জমিদার 'সদর স্টেশনে গবর্মেন্টের সদর-আপিস-নির্মাণের জন্য' জমি ছেড়ে দিচ্ছেন এই খবরটি কাগজে পড়ে। সম্পূর্ণ লেখাটিই ব্যঙ্গাত্মক। মন্ত্রিসভার সদস্য হওয়া বা মোটা মাইনের চাকরি পাওয়া পুরুষের প্রধান লক্ষ্য—লোকের ক্ষুধা-মেটানো, তৃষ্ণা-মেটানো, রোগের তাপ-নিবারণ করার কথা পুরুষের দেশানুরাগ তেমন করে ভাবতে পারে না। তাছাড়া

গতবৎসর জলকষ্ট নিয়ে আন্দোলন করে তাদের দেশানুরাগ যথেষ্ট তৃপ্ত হয়েছে। কিন্তু মেয়েরা ভয়ের তাড়না বা লোভের উত্তেজনায় নয়, প্রাণের টানেই ক্ষুধিতের ক্ষুধা তৃষ্ণার্তের তৃষ্ণা মিটিয়ে এসেছে, রোগের সেবা ও শোকের সান্ত্বনা তাদের স্নেহেরই কাজ।—'শ্রীমতী কনিষ্ঠা' লিখেছেন : 'আমরা মেয়েমানুষ, আমাদের একটা গর্ব ছিল যে, দেশের ধর্ম দেশের অন্তঃপুরেই শেষ আশ্রয় লইয়াছে।...দেশের কপালক্রমে এখন কি তাহার উল্টা দেখিতে হইবে? দেশে যখন অন্নজলের টানাটানি তখন যে স্ত্রীলোকের হাতে ভগবান সামর্থ্য দিয়াছেন, সেও তেলামাথায় তেল ঢালিয়া গেজেটে নাম লিখাইতে যাইবে?...জেলার ম্যাজিস্ট্রেটের চাঁদার খাতায় যদি বড়ো বড়ো অঙ্কপাত করিতে হয়, তবে এমন করিয়া কি করা যায় না যাহাতে দেশের মুখে কলঙ্কপাত না হয়, যাহাতে গেজেটেও নাম ওঠে আর পিপাসার জল পাইয়া পীড়িত ভগবানও প্রসন্ন হন? ম্যাজিস্ট্রেটের চেয়েও তিনি কি ছোটো?'

বৈশাখ-সংখ্যায় সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রশ্ন করেছিলেন : 'আজকাল পব্লিক্ উদ্‌যোগগুলির সঙ্গে প্রাকৃত-সাধারণের যোগরক্ষার উপায় কি?' প্রশ্নের উত্তর দেন নগেন্দ্রনাথ ঘোষ, হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, আশুতোষ চৌধুরী, যোগেশচন্দ্র চৌধুরী, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী ও পৃথ্বীশচন্দ্র রায়। 'পূর্বপ্রশ্নের অনুবৃত্তি' রচনায় এঁদের মতের সার নিষ্কাশন করে রবীন্দ্রনাথ কিছু সমস্যার কথা উত্থাপন করলেন। তাঁর ধারণা, নানা বিষয়ে মতানৈক্য সত্ত্বেও উত্তরদাতারা একটি বিষয়ে একমত যে, আগে শিক্ষার ভালো বন্দোবস্ত করা না হলে প্রাকৃতসাধারণকে পাব্লিক উদ্‌যোগগুলিতে আহ্বান করা চলে না। অতএব ইস্কুল করে ও অন্যান্য উপায়ে তাদের শিক্ষার গোড়াপত্তন করে দেওয়া দরকার। কিন্তু কর্তব্যসম্বন্ধে একমত হওয়া সহজ, উপায় সম্বন্ধে মতৈক্য হওয়া কঠিন। সেই কারণে রবীন্দ্রনাথ নেতৃবৃন্দকে কয়েকটি গোড়ার কথা ভেবে নেওয়ার জন্য পরামর্শ দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, সরকারও চায় প্রাকৃতসাধারণকে একটি ন্যূনতম শিক্ষা দিতে, কিন্তু নিজেরই স্বার্থে সে চায় না সেই শিক্ষার পরিধি বিস্তৃত হোক। অপরপক্ষে, দেশবাসী শিক্ষার উপযুক্ত আয়োজন করলে সরকারী দাক্ষিণ্যের অভাবে সেই শিক্ষায় অন্নসংস্থান হওয়া শক্ত। এই সমস্যার কোনো সমাধান তিনি নির্দেশ করেননি, পূর্বপ্রশ্নের অনুবৃত্তি-স্বরূপ তিনি অনুরোধ করেছেন, 'দেশকে ভালো করিয়া শিক্ষা দেওয়া উচিত, এই কথা বলিয়া ক্ষান্ত না হইয়া শিক্ষার কিরূপ ব্যবস্থা করিতে হইবে, দেশের হিতৈষিগণ 'ভাণ্ডারে' তাহারই আলোচনা করুন।'

'বিজ্ঞানসভা' সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ যে 'প্রস্তাব' করেছেন, তা আমাদের বৈশাখ ১৩০৫ সংখ্যা ভারতী-তে প্রকাশিত 'প্রসঙ্গকথা'টি স্মরণ করিয়ে দেয়। ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকার-প্রতিষ্ঠিত Indian Association for the Cultivation of Science [1876] তথা বিজ্ঞানসভার কার্যকলাপ সম্বন্ধে যে-সব প্রশ্ন তিনি সেখানে উত্থাপন করেছিলেন, এখানে সেগুলিকেই তিনি 'প্রস্তাব' আকারে উপস্থিত করলেন। তাঁর প্রস্তাব, বিজ্ঞানসভা কর্মশূন্য সভা হয়ে না থেকে জগদীশচন্দ্র প্রফুল্লচন্দ্র প্রভৃতির মতো বিশিষ্ট বৈজ্ঞানিকের সাহায্য নিয়ে অধ্যবসায়ী ছাত্রগোষ্ঠী গড়ে তুলুক এবং দেশের ভাষায় বিজ্ঞানের পরিচয় দিতে উদ্যত যোগেশচন্দ্র রায়ের মতো বিজ্ঞানপণ্ডিতের সাহায্য নিক। তিনি লিখলেন : 'আমরা স্বকীয় শাসনের অধিকার লইবার জন্য রাজদ্বারে প্রার্থনা করিতেছি। কিন্তু বিজ্ঞানসভার মতো ব্যাপারগুলি দেশের জমি জুড়িয়া নিষ্ফল হইয়া পড়িয়া থাকিলে প্রতিদিন প্রমাণ হইতে থাকে যে, আমরা স্বকীয় শাসনের অধিকারী নহি। কারণ, যে-অধিকার আমাদের হস্তে আছে তাহাকে যদি ব্যর্থ করি, তবে যাহা নাই তাহাকে পাইলেই যে আমরা চতুর্ভুজ হইয়া উঠিব এ-কথা স্বীকার করা যায় না।'

আমাদের মনে হয়, বর্তমান সংখ্যার 'সঞ্চয়' বিভাগে অন্তত 'প্রকৃতিতে নীতি' [পৃ ৯৭-৯৯], 'প্রজাতন্ত্রতা ও তাহার প্রতিক্রিয়া' [পৃ ৯৯-১০০] ও 'জ্যোতিঃশাস্ত্র' [পৃ ১০০-০২] রচনাগুলি রবীন্দ্রনাথের লেখা। বিষয় বা রচনাবৈশিষ্ট্য নয়, আমাদের অনুমানের কারণ রবীন্দ্রনাথের একটি মুদ্রাদোষ—'যাহারা *টিঁকিয়া গেছে* তাহাদের এই ভাবটি ছিল বলিয়াই *টিঁকিয়া গেছে*', 'ডিমোক্রাসির প্রয়োজনীয়তা মিল্ *বুঝাইয়া গেছেন*', 'গর্ত্তটা যেন ঠিক্ পৃথিবীর মাঝখান দিয়া *চলিয়া গেছে*'—তিনটি রচনাতেই এইরূপ প্রয়োগ আরও আছে। একসময়ে সুরেশচন্দ্র সমাজপতি রবীন্দ্রনাথের 'দাবিয়া গেছে' প্রয়োগ নিয়ে ঠাট্টা করেছিলেন;[১১] মনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় সম্ভবত এই প্রয়োগের বৈধতা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন, রবীন্দ্রনাথ ১৯ জ্যৈষ্ঠ [শুক্র 2 Jun] জবাবে লেখেন : 'হইল=হইয়াছে। করিল=করিয়াছে। ইত্যাদি। গিল—গিয়াছে হইতে পারিত। যখন কথাটা "গেল" তখন "গিয়াছে" হইতেই হইবে এমন কথা নাই। এক সময় কথাটা ছিল "গইল" কিন্তু এখন আর তাহা নাই। এরূপ পরিবর্ত্তনকে আমল না দিলে কথিত ও লিখিত ভাষার মধ্যে ব্যবধান ক্রমে অত্যধিক হইয়া উঠিবে।'[১২]

জ্যৈষ্ঠ ১৩১২-সংখ্যা ভাণ্ডার-এ একটি 'প্রশ্ন' ছিল : 'আমাদের দেশের শিক্ষার আদর্শ এখনকার অপেক্ষা দুরূহতর ও পরীক্ষা কঠিনতর করা ভাল কি মন্দ?' এর 'উত্তর' দেন রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, হেরম্বচন্দ্র মৈত্র, জগদীশচন্দ্র বসু [পৃ ৮৯-৯১], গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ও মোহিতচন্দ্র সেন। জগদীশচন্দ্রের 'উত্তর'টি চিঠিপত্র ৬।১৩৯-৪১-এ উদ্ধৃত হয়েছে। জগদীশচন্দ্র এই প্রসঙ্গে 16 May [মঙ্গল ২ জ্যৈষ্ঠ] দার্জিলিং থেকে রবীন্দ্রনাথকে লেখেন : 'ভাণ্ডারের লেখা বেশ হইয়াছে। তবে মেষচর্ম্মে আবৃত সিংহনাদ লোকে বুঝিতে পারিবে।'[১৩] এই চিঠি থেকে অনুমান করা যায়, 'উত্তর'টি রবীন্দ্রনাথেরই লেখা—তিনি বিষয়গুণে এটিকে জগদীশচন্দ্রের নামে প্রকাশ করেন।

ভারতী, জ্যৈষ্ঠ ১৩১২ [২৯।২] :

১৭০ 'পত্র' ['সৃষ্টি-প্রলয়ের তত্ত্ব'] দ্র প্রহাসিনী-সংযোজন ২৩।৪২-৪৪

'বনক্ষেত্র [Woodfield]। শিমলাশৈল। শনিবার ১৮৯৮' [১৮৯৩] স্থান-কাল-চিহ্নিত এই কবিতাটি 'খেয়ালখাতা' বিভাগে মুদ্রিত হয়। খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় পত্র-কবিতাটি অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরীর উদ্দেশে লিখিত বলে উল্লেখ করেছেন [দ্র রবীন্দ্র কথা। ১৯৭]।

সঙ্গীত-প্রকাশিকা, জ্যৈষ্ঠ ১৩১২ [৪।৯] :

১৮৪-৮৭ মিত্র দেশ-একতালা। সে জন কে সখি বোঝা গেছে দ্র স্বর ৪৮

১৯০-৯২ বড় হংস-সারঙ্গ-চৌতাল' (তাঁহারে) আরতি করে চন্দ্র তপন দ্র ঐ ২২

[১৯৭-৯৮ মিশ্র-একতালা। মুখের হাসি চাপলে কি হয় (রাজা বসন্ত রায়)]

দ্বিতীয় গানটির স্বরলিপি করেন কাঙালীচরণ সেন, প্রথমটির স্বরলিপিকারের নাম অনুল্লেখিত। 'রাজা বসন্ত রায়' নাটকে গীত 'মুখের হাসি চাপলে কি হয়' গানটি রবীন্দ্রনাথের লেখা নয়, একথা আমরা পূর্বেই বলেছি দ্র রবিজীবনী ৩।৪৭।

প্রায় পুরো জ্যৈষ্ঠ মাসটি শান্তিনিকেতনে কাটিয়ে রবীন্দ্রনাথ ঠিক কবে কলকাতায় আসেন তা জানা যায়নি। তবে ২৭ জ্যৈষ্ঠ [শনি 10 Jun] জেসরাজ জয়চাঁদ লাল-এর কাছ থেকে বার্ষিক শতকরা ১২ টাকা

সুদে ১৬০০্ ধার নিয়ে [১ আষাঢ়েই শোধ দেওয়া হয়] '১৯০৫ সালের ১০ জুন হইতে ১৯০৬ সালের ৯ জুন পর্য্যন্ত এক বৎসরের লাইফ ইনসিওরের টাকা শোধ দেওয়া যায় ২৬২৯ ল২'—এই ব্যাপারে যদি তাঁর উপস্থিতির প্রয়োজন হয়ে থাকে, তাহলে এর পূর্বেই তিনি কলকাতায় এসছেন। ২ আষাঢ় [শুক্র 16 Jun] রাধাকিশোর মাণিক্যকে লিখেছেন : 'আমাদের বৈষয়িক ব্যাপার লইয়া কলিকাতায় পড়িয়া আছি—আশা করিতেছি আর সপ্তাহ খানিকের মধ্যে শেষ করিয়া আপাতত কিছুকালের মত ছুটি পাইব।'[১৪] জগদীশচন্দ্র 'উদ্ভিদের বর্দ্ধন পরিমাপের জন্য' যে যন্ত্র উদ্ভাবন করেছেন, তার জন্য দ্রুতবর্ধনশীল সদ্য অঙ্কুরিত মুলীবাঁশের চারা পাঠিয়ে দেওয়ার অনুরোধও এই পত্রে আছে।

রাধাকিশোর রাজা হওয়ার পর থেকে খুব সুখে কালযাপন করছিলেন না। তিনি পুত্র বীরেন্দ্রকিশোরকে 'যুবরাজ' ঘোষণা করার [8 Feb 1899 : ২৬ মাঘ ১৩০৫] পরেই তাঁর ভ্রাতা 'বড়ঠাকুর' সমরেন্দ্রচন্দ্র এই কাজ প্রথাবিরোধী বলে ইংরেজ গবর্মেন্টের কাছে প্রতিবাদ করেন। তিনি প্রধানত কলকাতাতেই থাকতেন বলে এখানকার নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠতা ছিল। এই কারণে বেঙ্গলী প্রভৃতি পত্রিকায় তাঁর সমর্থনে অজস্র সম্পাদকীয় মন্তব্য প্রকাশিত হত। রাজকর্মচারীদের মধ্যেও তাঁর অনুগত লোকের অভাব ছিল না। এঁদের চক্রান্তে অতিষ্ঠ হয়ে ১১ আষাঢ় ১৩১১ [শনি 25 Jun 1904] রাধাকিশোর সমরেন্দ্রচন্দ্রকে ত্রিপুরা থেকে বহিষ্কৃত করেন, পাঁচ দিন পরে [১৬ আষাঢ়] তাঁর 'বড়ঠাকুর' উপাধি কেড়ে নেন।[১৫] ২৮ আষাঢ় [12 Jul] বেঙ্গলী-র সম্পাদকীয়তে লেখা হয়, তাঁর মামা মণিপুর রাজপরিবারের কুমার নরধ্বজকেও পনেরো দিনের মধ্যে আগরতলা ত্যাগের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

আর্থিক কারণেও রাধাকিশোর বিব্রত ছিলেন। গবর্মেন্টের কাছ থেকে ঋণ নিয়ে খুচরো দেনা মেটাবার পরামর্শ তাঁকে দেওয়া হয়েছিল। নানা সূত্রে ত্রিপুরারাজের এইসব সংকট সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ বিশেষ অবহিত ছিলেন। সেইজন্য সম্ভবত ৩১ জ্যৈষ্ঠ [বুধ 14 Jun] তিনি নানা পরামর্শ দিয়ে একটি সুদীর্ঘ পত্র [দ্র রবীন্দ্রনাথ ও ত্রিপুরা। ৩১৪-১৫] লিখে রাধাকিশোরকে রেজেস্ট্রি করে পাঠিয়ে দেন। 'পত্রখানি দয়া করিয়া অবিলম্বে নষ্ট করিয়া ফেলিবেন' অনুরোধ সত্ত্বেও সৌভাগ্যবশত রাধাকিশোর পত্রটি নষ্ট করেননি। ঋণগ্রহণ ও পরিশোধ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের যথেষ্ট বাস্তব অভিজ্ঞতা ছিল, সেই অভিজ্ঞতা থেকেই তিনি রাজবন্ধুকে সুপরামর্শ দেবার চেষ্টা করেছেন, ইংরেজের কূটনীতি সম্পর্কে সতর্ক থাকার জন্যও অনুরোধ জানিয়েছেন। আর একটি তারিখহীন পত্রে [দ্র ঐ।৩০৯-১১] তিনি দ্বিজেন্দ্রনাথের কনিষ্ঠ জামাতা রমণীমোহন চট্টোপাধ্যায়কে মন্ত্রীপদে নিয়োগ করার জন্য সুপারিশ করেছিলেন। তিনি আত্মীয় বলে এব্যাপারে রবীন্দ্রনাথ যথেষ্ট সংকোচ অনুভব করেছেন, কিন্তু ত্রিপুরার মঙ্গলাকাঙক্ষায় নিজের বিশ্বাসভাজন ব্যক্তিদের নাম সুপারিশ করতে তাঁর দ্বিধা হয়নি। রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন :

প্রকৃত কথা মহারাজের এমন একজন লোক চাই, যাহাকে স্বার্থপর লোকেরা ভয় মৈত্রের দ্বারা স্বপক্ষে আনিতে পারিবে না। যে ব্যক্তি সকল অবস্থাতেই একমাত্র মহারাজের পক্ষে থাকিবে! এই সঙ্ক টর সময় মহারাজকে এই উপায়েই সকল চক্রান্তজাল হইতে মুক্ত করা যাইতে পারে।

রমণীর নাম করিতে আমি অত্যন্ত সঙ্কোচ বোধ করি। আত্মীয় বলিয়া নহে। রাজ্যের সঙ্কটের সময় কোন ব্যক্তির নাম করিয়া দায়িত্ব গ্রহণ করা অত্যন্ত কুণ্ঠা-জনক। আমি নিতান্তই সুহৃদের কর্ত্তব্য স্মরণ করিয়া সঙ্কোচ অতিক্রম করিবার চেষ্টা করিয়াছি। আমি নিশ্চয় জানি রমণী এখানে নিযুক্ত হইলে অনেক গ্লানি আমাকে স্বীকার করিতে হইবে।[১৬]

এই পত্রটিরও শীর্ষে লেখা ছিল : 'ছিন্ন করিয়া ফেলিবেন।' সৌভাগ্যবশত এই অনুরোধ রক্ষিত না হওয়ায় আমরা জানতে পেরেছি, ত্রিপুরারাজ্য ও সুহৃদ রাধাকিশোরের মঙ্গলামঙ্গল নিয়ে রবীন্দ্রনাথ কত গভীরভাবে চিন্তা করতেন। ত্রিপুরাকে তিনি একটি জনকল্যাণমুখী আদর্শ দেশীয় রাজ্য হিসেবে দেখতে চাইতেন, এই পত্রগুলি ও তাঁর নানা কার্যকলাপের মধ্য দিয়ে সেই আকাঙক্ষা মূর্ত হয়ে উঠেছে।

রবীন্দ্রনাথ সরেজমিনে ত্রিপুরার প্রকৃত অবস্থা দেখতে চাইছিলেন, রাধাকিশোরও সাক্ষাতে সমস্ত বিষয় আলোচনা করে নিতে চাইলেন। সেইজন্য আষাঢ়ের মাঝামাঝি তিনি ত্রিপুরা রওনা হলেন।

রবীন্দ্রনাথ কবে কলকাতা থেকে যাত্রা শুরু করে কোন তারিখে ত্রিপুরায় পৌঁছন সে-বিষয়ে কোনো তথ্য পাওয়া যায়নি। তবে তিনি কলকাতা থেকে শিলাইদহ হয়ে ত্রিপুরায় যান সেই খবরটি পাওয়া যায় একটি হিসাব থেকে : 'রবীন্দ্রবাবু ত্রিপুরায় গমন সময় বিরাহিমপুর হইতে ২০০্ লইয়া যাওয়ায় তাহা শোধ'। এবারেও তিনি জোড়া-বাংলোয় অবস্থান করেন। ১৭ আষাঢ় [শনি 1 Jul] স্থানীয় উমাকান্ত একাডেমী হলে ত্রিপুরা সাহিত্য সম্মিলনী প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে সভায় রবীন্দ্রনাথ 'দেশীয় রাজ্য' [দ্র বঙ্গদর্শন, শ্রাবণ। ১৪৭-৫৬; আত্মশক্তি ৩। ৬২৬-৩৬] প্রবন্ধটি পাঠ করেন। মহিমচন্দ্র দেববর্মা লিখেছেন :

> ত্রৈপুরী ১৩১৫ সালে ১৭ই আষাঢ় তারিখে আগরতলার উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ের প্রশস্ত গৃহে, সাহিত্য সভা স্থাপনোপলক্ষে রবীন্দ্রনাথকে অভিনন্দিত করিতে এক সভার অনুষ্ঠান হয়। সে বিরাট সভার মঞ্চোপরি একটি আসন মহারাজ রাধাকিশোরের জন্য, অপরটি সভার সভাপতি রবীন্দ্রনাথের জন্য নির্দ্দিষ্ট ছিল। সভারম্ভে রবিবাবুকে সভাপতি পদে বরণ করিয়া, মহারাজ রাধাকিশোর মাণিক্য সর্ব্বসাধারণের সমসূত্রে আসন গ্রহণ করিলেন। রবীন্দ্রনাথ সসঙ্কোচে মহারাজকে নির্দ্দিষ্ট আসনে বসিতে অনুরোধ করিলে, মহারাজ বলেন—"সাহিত্যক্ষেত্রে আপনার স্থান সর্ব্বোপরি, আপনি সাহিত্যের রাজা, আমি আপনার ভক্ত বন্ধু মাত্র, এ উচ্চমঞ্চ আমার স্থান নহে।" দর্শক এবং উপস্থিত প্রজাবৃন্দ মহারাজের বিনয়নম্র ব্যবহারে মুগ্ধ এবং গৌরবান্বিত বোধ করিল, কবি রবীন্দ্রনাথ এ দৃশ্য দেখিয়া পরমানন্দ লাভ করিলেন।[১৭]

মহিমচন্দ্র লিখেছেন : 'সে সাহিত্য-সভায় কোন প্রবন্ধ পাঠের গৌরব আমার ভাগ্যে ঘটিয়াছিল।'

'দেশীয় রাজ্য' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ প্রথমেই বললেন, প্রত্যেক দেশ ও জাতি নিজ নিজ বিশেষ প্রকৃতি অনুসারেই মনুষ্যত্বের উৎকর্ষ প্রাপ্ত হয়, অনুকরণের দ্বারা তা সম্ভব নয়। ত্রিপুরারাজ্যের রাজচিহ্নের মধ্যে যে সংস্কৃতবাক্য আছে—'কিল বিদূর্বীরতাং সারমেকং'—বীর্যকেই সার বলে জানবে—এই বীর্যের দারিদ্র্যবশতই দেশ পিছিয়ে পড়ে, বিদেশের অনুকৃতি তাকে সার্থক করে তুলতে পারে না।

অনেকে বলেন ভারতের দেশীয় রাজ্যগুলি পিছিয়ে পড়ছে। রবীন্দ্রনাথ বললেন, 'দেশীয় রাজ্যের ভুলত্রুটি-মন্দগতির মধ্যেও আমাদের সান্ত্বনার বিষয় এই যে, তাহাতে যেটুকু লাভ আছে তাহা বস্তুতই আমাদের নিজের লাভ।...এই কারণেই আমাদের বাংলাদেশের এই ক্ষুদ্র ত্রিপুরারাজ্যের প্রতি উৎসুক দৃষ্টি না মেলিয়া আমি থাকিতে পারি না।' এই রাজ্যের মামলা-মোকদ্দমা, চক্রান্ত ইত্যাদি অশান্তির প্রতি ইঙ্গিত করে তিনি বললেন, 'এই কারণে, যদি জানিতে পাই তুচ্ছ স্বার্থপরতা আপনার সামান্য লোভের জন্য, উপস্থিত ক্ষুদ্র সুবিধার জন্য, রাজশ্রীর মন্দিরভিত্তিকে শিথিল করিয়া দিতে কুণ্ঠিত হইতেছে না, তবে সেই অপরাধকে আমি ক্ষুদ্ররাজ্যের একটি ক্ষুদ্র ঘটনা বলিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতে পারি না।' এই কারণেই তিনি রাজ্য-রাজনীতির মধ্যে প্রবেশ করেছিলেন, স্বার্থদুষ্ট চক্রান্তের ঊর্ধ্বে থেকে যাতে শাসনব্যবস্থা পরিচালিত হয় তার জন্য মন্ত্রীপদে রমণীমোহনকে সুপারিশ করেছিলেন।

বৈশাখ-সংখ্যা ভাণ্ডার-এ একটি প্রশ্ন ছিল : 'গবর্মেন্ট-শিল্পবিদ্যালয়ে যে সকল বিলাতিছবি সংগ্রহ করা হইয়াছিল, তাহা সম্প্রতি নিলামে বিক্রয় হইয়া গেছে এবং সেখানে দেশীয় চিত্রশিল্পাদি শিখাইবার আয়োজন

হইতেছে—ইহাতে আমাদের লাভ হইবে, কি ক্ষতি হইবে?' ['গবর্মেণ্ট' বানান ও 'হইয়া গেছে' প্রয়োগ থেকে মনে হয়, প্রশ্নটি রবীন্দ্রনাথের রচনা।] জ্যৈষ্ঠ-সংখ্যায় প্রশ্নটির উত্তর দেন অবনীন্দ্রনাথ ও উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী। আগরতলায় এক ব্যক্তি রবীন্দ্রনাথকে এই প্রশ্ন করলে তিনি যে উত্তর দেন, তার কথা উল্লেখ করেছেন এই প্রবন্ধে। বিক্রয়ের সিদ্ধান্তকে সমর্থন করে তিনি যা লিখেছেন, চিত্রকলা সম্পর্কে তাঁর ধারণা বোঝার পক্ষে তা খুবই জরুরি: 'তাহার কারণ এ নয় যে, বিলাতি চিত্রকলা উৎকৃষ্ট সামগ্রী নহে। কিন্তু সেই চিত্রকলাকে এত সস্তায় আয়ত্ত করা চলে না।...বিলাতি বাজারের কতকগুলি সুলভ আবর্জনা এবং সেই সঙ্গে দুটি একটি ভালো ছবি চোখের সামনে রাখিয়া আমরা চিত্রবিদ্যার যথার্থ আদর্শ কেমন করিয়া পাইব? এই উপায়ে আমরা যেটুকু শিখি তাহা যে কত নিকৃষ্ট তাহাও ঠিকমত বুঝিবার উপায় আমাদের দেশে নাই।...এই অসম্পূর্ণ শিক্ষায় আমাদের দৃষ্টি নষ্ট করিয়া দেয়—পরের দেশের ভালোটা তো শিখিতেই পারি না, নিজের দেশের ভালোটা দেখিবার শক্তি চলিয়া যায়।' অথচ দেশীয় শিল্পকলার আদর্শ দেশের মধ্যেই আছে—'একবার যদি আমাদের দৃষ্টি খুলিয়া যায় তবে ইহাকে আমাদের সমস্ত দেশের মধ্যে, থালায়, ঘটিতে, বাটিতে, ঝুড়িতে, চুপড়িতে, মন্দিরে, মঠে, বসনে, ভূষণে, পটে, গৃহভিত্তিতে, নানা-অঙ্গপ্রত্যঙ্গ-পরিপূর্ণ একটি সমগ্র মূর্তিরূপে দেখিতে পাইতাম; ইহার প্রতি আমাদের সচেষ্ট চিত্তকে প্রয়োগ করিতে পারিতাম'। ওকাকুরা এ দেশের কীটদষ্ট কয়েকটি পটের ছবি দেখে বিস্ময়ে পুলকিত হয়েছিলেন, তিনি যে পটখানি এখান থেকে দেশে নিয়ে গেছেন জাপানের অনেক গুণজ্ঞ তার জন্য অনেক মূল্য দিতে চেয়েছিলেন, য়ুরোপের অনেক রসজ্ঞ ব্যক্তি অখ্যাত দোকানবাজার ঘেঁটে মলিন ছিন্ন কাগজের চিত্রপট বহুমূল্য সম্পদের মতো সংগ্রহ করে নিয়ে যাচ্ছেন, কিন্তু 'সে-সকল চিত্র দেখিলে আমাদের আর্ট স্কুলের ছাত্রগণ নাসাকুঞ্চন করিয়া থাকেন। ইহার কারণ কী? ইহার কারণ এই, কলাবিদ্যা যথার্থভাবে যিনি শিখিয়াছেন তিনি বিদেশের অপরিচিত রীতির চিত্রের সৌন্দর্যও ঠিকভাবে দেখিতে পান—তাঁহার একটি শিল্পদৃষ্টি জন্মে। আর, যাহারা কেবল নকল করিয়া শেখে তাহারা নকলের বাহিরে কিছুই দেখিতে পায় না।' এর পরে তিনি লিখেছেন : 'বস্তুত বিলাতি সামগ্রীকে যথার্থভাবে চিনিতে শেখা বিলাতেই সম্ভবে। সেখানে শিল্পকলা সজীব, সেখানে শিল্পীরা প্রত্যহ নব নব রীতি সৃজন করিতেছেন, সেখানে বিচিত্র শিল্পপদ্ধতির কালপরম্পরাগত ইতিহাস আছে, তাহার প্রত্যেকটির সহিত বিশেষ দেশকালপাত্রের সংগতি সেখানকার গুণী লোকেরা জানেন।' অবনীন্দ্রনাথকে কেন্দ্র করে দেশীয় চিত্রকলার যে বিকাশ ঘটে, তার অন্তরালে রবীন্দ্রনাথের ভূমিকা স্বয়ং অবনীন্দ্রনাথ স্বীকার করেছেন। সুতরাং চিত্রকলা সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ এই সময়ে কি ভাবছেন তা জানার মূল্য আছে।

'পিয়ের লোটি' [Louis Marie Juleilva Viand, 1850-1923] ছদ্মনামধারী বিখ্যাত ফরাসী ভ্রমণকারী কিছুকাল আগে ভারত ভ্রমণ করে গিয়ে *Inde sans les Anglais* [1903] নামে একটি গ্রন্থ লেখেন, 'ইংরাজবর্জ্জিত ভারতবর্ষ' ও অন্যান্য শিরোনামে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ গ্রন্থটির বঙ্গানুবাদ ধারাবাহিকভাবে বঙ্গদর্শন-এ প্রকাশ করতে থাকেন আশ্বিন ১৩১১-সংখ্যা থেকে। পিয়ের লোটি দেশীয় রাজপ্রাসাদগুলিতে বিলিতি আসবাবের ছড়াছড়ি দেখে হতাশ হয়েছেন। কিন্তু এই আসবাবগুলিতে শিক্ষিত ইংরেজের রুচির পরিচয় নেই, সাধারণ ইংরেজের অশিক্ষিত শিল্পজ্ঞানের ফরমায়েশে এই সব দ্রব্য নির্মিত। কিন্তু এইসব কথা বলার সময়েও রবীন্দ্রনাথ অদ্ভুত মাত্রাজ্ঞানের পরিচয় দিয়েছেন। তিনি বলেন :'এ কথা আমরা বলি না যে, বিদেশী সামগ্রী আমরা গ্রহণ করিব না। গ্রহণ করিতেই হইবে, কিন্তু দেশীয় আধারে গ্রহণ করিব।...বিলাতি সামগ্রী যখন

আমাদের ভারতপ্রকৃতির দ্বারা জীর্ণ হইয়া তাহার আত্মরূপ ত্যাগ করিয়া আমাদের কলেবরের সহিত একাত্ম হইয়া যায় তখনই তাহা আমাদের লাভের বিষয় হইতে পারে—যতক্ষণ তাহার উৎকট বিদেশীয়ত্ব অবিকৃত ততক্ষণ তাহা লাভ নহে।' বঙ্গভঙ্গ ও অসহযোগ আন্দোলনের সময়ে স্বদেশিয়ানার উৎকট ভাবাতিশয্যে যখন যা-কিছু বিদেশী তাকেই বর্জন করার উলটোরথের পালা চলছিল, তখন এই ধারণা থেকে রবীন্দ্রনাথ তার বিরোধিতা করে দেশের লোকের নিন্দাভাজন হতে দ্বিধা করেননি। অন্য বিদেশী আদর্শ এনে একধরনের সামঞ্জস্যবিধানের চেষ্টাও তিনি করেছিলেন। জাপানী সূত্রধর কুসুমতো সান প্রথমে ব্রহ্মচর্যাশ্রমের ছাত্রদের কারিগরীশিক্ষার জন্য নিয়োজিত হয়েছিলেন, রবীন্দ্রনাথ পরে তাঁকে ত্রিপুরায় পাঠান সেখানকার উডবার্ন আর্টিজান স্কুলে শিক্ষকতার উদ্দেশ্যে।

ইংরেজের প্রত্যক্ষ শাসনাধীন ভারতে নিজস্ব আদর্শে কাজ করা কঠিন, তা রবীন্দ্রনাথ ভালোভাবেই জানতেন—এইজন্য দেশীয় রাজ্যগুলির, বিশেষত ত্রিপুরার, সম্বন্ধে তাঁর উচ্চাশা ছিল সীমাহীন : 'আমাদের মন্দভাগ্য আমাদের দেশীয় রাজ্যগুলিকে বিদেশী আপিসের ছাঁচের মধ্যে ঢালিয়া তাহাদিগকে কলরূপে বানাইয়া না তোলে, এই-সকল স্থানেই আমরা স্বদেশলক্ষ্মীর স্তন্যসিক্ত স্নিগ্ধ বক্ষঃস্থলের সজীব কোমল মাতৃস্পর্শ লাভ করিয়া যাইতে পারি—এই আমাদের কামনা।'

এই সভার পরদিন ১৮ আষাঢ় [রবি 2 Jul] বিকেলে রবীন্দ্রনাথ স্থানীয় ঠাকুর বোর্ডিং পরিদর্শন করে Visitors' Book-এ লেখেন : 'অদ্য অপরাহ্নে ঠাকুর বোর্ডিং পরিদর্শন করিয়া সন্তুষ্ট হইলাম। ইতি ১৮ই আষাঢ়/১৩১২/শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।'[১৮] এইদিনও তিনি আগরতলায় ছিলেন, এটি তার প্রমাণরূপে গণ্য হতে পারে।

সম্ভবত পরদিন ১৯ আষাঢ় [সোম 3 Jul] তিনি আগরতলা ত্যাগ করেন। সেখানে অবস্থানকালে রাধাকিশোরের সঙ্গে রাজ্যরাজনীতি সম্পর্কে তাঁর দীর্ঘ আলোচনা হয়েছিল। তারই জোর টেনে 'মঙ্গলবার' [২০ আষাঢ় : 4 Jul] গোয়ালন্দ আসার সময়ে স্টীমারে বসেই ত্রিপুরারাজকে দীর্ঘ পত্র লিখে তাঁর কর্মচারীদের সম্পর্কে তাঁকে সাবধান করে দিয়েছেন : 'যে সকল লোকের দ্বারা গবর্মেন্টের সহিত মহারাজের কথা চলিতেছে মহারাজের সহিত তাহাদের অভিপ্রায়ের পার্থক্য থাকাতে সমস্তই পণ্ড হইয়া যাইতেছে—কেবল তাহাই নহে চেষ্টাপূর্ব্বক কর্ত্তৃপক্ষের নিকট মহারাজকে বিরক্তিভাজন করা হইতেছে।'[১৯] এইসব লেখালেখিতে রবীন্দ্রনাথকে গোপনীয়তার আশ্রয়ও নিতে হয়েছিল। ইতিপূর্বে উল্লিখিত দুটি পত্র পাঠ করার পর ছিঁড়ে ফেলার অনুরোধ ছিল, বর্তমান পত্রটি পাঠানো হয় যতীন্দ্রনাথ বসুর ঠিকানা লেখা খামের মধ্যে। মহারাজকে লেখা পত্রও অনধিকারীর হাতে খোলার সম্ভাবনা ছিল, বাজদরবারের চক্রান্ত কতদূর বিস্তৃত হয়েছিল এই আশঙ্কা থেকে তা কিছুটা বোঝা যায়।

রবীন্দ্রনাথ ২১ আষাঢ় [বুধ 5 Jul] কলকাতায় প্রত্যাবর্তন করেন। ত্রিপুরায় মন্ত্রীপদ গ্রহণের ব্যাপারে রমণীমোহনের সঙ্গে তাঁর দীর্ঘ আলোচনা হয়। এর পরেই জমিদারির কাজে তিনি পতিসর যান। ২৮ আষাঢ় [বুধ 12 Jul] তিনি সেখান থেকে রাধাকিশোরকে লেখেন, রমণীমোহন মন্ত্রীপদে যোগ দিতে রাজি আছেন, কিন্তু তাঁর প্রার্থনা 'রমণীর প্রতি এমন অব্যাহতভাবে কর্ম্মভার অর্পণ করিবেন যাহাতে তিনি কোনো অংশে ব্যর্থ না হন এবং সম্পূর্ণভাবে দক্ষতা প্রয়োগ করিবার ক্ষেত্র পান।' ত্রিপুরারাজ্যের মঙ্গল সম্বন্ধে তিনি কী ধরনের আবেগ বোধ করেন তারই অকুণ্ঠ প্রকাশ আছে পত্রের শেষাংশে : 'মহারাজের রাজ্যে ব্যবস্থা স্থাপন

করিতে হইবে ঈশ্বর ইহা ব্রত স্বরূপ আমার প্রতি অর্পণ করিয়াছেন তাহা আমি অনুভব করিতেছি; আমার চিত্ত কর্ম্ম হইতে অবকাশ লইবার জন্য ব্যগ্র হইয়াছিল কিন্তু আমি স্পষ্ট বুঝিয়াছি মহারাজের এই কাজ আমাকে সাধন করিতে হইবে, আমি ইহাতে ধর্ম্মে বাধ্য—মহারাজও আমাকে ইহা হইতে নিষ্কৃতি দিতে পারিবেন না। আমাদের বর্ত্তমান বৈষয়িক সমস্ত ঝঞ্ঝাটের মধ্যেও মহারাজের রাজ্যের চিন্তা আমাকে কিছুতেই পরিত্যাগ করিতেছে না। কেবল মহারাজকে নহে, আমার নিজকে উদ্বেগ হইতে মুক্ত করিবার জন্য আমাকে মহারাজের কর্ম্মে চিত্ত নিয়োগ করিতে হইবে। ত্রিপুরার ইতিহাসে আমার পিতামহের যে যোগ ছিল সেই যোগ আমাকেও রক্ষা করিতে হইবে বিধাতার এই অভিপ্রায়বশতই অকস্মাৎ স্বর্গীয় মহারাজ বিনা পরিচয়েই আমাকে ত্রিপুরার সহিত আবদ্ধ করিয়া দিয়াছেন।'[২০]

এই পত্রেই তিনি লেখেন : 'আমি আগামী শনিবার প্রত্যুষে কলিকাতায় পৌঁছিব।' ৩১ আষাঢ় [শনি 15 Jul] সকালে কলকাতায় পৌঁছে তিনি বিকেলে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের দ্বিতীয় মাসিক অধিবেশনে যোগদান করেন। 'কার্য-বিবরণী'তে লিখিত হয়েছে :

সম্পাদক রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী বলিলেন,...পরিষৎ আপনার কর্ম্মক্ষেত্রের বিস্তারদ্বারা বঙ্গদেশের সমুদয় জ্ঞাতব্য অনুসন্ধান দ্বারা দেশের সহিত পরিচয় ও সম্বন্ধস্থাপনে প্রবৃত্ত হইয়াছেন।...যাঁহার উদ্‌যোগে পরিষৎ এই গুরুভার গ্রহণ করিয়াছেন, পরিষদের অনুষ্ঠেয় কর্ম্ম তাঁহারই স্বীকৃত জীবনের প্রধান ব্রতের সাহায্য করিবে। সেই রবীন্দ্রবাবু অদ্য সভাস্থলে উপস্থিত আছেন। তিনি সম্প্রতি মফস্বল ভ্রমণ করিয়া আসিয়াছেন; পরিষদের উদ্দেশ্যানুযায়ী কাজ যাহা তিনি করিয়া আসিয়াছেন, তাঁহার মুখেই তাহার বিবরণ শুনিতে ইচ্ছা করি।

শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলিলেন, সম্প্রতি তিনি ত্রিপুরায় সাহিত্যসভাস্থাপন করিয়া আসিয়াছেন; উহা পরিষদের শাখা স্বরূপে গৃহীত হইতে পারে। মফস্বল ভ্রমণে তাঁহার ধারণা জন্মিয়াছে যে, বর্ত্তমান সময় আমাদের সাধনের অনুকূল। মফস্বলে অনেকেই পরিষৎকে শ্রদ্ধা করেন ও পরিষদের যথোচিত চেষ্টা ঘটিলে বস্তুতই আমাদের বঙ্গদেশের পরিচয় পাইবার উপায় হইবে। বঙ্গদেশে জানিবার বিষয় প্রচুর আছে। বৈষ্ণব ধর্ম্ম প্রচারের পূর্ব্বে ত্রিপুরায় বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচলিত ছিল। এক পুষ্করিণীতে মায়াদেবীর মূর্ত্তি পাওয়া গিয়াছে। ত্রিপুরার পুরাতন রাজধানী উদয়পুরে অনেক বৌদ্ধ নিদর্শন বাহির হইতে পারে। ত্রিপুরার অধিপতি এইরূপ প্রাচীন তথ্যানুসন্ধান ও বাঙ্গালা অভিধান ও ব্যাকরণ সংগ্রহকার্য্যে উৎসাহ প্রকাশ করিয়াছেন। কুমিল্লাতেও পরিষদের শাখা সভাস্থাপনের জন্য পরামর্শ দিয়াছেন। সময় অনুকূল; এখন চেষ্টা করিলেই দেশ জুড়িয়া জাল ফেলা চলিতে পারে। ছাত্রদের উৎসাহ যেন পরিষদের ত্রুটিতে নির্ব্বাপিত না হয়।

সভাপতি মহাশয় [চন্দ্রনাথ বসু] বলিলেন,...রবীন্দ্র বাবুর সাহিত্যে প্রতিভা ও কর্ম্মে উদ্যম উভয়ই বিস্ময়জনক। তিনি যখন মূলে আছেন, তখন ফল লাভ হইবেই।

রবীন্দ্র বাবু পুনরায় বলিলেন, একটি মেলায় দেখিলাম, একটি অল্পবয়স্ক লোক মলিন পরিচ্ছদে দেশী কাপড়ের ও বহির বোঝা ঘাড়ে করিয়া লোকের দ্বারে দ্বারে ঘুরিতেছে। চাষারাও তাহার সম্যক্ আদর করিতেছে। জানিলাম লোকটী ভদ্র সন্তান, ব্রাহ্মণ, স্কুলের ছাত্র। দেখিয়া আমার আশা হইল।[২১]

উল্লেখ্য, 'স্বদেশী' আন্দোলন এখনও শুরু হয়নি, তা আরম্ভ হওয়ার কিছুদিনের মধ্যেই শেষোক্ত দৃশ্যটি বাংলায় খুবই সুলভ হয়ে আসবে।

আষাঢ়-সংখ্যা ভাণ্ডার [১।৩] প্রকাশিত হয়েছিল কিছু দেরিতে, বেঙ্গল লাইব্রেরির ক্যাটালগ অনুযায়ী 9 Jul [রবি ২৫ আষাঢ়]। এই সংখ্যায় রবীন্দ্রনাথের রচনা-তালিকাটি বেশ বড়ো :

১০৭ 'জাপানের প্রতি' দ্র ছন্দ [১৩৮২]। ১৯-২০ ['জাপানি ছন্দ']

১০৮-০৯ 'স্বাধীনশিক্ষা' দ্র শিক্ষা-পরিশিষ্ট ১২।৫২১-২৩

১০৯-১১ 'অহেতুক জলকষ্ট' দ্র স্বদেশী সমাজ [১৩৯৩]। ৭১-৭৩

১১১-১৪ 'বহুরাজকতা' দ্র রাজা প্রজা ১০।৪৪২-৪৪

১২১-২২ 'প্রস্তাব/ইতিহাসকথা' দ্র শিক্ষা-পরিশিষ্ট ১২।৫২০-২১

১২২-২৪ /'শিক্ষাপ্রচারক'

যুরোপীয় যন্ত্রবিদ্যা আয়ত্ত করে জাপানের আর্থিক সমৃদ্ধি ও রাশিয়ার সঙ্গে যুদ্ধ করে রুশ নৌবাহিনীকে বিধ্বস্ত করায় প্রাচ্য দেশগুলির, বিশেষত ভারতের কাছে, জাপানের মহিমা বহুগুণ বর্ধিত হয়। এর আগে ওকাকুরার ব্যক্তিগত সান্নিধ্য লাভ করে জাপানের সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রতি রবীন্দ্রনাথ আকৃষ্ট হন। জাপানী কবিতার ও ছন্দের অনুকরণে রচিত 'জাপানের প্রতি' নিবেদিত তিনটি কবিতায় তিনি তাঁর শ্রদ্ধা ব্যক্ত করলেন। সেদোকা, চোকা ও ইমায়ো ছন্দের অনুকরণে, অথচ 'বাঙালি পাঠকের অভ্যাসের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া নিজের অনুকৃতিগুলির মধ্যে একটু মিলের আভাস' রেখে কবিতাগুলি রচিত।

সরকারী বিদ্যালয়ের উপাধি ছাড়া চাকুরী পাওয়া দুর্লভ, সুতরাং বিদেশী রাজার অধীনতা থেকে দেশের শিক্ষাকে মুক্ত করা কঠিন, এই অভিমতকে অবলম্বন করেই 'স্বাধীনশিক্ষা' প্রবন্ধটি রচিত। রবীন্দ্রনাথ লিখলেন, এই বক্তব্য কেবল উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য—নিম্নশ্রেণীর শিক্ষা লাভ করে যারা সদাগরী অফিস বা জমিদারী সেরেস্তা প্রভৃতিতে চাকুরী গ্রহণ করে, তাদের শিক্ষার ভার দেশবাসীই নিতে পারে। দেশে এই পাঠশালার শিক্ষা চিরকালই স্বাধীন ছিল। সামান্য সরকারী দাক্ষিণ্যের লোভে এই শিক্ষার ভার সরকারকে না দিয়ে দেশবাসীর নিজেই হাতেই নেওয়া উচিত। 'ইহাদের শিক্ষা গোড়া হইতে এমনভাবে দিতে হইবে যাহাতে লোকহিত কাহাকে বলে তাহা ইহারা ভালো করিয়া জানিতে এবং জীবিকা উপার্জনের জন্য হাতে-কলমে সকল রকমে তৈরি হইয়া উঠিতে পারে। পাঠশালায় শিশুবয়সে যে-সকল ভাব, জ্ঞান ও অভ্যাস সঞ্চার করিয়া দেওয়া যায়, বড়োবয়সে বক্তৃতার দ্বারা তাহা কখনোই সম্ভবপর হয় না।'

আমাদের দেশে শিক্ষিত ও অশিক্ষিতের মধ্যে ইতিহাস জ্ঞানের বৈষম্য সবচেয়ে বেশি করে অনুভব করা যায়। এই জ্ঞান না থাকাতেই অশিক্ষিত জনসাধারণ শিক্ষিত মানুষের ভাবনা-চিন্তা ও কাজকর্মে অংশ গ্রহণ করতে পারছে না। একসময়ে যাত্রা ও কথকতার সাহায্যে দেশে লোকশিক্ষার ব্যবস্থা ছিল। 'ইতিহাসকথা' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ 'প্রস্তাব' করলেন, পৃথ্বীরাজ, গুরুগোবিন্দ, শিবাজি, আকবর প্রভৃতির ইতিহাসকে অবলম্বন করে যাত্রাভিনয় এবং আনন্দমঠ, রাজসিংহ প্রভৃতি উপন্যাস সুগায়ক কথককে দিয়ে পাঠ করানোর দ্বারা লোকের মনোরঞ্জন ও লোকশিক্ষার আয়োজন করা যেতে পারে।

'শিক্ষাপ্রচারক' রচনাটি ঠিক রবীন্দ্রনাথের লেখা নয়। শিক্ষাবিভাগের অভিজ্ঞ কর্মী ভূতনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় শিক্ষাপ্রচারকের ভূমিকা নিয়ে গ্রামে গ্রামে লোকশিক্ষা প্রসারের ক্ষেত্রে কী কী কাজ করা যায় সে-সম্পর্কে যে পাঁচটি প্রস্তাব করেন, সেইগুলিকেই রবীন্দ্রনাথ এই রচনায় উদ্ধৃত করেছেন। তাঁর মতে, 'একটি বিশেষ গ্রাম মনোনীত করিয়া লইয়া সেইখানে অন্তত পরীক্ষাস্বরূপ কিছুকাল এই সকল কার্য্য আরম্ভ করিয়া দিলে দেশের হিতৈষিগণ অভিজ্ঞতা ও আত্মপ্রসাদ লাভ করিতে পারিবেন।'

জ্যৈষ্ঠ-সংখ্যায় 'শ্রীমতী কনিষ্ঠা' ছদ্মনামে রবীন্দ্রনাথ 'জলকষ্ট' নামে একটি প্রবন্ধ লিখেছিলেন। বর্তমান সংখ্যায় তিনি 'শ্রীমতী মধ্যমা' ছদ্মনামে লিখিত 'অহেতুক জলকষ্ট' প্রবন্ধে বিষয়টিকে সামাজিক দৃষ্টিকোণ থেকে উপস্থাপিত করলেন। দেশে জলকষ্ট তো আছেই, কিন্তু প্রামাণ্য শাস্ত্রের বিধান না হওয়া সত্ত্বেও এদেশে একাদশীর দিনে বিধবার জন্য নিরম্বু উপবাসের প্রথা বজায় রেখে যে অহেতুক জলকষ্ট সৃষ্টি করা হয়েছে শ্রীমতী মধ্যমার জবানীতে তার যৌক্তিকতা বিষয়ে প্রশ্ন তুলে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন : 'আমাদের অনেক দুঃখকষ্টের প্রতিকারের জন্য দেশের শিক্ষিত লোকে গবর্মেন্টের কাছে দাবি করিয়া থাকেন। তখন তাঁহাদের

মনের উত্তেজনা ও ভাষার অসংযম দেখিখয়া আশ্চর্য হইতে হয়। দেশের দুঃখে বাস্তবিকই যদি তাঁহারা এত অধিক ব্যথা পান, তবে যে-সকল দুঃখ নিজেরা দূর করিতে পারেন সাহস করিয়া তাহা দূর করিতে চেষ্টা করুন।' শ্রীমতী কনিষ্ঠাকে তিনি অগ্রে নিজের ঘরে যে অনাবশ্যক অন্যায় জলকষ্ট আছে তা নিবারণ করার জন্য সর্বশক্তি প্রয়োগ করার উপদেশ দিয়েছেন, 'তবে দেশের জলাভাবের কথা উত্থাপন করিবার অধিকার তাঁহার জন্মিবে এবং কর্তব্যবিমুখ নরনারীকেও সবলে তিরস্কার করিতে পারিবেন।'

ইংরেজ জাতি গণতন্ত্রপ্রিয়, সুতরাং প্রত্যক্ষভাবে তাদের প্রভাবিত করতে পারলে ভারতে ইংরেজশাসনকে অনেকটা সংযত করতে পারা যাবে, এই আশায় বহু অর্থব্যয়ে কংগ্রেসের ব্রিটিশ কমিটিকে লালন করা হত —'আমরা মনে করিতেছি, বিলাতে গিয়া যদি দ্বারে দ্বারে দুঃখ নিবেদন করিয়া ফিরি তবে একটা সদ্‌গতি হইতে পারে।' কিন্তু রবীন্দ্রনাথ মনে করিয়ে দিয়েছেন, 'যাহার বিরুদ্ধে নালিশ আমরা তাহার কাছেই নালিশ করিতে যাইতেছি।' আগে ভারতের সিংহাসনে একজন বাদশাহ ছিলেন, তিনি জানতেন সমগ্র ভারতবর্ষ তাঁরই —এখন ইংরেজজাত জানে ভারতবর্ষ তাদের সকলেরই, 'একটা রাজপরিবারমাত্র নহে, সমস্ত ইংরেজজাতটা এই ভারতবর্ষকে লইয়া সমৃদ্ধিসম্পন্ন হইয়া উঠিয়াছে।' বাদশাহের আমলে এদেশেরই লোক উজির বা সেনাপতি হত, কিন্তু এখন ইংলণ্ড সমস্ত ইংরেজকে অন্ন দিতে পারে না বলে ভারতেই তাদের জন্য অন্নসত্র খোলা হয়েছে, ফলে দেশের লোকের পক্ষে বড়ো চাকরি দুর্লভ হয়ে পড়েছে। এই বাস্তব অবস্থাকে 'বহুরাজকতা' আখ্যা দিয়ে রবীন্দ্রনাথ বিদ্রূপ করে লিখলেন : 'অতএব কন্‌গ্রেসের যদি কোনো সংগত প্রার্থনা থাকে তবে তাহা এই যে, সম্রাট এডোআর্ডের পুত্রই হউন, স্বয়ং লর্ড কার্জন বা কিচেনারই হউন, অথবা ইংলিশম্যান-পায়োনিয়রের সম্পাদকই হউন, ভালো মন্দ বা মাঝারি যে-কোনো একজন ইংরেজ বাছিয়া পার্লামেন্ট্‌ আমাদের রাজা করিয়া দিল্লির সিংহাসনে বসাইয়া দিন। একটা দেশ যতই রসালো হউক্‌-না, একজন রাজাকেই পালিতে পারে, দেশসুদ্ধ রাজাকে পারে না।'

'রাজা প্রজা' গ্রন্থে প্রবন্ধটির দুটি অনুচ্ছেদ বর্জন করা হয়েছে।

বঙ্গদর্শন, আষাঢ় ১৩১২ [৫।৩] :

৯৯-১০৬ 'নৌকাডুবি' ৬৭ দ্র নৌকাডুবি ৫।৪২৪-৩২ [৬১-৬২]

১৪২-৪৩ 'শেষ খেয়া' ['দিনের শেষে ঘুমের দেশে'] দ্র খেয়া ১০।৯৭-৯৮

নৌকাডুবি উপন্যাস আরম্ভ হয়েছিল বৈশাখ ১৩১০-সংখ্যায়, ২৭টি সংখ্যায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়ে বর্তমান সংখ্যায় সম্পূর্ণ হল। গ্রন্থাকারে প্রকাশের সময়ে বহু অংশ, এমন-কি কয়েকটি পরিচ্ছেদ, বর্জিত হয়। ১ আষাঢ় ১৩১৩ [শুক্র 15 Jun 1906] রবীন্দ্রনাথ এ-সম্পর্কে দীনেশচন্দ্র সেনকে লেখেন : 'নৌকাডুবিকে নানা স্থানে খর্ব্ব করিয়া তাহাকে বেশ একটু আঁটসাঁট করিবার চেষ্টা করিয়াছি। এরূপ স্থলে তাহার অনেক সুরচিত সুপাঠ্য অংশও নিশ্চয়ই বাদ পড়িয়াছে। কিন্তু বাগান সাজাইতে হইলে আবশ্যক মত অনেক ভাল গাছও ছাঁটিয়া ফেলিতে হয়—এ সকল কাজ নিপুণভাবে করিতে হইলে নিষ্ঠুর ভাবেই করিতে হয়। নিজের লেখার সম্বন্ধে সুবিচার করা শক্ত—তাহার কারণ, অন্ধ মমত্ব বাধা দেয়—কিন্তু ছাঁটিবার বেলায় সেই মমত্ব অতি ছেদনের হাত হইতে রক্ষা করে। আমি যদি লেখক না হইয়া সমালোচক হইতাম হয়ত আরো অনেক বেশি কাটিতাম।'[২২] সত্যই অনেক 'সুরচিত সুপাঠ্য' অংশ গ্রন্থে বাদ পড়েছে, এই অংশগুলি পরিশিষ্টে সংকলিত হওয়া দরকার।

‘শেষ খেয়া’ কবিতাটির পাণ্ডুলিপিতেও [Ms. 110(i)] রচনাকাল ‘আষাঢ় ১৩১২’। বঙ্গদর্শন প্রকাশিত হয় 18 Jun [রবি ৪ আষাঢ়], সুতরাং কবিতাটি ১।২ আষাঢ়ে রচিত বলে অনুমান করা যেতে পারে। দ্বিতীয় স্তবকটি দিয়ে রচনা শুরু হয়েছিল।

ভারতী, আষাঢ় ১৩১২ [২৯।৩] :

২৭৮ ‘খেয়াল খাতা/নীতিজ্ঞ করুক নিন্দা অথবা স্তবন’ দ্র রূপান্তর। ৮৯

হেবর্‌লিনের কাব্যসংগ্রহ গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত ভর্তৃহরির ‘নিন্দন্তু নীতিনিপুণা যদি বা স্তুবন্তু’ শ্লোকটি রবীন্দ্রনাথ উক্ত গ্রন্থের মার্জিনে অনুবাদ করে রেখেছিলেন, সেখান থেকে উদ্ধার করে অনুবাদটি ‘খেয়াল খাতা’য় পরিবেশিত হয়। তিনি পরেও অন্তত দু’বার শ্লোকটি অনুবাদ করেন।

সঙ্গীত-প্রকাশিকা, আষাঢ় ১৩১২ [৪।১০] :

১৯৯-২০২ বেহাগ-একতালা। আগে চল্ ভাই আগে চল্ স্বর ৪৭

২০৪-০৬ বাহার-তাল ফের্‌তা। সখি সাধ করে যাহা দেবে দ্র ঐ ৪৮

২১২-১৪ মিশ্র কেদারা-চৌতাল। আজি কোন্ ধন বিশ্বে আমারে দ্র ঐ ২২

২১৫-১৬ নট্ মল্লার-চৌতাল। চির দিবস নব মাধুরী নব শোভা দ্র ঐ ২২

প্রথম গানটির স্বরলিপি করেন ইন্দিরা দেবী; অপরগুলির স্বরলিপিকারের নাম অনুল্লেখিত।

জ্যৈষ্ঠের শেষ সপ্তাহে শান্তিনিকেতন থেকে এসে রবীন্দ্রনাথ আবার সেখানে ফিরে যান ১০ শ্রাবণ [বুধ 26 Jul]। এর মধ্যে অধিকাংশ সময়ই তিনি ব্যস্ত থেকেছেন ত্রিপুরারাজ্যের সমস্যা সমাধানে। ত্রিপুরা থেকে ফিরে এসেও তিনি এই বিষয়ে ভাবনাচিন্তা ও শলাপরামর্শ করছেন, তাও আমরা দেখেছি। সন্দেহ ও অবিশ্বাসের আবহাওয়ায় ডাকে পত্র পাঠাননাও তিনি নিরাপদ বোধ করছিলেন না। বাধাকিশোরও যতীন্দ্রনাথ বসুর হাত দিয়ে তাঁকে চিঠি পাঠিয়েছেন। ৯ শ্রাবণ রবীন্দ্রনাথ লিখছেন ‘যতীর হস্তে মহারাজের পত্র পাইয়াছি। এ কয়দিন রমণীকে লইয়া প্রত্যহ আলোচনা করা গিয়াছে তাহার বিস্তারিত বিবরণ যতীর নিকট পাইবেন। রমণীমোহনকে নিয়োগের কয়েকটি সর্তের উল্লেখ করে তিনি লিখেছেন : ‘মহারাজকে আমি পুনশ্চ জানাইতেছি রমণীকে রাজকর্ম্মে নিযুক্ত করিলে তাঁহার বিশ্বস্ততা, দক্ষতা, দূরদর্শিতা ও সহৃদয়তাগুণে মহারাজ নিশ্চয়ই সন্তুষ্ট এবং সর্ব্বতোভাবে নিশ্চিন্ত হইতে পারিবেন। ছদ্মবেশী শত্রুদলের সঙ্কটজাল হইতে মহারাজকে সম্পূর্ণ নিষ্কৃতি দান করিতে পারিলে আমিও চরিতার্থ হইব।’[২৩] মহিমচন্দ্র দেববর্মা তাঁর বিশিষ্ট বন্ধু ও প্রীতিভাজন ছিলেন। কিন্তু কিছু-কিছু ঘটনা থেকে মহিমচন্দ্রকে উক্ত ‘ছদ্মবেশী শত্রুদলের’ একজন বলে ধারণা হওয়ায় তিনি আন্তরিক বেদনা অনুভব করেছেন, অথচ মহারাজের মঙ্গলকামনায় এই মনোভাব গোপনও করতে পারেননি। এই দ্বিধার যন্ত্রণা থেকে তিনি ১৬ শ্রাবণ [মঙ্গল 1 Aug] রাধাকিশোরকে লিখেছেন : ‘মহিমের ক্ষুদ্রতা ও দুর্ব্বলতা সম্বন্ধে আমার বারম্বার সন্দেহ জন্মিলেও তাহাকে বন্ধু হিসাবে আমি পরিত্যাগ করি নাই। সুতরাং তাহার সহিত আমার বিশ্বাসের সম্বন্ধ আছে। গোপনে এই বিশ্বাসকে ভঙ্গ করা আমার পক্ষে নিরতিশয় গর্হিত কার্য্য হইয়াছে—সেজন্য আমি অন্তর্য্যামীর নিকট দণ্ডভোগ করিতেছি। অতএব মহারাজ দয়া করিয়া আমার এই পত্রখানি মহিমকে দেখাইবেন। আমি যদি অবসর পাইতাম তবে মহিমের সম্মুখেই কোনো না কোনোদিন আমি আমার

মনের সমস্ত খেদ ও সংশয় স্পষ্ট করিয়া জানাইতাম কিন্তু সেরূপ অবকাশ আমি পাই নাই।'* এই সংকটের সমাধান হয়েছিল, মহিমচন্দ্রকে লেখা রবীন্দ্রনাথের পরবর্তীকালের পত্রে সৌহার্দ্যের অভাব নেই।

কিন্তু ত্রিপুরারাজ্যের সংকট নিয়ে যে সময়ে রবীন্দ্রনাথের উদ্বেগ দেখা যায়, বাংলাদেশের সংকট নিয়ে সেই সময়ে তিনি সম্পূর্ণ নীরব। বঙ্গভঙ্গের যে প্রস্তাব 1903-তে প্রকাশিত হয়েছিল, পরবর্তীকালে গভর্মেন্ট সে বিষয়ে চুপচাপ থাকায় বঙ্গবাসী ভেবেছিল প্রস্তাবটি পরিত্যক্ত হয়েছে। কিন্তু কূটকৌশলী কার্জন লণ্ডনে গিয়ে ভারতসচিব ব্রডরিককে [Brodrick] স্বমতে আনয়ন করেন। কার্জন দ্বিতীয়বার ভাইসরয় হয়ে Dec 1904-এ ভারতে এসে তাঁর পরিকল্পনাকে চূড়ান্ত রূপ দিতে থাকেন। 5 Jul [বুধ ২১ আষাঢ়] লণ্ডন থেকে রয়টার টেলিগ্রাম করে জানায়, বঙ্গবিভাগ সম্পর্কে ভারত সরকারের প্রস্তাবে ভারতসচিব সম্মতি দিয়েছেন।[২৪] 19 Jul [বুধ ৩ শ্রাবণ] ভারত সরকার 'Extraordinary' গেজেটে বঙ্গবিভাগ সম্পর্কে বিস্তৃত প্রস্তাব প্রকাশ করলে পরের দিন বেঙ্গলী পত্রিকা কালো বর্ডার দিয়ে আড়াই কলম-ব্যাপী প্রস্তাবটি মুদ্রিত করে।

সংবাদপত্রের সচেতন পাঠক রবীন্দ্রনাথ বিষয়টি জানতে পারেননি এমন হতেই পারে না, কিন্তু তিনি এ-বিষয়ে আশ্চর্য নীরবতা অবলম্বন করেন। মহর্ষির মৃত্যুর পর 'সরকারী ক্যাশবহি'র বিলোপ ঘটে, রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব ক্যাশবহিতেও আগে যে-রীতিতে তাঁর বিভিন্ন জায়গায় গতায়াতের বিবরণ লিপিবদ্ধ হত সাময়িকভাবে তাও বন্ধ হয়ে যায়। যার ফলে কলকাতায় থাকলে এই ধরনের হিসাবের মাধ্যমে তাঁর যে ব্যস্ততার ছবিটি ফুটিয়ে তোলা যেত সেটি থেকে আমরা বঞ্চিত হয়েছি। বর্তমান পর্যায়ে তাঁর লেখা চিঠিপত্রও যথেষ্ট পরিমাণে রক্ষিত হয়নি, সুতরাং পত্রে তিনি যদি কোনো তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে থাকেনও তা জানার কোনো উপায় নেই। বেঙ্গল লাইব্রেরির ক্যাটালগ অনুযায়ী শ্রাবণ-সংখ্যা ভাণ্ডার 22 Sep [শুক্র ৬ আশ্বিন] প্রকাশিত হয়, যা একেবারেই অবিশ্বাস্য, কারণ উক্ত ক্যাটালগে ভাদ্র-আশ্বিন সংখ্যা প্রকাশের তারিখও একই। কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার, উক্ত শ্রাবণ-সংখ্যায় তাঁর একটিও রচনা নেই। আরও আশ্চর্যের ব্যাপার, 7 Aug [সোম ২২ শ্রাবণ] বঙ্গভঙ্গের প্রস্তাবের বিরুদ্ধে টাউন হলে যে বিরাট জনসভা হয়, সেখানে রবীন্দ্রনাথের উপস্থিতির কোনো প্রমাণ নেই।

আমরা বলেছি, ১০ শ্রাবণ [বুধ 26 Jul] রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনে যান। তার আগের দিনের খরচ : 'বঃ Dr. Laha & Sons দং দাঁত বাঁধান ২টার মূল্য শোধ...১০্'। এইদিন তিনি ভূপেন্দ্রনাথ সান্যালকে একটি পোস্টকার্ডও লেখেন, কিন্তু প্রকাশিত পত্রাবলীর মধ্যে চিঠিটিকে শনাক্ত করা যায়নি।

খেয়া-র কবিতার সূত্রপাত হয়েছিল চৈত্র ১৩১১-তে সরলা দেবীর তাগিদে 'ভারতীর খেয়াল' ['মেঘ' : খেয়া ১০।১২৬-২৭] কবিতা লিখে। ১।২ আষাঢ় লেখেন 'শেষ খেয়া' [দ্র ঐ ১০।৯৭-৯৮]। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এই কবিতাগুচ্ছের সূত্রপাত ধরা যায় ৭ শ্রাবণ [রবি 23 Jul] বা তার আগে—৭ শ্রাবণ তিনি দুটি কবিতা লেখেন : 'মুক্তিপাশ' [দ্র ঐ ১০।১০৭-০৮] ও 'দুঃখমূর্তি' [দ্র ঐ ১০।১০৬], পাণ্ডুলিপির সাক্ষ্যে জানা যায় 'ঘাটের পথ' [দ্র ঐ ১০।৯৮-১০০] তার আগে লেখা।

এরপর শ্রাবণ মাসের বাকি দিনগুলিতে আরও ন'টি কবিতা লেখা হয়ে যায়।

'ঘাটের পথ', 'মুক্তিপাশ' ও 'দুঃখমূর্তি' কবিতা তিনটি লেখা হয় Jan 1898-এর একটি বড়ো আকারের ডায়ারির দুটি পাতায় [রবীন্দ্রভবনে রক্ষিত ফাইল-খেয়া]। এটির সূচনা শব্দচয়ন দিয়ে—'অ' থেকে 'ঔ' স্বরবর্ণগুলির উচ্চারণ অনুসরণ করে 'কুম, কম্‌লা, কমি। বর, বরণ।...ডাল, ডালা, ডালনা।...চিল, চিন্তা,...

কুল, কুলো, কুল্‌কুচো।...তেল, তেলা, তেলি।...দ্যাখ্‌, দ্যাথ্‌না।...দই, কৈ,...গোল, গোলা, গোলমাল... বউ, বৌঝি' ইত্যাদি শব্দ লিখে রাখা হয়েছে। কোন্‌ প্রবন্ধ রচনার জন্য শব্দগুলি সংগৃহীত হয়েছিল বলা শক্ত, হয়তো 'বীম্‌সের বাংলা ব্যাকরণ' [ভারতী, পৌষ ১৩০৫] প্রবন্ধে বাংলা শব্দে হসন্তের ব্যবহার পর্যালোচনার জন্য এই শব্দতালিকা প্রস্তুত হয়। ডায়ারির বাকি অংশের কী গতি হয়েছিল বলা যায় না, কিন্তু এই শব্দতালিকার নীচেই 'ঘাটের পথে' কবিতাটি আরম্ভ হয়েছে, সপ্তম স্তবকটি শেষ হয় পরপৃষ্ঠায় [ডায়ারির মুদ্রিত তারিখ 1-5 Jan 1898]—কিন্তু কবিতাটির সম্পূর্ণ পাণ্ডুলিপি পাওয়া যায়নি, নিশ্চয়ই তা হারিয়ে-যাওয়া পরবর্তী পাতায় সমাপ্ত হয়েছিল। ডায়ারির প্রাপ্ত দ্বিতীয় পাতাটি 13-17 Jan তারিখের—যাতে প্রথমে 'মুক্তিপাশ' ও পরে 'দুঃখমূর্তি' কবিতা-দুটি স্থান-কাল নির্দেশ-সহ লেখা হয়। মধ্যবর্তী পৃষ্ঠাটিতে কী লেখা হয়েছিল বলা সম্ভব নয়—'মেঘ' ছাড়া খেয়া-র অপর কবিতাগুলির পাণ্ডুলিপি পাওয়া গিয়েছে।

রবীন্দ্রনাথের কবিজীবনে বাস্তব ও কল্পনা কোথাও কোথাও সমসূত্রে বিধৃত হলেও বাস্তব ঘটনা দিয়ে তাঁর কবিতার ভাবকে ব্যাখ্যা করা বিভ্রান্তিজনক হতে পারে। এমনও দেখা দেখা গেছে, বাস্তব ঘটনার প্রতিক্রিয়ায় কোনো কবিতার সূত্রপাত হলেও পরক্ষণেই কল্পনার অনুরঞ্জনে বা গভীর ভাবদৃষ্টির আবির্ভাবে তার সম্পূর্ণ রূপান্তর ঘটেছে। সেই কারণেই রবীন্দ্রনাথের কবিজীবনকে অনুসরণ করা কঠিন, বহুবর্ণরঞ্জিত ও অসংখ্য মহলে বিভক্ত সেই কাব্যলোকের গোলকধাঁধায় ক্রমবিকাশ ও পরিণতির পথটি চিহ্নিত করা দুরূহ। এই সমস্যা আরও তীব্র হয়ে দেখা দিয়েছে খেয়া-র কবিতাগুচ্ছ থেকে। মানসী, সোনার তরী, চিত্রা-য় সমস্যা নেই সেকথা আমরা বলছি না, কিন্তু সেখানে মানব ও প্রকৃতির মধ্যে তাঁর মন সমভাবে বিভক্ত হওয়ায় গূঢ়সঞ্চারী কল্পনাকেও বুঝে নেওয়া অপেক্ষাকৃত সহজ। কিন্তু খেয়া থেকে তাঁর কবিতাবলী এমন একধরনের অধ্যাত্মচেতনার রূপকে নিজেদের আবৃত করেছে যে নিছক কাব্যরসবোধ দিয়ে তাদের অবগুণ্ঠন মোচন করা দুঃসাধ্য। বিশেষত সমকালীন কর্মজীবন, ও ভাবজীবনের মধ্যে ব্যবধান এত বেশি যে পারাপার করা দুরূহ।

শ্রাবণ ১৩১২-তে সাময়িকপত্রে রবীন্দ্র-রচনার প্রকাশ-সূচী নিতান্তই সংক্ষিপ্ত। 18 Jul [মঙ্গল ২ শ্রাবণ]-তে প্রকাশিত শ্রাবণ-সংখ্যা বঙ্গদর্শন-এ [৫।৪] তাঁর একটি মাত্র রচনা মুদ্রিত হয় :

১৪৭-৫৬ 'দেশীয় রাজ্য' দ্র আত্মশক্তি ৩।৬২৬-৩৬

সঙ্গীত-প্রকাশিকা, শ্রাবণ ১৩১২ [৪।১১] :

২২১-২৫ মিশ্র হাম্বীর-তাল ফেরতা। আনন্দ-ধ্বনি জাগাও গগনে দ্র স্বর ৪৭

২৩৩-৩৫ মিশ্র সুরট-একতালা। ওগো দেখি আঁখি তুলে চাও দ্র ঐ ৪৮

২৩৭-৩৯ ভৈরবী-কাওয়ালি। বিধি ডাগর আঁখি যদি দিয়েছিলে দ্র ঐ ৫১

প্রথম গানটির স্বরলিপি করেন ইন্দিরা দেবী, বাকি দুটির স্বরলিপিকারের নাম উল্লিখিত হয়নি।

শান্তিনিকেতনে যাওয়ার পর রবীন্দ্রনাথ খেয়া-র কবিতা লিখতে শুরু করেন ১৩ শ্রাবণ [শনি 29 Jul]; এইদিন তিনি দুটি কবিতা লিখলেন :

'শুভক্ষণ' ['ওগো মা, রাজার দুলাল যাবে আজি মোর'] দ্র বঙ্গদর্শন, অগ্র°। ৩৮৩-৮৪; খেয়া ১০।১০১-০২

'ত্যাগ' [ওগো মা, রাজার দুলাল গেল চলি মোর'] দ্র বঙ্গদর্শন, অগ্র°। ৩৮৪-৮৫; খেয়া ১০।১০২-০৩

এখন থেকে কিছুদিন তাঁর কবিতা লেখার বাহন এক্সারসাইজ বুক মাপের [20 [15.7 cm.] রুল-টানা একটি খাতা [Ms. 110 (i)]। এই খাতায় প্রথম কবিতাটি লেখা হয়েছিল 'শেষ খেয়া', শেষ কবিতা ১৮ আষাঢ় ১৩১৩ [সোম 2 Jul 1906] তারিখে লিখিত খেয়া-র উৎসর্গ-কবিতা—খাতাটি উলটে ধরে অন্তর্বর্তী সময়ে অনেকগুলি গানও লেখা হয়েছে। কানাই সামন্ত বিশ্বভারতী পত্রিকা-র বৈশাখ-আষাঢ় ১৩৭৮-সংখ্যায় [পৃ ৩৭১-৮৮] পাণ্ডুলিপিটির বিস্তৃত পরিচয় দিয়েছেন।

১৪ শ্রাবণ [রবি 30 Jul] লেখা হল 'প্রভাতে' ['এক রজনীর বরষণে শুধু'] কবিতাটি [দ্র খেয়া ১০। ১০৮-১০]। কানাই সামন্ত অনুমান করেছেন, মজুমদার পুঁথি-তে স্মরণ-এর কবিতাগুচ্ছ লেখার সময়ে লিখিত অসমাপ্ত কবিতা 'এক বরষার রাত্রে এ আমার অশ্রুসরোবর' [৭-১১ পৌষ ১৩০৯-এর মধ্যে লেখা] বর্তমান কবিতাটির অগ্রদূত।[২৫] বর্তমান কবিতার পাণ্ডুলিপিতেও কবিচিত্তের দোলাচলতা দেখা যায়। পাণ্ডুলিপিতে এর স্তবকবিন্যাস এই রকম : ১, ৩, ৪ [বর্জিত], ২ ও ৫—৪-চিহ্নিত স্তবকের পরেই রচনার তারিখ লিখিত হয়েছিল, তার পরে দ্বিতীয় ও পঞ্চম স্তবক লেখা হয়। প্রতিটি স্তবকের শেষে ৪ ছত্রের একটি ধুয়া ছিল—পেনসিলে লেখা ছত্রগুলির উপরে পেনসিল বুলিয়ে অলংকৃত নকশায় ছত্রগুলি দুর্বোধ্য করে দেওয়া হয়েছে। সবাই জানেন, পরবর্তীকালে পাণ্ডুলিপির কাটাকুটির মধ্য দিয়ে রবীন্দ্রনাথ চিত্রকলার জগতে প্রবেশ করেছিলেন। কিন্তু তার সূত্রপাত খেয়া-র পাণ্ডুলিপিতে। বিভিন্ন ছত্রের কেটে দেওয়া শব্দগুলিকে রেখার সাহায্যে জুড়ে দিয়ে ফুল-লতা-পাতার নকশা রচনা করা এখানেই আরম্ভ হয়। অবশ্য পরবর্তীকালের নকশার তুলনায় এগুলি সরলতর।

উক্ত ১৪ শ্রাবণই কলকাতায় রবীন্দ্রনাথের একটি কর্তব্যকর্ম ছিল। 28 Jul-এর বেঙ্গলী-তে খবর বেরিয়েছিল: 'The Third Annual Prize, Medal and Certificate Distribution Ceremony of Dawn Society will be held under the Presidency of Sir Gooroo Das Banerjee at the Calcutta University Institute on Sunday, the 30th at 5-30 P.M. ...Mr. S. K. Ratcliffe, ...Sister Nivedita and Babu Rabindra Nath Tagore will take part in the proceedings.' রবীন্দ্রনাথ এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকতে পারেননি, তিনি তখন শান্তিনিকেতনে।

১৫ শ্রাবণ [সোম 31 Jul] রবীন্দ্রনাথ দুটি কবিতা লিখলেন :

'বালিকা বধূ' ['ওগো বর, ওগো বঁধু'] দ্র বঙ্গদর্শন, মাঘ। ৫০৫-০৭; খেয়া ১০। ১১২-১৪

'খেয়া' ['তুমি এ পার-ও পার কর কে গো'] দ্র বঙ্গদর্শন, জ্যৈষ্ঠ ১৩১৩।৮৯; খেয়া ১০।১৮৬-৮৭

সামান্য কিছু পাঠান্তর-সহ তিনি এর একটি গীতরূপ প্রস্তুত করেন দ্র গীত ১।৬৮; স্বর ৬০।

বেঙ্গলী পত্রিকার Aug 3 [বৃহ ১৮ শ্রাবণ]-সংখ্যায় আর-একটি সংবাদ প্রকাশিত হয়; 'An address in connection with the present agitation against the Partition...will be delivered today at 5 p.m. at the Star Theatre by Bepin Chandra Pal. Rabindra Nath Tagore is expected to preside. Subject :—Self-control and self-assertion.' রবীন্দ্রনাথ এবারেও বক্তা ও উদ্যোক্তাদের হতাশ করেন। পরের দিনের অমৃতবাজার পত্রিকা থেকে জানা যায়, ব্যারিস্টার পি. মিত্র সভাপতিত্ব করেছিলেন।

রবীন্দ্রনাথের পরবর্তী কবিতা ২৫ শ্রাবণ [বৃহ 10 Aug]-এ লেখা 'অনাবশ্যক' ['কাশের বনে শূন্য নদীর তীরে' দ্র খেয়া ১০।১১৯-২০]। ১৬ শ্রাবণ [মঙ্গল 1 Aug] তিনি শান্তিনিকেতন থেকে রাধাকিশোর মাণিক্যকে

একটি দীর্ঘ পত্র লিখেছেন, 'অনাবশ্যক' কবিতার্টিও শান্তিনিকেতনে লেখা। ১৮ শ্রাবণ স্টার থিয়েটারের সভায় সভাপতিত্ব করবেন ঘোষণা সত্ত্বেও তিনি উপস্থিত হননি। অতঃপর 7 Aug [সোম ২২ শ্রাবণ] কলকাতার টাউন হলে বঙ্গভঙ্গ প্রস্তাবের বিরুদ্ধে যে বিরাট সভা হয়, সংবাদপত্রে প্রকাশিত বিবরণে তাতেও রবীন্দ্রনাথের উপস্থিতির উল্লেখ নেই,—বিশেষত এই সভায় আন্দোলন পরিচালনার জন্য যে স্ট্যান্ডিং কমিটি গঠিত হয়, তাতে যোগেশচন্দ্র চৌধুরী, জানকীনাথ ঘোষাল, সত্যেন্দ্রনাথ, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, গগনেন্দ্রনাথ প্রভৃতির নাম অন্তর্ভুক্ত হলেও রবীন্দ্রনাথের নাম গৃহীত হয়নি। এই আন্দোলন থেকে তিনি নিজেকে সরিয়ে রেখেছেন, তথ্যগুলি এই সত্যের প্রতি অঙ্গুলিনির্দেশ করে। সম্ভবত ঝড়ের কেন্দ্রস্থলে না থেকে দূর থেকে আন্দোলনের গতিপ্রকৃতিটি তিনি বুঝে নিতে চাইছিলেন, যাতে অবস্থা অনুযায়ী ব্যবস্থার পরামর্শ দেওয়া সম্ভব হয়।

২৬ শ্রাবণ [শুক্র 11 Aug] রবীন্দ্রনাথ লেখেন 'অনাহত' ['দাঁড়িয়ে আছ আধেক-খোলা' দ্র বঙ্গদর্শন, ফাল্গুন। ৫৪২-৪৪; খেয়া ১০।১১৫-১৭]। কবিতাটির ৫ম স্তবকের পরেই স্থান-কাল লেখা হয়েছিল, কেটে দিয়ে পরে ৬ষ্ঠ স্তবকটি সংযোজিত হয়।

বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের প্রথম ঢেউটি চলে যাবার পর রবীন্দ্রনাথ কলকাতায় এলেন ২৭ শ্রাবণ [শনি 12 Aug]—'শ্রীযুক্ত খোদ বাবু মহাশয় গত ২৭ শ্রাবণ বোলপুর হইতে আগমন করার পাথেয় ব্যায়' তাঁর নিজস্ব ক্যাশবহিতে ১৫ ভাদ্রের হিসাব থেকে তথ্যটি জানা যায়।

কবিতার ধারা এখানে এসেও চলেছে; ২৮ শ্রাবণ [রবি 13 Aug] 'আগমন' ['তখন রাত্রি হল' দ্র বঙ্গদর্শন, আশ্বিন। ২৬৭-৬৯; খেয়া ১০।১০৩-০৫] ও ২৯ শ্রাবণ [সোম 14 Aug] 'বাঁশি' ['ঐ তোমার ঐ বাঁশিখানি' দ্র খেয়া ১০।১১৭-১৯] লেখার পর সাময়িক বিরতি হয়।

'ব্রতধারণ' [দ্র আত্মশক্তি ৩।৬২০-২৫] প্রবন্ধটি তিনি মেয়ের জবানীতে লেখেন এই শ্রাবণ মাসেই। নিশ্চিত করে বলা সম্ভব নয়, তবে ভাগিনেয়ী হিরন্ময়ী দেবীর অনুরোধে তিনি প্রবন্ধটি লিখে থাকতে পারেন —সখিসমিতির উত্তরসূরী মহিলা শিল্পসমিতির সঙ্গে হিরন্ময়ী দেবীর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। 19 Aug [শনি ৩ ভাদ্র] তারিখে প্রকাশিত ভাদ্র-সংখ্যা বঙ্গদর্শন-এ [পৃ ২৮৮-৩৩] 'কোন "স্ত্রীসমাজে" জনৈক-মহিলা-কর্তৃক পঠিত' টীকা-সহ প্রবন্ধটি মুদ্রিত হয়। বর্তমান আন্দোলন সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের বক্তব্য এই প্রবন্ধেই প্রথম প্রকাশিত হল। কিন্তু মেয়ের জবানীতে প্রবন্ধটি লিখিত হওয়ায় বক্তব্যটি ঈষৎ তির্যক্ রূপ লাভ করেছে : 'আমরা ইতিহাসে পড়িয়াছি, যুদ্ধের সময় রাজপুত মহিলারা অঙ্গের ভূষণ, মাথার কেশ দান করিয়াছে; তখন সুবিধা বা সৌন্দর্যচর্চার কথা ভাবে নাই। ইহা হইতে আমরা এই শিখিয়াছি যে, জগতে স্ত্রীলোক যদি বা যুদ্ধ না করিয়া থাকে, ত্যাগ করিয়াছে; সময় উপস্থিত হইলে ভূষণ হইতে প্রাণ পর্যন্ত ত্যাগ করিতে কুণ্ঠিত হয় নাই। কর্মের বীর্য অপেক্ষা ত্যাগের বীর্য কোনো অংশেই ন্যুন নহে।...আজ আমাদের বঙ্গদেশ রাজশক্তির নির্দয় আঘাতে বিক্ষত হইয়াছে, আজ বঙ্গরমণীদের ত্যাগের দিন। আজ আমরা ব্রতগ্রহণ করিব। আজ আমরা কোনো ক্লেশকে ডরিব না, উপহাসকে অগ্রাহ্য করিব, আজ আমরা পীড়িত জননীর রোগশয্যায় বিলাতের সাজ পরিয়া শৌখিনতা করিতে যাইব না।' কিন্তু এরই মধ্যে বয়কট-আন্দোলন সম্পর্কে তাঁর স্বতন্ত্র দৃষ্টিভঙ্গিও ব্যক্ত হয়েছে : 'আমাদের অনেকে আজকাল যে বিলাতির পরিবর্তে দেশী জিনিস ব্যবহার করিতে ব্যগ্র হইয়াছেন তাহার কারণ এ নয় যে, তাঁহারা বিলাতকে দেউলে করিয়া দিতে চান। বস্তুত, আমাদের এই-যে চেষ্টা ইহা কেবল আমাদের মনের ভাবকে বাহিরে মূর্তিমান করিয়া রাখিবার চেষ্টা। আমরা সহজে না হউক, অন্তত বারংবার

আঘাতে ও অপমানে পরের বিরুদ্ধে নিজেকে যে বিশেষভাবে আপন বলিয়া জানিতে উৎসুক হইয়া উঠিয়াছি, সেই ঔৎসুক্যকে যে কায়ে মনে বাক্যে প্রকাশ করিতে হইবে—নতুবা দুই দিনেই তাহা যে বিস্মৃত ও ব্যর্থ হইয়া যাইবে। আমাদের মন্ত্রও চাই, চিহ্নও চাই। আমরা অন্তরে স্বদেশকে বরণ করিব এবং বাহিরে স্বদেশের চিহ্ন ধারণ করিব।' এই বক্তব্য কিছুদিন পরে তিনি আরও স্পষ্ট করে বললেন 'অবস্থা ও ব্যবস্থা' ভাষণে।

বঙ্গদর্শন, ভাদ্র ১৩১২ [৫।৫] :

১৯৯-২০১ 'ঘাটের পথ' ['ওরা চলেছে দিঘির ধারে'] দ্র খেয়া ১০।৯৮-১০০

২২৮-৩৩ 'ব্রতধারণ' দ্র আত্মশক্তি ৩।৬২০-২৫

সঙ্গীত-প্রকাশিকা, ভাদ্র ১৩১২ [৪।১২] :

২৪৩-৪৬ সিন্ধু কাফি-একতালা। তবু পারি নে সঁপিতে প্রাণ দ্র স্বর ৪৭

২৪৬-৪৭ মিশ্র ঝিঁঝিট-খাম্বাজ—মধ্যমান। ওকে বোঝা গেল না দ্র ঐ ৪৮

২৫৩-৫৫ বেহাগ-চৌতাল। ভয় হতে তব অভয় মাঝে দ্র ঐ ২২

কাঙালীচরণ সেন শেষ গানটির স্বরলিপি করেন, অন্য গানগুলির স্বরলিপিকারের নাম উল্লেখিত হয়নি।

৯ ভাদ্র [শুক্র 25 Aug] রবীন্দ্রনাথ কলকাতা টাউন হলে 'অবস্থা ও ব্যবস্থা' [দ্র বঙ্গদর্শন, আশ্বিন ১৩১২। ২৭৯-৯৬; আত্মশক্তি ৩।৬০০-১৯] প্রবন্ধটি পাঠ করেন। এইদিনের অমৃতবাজার পত্রিকা-য় সভার বিজ্ঞপ্তিটি এইভাবে প্রকাশিত হয় : 'In connection with the "New India" series of lecture, Babu Rabindra Nath Tagore will read a paper on "Situation and Remedy" in Bengali to-day at 5-30 P.M. at the Town Hall, Calcutta.' বিপিনচন্দ্র পাল তাঁর সম্পাদিত *New India* সাপ্তাহিকের নামে একটি বক্তৃতামালার আয়োজন করেন, হ্যারিসন রোডের গ্র্যাণ্ড থিয়েটারে ৩০ শ্রাবণ [মঙ্গল 15 Aug] হীরেন্দ্রনাথ দত্তের সভাপতিত্বে প্রথম বক্তৃতাটি দেন বিপিনচন্দ্র নিজে, বিষয় ছিল 'আমরা কী চাই?'[২৬] রবীন্দ্রনাথ পত্রিকাটির অন্যতম অংশীদার ছিলেন ও বর্তমানে বঙ্গভঙ্গ ও বয়কট প্রসঙ্গে বিপিনচন্দ্র ও তিনি প্রায় একই ধরনের মত পোষণ করতেন। রবীন্দ্রনাথ-সম্পাদিত বঙ্গদর্শন-এ বিপিনচন্দ্র অনেকগুলি রাজনৈতিক প্রবন্ধ লেখেন, যার মধ্যে রবীন্দ্রনাথের মতের প্রতিধ্বনি শোনা যায়।

বঙ্গদর্শন-এ 'অবস্থা ও ব্যবস্থা' প্রবন্ধটির পাদটীকায় লেখা হয় : 'গতবর্ষের জ্যৈষ্ঠমাসের বঙ্গদর্শনে বঙ্গবিভাগের প্রস্তাব উপলক্ষ্যে যে প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহার কোনো কোনো অংশ বর্ত্তমান প্রবন্ধে পুনরুক্ত হইয়াছে'—'বঙ্গবিভাগ' [দ্র সমূহ-পরিশিষ্ট ১০।৬১৩-১৯] প্রবন্ধের শেষাংশের কিছুটা বর্তমান প্রবন্ধের শেষে অন্তর্ভুক্ত হলেও প্রকৃত পুনরুক্তি আছে বক্তব্যে এবং সেদিক দিয়ে তাঁর অন্যান্য প্রবন্ধের কিছু বক্তব্য এখানে পুনঃকথিত হয়েছে। বঙ্গব্যবচ্ছেদের প্রস্তাবকে তিনি ক্ষতির দিক থেকে না দেখে লাভের দিক থেকে দেখার পরামর্শ দিয়েছেন এই প্রবন্ধে। বয়কট আন্দোলনকেও তিনি একই দৃষ্টিতে দেখতে চাইলেন : 'আমাদের দেশে বঙ্গব্যবচ্ছেদের আক্ষেপে আমরা যথাসম্ভব বিলাতি জিনিস কেনা বন্ধ করিয়া দেশী জিনিস কিনিবার জন্য যে সংকল্প করিয়াছি সেই সংকল্পটিকে স্তব্ধভাবে, গভীরভাবে, স্থায়ী মঙ্গলের উপরে স্থাপিত করিতে হইবে। আমি আমাদের এই বর্তমান উদ্‌যোগটির সম্বন্ধে যদি আনন্দ অনুভব করি তবে তাহার কারণ

এ নয় যে তাহাতে ইংরেজের ক্ষতি হইবে, তাহার কারণ সম্পূর্ণভাবে এও নহে যে তাহাতে আমাদের দেশী ব্যবসায়ীদের লাভ হইবে...আমি আমাদের অন্তরের লাভের দিকটা দেখিতেছি। আমি দেখিতেছি, আমরা যদি সর্বদা সচেষ্ট হইয়া দেশী জিনিস ব্যবহার করিতে প্রবৃত্ত হই, যে জিনিসটা দেশী নহে তাহার ব্যবহারে বাধ্য হইতে হইলে যদি কষ্ট অনুভব করিতে থাকি, দেশী জিনিস ব্যবহারের গতিকে যদি কতকটা পরিমাণে আরাম ও আড়ম্বর হইতে বঞ্চিত হইতে হয়, যদি সেজন্য মাঝে মাঝে স্বদলের উপহাস ও নিন্দা সহ্য করিতে প্রস্তুত হই, তবে স্বদেশ আমাদের হৃদয়কে অধিকার করিতে পারিবে। এই উপলক্ষে আমাদের চিত্ত সর্বদা স্বদেশের অভিমুখ হইয়া থাকিবে। আমরা ত্যাগের দ্বারা দুঃখস্বীকারের দ্বারা আপন দেশকে যথার্থভাবে আপনার করিয়া লইব।...দেশী জিনিস ব্যবহার করার ইহাই যথার্থ সার্থকতা—ইহা দেশের পূজা, ইহা একটি মহান সংকল্পের নিকটে আত্মনিবেদন।'

আঘাতের দ্বারা যে ঐক্যবোধের জন্ম হয়েছে, তাকে নানা উপলক্ষে নানা আকারে স্বীকার ও সম্মান করতে হবে, এই বলে তিনি 'স্বদেশী সমাজ'-এর আদর্শকে নূতন পরিস্থিতি অনুযায়ী একটু বিস্তৃতভাবে উপস্থিত করলেন : 'দেশের কর্মশক্তিকে একটি বিশেষ কর্তৃসভার মধ্যে বদ্ধ করিতে হইবে। অন্তত একজন হিন্দু ও একজন মুসলমানকে আমরা এই সভার অধিনায়ক করিব—তাঁহাদের নিকটে নিজেকে সম্পূর্ণ অধীন, সম্পূর্ণ নত করিয়া রাখিব; তাঁহাদিগকে কর দান করিব; তাঁহাদের আদেশ পালন করিব; নির্বিচারে তাঁহাদের শাসন মানিয়া চলিব; তাঁহাদিগকে সম্মান করিয়া আমাদের দেশকে সম্মানিত করিব।' স্বদেশী সমাজের প্রস্তাবকে কবিকল্পনা বলে অনেকে পরিহাস করেছিলেন, রুশীয় গবর্মেন্টের অধীনস্থ জর্জীয় ও আর্মেনীয় জনসাধারণ কীভাবে তাদের স্বাধীন বিচার ও শিক্ষা-ব্যবস্থা চালিয়ে যাচ্ছে তার উদাহরণ দিয়ে তিনি বললেন : 'ইহারমধ্যে এইটুকুই দ্রষ্টব্য যে, স্বদেশের কর্মভার দেশের লোকের নিজেদের গ্রহণ করিবার চেষ্টা একটা পাগলামি নহে—বস্তুত, দেশের হিতেচ্ছু ব্যক্তিদের এইরূপ চেষ্টাই একমাত্র স্বাভাবিক।'

পরের প্রদত্ত অধিকার যে জাতীয় সম্পদরূপে গণ্য হতে পারে না পঞ্চায়েৎবিধি তার প্রমাণ। পঞ্চায়েৎ গ্রামের নিজের জিনিস ছিল, শিক্ষার প্রসার ও অবস্থার পরিবর্তনে এগুলি স্বাদেশিক পঞ্চায়েতে পরিণত হতে পারত, কিন্তু গবর্মেন্টের পঞ্চায়েৎ গ্রামের লোকের চেয়ে ম্যাজিস্ট্রেটবর্গকেই আপন বলে জানবে ও প্রকারান্তরে গ্রামের চর হিসেবে কাজ করবে। মহাজনেরা চাষিদের অধিক সুদে কর্জ দিয়ে তাদের সর্বনাশ করছে বলে গবর্মেন্টকে গ্রামে গ্রামে কৃষিব্যাঙ্ক খুলতে বললে একই ব্যাপার ঘটবে। তাই নিজেদের পল্লী-পঞ্চায়েৎগুলিকে জাগিয়ে তুলে তাদেরই উপর শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও সালিশীর ভার দিতে হবে। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদকেও তিনি আহ্বান করেছেন জেলায় জেলায় শাখা স্থাপন ও পর্যায়ক্রমে এক-একটি জেলায় গিয়ে বার্ষিক অধিবেশন সম্পন্ন করতে—এর মাধ্যমে আমাদের চিন্তার ঐক্য, ভাবের ঐক্য, ভাষার ঐক্য, সাহিত্যের ঐক্য সম্বন্ধে সমস্ত দেশ সচেতন হবে।

রবীন্দ্রনাথ এই ভাষণের শেষে বললেন : 'আমাদের নিজের দিকে যদি সম্পূর্ণ ফিরিয়া দাঁড়াইতে পারি, তবে নৈরাশ্যের লেশমাত্র কারণ দেখি না। বাহিরের কিছুতে আমাদিগকে বিচ্ছিন্ন করিবে, এ কথা আমরা কোনোমতেই স্বীকার করিব না।...আমাদের কিছুতেই পৃথক করিতে পারে এ ভয় যদি আমাদের জন্মে তবে সে ভয়ের কারণ নিশ্চয়ই আমাদের মধ্যে আছে এবং তাহার প্রতিকার আমাদের নিজের চেষ্টা ছাড়া আর-কোনো কৃত্রিম উপায়ের দ্বারা হইতে পারে না।'

এই বক্তৃতার সংবাদ দিয়ে রবীন্দ্রনাথ পরের দিন [*26 Aug শনি ১০ ভাদ্র] মনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়কে লিখছেন : 'শরীর অত্যন্ত অসুস্থ ছিল এখন একটু ভাল। তাই এই অবকাশে কাল টৌনহলে এক প্রবন্ধ পাঠ করতে হয়েছিল। আজ ক্লান্ত হয়ে আছি।...ছেলেরা বর্ত্তমানে গিরিডিতে। ভবিষ্যতে কাশীতে যাবার প্রস্তাব আছে।'[২৭] তিনিও স্বাস্থ্য-পুনরুদ্ধার ও সন্তানদের সঙ্গে মিলিত হবার উদ্দেশ্যে গিরিডি রওনা হন ১৯ ভাদ্র [সোম 4 Sep]—'ব° শ্রীযুক্ত বাবু মহাশয়/দং গিরিধি গমন সময় সংসার খরচ জন্য দেওয়া যায় ১০০ রেলভাড়া ইত্যাদির জন্য ১৫' হিসাবটি থেকে আমরা তারিখটি নির্ণয় করেছি।

ইতিমধ্যে রবীন্দ্রনাথ-রচিত নূতন স্বদেশী গান 'আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি' [দ্র গীত ১।২৪৩; স্বর ৪৬] নিয়ে কলকাতা উত্তাল হয়ে পড়েছে। গানটির পাণ্ডুলিপি পাওয়া যায়নি, রচনার তারিখও জানা নেই। সত্যেন রায় লিখেছেন : 'বঙ্গভঙ্গের প্রতিবাদে ৭ই আগষ্ট (১৯০৫ খৃঃ) কলিকাতার টাউন হলে যে সভা হয়েছিল, সেই উপলক্ষ্যে...রবীন্দ্রনাথ নূতন সঙ্গীত "আমার সোনার বাংলা" বাউল সুরে গীত হয়েছিল।...১৯০৫ খৃঃ ৭ই সেপ্টেম্বর (১৩১২ সনের ২২শে ভাদ্র) তারিখের "সঞ্জীবনী" পত্রিকায় এই গানটি রবীন্দ্রনাথের স্বাক্ষরে প্রথম প্রকাশিত হয়।'[২৮] সঞ্জীবনী-র উক্ত সংখ্যাটি দেখার সুযোগ আমরা পাইনি, গানটি আশ্বিন-সংখ্যা বঙ্গদর্শন-এ [পৃ ২৪৭-৪৮] মুদ্রিত হয়। 7 Aug-এর মহাসভায় গানটি গাওয়ার বিবরণও আমরা সংবাদপত্রে দেখিনি, এই তথ্য সঠিক হলে গানটি এর আগে শান্তিনিকেতনে রচিত হয়েছিল। শিলাইদহের ডাক-পিওন গগন হরকরার 'আমি কোথায় পাব তারে আমার মনের মানুষ যে রে' গানটির সুরে রবীন্দ্রনাথ 'আমার সোনার বাংলা' গানটি রচনা করেন। সরলা দেবী ইতিপূর্বে শতগান [বৈশাখ ১৩০৭]-এ মূল গানটির স্বরলিপি প্রকাশ করেছিলেন। উল্লেখ্য, রবীন্দ্রনাথের বঙ্গভঙ্গ-পর্বের অনেক স্বদেশী গানের সুর এই স্বরলিপি-গ্রন্থটি থেকে সংগৃহীত হয়েছে।

আমাদের অনুমান, 'আমার সোনার বাংলা' গানটি ৯ ভাদ্র [শুক্র 25 aug] টাউন হলে 'অবস্থা ও ব্যবস্থা' প্রবন্ধ-পাঠের আসরে প্রথম গীত হয়। পরদিন *The Telegraph* পত্রিকা সভার প্রতিবেদনে লেখে : 'Before the proceedings of the meeting were commenced the patriotic song composed on this occasion by Babu Rabindra Nath Tagore was sung in a chorus.' রবীন্দ্রনাথের বক্তৃতার পরে 'Another song was sung amid hearty cheers. Such was the enthusiasm that the whole gathering stood upon their legs and joined in the chorus. The first song was again sung after the address of the President.' এই বিবরণ থেকে বোঝা যায়, দ্বিতীয় গানটির সঙ্গে ইতিপূর্বেই শ্রোতাদের পরিচয় ঘটেছিল। সেক্ষেত্রে শ্রোতৃবর্গের অনুরোধে পুনর্গীত উদ্বোধনী সংগীতটি 'আমার সোনার বাংলা' হওয়া খুবই সম্ভব।

1 Sep [শুক্র ১৬ ভাদ্র] সিমলা থেকে ঘোষিত হয় যে, 16 Oct [সোম ৩০ আশ্বিন] বঙ্গভঙ্গ কার্যকরী হবে। এই ঘোষণা আন্দোলনে নূতন গতি সঞ্চার করল। ১৮ ভাদ্র [রবি 3 Sep] বিকেল সাড়ে চারটেয় কলেজ স্কোয়ারে বিশাল সংখ্যক ছাত্র সমবেত হয়ে শপথ গ্রহণ করে, তারা পাদুকা ও চাদর বর্জন করে তিন দিন জাতীয় শোক পালন করবে।[২৯] এর পরে তারা মিছিল করে বাগবাজারে রায় পশুপতিনাথ বসুর বাড়ির দিকে যাত্রা করে; বেঙ্গলী-র [4 Sep] বিবরণে লেখা হয় : '...more than four thousand persons including College and School students, bare-footed and holding flags in hand came in procession

singing a national song composed by Babu Rabindra Nath Tagore...proceeding from the College Square.' রবীন্দ্রনাথের কোন্ স্বদেশী গানটি মিছিলে গাওয়া হয়েছিল, তা অনুমান করা শক্ত।

সিটি বুক সোসাইটির যোগীন্দ্রনাথ সরকার 'বন্দে মাতরম্' নামে দেশাত্মবোধক কবিতা ও গানের একটি সংকলন প্রকাশের আয়োজন করছিলেন। 3 Sep [১৮ ভাদ্র] বেঙ্গলী-তে এটি বিজ্ঞাপিত হয় :

> "বন্দে মাতরম্"/ইহাতে বঙ্কিম বাবুর "বন্দে মাতরম্", হেমবাবুর "বাজ্‌রে শিঙ্গা বাজ্ এই রবে", সত্যেন্দ্রবাবুর "মিলে সবে ভারত-সন্তান", রবীন্দ্র বাবুর "অয়ি ভুবন মনোমোহিনী" প্রভৃতি ১২।১৩টী উৎকৃষ্ট সঙ্গীত, গোবিন্দ বাবুর "নির্ম্মল-সলিলে" এবং এইরূপ আরও ৩০।৩৫টী উদ্দীপনাপূর্ণ জাতীয় কবিতা এবং সঙ্গীত প্রকাশিত হইয়াছে। পুস্তক খানি উৎকৃষ্ট স্বদেশী কাগজে সুন্দর ভাবে মুদ্রিত।... মূল্য ।০ আনা।

লক্ষণীয়, এই বিজ্ঞাপনে 'সোনার বাংলা' গানটি নেই, সেটি মর্যাদার স্থান নিয়েছে 8 Sep-এর বিজ্ঞাপনে, মোট রচনা-সংখ্যাও হয়েছে ৪১টি। এই কারণে আমরা 7 Aug-এর সভায় গানটি গীত হওয়ার ব্যাপারে সন্দেহ প্রকাশ করছি। এটি সম্ভবত বঙ্গভঙ্গের নির্দিষ্ট তারিখ জানতে পারার [2 Sep শনি ১৭ ভাদ্র] তাৎক্ষণিক আবেগে রচিত হয় ও ভক্তদের সূত্রে সমগ্র কলকাতায় ছড়িয়ে পড়ে। বেঙ্গল লাইব্রেরির ক্যাটালগ অনুসারে ৮৪ পৃষ্ঠার 'বন্দে মাতরম্' গ্রন্থটি প্রকাশিত হয় 13 Sep [বুধ ২৮ ভাদ্র]। মাত্র ছ'দিন পরে [19 Sep মঙ্গল ৩ আশ্বিন] বর্ধিতাকারে [পৃ ১০২] গ্রন্থটির দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয়।

গিরিডিতে গিয়ে ২৬ ভাদ্র [সোম 11 Sep] রবীন্দ্রনাথ লিখলেন খেয়া-র একটি কবিতা 'দান' ['ভেবেছিলাম চেয়ে নেব' দ্র বঙ্গদর্শন, অগ্র° ।৩৯৪-৯৬; খেয়া ১০।১১০-১২]। খেয়া-র অধ্যাত্মমুখী কবিতা-ধারার সঙ্গে সংগতিপূর্ণ হলেও কবিতাটিতে সমকালীন রাজনৈতিক পরিস্থিতির ছায়াপাত ঘটেছে বলে অনুমান করা যায়। পরের দিন ২৭ ভাদ্র [মঙ্গল 12 Sep] বাউল সুরে রচিত গান 'ঘাটে' ['আমার নাই-বা হল পারে যাওয়া' দ্র খেয়া ১০।১০১; গীত ২।৫৪৮; স্বর ১০] একই ভাবে ব্যাখ্যাত হতে পারে।

কলকাতার কোলাহলপূর্ণ তীব্র আন্দোলনের কেন্দ্রের বহির্বর্তী হলেও রবীন্দ্রনাথের ভাবলোকে সেই উন্মাদনার ঢেউ ঠিকই লাগছিল। গিরিডি তখন বাংলা প্রদেশেরই অন্তর্গত, সুতরাং বঙ্গভঙ্গের প্রতিক্রিয়া সেখানকার জনসাধারণকে, অন্তত বাঙালিদের, স্পর্শ করছিল। রবীন্দ্রনাথ তাকেও গঠনমূলক রূপ দিচ্ছিলেন, তা জানা যায় ২৯ ভাদ্রের [বৃহ 14 Sep] একটি হিসাব থেকে : 'ব° বাবু মহাশয় দং গিরিধি স্বদেশি গোলার ৫০০্ টাকার সেয়ার ক্রয়ের মধ্যে...২৫০্'। ১০ আশ্বিনের [শনি 23 Sep] হিসাব : 'দং উক্ত গোলায় টাকা আমানত রাখা যায় গুঃ বাবু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ২০০০্।'

এবারের গিরিডি-বাস রবীন্দ্রনাথের জীবনে একটি স্মরণীয় অধ্যায় হয়ে আছে স্বদেশী গানে লেখার কারণে। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের অন্যতম চারণকবির ভূমিকা নিলেন তিনি। মাসখানেকের মধ্যে তিনি ২২।২৩টি গান রচনা করেন,যেগুলি তখনকার লোকের মুখে মুখে ফিরেছে। গানগুলি শেখার জন্য বিশেষত তরুণ সম্প্রদায়ের মধ্যে কী আগ্রহ দেখা দিয়েছিল, তার আভাস পাওয়া যায় 20 Sep [বুধ ৪ আশ্বিন] অমৃতবাজার পত্রিকা-য় মুদ্রিত একটি বিজ্ঞপ্তিতে : 'Dawn Society Music class—A temporary Music class, to teach a number of the newest national songs composed by Babu Rabindra Nath Tagore will be opened inmmediately under the auspices of the Dawn Society.' উল্লেখ্য, রবীন্দ্রনাথের লেখা সমস্ত স্বদেশী সংগীতগুলি তখনও রচিত হয়নি বা জনসাধারণের কাছে পৌঁছয়নি।

এই গানগুলি সবই খেয়া-র পাণ্ডুলিপিতে লিখিত হয়েছিল, লেখা হয় খাতাটিকে উলটে নিয়ে। এদের মধ্যে শেষের দিকের মাত্র চারটি গানে রচনার স্থান-কাল লেখা আছে, কিন্তু পৃষ্ঠার ক্রমানুসারে রচনার ক্রমটিও নির্ধারণ করা যায়। গানগুলি হল :

[১] ও আমার দেশের মাটি দ্র গীত ১।২৪৪; বঙ্গদর্শন, আশ্বিন। ২৯৮, 'দেশের মাটি'; বাউল [আশ্বিন ১৩১২]। ১২-১৩, 'দেশের মাটি'; মূল গান : 'সোনার গৌর কেনে' [পাণ্ডুলিপিতেই ছত্রটি লেখা আছে]—এই গানটিও সরলা দেবীর শতগাম-এ আছে : 'আমার (সোণার) গৌর ক্যানে কেঁদে এল ও নরহরি'; স্বর ৪৬। আশ্বিন-সংখ্যা বঙ্গদর্শন-এর শেষ রচনা হিসেবে গানটি মুদ্রিত হয়; বোঝা যায়,ভাদ্রের শেষে রচিত গানটি শেষ মুহূর্তে পত্রিকার দপ্তরে উপস্থিত হয়।

[২] মা কি তুই পরের দ্বারে পাঠাবি তোর ঘরের ছেলে দ্র গীত ১।২৫৯; ভাণ্ডার, ভাদ্র-আশ্বিন। ১৯৬-৯৭, 'মাতৃগৃহ' (বাউলের সুর); বাউল। ২৭-২৮, 'মাতৃগৃহ'; স্বর ৪৬।

[৩] এবার তোর মরা গাঙে বান এসেছে দ্র গীত ১।২৪৫; ভাণ্ডার, ভাদ্র-আশ্বিন। ১৮৩, 'বান'; বাউল। ১৭, 'বান'; মূল গান : 'মন মাঝি সামাল সামাল ডুবল তরী'—গানটি সরলা দেবীর শতগান-এ আছে [পাণ্ডুলিপিতে লেখা : 'সারিগানের সুর']; স্বর ৪৬।

[৪] যে তোমায় ছাড়ে ছাড়ুক দ্র গীত ১।২৫৭-৫৮; ভাণ্ডার, ভাদ্র-আশ্বিন। ২০৩-০৪, 'বাউল। (১)'; বাউল। ২২-২৩; মূল গান : 'চিরদিন এমনিভাবে (ও মন) অসার মায়ায় ভুলে রবে' [পাণ্ডুলিপিতে লেখা]—গানটি সরলা দেবীর শতগান-এ আছে; স্বর ৪৬।

[৫] যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে দ্র গীত ১।২৪৪-৪৫; ভাণ্ডার, ভাদ্র-আশ্বিন। ১৮৪, 'একা'; বাউল। ১৮-১৯, 'একা'; মূল গান : 'হরিনাম দিয়ে জগৎ মাতালে' [পাণ্ডুলিপিতে লেখা]—গানটি সরলা দেবীর শতগান-এ আছে; স্বর ৪৬।

[৬] যে তোরে পাগল বলে দ্র গীত ১।২৫৮; ভাণ্ডার, ভাদ্র-আশ্বিন। ২০৪, 'বাউল' (২)'; বাউল। ২৩; স্বর ৪৬।

[৭] তোর আপন জনে ছাড়বে তোরে দ্র গীত ১।২৪৫; ভাণ্ডার, ভাদ্র-আশ্বিন। ১৯৭, 'প্রয়াস'; বাউল। ২৯-৩০, 'প্রয়াস'; স্বর ৪৬; দীর্ঘকাল পরে রবীন্দ্রনাথ নিজেই গানটি ইংরেজিতে অনুবাদ করেন : 'Let them desert thee even who are thine own' [Ms. 252]।

[৮] সার্থক জনম আমার জন্মেছি এই দেশে দ্র গীত ১।২৫৭; বাউল। ৭-৮ 'সার্থক জন্ম' ভৈরবী; মূল গান : 'কেমনে ফিরিয়ে যাস না দেখি তাঁহারে' [পাণ্ডুলিপিতে লেখা]—এটি রবীন্দ্রনাথেরই হিন্দি-ভাঙা 'কেমনে ফিরিয়া যাও...' গানের পাঠান্তর; স্বর ৪৬।

[৯] আমি ভয় করব না, ভয় করব না দ্র গীত ১।২৪৬; বাউল। ১৪-১৫, 'অভয়', ভূপালি-একতালা; স্বর ৪৬।

[১০] ওরে তোরা নেইবা কথা বললি দ্র গীত ১।২৫৮; ভাণ্ডার, ভাদ্র-আশ্বিন। ২০৪-০৫, 'বাউল (৩)'; বাউল। ২৩-২৪; স্বর ৪৬।

[১১] ছি ছি চোখের জলে ভেজাস নে আর মাটি দ্র গীত ১।২৫৯-৬০; ভাণ্ডার, ভাদ্র-আশ্বিন। ১৯৮, 'বিলাপী'; বাউল। ৩০-৩১, 'বিলাপী'; স্বর ৪৬।

[১২] বুক বেঁধে তুই দাঁড়া দেখি দ্র গীত ১।২৬০-৬১; বাউল। ১৩-১৪, 'দ্বিধা'; বঙ্গদর্শন, কার্তিক। ৩৪১, 'দ্বিধা', বেহাগ-একতালা [রবীন্দ্রনাথ পাণ্ডুলিপিতে গানটির সুর 'কালাংড়া' কেটে দিয়ে 'শঙ্করা' লিখেছেন, সেটিকে না কেটেই লেখেন 'বেহাগ']; স্বর ৪৬।

[১৩] নিশিদিন ভরসা রাখিস হবেই হবে দ্র গীত ১।২৪৬; বাউল। ১৫-১৬, 'হবেই হবে'; বঙ্গদর্শন, কার্তিক। ৩৪০, 'হবেই হবে', বাউলের সুর; স্বর ৪৬।

[১৪] [ও] জোনাকি কি সুখে ঐ ডানা দুটি মেলেছ দ্র গীত ২।৫৮২; ভাণ্ডার, ভাদ্র-আশ্বিন। ২০৬, 'বাউল। (৬)'; বাউল। ২৬-২৭; স্বর ৫১। গীতবিতান-এ গানটি প্রসঙ্গচ্যুত হয়ে বোধ হয় তার তাৎপর্য হারিয়েছে। পাণ্ডুলিপিতে গানটির উপর লেখা : 'যদি বারণ কর'—হয়তো এই গানটির সুর অনুসরণ করতে চাওয়া হয়েছিল। রাগ নির্দেশ করতে গিয়ে 'কালাংড়া' কেটে 'ছায়ানট' করা হয়; উল্লেখ্য, 'যদি বারণ কর' গানটির রাগিণী 'ছায়ানট'।

[১৫] আমরা পথে পথে যাব সারে সারে দ্র গীত ১।২৬১; বাউল। ৮-৯, 'পথের গান', রামকেলি-একতালা; স্বর ৪৬।

[১৬] আজি বাংলা দেশের হৃদয় হতে কখন আপনি দ্র গীত ১।২৫৫-৫৬; ভাণ্ডার, ভাদ্র-আশ্বিন। ১৯৫-৯৬, 'মাতৃমূর্ত্তি', বিভাস-একতালা; বাউল। ১৯-২১, 'মাতৃমূর্ত্তি'; স্বর ২৬।

[১৭] আপনি অবশ হলি, তবে বল দিবি তুই কারে দ্র গীত ১।২৪৬-৪৭; ভাণ্ডার, ভাদ্র-আশ্বিন। ২০৫-০৬, 'বাউল (৫)'; বাউল। ২৫-২৬; স্বর ৪৬।

[১৮] যদি তোর ভাবনা থাকে ফিরে যা না দ্র গীত ১।২৫৮-৫৯; ভাণ্ডার, ভাদ্র-আশ্বিন। ২০৫, 'বাউল (৪)'; বাউল। ২৪-২৫; স্বর ৪৬। গানটির শীর্ষে লেখা আছে : 'ও রাজা'—এর মূলটি উদ্ধার করা যায়নি।

[১৯] আমাদের যাত্রা হল সুরু, এখন ওগো কর্ণধার গিরিডি/২১শে আশ্বিন [শনি 7 Oct]/১৩১২ দ্র গীত ১। ২৪৮-৪৯; 'সঞ্জীবনী পত্রিকা ১২ই অক্টোবর ১৯০৫ [বৃহ ২৬ আশ্বিন] কবির স্বাক্ষরসহ প্রকাশিত হয়। দ্র গল্পভারতী ১৩৭৮ বৈশাখ ১০২৪।'[৩০] স্বর ৪৭। গীতাঞ্জলি-র পাণ্ডুলিপিতে [Ms. 427 (ii)] রবীন্দ্রনাথ গানটি লিখে রেখেছেন, সেখানে 'আমাদের' ও 'আমরা' শব্দগুলি যথাক্রমে 'আমার' ও 'আমি'-তে পরিবর্তিত হয়।

[২০] খাম্বাজ/বিধির বাঁধন কাটবে তুমি গিরিডি ২১শে আশ্বিন ১৩১২ [রবি 8 Oct] দ্র গীত ১।২৬৬; ভাণ্ডার, ভাদ্র-আশ্বিন [দ্বিতীয় ভাগ]। ২৩৮ 'রাখী সঙ্গীত' ৩; সঞ্জীবনী, 12 Oct;[৩০] স্বর ৪৬।

[২১] ওদের বাঁধন যতই শক্ত হবে রেলগাড়ি/২২শে আশ্বিন ১৩১২ [সোম 9 Oct] দ্র গীত ১।২৬৫-৬৬; ভাণ্ডার, ভাদ্র-আশ্বিন [দ্বিতীয় ভাগ]। ২৩৭-৩৮, 'রাখী সঙ্গীত' ২; সঞ্জীবনী, 12 Oct;[৩০] স্বর ৪৬

[২২] আজ সবাই জুটে আসুক ছুটে ২৪শে আশ্বিন [বুধ 11 Oct]/কলিকাতা দ্র গীত ৩।৮২৩; স্বরলিপি নেই।

[২৩] ওরে ভাই মিথ্যা ভেব না ২৫শে আশ্বিন [বুধ 11 Oct]/কলিকাতা দ্র গীত ৩।৮২৩; ভাণ্ডার, কার্তিক। ২৪৭, সিন্ধু ভৈরবী-একতালা; স্বর ৪৬। গানটির পাশে লেখা আছে : 'ভালবাসিবে বলে ভালবাসিনে'; শীর্ষে 'ঝিঁঝিট খাম্বাজ' কেটে 'সিন্ধু ভৈরবী' করা হয়েছে।

এই সংগীতাবলী রচনার মধ্যবর্তী পর্বে রবীন্দ্রনাথ একবার কলকাতায় আসেন। ১১ আশ্বিন [বুধ 27 Sep] বিকেল ৬টায় ১৮-৪ অক্রূর দত্ত লেনে রবীন্দ্রনাথের সভাপতিত্বে সাবিত্রী লাইব্রেরি স্বধর্ম সাধন সমিতির একটি বিশেষ অধিবেশন আহ্বান করা হয় 'to consider "what are our principal duties at the present regarding the indigeneous goods".'[৩১] রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, সুরেশচন্দ্র সমাজপতি, বিহারীলাল সরকার, শ্রীশচন্দ্র সর্বাধিকারী, নিখিলনাথ রায়, অমৃতলাল বসু, মনোরঞ্জন গুহঠাকুরতা, নগেন্দ্রনাথ ঘোষ, ক্ষিতীন্দ্রনাথ, সুরেন্দ্রনাথ প্রভৃতি উপস্থিত ছিলেন। সভায় তিনটি প্রস্তাব গৃহীত হয়। 'The chairman then delivered a short speech at the end of which he suggested that if Partition of Bengal were carried out on the 16th October next the people of entire Bengal Eastern and Western, should celebrate the day as an occasion of their union. That might be observed as an anniversary and Rakhi Bondhon, by exchange of yellow thread between the people of Eastern and Western Bengal on that day, might be observed. A national song terminated the meeting at 9-20 p.m.'[৩২]

রাখীবন্ধনের প্রস্তাব সম্ভবত এই সভাতেই প্রথম ঘোষিত হল। রবীন্দ্রনাথ এই উপলক্ষে তাঁর বিখ্যাত 'রাখীসঙ্গীত' 'বাংলার মাটি বাংলার জল' [দ্র গীত ১।২৫৫; ভাণ্ডার, ভাদ্র-আশ্বিন (২য় ভাগ)। ২৩৭, 'রাখী সঙ্গীত' ১, স্বর ৪৬] রচনা করেন। এটিও খেয়া-র পাণ্ডুলিপিতে [Ms. 110 (i)] আছে, কিন্তু খাতার উলটো দিকে অন্য স্বদেশী গানগুলির সঙ্গে নয়, খেয়া-র কবিতাগুলি যে-দিকে লেখা হচ্ছিল সেই দিকেই গানটি লেখা হয়। এখানে আমরা আরও কয়েকটি গান পাই। ২৯ পৃষ্ঠায় ২৭ ভাদ্রে [মঙ্গল 12 Sep] লেখা 'ঘাটে' গানটির পরবর্তী পৃষ্ঠায় একটি স্বদেশী গান 'ঘরে মুখ মলিন দেখে গলিস্ নে' [দ্র গীত ১।২৬০; স্বদেশ। ১৩৫-৩৬; বাউল। ৩১; স্বরলিপি নেই] রচিত হয়। এটি নিশ্চয়ই ১১ আশ্বিনের [বুধ 27 Sep] পূর্বে লেখা, কারণ 'স্বদেশ' গ্রন্থটি এই তারিখে প্রকাশিত হয়। পাণ্ডুলিপিতে [৩১-৩২ পৃষ্ঠা] এর পরবর্তী গান 'ভুবনেশ্বর হে' [গীত। ৫৬; স্বর ২৪]। এর পর ৩৩ পৃষ্ঠায় 'বাংলার মাটি বাংলার জল' গানটি লিখিত হয়। হয়তো কলকাতাতেই এই গানগুলি রচিত হয়েছিল।

১১ আশ্বিন [বুধ 27 Sep] সাবিত্রী লাইব্রেরির সভার দিনে রবীন্দ্রনাথের 'স্বদেশ' গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়। এটি মোহিতচন্দ্র সেন-সম্পাদিত কাব্য-গ্রন্থ চতুর্থ ভাগের অন্তর্গত 'সংকল্প' ও 'স্বদেশ' বিভাগ দুটি, 'বাউল' গ্রন্থের কুড়িটি গান ও পুরোনো আটটি দেশাত্মবোধক গান এবং 'শিবাজী উৎসব' কবিতা-সহ স্বতন্ত্র গ্রন্থরূপে মুদ্রিত হয়। ২ + ৬ + ১৪৫ পৃষ্ঠার আট আনা দামের বইটির মুদ্রণসংখ্যা মাত্র ৫০০। গ্রন্থটির আখ্যাপত্র :

স্বদেশ।/শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত।/কলিকাতা,/২০ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্ মজুমদার লাইব্রেরি।/১৩১২

[পরপৃষ্ঠায়] কলিকাতা,/২০ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্ "দিনময়ী প্রেসে"/শ্রীহরিচরণ মান্না দ্বারা মুদ্রিত/ও/২০ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্ মজুমদার লাইব্রেরি হইতে/শ্রীসুহাসচন্দ্র মজুমদার কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

'স্বদেশ' গ্রন্থ প্রকাশের তিন দিন পরে 30 Sep [শনি ১৪ আশ্বিন] ৩২ পৃষ্ঠার পুস্তিকারূপে 'বাউল' প্রকাশিত হল, মূল্য দু'আনা। আখ্যাপত্র :

বাউল।/শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত।/কলিকাতা, ২০ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্, মজুমদার লাইব্রেরি হইতে/পি, রায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত।/মূল্য ল০ আনা।

[পরপৃষ্ঠায়] কলিকাতা,/২০ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্ "দিনময়ী প্রেসে"/শ্রীহরিচরণ মান্না দ্বারা মুদ্রিত।

পৃষ্ঠাসংখ্যা : ২ + ২ + ২ + ২৬ [৭-৩২]; মুদ্রণসংখ্যা : ৫০০।

এই পুস্তিকার মধ্যে রবীন্দ্রনাথের সদ্যোরচিত কুড়িটি গান সংকলিত হয়। আমরা আগেই বলেছি, গানগুলি তিন দিন পূর্বে প্রকাশিত 'স্বদেশ' গ্রন্থেরও অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল। এই কুড়িটি গান থেকে নিশ্চিত ভাবেই বলা যায়, আমাদের পূর্বোদ্ধৃত তালিকার প্রথম আঠারোটি গান এবং 'আমার সোনার বাংলা' ও 'ঘরে মুখ মলিন দেখে গলিস্ নে' অবশ্যই ১১ আশ্বিনের [বুধ 27 Sep] পূর্বে রচিত। গ্রন্থে অবশ্য রচনার কালানুক্রম অনুসরণ করা হয়নি। উল্লেখ্য, এর মধ্যে বারোটি গান 22 Sep [শুক্র ৬ আশ্বিন] ভাদ্র-আশ্বিন-সংখ্যা [প্রথম ভাগ] ভাণ্ডার-এ প্রকাশিত হয়েছিল, 'সোনার বাংলা' ও 'ও আমার দেশের মাটি' তার আগেই ছাপা হয় আশ্বিন-সংখ্যা বঙ্গদর্শন-এ। পাণ্ডুলিপিতে গানের শীর্ষে রবীন্দ্রনাথ যেভাবে পরিচিত গানের সুর নির্দেশ করেছেন, তাতে মনে হয়, গানগুলি লেখা হলেই তিনি কলকাতায় পাঠিয়ে দিচ্ছিলেন এবং তিনি নিজে গিরিডিতে থাকলেও সুর-সহ গানগুলি কলকাতার গায়কদের কণ্ঠে প্রচারিত হয়ে যাচ্ছিল।

সাবিত্রী লাইব্রেরির সভায় সভাপতিত্ব করে রবীন্দ্রনাথ গিরিডি ফিরে যান ১৩ আশ্বিন [শুক্র 29 Sep]—এইদিন 'দং গিরিটি গমনের জন্য নগদ লয়েন ২৫০্' হিসাব থেকে আমরা তারিখটি নির্ধারণ করেছি।

গিরিডি থেকে তাঁকে দেওঘর যেতে হয় সরলা দেবীর বিবাহানুষ্ঠানে যোগ দিতে। পাঞ্জাবী আর্যসমাজী ব্রাহ্মণ রামভজ দত্ত চৌধুরীর সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয় ১৮ আশ্বিন [বুধ 4 Oct] দুর্গাসপ্তমীর আগের দিন। সরলা দেবী তাঁর স্মৃতিকথা জীবনের ঝরাপাতা-য় এই বিবাহের বিস্তৃত বর্ণনা দিয়েছেন [দ্র পৃ ১৮৫-৮৭]। তিনি ছিলেন হিমালয়ের মায়াবতী অদ্বৈত আশ্রমে, সেইখানেই বিবাহের ডাক গিয়ে পৌঁছয়। বৈদ্যনাথে পৌঁছেই দেখেন তিনি 'কনে' হয়ে গেছেন। তিনি লিখেছেন : 'সেদিন ভোরে রাঁচী থেকে নতুন মামা মেজমামা মেজমামী এসেছেন, বোলপুর থেকে রবি মামা বড় মামা, মধুপুর থেকে বড় মাসিমা কৃতী ও সুকেশী বৌঠান, কলিকাতা থেকে ইন্দিরা প্রমথবাবু ও সুরেন।'[৩৩] এই বর্ণনায় কিছু ত্রুটি আছে। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ-সত্যেন্দ্রনাথ তখনও রাঁচিতে আস্তানা গাড়েননি, আর রবীন্দ্রনাথ এসেছিলেন গিরিডি থেকে।

বিবাহ উৎসবে যোগ দিয়ে রবীন্দ্রনাথ ২১ আশ্বিনের [শনি 7 Oct] পূর্বেই গিরিডিতে ফিরে এসেছিলেন। এইদিন তিনি সেখানে 'আমাদের যাত্রা হল শুরু' ও 'বিধির বাঁধন কাটবে তুমি' গান-দুটি রচনা করেন। দেশাত্মবোধের উন্মাদনার পাশাপাশি দল-ভাঙাভাঙি ও চরিত্রহননের দুষ্কর্মও চলছিল, তা জানা যায় এইদিন ব্রজেন্দ্রকিশোর দেববর্মাকে লেখা একটি পত্রে : 'নাটোরের মহারাজা অমিয় মল্লিকের ভাইকে কন্যার বিবাহ উপলক্ষ্যে বহুতর টাকার বিলাতী জিনিষ কিনিবার ভার দিয়াছেন একথা আদ্যোপান্ত মিথ্যা। যাঁহারা এই অসত্য রটনা করিয়াছেন তাঁহাদিগকে তুমি আমার নাম করিয়া এই কথা জানাইতে পার। এবারকার যে আন্দোলনে দেশের হৃদয় জাগ্রত হইয়াছে তাহাকে যাহারা ছলনা বলিয়া বিদ্রূপ করিতে পারে তাহারা সয়তানের চেলা।/ তোমার কাছে আমার অনুরোধ এই যে তুমি যথাসম্ভব বিলাতী দ্রব্য পরিহার করিয়া দেশী জিনিষ ব্যবহার করিয়ো—এ জন্য যদি তোমাকে বিদ্রূপ সহিতে হয় তাহার জন্য প্রস্তুত হইয়ো। কেবল দেশী জিনিষ ব্যবহার করা নহে, যতটা সম্ভব, দেশী ভাবে দেশী আচার পালন করা চাই। সময় বিশেষে লোকের কাছে উপহাসাস্পদ হইবার গৌরব আছে একথা মনে রাখিয়ো।'[৩৪] রবীন্দ্রনাথের দেশ-মনস্কতা এই সময়ে কোন স্তরে অবস্থান করছে এই পত্রে তার কিছুটা হদিশ পাওয়া যায়।

পত্রটিতে আরও কিছু খবর আছে। রমণীমোহন ইতিমধ্যে ত্রিপুরা গিয়ে তাঁর কাজকর্মের সঙ্গে পরিচিত হচ্ছিলেন। জাপানী সূত্রধর কুসুমতো সান্‌ও ত্রিপুরায় গিয়ে সেখানকার আর্টিজান স্কুলে যোগ দেন। 'যতীকে জিজ্ঞাসা করিয়ো অ্যামেরিকা হইতে সে কোনো সংবাদ পাইয়াছে কি না'—এই বাক্য থেকে মনে হয়, কৃষিবিদ্যা শিক্ষার জন্য রথীন্দ্রনাথদের আমেরিকা পাঠানো নিয়ে রবীন্দ্রনাথ এখন থেকেই কার্যকরী চিন্তাভাবনা শুরু করে দিয়েছেন।

রবীন্দ্রনাথ গিরিডি থেকে আবার কলকাতা যাত্রা করেন ২২ আশ্বিন [রবি ৪ Oct]। এইদিন তিনি মনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়কে লেখেন : 'আমি যে কিরূপ আবর্ত্তের পাকে পড়িয়া ছিলাম তাহা কল্পনা করিতে পারিবেন না। সে সময় আপনার চিঠিপত্র যদি পাইয়া থাকি তবে কর্ম্মের পাকে তাহা সাফ তলাইয়া গেছে। কেবল আপনার কাছে নয় ঐ সময়টাতে আমি অনেকের কাছে অপরাধ সঞ্চয় করিয়াছি। গিরিডিতে সম্প্রতি বিশ্রামের আশায় আসিয়াছি—ইতিমধ্যে কলিকাতা হইতে আজ দূত আসিয়াছে আজই আমাকে সেখানে যাইতে হইবে। কতদিন থাকিতে হইবে কে জানে। রথীও কাল যাইবে।'[৩৫] রেলপথে তিনি 'ওদের বাঁধন যতই শক্ত হবে' [দ্র গীত ১।২৬৫] গানটি রচনা করেন, একথা আগেই বলা হয়েছে।

রবীন্দ্রনাথকে যেজন্য লোক পাঠিয়ে গিরিডি থেকে কলকাতায় নিয়ে আসা হয়, তার কারণ হল বাগবাজারে রায় পশুপতিনাথ বসুর সুরম্য প্রাসাদপ্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিতব্য বিজয়াসম্মিলন [বিজয়াদশমী : ২১ আশ্বিন শনি 7 Oct]। রবীন্দ্রনাথের দেশাত্মবোধক গানগুলি তখন কলকাতার মানুষদের মাতিয়ে তুলেছিল, তাঁর কবিত্বময় ভাষায় লিখিত উদ্দীপনামূলক ভাষণের আকর্ষণও ছিল। এই উভয় আকর্ষণেই তাঁকে উক্ত অনুষ্ঠানে আহ্বান করা হয়।

অনুষ্ঠানটি হয় ২৩ আশ্বিন [সোম 9 Oct] তারিখে। অমৃতবাজার পত্রিকা [12 Oct] 'Bejoya Sammilani' শিরোনামে এক দীর্ঘ প্রতিবেদনে লেখে :

On Monday last the Bejoya Sammilani was observed on a grand scale at the residence of Rai Pashupati Nath Bose Bahadur of Bagbazar. On that occasion a grand and fashionable gathering not less than 5000 met there including Maharajas, Rajas, titled men and other gentlemen of the town. Indeed the elite and gentry of Calcutta was there in Swadeshi clothes and the sight was a great one...

The members of the 'Bandey Mataram Party' came at about 5 p.m. in grand procession, and singing all the way from the house of Kumar Manmatha Nath Mitter. Several other parties such as 'Sanatan Samity', 'Students' Party' also joined the party and sang national songs. In this connection a meeting was held in the spacious quadrangle when Babu Rabindra Nath Tagore read a very impressive and thoughtful paper on the present topic of the day, which concluded with a prayer which moved the heart of one and all present on the occasion. Babu Rabindra Nath Tagore also sang an appropriate song specially composed for the occasion which was much appreciated by the vast assembly. The Hosts received the guests personally at the gates and were all attention to their comforts and convenience. There were wrestling, sword plays, fencing, lathi play etc. Sirrki and sweets were freely distributed and with cordial greetings of the season the gathering dispersed at about 9 in the evening.

ময়মনসিংহের মহারাজা সূর্যকান্ত আচার্য চৌধুরী, নাটোরের মহারাজা জগদিন্দ্রনাথ রায়, পাইকপাড়ার কুমার সতীশচন্দ্র সিংহ, কুমার মন্মথনাথ মিত্র, প্রভাসচন্দ্র মিত্র, নিবারণচন্দ্র দত্ত, নগেন্দ্রনাথ মল্লিক, হেমচন্দ্র মল্লিক, তারকনাথ পালিত প্রভৃতি বিশিষ্ট ব্যক্তিরা অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বলে পত্রিকায় উল্লিখিত হয়েছে। বেঙ্গলী [11 Oct] সরলা দেবীর নবপরিণীত স্বামী রামভজ দত্তচৌধুরীর উপস্থিতির কথা লিখে খবর দেয় :

'Babu Rabindra Nath Tagore himself treated the gentlemen present to some of his well known songs'—অমৃতবাজার একটি গান গাওয়ার কথা লিখেছিল।

এই সভায় রবীন্দ্রনাথ 'বিজয়া-সম্মিলন' [দ্র বঙ্গদর্শন, কার্তিক। ৩৪৯-৫৪; ভারতবর্ষ ৪।৪৮৬-৭৪] প্রবন্ধটি পাঠ করেন। প্রবন্ধটি পরে 25 Dec [সোম ১০ পৌষ] পুস্তিকাকারে প্রকাশিত হয়। বেঙ্গল লাইব্রেরির ক্যাটালগে প্রদত্ত বিবরণটি এইরূপ :

Tagore (Ravindra Nath). 'বিজয়া-সম্মিলন' (Vijaya Sammilan. Union on the day of Vijaya. (Last day of Durga Puja Festival). pp. 8. S. C. Majumdar, 20, Cornwallis Street, Calcutta. 25-12-05. RI. 8vo. 1st. Anna 1. Hari Charan Manna, 20, Cornwallis Street, Calcutta. 1,000.

অব্যবহিত কর্তব্যের ডাকে 'বিজয়া-সম্মিলন' প্রবন্ধটি দ্রুত লিখিত হয়, তাই কিছুটা আবেগোচ্ছ্বাস দিয়ে এর কলেবর পূর্ণ করা হয়েছে। বিজয়ার পরে প্রতি-আলিঙ্গন, গুরুজনদের প্রণাম, শুভেচ্ছা-বিনিময় ইত্যাদি প্রথাগতভাবে বহুকাল ধরেই চলে আসছিল, তা সীমাবদ্ধ ছিল আত্মীয়-বন্ধু-পরিচিতদের মধ্যে। কিন্তু বঙ্গব্যবচ্ছেদের আঘাতে সমস্ত বাঙালিই যখন একাত্মতার সূত্রে আবদ্ধ হয়েছে, তখন সেই প্রাচীন প্রথা একটি নূতন তাৎপর্য লাভ করেছে। এই কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে রবীন্দ্রনাথ তাই বললেন : 'সেইজন্যই আজ আমাদের চিরন্তন দেবমন্দিরে কেবল ব্যক্তিগত পূজা নহে সমস্ত দেশের পূজা উপস্থিত হইতেছে—আমাদের চিরপ্রচলিত সামাজিক উৎসবগুলি কেবলমাত্র পারিবারিক সম্মিলনে আমাদিগকে তৃপ্ত করিতেছে না—আনন্দের দিনে সমস্ত দেশের জন্য আমাদের গৃহদ্বার আজ অর্গলমুক্ত হইয়াছে। আজ হইতে আমাদের সমস্ত সমাজ যেন একটি নূতন তাৎপর্য গ্রহণ করিতেছে। আমাদের গার্হস্থ্য, আমাদের ক্রিয়াকর্ম, আমাদের সমাজধর্ম একটি নূতন বর্ণে রঞ্জিত হইয়া উঠিতেছে—সেই বর্ণ আমাদের সমস্ত দেশের নব-আশাপ্রদীপ্ত হৃদয়ের বর্ণ।' বিজয়া নিতান্ত হিন্দুদের একটি সামাজিক অনুষ্ঠান, কিন্তু রবীন্দ্রনাথ তাতে 'অস্তসূর্যের দিকে মুখ ফিরাইয়া যে মুসলমান নমাজ পড়িয়া উঠিয়াছে' তাকেও সম্ভাষণ করার আহ্বান জানিয়েছেন। তিনি নিশ্চয়ই লক্ষ্য করছিলেন, জাতীয় আন্দোলন ক্রমশই হিন্দু প্রতীকগুলিকে অবলম্বন করছিল, যা বৃহত্তর মুসলমান সমাজকে দূরে সরিয়ে দিতে পারে। এখানে বিষয়টি তিনি সাধারণভাবে স্পর্শ করে গেছেন মাত্র, কিন্তু ক্রমেই তিনি এই প্রবণতার বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়েছেন। ভাষণটি তিনি শেষ করলেন তাঁর বিখ্যাত 'রাখীসংগীত' 'বাংলার মাটি বাংলার জল' দিয়ে—সম্ভবত তিনি এটি গেয়ে শুনিয়েছিলেন।

ভাদ্র-সংখ্যা ভাণ্ডার যথাসময়ে প্রকাশিত হয়নি, ভাদ্র-আশ্বিন [প্রথম ভাগ] যুগ্ম-সংখ্যা রূপে প্রকাশিত হয় 22 Sep [শুক্র ৬ আশ্বিন]। এই সংখ্যায় রবীন্দ্রনাথের বারোটি স্বদেশীসংগীত মুদ্রিত হয়, স্বচ্ছন্দেই অনুমান করা চলে এগুলি ৬ আশ্বিনের পূর্বে লেখা। এই সংখ্যায় রবীন্দ্র-রচনার সূচীটি যথেষ্ট দীর্ঘ :

১৮৩ 'বান।/(সারিগানের সুর)' [এবার তোর মরা গাঙে বান এসেছে] দ্র গীত ১।২৪৫

১৮৪ 'একা।/(বাউলের সুর)' [যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে] দ্র গীত ১।২৪৫-৪৬

১৮৫-৮৭ 'বঙ্গব্যবচ্ছেদ'

১৮৭-৮৯ 'শোকচিহ্ন' [যদ্দৃষ্টং]

১৮৯-৯০ 'পার্টিশানের শিক্ষা'

১৯৫-৯৬ ‘মাতৃমূর্ত্তি’ [আজি বাংলাদেশের হৃদয় হতে]

১৯৬-৯৭ ‘মাতৃগৃহ।/(বাউলের সুর)’ [মা কি তুই পরের দ্বারে]

১৯৭ ‘প্রয়াস।/(বাউল)’ [তোর আপন জনে ছাড়বে তোরে]

১৯৮ ‘বিলাপী।/(বাউলের সুর)’ [ছি ছি, চোখের জলে]

১৯৯-২০১ ‘করতালি’

২০৩-০৬ ‘বাউল’।

২০৩-০৪ (১) যে তোমায় ছাড়ে ছাড়ুক দ্র গীত ১।২৫৭-৫৮

২০৪ (২) যে তোরে পাগল বলে দ্র ঐ ১।২৫৮

২০৪-০৫ (৩) ওরে তোরা/নেইবা কথা বল্লি দ্র ঐ ১।২৫৮

২০৫ (৪) যদি তোর ভাবনা থাকে দ্র ঐ ১।২৫৮-৫৯

২০৫-০৬ (৫) আপনি অবশ হলি তবে দ্র ঐ ১।২৪৬-৪৭

২০৬ (৬) জোনাকি, কি সুখে ঐ ডানা দুটি মেলেছে দ্র ঐ ২।৫৮২

২১১-১২ ‘প্রস্তাব’।/‘দেশীয় নাম’

২১২-১৩/‘স্বদেশী ভিক্ষু-সম্প্রদায়’

বিলিতি জিনিস ব্যবহার না করার সংকল্প যে ক্রমে ক্রমে সমস্ত দেশে ছড়িয়ে পড়ছে, এই বিষয়টিকে রবীন্দ্রনাথ একটি বিশেষ দৃষ্টিকোণ থেকে দেখিয়েছেন ‘বঙ্গব্যবচ্ছেদ’ প্রবন্ধে। এই ব্যবচ্ছেদের ফলে দেশবাসীর অন্নবস্ত্র-বাসস্থানের বিশেষ ক্ষতি না হলেও ‘ইহাতে আমাদের একমাত্র যথার্থ অনিষ্ট এই যে, সমস্ত বাংলা দেশ এক শাসনাধীনে থাকিলে বাঙালির অন্তঃকরণে যে একটা ঐক্যের অনুভূতি জাগ্রত থাকে, নানাকারণে বাঙালির একত্রে মিলিবার যে বহুতর উপলক্ষ ঘটে, তাহা নষ্ট হইলে আমরা ভিতরে ভিতরে যে বল-লাভের পথে চলিতেছিলাম, তাহাতে বাধা পড়িবে।’ সমস্ত বাংলা এক শাসনাধীনে ছিল বলে কলকাতা বাংলা দেশের মর্মস্থান হয়ে উঠেছিল। শিক্ষা, বাণিজ্য, বিচার, বিলাসভোগ প্রভৃতির আকর্ষণে এখানে জনসমাগম হচ্ছিল বলে ‘কলিকাতায় সমস্ত বাংলা দেশের হৃদয় গঠিত হইয়া উঠিতেছিল’। কলকাতা সমগ্র বাংলার জন্য চিন্তা করছিল, বেদনা বোধ করছিল, সর্ববিষয়ে আদর্শ খাড়া করে তুলছিল—কলকাতার ভাষা বা রীতিপ্রকৃতি কোনো বিশেষ জেলার নয়, তা সমগ্র বাংলাদেশের। ‘কলিকাতায় বাংলার অংশ-প্রত্যংশগুলি আপনাদের সকল প্রকার প্রাদেশিক পার্থক্য মিলাইয়া দিয়া একটি সম্পূর্ণ বিশ্ববঙ্গের প্রতিষ্ঠা করিতেছিল। এইরূপে এক বিপুল হৃৎপিণ্ডের সহিত বাংলাদেশের সমস্ত রক্তাবহা নাড়ির যোগসাধন হওয়াতেই এক প্রাণে বাংলার সমস্ত বৃহৎ কলেবর সঞ্জীবিত হইয়া উঠিতেছিল—অক্লান্ত-জাগ্রত কলিকাতার জোরেই সমস্ত বাংলাদেশ বল পাইতেছিল।’ কিন্তু বাংলার রাষ্ট্রকলেবর দু'টুকরো হওয়ায় দেশের নাড়িজালের মধ্যে ছেদ পড়ে রক্তপ্রবাহ ও চেতনাপ্রবাহ দুই স্বতন্ত্র কেন্দ্র আশ্রয় করল। এতে বাংলাদেশকে দুর্বল ও এককে দুই করে তাদের মধ্যে ক্রমশ নানাপ্রকার পার্থক্য ও বিরোধ সৃষ্টি করার সুযোগ তৈরি হল। এইরূপ সন্দেহ প্রকাশ ও বিলিতি জিনিস কেনা বন্ধ করার চেষ্টা করাতে বাঙালির প্রতি ইংরেজের সহানুভূতি কমে যাচ্ছে বলে ইংলিশম্যান মন্তব্য করেছে। রবীন্দ্রনাথ বলেন, এই ক্ষীণপ্রাণ সহানুভূতিতে বাঙালির কোনো লাভ নেই। এরকম না করলেও বাঙালির দুঃখে বিগলিত

হয়ে গবর্মেণ্ট বঙ্গবিভাগ রহিত করত, এমন আশা করা যায় না। 'প্রজার প্রবল ইচ্ছায় সায় দিতে গবর্মেন্টের সাহস হয় না—সেখানে গবর্মেন্ট দুর্ব্বল।' তবু এই চাঞ্চল্য ও উৎসাহে বাঙালিরই লাভ, কারণ 'এই চাঞ্চল্য আমাদের নিজের শক্তিকে জাগ্রত করিয়া তুলিতেছে। নিজের প্রাণশক্তিকে অনুভব করাই যে একটা পরম সফলতা। পার্টিশনের প্রস্তাবে আমাদের সকলের মনে যে একটা আন্দোলন উঠিয়াছে, ইহাতেই আমরা বুঝিতেছি পার্টিশান ঘটিলেও আমাদের তেমন ক্ষতি করিবে না। আমাদের অন্তরের মধ্যে যখন এতটা প্রেম প্রচ্ছন্ন আছে, যখন এতটা বেদনাবোধের শক্তি আছে, তখন বাহিরের বিচ্ছেদের উপরে জয়ী হইবার আশা আমাদের দূর হইবে না।'

'পার্টিশনের শিক্ষা' প্রবন্ধেও রবীন্দ্রনাথ এই আলোচনারই সূত্র অনুসরণ করেছেন। গবর্মেন্টের উপর চাপ সৃষ্টি করার জন্য দেশের লোককে এক হবার জন্য নেতারা পূর্বে যে উপদেশ দিতেন, সেই আবেগহীন সুবুদ্ধির আকর্ষণে দেশ একত্রিত হয়নি। কিন্তু এবারকার আন্দোলনে দেশবাসীর নাড়ীতে টান পড়ায় লাভ-লোকসানের কথা বিবেচনা না করেই 'একপ্রকার গভীরভাবে অন্ধভাবে' সকলেই বেদনা বোধ করছে। রবীন্দ্রনাথ হৃদয়ের এই অহেতুক প্রেমকেই চরম লাভ বলে গণ্য করেছেন, তাঁর মতে, 'এই প্রেম জিনিষটা অন্যের মনে সঞ্চার করিবার উপায়, ভাষায়, আচরণে ও সেবায় এই প্রেম অকৃত্রিমভাবে প্রকাশ করা। দেশকে ভালবাসিলে যে আমাদের কোনো সুবিধা আছে একথা বলিয়া ভালবাসা পাওয়া যায় না। ভালবাসা নিজেই নিজের লক্ষ্য—আর কোনো লক্ষ্যকে সে স্বীকার করে না।' অশিক্ষিত চাষীর মনেও দেশকে ভালোবাসার যে ভাব নিগূঢ়রূপে আছে, তাকে চেতনার এলাকার মধ্যে বের করে আনতে পারলে তারাও দেশের ক্ষতিকে নিজের ক্ষতির চেয়ে বেশি বলে অনুভব করতে পারবে। নেতারা যদি দেশের প্রেমে প্রাকৃতসাধারণের অসুবিধাকে নিজে গ্রহণ করতে পারেন, তবে সাধারণলোক দেশপ্রেমকে একটা বাস্তব জিনিস বলে বুঝতে পারবে। দেশকে নিজের জিনিস বলে উপলব্ধি হওয়াতেই বিলিতি জিনিস পরিত্যাগ করে দেশি জিনিস ব্যবহার করাতে দেশবাসী প্রবৃত্ত হয়েছে, সেইজন্য দোকানদাররাও ক্ষতি স্বীকার করে বিলিতি জিনিস কিনতে বারণ করছে, বালকেরা বিলিতি জিনিসের প্রলোভন ত্যাগ ও স্ত্রীলোকেরা সাজসজ্জার প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করছে। রবীন্দ্রনাথের বিশ্বাস, 'আমরা আমাদের দেশি জিনিস ব্যবহার করিব এই সংকল্পের মধ্যে রাগ আছে বা জেদ আছে বলিয়াই যে ইহা এমন ব্যাপ্ত হইয়াছে, তাহা নহে—ইহার মধ্যে প্রেম আছে। দেশের জিনিষই দেশের সকলে ব্যবহার করিব, ইহা আমাদের হৃদয়ে লাগিয়া গেছে—ইহা আমাদের নিগূঢ় প্রীতিকে জাগাইয়া তুলিয়াছে, সেই জন্যই ইহা এত বল পাইয়াছে।...ইহা ''বয়কটিং'' নহে, ইহা ফাঁকা আওয়াজ নহে, ইহা সত্যকার সামগ্রী, ইহা দেশের প্রতি দেশের লোকের শ্রদ্ধা।'

'শোকচিহ্ন' ও 'করতালি' একটু ভিন্নধরনের প্রবন্ধ। বঙ্গবিভাগের প্রস্তাব বা সেই বিষয়ে লিখিত সম্পাদকীয় প্রবন্ধ অনেক পত্রিকায় কালো বর্ডার দিয়ে মুদ্রিত হয়েছিল। আত্মীয়ের মৃত্যু উপলক্ষেও অনেক বাঙালি কালাপেড়ে চিঠির কাগজ ও লেফাফা ব্যবহার করে থাকেন। প্রথাটি বিদেশী। শোক উপলক্ষে প্রত্যেক সম্প্রদায়েই কিছু-কিছু বিধিবদ্ধ সামাজিক আচার পালন করতে হয়, কিন্তু সেই অধীনতা কেবল নিজের সমাজের কাছে, তার বাইরে আমাদের হৃদয়ের কোনো বন্ধন নেই। দেশ যেখানে বলের দ্বারা অধীন সেখানে গত্যন্তর নেই, কিন্তু সামাজিক ব্যাপারে স্বাধীন হয়েও ইচ্ছাপূবক পরবশতার চিহ্ন ধারণ করার মধ্যে যে মজ্জাগত দাসত্বের পরিচয় আছে, তাকে ধিক্কার দিয়ে 'শোকচিহ্ন' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন : 'সম্পাদক

মহাশয়, তোমাদের কাগজ হইতে এই কালিমা মুছিয়া ফেল। আজ স্বদেশ হইতে বিদেশসংসর্গের অনেকগুলি কালিমা প্রক্ষালন করিবার জন্য তোমরা আহ্বান করিতেছ—দেশের অঙ্গে বিদেশী কালী দিয়া নূতন কলঙ্ক আর লেপন করিও না! আমাদের শোক আজি শুভ্র হউক্, সংযত হউক, নিরাভরণ হউক;—কঠোর ব্রত দ্বারা তাহা আপনাকে সফল করুক, অনাবশ্যক অনুকরণের দ্বারা তাহা দেশে বিদেশে আপনার কৃষ্ণাশ্রুরেখাকে হাস্যকর করিয়া না তুলুক!'

শোক প্রকাশের জন্য কালাপেড়ে চিঠির কাগজ ও লেফাফা ব্যবহারের মতো আনন্দ প্রকাশের জন্য করতালি দেওয়ার প্রথাও বিদেশী—সভাস্থলে এইরূপ অকস্মাৎ অসংযম প্রাচ্যপ্রকৃতির পক্ষে নিতান্ত অসংগত। 'করতালি' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন : 'এরূপ উৎকট উপায়ে মান্য ব্যক্তিকে সম্মান করা হয় না—কারণ, সম্মান করিবার উপায় কখনই অসংযত হইতে পারে না। আমাদের দেশে করতালি চিরকাল অপমানের উদ্দেশেই ব্যবহার করা হইয়াছে—বস্তুত তাহাই সঙ্গত—কারণ, অসংযমের দ্বারাই অপমান করা যায়। তাই চিৎকার-রব দুয়ো বা সশব্দে করতালি দেওয়া অপমানের উপায়। অপর পক্ষে যিনি আমাদের সম্মানের যোগ্য, তাঁহার কাছে আমরা আত্মসম্বরণ করিয়া থাকি, কোনো প্রকার প্রগল্ভতা করি না।' ইংরেজ অনেক সময়ে উৎসাহের উদ্দীপনায় তাদের জনপ্রিয় লোককে কাঁধে করে নিয়ে যায়, অনেক সময়ে তাঁর গাড়ির ঘোড়া খুলে গাড়ি টানতে থাকে—'আমরাও ইংরেজের নকল করিয়া অনেক সময়ে এইরূপ লজ্জাকর হাস্যকর অশোভনতায় প্রবৃত্ত হই—তখন আমাদের দেশলক্ষ্মীর মুখ লজ্জায় নত হইয়া যায়।' জাপানে সৈনিকদের যুদ্ধযাত্রার সময়ে আত্মীয়বিচ্ছেদের সংযত ও শান্ত রূপ দেখে য়ুরোপীয়রা মনে করেছিল, জাপানীদের মধ্যে গার্হস্থ্যপ্রেমের গাঢ়তা নেই, কিন্তু 'প্রাচ্যদেশে আত্মসংবরণ ও সংযমই পৌরুষের আদর্শ—আমরা স্তব্ধতা দ্বারাই কেবল পরের প্রতি নহে, নিজের মনুষ্যত্বের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিয়া থাকি।' 'চীয়ার্স' দেওয়ার বিজাতীয় প্রথাকে ধিক্কৃত করে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, মান্যব্যক্তি সভাস্থলে উপস্থিত হলে করতালির পরিবর্তে দাঁড়িয়ে ওঠা ও বক্তৃতা শ্রবণকালে উৎসাহ অনুভব করলে 'সাধু সাধু' শব্দে বক্তাকে সাধুবাদ দেওয়াই শোভন ও সম্মানজনক। তিনি লিখেছেন : 'লিভারপুলের লবণ এবং ম্যাঞ্চেষ্টারের বস্ত্র আমাদের তেমন ক্ষতি করে না; কিন্তু স্বেচ্ছাপূর্ব্বক এই সকল বিদেশীয় প্রথার বন্ধন স্বীকার করিলে আমাদের অন্তঃকরণে বিকার উপস্থিত হয়।...হৃদয়ের মধ্যেই আমাদের স্বাধীনতার শেষ দুর্গ—সেখানকার চাবি আমাদের নিজের হাতে,—রাজার সাধ্য নাই সেখানে প্রবেশ করেন। সেখানে যদি আমরা স্বেচ্ছাপূর্ব্বক বিদেশী নিয়ম চালাইতে থাকি, তবে ভিক্ষুকতার পরম দুর্গতি দাসত্বের চরম লাঞ্ছনা আমরা লাভ করিব।' উল্লেখ্য, শান্তিনিকেতনে আজও ছাত্রছাত্রীরা 'সাধু' শব্দে তাদের আনন্দ প্রকাশ করে থাকে।

স্টার, ক্লাসিক, গ্র্যাণ্ড, য়ুনীক্ [Unique] প্রভৃতি বাঙালি-পরিচালিত নাট্যমঞ্চগুলির বিদেশী নাম সম্পর্কে অনুযোগ করে রবীন্দ্রনাথ 'দেশীয় নাম'-শীর্ষক প্রস্তাবে এগুলির নাম পরিবর্তনের জন্য সুপারিশ করলেন। নাট্যাভিনয় ভারতে নতুন নয়—নাট্যমঞ্চ নাট্যশালা প্রভৃতি শব্দগুলি তাদের প্রাচীনত্বই প্রমাণ করে—সুতরাং দেশীয় লোকের এই প্রমোদভবনগুলির গায়ে-পড়ে বিদেশী নামকরণ বাঙালির লজ্জা ঘোষণা করে। একবার একটি নাম প্রচলিত হয়ে গেলে তা পরিবর্তন করা অসুবিধাজনক, ব্যবসার পক্ষেও হয়তো ক্ষতিকর—'কিন্তু বর্ত্তমানে এমন একটি সুযোগ উপস্থিত হইয়াছে যখন এই নাট্যশালাগুলির পক্ষে বিলাতি নাম বিলাতি পোষাকের মত ছাড়িয়া ফেলাটা লোকের চক্ষে আকস্মিক ও নিরর্থক বলিয়া ঠেকিবে না। বরঞ্চ তাহা আমাদের

দেশের লোকের বর্ত্তমান হৃদয় ভাবের সহিত মিশ খাইয়া আমাদের স্বদেশপ্রেমের আনন্দোচ্ছ্বাসে নূতন তরঙ্গ তুলিবে।' তাই রবীন্দ্রনাথ প্রস্তাব করেছেন, 'পূজার আনন্দ-অবকাশে একদিন বিশেষ উৎসব করিয়া দেশীয় নাট্যশালাগুলি মাতৃভূমির আশীর্ব্বাদের সহিত নূতন দেশীয় নাম গ্রহণ করুন—ইহাতে তাঁহাদের মঙ্গল হইবে।' অবশ্য সেই সময়ে নাট্যশালাগুলি রবীন্দ্রনাথের এই প্রস্তাবে কর্ণপাত করেনি—শিশিরকুমার ভাদুড়ী [1889-1959] 1924-এ 'নাট্যমন্দির' প্রতিষ্ঠা করে প্রস্তাবটি প্রথম কার্যকর করেন।

আমাদের দেশে ভিক্ষুক গায়কগণ ধর্মশাস্ত্রের অনেক গভীর তত্ত্ব ও গাঢ়রসোচ্ছ্বাস যেমন সহজ কথায় ও সুরে সাধারণ লোকের দ্বারে দ্বারে পরিবেশন করে ধর্মভাব প্রচারে সহায়তা করেছে, তেমনি আপাতত কলকাতা শহরে একটি শখের ভিক্ষুসম্প্রদায় সহজ কথা ও সুরে স্বদেশের গান বেঁধে দ্বারে দ্বারে গেয়ে বেড়িয়ে ভিক্ষা সংগ্রহ করে দেশের কাজে লাগালে সেই দৃষ্টান্ত ক্রমে সমস্ত দেশে একটি প্রথায় পরিণত হতে পারে—'স্বদেশী ভিক্ষুসম্প্রদায়' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ এই প্রস্তাব করে লিখলেন : 'স্বদেশের মধ্যে ভগবানের একটি বিশেষ আবির্ভাব উপলব্ধি করা ও স্বদেশের হিতসাধন ভগবানের সেবার একটি বিশেষ অঙ্গ বলিয়া গণ্য করা যদি আমরা ধর্ম্ম বলিয়া স্বীকার করিতে আরম্ভ করিয়া থাকি তবে সেই ধর্ম্ম দেশের আবালবৃদ্ধবনিতার মধ্যে প্রচার করিবার স্বদেশি উপায়কে আমরা যেন উপেক্ষা না করি।' তিনি উক্ত ভিক্ষাকে জীবিকার উপায় করে নেবারও পরামর্শ দিয়েছেন। তাঁর বক্তব্য, আমাদের দেশের অধ্যাপকেরাও ভিক্ষাজীবী ছিলেন, অন্যের স্বেচ্ছাপ্রদত্ত দানের পরিবর্তে তাঁরা সমাজকে চতুর্গুণ প্রতিদান করতেন। 'তেমনি যে সকল ভিক্ষুক নাম গান করিয়া দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা সংগ্রহ করে—তাহারা যাহা পায় তাহার চেয়ে অনেক বেশি দেয়—তাহারা দেশের চিত্ত আকাশ হইতে প্রত্যহ কলুষ মোচন করিয়া, তাহাকে মধুময় করিয়া তুলিতেছে। কর্ম্মের ঘোরতর আন্দোলনের মধ্যেও তাহারা জীবনের চরম লক্ষ্যকে স্মরণ করাইয়া সংসারের কত আবর্জ্জনা দূর করিতেছে তাহার হিসাব লওয়া শক্ত। এইরূপে যে সম্প্রদায় স্বার্থনিরত লোকদিগকে প্রত্যহ স্বদেশী কর্ত্তব্য স্মরণ করাইয়া বেড়াইবেন—স্বদেশের স্বরূপকে অন্যমনস্কের মনে জাগ্রত করিয়া রাখিবেন, স্বদেশের প্রতি প্রেমকে প্রত্যহ সুরে তানে দেশের পথে ঘাটে উদ্বোধিত করিয়া তুলিবেন তাঁহারা এই মহৎ কর্ত্তব্য সাধনের দ্বারা যদি জীবিকা সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হইতে পারেন তবে তাহাতে লজ্জার বিষয় কিছুই নাই।'

জীবনোপায় না করলেও রবীন্দ্রনাথের উপদেশানুসারে কলকাতায় গান গেয়ে ভিক্ষাসংগ্রহকারী 'বন্দেমাতরম্ সম্প্রদায়' নামে একটি দলের প্রতিষ্ঠা হয়। সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সভাপতি, রবীন্দ্রনাথ, চিত্তরঞ্জন দাস ও কুমার শরৎচন্দ্র রায় (দিঘাপতিয়া) সহ-সভাপতি, অমৃতলাল মিত্র কোষাধ্যক্ষ এবং নন্দকিশোর মিত্র ও হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ এই সম্প্রদায়ের যুগ্ম-সম্পাদক ছিলেন।[৩৬] রবীন্দ্রনাথের 'আমরা পথে পথে যাব সারে সারে,/তোমার নাম গেয়ে ফিরিব দ্বারে দ্বারে' গানটি হয়তো উক্ত 'প্রস্তাব' উপলক্ষেই লেখা। রথীন্দ্রনাথ লিখেছেন : 'দিনেন্দ্রনাথের নেতৃত্বে আমরা একটি বৈতালিক দল গঠন করে রোজ সকালে স্বদেশী গান গেয়ে ন্যাশন্যাল ফণ্ডের জন্য টাকা তুলতে লেগে গেলুম। বড়ো ভালো লাগত যখন রাস্তার পানওয়ালা বা ফিরিওয়ালারা আমাদের ঝুলিতে পয়সা ফেলে দিত।'[৩৬ক] শান্তিনিকেতনে ও গিরিডিতেও তাঁরা এইরূপ স্বদেশী ভিক্ষুসম্প্রদায় গঠন করেছিলেন।

ভাদ্র-আশ্বিন-সংখ্যা ভাণ্ডার-এর দ্বিতীয় ভাগ 27 Oct [শুক্র ১০ কার্তিক] প্রকাশিত হয়। এই সংখ্যায় রবীন্দ্রনাথের একটি প্রবন্ধ ও তিনটি গান মুদ্রিত হয় :

২১৫-১৭ ‘উদ্বোধন’

২৩৭-৩৮ ‘রাখী সঙ্গীত।’

২৩৭ (১) বাংলার মাটি, বাংলার জল দ্র গীত ১।২৫৫

২৩৭-৩৮ (২) বেহাগ।/ওদের বাঁধন যতই শক্ত হবে দ্র ঐ ১।২৬৫-৬৬

২৩৮ (৩) খাম্বাজ।/বিধির বাঁধন কাট্‌বে তুমি দ্র ঐ ১।২৬৬

এছাড়া ‘সঞ্চয়’ [পৃ ২৩৯-৪৬]-এর অন্তর্গত স্বাক্ষর-হীন রচনাগুলি রবীন্দ্রনাথ কর্তৃক লিখিত হওয়া সম্ভব। ‘দেখা গেছে’ ও ‘হইয়া গেছে’-জাতীয় প্রয়োগের জন্য যথাক্রমে ‘জীবতত্ত্ব’ [পৃ ২৪০-৪১] ও ‘স্ত্রী-অধীনতা’ [পৃ ২৪১-৪২] নিবন্ধ-দুটি রবীন্দ্রনাথের লেখা বলে শনাক্ত করা যায়।

‘উদ্বোধন’ রচনাটি শিরোনামের নীচে ‘(মহিলাসভায় মহিলাকর্ত্তৃক পঠিত)’ টীকা-সহ মুদ্রিত হয়। কিন্তু সূচীপত্রে রচনাটি ‘সম্পাদক’ কর্তৃক লিখিত বলে নির্দেশিত হয়েছে। ইতিপূর্বে ‘ব্রতধারণ’ প্রবন্ধটিও অনুরূপ টীকা-সহ ভাদ্রসংখ্যা বঙ্গদর্শন-এ মুদ্রিত হয়েছিল। উক্ত প্রবন্ধটি ‘আত্মশক্তি’ গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় পাঠকসমাজে পরিচিত, কিন্তু বর্তমান রচনাটির সেই সৌভাগ্য হয়নি। এটিও জনৈক মহিলার জবানীতে লিখিত। রাখীবন্ধনের দিনটিতে প্রত্যুষে উঠেছেন এই নারী, ‘তখন মহানগরী নিস্তব্ধ—বাতাস জাগে নাই—আকাশে উষার স্নিগ্ধতা ও অন্ধকারের মধ্যে আসন্ন আলোকের প্রতীক্ষা বিরাজ করিতেছিল। আর কিছুক্ষণ পরেই যে একটি জগৎ-জোড়া জাগরণ বিপুল বেগে এককালে দশদিকে আন্দোলিত হইয়া উঠিবে, সেই বিরাট শক্তি আপনাকে সম্বরণ করিয়া জল-স্থল-আকাশের মধ্যে স্তম্ভিত হইয়াছিল।’ বিকাশোন্মুখ প্রভাতকে বরণ করে নেবার জন্য উদয়প্রাসাদের স্বর্ণসিংহদ্বারের সম্মুখে আপনার মঙ্গল-আলোকটুকু নিয়ে দণ্ডায়মানা কল্যাণী শুকতারাকে দেখে তাঁর মনে হয়েছে প্রতিদিন প্রাতে সংসার কর্মশালার দ্বার উদ্‌ঘাটন করে গৃহলক্ষ্মী নারী এই একই কাজ করে যাচ্ছে। কিন্তু দেশ ও জাতির সেই মহৎদিনের অভ্যুদয়কালে নারী কোথায়—‘দেশের সুদিনকে বরণ করিয়া লইবার জন্য আজ দেশের কন্যাগণ কি এখনো প্রস্তুত হন নাই?’ কিন্তু একথা বিশ্বাসযোগ্য নয়। ‘তোমরা দেশের হৃদয়নিকেতনের অধিষ্ঠাত্রী; সেই হৃদয়ের তোরণদ্বার আজ যে খুলিয়া গেছে, সেই হৃদয়ের প্রাঙ্গণতলে আজ যে জননী মাতৃভূমির মুহুর্মুহু জয়ধ্বনি উঠিতেছে, তাহাতে তোমাদের নিদ্রা ভঙ্গ হয় নাই, একথা আমি বিশ্বাস করিব না।’ আজ যদি দেশের কোনো নারী প্রস্তুত না হয়ে থাকে, তাহলে বুঝতে হবে ‘সেই দুর্ভাগিনী আপনার হৃদয়কে বিদেশের পায়ে বিক্রয় করিয়াছে, শুভলগ্নে দেশের বরণ ডালা তুলিয়া ধরিবার অধিকার সে স্বেচ্ছাপূর্ব্বক বিসর্জ্জন দিয়াছে।’ রবীন্দ্রনাথ মহিলাসভায় মহিলার জবানীতে আহ্বান জানিয়েছেন : ‘তোমরা—যাঁহারা আজ বিশ্ববঙ্গের বেদনার ব্যথা পাইয়াছ, বিশ্ববঙ্গের মিলনাবেগে গৌরব অনুভব করিতেছ, তোমরা আজ সকলে প্রস্তুত হইয়া এস— তোমাদের দুটি চক্ষু হইতে বিদেশী হাটের মোহাঞ্জন আজ চোখের জলে একেবারে ধুইয়া মুছিয়া এস—যে বিদেশের অলঙ্কার তোমাদের অঙ্গকে সোণার শৃঙ্খলে আপাদমস্তক বন্দী করিয়া রাখিয়াছে, তাহা আজ খণ্ড খণ্ড করিয়া ভাঙিয়া এস, আজ তোমাদের যে সজ্জা তাহা প্রীতির সজ্জা হউক, মঙ্গলের সজ্জা হউক, তাহাতে বিদেশের রেশম-পশম-লেস্-ফিতার জাল-জালিয়াতি অপেক্ষা তোমাদিগকে অনেক বেশি মানাইবে!’ আমাদের অনুমান, ‘ব্রতধারণ’-এর মতো এই রচনাটিও হিরণ্ময়ী দেবী কোনো মহিলাসভায় পাঠ করেছিলেন।

বঙ্গদর্শন, আশ্বিন ১৩১২ [৫।৬] :

২৪৭-৪৮ 'সোনার বাংলা।/বাউলের সুর' দ্র গীত ১।২৪৩

২৬৭-৬৯ 'আগমন' ['তখন রাত্রি আঁধার হল'] দ্র খেয়া ১০।১০৩-০৫

২৭৯-৯৬ 'অবস্থা ও ব্যবস্থা' দ্র আত্মশক্তি ৩।৬০০-১৯

২৯৮ 'দেশের মাটি/(বাউলের সুর)' দ্র গীত ১।২৪৪

সঙ্গীত-প্রকাশিকা, আশ্বিন ১৩১২ [৫।১] :

৩-৪ মিশ্র খাম্বাজ-একতালা। আমি হৃদয়ের কথা বলিতে ব্যাকুল দ্র স্বর ৪৮

৫-৭ সিন্ধু কাফি-একতালা। আমায় বোলো না গাহিতে বোলো না দ্র ঐ ৪৭

১৩-১৭ সোনার বাংলা।/বাউলের সুর।/আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালবাসি দ্র ঐ ৪৬

প্রথম গানটির স্বরলিপিকারের নাম উল্লিখিত হয়নি, সম্ভবত সম্পাদক জ্যোতিরিন্দ্রনাথ স্বরলিপি করেন। অপর দুটি গানের স্বরলিপি করেন ইন্দিরা দেবী।

সরলা দেবীর বিবাহ হয় বৈদ্যনাথধামে ১৮ আশ্বিন [সোম 4 Oct]। বিবাহের পর সকলে কলকাতায় আসেন। রামভজ দত্ত চৌধুরী ২৩ আশ্বিন [সোম 9 Oct] পশুপতিনাথ বসুর বাড়িতে বিজয়া-সম্মিলনে উপস্থিত ছিলেন। পরদিন ২৪ আশ্বিন [মঙ্গল 10 Oct] এই বিবাহ উপলক্ষে জানকীনাথ ঘোষাল তাঁর ২৬ বালিগঞ্জ সার্কুলার রোডের বাড়িতে একটি প্রীতিভোজের আয়োজন করেন।[৩৭] আশা করা যায়, এই অনুষ্ঠানে রবীন্দ্রনাথ উপস্থিত ছিলেন। ২৬ আশ্বিন [বৃহ 12 Oct] সরলা দেবী লাহোরে পতিগৃহে যাত্রা করেন।[৩৮]

রবীন্দ্রনাথ ১১ আশ্বিন [বুধ 27 Sep] সাবিত্রী লাইব্রেরির সভায় রাখীবন্ধনের যে প্রস্তাব করেছিলেন, জনসাধারণ উৎসাহের সঙ্গে তা গ্রহণ করে। 11 Oct [বুধ ২৫ আশ্বিন] বেঙ্গলী পত্রিকায় বঙ্গাক্ষরে 'রাখী সংক্রান্তির ব্যবস্থা' ঘোষিত হয় :

দিন। এই বৎসর ৩০শে আশ্বিন ১৬ই অক্টোবর
আগামী বৎসর হইতে আশ্বিনের সংক্রান্তি।
ক্ষণ। সূর্য্যোদয় হইতে রাত্রি প্রথম প্রহর পর্য্যন্ত।
নিয়ম। উক্ত সময় সংযম পালন।
উপকরণ। হরিদ্রাবর্ণের তিন সূতার রাখী।
মন্ত্র। ভাই ভাই এক ঠাঁই, ভেদ নাই ভেদ নাই।
অনুষ্ঠান। উচ্চ নীচ হিন্দু মুসলমান, খৃষ্টান বিচার না করিয়া ইচ্ছামত বাঙ্গালী মাত্রেই ডান হাতে রাখী বাঁধা। অনুপস্থিত ব্যক্তিকে সঙ্গে মন্ত্রটি লিখিয়া ডাকে বা লোকের হাতে রাখী পাঠাইলেও চলিবে।

13 Oct [শুক্র ২৭ আশ্বিন] উক্ত পত্রিকায় লেখা হয় :

We are requested to announce that Babu Rabindra Nath Tagore has composed a beautiful song in connection with the "Rakhi Bandhan Ceremony" which is to be held on the 16th October. This and the special hymn composed for the occasion, printed on nice country-made cards and also the "Rakhi Threads" are now being sold at the Bhandar office No. 7, Cornwallis Street, Calcutta.

২৯ আশ্বিন [রবি 15 Oct] জগদীশচন্দ্র দার্জিলিং থেকে রবীন্দ্রনাথকে লেখেন : 'তোমার রাখী সঙ্গীত পড়িলাম। তোমার লেখনী স্বর্ণময়ী হউক।"[৩৯] রাখী-সহ কার্ড পেয়েই হয়তো এই পত্র পাঠানো হয়। ৩০ আশ্বিন [সোম 16 Oct] রবীন্দ্রনাথ, গগনেন্দ্রনাথ, সমরেন্দ্রনাথ ও অবনীন্দ্রনাথ এইরূপ একটি কার্ডে স্বাক্ষর

করে মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরকে পাঠান।[৪০] এইদিন রবীন্দ্রনাথ নিজেও একটি কার্ড পাঠিয়েছেন পাটনায় যদুনাথ সরকারকে।[৪১] বরিশালের জননেতা অশ্বিনীকুমার দত্ত একটি কার্ড ও রাখী পেয়ে ৫ কার্তিক [রবি 22 Oct] 'বাটাজোড়' থেকে লিখেছেন : 'শ্রীশ্রীচরণেষু/আপনার প্রেরিত রাখিসূত্র ধারণ করিয়া কৃতার্থ হইয়াছি। আপনি যে আমার ন্যায় নগণ্য ব্যক্তিকে এই ভাবে স্মরণ করিয়াছেন তাহা মনে করিয়া আনন্দে আপ্লুত হইয়াছি।...আমি এতদিন প্রাদেশিক সমিতির কার্য্যোপলক্ষে দূর দূর পল্লীতে ভ্রমণ করিতেছিলাম তাই প্রাপ্তিস্বীকার করিতে বিলম্ব হইল।'[৪২] মনে করা যায়, আরও অনেককে রবীন্দ্রনাথ রাখী ও কার্ড পাঠিয়েছিলেন।

৩০ আশ্বিন [সোম 16 Oct] বঙ্গভঙ্গের দিন কলকাতায় স্বতঃস্ফূর্ত হরতাল পালিত হল। ড রমেশচন্দ্র মজুমদার লিখেছেন : '৩০ শে আশ্বিন প্রভাতে রবীন্দ্রনাথকে পুরোভাগে রাখিয়া বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি ও আপামর জনসাধারণ এক বিরাট শোভাযাত্রা করিয়া গঙ্গাতীরে সমবেত হইল। গঙ্গাস্নান করিয়া পরস্পরের হস্তে রাখি বন্ধন করিল।'[৪৩] ঘরোয়া-য় অবনীন্দ্রনাথ অনুষ্ঠানটির কিঞ্চিৎ আবেগাপ্লুত বর্ণনা দিয়েছেন [পৃ ২৯-৩১]। হৃদয়োচ্ছ্বাসের বহিঃপ্রকাশে রবীন্দ্রনাথের অস্বাভাবিক সংযম ছিল, তবু রাখীবন্ধনের 'মিলনের সাধনা' যে তাঁকে কিছুটা বিচলিত করেছিল তিনি নিজেই সেকথা পরবর্তীকালে বলেছেন সজনীকান্ত দাসকে : 'সামনে যাকে পেতাম, তারই হাতে বাঁধতাম রাখি। সরকারী পুলিস এবং কন্‌স্টেব্‌লদেরও বাদ দিতাম না। মনে পড়ে, একবার একজন কন্‌স্টেবল হাতজোড় ক'রে বলেছিল, মাফ করবেন হুজুর, আমি মুসলমান।'[৪৩ক] কিন্তু দৈনিক পত্রিকাগুলির প্রতিবেদনে গঙ্গাতীরের অভূতপূর্ব জনসমাবেশের সুদীর্ঘ বর্ণনা থাকলেও রবীন্দ্রনাথের নাম কোথাও উল্লেখিত হতে দেখিনি। সকালে বীডন স্কোয়ারে এই উপলক্ষে একটি বড়ো সভা হয়, রবীন্দ্রনাথ সেখানেও উপস্থিত ছিলেন না।

এইদিন দুপুর সাড়ে তিনটের সময় ২৯৪ আপার সার্কুলার রোডে 'ফেডারেশন হল'-এর ভিত্তিপ্রস্তর-স্থাপন উপলক্ষে একটি সভা হয়। দু'হাজার লোকের বসার উপযোগী শামিয়ানা খাটানো হয়েছিল, কিন্তু অমৃতবাজার পত্রিকার সংবাদদাতার মতে, জনসংখ্যা পঞ্চাশ হাজার ছাড়িয়ে যায়। স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় আবেগময় ভাষায় ফেডারেশন হল স্থাপনের উদ্দেশ্য বর্ণনা করে আনন্দমোহন বসুকে সভাপতির পদে বরণ করেন। কঠিন পীড়াগ্রস্ত আনন্দমোহনকে ইনভ্যালিড চেয়ারে করে সভাস্থলে নিয়ে আসা হয়। ক্ষীণ স্বরে কয়েকটি কথা বলে তিনি সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে তাঁর ভাষণটি পাঠ করার জন্য অনুরোধ করেন। ভাষণ পাঠের পর তাঁর অনুরোধে আশুতোষ চৌধুরী তাঁর স্বাক্ষরিত ঘোষণাপত্র ['Proclamation']টি পাঠ করেন :

Whereas the government has thought fit to effectuate the Partition of Bengal in spite of the universal protest of the Bengali nation, we hereby pledge and proclaim that we as a people shall do everthing in our power to counteract the evil effects of the dismemberment of our Province and to maintain the integrity of our race. So God help us.

—রবীন্দ্রনাথ ঘোষণাপত্রটির বঙ্গানুবাদ পাঠ করেন।

এরপর সভাপতি ভিত্তি-প্রস্তর স্থাপন করেন। তার নীচে একটি কাঁচের পাত্রে প্রচলিত মুদ্রা এবং ইন্ডিয়ান মিরর, বেঙ্গলী, অমৃতবাজার পত্রিকা, হিন্দু পেট্রিয়ট, টেলিগ্রাফ, ইণ্ডিয়ান নেশন, নিউ ইণ্ডিয়া, সঞ্জীবনী, বঙ্গবাসী, হিতবাদী ও বসুমতী পত্রিকা রক্ষিত হয়।

সভার শেষে সেই বিশাল জনতা পদব্রজে আপার সার্কুলার রোড অতিক্রম করে বাগবাজারে পশুপতিনাথ বসুর বাড়িতে উপস্থিত হয়। মিছিলে রবীন্দ্রনাথও ছিলেন এবং তাঁর রচিত স্বদেশী সংগীত সহস্র কণ্ঠে ধ্বনিত হয়।

ইতিপূর্বে ২৬ আশ্বিন [বৃহ 12 Oct] ময়মনসিংহের মহারাজার বাড়িতে তাঁর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এক সভায় একটি জাতীয় ভাণ্ডার গড়ে তোলার প্রস্তাব নেওয়া হয় :

...it was resolved that the nucleus of a National Fund should be formed on that memorable day. The object of the Fund would be the development of national resources by the establishment of cotton industries all over the country. The collection of the fund will begin on the 16th when a meeting will be held at the house of Rai Pasuputty Nath Bose, No. 65, Baghbazar Street to which the general public will be invited with a request that they would be pleased to contribute at least one day's income to the proposed Fund....The time fixed for the meeting of the 16th is from 4 o'clock to 9 o'clock.[88]

ময়মনসিংহের মহারাজা, বগুড়ার নবাব, কুমার মন্মথনাথ মিত্র, কুমার সতীশচন্দ্র সিংহ ও গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর এই জাতীয় ভাণ্ডারের ট্রাস্টী মনোনীত হন—মন্মথনাথ মিত্র ও পশুপতিনাথ বসু হন কোষাধ্যক্ষ।

৩০ আশ্বিন এই ভাণ্ডারের জন্য অর্থসংগ্রহের উদ্দেশ্যেই পশুপতিনাথ বসুর বাড়িতে সকলে সমবেত হন। তিনটি মঞ্চ থেকে ভাষণ দেন সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, রসিকমোহন চক্রবর্তী, মনোরঞ্জন গুহঠাকুরতা, ললিতমোহন ঘোষাল, ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ, শ্যামসুন্দর চক্রবর্তী, মন্মথমোহন বসু প্রভৃতি। অমৃতবাজার পত্রিকার [17 Oct] বিবরণে জানা যায়, এইদিন প্রায় ত্রিশ হাজার টাকা সংগৃহীত হয়েছিল। ২ কার্তিক [বৃহ 19 Oct] রবীন্দ্রনাথের ক্যাশবহির হিসাব : 'বঃ কুমার মন্মথনাথ মিত্র দং জাতিয় ভাণ্ডারে সাহার্য্য ১০০'।

৩০ আশ্বিন [সোম 16 Oct] বঙ্গবিভাগ কার্যকর হওয়ার দিন পর্যন্ত বঙ্গভঙ্গ-বিরোধী আন্দোলনের প্রথম পর্যায় বলা যেতে পারে। এই পর্যায়ে বিলিতি ভোগ্যপণ্য বয়কট, স্বদেশী শিল্পের সংগঠন ও প্রচার এবং এই উদ্দেশ্যে জাতীয় ধনভাণ্ডার স্থাপন—সভা, মিছিল, বক্তৃতা ও লেখালেখি ছাড়া—এই তিনটিকে প্রধান কার্যকরী পদক্ষেপ বলে গণ্য করা যায়। রবীন্দ্রনাথ এই পর্বে পাঁচটি সভায় যোগ দিয়ে দুটিতে লিখিত ভাষণ পাঠ করেছেন, একটিতে সভাপতিত্ব ও মৌখিক বক্তৃতা করেছেন, একটিতে ঘোষণাপত্রের বঙ্গানুবাদ পাঠ করে অন্যটিতে শুধু উপস্থিত থেকেছেন। অপর নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের তুলনায় এই ভূমিকা নিতান্তই সংক্ষিপ্ত। অবশ্য ভাণ্ডার ও বঙ্গদর্শন-এ এ-বিষয়ে তাঁর লেখালেখি পরিমাণ কম নয়। সেখানে তিনি কার্যকরী প্রস্তাবের মাধ্যমে বাঙালিজাতির ঐক্য ও সংহতি বিস্তারের উপর জোর দিয়েছেন—ভিতর থেকে ঐক্য গড়ে তুললে বাইরের আঘাতে তা আরও সংহত হবে, তাঁর এই ঐকান্তিক আশা প্রায় সবগুলি রচনাতেই ব্যক্ত হয়েছে। বয়কটকেও তিনি দেখেছেন একই দৃষ্টিকোণ থেকে—ইংরেজের উপর রাগ বা জেদের বশবর্তী হয়ে নয়, দেশকে ভালোবেসে দেশীয় শিল্পজাত দ্রব্যাদির ব্যবহার ও সেই কারণে কিছু ভোগ্যবস্তু থেকে নিজেদের বঞ্চিত রাখার মধ্যে যে ভাবাত্মক [positive] দিকটি আছে, তাকেই তিনি প্রাধান্য দিয়েছেন তাঁর রচনাগুলিতে। সহজ পরিচিত সুরের কাঠামোয় রচিত তাঁর স্বদেশী সংগীতগুলিতে ভাবাবেগ কোথাও-কোথাও দেশজননীর সৌন্দর্যময়ী কল্পমূর্তি রচনায় ব্যাপৃত হয়েছে বটে, কিন্তু আত্মশক্তিতে উদ্বুদ্ধ হওয়ার সংগ্রামী আহ্বানও সেখানে দুর্লক্ষ্য নয়। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনে রবীন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠ দান ঐ ভাবাত্মক দৃষ্টিভঙ্গি ও স্বদেশী গানগুলি—গান গেয়ে তিনি একটি জনসম্প্রদায়কে একটি জাতিতে পরিণত করার চেষ্টা করেছিলেন।

স্বদেশী আন্দোলনকে রবীন্দ্রনাথ দেখেছিলেন একটি বড়ো ভাবের দিক থেকে। ১ অগ্র° [শুক্র 17 Nov] তিনি দীনেশচন্দ্র সেনকে 'স্বদেশী আন্দোলন ইতিহাসের গুটিকয়েক সূত্র' বিবৃত করতে গিয়ে [দ্র চিঠিপত্র ১০। ৩০-৩৩] লেখেন : 'দেশ অন্তরে অন্তরে স্বদেশী ভাবে দীক্ষিত হইয়া আসিতেছিল। এমন সময় পার্টিশন ব্যাপার একটা উপলক্ষ্য মাত্র হইয়া এই স্বদেশী আন্দোলনকে স্পষ্টরূপে বিকশিত করিয়া তুলিল। বস্তুতঃ বয়কট করার ছেলেমানুষী ইহার প্রাণ নহে।' এটি অবশ্য প্রকৃতপক্ষে কোনো চিঠি নয়। দীনেশচন্দ্রের পুত্র বিনয়চন্দ্রের কার্যাধ্যক্ষতায় প্রকাশিত 'ইতিহাস ও আলোচনা' নামক একটি ক্ষণজীবী পত্রিকার শ্রাবণ ১৩২৮ [১।৩]-সংখ্যায় সম্বোধন ও স্বাক্ষর বর্জন করে রচনাটি 'স্বদেশী প্রচেষ্টার ইতিহাস' [পৃ ৪৯-৫২] নামে মুদ্রিত হয়। রচনা-শেষে মুদ্রিত একটি টীকায় পত্র-রচনার উপলক্ষটি বর্ণিত হয়েছে : '১৩১২ সনের ১লা অগ্রহায়ণ তারিখে শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয়ের নিকট লিখিত পত্র হইতে গৃহীত। এই খসড়া হইতে বড় করিয়া একটা প্রবন্ধ বঙ্গদর্শনের জন্য লিখিবার ভার দীনেশ বাবুর উপর ছিল।'*

বঙ্গদর্শন, কার্তিক ১৩১২ [৫।৭] :

৩৪০ 'হবেই হবে'/বাউলের সুর/নিশিদিন ভরসা রাখিস দ্র গীত ১।২৪৬

৩৪১ 'দ্বিধা'/বেহাগ-একতালা/বুক বেঁধে তুই দাঁড়া দেখি দ্র ঐ ১।২৬০-৬১

৩৪১-৪২ 'অভয়'/ভূপালি-একতালা/আমি ভয় ক্‌রব না দ্র ঐ ১।২৪৬

৩৪৯-৫৪ 'বিজয়া-সম্মিলন' দ্র ভারতবর্ষ ৪।৪৬৮-৭৪

ভাণ্ডার, কার্তিক ১৩১২ [১।৭] :

২৪৭ সিন্ধু ভৈরবী-একতালা/ওরে ভাই মিথ্যা ভেবনা দ্র গীত ৩।৮২৩

২৫৮ প্রশ্ন

কার্তিক-সংখ্যা ভাণ্ডার প্রকাশিত হয় বেঙ্গল লাইব্রেরির তালিকানুযায়ী 8 Dec [শুক্র ২২ অগ্র°] তারিখে। ইতিমধ্যে বাংলার রাজনৈতিক জীবনে অনেক গুরুতর ঘটনা ঘটে গেছে, তারই প্রতিফলন আছে 'সম্পাদক'-কর্তৃক উত্থাপিত দুটি 'প্রশ্ন'-তে, যার উত্তর দিয়েছেন যোগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, রাখালচন্দ্র সেন, অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়, কামিনীকুমার চন্দ, অশ্বিনীকুমার দত্ত, অম্বিকাচরণ মজুমদার, বিপ্রদাস পালচৌধুরী ও প্রমথনাথ রায়চৌধুরী। প্রশ্নগুলি হল :

১। মফস্বল স্কুল কলেজের কর্ত্তৃপক্ষের প্রতি গবর্ণমেন্ট যে পরোয়ানা জারি করিতেছেন তৎসম্বন্ধে বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ, অধ্যাপক ছাত্র ও ছাত্রগণের অভিভাবকদের কি কর্ত্তব্য?

২। জাতীয় ধন ভাণ্ডারে যে অর্থ সংগৃহীত হইতেছে কিরূপে তাহার ব্যবহার করা কর্ত্তব্য?

কার্তিক-সংখ্যায় মুদ্রিত উত্তর ছাড়াও প্রশ্ন দুটি নিয়ে মফস্বলে কয়েকটি সভাসমিতিতে আলোচনা করা হয়; ব্যক্তিবিশেষ ও কোনো সভার পক্ষ থেকে আরও তেরোটি উত্তর ছাপা হয় ভাণ্ডার-এর পৌষ-সংখ্যায় [পৃ ২৯৯-৩১২]।

বসুধা, কার্তিক ১৩১২ [৫।৭]

'গভীর রাতে ভক্তিভরে কে জাগে আজ' দ্র গীত ৩।৮৫৩

খেয়া-র পাণ্ডুলিপি দেখে মনে হয়, গানটি ২৫ আশ্বিনের [বুধ 11 Oct] পরে রচিত। স্বরলিপি নেই। অন্নদাপ্রসাদ ঘোষ-সম্পাদিত পত্রিকাটির কার্তিক-সংখ্যা প্রকাশিত হয় 7 Dec [বৃহ ২১ অগ্র°]। সম্পাদক কোন্ সূত্রে যে এই রচনাটি সংগ্রহ করলেন বোঝা দুষ্কর। গানটি কি কোজাগরী পূর্ণিমার দিন [২৬ আশ্বিন বৃহ 12 Oct] রচিত? এইদিন বিকেল সাড়ে পাঁচটায় কর্নওয়ালিশ স্ট্রীটে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সামনে সমবেত হয়ে বন্দেমাতরম সম্প্রদায় সাদা স্বদেশী পোশাকে সজ্জিত হয়ে কলেজ স্কোয়ার পর্যন্ত গান গেয়ে একটি 'moonlight tour' করে।[৪৫] রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে উক্ত সম্প্রদায়ের সম্পর্কের কথা আমরা আগেই বলেছি।

সঙ্গীত-প্রকাশিকা, কার্তিক ১৩১২ [৫।২] :

২৫-২৮ ভৈরবী-তেওরা। সখা, আপন মন নিয়ে কাঁদিয়ে মরি দ্র স্বর ৪৮

৩৩-৩৪ মিশ্র ভূপালী-একতালা। আমি ভয় কর্‌ব না, ভয় কর্‌ব না দ্র ঐ ৪৬

৪০-৪১ বাউলের সুর। যে তোরে পাগল বলে দ্র ঐ ৪৬

৪১-৪৩ বাউলের সুর। এবার তোর মরা গাঙে বান্ এসেছে দ্র ঐ ৪৬

৪৩-৪৪ বাউলের সুর—একতালা। যে তোমায় ছাড়ে ছাড়ুক দ্র ৪৬

প্রথম গানটির স্বরলিপিকার সম্ভবত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, অন্য গানগুলির স্বরলিপি করেন ইন্দিরা দেবী।

বঙ্গভঙ্গ-আন্দোলনের দ্বিতীয় পর্যায় শুরু হল 22 Oct [রবি ৫ কার্তিক] *The Statesman* পত্রিকায় Carlyle Circular প্রকাশিত হওয়ার পর। এই নির্দেশনামায় স্কুল ও কলেজের ছাত্রদের রাজনৈতিক কার্যকলাপ থেকে বিরত রাখার জন্য নানাবিধ শাস্তিমূলক বিধান রাখা হয়; শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলিকেও ভয় দেখানো হয় সরকারী সাহায্য থেকে বঞ্চিত করার। সংবাদটি প্রকাশিত হওয়ামাত্র কলকাতায় বিশেষ চাঞ্চল্য দেখা দিল। সার্কুলারটির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানানোর জন্য প্রথম সভাটি হয় ১৬ কর্নওয়ালিশ স্ট্রীটে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ মন্দিরের সম্মুখবর্তী ফিল্ড অ্যাণ্ড অ্যাকাডেমি ভবনে ৭ কার্তিক [মঙ্গল 24 Oct] তারিখে। ব্যারিস্টার আবদুল রসুলের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এই সভায় জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার সংকল্প প্রথম ঘোষিত হয়। শিক্ষাকে সরকারী শাসনের আওতার বাইরে নিয়ে আসার কথা রবীন্দ্রনাথ বহুদিন ধরে বলে আসছিলেন, কিন্তু কবিকল্পনা বলে নেতারা সে-কথায় কর্ণপাত করেননি—বিশ্ববিদ্যালয় বিলের বিরুদ্ধে তুমুল আন্দোলন করে বিলটি আইনে পরিণত হওয়ার পরেই তাঁরা চুপ করে গিয়েছিলেন। কিন্তু কার্লাইল সার্কুলার বিষয়টিকে রাজনৈতিক স্তরে উন্নীত করায় তাঁরা আবার সরব হয়ে উঠলেন। ভাবুক ও রাজনীতিক একই মঞ্চে মিলিত হলেন। ১০ কার্তিক [শুক্র 27 Oct] পটলডাঙায় চারুচন্দ্র মল্লিকের বাড়িতে রবীন্দ্রনাথের সভাপতিত্বে কলকাতার কলেজসমূহের প্রায় একহাজার ছাত্র একটি সভায় মিলিত হন। ভুপেন্দ্রনাথ বসু, কৃষ্ণকুমার মিত্র, জ্ঞানেন্দ্রনাথ রায়, বিপিনচন্দ্র পাল, মনোরঞ্জন গুহ, সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, ভুবনমোহন চট্টোপাধ্যায়, প্রেমতোষ বসু প্রভৃতি অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তি সভায় উপস্থিত ছিলেন। সিটি কলেজের চতুর্থ বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্র শচীন্দ্রনাথ বসু সার্কুলারটিকে প্রত্যাখ্যান করে প্রস্তাব আনলেন, 'আমরা কলিকাতার ছাত্রবৃন্দ সম্মিলিত হইয়া প্রকাশ্যভাবে ঘোষণা করিতেছি যে, যদি গবর্ণমেন্টের বিশ্ববিদ্যালয় আমাদিগকে পরিত্যাগ করিতে হয় তাহাও স্বীকার, তথাপি স্বদেশসেবারূপ যে মহাব্রত আমরা গ্রহণ করিয়াছি তাহা কখনও পরিত্যাগ করিব না।'

যথারীতি প্রস্তাবটি গৃহীত ও ভূপেন্দ্রনাথ বসুর বক্তৃতার পর রবীন্দ্রনাথ সভাপতির ভাষণে দেশের বর্তমান অবস্থায় ছাত্রদের যোগ দেওয়া সমর্থন করলেন : 'আমাদের দেশে শিক্ষার ভার যাঁহাদিগের হস্তে ন্যস্ত আছে, তাঁহাদের স্বার্থের সঙ্গে ছাত্রদের স্বার্থের বিরোধ। সুতরাং ছাত্রেরা যে সকল সময় সকল বিষয়ে শিক্ষাগুরুদিগের অনুবর্ত্তী হইয়া চলিবে, তাহা সম্ভবপরও নহে, সমাজের পক্ষে স্বাস্থ্যকরও নহে।' ছাত্রেরা যে গবর্মেন্টের বিশ্ববিদ্যালয় পরিত্যাগ করতে মনস্থ করেছেন তাকে স্বাগত জানিয়ে তিনি বললেন : 'আমাদের সমাজ যদি নিজের বিদ্যাদানের ভার নিজে না গ্রহণ করেন, তবে এক দিন ঠেকিতেই হইবে। আজকার এই অবমাননা যে নূতন, তাহা নহে; অনেক দিন হইতেই ইহার সূত্র আরম্ভ হইয়াছে। আমাদের উচ্চ শিক্ষার উপর গবর্ণমেন্টের অনুকূল দৃষ্টি নাই; সুতরাং গবর্ণমেন্ট যদি এই পরোয়ানা প্রত্যাহারও করেন, তবুও আমরা তাঁহাদের হাতে শিক্ষার ভার সমর্পণ করিয়া শান্ত থাকিতে পারিব না।...এই বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা আমাদের অন্তঃকরণকে অস্থি মজ্জাকে একেবারে দাসত্বে অভিভূত করিয়া ফেলিয়াছে। তাই আমাদের নিজেদের শিক্ষার ভার নিজেদের হাতে রাখিতেই হইবে।...জানি না আমাদের নেতারা বিষয়টিকে ঠিক কিরূপ ভাবে দেখিবেন। যদি দেশের হৃদয় এই দিকে যথার্থই উন্মুখ হইয়া থাকে, তবে স্থায়িভাবে ও অপমানের প্রতীকারের জন্য তাঁহারা নিঃসন্দেহ চেষ্টিত হইবেন।...আপনারা নিজের আদর্শের কাছে, স্বদেশের কাছে, ঈশ্বরের কাছে সত্য থাকিবেন, তাহা হইলে আর কাহারও মুখাপেক্ষা করিয়া থাকিতে হইবে না।'*

স্বদেশী আন্দোলনে মেয়েদেরও যে কিছু করবার আছে, রবীন্দ্রনাথ 'ব্রতধারণ' প্রবন্ধে তা স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলেন। রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী 'বঙ্গলক্ষ্মীর ব্রতকথা' [বঙ্গদর্শন, পৌষ। ৪৪৫-৪৯] আনুষ্ঠানিকভাবে পাঠ করার আহ্বান জানান। ভ্রাতৃদ্বিতীয়া [১২ কার্তিক রবি 29 Oct] উপলক্ষে বাংলার ভগিনীদের জাতীয় ধনভাণ্ডারে দান করার জন্য যে আবেদন প্রচার করা হয় রবীন্দ্রনাথ তার অন্যতম স্বাক্ষরকারী, হয়তো-বা রচয়িতা :

ভ্রাতৃদ্বিতীয়া ও ধনভাণ্ডার।

বন্দেমাতরম্।

ভগিনীগণ, ভাইদ্বিতীয়ার আর বিলম্ব নাই। ঈশ্বরের কৃপায় এই বৎসর হইতে তোমাদের ভাইদ্বিতীয়ার যজ্ঞ বৃহৎ হইয়া উঠিতেছে। এবার রাখীসূত্রে সমস্ত বাঙ্গালি ভাই হইয়া মিলিয়াছে। এবারে তোমরা ভাইকে নিমন্ত্রণ করিবার বেলায় দেশভাইকে ভুলিও না। ভগিনি! আমরা তোমাদের দেশভাই, সেই শুভদিনে সমস্ত বঙ্গরমণীর কোমল-হৃদয়ের কল্যাণ-কামনার জন্য উন্মুখ হইয়া থাকিব। সেদিন তোমাদের ঘরের ভাইয়ের অন্নের থালায় যখন অন্ন পরিবেশন করিবে, তাহাদের বস্ত্রের থালায় যখন বস্ত্র সাজাইয়া রাখিবে তখন হে কল্যাণি মনে রাখিও, ভাই তোমাদের একটি দুটি নহে—সমস্ত দেশ ব্যাপ্ত করিয়া বহু কোটী তোমাদের ভাই; তাহাদের অন্নের স্বচ্ছলতা নাই, তাহাদের শরীর রোগে জীর্ণ, তাহাদের পরিধানের বস্ত্রটুকু সমুদ্র পার হইতে আহরণ করিতে হয়। তাহারা অন্নবান্ হউক, তেজস্বী হউক, নীরোগ হউক, তাহারা নিজের দুঃখ নিজে মোচন করিবার শক্তি লাভ করুক, এই কামনা করিয়া, ভগিনীগণ সেই দেশ-ভাইদের অন্ন ও বস্ত্রের উদ্দেশ্যে সেদিন যথাসাধ্য কিঞ্চিৎ দান করিও। তোমাদের কল্যাণ কামনায়, তোমাদের মঙ্গলদানে আমাদের দেশের সমস্ত ভ্রাতৃগণের ললাটের তিলক উজ্জ্বল হইয়া উঠিবে, যমের দ্বারে যথার্থই কাঁটা পড়িবে—এবং যে বিধাতা তোমাদিগকে বাঙ্গলা দেশে বাঙ্গালীর ঘরে জন্ম দিয়া বাঙ্গালীর ভগিনী করিয়াছেন তিনি প্রসন্ন হইবেন। তাঁহার প্রসাদেই তোমাদের দেশের ও ভাইদের সঙ্গে সঙ্গে তোমাদের ঘরের ভাইদেরও যথার্থ মঙ্গল হইবে, ইতি।/শ্রীশিশিরকুমার ঘোষ,/" সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়,/" আনন্দমোহন বসু/" জগদিন্দ্রনাথ রায়,/" নলিনবিহারী সরকার,/" মতিলাল ঘোষ,/" ভূপেন্দ্রনাথ বসু/" রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।[৪৬]

পরে সূর্যকান্ত আচার্যচৌধুরী, নবাব আবদুল সোভান চৌধুরী, কুমার সতীশচন্দ্র সিংহ ও গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুরের নাম এর সঙ্গে যুক্ত হয়। বিজ্ঞপ্তিটির ইংরেজি অনুবাদ অমৃতবাজার পত্রিকায় প্রকাশিত হয় 28 Oct [শনি ১১ কার্তিক]।

৯ কার্তিক [বৃহ 26 Oct] মল্লিকবাজারে ট্রামডিপোর কাছে এ. রসুলের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত প্রধানত মুসলমানদের একটি সভায় রবীন্দ্রনাথ, মনোরঞ্জন গুহঠাকুরতা, বিপিনচন্দ্র পাল, পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি উপস্থিত ছিলেন। রবীন্দ্রনাথ সভাপতির প্রতি ধন্যবাদজ্ঞাপক প্রস্তাবটি উত্থাপন করেন।[৪৭] তিনি এই উপলক্ষে কী বলেছিলেন, সংবাদপত্রের প্রতিবেদনে তার উল্লেখ নেই। রবীন্দ্রনাথ নিজেই সেকথা লিখেছেন তাঁর 'ব্যাধি ও প্রতিকার' [দ্র প্রবাসী, শ্রাবণ ১৩১৪।২৩৫-৪৩; সমূহ-পরিশিষ্ট ১০।৬২৩-৩৫] প্রবন্ধে। তৎকালীন হিন্দু-মুসলমান বিরোধের পরিপ্রেক্ষিতে তিনি বর্তমান ভাষণের উল্লেখ করে লেখেন :

> হিন্দু-মুসলমান এক হইলে পরস্পরের কত সুবিধা একদিন কোনো সভায় মুসলমান শ্রোতাদিগকে তাহা বুঝাইয়া বলা হইতেছিল। তখন আমি এই কথাটি না বলিয়া থাকিতে পারি নাই যে, সুবিধার কথাটা এ স্থলে মুখে আনিবার নহে; দুই ভাই এক হইয়া থাকিলে বিষয়কর্ম ভালো চলে, কিন্তু সেইটেই দুই ভাই এক থাকিবার প্রধান হেতু হওয়া উচিত নহে। কারণ, ঘটনাক্রমে সুবিধার গতি পরিবর্তন হওয়াও আশ্চর্যকর নহে। আসল কথা, আমরা এক দেশে এক সুখদুঃখের মধ্যে একত্রে বাস করি, আমরা মানুষ, আমরা যদি এক না হই তবে সে লজ্জা, সে অধর্ম; আমরা উভয়েই এক দেশের সন্তান—আমরা ঈশ্বরকৃত সেই ধর্মের বন্ধনবশত শুধু সুবিধা নহে, অসুবিধাও একত্রে ভোগ করিতে প্রস্তুত যদি না হই, তবে আমাদের মনুষ্যত্বে ধিক। আমাদের পরস্পরের মধ্যে, সুবিধার চর্চা নহে, প্রেমের চর্চা নিঃস্বার্থ সেবার চর্চা যদি করি তবে সুবিধা উপস্থিত হইলে তাহা পুরা গ্রহণ করিতে পারিব এবং অসুবিধা উপস্থিত হইলেও তাহাকে বুক দিয়া ঠেকাইতে পারিব।

লক্ষণীয়, প্রথম থেকেই রবীন্দ্রনাথ উজানে চলেছেন। অন্য নেতারা যেখানে উপস্থিত সুবিধালাভ করাকেই কর্মনীতি হিসেবে গ্রহণ করেছেন, রবীন্দ্রনাথ সেখানে দেখেছেন দূরপ্রসারী চিন্তার মধ্যে তাকে উপস্থাপিত করে। হ্রস্বদৃষ্টি নেতারা সেজন্য রবীন্দ্রনাথের রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির সমাদর করতে পারেননি—কিন্তু ইতিহাস প্রমাণ করেছে, তিনি ভুল বলেননি।

১০ কার্তিক [শুক্র 27 Oct] পটলডাঙার মল্লিকবাড়ির ছাত্রসভার পর ১৬ কার্তিক [বৃহ 2 Nov] 'ফিল্ড অ্যাণ্ড অ্যাকাডেমি' ভবনে সদস্য ও ছাত্রদের এক সান্ধ্যসম্মিলনেও রবীন্দ্রনাথ সভাপতিত্ব করেন। সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, মনোরঞ্জন গুহঠাকুরতা, ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় প্রভৃতি বিশিষ্ট ব্যক্তি সভায় উপস্থিত ছিলেন। রবীন্দ্রনাথ আলোচনা উত্থাপন করে বলেন, বঙ্গব্যবচ্ছেদ ব্যাপারটি সর্বজনীন বলেই এতে ছাত্রদের যোগদান করা অত্যন্ত স্বাভাবিক। নেতারা আশানুরূপ ত্যাগস্বীকার করছেন না বলে যে অভিযোগ উঠেছে, সে সম্বন্ধে তিনি বলেন, 'যদি নেতৃগণ এবিষয়ে বাস্তবিকই অপরাধী হন, তবে সে অপরাধ একা তাঁহাদের নয়, আমাদের পাঁচ জনেরই; কেন না আমাদের পাঁচ জনের শক্তি সংহত হওয়াতেই নেতার শক্তি প্রতিষ্ঠিত হয়। এই যে আমাদের মধ্যে পরস্পরের প্রতি অনাস্থার ভাব এটি খুব অমঙ্গলকর, ইহাতে আমাদের বলক্ষয় হইবার সম্ভাবনা।' তাঁর মতে, জাতীয় ধনভাণ্ডারের ইংরেজি নাম National Fund না রেখে যদি 'বঙ্গভাণ্ডার' নাম রাখা হত, তাহলে মাত্র ৭০ হাজার টাকা চাঁদা ওঠার জন্য লজ্জা পেতে হত না, অবশ্য অতীতে এরূপ সাড়াও তো পাওয়া যায়নি। স্বদেশী দ্রব্যের যোগান সম্পর্কে তাঁর বক্তব্য এই যে, যথার্থ প্রয়োজন দেখা দিলে দেশের ব্যবসায়বুদ্ধি স্বতই অভাব মোচনে অগ্রসর হবে। জাতীয় শিক্ষা সম্বন্ধে তিনি পূর্ব বক্তৃতার প্রতিধ্বনি করে বললেন, 'আমাদের শিক্ষাকে স্বাধীন করিবার জন্য জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত করিবার সময় এখন উপস্থিত হইয়াছে। ছাত্রেরা ধীর ভাবে বিচার করিয়া দেখিবেন যে তাঁহারা সত্যসত্যই গবর্ণমেন্টের সম্মান এবং চাকরীর মায়া পরিত্যাগ করিবার জন্য প্রস্তুত আছেন কি না। যদি তাঁহারা যথার্থই প্রস্তুত হইয়া থাকেন তবে নেতৃবর্গ নিঃসন্দেহ তাঁহাদের শিক্ষার ব্যবস্থা করিবেন।'[৪৮] মোহিতচন্দ্র সেন তাঁর বক্তব্যে ছাত্রদের স্বদেশী আন্দোলনে যোগদান সমর্থন করলেও স্বতন্ত্র বিশ্ববিদ্যালয় একদিনে স্থাপন করা সম্ভব হবে না বলে মত প্রকাশ

করেন। হীরেন্দ্রনাথ দত্ত বলেন, স্বতন্ত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য অর্থ ও স্বেচ্ছাবৃত অধ্যাপকের অভাব হবে না—ছাত্রেরা অর্থোপার্জনের জন্য শিক্ষালাভের মোহ ত্যাগ করলেই বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করা সম্ভব। 'The Chairman concluded briefly and asked the students to consider the question calmly.'[৪৯]

১৯ কার্তিক [রবি 5 Nov] অপরাহ্নে ২২ শঙ্কর ঘোষ লেনে 'ডন সোসাইটি'তে প্রায় দু'হাজার ছাত্রের একটি সভায় রবীন্দ্রনাথ, সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, হীরেন্দ্রনাথ দত্ত ও কিছু ছাত্র তাঁদের বক্তব্য পেশ করেন। রবীন্দ্রনাথ আলোচনার সূত্রপাত করে বলেন, বাংলাদেশে আজ নবজীবনের উত্তেজনা বিদেশী পণ্যবর্জন ও স্বাধীন স্বদেশী শিক্ষার দ্বিমুখী সংকল্পকে আশ্রয় করেছে। তাঁর মতে, ছাত্রেরা যদি সরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের অপমান সহ্য করতে না পেরে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের সংকল্পে দৃঢ় থাকেন, তবে নেতারা তাঁদের শিক্ষার ব্যবস্থা না করে থাকতে পারবেন না—'কিন্তু ছাত্রগণের একথা স্মরণ রাখিতে হইবে যে, এ উদ্যোগে প্রথমেই আকাঙ্ক্ষার অনুরূপ ফললাভের আশা করা যাইতে পারে না।' এরপর তাঁর আহ্বানে ছাত্রদের মধ্য থেকে নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত [1882-1964], অতুলচন্দ্র গুপ্ত [1884-1961], নৃসিংহচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, সুরেন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত, প্রভৃতি এ-বিষয়ে আলোচনা করেন। প্রস্তাবিত বিশ্ববিদ্যালয়ে জীবিকোপার্জনের ব্যবস্থা, অভিভাবকদের মতগঠন, ইঞ্জিনিয়ারিং ডাক্তারি ভূবিদ্যা প্রভৃতি শিক্ষার আয়োজন না হলে ছাত্রদের কর্তব্য কী ইত্যাদি বাস্তব প্রশ্ন উত্থাপিত হয়।

রবীন্দ্রনাথ ছাত্রদের প্রশ্নের উত্তরে বলেন, 'প্রথম অবস্থাতেই আমাদের দেশের লোকের নিকট বেশী আশা করা দুরাশা। এতদিন আমরা কেবল বিদেশীর রুদ্ধ দ্বারেই আঘাত করিয়াছি, এখন কিছুদিন স্বদেশীর দ্বারে আঘাত করিতে হইবে।' নিছক আবেগের বশবর্তী না হয়ে বাস্তব অবস্থা বিবেচনা করে তিনি বললেন, যে-সব শিক্ষার ব্যবস্থা জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে করা যাবে না তার জন্য ইংরেজের বিশ্ববিদ্যালয়েই যেতে হবে, প্রয়োজনে বিদেশেও যাওয়া যেতে পারে। ছাত্রদের সতর্ক করে দিয়ে তিনি বলেন, তাঁদের পথ কুসুমাস্তীর্ণ নয়, তাঁদের জীবন উৎসর্গ করে ভবিষ্যদ্‌বংশীয়দের জন্য পথ প্রস্তুত করতে হবে, 'আজ জোয়ারের সময় তাঁহারা যে আত্মদানের সঙ্কল্প গ্রহণ করিবেন, ভাঁটার সময় যেন তাহা হইতে ভ্রষ্ট না হন।' ডন সোসাইটি-র সম্পাদক সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ছাত্রদের গবর্মেন্টের স্কুল ও কলেজ পরিত্যাগ করতে ও পরীক্ষা না দিতে আহ্বান করেন। হীরেন্দ্রনাথ দত্ত কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে 'গোলাম তৈয়ারী করিবার কারখানা' আখ্যা দিয়ে একই আহ্বান জানিয়ে বলেন, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হলে তিনি ওকালতি ব্যবসা ছেড়ে অধ্যাপনা করতে প্রস্তুত আছেন। ছাত্রনেতা শচীন্দ্রনাথ বসু 'ছাত্রবন্ধুগণকে গবর্ণমেন্টের বিশ্ববিদ্যালয় পরিত্যাগ করিবার জন্য ওজস্বিনী ভাষায় আহ্বান করেন।' উপসংহারে রবীন্দ্রনাথ বলেন, 'ছাত্রমণ্ডলী জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য যে আত্মবিসর্জন করিবার সংকল্প করিয়াছেন, তাহার জন্য তাঁহারা দেশের শুভাকাঙক্ষী মাত্রেরই ধন্যবাদার্হ। যদি তাঁহারা এই সংকল্প রক্ষা করিতে পারেন, তবে এই দিন বাংলার ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবে।'[৫০]

এইসব সভায় রবীন্দ্রনাথের বক্তব্য অনুধাবন করলে দেখা যায়, বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন অন্তত একটি দিক দিয়ে যখন তাঁর চিরপোষিত জাতীয় শিক্ষান্দোলনে পরিণত হয়েছে তখন তিনি সোৎসাহে তার সঙ্গে নিজেকে যুক্ত করেছেন। অবশ্য অন্য কর্তব্যেও তিনি অবহেলা করেননি—জাতির কণ্ঠে জাতীয়তাবোধের গান তুলে দিয়েছেন অজস্র ধারায়, স্বদেশীদ্রব্য প্রস্তুতে ও প্রচারেও তাঁর কর্মতৎপরতা যথাযথভাবে বিস্তৃত হয়েছে।

তাঁর নিজের বিদ্যালয় নিয়ে তিনি এই সময়ে কী ভাবছেন বা করছেন, উপযুক্ত উপকরণের অভাবে তার চিত্রটি স্পষ্ট নয়। ৮ কার্তিক [বুধ 25 Oct] তিনি গিরিডিতে সুবোধচন্দ্র মজুমদারকে লিখেছেন : 'তোমরা বোলপুর বিদ্যালয় খোলবার বরঞ্চ দুই-এক দিন আগে গেলেই ভাল করবে। সেখানে সত্যেন্দ্র আছেন।'[৫১] সম্ভবত ভ্রাতৃদ্বিতীয়ার [১২ কার্তিক রবি 29 Oct] দু'একদিন পরেই বিদ্যালয় খোলে। ১৬ কার্তিক রবীন্দ্রনাথের ক্যাশবহির হিসাব : 'মা° বাবু তারকনাথ পালিত দং যতীন্দ্রনাথ পালিতের বেতন ভরতি হওয়ার বাবদ পাওয়া যায় ১০০্।' সুবোধচন্দ্রকে লেখা চিঠি থেকে জানা যায়, পিসিমা রাজলক্ষ্মী দেবী তখন মীরা ও শমীন্দ্রকে নিয়ে গিরিডিতে বাস করছেন।

এর কয়েকদিন পরে রবীন্দ্রনাথ ত্রিপুরা যাত্রা করেন; ২০ কার্তিকের [সোম 6 Nov] হিসাব : 'দং ত্রিপুরায় গমন জন্য দেওয়া যায়...১৫০্'—হয়তো এই দিনই তিনি রওনা হন। ত্রিপুরারাজ্যের সমস্যা মেটানোর জন্য রমণীমোহন চট্টোপাধ্যায়কে রাজমন্ত্রীপদে দেখার জন্য তাঁর আগ্রহের কথা আমরা পূর্বে উল্লেখ করেছি। ২৪ কার্তিক [শুক্র 10 Nov]* আগরতলায় অনুষ্ঠিত এক দরবারে 'রোবকারী' [ঘোষণা] প্রচার দ্বারা তাঁকে আনুষ্ঠানিক ভাবে মন্ত্রীপদে অভিষিক্ত করা হল। রবীন্দ্রনাথ এই দরবারে উপস্থিত থাকার জন্য ত্রিপুরায় যান।

তার আগে কলকাতা কর্পোরেশনের কালেক্টর রমণীমোহনকে বিদায়-সংবর্ধনা জানানোর জন্য সম্ভবত ১৮ কার্তিক [শনি 4 Nov] শ্যামবাজারে গোপাললাল মিত্রের বাড়িতে এক সান্ধ্য-সম্মিলনের আয়োজন করা হয়। দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, নীলাম্বর মুখোপাধ্যায়, রজনীমোহন চট্টোপাধ্যায়, গগনেন্দ্রনাথ, সমরেন্দ্রনাথ, সুধীন্দ্রনাথ, দিনেন্দ্রনাথ প্রভৃতি প্রায় ৩০০ ব্যক্তির সঙ্গে রবীন্দ্রনাথও এই সম্মিলনসভায় উপস্থিত ছিলেন।[৫২] প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, কলকাতা থেকে খুলনায় বদলির [7 Nov] আগে দ্বিজেন্দ্রলালকেও তাঁর বন্ধুরা ১ সুকিয়া স্ট্রীটে কৈলাসচন্দ্র বসুর বাড়িতে ১৪ কার্তিক [মঙ্গল 31 Oct] সান্ধ্যভোজে আপ্যায়িত করেন,[৫৩] রবীন্দ্রনাথ এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কিনা বলা যায় না।

দ্বিজেন্দ্রনাথ দত্ত 'তথ্যক্রমপঞ্জী'তে লিখেছেন : 'নবনিযুক্ত রাজমন্ত্রীর কর্ম্মভার গ্রহণ উপলক্ষে, নাটোরের মহারাজ জগদীন্দ্রনাথ [যদ্দৃষ্টং] প্রভৃতি সহ কবি আগরতলায় আগমন করেন (চতুর্থবার)। স্থানীয় বিদ্যালয় গৃহে প্রাক্তন মন্ত্রীর বিদায় এবং নবনিযুক্ত মন্ত্রীর অভ্যর্থনা সভায় এবং মন্ত্রী নিয়োগ দরবারে কবির উপস্থিতির কথা সমকালীন স্মৃতিতে এখনও অবগত হওয়া যায়।'[৫৪] রবীন্দ্রনাথের মাথায় পাগড়ি বাঁধা সম্পর্কে ব্রজেন্দ্রকিশোরের কৌতূককর স্মৃতির কথা সত্যরঞ্জন বসু উদ্ধৃত করেছেন।[৫৫]

1 Nov [বুধ ১৫ কার্তিক] বাংলার বিভিন্ন স্থানে 'Proclamation Day' পালিত হয়। রংপুর জেলা ও টেকনিক্যাল স্কুলের ছাত্রেরা রাস্তায় 'বন্দেমাতরম্' গান গেয়ে উক্ত সভায় যোগ দেওয়ায় সেখানকার ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট T. Emerson প্রায় দু'শ ছাত্রকে পাঁচ টাকা করে জরিমানা করেন। খবরটি ১৮ কার্তিক [শনি 4 Nov] সংবাদপত্রে প্রকাশিত হলে এইদিনই বিকেলে গোলদিঘিতে এক বিশাল ছাত্রসভায় নরেশচন্দ্র সেনগুপ্তের সভাপতিত্বে ম্যাজিস্ট্রেটের আচরণকে ধিক্কৃত করে নিগৃহীত ছাত্রদের প্রতি সহানুভূতি জ্ঞাপন করা হয়। এই সভাতেই সঞ্জীবনী-সম্পাদক কৃষ্ণকুমার মিত্রকে কোষাধ্যক্ষ, শচীন্দ্রপ্রসাদ বসুকে সম্পাদক ও সুকুমার মিত্রকে সহকারী সম্পাদক করে 'পরওয়ানা বিরোধী সমিতি' ['Anti-circular Society'] স্থাপিত হয়। গবর্মেন্টের

বিশ্ববিদ্যালয় পরিত্যাগ করে প্রস্তাবিত জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়ার জন্য ছাত্রদের কাছে আবেদনও জানানো হয় এই সভায়।[৫৬]

পূর্বেই উল্লিখিত হয়েছে, পরদিন ১৯ কার্তিক [রবি 5 Nov] রবীন্দ্রনাথের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত ডন সোসাইটি-র সভায় এই প্রস্তাবগুলিই আলোচিত হয়। হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ লিখেছেন : '৫ই [নভেম্বর] শ্যামপুকুর-ময়দানে বগুড়ার নবাব আবদস শোভান চৌধুরীর সভাপতিত্বে এক বিরাট স্বদেশী সভা হইল। তখনও দেশের জনসাধারণের নিকট সুরেন্দ্রনাথের প্রভাব ক্ষুণ্ণ হয় নাই। তাই রবীন্দ্রনাথের ও সুরেন্দ্রনাথের নিন্দা করায় শ্রোতৃবৃন্দ বক্তা পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়কে বসাইয়া দিল।'[৫৭]

এর পরের দিনই ত্রিপুরা চলে যাওয়ায় রবীন্দ্রনাথ ঘটনাস্রোত থেকে বিযুক্ত হয়ে পড়েন। কিন্তু ঘটনা দ্রুত এগিয়ে চলছিল। অ্যান্টি-সার্কুলার সোসাইটির পক্ষ থেকে শচীন্দ্রপ্রসাদ বসু ও জাপান-ফেরৎ মাইনিং ইঞ্জিনিয়ার রমাকান্ত রায় [1873-1906] রংপুরে গিয়ে 7 Nov ছাত্রদের এক সভায় জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদন-সাপেক্ষে রংপুর জাতীয় বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব গ্রহণ করেন ও পরদিন 8 Nov [বুধ ২২ কার্তিক] থেকে প্রখ্যাত ঔপন্যাসিক ব্যারিস্টার প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়কে প্রধানশিক্ষক করে বিদ্যালয়ের কাজ আরম্ভ হয়। রবীন্দ্রনাথ, হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি শিক্ষাবিদ্গণ জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য ওকালতি করলেও রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ এই প্রস্তাব গ্রহণে দ্বিধান্বিত ছিলেন। কিন্তু রংপুরের এই ঘটনা নেতাদের বাধ্য করল প্রস্তাবটি বিবেচনা করতে। ২৩ কার্তিক [বৃহ 9 Nov] সংবাদপত্রে প্রকাশিত হল, পূর্ববঙ্গের ছোটলাট স্যার ব্যামফিল্ড্ ফুলারের আদেশে মাদারিপুর স্কুলের কয়েকজন ছাত্রকে 'বন্দেমাতরম্' বলার অপরাধে বেত্রাঘাত করা হয়েছে। এইদিন শচীন্দ্রপ্রসাদ বসু ও রমাকান্ত রায় রংপুরের ঘটনা বিবৃত করবেন বলে গোলদিঘিতে একটি ছাত্রসভা ডাকা হয়েছিল।[৫৮] এই সভায় মাদারিপুরের নিগৃহীত ছাত্রদের ও প্রধানশিক্ষক কালীপ্রসাদ দাশগুপ্তকে সহানুভূতি জানানো হয়। সভা চলাকালীনই খবর আসে, ফিল্ড অ্যাণ্ড অ্যাকাডেমির মাঠে ['পান্তির মাঠ', বর্তমানে বিদ্যাসাগর কলেজের হোস্টেল] সুবোধচন্দ্র মল্লিকের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এক সভায় সুবোধচন্দ্র প্রস্তাবিত জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য এক লক্ষ টাকা দান করতে প্রতিশ্রুত হয়েছেন। উত্তেজিত ছাত্রজনতা গোলদিঘি থেকে পান্তির মাঠের দিকে ধাবিত হয় ও স্বতঃস্ফূর্তভাবে সুবোধচন্দ্রকে 'রাজা' উপাধিতে ভূষিত করে। এই সভাটিতে রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, বিপিনচন্দ্র পাল, চিত্তরঞ্জন দাস, মৌলবী আবুল হোসেন প্রভৃতি জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের আবশ্যকতা প্রতিপন্ন করে বক্তৃতা করেন। 'সভা ভঙ্গ হইলে অন্যূন আট সহস্র যুবক নিজেরা সুবোধ বাবুর গাড়ী টানিয়া তাঁহাকে বাড়ীতে রাখিয়া আসেন।'[৫৯] রবীন্দ্রনাথ কিছুদিন আগেই এই বিজাতীয় প্রথাকে ধিক্কৃত করেছিলেন!

২৪ কার্তিক [শুক্র 10 Nov] একই স্থানে ব্যারিস্টার অশ্বিনীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে প্রায় চার হাজার ছাত্র সমবেত হয়। সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, মনোরঞ্জন গুহ প্রভৃতি বক্তৃতা করেন। বিপিনচন্দ্র পাল জানান, প্রস্তাবিত জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য একজন জমিদার [পরবর্তীকালে ময়মনসিংহ-গৌরীপুরের জমিদার ব্রজেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর নাম ঘোষিত হয়] পাঁচ লক্ষ টাকা দান করতে প্রতিশ্রুত হয়েছেন।

২৫ কার্তিক [শনি 11 Nov] গোলদিঘিতে আশুতোষ চৌধুরীর সভাপতিত্বে ও বহু বিশিষ্ট ব্যক্তির উপস্থিতিতে প্রায় দশ হাজার ছাত্র সমবেত হন। 'কতকগুলি ছেলে একখানি কাগজে মোটা মোটা করিয়া "এই

বাড়ী ভাড়া দেওয়া যাইবে” লিখিয়া বিশ্ববিদ্যালয়-গৃহে টাঙ্গাইয়া দিয়া আসিল।’[৬০] জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের আবশ্যকতা স্বীকার করেও আশুতোষ চৌধুরী ছাত্রদের বি. এ. ও এম. এ. পরীক্ষায় অনুপস্থিত থাকার সংকল্প ত্যাগ করতে বলেন।

কিন্তু ছাত্রদের আন্দোলন ও দাবী নেতৃবৃন্দ উপেক্ষা করতে পারলেন না। ২৬ কার্তিক [রবি 12 Nov] পান্তির মাঠে বিপিনচন্দ্র পালের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত বিরাট সভায় সিস্টার নিবেদিতা, অশ্বিনীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় প্রভৃতির বক্তৃতার পর আশুতোষ চৌধুরী বলেন, ‘নেতৃগণ বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের জন্য চেষ্টা করিতেছেন। এ সম্বন্ধে ৩০শে কার্ত্তিক বৃহস্পতিবার নেতৃবর্গের এক মন্ত্রণা সভা হইবে।’[৬১]

৩০ কার্তিক [বৃহ 16 Nov] বিকেল তিনটেয় ৫২।৪ পার্ক স্ট্রীটে বেঙ্গল ল্যাণ্ডহোল্ডার্স’ অ্যাসোসিয়েশনের সভাগৃহে বিশিষ্ট রাজনীতিক ও শিক্ষাবিদ্‌দের উপস্থিতিতে রাজা পিয়ারীমোহন মুখোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত মন্ত্রণাসভায় উপস্থিত ছিলেন ড রাসবিহারী ঘোষ, স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ভূপেন্দ্রনাথ বসু, আশুতোষ চৌধুরী, যোগেশচন্দ্র চৌধুরী, কুমুদনাথ চৌধুরী, প্রমথ চৌধুরী, লালমোহন ঘোষ, তারকনাথ পালিত, মতিলাল ঘোষ, নগেন্দ্রনাথ ঘোষ, প্রমথনাথ মিত্র, সত্যেন্দ্রনাথ সিংহ, মহম্মদ এ. গজনভি, ডাঃ নীলরতন সরকার, সুরেশচন্দ্র সর্বাধিকারী, ডাঃ প্রাণকৃষ্ণ আচার্য, জগদিন্দ্রনাথ রায়, ব্রজেন্দ্রনাথ শীল, হেরম্বচন্দ্র মৈত্র, চিত্তরঞ্জন দাস, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, কুমার মন্মথনাথ মিত্র, ডাঃ শরৎ মল্লিক, মোহিতচন্দ্র সেন, উমেশচন্দ্র দত্ত, নরেন্দ্রনাথ সেন, গণেশচন্দ্র চন্দ্র, অমিয়নাথ চৌধুরী, মৌলবী আবদুল মজিদ, মৌলবী সামসুল হুদা, রেভাঃ নাগ, চন্দ্রনাথ বসু, কৃষ্ণকুমার মিত্র, সুবোধচন্দ্র মল্লিক ও দ্বারকানাথ চক্রবর্তী।[৬২] রবীন্দ্রনাথ ইতিমধ্যে ত্রিপুরা থেকে ফিরে এসেছিলেন, তিনিও সভায় উপস্থিত থাকেন। দীর্ঘ আলোচনার পর সভায় তিনটি প্রস্তাব গৃহীত হয়। সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ‘জাতীয়ভাবে এবং জাতীয় তত্বাবধানে সাহিত্যিক, বৈজ্ঞানিক এবং কারীকরী এই ত্রিবিধ শিক্ষার ব্যবস্থা করিবার নিমিত্ত অবিলম্বে একটি জাতীয় শিক্ষা সমাজ প্রতিষ্ঠিত’ করার জন্য একটি কমিটি গড়ার প্রস্তাব দেন, কমিটি তিন সপ্তাহের মধ্যে তাঁদের প্রতিবেদন প্রকাশ করবেন। অমৃতবাজার পত্রিকা ১৪ জন সদস্যের নাম ছাপে, ‘শিক্ষার আন্দোলন’ পুস্তিকায় ২৮ জনের নাম আছে—উভয় তালিকাতেই রবীন্দ্রনাথের নাম বর্তমান। স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়-আনীত দ্বিতীয় প্রস্তাবে ছাত্রদের পরীক্ষা বয়কট করার সংকল্প ত্যাগ করতে বলা হয়। প্রস্তাবটি অনুমোদন করেন ড রাসবিহারী ঘোষ। [পরে এই প্রস্তাবটি নিয়েই অনেকে সমালোচনায় মুখর হন।] সভার শেষে আশুতোষ চৌধুরী জানান প্রস্তাবিত National Council of Education [অমৃতবাজারে এই নামটিই উল্লিখিত হয়েছে]-এর জন্য নিম্নলিখিত দানের প্রতিশ্রুতি পাওয়া গিয়েছে : একজন ভদ্রলোক নগদে পাঁচ লক্ষ টাকা বা বার্ষিক কুড়ি হাজার টাকা আয়ের ভূসম্পত্তি, একজন নগদ দু’লক্ষ টাকা ও একটি সুন্দর বাড়ি, একজন নগদ এক লক্ষ টাকা ও অপর একজন বার্ষিক ত্রিশ হাজার টাকা আয়ের সম্পত্তি দেবার কথা ঘোষণা করেছেন। সন্ধ্যা সাতটায় সভাভঙ্গ হয়।

ছাত্রসমাজ মন্ত্রণাসভার সিদ্ধান্ত জানার জন্য স্বভাবতই ব্যাকুল ছিল। ১ অগ্র° [শুক্র 17 Nov] অপরাহ্নে পান্তির মাঠে তাঁরা সমবেত হন। ‘জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়কে অভিনন্দন করিয়া লইবার নিমিত্ত সভাস্থলে পত্রপুষ্পে সুশোভিত করা হইয়াছিল। ক্ষুদ্র একটি চন্দ্রাতপের নিম্নে মঞ্চের উপর সুরেন্দ্রনাথ, রবীন্দ্রনাথ,

হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, 'কয়েকটি সম্ভ্রান্ত জাপানী ভদ্রলোক', বিপিনচন্দ্র পাল প্রভৃতি আসন গ্রহণ করেছিলেন। 'শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রস্তাবে সর্ব্বজন মান্য অধিনায়ক শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন।' সুরেন্দ্রনাথ তাঁর ইংরেজি ভাষণে বিশেষ করে মন্ত্রণাসভার প্রথম সিদ্ধান্তটি বর্ণনা করে বলেন, 'কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব্ব ভাইস চান্সেলার স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, কলিকাতা উকিলসমাজের অধিনায়ক ডাক্তার রাসবিহারী ঘোষ, স্বদেশভক্ত সর্ব্বতোমুখী প্রতিভাশালী সুকণ্ঠ কবি রবীন্দ্রনাথ, বাগ্মী বিপিনচন্দ্র পাল, মাননীয় ভূপেন্দ্রনাথ বসু এবং ডাক্তার নীলরতন সরকার প্রভৃতির মত ব্যক্তি যখন এই কমিটিতে আছেন, তখন এই কমিটির পরিশ্রম যে শুভ ফল প্রসব করিবে তাহার আর কোন সন্দেহ নাই।' পরিশেষে তিনি বলেন, 'আমি শুনিয়াছি কেহ কেহ বলিতেছেন যে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইলে রিপন কলেজের ক্ষতি হইতে পারে এই আশঙ্কায় আমি ইহার প্রতিবন্ধকতা করিব (সকলে বলিলেন : আমরা উহা বিশ্বাস করি না, উহা মিথ্যা কথা)।...আমি বলিতে পারি যে যখন জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইবে তখন রিপন কলেজই সর্ব্বপ্রথমে তাহার অন্তর্ভুক্ত হইবে।'[৬৩] জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় আনুষ্ঠানিকাবে 14 Aug 1906 [মঙ্গল ২৯ শ্রাবণ ১৩১৩] উদ্বোধিত হয়, কিন্তু শুধু রিপন কলেজ নয়, বৃহত্তর বঙ্গের কোনো কলেজই তার অন্তর্ভুক্ত হয়নি। হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ লিখেছেন : 'তিনি দেশের লোকের মতের বিরুদ্ধে যাইতে সাহস করিলেন না—বলিলেন, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত করা ভাল; কিন্তু ছাত্ররা যেন এখন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ত্যাগ না করে। রিপণ কলেজের মালিক সুরেন্দ্রনাথ জাতির এই সঙ্কটের সময় "দুকূল বজায়" রাখিয়া ছাত্রদিগকে এইরূপ উপদেশ দিলেন। ছাত্ররা তাঁহার এই ভাবে তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধা আর অবিচলিত রাখিতে পারিল না। ১২ দিন পূর্ব্বে যাহারা শ্যামপুকুরে তাঁহার নিন্দা সহিতে পারে নাই, আজ তাহারাই তাঁহার নিন্দা করিল।'[৬৪] হীরেন্দ্রনাথ দত্ত এইদিন যে বক্তৃতা করেন তাতেও তিক্ততার সুর অশ্রুত নয় : 'প্রায় তিন ঘণ্টাব্যাপী সভা হইয়াছিল। প্রথম দুই ঘণ্টা সভার যে ভাব দেখিয়াছিলাম, তাহাতে ভীত হইয়া আমরা ভাবিয়াছিলাম যে, আমাদের সুখ সঙ্কল্প বুঝি কুজ্ঝটিকার ন্যায় বিলীন হইয়া গেল।'[৬৫] 'শিক্ষার সহিত কোন সংশ্রব নাই' বলে বক্তৃতার প্রথমাংশ 'শিক্ষার আন্দোলন' পুস্তিকায় পরিত্যক্ত হয়েছে, সেখানে হয়তো তিক্ততর কোনো মন্তব্য ছিল!

৮ অগ্র° [শুক্র 24 Nov] পান্তির মাঠে আর একটি ছাত্রসভায় বিপিনচন্দ্র পাল, মৌলবী লিয়াকত হোসেন প্রভৃতি মন্ত্রণাসভার দ্বিতীয় প্রস্তাবটির সমালোচনা করে বলেন, 'আজ যদি রংপুরের ছাত্রগণকে ফেলিয়া কলিকাতার ছাত্রেরা পরীক্ষায় উপস্থিত হন তবে গবর্ণমেন্ট যে বঙ্গব্যবচ্ছেদ করিতে পারেন নাই, বাঙালী নিজেই সেই বঙ্গব্যবচ্ছেদ করিবেন।'[৬৬]

কিন্তু এইসব মতবিরোধ সত্ত্বেও রবীন্দ্রনাথ যথাসাধ্য প্রস্তাবিত কমিটির কাজে সহায়তা করেন। ৩ অগ্র° [রবি 19 Nov] ৬২ বউবাজার স্ট্রীটের ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন গৃহে প্রভিশ্যনাল কমিটির একটি সভা হয়।[৬৭] ১৬ অগ্র° [শনি 2 Dec] কমিটি খসড়া পরিকল্পনাটিকে চূড়ান্ত রূপ দেয়।[৬৮] রবীন্দ্রনাথ সেই সভায় অবশ্যই যোগ দিয়েছিলেন। রবীন্দ্রভবনে রক্ষিত ১০ অগ্র° [রবি 26 Nov] প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়কে লেখা তাঁর একটি 'ছিন্ন' পত্রের প্রতিলিপি থেকে তাঁর ব্যস্ততা ও মনোভাবের পরিচয় পাওয়া যায় :

...ব্যাপার...ব্যস্ত ছিলাম ...পত্রের উত্তরে...পাই নাই।...আমাদের কাজ ...হইয়াছে। গুরুদাস [বাবু]...হীরেন্দ্রবাবু, মোহিনী ...নীলরতন সরকার [প্রভৃতি] মিলিয়া সংকল্পিত [জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের] নিয়ম ও গঠনপ্র[ণালী প্রণয়নে] নিযুক্ত ছিলাম—... ... ...[যখন] ছাত্রগণ এক সংকল্প গ্রহণ করিয়াছেন তখন নিস্ফল আশঙ্কা বোধ হয় মন হইতে দূর করিয়া দেওয়া যাইতে পারে। আমি ত অনেকদিন হইতে ঔদাসীন্য ও প্রতিকূলতা সত্ত্বেও আশাপথ চাহিয়া কাজ করিয়া যাইতেছি—বর্ত্তমান উদ্যোগও যদি ব্যর্থ হয় তবু আমি আশা ছাড়িবনা। দেশের কল্যাণের অন্য যখন পথ নাই তখন বারবার প্রতিহত হইয়াও এই একই লক্ষ্যের দিকে ধাবিত হইতেই হইবে। কোনো অবস্থাতেই তোমরাও যেন হাল না ছাড়িয়া দাও, তোমাদের উদ্যম যেন নির্জ্জীব ও আশা যেন পরাহত না হয় এই আমার একান্ত মনের প্রার্থনা।

'শিক্ষার আন্দোলন' পুস্তিকার যে দীর্ঘ ভূমিকা তিনি লেখেন, সেখানেও তিনি একই ধরনের মনোভাব ব্যক্ত করেছেন :

বাংলাদেশে স্বদেশী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার জন্য যে-সকল সভা সমিতি বসিয়াছে, তাহার মধ্যে নানা মতের, নানা বয়সের, নানা দলের লোক সমবেত হইয়াছেন। ইঁহারা সকলে মিলিয়া যাহাকিছু স্থির করিতেছেন, তাহা ইঁহাদের প্রত্যেকেরই সম্পূর্ণ মনঃপূত হইতে পারে না। এই-সকল সমিতির সঙ্গে বর্তমান লেখকেরও যোগ ছিল। প্রস্তাবিত বিদ্যালয়ের যে শিক্ষাপ্রণালী ও নিয়ম নির্ধারিত হইয়াছে, লেখকের যদি সম্পূর্ণ স্বাধীনতা থাকিত তবে ঠিক সেরূপ হইত না সন্দেহ নাই; কিন্তু তাহা লইয়া লেখক বিবাদ করিতে প্রস্তুত নহেন। তিনি কাজ আরম্ভ হওয়াকেই সকলের চেয়ে বেশি মনে করেন। যদি তাঁহার মনোমতো প্রণালীই বাস্তবিক সর্বোৎকৃষ্ট হয়, তবে কাজ আরম্ভ হইলে পর সে-প্রণালীর প্রবর্তন যথাকালে সম্ভবপর হইবে, এ ধৈর্য তাঁহাকে রক্ষা করিতেই হইবে।[৬৯]

ইতিপূর্বে 'স্বদেশী সমাজ' প্রবন্ধে, বা পরে 'দেশনায়ক' প্রবন্ধে, তিনি একজনের নায়কত্ব স্বীকার করার যে-আদর্শ প্রচার করেছিলেন, এখানেও তিনি সেই বশ্যতা স্বীকারের প্রয়োজনীয়তার কথা সকলকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন।

কিন্তু এই মানসিক স্থৈর্য তিনি বেশিদিন রক্ষা করতে পারেননি। কমিটির রিপোর্ট লেখা শেষ হওয়ার পরেই তিনি শান্তিনিকেতনে চলে যান—অন্তর্বর্তীকালে আর কোনো প্রকাশ্য সভায় আবির্ভূত হননি। তাঁর শান্তিনিকেতন যাওয়ার তারিখটি নির্ধারণ করা যায়নি—তবে ২২ অগ্র° [শুক্র 8 Dec] ক্যাশবহিতে 'বাবু মহাশয়ের নিকট বোলপুর পত্র পাঠান' হিসাব থেকে সিদ্ধান্ত করা যায়, এর আগেই তিনি কলকাতা ছেড়ে এসেছেন। 'সোমবার' [২৫ অগ্র° : 11 Dec] তিনি মনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়কে লিখেছেন : 'কিছুদিনের জন্য সভাসমিতি হইতে পলায়ন করিয়া বোলপুর আশ্রয় লইয়াছি। বেশি দিন এমন আরামে কাটিবে না। আবার কখন জনতা হইতে ডাক পড়িবে, নির্জ্জনতা হইতে বিদায় লইতে হইবে।'[৭০] তিনি অবশ্য মাসাধিককাল শান্তিনিকেতনেই থাকেন, পিতার বার্ষিক শ্রাদ্ধোপলক্ষে কলকাতায় আসেন মাঘের প্রথমে।

তাঁকে টানাটানির আয়োজন ছিল। ২৪ অগ্র° [রবি 10 Dec] বেঙ্গল ল্যাণ্ডহোলডার্স' অ্যাসোসিয়েশনে নেতৃবৃন্দের দ্বিতীয় মন্ত্রণাসভায় প্রভিশ্যনাল কমিটির রিপোর্ট উপস্থিত করা হয়। সভায় অনেক বিশিষ্ট নেতার অনুপস্থিতি লক্ষণীয়ভাবে প্রকট হয়ে পড়ে। রবীন্দ্রনাথ-সহ কমিটির অনেক সদস্যই সভায় উপস্থিত ছিলেন না। এই সভায় স্থির হয়, 'জাতীয় শিক্ষাসমাজের গঠনপ্রণালী Draft Constitution এবং অন্যান্য বিষয় বিবেচনা' করবার জন্য ডাঃ নীলরতন সরকারকে সচিব করে একটি সমিতি গঠিত হোক, 'দশ দিন পরে সমিতি তাঁহাদের মন্তব্য উপস্থিত করিবেন। ইতিমধ্যে অন্যান্য বিষয়ের আলোচনা স্থগিত থাকিবে।' সচিব ছাড়া সমিতির সদস্য ছিলেন আট জন : তারকনাথ পালিত, রবীন্দ্রনাথ, নরেন্দ্রনাথ সেন, হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, সুবোধচন্দ্র মল্লিক, মনোমোহন ভট্টাচার্য এবং এ. রসুল।[৭১] খসড়া নিয়মাবলীটি পর্যালোচনা করে ও 11 Mar 1906 [রবি ২৭ ফাল্গুন] সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত তৃতীয় শিক্ষা-সম্মেলনে চূড়ান্ত

রিপোর্টটি গৃহীত হয়। রবীন্দ্রনাথ উক্ত সম্মেলনেও উপস্থিত ছিলেন না, কলকাতায় থাকার সময়ে কমিটির কাজে কতটুকু যোগ দেন বলা শক্ত।

শিক্ষা-বিষয়ে আন্দোলনের সূচনা থেকে ২৪ অগ্রহায়ণের সভা পর্যন্ত উল্লেখযোগ্য ঘটনার বিবরণ কেদারনাথ দাশগুপ্ত-কর্তৃক 'শিক্ষার আন্দোলন' নামক একটি পুস্তিকা রবীন্দ্রনাথের দীর্ঘ ৬ পৃষ্ঠাব্যাপী ভূমিকাসহ ২৬ অগ্র° [মঙ্গল 12 Dec] প্রকাশিত হয়। ভূমিকার শেষে রবীন্দ্রনাথ লেখেন : 'এখন যদি আমাদের আয়োজন পণ্ডও হয়, তবে যথাকালে ভবিষ্যৎ উদ্যোগের সময় এই প্রয়াসের ইতিহাস শিক্ষাপ্রদ হইবে মনে করিয়া বর্ত্তমান শিক্ষাসম্বন্ধীয় আন্দোলনের সমস্ত ঘটনা পরে পরে বিবৃত করা যাইতেছে।' ঘটনার বিবরণ, বিশেষত কয়েকটি বক্তৃতার অনুলেখন, থাকায় পুস্তিকাটি মূল্যবান। রবীন্দ্রনাথের ভূমিকাটি 'শিক্ষা' গ্রন্থের পরিশিষ্টে [দ্র শিক্ষা ১২।৫২৩-২৮] ও ভাষণগুলির অনুলেখন 'গ্রন্থপরিচয়' অংশে [দ্র ১২।৬২৩-২৯] আনুষঙ্গিক তথ্য-সহ সংকলিত হয়েছে।

বেঙ্গল লাইব্রেরির ক্যাটালগ অনুযায়ী বঙ্গদর্শন, অগ্র° ১৩১২ [৫।৮]-সংখ্যা প্রকাশিত হয় 15 Nov [বুধ ২৯ কার্তিক]। এই সংখ্যায় রবীন্দ্রনাথের পূর্বলিখিত তিনটি কবিতা মাত্র মুদ্রিত হয় :

৩৮৩-৮৪ 'শুভক্ষণ।/১' ['ওগো মা, রাজার দুলাল যাবে আজি মোর'] দ্র খেয়া ১০১-০২।

৩৮৪-৮৫ 'ত্যাগ।/২' ['ওগো মা, রাজার দুলাল গেল চলি মোর'] দ্র ঐ ১০।১০২-০৩

৩৯৪-৯৬ 'দান' ['ভেবেছিলাম চেয়ে নেব'] দ্র ঐ ১০।১১০-১২

সঙ্গীত-প্রকাশিকা, অগ্র° ১৩১২ [৫।৩] :

৪৫-৪৭ খাম্বাজ-একতালা। একসূত্রে বাঁধিয়াছি সহস্রটি মন দ্র স্বর ৪৭

৪৮-৫২ ইমন কল্যাণ-একতালা। হে ভারত, আজি তোমার সভায় দ্র ঐ ৪৭

৫২-৫৫ বাউলের সুর-একতালা। যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে দ্র ঐ ৪৬

৫৫-৫৮ বাউলের সুর-একতালা। ও আমার দেশের মাটি দ্র ঐ ৪৬

৫৮-৬০ ভৈরবী-একতালা। সার্থক জনম আমার দ্র ঐ ৪৬

৬১-৬৩ বাউলের সুর-একতালা। ওরে তোরা নেই বা কথা বল্লি দ্র ঐ ৪৬

৬৪-৬৬ বেহাগ-একতালা। ওদের বাঁধন যতই শক্ত হবে দ্র ঐ ৪৬

এর মধ্যে শেষ পাঁচটি গানের স্বরলিপি করেন ইন্দিরা দেবী। প্রথম দুটি গানের স্বরলিপিকারের নাম উল্লেখিত হয়নি, সম্ভবত সম্পাদক জ্যোতিরিন্দ্রনাথ গানগুলির স্বরলিপি করেন। 'বন্দে মাতরম্' ধুয়াটি ছাড়া 'একসূত্রে বাঁধিয়াছি' গানটি জ্যোতিরিন্দ্রনাথের পুরুবিক্রম নাটক-এর দ্বিতীয় সংস্করণে [১২৮৬] প্রথম মুদ্রিত হয়, গীতবিতান ৩য় খণ্ড [১৩৫৭] ছাড়া রবীন্দ্রনাথের কোনো গীতি-সংকলনেও নেই—এই কারণে রবীন্দ্রজীবনী-কার গানটি রবীন্দ্রনাথের লেখা কিনা এ-নিয়ে সংশয় প্রকাশ করেছিলেন [দ্র রবীন্দ্রজীবনী ১। ৫১]। কিন্তু জ্যোতিরিন্দ্রনাথ-সম্পাদিত পত্রিকায় সম্ভবত তাঁরই করা স্বরলিপিতে রচয়িতা হিসেবে রবীন্দ্রনাথ নামের উল্লেখ উপেক্ষা করা যায় না। [দ্র রবিজীবনী ১।৩০৫-০৭]। গানটির পাদটীকায় 'তবু না ছিঁড়িবে কভু এ

দৃঢ় বন্ধন' ছত্রটির একটি পাঠান্তর নির্দেশ করে লেখা হয়েছে : 'এই অংশ কেহ কেহ এইরূপও গাহিয়া থাকেন :—"তবু না ছাড়িব কভু আপন সম্ভ্রম"।'

উল্লেখ্য, ১০ অগ্র° [রবি 26 Nov] বিকেল পাঁচটার সময় ক্লাসিক থিয়েটারে পুনরায় এক রাত্রির জন্য রবীন্দ্রনাথের 'চোখের বালি'র নাট্যরূপ অভিনীত হয়। ম্যানেজার অমরেন্দ্রনাথ দত্ত ও রিসিভার অতুলচন্দ্র রায়-প্রদত্ত বিজ্ঞাপনে কুশীলবের বিবরণটি এইরূপ : মহেন্দ্র—অমরেন্দ্রনাথ; বিনোদিনী—মিস্ কুসুমকুমারী; বিহারী—মিঃ [মনোমোহন] গোস্বামী, বি. এ.; আশা—মিস্ হরি সুন্দরী (ব্ল্যাকি)। এই রাত্রে হিরণ্ময়ী নাটকের অভিনয় ও রয়্যাল বায়োস্কোপও দেখানো হয়। আগেই বলা হয়েছে, চোখের বালি ইতিপূর্বে ১১ অগ্র° ১৩১১ [শনি 26 Nov 1904] এই রঙ্গমঞ্চেই প্রথম অভিনীত হয়েছিল।

রবীন্দ্রনাথ বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের রাজনৈতিক অংশে কিছুটা উপর-উপর যোগ দিলেও, জাতীয় শিক্ষান্দোলনে তাঁর যোগ ছিল সর্বাঙ্গীণ। কিন্তু জাতীয় নেতাদের মতিগতি দেখে মাস-দেড়েকের মধ্যেই তাঁর মোহমুক্তি ঘটে। ২৬ অগ্র° [মঙ্গল 12 Dec] তিনি বন্ধু রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীকে লেখেন :

...আমাকে লইয়া টানাটানি করিয়া কি লাভ? বস্তুত দেশ যদি প্রস্তুত হইয়া না থাকে তবে আমি মাথা খুঁড়িয়া মরিলে কেবল আমারই মাথার পক্ষে অসুবিধা—তাহাতে জাতীয় বিদ্যালয়ের মত বৃহৎ ব্যাপারের কোনই সুবিধা হইবে না।...গৌরীপুরকে আমি ঠিক চিনি না—কিন্তু তাঁহার মন্ত্রদাতা মনোমোহন ভট্টাচার্য্যের [ইনি শিক্ষা-সম্মেলনের Ways and Means Committeeর অন্যতম সদস্য মনোনীত হন] প্রতি আমার লেশমাত্র শ্রদ্ধা নাই—আমি ইঁহাদের কাছে যাতায়াত করিয়া বৃথাই সময় নষ্ট করিয়াছি।

ইহা নিশ্চয় জানিবেন উচ্চতর লক্ষ্য বিস্মৃত হইয়া যাঁহারা গবর্মেন্টের বিরুদ্ধে স্পর্দ্ধা প্রকাশ করাকেই আত্মশক্তি-সাধনা ও আত্মপ্রতিষ্ঠা বলিয়া মনে করেন—যাঁহারা জাতীয় বিদ্যালয় স্থাপনাকে এই স্পর্দ্ধা প্রকাশেরই একটা উপলক্ষ্য বলিয়া জ্ঞান করেন তাঁহাদের দ্বারা স্থিরভাবে দেশের স্থায়ী মঙ্গল সাধন হইতে পারিবে না। দেশে যদি বর্ত্তমান কালে এইরূপ লোকেরই সংখ্যা এবং ইঁহাদের প্রভাবই অধিক থাকে তবে আমাদের মত লোকের কর্তব্য নিভৃতে যথাসাধ্য নিজের কাজে মনোযোগ করা। বৃথা চেষ্টায় নিষ্ফল আন্দোলনে শক্তি ও সময় ক্ষয় করা আমাদের পক্ষে অন্যায় হইবে। বিশেষত উন্মাদনায় যোগ দিলে কিয়ৎ পরিমাণে লক্ষ্যভ্রষ্ট হইতেই হয় এবং তাহার পরিণামে অবসাদ ভোগ করিতেই হয়। আমি তাই ঠিক করিয়াছি যে, অগ্নিকাণ্ডের আয়োজনে উন্মত্ত না হইয়া যতদিন আয়ু আছে আমার এই প্রদীপটি জ্বালিয়া পথের ধারে বসিয়া থাকিব। আমি কোনো জন্মেই "লীডার" বা জনসংঘের চালক নহি—আমি ভাট মাত্র—যুদ্ধ উপস্থিত হইলে গান গাহিতে পারি এবং যদি আদেশ দিবার কেহ থাকেন তাঁহার আদেশ পালনেও প্রস্তুত আছি। যদি দেশ কোনদিন দেশীয় বিদ্যালয় গড়িয়া তোলেন এবং তাহার কোনো সেবাকার্য্যে আমাকে আহ্বান করেন তবে আমি অগ্রসর হইব—কিন্তু "নেতা" হইবার দুরাশা আমার মনে নাই—যাঁহারা "নেতা" বলিয়া পরিচিত তাঁহাদিগকে আমি নমস্কার করি—ঈশ্বর তাঁহাদিগকে শুভবুদ্ধি প্রদান করুন।[৭২]

রামেন্দ্রসুন্দর এই আলাপ-আলোচনায় তাঁর অন্যতম সহযোগী ছিলেন। রবীন্দ্রনাথ পরবর্তীকালে সজনীকান্ত দাসকে বলেছিলেন : 'এই সময়ে আমার সর্বাপেক্ষা বড় সহায় ছিলেন, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মশাই। তাঁর সঙ্গে সব বিষয়েই আমার মতের মিল ছিল না। কিন্তু অকারণ বিদ্বেষবুদ্ধি কখনও আমাদের হৃদ্যতার সম্পর্কে ছেদ ঘটাতে পারে নি। এমন মহৎপ্রাণ ব্যক্তি আমি আর দ্বিতীয় দেখি নি।'[৭৩] সেইজন্যই এই চিঠিতে মনের ক্ষোভ প্রকাশের জন্য তিনি রামেন্দ্রসুন্দরকেই বেছে নিয়েছিলেন। জাতীয় শিক্ষাপরিষদের নিয়মাবলী ও পাঠ্যসূচী প্রণয়নের কমিটিতে ছিলেন রবীন্দ্রনাথ। শূন্যগর্ভ তর্কবিতর্কের সেই অভিজ্ঞতা তিক্ততার সঙ্গে বলেছেন তিনি বিপিনবিহারী গুপ্তকে ১১ আশ্বিন ১৩১৮ [বৃহ 28 Sep 1911] তারিখের আলোচনায় :

সেই ন্যাশনাল কলেজের কথা বলছি; আমিও ত আপনাদের সেই ব্যাপারের মধ্যে ছিলাম; রাত্রি এগারটা অবধি তর্ক চলছে যে, mineralogy'র জন্যে যদি দেড় ঘণ্টা দেওয়া যায় ত mechanics পড়ান কখন হবে? কি করে সময় করা যায় বলুন দেখি? অনেক রাত হয়ে গেল, তর্ক করতে করতে গাড়ীর কাছে গিয়ে হাজির, তবুও ঠিক হ'ল না কি করে mechanics-এর সময় করা যায়। আমার ত মাথা ঘুরতে লাগল। আমি ভাবলুম—

ওগো, ওগো mineralogy-ও হবে না mechanics-ও হবে না, আসল জিনিষটা আগে কিছু ঠিক করলে হয় না কি? দেখুন, একটা system-এর মধ্যে যাঁরা মানুষ হয়ে কর্মক্ষেত্রে খুব সফলতা লাভ করেন, তাঁহারা সে system থেকে কিছুতেই নিজেকে মুক্ত করতে পারেন না। গুরুদাস বাবু হাইকোর্টের জজ হলেন, কিন্তু পুরাতন শিক্ষা-পদ্ধতি থেকে নিজেকে মুক্ত করতে পারেন নি; আবার যেটা ন্যাশনাল হওয়া দরকার, সেটাকে হিন্দু করবার জন্যে চেষ্টা দেখে সফলতার আশা বড় করতে পারিনি। দেশের শিক্ষাপদ্ধতির মর্ম্মকথাটুকু বুঝতে না পারলে, নিজেকে ভাল করে চিনতে না পারলে একটা মিথ্যে মেকি নিয়ে আত্মবঞ্চনা করা ত স্বদেশের অপমান করা হয়।'[৭৪]

রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে অন্যদের পার্থক্য এইখানে যে, এই মানসিক প্রতিকূলতাকে অন্তরালে রেখে তিনি প্রকাশ্য সভায় গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের অধীনতা ও তাঁর মনস্বিতাকে স্বীকার করে নিয়েছেন; কিন্তু ঐক্যের স্বার্থে মতদ্বৈধতাকে প্রকাশ না করার সংযম অনেকেই দেখাতে পারেননি।

পৌষ-সংখ্যা বঙ্গদর্শন [৫।৮] প্রকাশিত হয় 15 Dec [শুক্র ২৯ অগ্র°]। এই সংখ্যায় রবীন্দ্রনাথের রচনা দুটি :

৪৪৩-৪৪ 'মুক্তিপাশ' ['ওগো, নিশীথে কখন এসেছিলে তুমি'] দ্র খেয়া ১০।১০৭-০৮

৪৪৯-৫১ 'অজবিলাপ' দ্র রূপান্তর। ৬১-৬৫

'মুক্তিপাশ' কবিতাটি ৭ শ্রাবণ [রবি 21 Jul] কলকাতায় লেখা। কিন্তু কালিদাসের রঘুবংশ-এর অষ্টম সর্গের অন্তর্গত অজবিলাপ-এর ৯টি শ্লোক তিনি কবে অনুবাদ করেছিলেন বলা শক্ত। অনুবাদগুলি মূল-সহ মুদ্রিত হয়।

পৌষ-সংখ্যা ভাণ্ডার [১।৯] প্রকাশিত হয় অনেক বিলম্বে 5 Feb 1906 [সোম ২৩ মাঘ]। এই সংখ্যায় রবীন্দ্রনাথের কোনো রচনা নেই, কার্তিক সংখ্যায় তিনি কার্লাইল সার্কুলার ও জাতীয় ধনভাণ্ডার সম্বন্ধে যে-দুটি প্রশ্ন করেন, তাদের তেরোটি উত্তর ২৯৯-৩১২ পৃষ্ঠায় মুদ্রিত হয়।

সঙ্গীত-প্রকাশিকা, পৌষ ১৩১২ [৫।৪] :

৬৭-৭০ মিশ্র টোড়ী-একতালা। আমাদের যাত্রা হল শুরু দ্র স্বর ৪৭

৭১-৭২ বাউলের সুর-একতালা। ছিছি চোখের জলে দ্র ঐ ৪৬

৭৩-৭৬ বাউলের সুর-একতালা। তোর আপন জনে ছাড়বে তোরে দ্র ঐ ৪৬

৭৬-৭৮ খাম্বাজ-একতালা। বিধির বাঁধন কাট্‌বে তুমি দ্র ঐ ৪৬

৭৯-৮১ সিন্ধু ভৈরবী-একতালা। ওরে ভাই, মিথ্যা ভেব না দ্র ঐ ৪৬

৮১-৮৪ বাউলের সুর-একতালা। মা কি তুই পরের দ্বারে পাঠাবি দ্র ঐ ৪৬

সবগুলি গানের স্বরলিপি করেন ইন্দিরা দেবী।

দীর্ঘদিন অনুপস্থিতির পর রবীন্দ্রনাথের এই সময়ে বিদ্যালয়ের কাজ নিয়ে ব্যস্ত, সেই কথাই লিখেছেন ৪ পৌষ [মঙ্গল 19 Dec] গিরিডির সুধাংশুবিকাশ রায়কে : 'আমি এখন বোলপুরের বিদ্যালয় লইয়া পড়িয়া আছি আমার কোথাও নড়িবার জো নাই।'[৭৫] শ্রীশচন্দ্র মজুমদারের সহায়তায় গিরিডি অঞ্চলে অনেকটা জমি সংগ্রহের কথা তিনি ৮ কার্তিক লিখেছিলেন সুবোধচন্দ্রকে : 'আমার ইচ্ছা আছে মীরার জন্যে আমি ঐ অঞ্চলে ঐ রকমের একটা সম্পত্তি করে রাখি সেটাতে বাড়ি করে চাষবাস করে তাকে দেব—এই সংকল্পটা আমার

মনে খুব লেগে গেছে, তোমরা এতে আমাকে সাহায্য কোরা।’[৭৬] সুধাংশুবাবুর পত্রে হয়তো এই জমি সংক্রান্ত কোনো আশা পেয়ে তাঁকে লিখেছেন : ‘সুরেনকে আপনার পত্র পাঠাইয়া দিলাম। সে ক্রিস্টমাসের ছুটিতে গিরিডি গিয়া যাহাতে সমস্ত দেখিয়া শুনিয়া কাজ সমাধা করিয়া আসিতে পারে এইরূপ তাহাকে লিখিয়া দিলাম।’

৭ পৌষ [শুক্র 22 Dec] শান্তিনিকেতনে পঞ্চদশ সাম্বৎসরিক ব্রহ্মোৎসব হয়। সকালের উপাসনায় রবীন্দ্রনাথের বিশেষ কোনো ভূমিকা না থাকলেও ‘সন্ধ্যার উপাসনায় শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত বাবু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বেদি গ্রহণ করিয়াছিলেন।’ তিনি যে ‘উপদেশ’ দেন, সেটি ‘উৎসব’ নামে মাঘ-সংখ্যা বঙ্গদর্শন-এ [পৃ ৪৮১-৮৭] মুদ্রিত হয় [দ্র ধর্ম ১৩।৩৩৫-৪০]। প্রেমে আমরা উৎসবের মধ্যে মিলিত হই, এই কথা বলতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ হয়তো দেশের সমকালীন মতদ্বৈধ ইত্যাদির কথা স্মরণ করে এই ভাষণে বললেন : ‘যে হতভাগ্য দেশবাসীরা পরস্পরের সুখে দুঃখে সম্পদে বিপদে এক হইয়া মিলিতে পারে না, তাহারা জগতের সর্বশ্রেষ্ঠ সত্য হইতে ভ্রষ্ট হইয়াছে বলিয়া শ্রী হইতে ভ্রষ্ট হয়—তাহারা ত্যাগ করিতে পারে না, সুতরাং লাভ করিতে জানে না—তাহারা প্রাণ দিতে পারে না, সুতরাং তাহাদের.জীবনধারণ করা বিড়ম্বনা। তাহারা পৃথিবীতে নিয়তই ভয়ে ভীত হইয়া, অপমানে লাঞ্ছিত হইয়া দীনপ্রাণে নতশিরে ভ্রমণ করে। ইহার কারণ কী? ইহার কারণ এই যে, তাহারা সত্যকে পাইতেছে না, প্রেমকে পাইতেছে না, এইজন্যই কোনোমতেই বল পাইতেছে না।’ সমকালীন পরিপ্রেক্ষিতে দেখলে সেইজন্য ভাষণের শেষাংশটি ধিক্কারের মতো শোনায় : ‘যেখানে অহংকার, যেখানে তর্ক, যেখানে বিরোধ, যেখানে খ্যাতিপ্রতিপত্তির জন্য প্রতিযোগিতা, যেখানে মঙ্গলকর্মও লোকে লুব্ধভাবে গর্বিতভাবে করে, যেখানে পুণ্যকর্ম অভ্যস্ত আচারমাত্রে পর্যবসিত—সেখানে সমস্ত আচ্ছন্ন, সমস্ত রুদ্ধ, সেখানে ক্ষুদ্র বৃহৎরূপে প্রতিভাত হয়, বৃহৎ ক্ষুদ্র হইয়া পড়ে, সেখানে তোমার বিশ্বযজ্ঞোৎসবের আহ্বান উপহসিত হইয়া ফিরিয়া আসে।’

পশুপতিনাথ বসুর বাড়িতে ২৩ আশ্বিন [সোম 9 Oct] রবীন্দ্রনাথ ‘বিজয়া-সম্মিলন’ নামে যে প্রবন্ধ পাঠ করেন, সেটি কার্তিক-সংখ্যা বঙ্গদর্শন-এ মুদ্রিত হয়েছিল [দ্র ভারতবর্ষ ৪।৪৬৮-৭৪]। 25 Dec [সোম ১০ পৌষ] ভাষণটি ৮ পৃষ্ঠার একটি পুস্তিকাকারে মজুমদার লাইব্রেরি থেকে প্রকাশিত হয়, একথা আমরা আগেই বলেছি। ৭ পৌষ [শুক্র 22 Dec] ২২৫ লোয়ার সার্কুলার রোডে অবস্থিত ট্রিভোলি পার্কে একটি বিরাট জাতীয় মেলার উদ্বোধন হয়। পুস্তিকাটি প্রকাশের অব্যবহিত উপলক্ষ হয়তো এইটিই।

বিডন স্ট্রীটে অবস্থিত চৈতন্য লাইব্রেরির সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল, ৮ পৌষ [শনি 23 Dec] লাইব্রেরির সাধারণ সভায় ই. বি. হ্যাভেল, এস. কে. র‍্যাটক্লিফ ও জাস্টিস স্টিফেনের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথকেও সম্মানিত সদস্য নির্বাচিত করে এই সম্পর্ককে স্বীকৃতি জানানো হয়।[৭৭]

এই সময়ে রবীন্দ্রনাথের ‘ভারতবর্ষ’ প্রবন্ধ-সংকলন গ্রন্থটি প্রকাশের আয়োজন চলছে। বেঙ্গলী-র 4 Jan [বৃহ ২০ পৌষ]-সংখ্যায় ‘মজুমদার লাইব্রেরী’র বিজ্ঞাপনে লেখা হয় : ‘...ভারতবর্ষ— (যন্ত্রস্থ; ২০ পৌষের মধ্যে প্রকাশিত হইবে)—৷৷ল০।’ একই ভাষায় বিজ্ঞাপনটি পরের মাস পর্যন্ত ছাপা হয়েছে। বেঙ্গল লাইব্রেরির ক্যাটালগ-অনুযায়ী গ্রন্থটি প্রকাশিত হয় 15 Feb 1906 [বৃহ ৩ ফাল্গুন]। গ্রন্থটির আখ্যাপত্র :

ভারতবর্ষ।/শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত।/ কলিকাতা,/২০ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্ মজুমদার লাইব্রেরি/হইতে প্রকাশিত।/১৩১২/মূল্য ৷৷ল০ দশ আনা।

[পরপৃষ্ঠায়] কলিকাতা,/২০ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্, ‘‘দিনময়ী প্রেসে’’/শ্রীহরিচরণ মান্না দ্বারা মুদ্রিত।

‘প্রকাশকের নিবেদন’-এ লেখা হয় : এই গ্রন্থের সমস্ত প্রবন্ধই বঙ্গদর্শনে (নব পর্য্যায়)/প্রকাশিত হইয়াছিল। এক্ষণে কোন কোন প্রবন্ধের স্থানে/ স্থানে সামান্য পরিবর্ত্তন হইয়াছে মাত্র।

পৃষ্ঠাসংখ্যা : ২+২+২+১৫৪। মূল্য দশ আনা।

দশটি প্রবন্ধ এই গ্রন্থে সংকলিত হয় : নববর্ষ, ভারতবর্ষের ইতিহাস, ব্রাহ্মণ, চীনেম্যানের চিঠি, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সভ্যতার আদর্শ, বারোয়ারি-মঙ্গল, অত্যুক্তি, মন্দিরের কথা, ধম্মপদং ও বিজয়া-সম্মিলন।

গোপালকৃষ্ণ গোখলের সভাপতিত্বে কংগ্রেসের একবিংশতিতম অধিবেশন বারাণসীতে অনুষ্ঠিত হয় 27-30 Dec [বুধ-শনি ১২-১৫ পৌষ]। বঙ্গভঙ্গের পরিপ্রেক্ষিতে বাঙালিদের কাছে এই অধিবেশন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ছিল। কংগ্রেস সভাপতির মঞ্চ থেকে কার্জনের শাসনকে ঔরংজীবের শাসনের সঙ্গে তুলনা করে বঙ্গভঙ্গের নিন্দা ও স্বদেশী আন্দোলনের প্রশংসা করা হয়েছিল, এই বিষয়ে দুটি প্রস্তাবও নেওয়া হয়। কিন্তু গোখলে, সুরেন্দ্রনাথের মতোই, বয়কটকে সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য পূরনের উদ্দেশ্যে একটি রাজনৈতিক অস্ত্র ছাড়া আর কিছু ভাবতে পারেননি, কিন্তু বাংলার কিছু চরমপন্থী রাজনীতিক ইতিমধ্যে বয়কট ও স্বদেশীকে স্বরাজের হাতিয়ার রূপে ভাবতে আরম্ভ করেছেন—মহারাষ্ট্রের টিলক ও পাঞ্জাবের লাজপৎ রায়ের সহানুভূতি ছিল এঁদের প্রতি। তাছাড়া সপ্তম এডোয়ার্ডের পুত্র যুবরাজ ও তাঁর পত্নী তখন ভারত পরিদর্শনে এসেছেন, তাঁদের কলকাতা সফরের সময়ে বিক্ষোভ প্রকাশের কার্যসূচীও তাঁদের ছিল। কিন্তু কংগ্রেসের মঞ্চ থেকে তাঁদের সাদর সম্ভাষণ জানানো হয়, ভূপেন্দ্রনাথ বসু 29 Dec [শুক্র ১৪ পৌষ] বারাণসী থেকে কলকাতায় ফিরে সোজা স্টীমারঘাটে চলে যান তাঁদের অভ্যর্থনায় যোগ দিতে। হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ লিখেছেন, ‘[ভূপেন্দ্রনাথ] যুবরাজের অভ্যর্থনায় যোগ দিয়া গোলদীঘীতে আসিলেন। তথায় এক স্বদেশী সভা হইতেছিল। লোক তাঁহাকে দেখিয়া উত্তেজিত হইয়া উঠিল—তাঁহাকে ধিক্কার দিল।/দুই দলে মতান্তর যত স্পষ্ট হইতে লাগিল, ততই ছাড়াছাড়ি হইতে লাগিল।’[৭৮]

কংগ্রেসের এই অধিবেশন সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ কোনো প্রবন্ধে আলোচনা করেননি, তাঁর প্রতিক্রিয়া প্রকাশ পেল মাঘ-সংখ্যা ভাণ্ডার-এ স্বাক্ষরিত এক ‘প্রশ্ন’ [পৃ ৩৪২]-তে : ‘কন্‌গ্রেসের প্রকৃতি ও পদ্ধতি সম্বন্ধে কোনো পরিবর্ত্তনের প্রয়োজন হইয়াছে কিনা—যদি হইয়া থাকে তবে কিরূপে তাহা সাধন করিতে হইবে।’ ফাল্গুন [পৃ ৩৫৯-৬৬] ও চৈত্র [পৃ ৪০৩-০৮]-সংখ্যায় প্রশ্নটির উত্তর দেন প্রমথনাথ রায়চৌধুরী, অশ্বিনীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, ‘বঙ্গরমণী’ ও বিপিনচন্দ্র পাল [চৈত্র]। চৈত্র-সংখ্যায় বরিশালের জননায়ক অশ্বিনীকুমার দত্ত ‘কংগ্রেসের কর্ত্তব্য কি?’ শীর্ষক একটি স্বতন্ত্র প্রবন্ধে [পৃ ৪০৯-১২] এই প্রশ্নটিরই জবাব দেন। ‘বঙ্গরমণী’ রবীন্দ্রনাথের উদ্দেশ্যটি ঠিক ধরতে পেরেছিলেন; তিনি লেখেন : ‘সম্পাদকের প্রশ্নটী একটী হেঁয়ালী। ইহার প্রকৃষ্ট পদ্ধতি তিনি অনেক দিন হইতে বলিয়া আসিতেছেন, কংগ্রেস তাহাতে কর্ণপাত না করায় তিনি কি প্রশ্ন স্বরূপ জিজ্ঞাসা করিয়া সকলের নিকট তাহাই উত্তর স্বরূপ আদায় করিয়া কংগ্রেসের মনোযোগ আকর্ষণ করিতে চাহেন?’

ভাণ্ডার-এর উক্ত সংখ্যায় রবীন্দ্রনাথ ‘বিলাসের ফাঁস’ [পৃ ৩২৩-২৯; দ্র সমাজ ১২।২১৭-২৩] ও ‘রাজভক্তি’ [পৃ ৩৪৩-৫২; দ্র রাজা প্রজা ১০।৪৩৫-৪২] নামে দুটি প্রবন্ধ লেখেন—দুটিই কোনো-কোনো দিক দিয়ে কংগ্রেসের বর্তমান অধিবেশনের সঙ্গে সম্পর্কান্বিত। স্বদেশী মিল স্থাপনে মূলধনের প্রশ্নে গোখলে

বলেছিলেন, ভারতের অন্যান্য প্রদেশের তুলনায় চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের কল্যাণে বাঙালি ভূম্যধিকারীদের হাতে অধিক উদ্বৃত্ত ধন বর্তমান। রবীন্দ্রনাথ 'বিলাসের ফাঁস' প্রবন্ধে দেখালেন, ইংরেজের অনুকরণে ব্যক্তিগত ভোগস্পৃহা চরিতার্থ করতে গিয়ে সেই অর্থ সমাজের কল্যাণে ব্যয়িত হতে পারছে না। আর ধনীদের সেই প্রবণতা দরিদ্রদের মধ্যে সংক্রামিত হয়ে অনেক সামাজিক ব্যাধির জন্ম দিচ্ছে। পণপ্রথার উদাহরণ দিয়ে তিনি লিখেছেন : 'একদিকে ভোগের আদর্শ উচ্চ হইয়া সংসারযাত্রা বহুব্যয়সাধ্য ও অপরদিকে কন্যামাত্রকেই নির্দিষ্ট বয়সের মধ্যে বিবাহ দিতে বাধ্য হইলে পাত্রের আর্থিক মূল্য না বাড়িয়া গিয়া থাকিতে পারে না। অথচ এমন লজ্জাকর ও অপমানকর প্রথা আর নাই। জীবনের সর্বাপেক্ষা ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ দোকানদারি দিয়া আরম্ভ করা, যাহারা আজ বাদে কাল আমার আত্মীয়শ্রেণীতে গণ্য হইবে আত্মীয়তার অধিকার স্থাপন লইয়া তাহাদের সঙ্গে নির্লজ্জভাবে নির্মমভারে দরদাম করিতে থাকা—এমন দুঃসহ নীচতা যে-সমাজে প্রবেশ করিয়াছে, সে সমাজের কল্যাণ নাই, সে-সমাজ নিশ্চয়ই নষ্ট হইতে আরম্ভ করিয়াছে।' রবীন্দ্রনাথ নিজেই এ-ব্যাপারে ভুক্তভোগী, অনূঢ়া মীরা দেবীর জন্য তিনি পাত্রসন্ধান করেছিলেন—ক্ষোভ তাই যথেষ্ট উত্তেজনার সঙ্গেই প্রকাশ পেয়েছে! চাকরির মায়ায় অনেক সুযোগ্য শিক্ষিত লোক অপমানকেই সম্মান বলে গ্রহণ করে দেশের সঙ্গে ধর্মসম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করতে বাধ্য হচ্ছে, এরূপ উদাহরণ স্বদেশী যুগে অনেক দেখা যাচ্ছিল। রবীন্দ্রনাথ দৃষ্টান্ত দিয়ে লিখলেন : 'বিধাতার লীলাসমুদ্র হইতে জোয়ার আসিয়া আজ যখন সমস্ত দেশের হৃদয়স্রোত আত্মশক্তির পথে মুখ ফিরাইয়াছে তখন বিমুখ কারা। তখন গোয়েন্দাগিরি করিয়া সত্যকে মিথ্যা করিয়া তুলিতেছে কারা। তখন ধর্মাধিকরণে বসিয়া অন্যায়ের দণ্ডে দেশপীড়নের সাহায্য করিতেছে কারা। তখন বালকদের অতি পবিত্র গুরুসম্বন্ধ গ্রহণ করিয়াও তাহাদিগকে অপমান ও নির্যাতনের হস্তে অনায়াসে সমর্পণ করিতে উদ্যত হইতেছে কারা। যারা চাকরির ফাঁস গলায় পরিয়াছে। তারা যে কেবল অন্যায় করিতে বাধ্য হইতেছে তাহা নয়, তারা নিজেকে ভুলাইতেছে, তারা প্রমাণ করিতে চেষ্ট করিতেছে, যে দেশের লোক ভুল করিতেছে।' রবীন্দ্রনাথ জীবনযাত্রাকে লঘু করার পরামর্শ দিয়েছেন, তাতেই চাকরির ফাঁস আলগা হয়ে যাবে, তখন চাষবাস বা সামান্য ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হওয়া সহজ হবে।

অনেকে মনে করেন, বিলাসিতার বৃদ্ধি ধনবৃদ্ধিরই লক্ষণ। কিন্তু ঘটনা এই যে, আগে যে অর্থ সাধারণের কাজে ব্যয়িত হত এখন তা ব্যক্তিগত ভোগে খরচ হচ্ছে। ফলে পল্লীগুলির দারিদ্র্যের বিনিময়ে শহরের ভোগবিলাসের স্থানগুলি সমৃদ্ধ হয়ে উঠছে। কিন্তু 'সমস্ত শরীরকে প্রতারণা করিয়া কেবল মুখেই যদি রক্ত সঞ্চার হয়, তবে তাহাকে স্বাস্থ্য বলা যায় না।...মঙ্গল করিবার শক্তিই ধন, বিলাস ধন নহে।'

যুবরাজ [পরবর্তীকালে রাজা পঞ্চম জর্জ] ও তাঁর পত্নী মেরী ভারত-ভ্রমণান্তে 29 Dec [শুক্র ১৪ পৌষ] কলকাতায় এসে 9 Jan 1906 [মঙ্গল ২৫ পৌষ] রেঙ্গুন যাত্রা করেন। রাজভক্ত ভারতে এই ভ্রমণের রাজনৈতিক তাৎপর্য ছিল। কার্জনী কুশাসনের কাঁটার উপর সস্তা প্রলেপ দেওয়ার জন্য ইংরেজ কূটনীতি এই রাজকীয় ভ্রমণের আয়োজন করে। কিন্তু ক্ষতিগ্রস্ত ও নিপীড়িত বাঙালির মর্মক্ষত এই মলমে সারেনি, তারই যন্ত্রণা রবীন্দ্রনাথের 'রাজভক্তি' প্রবন্ধে ব্যক্ত হয়েছে। সেইজন্য তাঁর ভাষাও কোথাও-কোথাও বেশ কাঠিন্যপূর্ণ : 'স্বাভাবিক আভিজাত্যের অভাবে লর্ড কার্জন কর্তৃত্বের নেশায় উন্মত্ত হইয়াছিলেন, তাহা স্পষ্ট অনুভব করা গিয়াছিল। এ গদি ছাড়িতে তাঁহার কিছুতেই মন সরিতেছিল না। এই রাজকীয় আড়ম্বর হইতে অবসৃত হইয়া

তাঁহার অন্তরাত্মা "খোঁয়ারি"-গ্রস্ত মাতালের মতো আজ যে অবস্থায় আছে তাহা যদি আমরা যথার্থভাবে অনুভব করিতাম তবে বাঙালিও বোধ হয় আজ তাঁহাকে দয়া করিতে পারিত।'

ভারতবর্ষের রাজভক্তি প্রকৃতিগত, দেশের সর্বোচ্চ শাসকপরিবারের প্রতি রবীন্দ্রনাথও সশ্রদ্ধ ছিলেন ভিক্টোরিয়ার মৃত্যুর পর তাঁর রচিত শোক-প্রবন্ধে তার পরিচয় পাওয়া গিয়েছিল। জমিদারির দায়িত্ব পাবার পর মফঃস্বলে গিয়ে তিনি নিজেও প্রজাদের কাছে প্রায় রাজার সম্মানই পেতেন। ভারতীয় রীতি অনুযায়ী তার প্রতিদানেও তিনি অভ্যস্ত ছিলেন। রাজপুত্রের কাছে তাঁর প্রত্যাশা ছিল এই রীতি-অনুসারী। প্রবন্ধটির একটি বর্জিত অংশে তিনি লিখেছিলেন : 'যে কয়দিন রাজপুত্র ভারতবর্ষে ছিলেন, সেই কয়দিনের মত কলের নিয়মের ব্যভিচার করিয়াও তাঁহার হস্তে কতকগুলি সত্যকার রাজক্ষমতা দেওয়া উচিত ছিল। বাজি পোড়ানো, ফৌজ কাওয়াজ করানো, অভিনন্দনপত্র গ্রহণ ও তাহার প্রত্যুত্তর প্রদানই রাজক্ষমতা নহে। আমরা জানি, অপরাধ ক্ষমা, অন্যায়ের প্রতিকার, দুঃখ দূর, অভাব পূরণ করা প্রভৃতিই রাজক্ষমতার সত্য পরিচয়। আমরা যদি যথার্থ রাজাকে পাইতাম, তবে তাঁহার কাছে প্রার্থনা করিতাম অভিযোগ করিতাম মার্জ্জনা চাহিতাম। তাঁহার ঔদার্য্য ও বদান্যতায় মুগ্ধ হইতাম, তাঁহার ক্ষমাগুণে তাঁহার সকরুণ প্রজাবাৎসল্যে তিনি আমাদের হৃদয়কে চিরদিনের জন্য কিনিয়া যাইতেন। আমাদের বড় দুঃখ—বড় নিগ্রহের সময়েই রাজপুত্র এদেশে পদার্পণ করিয়াছিলেন, কিন্তু সে দুঃখ তাঁহাকে যে নিবেদনমাত্র করিব, সেইটুকু রাজধর্ম্মও তিনি গ্রহণ করিলেন না।'[৭৯]

প্রবন্ধটি রবীন্দ্রনাথ ফিল্ড অ্যান্ড অ্যাকাডেমিতে ১০ মাঘ [মঙ্গল 23 Jan] তারিখে পাঠ করেন।

খেয়া-র 'দান' কবিতা তিনি লিখেছিলেন ২৬ ভাদ্র [সোম 11 Sep] গিরিডিতে—এর পর প্রায় এক মাস তাঁর স্বদেশী গান রচনার পর্ব। খেয়া-র আর একটি পর্ব শুরু হল শান্তিনিকেতনে ১৫ পৌষ [শনি 30 Dec] 'অবারিত' ['ওগো, তোরা বল্ তো এরে'] কবিতা [দ্র খেয়া ১০।১২০-২৩] দিয়ে। কবিতাটির দ্বিতীয় স্তবক সব শেষে লিখিত হয়, পরে সংখ্যা-চিহ্নিত করে স্তবকের বর্তমান বিন্যাসটি তৈরি হয়।

২০ পৌষ [বৃহ 4 Jan 1906] তিনি লিখলেন 'লীলা' ['আমি শরৎ শেষের মেঘের মতো'] কবিতাটি [দ্র বঙ্গদর্শন, ফাল্গুন। ৫৩২; খেয়া ১০।১২৫-২৬]; শেষ স্তবকটি স্থান-কাল লেখার পরে সংযোজিত হয়েছিল।

পৌষের শেষ দিনটিতে অর্থাৎ ২৯ পৌষ [শনি 13 Jan] লিখিত হল 'গোধূলিলগ্ন' ['আমার গোধূলিলগন এল বুঝি কাছে'] কবিতাটি [দ্র খেয়া ১০।১২৩-২৫]। কবিতাটির তৃতীয় ও চতুর্থ স্তবক বাদ দিয়ে একটি গীতরূপ প্রকাশিত হয় পৌষ ১৩২৬-এ প্রকাশিত কাব্যগীতি-তে [দ্র গীত ১।৬৫-৬৬; স্বর ৩৩]। শান্তিদেব ঘোষ লিখেছেন : "'খেয়া'র 'আমার গোধূলিলগন এল বুঝি কাছে' কবিতার গীত-রূপ ইমন-পূরবী সুরে ১৩২৬ সালের কিছু আগে রচিত।'[৮০]

মাঘ-সংখ্যা বঙ্গদর্শন [৫।১০] প্রকাশিত হয় 22 Jan [সোম ৯ মাঘ]। রবীন্দ্রনাথের তিনটি রচনা এই সংখ্যায় মুদ্রিত হয়;

৪৮১-৮৭ 'উৎসব' দ্র ধর্ম ১৩।৩৩৫-৪০

৪৮৮-৮৯ 'দুঃখমূর্ত্তি' দ্র খেয়া ১০।১০৬

৫০৫-০৭ 'বালিকা বধূ' দ্র ঐ ১০।১১২-১৪

‘দুঃখমূর্তি’ কবিতাটি মাঘ-সংখ্যায় প্রকাশিত হতে দেখে রবীন্দ্রজীবনী-কার লিখেছেন : ‘আমাদের অনুমান এই সময়ে ‘দুঃখ মূর্তি’ (খেয়া, ৭ সংখ্যক কবিতা) রচিত হয়।’[৮১] কিন্তু পাণ্ডুলিপির সাক্ষ্যে আমরা জানি, কবিতাটি ৭ শ্রাবণ [রবি 23 Jul] কলকাতায় রচিত। মিশ্র ইমনকল্যাণ-ঝম্পক সুর-তালে বিধৃত কবিতাটির গীতরূপ ১৩১৪ বঙ্গাব্দের মাঘোৎসবে গীত হয় [দ্র তত্ত্ব°, ফাল্গুন ১৮২৯ শক। ১৮৪; গীত ১।১০১; স্বর ২৫]।

মাঘ-সংখ্যা ভাণ্ডার [১।১০] প্রকাশিত হয় 25 Feb [রবি ১৩ ফাল্গুন]। এই সংখ্যায় রবীন্দ্র-রচনা :

৩২৩-২৯ ‘বিলাসের ফাঁস’ দ্র সমাজ ১২।২১৭-২৩

৩৪২ ‘প্রশ্ন’

৩৪৩-৫১ ‘রাজভক্তি’ দ্র রাজা প্রজা ১০।৪৩৫-৪১

প্রত্যেকটি রচনাই ‘সম্পাদক’-এর বদলে ‘শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর’ স্বাক্ষরিত। রচনাগুলি সম্পর্কে আমরা আগেই আলোচনা করেছি।

সঙ্গীত-প্রকাশিকা, মাঘ ১৩১২ [৫।৫] :

১০৪-০৭ সাহানা-ঝাঁপতাল। দুই হৃদয়ের নদী, একত্র মিলিল যদি দ্র স্বর ৫৫

গানটির স্বরলিপিকারের নাম উল্লেখিত হয়নি।

মহর্ষির প্রথম মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে মাঘ মাসের প্রথমে রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতন থেকে কলকাতায় আসেন। ৬ মাঘ [শুক্র 19 Jan] তারিখের এই অনুষ্ঠান সম্ভবত শাস্ত্রীয় ক্রিয়াকলাপে সীমাবদ্ধ ছিল, তত্ত্ববোধিনী বা অন্য কোন পত্রিকাতে এই উপলক্ষে ভাষণ গান প্রভৃতির উল্লেখ নেই। রবীন্দ্রনাথের ক্যাশবহিতে এই অনুষ্ঠান সংক্রান্ত হিসাবটি এইরূপ : ‘মহর্ষি দেবের সপিণ্ডকরণ ও অন্যান্য খরচ বাবদ ২১৪ ল ৯ টাকার তিন অংশের এক অংশ ৭১৮৷৷ল ৩'—পারিবারিক খরচগুলি এইভাবে দ্বিজেন্দ্রনাথ, সত্যেন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্রনাথ জমিদারির এই তিন মালিকের মধ্যে বিভক্ত হত।

আগেই বলেছি, ১০ মাঘ [মঙ্গল 23 Jan] রবীন্দ্রনাথ ফিল্ড অ্যান্ড অ্যাকাডেমি ক্লাবে ‘রাজভক্তি’ প্রবন্ধটি পাঠ করেন। এইদিন বেঙ্গলী-তে লেখা হয় : ‘Babu Ravindra Nath Tagore will read a paper on “Raj Vakti” to-day at 5 p.m. at the Field and Academy, 8 Sib Narayan Das’ Lane. Admission by free tickets.’ পূর্বদিন [22 Jan] অমৃতবাজার পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তিটি প্রকাশিত হয়েছিল।

১১ মাঘ [বুধ 24 Jan] সকালে আদি ব্রাহ্মসমাজগৃহে ও সন্ধ্যায় মহর্ষিভবনে ষট্‌সপ্ততিতম সাম্বৎসরিক ব্রাহ্মসমাজ অনুষ্ঠিত হয়। সায়ংকালে ‘যথাসময়ে স্বর্গীয় মহর্ষিদেবের গৃহপ্রাঙ্গণ লোকপূর্ণ হইলে শ্রদ্ধাস্পদ বাবু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, শ্রীযুক্ত শম্ভুনাথ গড়গড়ি ও শ্রীযুক্ত চিন্তামণি চট্টোপাধ্যায় বেদি গ্রহণ করিলে গড়গড়ি মহাশয়...সকলকে উদ্বোধিত করিলেন।...পরে ব্রহ্মোপাসনাদি সমাপ্ত হইলে শ্রদ্ধাস্পদ বাবু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এই উপদেশ দিলেন।’[৮২] উপদেশটি নূতন নয়, শান্তিনিকেতনে পঞ্চদশ সাম্বৎসরিক ব্রহ্মোৎসবে তিনি ‘উৎসব’ নামে যে প্রবন্ধটি পাঠ করেন সেইটিই এখানে পুনঃপঠিত হয়। তত্ত্ববোধিনী-র ফাল্গুন-সংখ্যার ১৭১-৭২ পৃষ্ঠায় রবীন্দ্রনাথের একটিমাত্র ব্রহ্মসংগীত ইমন ভূপালী-একতালা সুর-তালে বিধৃত ‘ভুবনেশ্বর হে’ গানটি [দ্র গীত

১।৫৬; স্বর ২৪] মুদ্রিত হয়। গানটি খেয়া-র পাণ্ডুলিপিতে রাখীসংগীত 'বাংলার মাটি বাংলার জল'-এর আগের দুটি পৃষ্ঠায় রচিত হয়েছিল অর্থাৎ এটি ভাদ্রের শেষে বা আশ্বিনের প্রথমে লেখা। নিশ্চয়ই পুরোনো কিছু গান মাঘোৎসবের সকাল-সন্ধ্যার উপাসনায় পরিবেশিত হয়।

এইদিন কাঙালীচরণ সেন-কৃত ব্রহ্মসঙ্গীত স্বরলিপি দ্বিতীয় ভাগ প্রকাশিত হয়। ৫০টি গানের এই স্বরলিপি-সংগ্রহ 'পরমার্চ্চনীয় শ্রীযুক্ত বাবু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহোদয়ের শ্রীচরণকমলে চির কৃতজ্ঞতার নিদর্শন স্বরূপ' 'উৎসর্গ' করা হয়। ৫০টির মধ্যে ৩৫টি গানই রবীন্দ্রনাথের এবং এর অধিকাংশের স্বরলিপি সঙ্গীত-প্রকাশিকা-র বিভিন্ন সংখ্যায় মুদ্রিত হয়েছিল।

মাঘোৎসবের অব্যবহিত পরে রবীন্দ্রনাথ শিলাইদহ যাত্রা করেন। ১৮ মাঘ [বুধ 31 Jan] সেখান থেকে সন্তানবিয়োগকাতর সুবোধচন্দ্রকে সান্ত্বনা দেওয়ার পরে লিখেছেন : 'আমি এখানে আর এক সপ্তাহের অধিক থাকিব না। এখান হইতে ফিরিয়া গিয়া কলিকাতাতেও বিলম্ব করিব না। রথীরা মার্চ্চ মাসের মাঝামাঝি যাত্রা করিবে অতএব তাহাদের আর অধিক বিলম্ব নাই—ইতিমধ্যে যাত্রার আয়োজন স্বরূপ কাপড় প্রভৃতি প্রস্তুত করাইতে হইবে। সন্তোষ যদি সম্পূর্ণ সুস্থ ও সবল হইয়া থাকে তবে তাহাকেও আনাইয়া লইতে হইবে।' মীরা দেবীর বিবাহের জন্য বৎসরখানেক পূর্ব থেকেই তিনি ব্যস্ত হয়ে উঠেছিলেন, এই চিঠিতেও প্রসঙ্গটি আছে : 'একবার প্রমথর সঙ্গে সেই বিবাহ প্রস্তাবটার পুনরালোচনা করিয়া দেখিয়ো। তিনি যখন বিলাতেই যাইতেছেন তখন আর ত জাতের ভয় রাখিলে চলিবে না—আমি তাঁহার লণ্ডনের খরচ যথাসম্ভব জোগাইব।—কেদার দাসগুপ্তকে জিজ্ঞাসা করিয়ো তিনি যে ছেলেটির কথা জানাইয়াছেন তাহার কি হইল—B. L. Chowdhury ইহার কথা বলিয়াছিলেন। যদি সুবিধা হয় তাহাকে দেখাইয়া লইয়ো।'[৮৩] মীরা দেবীর বয়স এখন মাত্র বারো বছর, কিন্তু রবীন্দ্রনাথ এখনই তাঁকে পাত্রস্থ করে হাত ধুয়ে ফেলতে চাইছিলেন—পরিপার্শ্বের নৈতিক শুচিতা সম্পর্কে তাঁর কী কোনো সংশয় ছিল?

পরদিন ১৯ মাঘ [বৃহ1 Feb] তিনি নগেন্দ্রনাথ আইচকে একটি পত্র লিখেছেন। পোস্টমার্ক PABNA 1 FE 06 দেখে মনে হয়, তিনি তখন পদ্মার অপর পারে কোনো চরে বাস করছেন। তিনি লিখেছেন : 'সেই ছাত্রটিকে কতদিন সাহায্য করিতে হইবে লিখিয়া পাঠাইলে ব্যবস্থা করিবার চেষ্টা করিব। আগামী মার্চ্চে বোধহয় পরীক্ষার সময়।'[৮৪] তাঁর ক্যাশবহিতে দেখা যায়, এইরূপ দানের ফর্দ বেশ লম্বা ছিল। পত্রের পরিশিষ্টে তিনি লিখেছেন : 'আগামী সোম মঙ্গলবারে কলিকাতায় যাইব।' কিন্তু তাঁর ফেরা বিলম্বিত হয়। ২৭ মাঘ [শুক্র 9 Feb] তিনি কলকাতায় আসেন।

শিলাইদহ-বাসের শেষ পর্বে তিনি কয়েকটি গান ও কবিতা রচনা করলেন, সবগুলিই খেয়া-র অন্তর্ভুক্ত হয়েছে :

২৩ মাঘ সোম [5 Feb] ['আমি কেমন করিয়া জানাব আমার']

শিলাইদহ। পদ্মা দ্র খেয়া ১০।১৪১-৪২; গীত ১।৩৩-৩৪; সুর ২৪;

সম্ভবত ১৩১৪ বঙ্গাব্দের মাঘোৎসবের আগে গানটিতে সুর সংযোজিত হয়; গীতরূপে শুধু প্রথম ও চতুর্থ স্তবক-দুটি গৃহীত হয়েছে। সামান্য পাঠান্তর আছে।

২৪ মাঘ [মঙ্গল 6 Feb] 'বিচ্ছেদ' ['তোমার বীণার সাথে আমি'] শিলাইদহ। পদ্মা দ্র খেয়া ১০।১৪২-৪৩।

২৫ মাঘ [বুধ 7 Feb] 'বিকাশ' ['আজ বুকের আসন ছিঁড়ে ফেলে'] শিলাইদহ। পদ্মা দ্র খেয়া ১০।১৪৪; গীত ৩।৮৯৬; স্বর ৫০;

এই কবিতাটির চারটি ছত্র বাদ দিয়ে ১৩১৪ বঙ্গাব্দের মাঘোৎসবের পূর্বে গীতরূপ দেওয়া হয় দ্র তত্ত্ব° ফাল্গুন ১৮২৯ শক। ১৭৮, ভৈরবী-তেওরা। মুদ্রিত গ্রন্থে রচনার তারিখ '২৪ মাঘ' হলেও পাণ্ডুলিপিতে স্পষ্টই '২৫শে মাঘ' লেখা আছে।

২৫ মাঘ [বুধ 7 Feb] 'সীমা' ['সেটুকু তোর অনেক আছে'] শিলাইদহ। পদ্মা দ্র খেয়া ১০।১৪৪-৪৫; গীত ১।১১১; স্বর ২৬;

প্রথম চারটি ছত্র বাদ দিয়ে কবিতাটির গীতরূপ 'একমনে তোর একতারাতে একটি যে তার সেইটি বাজা' ১৩১৫ বঙ্গাব্দের মাঘোৎসবে গীত হয়। দ্র তত্ত্ব°, ফাল্গুন ১৮৩০ শক। ১৮০, মিশ্রবাহার-যৎ।

২৫ মাঘ [বুধ 7 Feb] 'ভার' ['তুমি যত ভার দিয়েছ সে ভার'] পদ্মা দ্র খেয়া ১০।১৪৫-৪৭; গীত ১।৪৬-৪৭; স্বর ২৬;

দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্তবক বাদ দিয়ে কবিতাটির গীতরূপ ১৩১৫ বঙ্গাব্দের মাঘোৎসবে গাওয়া হয় দ্র তত্ত্ব°, ফাল্গুন ১৮৩০ শক। ১৮০, বাউলের সুর-একতালা।

২৬ মাঘ [বৃহ 8 Feb] 'টিকা' ['আজ পুরবে প্রথম নয়ন মেলিতে'] পদ্মা দ্র খেয়া ১০।১৪৭-৪৮।

এর পরের দিনই ২৭ মাঘ [শুক্র 9 Feb] রবীন্দ্রনাথ কলকাতায় ফিরে আসেন—'নজর খাতা মা° খোদ বাবু মহাশয় ৫০, হিসাব থেকে তারিখটি নির্ধারিত হয়েছে।

২৮ মাঘ [শনি 10 Feb] তিনি মহিমচন্দ্র দেববর্মাকে লিখেছেন : 'তোমার কল্যাণী গৃহলক্ষ্মীর কথা শুনিয়া অত্যন্ত আনন্দলাভ করিলাম।'[৮৫] 11 Dec 1905 [সোম ২৫ অগ্র°] কাশীতে নেপালের পরলোকগত রানা Dhujnadsing [?] Jung-এর কন্যার সঙ্গে মহিমচন্দ্রের বিবাহ হয়।[৮৬] রবীন্দ্রনাথ পত্রে এই নবোঢ়া পত্নীর কথা উল্লেখ করেছেন। তিনি এই পত্রেই লেখেন : 'আমি আগামী কল্য বোলপুর যাত্রা করিব।' এই সংক্রান্ত 'বোলপুর গমনের জন্য দেওয়া যায় ১৫' হিসাবটি অবশ্য পাওয়া যায় ৩০ মাঘ [সোম 12 Feb] তারিখে।

তত্ত্ববোধিনী, ফাল্গুন ১৮২৭ শক [৭৫১ সংখ্যা] :

১৬৬-৭১ ['উৎসব'] দ্র ধর্ম ১৩।৩৩৫-৪০

১৭১-৭২ 'ভুবনেশ্বর হে' দ্র গীত ১।৫৬

বঙ্গদর্শন, ফাল্গুন ১৩১২ [৫।১১] :

৫৩২ 'লীলা' ['আমি শরৎশেষের মেঘের মতো'] দ্র খেয়া ১০।১২৫-২৬

৫৪২-৪৪ 'অনাহত' ['দাঁড়িয়ে আছ আধেক-খোলা'] দ্র খেয়া ১০।১১৫-১৭

ভাণ্ডার, ফাল্গুন ১৩১২ [১।১১] :

৩৪৩ 'স্বদেশী আন্দোলনে নিগৃহীতদের প্রতি নিবেদন'

৩৭৫ 'পূজার লগ্ন' ['এখন আর দেরি নয়, ধরগো তোরা'] দ্র গীত ১।২৬০

বেঙ্গল লাইব্রেরির ক্যাটালগ অনুযায়ী ফাল্গুন-সংখ্যা ভাণ্ডার প্রকাশিত হয় 18 Mar [রবি ৪ চৈত্র], সেই কারণেই 'স্বদেশী আন্দোলনে নিগৃহীতদের প্রতি নিবেদন' রচনাটি প্রকাশের সুযোগ ঘটে—এটি সম্পর্কে আমরা পরে আলোচনা করব।

'পূজার লগ্ন' এই স্বদেশী গানটি খেয়া-র পাণ্ডুলিপিতে [Ms. 110 (i)] 'গভীর রাতে ভক্তি ভরে' গানটির পরের পৃষ্ঠায় লিখিত—হয়তো ভাদ্রের শেষে বা আশ্বিনের গোড়ায় রচিত। পাণ্ডুলিপিটি অনেক কাটাকুটিতে ভর্তি—অন্তরার বর্জিত পাঠ :

হঠাৎ আদেশ এল বাতাস বেয়ে
ছড়িয়ে গেল আকাশ ছেয়ে
ছুটে এল ছোট বড়
গরীবধনীবর্গ।

সঞ্চারীর পাঠটিও ভিন্ন :

যার যা কিছু আছে ঘরে
আন্ আপনার থালা ভরে
আন্‌রে পূজার প্রদীপ জ্বেলে
আন্‌রে পূজার খড়্গ

ভাণ্ডার-এর পাঠে সঞ্চারীর শেষ দুটি ছত্র এইরকম :

আন্ আরতির প্রদীপ জ্বেলে।
আন্‌রে বলির খড়্গ।

স্বীকার করতেই হবে, গীতবিতান-এর পাঠটি অনেক বেশি কবিত্বপূর্ণ।

সঙ্গীত-প্রকাশিকা, ফাল্গুন ১৩১২ [৫।৬] :

১১২-১৩ টোড়ি-কালাংড়া—একতালা। আমরা পথে পথে যাব সারে সারে দ্র স্বর ৪৬

১১৬-১৯ বিভাস-একতালা। নিশিদিন ভরসা রাখিস দ্র ঐ ৪৬

১১৯-২১ বেহাগ-একতালা। বুক বেঁধে তুই দাঁড়া দেখি দ্র ঐ ৪৬

১২২-২৪ মিশ্র সুরট-একতালা। যদি তোর ভাবনা থাকে দ্র ঐ ৪৬

গানগুলির স্বরলিপি করেন ইন্দিরা দেবী।

বঙ্গভঙ্গ ও স্বদেশী আন্দোলন আরম্ভ হওয়ার পর ইংরেজ সরকার দমননীতির আশ্রয় নেয়—বিশেষত পূর্ববঙ্গ ও আসামের লেফটেন্যান্ট গবর্নর স্যার ব্যামফিল্ড ফুলারের শাসনাধীন এলাকায় ন্যায়বিচারের সমস্ত আদর্শ চূড়ান্তভাবে লঙ্ঘিত হয়ে নির্বিচার দমন-পীড়ন চলতে থাকে। প্রধানত হিতবাদী-সম্পাদক কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদের উদ্যোগে স্বদেশী আন্দোলনের কিছু নির্বাচিত নিগৃহীত ব্যক্তিকে সংবর্ধিত করার জন্য কলকাতায় একটি সভার আয়োজন হয়। টাউন হলে সভাটি অনুষ্ঠিত করার জন্য অনুমতি দিয়েও কলকাতা কর্পোরেশনের চেয়ারম্যান C. Allen অনুমতি প্রত্যাহার করায় হ্যারিসন রোডের গ্র্যাণ্ড থিয়েটারে ইণ্ডিয়ান মিরার-সম্পাদক নরেন্দ্রনাথ সেনের সভাপতিত্বে ২ ফাল্গুন [বুধ 14 Feb] সভাটি হয়। এই সভাতে রবীন্দ্রনাথও বক্তা হিসেবে আমন্ত্রিত ছিলেন, কিন্তু পূর্বোক্ত তারিখ-বিভ্রাটের কারণে তিনি 'স্বদেশী আন্দোলনে

নিগৃহীতদের প্রতি নিবেদন' লেখাটি পাঠিয়ে দিয়ে শান্তিনিকেতন চলে যান, কালীপ্রসন্ন সেটি সভায় পাঠ করেন। 'লাঞ্ছিতের সম্মান' [১৩১৩] পুস্তিকার ১৫-১৬ পৃষ্ঠায় '২রা ফাল্গুন/১৩১২' তারিখ ও স্বাক্ষর-সংবলিত রবীন্দ্রনাথের নিবেদনটি 'রবীন্দ্রবাবুর পত্র' নামে মুদ্রিত হয়। তিনি লেখেন :

বাংলা দেশের বর্ত্তমান স্বদেশী আন্দোলনে কুপিত রাজদণ্ড যাঁহাদিগকে পীড়িত করিয়াছে, তাঁহাদের প্রতি আমার নিবেদন এই যে, তাঁহাদের বেদনা যখন আজ সমস্ত বাংলাদেশ হৃদয়ের মধ্যে বহন করিয়া লইল, তখন এই বেদনা অমৃতে পরিণত হইয়া তাঁহাদিগকে অমর করিয়া তুলিয়াছে। রাজচক্রের যে অপমান তাঁহাদের অভিমুখে নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল, মাতৃভূমির করুণ করস্পর্শে তাহা বরমাল্য রূপে ধারণ করিয়া তাঁহাদের ললাটকে আজ ভূষিত করিয়াছে, যাঁহারা মহাব্রত গ্রহণ করিয়া থাকেন, বিধাতা জগৎ সমক্ষে তাঁহাদের অগ্নিপরীক্ষা করাইয়া সেই ব্রতের মহত্ত্বকে উজ্জ্বল করিয়া প্রকাশ করেন। অদ্য কঠিন ব্রতনিষ্ঠ বঙ্গভূমির প্রতিনিধি স্বরূপ যেই কয়জন এই দুঃসহ অগ্নিপরীক্ষার জন্য বিধাতা কর্তৃক বিশেষ রূপে নির্ব্বাচিত হইয়াছেন, তাঁহাদের জীবন সার্থক। রাজারোষরক্ত অগ্নিশিখা, তাঁহাদের জীবনের ইতিহাসে লেশমাত্র কালিমাপাত না করিয়া বার বার সুবর্ণ অক্ষরে লিখিয়া দিয়াছে। বন্দে মাতরম্।[৮৭]

কুন্তলীন-প্রস্তুতকারক হেমেন্দ্রমোহন বসু ধর্মতলা স্ট্রীটে অবস্থিত মার্বেল হাউসে 5 Feb 1906 [সোম ২৩ মাঘ] The Talking Machine Hall নামে ফনোগ্রাফ ও রেকর্ড বিক্রয়ের জন্য একটি প্রতিষ্ঠান খুলে[৮৮] তাঁর ব্যবসায়ের বিস্তৃতি ঘটান। এর ক'দিন পরে 16 Feb [শুক্র ৪ ফাল্গুন] তিনি বেঙ্গলী পত্রিকায় পাতা-জোড়া বিজ্ঞাপন দিয়ে ঘোষণা করেন : '...we have much pleasure in informing the public that highly respectable gentlemen like Babu Rabindra Nath Tagore Babu Dwijendra Lal Roy & Babu Satya Bhusan Gupta have very kindly allowed us to record their voices and this is a privilege which has not been conferred upon any one else.' 6 Mar [মঙ্গল ২২ ফাল্গুন] একই পত্রিকায় পুনশ্চ পাতা-জোড়া বিজ্ঞাপন দেখি :

H. Bose's Records/Songs composed and sung by Babu Rabindra Nath Tagore
১। সার্থক জনম আমার জন্মেছি এই দেশে
২। ও আমার দেশের মাটী।
৩। নিশি দিন ভরসা রাখিস।
৪। এবার তোর মরা গাঙে বান এসেছে।
৫। যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে
৬। বাংলা দেশের হৃদয় হতে কখন আপনি
৭। যে তোমায় ছাড়ে ছাড়ুক
৮। যদি তোর ভাবনা থাকে
and many others.

—একই বিজ্ঞাপনে পাঁচটি National Songs composed by Pundit Kaliprosanna Kabyabisarad ও আটটি Songs composed and sung by Mr. D. L. Roy [প্রধানত হাসির গান ও 'ধাও ধাও বাণিজ্যক্ষেত্রে'] গানের প্রথম ছত্র মুদ্রিত হয়। বিজ্ঞাপনটি পরেও সম্পূর্ণাকারে বা সংক্ষিপ্তভাবে বহুবার ছাপা হয়েছে।

সিদ্ধার্থ ঘোষ 'যন্ত্ররসিক এইচ বোস' প্রবন্ধে Mar 1906-এ প্রকাশিত 'এইচ বোস-রেকর্ডস'-এর ক্যাটালগের দ্বিতীয় খণ্ড থেকে রবীন্দ্রনাথের উল্লিখিত আটটি গান ছাড়া আরও ছ'টি গানের সন্ধান দিয়েছেন :
৩৫২—পথের গান (আমরা পথে পথে যাব...)
৩৫৪—দ্বিধা (বুক বেঁধে তুই দাঁড়া দেখি...)

৩৬০—বাউল (২) (যে তোরে পাগল বলে...)

৩৬২—(৪) (আপনি অবশ হলি...)

৩৬৩—প্রয়াস (তোর আপন জনে ছাড়বে তোরে...)

৩৬৪—বাউল (ঘরে মুখ মলিন দেখে...)

ক্যাটালগে রবীন্দ্রনাথের আলোকচিত্র-সহ চৌদ্দটি গান সম্পূর্ণ মুদ্রিত হয়।[৮৯] রেকর্ডগুলি ৩৫১ থেকে ৩৬৪ সংখ্যা-চিহ্নিত। এগুলি সম্পর্কে বহু তথ্য সিদ্ধার্থ ঘোষের প্রবন্ধটিতে দেওয়া হয়েছে। গানগুলি রেকর্ড করা হয়েছিল ফোনোগ্রাফে মোমের সিলিণ্ডারের উপর, ফলে তার সবগুলিই নষ্ট হয়ে গিয়েছে।

পরে হেমেন্দ্রমোহন ফ্রান্সের প্যাথে কোম্পানির সহায়তায় গানগুলি ডিস্ক রেকর্ডে পরিবর্তিত করার আয়োজন করেন। বেঙ্গলী-র 15 Mar 1908 [রবি ২ চৈত্র ১৩১৪]-সংখ্যায় অন্যান্য বহু রেকর্ডের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথেরও একটি রেকর্ড [দু'পিঠে দুটি গান] বিজ্ঞাপিত হয়, তখনও রেকর্ডগুলি দেশে এসে পৌঁছয়নি :

3511 350—বন্দে মাতরম

,, 366—অয়ি ভুবনমনমোহিনী

কিন্তু রেকর্ড শেষ পর্যন্ত বাজারে বেরোয় একপিঠে 'বন্দে মাতরম্' গান ও অন্যপিঠে 'সোনার তরী' কবিতার আবৃত্তি নিয়ে। হেমেন্দ্রমোহন-কৃত রবীন্দ্রনাথের গান ও আবৃত্তির বহু রেকর্ডের মধ্যে এই একটিই কালের কবল থেকে রক্ষা পেয়েছে।

জগদীশচন্দ্রের ভাগিনেয় দেবেন্দ্রমোহন বসু লিখেছেন : 'In the early days Rabindranath was a frequent visitor to his house; he used to go straight to Jagadis Chandra's study on the top floor. The partition of Bengal was associated with many scenes of activity in this house. Whenever Rabindranath composed a new *Swadeshi* song he came with it to Jagadis Chandra's drawing room to have his songs recorded by Hemendramohan Bose in the new Pathephone.'[৯০] —স্মৃতিকথাটি কিছুটা বিভ্রান্তিকর। ভাদ্র-আশ্বিন ১৩১২-তে স্বদেশী গান রচনার পর্বটিতে রবীন্দ্রনাথ অধিকাংশ সময়েই গিরিডিতে বাস করছিলেন, কলকাতায় ফিরে তিনি জগদীশচন্দ্রের বাড়িতে গিয়ে গান শোনাতে পারেন [এই পুজোর ছুটিতে জগদীশচন্দ্র দার্জিলিঙে ছিলেন, রবীন্দ্রনাথ 'রাখীসঙ্গীত' সেখানেই প্রেরণ করেন] ও শখ করে হেমেন্দ্রমোহন গানগুলি ফোনোগ্রাফে ধরেও রাখতে পারেন—কিন্তু তার সঙ্গে বর্তমান ব্যবসায়িক যোগাযোগ থাকা অনিবার্য নয়। বরং এ-বিষয়ে অমল হোমের স্মৃতি নির্ভরযোগ্য : "তার পর এল তাঁর গানের বন্যা স্বদেশী আন্দোলনের স্রোতধারায়, সোনার বাংলা গেল ভেসে! বাংলা দেশের হৃদয় হতে অপরূপরূপে বাহির সেই গানগুলি সব ধরেছিলেন তাঁর প্যাথেফোন রেকর্ডে কুন্তলীন দেলখোসের এইচ বসু-মশাই। মনে পড়ে, শিবনারায়ণ দাসের লেনে হেমেন্দ্রমোহনের বাসভবনে যেদিন কবি রেকর্ডে গান দিতে আসতেন, কর্নওয়ালিস স্ট্রীটের মুখ থেকে সে-সরু গলির দুধারে লোক দাঁড়িয়ে যেত। আর, আমরা ছেলেরা বসু-মশায়ের বাড়িতে অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করতাম। রেকর্ড নিখুঁত করবার জন্য কখনো কখনো রবীন্দ্রনাথ যখন একটি গান দুবার গাইতেন, তখন আর আমাদের সে-অপ্রত্যাশিত আনন্দের সীমা থাকত না। 'বন্দে মাতরম' গানও তিনি রেকর্ডে দিয়েছিলেন। বড় দুঃখের কথা, স্বদেশী যুগে রবীন্দ্রনাথের তেজদৃপ্ত কণ্ঠের সে

উদ্দীপ্ত সংগীতগুলির রেকর্ড প্রায় সবই নষ্ট হয়ে গিয়েছে। সেগুলি থাকলে আজ লোকে জানতে পারত কী বীর্যবন্ত ছিল সে-কণ্ঠ। একথা বলছি এই জন্য যে, অনেকের ধারণা—ভুল ধারণা—আছে, রবীন্দ্রনাথের গলা ছিল মেয়েলি। একেবারেই নয়।"[৯১] বেঙ্গলী-তে মুদ্রিত পূর্বোদ্ধৃত 16 Feb [৪ ফাল্গুন]-এর বিজ্ঞাপনের পরেই শিবনারায়ণ দাস লেনের বাড়িতে রবীন্দ্রনাথ গানগুলি রেকর্ড করেছিলেন, এমন মনে করা যেতে পারে। তিনি 25 Feb [রবি ১৩ ফাল্গুন]-এর পূর্বেই শান্তিনিকেতন থেকে কলকাতায় ফিরে আসেন। রবীন্দ্রনাথের গাওয়া গানের রেকর্ড অন্যান্য প্রতিষ্ঠান থেকেও বিক্রয় হত; জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ৬ ফাল্গুন ১৩১৪ [18 Feb 1908] 'Dwarkinদের ওখান থেকে রবির গাওয়া phonograph recordএর list' নিয়ে আসেন। অন্য প্রতিষ্ঠান থেকে অন্য ব্যক্তির গাওয়া স্বদেশী গানের রেকর্ডও বেরিয়েছে; বেঙ্গলীর 22 Sep 1907 [৫ আশ্বিন ১৩১৪]-সংখ্যায় The Gramaphone & Type-writer Ld মিনার্ভা থিয়েটারের ননীলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের গাওয়া 'বাংলার মাটি বাংলার জল' রেকর্ডটির বিজ্ঞাপন প্রকাশ করেছে।

রবীন্দ্রনাথ কলকাতায় আসেন প্রধানত রথীন্দ্রনাথের আমেরিকা-যাত্রার ব্যবস্থাদি করার জন্য। ১৩ ফাল্গুন [রবি 25 Feb] ক্যাশবহিতে এই বিষয়ে প্রথম হিসাবটি দেখা যায় : 'রথীবাবুর এমিরিকায় গমন জন্য দ্রব্যাদি ক্রয়...৬৬ ল০'। এইদিনই রবীন্দ্রনাথ ডন সোসাইটির একটি সভায় ছাত্রদের কাছে বক্তৃতা করেন। সোসাইটির সম্পাদক সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় [1865-1948] ঋষিকল্প ব্যক্তি ছিলেন। শিক্ষাবিদ্ এই মানুষটির প্রতি রবীন্দ্রনাথও সশ্রদ্ধ ছিলেন। সেই শ্রদ্ধাই ব্যক্ত হয়েছে তাঁর এই ভাষণে :

> আজ আমাদের দেশে স্বদেশী বিদ্যালয় স্থাপনের যে চেষ্টা হইতেছে, সতীশবাবু তাহার একটি মুখ্য অবলম্বন। তাঁহার উৎসাহেই ইহা অনুপ্রাণিত হইয়াছে। সুতরাং জাতীয় বিদ্যালয়ের সহিত ডন সোসাইটি জড়িত রহিয়াছে একথা বলা যাইতে পারে। এতদিন সভাসমিতিতে ঝড়ের মুখে যাঁহারা তরণী চালনা করিয়াছিলেন, তাঁহারা এখন উহাকে ঘাটের মুখে আনিয়াছেন একথা বলিতে পারা যায়। এখন উহাকে সফলতা দিবার ভার আপনাদের উপর।...সতীশবাবু যে সময় ডন্ সোসাইটি স্থাপন করিয়াছিলেন তখন স্বদেশী আন্দোলন ছিল না, শিক্ষা সম্পর্কীয় এই National Movement-এরও তখন সূত্রপাত হয় নাই। এমন দিনে সতীশবাবু দূরের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া বাহিরের উৎসাহ উত্তেজনার অপেক্ষায় না থাকিয়া মহৎ লক্ষ্য মাত্র সম্বল করিয়া এই সভা স্থাপন করিয়াছিলেন। যে সভা সাময়িক কোন বৃহৎ উত্তেজনা উদ্দীপনার মুখে তৈয়ার হয় নাই, আপনারা সেই সভার আকর্ষণে এখানে মিলিয়াছেন। এতদিন ধীরে ধীরে ইহার বীজ অঙ্কুরিত হইতেছিল, এখন তাহা পল্লবিত হইবার লক্ষণ যাইতেছে।...স্বদেশী আন্দোলনের ফলে দেশের হৃদয় আপনাদের এই সোসাইটির দিকে আসিবে, ইহার শিকড়ের কাছে রস সঞ্চার হইবে, আপনারা আশার সঙ্গে অগ্রসর হইবেন। বড়র জন্য লাভ করিবেন না।[৯২]

সাময়িক উত্তেজনার বশবর্তী হয়ে নয়, উচ্চ আদর্শকে সামনে রেখে স্বল্প আয়োজনে রবীন্দ্রনাথও ব্রহ্মচর্যাশ্রম স্থাপন করেছিলেন, সতীশচন্দ্রের মধ্যেও তিনি একই কর্মপদ্ধতির প্রতি আনুগত্য লক্ষ্য করেন। জাতীয় শিক্ষা পরিষদের কাজে উভয়ে সহযোগী ছিলেন। পরিষদের তত্ত্বাবধায়কের দায়িত্ব নিয়ে সতীশচন্দ্র ডন সোসাইটিকে পরিষদের অন্তর্ভুক্ত করে দেন, এরূপ একটি ধারণা প্রচলিত আছে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের ক্যাশবহি এই ধারণার বিরোধিতা করে—৩০ আশ্বিন ১৩১৩ [16 Oct 1906] : 'ব° সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় দং ডন সোসাইটীর চাঁদা...১০্', ২৯ কার্তিক ১৩১৩ [15 Nov 1906] : 'ডন সোসাইটী কার্ত্তিক-অগ্রহায়ণ...২০্', ২২ ফাল্গুন ১৩১৩ [6 Mar 1907] : 'ডন সোসাইটী ফাল্গুন গুঃ শৈলেশচন্দ্র মজুমদার ১০্', ৮ চৈত্র ১৩১৩ [22 Mar 1907] '...চৈত্র ১০্' এবং ২৭ বৈশাখ ১৩১৪ [10 May 1907] : 'বাবু সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় দঃ ডন সোসাইটির subscription বৈশাখ ১০্'—এর পর মাসিক চাঁদা দেবার আর কোনো হিসাব আমরা দেখিনি। ১১ বৈশাখ ১৩১৫ [24 Apr 1908] 'ব° ডন সোসাইটী দং উক্ত সোসাইটীর ১১ ভলমের সাবস্ক্রপসন শোধ

১ বিল ৪'-র যে হিসাব পাওয়া যায় সেটি 'দি ডন অ্যাণ্ড ডন সোসাইটীজ ম্যাগাজিন'-সংক্রান্ত—পত্রিকাটি 1913 পর্যন্ত স্থায়ী হয়েছিল।

১৯ ফাল্গুন [শনি 3 Mar] 'শ্রীযুক্ত খোদ বাবু মহাশয় ও রথীন্দ্র বাবু মহাশয়দিগের বোলপুর গমন জন্য...২০' হিসাব থেকে মনে হয়, এইদিন তাঁরা শান্তিনিকেতনে ফিরে যান। রথীন্দ্রনাথ ও সন্তোষচন্দ্র মজুমদারকে সেখানে বিদায়-সংবর্ধনা জানানো হয় ২৮ ফাল্গুন [সোম 12 Mar]। বিধুশেখর শর্ম্মণঃ-স্বাক্ষরিত 'বোলপুর শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমঃ/১৮২৭ শকঃ ফাল্‌গুণ কৃষ্ণ দ্বিতীয়া। ইং ১২ মার্চ্চ, ১৯০৬' স্থান-কাল-উল্লিখিত আশীর্বচন 'শ্রীরথীন্দ্রনাথ ঠাকুর শ্রীসন্তোষকুমার মজুমদারয়োঃ কৃষিবিদ্যার্জ্জনার্থম্ আমেরিকা যাত্রায়াং তৌ প্রতি স্বস্তিবাদঃ' রবীন্দ্রভবনে রক্ষিত আছে। এইদিন 'ব° মেকিনলাল মেকিঞ্জি দং শ্রীযুক্ত রথীন্দ্রবাবু ও সন্তোষবাবুর জাপান গমনের জাহাজের সেকেণ্ড ক্লাশের টিকিট ২খান ক্রয় জন্য দেওয়া যায় গুঃ শৈলেশচন্দ্র মজুমদার ২১৮' হিসাব পাওয়া যায় ক্যাশবহিতে।

রবীন্দ্রনাথ তখন গিরিডিতে। ২৯ ফাল্গুন [মঙ্গল 13 Mar] তিনি মহিমচন্দ্র দেববর্মাকে লিখেছেন : 'সম্প্রতি কিঞ্চিৎ বিস্তৃত পরিমাণে রেললাইনের ধারে জমি সংগ্রহ করিয়া রাখিবার জন্য এখানে আসিয়াছি—আজ রাত্রে জমি দেখিতে নূতন গ্রাণ্ড কর্ড্ লাইনের পার্শ্ববর্ত্তী স্থান লক্ষ্য করিয়া বাহির হইব। ১৮ই মার্চ্চের মধ্যে কলিকাতায় ফিরিতে হইবে।'[৯৩] বহুদিন ধরে এই অঞ্চলে জমি সংগ্রহ করে রাখার বাসনা তিনি মনে পোষণ করে আসছিলেন, কিন্তু এই চেষ্টার কোন্ পরিণতি হয়েছিল আমাদের জানা নেই।

চৈত্র-সংখ্যা বঙ্গদর্শন [৫।১২] প্রকাশিত হয় 23 Mar [শুক্র ৯ চৈত্র]। এই সংখ্যায় রবীন্দ্রনাথের রচনা একটি :

৫৯৫ 'পাল্‌কী-বেহারার গান' দ্র বি. ভা. প., কার্তিক-পৌষ ১৩৫৬।৮৭

এটি তাঁর মৌলিক রচনা নয়, 'হাইদ্রাবাদের ডাক্তার শ্রীযুক্ত অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের কন্যা শ্রীমতী সরোজিনী দেবীর রচিত ইংরেজি কবিতা হইতে অনূদিত।' ডাঃ মোতিয়ালা গোবিন্দ রাজুলু নাইডুর পত্নী সরোজিনী নাইডু [1879-1949] তখনও রাজনীতিতে যোগ দেননি, ইংরেজি কবিতা রচনার জন্যই তখন তিনি বিখ্যাত—তাঁর সুপরিচিত 'Palanquin Bearers' কবিতাটি রবীন্দ্রনাথ অনুবাদ করেন।

সঙ্গীত-প্রকাশিকা, চৈত্র ১৩১২ [৫।৭] :

১৩৬-৩৯ মিশ্র কালাংড়া-একতালা। আপনি অবশ হলি তবে দ্র স্বর ৪৬

ইন্দিরা দেবী গানটির স্বরলিপি করেন।

চৈত্র-সংখ্যা ভাণ্ডার [১।১২]-এ রবীন্দ্রনাথের কোনো রচনা নেই; ৪০৩ পৃষ্ঠায় মাঘ সংখ্যায় প্রকাশিত তাঁর কংগ্রেসের প্রকৃতি ও পদ্ধতি পরিবর্তন-সংক্রান্ত প্রশ্নটি ও বিপিনচন্দ্র পাল-কৃত তার একটি দীর্ঘ উত্তর [পৃ ৪০৩-০৮] মুদ্রিত হয়। 'শিল্পসমিতি বা মহিলা-শিল্পসমিতি'-শীর্ষক একটি 'প্রস্তাব' [পৃ ৩৯৭-৪০২]-এ হিরণ্ময়ী দেবী হস্তশিল্প ও লেখাপড়ার সাহায্যে দুঃস্থ মেয়েদের স্বাবলম্বী করে তোলার জন্য একটি পরিকল্পনা প্রকাশ করে লেখেন : 'কিছুদিন পূর্ব্বে এই উদ্দেশ্যে ৬ নং দ্বারকানাথ ঠাকুরের ষ্ট্রীটে শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বাটীতে "মহিলা-শিল্পসমিতি" নামে আমরা একটী সাপ্তাহিক মহিলা-সম্মিলনীর অধিবেশন করি।' রবীন্দ্রনাথের ক্যাশবহিতে দেখা যায়, এই সমিতিটিকে তিনি দীর্ঘকাল মাসিক এক টাকা করে সাহায্য দিয়ে গেছেন।

রবীন্দ্রনাথ যে 18 Mar [রবি ৪ চৈত্র]-এর মধ্যে কলকাতায় ফিরে আসেন তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ রয়েছে রবীন্দ্রভবনের সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর ফাইলে রক্ষিত একটি দলিলে। মোহিনীমোহন চট্টোপাধ্যায়, সুরেন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র খাঁ, রবীন্দ্রনাথ, ব্রজেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী, রমণীমোহন চট্টোপাধ্যায়, মনোমোহন ভট্টাচার্য, শশিভূষণ চট্টোপাধ্যায়, সতীশচন্দ্র রায়, সুরেন্দ্রকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ও জনৈক [নামটি পড়া যায়নি] সান্যাল-স্বাক্ষরিত এই দলিলে লেখা হয় :

We are convinced of the utility and necessity of starting an Indian Insurance office on co-operative lines under Indian management and control and think it our duty to give the staunchest support to such a project which has been placed before us by Babu A. C. Ukil we have agreed to subscribe shares, according to our means, in the Insurance scheme drawn up by him under the name of the National Cooperative Insurance Society Limited, which is to be incorporated as soon as a thousand shares are subscribed, and we should be glad to see others giving similar support and encouragement, which, we believe, the project fully deserves.

এই বীমা-প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে আলোচনার সূত্রপাত হয় সরলা দেবীর বিবাহের সময়ে দেওঘরে। অন্যতম উদ্যোক্তা ব্রজেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী 'সুরেন্দ্রনাথ-স্মৃতি' প্রবন্ধে লিখেছেন :

...তিনি [অম্বিকাচরণ উকিল] তখন পাটনায় প্রফেসারি করিতেন। আমি ছিলাম তখন দেওঘরে। বিশ্ববরেণ্য রবীন্দ্রনাথ, মহাত্মা শিশির ঘোষ, মাননীয় মতিলাল ঘোষ, দেবপ্রসাদ ও সুরেশ সর্বাধিকারী, অক্ষয় মৈত্রেয়, অম্বিকা মজুমদার প্রমুখ অনেক মনীষীই সেই সময়ে দেওঘরে উপস্থিত হইয়াছিলেন।...পাটনা হইতে দেওঘরে আসিয়া তিনি আবার আমাকে ও সুরেন ঠাকুর মহাশয়কে সমবায়নীতির উপকারিতা ও আদর্শ সম্বন্ধে বুঝাইতে লাগিলেন এবং Co-operative basis-এ একটি জীবন-বীমা প্রতিষ্ঠান স্থাপনের প্রস্তাব উত্থাপন করিলেন।...আমাদের পরিকল্পিত প্রতিষ্ঠান স্থাপনের সংকল্প কার্যে পরিণত করিতে হইলে আপাতত একটি স্থান চাই—যেখানে বসিয়া আমরা আলাপ-আলোচনা ও নীতি-নির্ধারণ করিতে পারি। সুহৃদ্‌বর সুরেন্দ্রনাথ, রবীন্দ্রনাথকে বলিয়া তাঁহার জোড়াসাঁকোর বৈঠকখানার দোতালায় একটি ঘর আমাদের জন্য চাহিয়া লইলেন। অতঃপর অম্বিকাবাবুর শিক্ষাধীনে আমি ও সুরেনবাবু প্রভৃতি সেখানে শিক্ষানবিশী করিতে লাগিলাম। আরো দুই-একজনসহ মধ্যাহ্ন-আহারের পর আমরা সেখানে মিলিত হইতাম।...কলিকাতায় ইতোমধ্যে দুইটি দেশী কোম্পানিও প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল : Sir R. N. Mookherjee স্থাপন করিয়াছিলেন National Indian Insurance Company, আর পান্নালাল ব্যানার্জি করিয়াছিলেন রে সাহেবের নেতৃত্বে National Insurance Company। দুইটি "National" নামধেয় কোম্পানি হইয়া গিয়াছে, সুতরাং আমাদের কোম্পানির নামকরণ আমরা Hindusthan Co-operative Insurance Society করিলাম।...জোড়াসাঁকোর বাড়িতে নয় মাস থাকিয়া আমরা কোম্পানি রেজেস্টারি করিলাম।... Here Street-এর ১৪ নং বাড়িতে হিন্দুস্থানের রেজিস্টার্ড অফিস স্থাপিত হইল।[৯৩ক]

[ইন্দিরা দেবী ভুল করে লিখেছেন, 1906-এ শিমুলতলায় অম্বিকাচরণ উকিল, সুরেন্দ্র নাথ প্রভৃতির প্রাথমিক আলোচনা হয়েছিল। বস্তুত 1905-এর পুজোর সময়ে সত্যেন্দ্রনাথ সপরিবারে শিমুলতলায় বেড়াতে গিয়েছিলেন, সরলা দেবীর বিবাহানুষ্ঠানে যোগ দিতে দেওঘরে এসে এই সম্মিলন হয়।]

প্রতিষ্ঠানটির নাম বদলে The Hindusthan Cooperative Insurance Society Limited রাখা হয়, সেকথা উদ্যোক্তা অম্বিকাচরণ উকিল স্বয়ং দলিলটির পাশে লিখে রেখেছেন। সোসাইটি গঠনের জন্য প্রাথমিক পঁচিশ টাকা চাঁদা রবীন্দ্রনাথ না দিলেও ৪ মাঘ ১৩১৪ [18 Jan 1908] 'হিন্দুস্তান কোঅপারেটিভ ইনসিওর অফিস দং ১০টা সেয়ার ক্রয়ের ২য় কলের টাকা শোধ...৫০' ইত্যাদি হিসাব থেকে জানা যায়, দলিলে প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি তিনি রক্ষা করেছিলেন। সমবায় আন্দোলন সম্পর্কে তিনি উৎসাহী ছিলেন, অন্যভাবেও তিনি প্রতিষ্ঠানটিকে সাহায্য করেন ব্রজেন্দ্রকিশোরের স্মৃতিকথায় তার প্রাথমিক উল্লেখটি পাওয়া যায়।

রবীন্দ্রনাথ ১০ চৈত্র [শনি 24 Mar] পর্যন্ত কলকাতায় থাকেন, কিন্তু তাঁর গতিবিধি বা কার্যকলাপের কোনো খবর মেলে না। তবে এই সময়ে তাঁকে আবার কবিতা লিখতে দেখা যায়। কলকাতায় অবস্থানকালে তিনি লেখেন চারটি কবিতা :

৬ চৈত্র [মঙ্গল 20 Mar] 'নিরুদ্যম' ['তখন আকাশতলে ঢেউ তুলেছে'] দ্র খেয়া ১০।১২৭-৩০

পাণ্ডুলিপিতে দেখা যায়, রবীন্দ্রনাথ 'ছুটি' নামের একটি কবিতা ৯টি ছত্র লিখে কেটে দিয়ে বর্তমান কবিতাটি লিখতে শুরু করেছেন। চতুর্থ স্তবকটি সব শেষে লেখা হয়েছিল।

৮ চৈত্র [বৃহ 22 Mar] 'কৃপণ' ['আমি ভিক্ষা করে ফিরতেছিলেম'] দ্র খেয়া ১০।১৩০-৩২

এই কবিতাটি লেখার আগেই 'আমি নীড়ে বসে গেয়েছিলেম/আলোছায়ার গান' 'নীড় ও আকাশ' [দ্র খেয়া ১০।১৫৩-৫৪] কবিতার দুটি ছত্র তাঁর লেখনীমুখে এসে গিয়েছিল। ছত্র-দুটি কেটে দিয়ে তিনি বর্তমান কবিতাটি লেখেন। কিন্তু ভাবটি তাঁর মন থেকে অন্তর্হিত হয়নি, ১২ চৈত্র শান্তিনিকেতনে এটি পূর্ণ কাব্যরূপ লাভ করে।

৯ চৈত্র [শুক্র 23 Mar] 'কুয়ার ধারে' ['তোমার কাছে চাই নি কিছু'] দ্র খেয়া ১০।১৩২-৩৩

১০ চৈত্র [শনি 24 Mar] 'জাগরণ' ['পথ চেয়ে তো কাটল নিশি'] দ্র খেয়া ১০।১৩৪-৩৫

এর পরেই রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনে চলে যান, কিন্তু কবিতার ধারারুদ্ধ হয়নি—সেখানে লেখেন :

১১ চৈত্র [রবি 25 Mar] 'ফুল ফোটানো' ['তোরা কেউ পারবি নে গো'] দ্র খেয়া ১০।১৩৫-৩৬

১২ চৈত্র [সোম 26 Mar] 'হার' ['মোদের হারের দলে বসিয়ে দিলে'] দ্র খেয়া ১০।১৩৭-৩৮

আগেই বলেছি, এই দিন তিনি 'নীড় ও আকাশ' কবিতাটি সম্পূর্ণ করেন।

১৪ চৈত্র [বুধ 28 Mar] 'বিদায়' ['বিদায় দেহো, ক্ষম আমায় ভাই'] দ্র খেয়া ১০।১৫০-৫১

একই দিনে তিনি লেখেন 'পথের শেষ' ['পথের নেশা আমায় লেগেছিল' কবিতাটি [দ্র খেয়া ১০।১৫১-৫২]। খেয়া-র একটি পর্ব এখানে সমাপ্ত হয়েছে।

অনেকে এই কবিতা-দুটিতে বঙ্গভঙ্গ ও স্বদেশী আন্দোলন থেকে রবীন্দ্রনাথের সরে আসার মনোভাব খুঁজে পেয়েছেন। কিন্তু আমরা আগেই দেখেছি, জাতীয় শিক্ষান্দোলনে তিনি সক্রিয় ভূমিকা নিলেও বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের রাজনৈতিক দিকটিতে তিনি নিজেকে বিশেষ জড়িত করেননি। জাতীয় শিক্ষার আন্দোলনে যে উচ্ছ্বাসপ্রবণতা ও খুঁটিনাটি বিষয় নিয়ে ব্যক্তিগত মতবিরোধ দেখা দিয়েছিল, রবীন্দ্রনাথ সেটি পছন্দ না করলেও এই আন্দোলন থেকে নিজেকে সম্পূর্ণ বিযুক্ত করেননি। আসলে স্ত্রী-কন্যার মৃত্যুর পর থেকেই তিনি সংসারের বিচিত্র কর্মজাল থেকে মুক্তির আকাঙ্ক্ষা মনে পোষণ করে আসছিলেন। এর সঙ্গে মিশেছিল ঈশ্বরমুখীন একধরনের আধ্যাত্মিকতা। খেয়া-র কবিতাগুলিতে লিরিকের সঙ্গে এই আধ্যাত্মিকতার মিশ্রণ ঘটেছে। ব্যক্তিগত ক্ষেত্রেও এই মনোভাব কিভাবে সক্রিয় ছিল তার একটি উদাহরণ আছে মহিমচন্দ্র দেববর্মাকে লিখিত পূর্বোদ্ধৃত ২৮ মাঘের [শনি 10 Feb] পত্রে :

...ত্রিপুরার প্রতি একটু বিশেষভাবে আমি চিত্ত প্রয়োগ করিয়াছিলাম—ত্রিপুরার রাজ্যশাসন কার্য্য সর্ব্বতোভাবে উজ্জ্বল করিয়া তুলিব ইহা উত্তরোত্তর আমার আকাঙ্ক্ষার বিষয় হইয়া উঠিয়াছিল। এজন্য আমি অনেক সময় অনর্থক অনেক উদ্বেগ ও বেদনা বোধ করিয়াছি। কিন্তু আমি বুঝিয়াছি এরূপ আসক্তি কোনমতেই প্রার্থনীয় নহে। ঈশ্বর আমার উপরেই সমস্ত সংশোধনের ভার দেন নাই—তাঁর কাজ তিনিই করিবেন আমি যখন তাহার উপলক্ষ্য মাত্র তখন ফলাফল লইয়া নিজেকে পীড়া দিবার কোনোই প্রয়োজন নাই। আমার যেটুকু ক্ষমতা আছে ঈশ্বর আমার কাছ হইতে তাহারই হিসাব লইতেছেন যাহা তাহার বাহিরে তাহার জন্য লেশমাত্র ক্ষোভ স্বীকার করিব না মনকে সম্পূর্ণ মুক্ত রাখিব। মহারাজ আমার অনেক উপকার করিয়াছেন, আমি তাঁহাকে অন্তরে অন্তরে প্রীতি করি—আমার যেটুকু সাধ্য তাঁহার মঙ্গলের চেষ্টাও করিয়াছি—হয়ত ভুল করিয়াছি—হয়ত হিতে বিপরীতও হইতে পারে—অতএব যেখানে আমার মঙ্গল ইচ্ছা কর্ম্মক্ষেত্রে প্রকৃত অধিকার পাইতে পারে না, সেখানে ঈশ্বর আমাকে

কর্ম্মবন্ধন হইতে মুক্তি দিবেন। আমি এখন ঈশ্বরের নিকট হইতে আমার নিজকৃত সমস্ত বোঝা হইতে একান্তচিত্তে মুক্তি প্রার্থনা করিতেছি—তিনি স্বহস্তে যে ভার চাপাইবেন আমি তাহাই অক্লিষ্টচিত্তে বহন করিব—অধিকারের বাহিরে গিয়া জালে পা দিবনা।[৯৪]

—এইপত্রে কর্মবন্ধন সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের সমকালীন মনোভাব সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ পেয়েছে। অবশ্য এর সঙ্গে ত্রিপুরার রাজনীতিক্ষেত্র থেকে উদ্ভূত সমালোচনার প্রত্যাঘাতও ছিল। জাতীয় শিক্ষা আন্দোলনের ক্ষেত্রেও সমালোচনার অভাব ছিল না। বেঙ্গলী পত্রিকার 23 Mar [শুক্র ৯ চৈত্র]-সংখ্যায় 'A Hindu Observer' একটি পত্রে শিক্ষা-কমিটিতে ব্রাহ্ম-প্রধান্য ও বিশিষ্ট হিন্দুদের অনুপস্থিতি নিয়ে কটাক্ষ করেছেন। সুতরাং মতামতের সংঘর্ষ থেকে বিদায় নিয়ে আত্মসাধনার কেন্দ্রে স্থিত হওয়ার আকাঙ্ক্ষা তাঁর পক্ষে অস্বাভাবিক নয়।

কিন্তু কর্মের আহ্বান তাঁকে ত্যাগ করেনি, তিনিও তাতে সাড়া দিয়েছেন। ২৯ ফাল্গুন [মঙ্গল 13 Mar] তিনি মহিমচন্দ্রকে লিখেছেন :

তোমার পত্র ও মহারাজের টেলিগ্রাম পাইলাম। চৈত্রের প্রথম সপ্তাহে আমাকে আগরতলায় যাইতে অনুরোধ করিয়াছ সে সম্বন্ধে আমার মনে যে দ্বিধার কারণ জন্মিয়াছে তাহা তোমাকে জানাইতেছি।

তোমাদের অরুণ পত্রিকায় বর্ত্তমান রাজকার্য্য লইয়া তীব্র আলোচনা চলিতেছে। ইতিমধ্যে আমি যদি ত্রিপুরার রাজ্যব্যাপারে কোনো প্রকার হস্তক্ষেপ করি তবে আমিও আলোচনার বিষয় হইয়া উঠিব সন্দেহ নাই।

খবরের কাগজে আমাকে যদি ভালমন্দ কিছু বলে সেটাকে আমি গুরুতর দুর্ঘটনা বলিয়া জ্ঞান করি না অতএব নিজের সম্বন্ধে আমার কোনো ভাবনা নাই। কিন্তু সাক্ষাৎসম্বন্ধে ত্রিপুরার রাজকার্য্যে আমার যোগ খবরের কাগজে বিশেষভাবে আলোচিত হইতে থাকিলে রাজ্যের ক্ষতির কারণ আছে কি না সে কথা তোমাদিগকে বিবেচনা করিতে অনুরোধ করি। কর্ম্মপ্রণালী সংশোধনসময়ে অনেকের অপ্রিয় হইতেই হয়—সেইসকল ব্যক্তি আমার নাম সুযোগমত এমনভাবে ব্যবহার করিতে পারে যাহাতে তোমাদের নূতন কর্ত্তৃপক্ষের কাছে তোমরা সন্দেহভাজন হইয়া থাক। তোমাদের গবর্মেন্টের মেজাজ তোমরা ত জানই অতএব আমার এই পত্রসম্বন্ধে মহারাজের সহিত পরামর্শ করিয়া আমাকে যথাকর্ত্তব্য লিখিয়া পাঠাইলে আমি তদনুরূপ প্রস্তুত হইব।

যদি আমার আগরতলায় যাওয়াই সঙ্গত বোধ হয় তবে রথীরা আমেরিকায় গেলেই আমি যাত্রা করিতে পারিব। তাহাদের প্রস্থানের আর বিলম্ব নাই।[৯৫]

রথীন্দ্রনাথ ও সন্তোষচন্দ্র কবে আমেরিকার উদ্দেশে জাপান যাত্রা করেন তা নির্দিষ্ট করে বলার মতো উপকরণের অভাব আছে। রবীন্দ্রজীবনী-কার তারিখটি উল্লেখ করেছেন ২০ চৈত্র ১৩১২ [মঙ্গল 3 Apr][৯৬]—কিন্তু তিনি যে সূত্র নির্দেশ করেছেন তাতে কোনো নির্দিষ্ট তারিখ নেই। রথীন্দ্রনাথ লিখেছেন : 'বাবা জানতে পেলেন যে বিজ্ঞান ও শিল্পবিদ্যা শিক্ষার উদ্দেশ্যে বিদেশে বাঙালি ছাত্র পাঠাবার একটি প্রতিষ্ঠান থেকে একটি শিক্ষার্থীর দল কিছুদিনের মধ্যে জাপান ও আমেরিকা পাড়ি দিচ্ছে। সন্তোষ ও আমাকে বলে দিলেন এই দলের সঙ্গে যোগ দিতে। আমাদের গন্তব্য হবে আমেরিকার কোনো বিশ্ববিদ্যালয় যেখানে কৃষি- ও পশুপালন-বিদ্যা শিক্ষা দেবার ব্যবস্থা আছে।/১৯০৬ সালের এপ্রিল মাসে আমরা ষোলোটি প্রাণী জাপানগামী একটি মালবাহী জাহাজে চড়ে কলকাতা থেকে পাড়ি দিলাম। উচ্চশিক্ষার জন্য সুদূর বিদেশ যাচ্ছি, সম্বলের মধ্যে সেই প্রতিষ্ঠান থেকে কিনে দেওয়া জাপানী মালবাহী জাহাজের অপেক্ষাকৃত অল্প মূল্যের একখানা টিকিট এবং একগুচ্ছ পরিচয়পত্র।...মালয় ও চীনের বন্দরে বন্দরে মাল উঠিয়ে মাল নামিয়ে আমাদের জাহাজ মাস পাঁচেক পরে জাপানে এসে পৌঁছল।'[৯৭] এই বিবরণ বিস্মৃতিভারে আক্রান্ত। এ থেকে মনে হতে পারে, বাঙালি ছাত্রদের শিল্পশিক্ষা দেওয়ার জন্য বিদেশে পাঠানোর দাতব্যমূলক প্রতিষ্ঠান Association for the Advancement of Industrial and Scientific Education রথীন্দ্রনাথ ও সন্তোষচন্দ্রের বিদেশযাত্রার ব্যয় বহন করেছিল—কিন্তু ২৮ ফাল্গুন [সোম 12 Mar] রবীন্দ্রনাথের ক্যাশ থেকে ২১৮৲ টাকা দিয়ে তাঁদের জন্য দু'খানা সেকেণ্ড ক্লাশের

টিকিট কাটা হয়েছিল, সেই হিসাব আমরা আগেই উদ্ধৃত করেছি। টোকিয়ো থেকে 18 May [৪ জ্যৈষ্ঠ ১৩১৩] মীরা দেবীকে লেখা সন্তোষচন্দ্রের চিঠি থেকে জানা যায়, তাঁরা এর আগেই জাপানে পৌঁছে গেছেন—সুতরাং 'মাস পাঁচেক পরে' জাপানে পৌঁছনোর কথাও ঠিক নয়। কলকাতার জাহাজঘাটায় তোলা একটি ছবি রবীন্দ্রভবনে আছে, তাতে রথীন্দ্রনাথ-সহ ষোল জনকে ডেকের উপর দেখা যায়। রথীন্দ্রনাথের জন্য অর্থব্যয়ের আর-একটি হিসাব পাওয়া যায় ১৭ চৈত্র [শনি 31 Mar] : 'রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর ব° থম্‌স্ কুক এণ্ড সেন ব্যাঙ্ক [Thomas Cook & Sons Bank] দং উক্ত ব্যাঙ্কের ২০০ শত ডলারের ২ খণ্ড ড্রাফট একশত ডলার হিসাবে ৬২৩৷৷০ ...উক্ত ব্যাঙ্কের বরাত চিটী হুণ্ডি-৯৮০ ০'। পরেও নিয়মিত ব্যবধানে বিভিন্ন অঙ্কের টাকা তাঁর নামে আমেরিকায় প্রেরিত হয়েছে।

ত্রিপুরা ছাড়া অন্য জায়গা থেকেও রবীন্দ্রনাথের কাছে কর্তব্যের আহ্বান এসে পৌঁছেছে। ১১ চৈত্র [রবি 25 Mar] বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের ষষ্ঠ বিশেষ অধিবেশন হয়। এই সভায়।

ব্যোমকেশ মুস্তফী বরিশালে প্রস্তাবিত সাহিত্যসম্মিলনের কথা উপস্থিত করিয়া শ্রীযুক্ত দেবকুমার রায়চৌধুরীর নিমন্ত্রণপত্র পড়িয়া পরিষদের সভ্যগণকে ঐ সাহিত্যসম্মিলনে উপস্থিত হইতে অনুরোধ করিলেন। সম্পাদক শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী ঐ সম্পর্কে বলিলেন যে, স্বদেশী আন্দোলনের সময় পূজার পূর্ব্বে টাউনহলে রবীন্দ্র বাবু বঙ্গের বিভিন্ন জেলায় বার্ষিক সাহিত্যসম্মিলনের প্রস্তাব উপস্থিত করেন [৯ ভাদ্রে প্রদত্ত বক্তৃতা 'অবস্থা ও ব্যবস্থা']। তিনি পরিষৎকে ঐরূপ অনুষ্ঠানের আয়োজন করিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন। উহাতে ব্যবচ্ছিন্ন বঙ্গের বিভিন্ন স্থানের সাহিত্যসেবীরা সম্মিলিত হইলে সাহিত্যের বন্ধনে জাতীয়তার বন্ধন দৃঢ়ীকৃত হইবে; তদ্ব্যতীত বিলাতে British Association যেরূপ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের বিভিন্ন নগরে বর্ষে বর্ষে মিলিত হইয়া বিজ্ঞানচর্চ্চা ও বিজ্ঞানের উন্নতি সাধন করেন; সেইরূপ বঙ্গের সাহিত্যিকগণও স্থানীয় তথ্য স্থানীয় ইতিহাস প্রভৃতির সঙ্কলনে সুযোগ পাইবেন। তদনুসারে পরিষৎ ঐ অনুষ্ঠানে উদ্যোগী ছিলেন। এবং পরিষদের রঙ্গপুর শাখা মূল পরিষৎকে ও অন্যান্য সাহিত্যসভাকে নিমন্ত্রণ দ্বারা রঙ্গপুরেই ঐরূপ সাহিত্যসম্মিলনের প্রস্তাব করিয়াছিলেন। বঙ্গের বিভিন্ন জেলার লোককে এ বৎসর রঙ্গপুর উপস্থিত করা সুসাধ্য হইত না। Provincial Conference উপলক্ষে বাঙ্গালার নানা স্থান হইতে প্রতিনিধিগণ ঈষ্টারের সময় বরিশালে উপস্থিত হইবেন। ঐ সময়ে সাহিত্যিক সম্মেলনের প্রস্তাব করিয়া বরিশালবাসীরা পরিষদের সঙ্কল্প কার্য্যে পরিণত করা সুসাধ্য করিয়াছেন। এইজন্য পরিষৎ তাঁহাদের নিমন্ত্রণ সাদরে গ্রহণ করিয়া পরিষদের সকল সভ্যকে বরিশালে পরিষদের প্রতিনিধিরূপে উপস্থিত হইতে অনুরোধ করিতেছেন। ...বলা বাহুল্য, এই সাহিত্যিক সম্মিলনের সহিত কোন রাজনৈতিক আলোচনার সম্পর্ক থাকিবে না।[৯৮]

লাখুটিয়ার জমিদার ও কবি দেবকুমার রায়চৌধুরী [1884-1929] সাহিত্যসম্মেলনের সভাপতি হিসেবে রবীন্দ্রনাথের নাম প্রস্তাব করলে বিরূপ সমালোচনা শুরু হয়, সেটি জানা যায় দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের পত্র থেকে : 'রবি বাবুকে সাহিত্যিক সম্মিলনের সভাপতি করায় "বঙ্গবাসী" তোমার উপরে অত নারাজ হইয়া চটিয়া উঠিলেন কেন, জানি না। আমি যদিও রবিবাবুর ঐ সব লালসা-মূলক রচনাবলীর নিতান্ত বিরোধী তবু এ কথা আমি মুক্ত কণ্ঠেই মানি যে, বর্ত্তমান সাহিত্য-ক্ষেত্রে তিনিই সর্ব্বাপেক্ষা যোগ্যতম ব্যক্তি এবং তাঁর সাহিত্যিক প্রতিভার সঙ্গে এখন আর কাহারও তুলনাই হইতে পারে না।/ অবশ্য সে বিষয়েও যে ঘোর মতভেদ আছে তা বলাই বাহুল্য। তবে এ সম্বন্ধে আমার যা মত, জানিতে চাহিয়াছ বলিয়াই লিখিলাম। কিন্তু তবু শুধু এই সাহিত্যসম্মিলনের সভাপতি সম্বন্ধে যদি শুধু আমার মত জিজ্ঞাসা করিয়া থাক তা হইলে আমি বলি—শিবনাথ শাস্ত্রী, দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, চন্দ্রনাথ বসু অথবা নবীনচন্দ্র সেনকে রবিবাবুর আগে সভাপতি করা উচিত ছিল। তিনি যত বড় সাহিত্যিকই হৌন না, ইঁহাদের অপেক্ষা তাঁহার বয়স অল্প। সুতরাং ইঁহাদের দাবীকে অগ্রগণ্য না করায়, আমার মতে অবিবেচনা ও অকৃতজ্ঞতার পরিচয় দেওয়া হইয়াছে।"[৯৯] —বয়সের প্রশ্ন গৌণ, সাহিত্যিক প্রতিভার বিচারে রবীন্দ্রনাথ-প্রস্তাবিত প্রাদেশিক সাহিত্যসম্মেলনে তাঁকেই সভাপতির পদে বরণ করে বরিশালবাসী সুবিবেচনার পরিচয়ই দিয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথ এই আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করেননি।

রথীন্দ্রনাথদের জাহাজে তুলে দিয়ে রবীন্দ্রনাথ আগরতলা যাত্রা করেন। জ্যেষ্ঠপুত্রকে দূর বিদেশে প্রেরণের আগে তাঁর মানসিক অবস্থার বর্ণনা করেছেন সন্তোষচন্দ্র 13 Sep 1910 [২৮ ভাদ্র ১৩১৭] শিকাগো অভিমুখে যাওয়ার সময়ে ট্রেন থেকে রথীন্দ্রনাথকে লেখা একটি চিঠিতে : 'মনে আছে আসার দু'দিন আগে একদিন সন্ধ্যার সময় একলা একলা ছাতে বেড়াচ্ছিলুম, তুমি কোথায় গিয়েছিলে, তখন অন্ধকার হয়ে এসেছে। অন্যমনস্কভাবে কি ভাবছিলুম, হঠাৎ চেয়ে দেখি গুরুদেব দাঁড়িয়ে আছেন। তাঁকে প্রণাম করলুম। হঠাৎ তিনি উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বল্লেন, "সন্তোষ, তোমরা দূর দেশে যাচ্ছ। —রথী ছেলেবেলা থেকে আনন্দ আহ্লাদের মধ্যেই প্রধানত মানুষ হয়ে এসেছে, আজও ও দুঃখকে জানে না, ওর জন্য আমার ভাবনা আছে। আজও ও স্রোতের মধ্যে গা ভাসিয়ে দেয়।"—জান, কোনোদিন তাঁকে কোনো কথা বলতে পারতুম না, হঠাৎ আমি নিজেকে ভুলে গেলুম, সেই অন্ধকারের মধ্যে, খোলা আকাশের নীচে আমার সমস্ত সঙ্কোচ দূর হয়ে গেল—আমি বল্লুম "আপনি ওর উপর অবিচার করছেন।" তিনি কিছু উত্তর না দিয়ে বলে গেলেন, "কিন্তু এর reaction ওর মধ্যে আসবে—সে বড় ভয়ানক struggle। তুমি কাছে আছ, তাকে sustain করতে পারবে।'[১০০] প্রায় অন্ধ পুত্রস্নেহ সত্ত্বেও রবীন্দ্রনাথ পুত্রের প্রকৃতিটি চিনতে ভুল করেননি, কিন্তু তা সংশোধন করা তাঁর সাধ্যাতীত ছিল!

রবীন্দ্রনাথের ত্রিপুরাযাত্রার তারিখটি অজ্ঞাত। ১৯ চৈত্র [সোম 2 Apr] তাঁর ক্যাশবহিতে লেখা হয় : 'বঃ শ্রীযুক্ত খোদ বাবু মহাশয় দং ত্রিপুরায় গমন জন্য লইয়া জান...২০০ৎ'—এই দিনই তিনি ত্রিপুরা যাত্রা করে থাকতে পারেন।

২০ চৈত্র [মঙ্গল 3 Apr] বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সপ্তম বিশেষ অধিবেশন হয় মিনার্ভা থিয়েটারে —'কলিকাতায় উপস্থিত পরীক্ষার্থী ও অন্যান্য ছাত্রগণকে অভ্যর্থনার জন্য এই বিশেষ অধিবেশন আহূত হইয়াছিল।' গত বৎসর ১৭ চৈত্র [বৃহ 30 Mar] ক্লাসিক থিয়েটারে একই উপলক্ষে আহূত ছাত্রসভায় রবীন্দ্রনাথ 'ছাত্রদের প্রতি সম্ভাষণ' প্রবন্ধটি পাঠ করেছিলেন। এবারেও তাঁকে আহ্বান করা হয়েছিল, কিন্তু 'শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর অনিবার্য্য কারণে উপস্থিত হইয়া ছাত্রগণকে সম্ভাষণ করিতে পারিলেন না, এ বিষয়ে যে পত্র লেখেন, সম্পাদক তাহা পাঠ করিলেন।'[১০১] পত্রটি মুদ্রিত বা রক্ষিত হয়নি।

রমণীমোহন চট্টোপাধ্যায়কে ত্রিপুরার রাজমন্ত্রী নিয়োগ করার পর যে-সব সমস্যা উপস্থিত হয়েছিল, তারই সমাধানকল্পে রাধাকিশোর মাণিক্য রবীন্দ্রনাথকে আগরতলায় আহ্বান করেছিলেন। কী ধরনের আলোচনা হয়েছিল তার কিছুটা ইঙ্গিত আছে রবীন্দ্রনাথ-লিখিত তারিখ-হীন 'বজেটের বিস্তারিত আলোচনার পূর্ব্বে কয়েকটি মূলনীতি সম্বন্ধে মহারাজের নিকট নিবেদন'-শীর্ষক দলিলে। তিনি ইতিপূর্বে 'স্বদেশী সমাজ' ও পরে 'দেশনায়ক' প্রবন্ধে এককেন্দ্রিক পরিচালনার স্বপক্ষে যে মত প্রকাশ করেছিলেন, এখানেও তারই প্রতি তাঁর সমর্থনের পরিচয় রয়েছে। 'অরুণ' সাপ্তাহিক পত্রিকায় যে-সব সমালোচনা হচ্ছিল তার কথা স্মরণে রেখে তিনি মহারাজের স্বকীয় ও রাষ্ট্রগত বিভাগ দুটিকে স্বতন্ত্র রাখার পরামর্শ দিয়ে লিখেছেন : 'উভয়কে জড়ীভূত করিয়া রাখিলে পরস্পর পরস্পরকে আঘাত করিতে থাকে—এই উপলক্ষ্যে প্রভূত অনিষ্ট উৎপন্ন হয়—এবং এই দুই বিভাগের সন্ধিস্থলে নানা প্রকার দুষ্ট চক্রান্তের অবকাশ থাকিয়া যায়।' রমণীমোহন 'স্বদেশী movementএর নেতা' বলে তিনি ইংলণ্ডের যুবরাজের কলকাতা-ভ্রমণের সময়ে মহারাজকে অন্তঃপুরিকাদের সঙ্গে আনতে বাধা দিয়েছিলেন, রমণীমোহন তাঁর ২০ পৌষের [বৃহ 4 Jan 1906] পত্রে ষড়যন্ত্রকারীদের এমন রটনা সম্পর্কে

মহারাজকে অবহিত করেন।[১০২] রবীন্দ্রনাথও বিষয়টি জেনেছিলেন বলে তাঁর নিবেদনে লেখেন : 'যাহা মহারাজের স্বকীয়—অর্থাৎ সংসার বিভাগ, নিজ তহবিল, পরিচরবর্গ এবং মহারাজের ভ্রমণাদি ব্যাপার যাহার অন্তর্গত—তাহার উপরে মন্ত্রী বা আর কাহারো হস্তক্ষেপ করিবার অধিকার দেওয়া চলে না। এইজন্য মহারাজার স্বকীয় বিভাগকে মন্ত্রীর অধিকার হইতে স্বতন্ত্র করিয়া মন্ত্রীর প্রতি রাষ্ট্রবিভাগের সম্পূর্ণ ভারার্পণ করা আবশ্যক হইবে।' 'নিবেদন'টি 'রবীন্দ্রনাথ ও ত্রিপুরা' গ্রন্থে সম্পূর্ণ মুদ্রিত হয়েছে [পৃ ৩১৯-২০], এটি পাঠ করলে রবীন্দ্রনাথের সূক্ষ্ম বিচারশক্তির পরিচয় পাওয়া যায়।

তর্কবিতর্ক, আলাপ-আলোচনায় আগরতলায় থাকার দিনগুলি নিশ্চয়ই ক্লান্তিকর হয়ে উঠেছিল। ২৫ চৈত্র [রবি ৪ Apr] তিনি মনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়কে লিখেছেন : 'ঘুরিয়া মরিতেছি। সম্প্রতি আগরতলায় আটকা পড়া গেছে। বরিশালে যাইতে হইবে। তাহার পর চাটগাঁয়ে যাইবার কথা কিন্তু আমার মন বিদ্রোহী হইতেছে। বোলপুরে গিয়া একেবারে নিশ্চেষ্টতার মধ্যে ডুব মারিয়া বসিতে ইচ্ছা করিতেছে। শনি আমাকে ঘুরাইতেছে—রবি তাহার সঙ্গে পারিয়া উঠিল না।...আমি আগামী বৃহস্পতিবারে বরিশালে যাইব তাহার পরে শনি আমাকে যদি নিষ্কৃতি দেয় তাহলে বোলপুরে ফিরিবার চেষ্টা করা যাইবে।'[১০৩]

বিদেশগামী পুত্রের জন্য উদ্বেগও এই পত্রে ব্যক্ত হয়েছে : 'এতদিনে রথীদের রেঙ্গুন ছাড়িবার কথা। তাহাদের সংবাদ আমার হস্তগত যে কবে হইবে তাহার ঠিকানা নাই।' সন্তোষচন্দ্র অন্তত সংবাদ দিয়েছিলেন, 'সোমবার' [২৬ চৈত্র : 9 Apr] তিনি 'ইরাবতী' থেকে লেখেন : 'আমরা আর একটু পরেই রেঙ্গুন পৌঁছব।'[১০৪]

ব্যারিস্টার আবদুল রসুলের সভাপতিত্বে বরিশালে বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মেলনের পর সাহিত্যসম্মিলনী আরম্ভ হওয়ার কথা ছিল ৩ বৈশাখ ১৩১৩ [সোম 16 Apr 1906]। চিঠিতে লেখা ভ্রমণসূচী রবীন্দ্রনাথ রক্ষা করে থাকলে ২৯ চৈত্র [বৃহ 12 Apr] তিনি বরিশাল যাত্রা করেন। নৌকাপথে বরিশাল পৌঁছে তিনি নদীর উপর একটি বজরায় আশ্রয় নেন। পুলিশী তাণ্ডবের ফলে তাঁর পক্ষে বরিশালের মাটিতে পদার্পণ করা সম্ভব হয়নি—কিন্তু সে পরের বৎসরের কথা।

প্রাসঙ্গিক তথ্য : ১

উপযুক্ত উপকরণের অভাবে বর্তমান বৎসরে ঠাকুরবাড়ির পারিবারিক চিত্রটি স্পষ্ট করা দুরূহ।

রবীন্দ্রনাথ গত বৎসর থেকে মীরা দেবীর জন্য পাত্র সন্ধান করছিলেন, এই বৎসরেও তা অব্যাহত থেকেছে। ২৩ বৈশাখ [শনি 6 May] তিনি মোহিতচন্দ্র সেনকে লিখেছেন : 'লাহোরের পাত্রটির কথা শঙ্কর পণ্ডিত আমার কাছে উত্থাপন করেছিলেন কিন্তু আমি তাতে কর্ণপাত করিনি [।] কোনো পাত্রকে আমি বিলেতে পাঠাতে চাইও নে, পার্ব্বও না,—অতএব ঘোষালের আশা করবেন না।' উক্ত 'শঙ্কর পণ্ডিত' হলেন নৃত্যশিল্পী উদয়শঙ্করের [1900-77] পিতা ঝালোয়ার রাজার দেওয়ান শ্যামশঙ্কর চৌধুরী। ১৮ মাঘ [বুধ 31 Jan] তিনি 'প্রমথর সঙ্গে সেই বিবাহ প্রস্তাবটার পুনরালোচনা' করার জন্য সুবোধচন্দ্র মজুমদারকে লিখেছেন। এদিকে মীরা দেবীকে গৃহকর্ম্মনিপুণা করে তোলার জন্যও তাঁর চেষ্টার ত্রুটি ছিল না।

সরলা দেবীর সঙ্গে ডাঃ পেয়ার মল-এর বিবাহ-সম্বন্ধ সংবাদপত্রে ঘোষিত হয়েছিল, মহর্ষির মৃত্যুতে তা স্থগিত রাখা হয়—একথা আমরা পূর্বেই বলেছি। কোনো কারণে সম্বন্ধটি ভেঙে যায়। কিন্তু তিনি উগ্র রাজনীতিতে যেভাবে জড়িয়ে পড়ছিলেন, তাতে তাঁর অভিভাবকেরা তাঁকে অবিবাহিত ও বাংলায় রেখে দেওয়া উচিত মনে করেননি। তাঁরা সরলা দেবীর অজ্ঞাতে লাহোরের উকিল আর্যসমাজ-নেতা বিপত্নীক রামভজ দত্তচৌধুরীর সঙ্গে তাঁর বিবাহ-সম্বন্ধ পাকা করে ফেলেন। এই সম্বন্ধটিও আনেন 'শঙ্কর পণ্ডিত'। সরলা দেবী তখন হিমালয়ে মায়াবতী অদ্বৈত আশ্রমে তিব্বতযাত্রার পরিকল্পনা করছেন ও স্বর্ণকুমারী দেবী তখন স্বাস্থ্যোদ্ধারের জন্য বৈদ্যনাথধামে। বিবাহের আয়োজন সেখানেই হয়। ১৮ আশ্বিন [বুধ 4 Oct] আর্যসমাজ মতে বিবাহ হল। বেঙ্গলী-তে খবরটি প্রকাশিত হয় 11 Oct: 'Miss Sarala Debi Ghosal B. A., was married on Wednesday the 4th instant, to Mr. Rambhuj [sic.] Dutt Chaudhuri, pleader, Chief Court, Lahore at Baidyanath Junction according to the Arya Samaj rites.' ২০ আশ্বিন [শুক্র 6 Oct] তাঁদের বালিগঞ্জের বাড়িতে 'বীরাষ্টমী' উৎসব হয়, এর আগেই তাঁরা কলকাতায় ফিরেছেন অর্থাৎ সরলা দেবী-লিখিত 'দুচারদিন পরে' নয়, বিবাহের পরের দিনই তাঁরা কলকাতা রওনা হন। পুজোর ছুটিতে মধুপুর-শিমুলতলা-বৈদ্যনাথে বায়ুপরিবর্তনভিলাষী পরিচিত বন্ধুবান্ধবেরা বিবাহানুষ্ঠানেই যোগ দিয়েছিলেন, কলকাতাতেও বন্ধুবান্ধব আত্মীয়স্বজনকে আপ্যায়িত করা হয় ২৪ আশ্বিন [মঙ্গল 10 Oct]—পরদিন বেঙ্গলী লেখে : 'The reception and feasts took place last night at the residence of Mr. J. Ghosal, at No. 26, Ballyguange Circular Road.' ২৩ আশ্বিন বাগবাজারে পশুপতিনাথ বসুর বাড়িতে অনুষ্ঠিত 'বিজয়া-সম্মিলন' সভায় রামভজ উপস্থিত ছিলেন। ২৬ আশ্বিন [বৃহ 12 Oct] সরলা দেবী শ্বশুরালয়ে যাত্রা করেন, সে-খবরও বেঙ্গলী-তে [14 Oct] প্রকাশিত হয় : 'Sm. Sarala Devi left Calcutta on Thursday last for Lahore with her husband Mr. Rambhuj [sic.] Dutt Chaudhuri.'

সুরেন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠ পুত্র সুবীরেন্দ্রনাথের জন্ম হয় ৮ কার্তিক [বুধ 25 Oct 1905] ইন্দিরা দেবী লিখেছেন : 'সেই বৎসরেরই [1905] মাঘ মাসে ঠিক নয় মাস আগে মহর্ষিদেব দেহ রাখেন। তাই আমরা বলাবলি করতুম যে, তিনি আবার জন্ম নিয়েছেন।/পুত্রের জন্মের পরই বউ[সংজ্ঞা দেবী] অসুস্থ হয়ে পড়ে বলে মা প্রথম নাতি সুবীরকে নিয়ে রাঁচিবাস করতে যান। সুরেন ও বিবি এই দুই নাম মিলিয়ে আদরের নাতির নাম রেখেছিলেন সুবীর।'[১০৪ক]

পুত্র রথীন্দ্রনাথকে রবীন্দ্রনাথ কৃষিবিদ্যা শিক্ষার জন্য আমেরিকায় পাঠাতে মনস্থ করেন। আরবানা কৃষি কলেজে লেখালেখি নিশ্চয়ই অনেক আগে থেকেই শুরু হয়েছিল, ক্যাশবহিতে 'রথীবাবুর এমিরিকায় গমন জন্য দ্রব্যাদি' ক্রয়ের প্রথম হিসাব পাওয়া যায় ১৩ ফাল্গুন [রবি 25 Feb 1906]। এরপর ২৮ ফাল্গুন [সোম 12 Mar] 'ব° মেকিনলাল মেকিঞ্জি দং শ্রীযুক্ত রথীন্দ্রবাবু ও সন্তোষ বাবুর জাপান গমনের জাহাজের সেকেণ্ড ক্লাশের টিকিট ক্রয় জন্য' শৈলেশচন্দ্র মজুমদারকে ২১৮ টাকা দেওয়া হয়। একই দিনে শান্তিনিকেতনে 'স্বস্তিবাদ' করে রথীন্দ্রনাথ ও সন্তোষচন্দ্রকে বিদায়-সংবর্ধনা জানানো হয়। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনে যোগ দিয়ে তাঁদের সঙ্গে অনুশীলন সমিতির সংযোগ স্থাপিত হয়েছিল। জীবনতারা হালদার লিখেছেন : 'কিছুকাল পরে দেশে জাতীয় শিক্ষা প্রবর্তনের উদ্দেশ্যে জ্ঞানলাভের জন্য রথীন ঠাকুর, নগেন গাঙ্গুলী [?], সন্তোষ মজুমদার প্রভৃতি আমেরিকা যাত্রা করেন। তাঁহাদের শুভকামনায় সমিতির কেন্দ্রস্থলে (৪৯, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট) একটি

প্রীতি-সম্মেলনের আয়োজন হয়। তাহাতে রবীন্দ্রনাথ যোগদান করেন, সমিতিকে অভিনন্দন জানান ও সভ্যবৃন্দের সহিত আহারাদি করেন।'[১০৫] রবীন্দ্রজীবনী-কার লিখেছেন : 'রথীন্দ্রনাথ ও সন্তোষচন্দ্র জাপানের পথে স্টীমার-যোগে আমেরিকা রওনা হইলেন (৩ এপ্রিল ১৯০৬।২০ চৈত্র ১৩১২)'[১০৬], কিন্তু তিনি যে সূত্র নির্দেশ করেছেন তাতে কোনো নির্দিষ্ট তারিখ নেই।

মহর্ষির মৃত্যুর পর জমিদারি পরিচালনার দায়িত্ব নেন সুরেন্দ্রনাথ। তিনি কর্মচারীদের দায়িত্বভারের কিছু পরিবর্তন করেন। শৈলেশচন্দ্র মজুমদার কালীগ্রামের ম্যানেজার ছিলেন, ১ জ্যৈষ্ঠ [15 May 1905] থেকে তিনি সদর অফিসে ১০০ টাকা বেতনে দেওয়ান নিযুক্ত হন। ১ আষাঢ় [15 Jun] থেকে কেদারচন্দ্র লাহিড়িকে ৭০ টাকা বেতন ও মুনাফার উপর ১/২% কমিশনে কালীগ্রামের অ্যাকটিং সাব-ম্যানেজার নিয়োগ করা হয়। ১ শ্রাবণ [17 Jul] জানকীনাথ রায় কালীগ্রামের অ্যাসিস্টান্ট সাব-ম্যানেজার ও প্রসন্নকুমার চাকী বিরাহিমপুরের অ্যাসিস্টান্ট সাব-ম্যানেজার নিযুক্ত হন, উভয়েরই বেতন ৬০ টাকা।

প্রাসঙ্গিক তথ্য : ২

৩ জ্যৈষ্ঠ [বুধ 17 May] জোড়াসাঁকোর বাড়িতে মহর্ষির ঊননবতিতম জন্মোৎসব পালিত হয় :'গত ৩ জ্যৈষ্ঠ পূজ্যপাদ মহর্ষি দেবের জন্মোৎসব অতিশয় শ্রদ্ধা ভক্তির সহিত সমাহিত হইয়াছিল। তিনি জীবদ্দশায় যে গৃহে যে আসনে বসিতেন সেই গৃহে সেই আসনের সম্মুখে তাঁহার ব্যবহার্য্য বস্তু সকল সুসজ্জিত রাখা হইয়াছিল। ভক্তিভাজন বাবু সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর ব্রহ্মোপাসনা করিয়াছিলেন এবং মহর্ষি দেবের একান্ত প্রিয় হাফেজ হইতে কএকটা কবিতা বাঙ্গলায় অনুবাদ করিয়া পাঠ করিয়াছিলেন।[১০৭]

৭ পৌষ [শুক্র 22 Dec] শান্তিনিকেতনে পঞ্চদশ সাম্বৎসরিক ব্রহ্মোৎসব হয়। প্রাতে প্রিয়নাথ শাস্ত্রী ও সায়ংকালে রবীন্দ্রনাথ আচার্যের বেদিগ্রহণ করে উপদেশ দেন। রবীন্দ্রনাথের উপদেশটি 'উৎসব' [দ্র ধর্ম ১৩। ৩৩৫-৪০] নামে মাঘ-সংখ্যা বঙ্গদর্শন-এ মুদ্রিত হয়। দ্বিপ্রহরে মেলাস্থলে সুপ্রসিদ্ধ যাত্রাকার নীলকণ্ঠ মুখোপাধ্যায়ের [1841-1912] যাত্রাভিনয় হয়। রাত্রে 'সঙ্গীতাদি হইলে পূর্ব্ববৎ নানারূপ বিস্ময়কর বাজী হইয়াছিল।'

১১ মাঘ [বুধ 24 Jan] আদি ব্রাহ্মসমাজের ষট্‌সপ্ততিতম সাম্বৎসরিক ব্রাহ্মসমাজ উপলক্ষে প্রাতে আদি ব্রাহ্মসমাজগৃহে শম্ভুনাথ গড়গড়ি, যোগেন্দ্রনাথ শিরোমণি ও প্রিয়নাথ শাস্ত্রী বেদিগ্রহণ করেন। দ্বিজেন্দ্রনাথ বেদীর সম্মুখে দাঁড়িয়ে সকলকে উদ্বোধিত করেন ও প্রিয়নাথ শাস্ত্রী উপদেশ দেন।

মহর্ষিভবনে অনুষ্ঠিত সায়ংকালীন উপাসনায় রবীন্দ্রনাথ, শম্ভুনাথ গড়গড়ি ও চিন্তামণি চট্টোপাধ্যায় 'বেদি গ্রহণ করিলে গড়গড়ি মহাশয়...সকলকে উদ্বোধিত করিলেন'। রবীন্দ্রনাথ পৌষ উৎসবে পঠিত উপদেশটি এখানেও পাঠ করেন।

ফাল্গুন-সংখ্যা তত্ত্ববোধিনী-তে ট্রাস্টীদের স্বাক্ষরে এই বিজ্ঞপ্তিটি প্রকাশিত হয় : 'শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় আদি ব্রাহ্মসমাজের আচার্য্য পদে বৃত হইলেন। আগামী ২রা ফাল্গুন বুধবার হইতে সাপ্তাহিক উপাসনায় বেদী গ্রহণ করিয়া তিনি উপাসনার কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে থাকিবেন।' সত্যেন্দ্রনাথ ১৩১৪ বঙ্গাব্দের

প্রায় শেষ পর্যন্ত এই কাজ নিষ্ঠার সঙ্গে করে গেছেন। তাঁর পরে রবীন্দ্রনাথ কয়েকমাস এই দায়িত্ব পালন করেন। তাঁদের আগে দ্বিজেন্দ্রনাথ বহুবৎসর সাপ্তাহিক উপাসনার দায়িত্বে ছিলেন।

প্রাসঙ্গিক তথ্য : ৩

বর্তমান বৎসরে ৯-১০ বৈশাখ [শনি-রবি 22-23 Apr] ময়মনসিংহে ভূপেন্দ্রনাথ বসুর সভাপতিত্বে বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। বঙ্গভঙ্গের প্রস্তাবের পটভূমিকায় এই সম্মেলন বিশেষ গুরুত্ব লাভ করেছিল। বৃহত্তর বাংলা থেকে দু'হাজারের বেশি প্রতিনিধি ও দশ হাজার ব্যক্তির উপস্থিতি এই গুরুত্বের অন্যতম প্রমাণ। সম্মেলনে গৃহীত দ্বিতীয় প্রস্তাবে বাঙালির অগ্রগতির পক্ষে ক্ষতিকর এই পরিকল্পনা প্রত্যাহারের দাবী জানিয়ে বাংলাকে কার্যনির্বাহক পরিষদ-সহ প্রেসিডেন্সি গবর্মেন্টের স্তরে উন্নীত করার আহ্বান জানানো হয়। ভূপেন্দ্রনাথ তাঁর সভাপতির অভিভাষণ ইংরেজিতে দিলেও তাঁর সমাপ্তি-ভাষণ ও অন্যান্য কার্যাবলীতে বাংলাভাষাই প্রাধান্য পেয়েছিল।

রবীন্দ্রনাথ কলকাতার মেট্রোপলিটান ইলেক্টোরাল ডিভিশন থেকে এই সম্মেলনে প্রতিনিধি নির্বাচিত হয়েছিলেন। সম্মেলনের অনুষঙ্গ হিসেবে সারস্বত সমিতি দ্বারা আয়োজিত শিল্পপ্রদর্শনী ও সাহিত্যসম্মেলনেরও মনোনীত সভাপতি ছিলেন তিনি। কিন্তু অসুস্থতার জন্য তিনি ময়মনসিংহে যেতে পারেননি। জেলা-ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ টমসন শিল্পপ্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন; জেলা-জজ মিঃ ওয়েবস্টার ও অ্যাডিশনাল জজ জে. এন. ঘোষ বিচারকের ভূমিকা নেন এবং ঢাকা বিভাগের কমিশনার মিঃ ইংলিশ [Mr. Inglis] পুরস্কার বিতরণ করেন। রাজকর্মচারীদের এই আনুকূল্য পরবর্তী বৎসর সম্পূর্ণ অন্তর্হিত হয়েছিল।

কলকাতার অনুশীলন সমিতির মতো ময়মনসিংহের সুহৃদসমিতিও ব্যায়াম-চর্চাদির মাধ্যমে স্বদেশী আন্দোলনের ভূমিকা রচনা করছিল। প্রাদেশিক সম্মেলন উপলক্ষ করে সুহৃদ সমিতি ৭ বৈশাখ [বৃহ 20 Apr] সরলা দেবীর সভানেত্রীত্বে তাদের সাম্বৎসরিক উৎসব পালন করে। 'Hymns, atheletic sports and accounts of Pratapaditya's life and work'[১০৮] অনুষ্ঠানের অঙ্গ ছিল। এই উপলক্ষে বঙ্কিমচন্দ্রের 'আনন্দমঠ'-এর নাট্যরূপ অভিনয়ের আয়োজন হয়েছিল। কিন্তু মুসলমানেরা এই অভিনয়ের ব্যাপারে আপত্তি করে প্রাদেশিক সম্মেলন বর্জনের হুমকি দেয়। আপত্তিকর অংশ বর্জন করার প্রতিশ্রুতি দিয়েও তাদের সন্তুষ্ট করা যায়নি। ফলে অভিনয়টি পরিত্যক্ত হয়। চরমপন্থী হিন্দু নেতারা পরে আনন্দমঠের আদর্শে তাঁদের রাজনৈতিক কাজকর্ম রূপায়িত করতে চেষ্টা করেছিলেন। মুসলমানেরা যে এই কাজে অংশ গ্রহণ করেননি আনন্দমঠী রাজনীতি তার অন্যতম কারণ। এই বৎসর প্রতাপাদিত্য ও উদয়াদিত্য উৎসব অনুষ্ঠিত হওয়ার খবর পাওয়া যায় না।

কার্জন ইংলণ্ডে গিয়ে বঙ্গভঙ্গের ব্যবস্থা পাকা করে এসেছিলেন। ইণ্ডিয়া কাউন্সিলে যেটুকু বিরোধিতা ছিল সেটি কাটিয়ে ভারতসচিব ব্রডরিক 4 Jul [মঙ্গল ২০ আষাঢ়] পার্লামেন্টে লর্ড রবার্ট্স্‌কে জানান, তিনি বঙ্গভঙ্গের প্রস্তাব গ্রহণ করেছেন। 9 Jul [রবি ২৫ আষাঢ়] ভারতসচিবের ডেসপ্যাচ প্রকাশিত হয়। 19 Jul [বুধ ৩ শ্রাবণ] সিমলা থেকে বিশেষ গেজেটে সরকারী 'রেজোলিউশন' ঘোষিত ও পরের দিন বেঙ্গলী-তে কালো

বর্ডার দিয়ে ও অন্যান্য কাগজে সম্পূর্ণ সিদ্ধান্তটি মুদ্রিত হল। পূর্ব থেকেই বাঙালি এ-বিষয়ে উত্তেজিত ছিল, এই ঘোষণা সেই আগুনে ঘৃতাহুতি দিল। আবেদন-নিবেদনের রাজনীতি ত্যাগ করে প্রত্যক্ষ সংগ্রামের আহ্বান জানানো হল টাউন হলের ঐতিহাসিক সভায় 7 Aug [সোম ২২ শ্রাবণ] তারিখে। প্রত্যেক জেলার প্রতিনিধি, ছাত্র ও জনসাধারণের বিপুল সমাগমে টাউন হল জনারণ্যে পরিণত হয়। ফলে মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী, ভূপেন্দ্রনাথ বসু ও অম্বিকাচরণ মজুমদারের সভাপতিত্বে তিনটি পৃথক সভার আয়োজন করতে হয়। মূল সভায় নরেন্দ্রনাথ সেন বিলাতী-বর্জন বা বয়কট প্রস্তাব উত্থাপন করেন। বাণিজ্যজীবী ইংরেজের ব্যবসায়ের ক্ষতি করে তাদের সিদ্ধান্ত পরিবর্তনে বাধ্য করার এই কৌশল গ্রহণের প্রস্তাব 1891-এ সহবাস-সম্মতির আইন বিধিবদ্ধ হওয়ার সময়েই উত্থাপিত হয়েছিল, পরে টহলরাম গঙ্গারাম একক প্রয়াসে বিলাতীবর্জনের স্বপক্ষে কলকাতায় প্রচার চালিয়েছিলেন, বঙ্গভঙ্গ-প্রস্তাবের পটভূমিকায় কৌশলটি ব্যাপক জনসমর্থন লাভ করল। স্বভাবতই এর সঙ্গে স্বদেশী শিল্পের উন্নয়নের বিষয়টি, জড়িত ছিল। 19 Aug [শনি ৩ ভাদ্র] নাটোরের মহারাজার সভাপতিত্বে বেঙ্গল ল্যাণ্ডহোল্ডারস্‌' অ্যাসোসিয়েশনে অনুষ্ঠিত সম্মেলনে একটি কাপড়ের কল স্থাপনের প্রস্তাব করা হয়—ময়মনসিংহ ও কাশিমবাজারের মহারাজা ৫০,০০০ টাকা, নাটোর ১০,০০০ টাকা, বগুড়ার নবাব ১০,০০০ টাকা, তারকনাথ পালিত ও শ্রীনাথ রায় ২৫,০০০ টাকা প্রভৃতি সাহায্যের প্রতিশ্রুতি ঘোষিত হয়।[১০৯] পরিকল্পনাটি শ্রীরামপুরের বঙ্গলক্ষ্মী মিলে পরিণতি লাভ করে।

স্বদেশী শিল্পের প্রসারে নানাবিধ ব্যবস্থাও গ্রহণ করা হয়। স্বদেশী দ্রব্য বিক্রয়ের জন্য ইতিপূর্বে কয়েকটি প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয়েছিল, বয়কট-আন্দোলনের ফলে তাদের সংখ্যা ও ব্যবসায়ও বৃদ্ধি পায়। সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সভাপতিত্বে ৩ আশ্বিন [মঙ্গল 19 sep] কুষ্টিয়ায় একটি বিরাট সভায় বিলাতী-বর্জন ও স্বদেশী-গ্রহণের সংকল্প ঘোষিত হয়; সুরেন্দ্রনাথকে সভাপতি এবং ঠাকুর এস্টেটের সাব-ম্যানেজার বামাচরণ বসু ও নলডাঙা রাজ এস্টেটের চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে যুগ্ম-সম্পাদক করে একটি 'কো-অপারেটিভ স্বদেশী সমাজ' কুষ্টিয়া কো-অপারেটিভ সোসাইটি প্রতিষ্ঠিত হয়। বামাচরণ বসুর তত্ত্বাবধানে কুষ্টিয়া উইভিং স্কুল স্থাপিত হয়। বিশেষ করে পূর্ববঙ্গ ও ত্রিপুরা থেকে আগত বহু শিক্ষার্থী এই স্কুলে বস্ত্রবয়নশিক্ষা লাভ করে। সুরেন্দ্রনাথ, অম্বিকাচরণ উকিল প্রভৃতি ৪ চৈত্র [রবি 18 Mar 1906] একটি সভায় মিলিত হয়ে হিন্দুস্থান কো-অপারেটিভ ইনস্যুরেন্স সোসাইটি লিমিটেড প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ করেন, রবীন্দ্রনাথও তার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। শিলাইদহে ও পতিসরে কৃষকদের সাহায্য করার জন্য আগেই কৃষিব্যাঙ্ক স্থাপিত হয়েছিল, গিরিডিতে অবস্থানের সময়ে রবীন্দ্রনাথ 'গিরিডি স্বদেশী গোলা'তে অর্থ-বিনিয়োগ করেন একথা আমরা পূর্বেই বলেছি।

বয়কট ঘোষণার পর বৃহত্তর বঙ্গের সর্বত্র প্রতিদিন শত শত সভায় বঙ্গভঙ্গ প্রস্তাবের বিরোধিতা ও বিলাতী-বর্জনের শপথ গৃহীত হয়। বহু তরুণ ছাত্র দোকানে দোকানে পিকেটিং [picketing] ও দূর গ্রামে মাথায় করে দেশী দ্রব্যাদি বিক্রয় করতে থাকে। বঙ্গভঙ্গের প্রস্তাবে ভারতে ইংরেজ বণিকরাও কিছু অসুবিধা আশঙ্কা করে প্রথমে প্রস্তাবটির বিরোধিতা ও বাঙালিদের প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন করে। কিন্তু বয়কট ঘোষিত হওয়ায় তাদের সুর পালটে যায়। সলিমুল্লার মতো শাসকগোষ্ঠীর অনুচরেরাও সক্রিয় ছিল। সস্তা বিলিতি কাপড়ের বদলে দেশী মহার্ঘ বস্ত্রাদি কিনতে দরিদ্রদের অসুবিধা হচ্ছিল। ফলে কোথাও কোথাও জবরদস্তিও চলে। এইসবের প্রতিক্রিয়ায় 26 Aug [শনি ১০ ভাদ্র] ফরিদপুরে দাঙ্গা দেখা দেয়। এর পর হিন্দুমুসলমান

দাঙ্গা জাতীয় আন্দোলনের সঙ্গে হাত-ধরাধরি করে চলেছে। কিন্তু সামান্য পরিমাণে হলেও কিছু মুসলমান আন্তরিকভাবে স্বদেশী আন্দোলনে যোগদান করেছিলেন।

সেনাপতি লর্ড কিচেনারের সঙ্গে কার্জনের মতভেদ হওয়ায় কার্জন পদত্যাগ করেন। 20 Aug [রবি ৪ ভাদ্র] এই পদত্যাগপত্র গ্রহণ ও তাঁর স্থলে লর্ড মিন্টোর নিয়োগের সংবাদ লণ্ডনে ঘোষিত হয়। পরদিন কাগজে এই সংবাদ প্রকাশিত হলে কলকাতায় ও অন্যত্র আনন্দের হিল্লোল দেখা দেয়। কিন্তু লর্ড মিন্টোর সুদূর কানাডা থেকে ভারতে এসে কর্মভার গ্রহণের বিলম্ব থাকায় কার্জন তাঁর অশুভ আকাঙক্ষা চরিতার্থ করার যথেষ্ট সময় পেলেন। 1 Sep [শুক্র ১৬ ভাদ্র] সিমলা থেকে প্রচারিত Partition Proclamation-এ 16 Oct [সোম ৩০ আশ্বিন] বঙ্গভঙ্গের দিন ধার্য হয়। নবগঠিত প্রদেশ আসাম ও পূর্ব বাংলার লেফটেনান্ট গবর্নর নিযুক্ত হলেন কার্জনের চেয়েও পাষণ্ড শাসক ব্যামফিল্ড ফুলার। অ্যান্ড্রু ফ্রেজার পুনর্গঠিত বাংলা প্রদেশের লেফটেনান্ট গবর্নর থাকেন।

বঙ্গভঙ্গের দিনে স্বতস্ফূর্ত হরতাল পালিত হয়। ভোরে বিপুল জনতা গঙ্গাস্নান করে পরস্পরের হাতে রাখী বেঁধে দেয়। বিকেলে আনন্দমোহন বসুর সভাপতিত্বে আপার সার্কুলার রোডে ফেডারেশন হল বা মিলন-মন্দিরের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করা হয়। পরে বাগবাজারে পশুপতিনাথ বসুর গৃহপ্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত সভায় ন্যাশনাল ফাণ্ড বা জাতীয় ভাণ্ডারে অর্থসংগ্রহের সূচনা হয়। দুঃখের বিষয়, জাতীয় ভাণ্ডারে প্রদত্ত এই অর্থের সদ্ব্যবহার হয়নি মতদ্বৈধের কারণে।

আগেই বলেছি, স্বদেশী আন্দোলনে ছাত্রসমাজ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। 3 Oct [মঙ্গল ১৭ আশ্বিন] বড়োবাজারে একটি ১৪।১৫ বছরের বালক এক বয়স্ক ব্যক্তিকে বিলিতি কাপড় না কিনতে অনুরোধ করলে ঘটনাটিকে কেন্দ্র করে পুলিশ ও জনসাধারণের মধ্যে গোলমাল শুরু হয়; সংঘর্ষে ইনস্পেক্টর ক্যারোল আহত হলে পুলিশ ৬ জন ছাত্র-সহ ১৭ জনকে গ্রেপ্তার করে। সুরেন্দ্রনাথ ভূপেন্দ্রনাথ প্রভৃতি নেতা দ্রুত থানায় গিয়ে ১০০ টাকা ক্ষতিপূরণ দিয়ে মামলাটি মিটিয়ে নেন। ঘটনাটি সরকারের সুবিধা করে দেয়। চতুর ফ্রেজার ৪ Oct কার্জনকে লেখেন :

> We could not have procured a conviction, for the complainant refused to come forward, and witnesses concealed themselves. But we did not let this be known. So the leaders of the agitation in Calcutta came in great alarm and begged for the boys' release. We agreed, provided that they guaranteed that there should be no more of this, and that the matter should be dealt with by the institutions. They have thus given themselves into our hands; and we are in a far stronger position, for future action through the education department.[১১০]

শিক্ষাবিভাগের অধিকর্তা A. Pedler কয়েকটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষকে 21 Oct [শনি ৪ কার্তিক] পত্র দিয়ে কেন অভিযুক্ত ছাত্রদের বহিষ্কৃত করা হবে না তার কারণ দর্শাতে বলেন।[১১১] এর আগেই সরকারের স্থানাপন্ন মুখ্যসচিব R. W. Carlyle 10 Oct [মঙ্গল ২৪ আশ্বিন] ছাত্রদের রাজনৈতিক সভায় অংশগ্রহণ নিষিদ্ধ করে জেলাসমূহের ম্যাজিস্ট্রেট ও কালেক্টরদের কাছে একটি গোপন সার্কুলার প্রেরণ করেন। 22 Oct [রবি ৫ কার্তিক] সার্কুলারটি *The Statesma*-এ প্রকাশিত হলে ৭ কার্তিক [মঙ্গল 24 Oct] ফিল্ড অ্যাণ্ড অ্যাকাডেমি ক্লাবে ব্যারিস্টার আবদুল রসুলের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত একটি সভায় জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার সংকল্প ঘোষিত হয়। ১০ কার্তিক [শুক্র 27 Oct] পটলডাঙার মল্লিকবাড়িতে রবীন্দ্রনাথের

সভাপতিত্বে ছাত্রদের একটি সভা হয়। সিটি কলেজের ছাত্র শচীন্দ্রনাথ বসু গবর্মেন্টের বিশ্ববিদ্যালয় ত্যাগ করা সম্পর্কে প্রস্তাব আনেন। এর পরে বিভিন্ন সভায় বিষয়টি যখন আলোচিত হচ্ছে তখন রংপুরের জেলা ম্যাজিস্ট্রেট T. Emerson কার্লাইল সার্কুলারকে কার্যকরী রূপ দিলেন। 1 Nov [বুধ ১৫ কার্তিক] বাংলার বিভিন্ন স্থানে 'Proclamation Day' পালিত হয়। রংপুর জেলা ও টেকনিক্যাল স্কুলের ছাত্রেরা রাস্তায় 'বন্দেমাতরম্' গান গেয়ে এই সভায় যোগ দিলে এমার্সন প্রায় দু'শ ছাত্রকে পাঁচ টাকা করে জরিমানা করেন। সংবাদটি 4 Nov-এর কাগজে প্রকাশিত হলে কৃষ্ণকুমার মিত্র, শচীন্দ্রপ্রসাদ বসু, রমাকান্ত রায় প্রভৃতি অ্যান্টি-সার্কুলার সোসাইটি স্থাপন করেন। শচীন্দ্রপ্রসাদ ও রমাকান্ত রংপুরে গিয়ে 7 Nov ছাত্রদের একটি সভায় যোগ দেন, ৪ Nov [বুধ ২২ কার্তিক] ব্যারিস্টার-ঔপন্যাসিক প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়কে প্রধান শিক্ষক করে রংপুর জাতীয় বিদ্যালয়ের কার্যারম্ভ হয়। 9 Nov 'বন্দেমাতরম্' বলার অপরাধে 'ক্ষুদে লাট' ব্যামফিল্ড ফুলারের আদেশে মাদারিপুরের কয়েকটি ছাত্রকে বেত্রাঘাত করার সংবাদ প্রকাশিত হলে 'পান্তির মাঠ' ও কলেজ স্কোয়ারে দুটি সভা হয়, প্রথমটিতে সুবোধচন্দ্র মল্লিক প্রস্তাবিত জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য এক লক্ষ টাকা দান করার প্রতিশ্রুতি দিলে জনতা স্বতঃস্ফূর্তভাবে তাঁকে 'রাজা' উপাধিতে ভূষিত করে। 10 Nov একই স্থানে অনুষ্ঠিত একটি সভায় বিপিনচন্দ্র পাল অপর এক ব্যক্তির [গৌরীপুরের জমিদার ব্রজেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী] পাঁচ লক্ষ টাকা দানের প্রতিশ্রুতি ঘোষণা করেন। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন ও সরকারী বিশ্ববিদ্যালয় পরিত্যাগের ব্যাপারে ছাত্রদের সংকল্প ও বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ্গণের সমর্থন ঘোষিত হলেও সুরেন্দ্রনাথ প্রমুখ রাজনৈতিক নেতারা দ্বিধান্বিত ছিলেন। কিন্তু ঘটনাপ্রবাহ তাঁদের বাধ্য করল। ৩০ কার্তিক [বৃহ 16 Nov] বেঙ্গল ল্যান্ডহোল্ডারস' অ্যাসোসিয়েশনের সভাগৃহে রাজা পিয়ারীমোহন মুখোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে শিক্ষাবিষয়ক মন্ত্রণাসভা বসে। আশুতোষ চৌধুরী ও ডাঃ নীলরতন সরকারকে সম্পাদক করে ৪২ সদস্যের Provisional Education Committee গঠিত হয়। নানা ধরনের উত্থানপতনের পর 11 Mar 1906 [রবি ২৭ ফাল্গুন] সত্যেন্দ্রনাথের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত তৃতীয় শিক্ষা-সম্মেলনে জাতীয় শিক্ষাপরিষদের নিয়মাবলী গৃহীত হয়। 1860-র ২১ আইন অনুযায়ী 1 Jun 1906 [শুক্র ১৮ জ্যৈষ্ঠ ১৩১৩] পরিষদ রেজেস্ট্রীকৃত হয়। ২৯ শ্রাবণ [মঙ্গল 14 Aug] টাউন হলে অনুষ্ঠিত এক জনসভায় পরিষদের উদ্‌বোধন হয়।

সরকারও দমনমূলক ব্যবস্থাদি গ্রহণ করতে থাকে। রংপুর ও মাদারিপুরের ঘটনার কথা পূর্বে বলা হয়েছে। আসাম ও পূর্ববঙ্গ সরকার 18 Nov [শনি ২ অগ্র°] মাধবপাশা এবং বানারিপুর ও নরোত্তমপুরে প্যুনিটিভ পুলিশ নিয়োগ করে হিন্দু গ্রামবাসীদের উপর ব্যয়ভার চাপিয়ে দেয়।[১১২] বরিশালের জননেতা অশ্বিনীকুমার দত্ত তাঁর সহযোগীদের সাহায্যে সেখানে স্বদেশী আন্দোলন তীব্রতর করে তুলছিলেন। ২১ কার্তিক তাঁরা 'বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদ ও স্বদেশী আন্দোলন সম্বন্ধে নিবেদন' মুদ্রিত করে প্রচার করলে বরিশালের জেলা ম্যাজিস্ট্রেট J. C. Jack নেতারা 'ঐ নিবেদন পত্রে রাজদ্রোহ সূচক ও জনসাধারণ উত্তেজিত হইতে পারে এরূপ কথা আছে বুঝিতে পারিয়া ঐ নিবেদন পত্র প্রত্যাহার করিয়াছেন' বলে মিথ্যা 'বিজ্ঞাপন' প্রকাশ করেন।[১১৩] অশ্বিনীকুমার মানহানির মামলা করেন। ব্রহ্মবান্ধবের 'সন্ধ্যা' পত্রিকা স্বদেশী আন্দোলনের শুরু থেকেই সুর বদলে ফেলেছিল। প্রেস অ্যাক্টের declaration-সংক্রান্ত খুঁটিনাটি অমান্য করার অজুহাতে ব্রহ্মবান্ধবকে 23 Nov [বৃহ ৭ অগ্র°] প্রেসিডেন্সি ম্যাজিস্ট্রেট D. H. Kingsford-এর আদালতে হাজির করা হয়। চতুর ব্রহ্মবান্ধব ত্রুটি স্বীকার করে মামলাটি মিটিয়ে নেন।

গোপালকৃষ্ণ গোখলের সভাপতিত্বে ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের একবিংশতিতম অধিবেশন বারাণসীতে হয় 27-29 Dec [বুধ-শুক্র ১২-১৪ পৌষ]। বঙ্গভঙ্গের অব্যবহিত পরে অনুষ্ঠিত এই অধিবেশন বাঙালির পক্ষে যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ ছিল। সভাপতির ভাষণে গোখলে কার্জনের অপশাসন ও রাতের অন্ধকারে উদ্ভাবিত ['concocted in the dark'] বঙ্গভঙ্গ-পরিকল্পনাকে ধিক্কৃত করেন। এই অধিবেশনে গৃহীত দুটি প্রস্তাবেও বঙ্গভঙ্গ ও দমননীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানানো হয়। কিন্তু এ-ব্যাপারে কংগ্রেস-নেতৃত্বের দ্বিধা ও পশ্চাদপসরণের লক্ষণও অস্পষ্ট থাকেনি। প্রথম প্রস্তাবে বঙ্গভঙ্গের নিন্দা করেও সিদ্ধান্তটি পরিবর্তন বা সংশোধনের জন্য আবেদন ['appeals'] জানানো হয়, দ্বিতীয় প্রস্তাবে 'বাঙালি'র বয়কটকে ব্রিটিশ জনসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণের 'perhaps the only constitutional and effective means'-এর অতিরিক্ত কোনো মর্যাদা দেওয়া হয়নি। এটুকুও করা হয়েছিল যুবরাজকে স্বাগত জানানোর প্রস্তাবের বিরোধিতা করার ভয় দেখিয়ে। যেখানে রাজনৈতিক অস্ত্র হিসেবে বয়কটকে সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে প্রয়োগ করার সিদ্ধান্ত নেওয়া উচিত ছিল, সেখানে কেবল বাঙালির ক্ষেত্রে অগত্যা-গৃহীত উপায় রূপে স্বীকৃতি দুধের বদলে পিটুলি-গোলার অতিরিক্ত কিছু নয়। তাছাড়া বস্ত্রের ক্ষেত্রে বয়কট ও স্বদেশীগ্রহণের সংকল্পে সর্বাধিক উপকৃত হয়েছিল বোম্বে-আমেদাবাদের মিল মালিকেরা। স্বভাবতই বাঙালি ক্ষুব্ধ হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথের ক্ষোভ ব্যক্ত হয় মাঘ-সংখ্যা ভাণ্ডার-এর প্রশ্নে : 'কন্‌গ্রেসের প্রকৃতি ও পদ্ধতি সম্বন্ধে কোনো পরিবর্ত্তনের প্রয়োজন হইয়াছে কিনা—যদি হইয়া থাকে তবে কিরূপে তাহা সাধন করিতে হইবে।' সুরাটের যজ্ঞভঙ্গের সূচনা হয়েছিল এই ক্ষোভ থেকেই।

1905-এর শেষে ব্রিটিশ মন্ত্রিসভার পরিবর্তন হয়, কনজারবেটিভ দলের স্থানে লিবারেল দল পার্লামেন্টে সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে। প্রসিদ্ধ লেখক ও উদারনৈতিক নেতা জন মর্লি ভারতসচিব হওয়ায় বঙ্গবাসীর মনে বঙ্গভঙ্গ রদ সম্পর্কে আশার সঞ্চার হয়। কিন্তু এর ফলে সর্বভারতীয় স্তরে বয়কট ও স্বদেশী আন্দোলন তার গুরুত্ব হারায়। অনুকূল শাসন-সংস্কারের লোভে কংগ্রেসের মডারেট নেতৃবৃন্দ শাসকবর্গের বিরক্তি উৎপাদন করতে পারে এমন সমস্ত আন্দোলনেরই বিরোধিতা করতে থাকেন। কিন্তু ভারত-বিষয়ক নীতিতে লিবারেল ও কনজারবেটিভ দলের মধ্যে কোনো পার্থক্যই ছিল না—ব্রিটিশ 'প্রেস্টিজ'ই তাঁদের কাছে বড়ো ছিল, ফলে মর্লি বঙ্গভঙ্গকে 'settled fact' বলে ঘোষণা করেন। কার্জনের পরিবর্তে মিন্টোকে ভাইসরয় রূপে পেয়েও বাঙালি আশান্বিত হয়েছিল, কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে মিন্টোর আমলেই দমননীতি নানাভাবে আত্মপ্রকাশ করতে আরম্ভ করে। এই চতুর লোকটি সংস্কারের টোপ সামনে ঝুলিয়ে রেখে একদিকে মডারেট ও ন্যাশনালিস্ট দলের এবং অন্যদিকে হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে বিরোধকে তীব্রতর করে তোলেন।

প্রাসঙ্গিক তথ্য : ৪

ব্রহ্মচর্যাশ্রমের জন্মলগ্ন থেকে অর্থাভাব তার নিত্যসঙ্গী। মহর্ষির জীবৎকালে তাঁর অকুণ্ঠ অর্থসাহায্যে বিদ্যালয়ের ঘরবাড়ি প্রস্তুত হয়েছে, তা আমরা পূর্বেই দেখেছি। কিন্তু তাঁর তিরোধানের পর সেই অর্থাগমের পথ রুদ্ধ হয়ে যায়। বর্তমান বৎসরের প্রথমেই রবীন্দ্রনাথ অর্থাভাব মেটানোর জন্য তাঁর পুরীর বাড়ি ও জমি বিক্রয় করে দেন; ৫ বৈশাখ [মঙ্গল 18 Apr] তাঁর ক্যাশবহির হিসাব : 'মা° কুমার নগেন্দ্রনাথ মল্লিক দং

পুরীর সমুদ্র তীরবর্ত্তির জমী ও বাঙ্গলা বিক্রয়ের মূল্য পাওয়া যায় নোট তিন কেতা গুঃ চরণদাস চট্টোপাধ্যায় ৩০০০্', ১২ বৈশাখ [মঙ্গল 25 Apr] এই টাকা খরচের হিসাবটি পাই : 'ব° শ্রীযুক্ত খোদ বাবু মহাশয়ের নিকট দং শান্তিনিকেতনের বাটী তৈয়ারী দেনা শোধ দিবার জন্য পাঠান যায়...৩০০০্'। এই 'বাটী' রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব বসবাসের জন্য তৈরি 'দেহলি' বাড়ি, কিন্তু কয়েক বৎসর পরেই বাড়িটি বিদ্যালয়ের প্রয়োজনে ব্যবহৃত হয়েছে।

ত্রিপুরার মহারাজা রাধাকিশোর মাণিক্য নিয়মিতভাবেই প্রতি মাসে ১০০্ টাকা করে বিদ্যালয়কে সাহায্য করে আসছিলেন। ১৮ অগ্র° [সোম 4 Dec] অন্য এক রাজার সাহায্যের হিসাব রয়েছে :'মা° কুচবিহারের মহারাজ দং বিদ্যালয়ের সাহার্য্য..১০০্'। ১৬ কার্তিক [বৃহ 2 Nov] 'মা° বাবু তারকনাথ পালিত দং যতীন্দ্রনাথ পালিতের বেতন ভরতি হওয়ার বাবদ পাওয়া যায় ১০০্'—স্কুলে ভর্তি হওয়ার খরচ অনেক কম ছিল, সুতরাং ভর্তি উপলক্ষে অর্থসাহায্যের কথাই ভাবতে হয়।

গত বছর ১৮ ফাল্গুন [বৃহ 2 Mar 1905] জাপানী সূত্রধর কুসুমতো সান্ বিদ্যালয়ের কাছে যোগ দেন। বর্তমান বৎসরে জে স্যানো বা সানো সান্ নামে আর-একজন জাপানী বিদ্যালয়ে আসেন জুজুৎসু-শিক্ষক রূপে সম্ভবত Nov 1905-এ, তাঁর নভেম্বর ও ডিসেম্বর মাসের বেতন ২০০্ মিটিয়ে দেওয়া হয়েছে ১৮ অগ্র° [সোম 4 Dec 1905] তারিখে। রথীন্দ্রনাথ লিখেছেন : 'ওকাকুরার সাহায্যে বাবা জাপান থেকে আনালেন একজন জুজুৎসু-শিক্ষক।...তাঁর কাছে সন্তোষচন্দ্র ও আমি জুজুৎসু শিখতে লাগলুম। সানো সান খুব যত্ন করে আমাদের শেখালেন। আমরাও আগ্রহের সঙ্গে তাঁর শাগরেদি করলুম।'[১১৪] এর কয়েকমাস পরে জাপানে গিয়ে তিনি ৫ জ্যৈষ্ঠ ১৩১৩ [শনি 19 May] টোকিয়ো থেকে শমীন্দ্রনাথকে যে চিঠি লিখেছেন, তার মধ্যে এ-বিষয়ে আরও খবর আছে : 'তোমাদের জাপানী পড়া এগোচ্ছে শুনে খুশি হলুম।...এখন কি একটু ২ কথা বলতে পার? শুধু পড়লে হবে না, নিজেদের মধ্যে ও সানো সানের সঙ্গে খুব কথা বলতে চেষ্টা করবে। তোমরা এখন কি রকম জুজুৎসু শিখলে? আজকাল কি রোজ জুজুৎসু হয়?'[১১৫] রবীন্দ্রনাথ চেয়েছিলেন ব্রহ্মচর্যাশ্রমের ছাত্ররা দেহে ও মনে শক্তিশালী হয়ে উঠুক, তাই নিদারুণ অর্থকৃচ্ছ্রতার মধ্যেও এত অধিক বেতনে জুজুৎসু-শিক্ষক নিয়োগকে তিনি বিলাসিতা মনে করেননি।

বিদ্যালয়ে সন্ধ্যায় ছাত্রদের জন্য বিনোদন পর্বের আয়োজন ছিল। রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনে থাকলে তিনি এই পর্বে বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করতেন। ১৯ জ্যৈষ্ঠ [শুক্র 2 Jun] তিনি মনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়কে লিখেছেন : 'আজকাল আমাদের এখানে আলোচনা বেশ জমাট রকম হইয়া থাকে। আমি অধ্যাপকদের লইয়া প্রায় মাসখানেক প্রতিদিন সন্ধ্যার সময় কিছু না কিছু বলা কহা করিয়াছি তাহার পরে বড়দাদাও কিছুদিন সন্ধ্যার আসর জমাইয়াছিলেন—আজকাল আবার আমার হাতে পড়িবার উপক্রম করিয়াছে।'[১১৬] আমরা আগেই বলেছি, তিনি ২ বৈশাখ 'মেয়েদের অধিকার' সম্পর্কে যা বলেন রথীন্দ্রনাথ তার অনুলেখন করেন। আজিতকুমার চক্রবর্তী লিখেছেন : '[রবীন্দ্রনাথ] অধ্যাপকগণকে লইয়া একটি সায়ংসভা গঠিত করিলেন, তাহাতে নানা বিষয়ে আলোচনা এবং পাঠ হইত। সাহিত্য সমাজ রাষ্ট্রধর্ম সকল বিষয়ে পাঠ এবং কথাবার্তা হইত, তাহার কিছু কিছু রিপোর্ট আমাদের পরলোকগত বন্ধু সত্যেন্দ্রবাবু [সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত] রাখিয়াছিলেন। হয়তো কোথাও-না-কোথাও সে খাতাগুলি এখনও আছে।'[১১৭] এই খাতাগুলির এখনও সন্ধান পাওয়া যায়নি।

বঙ্গভঙ্গের আন্দোলন ব্রহ্মচর্যাশ্রমকেও চঞ্চল করেছিল, কিন্তু রবীন্দ্রনাথ তাকে প্রশ্রয় দেননি। অজিতকুমার লিখেছেন : তখন যে তাহা অনেক সময়েই ভালো লাগে নাই এবং অনেক সময় বিরোধ জাগাইয়াছিল তাহা স্বীকার করিতেই হইবে।...তখন মনে করিতাম যে, সমস্ত দেশকে সমাজকে ছাড়িয়া যে ধর্মের সাধনা সে অত্যন্ত অ্যাব্‌স্ট্রাক্ট অর্থাৎ বস্তুবিচ্ছিন্ন সাধনা।...অনেকে বলিয়াছিলেন যে, এরকম ধর্ম শৌখিন ধর্ম, পাছে কোথাও সংসারের আঁচ লাগে এই ভয়ে ভয়ে সে পলাইয়া পলাইয়া বেড়ায়।'[১১৮] কিন্তু রবীন্দ্রনাথ সাময়িক উত্তেজনার বশবর্তী হয়ে বিরোধকে জাগিয়ে তুলে মনুষ্যত্বের সাধনায় বিঘ্ন আনতে চাননি। কিন্তু তারও যে প্রতিক্রিয়া হয়েছিল সে-কথাও লিখেছেন অজিতকুমার : 'উত্তেজনা হইতে বাধা পাইয়া ডিসিপ্লিন জিনিসটাকে মঙ্গলচর্যার স্থানে রাজা বলিয়া আমাদিগকে অভিষিক্ত করিতে হইল।'[১১৯]

উল্লেখপঞ্জী

১ দ্র সুনীল দাস-সংকলিত ক্ষিতিমোহন সেনের 'দিনলিপি' : দেশ, সাহিত্য ১৩৯৪।১৪১-৪২

২ দেশ, সাহিত্য ১৩৮৫।১০, পত্র ৫

৩ ঐ। ১০, পত্র ৬

৪ রবীন্দ্রভবনে রক্ষিত মূল পত্র

৫ চিঠিপত্র ১০।৩০, পত্র ৩১

৬ বি. ভা. প., চৈত্র ১৩৪৯।৫৭৪

৭ ঐ। ৫৭৫

৮ স্মৃতি। ৫২

৯ দ্বিজেন্দ্রলাল [১৩২৪]। ৪৭৬-৭৮

১০ 'গ্রন্থপরিচয়', স্বদেশী সমাজ [১৩৯৩]। ১২৩

১১ দ্র সাহিত্য, ফাল্গুন ১৩০৮। ৭০৪

১২ স্মৃতি। ৫৩

১৩ পত্রাবলী। ১৬৭, পত্র ৬০

১৪ রবীন্দ্রনাথ ও ত্রিপুরা। ৩১১

১৫ দ্র বিকচ চৌধুরী : 'রবীন্দ্র সান্নিধ্যে ত্রিপুরা' [1987]। ৪৩

১৬ রবীন্দ্রনাথ ও ত্রিপুরা। ৩১০-১১

১৭ দেশীয় রাজ্য [১৩৩৪]। ২২৪-২৫

১৮ রবীন্দ্রনাথ ও ত্রিপুরা। ৪৪-সংখ্যক চিত্র

১৯ ঐ। ৩১২

২০ ঐ। ৩১৩

২১ বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের কার্য্য-বিবরণী [১৩১২]। ৭-৮

২২ চিঠিপত্র ১০।৩৫-৩৬, পত্র ৩৪

২৩ রবীন্দ্রনাথ ও ত্রিপুরা। ৩১৪

২৪ দ্র *The Amrita Bazar Patrika*, 7 Jul 1905

২৫ দ্র 'রবীন্দ্রপ্রতিভার নেপথ্যভূমি', রবীন্দ্রপ্রতিভা [১৩৬৮]। ২৭৬-৭৭

২৬ দ্র *The Bengalee* 15 Aug 1905

২৭ স্মৃতি। ২৭

২৮ 'রবীন্দ্রনাথের স্বদেশী সংগীত সংগীত নয়—সঞ্জীবনী' : গল্পভারতী, বৈশাখ ১৩৭৮।১০২৪

২৯ দ্র *The Amrita Bazar Patrika*, 4 Sep 1905

৩০ দ্র গীতবিতান : কালানুক্রমিক সূচী ১।১২৯

৩১ *The Amrita Bazar Patrika*, 27 Sep 1905

৩২ *The Bengalee*, 28 Sep 1905

৩৩ জীবনের ঝরাপাতা। ১৮৭

৩৪ রবীন্দ্রভবনে রক্ষিত মূল পত্র

৩৫ স্মৃতি। ৫০

৩৬ *The Bengalee*, 1 Nov 1906

৩৬ক পিতৃস্মৃতি। ৯৯

৩৭ দ্র *The Bengalee*, 11 Oct 1905

৩৮ দ্র ঐ, 14 Oct

৩৯ পত্রাবলী। ১৬৮, পত্র ৬১

৪০ দ্র দৈনিক বসুমতী, শারদীয়া ১৩৬৪।৪০

৪১ দ্র প্রবাসী, ফাল্গুন ১৩৫২।৩৯৩

৪২ রবীন্দ্রভবনে রক্ষিত মূল পত্র

৪৩ বাংলা দেশের ইতিহাস ৪ [১৩৮২]। ৩৫

৪৪ *The Amrita Bazar Patrika*, 13 Oct 1905

৪৫ দ্র ঐ, 12 Oct 1905

৪৬ *The Bengalee*, 25 Oct 1905

৪৭ দ্র ঐ, 27 Oct 1905

৪৮ দ্র শিক্ষার আন্দোলন। ৪-৫; শিক্ষা [গ্র.প.] ১২।৬২৬-২৭

৪৯. *The Amrita Bazar Patrika*, 3 Nov 1905

৫০ দ্র শিক্ষার আন্দোলন। ১০-১৩; শিক্ষা [গ্র. প.] ১২।৬২৭-২৯

৫১ কথাসাহিত্য, বৈশাখ ১৩৬৮।৭৭৭-৭৮

৫২ দ্র *The Bengalee*, 5 Nov 1905

৫৩ দ্র ঐ, 1 Nov 1905

৫৪ রবীন্দ্রনাথ ও ত্রিপুরা। ১৪৩

৫৫ দ্র ঐ। ৭১-৭২

৫৬ দ্র শিক্ষার আন্দোলন। ৬-১০

৫৭ হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ : 'কংগ্রেস' [১৩২৭]। ৯৭-৯৮

৫৮ দ্র. *The Bengalee*, 9 Nov 1905

৫৯ শিক্ষার আন্দোলন। ১৬

৬০ কংগ্রেস। ৯৮

৬১ শিক্ষার আন্দোলন। ১৮

৬২ দ্র *The Amrita Bazar Patrika*, 17 Nov 1905

৬৩ শিক্ষার আন্দোলন। ২২-২৬

৬৪ কংগ্রেস। ১০০

৬৫ শিক্ষার আন্দোলন। ঢ

৬৬ ঐ। ২৭

৬৭ দ্র *The Amrita Bazar Patrika*, 18 Nov 1905

৬৮ দ্র *The National Council of Education, Bengal. Calendar 1906-1908* [1908], p. 1

৬৯ 'শিক্ষার আন্দোলনের ভূমিকা' শিক্ষা ১২।৫২৭

৭০ স্মৃতি। ৩৩

৭১ দ্র শিক্ষার আন্দোলন। ৩২

৭২ দেশ, সাহিত্য ১৩৮৫।১১, পত্র ৭

৭৩ রবীন্দ্রনাথ : জীবন ও সাহিত্য [সুবর্ণরেখা সং ১৩৯৫]। ৩০

৭৪ রবীন্দ্র-সঙ্গ-প্রসঙ্গ। ১৯

৭৫ রবীন্দ্রভবনে রক্ষিত মূল পত্র

৭৬ কথাসাহিত্য, বৈশাখ ১৩৬৮।৭৭৮

৭৭ দ্র *The Amrita Bazar Patrika*, 25 Dec 1905

৭৮ কংগ্রেস। ১০৭

৭৯ ভাণ্ডার, মাঘ। ৩৫০

৮০ রবীন্দ্রসংগীত [১৩৭৬]। ১৭২

৮১ রবীন্দ্রজীবনী ২।১৮২, পাদটীকা ১

৮২ তত্ত্ব°, ফাল্গুন। ১৬৫-৬৬

৮৩ কথাসাহিত্য, বৈশাখ ১৩৬৮।৭৭৯

৮৪ রবীন্দ্রভবনে রক্ষিত মূল পত্র

৮৫ ঐ

৮৬ দ্র *The Bengalee* 12 Dec 1905

৮৭ ভাণ্ডার, ফাল্গুন। ৩৪৩

৮৮ দ্র *The Bengalee*, 7 Feb 1906

৮৯ সিদ্ধার্থ ঘোষ, 'যন্ত্ররসিক এইচ বোস' : এক্ষণ, শারদীয় ১৩৯০।১১৭-১৮

৯০ 'Abala Bose Her Life and Times': *The Modern Review*, June, p. 448

৯১ 'রবীন্দ্রসঙ্গীত-স্মৃতিকথা' : এক দুই তিন [১৩৬৫]। ৮-৯

৯২ *The Dawn & Dawn Society's Magazine*, Mar 1906; অধ্যাপক হরিদাস ও উমা মুখোপাধ্যায়-প্রণীত 'স্বদেশী আন্দোলন ও বাংলার নবযুগ [1961]। ৭৮-৭৯-তে উদ্ধৃত।

৯৩ রবীন্দ্রভবনে রক্ষিত মূল পত্র

৯৩ক সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর শতবার্ষিক সংকলন। ১২৫-২৭

৯৪ রবীন্দ্রভবনে রক্ষিত মূল পত্র

৯৫ ঐ

৯৬ দ্র রবীন্দ্রজীবনী ২।১৮৩

৯৭ পিতৃস্মৃতি। ১০৮

৯৮ বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের কার্য্য-বিবরণী। দ্বাদশ বর্ষ। ৫৭-৫৮

৯৯ দ্বিজেন্দ্রলাল [২য় সং]। ৪৪৯

১০০ রবীন্দ্রভবনে রক্ষিত মূল পত্র

১০১ বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের কার্য্য-বিবরণী। দ্বাদশ বর্ষ। ৫৯

১০২ রবীন্দ্রনাথ ও ত্রিপুরা, চিত্র ৫১

১০৩ স্মৃতি। ৫১-৫২

১০৪ রবীন্দ্রভবনে রক্ষিত মূল পত্র

১০৪ক সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর শতবার্ষিক সংকলন। ১৪

১০৫ জীবনতারা হালদার : অনুশীলন সমিতির ইতিহাস [১৩৮৩]। ৩২

১০৬ 'রবীন্দ্রজীবনী' ২।১৮৩

১০৭ তত্ত্ব°, জ্যৈষ্ঠ। ৬১

১০৮ *The Bengalee*, 22 Apr 1905

১০৯ দ্র ঐ, 20 Aug 1905

১১০ *The Swadeshi Movement in Bengal 1903-1908*, p. 67

১১১ দ্র *The Amrita Bazar Patrika*, 6 Nov 1905

১১২ দ্র *The Bengalee*, 26 Nov 1905

১১৩ দ্র ঐ, 23 Nov 1905

১১৪ পিতৃস্মৃতি। ৯৭

১১৫ অনাথনাথ দাস-সম্পাদিত রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর : জন্মশতবর্ষপূর্তি-শ্রদ্ধার্ঘ্য [1988]। ৬

১১৬ স্মৃতি। ৫২

১১৭ ব্রহ্মবিদ্যালয়। ২৯

১১৮ ঐ। ৩৩-৩৪

১১৯ ঐ। ৩৭-৩৮

---

* গায়ত্রী মজুমদার, 'রবীন্দ্রনাথ ও দ্বিজেন্দ্রলাল' [১৩৮৬]। ৩৯-৪৪; রবীন্দ্রভবনে রক্ষিত মূল পত্র অবলম্বনে পাঠপ্রমাদ সংশোধিত।

* রবীন্দ্রনাথ ও ত্রিপুরা। ৩১৭; এই গ্রন্থে 'সাধারণ সৌজন্যে চিঠিতে উল্লিখিত রাজপুরুষ বিশেষের নাম' অনুল্লেখিত ছিল—ঐতিহাসিক সত্যতা রক্ষার জন্য বিকচ চৌধুরী 'রবীন্দ্র সান্নিধ্যে ত্রিপুরা' গ্রন্থে নামটি উল্লেখ করে আমাদের ধন্যবাদভাজন হয়েছেন।

* এই পত্রিকাটির প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের প্রবীণ কর্মী বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায়, এর জন্য তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ।

* শিক্ষার আন্দোলন। ঙ-ছ; রবীন্দ্রনাথ মৌখিক বক্তৃতা করেন, তার বিবরণ সংকলন করেন সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত। কার্লাইল সার্কুলার প্রকাশিত হওয়ার পর ২৫ অগ্র° পর্যন্ত তার বিরুদ্ধে যে-সব সভা হয় তার ধারাবাহিক বিবরণ কিছু-কিছু বক্তৃতা-সহ রবীন্দ্রনাথের ভূমিকা সংবলিত হয়ে উক্ত নামীয় গ্রন্থে ২৬ অগ্র° [মঙ্গল 12 Dec] প্রকাশিত হয়। দ্র শিক্ষা [গ্র.প.]। ৬২৩-২৬

* দ্র 'ত্রিপুরায় রবীন্দ্র-স্মৃতি', রবীন্দ্রনাথ ও ত্রিপুরা। ৪৬-৪৭; বিকচ চৌধুরী তাঁর 'রবীন্দ্র সান্নিধ্যে ত্রিপুরা' গ্রন্থে [পৃ ৪৮] তারিখটি ২৭ কার্তিক [সোম 13 Nov] বলে জানিয়েছেন।

ষ ট্ চ ত্বা রিং শ অ ধ্যা য়

১৩১৩ [1906-07] ১৮২৮ শক ॥ রবীন্দ্রজীবনের ষট্‌চত্বারিংশ বৎসর

নববর্ষের প্রথম দিনটিতে বরিশাল সাহিত্যসম্মেলনের নির্বাচিত সভাপতি রবীন্দ্রনাথ বরিশালের দিকে চলেছেন। এইদিন [১ বৈশাখ শনি 14 Apr] ব্যারিস্টার আবদুল রসুলের সভাপতিত্বে সেখানে বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মেলন শুরু হওয়ার কথা। বরিশাল তখন নবগঠিত পূর্ববাংলা ও আসাম প্রদেশের অন্তর্ভুক্ত, লেফটেনান্ট গবর্নর ব্যামফিল্ড ফুলারের স্বেচ্ছাচারে নিপীড়িত। অনেকটা তারই বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানানো এবং উভয় বাংলা ও হিন্দু-মুসলমানের সংহতি ঘোষণার জন্য আবদুল রসুলকে সভাপতি করে বরিশালে প্রাদেশিক সম্মেলন আহ্বান করা হয়। কিন্তু পুলিশী নিপীড়নে বহুবিধ বিশৃঙ্খলার মধ্যে দেড়দিন অধিবেশন চলার পর সম্মেলনের অকালসমাপ্তি ঘোষিত হয়।*

রবীন্দ্রনাথ ২ বৈশাখ [রবি 15 Apr] দুপুরে জলপথে বরিশালে উপস্থিত হন। কিন্তু তিনি শহরে পদার্পণ না করে নদীবক্ষে তাঁর বাসের জন্য নির্দিষ্ট বজরাতেই অবস্থান করেন। সাহিত্যসম্মেলন শুরু হওয়ার কথা পরদিন ৩ বৈশাখে। কিন্তু প্রাদেশিক সম্মেলনের অকাল-সমাপ্তির পর সাহিত্য সম্মেলনের ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত হয়ে পড়ে। প্রধান উদ্যোক্তা দেবকুমার রায়চৌধুরী লিখেছেন :

> সেদিন সন্ধ্যার পরে পুনরায় সাহিত্য-সম্মিলনের নির্ব্বাচিত সভাপতি রবীন্দ্রনাথের বসতি-বজ্‌রায়* [* রবীন্দ্রনাথের থাকিবার জন্য নদী-বক্ষে একটি 'বোট' বা বজরা নির্দ্দিষ্ট করা গিয়াছিল।...] কর্ত্তব্য-নির্ণয়ার্থ সমাগত সাহিত্যিকগণের আর এক বৈঠক হইল। বহুক্ষণ ব্যাপিয়া বহুবিধ বাদানুবাদের পর সেখানেও স্থির হইল—বর্ত্তমান এই অশান্তি, উদ্বেগ ও বিরক্তির অবস্থায় বরিশালে আর কোনরূপ অধিবেশন হওয়া একটুও বাঞ্ছনীয় নহে। বিশেষতঃ, যে ব্যক্তি 'অকারণ' সমগ্র বঙ্গদেশের শীর্ষস্থানীয় নেতৃবর্গ ও প্রতিনিধিগণকে পুনঃ-পুনঃ এভাবে কষ্ট ও লাঞ্ছনা দিতেছেন সেই 'অবিবেচক' এমার্সনের কাছে অনুগ্রহ-প্রার্থীরূপে সাহিত্য-সম্মিলনের জন্য আবার করুণা ভিক্ষা করিতে যাওয়া, এক্ষেত্রে কোনক্রমেই পৌরুষ ও আত্মমর্য্যাদার অনুকূল নহে। তদ্ভিন্ন, এতটা অবনতি স্বীকার করিয়া, এই মর্ম্মে অনুমতি-ভিক্ষা করিলেও, যেরূপ অবস্থা তাহাতে তিনি যে এ-বিষয়ে সহজে সম্মত হইবেন তৎপক্ষেও যখন কোন নিশ্চয়তা নাই (কারণ, সাহিত্য-সম্মিলনের সহিত রাজনীতির কোন সম্পর্ক নাই তাহা তিনি পূর্ব্ব হইতেই জ্ঞাত ছিলেন), তখন অযথা যাচিয়া আর-একবার অপমানিত হইতে না যাওয়াই সর্ব্বথা শোভন ও সুপরামর্শ। পরদিন দিনমণি রবির আবির্ভাবের পূর্ব্বে, অতি প্রত্যুষেই, ব্যর্থকাম হইয়া সাহিত্যাকাশের সেই সমুজ্জ্বল সূর্য্য কবীন্দ্র রবীন্দ্র ও অপরাপর মনস্বিবৃন্দ একে-একে আমাদিগকে কাঁদাইয়া চলিয়া গেলেন।[১]

The Bengalee 17 Apr [মঙ্গল ৪ বৈশাখ] 16 Apr-এর টেলিগ্রামের খবর উদ্ধৃত করে লেখে : 'Babu Rabindra Nath Tagore reached here last noon and left this morning. The Literary Conference has been given up.'

রবীন্দ্রনাথ ৪ বৈশাখেই শান্তিনিকেতনে চলে যান; এইদিন তার ক্যাশবহিতে লেখা হয় : 'শ্রীযুক্ত রবীন্দ্র বাবু মহাশয়ের বোলপুর শুভাগমনের ব্যায় রেল ভাড়া প্রভৃতির জন্য ১৫্'।

ইতিমধ্যে বরিশালের ব্যাপার নিয়ে কলকাতায় ও অন্যত্র তুমুল চাঞ্চল্য দেখা দেয়। প্রতিবাদ-সভা ও মিছিলে কলকাতা মুখর হয়ে ওঠে। কিন্তু বাঙালির স্বভাববৈশিষ্ট্য অনুসারে পারস্পরিক দোষারোপ চরিত্রহনন প্রভৃতির চেষ্টাও শুরু হয়ে গিয়েছিল, তার সুন্দর উদাহরণ মেলে কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদের সহযোগী যোগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়-সংকলিত 'লাঞ্ছিতের সম্মান।/(বরিশালকাণ্ডের বিবৃতি-সমেত)/বহু সংখ্যক স্বদেশী কার্য্যকরক,/নিগৃহীত ও আহত ব্যক্তির/প্রতিকৃতি সম্বলিত' পুস্তিকায় : 'বাবু বিপিনচন্দ্র পাল/গোলযোগের প্রারম্ভকালে লোন আফিসের অলিন্দোপরি দ্রুত-পদবিক্ষেপে গমন করিলেন, আর/ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়/"আত্মশক্তির" উপর নির্ভর করিয়া "সমাজের অন্তর্নিহিত শক্তির বিকাশের" আশায় শনৈঃ শনৈঃ প্রাচীর উল্লঙ্ঘন পূর্ব্বক "ফিরিঙ্গীর ভিক্ষাপুত্রদের" সংসর্গ ত্যাগ করিলেন।'[২]

রবীন্দ্রনাথ এই বাঙালিকে ভালো করেই চিনতেন, তাই ঘূর্ণিবাত্যার কেন্দ্রস্থল কলকাতা থেকে সরে এসে 'বোলপুরে গিয়া একেবারে নিশ্চেষ্টতার মধ্যে ডুব মারিয়া' বসবার ইচ্ছাকে পূর্ণ করেছেন। এই অবসরে তিনি মাত্র চার দিনের মধ্যে ছ'টি কবিতা লিখলেন, কিন্তু প্রায় কোনোটিতেই সমকালীন ঘটনাজনিত মনঃক্ষোভের চিহ্নমাত্র নেই। তাঁর বহির্জীবন ও অন্তর্জীবন কতটা স্বতন্ত্র পথে পরিভ্রমণ করে সমসাময়িক ঘটনা ও কবিতাগুলি পাশাপাশি ধরে দেখলে তা স্পষ্ট বোঝা যায়। কবিতাগুলি হল :

৭ বৈশাখ [শুক্র 20 Apr] 'সমুদ্রে' ['সকাল বেলায় ঘাটে যেদিন'] 'পথিক' দ্র খেয়া ১০।১৫৪-৫৫

৭ বৈশাখ [শুক্র 20 Apr] 'বৈশাখে' ['তপ্ত হাওয়া দিয়েছে আজ'] দ্র খেয়া ১০।১৪৮-৪৯

'সমুদ্রে' কবিতাটি গ্রন্থে পরে বিন্যস্ত হলেও পাণ্ডুলিপির সাক্ষ্যে জানা যায়, এটি 'বৈশাখে' কবিতার আগে রচিত।

৮ বৈশাখ [শনি 21 Apr] 'দিনশেষ' ['ভাঙা অতিথশালা'] দ্র খেয়া ১০।১৫৬-৫৭

৮ বৈশাখ [শনি 21 Apr] 'পথিক' ['ওগো পথিক, যাবে তুমি'] দ্র খেয়া ১০।১৩৯-৪০

৯ বৈশাখ [রবি 22 Apr] 'বন্দী' ['বন্দী, তোরে কে বেঁধেছে'] দ্র ভাণ্ডার, জ্যৈষ্ঠ। ৬৭-৬৮; খেয়া ১০। ১৩৮-৩৯

১০ বৈশাখ [সোম 23 Apr] 'সমাপ্তি' ['বন্ধ হয়ে এল স্রোতের ধারা'] দ্র বঙ্গদর্শন, বৈশাখ। ৪৮; খেয়া ১০। ১৫৭-৫৮

৯ বৈশাখ রবীন্দ্রনাথ মহিমচন্দ্র দেববর্মা ও দীনেশচন্দ্র সেনকে দুটি চিঠি লেখেন। কুমিল্লা ছিল তখন দেশীয় রাজ্য ত্রিপুরার ব্রিটিশ প্রবেশদ্বার, চাঁদপুর হয়ে ত্রিপুরা যাওয়ার প্রধান রেলওয়ে ষ্টেশনও বটে! রবীন্দ্রনাথ আগরতলা থেকে বরিশালের পথে কুমিল্লা আসেন, ব্রজেন্দ্রকিশোর অসুস্থ শরীরেও সেই পর্যন্ত এসে তাঁকে বিদায় জানিয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথ মহিমচন্দ্রকে লেখেন : 'আশা করি রাজকার্য্যের নূতন বিধানে কোনো ব্যাঘাত ঘটে নাই। কুমিল্লায় যে অল্পকাল ছিলাম তাহার মধ্যেই অনেক জল্পনা-কল্পনা ও ষড়যন্ত্রের আভাস পাইয়াছি। মন্ত্রীকে অকৃত্রিম বন্ধুর ন্যায় সাহায্য করিয়ো তোমার কাছে আমার এই প্রার্থনা।'[৩] এই পত্রেই তিনি লিখেছেন : 'আমি অবশেষে বোলপুরে আসিয়া পৌঁছিয়াছি। এখন কিছুকাল আর নড়িবার ইচ্ছা নাই।' দীনেশচন্দ্রকে তিনি এই কথাই লিখেছেন একটু বিস্তৃতভাবে :

আর কাজের কথা তুলিবেন না—আমার এখন ছুটি। প্রবন্ধ লিখিবার কথা আমার মনেও নাই—দেশ যে আমার কোনো কথার জন্য অপেক্ষা করিয়া বসিয়া আছে এমন আমার ধারণা হইতেছে না। এখানে খোলা মাঠের বিপুল রৌদ্রের মধ্যে মনটাকে একেবারে মুক্তি দিয়া চুপ করিয়া তপ্ত হাওয়ায় পড়িয়া আছি। কখনো বা নিতান্ত আলস্য ভরে অর্ধশয়ান অবস্থায় দুটো একটা বাজে কবিতা লিখিতেছি। সত্য কথা বলিতে কি [মহা]শয় আমি আমার অন্তরের অন্তরে জাতীয়তা স্বদেশিতা প্রভৃতি কথার [...] হইতে মুক্ত। যখনি অবকাশ পাই তখনি নিজের এই পরিচয় আমার কাছে পরিস্ফুট হইয়া উঠে। এ সম্বন্ধে আমি যাহা কিছু বলিয়াছি নিশ্চয়ই তাহা অনেক মিথ্যায় বিজড়িত—তাহার মধ্যে শেখা বুলির ভাগই বিস্তর। আত্মার স্বাধীনতা ছাড়া আর কোনো স্বাধীনতা নাই—আমরা নূতন বন্ধনকেই মুক্তি বলিয়া ভ্রম করি। আমি এ সমস্ত জঞ্জালের মধ্যে নিজেকে জড়াইয়া লক্ষ্যভ্রষ্ট হইতে চাই না—আগে বেশ একটু নিরালায় ভাল করিয়া নিজের সঙ্গে একটা বোঝাপড়া করিয়া লই—আগে নির্ম্মল অন্তঃকরণে সমস্ত জিনিসটাকে তলাইয়া দেখি—তার পরে যদি কথা বলার আবশ্যক থাকে ত কথা বলিব। আমি এখন লোকলোচনের অন্তরালে থাকিতে ইচ্ছা করি—আমার আর যশোমানে কাজ নাই। ভিড়ের মধ্যেই যদি দিন কাটাই তবে ঘরের কাজ কখন করিব? অতএব এবারে আমি সরিয়া পড়িলাম।[8]

সরে পড়তে তিনি পারেননি—বরিশালের অভিজ্ঞতার পর তাঁর বলবার মতো কথাও জমেছিল, তাই কিছুদিনের মধ্যেই তিনি জনতার আহ্বানে আবার কলকাতায় উপস্থিত হলেন। বেঙ্গলী পত্রিকার 26 Apr [বৃহ ১৩ বৈশাখ]-সংখ্যায় সভাটির বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয় '...to protest against the proceedings of the Barisal atrocities comes off on Saturday afternoon next at 5-30 P.M. at the residence of Rai Pashupati Nath Bose at Bagbazar.' রবীন্দ্রনাথ এই সভায় 'দেশনায়ক' [দ্র ভাণ্ডার, বিশেষ সংখ্যা। ৪৩-৬১; বঙ্গদর্শন, জ্যৈষ্ঠ। ৪৯-৬৪; সমূহ ১০।৪৮৭-৯৬] প্রবন্ধটি পাঠ করলেন। 'সমূহ' গ্রন্থে প্রবন্ধটির কিছু অংশ বর্জিত হয়, সেই অংশ 'গ্রন্থপরিচয়'-এ [পৃ ৬৫৩-৬১] সংকলিত হয়েছে। এটি ১৬ পৃষ্ঠার স্বতন্ত্র পুস্তিকাকারেও প্রকাশিত হয় 18 May [শুক্র ৪ জ্যৈষ্ঠ] তারিখে; বেঙ্গল লাইব্রেরির ক্যাটালগ থেকে পুস্তিকার বিবরণটি উদ্ধৃত করছি :

Tagore (Ravindra Náth). দেশনায়ক। (Desanáyak. Leaders of the Country.) pp 16. The Majumdár Library. 20, Cornwallis Street, Calcutta. 18-5-06. RI. 8vo. 1st. As. 2./Hari Charan Mánná, 20, Cornwallis Street, Calcutta./1000.

বরিশালের ঘটনায় বাঙালি বড়ো একটা আঘাত পেয়েছে সন্দেহ নেই, কিন্তু সেখানে ছাত্র যুবক ও নেতারা পুলিশী উৎপাতের মধ্যেও যে স্থৈর্য দেখিয়েছিলেন, তা থেকেই রবীন্দ্রনাথের মনে হয়েছে 'এবারে কর্তৃপুরুষের সহিত সংঘাতে বাঙালি জয়ী হইয়াছে।' বিপদের মুখে ধীরতা অবলম্বনের যে পরামর্শ তিনি বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সূচনা থেকেই দিয়ে আসছিলেন, তিনি বললেন, বরিশালের ঘটনায় তার অনুসরণের দৃষ্টান্ত তাঁকে বোলপুরের নিশ্চেষ্টতা থেকে সভাস্থলে উপস্থিত করেছে। 'দেশের হিতসাধন একটা বৃহৎ মঙ্গলের ব্যাপার, নিজের প্রবৃত্তির উপস্থিত চরিতার্থসাধন তাহার কাছে নিতান্ত তুচ্ছ। যদি এই বৃহৎ লক্ষ্যটাকে আমাদের হৃদয়ের সম্মুখে যথার্থভাবে ধরিয়া রাখিতে পারি, তবে ক্ষণিক উত্তেজনা, ক্ষুদ্র অন্তর্দাহ আমাদিগকে পথভ্রষ্ট করিতে পারে না' এ কথা পুনরায় স্মরণ করিয়ে দিয়ে তিনি বললেন, দেশে সম্প্রতি যে আন্দোলন-আলোচনার ঢেউ উঠেছে তার অনেকটাই কলহমাত্র—কিন্তু 'কলহ অক্ষমের উত্তেজনাপ্রকাশ, তাহা অকর্মণ্যের একপ্রকার আত্মবিনোদন'। এই বক্তব্যের সূত্র ধরে তিনি বললেন : 'আপনাদেরকাছে আমি স্পষ্টই স্বীকার করিতেছি, বাঙালির মুখে "বয়কট" শব্দের আস্ফালনে আমি বারংবার মাথা হেঁট করিয়াছি। আমাদের পক্ষে এমন সংকোচজনক কথা আর নাই। বয়কট দুর্বলের প্রয়াস নহে, ইহা দুর্বলের কলহ। আমরা নিজের মঙ্গলসাধনের উপলক্ষ্যে নিজের ভালো করিলাম না, আজ পরের মন্দ করিবার উৎসাহেই নিজের ভালো করিতে বসিয়াছি, এ কথা মুখে উচ্চারণ করিবার নহে। আমি অনেক বক্তাকে উচ্চৈঃস্বরে বলিতে শুনিয়াছি—"আমরা য়ুনিভর্সিটিকে

বয়কট করিব।” কেন করিব। য়ুনিভর্সিটি যদি ভালো জিনিষ হয়, তবে তাহার সঙ্গে গায়ে পড়িয়া আড়ি করিয়া দেশের অহিত করিবার অধিকার আমাদের কাহারও নাই। যদি য়ুনিভর্সিটি অসম্পূর্ণ হয়, যদি তাহা আমাদিগকে অভীষ্টফল দান না করে, তবে তাহাকে বর্জন করাকে বয়কট করা বলে না।···দেশের যাহাতে ইষ্ট, তাহা যেমন করিয়াই হউক সংগ্রহ করিতে হইবে, সেজন্য সমস্ত সহ্য করা পৌরুষেরই লক্ষণ—তাহার পর সংগ্রহকার্য শেষ হইলে স্বাতন্ত্র্যপ্রকাশ করিবার দিন আসিতে পারে। দেশের কাজে রাগারাগিটা কখনোই লক্ষ্য হইতে পারে না। দেশের কাজের মাহাত্ম্য যদি আমরা মনের মধ্যে ধারণ করিয়া রাখিতে পারি, তবে তাহারই উদ্দেশে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উত্তেজনা আমরা উপেক্ষা করিয়া কর্তব্যপথে স্থির থাকিতে পারিব।'

বিদেশীদ্রব্যের ব্যবহার যথাসাধ্য বর্জন করে দেশীয় জিনিসের ব্যবহারবৃদ্ধি ও উৎপাদনের সুব্যবস্থার জন্য রবীন্দ্রনাথ ক্রমাগত প্রচার চালিয়ে ক্ষান্ত হননি, নিজের সীমিত সামর্থ্যে সেজন্য যথাসাধ্য পরিকাঠামো গড়ে তোলবারও চেষ্টা করেছেন। কিন্তু 'বয়কট' শব্দ উচ্চারণের মধ্যে যে স্পর্ধার প্রকাশ তাকে তিনি কখনোই প্রশ্রয় দেননি। তিনি জানতেন, 'স্বভাবের নিয়মে স্পর্ধার বিরুদ্ধে ক্রোধ উৎপন্ন হইয়া থাকে এবং সক্ষমের ক্রোধ কোনো-না-কোনো উপায়ে হিংসার আকার ধারণ করে।' কিন্তু শাসনযন্ত্রের সেই স্বাভাবিক বৈলক্ষণ্য দেখে মর্লি-মিন্টোর দোহাই পাড়া ও আদালতের শরণাপন্ন হওয়াকে স্পর্ধার দৌর্বল্য বলে তিনি মনে করেছেন। নিরস্ত্র জাতির রাজনৈতিক সংগ্রামের এইগুলিই হাতিয়ার, রবীন্দ্রনাথ সে-সম্পর্কে সচেতন ছিলেন না—এই বলে সে-কালে তো বটেই, আজকের দিনেও অনেকে তাঁর সমালোচনা করেছেন। কিন্তু তাঁরা মেরুদণ্ডহীন জাতির তুচ্ছ কলহ ও পারস্পরিক কালিমালেপনের উৎসাহী পটভূমিকাটি স্মরণে রাখেননি। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ নিজের অভিজ্ঞতাতেই স্বদেশবাসীকে জানতেন, এবং সেইজন্যই বলতে পেরেছেন : 'আমাদের সৌভাগ্যক্রমে, দেশে স্বদেশী উদ্যোগ আজ যে এমন ব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছে, বয়কট তাহার প্রাণ নহে। একটা তুচ্ছ কলহের ভাব কখনোই দেশের অন্তঃকরণকে এমন করিয়া টানিতে পারিত না।···আজ আমরা দেশের কাপড় পরিতেছি কেবল পরের উপর রাগ করিয়া, এই যদি সত্য হয়, তবে দেশের কাপড়ের এতবড়ো অবমাননা আর হইতেই পারে না। আজ আমরা স্বায়ত্তভাবে দেশের শিক্ষার উন্নতিসাধনে প্রবৃত্ত হইয়াছি, রাগারাগিই যদি তাহার ভিত্তিভূমি হয়, তবে এই বিদ্যালয়ে আমরা জাতীয় অগৌরবের স্মরণস্তম্ভ রচনা করিতেছি।'

'স্বদেশী সমাজ' প্রবন্ধ দ্বিতীয়বার পাঠের সময় রবীন্দ্রনাথ গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়কে 'সমাজপতি' হিসেবে গ্রহণ করার পরামর্শ দিয়েছিলেন। তখন স্বদেশী আন্দোলনের সূচনা হয়নি, ভিন্ন পরিস্থিতিতে বর্ণাশ্রমনির্ভর সমাজ পরিকল্পনায় তিনি সাত্ত্বিক ব্রাহ্মণ গুরুদাসকে উক্ত পদের উপযুক্ত মনে করেছিলেন। এখন ভিন্নতর পরিস্থিতিতে রাজনৈতিক নেতা সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে তিনি 'দেশনায়ক' পদে বরণ করে নেবার জন্য দেশবাসীকে আহ্বান জানালেন। দেশে চরমপন্থী রাজনীতির আবির্ভাবে মডারেট সুরেন্দ্রনাথ পূর্বমর্যাদা অনেকটা হারিয়েছেন, এ-সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ অনবহিত ছিলেন বলে মনে হয় না—কিন্তু তাঁর যুক্তি ছিল এই যে, 'দেশের সমস্ত উদ্যমকে বিক্ষেপের ব্যর্থতা হইতে একের দিকে ফিরাইয়া আনিবার একমাত্র উপায় আছে—কোনো একজনকে আমাদের অধিনায়ক বলিয়া স্বীকার করা।' ডিবেটিং সোসাইটি দ্বারা দেশের কাজ চালানোর বাল্যসংস্কার কেটে গিয়ে যখন কর্মক্ষেত্রে নামার জন্য দেশবাসী প্রস্তুত, তখন বক্তৃতাসভার সভাপতির পরিবর্তে দেশনায়কের প্রয়োজন সবচেয়ে বেশি। সেই পদে সুরেন্দ্রনাথকে তিনি যোগ্যতম ব্যক্তি বলে মনে

করেছেন। রাজতন্ত্রের স্বেচ্ছাচার তাঁর জানা ছিল, কিন্তু ডিক্টেটরশিপের লৌহশাসনের ইতিহাস তখনও দেখা দেয়নি—পরাধীন জাতির স্বায়ত্তশাসনসাধনার অধিনেতার ডিক্টেটর হবার সম্ভাবনাও অল্প ছিল। সুতরাং তৎকালীন পরিবেশে সুরেন্দ্রনাথকে দেশনায়ক পদে বরণের আহ্বানকে যাঁরা ডিক্টেটরশিপের সমর্থন বলে মনে করেছেন, তাঁরা যথার্থ পরিপ্রেক্ষিতটি বিচার করেননি। সুরেন্দ্রনাথ এতকাল পিটিশন ও প্রোটেস্ট, প্রণয় বা কলহ করবার জন্য রাজবাড়ির বাঁধারাস্তাতেই দৌড়োদৌড়ি করে অশ্রু ও ঘর্ম সেচন করে এসেছেন, কিন্তু তখন দেশের অভিপ্রায়ই অনুরূপ ছিল। কিন্তু এখন অবস্থার পরিবর্তন হয়েছে, এখন সুরেন্দ্রনাথকে নায়কপদে অভিষিক্ত করলে রবীন্দ্রনাথের বিশ্বাস, 'তিনি কেবলমাত্র শিক্ষিতসম্প্রদায়ের ইংরেজিবিদ্যার অভ্যস্ত বুলির প্রতি কর্ণপাত না করিয়া আমাদের এই পুরাতন দেশের চিরন্তন প্রকৃতির প্রতি মনোযোগ করিবেন—যে সকল পদার্থ পরদেশের সজীব কলেবরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ, যথাস্থান হইতে ভ্রষ্ট হইলে এ দেশে যাহা অসংগত আবর্জনারূপে গণ্য হইবে, অনুকরণের মোহে তাহাকে তিনি আদর করিবেন না—বিরোধমূলক যে সংগ্রামশীলতা য়ুরোপীয় সভ্যতার স্বভাবগত, যাহা কখনোই এ দেশের মৃত্তিকায় মূলবিস্তার করিয়া ফলবান হইবে না, তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া যে মঙ্গলময় মিলনপরতা, যে অবিচলিত ধর্মনিষ্ঠা ভারতবর্ষের চিরকালীন সাধনা, তাহাকেই বর্তমানকালের অবস্থান্তরের সহিত তিনি সংগত করিয়া লইবার চেষ্টা করিবেন।'

কিন্তু অত্যধিক আশাবাদে রবীন্দ্রনাথ সুরেন্দ্রনাথের অন্তর্নিহিত বাঙ্গালিত্ব, ক্ষমতাপ্রিয়তা, বিপক্ষকে পর্যুদস্ত করার জন্য হীন কূটকৌশল অবলম্বনের প্রবণতা এবং সর্বোপরি ব্রিটিশতোষণ ও রাজসমাদরের লোভের কথা বিস্মৃত হয়েছিলেন। কাজেই তাঁর আহ্বান অরণ্যে রোদনে পর্যবসিত হয়েছিল। মনে রাখা দরকার, প্রবন্ধটি তিনি 'সমূহ' [১৩১৫] গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত করলেও বয়কট ও সুরেন্দ্রনাথ-সংক্রান্ত প্রসঙ্গগুলি বর্জন করেছিলেন।

১৫ বৈশাখ 'দেশনায়ক' প্রবন্ধ পাঠের পর অন্তত দিন-দুই রবীন্দ্রনাথ কলকাতায় ছিলেন—১৭ বৈশাখ [সোম 30 Apr] তিনি সেখানেই 'প্রতীক্ষা' ['আমি এখন সময় করেছি'] কবিতাটি [দ্র খেয়া ১০|১৬৪-৬৫] লেখেন। এরপর তাঁর গতিবিধি অস্পষ্ট। আমরা আগেই বলেছি, মহর্ষির মৃত্যুর পর ক্যাশবহিতে হিসাব লেখার পদ্ধতি কিছুদিনের জন্য পরিবর্তিত হওয়ায় পূর্বের মতো গাড়িভাড়া ইত্যাদির হিসাব লেখা বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। এর ফলে তাঁর প্রাত্যহিক জীবনচর্যার রূপটি ফুটিয়ে তোলা দুরূহ হয়েছে। পরে অবশ্য পদ্ধতিটি আবার প্রবর্তিত হয়।

২৫ বৈশাখ [মঙ্গল 8 May] তিনি ছেচল্লিশ বৎসর বয়সে পদার্পণ করলেন, এদিন সম্ভবত তিনি শান্তিনিকেতনে অবস্থান করছেন। পরের দিন তিনি কাদম্বিনী দেবীকে নববর্ষের আশীর্বাদ ও সংসারক্লিষ্ট হৃদয়ের শান্তির জন্য ঈশ্বরনির্ভরতার উপদেশ দিয়ে যে চিঠি [দ্র চিঠিপত্র ৭।৬-৭, পত্র ৩] লিখেছেন, তাতেও রচনাস্থানের উল্লেখ নেই, রবীন্দ্রভবনে রক্ষিত খামটিতে প্রেরক ডাকঘরের ছাপটি অস্পষ্ট।

কিন্তু ২৭ বৈশাখ [বৃহ 10 May]-লিখিত 'দিঘি' ['জুড়ালো রে দিনের দাহ, ফুরালো সব কাজ'] কবিতাটি [দ্র খেয়া ১০।১৬০-৬২] শান্তিনিকেতনেই লেখা। ২৯ বৈশাখ [শনি 12 May] 'কোকিল' ['আজ বিকালে কোকিল ডাকে'] কবিতাটিও [দ্র ভাণ্ডার, আষাঢ়। ১১৫-১৬; খেয়া ১০।১৫৮-৬০] এখানে রচিত হয়। এই কবিতাটির মধ্যে তিনশো বছর আগের বাংলাদেশের 'পল্লীখানি প্রাণে ভরা,/ গোলায় ভরা ধান'-এর সঙ্গে আজকের 'ঘাটের সিঁড়ি ভেঙে গেছে,/ ফেটেছে সেই ছাদ'-এর পার্থক্যটি হয়তো তাঁর সমকালীন চিন্তার সূত্রে

গ্রথিত—সেইকারণেই ‘কেজো’ পত্রিকা ভাণ্ডার-এ এটি প্রকাশিত হয়েছে। একই কথা জ্যৈষ্ঠ-সংখ্যায় মুদ্রিত ‘বন্দী’ কবিতাটি সম্পর্কে প্রযোজ্য হতে পারে—সমকালীন ভাবনার প্রতিধ্বনি এই কবিতাটিতেও শোনা যায়।

ভাণ্ডার, বৈশাখ ১৩১৩ [২।১] :

২৫ ‘প্রশ্ন’

এই সংখ্যায় রবীন্দ্রনাথ ‘প্রশ্ন’ করেন : ‘বঙ্গীয় প্রাদেশিক সমিতির কর্ত্তব্য ও কার্য্যাবলী সম্বন্ধে কোন সংস্কারের প্রয়োজন হইয়াছে কি না?’ ত্রৈলোক্যনাথ মৌলিক, বিপ্রদাস পালচৌধুরী, কালীপ্রসন্ন দাসগুপ্ত, কামিনীকুমার চন্দ প্রমুখ কুড়ি জনের উত্তর মুদ্রিত হয় [প ২৫-৪২]। উত্তরগুলি কৌতুহলজনক, এগুলি মন দিয়ে পড়লে দেখা যাবে আবেদন-নিবেদন ও অনাবশ্যক বক্তৃতা পরিহার করে গঠনমূলক কাজ করার রাবীন্দ্রিক আদর্শ বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে কতটা ছড়িয়ে পড়েছে। নিবারণচন্দ্র দাসগুপ্ত বরিশালে স্বদেশী প্রচারের একটি উল্লেখযোগ্য বিবরণ দিয়েছেন : “আমার মতে ‘প্রাদেশিক সমিতি’কে সম্পূর্ণরূপে জনসাধারণের রাজনৈতিক শিক্ষার এক প্রধান উপায়ে পরিণত করা আবশ্যক, এই উদ্দেশ্য সাধন জন্য আমরা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুস্তিকা মুদ্রিত করিয়া সাধারণ্যে প্রচার করিয়াছি; এবং বেতনভোগী প্রচারক দ্বারা সরল ভাষায়, গ্রামে গ্রামে ‘জাতীয় মহাসমিতি’ ও ‘প্রাদেশিক সমিতির’ উদ্দেশ্য ও কার্য্য সম্বন্ধে বক্তৃতা দেওয়াইয়াছি। এ জেলায় নিরক্ষর মুসলমানগণ, ‘জারি’ গান বড়ই পশন্দ করে, জারিওয়ালা দ্বারা ‘রাজনৈতিক’ ও ‘স্বদেশী’ গান রচিত হইয়া গ্রামে গ্রামে গীত হইয়াছে : এবং ভাটেরা ঐ পদ্ধতি অবলম্বন করিয়া প্রচারকার্য্যের সহায়তা করিয়াছে।” রবীন্দ্রনাথ এই বিবরণ পড়ে নিশ্চয়ই খুশি হয়েছিলেন, এই ধরনের পন্থা অবলম্বনের জন্য তিনি বহুদিন ধরেই পরামর্শ দিয়ে আসছিলেন।

ভাণ্ডার, বিশেষ সংখ্যা

৪৩-৬১ ‘দেশনায়ক’ দ্র সমূহ ১০।৪৮৭-৯৬ [বর্জিত অংশ দ্র গ্রন্থপরিচয় ১০।৬৫৩-৬১]

৬২-৬৬ ‘সঞ্চয়/স্বদেশী আন্দোলন’

ভাণ্ডার-এর ২৪ পৃষ্ঠার এই বিশেষ সংখ্যা প্রকাশিত হয় 3 Jun [রবি ২০ জ্যৈষ্ঠ]। ‘দেশনায়ক’ প্রবন্ধটি এই সংখ্যার লক্ষ্য ছিল, কিন্তু তার আগেই মজুমদার লাইব্রেরি স্বতন্ত্র পুস্তিকার আকারে প্রবন্ধটি প্রকাশ করে।

‘সঞ্চয়’ বিভাগে ‘স্বদেশী আন্দোলন’ রচনাটি ‘ডন সোসাইটির ছাত্রগণের প্রতি শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের উপদেশের মর্ম্ম’ ডন সোসাইটির মুখপত্র *The Dawn and Dawn Society's Magazine*-এর Mar 1906-সংখ্যা থেকে উদ্ধৃত। রবীন্দ্রনাথ 25 Feb 1906 [রবি ১৩ ফাল্গুন ১৩১২] ডন সোসাইটিতে এই মৌখিক বক্তৃতাটি করেন, যার কিয়দংশ আগেই উদ্ধৃত হয়েছে।

বঙ্গদর্শন, বৈশাখ ১৩১৩ [৬।১] :

৪৮ ‘সমাপ্তি’ [‘বন্ধ হয়ে এল স্রোতের ধারা’] দ্র খেয়া ১০।১৫৭-৫৮

পাঁচ বছর বঙ্গদর্শন সম্পাদনা করার পর এই মাস থেকে রবীন্দ্রনাথ সম্পাদক পদ ত্যাগ করেন। কিন্তু পত্রিকাটির সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক ছিন্ন হয়নি। শৈলেশচন্দ্র মজুমদার আষাঢ়-সংখ্যায় ‘নিবেদন’-এ লেখেন :

পাঁচবৎসর বঙ্গদর্শনের সম্পাদকতা করিয়া পূজনীয় শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় বিশ্রামার্থে এক্ষণে অবসরগ্রহণ করিতেছেন। তিনি এই উপলক্ষ্যে যাহা লিখিয়াছেন, তাহা নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি—

"নবপর্য্যায় বঙ্গদর্শন পাঁচবৎসরকাল চালনা করিয়া বর্তমান বৎসরে আমি সম্পাদকপদ হইতে নিষ্কৃতিগ্রহণ করিতেছি। এই পাঁচবৎসর নানা দুঃখদুর্ঘটনার মধ্য দিয়া আমাকে যাত্রা করিতে হইয়াছে। এক্ষণে আমি বিশ্রামপ্রার্থী। আশা করি, পাঠকগণ আমার সম্পাদনকালের সমস্ত ত্রুটি মার্জ্জনা করিয়া আমাকে অবসরদান করিবেন। ইতি ১লা বৈশাখ, ১৩১৩/শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।"

গত দুইবৎসর হইতেই সম্পাদকমহাশয় অবসর লইতে ইচ্ছুক হইয়াছিলেন, কেবল আমাদের একান্ত অনুরোধেই লন নাই; এখন কিন্তু তাঁর বিশ্রাম একান্ত আবশ্যক, তিনি এখন বৈষয়িক সকল বন্ধন হইতেই মুক্তি পাইবার প্রয়াসী, আর তাঁহাকে সম্পাদকরূপে আবদ্ধ রাখিতে পারা গেল না। নবপর্য্যায়-বঙ্গদর্শন প্রচারের সময়ে প্রথমে রবীন্দ্রবাবুকে সম্পাদকরূপে পাইবার আশা আমাদের ছিল না, তবু প্রধানত তাঁহারই সম্পূর্ণ সহায়তা পাইবার ভরসাতেই আমরা বঙ্গদর্শন প্রকাশে সাহসী ও উৎসাহী হইয়াছিলাম। আজও আবার তাঁহারই নির্দ্দেশে ও উপদেশে বঙ্গদর্শনপ্রচারে ব্রতী রহিলাম। রবীন্দ্রবাবু সম্পাদক না থাকিলেও বঙ্গদর্শনের মূলভরসা তিনিই। তাঁহারই নির্দ্দিষ্ট পথে, প্রধানত তাঁহারই সহায়তায় বঙ্গদর্শন পরিচালিত হইবে। ইতি।/শ্রীশৈলেশচন্দ্র মজুমদার।

রবীন্দ্রনাথের সম্পাদকপদ ত্যাগের কথা প্রথমে শৈলেশচন্দ্র গোপন করেন। সম্ভবত জ্যৈষ্ঠ মাসের শুরুতে রবীন্দ্রনাথ শিলাইদহ থেকে শ্রীশচন্দ্র মজুমদারকে লেখেন : 'বঙ্গদর্শন সম্পাদকের কি কিনারা হইল জানিনা। বড়দাদা মেজদাদা রাজি নহেন। আমি ত অচল অটল—তুমি ত কর্ম্মে বদ্ধ। তাহা হইলে যেমন শৈলেশ আছে তেমনি থাকি[য়া] যাক্। কিন্তু আমি যে সম্পাদকী পরিত্যাগ করিলাম তাহা না জানাইলে পাঠকদিগকে নিতান্ত ঠকানো হইবে—কারণ এ[মাসে] আমার নাম বঙ্গদর্শনে বা[হির] হয় নাই। ইহা কর্ত্তব্য হইবে না।'[৫] রবীন্দ্রনাথ সম্ভবত ভাণ্ডার-এর সম্পাদকপদও ত্যাগ করতে ইচ্ছুক ছিলেন, কিন্তু প্রকাশক কেদারনাথ দাশগুপ্তের নির্বন্ধাতিশয্যে তা সম্ভব হয়নি—জ্যৈষ্ঠ-সংখ্যা থেকে 'শ্রীপ্রমথনাথ চৌধুরী, এম্, এ, বার-এট্-ল'-র নাম 'সহকারী সম্পাদক'-রূপে মুদ্রিত হতে থাকে।

সঙ্গীত-প্রকাশিকা, বৈশাখ ১৩১৩ [৫।৮] :

১৬৪-৭০ মিশ্র বিভাস-একতালা। আজি বাংলাদেশের হৃদয় হতে দ্র স্বর ৪৬
গানটির স্বরলিপি করেন ইন্দিরা দেবী।

৩ জ্যৈষ্ঠ [বৃহ 17 May] জোড়াসাঁকোয় সমারোহসহকারে মহর্ষির জন্মোৎসব পালিত হয়। তত্ত্ববোধিনী-তে মুদ্রিত বিবরণে রবীন্দ্রনাথের কোনো ভূমিকার উল্লেখ নেই।

৫ জ্যৈষ্ঠ [শনি 19 May] তাঁর কলকাতায় উপস্থিতির প্রমাণ এইদিন মনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়কে লেখা একটি চিঠি। এই চিঠিতে তাঁর ব্যস্ততার কথা জানিয়ে তিনি লিখেছেন : 'ইতিমধ্যে শিলাইদহ প্রভৃতি নানাস্থানে ঘুরিতে হইয়াছে—তাহার উপরে বৈষয়িক এবং বেগার নানা কাজে আমাকে হাঁফ ছাড়িবার সময় দিতেছে না'।[৬] 'শিলাইদহ প্রভৃতি নানাস্থানে' তিনি কখন ঘুরছিলেন বলা শক্ত—১৭ বৈশাখের [সোম 30 Apr] পর থেকে ২৫ বৈশাখের [মঙ্গল 8 May] বা ৩০ বৈশাখ [রবি 13 May] থেকে ৪ জ্যৈষ্ঠের [শুক্র 19 May] মধ্যে ভ্রমণ করা সম্ভব। ৫ জ্যৈষ্ঠই 'বোলপুর গমনের রেলভাড়া প্রভৃতি···১৫,' হিসাব থেকে জানা যায়, রবীন্দ্রনাথ এই দিন শান্তিনিকেতনে ফিরে যান। সেখানে দিন-দশেক কাটিয়ে তিনি আবার কলকাতায় আসেন ১৫ জ্যৈষ্ঠ [মঙ্গল 29 May]। ইত্যবসরে তিনি দুটি কবিতা লেখেন :

১২ জ্যৈষ্ঠ [শনি 26 May] 'গান শোনা' ['আমার এ গান শুনবে তুমি যদি'] দ্র খেয়া ১০।১৬৬-৬৮
উল্লেখ্য, কবিতার তৃতীয় স্তবকটি রচনাশেষে লিখিত হয়।

১৪ জ্যৈষ্ঠ [সোম 28 May] 'জাগরণ' ['কৃষ্ণপক্ষে আধখানা চাঁদ'] দ্র খেয়া ১০।১৬৮-৭১
এই কবিতাতেও পঞ্চম ও ষষ্ঠ স্তবকদুটি পাণ্ডুলিপিতে পরে আড়াআড়ি ভাবে লিখে সংযোজিত হয়েছে।

বিনয়েন্দ্রনাথ সেন য়ুরোপ-ভ্রমণান্তে ভারতে ফিরে আসেন 22 Mar 1906 [৮ চৈত্র ১৩১২]।[৭] বিনয়েন্দ্রনাথ একটি পত্র-সহ 'বর্ত্তমানযুগের স্বাধীনচিন্তা' [দ্র আষাঢ়। ১১৪-২৪] প্রবন্ধটি বঙ্গদর্শন-এ প্রকাশের জন্য রবীন্দ্রনাথের কাছে প্রেরণ করলে তিনি অনুকূল মন্তব্য-সহ প্রবন্ধটি শৈলেশচন্দ্রকে পাঠিয়ে ১৫ জ্যৈষ্ঠ [মঙ্গল 29 May] জোড়াসাঁকো থেকে লেখেন :

আমি বিরোধ ও বিদ্বেষপরবশ জাতীয় ভাবের পক্ষপাতী নই—আমি বিধাতার নির্দ্দিষ্ট স্বাভাবিক অধিকার ও অনুরাগমূলক জাতীয় ভাবের সমর্থন করিয়া থাকি। প্রত্যেকে জাতির বিশেষত্ব সমস্ত মানবের সম্পত্তি—এই জন্যই গৌরবের সহিত সেই বিশেষত্বকে উজ্জ্বল করিয়া তোলা আবশ্যক। উজ্জ্বল করিতে গেলে সঙ্কীর্ণতাই যে তাহার সহায়তা করে তাহা নহে ঔদার্য্যের প্রয়োজন—কিন্তু ঔদার্য্যের নামধারী সঙ্কীর্ণতা যাহা নিকটের প্রতি অন্ধ ও অসাড় তাহাই সর্বাপেক্ষা বিপদ্‌জনক। বরঞ্চ যেখানে অনুরাগের গতি স্বাভাবিক সেখানে পক্ষপাত মার্জনীয়—কারণ সে পক্ষপাতে অনিষ্ট করিলেও আনুকূল্য করে এবং এই পক্ষপাতের ইষ্টীমে জগতের অনেক কাজ অগ্রসর হইয়াছে। কিন্তু অনুরাগের স্বাভাবিক ক্ষেত্রেই অশ্রদ্ধা ও অবজ্ঞা যত অনিষ্টকর এমন আর কিছু নয়। কারণ, এই ক্ষেত্রই আমাদের কর্মক্ষেত্র—আমাদের যথার্থ উপযোগিতা এই ক্ষেত্রেই। যদি স্বদেশপক্ষপাতের প্রতি বেশি ঝোঁক দিয়া কিছু লিখিয়া থাকি তবে এই স্বাভাবিক মমত্বের অপরাধ মার্জনা করিবেন—কিন্তু বিদেশ-বিদ্বেষকে আমি শ্রেয়স্কর বলিয়া জ্ঞান করি না।[৮]

—রবীন্দ্রনাথের ভাবনায় জাতীয়তা ও আন্তর্জাতিকতার মিশ্রণ ঘটছে, পত্রটিতে তার সুস্পষ্ট উদাহরণ পাওয়া যায়। অবশ্য স্বদেশের খাতিরে বিদেশকে সম্পূর্ণ বর্জন করার সংকীর্ণতা তাঁর মধ্যে কখনোই দেখা যায়নি—স্বদেশের শ্রেষ্ঠ আদর্শের সঙ্গে বিদেশের যা-কিছু ভালো তাকে গ্রহণ করার মানসিক উদারতার স্বপক্ষে তিনি দরবার করেছেন সাধনা-র যুগ থেকেই, নিতান্ত তরুণ বয়সের রচনাতেও এই ভাব দুর্লক্ষ্য নয়।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর পত্রটি শৈলেশচন্দ্রের হাত দিয়ে বিনয়েন্দ্রনাথের কাছে প্রেরণ করেন। পত্রটি পেয়ে তিনি উৎসাহিত হয়ে 30 May [বুধ ১৬ জ্যৈষ্ঠ] লেখেন : 'স্বাধীন চিন্তার ভূমিতে সকল শাস্ত্রের আলোচনার জন্য একটী বিশেষ ক্লাস্ খুলিতে বড়ই মনের আগ্রহ।…আপনি যদি "সংস্কৃত কি বঙ্গসাহিত্যের কোন অংশে ধর্ম্মচিন্তার ক্রমবিকাশ" কি এইরূপ কোন একটী বিষয়ে ৪ কি ৫টী বক্তৃতা করিয়া এই জিনিষটীর সূত্রপাত করেন তবে আমাদের মনে ইহার সুফল হইবার আশা দৃঢ়মূল হয়।'[৯] দীনেশচন্দ্র সেনকে দিয়ে বৈষ্ণব ধর্ম ও দর্শনের ক্রমবিকাশ সম্বন্ধে বক্তৃতা দেওয়ানোর প্রস্তাবও তিনি করেন। রবীন্দ্রনাথ পত্রোত্তরে ১৮ জ্যৈষ্ঠ [শুক্র 1 Jun] লেখেন : 'আপনারপ্রস্তাবটি আমার মনে লাগিয়াছে। ব্যাপারটি সহজ নহে। আপাতত প্রবন্ধ পাঠ দিয়া আরম্ভ করিতে পারেন।আমি একটু অবকাশ পাইলেই একটা লিখিবার চেষ্টা করিব। দীনেশবাবুকেও এ কাজে প্রবৃত্ত করা যাইতে পারে।'[১০] বেণীমাধব দাস লিখেছেন : 'At this time, Rabindranath came to Benoyendranath at his Mechuabazar residence. The occasion was duly taken advantage of the Prayer Meeting Band, who were present at the meeting. Some eminent men, like Dr. Brajendra Nath Seal, Principal Heramba Chandra Maitra and others were also present. The Poet delighted the gathering with two of his new songs—"I will feel Thy presence in whomsoever I meet, wherever I go' and then, 'Whomsoever Thou presentest Thine banner,—let him have strength to uphold it' ['তোমার পতাকা যারে দাও তারে বহিবার দাও শকতি']। These indeed were prayers from the heart of a Pilgrim!'[১১] এই অনুষ্ঠান কবে হয়েছিল বলার উপায় নেই।

উক্ত ১৮ জ্যৈষ্ঠ [শুক্র 1 Jun] তারিখেই রবীন্দ্রনাথ 'ঝড়' ['আকাশ ভেঙে বৃষ্টি পড়ে'] কবিতাটি [দ্র খেয়া ১০।১৬২-৬৪] রচনা করেন। দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্তবক দুটি পাণ্ডুলিপির মার্জিনে আড়াআড়িভাবে পরে লিখিত

হয়েছিল।

এই বৎসর কলকাতায় টিলক, খাপার্দে ও মুঞ্জে মহারাষ্ট্রের এই তিন নেতার উপস্থিতিতে মহাসমারোহে শিবাজী-উৎসব পালিত হয়। অশ্বিনীকুমার দত্তের সভাপতিত্বে মূল অনুষ্ঠানটি হয় ২২ জ্যৈষ্ঠ [মঙ্গল 5 Jun] ১৬ কর্নওয়ালিশ স্ট্রীটে পান্তির মাঠে। শ্যামসুন্দর চক্রবর্তী এখানে রবীন্দ্রনাথের 'শিবাজী উৎসব' কবিতা পাঠ করেন। 'কিন্তু স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ, ব্রাহ্ম কৃষ্ণকুমার মিত্র এই শিবাজী উৎসবে যোগ দিলেন না। কেননা মূর্ত্তি গড়িয়া ভবানী পূজা হইয়াছে।'[১২] রবীন্দ্রনাথ দেশজননীকে 'মাতৃমূর্তি'তে বন্দনা করলেও স্বদেশী আন্দোলনে ক্রমশ হিন্দু পৌত্তলিকতার অনুপ্রবেশে শঙ্কা বোধ করছিলেন, জাতীয়তাবাদী মুসলমানদের মধ্যেও বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা দিচ্ছিল।

২৩ জ্যৈষ্ঠ [বুধ 6 Jun] কলেজ স্ট্রীটে অবস্থিতY. M. C. A.-এর ওভারটুন হলে রবীন্দ্রনাথ 'শিক্ষাসমস্যা' [দ্র ভাণ্ডার, জ্যৈষ্ঠ। ৭৯-৯৮; বঙ্গদর্শন, আষাঢ়। ১৪৩-৫৮; শিক্ষা ১২।২৯৫-৩১৩] প্রবন্ধটি পাঠ করেন।

জাতীয় শিক্ষাপরিষদের গঠনপ্রণালী ও শিক্ষাসূচী প্রণয়নের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন, তা আমরা পূর্বেই দেখেছি। 1 Jun 1906 [শুক্র ১৮ জ্যৈষ্ঠ] জাতীয় শিক্ষাপরিষদ Act XXI of 1860 অনুযায়ী বিধিবদ্ধ হয়। তার আগেই Jul 1906-এর দ্বিতীয় সপ্তাহে অনুষ্ঠেয় পরীক্ষার পাঠ্যসূচী [syllabus] ইত্যাদি 25 Apr [১২ বৈশাখ]-সংখ্যা *Bengalee*-তে প্রকাশিত হয়—এন্ট্রান্স ও এফ. এ. পরীক্ষার সমতুল পঞ্চম ও সপ্তম বর্গের [Fifth and Seventh standard] জন্য বাংলা পরীক্ষার প্রশ্ন রচনার দায়িত্ব রবীন্দ্রনাথের উপর অর্পিত হয়েছিল [দ্র আদর্শ প্রশ্ন অ-২।৭০০-০৮]।

এই-সব অভিজ্ঞতা 'শিক্ষাসমস্যা' প্রবন্ধটির ভিত্তি রচনা করেছে। জাতীয় শিক্ষাপরিষদের বিদ্যালয়-বিভাগের গঠন-পত্রিকা তৈরির ভার পেয়ে প্রথমেই সংকল্পিত বিদ্যালয়ের কারণ-বীজ অর্থাৎ মূলবর্তী ভাবটি নির্ধারণ করতে গিয়ে তাঁর মনে যে চিন্তার উদ্রেক হয়েছিল, সেইটিই সর্বসাধারণের সামনে উপস্থিত করা রবীন্দ্রনাথের এই প্রবন্ধের লক্ষ্য। য়ুরোপীয় সমাজের সঙ্গে গভীরভাবে সম্পৃক্ত শিক্ষাপদ্ধতি বাইরে থেকে ভারতীয় ছাত্রদের উপর চাপিয়ে দেওয়ার ফলেই যে তা সুফলপ্রসূ হচ্ছে না, তাঁর এই পূর্ব-প্রচারিত মত দিয়ে তিনি প্রবন্ধটি আরম্ভ করেছেন। আবার অপরদিকে প্রাচীন ভারতীয় শিক্ষার বিষয় ও পদ্ধতিকে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করলেও সে-ও একটা নকল হবে মাত্র, তার বাহ্য আয়োজন বোঝা হয়ে উঠে কোনো কাজে লাগবে না। সুতরাং এখনকার প্রয়োজন ঠিক মতো বুঝে এমন ব্যবস্থা করতে হবে 'যাহাতে পাঠ্যবিষয়ের বিচিত্রতার সঙ্গে অধ্যাপনার সজীবতা মিশিতে পারে; যাহাতে পুঁথির শিক্ষাদান এবং হৃদয় মন গড়িয়া তোলা দুই ভাই বিদ্যালয় গ্রহণ করে।'

শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্যাশ্রমে এরই পরীক্ষা তিনি আরম্ভ করেছিলেন পাঁচ বছর আগে। প্রবন্ধের পরবর্তী অংশ মোটামুটি সেখানে প্রচলিত শিক্ষাদর্শের ব্যাখ্যা; এমন-কি এখানে এমন ইঙ্গিত আছে যে, প্রকৃত জাতীয় বিদ্যালয় সেখানেই বা অনুরূপ কোনো স্থানে স্থাপন করা উচিত : 'আদর্শ বিদ্যালয় যদি স্থাপন করিতে হয় তবে লোকালয় হইতে দূরে নির্জনে মুক্ত আকাশ ও উদার প্রান্তরে গাছপালার মধ্যে তাহার ব্যবস্থা করা চাই। সেখানে অধ্যাপকগণ নিভৃতে অধ্যয়ন ও অধ্যাপনায় নিযুক্ত থাকিবেন এবং ছাত্রগণ সেই জ্ঞানচর্চার যজ্ঞক্ষেত্রের মধ্যেই বাড়িয়া উঠিতে থাকিবে।'

রবীন্দ্রনাথ কলকাতায় এসেছিলেন 'দেশনায়ক' প্রবন্ধ পাঠ করে পতিসরে যাওয়ার লক্ষ্য নিয়ে। সেখানে মহর্ষির জন্মদিবসকে উপলক্ষ করে ৬ জ্যৈষ্ঠ [রবি 20 May] থেকে পনেরো দিন 'মহর্ষিদেবের মেলা, কৃষিপ্রদর্শনী ও পুরস্কারের আয়োজন হয়েছিল [দ্র পত্রজমা বহি, রবীন্দ্রভবন-সংগ্রহণ সংখ্যা ১৪৬]। উল্লেখ্য, 'স্মৃতিরক্ষা' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ এইরূপ প্রস্তাবই করেছিলেন। এছাড়া বিষয়কও ছিল। ১৬ জ্যৈষ্ঠ [বুধ 30 May] তিনি শান্তিনিকেতনে কোনো অজ্ঞাত ব্যক্তিকে লেখেন : '···আমাকে কাল মফঃস্বলে বিষয়কর্ম্মে যাইতে হইবে, কবে ফিরিব নিশ্চয় জানি না—আশা করি বিলম্ব হইবে না।···বর্ধমানে আমার ভৃত্য উমাচরণ পুলিশের কবলে অন্তর্ধান করাতে আমি কিছু বিপন্ন হইয়া পড়িয়াছি—···আশা করি সুবোধচন্দ্র তাহাকে উদ্ধার করিয়া যথাসময়ে আমার কাছে পাঠাইয়া দিবে—কাল বৃহস্পতিবারে দার্জিলিং মেলে কলিকাতা ছাড়িব'।[১৩] কিন্তু ভৃত্য উমাচরণ নন্দী যথাসময়ে না আসায় ও অন্য কারণে তাঁর কালীগ্রামে যাওয়া হয়নি। ১৮ জ্যৈষ্ঠ [শুক্র 1 Jun] তিনি বিনয়েন্দ্রনাথকে জানান : 'কোনো কারণে আমার মফস্বলে যাওয়া হইল না।'[১৪] এইদিনই তিনি সুবোধচন্দ্র মজুমদারকে লিখেছেন, উমাচরণ-সংক্রান্ত ব্যাপারের জন্যই তাঁর কালীগ্রাম যাওয়া হয়নি। এই পত্রেই তিনি লেখেন : 'আজ সকালবেলায় মোহিতবাবু এসেছিলেন। তাঁর ইচ্ছা তিনি গ্রীষ্মবকাশের অবশিষ্ট কয়দিন বোলপুরে যাপন করেন। আমি সম্মতি দিয়েছি। আমি খুব সম্ভব আগামী বৃহস্পতিবারে যেতে পারব—কারণ বুধবারে আমার প্রবন্ধ-পাঠের কথা হচ্চে—তাহলে মোহিতবাবু, তাঁর স্ত্রী ও দুই শিশুকন্যা আমার সঙ্গেই যাবেন এবং প্রায় দিন দশেক ওখানে থাকবেন।'[১৫] আবার ২০ জ্যৈষ্ঠ [রবি 3 Jun] তাঁকে লেখেন : 'যে রকম গতিক দেখা যাচ্চে আগামী শনিবারের পূর্ব্বে যে ছুটি পাব, সে আশা দেখচিনে। এক লক্ষ্মীছাড়া শিবাজি মেলা নিয়ে বৃহস্পতিবার পর্য্যন্ত আটক পড়েছে, কাজেই তার পরে শুক্রবারে প্রবন্ধ পাঠ করে শনিবারে আমি খালাস পাব।'[১৬] ২১ জ্যৈষ্ঠ তাঁকে লিখলেন : 'মোহিতবাবুরা যদি যান ত শান্তিনিকেতনেই থাকিবেন। অরুর মেয়ের বিয়ে [অরুণেন্দ্রনাথের কন্যা লতিকার সঙ্গে জ্ঞানাভিরাম বরুয়ার বিবাহ] যদি বোলপুরে ১লা আষাঢ়েই স্থির হইয়া যায় তাহা হইলে মোহিতবাবুকে লইয়া যাইব না।'[১৭] রবীন্দ্রনাথের বক্তৃতা বুধবার ২৩ জ্যৈষ্ঠতেই হয়, কিন্তু মোহিতচন্দ্রের সপরিবারে শান্তিনিকেতনে যাওয়া হয়নি—সামান্য একটি অস্ত্রোপচারের পর ২৬ জ্যৈষ্ঠ [শনি 9 Jun] মাত্র সাড়ে পঁয়ত্রিশ বৎসর বয়সে মোহিতচন্দ্রের মৃত্যু হয়। রবীন্দ্রনাথ সম্ভবত বৃহস্পতিবারেই [২৪ জ্যৈষ্ঠ : 7 Jun] শান্তিনিকেতনে ফিরে যান। মোহিতচন্দ্রের মৃত্যুর খবর পেয়ে সেখান থেকে 'বন্ধুবিয়োগার্ত্ত' রবীন্দ্রনাথ বন্ধুপত্নী সুশীলা দেবীকে ২৮ জ্যৈষ্ঠ [সোম11 Jun] 'কল্যাণীয়াসু' সম্বোধনে লেখেন : 'আজ প্রমথ বাবুর [প্রমথলাল সেন] পত্রে মর্ম্মান্তিক সংবাদ শুনিয়া অবধি আমার ব্যথিত চিত্ত দুইটি অনাথা বালিকা ও তাহাদের শোকার্ত্ত মাতার প্রতি ধাবিত হইতেছে। সংসারে নিদারুণ শোকের পরিচয় পাইয়াছি সেইজন্য নিস্ফল সান্ত্বনাবাক্য প্রয়োগের চেষ্টামাত্র করি না—ঈশ্বর যথাকালে শান্তি বিধান করিয়া অসহ্য দুঃখকে নিজের হস্তে সার্থক করিবেন এই আমার প্রার্থনা।'[১৮] বন্ধুবিয়োগে তিনি একটি শোক-প্রবন্ধও লেখেন, প্রবন্ধটি 'মোহিতচন্দ্র সেন' নামে শ্রাবণ-সংখ্যা বঙ্গদর্শন-এ [পৃ ১৬৫-৬৯] মুদ্রিত এবং বিচিত্র প্রবন্ধ [১৩১৪]-তে 'বন্ধুস্মৃতি' বিভাগে [প ৩১৪-১৯] সংকলিত হয়, কিন্তু বিচিত্র প্রবন্ধ-এর পরবর্তী সংস্করণে ও রবীন্দ্র-রচনালী-তে গৃহীত হয়নি।

মোহিতচন্দ্রের সঙ্গে তাঁর পরিচয় অল্পদিনের হলেও বেশিবয়সের বন্ধুত্বের অভাবনীয় রহস্যে 'একরাত্রির অতিথি' 'চিরদিনের আত্মীয়' হয়ে উঠেছিলেন। মোহিতচন্দ্র পণ্ডিত ছিলেন, কিন্তু তাঁর উদার কল্পনাশক্তিও ছিল; সেই শক্তিতেই তিনি নবস্থাপিত বিদ্যালয়ের সমস্ত দুর্বলতা-বিচ্ছিন্নতা অতিক্রম করে তার অনতিগোচর সম্পূর্ণতাকে উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। 'যাহা আমার প্রয়াসের মধ্যে আছে, তাহা আর একজনের উপলব্ধির নিকট সত্য হইয়া উঠিয়াছে, উদ্যোগকর্ত্তার পক্ষে এমন বল,—এমন আনন্দ আর কিছুই হইতে পারে না।' পরীক্ষকের পারিশ্রমিক তাঁর এক হাজার টাকা দানের কথা স্মরণ করে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন : 'এই হাজারটাকার মত দুর্লভ হাজারটাকা ইহার পূর্ব্বে এবং পরে আমার হাতে আর পড়ে নাই। টাকায় যাহা পাওয়া যায় না, এই হাজারটাকায় তাহা পাইলাম। আমার সমস্ত বিদ্যালয় একটা নূতন শক্তির আনন্দে সজীব হইয়া উঠিল।' বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষপদ মোহিতচন্দ্র গ্রহণ করেছিলেন, কিন্তু অসুস্থতার জন্য তাঁকে ফিরে যেতে হয়। তাঁর জন্য উচ্চ বেতন ও তাঁর পরিকল্পিত বিদ্যালয়ের জন্য ব্যয়বহুল আয়োজনের ভার বহন করা রবীন্দ্রনাথের পক্ষে কষ্টকর হচ্ছিল—সুতরাং মোহিতচন্দ্রের বিদায়গ্রহণে তিনি হয়তে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলেছিলেন। কিন্তু মোহিতচন্দ্রের মতো মানুষের শূন্যতা সহ্য করাও তাঁর পক্ষে শক্ত—'উৎসাহের শক্তি যাহাদের পক্ষে স্বাভাবিক, আনুকূল্য যাহাদের নিকট হইতে সহজে প্রবাহিত হয়, যাহারা উদার নিষ্ঠার দ্বারা ভূমার প্রতি আমাদের চেষ্টাকে অগ্রসর করিয়া দেয় এবং সংসারপথের ক্ষুদ্রতা উত্তীর্ণ করিয়া দিবার যাহারা সহায় হইতে পারে—এমন বন্ধু কয়জনই বা আছে!'

মোহিতচন্দ্রের স্ত্রী সুশীলা সেন [1882-1914] এবং তাঁর কন্যাদ্বয় মীরা ও উমা রবীন্দ্রনাথের স্নেহের পাত্রী ছিলেন। ব্রহ্মচর্যাশ্রমের মধ্যপর্বে অচিরস্থায়ী একটি বালিকা বিভাগ গড়ে উঠেছিল [1908-10], রবীন্দ্রনাথ সুশীলা দেবীকে তার তত্ত্বাবধায়িকা নিযুক্ত করেছিলেন। সুশীলা দেবী দীর্ঘজীবন পাননি, তাঁর কন্যারা রবীন্দ্রনাথের স্নেহে অভিষিক্ত হয়েছিলেন।

বঙ্গদর্শন, জ্যৈষ্ঠ ১৩১৩ [৬।২]:

৪৯-৬৪ 'দেশনায়ক' দ্র সমূহ ১০।৪৮৭-৯৬ [বর্জিত অংশ : দ্র গ্রন্থপরিচয় ১০।৬৫৩-৮১]

৮৯ 'খেয়া' ['তুমি এপার-ওপার কর কে গো'] দ্র খেয়া ১০।১৮৬-৮৭

ভাণ্ডার, জ্যৈষ্ঠ ১৩১৩ [২।২]:

৬৭-৬৮ 'বন্দী' ['বন্দী, তোরে কে বেঁধেছে'] দ্র খেয়া ১০।১৩৮-৩৯

৭৯-৯৮ 'শিক্ষাসমস্যা' দ্র শিক্ষা ১২।২৯৫-৩১৩

১১১-১৪ 'সঞ্চয়/স্বদেশী আন্দোলন'

শেযোক্ত প্রবন্ধটি 'ডন সোসাইটীর ছাত্রগণের প্রতি শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের দ্বিতীয় বক্তৃতার সারাংশ' পাদটীকা-সহ প্রকাশিত এবং দি ডন অ্যাণ্ড ডন সোসাইটি'জ ম্যাগাজিন থেকে সংকলিত। এই ভাষণে রবীন্দ্রনাথ বিদেশী রাজার শাসনাধীনে থেকে স্বদেশী আন্দোলনকে জলের কলস মাথায় নৃত্যের সঙ্গে তুলনা করে উভয়ের স্বার্থের দ্বন্দ্বটি প্রদর্শন করেছেন। চিনির বাজার বাড়ানোর জন্য বিদেশী সরকার উৎপাদনব্যয়ের কমে যখন চিনি বিক্রয় করে, তখন দেশের যে ইক্ষুক্ষেত্র অন্নপূর্ণার মিষ্টান্নভাণ্ডার ছিল তার মিষ্টান্ন পরিবেশনের কাজ বন্ধ হবার উপক্রম হয়। এর প্রতিকার তখনই সম্ভব যখন দেশের লোক কষ্টসহিষ্ণু হয়ে দেশীয় জিনিস

ব্যবহার করবে। কিন্তু এই কথা কাজে পরিণত করা শক্ত। আগে সমাজের কল্যাণের নিমিত্ত মঙ্গলকর্ম্মের অনুষ্ঠান করে যাঁরা সামাজিক খ্যাতি লাভ করতেন তাঁরাই সমাজের উপর আধিপত্য করতেন। কিন্তু এখন 'রায় বাহাদুর' খ্যাতির জন্য অন্য কাজে বদান্যতা দেখাতে হয়, সমাজের মঙ্গল তাতে সামান্য। আগে মঙ্গলকর্ম্ম উপলক্ষে ভোজ দিলে আহূত রবাহূত সকলকেই সমানভাবে খাওয়াতে হত, সুতরাং পোলাও-কালিয়ার বিলাসিতা ছিল না, কিন্তু এখন গুটিকতক আত্মীয়বান্ধবকে খাওয়াতে গেলে ভোজ্যব্যাপারে বিলাসী হতে হয়। এর প্রতিকারকল্পে রবীন্দ্রনাথ বললেন : 'শিক্ষিত ছাত্রেরা যদি এই একটা সংস্কার গড়িয়া তুলিতে পারেন যে, যে কেহ বিলাতী জিনিষ কিনিবে তাহাকে লজ্জা পাইতে হইবে, তাহা হইলে দেশের মহা উপকার হয়। আমাদের অস্ত্র ত আমাদের হাতেই রহিয়াছে। আমাদের গৃহে আমাদের বন্ধুবান্ধবদের মধ্যে আমরা যদি এইভাবে কাজ করিতে পারি, তাহা হইলে কি অভাবনীয় শক্তি আমাদের হাতে আছে, তাহা পাঁচ বৎসরের মধ্যেই দেখিতে পাইব।' আন্দোলনের সূচনায় যেরূপ আশাতিরিক্ত সাফল্য দেখা গিয়েছিল তা স্থায়ী হয়নি বলে অনেকে আক্ষেপ করেন। রবীন্দ্রনাথ বললেন : 'আমি সম্প্রতি পাবনা গিয়াছিলাম। সেখানে যেরূপ ভাবে কাজ হইতেছে তাহা দেখিয়া আমার মনে আশার সঞ্চার হইয়াছে।···সেখানে তাঁতী ও জোলারা কাপড় তৈরি করিতেছে, চরকায় সুতা কাটার আয়োজন হইতেছে, দোকানে দোকানে দেশী জিনিষ বিক্রয়ের ব্যবস্থা হইতেছে।···যে সকল উপায় অবলম্বন করা হইয়াছে, তাহাতেই যে এ উদ্যম সফল হইবে তাহা নহে, অন্তঃকরণের যে পরিবর্ত্তন দেখিয়াছি তাহাতেই হইবে। আমি যেখানে যেখানে গিয়াছি, সেইখানেই দুই তিনটী করিয়া মানুষ দেখিয়া আসিয়াছি। এই চিত্তের পরিবর্ত্তনের ফলে দেশের অভাবমোচনের জন্য দেশের শক্তি নিয়োজিত হইবে।' তিনি আরও বললেন : 'আমি অল্প দিন হইল কুষ্টিয়া ও সিলাইদহের তাঁতের স্কুল দেখিয়া আসিয়াছি। এই সকল স্কুলে অনেক শ্রেষ্ঠবর্ণের ছাত্র আছেন। তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ বিশিষ্ট ভদ্রসন্তান, বাড়ীতে ২০।৩০ হাজার টাকার সম্পত্তি আছে। তাঁহারা এমন দীনভাবে নিষ্ঠার সঙ্গে শিক্ষা করিতেছেন যে, বস্তুত তাঁহাদের অধ্যবসায়ের প্রশংসা না করিয়া পারা যায় না। তাঁহাদের অনেকেরই বাড়ী পল্লীগ্রামে। তাঁহারা যখন শিক্ষাসমাপন করিয়া নিজ নিজ পল্লীতে ফিরিয়া যাইবেন, তখন তাঁহারা নিজেরা কেন্দ্রস্বরূপ হইয়া আর দশ জনকে শিখাইতে পারিবেন। এখানে একটী বিষয় লক্ষ্য করিয়া আমি আশ্চর্য্য হইয়াছি। এই সকল স্কুলে যে সকল ছাত্র আছেন, তাঁহারা সকলেই পূর্ব্ববঙ্গবাসী। এখানে এখন পশ্চিমবঙ্গবাসী ছাত্র একটীও নাই। পশ্চিমবঙ্গবাসী ছাত্রেরা একেবারে রাতারাতি কাজ শিখিয়া বড় মানুষ হইবার আশা করেন, সুতরাং শিক্ষালাভের জন্য যে ধৈর্য্য আবশ্যক তাঁহাদের তাহা থাকে না। পূর্ব্ববঙ্গবাসী এই সকল ছাত্রদের অধ্যবসায় ও নিষ্ঠা দেখিলে বেশ বুঝিতে পারা যায় যে, গবর্ণমেণ্ট কেন আমাদের নিকট হইতে পূর্ব্ববঙ্গ কাড়িয়া লইবার চেষ্টা করিতেছেন।' তাঁর মতে, স্বদেশী আন্দোলনের ফলে দেশের মন প্রস্তুত হয়ে এসেছে, কিন্তু পঞ্চায়েত গ্রাম্য সম্মিলন প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানের অভাবে তাকে কাজে লাগানো যাচ্ছে না। তিনি বললেন : "কিছুদিন হইতে আমি 'পল্লীসমিতি' স্থাপনের চেষ্টা করিতেছি, কিন্তু সে চেষ্টা সফল হয় নাই। যাহার জন্য বাঙালীর কোন কাজ সুসম্পন্ন হয় না—পরস্পরের মধ্যে ছোট ছোট কথা লইয়া মতভেদ, তাহার জন্যই এ চেষ্টাও সফল হইতেছে না। এরকম 'পল্লী-সমিতি' স্থাপন করা এখন আমাদের বিশেষ আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে।···আমরা সর্ব্বদাই বলি গবর্ণমেণ্ট আমাদের স্বায়ত্তশাসন কাড়িয়া লইতেছেন। যথার্থ যাহা স্বায়ত্তশাসন তাহা কেহ কাড়িয়াও

লইতে পারে না, কেহ দিতেও পারে না। ···এই যে ভারত জুড়িয়া patriotism-এর কথা এত শুনিতে পাই, যথার্থভাবে তাহা আমাদের মধ্যে কাহারও নাই। ছিটে ফোঁটা থাকিতে পারে কিন্তু অল্প বৃষ্টিতে যেমন চাষ হয় না, তেমনি এই patriotismও কোন কাজে লাগে না। আমাদের সুরু করিতে হইবে পল্লীর patriotism হইতে। আমরা যদি প্রতি পল্লীতে পল্লীর সকল অভাব মোচনের ভার নিজেরা গ্রহণ করি, তাহা হইলে পল্লীকে গৌরবান্বিত করিয়া তুলিতে পারি। পল্লীর শিক্ষাকে স্বাধীন করা, জলাশয়ের পঙ্কোদ্ধার করা, গরীবদের শিক্ষার ব্যবস্থা, রাস্তাঘাট তৈরি করা, অত্যাচারীর হস্ত হইতে দুর্ব্বলকে রক্ষা করা, সংক্ষেপে পল্লীর সমস্ত অভাবমোচনের ভার নিজেরাই গ্রহণ করা, আর কাহাকেও গ্রহণ করিতে না দেওয়া এইটী 'পল্লীসমিতি'র মূলনীতি। এইভাবে কিছুদিন কাজ করিতে পারিলে পল্লীর দুঃখী দরিদ্রদের সঙ্গে আমাদের হৃদয়ের যোগ সংস্থাপিত হইবে এবং একত্র হওয়ার সার্থকতা আমরা বুঝিতে পারিব। আত্মশক্তিচালনা করিয়া কর্ত্তৃত্বের প্রকৃত অধিকারী হওয়ার জন্য এইরূপ 'পল্লীসমিতি'তে আমাদের এখন হাতে খড়ি করিতে হইবে।"[১৯]

রবীন্দ্রনাথ কেবল উপদেশ দিয়ে ক্ষান্ত হননি, শিলাইদহ ও কালীগ্রামে হাতেকলমে এই কাজে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন, আমরা যথাস্থানে সে-প্রসঙ্গ উত্থাপন করব। কুষ্টিয়া ও শিলাইদহের যে বস্ত্রবয়নশিক্ষালয়ের অভিজ্ঞতার কথা তিনি বর্ণনা করেছেন, সেগুলি তাঁদের উদ্যোগেই প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত হচ্ছিল।

পরিশেষে তিনি বলেন, দোকানদারেরা দেশীয় দ্রব্যের জন্য বেশি দাম আদায় করছে বলে যে অভিযোগ শোনা যাচ্ছে তার প্রতিকার সম্ভব অ্যান্টিসার্কুলার সোসাইটি বা স্টুডেন্টস অ্যাণ্ড ইয়ং মেন'স য়ুনিয়নের সদস্যেরা নিয়মিত পরিদর্শন করে সাধু ও অসাধু ব্যবসায়ীদের তালিকা প্রকাশ করলে। তাতে বিশেষত মফস্বলবাসীরা উপকৃত হবেন। অবশ্য কিছুদিনের মধ্যেই এই উপদেশের অপপ্রয়োগ আরম্ভ হয়েছিল—ভয়-দেখানো, শারীরিক উৎপীড়ন, আগুন-লাগানো ইত্যাদি উৎপাতের-আকারে আবির্ভূত হওয়ায় স্বদেশী আন্দোলনের প্রতি দেশবাসী, বিশেষত দরিদ্র মুসলমানেরা, সহানুভূতি হারিয়ে ফেলছিল—রবীন্দ্রনাথই তখন প্রবন্ধে, বক্তৃতায় ও 'ঘরে বাইরে' উপন্যাসে এই হঠকারিতার বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করেছিলেন।

সঙ্গীত-প্রকাশিকা, জ্যৈষ্ঠ ১৩১৩ [৫।৯]:

১৮৪-৮৬ বাউলের সুর—একতালা। আমার নেই[নাই] বা হল পারে যাওয়া দ্র স্বর ১০
ইন্দিরা দেবী গানটির স্বরলিপি করেন।

রবীন্দ্রনাথ ২৪ জ্যৈষ্ঠ [বৃহ 7 Jun] শান্তিনিকেতনে ফিরে আসেন। ১ আষাঢ় [শুক্র 15 Jun] তিনি দীনেশচন্দ্র সেনকে লেখেন : 'এখানে আসিয়া শরীরটা কলিকাতার চেয়ে অনেক ভাল আছে।' পাঠকের স্মরণ আছে, ৯ অগ্র° ১৩১২ [শনি 25 Nov] রবীন্দ্রনাথ নৌকাডুবি প্রকাশের ব্যাপারে বসুমতী-র উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়কে অনুমতি-পত্র দিয়েছিলেন। বঙ্গদর্শন-এ প্রকাশিত পাঠের অনেক অংশ তিনি গ্রন্থে বর্জন করেন। এসম্পর্কে তিনি উক্ত পত্রে লেখেন : 'নৌকাডুবিকে নানা স্থানে খর্ব্ব করিয়া তাহাকে বেশ একটু আঁটসাঁট করিবার চেষ্টা করিয়াছি। এরূপ স্থলে তাহার অনেক সুরচিত সুপাঠ্য অংশও নিশ্চয়ই বাদ পড়িয়াছে।'[২০] সত্যই অনেক 'সুরচিত সুপাঠ্য অংশ' রবীন্দ্রনাথের কাঁচিতে কাটা পড়েছে—নৌকাডুবি সম্পর্কে সমালোচকদের একটি বড়ো অভিযোগ ঘটনার আকস্মিক যোগাযোগ, প্রথম প্রকাশের সময়ে মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণে উপন্যাস-কাহিনীর

অনেকটাই সংগতিপূর্ণ ছিল—কিন্তু কিছু বিশ্লেষণ ও ঘটনা বর্জিত হওয়ায় যে শূন্যতা সৃষ্টি হয়েছে তা কেবলমাত্র সংহতিগুণে পূর্ণ হয়নি। আশা করব, কোনোদিন বর্জিত অংশগুলি গ্রন্থপরিচয়-এ সংকলিত হবে। নৌকাডুবি গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় 2 Sep [রবি ১৭ ভাদ্র]।

বেঙ্গল লাইব্রেরির তালিকানুযায়ী ইংরাজি সোপান দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশিত হয় 15 Jun [শুক্র ১ আষাঢ়] গ্রন্থটির ৪১ পৃষ্ঠার প্রথম ভাগটি প্রকাশিত হয়েছিল 7 May 1904 [শণি ২৫ বৈশাখ ১৩১১], তখন এতে উপক্রমণিকা অংশ ছিল না; ৪৪ পৃষ্ঠার দ্বিতীয় ভাগ প্রকাশিত হয় 28 Oct 1904 [শুক্র ১২ কার্তিক], তৃতীয় ভাগ তার অন্তর্ভুক্ত হয়নি। বর্তমানে উপক্রমণিকা-সহ প্রথম ভাগটি প্রথম খণ্ড এবং দ্বিতীয় ও তৃতীয় ভাগ একত্রে দ্বিতীয় খণ্ড রূপে মুদ্রিত হয়। রবীন্দ্র-রচনাবলী অচলিত সংগ্রহ দ্বিতীয় খণ্ডে গ্রন্থটির এই সংস্করণটি পুনর্মুদ্রিত হয়েছে। বৈশাখ ১৩১৩-সংখ্যা ভাণ্ডার-এ রবীন্দ্রনাথের 'বিশেষ দ্রষ্টব্য'-শীর্ষক ভূমিকা-সহ দুটি খণ্ডের বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয় কেদারনাথ দাসগুপ্তের নামে—তিনিই খণ্ডগুলি মুদ্রণের দায়িত্ব নেন; ভাণ্ডার-এর মুদ্রক ২৭ হরিতকী বাগান লেন কমার্শিয়াল প্রেসের কে. সি. আইচ এই দুটি খণ্ডও মুদ্রিত করেন। বেঙ্গল লাইব্রেরির তালিকা থেকে জানা যায়, আট আনা দামের ৩৮+৪৪ পৃষ্ঠার দ্বিতীয় খণ্ডটি ১০০০ কপি ছাপা হয়েছিল। বইটি হয়ত কিছুদিন আগেই প্রকাশিত হয় : ২০ জ্যৈষ্ঠ [রবি 3 Jun] রবীন্দ্রনাথ সুবোধচন্দ্র মজুমদারকে লেখেন : 'ইংরেজী সোপান দ্বিতীয় খণ্ড ত পেয়েছ! অনেকগুলো ছাপার ভুল দেখলুম। এই খণ্ডটি একদিন অন্তর সত্যরঞ্জন [বসু] নরেন খাঁদের ক্লাসে পড়ালে হয়।'[২১]

কেদারনাথ দাসগুপ্ত 'রবীন্দ্র বাবুর নূতন কবিতার বহি' খেয়া প্রকাশের দায়িত্বও গ্রহণ করেন। বৈশাখ সংখ্যা ভাণ্ডার-এ 'সত্বরই প্রকাশিত হইবে' বলে বিজ্ঞাপনও মুদ্রিত হয়। কিন্তু গ্রন্থটি সত্বর প্রকাশিত হয়নি, আষাঢ়-সংখ্যাতেও বিজ্ঞাপনটি একই ভাষায় মুদ্রিত হয়েছে। বেঙ্গল লাইব্রেরির তালিকানুযায়ী গ্রন্থটির প্রকাশ-তারিখ 10 Aug [শুক্র ২৫ শ্রাবণ]। প্রকাশ বিলম্বিত হওয়ায় রবীন্দ্রনাথ আরও কবিতা লিখে গেছেন, সেগুলিও গ্রন্থটির অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। তিনি অন্তত ১৬ আষাঢ় [শনি 30 Jun] পর্যন্ত শান্তিনিকেতনে ছিলেন, তার মধ্যে সাতটি কবিতা লেখেন। কলকাতায় গিয়েও উৎসর্গ-কবিতা-সহ তিনটি কবিতা রচনা করেন। কবিতাগুলি হল :

২ আষাঢ় [শনি 16 Jun] 'প্রচ্ছন্ন' ['কোথা ছায়ার কোণে দাঁড়িয়ে তুমি··'] দ্র খেয়া ১০।১৭৪-৭৬

৮ ছত্রের ৬টি স্তবকে কবিতাটি সম্পূর্ণ হয়, কিন্তু রচনা-শেষে চিহ্ন দিয়ে ষষ্ঠ স্তবকটিকে তৃতীয় স্তবকে ['আজি কোন্ লাজে বা বলব আমি···'] পরিণত করা হয়েছে।

৪ আষাঢ় [সোম 18 Jun] 'অনুমান' ['পাছে দেখি তুমি আস নি, তাই'] দ্র খেয়া ১০।১৭৬-৭৭

৭ আষাঢ় [বৃহ 21 Jun] 'বর্ষাপ্রভাত' ['ওগো এমন সোনার মায়াখানি'] দ্র খেয়া ১০।১৭৭-৭৯

৯ আষাঢ় [শনি 23 Jun] 'সব-পেয়েছি'র দেশ' ['সব-পেয়েছি'র দেশে কারো'] দ্র খেয়া ১০।১৮১-৮৩; ভাণ্ডার, শ্রাবণ। ১৪৭-৪৯

৯ আষাঢ় রাত্রি [শনি 23 Jun] 'বর্ষাসন্ধ্যা' ['আমায় অমনি খুশি করে রাখো'] দ্র খেয়া ১০।১৭৯-৮০

১০ আষাঢ় [রবি 24 Jun] 'হারাধন' ['বিধি যেদিন ক্ষান্ত দিলেন'] দ্র খেয়া ১০।১৭১-৭২

১৩ আষাঢ় [বুধ 27 Jun] 'চাঞ্চল্য' ['নিশ্বাস রুধে দু চক্ষু মুদে'] দ্র খেয়া ১০।১৭২-৭৪

এর পরের কবিতাগুলি কলকাতায় লেখা:

১৮ আষাঢ় [সোম 2 Jul] 'উৎসর্গ' ['বন্ধু, এ যে আমার লজ্জাবতী লতা'] দ্র খেয়া ১০।৯৫-৯৬

খেয়া কাব্যগ্রন্থটি রবীন্দ্রনাথ বন্ধু 'বিজ্ঞানাচার্য জগদীশচন্দ্র বসু'কে উৎসর্গ করেন। উৎসর্গ-কবিতাটি তিনি লেখেন খেয়া-র পূর্বর্তন পাণ্ডুলিপির [Ms. 110 (i)] অবশিষ্ট শেষ পৃষ্ঠাটিতে [p. 127]। কিন্তু মুদ্রিত গ্রন্থে কলিকাতা/২৮ আষাঢ় ১৩১৩' যে-তারিখটি আছে সেটি ঠিক নয়, পাণ্ডুলিপিতে স্পষ্টতই '১৩১৩/১৮ই আষাঢ়/ কলিকাতা' লেখা দেখা যায়। বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগের সুলভ-সংস্করণ রবীন্দ্র-রচনাবলী পঞ্চম খণ্ডে [১৩৯৪] ভ্রমটি সংশোধিত হয়েছে।

১৯ আষাঢ় [মঙ্গল ৩ Jul] 'সার্থক নৈরাশ্য' ['তখন ছিল যে গভীর রাত্রিবেলা'] দ্র খেয়া ১০।১৮৪-৮৫

২০ আষাঢ় [বুধ 4 Jun] 'প্রার্থনা' ['আমি বিকাব না কিছুতে আর'] দ্র খেয়া ১০।১৮৪-৮৫

বস্তুত খেয়া কবিতাগুচ্ছের এটিই শেষ কবিতা। এর পরে রবীন্দ্রনাথ ১৩১৩ বঙ্গাব্দে কয়েকটি গান লেখেন, যেগুলি গীতাঞ্জলি [১৩১৭]-তে সংকলিত হয়েছে—কিন্তু 'আমার মাথা নত করে দাও হে তোমার' [১৩১৩ বঙ্গাব্দের মাঘোৎসবে গীত দ্র তত্ত্ব°, ফাল্গুন। ১৮০-৮১; গীতাঞ্জলি ১১।৫] গানটি ছাড়া অন্যগুলির সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট কিছু বলা শক্ত। গানগুলি হল:

[২] 'আমি বহু বাসনায় প্রাণপণে চাই' দ্র বঙ্গদর্শন, আশ্বিন ১৩১৪।২৯৮; গীতাঞ্জলি ১১।৬

[৩] 'কত অজানারে জানাইলে তুমি' দ্র তত্ত্ব°, ফাল্গুন ১৮৩০ শক [১৩১৫]। ১৮০; ঐ ১১।৬-৭

[৪] 'বিপদে মোরে রক্ষা করো' দ্র বঙ্গদর্শন, ভাদ্র ১৩১৪।২১৫; ঐ ১১।৭-৮

'কত অজানারে' গানটির রবীন্দ্র-হস্তাক্ষরে লিখিত একটি নকল পাওয়া যায় গীতাঞ্জলি-র ইংরেজি পাণ্ডুলিপিতে [রবীন্দ্রভবনে রক্ষিত ফোটোকপি: Ms. 429 (i)], অন্যগুলির পাণ্ডুলিপি পাওয়া যায়নি।

প্রথম দুটি সংখ্যা প্রকাশের বিশৃঙ্খলার পর আষাঢ়-সংখ্যা বঙ্গদর্শন [৬।৩] যথাসময়েই 15 Jun [শুক্র ১ আষাঢ়] প্রকাশিত হয়। এই সংখ্যায় রবীন্দ্রনাথের দুটি রচনা মুদ্রিত হয়:

১১০-১৪ 'শুভবিবাহ' দ্র আধুনিক সাহিত্য ৯।৪৯১-৯৪

১৪৩-৫৮ 'শিক্ষাসমস্যা' দ্র শিক্ষা ১২।২৯৫-৩১৩

অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরীর পত্নী শরৎকুমারী চৌধুরানীর [1861-1920] সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ তথা ঠাকুর-পরিবারের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। অক্ষয়চন্দ্রের মৃত্যুর পরেও সেই সম্পর্ক শিথিল হয়নি, তাঁর জামাতা যতীন্দ্রনাথ বসুকে ত্রিপুরার রাজসরকারে চাকুরি করে দেওয়ার ব্যাপারে রবীন্দ্রনাথ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেন, শরৎকুমারীকেও তিনি যুবরানীর শিক্ষয়িত্রীর পদে নিয়োগের ব্যবস্থা করে তাঁর অর্থকৃচ্ছ্রতার সমাধান করেছিলেন। গার্হস্থ্যজীবনের খুঁটিনাটি চিত্র অঙ্কনে তাঁর দক্ষতার পরিচয় ভারতী-র বিভিন্ন গদ্যরচনায় ছড়িয়ে আছে—'শুভবিবাহ' [প্রথম প্রকাশ : 26 Mar 1906: ১২ চৈত্র ১৩১২] উপন্যাসটি তার উজ্জ্বলতম উদাহরণ। শরৎকুমারী চৌধুরাণীর রচনাবলী [১৩৫৭]-র সম্পাদক ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস লিখেছেন :'লেখাটির গুণে মুগ্ধ হইয়া রবীন্দ্রনাথ তৎপরিচালিত নব পর্য্যায় 'বঙ্গদর্শনে' প্রকাশ করিবার জন্য পেন্সিলে লেখা পাণ্ডুলিপি ধরিয়াই টানাটানি করিয়াছেন, কিন্তু শরৎকুমারীকে রাজী করাইতে পারেন নাই।' নিশ্চয়ই তাঁরই চেষ্টায় পরে মজুমদার

লাইব্রেরি থেকে রচনাটি লেখিকার আত্মপ্রচার-বিমুখতার জন্য নামহীন অবস্থায় গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়, রবীন্দ্রনাথ তাঁর কর্তব্য করলেন এই সমালোচনা-প্রবন্ধে। মহৎ আর্ট মাত্রই স্তব, রাস্কিনের এই মতের সমালোচনা করে তিনি লিখলেন, 'শুভবিবাহ' গ্রন্থে সৌন্দর্যের ছবি ও মহত্ত্বের আদর্শ না থাকলেও জীবনের সহজ আনন্দের প্রকাশেই গ্রন্থটি আস্বাদ্য হয়েছে :

'শুভবিবাহ' একটি গল্পের বই, স্ত্রীলোকের লেখা, ইহার গল্পের ক্ষেত্রটি কলিকাতা কায়স্থসমাজের অন্তঃপুর। এটুকু বলিতে পারি, মেয়ের কথা মেয়েতে যেমন করিয়া লিখিয়াছে, এমন কোনো পুরুষ-গ্রন্থকার লিখিতে পারিত না।

পরিচয় থাকিলেই তাহার বিষয়ে যে সহজে লেখা যায়, এ-কথা ঠিক নহে। নিত্য-পরিচয়ে আমাদের দৃষ্টিশক্তির জড়তা আনে—মনকে যাহা নূতন করিয়া, বিশেষ করিয়া আঘাত না করে, মন তাহাকে জানিয়াও জানে না। তাহা সুপরিচিত, তাহার প্রতিও মনের নবীন ঔৎসুক্য থাকা একটি দুর্লভ ক্ষমতা।

'শুভবিবাহে' লেখিকা সেই ক্ষমতা প্রচুরপরিমাণে প্রকাশ করিয়াছেন। এমন সজীব সত্য চিত্র বাংলা কোনো গল্পের বইয়ে আমরা দেখি নাই। গ্রন্থে বর্ণিত অন্তঃপুর ও অন্তঃপুরিকাগণ যে লেখিকার বানানো, এ-কথা আমরা কোনো জায়গাতেই মনে করিতে পারি নাই। তাহারাই দেদীপ্যমান সত্য এবং লেখিকা উপলক্ষ্যমাত্র।

ইতিপূর্বে শ্রীশচন্দ্র মজুমদারের লেখায় তিনি এই সহজরসের সন্ধান পেয়ে তাঁকে 'কোনোরকম জটিলতা বা চরিত্রবিশ্লেষণ বা দুর্দান্ত অসাধারণ হৃদয়াবেগ এনে স্বচ্ছ মধুর শান্তিময় ঘটনাস্রোতকে ঘোলা' না করে তুলতে পরামর্শ দিয়েছিলেন, কিন্তু শ্রীশচন্দ্র অসাধারণত্বের মোহে সেই পরামর্শ গ্রহণ করেননি। 'শুভবিবাহ' গ্রন্থে শরৎকুমারী আপন স্বভাববৈশিষ্ট্যেই রবীন্দ্রনাথের আকাঙ্ক্ষিত সারল্যকে মর্যাদা দিয়েছেন দেখে তিনি লিখেছেন : 'রোমান্টিক উপন্যাস বাংলাসাহিত্যে আছে, কিন্তু বাস্তবচিত্রের অত্যন্ত অভাব। এজন্যও এই গ্রন্থকে আমরা সাহিত্যের একটি বিশেষ লাভ বলিয়া গণ্য করিলাম। য়ুরোপীয় সাহিত্যে কোথাও কোথাও দেখিতে পাই, মানবচরিত্রের দীনতা ও জঘন্যতাকেই বাস্তবিকতা বলিয়া স্থির করা হইয়াছে। আমাদের আলোচ্য বাংলা গ্রন্থটিতে পঙ্কিলতার নামগন্ধমাত্র নাই, অথচ বইটির আগাগোড়ায় এমন কিছু নাই, যাহা সাধারণ নহে, স্বাভাবিক নহে, বাস্তব নহে।' সমকালীন য়ুরোপীয় উপন্যাসের তথাকথিত 'বাস্তবতা' সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের মনোভাবটিও এখানে লক্ষণীয়।

'শিক্ষাসমস্যা' প্রবন্ধটি রবীন্দ্রনাথ ২৩ জ্যৈষ্ঠ [বুধ 6 Jun] ওভারটুন হলে পাঠ করেন ও জ্যৈষ্ঠ-সংখ্যা ভাণ্ডার-এ [পৃ ৭৯-৯৮] মুদ্রিত হয়। প্রবন্ধটি সম্পর্কে আমরা পূর্বেই আলোচনা করেছি।

ভাণ্ডার, আষাঢ় ১৩১৩ [২।৩] :

১১৫-১৬ 'কোকিল' দ্র খেয়া ১০।১৫৮-৬০

১২৩-২৯ 'শিক্ষা-সংস্কার' দ্র শিক্ষা ১২।২৮৯-৯৫

জাতীয় শিক্ষাপরিষদের কর্মপ্রণালীর সঙ্গে যুক্ত হবার ফলে রবীন্দ্রনাথ শিক্ষার সমস্যা সম্পর্কে যা ভাবছিলেন, তা ইতিপূর্বে 'শিক্ষাসমস্যা' ভাষণ ব্যক্ত করেছিলেন। এমন সময়ে ইংরেজি সাপ্তাহিক Speaker পত্রিকায় আইরিশ শিক্ষা-সংস্কার সম্পর্কে একটি প্রবন্ধ পাঠ করে তিনি বিষয়টি সম্বন্ধে দেশবাসীকে অবহিত করতে চেয়ে বর্তমান প্রবন্ধটি লিখলেন, অবশ্য দেশীয় ক্ষেত্রে এই সংস্কারগুলি প্রয়োগ করা সম্পর্কে তাঁর নিজস্ব মতামতও এখানে ব্যক্ত হয়েছে। য়ুরোপের অন্ধকার যুগে আয়ার্ল্যাণ্ডেই বিদ্যার চর্চা জেগে ছিল বলে য়ুরোপের বিভিন্ন দেশ থেকে বিদ্যার্থীরা সেখানে সমবেত হত এবং আমাদের দেশের টোলের মতো তারা আহার বাসস্থান পুঁথি ও শিক্ষা বিনামূল্যেই লাভ করত। সেখানে শিক্ষার ভাষা ছিল আইরিশ—লাটিন গ্রীক ও

হিব্রু ভাষা এবং প্রচলিত বিজ্ঞান শেখানো হত সেই ভাষাতেই। কিন্তু দিনেমার ও ইংরেজদের আক্রমণে এই ব্যবস্থা বিপর্যস্ত হয় ও উনিশ শতকে 'ন্যাশনাল স্কুল' প্রণালী চালু করে আইরিশ ভাষা ইতিহাস ভূবৃত্তান্ত পড়া বন্ধ করে দিয়ে আইরিশদের ইংরেজ করে তোলার চেষ্টা শুরু হয়। ফলে 'আইরিশ-ভাষী ছেলেরা বুদ্ধি এবং জিজ্ঞাসা লইয়া বিদ্যালয়ে প্রবেশ করিল আর বাহির হইল পঙ্গু মন ও জ্ঞানের প্রতি বিতৃষ্ণা লইয়া। ইহার কারণ, এ শিক্ষাপ্রণালী কলের প্রণালী, ইহাতে মন খাটে না, ছেলেরা তোতাপাখি বনিয়া যায়।' সেখানকার মাধ্যমিক শিক্ষাতেও 'পরীক্ষাফলের প্রতি অতিমাত্র লোভ করিয়া কলেজে শেখাইবার চেষ্টা হয় না, কেবল গেলাইবার আয়োজন হয়। ইহাতে হাজার হাজার আইরিশ ছাত্রের স্বাস্থ্য নষ্ট এবং বুদ্ধি বন্ধ্যা হইয়া যাইতেছে।'

ভারতবর্ষের অবস্থাও অনেকটা এইরকম। 'বিদ্যাশিক্ষায় আমাদেরও মন খাটিতেছে না—আমাদেরও শিক্ষাপ্রণালীতে কলের অংশ বেশি।' বিদেশী ভাষা শিক্ষাতেই অনেকদিন কেটে যায়, কিন্তু জ্ঞান ও ভাবকে গ্রহণ করার সঙ্গে সঙ্গে প্রকাশ করার চর্চা না থাকায় 'আমাদের পাণ্ডিত্য অল্প কিছু দূর পর্যন্ত অগ্রসর হয়, আমাদের উদ্ভাবনাশক্তি শেষ পর্যন্ত পৌঁছে না, আমাদের ধারণাশক্তির বলিষ্ঠতা নাই।' কর্তৃপক্ষ এর সঙ্গে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সিদ্ধ করার মানসে শিক্ষাব্যাপারে দেশীয় লোকের স্বাধীনতা খর্ব করিতে উদ্যত। ডিসিপ্লিনের যন্ত্রটাতে অতিরিক্ত পাক দিয়ে ছেলেদের সংযত করার বদলে নিঃসত্ত্ব করা হচ্ছে।

আইরিশ জাতি তাদের বিদ্যাবিভ্রাটের প্রতিকারস্বরূপ দেশের শিক্ষাভার নিজের হাতে নিতে চায়। গবর্মেন্ট-প্রতিষ্ঠিত সিনেট-সিণ্ডিকেটে বাঙালি থাকলেই শিক্ষার ভার নিজের হাতে রইল, রবীন্দ্রনাথ একথা স্বীকার করেন না। 'বর্তমানকালে যে একটিমাত্র সাধক য়ুরোপে গুরুর আসনে বসিয়া নিরন্তর অরণ্যে রোদন করিয়া মরিতেছেন' সেই টলস্টয় রাশিয়ার শিক্ষানীতি সম্বন্ধে যা বলেছেন তা থেকে দীর্ঘ উদ্ধৃতি দিয়ে তিনি নিজের এই বক্তব্য সমর্থন করেছেন : 'আমরা গবর্মেন্টের সম্মতির অধীনে যখন বাহ্যস্বাতন্ত্র্যের একটা বিড়ম্বনা লাভ করি, তখনই আমাদের বিপদ সব চেয়ে বেশি। তখন প্রসাদলব্ধ সেই মিথ্যা স্বাতন্ত্র্যের মূল্য যাহা দিতে হয়, তাহাতে মাথা বিকাইয়া যায়। বিশেষত দেশীলোককে দিয়াই দেশের মঙ্গল দলন করা গবর্মেন্টের পক্ষে কিছুমাত্র কঠিন নহে, নইলে এ দেশের দুর্গতি কিসের। অতএব, চাকরির অধিকার নহে, মনুষ্যত্বের অধিকারের যোগ্য হইবার প্রতি যদি লক্ষ্য রাখি, তবে শিক্ষা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ স্বাতন্ত্র্য-চেষ্টার দিন আসিয়াছে, এ-বিষয়ে সন্দেহ নাই। দেশের লোককে শিশুকাল হইতে মানুষ করিবার সদুপায় যদি নিজে উদ্ভাবন এবং তাহার উদ্যোগ যদি নিজে না করি, তবে আমরা সর্বপ্রকারে বিনাশপ্রাপ্ত হইব—অন্নে মরিব, স্বাস্থ্যে মরিব, বুদ্ধিতে মরিব, চরিত্রে মরিব—ইহা নিশ্চয়।'

স্বাস্থ্যোদ্ধারের জন্য মজঃফরপুর গিরিডি প্রভৃতি ভ্রমণে এবং বঙ্গভঙ্গ ও স্বদেশী আন্দোলনের জন্য কলকাতা যাতায়াতে ১৩১২ বঙ্গাব্দের অনেকটা সময় রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্যাশ্রমের কাজে মনোযোগ দিতে পারেননি। ঐ বৎসর বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের লেখা তাঁর চিঠিপত্রও যথেষ্ট উদ্ধার করা যায়নি। ফলে সেখানকার কাজকর্ম ও সে-সম্পর্কে তাঁর নির্দেশাবলী জানার সুযোগ আমরা কমই পেয়েছি। বর্তমান বৎসরের প্রথম দুটি মাসের ক্ষেত্রেও অবস্থার পরিবর্তন হয়নি। কিন্তু জ্যৈষ্ঠের শেষে শান্তিনিকেতনে এসে তিনি যে বিদ্যালয়ের কাজে নিজেকে যুক্ত করেছেন, তা জানা যায় ২ আষাঢ় [শনি 16 Jun] মহিমচন্দ্র দেববর্মাকে লেখা

তাঁর একটি পত্রে : 'প্রায় সকল কর্ম্ম থেকেই অবসর নিয়েছি—এখন কেবল বিদ্যালয়ের ছাত্রদের পড়াচ্ছি। তোমার রেণু [সোমেন্দ্রচন্দ্র] আমার ক্লাসে বাংলা পড়ে।' ছুটির সময়েও যাতে ছাত্রদের সুশিক্ষার ধারা অব্যাহত থাকে সে-সম্পর্কেও তিনি সচেতন ছিলেন: 'ছুটীর সময়ে রেণুকে একটু বিশেষ সাবধানে রাখা দরকার হবে। সেই দীর্ঘ অবকাশের সময় যাতে সে তার পুরাতন সঙ্গীদের সঙ্গে মিশে আবার সকল বিষয়ে আলগা হয়ে না যায় বিশেষ দৃষ্টি রেখো।···ছুটীর সময়ে যদি মোক্ষদাবাবু রেণুকে এবং তাঁর ছেলেকে [সত্যরঞ্জন বসু] নিজের কাছে রেখে এখানকার বিদ্যালয়ের পাঠ্য-পুস্তক অল্প করে নিজে পড়াতে থাকেন তাহলে ভাল হয়। তোমাদের বাড়ীতে সমস্ত হট্টগোল—তুমি সকল সময়ে দেখবার সময় পাও না—এবং নানা কর্ত্তা ও কর্ত্রীপক্ষে মিলে ছেলেদের মনকে সর্ব্বদা বিক্ষিপ্ত করে দিলে বড়ই অনিষ্ট হয়।'[২২] রবীন্দ্রভবনে রক্ষিত মূল পত্রে সম্ভবত মোক্ষদাকুমার বসুর উদ্দেশে লেখা একটি দীর্ঘ নোটে মহিমচন্দ্র রবীন্দ্রনাথের এই মঙ্গলকাঙ্ক্ষার জন্য কৃতজ্ঞতা ও শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেছেন।

জাতীয় শিক্ষাপরিষদের গঠনপ্রণালী, পাঠ্যসূচী ও প্রশ্নপত্র প্রণয়নে রবীন্দ্রনাথের কার্যকরী ভূমিকার কথা আমরা পূর্বে আলোচনা করেছি। বিদ্যালয়ের ছাত্রদের এই কার্যক্রমের সঙ্গে যুক্ত করার ব্যাপারে তাঁর মনোভাবের কথা জানা যায় সুবোধচন্দ্র মজুমদারকে লেখা ২০ জ্যৈষ্ঠের [রবি 3 Jun] পত্রে : 'অরুণকে [সেন] দীনেশবাবু এক সপ্তাহের মত চান—অরুণই শুনচি আসতে চেয়েছে। অতএব পাঠিয়ে দেওয়াই ভাল—কিন্তু তাহলে তাকে জাতীয় শিক্ষাপরিষদের পরীক্ষায় উপস্থিত হতে দেওয়া চলবে না।দেখছি কেবল উপেন [ভট্টাচার্য] আর সুজিতকে [চক্রবর্ত্তী] পরীক্ষায় পাঠান সঙ্গত হবে।' জাতীয় শিক্ষাপরিষদের পাঠক্রমে কারিগরী শিক্ষার গুরুত্ব নিয়ে মতভেদ দেখা দেওয়ায় তারকনাথ পালিত, ডাঃ নীলরতন সরকার প্রভৃতি ৯২ আপার সার্কুলার রোডে The Bengal Technical Institute নামক একটি স্বতন্ত্র প্রতিষ্ঠান স্থাপন করার সিদ্ধান্ত নেন। পারিবারিক ও আর্থিক সূত্রে তারকনাথ পালিতের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ ঘনিষ্ঠ ছিলেন। সুতরাং টেকনিক্যাল স্কুলেরও কিছু দায়িত্ব তাঁকে বহন করতে হয়েছে। উক্ত পত্রে তিনি লিখেছেন : 'তারকবাবুরা আমাকে ধরেছেন যে আমাদের স্কুলের তিনমাস ছুটির সময় সানোসান যদি তাঁদের টেকনিক্যাল বিদ্যালয়ের ছাত্রদের জুজুৎসু শেখান এবং তার পর থেকে হপ্তায় দুদিন করে এসে Exercise করিয়ে যান ত ভাল হয়। আমি জানি সানোসান ঐ সময়ে ছুটিতে পাহাড়ে যেতে ইচ্ছুক অতএব এ প্রস্তাবে তিনি বোধ হয় সম্মত হবেন না। যাহোক তাঁর মত পেলে আমি পালিতকে জানাব।'[২৩] এই প্রস্তাবের কী পরিণতি হয়েছিল আমাদের জানা নেই, কিন্তু কার্যসূত্রে রবীন্দ্রনাথ জাতীয় শিক্ষাপরিষদের সঙ্গেই অধিকতর ঘনিষ্ঠ ছিলেন।

তিনি এইসময়ে কুমুদিনী মিত্র এবং স্নেহলতা সেন ও ললিতা গুপ্তকে যে-দুখানি চিঠি লেখেন, সেগুলি পরে বিজ্ঞাপন ও ভূমিকা-রূপে ব্যবহৃত হয়। কুমুদিনী মিত্র [বসু] কৃষ্ণকুমার ও লীলাবতী মিত্রের কন্যা, এঁদের বিবাহে রবীন্দ্রনাথ বিবাহ-সংগীত লিখে দিয়েছিলেন। কুমুদিনীর 'মেরী কার্পেন্টার' বইটি পেয়ে রবীন্দ্রনাথ ১১ আষাঢ় [সোম 25 Jun] শান্তিনিকেতন থেকে তাঁকে লেখেন : 'তোমার মেরী কার্পেন্টার' গ্রন্থখানি উপহার পাইয়া প্রীত হইলাম। আমার ছেলেদের পড়িবার জন্য ইতিপূর্ব্বে তোমার শিখের বলিদান একখানি আনাইয়াছিলাম। বইখানি পড়িয়া ছিঁড়িয়া শেষ করিয়া ফেলিতে বিলম্ব হয় নাই।' মাঘ ১৩১১-তে প্রকাশিত 'শিখের বলিদান' গ্রন্থটি জনপ্রিয় হয়েছিল, ১৩১৪ বঙ্গাব্দের মধ্যে বইটির তৃতীয় 'সংশোধিত ও পরিবর্দ্ধিত'

সংস্করণ প্রকাশই তার প্রমাণ। বইটির আখ্যাপত্রের পরের পৃষ্ঠায় রবীন্দ্রনাথের 'বন্দী বীর' ['পঞ্চনদীর তীরে'] কবিতার ছ'টি ছত্র উদ্ধৃত হয়। তৃতীয় সংস্করণের বইটির শেষে অন্যান্য পত্রিকার সমালোচনার সঙ্গে 'Babu Rabindra Nath Tagore, the premier poet of Bengal writes:—' বলে সম্পূর্ণ চিঠিটি উদ্ধৃত হয়, বিভিন্ন পত্রিকায় বিজ্ঞাপন হিসেবে চিঠির কয়েকটি বাক্য ব্যবহৃত হয়েছে।

স্নেহলতা সেন [1874-1967] ও ললিতা গুপ্ত বিহারীলাল [1848-1916] ও সৌদামিনী গুপ্তের [মৃত্যু : 27 Apr 1903] কন্যা। এই পরিবারের সঙ্গেও কৈশোরাবধি রবীন্দ্রনাথের ঘনিষ্ঠতা ছিল, বিহারীলাল কটকে ডিস্ট্রিক্ট জজ থাকার সময়ে তিনি ও বলেন্দ্রনাথ তাঁদের সহযাত্রী হয়ে ভুবনেশ্বর পুরী কনারক প্রভৃতি স্থানে ভ্রমণ করেন [1893]। মায়ের স্মরণে নিবেদিত দুই ভগ্নীর রচিত 'বিচিত্র গল্প' ও *A Garland of Fancies*-এর একত্র সংগ্রহ 'যুগলাঞ্জলি' সম্বন্ধে এই সম্পর্কের স্মৃতিচারণ করে ২১ আষাঢ় [বৃহ 5 Jul] রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতন থেকে লেখেন :

> একদিন যাহাদিগকে অস্ফুটবাক্ শিশুকালে পিতামাতার কোলে বাড়িতে দেখিয়াছি, আজ সংসারের নানা সুখদুঃখের নানা চিন্তা ও বেদনার আঘাতে তাহাদের চিত্ত যখন গানে ও গল্পে আপনাকে ব্যক্ত করিতে থাকে, তখন পিতৃবন্ধুদের মনে বিস্ময় উপস্থিত হয়।···এখানে আমরা সাহিত্যের পাঠক নহি। তোমাদের শিশুকালের স্মৃতিবিজড়িত পিতৃগৃহে যে অপর্যাপ্ত স্নেহসমাদর লাভ করিয়াছি, তোমাদের লেখার ভিতর দিয়া সেই বহুদিনের কথাও জাগিয়া উঠে এবং সেই সঙ্গে মনে পড়ে তোমাদের মাতৃদেবীর লক্ষ্মীহস্তের অশ্রান্ত আতিথ্য। আজ কন্যার যুগলাঞ্জলি হইতে সেই স্বর্গধামবাসিনী মর্ত্যলোকের উপহার গ্রহণ করিতেছেন স্মরণ করিয়া তোমাদের এই স্বহস্তরচিত ভক্তি-অভিষিক্ত অর্ঘ্যের সহিত আমারও অন্তরের শ্রদ্ধা সম্মিলিত করিলাম।[২৪]

—এই পত্রটিই 'যুগলাঞ্জলি' গ্রন্থের ভূমিকা হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

রবীন্দ্রনাথ কলকাতায় এসেছিলেন অর্শের চিকিৎসার জন্য। ১৯ আষাঢ় [মঙ্গল 3 Jul] তাঁর ক্যাশবহির হিসাবেই তথ্যটি জানা যায় : 'ব° এস এন ঘোষ কবিরাজ দং অর্শের পিড়ার ঔষধ তৈয়ারী জন্য—২ সপ্তার মূল্য উক্ত কবিরাজকে দেওয়া যায় ১৬ / ভিজিট ২/ গাড়িভাড়া ১/ ১৯'। এর দু'দিন পরেই তিনি শান্তিনিকেতনে ফিরে গিয়ে ২১ আষাঢ় [বৃহ 5 Jul] 'যুগলাঞ্জলি' গ্রন্থের পত্র-ভূমিকা রচনা করেন। খেয়া-র উৎসর্গ-কবিতা ও শেষ কবিতা 'প্রার্থনা' আগেই রচিত হয়েছিল, একথা আমরা পূর্বেই বলেছি।

বেঙ্গল লাইব্রেরির ক্যাটালগ অনুযায়ী খেয়া প্রকাশিত হয় 10 Aug 1906 [শুক্র ২৫ শ্রাবণ]। অর্ধ-নামপত্রে 'খেয়া' ও আখ্যাপত্র আছে :

খেয়া/শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।/ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম, বোলপুর।/ মূল্য ১ এক টাকা।

আখ্যাপত্রের পিছনের পৃষ্ঠায় :

মজুমদার প্রেশ,/৫০ নং কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট,/ কলিকাতা।

বেঙ্গল লাইব্রেরির ক্যাটালগে মুদ্রকের নাম তমিজুদ্দি মুনশি ও প্রকাশকের নাম-ঠিকানা ৫ সুকিয়া স্ট্রীটের কেদারনাথ দাশগুপ্ত। বস্তুত কেদারনাথই কাব্যগ্রন্থটি প্রকাশের সমস্ত দায়িত্ব বহন করেছিলেন। ভাণ্ডার পত্রিকার বিজ্ঞাপন থেকে জানা যায়, বিক্রয়ের দায়িত্বও ছিল তাঁর। স্বদেশী আন্দোলনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেওয়ার দায়ে নির্বাসনদণ্ডের আশঙ্কায় এই বছরের শেষে কেদারনাথ যখন ইংলণ্ডে যাওয়ার প্রস্তুতি শুরু করেন, তখন রবীন্দ্রনাথ গ্রন্থটি মুদ্রণের ব্যয় ইত্যাদি তাঁকে পরিশোধ করে দেন—সেই খবরটি পাওয়া যায় ক্যাশবহির ৩০ চৈত্রের [13 Apr 1907] হিসাবে : 'ব° কেদার নাথ দাসগুপ্ত/ দং "খেয়া" বহির তৈয়ারীর মূল্য শোধ/ ১০০০

হাজার বহি ছাপাইবার ১ বিল ২০২্’। ‘ইংরাজি সোপান’ বইটির দুটি ভাগও কেদারনাথের তত্ত্বাবধানে মুদ্রিত হয়। ‘১৮ চৈত্র কেদার দাসগুপ্তর বাটী হইতে “খেয়া” ও ইংরাজী সোপান বহি আনা মুটে’ ভাড়ার হিসাব থেকে বোঝা যায়, অবিক্রীত বইগুলি জোড়াসাঁকোয় এনে বিক্রয়ের ব্যবস্থা করা হয়। ইংরাজি সোপান-এর গ্রন্থস্বত্ব ব্রহ্মচর্যাশ্রমে প্রদত্ত হলেও খেয়া-র স্বত্বাধিকারী ছিলেন রবীন্দ্রনাথ নিজেই।

খেয়া-র পৃষ্ঠাসংখ্যা : ২+২+৪ [‘উৎসর্গ।/বিজ্ঞানাচার্য্য শ্রীযুক্ত জগদীশচন্দ্র বসু/ করকমলেষু।/···/১৮ই আষাঢ় ১৩১৩’]+৪ [সূচী]+১৭৪; মুদ্রণসংখ্যা : ১০০০। উৎসর্গ-সহ মোট ৫৪টি কবিতা এই গ্রন্থে মুদ্রিত হয়।

খেয়া-র একটি সমালোচনা বেরোয় অগ্র°-সংখ্যা প্রবাসী-তে [পৃ ৪৭২-৭৩]। তার আগেই কার্তিক-সংখ্যা প্রবাসী-তে রবীন্দ্রনাথের কবিতায় অস্পষ্টতার অভিযোগ করে দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের ‘কাব্যের অভিব্যক্তি’ [৩৬১-৬৬] প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। অজ্ঞাতনামা সমালোচক সুকৌশলে অভিযোগের ইঙ্গিতটি তাঁর সমালোচনায় ব্যবহার করে লেখেন : “যাঁহারা অত্যন্ত স্পষ্টতার প্রার্থী, তাঁহাদের নিকটে হয় ত অনেক কবিতাই উপেক্ষিত হইবে। ‘বিদায়’, ‘কোকিল’, ‘সমুদ্র’ এবং ‘সমাপ্তি’র মত খুব স্পষ্ট কবিতা এ গ্রন্থে বেশী নাই। ‘গোধূলিলগ্ন’ এবং ‘হারাধন’ খুব অস্পষ্ট না হইলেও অনেককে ঐ সকল কবিতা বুঝাইয়া দিতে হয়। সত্য সত্যই ফুটিতে পারে নাই, কাজেই অস্পষ্টতাদোষে দূষিত হইয়াছে, এরকম কেবল তিনটি কবিতা এ গ্রন্থে আছে, যথা—দান, বাঁশি এবং হার। অস্পষ্টতার কথা উঠিয়াছে বলিয়াই ৫৪টি কবিতার মধ্যে তিনটির বিকাশের অভাবের কথা বলিলাম।” মাঘ সংখ্যায় চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ‘খেয়া’-শীর্ষক একটি রচনায় [প ৫৬২-৬৩] এই সমালোচনার উত্তরে ‘দান’ ও ‘হার’ কবিতা-দুটি ব্যাখ্যা করে ‘কোকিল’, ‘অনাহত’, ‘অনাবশ্যক’ ও ‘গান শোনা’ কবিতাগুলির অর্থ বুঝিয়ে দেওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন।

রবীন্দ্রনাথ শিলাইদহ থেকে লেখা একটি তারিখহীন পত্রে শ্রীশচন্দ্র মজুমদারকে লিখেছিলেন : ‘এবারে ছুটিতে কো[থায়] যাইব তাই ভাবিতেছি। মী[রার] ইচ্ছা কোনো নূতন জায়গায় যাওয়া হয়। তুমি সন্ধান করিয়া দেখিয়ো পরেশ[নাথ] পাহাড়ে শ্রাবণ ভাদ্র আশ্বিন কার্ত্তিক কিরূপ স্বাস্থ্যের অবস্থা।’[২৫] কিন্তু বিদ্যালয়ের ছুটির সুযোগে, যে-কোনো কারণেই হোক, এরূপ ভ্রমণে যাওয়া সম্ভব হয়নি। তাই তিনি ছুটির সময়টি প্রধানত শান্তিনিকেতনেই কাটাতে মনস্থ করেন। পিসিমা রাজলক্ষ্মী দেবীর তত্ত্বাবধানে মীরা ও শমী তখন ‘নতুন বাড়ি’তে বাস করছিলেন; রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব একতলা বাড়ি ‘দেহলি’ও তখন প্রস্তুত হয়ে গেছে, তিনি আশ্রয় নিলেন এই গৃহে। সেখান থেকে ৩ শ্রাবণ [বৃহ 19 Jul] বন্ধুপত্নী অবলা বসুকে লিখেছেন : ‘অরবিন্দের জন্য কিছুমাত্র ভাববেন না। এবারে আসবামাত্র তাকে পিসিমার জিম্মা করে দেব—তিনি ওকে মাছ ভাত মাংস, সজনের ডাঁটা, কুমড়োর ফুল, লাউডগা-সিদ্ধ প্রভৃতি খাইয়ে তাজা করে তুলবেন।’ তাঁর স্নেহভিক্ষু মনটিরও পরিচয় আছে এই পত্রে, চিঠিতে ‘শ্রদ্ধাস্পদেষু’ প্রভৃতি বিভীষিকা প্রচার করতে নিষেধ করে তিনি লিখেছেন : ‘যদি স্নেহ করেন ত বাঁচি—তাহলে অল্প বয়সের স্মৃতিটাও মাঝে মাঝে মনে পড়ে। আমার এক বৌঠাকরুণ ছিলেন আমি ছেলেবেলায় তাঁর স্নেহের ভিখারী ছিলেম—তাঁকে হারানর পর আমার দ্রুতপদবিক্ষেপে বয়স বেড়ে উঠেছে এবং আমি সম্মান ও শ্রদ্ধা লাভ করে হয়রান্ হয়েছি। কিন্তু আপনার কাছে এ রকম নৃশংসতা প্রত্যাশা করি নি।···তার চেয়ে আমাকে আপনি “কবিবরেষু” বলে লিখবেন। আপনাদের কাছ থেকে এ রকম

উৎসাহজনক সম্ভাষণ পেলে হয়ত আমার কলমের বেগ আরো বাড়তে পারে—সেটাকে যদি দুর্ঘটনা জ্ঞান না করেন তবে দ্বিধা করবেন না।'[২৬]

পত্রের শেষে তিনি তাঁদের শান্তিনিকেতনে আহ্বান করলেও নিজে কয়েকদিন পরে মফস্বলে-ভ্রমণ বহির্গত হন। ১১ শ্রাবণ [শুক্র 27 Jul] শিলাইদহ থেকে ঢাকার উকিল বিভুচরণ গুহঠাকুরতার বাল্যবিধবা ভগিনী [পরবর্তীকালে বিদ্যালয়ের শিক্ষক অজিতকুমার চক্রবর্তীর পত্নী] লাবণ্যলেখাকে [?1891-1972] লেখেন : 'আমি এখনো শিলাইদহে আছি। আরো কিছুদিন থাকিয়া কালিগ্রামের নদীপথে যাত্রা করিব। নদী দিয়া সেখানে যাইতে ৬।৭ দিন লাগিবে। তুমি যখনই সুস্থ সবল হইয়া বোলপুরে যাইবে তখনই সেখানে তোমার স্থান গ্রহণ করিতে পারিবে। আমি থাকি বা না থাকি তাহাতে কিছুই আসে যায় না। তোমাকে সুবিধামত কেহ কলিকাতায় বেলার কাছে পাঠাইয়া দিলে সেখান হইতে তোমার বোলপুরে যাওয়া কঠিন হইবেনা। আমি সম্ভবত ভাদ্রমাসের আরম্ভে বোলপুরে ফিরিব।'[২৭]

রবীন্দ্রনাথ অবশ্য জাতীয় শিক্ষাপরিষদের আনুষ্ঠানিক উদ্‌বোধন উপলক্ষে ভাদ্রের পূর্বেই কলকাতায় ফিরে আসেন। ১৯ শ্রাবণ [শনি 4 Aug] ড প্রসন্নকুমার রায়ের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত পরিষদের একটি সভায় বোর্ড অফ স্টাডিজ কর্তৃক প্রস্তুত ও বিশেষ কমিটি দ্বারা সংশোধিত শিক্ষাক্রম অনুমোদিত হয়।[২৮] রবীন্দ্রনাথ বোর্ড অফ স্টাডিজ-এর সদস্য ও বাংলা বিভাগের ডিরেক্টর ছিলেন, সুতরাং এই সভায় তাঁর উপস্থিত থাকা স্বাভাবিক—কিন্তু তাঁর উপস্থিতির কোনো নির্ভরযোগ্য প্রমাণ পাওয়া যায়নি।

২৯ শ্রাবণ [মঙ্গল 14 Aug] বিকেল সাড়ে পাঁচটায় ড রাসবিহারী ঘোষের সভাপতিত্বে কলকাতা টাউন হলে জাতীয় শিক্ষাপরিষদের উদ্‌বোধনী সভা অনুষ্ঠিত হয়। রবীন্দ্রনাথ এই সভায় 'জাতীয় বিদ্যালয়' প্রবন্ধটি [দ্র বঙ্গদর্শন, ভাদ্র। ২৬১-৬৮; শিক্ষা ১২।৩১৩-২২] পাঠ করেন। এইদিন *The Bengalee* পত্রিকার সম্পাদকীয়তে লেখা হয়: 'Then will follow addresses in vernaculars—the Bengalee address being delivered by Babu Rabindra Nath Tagore—the grand Napoleon of the realm of Bengali rhyme—whose interest in the education of the rising generation has already borne a tangible fruit in the foundation of the Brahmacharya Asram at Bolpur.' পরের দিন [15 Aug] সভার প্রতিবেদনে পত্রিকাটি রবীন্দ্রনাথের বক্তৃতা সম্পর্কে লেখে : 'Babu Rabindra Nath Tagore next delivered an inspiring and charming address in Bengalee. It was quite characteristic of the great author and poet which held the vast audience quite spell-bound. His sonorous thunder made the whole meeting feel with him.' প্রবন্ধটির সংক্ষিপ্তসার দিয়ে পত্রিকাটি লেখে : 'The speaker concluded his able speech with a prayer for the success and long life of the council.'

পরিণামহীন আন্দোলন-আলোচনার প্রতি তাঁর অশ্রদ্ধা রবীন্দ্রনাথ বহু প্রবন্ধেই ব্যক্ত করেছেন। কিন্তু জাতীয় শিক্ষাপরিষদ প্রতিষ্ঠার দ্বারা দেশের সমবেত ইচ্ছার যে বাস্তব পরিণতি ঘটল তা স্বভাবতই তাঁর ভাবাবেগকে উদ্‌বেলিত করেছে। তারই প্রকাশ আছে বর্তমান ভাষণে। 'অনেকদিন পরে আজ বাঙালি যথার্থভাবে একটা-কিছু পাইল। এই পাওয়ার মধ্যে কেবল যে একটা উপস্থিত-লাভ আছে তাহা নহে, ইহা আমাদের একটা শক্তি। আমাদের যে পাইবার ক্ষমতা আছে, সে-ক্ষমতাটা যে কী এবং কোথায়, আমরা তাহাই বুঝিলাম। এই পাওয়ার আরম্ভ হইতে আমাদের পাইবার পথ প্রশস্ত হইল। আমরা বিদ্যালয়কে পাইলাম যে

তাহা নহে, আমরা নিজের সত্যকে পাইলাম, নিজের শক্তিকে পাইলাম।' তাঁর মতে, এইটিই প্রকৃত লাভ। দেশের শক্তিকে দেশের কাজে লাগাবার, তাকে কোথাও একত্রে সংগ্রহ করবার কোনো উপায় এতদিন না থাকায় সেই সামর্থ অপচয়িত হত। কিন্তু জাতীয়বিদ্যালয় আবির্ভূত হয়েছে সেই শক্তিসঞ্চয়ের উপায়রূপে, 'দেশের মহত্ত্ব এইখানে স্বভাবতই আকৃষ্ট হইয়া বাঙালিজাতির চিরদিনের সম্বলের মতো এই ভাণ্ডে এই ভাণ্ডারে রক্ষিত ও বর্ধিত হইতে থাকিবে।' এর গৌরব অন্যের সঙ্গে তুলনায় নয়, এর গৌরব বাঙালিজাতির প্রাণের মধ্যে। তাই ছাত্রদের আহ্বান করে তিনি বলেছেন : 'আজ তোমরা গৌরবে সমুদয় হৃদয় পরিপূর্ণ করিয়া স্বদেশের বিদ্যামন্দিরে প্রবেশ করো—তোমরা অনুভব করো, বাঙালিজাতির শক্তির একটি সফলমূর্তি তাঁহার সিংহাসনের সম্মুখে তোমাদিগকে আহ্বান করিয়াছেন; তাঁহাকে যে পরিমাণে যথার্থরূপে তোমরা মানিবে, তিনি সেই পরিমাণে তেজ লাভ করিবেন এবং সেই তেজে আমরা সকলে তেজস্বী হইব। এই যে জাতীয়শক্তির তেজ, ইহার কাছে ব্যক্তিগত সামান্য ক্ষতিবৃদ্ধি সমস্তই তুচ্ছ। তোমরা যদি এই বিদ্যাভবনের জন্য গৌরব অনুভব কর তবেই ইহার গৌরববৃদ্ধি হইবে। বড়ো বাড়ি, মস্ত জমি বা বৃহৎ আয়োজনে ইহার গৌরব নহে; তোমাদের শ্রদ্ধা, তোমাদের নিষ্ঠা, বাঙালির আত্মসমর্পণে ইহার গৌরব। বাঙালির ইচ্ছায় ইহার সৃষ্টি, বাঙালির নিষ্ঠায় ইহার রক্ষা—ইহাই ইহার গৌরব এবং এই গৌরবই আমাদের গৌরব।'

'জাতীয় বিদ্যালয়' প্রবন্ধটি আশাপূর্ণ আবেগের প্রকাশ, কিন্তু প্রায় সমকালে রচিত 'আবরণ' [দ্র বঙ্গদর্শন, ভাদ্র। ২১৩-২৪; শিক্ষা ১২।৩২২-৩৪] প্রবন্ধটিতে শিক্ষা সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের সুচিন্তিত মত ব্যক্ত হয়েছে। য়ুরোপীয় আদর্শে সভ্যতা ও আবরণের মধ্যে যে কৃত্রিম সম্পর্ক স্থাপন করা হয়েছে তা ভারতীয় আবহাওয়া ও মানসিকতার পক্ষে অবাঞ্ছনীয়—এই বক্তব্য থেকে তিনি শিক্ষাবিধির আলোচনায় পৌঁছে বলেছেন : 'আমাদেরশরীর যেমন কৃত্রিম জিনিসের আড়ালে পড়িয়া পৃথিবীর সঙ্গে গায়ে-গায়ে যোগটা হারাইয়াছে এবং হারাইয়া এমন অভ্যস্ত হইয়াছে যে, সে-যোগটাকে আজ ক্লেশকর লজ্জাকর বলিয়া মনে করে—তেমনি আমাদের মনটা এবং বাহিরের মাঝখানে বই আসিয়া পড়াতে আমাদের মন জগতের সঙ্গে প্রত্যক্ষ যোগের স্বাদ-শক্তি অনেকটা হারাইয়া ফেলিয়াছে।···জগতকে আমরা মন দিয়া ছুঁই।' না, বই দিয়া দুই। মানবসভ্যতায় পুস্তকের মূল্য অসামান্য, বিভিন্ন দেশের ও যুগের মানুষের অভিজ্ঞতা ও চিন্তালব্ধ জ্ঞানকে সঞ্চিত করার এত কার্যকরী মাধ্যম আর নেই। কিন্তু 'বইপড়াটাই যে শেখা, ছেলেদের মনে এই অন্ধসংস্কার যেন জন্মিতে দেওয়া না হয়।' লিপির ব্যবহার প্রচলিত হওয়া সত্ত্বেও আগেকার দিনে গুরু শিষ্যকে মুখে-মুখে শিক্ষা দিতেন ও ছাত্র তা খাতায় নয়, মনের মধ্যে লিখে নিত। মানব-সম্পর্কের সূত্রে এর ফলে 'এক দীপশিখা হইতে আর-এক দীপশিখা জ্বলিত'। বর্তমান কালে এতটা সম্ভব নয়, কিন্তু যতটা সম্ভব গুরুর মুখের কথা ছাত্রকে দিয়ে রচনা করিয়ে নেওয়া দরকার—তাতে স্বাধীন উদ্যমের দ্বারা জ্ঞানলাভ করার স্বাভাবিক মানসিক শক্তির বিকাশ হবে, উপর থেকে চাপিয়ে দেওয়া বিদ্যার দ্বারা আচ্ছন্ন ও অভিভূত হবে না। মনের আবরণ ঘোচানোর এই সাধনা রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাপরিকল্পনার একটি প্রধান লক্ষ্য—ব্রহ্মচর্যাশ্রম ও বিশ্বভারতীর বিভিন্ন কর্মকাণ্ড এই ভাবনার ভূমি থেকেই উদগত হয়েছে। প্রবন্ধটি কি তিনি কোনো সভায় পাঠ করেছিলেন? রচনার ভঙ্গি থেকে সেইরকমই মনে হয়।

এই প্রবন্ধ-দুটি বঙ্গদর্শন-এর ভাদ্র-সংখ্যায় [৬।৫] মুদ্রিত হয়। শ্রাবণ-সংখ্যা [৬।৪]-র ১৬৫-৬৯ পৃষ্ঠায় মুদ্রিত হয়েছিল 'মোহিতচন্দ্র সেন'-শীর্ষক শোক-প্রবন্ধটি। শ্রাবণ-ভাদ্র সংখ্যা ভাণ্ডার [২।৪]-এর ১৪৭-৪৯

পৃষ্ঠায় ছাপা হয় '"সব পেয়েছির" দেশ' [দ্র খেয়া ১০।১৮১-৮৩] কবিতাটি। বেঙ্গল লাইব্রেরির ক্যাটালগ অনুযায়ী সংখ্যাটি প্রকাশিত হয় 19 Sep [বুধ ৩ আশ্বিন]। ১ ভাদ্র [শুক্র 17 Aug] রবীন্দ্রনাথের ক্যাশবহির হিসাব: 'মা° শৈলেশচন্দ্র মজুমদার বঙ্গদর্শনে ১৩১৩ সালের ভাদ্র মাসে দুইটি প্রবন্ধ লেখার জন্য ৩০্'— ইতিপূর্বে তিনি সরলা দেবী-সম্পাদিত ভারতী থেকে রচনার জন্য আর্থিক প্রতিদান পেয়েছিলেন, কিন্তু বঙ্গদর্শন-এর সঙ্গে এরূপ আর্থিক সম্পর্কের কোনো হিসাব আগে আমাদের চোখে পড়েনি। উল্লেখ্য, 'জাতীয় বিদ্যালয়' প্রবন্ধটি আশ্বিন-সংখ্যা ভাণ্ডার [২।৬]-এর ১১১-২১ পৃষ্ঠায় পুনর্মুদ্রিত হয়।

সঙ্গীত-প্রকাশিকা, শ্রাবণ ১৩১৩ [৫।১১]:

২৩২-৩৪ মিশ্র জয়জয়ন্তী-একতালা। আমাদের সখিরে কে নিয়ে যাবেরে দ্র স্বর ৫১

২৪১-৪২ গুজরাটী ভজন-একতালা। কোথা আছ প্রভু? এসেছি দীন হীন দ্র ঐ ২৩

এর মধ্যে প্রথম গানটির স্বরলিপি করেন ইন্দিরা দেবী, দ্বিতীয়টির স্বরলিপিকার কাঙালীচরণ সেন।

জাতীয় শিক্ষাপরিষদে বক্তৃতা দেওয়ার পরে শ্রাবণের শেষে বা ভাদ্রের শুরুতে রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনে ফিরে আসেন। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সূত্রে কাশিম বাজারের মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দীর [1860-1930] সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ স্থাপিত হয়েছিল। বেঙ্গল লেজিসলেটিভ কাউন্সিলের সভ্যপদপ্রার্থী হয়ে মহারাজা ভোটের জন্য রবীন্দ্রনাথের সাহায্য চান। শরৎকুমারী দেবীর জামাতা সুকুমার হালদার তখন নদীয়া জেলার মেহেরপুরের সাব-ডিভিশনাল অফিসার ও ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের সদস্য। ডিস্ট্রিক্ট বোর্ড থেকেই মহারাজা নির্বাচনপ্রার্থী হয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁর পত্রটি-সহ ৫ ভাদ্র [মঙ্গল 21 Aug] সুকুমার হালদারকে লেখেন : 'পরপৃষ্ঠায় পত্রখানি পড়িলেই সমস্ত অবগত হইবে। যদি মহারাজাকে ভোট দিতে পার তবে আনন্দিত হইব।'[২৯] ১৪ ভাদ্র [বৃহ 30 Aug] তারিখেও তিনি শান্তিনিকেতনে আছেন; এইদিন তিনি খুলনার দক্ষিণডিহি ফুলতলায় বিদ্যালয়ের শিক্ষক নগেন্দ্রনাথ আইচকে লেখেন : 'খুলনার লোকটিকে দশ টাকা বেতন ও খোরাকী দিয়া রাখিতে পারি কিন্তু বিশ্বাসী হওয়া চাই। সুশীল যতীনের পড়া ভালই চলিতেছে। এখানে সকলের স্বাস্থ্য ভাল আছে। আশা করি ছুটির অবকাশে তুমি শরীর মনের উন্নতি লাভ করিয়া আসিবে।'[৩০] এই পত্রের ভাবে মনে হয়, এই সময়ে বিদ্যালয়ের ছুটি থাকলেও কয়েকজন ছাত্র দু'একটি শিক্ষকের তত্ত্বাবধানে সেখানেই বাস করছিলেন। শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্যাশ্রমে এই প্রথা পূর্বাপর বলবৎ ছিল।

বেঙ্গল লাইব্রেরির ক্যাটালগ অনুযায়ী ১১৫-৪ গ্রে স্ট্রীট [বসুমতী কার্যালয়] থেকে উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় নৌকাডুবি প্রকাশ করেন 2 Sep [রবি ১৭ ভাদ্র]। ডবল ক্রাউন ১৬ পেজী ৪০৪ পৃষ্ঠা দু'টাকা দামের বইটি ২০০০ কপি ছাপা হয়। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন : '"নৌকাডুবি প্রথমে ১৩১৩ সালের (ইং ১৯০৬) শ্রাবণ মাসে মজুমদার লাইব্রেরি কর্তৃক প্রকাশিত হইয়াছিল, মনে হইতেছে। ১৩১৩ সালের ভাদ্র সংখ্যা 'বঙ্গদর্শনে' প্রকাশিত মজুমদার লাইব্রেরির বিজ্ঞাপনে প্রকাশঃ—"নূতন পুস্তক। শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, নৌকাডুবি বাঁধাই (উপন্যাস) মায় ডাক মাশুল ২।০।" কিন্তু বেঙ্গল লাইব্রেরির পুস্তক-তালিকা হইতে জানা যাইতেছে, ঐ বৎসরের ২ সেপ্টেম্বর বসুমতীর স্বত্বাধিকারী উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় 'নৌকাডুবি' প্রকাশ করেন। সম্ভবতঃ একই বৎসরে দুইটি স্বতন্ত্র সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছিল।"[৩১] অনুমানটি সঠিক নয়। বেঙ্গল লাইব্রেরির ক্যাটালগেই 2 Sep-এ প্রকাশিত গ্রন্থটি প্রথম সংস্করণ-রূপে উল্লিখিত হয়েছে; তাছাড়া ২১ অগ্র° ১৩১২

তারিখে লিখিত পূর্বোদ্ধৃত উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের পত্রটিতেই প্রকাশ যে, রবীন্দ্রনাথ দু' হাজার টাকার বিনিময়ে নৌকাডুবি ও চোখের বালি উপন্যাস দুটি নৌকাডুবি প্রকাশের তারিখ থেকে তিন বৎসর কাল বিক্রয় ও উপহার দেওয়ার ক্ষমতা তাঁকে প্রদান করেন এবং তিনি একমাত্র মজুমদার লাইব্রেরির শৈলেশচন্দ্র মজুমদারকে দুটি উপন্যাস কমিশনে বিক্রয় করতে দিতে সম্মত হয়েছিলেন। মজুমদার লাইব্রেরি এই অধিকার পেয়েই নৌকাডুবি বিক্রয় করার বিজ্ঞাপন দিতে পেরেছিল। গ্রন্থের আখ্যাপত্রটি এইরূপ:

নৌকাডুবি/ উপন্যাস/ শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত/ প্রকাশক/ শ্রীউপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়/ বসুমতী আফিস/ ১৩১৩

[পরপৃষ্ঠায়] বসুমতী মেসিন;/ মুদ্রাকর শ্রীপূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

নৌকাডুবি ও চোখের বালি-র সঙ্গে নৈবেদ্য বিক্রয়ের অধিকারও উপেন্দ্রনাথ সংগ্রহ করেছিলেন। তথ্যটি জানা যায় নৌকাডুবি গ্রন্থের শেষে সংলগ্ন একটি পাতার উভয় পৃষ্ঠায় মুদ্রিত যথাক্রমে নৈবেদ্য ও চোখের বালি-র বিজ্ঞাপনে। বিজ্ঞাপনের ভাষা 'পেশাদার' পুস্তকব্যবসায়ীর উপযুক্ত, গ্রে স্ট্রীট থেকে বটতলা খুব বেশি দূরবর্তী নয়!

শিক্ষিত নরনারীর চির-আদরের সুপ্রতিষ্ঠিত সুকবি অধুনা বঙ্গসাহিত্যের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ—সর্ব্বজনপ্রিয় শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নূতন লিখিত—সুচারু কাব্যগ্রন্থ।

রাজ সংস্করণ—গ্লেজ তাসের ন্যায় কাগজে, মুক্তার ন্যায় অক্ষরে, রেশমের ন্যায় কাগজের আভরণে এই কাব্যগ্রন্থ মুদ্রিত; ২০০ দুই শত পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। যিনি প্রেমিক, যিনি ভাবুক, যিনি সুধার রসাস্বাদে অভ্যস্ত, তিনিই এই সুন্দর, প্রেমময়—প্রাণময়—ভাবময়—সুধাময়—গ্রন্থখানি নিশ্চয়ই পাঠ করিবেন। সহৃদয়কে কাঁদাইতে, ভাবুককে ভাবসাগরে ভাসাইতে, তন্ময় করিয়া মরজগৎ হইতে চিরসুন্দর অমর-রাজ্যে বিচরণ করাইতে এই গ্রন্থ কিরূপ উপযোগী হইয়াছে, কিরূপ পাঠ-মনোহর হইয়াছে, তাহা দেখিবার—পাঠ করিবার—শুনিবার—পক্ষে এবং উপহার প্রদানে—উপহার গ্রহণে—বিবাহ-বাসরে—ফুলশয্যায়—শুভকার্যে—সর্ব্বত্র সকল বিষয়ে একমাত্র আদরণীয় ও গ্রহণীয় হইয়াছে। তাহা ভাবুকেরা বুঝিবেন, এই ফুলেরহার গলায় পরিলে–সৌরভে দশদিক্ আমোদিত হইবে, পঙ্কিল দুর্গন্ধময় পল্লীও "নৈবেদ্যর" পবিত্র সৌরভে সুরভিত হইবে। জীবনের অপকার্য্যের অবসাদ যাইবে, জীয়ন্তে স্বর্গের সুষমা প্রাপ্ত হইবেন। কবির ভাব বিজ্ঞাপনে প্রকাশ করা অসম্ভব; আমাদের সবিনয় অনুরোধ—একবার পাঠ করুন।

চোখের বালি-র বিজ্ঞাপনটিও একই জাতের : 'অতি শীঘ্র এই উপন্যাস পাঠ করুন। নরনারী, যুবক-যুবতী, বিবাহিত অবিবাহিত, যাঁহারা নূতন বিবাহ করিয়াছেন, যাঁহাদের বিবাহ পুরাতন হইয়াছে, যাঁহাদের প্রেমে ভাটা পড়িতেছে, যাঁহারা স্ত্রীকে মনের মত করিতে চাহেন, যাঁহারা সুখের দাম্পত্যপ্রেম চাহেন, তাঁহারা "চোখের বালি" নিশ্চয়ই পাঠ করিবেন। আর্থিক সুবিধা দেওয়ার ঘোষণাও আছে বিজ্ঞাপনে : নৈবেদ্যর 'মূল্য ১ টাকা স্থলে।।০ আট আনা মাত্র' ও চোখের বালি 'রাজ সংস্করণ, বিলাতী বাঁধাই, মূল্য ২।০ দুই টাকা চারি আনা মাত্র, এক্ষণে ২ দুই টাকায় পাইবেন। যাঁহারা একত্রে দুইখানি পুস্তক—"চোখের বালি" ও "নৈবেদ্য" লইবেন, তাঁহারা ২ দুই টাকায় পাইবেন। ডাকমাশুল ল০ তিন আনা।'[৩১ক]

১৩২০ বঙ্গাব্দে উপেন্দ্রনাথ নৌকাডুবি-র দ্বিতীয় মুদ্রণও প্রকাশ করেন। কিন্তু টাকা-পয়সার ব্যাপারে নানাবিধ বিশৃঙ্খলার জন্য রবীন্দ্রনাথ তাঁর বিরুদ্ধে মামলা করতে বাধ্য হন। প্রসঙ্গটি যথাস্থানে আলোচিত হবে।

ভাদ্র মাসের শেষ সপ্তাহে চিকিৎসার জন্য রবীন্দ্রনাথকে পুনরায় কলকাতায় আসতে হয়। তাঁর ক্যাশবহিতে ২ আশ্বিন [মঙ্গল 18 Sep] লেখা হয় : 'ব° ডাক্তার অক্ষয়কুমার দত্ত দং শ্রীযুক্ত খোদ বাবু মহাশয়ের চিকিৎসার জন্য উক্ত ডাক্তারের ফি শোধ ২৮।২৯।৩০ ভাদ্র। ১ আশ্বিন ১৬্'। এই হিসাব থেকে জানা যায়, তিনি অন্তত ২৮ ভাদ্র [বৃহ 13 Sep] থেকে ১ আশ্বিন [সোম 17 Sep] পর্যন্ত কলকাতায় ছিলেন।

৩০ ভাদ্র [শনি 15 Sep] বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের ত্রয়োদশ বর্ষের পঞ্চম মাসিক অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। রবীন্দ্রনাথ 'কৃষ্ণদাস-রচিত হস্তলিখিত ভক্তমাল, কাঠের হরফে ছাপা মুগ্ধবোধং ব্যাকরণং' প্রভৃতি তিয়াত্তরটি প্রাচীন পুস্তক পরিষদকে উপহার দিয়েছিলেন। 'উপহারের পুস্তক ও পুঁথিগুলি প্রদর্শন করিয়া সম্পাদক বলিলেন, গত চৈত্র মাসে আমাদের সহকারী সভাপতি ও আদি ব্রাহ্ম-সমাজের সম্পাদক শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় এই পুস্তকরাশি প্রদান করিয়াছেন। পুস্তকগুলি আদি ব্রাহ্ম-সমাজের লাইব্রেরীভুক্ত ছিল। কতকগুলি পুস্তক তত্ত্ববোধিনী সভার সম্পত্তি ছিল, পরে আদি ব্রাহ্মসমাজের পুস্তকালয়ের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছিল। এই পুস্তকরাশির মধ্যে বিস্তর দুষ্প্রাপ্য প্রাচীন পুস্তক রহিয়াছে। ১২২০।১৮৩০।১৮৪০ অব্দে প্রকাশিত অনেক পুস্তক রহিয়াছে। দুই একখানি পুস্তক আরও পুরাতন; শ্রীরামপুরের মিশনারিদের প্রকাশিত কাঠের খোদাই অক্ষরে ছাপা। দুইখানি পুস্তকে ঁদ্বারকানাথ ঠাকুরের স্বাক্ষর আছে। পুস্তকগুলি পরিষদের ব্যয়ে বাঁধান হইয়াছে। রবীন্দ্রবাবুর সহিত সর্ত্ত ছিল যে এই পুস্তক সম্বন্ধে একটি 'রিপোর্ট' পরিষদে পাঠ করিতে হইবে। সম্পাদকের অনবকাশে রিপোর্ট লেখা অদ্যাপি ঘটে নাই। ভবিষ্যতে পত্রিকায় বাহির করিবার আশা আছে। উপহারদাতা পরিষদের কৃতজ্ঞতার দাবি রাখেন।'[৩২] রবীন্দ্রনাথ এই অধিবেশনে উপস্থিত ছিলেন কিনা জানা নেই।

হিরন্ময়ী দেবীর উদ্যোগে যে মহিলা শিল্প সমিতি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, সেই সমিতি ৮ শিবনারায়ণ দাস লেনে ফিল্ড অ্যাণ্ড অ্যাকডেমি ভবনে ২৯ ভাদ্র থেকে ২ আশ্বিন [14-18 Sep] পর্যন্ত একটি স্বদেশী মেলার আয়োজন করে। দর্শকদের মনোরঞ্জনের জন্য নাট্যাভিনয়েরও ব্যবস্থা ছিল। ৩১ ভাদ্র ও ১ আশ্বিন দুটি দিন কেবল মহিলাদের জন্য নির্দিষ্ট হয়—এই দুদিন 'Ladies till take part in the performance of Lakshmir Pariksha and Bharut Matar Jagaran.'[৩৩] 'লক্ষীর পরীক্ষা' হয়তো জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়িতে ঘরোয়াভাবে ইতিপূর্বেই অভিনীত হয়েছিল, কিন্তু সাধারণের সমক্ষে এই প্রথম অভিনীত হল। অভিনয় বা অভিনেত্রীদের সম্পর্কে কোনো তথ্য পাওয়া যায়নি।

কলকাতায় চিকিৎসার পর রবীন্দ্রনাথ সম্ভবত শান্তিনিকেতনেই ফিরে যান। ১৪ আশ্বিন [রবি 30 Sep] সেখান থেকে নগেন্দ্রনাথ আইচকে বিজয়ার আশীর্বাদ জানিয়ে লিখেছেন : 'তোমার দাদার কর্ম্মের জন্য দরখাস্ত বিরাহিমপুরের নায়েবের নিকট পাঠাইবে। জামিন দিতে পারিবে কি?'[৩৪] ১৬ আশ্বিন [মঙ্গল 2 Oct] তিনি ব্রজেন্দ্রকিশোর দেববর্মার স্বাস্থ্য সম্বন্ধে উদ্বেগ প্রকাশ করে নিজের সম্পর্কে লিখেছেন : 'আমি সুস্থ হইয়াছি সবল হই নাই। অগ্রহায়ণ মাসে বোটে যাইবার ইচ্ছা আছে।'[৩৫]

রবীন্দ্রনাথ বঙ্গদর্শন-এর সম্পাদক-পদ ত্যাগ করেছেন, ভাণ্ডার সম্পর্কেও তাঁর প্রাথমিক উৎসাহ হ্রাস পেয়েছে, খেয়া-র পাণ্ডুলিপি মুদ্রণালয়ে প্রেরণের পর কবিতা লেখারও প্রেরণা নেই—সুতরাং তাঁর রচনাকার্য সম্পূর্ণ স্তব্ধ। সেই কথাই তিনি ১৭ আশ্বিন [বুধ 3 Oct] লিখেছেন মনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়কে :

> জাতিভেদের প্রশ্ন তুলিয়া আপনি বড়দাদাকে বিপদে ফেলিয়াছিলেন—তিনি উত্তরে প্রকাণ্ড এক লেখা ফাঁদিয়া শ্রান্ত হইয়া পড়িতেছিলেন। আজকাল বড়দাদার লিখিতে বিশেষ কষ্ট বোধ হয়—বিশেষত তিনি একটা দার্শনিক প্রবন্ধের চিন্তায় নিবিষ্ট আছেন—অন্য কোনো প্রসঙ্গে তাহার বিঘ্ন ঘটিলে তিনি পীড়িত হইতে থাকেন এবং তাহাতে বস্তুত ক্ষতির সম্ভাবনা আছে—এই জন্য তিনি আমার উপরে প্রশ্নের উত্তর দিবার ভার সমর্পণ করিয়াছেন। আমি একটা প্রবন্ধে এ সম্বন্ধে আলোচনা করিব কিন্তু আমার অবস্থাও বিশেষ আশাজনক নহে। কিন্তু আমার বোধ হয় জাতিভেদ সম্বন্ধে মীমাংসা সদ্য আপনার পক্ষে জরুরী নহে এইজন্য বড়দাদাকে আমি আপাতত নিষ্কৃতি দিবার জন্য এ ভার নিজের স্কন্ধে লইয়াছি—কিন্তু খুব বেশি তাগিদ দিবেন না।[৩৬]

—রবীন্দ্রনাথ তাঁর প্রতিশ্রুতি রক্ষা করেছিলেন বলে মনে হয় না।

৩০ আশ্বিন [মঙ্গল 16 Oct] বঙ্গভঙ্গের প্রথম বার্ষিকী স্মরণে উভয় বাংলায় গত বৎসরের মতো অরন্ধন ও রাখীবন্ধন পালিত হয়। রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এই উপলক্ষে যে 'বঙ্গলক্ষ্মীর ব্রতকথা' লিখেছিলেন [বঙ্গদর্শন, পৌষ ১৩১২।৪৪৫-৪৯], সেটি মজুমদার লাইব্রেরি এই সময়ে পুস্তিকাকারে মুদ্রিত করে। কিন্তু রাখীবন্ধন অনুষ্ঠানের প্রধান প্রবর্তক রবীন্দ্রনাথ এই বৎসর আশ্চর্যভাবে নীরব, এমন-কি 7 Oct [রবি ২১ আশ্বিন] *The Bengalee* পত্রিকায় বঙ্গাক্ষরে যে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয় তাতেও তাঁর স্বাক্ষর নেই। পাঠক এই প্রসঙ্গে গত বৎসরে তাঁর স্বাক্ষরিত [হয়তো-বা লিখিত] বিজ্ঞপ্তিটির কথা স্মরণ করতে পারেন, সেই বিশেষ দিনে তাঁর অন্যান্য ভূমিকার কথাও মনে পড়া স্বাভাবিক।

অবশ্য অন্যের প্রেরিত রাখী তিনি পেয়েছেন। ৩১ আশ্বিন [বুধ 17 Oct] তিনি কেশবচন্দ্র সেনের কন্যা ময়ূরভঞ্জের মহারানী সুচারু দেবীকে লিখেছেন :

> মনে করে এই দূরস্থিতকে রাখী পাঠিয়েছ এতে কত খুসি হলুম বল্‌তে পারিনে। আমি এবার অনেকদিন পীড়িত অবস্থায় কাটিয়েছি তাই তোমাদের সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ করতে যেতে পারি নি। তা ছাড়া আমি সংসার রঙ্গভূমির এমন নেপথ্যে এসে দাঁড়িয়েছি যে তোমাদের চোখের অগোচর হয়ে পড়েছি—তবুও যে বিশেষ দিনে মনে করেছ এতেই আনন্দ হল। আমি আমার এই ইস্কুলটি আগলে মাঠের ধারে চুপচাপ বসে আছি—আর সমস্ত কর্মসম্বন্ধ হতে নিষ্কৃতি নিয়েছি। একবার এখানে এসে আমাদের নির্জন নীড়টি যদি দেখে যাও ত খুসি হব—মহারাজকেও যদি টেনে আন তিনি হয়ত অসন্তুষ্ট হবেন না।[৩৭]

একই দিনে লেখা একটি পত্রে তিনি অবলা বসুকেও শান্তিনিকেতনে আহ্বান করেছেন—কিন্তু কিছুটা অভিমানের সঙ্গে। এই পত্রে অন্যান্য খবরও আছে : 'বেলা ও তাহার স্বামী আসিয়াছিল দিন তিনেক হইল চলিয়া গেছে—মীরাও তাহাদের সঙ্গে মজঃফরপুর গেছে—তাই আমার এখানকার আশ্রম সম্প্রতি আমার পক্ষে অত্যন্ত শূন্য হইয়া গেছে।'[৩৮] মীরা দেবী জ্যৈষ্ঠ ১৩১৪-তে বিবাহের পূর্ব পর্যন্ত মজঃফরপুরে দিদির তত্ত্বাবধানেই ছিলেন। তাঁকে লেখা অনেকগুলি অপ্রকাশিত পত্রে আমরা রবীন্দ্রজীবন ও পারিপার্শ্বিক সম্বন্ধে অনেক অজ্ঞাত তথ্য জানতে পারব।

ভগিনী নিবেদিতার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের অম্লমধুর সম্পর্কের বিবরণ আমরা আগে দিয়েছি। তাঁদের মধ্যে পত্র-সম্পর্কও ছিল, কিন্তু নিবেদিতার তিনটি পত্র রক্ষিত হলেও তাঁকে লেখা রবীন্দ্রনাথের কোনো পত্র এখনও পর্যন্ত উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি। এইরূপ একটি পত্রের সংবাদ পাওয়া যায় অবলা বসুকে লেখা পূর্বোল্লিখিত চিঠিতে :

> নিবেদিতা যে আপনার ওখানে পীড়িত অবস্থায় তাহা আমি জানিতাম না—আমি একখানা বই চাহিয়া তাঁহাকে কলিকাতার ঠিকানায় কয়েক দিন হইল পত্র লিখিয়াছি। আপনি দয়া করিয়া এমন ব্যবস্থা করিবেন যে, সে পত্রের যেন তিনি কোনো নোটিস্ না লন্। তাঁহাকে আমার সাদর নমস্কার জানাইবেন এবং বলিবেন যে উৎসুক চিত্তে তাঁহার আরোগ্যপ্রত্যাশায় রহিলাম।

২ কার্তিক [শুক্র 19 Oct] ভ্রাতৃদ্বিতীয়ার দিনে রবীন্দ্রনাথের নাতবউ দিনেন্দ্রনাথের স্ত্রী কমলা দেবী তাঁকে ভাইফোঁটা দেন। সেই-সব খবর দিয়ে তিনি সম্ভবত ৪ কার্তিক মীরা দেবীকে লেখেন :

> …কমল প্রত্যহ আসে না। সে আমাকে পর্শু ভাইফোঁটা দিয়েছে বোধ হয় শুনেছিস্। সেই ভাইফোঁটার নিমন্ত্রণ খেয়ে শমীকে দুদিন উপবাস দিতে হয়েছে। সেদিন খুব কসে ক্ষীর খেয়ে তার পরে গা বমি করে দুদিন ত বিছানায় পড়ে ছিল। আজ স্নানাহার করেচে।
>
> পিসিমা বাগান করতে খুব উঠে পড়ে লেগে গেছেন। আমি তাঁকে নৈনিতাল আলুর এবং অন্যান্য অনেকরকম বীজ আনিয়ে দিয়েছি…। সন্ধ্যাবেলা এক একদিন শমী ঠাকুর তাঁকে মহাভারত পড়ে শোনায়। সে ত যখনি সময় পাচ্চে মহাভারত পড়চে। তোর সুরেনদাদার মহাভারত

তুইও পড়ে ফেলিস্।[৩৯]

'শ্রীসুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর সঙ্কলিত' মহাভারতের 'মূল আখ্যান' প্রাঞ্জল গদ্যে দুই খণ্ডে [পৃ ৩০৬+২৮৯+১১] প্রকাশিত হয় বেঙ্গল লাইব্রেরির ক্যাটালগ অনুযায়ী 2 Nov [শুক্র ১৬ কার্তিক]। কিন্তু গ্রন্থটি যে তার আগেই প্রস্তুত হয়ে গিয়েছিল এই পত্রই তার প্রমাণ। গ্রন্থটি 'উৎসর্গ' করে সুরেন্দ্রনাথ লেখেন : 'যাঁহার স্নেহে ইহা সম্ভব হইয়াছে,/যাঁহার উপদেশে ইহা গঠিত হইয়াছে,/ যাঁহার সাহায্যে ইহা সম্পূর্ণ হইয়াছে,/ তাঁহারই শ্রীচরণে,/ অনুপযুক্ত হইলেও,/ এই গুরুদক্ষিণা/ সমর্পিত/ হইল।' নামোল্লেখ না করলেও, আমাদের অনুমান, সুরেন্দ্রনাথ গ্রন্থটি রবীন্দ্রনাথকেই উৎসর্গ করেছিলেন। তাঁরই আগ্রহে ও নিরন্তর তাগিদে রচনাকার্যে আলস্যপরায়ণ সুরেন্দ্রনাথের পক্ষে এই বিশাল গ্রন্থটি সমাপ্ত করা সম্ভব হয়েছিল। শিলাইদহ ও শান্তিনিকেতনে বইটি পড়ে শোনানোর কথা রথীন্দ্রনাথ পিতৃস্মৃতি-তে সানন্দে স্মরণ করেছেন।

৮ কার্তিক [বৃহ 25 Oct] রবীন্দ্রনাথ কন্যাকে শান্তিকেতনের আরও খবর দিয়ে লিখেছেন:

শমী তোর সুরেনদাদার মহাভারতটা দিনরাত্রি পড়ে শেষ করে ফেলেছে। তাই ভারি আনন্দে আছে। আজকাল সে রাজস্থান পড়তে প্রবৃত্ত। তার নীচের ঘরটা গুছিয়ে নিয়েছে—সময় পেলেই সেইখেনে বসে তার বাংলা বই পড়ে। রাত্রে পিসিমার কাছে তোর খাটটাতে শোয়।

আমি সকালে আমার ঘরের উত্তরের বারান্দায় ছোট টেবিল পেতে লেখাপড়া করি। বেলা দশটা পর্য্যন্ত এই রকমে কাটে। তারপরে স্নানাহার—দুপুরবেলা হেমলতা একঘন্টা পড়তে আসেন—তাঁর মাষ্টার অজিত ছুটি নিয়ে দিল্লি বেড়াতে গেছে। সন্ধ্যাবেলায় আবার আমার ঘরটাতে বসে পড়াশুনা করি।[৪০]

পত্রটিতে রবীন্দ্রনাথের প্রাত্যহিক জীবনযাত্রার একটি সুন্দর ছবি ফুটেছে। এর আগে তিনি লেখেন : 'কাল বেলার চিঠি পেয়েছি।···Mrs Scragg-এর কাছে ইংরেজি বলা ও. লেখাটা শিখ্‌লেই তোর শিক্ষা অনেকটা ব্যবহারযোগ্য হয়ে উঠবে।' তিনি নিজেও কন্যার ইংরেজিশিক্ষার জন্য তাঁকে ইংরেজিতে পত্র লিখতে বলেছেন ও তার উত্তর দিয়েছেন ইংরেজিতে।

পত্রের শেষে তিনি 'পুনশ্চ' দিয়ে লিখেছেন : 'এই মাত্র জগদীশের টেলিগ্রাম পেলুম তিনি আজ আস্‌চেন।' কিছুদিন আগে তিনি শান্তিনিকেতনে আসা নিয়ে অবলা বসুর কাছে অভিমান প্রকাশ করেছিলেন, জগদীশচন্দ্র হয়তো মানভঞ্জনের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। সম্ভবত তিনিই ডাঃ নীলরতন সরকারের কারখানায় প্রস্তুত 'বিজয়া' সাবান এনে দেন; রবীন্দ্রনাথ সেই সাবান মাধুরীলতাকে পাঠিয়ে ১৭ কার্তিক [শনি 3 Nov] মীরা দেবীকে লেখেন: 'বেলার নামে এক বাক্স বিজয়া সাবান পাঠাচ্ছি। কলকাতায় ডাক্তার নীলরতন সরকার একটা সাবানের কারখানা খুলেছেন সেই কারখানায় এই সাবান তৈরি হয়েছে। জগদীশ বলেন এই সাবান খুব ভালবাতে চামড়ার কোনো হানি না করে তারই প্রতি লক্ষ্য রেখে অনেককাল পরীক্ষার পরে এই সাবান তৈরি করা হয়েছে।'[৪১] স্বদেশী দ্রব্যকে এইভাবেই তিনি উৎসাহ দিয়েছেন, কিন্তু বিদেশী জিনিস ব্যবহার সম্বন্ধে তাঁর কোনো গোঁড়ামি ছিল না; 26 Nov [সোম ১০ অগ্র°] মীরা দেবীকে লেখেন : 'I am sorry to learn that your dolls are not Swadeshi but I am sure Swadeshi dolls of your requirements can't be found in the market.'

ভূপেন্দ্রনাথ স্যানালকে রবীন্দ্রনাথ বিদ্যালয়ের পরিচালনা-ভার দিয়েছিলেন। কিন্তু বর্তমান বৎসরের প্রায় শুরু থেকেই অসুস্থ হয়ে তিনি স্বাস্থ্যোদ্ধারের জন্য বিভিন্ন জায়গায় অবস্থান করছিলেন। রবীন্দ্রনাথ নিজেও তাঁর স্বাস্থ্য সম্বন্ধে উদ্বিগ্ন ছিলেন। তাই ত্রিপুরার মহারাজার পিতৃব্য নবদ্বীপ বাহাদুর যখন বর্ষার ছুটিতে তাঁর

দুই পুত্রকে আশ্রম থেকে নিয়ে গিয়ে বাঁকিপুরে কাটাতে মনস্থ করেন, তখন তিনি ভূপেন্দ্রনাথকে ছেলে-দুটির ভার নিয়ে সেই স্বাস্থ্যকর স্থানে যাওয়ার পরামর্শ দেন। অন্যথায় শান্তিনিকেতনে আসার আহ্বান জানিয়ে ১৬ আষাঢ় [শনি 30 Jun] লেখেন : 'আজকাল এখানে বহু দিন কোনো রোগতাপ নাই। তবে আপনি যদি স্বপাক চালাইতে থাকেন তবে বিপাক ঘটিতে কতক্ষণ?···আপনার চোখ ভাল হইয়াছে শুনিয়া খুসী হইলাম—কিন্তু প্লীহার দুর্বলতাকে কদাচ প্রশ্রয় দিবেন না। কারণ ইহা ইংরেজের রাজত্ব।'[৪২] এর কয়েকমাস পরে ভূপেন্দ্রনাথ আরও অসুস্থ হয়ে পড়েন। তিনি লিখেছেন : 'আর একবার আমি যখন বর্ধমানে রোগশয্যায় মৃত্যুমুখে শায়িত, নাড়ী ছাড়িয়া গিয়াছে, চিকিৎসকেরা আশা ত্যাগ করিয়াছেন, তখন আমার অবস্থা শ্রীমান বিধুশেখর শাস্ত্রী মহাশয়ের মুখে অবগত হইয়া তিনি আমাকে দেখিবার জন্য বর্ধমানে আমাদের ক্ষুদ্র বাসগৃহে আসিয়া উপস্থিত হন। যাইবার সময় আমার জননীকে বলিয়া গেলেন, "অর্থের জন্য যেন চিকিৎসার ত্রুটি না হয়, অর্থের জন্য কোন চিন্তা নাই। যাহা প্রয়োজন হইবে, আমি তাহার ব্যবস্থা করিব।" যাইবার সময় কিছু টাকাও রাখিয়া গেলেন।'[৪৩] রবীন্দ্রনাথ এই কারণে বর্ধমান যান ১২ কার্তিক [সোম 29 Oct]। ১৩ কার্তিক তিনি দীনেশচন্দ্র সেনকে লেখেন : 'ভূপেন্দ্রবাবু অত্যন্ত পীড়িত অবস্থায় বৰ্দ্ধমানে পড়িয়া আছেন—কাল তাঁহাকে দেখিতে গিয়াছিলাম। তাঁহার অবস্থা একান্ত উদ্বেগজনক।'[৪৪]

এই কারণে তিনি বিদ্যালয়ের জন্যও উদ্বেগ বোধ করেছেন। সুবোধচন্দ্র মজুমদারও তখন বিদ্যালয়ের শিক্ষকতা ত্যাগ করে শিলাইদহে অ্যাসিস্টেন্ট সাব-ম্যানেজারের কাজ নিয়েছেন। ফলে শিক্ষকাভাবে উদ্বিগ্ন হয়ে ২৭ কার্তিক [মঙ্গল 13 Nov] মনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়কে লেখেন:

> যদি এমন হয় যে সম্প্রতি আপনি বেকারপ্রায় অবস্থাতেই আছেন তবে পরীক্ষাকাল পর্য্যন্ত এখানকার এন্ট্রেন্স ক্লাসের কর্ণধার পদ আপনি অধিকার করিতে পারিবেন কি? তাহা হইলে আমি বড়ই নিশ্চিন্ত হই। কাজটা সুখকর নয় জানি—কিন্তু এই কাজে আপনার হাড় পাকিয়া গেছে, আপনার পক্ষে কয়েক মাসের জন্য এ বোঝা দুঃসাধ্য হইবে না। যদি কোনো মতে মন স্থির করেন তবে দেরি করিবেন না—এখনি অবিলম্বে পুরাদমে কাজ সুরু করিয়া দেওয়া অত্যন্ত দরকার হইয়াছে। অগ্রহায়ণ মাসের প্রথম হইতেই কি আপনার আশ্রয় পাওয়া যাইবে?[৪৫]

—মনোরঞ্জনবাবু তাঁকে এই উদ্বেগ থেকে মুক্ত করতে পারেননি, তাঁকে অন্য ব্যবস্থা নিতে হয়েছিল।

ইতিমধ্যে বাংলা সাহিত্যজগতে একটি কলহ ধূমায়িত হয়ে ওঠে। দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের কিছু সমালোচনা ও ব্যক্তিগত আক্রমণের উত্তর রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন ২৩ বৈশাখ ১৩১২ [6 May 1905] তারিখের পত্রে—উক্ত পত্রটি হয়তো দ্বিজেন্দ্রলালকে পাঠানো হয়নি, কিন্তু ঈষৎ মোলায়েম কোনো উত্তর নিশ্চয়ই দেওয়া হয়েছিল যা তাঁর উপাদেয় না লাগাই স্বাভাবিক। বৎসরের শেষ দিকে বাঙালি সাহিত্যিকদের মধ্যে রবীন্দ্রনাথকে শ্রেষ্ঠ বলে রায় দিলেও তাঁর রচনাকে 'লালসাপূর্ণ' বলেও তিনি ভাবতে শুরু করেছেন। এর অব্যবহিত পরে দ্বিজেন্দ্রলাল ও লোকেন্দ্রনাথ পালিত উভয়ে গয়ায় বদলি হন—প্রথমে লোকেন্দ্রনাথ 25 Apr 1906 [১২ বৈশাখ] ও পরে দ্বিজেন্দ্রলাল 2 Jul [১৮ আষাঢ়] তারিখে। সাহিত্যপ্রেমী ও তার্কিক এই দু'জনের সম্মিলন অন্তত রবীন্দ্রনাথের পক্ষে শুভঙ্কর হয়নি। ক্ষেত্রবিশেষে লোকেন্দ্রনাথ রবীন্দ্ররচনার কঠোর সমালোচনা করলেও [যেমন চৈতালি-র ক্ষেত্রে] তিনি প্রধানত রবীন্দ্রানুরাগীই ছিলেন, অপরপক্ষে দ্বিজেন্দ্রলাল তখন রবীন্দ্ররচনায় নতুন নতুন দোষ খুঁজে পাচ্ছেন—সুতরাং উভয়ের বিতর্কে জেদী দ্বিজেন্দ্রলাল ক্রমেই অধিকতর বিমুখ হয়ে উঠেছেন রবীন্দ্রনাথের প্রতি। এই অবস্থায় তিনি দেবকুমার রায়চৌধুরীকে চিঠিতে লিখলেন :

এত দিন চুপ করেই ছিলাম, স্পষ্টতঃ হাতে-কলমে রবিবাবুর বিপক্ষে কোন কথা বলিনি। কিন্তু ক্রমে যেরূপ দেখা যাচ্ছে, রবিবাবুর এই-সব অন্ধ স্তাবক ও অনুকারকদের মধ্যে তাঁর দোষগুলির বড়ই বেশি প্রতিপত্তি বেড়ে চল্‌ল এবং রবিবাবুর প্রতিভার যে রকম দুর্দ্দম প্রতাপ তাতে নিশ্চয়ই পরিণামে এসব দোষ আমাদের সাহিত্যে অধিকাংশ নবীন লেখকদের মধ্যে অল্পাধিক সংক্রামিত হয়ে পড়্‌বে।···আজ তিন দিন ধরে' পালিতের সঙ্গে ক্রমাগত তর্ক কর্লাম; তা' রবিবাবুর Personality এম্‌নি Dangerously strong যে, তিনি আমার যুক্তি-খণ্ডন কর্ত্তে অক্ষম হয়েও আমার Points সব avoid করে' কেবল সেই-সব অস্পষ্ট, দুর্নীতিপূর্ণ লেখার art ও গুণই দেখ্‌তে লাগলেন। এখন স্বয়ং পালিতের মত বিজ্ঞ ও বিদ্বান লোকেরই যখন এই দশা তখন আর অন্যের কথা কি?** নব্য সাহিত্যিক ও কবির দল রবিবাবুর গুণের তো আর নাগাল পাবেন না, কেবল এই সব নিকৃষ্ট Style ও Ideaর অনুকরণই করে' ক্রমে আমাদের আরাধ্যা মাতৃভাষার Temple'এ আস্তাকুঁড়ের আবর্জ্জনা জমিয়ে তুলবেন।[৪৬]

এই অগ্নিতে ঘৃতাহুতি দিয়েছিল শ্রাবণ-সংখ্যা বঙ্গদর্শন-এ মুদ্রিত 'কাব্যের প্রকাশ' [পৃ ১৭৮-৮০] প্রবন্ধটি। প্রবন্ধটিতে লেখকের নাম ছিল না, 'শ্রীঃ—' স্বাক্ষরে এটি মুদ্রিত হয়; রবীন্দ্রজীবনী-কার রচনাটি অজিতকুমার চক্রবর্তীর লেখা বলে মনে করেছেন,[৪৭] বক্তব্য ও ভাষার দিক দিয়ে এটি তাঁর লেখা হওয়াই সম্ভব। রোম্যান্টিক কাব্য সম্বন্ধে আলোচনা করতে গিয়ে প্রবন্ধটিতে বলা হয়েছিল, মনোভাবের সবটাই সব সময়ে কবির কাছে স্পষ্ট হয়ে ধরা দেয় না বলে এই শ্রেণীর কবিতায় কিছুটা অস্পষ্টতা অনিবার্যভাবেই এসে পড়ে। দেবকুমার তাঁর গ্রন্থে দ্বিজেন্দ্রলালের চিঠির তারিখ নির্দেশ করেননি, কিন্তু অনুমান করা যায় লোকেন্দ্রনাথের সঙ্গে তর্কে এই প্রবন্ধটির প্রসঙ্গও উঠেছিল। পরবর্তী প্রতিক্রিয়ার বর্ণনা আছে পুত্রটির শেষাংশে :

পালিত শেষে আর কিছুতে না পেরে বললেন—"তুমি তা হলে তোমার বক্তব্যগুলো লিখেই কোনো কাগজে ছাপাও না? নিশ্চয়ই তা হলে তোমার এ ভুল কেউ না কেউ দূর করে' দেবেন,—চাইকি আমিও তোমাকে তখন লিখে বুঝিয়ে দিতে পারি।" পালিতের এ পরামর্শ একটু Riskyহ'লেও Fair যে, তার আর কোন সন্দেহ নেই। বেশ, তবে তাই হ'ক। আমি তা হলে লিখেই প্রতিবাদ করব। যা থাকে অদৃষ্টে,—দুর্গা বলে' ঝুলে ত পড়া যাক। Honest Controversyকে আমি বাঞ্ছনীয়ই মনে করি; কিন্তু, কেউ যদি আমাকে এজন্য বিদ্বিষ্ট ভাবে,—সে কিন্তু বড়ই অন্যায় ও আক্ষেপের কথা হবে। কিন্তু Greatest good to the greatest number হিসাবে আমার এ কাজটা কি মূলে অন্যায়? আমার ত তা' একটুও মনে হচ্ছে না। 'মনের অগোচর পাপ নেই'; আর তা যখন এক্ষেত্রে একটুও নেই তখন লোক-মতকে আমি অতি থোড়াই Care করি। জীবনে এই বুড়ো বয়েস পর্য্যন্ত যা কখনো কর্লাম না, আজ কিনা আমি সেই লোকের নিন্দার ভয়ে 'হক' কথা বলতে পিছু হট্‌ব? তেমন কাপুরুষ শর্মা নন,—হুঁ! ভারি তো আমার ভয়—ফুঃ![৪৮]

লোকেন্দ্রনাথের পরামর্শে দ্বিজেন্দ্রলাল রবীন্দ্র-সমালোচনায় প্রবৃত্ত হন, এই সংবাদটি হয়তো একটু বিকৃতভাবে রবীন্দ্রনাথের কাছে পৌঁছেছিল। তাই ২১ বৈশাখ ১৩১৮ [4 May 1911] তারিখের একটি আলোচনা-সভায় তিনি ক্ষিতিমোহন সেন-প্রমুখ অনেককে চৈতালি-র 'পুঁটু' কবিতা-প্রসঙ্গে বলেন : 'আমার এই কবিতায় লোকেন একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়িল। পরে বিরুদ্ধ সাহিত্যিক দলের সহিত মিলিত হইয়া লোকেন আমার বিরুদ্ধে উৎসাহিত করে।'[৪৯] কিন্তু চৈতালি-র মতো 'স্পষ্ট' কাব্য সম্বন্ধে নিশ্চয়ই দ্বিজেন্দ্রলালের কোনো অভিযোগ ছিল না!

দুঃখের বিষয়, দ্বিজেন্দ্রলালের পত্রের অশালীন রচনাভঙ্গি তাঁর প্রতিবাদ-মূলক রচনাতেও প্রতিফলিত হল। তাঁর রচিত 'কাব্যের অভিব্যক্তি' কার্তিক-সংখ্যা প্রবাসী-তে [পৃ ৩৬১-৬৬] মুদ্রিত হয়। 'কাব্যের প্রকাশ' প্রবন্ধ 'রবীন্দ্রবাবুর মতের প্রতিধ্বনি মাত্র' বলেই প্রতিবাদে প্রবৃত্ত হয়েছেন এই ঘোষণা করে তিনি অভিব্যক্তিক্রমে রবীন্দ্রনাথের 'সোনার তরী' কবিতাটির গদ্যার্থ, আধ্যাত্মিক অর্থ ও বর্ণনার স্বভাবসঙ্গতি বিচার করে দেখিয়েছেন, কবিতাটি শুধু দুর্বোধ্য বা অবোধ্য নয়, 'একেবারে অর্থশূন্য, স্ববিরোধী'। যে-কোনো সিদ্ধান্তে পৌঁছনোর স্বাধীনতা তাঁর ছিল, কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধে হাসির গান-সুলভ বাক্যবিন্যাসে তিনি কুণ্ঠিত হননি—এইটাই দুঃখের। 'আমাদের দেশের আধুনিক অস্পষ্ট কবিগণের দুই এক শ্লোক নহে—সমস্ত কবিতাটি খুঁজিয়া না পাওয়া যায় মাথা, না পাওয়া যায় লাঙ্গুল' বা 'নারীর গুম্ফ, দীর্ঘবাহু ও গম্ভীরস্বরও দেখা গিয়াছে এবং

পুরুষের কোমলকণ্ঠ, কোমলদেহ ও কুঞ্চিতকেশও দেখা গিয়াছে' এর সামান্য দুটি উদাহরণ—দ্বিতীয় উদ্ধৃতির শেষাংশ রবীন্দ্রনাথের প্রতি ব্যক্তিগত আক্রমণ এরূপ অভিযোগও করা সম্ভব। বস্তুত দ্বিজেন্দ্রলালের 'কাব্যের উপভোগ' [দ্র বঙ্গদর্শন, মাঘ ১৩১৪। ৪৯৬-৫০০]-এর প্রত্যুত্তরে লিখিত 'রবীন্দ্রবাবুর বক্তব্য'-তে রবীন্দ্রনাথ যে লিখেছেন, 'যে ব্যঙ্গ ইতিপূর্ব্বে কদাচ কোনো ব্যক্তিবিশেষের মর্ম্মভেদ করিবার জন্য নিক্ষিপ্ত হয় নাই'—সে হয়তো উক্ত বাক্যাংশকে লক্ষ্য করেই।

আশ্বিন-সংখ্যা সাহিত্য-তে মুদ্রিত 'একটি পুরাতন মাঝির গান।/[আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা' [প ৩৭৭-৭৯] রচনাটিতে দ্বিজেন্দ্রলাল 'কাব্যের অভিব্যক্তি'কেও অতিক্রম করে গেছেন। কয়েক বছর ধরে 'সাহিত্য'-এর প্রকাশ অত্যন্ত অনিয়মিত হয়ে পড়েছিল বলে অনুমান করা যায়, রচনাটি 'কাব্যের অভিব্যক্তি'র পরে লিখিত ও মুদ্রিত হয়েছিল। এই অনুমান সঠিক না হলে দ্বিজেন্দ্রলালকে 'বিদ্বিষ্ট' না ভাবা 'অন্যায় ও আক্ষেপের কথা' হবে!

দীনেশচন্দ্র সেন হয়তো এই রচনাগুলির প্রতি রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ প্রত্যুত্তরে ১৩ কার্তিকের [মঙ্গল 30 Oct] পত্রে লেখেন :

আমার কাব্য সম্বন্ধে দ্বিজেন্দ্রলাল রায় মহাশয় যে সকল অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন তাহা লইয়া বাদ প্রতিবাদ করিবার কোনোই প্রয়োজন নাই। আমরা বৃথা সকল জিনিষকে বাড়াইয়া দেখিয়া নিজের মনের মধ্যে অশান্তি ও বিরোধ সৃষ্টি করি। জগতে আমার রচনা খুব একটা গুরুতর ব্যাপার নহে তাহার সমালোচনাও তথৈবচ। তা ছাড়া, সাহিত্য সম্বন্ধে যাঁহার যেরূপ মত থাকে থাক্ না সেই তুচ্ছ বিষয় লইয়া কলহের সৃষ্টি করিতে হইবে না কি? আমার লেখা দ্বিজেন্দ্রবাবুর ভাল লাগেনা কিন্তু তাঁহার লেখা আমার ভাল লাগে, অতএব আমিই ত জিতিয়াছি—আমি তাঁহাকে আঘাত করিতে চাই না।[৫০]

কিন্তু রবীন্দ্রানুরাগীরা দ্বিজেন্দ্রলালের প্রকাশ্য বিরোধিতায় ক্ষুব্ধ হয়ে তাঁর সমর্থনে এগিয়ে আসেন। অগ্রহায়ণ-সংখ্যা প্রবাসী-তেই 'পাটনা কলেজের অধ্যাপক' যদুনাথ সরকার "সোনার তরী"র ব্যাখ্যা' [প ৪৬৭-৬৮] ও ইন্দুপ্রকাশ বন্দ্যোপাধ্যায় "সোনার তরী"র অর্থাভাব' [পৃ ৪৬৮-৬৯]-শীর্ষক দুটি রচনায় কবিতাটির অর্থ বিশ্লেষণ করেন। একই সংখ্যায় খেয়া-র সমালোচনা করতে গিয়ে অজ্ঞাত সমালোচক এই বিতর্ক তথা দ্বিজেন্দ্রলালের প্রতি কটাক্ষপাত করেন, একথা আমরা আগেই বলেছি। দ্বিজেন্দ্রলাল honest controversy চেয়েছিলেন কিন্তু নিজের লেখায় বক্তব্যে ও ভাষা-ভঙ্গিতে বিতর্কের সততা রক্ষা করতে পারেননি, রবীন্দ্র-ভক্তেরাও ভাষাব্যবহারে তাঁকেই অনুসরণ করেছেন। তাই যদুনাথ সরকার তাঁর ব্যাখ্যার উপসংহারে লেখেন : 'রবীন্দ্রনাথের গত ১৬ বৎসরের কবিতাগুলি সম্পূর্ণরূপে নূতন ভাব প্রচার করিতেছে। ("সোনার তরী"কে এ ভাবের শ্রেষ্ঠ দৃষ্টান্ত বা আদর্শ মনে করা ভুল।) এই ভাবগুলি আমাদের পুরাতন-স্মৃতি-অভ্যস্ত ভাব হইতে ভিন্ন, অনেকের পক্ষেই নূতন। প্রথম পাঠেই যে এরূপ কবিতার প্রতি পংক্তি বোঝা যাইবে এরূপ আশা করা যায় না; এবং না বুঝিতে পারিয়া অমনি নব-বাণীর দূতের প্রতি অথবা রবি-ভক্তগণের মধুচক্রে ঢিল ছুড়িলে শুধু "হাসির সমালোচনা" করা হয়।' ড আদিত্য ওহদেদার খবর দিয়েছেন, দ্বিজেন্দ্রলালের সমালোচনার প্রত্যুত্তর হিসেবে সুরেশচন্দ্র সেন-রচিত ২৮ পৃষ্ঠার পুস্তিকা 'বাঙ্গালা কবিতার ভাষা ও ভাব' ১৩১৩ সালেই প্রকাশিত হয়।[৫১]

ইন্দুপ্রকাশের বন্দ্যোপাধ্যায়ের ব্যাখ্যা-সম্পর্কে সম্ভবত অতুলচন্দ্র ঘোষ [বীরেশ্বর গোস্বামী] রবীন্দ্রনাথকে প্রশ্ন করেন; প্রত্যুত্তরে ৯ অগ্র° [রবি 25 Nov] তিনি লেখেন : 'ইন্দুপ্রকাশ "প্রবাসী"তে যে ব্যাখ্যা লিখিয়াছে

তাহা ভাল বুঝিতে পারি নাই। আমার নিজের ব্যাখ্যা খুব সহজ।' এই বলে তিনি কবিতাটির দীর্ঘ ব্যাখ্যা দিয়ে শেষে লেখেন : 'কিন্তু এ সমস্ত ব্যাখ্যাকে ধিক্। এই সমস্ত কবিতার রস এই ব্যাখ্যার উপরেই যদি নির্ভর করে তবে ইহা বৃথাই লিখিত হইয়াছিল। মনে করো না, কোনই বিশেষ অর্থ নাই—কেবল বর্ষা, নদীর চর, কেবল মেঘলা দিনের ভাব, একটা ছবি একটা সঙ্গীতমাত্রই যদি হয় তাহাতে ক্ষতি কি?'[৫২] রবীন্দ্রনাথের এই ব্যাখ্যা সেই সময়ে কোনো পত্রিকায় সম্ভবত প্রকাশিত হয়নি, কিন্তু হলে ভালো হত। তবে দ্বিজেন্দ্রলাল কর্তৃক প্রযুক্ত 'আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা' কথাটি বঙ্কিমচন্দ্রের 'মেছোহাটার ভাষা'র মতো বহুদিন রবীন্দ্র-বিরোধীদের হাতে ইডিয়ম হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছিল।

বিতর্কটি আপাতত এখানে স্থগিত হয়ে গেলেও দ্বিজেন্দ্রলাল নিজেই আবার বিষয়টির অবতারণা করেন তাঁর 'আলেখ্য' [8 Jul 1907: ২৩ আষাঢ় ১৩১৪] কাব্যের ২১ বৈশাখ ১৩১৪ [শনি 4 May 1907] তারিখে গয়ায় লিখিত ভূমিকা-য় : '···এটুকু আমার স্বীকার করায় দোষ নাই যে, এ পদ্যগুলি কবিতা হোক বা না হোক—প্রহেলিকা নয়। এ গ্রন্থের কোন কবিতা পড়ে, তার মানে দশ জনে দশ রকম বের ক'রে তাঁদের নিজেদের মধ্যে বিবাদ করার প্রয়োজন হবে না। কবিতাগুলির মানে যদি থাকে ত এক রকমই আছে। কোন কবিতার দুই একটি শ্লোক যদি বোঝা না যায়, সেখানে আমি বলবো যে, সেটা আমার ভাষার দোষ; 'বৃহৎ ভাব' দাবী কর্ব্ব না। পরিশেষে এও ব'লে রাখি যে, আমার বর্ণিত বিষয়গুলি পার্থিব; আমি যে ভাবের ধারণা কর্ত্তে পারি, সেই ভাব সম্বন্ধেই লিখি; আর আমি নিজের কবিতার মানে নিজে বেশ বুঝিতে পারি।'[৫৩] 'কাব্যের উপভোগ' ও 'কাব্যে নীতি'র ধ্বজা তুলে তিনি একাধিকবার আসরে অবতীর্ণ হয়েছিলেন, সে-প্রসঙ্গ পরে আলোচিত হবে।

দীনেশচন্দ্র সেনকে রবীন্দ্রনাথ পূর্বোল্লিখিত ১৩ কার্তিকের [মঙ্গল 30 Oct] পত্রের প্রথমেই লেখেন : 'সাময়িক সমস্ত প্রসঙ্গ বর্জ্জন করিলেও এবং গল্প উপন্যাস বাদ দিলেও গদ্য গ্রন্থাবলী নিতান্ত ছোট হইবে না। বোধ হয় যোলো পেজি ফর্ম্মার অন্ততঃ ১০০ ফর্ম্মা হইবে। সমালোচকের সুতীক্ষ্ণ কুঠার হাতে লইয়া সংগ্রহ কার্য্যে প্রবৃত্ত আছি—বোধ হয় জঙ্গল আগাছা অধিক দেখিতে পাইবেন না—প্রত্যেক লেখাটিই পাঠ্য হইবে এইরূপ আশা করি।'[৫৪] এই গদ্যগ্রন্থাবলী সংকলনের জন্য তাঁকে ১২৯১ বঙ্গাব্দের ভারতী ও নবজীবন থেকে আরম্ভ করে গ্রন্থাবলীর প্রকাশকাল পর্যন্ত প্রায় চব্বিশ বছরের ভারতী, বালক, সাধনা, তত্ত্ববোধিনী, প্রদীপ ও বঙ্গদর্শন-এর ফাইল ঘাঁটতে হয়েছে, প্রবন্ধগুলিকে শ্রেণীবিন্যস্ত করতে হয়েছে এবং নির্মমহস্তে সংস্কারকার্যে ব্রতী হতে হয়েছে। কাজটি সহজ ছিল না; সাময়িক প্রসঙ্গ ও পুনরাবৃত্তির 'জঙ্গল আগাছা' সাফ ও পরিবর্তিত পরিস্থিতির কারণে তাঁকে সত্যই 'সমালোচকের সুতীক্ষ্ণ কুঠার' হাতে নিয়ে অগ্রসর হতে হয়েছিল। হাস্যকৌতুক, ব্যঙ্গকৌতুক, গোড়ায় গলদ, বৈকুণ্ঠের খাতা ও প্রজাপতির নির্বন্ধ-সহ গদ্যগ্রন্থাবলী 'বিচিত্র প্রবন্ধ' থেকে 'ধর্ম পর্যন্ত যোলোটি ভাগে প্রকাশিত হয় [১৩১৪-১৫], মোট পৃষ্ঠাসংখ্যা ২৩৪৬। হয়তো এই গদ্যময় কাজে লিপ্ত ছিলেন বলেই এইসময়ে তাঁর কবিতা বা গান রচনার প্রেরণা ছিল না, অন্য গদ্যরচনাও স্বল্প।

তরুণ কবি কালিদাস রায় [1889-1975] তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'কুন্দ' রবীন্দ্রনাথকে উৎসর্গ করেন। বইটি পেয়ে তিনি অবশ্য কবিকে বিশেষ উৎসাহ দিতে পারেননি; ২২ কার্তিক [বৃহ ৪ Nov] তাঁকে লেখেন :

'তোমার কাঁচা বয়সের লেখা—ইহার উপরে অধিক ভরসা রাখিয়ো না।'[৫৫]

১৭ কার্তিক [শনি 3 Nov] তিনি মীরা দেবীকে লিখেছেন : 'এখানে মাঝে রীতিমত বৃষ্টিবাদল হয়ে গিয়ে আবার আকাশ নির্ম্মল হয়েছে। অল্প অল্প ঠাণ্ডাও পড়েছে।'[৫৬] এই ঠাণ্ডার প্রতিক্রিয়ার কথা আছে সম্ভবত ২০ কার্তিকে [মঙ্গল 6 Nov] লেখা চিঠিতে : 'আমার বেজায় সর্দ্দি হয়েছে। কাল থেকে বেশ রীতিমত হাঁচা যাচ্ছে —আমার ছোট ঘরটি হাঁচির শব্দে বেশ জমিয়ে রাখা গেছে।'[৫৭] আরোগ্য সংবাদের সঙ্গে আরও খবর আছে 10 Nov [শনি ২৪ কার্তিক] তারিখের এতাবৎ-প্রাপ্ত তাঁর লেখা প্রথম ইংরেজি চিঠিতে :

> I was agreeably surprised to receive your letter in English. ...All the same, I am not going to be altogether deprived of the sight of your Bengali handwriting and the quaint spelling which betray your East Bengal origin through mother's side....
>
> Boys are all coming back to our school and in thousand ways their presence is being felt all over here...As the school work has not begun yet they are having a very jolly time. Kusumato surprised me last night by suddenly making his appearance. There is some hope of his getting an appointment in the National Technical Institute, and he wants a recommendation letter from me to Mr. Palit....I have complete(ly) recovered from the bad cold I had.[৫৮]

কন্যাকে লেখা তাঁর এইরূপ আরও কয়েকটি ইংরেজিতে লেখা চিঠি আছে। 13 Nov (মঙ্গল ২৭ কার্তিক]-এর চিঠিতে মুসৌরী থেকে আনীত তরকারি ও ফুলের বীজের কথা আছে—শিশুকাল থেকেই মীরা দেবী বাগান করার প্রতি আকর্ষণ বোধ করতেন, তাই রবীন্দ্রনাথ কন্যাকে বাগান-সংক্রান্ত খবরাখবর সরবরাহ করেছেন। 18 Nov [রবি ২ অগ্র°]-এর চিঠিতে আবার বিদ্যালয়ের সংবাদ: 'Some of my boys are down with fever—they brought this from home and our trouble with them won't be over till the cold season sets in in right earnest. Altogether we are very busy with the reopening of the school.'

নবীনচন্দ্র সেনের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সম্পর্ক ও পত্রালাপের কিছু-কিছু বিবরণ আমরা পূর্ববর্তী অধ্যায়গুলিতে দিয়েছি। পুত্র নির্মলচন্দ্রকে ব্যারিস্টারি পড়ার জন্য, বিলাত পাঠানোর আগে নবীনচন্দ্র রবীন্দ্রনাথের কাছে পরিচিতি-পত্র প্রার্থনা করেছিলেন [দ্র রবিজীবণী ৪।২৯২]। ইতিমধ্যে নির্মলচন্দ্র ব্যারিস্টারি পাশ করে দেশে ফেরার কিছুদিন পরে নবীনচন্দ্র 1 Jul 1904 [১৭ আষাঢ় ১৩১১] অবসর গ্রহণ করে পুত্রের সঙ্গে রেঙ্গুন যাত্রা করেন—নির্মলচন্দ্র সেখানকার চীফকোর্টে প্র্যাকটিশ করার সিদ্ধান্ত নেন। রবীন্দ্রনাথ কয়েকবার বিদেশ ভ্রমণের সময়ে তাঁর বাড়িতে যাত্রাবিরতি ঘটান। রেঙ্গুনে যাওয়ার পরেও নবীনচন্দ্রের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন হয়নি। 'খেয়া' কাব্যগ্রন্থ উপহার পেয়ে নবীনচন্দ্র 12 Oct [শুক্র ২৬ আশ্বিন] লেখেন : "আপনার 'খেয়া' উপহার পাইয়া বড়ই অনুগৃহিত [যদ্দৃষ্টং] হইলাম'।[৫৯] 'স্মরণ'-কবিতাগুচ্ছের জন্য তাঁর প্রার্থনা ছিল—কিন্তু তখনও স্বতন্ত্র পুস্তকাকারে গ্রন্থটি মুদ্রিত হয়নি, তাই রবীন্দ্রনাথ তাঁকে সমগ্র 'কাব্যগ্রন্থ' পাঠিয়ে দেন। সেগুলি পেয়ে 23 Nov [শুক্র ৭ অগ্র°] তিনি লেখেন : 'আপনার প্রতিলিপি ও এক সেট বই উপহার পাইয়াছি। আপনার অন্যান্য কাব্য সকলই আমার ছিল। কেবল যে বইখানাতে আপনার পত্নীশোকের কবিতাগুলিন ছিল তাহা পাঠাইলেই হইত।'[৬০] রবীন্দ্রনাথের পত্রটি কিন্তু আমাদের হাতে এসে পৌঁছয়নি। এই পত্রে আর একটি অভিনব সংবাদ পাওয়া যায়, যা সম্ভবত রবীন্দ্রনাথই তাঁকে জানিয়েছিলেন : 'নাটোরের মহারাজা যে সংস্করণ ছাপিবেন, ভরসা করি তাহা প্রকৃত রাজসংস্করণ হইবে, এবং তাহাতে ছবি

প্রত্যেক কবিতায় থাকিবে। এরূপ একখানা বই এখনো বাঙ্গালাতে হইল না।' বীরচন্দ্র মাণিক্য বা লোকেন্দ্রনাথ পালিতও একদা এইরূপ পরিকল্পনা করেছিলেন, বর্তমান প্রকল্পেরও একই গতি হয়েছিল।

বেশ কিছুদিন ধরে রবীন্দ্রনাথ বিভিন্ন জনকে লিখছিলেন অগ্রহায়ণের মাঝামাঝি শিলাইদহে বোটে ঘুরে আসার ইচ্ছার কথা। ৮ কার্তিক [বৃহ 25 Oct] শ্রীশচন্দ্র মজুমদারকে লিখেছেন : 'অগ্রহায়ণের মাঝামাঝি বোটে যাইবার ইচ্ছা আছে';[৬১] ১৩ কার্তিক [মঙ্গল 30 Oct] দীনেশচন্দ্র সেনকে লেখেন : 'আমি অগ্রহায়ণে বিদ্যালয় [খুলিলে] দিন পনেরো কাজকর্ম্ম চালাইয়া দিয়া বোটে যাইবার সংকল্প করিতেছি—আমার শরীর মন্দ নাই কিন্তু মনের ভিতরটা নির্জ্জনবাস ও বিশ্রামের জন্য ব্যাকুল হইয়াছে।'[৬২] সেই ইচ্ছা তিনি কাজে পরিণত করলেন অগ্রহায়ণ মাসের তৃতীয় সপ্তাহে। কিন্তু তার আগে তাঁকে কলকাতায় একটি প্রবন্ধ পাঠ করতে হল। মনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়কে তিনি লিখেছিলেন, সময় পেলে জাতিভেদের উপর একটি প্রবন্ধ লিখে দেবেন—যে-প্রতিশ্রুতি তিনি পালন করেননি; পরিবর্তে লিখলেন চতুরাশ্রমের আধুনিক উপযোগিতার কথা 'ততঃ কিম্' প্রবন্ধে [দ্র বঙ্গদর্শন, অগ্র°। ৪০০-১৮; ধর্ম ১৩।৪২০-৪১]। প্রবন্ধটি পঠিত হল ২১ অগ্র° [শুক্র 7 Dec] ওভারটুন হলে হীরেন্দ্রনাথ দত্তের সভাপতিত্বে আলোচনা সমিতির বিশেষ অধিবেশন হিসেবে। রবীন্দ্রনাথ সম্ভবত উদ্যোক্তাদের প্রবন্ধের বিষয় সম্বন্ধে স্পষ্ট করে কিছু জানাননি, ফলে এই দিনের *The Bengalee* পত্রিকায় সংবাদটি বিজ্ঞাপিত হয় ভুলভাব : 'At a special meeting of the *Alochana Samiti* Babu Rabindra Nath Tagore will deliver a lecture at Overtoun Hall, 86 College Street, on educational matter at 5.30 p.m. to-day on "What then?" The meeting is open to the public.' পরের দিন অবশ্য পত্রিকাটিতে এক কলম প্রতিবেদনে প্রবন্ধটির সংক্ষিপ্তসার দেওয়া হয়। এই বিবরণ থেকে জানা যায়, সভায় গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, দীনেশচন্দ্র সেন, জগদীশচন্দ্র বসু, ললিতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ, বিপিনচন্দ্র পাল, বিহারীলাল সরকার, মোক্ষদাচরণ সামধ্যায়ী, ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ উপস্থিত ছিলেন এবং প্রবন্ধপাঠের পর বিপিনচন্দ্র, ব্রহ্মবান্ধব, যদুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, মোক্ষদাচরণ ও আরো অনেকে আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন।

শিক্ষার কথা প্রবন্ধটিতে নেই তা নয়, কিন্তু সেই কথা এসেছে প্রাচীন ভারতীয় চতুরাশ্রমের বর্তমান সর্বজনীন উপযোগিতার আলোচনা-প্রসঙ্গে। এই প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ বললেন, কর্ম বা কর্মবিরতি কোনোটাই মানবের চরম লক্ষ্য নয়—মানবাত্মার মুক্তিকে চরম লক্ষ্য করলে গ্রহণ ও বর্জন, বন্ধন ও বৈরাগ্য দুটিকেই মেলাতে হয়—প্রাচীন সংহিতাকারগণ মানবজীবনকে চতুরাশ্রমে ভাগ করে এই লক্ষ্যে পৌঁছনোর পথ বলে নির্দেশ করেছেন। প্রশ্ন উঠতে পারে, একটি দেশের সমস্ত লোককে এই আদর্শে গড়ে তোলা যায় কিনা। রবীন্দ্রনাথ উত্তরে বলেন: 'ভারতবর্ষে যদি এমন দিন আসে যে, আমাদের দেশের মান্যশ্রেষ্ঠ ব্যক্তিরা সর্বোচ্চ সত্য এবং সর্বোচ্চ মঙ্গলকেই আর-সমস্ত খণ্ড প্রয়োজনের ঊর্ধ্বে তুলিয়া চিরজীবনের সাধনার সামগ্রী করিয়া রাখেন, তবে তাঁহাদের সাধনা ও সার্থকতা সমস্ত দেশের মধ্যে একটা বিশেষ গতি একটা বিশেষ শক্তি সঞ্চার করিবেই।' তাঁর মতে, এই আদর্শ সমগ্র মানবজাতির পক্ষেই শ্রেয়: 'প্রথম বয়সে শ্রদ্ধার দ্বারা সংযমের দ্বারা ব্রহ্মচর্যের দ্বারা প্রস্তুত হইয়া দ্বিতীয় বয়সে সংসার-আশ্রমে মঙ্গলকর্মে আত্মাকে পরিপুষ্ট করিতে হইবে; তৃতীয় বয়সে উদারতর ক্ষেত্রে একে একে সমস্ত বন্ধন শিথিল করিয়া অবশেষে আনন্দের সহিত মৃত্যুকে মোক্ষের

নামান্তররূপে গ্রহণ করিবে—মানুষের জীবনকে এমন করিয়া চালাইলেই তবে তাহার আদ্যন্তসংগত পূর্ণতাৎপর্য পাওয়া যায়।···ইহার কাছে বিলাসীর উপকরণ, নেশনের প্রতাপ, রাজার ঐশ্বর্য, বণিকের সমৃদ্ধি, সমস্তই গৌণ; মানুষের আত্মাকে জয়ী হইতে হইবে, তবেই মানুষের এতকালের সমস্ত চেষ্টা সার্থক হইবেনহিলে—ততঃ কিম্, ততঃ কিম্, ততঃ কিম্।'

প্রবন্ধপাঠের অব্যবহিত পরেই রবীন্দ্রনাথ শিলাইদহে যাত্রা করেন। কিন্তু সেখানে বেশিদিন থাকা হল না। '২৭ অগ্রহায়ণ সিলাইদহায় এক পত্র রেজিষ্টারী করিয়া পাঠান ব্যয় সত্যবাবু বাবু মহাশয়ের নামে পাঠান।' এই পত্র পেয়ে রবীন্দ্রনাথ ২৯ অগ্র° [শনি 15 Dec] মীরা দেবীকে লিখলেন : 'মনে করেছিলুম অনেকদিন বোটে নদীর উপরে কাটাব। কিন্তু খুব একটা জরুরী কাজে আজই কলকাতায় যাচ্চি সেখানে থেকে দুই এক দিনের মধ্যেই বোলপুরে যেতে হবে। মনে ইচ্ছা আছে ১১ই মাঘের পরে আবার একবার বোটে আসব।'[৬৩] কী কাজের জন্য এই অকাল-প্রত্যাবর্তন জানা যায়নি, ক্যাশবহির হিসাব থেকে জানা যায় ১ পৌষ [রবি 16 Dec] তিনি শান্তিনিকেতনে ফিরে গেছেন।

শান্তিনিকেতনে ষোড়শ সাম্বৎসরিক ব্রহ্মোৎসব অনুষ্ঠিত হল ৭ পৌষ [শনি 22 Dec]। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা-য় প্রদত্ত বিবরণ অনুযায়ী এবার শান্তিনিকেতনে দেশ বিদেশ হইতে অনেকে নিমন্ত্রিত হইয়া আসিয়া ছিলেন।' প্রাতঃকালীন উপাসনায় আচার্য্যেরা বেদীর সম্মুখে একপংক্তিতে দণ্ডায়মান হইয়া সমস্বরে 'ওঁ পিতানোহসি এই মন্ত্র পাঠ করিলেন এবং মন্ত্র পাঠান্তে তাঁহারা ও সভাস্থ সকলে দণ্ডবৎ হইয়া প্রণাম করিলে শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ শাস্ত্রী ও শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ শিরোমণিকে সঙ্গে লইয়া বেদী গ্রহণ করিলেন। প্রথম সঙ্গীত হইল। তৎপরে শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় সুললিত ও সরল ভাষায় সকলকে উদ্বোধিত করিলেন।'[৬৪]

সায়ংকালীন উপাসনায় প্রিয়নাথ শাস্ত্রী ও চিন্তামণি চট্টোপাধ্যায়কে সঙ্গে নিয়ে রবীন্দ্রনাথ বেদী গ্রহণ করেন। সংগীতের পর রবীন্দ্রনাথ একটি 'মর্ম্মস্পর্শী উপদেশ' পাঠ করেন।

পৌষ-উৎসবে সকালে ও সন্ধ্যায় প্রদত্ত তাঁর দুটি ভাষণ 'আনন্দরূপ' [দ্র বঙ্গদর্শন, মাঘ। ৪৮৩-৮৬; ধর্ম ১৩।৪৪১-৪৫] ও 'শান্তং শিবমদ্বৈতম্' [দ্র বঙ্গদর্শন, পৌষ। ৪২৩-২৮; তত্ত্ব, বৈশাখ ১৮২৯ শক (১৩১৪)। ১-৬; ধর্ম ১৩।৪১০-১৬] মাঘোৎসবে যথাক্রমে প্রাতঃকালীনও সায়ংকালীন উপাসনায় পঠিত হয়। 'আনন্দরূপ' প্রবন্ধ উপনিষদের 'সত্যং জ্ঞানমনন্তম্' 'আনন্দরূপমমৃতং যদ্বিভাতি' ইত্যাদি কয়েকটি শ্লোকাংশের স্বাধীন ব্যাখ্যামাত্র, 'ক্ষুদ্র স্বার্থ ভুলিয়া, ক্ষুদ্র অহমিকা দূর করিয়া···নিজের অন্তঃকরণকে একবার আনন্দে জাগাইয়া' তোলার আহ্বান। 'শান্তং শিবমদ্বৈতম্' সেদিক দিয়ে অনেক গুরুতর প্রবন্ধ, , 'ততঃ কিম্' প্রবন্ধে ভারতীয় চতুরাশ্রমের মধ্যে মানবাত্মার যে পরিপূর্ণতার আদর্শ তিনি ব্যাখ্যা করেছিলেন তাকেই 'শান্তং শিবমদ্বৈতম্' মন্ত্রাংশের মধ্যে বিধৃত করে দেখালেন।

পৌষ-উৎসবের পরেই রবীন্দ্রনাথকে কলকাতায় আসতে হল, কারণ ত্রিপুরারাজ রাধাকিশোর মাণিক্যের কলকাতায় আগমন। বেঙ্গলী পত্রিকার [23 Dec] খবর অনুযায়ী রাধাকিশোর ৭ পৌষ সকালেই কলকাতায় পৌঁছে ১৩ পার্ক স্ট্রীট-স্থ ভবনে উঠেছেন। ত্রিপুররাজ্যের কল্যাণকামনায় লোকনিন্দা সত্ত্বেও রবীন্দ্রনাথ যে আগ্রহ দেখিয়েছিলেন এবং যতীন্দ্রনাথ বসু বা রমণীমোহন চট্টোপাধ্যায়ের মতো নিজের বিশ্বাসভাজন ব্যক্তিদের

রাজকর্মে যুক্ত করে পারিষদদের চক্রান্ত থেকে মহারাজকে রক্ষা করবার চেষ্টা করছিলেন, রাধাকিশোরের দুর্বলতার ফলেই সেই প্রয়াস ব্যর্থ হচ্ছে এই বিশ্বাস তাঁর মনে ক্রমশই দৃঢ় হচ্ছিল। সেইজন্য কলকাতায় মৌখিক আলোচনায় নানা বিষয়ে কথা বলার পরও ১৪ পৌষ [শনি 29 Dec] শান্তিনিকেতনে প্রত্যাবর্তনের আগে তাঁকে একটি দীর্ঘ পত্র লেখেন [দ্র রবীন্দ্রনাথ ও ত্রিপুরা।৩২০-২১]। পত্রটির মধ্যে তাঁর উষ্মা খুবই স্পষ্টভাবে প্রকাশ পেয়েছে। বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যস্থাপনের প্রবক্তা রবীন্দ্রনাথ এককেন্দ্রিক শাসনব্যবস্থার পক্ষপাতী ছিলেন, তাঁর স্বদেশী সমাজ পরিকল্পনা ও দেশনায়ক বরণের প্রস্তাবের মাধ্যমে তা আমরা জানতে পারি। রাজমন্ত্রী রমণীমোহনকে রাজ্যশাসনকার্যে স্বাধীনতা দেওয়ার পরামর্শ তিনি দিয়েছিলেন এই দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে বিচার করে। কিন্তু ত্রিপুরারাজের স্থানীয় পারিষদবৃন্দ বহিরাগত এক ব্যক্তির আধিপত্য মেনে নিতে প্রস্তুত ছিলেন না, ফলে তাঁরা মহারাজকে কাউন্সিলের দ্বারা রাজ্যপরিচালনার প্রস্তাব দেন।* রবীন্দ্রনাথ তাঁর পত্রের প্রথমেই এই প্রস্তাবের বিরোধিতা করে উক্ত পরামর্শদাতাদের সম্বন্ধে লেখেন : ‘মহারাজ নিয়ত প্রশ্রয় দিয়া ইহাদের বলবৃদ্ধি করিয়া দিয়াছেন, কোথায় ধীরে ধীরে সেই বল খর্ব্ব করিবেন, নিজেকে স্বার্থপর দীনচরিত্র ক্ষুদ্রমনা ব্যক্তিদের জাল হইতে মুক্ত করিবেন, না, রাজ্যশাসনভার ইহাদের হাতে সমর্পণ করিয়া ইহাদের প্রলয়শক্তিকে দুর্জয় করিয়া তুলিবেন?’ দ্বিতীয় প্রস্তাব ছিল চট্টগ্রাম বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত কমিশনার সি. ডব্ল্যু. ম্যাকমিন্‌কে [C. W. McMinn, I.C.S.] চাকলা রোশনাবাদের ম্যানেজার হিসেবে নিয়োগ করা। রবীন্দ্রনাথ রাজ্যের স্থায়ী মঙ্গলের স্বার্থে এই প্রস্তাবের বিরোধিতা করেছেন।

রমণীমোহন ত্রিপুরার রাজমন্ত্রী ও দেওয়ান-পদে দীর্ঘকাল টিকে থাকতে পারেননি; 19 Mar 1907 [মঙ্গল ৫ চৈত্র] বেঙ্গলী-তে এই সংবাদ প্রকাশিত হয় : ‘We understand that Mr. Romoni Mohan Chatterjee M.A. is to be Joint-Secretary of the Bengal Technical Institute with Dr. Nilratan Sircar and B.L. Choudhury.’ তাঁর জায়গায় রায়বাহাদুর উমাকান্ত দাস নিযুক্ত হন। এই নিয়োগের পটভূমিকাটি 22 Apr 1907 [সোম ৯ বৈশাখ ১৩১৪] মহিমচন্দ্র দেববর্মার কাছে বিবৃত করেছেন দীনেশচন্দ্র সেন : ‘রবীন্দ্র বাবুর সঙ্গে আগরতলার সম্বন্ধে অনেক কথা হইয়াছিল। উ-দা [উমাকান্ত দাস] মহাশয়ের পুনর্নিয়োগে তাঁহার কোন হাত ছিল না। তিনি বলিলেন সব ঠিক ঠাক করিয়া শ্রীশ্রীযুত বাহাদুর তাঁহাকে জানাইয়াছিলেন—এই পর্যন্ত।’[৬৫]

ত্রিপুরার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সম্পর্কের আর-একটি পর্ব এখানে শেষ হয়েছে। কিন্তু এই রাজ্যের মঙ্গলাকাঙক্ষায় তিনি বিরত ছিলেন না। ৬ চৈত্র [বুধ 20 Mar 1907] তিনি মহিমচন্দ্রকে লেখেন :

এই রাজ্যের সঙ্গে আমার যেন ধর্ম্মের সম্বন্ধ বাধিয়া গেছে—আমি যতই ইচ্ছা করি ইহার সম্বন্ধে আমি মনকে উদাসীন করিতে পারি না। এক এক সময় অভিমান করিয়া তোমাদের সংস্রব হইতে একেবারে দূরে সরিয়া যাইতে ইচ্ছা করে—কারণ রাজা মাত্রেরই চারিদিকের আবহাওয়া এমনতর, এত চক্রান্ত ও চক্রীদের দ্বারা রাজাকে সর্ব্বদা বেষ্টিত থাকিতে হয় যে তাহার মধ্যে দুর্দ্দৈববশত আকৃষ্ট হইয়া পড়িলে মনের মধ্যে বারম্বার গ্লানি জন্মিতে থাকে। কিন্তু বিধাতা কেন আমাকে এখানে টানিয়াছেন জানি না—মহারাজের সঙ্গে তিনি আমার একটি মঙ্গল সম্বন্ধ বাঁধিয়া দিয়াছেন। এখন আর আমার দ্বারা তো মহারাজের বিশেষ কোনো উপকারের সম্ভাবনা দেখি না—আমার সাধ্যও নাই, সময়ও নাই, সুযোগও নাই—তোমাদের প্রতি আমার

সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ এই নিজের কোন দুর্ব্বলতাবশত তোমাদের রাজ্যের হিতসাধনে নিজেকে অক্ষম করিয়ো না। [৬৬]

মহিমচন্দ্রের পুত্র সোমেন্দ্রচন্দ্র-সহ অনেকগুলি বালক ব্রহ্মচর্যাশ্রমে শিক্ষা গ্রহণ করছিলেন, রবীন্দ্রনাথ শেষ পর্যন্ত তাঁদের প্রতিই নির্ভর করেছেন : 'তোমার ছেলেকে আমি বিলাসের নাগপাশ হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত করিয়া পুরুষোচিত গুণে ভূষিত করিতে চাই যাহাতে বড় হইয়া সে নিজের অভ্যাস ও সংস্কারে পদে পদে জড়িত হইয়া কর্ত্তব্যের পথে নিজেকে অচল করিয়া না ফেলে। আশা করি সে বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে তোমাদের রাজ্যের পক্ষে একটি লাভস্বরূপ গণ্য হইবে। এছাড়া মধ্যম রাজকুমার ব্রজেন্দ্রকিশোরের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সম্পর্ক সুচিরস্থায়ী হয়েছিল।

রবীন্দ্রনাথের কলকাতায় অবস্থানের সময়ে সেখানে ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের দ্বাবিংশতিতম অধিবেশন চলছিল [26-28 Dec বুধ-শুক্র ১১-১৩ পৌষ] দাদাভাই নৌরজীর সভাপতিত্বে। ইতিপূর্বে কলকাতায় অনুষ্ঠিত 1886, 1890, 1896 ও 1901-এর অধিবেশনগুলিতে রবীন্দ্রনাথ যে উৎসাহী ভূমিকা নিয়েছিলেন, বর্তমান অধিবেশনে তার অভাব ছিল। অবশ্য 10 Jul [মঙ্গল ২৬ আষাঢ়] ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন হলে মতিলাল ঘোষের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত একটি সভায় গঠিত অভ্যর্থনা সমিতিতে সত্যেন্দ্রনাথ, গগনেন্দ্রনাথ প্রভৃতিদের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথকেও সভ্য মনোনীত করা হয়[৬৭] এবং 22 Dec [শনি ৭ পৌষ] সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত The Students & Young Men's Association-এর সভায় তিনি প্রতিনিধি [Delegate] মনোনীত হন।[৬৮] তবে সভাপতি দাদাভাই নৌরজী ৯ পৌষ [সোম 24 Dec] সকালে যখন কলকাতায় আসেন, তখন রীতি-অনুযায়ী তাঁকে অভ্যর্থনার জন্য রবীন্দ্রনাথ হাওড়া স্টেশনে উপস্থিত ছিলেন কিনা জানার উপায় নেই কিংবা কংগ্রেসের অধিবেশনে তাঁর উপস্থিতির প্রমাণ মেলে না। অবশ্য কংগ্রেস অধিবেশনের সঙ্গে যে শিল্প-প্রদর্শনী হয় সেখানে তিনি গিয়েছিলেন, সেই কথাটি জানা যায় 30 Dec [রবি ১৫ পৌষ] শান্তিনিকেতন থেকে মীরা দেবীকে লেখা তাঁর ইংরেজি চিঠিতে : 'Of course I could give you a lengthy description of the Exhibition but it did not interest me and I ran away from the Calcutta crowd tired and disappointed.[৬৯]

হিরণ্ময়ী দেবী-প্রতিষ্ঠিত মহিলা শিল্পসমিতির সাহায্যার্থে এই সময়ে কয়েকবার টিকিট বিক্রি করে কালমৃগয়া-র অভিনয় হয়। প্রথম অভিনয়টি হয় সংগীতসমাজে ২৫ পৌষ [বুধ 9 Jan] তারিখে। বেঙ্গলী-তে [Jan 8] প্রদত্ত সংশ্লিষ্ট বিজ্ঞাপনটি উদ্ধৃত হল :

Under the distinguished patronage of H. H. the Maharani of Mysore Indian Tableaux & Theatricals./ By Indian Ladies./ For Ladies only./ In aid of Indian Educational Institutions for Women./Scenes from the Kumar Sambhaba and the musical Play Kal Mrigaya./ Wednesday 9th at 6 p.m./ Place 209, Cornwallis Street./ Tickets Rs. 10, 5 and 3.

দ্বিতীয় অভিনয়টি হয় ২৮ পৌষ [শনি 12 Jan] শিল্পপ্রদর্শনী-প্রাঙ্গণে। একই উদ্দেশ্যে ১০, ৫, ৩, ২, ১ টাকার টিকিট বিক্রি করে অভিনয় হওয়ার কথা ছিল ১৮ পৌষ [বুধ 2 Jan], কিন্তু অনিবার্য কারণবশত তারিখটি পরিবর্তিত হয়। 11 Jan বেঙ্গলী-তে প্রদত্ত বিজ্ঞাপনটি এই রকম :

At the Theatre Hall, Exhibition Grounds./ Entrance Zenana Gate, South side/ on Saturday, the 12th Jan at 6 p.m.... The musical Play of Kal Mrigaya./ Tickets to be obtained from Ms. Bevan & Co, Mrs J. N. Roy, 62-2 Beadon Street, Mrs. S. R.

Das 31, Theatre Road.

পাঠকের মনে পড়তে পারে, এর আগে মহিলা শিল্পসমিতির উদ্যোগে অনুষ্ঠিত স্বদেশী মেলায় ৩১ ভাদ্র ও ১ আশ্বিন 'লক্ষ্মীর পরীক্ষা' অভিনীত হয়েছিল।

কলকাতায় এসে রবীন্দ্রনাথ গদ্যগ্রন্থাবলী মুদ্রণের ব্যবস্থা করে গিয়েছিলেন। তাঁর ক্যাশবহিতে দেখা যায়, মজুমদার লাইব্রেরি প্রকাশকের দায়িত্ব নিলেও আনুষঙ্গিক ব্যয় তিনি নিজে বহন করেছেন। এ-সংক্রান্ত প্রথম হিসাবটি পাওয়া যায় ১৮ পৌষ [বুধ 2 Jan] : 'ব° শৈলেশচন্দ্র মজুমদার দং ১০ ফর্ম্মা গ্রন্থাবলী ছাপানর কাগজ ক্রয় ৫০্'। বই ছাপানোর জন্য নূতন টাইপ কেনার উদ্দেশ্যে তাঁকে ১০০ টাকা দেওয়া হয় ২ ফাল্গুন [বৃহ 14 Feb] তারিখে। এরূপ ব্যয়ের হিসাব আরও আছে।

রবীন্দ্রনাথ আবার কলকাতায় আসেন মাঘের প্রথম সপ্তাহে। এবারে তাঁর কর্মসূচী অনেক দীর্ঘ ছিল। তার প্রথমটি হল সরস্বতী পুজোর ছুটিতে ভারতীয় শিল্পপ্রদর্শনী প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত একটি সাহিত্যসম্মিলনে ভাষণ দান। ইণ্ডিয়ান মিরার-সম্পাদক নরেন্দ্রনাথ সেনকে স্থায়ী সভাপতি করে 'সাহিত্য সম্মিলন' নামে একটি প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয়। ১ পৌষ [রবি 16 Dec] ১৩ ওয়েলিংটন স্ট্রীট-স্থ ইণ্ডিয়ান আর্ট স্কুলে এই প্রতিষ্ঠানের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত একটি সভায় ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে দুর্গাদাস লাহিড়ি তিন মাসের মধ্যে কলকাতায় একটি সাহিত্যসমাবেশের আয়োজন করার প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করলে পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় প্রস্তাব করেন সমাবেশটি সরস্বতী পুজোর ছুটিতে অনুষ্ঠিত হোক। আয়োজনের দায়িত্ব দেওয়া হয় দেবকুমার রায়চৌধুরীকে, তাঁর উদ্যোগেই বরিশাল সাহিত্যসম্মেলন আয়োজিত হয়েছিল।[৭০] দেবকুমার বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সম্পাদক রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী ও ভারতীয় শিল্পপ্রদর্শনীর সম্পাদক ব্যারিস্টার যোগেশচন্দ্র চৌধুরীর সঙ্গে এ-বিষয়ে আলোচনা করেন। সিদ্ধান্ত হয়, প্রদর্শনীপ্রাঙ্গণে ৪ ও ৫ মাঘ [শুক্র-শনি 18-19 Jan] গান-বাজনা, হাস্যকৌতুক আবৃত্তি, ব্যায়াম, যাদুপ্রদর্শনী, ভাষণ প্রভৃতির সমন্বয়ে বিচিত্রানুষ্ঠান সারস্বত সম্মিলন অনুষ্ঠিত হবে। ৪ মাঘ [শুক্র 18 Jan] কণ্ঠ ও যন্ত্র সংগীত, অর্ধেন্দুশেখর মুস্তাফি ও গোপালচন্দ্র সিংহরায়ের হাস্যকৌতুক, প্রোফেসর মুর্তাজার অসিচালনা প্রভৃতি পরিবেশিত হয়। উপস্থিত ছিলেন যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর, গোপালকৃষ্ণ গোখলে, সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন সিংহ, গগনেন্দ্রনাথ, আশুতোষ চৌধুরী-প্রমুখ পাঁচ ভাই, রামেন্দ্রসুন্দর, কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ, শ্রীশচন্দ্র মজুমদার, গোবিন্দলাল দত্ত প্রভৃতির সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ। ৫ মাঘ [শনি 19 Jan] দ্বিতীয় দিনেও অনুষ্ঠানসূচীটি দীর্ঘ ছিল, কিন্তু প্রধান আকর্ষণ ছিল সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে রবীন্দ্রনাথের 'সাহিত্যসম্মিলন' [দ্র বঙ্গদর্শন, ফাল্গুন। ৫১৭-২৯; সাহিত্য-পরিশিষ্ট ৮।৪৯৩-৫০৬] প্রবন্ধ-পাঠ। মহাকালী পাঠশালার বালিকাদের সংস্কৃত মন্ত্র আবৃত্তির পর রবীন্দ্রনাথ তাঁর প্রবন্ধ পাঠ করেন। *The Bengalee* পত্রিকার প্রতিবেদক লেখেন :

Babu Rabindra Nath Tagore then read his now famous dissertation that was to have opened the Barisal Sammilan last year. It was one of the greatest of intellectual efforts of Babu Rabindranath. What with its exquisite phrasing, its luminous tropes, its grand well poised peroration and the sparkling bits of epigrams and what with its deep thought and pathos its thorough analysis of the present intellectual condition of Bengal, Babu Rabindra Nath's utterance would rank as one of his best and noblest.[৭২]

এই প্রতিবেদনেই প্রকাশ যে, প্রবন্ধটি বরিশাল সাহিত্যসম্মিলনের জন্যই লেখা হয়েছিল—বর্তমান উপলক্ষে রবীন্দ্রনাথ ভাষণের পূর্বাংশে কিছু সংযোজন করেন। তিনি বলেন : 'বর্তমান সভার কর্তৃপক্ষদের কাছে কাতরকণ্ঠে ছুটির দরখাস্ত করিয়াছিলাম। তাঁহারা আমার পূর্বেকার নোক্‌রি স্মরণ করিয়া দরখাস্ত নামঞ্জুর করিয়াছেন। তাঁহারা কেহ বা আমার প্রিয় আত্মীয়, কেহ বা আমার মান্য ব্যক্তি; তাঁহাদের অনুরোধের উত্তরে 'না' বলিবার অভ্যাস এখনো পাকে নাই বলিয়া যেখানেই তাঁহারা আমাকে দাঁড় করাইয়া দিলেন সেইখানেই আসিয়া দাঁড়াইলাম।'

বরিশালের নিমন্ত্রণপত্রে ঘোষণা করা হয়েছিল যে, 'সভার উদ্দেশ্য সাহিত্যিকদের মধ্যে প্রীতিস্থাপন ও মাতৃভাষার উন্নতিসাধন'। 'সাহিত্যিকদের মধ্যে প্রীতিস্থাপন'-এর উদ্দেশ্য সম্বন্ধে মূল ভাষণে তিনি বিশেষভাবে এই প্রচেষ্টা সমর্থন করেননি : 'ব্যবসায় হিসাবে সাহিত্যিকগণ বিচ্ছিন্ন, স্ব-স্ব-প্রধান; তাঁহারা পরস্পর পরামর্শ করিয়া জোট করিয়া সাহিত্যের যৌথকারবার করেন না।···কার্যগতিকে যাঁহারা এইরূপ একাধিপত্যদ্বারা পরিবেষ্টিত কোনো কোনো স্থলে তাঁহাদের মধ্যে পরিচয় ও প্রীতির অভাব, এমন-কি, ঈর্ষাকলহের সম্ভাবনা ঘটে।···কোনো কৃত্রিম প্রণালীদ্বারা তাহার প্রতিকার সম্ভবপর হইলে আমাদের অদ্যকার উদ্‌যোগের অনেক পূর্বে সত্যযুগ ফিরিয়া আসিত।' 'মাতৃভাষার উন্নতিসাধন' প্রসঙ্গে তিনি বললেন, বর্তমান ঐক্যসাধনার মূলেই আছে বাংলা ভাষা ও বাংলা সাহিত্য : 'বাঙালির সঙ্গে বাঙালিকে গাঁথিবার জন্য কত কাল ধরিয়া বঙ্গসাহিত্য হৃদয়তন্তুনির্মিত নানা রঙের একটা বিপুল মিলনজাল রচনা করিয়া আসিয়াছে!···মনে রাখিতে হইবে এই মিলনোৎসবের 'বন্দে মাতরং' মহামন্ত্রটি বঙ্গসাহিত্যেরই দান।' 'সাহিত্যই মানুষের যথার্থ মিলনের সেতু' তার কারণটি ব্যাখ্যা করে তিনি বললেন, এই সাহিত্যের সৃষ্টিকার্যে পরামর্শপূর্বক হস্তক্ষেপ করা না গেলেও ব্যাকরণ অভিধান ভাষাতত্ত্ব প্রভৃতি সংগ্রহ করার আয়োজনকার্যে দলবদ্ধ চেষ্টার প্রয়োজন। এতদিন পর্যন্ত দেশের পুরাবৃত্ত ভাষাতত্ত্ব লোকবিবরণ প্রভৃতির সংগ্রহ ও আলোচনা বিদেশী পণ্ডিতেরাই করে এসেছেন, সেই কাজে যোগ দেবার জন্য ১৭ চৈত্র ১৩১১ [30 Mar 1905] তিনি 'ছাত্রদের প্রতি সম্ভাষণ' [দ্র আত্মশক্তি ৩। ৫৭৯-৯৪] করেছিলেন, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদকে পরামর্শ দিয়েছিলেন বিভিন্ন জেলায় শাখা-পরিষদ স্থাপন করে এক এক জেলায় সভার সাংবৎসরিক অধিবেশন করার জন্য ['অদ্য বরিশাল-সাহিত্যসম্মিলনের আহ্বানে সাহিত্যপরিষদের সেই প্রাদেশিক অধিবেশনের প্রথম আরম্ভ হওয়াতে আমি আশান্বিত হইয়াছি'—অনবধানবশত রবীন্দ্রনাথ এই বাক্যটি পরিমার্জন করতে ভুলে গিয়েছিলেন]—এই ভাষণে তিনি সেই আহ্বানেরই পুনরাবৃত্তি করলেন।

সুরেন্দ্রনাথ তাঁর সভাপতির অভিভাষণটি বাংলায় দেন [দ্র ভাণ্ডার, মাঘ। ৩৬৩-৬৫]। 'দেশের সাহিত্যই দেশের গৌরব, দেশের প্রাণ, দেশের মান, দেশের আশা-ভরসাস্থল' একথা স্বীকার করে উপসংহারে তিনি বলেন : 'আপনারা রবীন্দ্র বাবুকে তাঁর বক্তৃতার জন্য ধন্যবাদ প্রদান করুন—যিনি আমাদের সাহিত্যগগনের উজ্জ্বল নক্ষত্র। তাঁর চেয়ে উজ্জ্বলতর নক্ষত্র আর নাই। গদ্যে পদ্যে তাঁহার অসীম প্রতিভা। শুধু সাহিত্যক্ষেত্রে নয়, রাজনৈতিক ক্ষেত্রেও তিনি আমাদের একজন প্রধান অধিনায়ক, ইহা তিনি স্বীকার করুন, আর নাই করুন। শিক্ষাসম্বন্ধেও তাঁহার উদ্যম অপরিসীম। ভগবানের নিকট প্রার্থনা করি, তিনি দীর্ঘায়ু হউন এবং আমাদের সমাজে তিনি যে শীর্ষ স্থান অধিকার করেছেন, চিরদিন সেই স্থান অধিকার করে থাকুন।'

কলকাতায় রবীন্দ্রনাথের দ্বিতীয় কাজটি ছিল ৬ মাঘ [রবি 20 Jan] মহর্ষির তিরোভাবের দ্বিতীয় সাম্বৎসরিকে 'মহাপুরুষ' [দ্র বঙ্গদর্শন, মাঘ। ৪৭১-৭৬; তত্ত্ব°, ফাল্গুন। ১৬৯-৭৪; চারিত্রপূজা ৪।৫৩৫-৪১] প্রবন্ধ পাঠ। তিনি চেয়েছিলেন বিনয়েন্দ্রনাথ সেনও এই সভায় কিছু বলুন; তাই দ্বিজেন্দ্রনাথ-স্বাক্ষরিত সভার মুদ্রিত আমন্ত্রণলিপির পিছনে ৩ মাঘ [বৃহ 17 Jan] তাঁকে লেখেন : 'পিতৃদেবের শ্রাদ্ধসভায় আপনি কিছু বলিবেন এই আমাদের সানুনয় অনুরোধ। ত্রৈলোক্যবাবুর দ্বারা আপনার নিকট এই অনুরোধ প্রেরিত হইয়াছিল। যদি আপত্তি না করেন ত আমাদের পক্ষে আনন্দের বিষয় হইবে।'[৭২] বিনয়েন্দ্রনাথ এই অনুরোধ রক্ষা করেছিলেন।

ইতিপূর্বে ধর্ম ও সাম্প্রদায়িকতার পার্থক্য বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ 'ধর্মপ্রচার' প্রবন্ধে যা বলেছিলেন, মহর্ষির শ্রাদ্ধসভা উপলক্ষে করে প্রায় সেই কথাই বললেন 'মহাপুরুষ' প্রবন্ধে। বর্তমানে পৃথিবীর প্রায় সর্বত্র যখন ধর্মের নামে সাম্প্রদায়িকতার উত্থান ঘটছে তখন এই প্রবন্ধগুলির গুরুত্ব অসামান্য, কিন্তু এগুলি কেউ পড়েন বলে মনে হয় না। রবীন্দ্রনাথ বললেন : 'মহাপুরুষেরা ধর্মসম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠা করিয়া যান, আর আমরা তাহার মধ্য হইতে সম্প্রদায়টাই লই, ধর্মটা লই না। কারণ, ধর্ম জিনিসটাকে নিজের স্বাধীন শক্তির দ্বারাই পাইতে হয়, অন্যের কাছ হইতে আরামে ভিক্ষা মাগিয়া লইবার জো নাই।' তাঁর মতে, ধর্মসম্প্রদায় তৃষ্ণা মেটাবার জল নয়, জল খাবার পাত্র মাত্র। যাদের সত্যকার তৃষ্ণা আছে তারা পাত্রের অভাবে গণ্ডূষেও তৃষ্ণা মেটায়, কিন্তু যার পিপাসা নেই সে পাত্রটাকেই দামি বলে মনে করে। 'সেই জন্যই জল কোথায় পড়িয়া থাকে, তাহার ঠিক নাই, পাত্র লইয়াই পৃথিবীতে বিষম মারামারি লাগিয়া যায়। তখন যে-ধর্ম বিষয়বুদ্ধির ফাঁস আলগা করিবে বলিয়া আসিয়াছিল, তাহা জগতে একটা নূতনতর বৈষয়িকতার সূক্ষ্মতর জাল সৃষ্টি করিয়া বসে, সে-জাল কাটানো শক্ত।' মহর্ষি একদিন পরিপূর্ণ ভোগের মাঝখানে জেগে উঠে তৃষ্ণার্ত চিত্ত নিয়ে পিপাসা মেটানোর জন্য দুর্গম পথে যাত্রা করেছিলেন—তাঁর পূর্বতন সমস্ত সংস্কার, সমাজের প্রচলিত প্রথা, শাস্ত্রের আশ্রয় সব ত্যাগ করে তিনি চলেছিলেন—' তাঁহার ব্যাকুলতাই তাঁহাকে পথ দেখাইয়া চলিয়াছে। সে-পথ তাঁহার নিজেরই প্রকৃতির গভীর গোপন পথ।' এই পথের শেষে যে তীর্থ সেখান থেকে তিনিও পাত্র ভরে এনেছিলেন—সেই পাত্র একদিন ভেঙে যেতে পারে, তাঁর প্রতিষ্ঠিত ধর্মসমাজের আকৃতি পরিবর্তিত হতে পারে—কিন্তু তিনি যে আকর্ষণে সমস্ত ত্যাগ করেছিলেন বা ত্যাগের বিনিময়ে যা পেয়েছিলেন, তার দিকে যদি আমাদের মন জাগরিত হয় সেইটাই আমাদের লাভ। মহাপুরুষদের জীবন আলোচনায় এই শেষ লক্ষ্যটিই মনে রাখা দরকার — 'তাঁহাদের স্মৃতি যেন আমাদিগকে পারের ঘাটের আলো দেখায়—তাহাকে যেন আমরা কোনো দিন সাম্প্রদায়িক অভিযানের মশাল করিয়া না তুলি।'

প্রবন্ধটি আর-এক দিক থেকেও মূল্যবান। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, ঈশ্বর মানুষের মনের গভীরতর স্তরে যে স্বাতন্ত্র্য দিয়েছেন সেখানে এক জনের উপর আর-এক জনের কোনো অধিকার নেই—প্রলোভনে অনেকে এই অধিকার ত্যাগ করে, কিন্তু সেই সঙ্গে সত্যকেও হারায়। 'তিনি বিশ্বের ঈশ্বর হইয়াও আমাদের প্রত্যেকের সঙ্গে একটি নিতান্ত একমাত্র স্বতন্ত্র সম্বন্ধে ধরা দিবেন—সেইজন্য আমাদের প্রত্যেকের মধ্যে তিনি একটি দুর্ভেদ্য স্বাতন্ত্র্যকে চারিদিকের আক্রমণ হইতে নিয়ত রক্ষা করিয়াছেন—এই অতি নির্মল নির্জন-নিভৃত স্বাতন্ত্র্যের মধ্যেই তাঁহার সঙ্গে আমাদের মিলনের স্থান নির্দিষ্ট রহিয়াছে। সেইখানকার দ্বার যখন আমরা নিজের চেষ্টায় খুলিয়া তাঁহার কাছে আমাদের সেই চরম স্বাতন্ত্র্যের অধিকার একেবারে ছাড়িয়া দিব, বিশ্বের মধ্যে যাহা আমি

ছাড়া আর কাহারও নহে, সেইটেই যখন তাঁহার কাছে সমর্পণ করিতে পারিব, তখনই আর আমার কিছু বাকি থাকিবে না, তখনই তাঁহাকে পাওয়া যাইবে।' সাম্প্রদায়িক ঈশ্বর থেকে ব্যক্তিগত ঈশ্বরের এই ধারণায় উত্তরণ গীতাঞ্জলি-পর্বের মূল সুর—এই রচনায় আমরা তার আভাস লক্ষ্য করি।

কলকাতায় রবীন্দ্রনাথের তৃতীয় কাজটি হল মাঘোৎসবে অংশগ্রহণ। ১১ মাঘ [শুক্র 25 Jan] সপ্তসপ্ততিতম সাম্বৎসরিক ব্রাহ্মসমাজ উপলক্ষে প্রাতঃকালীন উপাসনা হয় আদি ব্রাহ্মসমাজ গৃহে। 'ভক্তিভাজন শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ শাস্ত্রী ও যোগেন্দ্রনাথ শিরোমণিকে লইয়া উপাসনা আরম্ভ করিয়া দিলেন।…রবীন্দ্র বাবু কবিত্ব ও আবেগপূর্ণ উচ্ছ্বাসময়ী ভাষায় যে উপদেশ দিলেন তাহার তুলনা কোথায় মিলিবে।'[৭৩] তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা-য় এর পর যে 'উপদেশ'টি উদ্ধৃত হয় [পৃ ১৬৯-৭৪], সেটি মাঘ-সংখ্যা বঙ্গদর্শন-এ [পৃ ৪৮৩-৮৬] 'বোলপুর শান্তিনিকেতন আশ্রমে ৭ই পৌষের উৎসবসভায় পঠিত' টীকাসহ 'আনন্দরূপ' [দ্র ধর্ম ১৩।৪৪১-৪৫] শিরোনামে মুদ্রিত হয়েছিল [সংখ্যাটি অবশ্য প্রকাশিত হয় তত্ত্ববোধিনী-র পরে]। রবীন্দ্রজীবনী-কার লিখেছেন, 'স্বাতন্ত্র্যের পরিণাম' [দ্র ধর্ম ১৩।৪১৬-১৯] প্রবন্ধটিও রবীন্দ্রনাথ এই অনুষ্ঠানে পাঠ করেন[৭৪]—কিন্তু এই তথ্য তিনি কোথায় পেয়েছেন উল্লেখ করেননি। বস্তুত রচনাটি জাতীয় শিক্ষাপরিষদে প্রদত্ত রবীন্দ্রনাথের প্রথম বক্তৃতা 'সৌন্দর্যবোধ'-এর একটি অংশ—গ্রন্থাকারে সংকলনের সময়ে তিনি অংশটিকে বিচ্ছিন্ন করে 'ধর্ম্ম' [১৩১৪] গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত করেন।

মহর্ষিভবনে সায়ংকালীন অধিবেশনে 'সন্ধ্যা ৬টার সময় ভক্তিভাজন রবীন্দ্র বাবু, যোগেন্দ্রনাথ শিরোমণি ও চিন্তামণি চট্টোপাধ্যায় বেদীর আসন গ্রহণ করিলে সঙ্গীত হইয়া উপাসনা আরম্ভ হইল।' 'শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত বাবু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের পাণ্ডিত্যপূর্ণ উপদেশ' 'সপ্তসপ্ততিতম সাম্বৎসরিক উৎসবে শ্রীযুক্ত বাবু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাদয়ের সায়ংকালে প্রদত্ত উপদেশ' টীকা-সহ 'শান্তং শিবমদ্বৈতম্' [দ্র ধর্ম ১৩।৪১০-১৬] নামে বৈশাখ ১৮২৯ শক [১৩১৪]-সংখ্যা তত্ত্ববোধিনী-তে [পৃ ১-৬] মুদ্রিত হয়। অবশ্য প্রবন্ধটি ইতিপূর্বেই 'শান্তিনিকেতনে ৭ই পৌষ ১৩১৩ পৌষ উৎসবে প্রদত্ত ভাষণ' টীকা-সহ পৌষ-সংখ্যা বঙ্গদর্শন-এ [পৃ ৪২৩-২৮] প্রকাশিত হয়েছিল।

তত্ত্ববোধিনী-তে মাঘোৎসবে গীত রবীন্দ্রনাথের চারটি নূতন ব্রহ্মসংগীত মুদ্রিত হয় :

[১] ইমন কল্যাণ-তেওরা। আমার মাথা নত করে দাও হে তোমার দ্র তত্ত্ব°, ফাল্গুন। ১৮০-৮১; বঙ্গদর্শন, জ্যৈষ্ঠ ১৩১৪।১১০-১১ ['প্রার্থনা']; গীতাঞ্জলি ১১।৫ [১]; গীত ১।১৯৪-৯৫; স্বর ২৩

[২] বাগেশ্রী বাহার-ঝাঁপতাল। নিবিড় অন্তরতর বসন্ত এল প্রাণে দ্র তত্ত্ব°, ফাল্গুন। ১৮১; গীত ২।৫৩৮; স্বর ২৪; মূল গান : সরস সুন্দর বর বসন্ত ঋতু আয়ে দ্র গবেষণা-গ্রন্থমালা ৩।৫২-৫৪

[৩] বাহার-চৌতাল। নব নব পল্লব রাজি দ্র তত্ত্ব°, ফাল্গুন। ১৮১; গীত ২।৫৩৮; মূল গান : মনমথ তন দহে মেরো দুখত দ্র গবেষণা-গ্রন্থমালা ৩।২৫; স্বর ২৪

[৪] নট মল্লার-একতালা। মোরে বারে বারে ফিরালে দ্র তত্ত্ব°, ফাল্গুন। ১৮১; গীত ১।১৭৩; স্বর ২৫; মূল গান : মোরি নই লগন লাগীরে দ্র গবেষণা-গ্রন্থমালা ৩।৮৭।

কলকাতায় রবীন্দ্রনাথের চতুর্থ কাজ ছিল জাতীয় শিক্ষাপরিষদে কার্যক্রমাতিরিক্ত বক্তৃতা [extension lecture] দান। *The Bengalee*-র 24 Jun-সংখ্যায় এই বক্তৃতা-সংক্রান্ত ঘোষণাটি মুদ্রিত হয় :

At the invitation of the National Council of Education, Bengal, two of their members Babu Rabindra Nath Tagore (Director of Studies in Bengali for the Bengal National College) and Babu Mohini Mohan Chatterjee, M.A.B.L. have kindly undertaken to deliver courses of extension lectures at the above College at No. 191-1, Bowbazar Street. Babu Rabindranath Tagore's lecture will be on "Comparative Literature" and will be delivered in Bengali. The first lecture of the series will be delivered on Sunday, the 27th January at 4 P.M. sharp. Babu Mohini Mohan Chatterjee's lecture will be on "The Study of History," and will be delivered in every alternate Saturday at 4 P.M. commencing from the 2nd February.... Except for invited gentlemen admission will be by tickets to be had on application to the Honorary Superintendent of the College between 11 and 4 p.m.

এই ঘোষণা অনুযায়ী রবীন্দ্রনাথ তাঁর প্রথম প্রবন্ধ পাঠ করেন ১৩ মাঘ [রবি 27 Jan]। গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, মোহিনীমোহন চট্টোপাধ্যায়, হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, পণ্ডিত শিবধন বিদ্যার্ণব, ড পি. কে. রায়, পণ্ডিত তারাকুমার কবিরত্ন, ব্যোমকেশ মুস্তাফি, শৈলেশচন্দ্র মজুমদার, দেবপ্রসাদ সর্বাধিকারী প্রভৃতি বিশিষ্ট ব্যক্তিরা এই সভায় উপস্থিত ছিলেন।[৭৫]

রবীন্দ্রনাথ এই বক্তৃতামালায় প্রথম যে প্রবন্ধটি পাঠ করেন তার নাম 'সৌন্দর্যবোধ' [দ্র বঙ্গদর্শন, পৌষ। ৪২৮-৪৬; সাহিত্য ৮।৩৫৫-৭২]। সৌন্দর্যকে পুরোপুরি উপভোগ ও সৃষ্টি করতে হলে চিত্তের সংযম প্রয়োজন, এই কথাটি রবীন্দ্রনাথ এই প্রবন্ধে বিবিধ উপমা ও দৃষ্টান্ত প্রয়োগে ব্যাখ্যা করেছেন। শুধু চোখ দিয়ে নয়, মন দিয়ে না দেখলে সৌন্দর্যকে বড়ো করে দেখা যায় না। এই মনের দৃষ্টি বিশেষ শিক্ষা দ্বারাই লাভ করা যায়। মনেরও অনেকগুলি স্তর আছে। কেবল বুদ্ধিবিচারে যতটুকু দেখি হৃদয়ভাব তার সঙ্গে যুক্ত হলে দেখার ক্ষেত্র আরও বেড়ে যায়, ধর্মবুদ্ধি যোগ দিলে আরও দূর পর্যন্ত চোখে পড়ে, 'অধ্যাত্মদৃষ্টি খুলিয়া গেলে দৃষ্টিক্ষেত্রের আর সীমা পাওয়া যায় না।' সৌন্দর্যবোধের প্রসঙ্গে অধ্যাত্মদৃষ্টির উল্লেখে যাঁরা ভ্রূকুঞ্চিত করেন, রবীন্দ্রনাথ তাঁদের বলেন, 'যথার্থ যে মঙ্গল তাহা আমাদের প্রয়োজনসাধন করে এবং তাহা সুন্দর; অর্থাৎ প্রয়োজনসাধনের ঊর্ধ্বেও তাহার একটা অহেতুক আকর্ষণ আছে।···মঙ্গলমাত্রেরই সমস্ত জগতের সঙ্গে একটা গভীরতম সামঞ্জস্য আছে, সকল মানুষের মনের সঙ্গে তাহার নিগূঢ় মিল আছে। সত্যের সঙ্গে মঙ্গলের সেই পূর্ণ সামঞ্জস্য দেখিতে পাইলেই তাহার সৌন্দর্য আর আমাদের অগোচর থাকে না।···সৌন্দর্যমূর্তিই মঙ্গলের পূর্ণমূর্তি এবং মঙ্গলমূর্তিই সৌন্দর্যের পূর্ণস্বরূপ।' কিন্তু মঙ্গলের মধ্যেও একটি দ্বন্দ্ব আছে, মঙ্গলের বোধ ভালোমন্দের সংঘাতের অপেক্ষা রাখে। এই সংঘাত যখন সমাধান প্রাপ্ত হয়, তখন সেখানে সত্যের উপলব্ধিতে আনন্দের আবির্ভাব ঘটে।

মূল প্রবন্ধে এই সমাধানের প্রক্রিয়া বিস্তৃতভাবে বর্ণিত হয়েছিল, কিন্তু সেই আলোচনায় Aesthetics-এর চেয়ে Ethics-এর প্রাধান্য বেশি বলে রবীন্দ্রনাথ সেই আলোচনাটিকে সাহিত্য [১৩১৪]-তে সংকলিত প্রবন্ধটি থেকে বিচ্ছিন্ন করে 'স্বাতন্ত্র্যের পরিণাম' নামে ধর্ম [১৩১৫] গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত করেন [দ্র ধর্ম ১৩।৪১৬-১৯]। উক্ত অংশে তিনি এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন যে, মানুষের স্বাতন্ত্র্য যখন মঙ্গলের সহায়তায় সমস্ত দ্বন্দ্বকে নিরস্ত করে সুন্দর হয়ে ওঠে তখনই সে বিশ্বাত্মার সঙ্গে মিলনে সম্পূর্ণ আত্মবিসর্জনের জন্য প্রস্তুত অর্থাৎ প্রেমে উত্তীর্ণ হয়।

মানুষের সাহিত্য সংগীত ললিতকলা জেনে বা না জেনে এই দিকেই চলেছে। সত্যকে যখন আমরা শুধু চোখে দেখি, বুদ্ধিতে পাই—তখন নয়, যখন তাকে হৃদয় দিয়ে পাই তখনই তাকে সাহিত্যে প্রকাশ করতে

পারি। এর মধ্যে সৃষ্টিরও একটি ভাগ আছে। হৃদয় যা আবিষ্কার করে তার বিস্ময় ও আনন্দকে নিজের ঐশ্বর্যদ্বারা ভাষায় বা ধ্বনিতে বা বর্ণে চিত্রিত করে রাখে—'ইহাতেই সৃষ্টিনৈপুণ্য; ইহাই সাহিত্য, ইহাই সংগীত, ইহাই চিত্রকলা'।

জাতীয় শিক্ষাপরিষদে ভাষণ দিয়ে সম্ভবত সেই দিন [১৩ মাঘ রবি 27 Jan] রাত্রেই রবীন্দ্রনাথ গিরিডি রওনা হন; ক্যাশবহির হিসাব : 'খোদ বাবু মহাশয়/গিরিডি গমন জন্য দেওয়া যায় ১৩ মাঘ ৫০্'। শ্রীশচন্দ্র মজুমদারকে ৮ কার্তিক [বৃহ 25 Oct] তিনি একটি পত্রে লিখেছিলেন : 'রথীদের গত সপ্তাহের পত্রে তাহারা এই বেলা জমী সংগ্রহের কথা বলিয়াছে। তাহাদের ইচ্ছা, যেখানে তাহাদিগকে চাষ করিতে হইবে সেখানকার মাটির নমুনা লইয়া তাহাদের কলেজ laboratoryতে an[a]lyse করিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখে এবং সেখানকার সমস্ত প্রাকৃতিক বিবরণ জানিয়া অধ্যাপকদের সহিত পরামর্শ করিয়া আসে।···কিন্তু ছোট নাগপুরে কর্ড লাইনের ধারে কি আর জমি পাইবার কোনো আশা নাই? তোমাদের হাজারিবাগের কর্ত্তারা বোধ হয় তাঁহাদের এলাকায় আমাদিগকে কোনমতেই প্রবেশ করিতে দিবেন না সেইজন্য সেবার অত শশব্যস্ত হইয়া আমাদের সহায়তা করিতে আসিয়াছিলেন।'[৭৬] হয়তো জমি পাবার কোনো আশা পেয়েই রবীন্দ্রনাথ তড়িঘড়ি গিরিডি গিয়েছিলেন। কিছুদিন আগে সরস্বতী পুজোর সময়ে সারস্বত সম্মিলনের আসরে শ্রীশচন্দ্রের সঙ্গে তাঁর দেখা হয়েছিল। কিন্তু তাঁদের আশা পূর্ণ হয়নি।

গিরিডিতে রবীন্দ্রনাথ কয়েকটি ব্যস্ত দিন কাটান। ২২ মাঘ [মঙ্গল 5 Feb] তিনি মীরা দেবীকে লেখেন: 'আমি বোধ হয় আজ সন্ধ্যার গাড়িতেই কলকাতায় যাব। যেদিন থেকে এখানে এসেছি সেই দিন থেকেই একটা লেখা নিয়ে ঘাড়মোড় ভেঙে পড়েছি—আজ সেই লেখাটা শেষ করে ফেলে আজই দৌড় দিতে হচ্চে। আস্‌চে শনিবারে কলকাতায় জাতীয় শিক্ষা পরিষদে এটা পড়তে হবে। ইতিমধ্যে এখানেও আমাকে একদিন মুখে মুখে বক্তৃতা দিতে হয়েছে। তাছাড়া লোকজনের দেখাশুনোর উৎপাত এখানেও কম নয়।'[৭৭]

তিনি যে-লেখাটির কথা এখানে উল্লেখ করেছেন সেটির নাম 'বিশ্বসাহিত্য', কয়েকদিন পরে ২৬ মাঘ [শনি 9 Feb] তিনি এটি জাতীয় শিক্ষাপরিষদে পাঠ করেন।

রবীন্দ্রজীবনী-কার প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় [1892-1985] তখন গিরিডিতে প্রথমশ্রেণীর [আধুনিক দশম শ্রেণী] ছাত্র। রবীন্দ্রনাথ-উল্লিখিত 'লোকজনের···উৎপাত' প্রসঙ্গে তিনি 'সাক্ষ্য' দিয়েছেন :

> তাঁহার [জীবনীকারের] পিতা স্থানীয় উকিল নগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের [?-1908] চেষ্টায় বারগণ্ডা পল্লীতে শিশুদের জন্য একটি বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। বিজয়চন্দ্র মজুমদারের ভ্রাতা বামনদাস মজুমদার ও হিমাংশুপ্রকাশ রায় শিক্ষকদ্বয়ের আন্তরিক প্রচেষ্টায় ক্ষুদ্র শিশুবিদ্যালয়টি উন্নতি লাভ করিতে থাকে। মনে আছে, লেখকের পিতা শ্রীশচন্দ্রের গৃহে কবির নিকট এই বিদ্যালয় সম্বন্ধে বলিলে, তিনি সানন্দে ইহার পৃষ্ঠপোষকতা করিতে স্বীকৃত হন এবং একটি আবেদন পত্র লিখিয়া দেন।···কবির আবেদন পত্র মুদ্রিত ও প্রচারিত হয়। এই বিদ্যালয়টি কালে জাতীয় বিদ্যালয়ে পরিণত হয়; দুই বৎসর চলিয়া উহা বন্ধ হইয়া যায়।···কালে সেই শিশুবিদ্যালয় নূতন ধারায় চলিয়া গিরিডির বিখ্যাত বালিকা বিদ্যালয়ে পরিণত হয়।[৭৮]

সম্ভবত এই বিদ্যালয়টির প্রসঙ্গেই রবীন্দ্রনাথ ২৭ ফাল্গুন [সোম 11 Mar] গিরিডির সুধাংশুবিকাশ রায়কে লেখেন : 'পাঠ্যপুস্তকের তালিকা কেন চাহিতেছেন? পাঠ্যপুস্তক আছে কোথায় যে তালিকা দিব? ছেলেদের পড়াইতে পড়াইতে প্রত্যহ পাঠ্যপুস্তক তৈরি হইয়া উঠিতেছে। কেবল নিম্নশ্রেণীতে ইংরাজি সোপান এবং

সংস্কৃত শিক্ষার জন্য সংস্কৃতপ্রবেশ বইখানি ব্যবহার করা হইয়া থাকে। আপনি অথবা বামনদাসবাবু যদি একসপ্তাহকাল এখানকার নিয়ম ও প্রণালী দেখিয়া যান তবে সমস্ত বুঝিবেন, নহিলে পত্র লিখিয়া বোঝান অসম্ভব।'[৭৯] ব্রহ্মচর্যাশ্রমের শিক্ষাপদ্ধতির খ্যাতি ক্রমশই বিস্তৃত হচ্ছিল, এর পরেও অনেকে এখানকার পাঠ্যতালিকার খোঁজ করেছেন, অনেকে শিক্ষাপদ্ধতি স্বচক্ষে দেখার জন্য শান্তিনিকেতন-ভ্রমণে এসেছেন।

রবীন্দ্রনাথ ২৩ মাঘ [বুধ 6 Feb] কলকাতায় ফিরে আসেন এবং ২৬ মাঘ [শনি 9 Feb] বিকেল পাঁচটায় জাতীয় শিক্ষাপরিষদে তাঁর বক্তৃতামালার দ্বিতীয় প্রবন্ধ 'বিশ্বসাহিত্য' [দ্র বঙ্গদর্শন, মাঘ। ৪৮৭-৯৯; সাহিত্য ৮।৩৭২-৮৭] পাঠ করেন। প্রথমবার হয়তো প্রবন্ধ পাঠ শুরু হওয়ার পরেও শ্রোতাদের আগমন অব্যাহত থাকায় তিনি কিছু অসুবিধা বোধ করেছিলেন, তাই এবারে বেঙ্গলী-তে [8 Feb] প্রদত্ত বিজ্ঞপ্তিতে স্পষ্ট করে লেখা হয় : 'The gates close at 4-45 P.M.'

রবীন্দ্রনাথের আলোচনার বিষয় ছিল 'Comparative Literature'—যাকে তিনি বাংলায় 'বিশ্বসাহিত্য' আখ্যা দিয়েছেন—কিন্তু প্রথম বক্তৃতায় তিনি বিশ্বসাহিত্য ধারণার ব্যাখ্যা না করে মানুষের সৌন্দর্যবোধের তত্ত্বরূপটিকে স্পষ্ট করে তুলতে চেষ্টা করেছিলেন। বর্তমান প্রবন্ধে তিনি সেই 'বিশ্বসাহিত্য' ব্যাপারটিকে ব্যাখ্যা করলেন। তিনি বললেন, মানুষ বুদ্ধির যোগে, প্রয়োজনের তাগিদে ও আনন্দের প্রেরণায় জগতের সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত হয়; বুদ্ধি দিয়ে সত্যকে বোঝা বা প্রয়োজনের তাগিদে সত্যকে নিজের কাজে লাগানোয় অহংকার আছে, কিন্তু সৌন্দর্য বা আনন্দের যোগে যখন পরকে আপনার ও আপনাকে পরের করে জানা যায় তখন সেই অহংকার থাকে না এবং তখনই মানুষ দেশে ও কালে অধিকাংশ মানুষের মধ্যে নিজের আত্মাকে মিলিয়ে নিজেকে উপলব্ধি ও প্রকাশ করে সার্থক হয়। সংসারে মানুষের প্রকাশের দুটি মোটা ধারা আছে—তার কর্ম ও তার সাহিত্য। কর্মক্ষেত্রে মানুষ তার দেহ-মন-হৃদয়ের সমস্ত শক্তি ও অভিজ্ঞতা নিয়ে গৃহ সমাজ রাজ্য ও ধর্মসম্প্রদায় গড়ে তুলছে, ইতিহাস সেই মানুষেরই কর্মের পরিচয়। কিন্তু এলিজাবেথ বা আকবরের জীবনবৃত্তান্ত ইতিহাস নয়, মানুষের গভীরতম অভিপ্রায় কিভাবে নানা সাধনায় নানা ভুল ও সংশোধনে সিদ্ধ হবার চেষ্টা করছে ইতিহাসে সেটিই দেখার জিনিস। তেমনি সাহিত্যের মধ্যে মানুষ আপনার আনন্দকে কেমন করে প্রকাশ করছে, এই প্রকাশের বিচিত্রমূর্তির মধ্যে মানুষের আত্মা আপনার কোন্ নিত্যরূপ দেখাতে চায়, সেইটিই বিশ্বসাহিত্যের মধ্যে যথার্থ দেখবার জিনিস। এই বিশ্বসাহিত্যে রবীন্দ্রনাথ পথপ্রদর্শকের দায়িত্ব নিতে অস্বীকার করেছেন, কারণ নিজের নিজের সাধ্যানুসারে এ পথ সকলকে নিজেই কেটে চলতে হবে। কিন্তু তিনি সতর্ক করে বলেছেন, সাহিত্যকে ব্যক্তিবিশেষের বলে দেখা নিতান্ত গ্রাম্যভাবে দেখা—'সেই গ্রাম্য সংকীর্ণতা হইতে নিজেকে মুক্তি দিয়া বিশ্বসাহিত্যের মধ্যে বিশ্বমানবকে দেখিবার লক্ষ্য আমরা স্থির করিব, প্রত্যেক লেখকের রচনার মধ্যে একটি সমগ্রতাকে গ্রহণ করিব এবং সমগ্রতার মধ্যে সমস্ত মানুষের প্রকাশচেষ্টার সম্বন্ধ দেখিব, এই সংকল্প স্থির করিবার সময় উপস্থিত হইয়াছে।'

এই দুটি বক্তৃতায় তাঁর বক্তব্য বিষয়টি স্পষ্ট হয়নি বলে অভিযোগ উঠেছিল, তাই ২৯ চৈত্র [শুক্র 12 Apr 1907] তারিখে প্রদত্ত বক্তৃতামালার তৃতীয় কিস্তি 'সৌন্দর্য ও সাহিত্য' প্রবন্ধে যথাসাধ্য পুনরুক্তি বাঁচিয়ে তিনি তাঁর মূলকথাটা পরিষ্কার করে নেবার চেষ্টা করেন।

গিরিডি থেকে রবীন্দ্রনাথ ২২ মাঘ [মঙ্গল 5 Feb] মীরা দেবীকে লিখেছিলেন : 'শুনতে পাচ্চি মেজ বোঠান কিছুদিনের জন্যে বোলপুরে যাবেন। সুশি বৌমাও [বলেন্দ্রনাথের স্ত্রী] তাঁর সঙ্গে যাবেন বলে আমাকে

লিখেচেন।' দলটি আরও বড়ো ছিল—জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, সুরেন্দ্রনাথের স্ত্রী সংজ্ঞা দেবী, তাঁদের প্রথম সন্তান সুবীরেন্দ্রনাথ ও হয়তো আরও কেউ-কেউ এই ভ্রমণে অংশ গ্রহণ করেছিলেন। অনেকের একটা ভুল ধারণা আছে, রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনে ব্রহ্মচর্যাশ্রম স্থাপনের পর জ্যোতিরিন্দ্রনাথ কখনও সেখানে যাননি—বর্তমান ঘটনাটি উক্ত ভুলটি সংশোধনে সাহায্য করবে। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ নিজেই এই ভ্রমণের সাক্ষ্য রেখে গেছেন 17 Feb 1907 [রবি ৫ ফাল্গুন] 'বোলপুর'-এ আঁকা শমীন্দ্রনাথের একটি পেনসিল-স্কেচে [দ্র রবীন্দ্রস্মৃতি। ৫৬]।

তাঁরা চলে যাবার পরে রবীন্দ্রনাথ 'শনিবার' [১১ ফাল্গুন : 23 Feb] মীরা দেবীকে খুঁটিনাটি খবর দিয়ে লিখেছেন:

মেজবোঠানরা কিছুদিন থেকে চলে গেছেন। সুরেনের খোকা খুব জমিয়ে রেখেছিল। তার সবচেয়ে প্রধান আমোদ কাউকে মারা। খুব কান্নার সময়ে আর কাউকে মারতে দেখলে তার উৎসাহ বেড়ে উঠত। মানুষকে না হলেও কোনো জিনিষকে মারলেও তার মনে যথেষ্ট সান্ত্বনা বোধ হত। এখন আবার আমাদের ঘর পূর্ব্বের মত চুপচাপ। ওঁরা থাকতে রোজ সন্ধ্যাবেলায় শমী ওঁদের সঙ্গে বাজি রেখে দশপঁচিশ খেলে খেলে দুটাকা জিতেছে। এখন সন্ধ্যাবেলায় দশপঁচিশ বন্ধ—আমি শাস্ত্রীমশাইকে দিয়ে সংস্কৃত ধর্ম্মশাস্ত্র ও বাইবেল পড়ি—পিসিমা শোনেন—একে ঠিক বাজি রেখে খেলার সঙ্গে তুলনা করা যায় না।[৮০]

রবীন্দ্রনাথের এই পত্রগুলিতে তাঁর পিতৃস্নেহের প্রকাশটি অত্যন্ত রমণীয়। কন্যাকে ইংরেজি ভাষা ও সাহিত্যের সঙ্গে পরিচিত করে দেবার জন্য নানা ধরনের পরামর্শ, বঙ্গভাষাভাষীর নিজেদের মধ্যে ইংরেজিতে পত্র লেখা সম্বন্ধে বিরাগ সত্ত্বেও কন্যার সঙ্গে উক্ত ভাষায় পত্রালাপ, Mrs. Lee ও তাঁর ভাইঝি-ভগ্নীদের সঙ্গে সম্পর্কস্থাপনে উৎসাহদান, মাধুরীলতা ও অনুরূপা দেবী মজঃফরপুরে যে বালিকা-বিদ্যালয় স্থাপন করেছিলেন তার জন্য মীরা দেবীর ফরমাশ-অনুযায়ী প্রাইজ কিনে পাঠানো প্রভৃতি কাজ তিনি করেছিলেন, কন্যাস্নেহের সঙ্গে সঙ্গে কিছুটা কর্তব্যবুদ্ধির তাগিদে। কিন্তু তারই সঙ্গে শান্তিনিকেতনের খুঁটিনাটি খবর সরস ভঙ্গিতে লিখে পাঠিয়েছেন কন্যার প্রবাসজীবনের নিঃসঙ্গতাবোধ কাটানোর জন্য।

শান্তিনিকেতন তখন আর বালিকা-বর্জিত নয়। স্ত্রী শরৎকুমারীর মৃত্যুর পর জগদানন্দ রায় তাঁর তিন মেয়ে দুর্গেশনন্দিনী [দুর্গা], তরুলতা [টুগলি] ও পারুল এবং পুত্র ত্রিগুণানন্দ [পটল]কে শান্তিনিকেতনে নিয়ে আসেন। সুধীন্দ্রনাথের কন্যা রমাও কিছুকাল এখানে থাকেন। রবীন্দ্রনাথ এঁদের খবরও দিয়েছেন মীরা দেবীকে : 'তোর বন্ধু দুর্গা ত বিবাহ করতে তার দাদামশায়দের কাছে গেছে। ফাল্গুনমাসেই তার বিবাহ একেবারে ঠিক হয়ে গেছে। এখন কেবল পারুল ও টুগলি ঝগড়া করবার জন্য বাকি রইল। কমল আজকাল রমাকে নিয়ে দিনযাপন করচে—খোকাও খুব সভা জমাচ্চে—বেঙ্গু ইস্কুলে জ্ঞানবাবুর কাছে পড়চে। এইভাবে একরকম মন্দ চলচে না।' দিনেন্দ্রনাথ ব্যারিস্টারি পড়ার জন্য বিলেতে গিয়েছিলেন, তার স্ত্রী কমলা তখন শান্তিনিকেতনে।

রবীন্দ্রনাথ সম্পূর্ণ ফাল্গুন মাস ও চৈত্র মাসের প্রথমার্ধ প্রায় দেড়মাস শান্তিনিকেতনে কাটান। রচনাকার্য প্রায় নেই, অন্যান্য খবর পাওয়া যায় মীরা দেবীকে লেখা চিঠিতে। ২১ ফাল্গুন [মঙ্গল 5 Mar] তিনি লিখেছেন : 'আমার এন্ট্রেন্সের ছেলেরা এখন হুগ্‌লিতে পরীক্ষা দিচ্ছে। কাল তাদের প্রথম দিন গেছে। কাল ইংরিজি ছিল। শুনচি ত কাল তারা ভালই লিখেচে। আজ বোধ হয় অঙ্কের দিন—আজ কি রকম কাটে দেখা যাক্। বৃহস্পতিবারে তাদের পরীক্ষা শেষ হয়ে যাবে। ওদের মধ্যে যোগেনের তেমন আশা নেই—ও বেচারা একে কাঁচা তাতে বারবার জ্বরে পড়ে ভাল করে তৈরি হতেই পারে নি।'[৮১] ২ চৈত্র [শনি 16 Mar] আবার মীরা দেবীকে লিখেছেন : 'এদিকে যে পাঁচটি এবার এন্ট্রেন্স্ দিয়েছে তাদের মধ্যে অরুণ [চন্দ্র সেন] ও যোগেন

[যোগেন্দ্রলাল গঙ্গোপাধ্যায়] চলে গেছে—অরবিন্দ[মোহন বসু]ও দু চারদিনের মধ্যেই চলে যাবে। অরুণ বেচারা ভারি কেঁদে গেছে—তার জন্যে আমরা সকলেই বেদনা পেয়েছি।···যোগেন তার বাপকে বলেছে পরীক্ষায় পাস হলেও অন্তত আর এক বছরের জন্যে সে এখানে তার ইংরিজি বিদ্যা পাকা করে যাবে। আসল কথা, ওরা এ জায়গা ছেড়ে যেতে চায় না। এখানকার প্রতি এতটা টান দেখে আমি খুব খুসি হয়েছি।'[৮২] এই টান পরবর্তীকালে অনেক ছাত্রছাত্রীর মধ্যেই দেখা গেছে। কিন্তু এরই জন্য অন্তত অরুণচন্দ্র ও অরবিন্দমোহনের অভিভাবকদের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের দীর্ঘস্থায়ী মনোমালিন্য দেখা দিয়েছিল।

এই চিঠিতেই তিনি বিদ্যালয় সম্পর্কে আরও খবর দিয়েছেন : 'আমি যে কিছুকাল আমাদের বিদ্যালয়ে একটা ক্লাসে ইংরিজি পড়াচ্ছিলুম—দুজন নতুন মাষ্টার আসাতে আবার ছুটি পাওয়া গেছে। আজকাল আমাদের বিদ্যালয়ে ছাত্র আর ধরচে না—৫৫ জন ছেলে হয়েছে—মাষ্টারও অনেকগুলি—কাকে কোথায় রাখি তার ঠিক নেই—দোতলার ঘর তৈরি হয়ে গিয়েছে—সেখানে ২৩ জন ছেলে আছে—তবু ভাল করে ধরচে [না]—ছেলে বোধ হয় শীঘ্রই আরো অনেকগুলি আসবে।' অন্য ধরনের ছাত্রও আসছিলেন, তার বিবরণ পাওয়া যায় যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের 'রবীন্দ্রনাথ ও শান্তিনিকেতন' প্রবন্ধে :

> ১৯০৭ সালের দোলপূর্ণিমার [১৬ ফাল্গুন বৃহ 28 Feb] সময় কোন বয়স্ক বন্ধুর কাছ থেকে পরিচয়পত্র লইয়া আমি প্রথমে শান্তিনিকেতনে যাই।···সে সময়ে কবি আশ্রমের 'দেহলী' নামক বাড়িতে থাকিতেন। সন্ধ্যার পরে আমি সেখানে প্রবেশ করিয়া দেখিলাম কবি তখন পণ্ডিত বিধুশেখর শাস্ত্রীর সঙ্গে সংস্কৃত অলঙ্কার শাস্ত্র আলোচনা করিতেছেন। এই সময়ে তিনি জাতীয় বিদ্যালয়ে সাহিত্য সম্বন্ধে ধারাবাহিক বক্তৃতা দিতেছিলেন। সম্ভবত ঐ সম্পর্কেই শাস্ত্রী মহাশয়ের সঙ্গে আলোচনা করিতেছিলেন।···পরদিন সকালে আবার কবির সঙ্গে দেখা হইল এবং স্থির হইল ইতিহাসের অগ্রসর ছাত্ররূপে আমি আশ্রমে যোগ দিব।[৮৩]

—যতীন্দ্রনাথ তখন কলকাতায় বি. এ. ক্লাশের ছাত্র, সুতরাং 'অগ্রসর ছাত্র' ব্যাপারটি কী বোঝা শক্ত; তিনি কয়েকদিন পরে কনিষ্ঠ শিক্ষক হিসেবে বিদ্যালয়ে যোগ দেন।

জগদীশচন্দ্র ভাগিনেয় অরবিন্দমোহনকে প্রায় পালিত পুত্রের ন্যায় মানুষ করছিলেন, কবিবন্ধুর আদর্শের প্রতি শ্রদ্ধাবশত তাঁকে ছাত্ররূপে ব্রহ্মচর্যাশ্রমে পাঠান। রবীন্দ্রনাথও পুত্রোপম যত্নে তাঁর শিক্ষার বন্দোবস্ত করেন। কৃতজ্ঞতাস্বরূপ জগদীশচন্দ্র তাঁকে ৩০০ টাকার একটি চেক পাঠিয়ে দেন। আর্থিক সমস্যায় বিব্রত হয়ে প্রাচীন গুরুগৃহের প্রথা ভুলে রবীন্দ্রনাথকে ছাত্রদের কাছ থেকে বেতন গ্রহণ করতে হয়েছিল, কিন্তু এই উদ্দেশ্যে বন্ধুর কাছ থেকে টাকা নিতে তিনি সংকোচ বোধ করে পত্র লেখেন [পত্রটি পাওয়া যায়নি]—প্রত্যুত্তরে জগদীশচন্দ্র 18 Mar [সোম ৪ চৈত্র] তাঁকে লেখেন : 'অরবিন্দের পাস কিম্বা ফেল হইবার সহিত তোমার কার্য্যে একটু সাহায্য করিয়া আমার সার্থকতালাভের কি সম্পর্ক?···তোমার গুরুদক্ষিণা কয়েক বৎসর অদেয় থাকিবে। কিন্তু আমার সম্পূর্ণ বিশ্বাস যে তোমার শিষ্য কোনদিন তাহার জীবনের পূর্ণতার দ্বারা সেই ঋণ কিয়ৎপরিমাণে শোধ করিতে প্রয়াসী হইবে। গুরুগৃহ হইতে অরবিন্দ যাহা আহরণ করিয়া আনিতেছে, তাহা যেন চিরকাল অক্ষয় থাকে।'[৮৪]

[আমরা আগেই বলেছি, ব্রহ্মচর্যাশ্রমের প্রতি অরবিন্দমোহনের অতিরিক্ত আকর্ষণ-হেতু পরবর্তীকালে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে জগদীশচন্দ্রের, বিশেষত অবলা বসুর, মনোমালিন্য দেখা দেয়। তার ফলে, ১৩৩৩ বঙ্গাব্দের প্রবাসী-তে যখন রবীন্দ্রনাথকে লেখা জগদীশচন্দ্রের পত্রাবলী মুদ্রিত হয় তখন উপরে উদ্ধৃত সম্পূর্ণ পত্রটি ও

অন্যান্য পত্রে যেখানে অরবিন্দমোহনের উল্লেখ আছে সেই-সব অংশ বর্জিত হয়। মৃণালিনী দেবীর জীবৎকালে জগদীশচন্দ্র কৌতুক করে অনেক পত্রে মীরা দেবীকে পুত্রবধূ করার প্রস্তাব করেছেন, সেই অংশগুলি প্রবাসী-র মতো পুলিনবিহারী সেন-সংকলিত পত্রাবলী-তেও বর্জন করা হয়েছে।]

জগদীশচন্দ্র এই সময়ে *Comparative Electrophysiology* [1907] নামে একটি বড়ো বই লেখায় ব্যস্ত। ড দেবেন্দ্রমোহন বসু লিখেছেন : 'সম্ভবতঃ তিনিই মানুষের স্মৃতিশক্তির প্রথম অজৈব মডেল বা যান্ত্রিক নমুনা তৈয়ারি করেন।'[৮৫] জগদীশচন্দ্রের স্বীকৃতি অনুযায়ী, রবীন্দ্রনাথই তাঁকে এই গবেষণায় প্রবৃত্ত করেন। 11 Mar [সোম ২৭ ফাল্গুন] জগদীশচন্দ্র লিখছেন : 'তুমি psychology সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিতে বলিয়াছিলে। সেই কথা অনুসারে পরীক্ষা আরম্ভ করিয়াছিলাম। তাহার ফলে যে অদ্ভুত আবিষ্কার হইতেছে তাহা লিখিয়া জানাইতে পারি না। সুখ ও দুঃখের মৌলিক স্নায়বীয় ঘটনা কি তাহা প্রত্যক্ষ হইয়াছে এবং তাহা হইতে psychologyর মূল নিয়ম ধরা পড়িয়াছে। দুঃখের বিষয়, এরূপ কোন লোক দেখিতেছি না যাহার সহিত এ সম্বন্ধে আলোচনা করিতে পারি। তুমি যদি কলিকাতা না আইস তবে আমার এই অধ্যায়টি তোমাকে দেখিতে পাঠাইব।'[৮৬] 7 Jun [শুক্র ২৪ জ্যৈষ্ঠ ১৩১৪] তিনি মায়াবতী থেকে লিখেছেন : 'তোমার অনুরোধে পড়িয়া যে psychological বিষয় লিখিতেছিলাম, তাহাও বিশেষরূপ বর্দ্ধিত হইয়াছে—এখন ৩ chapterএ দাঁড়াইয়াছে। যতই এ বিষয় ভাবি, তই আশ্চর্য্য বলিয়া মনে হয়! 'স্মৃতি' সম্বন্ধেও এক নূতন অধ্যায় লিখিয়াছি। তোমার তাড়া না হইলে এ সব হইত না।'[৮৭] রবীন্দ্রনাথের পরামর্শে ও উৎসাহে এই বিশেষ গবেষণায় প্রবৃত্ত হয়ে তাঁকে আবিষ্কৃত বিষয়টি না দেখানো ও বোঝানো পর্যন্ত জগদীশচন্দ্র তৃপ্তি পাচ্ছিলেন না, তাই 'মঙ্গলবার' [? ১২ চৈত্র : 26 Mar] তাঁকে লিখছেন : 'পরম্পরা শুনিলাম তুমি কলিকাতা আসিয়াছ। আজ দু সপ্তাহ হইল আমি অতি আশ্চর্য্য কয়টি নূতন আবিষ্ক্রিয়া করিয়াছি। তাহাতে একেবারে অভিভূত হইয়াছি।…যদি পার তবে আজ সন্ধ্যার সময় আসিও, নতুবা কাল সকালে কি সন্ধ্যায়। অনেক কথা আছে।'[৮৮] রবীন্দ্রনাথ কলকাতায় ছিলেন, সুতরাং অবশ্যই বন্ধুর আমন্ত্রণ রক্ষা করেছিলেন।

রবীন্দ্রনাথ ১১ চৈত্র [সোম 25 Mar] কলকাতায় আসেন বহরমপুরে প্রস্তাবিত প্রাদেশিক সাহিত্য-সম্মিলনে যোগ দেওয়ার উদ্দেশ্যে। গত বছর বরিশালে বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মিলনের সঙ্গে সাহিত্য-সম্মিলন আহূত হয়েছিল—রবীন্দ্রনাথ ছিলেন সভাপতি। কিন্তু পুলিশী অত্যাচারের প্রতিবাদে উক্ত সম্মিলন আরম্ভই হতে পারেনি। ক্ষতিপূরণস্বরূপ সরস্বতী পুজোর সময় কলকাতায় সারস্বত-সম্মিলন অনুষ্ঠিত হয়। বর্তমান বৎসর ঈস্টারের ছুটির সময়ে 29-31 Mar [১৫-১৭ চৈত্র] দীপনারায়ণ সিং-এর সভাপতিত্বে বহরমপুরের বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মিলনের অধিবেশন আহূত হয়। এরই অনুষঙ্গে সেখানে প্রাদেশিক সাহিত্য-সম্মিলনের অধিবেশন করার উদ্যোগ নেয় বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ। ২ চৈত্র [শনি 16 Mar] হীরেন্দ্রনাথ দত্তের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত পরিষদের পঞ্চম বিশেষ অধিবেশনে সম্পাদক রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী বলেন :

সাহিত্য-পরিষদের কার্য্য-নির্ব্বাহক সমিতির আদেশে আমি মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুর ও শ্রীযুক্ত মণিমোহন সেন মহাশয়কে বহরমপুরে সাহিত্য-সম্মিলন আহ্বানের জন্য পত্র লিখিয়াছিলাম; তাঁহারা অনুগ্রহপূর্ব্বক সেই প্রস্তাবে সম্মত হইয়া বহরমপুরে আগামী ১৭ই ও ১৮ই চৈত্র তারিখে প্রাদেশিক সাহিত্য-সম্মিলন আহ্বানের আয়োজন করিতেছেন। বহরমপুরে এজন্য অভ্যর্থনা সমিতি গঠিত হইয়াছে ও অভ্যর্থনার ব্যয় ও আয়োজনের ভার তাঁহারা গ্রহণ করিয়াছেন।…গত বৎসর বরিশালে শ্রীযুক্ত দেবকুমার রায়চৌধুরীর আহ্বানে সাহিত্য-সম্মিলনের উদ্যোগ হইয়াছিল, পরিষৎ নিমন্ত্রিত হইয়া সেখানে প্রতিনিধি পাঠাইয়াছিলেন;…এ বৎসর সাহিত্য-পরিষৎ স্বয়ং উদ্যোগকর্ত্তা ও নিমন্ত্রণকর্ত্তা, সাহিত্য-পরিষদের

প্রত্যেক সভ্যই উপস্থিত হইবার জন্য অনুরোধ পত্র পাইবেন। এই সম্মিলন বার্ষিক অনুষ্ঠানে পরিণত হইলে সাহিত্যের মহোপকার সাধিত হইবে।[৮৯]

রবীন্দ্রনাথ এবারেও সভাপতি মনোনীত হন। এ-সংক্রান্ত সংবাদ অবশ্য উক্ত অধিবেশনের পূর্বেই বেঙ্গলী-তে [Mar 13] প্রকাশিত হয় : 'Under the auspices of the Bangiya Sahitya Parishad a Provincial Literary Conference will be held at Berhampore during the Easter holidays on 31st March Sunday and 1 April Monday. Babu Rabindra Nath Tagore will preside.'

রবীন্দ্রনাথ এই প্রস্তাব গ্রহণ করেন। ৬ চৈত্র [বুধ 20 Mar] তিনি দীনেশচন্দ্র সেনকে লেখেন : 'কোন তারিখে কখন আপনারা বহরমপুরে রওনা হইবেন জানিবার জন্য উৎসুক আছি কারণ সেই বুঝিয়া আমাকে এখান হইতে কলিকাতায় রওনা [হইতে] হইবে। হীরেন্দ্রবাবুর কাছ হইতে খবর লইয়া একথা আমাকে জানাইতে বিলম্ব করিবেন না।'[৯০] দীনেশচন্দ্র কী খবর দিয়েছিলেন জানা নেই, কিন্তু 'শ্রীযুক্ত খোদ বাবু মহাশয়ের বোলপুর হইতে ১১ চৈত্র শুভাগমন করার ব্যায় ১৫' হিসাব থেকে জানা যায় তিনি সম্মিলনের অনেক আগেই ১১ চৈত্র [সোম 25 Mar] কলকাতায় চলে এসেছেন। কিন্তু মথুরায় বেড়াতে গিয়ে মণীন্দ্রচন্দ্রের জ্যেষ্ঠপুত্র মহারাজকুমার মহিমচন্দ্র নন্দী টাইফয়েড রোগে মারা যান ১২ চৈত্র তারিখে। ফলে সাহিত্য-সম্মিলন স্থগিত রাখা হয়।[৯১] রবীন্দ্রনাথ সভাপতির অভিভাষণ হিসেবে যে প্রবন্ধটি লিখেছিলেন, সেটি মুদ্রণের জন্য ইতিমধ্যেই বঙ্গদর্শন-এ প্রদত্ত হয়েছিল। 'এই প্রবন্ধ বহরমপুরের প্রস্তাবিত প্রাদেশিক সাহিত্যসম্মিলনের জন্য লিখিত হইয়াছিল। এই সাহিত্যসম্মিলনের প্রধান উদ্যোগী ও পৃষ্ঠপোষক সাহিত্যানুরাগী মহানুভব মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুরের জ্যেষ্ঠপুত্রের শোচনীয় অকালমৃত্যুতে এই সম্মিলন স্থগিত করা হইয়াছে। এই প্রবন্ধ বঙ্গদর্শনে মুদ্রিত হইবার সময়ে আমরা এই নিদারুণ সংবাদ পাই, সেজন্য প্রবন্ধ যেভাবে রচিত হইয়াছিল, ঠিক সেইভাবেই প্রকাশিত হইল' পাদটীকা-সহ প্রবন্ধটি চৈত্র-সংখ্যা বঙ্গদর্শন-এ [পৃ ৫৬৫-৭৫] মুদ্রিত হয় 'সাহিত্যপরিষদ' শিরোনামে [দ্র সাহিত্য-পরিশিষ্ট ৮।৫০৭-১৮]। বাংলার বিভিন্ন স্থানে সাহিত্যপরিষদের শাখাস্থাপন ও প্রতি বৎসর ভিন্ন ভিন্ন জেলায় পরিষদের বার্ষিক অধিবেশন করার প্রস্তাব, তাতে কী উপকার আশা করা যায় ও তার কার্যপ্রণালী কী হওয়া উচিত, সে-সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ অন্তত দু'বার আলোচনা করেছিলেন—তাই তৃতীয়বারের জন্য তাঁকে নিষ্কৃতি দেওয়া উচিত ছিল, এই বলে তিনি তাঁর প্রস্তাবিত ভাষণ আরম্ভ করেন। বন্ধুরা যে তাঁকে পুনশ্চ সভাপতির পদে বসিয়েছেন এ কেবল তাঁর প্রতি পক্ষপাত—'এই অকারণ পক্ষপাত ব্যাপারটার অপব্যয় অন্যের সম্বন্ধে সহ্য করা অত্যন্ত কঠিন, কিন্তু নিজের সম্বন্ধে সেটা তেমন অত্যুগ্র অন্যায় বলিয়া ঠেকে না—মনুষ্যস্বভাবের এই আশ্চর্যধর্মবশত' তিনি বন্ধুদের আহ্বান অমান্য করতে পারেননি। সম্ভাব্য সমালোচনার প্রতি সূক্ষ্ম কটাক্ষ এই উক্তিতে লক্ষণীয়। হুজুগে মেতে সভাসমিতি স্থাপন করে নিজেদের সাধ্যের অতিরিক্ত বড়ো বড়ো সংকল্প ঘোষণা ও পরিণামে ব্যর্থতার জন্য পারস্পরিক দোষারোপ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ এখানেও ধিক্কার জানিয়েছেন। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ সম্পর্কে তাঁর শ্রদ্ধা ও প্রীতি প্রকাশেও তিনি অকুণ্ঠ : "যদি বলেন, 'সাহিত্যপরিষদ এত দিনে কী এমন কাজ করিয়াছে' তবে সে কথাটা ধীরে বলিবেন এবং সংকোচের সঙ্গে বলিবেন।" সাহিত্যপরিষদ যদি কোনো বড়ো কাজ করতে অক্ষম হয়ে থাকে তার জন্য দায়ী বাঙালিজাতির জড়তা। তাই তিনি আহ্বান জানিয়ে বলেছেন : 'দেশের ভাষা পুরাবৃত্ত সাহিত্য প্রভৃতি সকল দিক দিয়া দেশকে জানিবার জন্য সাহিত্যপরিষৎ প্রবৃত্ত হইয়াছেন। বাংলাদেশের

সকল জেলাই যদি তাঁহার সঙ্গে সচেষ্টভাবে যোগ দেন তবেই তাঁহার উদ্দেশ্য সফল হইবে। সফলতা দুই দিক দিয়াই হইবে—এক, যোগের সফলতা; আর-এক, সিদ্ধির সফলতা।···আপনারা মনে করিবেন না, আমাদের এ সভা কেবল বিশেষ একটি কার্যসাধন করিবার সভামাত্র। দেশের অদ্যকার পরম দুঃখদারিদ্র্যের দিনে যে-কোনো মঙ্গলকর্মের প্রতিষ্ঠান আমরা রচনা করিয়া তুলিতে পারিব তাহা শুদ্ধমাত্র কাজের আপিস হইবে না, তাহা তপস্যার আশ্রম হইয়া উঠিবে; সেখানে আমাদের প্রত্যেকের নিঃস্বার্থ সাধনার দ্বারা সমস্ত দেশের বহুকালসঞ্চিত অকৃতকর্তব্যের অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত হইতে থাকিবে।'

বহরমপুরে যাওয়ার ব্যবস্থা স্থগিত হয়ে যাওয়ায় রবীন্দ্রনাথ শিলাইদহে যেতে মনস্থ করেন। কিন্তু তার আগে ১৬ চৈত্র [শনি 30 Mar] তাঁকে একটি ছোট সামাজিক অনুষ্ঠানে যোগ দিতে হল। এই সময়ে ব্রহ্মচর্যাশ্রমের প্রাক্তন দারুশিল্পশিক্ষক কুসুমতো-সানের বিবাহ হয়;* এইদিন সম্ভবত সুরেন্দ্রনাথের বাড়িতে তাঁর নবপরিণীতা বধূকে খাওয়ানো হয়। পরদিন 'রবিবার' [১৭ চৈত্র : 31 Mar] রবীন্দ্রনাথ মীরা দেবীকে লিখছেন : 'কুসুমতোসানের বউটির সঙ্গে কথাবার্ত্তা চালাবার উপায় নেই। বাংলাও জানেনা, ইংরিজিও না। দেখতে বেঁটেখাটো গোলগাল জাপানি পুতুলের মত। বাংলা খাবার বেশ রুচিপূর্ব্বক খেলে। তাকে সাড়ি পরিয়ে দেওয়া গেল—তাতে একরকম মন্দ দেখাচ্ছিল না। তোরা এলে ওদের নিশ্চয়ই আর একবার নিমন্ত্রণ করে আনা যাবে।'[৯২] চিঠির সূচনায় তিনি লিখেছেন : 'আজ এখনি আমি শিলাইদহে রওনা হব। এখন সাড়ে পাঁচটা সকাল। সাড়ে তিনটে রাত্রে উঠে মুখ ধুয়ে স্নান করে ভদ্রবেশ পরিধান করে প্রস্তুত হয়ে বসে আছি—সেই বারোটা একটার সময় শিলাইদহে পৌঁছে আর একবার পদ্মায় ডুব দিয়ে স্নান করে নিতে হবে। এবারে কতদিন শিলাইদহে থাক্‌তে পাব ঠিক জানিনে—যতদিন পারি সেখানে কাটিয়ে আস্‌ব এই আমার অভিপ্রায়—বিশেষ যে কোনো কাজ আছে তা নয় কিন্তু কোনো একটা ছুতো করে কিছু দিন ছুটি নিয়ে একটু আরাম করে আসা আর কি।'

তিনি এক সপ্তাহ শিলাইদহে কাটিয়ে কলকতায় ফিরে আসেন ২৫ চৈত্র [সোম 8 Apr]। তার আগের দিন মীরা দেবীকে লিখেছেন :

তুই তো জানি আমার কি রকম ঝোড়ো কপাল—যেদিন এখানে এসেছি তার পরদিন থেকেই প্রত্যহ সন্ধের সময় নিয়মিত ঝড়বৃষ্টি বাদল চল্‌চে। প্রথমদিন যেখানে বোটটা ছিল সেখানে থাক্‌লে আমাকে মুস্কিলে পড়তে হত। পাঁচজনের পরামর্শ শুনে একটা কোলের মধ্যে আশ্রয় নিয়েছিলুম তাই এই ঝড়ের দাপটগুলো একরকম উত্তীর্ণ হওয়া গেল।···একলা পদ্মায় বোটে থাক্‌লে আমার মন যেমন সুস্থ হয়ে ওঠে এমন আর কোথাও না। কিন্তু যে কাজের ভার ঈশ্বর আমাকে দিয়েছেন—এখানে পড়ে থাকবার জো নেই। কালই এখান থেকে কলকাতায় গিয়ে সেখানকার কতগুলো কর্ম্ম সেরে আবার বোলপুরে যাব। বোলপুরের কাজ একটু গুছিয়ে নিয়ে এবার তোদের দেখ্‌তে যাব।[৯৩]

কলকাতায় ফিরে এসে পরদিন ২৬ চৈত্র [মঙ্গল 9 Apr] রবীন্দ্রনাথ মীরা দেবীকে লেখেন : 'কাল কলকাতায় এসেছি। কাল পর্শুর মধ্যেই বোলপুরে যাব। কিন্তু আমাদের বিষয়কর্মের হাঙ্গামা চোকাতে আবার বৈশাখের ২।৩রা এখানে আস্‌তে হবে। তার পরে কালিগ্রামে যাওয়ার দরকার হবে। তারপরে ফিরে এসে বোলপুর হয়ে কোন্ নাগাদ তোদের ওখানে যেতে পারব—এখন নিশ্চয় করে বলতে পারচিনে। হয়ত সব কাজ চুকিয়ে যেতে জ্যৈষ্ঠমাসের কোনো এক সময়ে হতেও পারে।'[৯৪]

কিন্তু 'কালপর্শুর মধ্যেই' তাঁর বোলপুরে যাওয়া হয়নি। সম্ভবত শিলাইদহ অবস্থানকালে তিনি জাতীয় শিক্ষাপরিষদে পঠিতব্য তৃতীয় প্রবন্ধ 'সৌন্দর্য ও সাহিত্য' রচনা করেছিলেন; সেইটি পড়লেন ২৯ চৈত্র [শুক্র

12 Apr] তারিখে। বেঙ্গলী-তে [11 Apr] মুদ্রিত বিজ্ঞপ্তিটি এইরূপ :

Babu Robindra Nath Tagore will deliver a lecture in Bengali on সাহিত্য ও সৌন্দর্য্য being the third of the series of "National Council of Education Extension Lectures on Comparative Literature" in the premises of the National College to-morrow, the 12th at 5-30 p.m. The meeting is open to the public.

—প্রবন্ধের নামটি ভুল ছাপা হলেও বঙ্গাক্ষরে মুদ্রিত।

'সৌন্দর্য ও সাহিত্য' [দ্র বঙ্গদর্শন, বৈশাখ ১৩১৪।১-১০; সাহিত্য ৮।৩৮৭-৯৯] প্রবন্ধের গোড়াতেই রবীন্দ্রনাথ বললেন, জগতের যতটা জ্ঞানের দ্বারা জানা যায় ও হৃদয়ের দ্বারা পাওয়া যায় ততটাতেই আমাদের ব্যাপ্তি ও বিস্তৃতি। সৌন্দর্যবোধ এই বিকাশকে ব্যাহত করে না, বরং ভালোমন্দ সুখদুঃখ জীবনমৃত্যু সমস্ত-কিছুর মধ্যে সংগতি এনে আনন্দের দ্বারা তাকে সম্পূর্ণ করে তোলে। য়ুরোপে একদল লোক সৌন্দর্যপূজার ধুয়ো তুলে যা-কিছু পরিচিত বা প্রাকৃত তাদের তুচ্ছ বলে উড়িয়ে দিতে চান। প্রসঙ্গত তিনি Theophile Gautier [1811-72]-রচিত *Mademoiselle de Maupin* [1835] উপন্যাসটির সৌন্দর্যসন্ধানের কথা উল্লেখ করে লিখেছেন : 'আমার তো মনে হয়, এমন নিষ্ঠুর বই আমি [আর] পড়ি নাই।' এইরূপ সংসারবিচ্ছিন্ন সৌন্দর্যপূজাকে ধিক্কৃত করে তিনি নিজের মত ব্যক্ত করেছেন : 'সৌন্দর্য জাত মানিয়া চলে না, সে সকলের সঙ্গেই মিশিয়া আছে। সে আমাদের ক্ষণকালের মাঝখানেই চিরন্তনকে, আমাদের সামান্যের মুখশ্রীতেই চিরবিস্ময়কে উজ্জ্বল করিয়া দেখাইয়া দেয়। সমস্ত জগতের যেটি মূলসুর সৌন্দর্য সেটি আমাদের মনের মধ্যে ধরাইয়া দেয়, সমস্ত সত্যকে তাহার সাহায্যে নিবিড় করিয়া দেখিতে পাই।' সাহিত্যিকেরা ভাষা ছন্দ ও রচনাসৌন্দর্যে অতিপরিচিতকেই নূতন করে দেখান, 'সুপরিচিত ও অপরিচিতকে আমরা একই বিস্ময়পূর্ণ অপূর্বতার মধ্যে গভীর করিয়া উপলব্ধি করি'।

নানা দ্বন্দ্ব নানা সুখদুঃখের ভিতর দিয়ে মানুষ সুন্দরকে আনন্দকে সত্যের সব দিকে ছড়িয়ে বৃহৎ করে চিনে নিচ্ছে। দেশে ও কালে এই চেনা সঞ্চিত হচ্ছে সাহিত্যের ভাণ্ডারে। যখন আমরা সেই নিত্যরূপ প্রত্যক্ষ করি তখন নিজেরই বাধামুক্ত পরিচয় অন্যের মধ্যে আবিষ্কার করে কৃতার্থ হই।

সাহিত্য দু'ভাবে আমাদের আনন্দ দেয়—সত্যকে মনোহররূপে দেখিয়ে ও সত্যকে আমাদের গোচর করে। মন চক্ষুরিন্দ্রিয় দিয়ে যেটাকে দেখতে পায়, ভাষা যদি ইন্দ্রিয়স্বরূপ হয়ে সেইটিকেই দেখাতে পারে, তবে মন তাতে নূতন একটি রস লাভ করে। এইভাবে সাহিত্য একটি নূতন ইন্দ্রিয়ের মতো হয়ে জগৎকে আমাদের কাছে নূতন করে দেখায়। কেবল নূতন নয়, ভাষা যেহেতু মানুষেরই মন-গড়া জিনিস, সেই জন্য বাইরের যে-জিনিসকে সে ভাষা-রূপে এনে দেয় তা বিশেষভাবে মানুষেরই জিনিস হয়ে ওঠে। 'ভাষা যে ছবি আঁকে সে ছবি যে যথাযথ ছবি বলিয়া আমাদের কাছে আদর পায় তাহা নহে; ভাষা যেন তাহার মধ্যে একটা মানবরস মিশাইয়া দেয়, এইজন্য সে ছবি আমাদের হৃদয়ের কাছে একটা বিশেষ আত্মীয়তা লাভ করে।' শুধু তাই নয়, ভাষার মধ্য দিয়ে যে ছবি আসে অনাবশ্যক বাহুল্য দিয়ে সে রস ভঙ্গ করে না, একটি বিশেষ সমগ্রতা লাভ করে সেই ছবি সুসম্পূর্ণ রসের মধ্যে দিয়ে এসে আমাদের অন্তঃকরণের কাছে অধিকতর গোচর হয়ে ওঠে।

সাহিত্যের যা উপকরণ সাহিত্যরাজ্যে তার মূল্যও কম নয়। এইজন্য অনেক সময়ে কেবল ভাষার সৌন্দর্য বা রচনানৈপুণ্যও সাহিত্যে সমাদর পেয়েছে। বস্তুত হৃদয়ের ভাব প্রকাশের জন্য মানুষ ব্যাকুল, নিজের ভাবটিকে অন্যের ভাব করে তুলতে পারলেই সে সার্থক হয়। অথচ কাজটি সহজ নয়। সেইজন্য একটা কথা

কেউ অত্যন্ত চমৎকার করে প্রকাশ করলে আমাদের আনন্দ হয়। প্রকাশের বাধা দূর হওয়াটাই আমাদের কাছে একটি দুর্মূল্য ব্যাপার বলে মনে হয়, এতে আমাদের শক্তি অনেকটা বেড়ে যায়। অনেক সময়ে বিষয়টি বিশেষ মূল্যবান না হলেও চলে, কিন্তু শুধু সেই প্রকাশ-ব্যাপারের মধ্যেই যদি কোনো অসামান্যতা দেখা যায় তবে মানুষ তাকে সমাদর করে রাখে। কারণ, প্রকাশই আনন্দ।

এই প্রবন্ধ পাঠ করার পরের দিন ৩০ চৈত্র [শনি 30 Apr] রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনে যান, ক্যাশবহির হিসাবে আছে : 'বোলপুর শুভগমন জন্য রেলভাড়া প্রভৃতির জন্য দেওয়া যায় ১০্'। শান্তিনিকেতন মন্দিরে সায়ংকালে সম্ভবত তিনি বর্ষশেষের উপাসনা করেছিলেন, কিন্তু উপাসনাটির কোনো লিখিত রূপ রক্ষিত হয়নি।

চৈত্র মাসের কোনো এক সময়ে রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধগ্রন্থ চারিত্রপূজা প্রকাশিত হয়। বেঙ্গল লাইব্রেরির ক্যাটালগে গ্রন্থটির প্রকাশ-তারিখ 28 May 1907 [মঙ্গল ১৪ জ্যৈষ্ঠ ১৩১৪] হলেও গ্রন্থটি যে অন্তত ১৬ চৈত্রের [শনি 30 Mar] পূর্বে প্রকাশিত হয়েছিল তার প্রমাণ ক্যাশবহির ৩০ চৈত্রের হিসাব : 'মা০ ভট্টাচার্য্য এণ্ড সন্ কোং দং চরিত্র পূজা পুস্তকের মূল্য বাবদ পাওয়া যায় ১৬ চৈত্র ৫০্/৩০ চৈত্র ২০০্/২৫০্'। গ্রন্থটি ১৩১৪ বঙ্গাব্দে গদ্যগ্রন্থাবলী ১ম ভাগ বিচিত্র প্রবন্ধ-এর পরে প্রকাশিত হয় বলে সর্বত্র উল্লিখিত হয়েছে, এই ধারণার সংশোধন প্রয়োজন।

অর্ধ-নামপত্র : চারিত্রপূজা।

আখ্যাপত্র : চারিত্রপূজা।/শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।/মূল্য ॥০ আনা।

[আখ্যাপত্রের পিছনের পৃষ্ঠায়] : কলিকাতা, মজুমদার লাইব্রেরি,/২০ নং কর্ণওয়ালিস্ স্ট্রীট দিনময়ী প্রেসে/ শ্রীহরিচরণ মান্না দ্বারা মুদ্রিত।

[স্বতন্ত্র একটি পৃষ্ঠায়] : প্রকাশক/ ভট্টাচার্য্য এণ্ড সনস্,/৬৫ নং কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

পৃষ্ঠাসংখ্যা : ২+২+২+২ [সূচী]+১০৪; মুদ্রণসংখ্যা : ২০০০।

সূচী

গ্রন্থটি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যতালিকা-ভুক্ত হয়, সেইজন্যই প্রকাশক ২০০০ কপি ছাপাতে সাহস করেছিলেন। অমরেন্দ্রনাথ রায় রবীন্দ্রনাথের রাজনৈতিক মত-পরিবর্তনের সমালোচনা-সূত্রে লেখেন : "যে দিন হইতে তাঁহার দুই একখানি পুস্তক কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্য পুস্তকরূপে নির্দ্ধারিত হইয়াছে, যে দিন হইতে তিনি উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষকপদে নিযুক্ত হইয়াছেন; সেই দিন হইতে তাঁহার 'কড়িসুর' কোমলে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। সেই 'কোমল সুর' তাঁহার 'ব্যাধি ও প্রতীকার' [যদ্দৃষ্টং] নামক প্রবন্ধে সর্ব্বপ্রথম ঝঙ্কৃত

হইয়া উঠিল।”[৯৪ক]‘ব্যাধি ও প্রতিকার’ শ্রাবণ ১৩১৪-সংখ্যা প্রবাসী-তে ছাপা হয়—সুতরাং মন্তব্যটি বর্তমান গ্রন্থটি সম্পর্কে প্রযোজ্য বলে মনে হয়।

আশ্বিন-সংখ্যা থেকে ভাণ্ডার ও বঙ্গদর্শন পত্রিকার প্রকাশ অত্যন্ত অনিয়মিত হয়ে যাওয়ায় আমরা পূর্বানুসৃত রীতি অনুযায়ী উক্ত মাস থেকে রবীন্দ্রনাথের জীবনকথার সঙ্গে সাময়িকপত্রে তাঁর রচনার সূচী অন্তর্ভুক্ত করিনি। এখানে সেগুলি ধারাবাহিকক্রমে প্রদত্ত হল।

ভাণ্ডার, আশ্বিন ১৩১৩ [২।৬] :

২১১-২১ জাতীয় বিদ্যালয়’ দ্র শিক্ষা ১২।৩১৩-২২

২৯ শ্রাবণ [মঙ্গল 14 Aug] জাতীয় শিক্ষাপরিষদের উদ্‌বোধন-সভায় পঠিত এই ভাষণটি ইতিপূর্বেই ভাদ্র-সংখ্যা বঙ্গদর্শন-এ [পৃ ২৬১-৬৮] মুদ্রিত হয়েছিল।

সঙ্গীত-প্রকাশিকা, আশ্বিন ১৩১৩ [৬।১] :

২০-২২ কাফি-একতালা। মাঝে মাঝে তব দেখা পাই দ্র স্বর ২৩

কাঙালীচরণ সেন গানটির স্বরলিপি-কার।

ভাণ্ডার, কার্তিক ১৩১৩ [২।৭] :

বেঙ্গল লাইব্রেরির ক্যাটালগ-অনুযায়ী সংখ্যাটি প্রকাশিত হয় 7 Dec [বৃহ ২১ অগ্র°]

২৮৫-৯০ সঞ্চয়/‘ডনসোসাইটীতে শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বক্তৃতা’

রচনাটি ডন সোসাইটি’জ ম্যাগাজিন থেকে পুনর্মুদ্রিত। রবীন্দ্রনাথ কবে ডন সোসাইটির সভ্যদের কাছে এই বক্তৃতা করেছিলেন পত্রিকাটিতে তার উল্লেখ নেই, কিন্তু করতালি শোকসভা স্মৃতিরক্ষা বা শোকচিহ্নধারণ প্রভৃতি বিষয়ে এই বক্তৃতায় তিনি যে বিরুদ্ধমত প্রকাশ করেছেন তা ইতিপূর্বেই প্রবন্ধাকারে ভাণ্ডার-এর বিভিন্ন সংখ্যায় মুদ্রিত হয়েছিল। পরিশেষে তিনি বলেছেন, বিদেশী সরকারের অধীনে থেকে আত্মপ্রতিষ্ঠ হয়ে সামাজিক স্বাধীনতা রক্ষা করতে গেলে স্বদেশী বিশ্ববিদ্যালয় সংস্থাপন ছাড়া উপায়ান্তর নেই। জীবিকার প্রশ্ন থাকলেও আত্মরক্ষা ও আত্মসম্মানের কথা ভেবে সেই কণ্টকাকীর্ণ পথেই চলতে হবে। শিক্ষার উপরে জীবনের গতি অনেকটা নির্ভর করে—পাশ্চাত্য শিক্ষা পাশ্চাত্য রাজসিক ভাবেই আমাদের দীক্ষিত করে, দেশীয় শান্তি ও সংযমের আদর্শ তাতে উপেক্ষিত হয়। ‘অতএব আমাদের অতীত গৌরব পুনঃপ্রাপ্ত হইতে হইলে, স্বদেশ স্বজাতির প্রতি ভালবাসা অঙ্কুরিত করিতে হইলে স্বদেশী ভাবে শিক্ষার প্রচার করা আবশ্যক। ইহাই আত্মপ্রতিষ্ঠার একমাত্র উপায়।’ রবীন্দ্রনাথ এক সময়ে স্বদেশী সমাজ প্রতিষ্ঠায় উদ্যোগী হয়েছিলেন, কিন্তু নানা বিরূপ অভিজ্ঞতায় বুঝতে পেরেছিলেন সে-সময় এখনও আসেনি। তবু তিনি বলেছেন : ‘ইহার ভিত্তি স্থাপনের কাজ আজ হইতেই করিতে হইবে। রুষিয়ার একজন সুপ্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক প্রিন্স ক্রপট্‌কিন (Prince Kropotkin) আমাদের দেশের কোন মান্যব্যক্তির [জগদীশচন্দ্র বসু] কাছে বলিয়াছিলেন যে আমাদের সবই আছে কেবল নেতার অধীনে এক হইয়া কাজ করিবার বল নাই। তিনি বলিয়াছেন যে কোন উপায়ে হউক দল বাঁধা শিখিতে হইবে।’ রবীন্দ্রনাথও বলেছেন, ব্যায়াম বা বক্তৃতা প্রভৃতি যে-কোনো উপলক্ষে দল বেঁধে নেতার অধীনে কাজ করা শিখলেই স্বদেশী সমাজের ভিত্তি সংস্থাপিত হবে এবং তার প্রতিষ্ঠা সহজ ও সম্ভবপর হয়ে উঠবে।

বঙ্গদর্শন, অগ্র° ১৩১৩ [৬।৮] :

শৈলেশচন্দ্র মজুমদার কার্তিক-সংখ্যায় লিখেছিলেন : 'পারিবারিক বিশেষ শোচনীয় ঘটনায় কার্ত্তিকের বঙ্গদর্শন প্রকাশে বিলম্ব ঘটিল, এজন্য অগ্রহায়ণের কাগজও ১৫ই অগ্রহায়ণের পূর্ব্বে বাহির হইবে এ আশা করিতে পারি না।' বেঙ্গল লাইব্রেরির ক্যাটালগ অনুযায়ী সংখ্যাটি প্রকাশিত হয় 22 Dec [শনি ৭ পৌষ]।

৪০০-১৮ 'ততঃ কিম্' দ্র ধর্ম ১৩।৪২০-২১

প্রবন্ধটি আলোচনা সমিতির বিশেষ অধিবেশনে ২১ অগ্র° [শুক্র 7 Dec] ওভারটুন হলে পঠিত হয়।

বঙ্গদর্শন, পৌষ ১৩১৩ [৬।৯]:

এই সংখ্যায় শৈলেশচন্দ্র মজুমদার '২০শে মাঘ' [রবি 3 Feb] তারিখ দিয়ে 'নিবেদন'-এ লিখেছেন : 'অনিবার্য্য কারণে পৌষ মাসের বঙ্গদর্শন প্রকাশেও অযথা বিলম্ব হইল, গ্রাহকগণ এ ত্রুটী মার্জ্জনা করিবেন। মাঘের সংখ্যা অনেক দূর অগ্রসর হইয়াছে ফাল্গুনের সংখ্যাও যন্ত্রস্থ; সুতরাং আশা করিতেছি, ফাল্গুন মাসের ২৫শের মধ্যে গ্রাহকগণ ফাল্গুন পর্য্যন্তের কাগজ পাইবেন।' বেঙ্গল লাইব্রেরির ক্যাটালগ অনুযায়ী সংখ্যাটি প্রকাশিত হয় 12 Feb [মঙ্গল ২৯ মাঘ]।

৪২৩-২৮ 'শান্তং শিবমদ্বৈতম্' দ্র ধর্ম ১৩।৪১০-১৬

৪২৮-৪৬ 'সৌন্দর্য্যবোধ' দ্র সাহিত্য ৮।৩৫৫-৭২; ধর্ম ১৩।৪১৬-১৯ ['স্বাতন্ত্র্যের পরিণাম']

এর মধ্যে প্রথম প্রবন্ধটি ৭ পৌষ শান্তিনিকেতন মন্দিরে ও ১১ মাঘ মহর্ষিভবনে সায়ংকালে পঠিত হয়। দ্বিতীয় প্রবন্ধটি পড়া হয় ১৩ মাঘ জাতীয় শিক্ষাপরিষদে।

ভাণ্ডার, মাঘ ১৩১৩ [২।১০]:

বেঙ্গল লাইব্রেরির ক্যাটালগ অনুযায়ী সংখ্যাটি প্রকাশিত হয় 1 Mar [শুক্র ১৭ ফাল্গুন]।

৩৪৭-৬৩ 'সাহিত্য-সম্মিলন' দ্র সাহিত্য-পরিশিষ্ট ৮।৪৯৩-৫০৬

প্রবন্ধটি ৫ মাঘ [শনি 19 Jan] সারস্বত-সম্মিলন উপলক্ষে জাতীয় শিল্পপ্রদর্শনী প্রাঙ্গণে পঠিত হয়।

বঙ্গদর্শন, মাঘ ১৩১৩ [৬।১০] :

১২ ফাল্গুন [রবি 24 Feb] তারিখ দিয়ে সম্পাদক 'নিবেদন'-এ লেখেন: 'মাঘ মাসের বঙ্গদর্শন গ্রাহক মহাশয়দের নিকট অদ্য প্রেরিত হইতেছে।/ফাল্গুনের বঙ্গদর্শন ১০ই চৈত্রের মধ্যে ও চৈত্রসংখ্যা চৈত্রমাস মধ্যেই গ্রাহক মহাশয়দের হস্তগত হইবে।' বেঙ্গল লাইব্রেরির ক্যাটালগ অনুযায়ী বর্তমান সংখ্যাটি প্রকাশিত হয় 2 Mar [শনি ১৮ ফাল্গুন]।

৪৭১-৭৬ 'মহাপুরুষ' দ্র চারিত্রপূজা ৪।৫৩৫-৪১

৪৮৩-৮৬ 'আনন্দরূপ' দ্র ধর্ম ১৩।৪৪১-৪৫

৪৮৭-৯৯ 'বিশ্বসাহিত্য' দ্র সাহিত্য ৮।৩৭২-৮৭

প্রথম প্রবন্ধটি ৬ মাঘ মহর্ষির শ্রাদ্ধসভায়, দ্বিতীয়টি ৭ পৌষ শান্তিনিকেতন মন্দিরে ও ১১ মাঘ আদি ব্রাহ্মসমাজ গৃহে প্রাতঃকালীন উপাসনায় এবং তৃতীয়টি ২৬ মাঘ জাতীয় শিক্ষাপরিষদে পঠিত হয়।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, ফাল্গুন ১৮২৮ শক [৭৬৩ সংখ্যা] :

১৬৯-৭৪ ['মহাপুরুষ'] দ্র চারিত্রপূজা ৪।৫৩৫-৪১

১৭৬-৭৯ [‘আনন্দরূপ’] দ্র ধর্ম ১৩।৪৪১-৪৫

১৮০-৮১ ইমন কল্যাণ-তেওরা। আমার মাথা নত করে দাও দ্র গীত ১।১৯৪-৯৫

১৮১ বাগেশ্রী বাহার-ঝাঁপতাল। নিবিড় অন্তরতর বসন্ত এল প্রাণে দ্র ঐ ২।৫৩৮

১৮১ বাহার-চৌতাল। নব নব পল্লব রাজি দ্র ঐ ২।৫৩৮

১৮১ নট মল্লার-একতালা। মোরে বারে বারে ফিরালে দ্র ঐ ১।১৭৩

সঙ্গীত-প্রকাশিকা, ফাল্গুন ১৩১৩ [৬।৬] :

১২২-২৪ বাহার-তেওরা। আজি বহিছে বসন্ত পবন সুমন্দ দ্র স্বর ২৩

কাঙালীচরণ সেন গানটির স্বরলিপি করেন।

বঙ্গদর্শন, ফাল্গুন ১৩১৩ [৬।১১] :

বেঙ্গল লাইব্রেরির ক্যাটালগ অনুযায়ী সংখ্যাটি প্রকাশিত হয় 4 Apr [বৃহ ২১ চৈত্র]।

৫১৭-২৯ ‘সাহিত্যসম্মিলন’ দ্র সাহিত্য-পরিশিষ্ট ৮।৪৯৩-৫০৬

প্রবন্ধটি ইতিপূর্বেই মাঘ-সংখ্যা ভাণ্ডার-এ প্রকাশিত হয়েছিল।

ভাণ্ডার, ফাল্গুন ১৩১৩ [২।১১] :

বেঙ্গল লাইব্রেরির ক্যাটালগ অনুযায়ী সংখ্যাটি প্রকাশিত হয় 30 Apr 1907 [মঙ্গল ১৭ বৈশাখ ১৩১৪]।

৩৯৬-৪১২ ‘সঞ্চয়’/‘বিশ্বসাহিত্য’ দ্র সাহিত্য ৮।৩৭২-৮৭

সঙ্গীত-প্রকাশিকা, চৈত্র ১৩১৩ [৬।৭] :

১৪৫-৪৬ আড়ানা-ঝাঁপতাল। নিত্য সত্যে চিন্তন কর রে বিমল হৃদয়ে দ্র স্বর ২৪

১৪৭-৫০ কাফি-ঝাঁপতাল। প্রতিদিন আমি হে জীবনস্বামী দ্র ঐ ২৪

কাঙালীচরণ সেন গানগুলির স্বরলিপি করেন।

বঙ্গদর্শন, চৈত্র ১৩১৩ [৬।১২] :

এই সংখ্যায় ২৯ চৈত্র [শুক্র 12 Apr] তারিখ দিয়ে লেখা হয় : ‘চৈত্রের বঙ্গদর্শন প্রকাশিত হইল’, কিন্তু বেঙ্গল লাইব্রেরির ক্যাটালগ অনুসারে সংখ্যাটির প্রকাশ-তারিখ 15 Apr [সোম ২ বৈশাখ ১৩১৪]

৫৬৫-৭৫ ‘সাহিত্যপরিষদ’ দ্র সাহিত্য-পরিশিষ্ট ৮।৫০৭-১৮ [‘সাহিত্যপরিষৎ’]

১৭ চৈত্র বহরমপুরে প্রাদেশিক সাহিত্য সম্মিলনে সভাপতির অভিভাষণ-রূপে পঠিত হবার জন্য প্রবন্ধটি লিখিত হয়েছিল।

ভাণ্ডার, চৈত্র ১৩১৩ [২।১২] :

বেঙ্গল লাইব্রেরির ক্যাটালগ অনুসারে সংখ্যাটি প্রকাশিত হয় 20 May [সোম ৬ জ্যৈষ্ঠ ১৩১৪]।

৪৩৬-৪৮ ‘সঞ্চয়’/‘সাহিত্যপরিষদ’ দ্র সাহিত্য-পরিশিষ্ট ৮।৫০৭-১৮ [‘সাহিত্যপরিষৎ’]

প্রাসঙ্গিক তথ্য : ১

বর্তমান বৎসরে ঠাকুরপরিবারের পক্ষে উল্লেখযোগ্য বিশেষ কোনো সংবাদ নেই। সত্যপ্রসাদের কন্যা শান্তার বিবাহ হয়েছিল ২৩ বৈশাখ ১৩১১ [5 May 1904] প্যারীলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে। তাঁদের প্রথম পুত্র প্রণবকুমারের জন্ম হয় ২৮ আষাঢ় ১৩১৩ [বৃহ 12 Jul], অন্নপ্রাশন হয় ১৭ ফাল্গুন [শুক্র 1 Mar 1907] — দুটি তারিখই দাদামশাই সত্যপ্রসাদ তাঁর হিসাবখাতায় লিখে রেখেছেন। বস্তুত এইরূপ শুভানুষ্ঠান ঠাকুরপরিবারে বর্তমান বৎসরে আরও হয়ে থাকতে পারে, কিন্তু মহর্ষির মৃত্যুর পর হিসাবরক্ষার পদ্ধতি পরিবর্তিত হওয়ায় এই ধরনের সংবাদ সংগ্রহ করা সহজ নয়।

রথীন্দ্রনাথ ও সন্তোষচন্দ্র মজুমদার আমেরিকার পথে জাপান রওনা হয়েছিলেন চৈত্র ১৩১২-র শেষ দিকে [? ২০ চৈত্র : 3 Apr]। 22 Apr [রবি ৯ বৈশাখ] সন্তোষচন্দ্র রবীন্দ্রনাথকে লিখেছেন : 'পরশু হংকং এসেছি। ক্যান্টন দেখতে গিয়েছিলুম বলে চিঠি লেখার সময় পেলুম না।' 18 May [শুক্র ৪ জ্যৈষ্ঠ] তিনি মীরা দেবীকে টোকিয়ো থেকে একটি দীর্ঘ পত্র লিখেছেন, রাশিয়ার সঙ্গে যুদ্ধে জয়লাভ করে জাপানীরা যে আনন্দোৎসব করছে তার বিস্তৃত বর্ণনা পত্রটিতে আছে। রথীন্দ্রনাথ তাঁর পিতৃস্মৃতি-তেও এই বর্ণনা দিয়েছেন। অনেক কষ্টে চক্ষু-পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে আমেরিকার জাহাজে তৃতীয় শ্রেণীর ডেক-প্যাসেঞ্জার হয়ে ভ্রমণের বৃত্তান্তও তিনি লিখেছেন সবিস্তারে; কিন্তু কবে বা কোন্ সময়ে তাঁরা ভূমিকম্প-বিধ্বস্ত সান্‌ফ্রান্সিকো হয়ে ইলিনয় স্টেটের আরবানা-য় পৌঁছলেন তা উল্লেখ করেননি। পথে তুষার-ঝড়ের বর্ণনায় মনে হয় তাঁদের পৌঁছতে শীতকাল এসে গিয়েছিল।[৯৫] কিন্তু ক্যাশবহির ১ জ্যৈষ্ঠের [মঙ্গল 15 May] হিসাবে রথীন্দ্রনাথের কাছে 'চিকাগো এমেরিকায়' ৫০০ টাকা পাঠানোর হিসাব পাওয়া যায়, ২২ শ্রাবণ [মঙ্গল 7 Aug] ৫০০ টাকা পাঠানো হয় '১০০২ কালিফোর্নিয়া ষ্ট্রীট চেম্পাইগন কাউনটি আরবানা ইলিনোইস ইউ, এস, এ স্থানে'—সুতরাং অনুমান করা যায়, অন্তত Aug 1906-এর মধ্যে তাঁরা আরবানায় পৌঁছে গেছেন। *The Bengalee*-র 2 Jan 1907 [বুধ ১৮ পৌষ]-সংখ্যায় ইলিনয় থেকে একজন বাঙালি ছাত্রের লেখা 'Student Life in America'-শীর্ষক একটি বিবরণ ছাপা হয়—লেখাটি রথীন্দ্রনাথের হতে পারে।

মীরা দেবীর বিবাহের জন্য রবীন্দ্রনাথ অনেক দিন ধরেই সচেষ্ট ছিলেন। এই বৎসরও তাঁর পাত্রসন্ধান অব্যাহত ছিল। বৈশাখ মাসে একটি তারিখহীন পত্রে তিনি শ্রীশচন্দ্র মজুমদারকে লেখেন : 'মীরার জন্যও চেষ্টায় আছি।'[৯৬] আশ্বিনের শেষে মাধুরীলতার সঙ্গে তাঁকে মজঃফরপুরে পাঠিয়ে দেন, বিবাহের ব্যবস্থা পাকা হয়ে যাবার পর তাঁকে নিয়ে আসা হয় বৈশাখ ১৩১৪-এর শেষে। বরিশালের বামনদাস গঙ্গোপাধ্যায়ের দ্বিতীয় পুত্র নগেন্দ্রনাথ বিলেতে উচ্চশিক্ষা লাভের জন্য বিভিন্ন ব্যক্তির কাছে অর্থসাহায্য ভিক্ষা করছিলেন, হয়তো সেই কারণে তিনি রবীন্দ্রনাথের কাছেও এসেছিলেন। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের উৎসাহী সদস্য নগেন্দ্রনাথের বহুবিধ ব্রাহ্ম গোঁড়ামি তাঁর পছন্দসই ছিল না, তবু উচ্চাকাঙ্ক্ষী সুদর্শন এই তরুণের তেজস্বিতায় তিনি মুগ্ধ হয়েছিলেন। তাই পাত্রসন্ধানে বিব্রত রবীন্দ্রনাথ আমেরিকা পাঠানোর সর্তে শেষপর্যন্ত নগেন্দ্রনাথকেই জামাতা রূপে নির্বাচন করেন। আমাদের অনুমান, বর্তমান বৎসরের শেষ দিকে এই যোগাযোগ গড়ে উঠেছিল, যার পরিণতি হয় ২৩ জ্যৈষ্ঠ ১৩১৪ [বৃহ 6 Jun 1907] মীরা দেবী ও নগেন্দ্রনাথের বিবাহে। পরবর্তী অধ্যায়ে আমরা বিষয়টি নিয়ে দীর্ঘ আলোচনা করেছি।

১৯ পৌষ [বৃহ 3 Jan 1907] সরলা দেবীর একমাত্র পুত্র পণ্ডিত দীপক দত্তচৌধুরী জন্মগ্রহণ করেন।

প্রাসঙ্গিক তথ্য : ২

৩ জ্যৈষ্ঠ [বৃহ 17 May] জোড়াসাঁকোর মহর্ষিভবনে মহর্ষির নবতিতম জন্মোৎসব পালিত হয়। 'ভক্তিভাজন শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় উপাসনা করিয়াছিলেন। এবং উপাসনান্তে যে বক্তৃতা করিয়াছিলেন তাহা সকলের হৃদয়গ্রাহী হইয়াছিল।'[৯৭]

মহর্ষির জন্মদিনকে স্মরণীয় করে রাখার জন্য ৬ জ্যৈষ্ঠ [রবি 20 May] থেকে পতিসরে পক্ষকালব্যাপী মহর্ষিমেলা আরম্ভ হয়। এর সঙ্গে একটি কৃষিপ্রদর্শনী ও পুরস্কারদানের ব্যবস্থাও[৯৭ক] হয়েছিল।

৩ ভাদ্র [শুক্র 19 Aug] রাজনারায়ণ বসুর পুত্র যোগীন্দ্রনাথের মৃত্যু হয়। আদি ব্রাহ্মসমাজের কার্যকলাপ বিস্তৃততর করার জন্য তাঁর আন্তরিক প্রয়াস ছিল। পরদিন ৪ ভাদ্র সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা আনন্দমোহন বসুর মৃত্যু হয়। থিয়োসফিক্যাল সোসাইটির প্রতিষ্ঠাতা কর্নেল অলকটের মৃত্যু হয় ৫ ফাল্গুন [রবি 17 Feb 1907]। এই বৎসর আদি ব্রাহ্মসমাজের আরও দু'জন একনিষ্ঠ কর্মীর জীবনাবসান হয়—বাল্মীকি রামায়ণের বিখ্যাত অনুবাদক হেমচন্দ্র বিদ্যারত্ন ২৪ অগ্র° [সোম 10 Dec] ও শম্ভুনাথ গড়গড়ি ২ মাঘ [বুধ 16 Jan 1907] পরলোকগমন করেন।

৭ পৌষ [শনি 22 Dec] শান্তিনিকেতনে ষোড়শ সাম্বৎসরিক ব্রহ্মোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। প্রাতঃকালে মঠধারী স্বামী অচ্যুতানন্দ 'প্রকাণ্ড ঘণ্টারব সহকারে ঘন ঘন শঙ্খধ্বনি' করে উপাসকদের আহ্বান করেন 'পরে আচার্য্যেরা বেদীর সম্মুখে একপংক্তিতে দণ্ডায়মান হইয়া সমস্বরে 'ওঁ পিতানোইসি' এই মন্ত্র পাঠ করিলেন এবং মন্ত্র পাঠান্তে তাঁহারা সভাস্থ সকলে দণ্ডবৎ হইয়া প্রণাম করিলে' রবীন্দ্রনাথ, প্রিয়নাথ শাস্ত্রী ও যোগেন্দ্রনাথ শিরোমণি বেদী গ্রহণ করেন। সংগীতের পর রবীন্দ্রনাথ 'সুললিত ও সরল ভাষায়' সকলকে উদ্বোধিত করেন। স্বাধ্যায়ান্ত উপাসনার পর প্রিয়নাথ শাস্ত্রী উপদেশ দিলে সংগীত হয়ে সভা ভঙ্গ হয়। 'পরে শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত বাবু ত্রৈলোক্যনাথ সান্যাল প্রভৃতি সকলে (কর তাঁর নাম গান) কীর্ত্তন করিতে করিতে সপ্তপর্ণমূলে উপস্থিত হইয়া মহর্ষিদেবের প্রস্তর-নির্ম্মিত সাধন-বেদী প্রদক্ষিণ করিলে পূর্ব্বাহ্নের কার্য্য শেষ হয়।'

সায়ংকালে রবীন্দ্রনাথ, প্রিয়নাথ শাস্ত্রী ও চিন্তামণি চট্টোপাধ্যায় বেদী গ্রহণ করেন। সংগীতের পর রবীন্দ্রনাথ যে উপদেশ দেন সেটি 'শান্তং শিবমদ্বৈতম্' নামে মুদ্রিত হয়। 'পরিশেষে সঙ্গীত হইয়া সভাভঙ্গ হইল।'

দ্বিপ্রহরে মেলাস্থলে এবারেও নীলকণ্ঠে মুখোপাধ্যায়ের যাত্রা হয়। 'এবারে শান্তিনিকেতনে দেশ বিদেশ হইতে অনেকে নিমন্ত্রিত হইয়া আসিয়াছিলেন।'[৯৮]

৬ মাঘ [রবি 20 Jan] মহর্ষির তিরোধানের দ্বিতীয় সাংবৎসরিক অনুষ্ঠিত হয়। শিবনাথ শাস্ত্রী, রবীন্দ্রনাথ ও বিনয়েন্দ্রনাথ সেন প্রবন্ধ পাঠ করেন। 'উক্ত উৎসবে ব্রহ্মের বিশেষ উপাসনা ও সঙ্গীতাদি হইয়াছিল।'

১১ মাঘ [শুক্র 25 Jan] সপ্তসপ্ততিতম সাম্বৎসরিক ব্রাহ্মসমাজ উপলক্ষে প্রাতে আদি ব্রাহ্মসমাজ গৃহে রবীন্দ্রনাথ, প্রিয়নাথ শাস্ত্রী ও যোগেন্দ্রনাথ শিরোমণি বেদী গ্রহণ করেন। প্রিয়নাথ শাস্ত্রী উদ্বোধন করেন। রবীন্দ্রনাথ পৌষ উৎসবে পঠিত 'আনন্দরূপ' প্রবন্ধটি এখানেও উপদেশ রূপে পাঠ করেন। 'পরিশেষে ঋষিকল্প দ্বিজেন্দ্রনাথের পৌত্রী শ্রীযুক্ত সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের কন্যা বালিকা রমা দেবীর সঙ্গীতে অনেকেই

অশ্রুপাত করিয়াছিলেন।' রাত্রে মহর্ষিভবনে রবীন্দ্রনাথ, যোগেন্দ্রনাথ শিরোমণি ও চিন্তামণি চট্টোপাধ্যায় বেদীর আসন গ্রহণ করেন। চিন্তামণি চট্টোপাধ্যায়ের উদ্বোধনের পর রবীন্দ্রনাথ 'শান্তং শিবমদ্বৈতম্' প্রবন্ধটি পুনরায় পাঠ করেন।

শান্তিনিকেতনেও এইদিন দ্বিজেন্দ্রনাথ মাঘোৎসব উপলক্ষে উপাসনা করেন। হেমলতা দেবী 'শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমের বালকগণের উদ্দেশে লিখিত' একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন [দ্র তত্ত্ব°, ফাল্গুন। ১৮৩-৮৪]।

দিনেন্দ্রনাথ এই সময়ে ব্যারিস্টারি পড়ার জন্য লণ্ডনে অবস্থান করছিলেন। তিনি সেখানে মাঘোৎসব পালন করেন। তত্ত্ববোধিনী-তে 'নানা কথা' বিভাগে লেখা হয় : 'মহর্ষির প্রপৌত্র শ্রীযুক্ত দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিমলচন্দ্র ঘোষ ও শশধর হালদারের উদ্যোগে লণ্ডন ইসেক্স হলে মাঘোৎসব সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। রেভাঃ পেজ হপস্ উপাসনার কার্য্য করেন।'[৯৯]

কংগ্রেস উপলক্ষে আগত একেশ্বরবাদীদের সম্মেলন [Theistic Conference] আর. ভেঙ্কটরত্নম্ নাইডুর সভাপতিত্বে সিটি কলেজ হলে অনুষ্ঠিত হয় 26-29 Dec [বুধ-শনি ১১-১৪ পৌষ]। 'মহারাজা ময়ূরভঞ্জ "ব্রাহ্মধর্ম্মই সার্ব্বভৌমিক ধর্ম্ম হইবার উপযোগী" এই মর্ম্মে এক চিন্তাপূর্ণ প্রস্তাব পাঠ করেন। পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী নিজ বক্তৃতায় জনসংখ্যা-বিবরণী (সেন্সস্ রিপোর্ট) প্রদর্শিত ব্রাহ্মসংখ্যা-অবনতি[র] চারিটি কারণ মূলক বলিয়া নির্দ্দেশ করেন।'[১০০]

প্রাসঙ্গিক তথ্য : ৩

বঙ্গভঙ্গকে কেন্দ্র করে বাঙালি জনসাধারণ ও ইংরেজ শাসককুল কতটা সংঘর্ষমুখী হয়ে উঠেছিল তার দৃষ্টান্ত মিলল বৎসরের প্রথম দিনেই বরিশালে বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মেলনকে উপলক্ষ করে। 'বন্দে মাতরম্' ইতিমধ্যেই বাঙালির যুদ্ধধ্বনি ও ইংরেজের কর্ণশূলে পরিণত হয়েছিল। সেই কারণে বরিশালের জেলা-ম্যাজিস্ট্রেট এমার্সন বরিশালের রাস্তায় 'বন্দে মাতরম্' ধ্বনি দেওয়া নিষিদ্ধ করে একটি আদেশ জারি করেন, ফলে অশ্বিনীকুমার দত্তের সভাপতিত্বে গঠিত অভ্যর্থনা সমিতি সুরেন্দ্রনাথ-প্রমুখ প্রতিনিধিদের আগমনের সময়ে তাঁদের 'বন্দে মাতরম্' ধ্বনি দিয়ে তাদের স্বাগত জানাতে পারেননি। কিন্তু ১ বৈশাখ [শনি 14 Apr] প্রাতে সুরেন্দ্রনাথের বাসগৃহে একটি রুদ্ধ দ্বার বৈঠকে স্থির হয়, প্রতিনিধিবর্গ রাজাবাহাদুরের হাবেলিতে সমবেত হয়ে 'বন্দে মাতরম্' ধ্বনি-সহ মনোনীত সভাপতি ব্যারিস্টার আবদুল রসুলকে শোভাযাত্রা সহকারে অনুসরণ করবেন। প্রধান নেতৃবৃন্দ অগ্রসর হয়ে যাওয়ার পর পুলিশ সুপারিন্টেন্ডেন্ট কেম্প তাঁর পুলিশবাহিনী নিয়ে প্রধানত অ্যান্টি-সার্কুলার সোসাইটির সদস্যদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়েন। ফণিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, ব্রজেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, মনোরঞ্জন গুহঠাকুরতার বালক পুত্র চিত্তরঞ্জন প্রভৃতি গুরুতর আহত হন। সুরেন্দ্রনাথ এই আচরণের প্রতিবাদ করলে কেম্প তাঁকে গ্রেপ্তার করেন ও এমার্সন তাঁকে চারশ' টাকা জরিমানা করেন।

সম্মেলন যথারীতি আরম্ভ হয়েছিল। মতিলাল ঘোষ দ্বারা আনীত প্রথম প্রস্তাবে জনসাধারণকে আহ্বান জানানো হয় সরকারের সঙ্গে অসহযোগিতা করার জন্য। প্রস্তাবটি সমর্থন ও পোষকতা করেন যথাক্রমে ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় ও গীস্পতি কাব্যতীর্থ। এই সময়ে সুরেন্দ্রনাথ ও আহত পুত্র চিত্তরঞ্জনকে নিয়ে মনোরঞ্জন

গুহঠাকুরতা সভায় প্রবেশ করেন। মনোরঞ্জন বলেন, তাঁর পুত্রের জন্য তিনি গর্বিত ও তার মৃত্যু হলেও তিনি দুঃখিত হতেন না—এর পরে তিনি 'মেঘনাদবধ কাব্য' থেকে বীরবাহুর মৃত্যুতে রাবণের শোকোচ্ছ্বাসের অংশবিশেষ আবৃত্তি করেন। ব্রহ্মবান্ধব বৃষকেতুর কাহিনী আবৃত্তি করে বলেন, বাঙালি বালকদের রক্ত স্বদেশী আন্দোলনের উপর ঈশ্বরের স্বীকৃতি চিহ্নিত করল।

'বন্দে মাতরম্' ও কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদের 'যায় যাবে জীবন চলে, জগৎ মাঝে তোমার কাজে বন্দে মাতরম বলে' গান দিয়ে দ্বিতীয় দিনের অধিবেশন আরম্ভ হয় ২ বৈশাখ [রবি 15 Apr] বেলা এগারোটার সময়ে। তারাপ্রসন্ন বসুর স্ত্রী সরোজিনী পাঁচ বছরের ছেলে হেমন্তচন্দ্রের হাত দিয়ে নিজের ডান হাতের কঙ্কণ স্বদেশের কাজে দান করে জানান, বন্দে মাতরম্-সংক্রান্ত নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহৃত না হওয়া পর্যন্ত তিনি কঙ্কণ পরবেন না।[১০১]

এই দিনও তিনটি প্রস্তাব নিয়ে আলোচনা হয়। তারপর কেম্প সভায় প্রবেশ করে বলে, সভাভঙ্গের পর কেউ রাস্তায় 'বন্দে মাতরম্' ধ্বনি দেবেন না এরূপ প্রতিশ্রুতি না পেলে তিনি সভা বন্ধ করে দিতে বাধ্য হবেন। সভাপতি এরূপ প্রতিশ্রুতি দিতে অসম্মত হলে কেম্প ম্যাজিস্ট্রেটের আদেশ পাঠ করে সভা ভঙ্গের নির্দেশ দেন।

পরদিন রবীন্দ্রনাথের সভাপতিত্বে প্রাদেশিক সাহিত্য সম্মেলন বসার কথা ছিল। অনেক পরামর্শের পর এই সম্মেলন পরিত্যক্ত বলে ঘোষিত হয়।

প্রত্যাবর্তনের পথে সুরেন্দ্রনাথ প্রতিটি স্টেশনে সংবর্ধিত হন এবং 18 Apr [বুধ ৫ বৈশাখ] ভোরে ট্রেন শিয়ালদহে পৌঁছলে বিরাট জনতা তাঁকে রাজকীয় অভ্যর্থনা জানিয়ে তাঁর গাড়ি টেনে নিয়ে গিয়ে গোলাদিঘিতে এক সভায় মিলিত হন। এর পর প্রায় প্রত্যহই বরিশালের নিপীড়নকে ধিক্কার দিয়ে দেশের বিভিন্ন স্থানে সভা হতে থাকে। ১৫ বৈশাখ [শনি 28 Apr] বাগবাজারে পশুপতিনাথ বসুর বাড়ির প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত একটি বিরাট সভায় রবীন্দ্রনাথ সুরেন্দ্রনাথকে 'দেশনায়ক' পদে অভিষিক্ত করার আহ্বান জানান।

কিন্তু সামন্ততান্ত্রিক ঐতিহ্যে লালিত দেশে এইরূপ আহ্বানের বিপদও ছিল। ১৩ ভাদ্র [বুধ 29 Aug] একটি সভায় হিন্দুপণ্ডিতগণ সুরেন্দ্রনাথের 'অভিষেক' ক্রিয়া নিষ্পন্ন করেন। বরিশালে দণ্ডভোগের ফলে যিনি বাংলার মুকুটহীন সম্রাট-রূপে সম্মানিত হচ্ছিলেন, অভিষেক-ক্রিয়ার বাহ্যাড়ম্বর তাঁকে কতটা হাস্যকর করে তুলেছে অরবিন্দ *Bande Mataram*-এর 1 Sep-সংখ্যার একটি রচনায় তার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। তিনি উদাহরণ দিয়ে দেখান, দাক্ষিণাত্যে টিলকের জন্মোৎসবের আয়োজনে স্বয়ং টিলক বাধা দিয়েছিলেন।

পারস্পরিক দোষারোপ, চরিত্রহননের প্রয়াস প্রভৃতি দ্বারা বরিশালের নিপীড়নের বিরুদ্ধে সংগত বিক্ষোভও কিভাবে কলুষিত হয়ে উঠেছিল, তার উদাহরণ আমরা আগেই দিয়েছি।

২৫ বৈশাখ [মঙ্গল 8 May] বীডন স্কোয়ারে একটি সভায় প্রতাপাদিত্য-উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। শ্রীশচন্দ্র ধর লিখেছেন : 'গত ২৫শে বৈশাখ মঙ্গলবার বৈশাখীপূর্ণিমায় বাঙ্গালীবীর মহারাজা প্রতাপাদিত্যের রাজ্যাভিষেকতিথি-উপলক্ষে লাহোরে চিফ্ কোর্টের উকিল শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত পণ্ডিত রামভজ দত্ত চৌধুরীমহাশয়ের বাসভবনে "প্রতাপাদিত্য-হোম" সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে।'[১০২]

এই বৎসর মহাসমারোহে শিবাজী-উৎসব পালিত হয়। উৎসব উপলক্ষে একটি' শিবাজীমেলারও আয়োজন করা হয়। উৎসবের প্রবর্তক বালগঙ্গাধর টিলক সহযোগী খাপার্দে ও মুঞ্জে-কে নিয়ে এই উপলক্ষে

কলকাতায় আসেন ২১ জ্যৈষ্ঠ [সোম 4 Jun]। ইংরেজের নিপীড়নের অন্যতম লক্ষ্য চরমপন্থী টিলক তখন বাংলার 'হিরো'। সুতরাং তাঁকে অভ্যর্থনা জানানোর জন্য হাওড়া স্টেশন জনারণ্যে পরিণত হয়। ২২ জ্যৈষ্ঠ [মঙ্গল 5 Jun] পান্তির মাঠে অশ্বিনীকুমার দত্তের সভাপতিত্বে যে বিরাট সভা হয় তাতে টিলক উপস্থিত ছিলেন। সখারাম গণেশ দেউস্কর-প্রণীত 'শিবাজী' পুস্তিকাটি এই উপলক্ষে বিতরিত হয়। পরদিন একই স্থানে টিলকের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় খাপার্দে, মুঞ্জে, হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, বিপিনচন্দ্র পাল প্রভৃতি বক্তৃতা করেন।

হিন্দুমুসলমান সমস্যার পরিপ্রেক্ষিতে এই উৎসবে শিবাজীকে অসাম্প্রদায়িক রূপে প্রতিপন্ন করার একটি অনৈতিহাসিক প্রয়াস পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু একই সঙ্গে প্রদর্শনী-স্থলে ভবানীমূর্তি প্রতিষ্ঠা ও পূজা করে উৎসবকে বিশেষভাবে হিন্দু-আকারও দেওয়া হয়। মুসলমানেরা তো বটেই, কৃষ্ণকুমার মিত্র ও অ্যান্টিসার্কুলার সোসাইটির ব্রাহ্ম ছাত্রনেতারাও এই কারণে উৎসব বয়কট করেন। রবীন্দ্রনাথ ২০ জ্যৈষ্ঠ [রবি3 Jun] সুবোধচন্দ্র মজুমদারকে লিখেছেন : 'এক লক্ষ্মীছাড়া শিবাজি মেলা নিয়ে বৃহস্পতিবার পর্য্যন্ত আটক পড়েছে'—এই 'লক্ষ্মীছাড়া' বিশেষণেই তাঁর বিরক্তি অনুভব করা যায়। রবীন্দ্রনাথ সম্পাদনার দায়িত্ব ত্যাগ করায় বিপিনচন্দ্র পাল তখন বঙ্গদর্শন-এর অন্যতম প্রধান লেখক, তিনি 'শিবাজী-উৎসব' [ভাদ্র। ২৩৫-৪৩], 'শিবাজী-উৎসব ও ভবানীমূর্ত্তি' [আশ্বিন। ২৯৬-৩০৫] প্রভৃতি প্রবন্ধে তাঁদের ভূমিকাটি সমর্থন করার চেষ্টা করেছেন।

স্বদেশী আন্দোলনকে হিন্দুরূপে দেওয়ার প্ররোচনামূলক ও অদূরদর্শী প্রচেষ্টার সূত্রপাত এখানেই। 'বন্দে মাতরম্' মন্ত্রের উদ্‌গাতা বঙ্কিমচন্দ্র তখন ঋষির মর্যাদায় অধিষ্ঠিত। বাংলার প্রথম উল্লেখযোগ্য বৈপ্লবিক সংগঠন অনুশীলন সমিতি বঙ্কিমচন্দ্রের ব্যাখ্যাত অনুশীলন-তত্ত্ব থেকে তাঁদের সংস্থার নাম ও আদর্শ গ্রহণ করেছিল, দেবীচৌধুরানীর মতো শারীরিক ও মানসিক বৃত্তিগুলির পরিপূর্ণ বিকাশের দ্বারা দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালনের মহাব্রত তাঁদের রাজনৈতিক কার্যকলাপের আদর্শ ছিল। বারীন্দ্রকুমারের প্ররোচনায় অরবিন্দ *Bhawani Mandir* [1906] রচনা করেছিলেন আনন্দমঠ-এর আদর্শে, ভারতের কোনো দুর্গম স্থানে মন্দির স্থাপন করে 'সন্তান'দের মতো শক্তিচর্চার রোম্যান্টিক পরিকল্পনা এই পুস্তিকার বিষয়বস্তু—সত্যানন্দের মতো গুরুর সন্ধানে বারীন্দ্রকুমার অনেক পরিভ্রমণ করেছিলেন, বিভিন্ন স্মৃতিকথায় তার উল্লেখ আছে। রাজনৈতিক ডাকাতি, গুপ্তসমিতিতে ধর্ম ও আধ্যাত্মিক ভাবের চর্চা প্রভৃতি অনেক কিছুতেই দেবীচৌধুরানী ও আনন্দমঠ-এর প্রভাব সুস্পষ্ট। অরবিন্দ তরুণ বয়স থেকেই বঙ্কিমপ্রতিভায় মুগ্ধ, দেশবিদেশের বিপ্লবের ইতিহাস ও কার্যপদ্ধতির সঙ্গে পরিচিত হয়েও বঙ্কিমের রোমান্সের অনুকরণে পরিচালিত গুপ্তসমিতিকে তিনি বাস্তব পথের দিশা দেবার চেষ্টা করেননি—গীতা-র 'মা ফলেষু কদাচন' বচনের নির্বেদাত্মক অশুভ ব্যাখ্যা তাদের সর্বনাশকে ত্বরান্বিত করেছিল। বঙ্কিম-পূজা অন্যত্রও বিস্তৃত হয়েছিল। ২১ আশ্বিন ১৩১২ [শনি 7 Oct 1905] বিজয়ার রাত্রে রমাকান্ত রায়ের নেতৃত্বে ছাত্রযুবাদের একটি মিছিল প্রতাপ চ্যাটার্জি লেনে বঙ্কিমচন্দ্রের বাড়িতে উপস্থিত হয়; সেখানে 'বন্দে মাতরম্' গাওয়া হয়, প্রেমতোষ বসু ও একজন মুসলমান ভদ্রলোক বক্তৃতা করেন।[১০৩] গিরিজাশঙ্কর রায়চৌধুরী লিখেছেন : '২৯ জুন [1906] "বন্দেমাতরম্ সম্প্রদায়" কাঁঠালপাড়ায় বঙ্কিম উৎসব সমারোহের সহিত সম্পন্ন করিলেন।'[১০৪] বঙ্কিমচন্দ্রের মৃত্যুবার্ষিকীর পূর্বদিন ২৫ চৈত্র [সোম 8Apr 1907] ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়ের উদ্যোগে স্টীমার ভাড়া করে দলবল নিয়ে নৈহাটি-কাঁঠালপাড়ায় গিয়ে বঙ্কিমোৎসব পালিত হয়।[১০৫]

বারীন্দ্রকুমার বিপ্লবকর্মে প্রাথমিক ব্যর্থতার পর 1906-এর প্রথমে [Feb/Mar] *Bhawani Mandir*-এর পাণ্ডুলিপি নিয়ে বরোদা থেকে কলকাতায় আসেন।[১০৬] কিছুদিন পরে বরিশালে ফুলারী অত্যাচারের প্রতিশোধ নেবার জন্য তিনি, প্রফুল্ল চাকী ও হেমচন্দ্র কানুনগো শিলঙে যান—হেমচন্দ্রের বর্ণানুযায়ী 'সেটা বোধ হয়, ১৯০৬ খৃষ্টাব্দের মে মাসের প্রথম সপ্তাহ।' ব্যর্থ হলে ফিরিয়ে দিতে হবে এই শর্তে কোনো এক ধনী ব্যক্তি তাঁদের এক হাজার টাকা দিয়েছিলেন। অভিযানটি শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ হয়, কিন্তু বারীন্দ্রের হরেকরকম বাগ্‌বিস্তার ও পরিকল্পনা-পরিবর্তনের যে বিবরণ হেমচন্দ্র দিয়েছেন তাতে অরবিন্দ প্রমুখ তথাকথিত বিপ্লবতত্ত্বাভিজ্ঞ নেতারা কেন বারীন্দ্রের কার্যকলাপের উপর আস্থা স্থাপন করে নিশ্চিন্ত ছিলেন ভাবলে আশ্চর্য হতে হয়। হেমচন্দ্র-প্রদত্ত বিবরণকে অবশ্য কেউ-কেউ 'ভগ্নমোহ বীতশ্রদ্ধ এক ব্যক্তির লেখা' বলে তুচ্ছতাচ্ছিল্য করেছেন, কিন্তু স্বয়ং বারীন্দ্র-লিখিত স্মৃতিকথাগুলিতে প্রকারান্তরে একই চিত্র পাওয়া যায়—হেমচন্দ্রের লেখায় বিপ্লবের সঙ্গে যোগমাহাত্ম্য ও আধ্যাত্মিক তত্ত্বকথার সংমিশ্রণের ফাঁকিবাজি অন্তত নেই। ফুলারী-অভিযানের ব্যর্থতায় হতাশ হেমচন্দ্র হাতে-কলমে শিক্ষার জন্য নিজের চেষ্টাতেই ফ্রান্সের উদ্দেশে যাত্রা করেন Jul 1906-এর শেষে। সেখান থেকে তিনি বোমা তৈরি শিক্ষা করে দেশে ফিরে আসেন Jan 1908-এর গোড়ায়।

বিপ্লব-আন্দোলনের প্রসারে সংবাদপত্র ও সাহিত্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। ব্রহ্মবান্ধবের 'সন্ধ্যা' লৌকিক ভাষার প্রচণ্ড শক্তিতে ফিরিঙ্গি-বিদ্বেষ উদ্‌গীরণ করছিল। কিন্তু তরুণ বিপ্লবীরা তাতেই সন্তুষ্ট হতে পারেননি। বারীন্দ্র, অবিনাশচন্দ্র ভট্টাচার্য ও ভূপেন্দ্রনাথ দত্তের উদ্যোগে 'যুগান্তর' সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছিল Mar 1906-এ। খোলাখুলি বিপ্লববাদ প্রচার পত্রিকাটির লক্ষ্য ছিল। যুগান্তর-এর আকর্ষণে বহু তরুণ বিপ্লবীদলে যোগদান করেন।

ইংরেজি দৈনিক *Bande Mataram* বিপিনচন্দ্র পালের সম্পাদনায় প্রথম প্রকাশিত হয় 6 Aug 1906 [সোম ২১ শ্রাবণ] তারিখে। অরবিন্দ, শ্যামসুন্দর চক্রবর্তী, হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ প্রভৃতি সম্পাদকমণ্ডলীতে যোগ দেন। পত্রিকা পরিচালনার জন্য একটি জয়েন্ট-স্টক কোম্পানি গঠিত হয়, কিন্তু ব্যয়ভার প্রধানত বহন করতেন সুবোধচন্দ্র ও নীরদচন্দ্র মল্লিক। কয়েক মাস পরে মতদ্বৈধ উপস্থিত হওয়ায় বিপিনচন্দ্র সম্পাদকের পদ ত্যাগ করেন, অরবিন্দ অঘোষিত সম্পাদক হন। যুগান্তর-এর বক্তব্য ও প্রকাশভঙ্গির সঙ্গে বন্দে মাতরম্-এর লেখার পার্থক্য ছিল। বুদ্ধিদীপ্ত অপূর্ব ইংরেজিতে লেখা অরবিন্দের সম্পাদকীয় ও মন্তব্যগুলির জন্য শিক্ষিত বাঙালি ও ভারতীয়গণ প্রশংসামুখর হয়ে ওঠেন। বিপিনচন্দ্র, টিলক, লাজপৎ রায়, অরবিন্দ প্রমুখ নেতৃবৃন্দকে ঘিরে কংগ্রেসের মধ্যে যে ন্যাশানালিস্ট উপদল সৃষ্টি হয়েছিল বন্দে মাতরম্ সেই দলের তাত্ত্বিক মুখপত্রের ভূমিকা গ্রহণ করে।

এই ন্যাশানালিস্ট উপদলের উদ্ভব জাতীয় কংগ্রেসের একুশ বছরের ইতিহাসে একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে ধূমায়িত বিষবাষ্পকে নিরাপদ পদ্ধতিতে বিমুক্ত করে দেওয়ার যন্ত্র হিসেবে কংগ্রেসের আবির্ভাবকে লর্ড ডাফরিন স্বাগত জানিয়েছিলেন। প্রতি বৎসর 'তিন দিনের অমাশা'য় শাসন ও বিচার বিভাগের পৃথকীকরণ, আই. সি. এস. পরীক্ষার্থীদের বয়সের সীমা বৃদ্ধি, কাউন্সিলে বর্ধিত সংখ্যায় ভারতীয়দের নির্বাচন ইত্যাদি গুটিকতক প্রস্তাব গ্রহণ করে নেতাগণ স্বদেশসেবার কর্তব্য সমাধা করতে অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছিলেন। আর সেই সুযোগে 'স্যার' ফিরোজশা মেটা প্রমুখ রাজভক্ত বোম্বাই-গোষ্ঠী কংগ্রেসের ছড়িদার হয়ে উঠেছিলেন—গোখলে, সুরেন্দ্রনাথ, ভূপেন্দ্রনাথ বসু প্রভৃতি অন্য নেতারা একই সুরের সাধক ছিলেন।

কিন্তু বয়কটের প্রস্তাব ও সিদ্ধান্ত ভারতীয় রাজনীতিতে গুণগত পরিবর্তন আনল। নরমপন্থী নেতারাও বঙ্গভঙ্গের প্রস্তাবটির বিরোধিতা করেছেন—কিন্তু বাঁচার তাগিদে বাঙালি যখন বয়কটের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে বাধ্য হল তখন উক্ত নেতারা প্রমাদ গুণলেন। গোখলের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত 1905-এর বারাণসী অধিবেশনে যুবরাজকে স্বাগত জানানোর প্রস্তাবের বিরোধিতা করার হুমকি দিয়ে বাঙালি প্রতিনিধিরা বয়কট প্রস্তাবের প্রতি কংগ্রেসের 'সহানুভূতি' আকর্ষণে সমর্থ হন। পত্রপত্রিকায় আবেদন-নিবেদনের রাজনীতির বিরোধিতার সূত্রপাত হয়েছিল কংগ্রেসের জন্মলগ্ন থেকেই, কিন্তু অধিবেশন-স্থলে বিরোধিতার শুরু বারাণসীতেই। 1906-এর কংগ্রেসের অধিবেশন হওয়ার কথা ছিল কলকাতাতে। বাংলার 'গরম' নেতারা মেটা-দের চক্ষুশূল টিলককে এই অধিবেশনের সভাপতি করতে চাইলেন। সিদ্ধান্তটি নেওয়ার কথা কলকাতার অভ্যর্থনা সমিতির—কিন্তু মেটা-দের চক্রান্ত অনুযায়ী সুরেন্দ্রনাথ ভাগলপুরে একটি জনসভায় ঘোষণা করেন, দাদাভাই নৌরজীকে সভাপতি হবার অনুরোধ জানানোয় তিনি সম্মতি জ্ঞাপন করেছেন।[১০৬ক] জাতীয়তার 'পিতামহ' নৌরজী সর্বজনশ্রদ্ধেয় ছিলেন, সুতরাং শেষপর্যন্ত 'গরম' নেতারা তাঁর সভাপতিত্ব মেনে নিতে বাধ্য হন। কংগ্রেসের তথাকথিত 'New Party' বা ন্যাশানালিস্ট উপদলের নেতৃত্বে ছিলেন লাল [লালা লাজপৎ রায়]-বাল [বালগঙ্গাধর টিলক]-পাল [বিপিনচন্দ্র পাল], অরবিন্দ ঘোষ ও তাঁদের সহযোগিবৃন্দ, কিন্তু লাজপৎ প্রথম থেকেই দ্বিধাগ্রস্ততার পরিচয় দিয়েছেন ও টিলক আপোষের মাধ্যমে ভিতর থেকে ক্ষমতা দখলের পক্ষপাতী ছিলেন, বিপিনচন্দ্রও অরবিন্দের মতো 'অতিবিপ্লবী' প্রকৃতির ছিলেন না—ফলে নিউ পার্টি রাজনৈতিক চাতুর্যের খেলায় অনেকটাই পিছিয়ে ছিল।

দাদাভাই নৌরজীর সভাপতিত্বে কলকাতায় কংগ্রেসের দ্বাবিংশ অধিবেশন হয় 26-28 Dec 1906 [বুধ-শুক্র ১১-১৩ পৌষ] দিনগুলিতে। বিষয়-নির্বাচনী কমিটিতেই বিরোধ অনিবার্য হয়ে পড়েছিল। স্বায়ত্তশাসন প্রস্তাবের ক্ষেত্রে মডারেট ও গরমপন্থী নেতাদের মতপার্থক্য দেখা দিলে দাদাভাই ভোটাভুটি হতে না দেওয়ায় গরমপন্থীরা সভাত্যাগ করেন। তিনি মূল বক্তৃতায় উভয় পক্ষকে সন্তুষ্ট করার চেষ্টা করেন "Self-Government" or *Swaraj* like that of the United Kingdom or the Colonies-এর দাবী জানিয়ে—তাঁর বক্তব্য তিনি ব্যাখ্যা করেননি, কিন্তু এর পরে 'স্বরাজ' শব্দটি বহুলভাবে ব্যবহৃত হতে থাকে। দ্বাবিংশ অধিবেশনে গৃহীত সতেরোটি প্রস্তাবের মধ্যে ছ'টি বাংলাদেশের রাজনীতির সঙ্গে সম্পর্কিত। বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ, বাংলাদেশের ক্ষেত্রে বয়কট আন্দোলনের যুক্তিযুক্ততা স্বীকার, বিদেশী দ্রব্যের পরিবর্তে 'even at some sacrifice' স্বদেশী দ্রব্যের ব্যবহার ও স্বদেশী শিল্পের উন্নয়নের জন্য দেশবাসীকে আহ্বান, ব্রিটিশ উপনিবেশগুলিতে প্রচলিত স্বায়ত্তশাসনের পদ্ধতি ভারতেও প্রবর্তিত করার দাবী, সরকারী শিক্ষানীতির প্রতিবাদ এবং সমগ্র দেশে জাতীয় শিক্ষা প্রবর্তনের ['National Education...—Literary, Scientific and Techincal—...on National lines and under National control'] আহ্বান এই প্রস্তাবগুলির অন্তর্ভুক্ত ছিল।

কংগ্রেস অধিবেশনের পাশাপাশি সর্বভারতীয় চরমপন্থী নেতা ও কর্মীদের একটি সম্মেলন হয় ব্যারিস্টার প্রমথনাথ মিত্রের সভাপতিত্বে। সভায় যথেষ্ট গোপনীয়তা অবলম্বন করা হয়েছিল, কিন্তু দেশের বিভিন্ন স্থানে বিক্ষিপ্তভাবে সংগঠিত গুপ্তসমিতিগুলির কর্মপদ্ধতির মধ্যে কোনো সংহতি গড়ে উঠেছিল কিনা সন্দেহ।

ঘটনাচক্রে বাংলার নেতৃবৃন্দ জাতীয় শিক্ষাপরিষদ গঠনের প্রস্তাব নিয়ে অগ্রসর হয়েছিলেন, কিন্তু বাস্তববুদ্ধি ও আন্তরিকতা কোনোটাই অধিকাংশ নেতার মধ্যে দেখা যায়নি। তাই তুচ্ছ কারণে এই আন্দোলন দ্বিধাবিভক্ত হয়ে পড়ে। সাহিত্য, বিজ্ঞান ও কারিগরী এই ত্রিমুখী শিক্ষার সংকল্প নিয়ে পরিষদ গঠিত হয়েছিল,—কিন্তু তারকনাথ পালিত, ডাঃ নীলরতন সরকার, মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী প্রমুখ নেতারা কারিগরী শিক্ষার উপরেই জোর দিতে চেয়েছিলেন। পরিষদের আর্থিক সংগতি ও দেশের প্রয়োজন বিবেচনা করলে তাঁদের যুক্তি অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু অন্যেরা তাঁদের যুক্তি মানেন নি। ফলে 1 Jun [শুক্র ১৮ জ্যৈষ্ঠ] দুটি জাতীয় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ইংরেজের আইন অনুসারে রেজেস্ট্রি করা হল—একটির নাম National Council of Education ও অপরটির নাম Society for the Promotion of Technical Education—দুটিরই সভাপতি রাসবিহারী ঘোষ! প্রসিদ্ধ ভূতাত্ত্বিক প্রমথনাথ বসুর অধ্যক্ষতায় Bengal Technical Institute-এর উদ্বোধন হল ৯ শ্রাবণ [বুধ 25 Jul] ৯২ আপার সার্কুলার রোডের বাড়িতে। ইন্টারমিডিয়েট [৩ বছর] ও সেকেণ্ডারি [৪ বছর] দুটি স্তরে বিভক্ত শিক্ষাক্রমে পদার্থবিদ্যা, রসায়ন, ইংরেজি ও গণিতের প্রাথমিক পাঠ-সহ মাতৃভাষার মাধ্যমে বিবিধ কারিগরী বিদ্যা শেখাবার ব্যবস্থা এখানে করা হয়েছিল। জাতীয় শিক্ষাপরিষদের উদ্বোধন হয় ২৯ শ্রাবণ [মঙ্গল 14 Aug] টাউনহলে রাসবিহারী ঘোষের সভাপতিত্বে। ১৯১/১ বউবাজার স্ট্রীটে অরবিন্দ ঘোষের অধ্যক্ষতায় Bengal National College and school পরের দিন থেকে কাজ শুরু করে—সুপারিন্টেন্ডেন্ট হন শিক্ষাবিদ সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। রবীন্দ্রনাথ তাঁর শিক্ষা ও প্রবণতা অনুযায়ী এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গেই। অধিকতর ঘনিষ্ঠ ছিলেন—বাংলা বিভাগের ডাইরেক্টর ছিলেন তিনি—1906 ও 1907-এর Fifth ও Seventh Standard পরীক্ষার জন্য চারটি আদর্শ প্রশ্ন তিনি রচনা করেন [দ্র অ-২।৭০০-১৫], এছাড়া Extension Lecture হিসেবে Comparative Literature বা বিশ্বসাহিত্য বিষয়ে তিনি চারটি প্রবন্ধ পাঠ করেন।

বিবিধ বিষয়ে শিক্ষার ব্যবস্থা করে এবং উৎসাহী ও যোগ্য শিক্ষকদের সমবেত করে জাতীয় শিক্ষাপরিষদের সূচনাটি ভালই হয়েছিল। কিন্তু কলকাতা ও মফস্বলের কোনো কলেজ ও পূর্বপ্রতিষ্ঠিত স্কুল পরিষদের অনুমোদনের জন্য আবেদন জানায়নি। আন্দোলনে যোগ দেওয়ার জন্য যে-সব ছাত্র সরকারী সাহায্যপ্রাপ্ত বিদ্যালয়গুলি থেকে বিতাড়িত হয়েছিল তাদের জন্য জাতীয় বিদ্যালয় অধিকাংশই গড়ে উঠেছিল মফস্বলে—কিন্তু কলকাতার কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষের ঔদাস্যে ও অবহেলায় বিদ্যালয়গুলি প্রথমাবধি অর্থ ও সুযোগসুবিধার অভাবে দুর্বলতায় ভুগেছে ও কয়েকবছর পরে মৃত্যুবরণ করেছে। বিদ্যালয়গুলির ছাত্র ও শিক্ষকেরা প্রধানত জাতীয় আন্দোলনের কর্মী ও স্বেচ্ছাসেবক ছিলেন—কিন্তু পরিষদের সচিব আশুতোষ চৌধুরী ও হীরেন্দ্রনাথ দত্ত 17 Dec 1908 [২ পৌষ ১৩১৫] একটি ফতোয়া জারি করে সাহিত্যসমিতি ব্যতীত অন্যান্য সমিতিতে ছাত্র-শিক্ষকদের যোগদান নিষিদ্ধ করেন, অনুমোদন ও অর্থসাহায্য প্রত্যাহারের হুমকিও দেওয়া হয়েছিল।[১০৭] পরিকল্পনা অনুযায়ী পাঠ্যপুস্তক রচিত হয়নি, উত্তীর্ণ ছাত্রদের উচ্চশিক্ষা ও কর্মনিয়োগের সুযোগও গড়ে ওঠেনি—ফলে প্রায় বাধ্য হয়েই 25 May 1910 [১১ জ্যৈষ্ঠ ১৩১৭] জাতীয় শিক্ষাপরিষদ বেঙ্গল টেকনিক্যাল ইনস্টিট্যুটের সঙ্গে মিলিত হয়ে Bengal National College and Technical Institute নাম গ্রহণ করে—৯২ আপার সার্কুলার রোড হয় মিলিত কর্মকেন্দ্র, যে বাড়ি ও জমি পরে [15 Jun 1912] তারকনাথ পালিত কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান কলেজ প্রতিষ্ঠার জন্য দান করেন। ড রাসবিহারী

ঘোষ-প্রদত্ত বিপুল পরিমাণ অর্থও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় লাভ করে [1913]। বস্তুত Mar 1906-এ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলার পদে ড আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের [1864-1924] নিয়োগ জাতীয় শিক্ষাপরিষদের ব্যর্থতার অন্যতম কারণ। কল্পনাশক্তি ও কর্মক্ষমতার সমবায়ে সরকারী বিশ্ববিদ্যালয়কেই তিনি প্রকৃত জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত করেন—এই শক্তি কলহপরায়ণ জাতীয় নেতাদের ছিল না।

স্বদেশী শিল্পপ্রতিষ্ঠান স্থাপন করা স্বদেশী আন্দোলনের অন্যতম লক্ষ্য ছিল। জনসাধারণের নিত্যব্যবহার্য বিবিধ দ্রব্যাদি প্রস্তুতের জন্য অনেকগুলি শিল্প প্রতিষ্ঠিত হয়। এদের মধ্যে প্রাধান্য পায় বস্ত্রশিল্প। নূতন ধরনের তাঁত ব্যবহার শেখানোর জন্য বাংলার বিভিন্ন জায়গায় শিক্ষাকেন্দ্র গড়ে তোলা হয়, রবীন্দ্রনাথ ও সুরেন্দ্রনাথের উৎসাহে কুষ্টিয়ার বয়নশিক্ষালয় তার মধ্যে অন্যতম। শিলাইদহ কাছারির ম্যানেজার বামাচরণ বসুর তত্ত্বাবধানে বহু শিক্ষার্থী এখানে শিক্ষা গ্রহণ করেন। কিন্তু এরও পরিণতি হয়েছিল হতাশাজনক। এ-সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ সজনীকান্ত দাসকে বলেন : 'কুষ্টিয়ায় প্রতিষ্ঠিত আমার তাঁতের কারখানার ইতিহাস যদি কোন দিন জানতে পাও তো দেখতে পাবে, ওই তাঁতের সুতো ধরে আমি সর্বনাশের দরজা পর্যন্ত পৌঁছতেও ইতস্তত করি নি। সুতো সরবরাহ করে যাঁরা আমাকে ঠকিয়েছিলেন, তাঁরা আমারই দেশের লোক; স্বদেশীয়ানাকে মূলধন করে বেশ গুছিয়ে নিয়েছিলেন তাঁরা।'[১০৮] শুধু রবীন্দ্রনাথকেই নয়, স্বদেশীয়ানাকে মূলধন করে অনেকেই প্রতারণার ব্যবসা খুলেছিলেন—স্বদেশী বস্ত্রের অভাবকে কাজে লাগিয়ে তাঁরা অতিরিক্ত মুনাফা অর্জন করেছেন, বিলিতি কাপড়ের ছাপ মুছে দিয়ে দেশীবস্ত্র বলে বিক্রয় করার চাতুর্যও দুর্লভ ছিল না। তবে এরই মধ্যে শ্রীরামপুরে বঙ্গলক্ষ্মী কটন মিলটি গড়ে উঠেছিল—১৬ শ্রাবণ [বুধ 1Aug] পরিচালকমণ্ডলী মিলটির অধিকার পান—1907-এর মধ্যভাগে ৫% লভ্যাংশ ঘোষিত হয়।

কার্জনের পদত্যাগ, ব্রিটিশ পার্লামেন্টের নির্বাচনে লিবারেলদের জয় ও ভারতসচিব পদে মর্লির নিয়োগ ভারতবাসীর, বিশেষ করে বাঙালির, মনে বঙ্গভঙ্গের প্রতিকারের আশা জাগিয়েছিল। কিন্তু ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদের স্বরূপ বোঝার ক্ষমতা তাঁদের ছিল না। ঢাকার নবাব সলিমুল্লাকে হাত করে কার্জন আগেই বাঙালি মুসলমানদের একাংশকে স্বদেশী আন্দোলন থেকে বিচ্ছিন্ন করতে সমর্থ হয়েছিলেন। ফুলার নবগঠিত প্রদেশের শাসনভার নিয়েই মুসলমানদের তাঁর সুয়োরানী বলে ঘোষণা করলেন। পূর্ববঙ্গে মুসলমানরা সংখ্যাগরিষ্ঠ হলেও প্রধান জমিদার ও ব্যবসায়ীরা ছিলেন হিন্দু, মুসলমানদের মধ্যে ব্যাপক দারিদ্র্য ও অশিক্ষার জন্য সরকারী চাকরি, শিক্ষকতা, ওকালতি-ব্যবসায় প্রভৃতিতেও হিন্দুপ্রাধান্য ছিল। সলিমুল্লার অনুচরেরা এই বৈষম্যের পূর্ণ সুযোগ নিয়েছে। কামার আলী আহমদ নামক এক ব্যক্তি 'ঢাকার নবাব বাহাদুর ছায়েবের সুবিচার' [Apr 1906] নামে ৩৬ পৃষ্ঠার একটি পুস্তিকা প্রকাশ করেন, মৈমনসিংহের 'চারুমিহির' পত্রিকাও হিন্দুবিদ্বেষ প্রচার করতে থাকে। এর অবধারিত ফল মৈমনসিংহতেই প্রথম দেখা দিয়েছে—10 May [বৃহ ২৭ বৈশাখ]-সংখ্যা বেঙ্গলী-তে খবর বেরুল : 'Mohomedan Disturbances in Mymensing. Hindoo Houses and Bazars looted'. বছরের শেষদিকে 5 Mar 1907 [মঙ্গল ২১ ফাল্গুন] আবার দাঙ্গা বাধে কুমিল্লা শহরে। এর আগের দিনই সলিমুল্লা সাঙ্গপাঙ্গ নিয়ে শহর পরিদর্শনে আসেন!

ফুলার স্বদেশী আন্দোলন দমন করার জন্য তাঁর চণ্ডনীতি চালিয়ে যেতে থাকেন। বরিশালে এবং অন্যত্র গুর্খা সৈন্য ও প্যুনিটিভ পুলিশ নিয়োগ করা হয়, ব্যয়ভার চাপিয়ে দেওয়া হয় প্রধানত হিন্দুদের উপর। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই অসম্মানজনক পরিস্থিতিতে ফুলারকে পদত্যাগ করতে হল। তিনি রাজনৈতিক কার্যকলাপে

যোগ দেবার অপরাধে সিরাজগঞ্জের কয়েকটি স্কুলের স্বীকৃতি প্রত্যাহারের জন্য কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিণ্ডিকেটকে অনুরোধ করেন। কিন্তু ভাইস-চ্যান্সেলার ড আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের প্রভাবে সিণ্ডিকেট সেই অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করে, ভারত সরকারও সিণ্ডিকেটের সিদ্ধান্ত সমর্থন করলে ফুলার 4 Aug [শনি ১৯ শ্রাবণ] পদত্যাগ করেন। অত্যাচারী ফুলারের পদত্যাগে বঙ্গবাসী উৎফুল্ল হলেও তাঁর উত্তরাধিকারী Lancelot Hare-এর আমলে দণ্ড ও ভেদনীতির বিশেষ কোনো প্রভেদ হয়নি।

মর্লি-মিন্টো ভেদনীতিকে দ্বিমুখী অস্ত্রে পরিণত করলেন। কংগ্রেসের ন্যাশানালিস্ট ও মডারেট দলের মধ্যে বিচ্ছেদ সম্পূর্ণ করার উদ্দেশ্যে মর্লি মডারেটদের সামনে শাসন-সংস্কারের টোপ ফেললেন। 15 Jun [১ আষাঢ়] এক পত্রে মর্লি কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক আইন পরিষদগুলিতে ভারতীয় সদস্যবৃদ্ধি ও ইণ্ডিয়া কাউন্সিলে একজন ভারতীয় সদস্য গ্রহণ সম্বন্ধে মিন্টোর অভিমত জানতে চান। মিন্টো প্রস্তাবটি সমর্থন করে একটি কমিটি গঠন করেন। মুসলিম নেতারাও প্রস্তাবিত শাসনতন্ত্রে নিজেদের অধিকার প্রতিষ্ঠায় সচেষ্ট হলেন। আলিগড়ের অ্যাংলো-ওরিয়েন্টাল কলেজের অধ্যক্ষ আর্চবোল্ড সিমলার কর্তাদের ইঙ্গিতে একটি চক্রান্তজাল গড়ে তুললেন। তাঁরই রচিত স্মারকলিপি নিয়ে স্বনির্বাচিত মুসলিম নেতারা আগা খানের নেতৃত্বে 1 Oct [সোম ১৫ আশ্বিন] সিমলায় মিন্টোর সঙ্গে দেখা করে সাম্প্রদায়িক স্বার্থরক্ষার প্রতিশ্রুতি লাভ করলেন। বড়দিনের ছুটিতে ঢাকায় মুসলিম এডুকেশনাল কনফারেন্সের বিংশ অধিবেশন হবার কথা ছিল। সলিমুল্লা 11 Nov একটি সর্বভারতীয় মুসলিম প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য ও গঠনপ্রণালীর খসড়া প্রচার করলেন। 30 Dec 1906 [রবি ১৫ পৌষ] ঢাকায় নবাব ভিকার উল-মুল্‌কের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত একটি বিশেষ সভায় All India Muslim League নামে একটি প্রতিষ্ঠান গড়ার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। একচল্লিশ বছরের চেষ্টায় এই প্রতিষ্ঠান দ্বিতীয়বার বঙ্গভঙ্গ ও ভারতবিভাগ করতে সমর্থ হয়েছিল।

7 Aug 1906 [মঙ্গল ২২ শ্রাবণ] সার্কুলার রোডের প্রস্তাবিত ফেডারেশন হলের মাঠে বয়কট ঘোষণার প্রথম বার্ষিকী উপলক্ষে সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে একটি বিরাট সভা হয়। অ্যান্টি-সার্কুলার সোসাইটির উদ্যোগে প্রস্তুত ত্রিবর্ণ-রঞ্জিত জাতীয় পতাকা এই সভায় প্রথম উত্তোলিত হয়।

এই বৎসর বিজয়াদশমী ছিল ১১ আশ্বিন [বৃহ 27 Sep], কিন্তু রাজনৈতিকভাবে 'স্বদেশী সংহতি'র উদ্যোগে পণ্ডিত রসিকমোহন চক্রবর্তীর সভাপতিত্বে বিডন স্কোয়ারে 'বিজয়াসম্মিলনী অনুষ্ঠিত হয় ১৬ আশ্বিন [মঙ্গল 2 Oct]। মতিলাল ঘোষ এই সভায় চরকা ব্যবহারের জন্য জনগণকে উৎসাহিত করেন। 'Anath Bandhu Guha of Mymensingh…suggested that unmarried boys should make it a point to marry those girls only who know how to work on *charka*'.[১০৯]

৩০ আশ্বিন [মঙ্গল 16 Oct] উপযুক্ত সমারোহে রাখীবন্ধন উৎসব পালিত হয়। এবারে 'রাখী-বন্ধন' বিজ্ঞপ্তিতে [দ্র *The Bengalee*, 7 Oct] হিন্দু-মুসলমান মিলনের উপর গুরুত্ব প্রদান করা হয় :

> যে দিনে জন্মভূমির অঙ্গচ্ছেদ হইয়াছিল আবার সেই দিন আসিতেছে। ৩০শে আশ্বিন তারিখে বঙ্গবাসীর দেহে নবজীবনের সঞ্চার হইয়াছে। বাঙ্গালী মৃত্যুর মধ্যে অমৃতের সন্ধান পাইয়াছে। সে দিন—
>
> ১। সমস্ত বাঙ্গালী নরনারী, হিন্দু মুসলমান, খৃষ্টান কাহারও রন্ধনশালায় অগ্নি জ্বলিবে না।···
>
> ৩। বঙ্গের প্রত্যেক গ্রামে ও নগরে, হিন্দু, মুসলমান ও খৃষ্টান সকলে একত্র হইয়া মহাব্রত গ্রহণ করিবেন। (ক) বিদেশী দ্রব্য বর্জ্জন। (খ) স্বদেশী দ্রব্য ব্যবহার। (গ) স্বদেশী দ্রব্য উৎপাদনে আপন আপন শক্তি ও অর্থ নিয়োগ (যথা, কল, কারখানা স্থাপন, গৃহে গৃহে চরকার প্রচলন ইত্যাদি।)

৪। সে দিন সমস্ত বঙ্গবাসী স্নানান্তে পরস্পরের হস্তে "রাখী বন্ধন" করিবেন। এবং চিরদিন সুখে দুঃখে, পূর্ব্বে ও পশ্চিমে বঙ্গবাসী সমুদয় হিন্দু, মুসলমান ও খৃষ্টান পরস্পরের সহায়তা করিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইবেন।

বিজ্ঞপ্তিটির চৌদ্দজন স্বাক্ষরকারীর মধ্যে তিনজন ছিলেন মুসলমান—গোলাম মওলা চৌধুরী, এ. এইচ. গজনভী এবং এ. রসুল। বঙ্গলক্ষ্মী কটন মিলের কর্তপক্ষ বিশহাজার রাখী বিতরণ করেন। বিকেলে প্রস্তাবিত ফেডারেশন হলের মাঠে অনুষ্ঠিত জনসভায় সুরেন্দ্রনাথের প্রস্তাবে মৌলবী মহম্মদ ইউসুফ খান বাহাদুর সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। কিন্তু এইদিনই ঢাকায় প্রভিনশ্যাল মহমেডান আসোসিয়েশনের উদ্যোগে পার্টিশন-দিবস পালিত হয়।

ভাগলপুরের ব্যরিস্টার দীপনারায়ণ সিং-এর সভাপতিত্বে বহরমপুরে বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় ১৫-১৭ চৈত্র [শুক্র-রবি 29-31 Mar 1907] ইস্টারের ছুটির সময়। সম্মেলনের স্থান নির্বাচন থেকে আরম্ভ করে প্রায় সকল বিষয়েই এই সম্মেলনে মডারেট ও ন্যাশনালিস্ট ['নিউ পার্টি'] দলের মধ্যে বিরোধ দেখা দেয়। ব্যারিস্টার আবদুল রসুল পার্টিশান প্রস্তাবের পক্ষে বলতে গিয়ে সরাসরি অভিযোগ করেন, পশ্চিমবঙ্গের নেতারা পূর্ববঙ্গের ব্যাপারে সহানুভূতিশীল নন—পূর্ববঙ্গ যেখানে কাউন্সিলে সদস্য পাঠানোর বিরোধিতা করেছে পশ্চিমবঙ্গ সেখানে দ্বিধা করেনি, পশ্চিমবঙ্গ অম্লানবদনে ঘোটলাটকে সংবর্ধিত করেছে আর পূর্ববঙ্গ সেরকম কিছু করতে গেলে চেঁচামেচি শুরু করে দিয়েছে। পণ্ডিত গীস্পতি কাব্যতীর্থ বয়কট ও স্বদেশী প্রস্তাব উত্থাপনের সময়ে কাউন্সিলে সদস্য প্রেরণ সমর্থন করতে গেলে শ্রোতারা তাঁকে চুপ করিয়ে দেয়।[১১০] সুরাটের যজ্ঞভঙ্গের ভূমিকা কিভাবে রচিত হচ্ছিল এই ঘটনাবলীই তার প্রমাণ, কিন্তু আত্মদরসর্বস্ব নেতারা তার প্রতিকারের কোনো চেষ্টাই করেননি।

প্রাসঙ্গিক তথ্য : ৪

জাতীয় শিক্ষাপরিষদের কার্যক্রমের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের ঘনিষ্ঠ যোগ ছিল। ইংলণ্ডের জীবনপরিবেশের উপযোগী শিক্ষাপদ্ধতি ভারতের মাটিতে রোপণ করলে তা উৎকৃষ্ট ফল দেবে না এ বিষয়ে তিনি বহুদিন ধরে সতর্কবাণী উচ্চারণ করছিলেন; জাতীয় শিক্ষা দেশের ঐতিহ্য, আবহাওয়া ও মানসপ্রকৃতির অনুকূল হয়ে গড়ে উঠবে এইটিই তিনি চেয়েছিলেন। কিন্তু অন্তহীন তর্কবিতর্ক ও গৃহবিচ্ছেদের মধ্য দিয়ে যে পরিষদ গড়ে উঠল বাইরে থেকে তার সঙ্গে যোগ রাখলেও অন্তরের মধ্যে তিনি তার প্রতি সমর্থন অনুভব করেননি। ফলে পরিষদের অন্যতম পরিচালক [Director of Studies] হয়েও তিনি ব্রহ্মচর্যাশ্রমকে অনুমোদিত [affiliated] জাতীয় বিদ্যালয়ে পরিণত করলেন না। ব্রহ্মচর্যাশ্রম তাঁর কাছে লাভজনক প্রতিষ্ঠান ছিল না, সুতরাং সুরেন্দ্রনাথ-প্রমুখ স্কুলকলেজের স্বত্বাধিকারীর দৃষ্টিভঙ্গিতে তিনি বিষয়টিকে দেখেননি। তাঁর সমস্যা ছিল অন্যরকম, মনুষ্যত্বের সর্বাঙ্গীন যে চর্চাকে তিনি ব্রহ্মচর্যাশ্রমের আদর্শরূপে স্থাপন করেছিলেন জাতীয় শিক্ষাপরিষদের পাঠক্রমে তার প্রতিফলন তিনি দেখতে পাননি। তাই অন্তত প্রাথমিক শিক্ষায় ব্রহ্মচর্যাশ্রম কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠক্রম অনুসরণ না করলেও আর একটি জাতীয় বিদ্যালয়েও [National School] পরিণত হল না।

অথচ জাতীয় শিক্ষাপরিষদের পরীক্ষায় তিনি কয়েকজন ছাত্রকে পাঠাবার কথা ভেবেছিলেন। ২০ জ্যৈষ্ঠ [3 Jun] তিনি সুবোধচন্দ্র মজুমদারকে লেখেন : 'অরুণ[চন্দ্র সেন]কে দীনেশবাবু এক সপ্তাহের মত চান—অরুণই শুনচি আসতে চেয়েছে। অতএব পাঠিয়ে দেওয়াই ভাল—কিন্তু তাহলে তাকে জাতীয় শিক্ষাপরিষদের পরীক্ষায় উপস্থিত হতে দেওয়া চলবে না। দেখচি কেবল উপেন [চন্দ্র ভট্টাচার্য] আর সুজিত [কুমার চক্রবর্ত্তী]কে প্রীক্ষায় পাঠান সঙ্গত হবে।'[১১১] কিন্তু এঁরা তিনজনই 1907-এ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এন্ট্রান্স পরীক্ষা দিয়ে উত্তীর্ণ হয়েছিলেন।

রথীন্দ্রনাথ-সন্তোষচন্দ্রের পর ব্রহ্মচর্যাশ্রম থেকে প্রেরিত দ্বিতীয় দলে 1907-এ এন্ট্রান্স পরীক্ষা দিয়েছিলেন উল্লিখিত তিনজন ছাড়া আরও দু'জন—অরবিন্দমোহন বসু ও যোগেন্দ্রলাল গঙ্গোপাধ্যায়। এঁরা প্রাইভেট পরীক্ষার্থী হিসেবে হুগলি কেন্দ্র থেকে পরীক্ষা দেন। ২০-২৩ ফাল্গুন [সোম-বৃহ 4-7 Mar] চারদিন পরীক্ষা হয়। এঁদের মধ্যে যোগেন্দ্রলাল সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের ভরসা ছিল না—তাঁর আশঙ্কাই সত্য হয়। সুজিতকুমার চক্রবর্তী ও উপেন্দ্রচন্দ্র ভট্টাচার্য প্রথম বিভাগে এবং অরবিন্দমোহন বসু ও অরুণচন্দ্র সেন দ্বিতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ হন।

অরবিন্দমোহনকে এন্ট্রান্সের জন্য তৈরি করে দেওয়ায় কৃতজ্ঞ জগদীশচন্দ্র ব্রহ্মচর্যাশ্রমকে ৩০০ টাকার একটি চেক উপহার দেন [৪ চৈত্র : 14 Mar]। যতীন্দ্রনাথ পালিতের পড়া-থাকা উপলক্ষ করে তারকনাথ পালিত মাঝেমাঝে বিদ্যালয়কে সাহায্য করছিলেন—১৭ বৈশাখ [30 Apr] তিনি ১৩০ টাকা দেন, ১ ভাদ্র [17 Aug] তিনি আরও ৫০০ টাকা সাহায্য করেন। সত্যপ্রসাদ 'বোলপুর ব্রহ্মবিদ্যালয় গৃহ নির্ম্মাণ সাহায্য' উপলক্ষে ৫০ টাকা দেন ১ ফাল্গুন [13 Feb]। এরূপ সাহায্য হয়তো আরও অনেকেই করতেন। ত্রিপুরার মহারাজের মাসিক ও বার্ষিক সাহায্য তো ছিল-ই।

সাহায্যের প্রয়োজনও ছিল। বন্ধুবান্ধব ও আত্মীয়স্বজনের অনেকেই তাঁদের পুত্রদের ব্রহ্মচর্যাশ্রমে পাঠাচ্ছিলেন। কবি অক্ষয়কুমার বড়াল তাঁর পুত্র অময়কুমারকে ১৮ মাঘ [1 Feb 1907] ভর্তি করেন। যাঁরা জাতীয় বিদ্যালয়ে ছেলেদের পাঠিয়ে সরকারের রোষভাজন হতে চাইছিলেন না, অথচ জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ হয়ে সরকারী সাহায্যপ্রাপ্ত বিদ্যালয়কেও বর্জন করতে চেয়েছেন, তাঁরা অনেকেই ব্রহ্মচর্যাশ্রমে পুত্রদের প্রেরণ করেছেন। ২ চৈত্র [শনি 16 Mar] রবীন্দ্রনাথ মীরা দেবীকে লিখছেন : 'আজকাল আমাদের বিদ্যালয়ে ছাত্র আর ধরচে না—৫৫ জন ছেলে হয়েছে—মাষ্টারও অনেকগুলি—কাকে কোথায় রাখি তার ঠিক নেই—দোতলার ঘর তৈরি হয়ে গেছে—সেখানে ২৩ জন ছেলে আছে—তবু ভাল করে ধরচে [না]—ছেলে বোধ হয় শীঘ্রই আরো অনেকগুলি আসবে।'[১১২] কিছুদিনের মধ্যেই ছাত্রসংখ্যা আশিতে পৌঁছে যায়।

রবীন্দ্রনাথ যাকে 'দোতলার ঘর' বলে উল্লেখ করেছেন, সেটি তৈরি হয়েছিল বলেন্দ্রনাথ-নির্মিত মূল ব্রহ্মবিদ্যালয়গৃহের উপরে—খড়ের চাল দেওয়া ইঁটের পাকা গাঁথুনি—পরবর্তীকালের ছাত্রেরা এখানে বসবাসকারী ছাত্রদের 'উপরতলার ছেলেরা' বলে উল্লেখ করেছেন।

ছাত্রসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে নূতন শিক্ষক নিয়োগ করতে হয়েছে। ভূপেন্দ্রনাথ সান্যাল অসুস্থতার জন্য দীর্ঘকাল অনুপস্থিত ছিলেন। সম্ভবত তাঁর শূন্যস্থান পূরণের জন্য জ্ঞানেন্দ্রনারায়ণ রায়কে নিয়োগ করা হয়। সুবোধচন্দ্র মজুমদারকে লেখা রবীন্দ্রনাথের ২১ জ্যৈষ্ঠের [4 Jun] পত্র থেকে জানা যায় সেই সময়ে সুবোধচন্দ্র,

অজিতকুমার, জ্ঞানেন্দ্রনারায়ণ, সত্যেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য ও অক্ষয়কুমার বসু শিক্ষকতা করছেন—অন্য শিক্ষকেরা ছিলেন জগদানন্দ, বিধুশেখর, হরিচরণ ও নগেন্দ্র আইচ। এতজন শিক্ষক থাকা সত্ত্বেও রবীন্দ্রনাথ ২৭ কার্তিক [13 Nov] পুনরায় মনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়কে আহ্বান জানিয়েছেন : 'যদি এমন হয় যে সম্প্রতি আপনি বেকারপ্রায় অবস্থাতেই আছেন তবে পরীক্ষাকাল পর্য্যন্ত এখানকার এন্ট্রেন্স ক্লাসের কর্ণধার পদ আপনি অধিকার করিতে পারিবেন কি? ···অগ্রহায়ণ মাসের প্রথম হইতেই কি আপনার আশ্রয় পাওয়া যাইবে?'[১১৩] পাঁচজন এন্ট্রান্স পরীক্ষার্থী ছিলেন—কিন্তু মনোরঞ্জনবাবুর সাহায্য পাওয়া যায়নি। এন্ট্রান্স ক্লাসে না হলেও অন্য শ্রেণীতে রবীন্দ্রনাথকেও যে শিক্ষকতা করতে হয়েছে সেই খবর পাওয়া যায় মীরা দেবীকে লেখা ২ চৈত্রের [16 Mar] পূর্বোল্লিখিত চিঠিতে : 'আমি যে কিছুকাল আমাদের বিদ্যালয়ে একটা ক্লাসে ইংরিজি পড়াচ্ছিলুম—দুজন নতুন মাষ্টার আসাতে আবার ছুটি পাওয়া গেছে।' এই দু'জন 'নতুন মাষ্টার' হলেন যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ও বঙ্কিমচন্দ্র রায় [1880-1956]। সুবোধচন্দ্র পুজোর আগে বিদ্যালয়ের কর্ম ত্যাগ করে বিরাহিমপুর পরগণার অ্যাসিস্ট্যান্ট সাব ম্যানেজারের পদ গ্রহণ করেন।

দু'জন জাপানী শিক্ষকও ছিলেন—দারুশিল্পী কুসুমতো-সান্ ও জুজুৎসু-শিক্ষক জে. স্যানো [সানো-সান্]। এঁরা বিদ্যালয়ে থাকার সময়ে বাংলা শিখতেন ও জাপানী ভাষা শিক্ষা দিতেন আগ্রহী বালকদের। ৫ জ্যৈষ্ঠ শনিবার [19 May]রথীন্দ্রনাথ টোকিয়ো থেকে শমীন্দ্রনাথকে লিখছেন : 'তোমাদের জাপানী পড়া এগোচ্ছে শুনে খুশি হলুম। ···এখন কি একটু২ কথা বলতে পার? শুধু পড়লে হবে না, নিজেদের মধ্যে ও সানো সানের সঙ্গে খুব কথা বলতে চেষ্টা করবে।'[১১৪] কুসুমতো পরে বেঙ্গল টেকনিক্যাল স্কুলে যোগদান করেন। তারকনাথ পালিত সানো-সান্‌কেও সেখানে পেতে আগ্রহী ছিলেন।

সুধীরঞ্জন দাস ১৩১১ বঙ্গাব্দে ব্রহ্মবিদ্যালয়ে ভর্তি হয়েছিলেন, বর্তমান বৎসর গ্রীষ্মের ছুটিতে বাড়ি গিয়ে ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত হয়ে এক বছরের বেশি কলকাতাতেই থেকে যান। দু'বছর বিদ্যালয়ে অবস্থানের সময়ে তিনি যে-সমস্ত শিক্ষক ও ছাত্রের সান্নিধ্যে এসেছিলেন, তাঁদের নাম ও পরিচয় তিনি বিশ্বস্তভাবে বর্ণনা করেছেন 'আমাদের শান্তিনিকেতন' [পৃ ১৩-১৫] গ্রন্থে। সত্যরঞ্জন বসু 'আশ্রম-স্মৃতি' প্রবন্ধেও [দ্র রবীন্দ্রনাথ ও ত্রিপুরা। ২৪০-৫৩] এই পর্বের ছাত্র-শিক্ষকদের একটি সজীব চিত্র উপহার দিয়েছেন। জাপানী ছাত্র হোরি-র পরে এঁদের বর্ণনায় দু'জন অবাঙালি ছাত্রের সংবাদ পাওয়া যায়—নারায়ণ কাশীনাথ দেবল ও নরভূপ—এঁরা উভয়েই বিদ্যালয়ে দীর্ঘকাল কাটিয়েছিলেন। কিন্তু পুণ্যবজ্র নামে দার্জিলিং থেকে আগত একজন অস্থায়ী অবাঙালী ছাত্রের খবর পাওয়া যায়—সমবয়সী এই সহপাঠীর সঙ্গে শমীন্দ্রনাথের খুব অন্তরঙ্গতা গড়ে উঠেছিল। রথীন্দ্রনাথ ২০ শ্রাবণ [5 Aug] আমেরিকা থেকে রাজলক্ষ্মী দেবীকে লিখেছেন : 'পুণ্যবজ্রা দার্জিলিঙে গিয়ে শমীর বোধহয় কিছু অসুবিধে হয়েছে। সে কি ফিরে এসেছে?'[১১৫] পুণ্যবজ্র ফিরে এসেছিলেন কিন্তু স্থায়ী হননি, রবীন্দ্রনাথ 30 Dec [১৫ পৌষ] মীরা দেবীকে লেখেন : 'Yesterday Punya-bajra went home with his father and he is not likely to come back. I only hope that the poor boy's education will not be closed in such abrupt manner.'[১১৬]

শান্তিনিকেতন-ব্রহ্মচর্যাশ্রম প্রথম থেকেই নারীবর্জিত ছিল না—ক্রমে ক্রমে সেখানে মেয়েদের সংখ্যাও বর্ধিত হয়েছে। রাজলক্ষ্মী দেবী, দ্বিপেন্দ্রনাথের স্ত্রী 'বড়োমা' হেমলতা দেবী, দিনেন্দ্রনাথের স্ত্রী কমলা দেবী,

সুবোধচন্দ্র মজুমদারের স্ত্রী ও কন্যা লতিকা, মীরা দেবী, জগদানন্দের কন্যা দুর্গেশনন্দিনী তরুলতা ও পারুল, সুধীন্দ্রনাথের কন্যা রমা দেবী প্রভৃতি শান্তিনিকেতনে বসবাস করতে শুরু করেছেন। তাই এঁদের জন্য নিয়মিত বিদ্যালয়-শিক্ষার আয়োজন না হলেও অবসর সময়ে এঁদের পড়াবার জন্য রবীন্দ্রনাথ শিক্ষকদের নির্দেশ দিয়েছেন। মীরা দেবীকে পড়াবার কথা অনেকগুলি চিঠিতে আছে। ২১ জ্যৈষ্ঠ [4 Jun] সুবোধচন্দ্রকে লিখেছেন : 'মীরার Sohrab Rustam পড়া শেষ হইলে তাহাকে টেনিসনের Enoch Arden পড়াইতে শুরু করিয়ো।'[১১৭] ম্যাথু আর্নল্ডের কাব্যটি পড়াবার জন্য রবীন্দ্রনাথ নিজে একটি পাঠচর্চার পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করেছিলেন, সেটি রবীন্দ্রবীক্ষা ১২ [১৩৯১, পৃ ৩৯-৭৩] খণ্ডে মুদ্রিত হয়েছে। অন্য মেয়েদেরও সুবোধচন্দ্র পড়াতেন তার উল্লেখ আছে ২০ জ্যৈষ্ঠের পত্রে: 'তোমার নূতন ছাত্রীদের পড়া এগচ্চে?' হেমলতা দেবীকে অজিতকুমার ও তাঁর অনুপস্থিতিতে রবীন্দ্রনাথ নিজেই পড়াতেন সেকথা আছে মীরা দেবীকে লেখা ৮ কার্তিকের [25 Oct] চিঠিতে : 'দুপুরবেলা হেমলতা একঘণ্টা পড়তে আসেন—তাঁর মাষ্টার অজিত ছুটি নিয়ে দিল্লি বেড়াতে গেছে।'[১১৮] ১১ শ্রাবণ [27 Jul] তিনি বালবিধবা লাবণ্যলেখাকে [চক্রবর্তী] শন্তিনিকেতনে আশ্রয় নেবার জন্য আহ্বান জানিয়েছিলেন। এইভাবেই বছর-দুয়েকের মধ্যে একটি ক্ষণস্থায়ী বালিকা-বিদ্যালয়ও শান্তিনিকেতনে গড়ে ওঠে। অবস্থার চাপে যথাযথ পূর্বপ্রস্তুতি ছাড়াই এই বালিকাবিভাগটি গজিয়ে উঠেছিল, সেইজন্য মূল বিদ্যালয়ের স্বার্থে আগাছা বিবেচনা করে শীঘ্রই সেটিকে উৎপাটিত করতে হয়।

শান্তিনিকেতন মন্দির ও অতিথিশালাকে ঘিরে একটি সুন্দর বাগান বহুদিন আগেই গড়ে উঠেছিল। রাজলক্ষ্মী দেবী শমী ও মীরাকে নিয়ে 'নতুন বাড়ি'তে বসবাস শুরু করার পর তিনিও মহোৎসাহে ভৃত্যদের সহায়তায় একটি তরকারিবাগান গড়ে তোলেন। রবীন্দ্রনাথ সম্ভবত ৪ কার্তিক [21 Oct] মীরা দেবীকে লিখেছেন : 'পিসিমা বাগান করতে খুব উঠে পড়ে লেগে গেছেন। আমি তাঁকে নৈনিতাল আলুর এবং অন্যান্য অনেকরকম বীজ আনিয়ে দিয়েছি'; ৮ কার্তিকের চিঠিতে আছে : 'ভাতু সাম্‌নে বাগানে মাটি খুঁড়ে আলুর ক্ষেত তৈরি করচে, পিসিমা তারই তত্ত্বাবধানে নিযুক্ত'। রাজলক্ষ্মী দেবী তাঁর উদ্বৃত্ত উৎপাদন সুদূর মজঃফরপুরেও প্রেরণ করেছেন; এ-সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের 13 Nov [২৭ কার্তিক]-এর চিঠি : 'I am glad to hear that you have received the vagetables in good condition. You know Pisima is very proud of her brinjals—she is sending them to everybody she knows...Seeds of various kinds of vegetables and flowers have come today by post from the Mussoorie hills. Pisima is busily engaged in preparing new beds for their reception.'[১১৯]

শুধু পারিবারিক বাগান নয়, রবীন্দ্রনাথ ছাত্রদেরও উদ্যানচর্চায় উৎসাহ দিতেন। সুধীরঞ্জন দাস লিখেছেন : 'একটু একটু জমি এক-একজনকে বিলি করা হত। কেউ-বা করত অড়হর ডাল, কেউবা করত চিনেবাদামের চাষ, আবার কেউ লাগাত ঢেঁড়স। বড়ো কুয়োটার কাছ থেকে নালা কেটে স্নানের জলের ধারা এনে ক্ষেতে জল দেওয়া হত। কেউ যদি জমি পেয়ে তার যত্ন না করত বা তার জমিতে আগাছা জন্মাত তবে তার জমি বাজেয়াপ্ত করে যার জমিতে খুব ভালো চাষ হত তাকে দেওয়া হত।'[১২০] ব্যবহারিক শিক্ষার সঙ্গে কোদাল-চালানোর মত শরীরচর্চা এর সঙ্গে যুক্ত থাকত বলে রবীন্দ্রনাথের উৎসাহ ছিল বেশি। ২৬ বৈশাখ [9 May]'বোলপুর বাগানে জল দেওয়া পাম্প ৬৩্' এই হিসাবটি তাঁর উৎসাহের আর্থিক দিকটিও উদ্‌ঘাটিত

করে। শমীন্দ্রনাথ-প্রমুখ ছাত্রদের উৎসাহে ভাঁটা পড়ার কথাও লিখেছেন রবীন্দ্রনাথ ২১ ফাল্গুন [5 Mar]: 'শমীদের বাগানের কি আর সেদিন আছে? অনেকদিন হল ওরা বাগান করা ছেড়েছুড়ে দিয়েছে। গোটা দুইচার ওলকপি গাজর হয়েছিল সে সমস্ত হজম হয়েছে এখন আর গাছে জল দেবার হুড়োহুড়ি নেই।' মীরা দেবীর বাগানের শখ ছিল, সেইজন্য তাঁকেই রবীন্দ্রনাথ এত বিস্তৃত করে এইসব সংবাদ দিয়েছেন।

শমীন্দ্রনাথ ব্রহ্মচর্যাশ্রমে ঋতু-উৎসবের প্রবর্তন করেন বলে আমাদের জানিয়েছেন রবীন্দ্রজীবনী-কার : "১৩১৩ সালের শ্রীপঞ্চমীর দিন (১৭ ফেব্রুয়ারি ১৯০৭) তাহার উদ্‌যোগে এই ঋতু-উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। শমীন্দ্রনাথ এবং আরো দুইজন ছাত্র বসন্ত সাজে, একজন সাজে বর্ষা; আর তিনজন হয় শরৎ। 'বসন্তে অনেক ফুল হয় বলিয়া যাহারা বসন্ত সাজিয়াছিল তাহারা ফুলের মুকুট মাথায় দিয়া, হাতে ফুলের সাজি লইয়া স্টেজে আসে।' "রীতিমত stage করে, সাজ করে হয়েছিল।" উৎসবটি হয় 'হল্' [আদি কুটির] ঘরে। ছাত্ররা সংস্কৃত, ইংরেজি, বাংলা কাব্য হইতে ঋতুস্তব আবৃত্তি করে। শমীন্দ্রনাথ 'একি লাবণ্যে পূর্ণ প্রাণ, প্রাণেশ হে' গানটি করেন।"[১২১] তথ্যগুলি সমকালীন ছাত্র নরেন্দ্রনাথ খাঁ ও নির্মলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মারফৎ অচ্যুত সরকারকে লিখিত শমীন্দ্রনাথের পত্রাংশ থেকে পেয়েছেন বলে রবীন্দ্রজীবনী-কার উল্লেখ করেছেন। কিন্তু এই বৎসর সরস্বতীপূজা হয় ৪ মাঘ [শুক্র 18 Jan] —রবীন্দ্রনাথ তখন 'সারস্বত সম্মিলন' উপলক্ষে কলকাতায়। 17 Feb [রবি ৫ ফাল্গুন] রবীন্দ্রনাথ, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ জ্ঞানদানন্দিনী দেবী প্রভৃতি অনেকে শান্তিনিকেতনে উপস্থিত ছিলেন—জ্যোতিরিন্দ্রনাথ এইদিন শমীন্দ্রনাথের একটি ছবি আঁকেন।

রবীন্দ্রনাথের দ্বিতল বাড়ি 'দেহলি' সম্পূর্ণ হয়ে গিয়েছিল এই বছরেই। তিনি 'শুক্রবার' [১৮ জ্যৈষ্ঠ : 1 Jun] সুবোধচন্দ্রকে লিখছেন : 'আমার বাসস্থানটি এতদিনে বোধ হয় অনেকটা সমাপ্তির দিকে গেছে—কিন্তু আশা করি কোনো একদিন ঝড়ে তার খড় কুটো সমস্ত উড়িয়ে বাড়িটাকে নেড়া না করে দেয়। লোহার শিক দিয়ে এঁটে দেওয়াই ভাল।'[১২২] এই বাড়িতে বসবাসের একটি ভাষাচিত্র তিনি এঁকে পাঠিয়েছেন মীরা দেবীকে ৮ কার্তিক [বৃহ 25 Oct] : 'আমি সকালে আমার ঘরের উত্তরের বারান্দায় ছোট টেবিল পেতে লেখাপড়া করি। বেলা দশটা পর্য্যন্ত এইরকমে কাটে।···সন্ধ্যাবেলায় আবার আমার ঘরটাতে বসে পড়াশুনা করি। এখন সকালে আমার বারান্দায় বসে তোকে লিখ্‌চি—অল্প অল্প শীতের হাওয়া দিচ্চে—পায়ের কাছে রোদ এসে পড়েছে—কাঠবিড়ালী নির্ভয়ে আমার সামনে দিয়ে ল্যাজ্ তুলে ছুট্‌চে,...শাস্ত্রীর ঘরে ছেলেরা সংস্কৃত পড়চে এখানে থেকে শোনা যাচ্চে। বৃহস্পতিবার, হাটের লোক রাস্তায় কলরব করতে করতে চল্‌চে।'

উল্লেখপঞ্জী

১ দ্বিজেন্দ্রলাল [২য় সং]। ৪৪১-৪২

২ লাঞ্ছিতের সম্মান [১৩১৩]। ৬২-৬৩

৩ রবীন্দ্রনাথ ও ত্রিপুরা। ৩৫০

৪ চিঠিপত্র ১০।৩৪, পত্র ৩৩

৫ বি. ভা. প., মাঘ-চৈত্র ১৩৭৩।১৮৭

৬ স্মৃতি। ৫৪

৭দ্র Beni Madhab Das: '*Pilgrimage through Prayer*', p. 65

৮ বি. ভা, প., কার্তিক-পৌষ ১৩৫৮।৬১-৬২

৯ রবীন্দ্রভবনে রক্ষিত মূল পত্র

১০ ঐ

১১ *Pilgrimage through Prayer*, pp. 51-52

১২ গিরিজাশঙ্কর রায়চৌধুরী : 'শ্রীঅরবিন্দ ও বাঙ্গলায়, স্বদেশী যুগ' [1965]। ৪৫২

১৩ দেশ, শারদীয় ১৩৪৯।৪০২ পত্র ৪

১৪ রবীন্দ্রভবনে রক্ষিত মূল পত্র

১৫ কথাসাহিত্য, ফাল্গুন ১৩৬৭। ৫৬৫

১৬ ঐ, পৌষ ১৩৬৭।৩৬৯

১৭ ঐ, ফাল্গুন ১৩৬৮।১০৪৯-৫০

১৮ দেশ, শারদীয়া ১৩৯৬।৩৫

১৯ ভাণ্ডার, জ্যৈষ্ঠ। ১১৪

২০ চিঠিপত্র ১০।৩৬, পত্র ৩৪

২১ কথাসাহিত্য, পৌষ ১৩৬৭।৩৭১

২২ রবীন্দ্রনাথ ও ত্রিপুরা। ৩৫০-৫১

২৩ কথাসাহিত্য, পৌষ ১৩৬৭।৩৭০-৭১

২৪ দেশ, সাহিত্য ১৩৭২।৩১-৩২

২৫ বি. ভা, প., মাঘ-চৈত্র ১৩৭৩।১৮৭

২৬ চিঠিপত্র ৬। ৮৬-৮৭, পত্র ৪

২৭ রবীন্দ্রভবনে রক্ষিত প্রতিলিপি

২৮ দ্র *The Bengalee*, 7 Aug 1906

২৯ রবীন্দ্রভবনে রক্ষিত মূল পত্র

৩০ রবীন্দ্রভবনে রক্ষিত প্রতিলিপি

৩১ ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় : 'রবীন্দ্র-গ্রন্থ-পরিচয়' [১৩৫০]। ২১

৩১ক ড চিত্রা দেব : অনালোচিত রবীন্দ্র-প্রসঙ্গ [১৩৯২]। ৬৪-৬৫

৩২ বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের কার্যবিবরণী। এয়োদশ বর্ষ

৩৩ *The Bengalee*, 15 Sep 1906

৩৪ রবীন্দ্রভবনে রক্ষিত মূল পত্র

৩৫ ঐ

৩৬ স্মৃতি। ৫৫

৩৭ দেশ, সাহিত্য ১৩৭১।২০-২১, পত্র ৫

৩৮ চিঠিপত্র ৬।৮৯, পত্র ৫

৩৯ রবীন্দ্রভবনে রক্ষিত প্রতিলিপি

৪০ ঐ

৪১ ঐ

৪২ দেশ, শারদীয়া ১৩৪৯।৪০২, পত্র ৫

৪৩ ‘রবীন্দ্র প্রসঙ্গ’ : ঐ। ৪৩০

৪৪ চিঠিপত্র ১০।৩৭, পত্র ৩৫

৪৫ স্মৃতি। ৫৮

৪৬ দ্বিজেন্দ্রলাল। ৫৬৬-৬৮

৪৭ দ্র রবীন্দ্রজীবনী ২।৩৭৬

৪৮ দ্বিজেন্দ্রলাল। ৫৬৮-৬৯

৪৯ ‘চৈতালিটা আমার বড় আদরের’ [ক্ষিতিমোহন সেন-অনুলিখিত] : দেশ, সাহিত্য ১৩৮৫।৪৩

৫০ চিঠিপত্র ১০।৩৭, পত্র ৩৫

৫১ দ্র ড আদিত্য ওহদেদার : ‘রবীন্দ্র-বিদূষণ ইতিবৃত্ত’ [১৩৯২]। ২২

৫২ দ্র বৈশাখী বার্ষিকী ১৩৫০।১-৩

৫৩ দ্বিজেন্দ্রলাল রচনাবলী [ব. সা. প.-সংস্করণ, ১৩৫৩]। ৪০৭

৫৪ চিঠিপত্র ১০।৩৬, পত্র ৩৫

৫৫ রবীন্দ্রভবনে রক্ষিত প্রতিলিপি

৫৬ ঐ

৫৭ ঐ

৫৮ ঐ

৫৯ ঐ

৬০ ঐ

৬১ বি. ভা, প., মাঘ-চৈত্র ১৩৭৩। ১৮৮

৬২ চিঠিপত্র ১০।৩৭-৩৮, পত্র ৩৫

৬৩ রবীন্দ্রভবনে রক্ষিত প্রতিলিপি

৬৪ তত্ত্ব°, মাঘ ১৮২৮ শক। ১৫৩

৬৫ রবীন্দ্র সান্নিধ্যে ত্রিপুরা। ১৭৪
৬৬ রবীন্দ্রনাথ ও ত্রিপুরা। ৩৪৯
৬৭ দ্র *The Bengalee*, 11 July 1906
৬৮ দ্র ঐ, 25 Dec 1906
৬৯ রবীন্দ্রভবনে রক্ষিত প্রতিলিপি
৭০ দ্র *The Bengalee*, 18 Dec 1906
৭১ ঐ, 20 Jan 1907
৭২ রবীন্দ্রভবনে রক্ষিত মূল পত্র
৭৩ তত্ত্ব°, ফাল্গুন। ১৭৫
৭৪ দ্র রবীন্দ্রজীবনী ২।২০২
৭৫ দ্র *The Bengalee*, 30 Jan 1907
৭৬ বি. ভা, প., মাঘ-চৈত্র ১৩৭৩।১৮৮
৭৭ চিঠিপত্র ৪।১৫, পত্র ১
৭৮ রবীন্দ্রজীবনী ২।২০৬, পাদটীকা ২
৭৯ রবীন্দ্রভবনে রক্ষিত মূল পত্র
৮০ রবীন্দ্রভবনে রক্ষিত প্রতিলিপি
৮১ ঐ
৮২ ঐ
৮৩ দেশ, সাহিত্য ১৩৬৬।২১৯
৮৪ পত্রাবলী। ১৭৪, পত্র ৬৫
৮৫ ভারতকোষ ২।৪৩২
৮৬ পত্রাবলী। ১৭২, পত্র ৬৪
৮৭ ঐ। ১৭৬, পত্র ৬৭
৮৮ ঐ। ১৭৫, পত্র ৬৬
৮৯ বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের কার্য্যবিবরণী। এয়োদশ বর্ষ। ১৪১-৪২
৯০ চিঠিপত্র ১০।৩৮, পত্র ৩৬
৯১ দ্র *The Bengalee*, 27 Mar 1907
৯২ রবীন্দ্রভবনে রক্ষিত প্রতিলিপি
৯৩ ঐ
৯৪ ঐ

৯৪ক 'রবীন্দ্রনাথের "সদুপায়" : অর্চনা ভাদ্র ১৩১৫।২০৩-০৪

৯৫ পিতৃস্মৃতি। ১০৮-১৩

৯৬ বি. ভা, প., মাঘ-চৈত্র ১৩৭৩।১৮৮

৯৭ তত্ত্ব°, আষাঢ়। ৫৪

৯৭ক দ্র Tagore Estate Papers, No. 146

৯৮ দ্র তত্ত্ব°, মাঘ।১৫৩-৫৮

৯৯ ঐ, চৈত্র। ১৯৯

১০০ ঐ, চৈত্র। ২০০

১০১ দ্র *Bengal Provincial Conference/ 1906/ Barisal Session* [1978], compiled by Yatindrakumar Ghosh, pp. 2-4, 70-71

১০২ ভারতী, আষাঢ়। ৩১৭

১০৩ দ্র *The Bengalee*, 11 Oct 1905

১০৪ গিরিজাশঙ্কর রায়চৌধুরী : শ্রীঅরবিন্দ ও বাঙ্গলায় স্বদেশী যুগ। ৪৫৪

১০৫ দ্র *The Blade*, p. 145

১০৬ দ্র শ্রীঅরবিন্দ ও বাঙ্গলায় স্বদেশী যুগ। ৪১১

১০৬ক দ্র *Bande Mataram*, 3 Sep 1906

১০৭ দ্র *The Swadeshi Movement in Bengal*, p. 172

১০৮ রবীন্দ্রনাথ : জীবন ও সাহিত্য। ২৭

১০৯ *The Bengalee*, 4 Oct 1906

১১০ দ্র *The Bengal Provincial Congress/ 1907/ Berhampore Session* [1971], compiled by Yatindrakumar Ghosh, pp. 139-41

১১১ কথাসাহিত্য, পৌষ ১৩৬৭।৩৬১

১১২ রবীন্দ্রভবনে রক্ষিত প্রতিলিপি

১১৩ স্মৃতি। ৫৮

১১৪ রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর : জন্মশতবার্ষিক-শ্রদ্ধার্ঘ্য। ৬

১১৫ ঐ।১২

১১৬ রবীন্দ্রভবনে রক্ষিত প্রতিলিপি

১১৭ কথাসাহিত্য, ফাল্গুন ১৩৬৮।১০৫০

১১৮ রবীন্দ্রভবনে রক্ষিত প্রতিলিপি

১১৯ ঐ

১২০ আমাদের শান্তিনিকেতন। ৪৩

১২১ রবীন্দ্রজীবনী ২।২৩২-৩৩

১২২ কথাসাহিত্য, ফাল্গুন ১৩৬৭।৫৬৬

---

* দ্র প্রাসঙ্গিক তথ্য : ৩

* রাজপরিবারের কুমার সুরেন্দ্রচন্দ্র দেববর্মা স্ব-সম্পাদিত 'বঙ্গভাষা' পত্রিকার আষাঢ় ১৩১৫ ত্রিপুরাব্দ [১৩১২]-সংখ্যার 'আলোচনা'য় লেখেন : 'স্বদেশের দায়িত্বপূর্ণ রাজকার্য্য পরিচালনের ভার অন্যের হস্তে থাকায় আমাদের কি কি অনিষ্ট হইতেছে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে তাহার আলোচনা হওয়া সঙ্গত মনে করি।...কেবলমাত্র পরের দ্বারা রাজকার্য্য পরিচালনের সর্ব্বাপেক্ষা কুফল এই যে, স্বদেশের সহিত আমাদের কি সম্পর্ক আছে এবং কিরূপ সম্পর্কই বা স্থাপন করা উচিত সে বিষয়ে আমরা নিতান্ত অনভিজ্ঞ হইয়া রহিয়াছি।...সুযোগের অভাবে আমাদের দ্বারা স্বদেশের জন্য সহানুভূতি-সূচক কোন কাজই হইতেছে না। এমন কি স্বদেশের জন্য কোনও কথা বলিতে আমাদের ভয় ও সঙ্কোচ বোধ হইতেছে; পাছে রাজদ্রোহী অথবা হাস্যম্পদ হইতে হয়। [পৃ ২-৩]

* 'Mr. S. Kusumoto, Professor of Carpentry, Bengal Technical Institute is shortly to be married. His bride comes all the way from Japan and arrived here last week accompanied by a relative'.—*The Bengalee*, 14 Mar 1907.

সপ্তচত্বারিংশ অধ্যায়

১৩১৪ [1907-08] ১৮২৯ শক ॥ রবীন্দ্রজীবনের সপ্তচত্বারিংশ বৎসর

নববর্ষের দিন [রবি 14 Apr] ভোরে রবীন্দ্রনাথ নিশ্চয়ই যথারীতি শান্তিনিকেতন মন্দিরে উপাসনা করেন, কিন্তু তখনও শান্তিনিকেতনে তাঁর মৌখিক ভাষণের অনুলেখন নেওয়ার প্রথা প্রচলিত না হওয়ায় এই উপাসনার কোনো লিখিত রূপ পাওয়া যায়নি। তবে কাদম্বিনী দেবীকে লেখা একটি তারিখহীন [* 16 Apr : ৩ বৈশাখ] পত্রে তিনি বক্তব্যটির কিছু আভাস দিয়েছেন : 'নববর্ষের দিনে আমি ঈশ্বরের কাছে এই কথাই জানাইয়াছি যে সুখে দুঃখে আমার জীবনকে লইয়া প্রতিদিনই তুমি ত মঙ্গলসঙ্গীত রচনা করিয়া চলিয়াছই—আমার প্রার্থনা কেবল এই যে তোমার সেই মঙ্গলে আমারও অন্তঃকরণ যেন যোগ দিয়া চলে—আমি যেন তোমার হাতের সমস্ত দানকেই মাথা পাতিয়া স্বীকার করিয়া লইতে পারি।'[১]

এই সময়ে ব্রহ্মচর্যাশ্রমের অনেকগুলি ছাত্র পানবসন্তে আক্রান্ত। ফলে এখানে এসে রবীন্দ্রনাথকে যথেষ্ট বিব্রত থাকতে হয়েছে। ৩ বৈশাখ [মঙ্গল 16 Apr] তিনি যতীন্দ্রনাথ বসুকে লিখেছেন : 'এখানে এসে দেখি বিদ্যালয়ের ছেলেদের মধ্যে হঠাৎ পানবসন্ত দেখা দিয়েছে। এতগুলি ছেলেকে নিয়ে ছোঁয়াচ সামলানো বিষম ব্যাপার। বোধ হচ্ছে ক্রমে ক্রমে অনেকগুলিকেই শয্যা আশ্রয় করতে হবে। আমার ক্ষুদ্র সংসারটির বাইরে যে বৃহৎ সংসার ফেঁদে বসেছি এই সব তার সমস্যা।'[২]

৪ বৈশাখ মনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়কেও সংবাদটি দিয়ে লিখেছেন :

> আমি বিদ্যালয়ের কাজে ক্রমশই বেশি করিয়া জড়িত হইতেছি। অনেক ছাত্র বাড়িয়াছে—দায়ও বাড়িতেছে। তাড়াতাড়ি অনেকগুলি ঘরদুয়ার ফাঁদিতে হইতেছে। ল্যাবরেটরি ঘরের উপরে একটি দোতলা হইয়াছে—তাহাতেও কুলাইতেছে না। এখনো নানা কাজের জন্য আরো অনেকগুলি ঘর নির্ম্মাণ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি। অর্থব্যয়ের আশঙ্কা করিবার অবকাশও পাওয়া গেল না—চারিদিকেই মিস্ত্রি লাগাইয়া দেওয়া গেছে। আর কিছুদিন পরে এখানে আসিলে চিনিতেই পারিবেন না।[৩]

৫ বৈশাখেই ক্যাশবহিতে এই খরচের একটি হিসাব পাওয়া যায় : 'শান্তিনিকেতন স্কুল বাটী তৈয়ারী খাতা/ ব° কেদার নাথ দাসগুপ্ত দং একজিবিসন হইতে যে সমস্ত কাট তক্তা ও অন্যান্য জিনীস ক্রয় করা হয় তাহার মূল্য সমুদায় শোধ···১ বিল ৩৫৩ ৬/১ বিল ২৫৫ ৯/১ বিল ৩৯॥০'। ঠাকুর কোম্পানির ঋণের জের এখনও টেনে চলতে হচ্ছে। তারকনাথ পালিতের কাছ থেকে নেওয়া ৫০,০০০ টাকার মধ্যে নিজ অংশের ২৫,০০০ টাকার বার্ষিক শতকরা ৭ টাকা সুদের মাসিক কিস্তি ১৪৫ ⁄৪, নরেন্দ্রনন্দিনী দেবীর থেকে নেওয়া ৫০০০ টাকার মধ্যে নিজ অংশের ২৫০০ টাকার বার্ষিক শতকরা ৬।। টাকা সুদের মাসিক কিস্তি ১৩॥৭॥

নিয়মিত মিটিয়ে যেতে হচ্ছে। প্রিয়ম্বদা দেবীর কাছ থেকে দশ হাজার টাকা ধার নেওয়া হয়েছিল, তার মধ্যে নিজ অংশের ৫০০০ টাকা উক্ত ৫ বৈশাখেই শোধ করতে হয়েছে কালীগ্রাম কৃষি ব্যাঙ্কে জমা ৪০০০ টাকা তুলে ও দ্বিপেন্দ্রনাথের কাছ থেকে শতকরা বার্ষিক ৯ টাকা সুদে ১০০০ টাকা ধার করে। এছাড়াও থ্যাকার স্পিংক কোম্পানির বিল শোধ করতে হয়েছে ৮√০ ও গদ্যগ্রন্থাবলী ছাপানোর জন্য দিতে হয় ২৩০্। এই ব্যয়াধিক্যের জন্যই রবীন্দ্রনাথকে রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের কাছ থেকে ৩০০ টাকা নিতে হয়েছিল, পরে প্রবাসী-র জন্য 'মাস্টারমশায়' গল্প ও 'গোরা' উপন্যাস লিখে তিনি নিজেকে দায়মুক্ত মনে করেন।

গত বৎসর বিদ্যালয়ে বর্ষাকালে ছুটি দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু এই বৎসর অনাবৃষ্টির জন্য কুয়োর জল কমে যাওয়ায় ও অসুখের উপদ্রবে বৈশাখের দ্বিতীয় সপ্তাহেই ছুটি দিয়ে দেওয়া হয়। ৭ বৈশাখ [শনি 20 Apr] তিনি মীরা দেবীকে লিখেছেন :'[এখা]নে বিদ্যালয়ে পাণবসন্ত [হ]াম প্রভৃতি উৎপাত হওয়াতে ছুটি দিতে [বাধ] ্য হলুম। কাল থেকে দেড়মাস ছুটি হবে। এই ছুটির মধ্যে কতকগুলো নতুন ঘরটর তৈরি করাতে হবে।'[৪]

৮ বৈশাখ [রবি 21 Apr] গ্রীষ্মের ছুটি হয়ে যাওয়ায় বিদ্যালয় প্রায় ফাঁকা হয়ে গেল। সেই কথাই মীরা দেবীকে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন ১১ বৈশাখ-[বুধ 24 Apr] : 'আমাদের এখানে সমস্ত ছেলেই চলে গেছে। কেবল ক্ষিতীশ [মুস্তাফি] শমী এবং পটল [জগদানন্দ রায়ের পুত্র ত্রিগুণানন্দ] বাকি। যদি ইতিমধ্যে পটলের বোনের বিবাহ হয় তাহলে সেও কিছুদিনের মধ্যে চলে যাবে। বোলপুর অনেকদিন এমনতর শূন্য হয় নি—এমন কি যতীন পালিত এবং দেবলও চলে গেছে।'[৪]

এই পত্রে শমীন্দ্রনাথ সম্পর্কেও কিছু খবর আছে : 'শমী ঠাকুর সেদিন লাইব্রেরির বই গোছাতে অতিরিক্ত পরিশ্রম করাতে জ্বরে পড়েছে। জ্বরে পড়ে পড়ে খুব গান ও কাব্যালোচনা করচে। আজকাল হঠাৎ তার গানের উৎসাহ অত্যন্ত বেড়ে উঠেছে। প্রায়ই "এ কি লাবণ্যে পূর্ণ প্রাণ" গেয়ে গেয়ে বেড়াচ্চে। সুর যে খুব বিশুদ্ধভাবে প্রয়োগ করচে সত্যের অনুরোধে তা আমি বল্‌তে পারি নে।' শমীন্দ্রনাথের সংগীতপ্রীতির কথা লিখেছেন তাঁর সহপাঠী সুধীরঞ্জন দাস : 'শমী হুবহু গুরুদেবের মতো দেখতে ছিলেন—একই রকম রঙ, মুখের গড়ন ও চোখের চাহনি। গানও করতেন খুব চমৎকার।'[৫] আর এক সহপাঠী সুধাকান্ত রায়চৌধুরী স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে বলেন : 'আমার বেশ মনে পড়ে সে সময়কার সঙ্গীত শিক্ষক শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত অজিতকুমার চক্রবর্ত্তি [যদ্দৃষ্টং] মহাশয় তাহাকে একদিন একটি সঙ্গীত করিতে বলেন, আমাদের কয়েকজনকে নূতন দেখিয়া প্রথমত তিনি যৎসামান্য সঙ্কোচ বোধ করেন কিন্তু কিয়ৎক্ষণ পরেই সুমধুর কণ্ঠে গুরুদেব-রচিত পূর্ণ "প্রাণেশ" সঙ্গীতটি গাহিলেন, তৎপরেই পুনরায় "বহে নিরন্তর অনন্ত আনন্দধারা" গাহিলেন। তৎপূর্ব্বে কোন বালক কণ্ঠে তেমন মধুর সঙ্গীত শুনি নাই, চিরকাল লক্ষ্ণৌ অঞ্চলের অধিবাসী ছিলাম বলিয়া শুনিবার সুযোগ পাই নাই।'[৬]

রবীন্দ্রনাথ মীরা দেবীকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, মজঃফরপুরে গিয়ে তাঁকে দেখে বা নিয়ে আসবেন। কিন্তু এইসময়ে তিনি তাঁর বিবাহের ব্যবস্থা করতে ব্যস্ত, তাই নানা অজুহাতে যাওয়া পিছিয়ে দিচ্ছিলেন। ৭ বৈশাখ তিনি লিখেছেন : 'কাল এখানে একটি ভদ্রলোকের কাছে শোনা গেল যে বেণী তার স্ত্রী[কে] ও শরতের মাকে নিয়ে মজঃফরপুরে গেছে। শুন[লুম] শরতের মার শরীর খুব খারাপ। এখন তাহলে আমার মজঃ[ফর]পুরে

যাওয়া ঠিক উচিত হবে না।' ১১ বৈশাখ আবার লিখেছেন : 'তুই ত বেশ। তোর দিদি। আমাকে যেতে লিখেছে বটে কিন্তু আমি এ সময়ে গেলে তাদের নানা রকমে অসুবিধা হবে তাতে কি আর সন্দেহমাত্র আছে। তা ছাড়া আমি একটা বিশেষ কাজে ব্যস্ত হয়ে আছি—তার একটা কিনারা না করে আমার কোনো মতেই নড়বার জো নেই।' এই 'বিশেষ কাজ' অবশ্যই মীরা দেবীর বিবাহের ব্যাপারে কথাবার্তা; ৩ বৈশাখ তিনি শ্রীশচন্দ্র মজুমদারকে লিখেছিলেন : 'মাধুরীর বিবাহের সম্বন্ধের কথা পূর্ব্বেই শুনিয়াছি। মীরার জন্য দুই একটি পাত্রের সমাগম দেখা যাইতেছে। হয়ত দুই সখীর বিবাহের শঙ্খ এক রাত্রেই বাজিয়া উঠে।'[৭]

অবশ্য লেখার কাজেও তিনি ব্যস্ত ছিলেন। ১৯ বৈশাখ [বৃহ 2 May] তিনি রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীকে লেখেন : 'ইতিমধ্যে শিক্ষা-পরিষদের জন্য আমার সাহিত্য প্রবন্ধ চতুর্থ কিস্তি ['সাহিত্যসৃষ্টি'] লেখা হইয়াছে —পরিষদের ছুটি ফুরাইলে কোনো একদিন পড়িয়া আসিব—কিন্তু আপনাকে কি সভায় উপস্থিত দেখিতে পাইব? না পাইলে ও আপনার চিরপ্রসন্ন মুখ না দেখিলে আমার পড়িয়া সুখ হইবে না।'[৮] এ থেকে মনে হয় তিনি অবিলম্বে প্রবন্ধটি পাঠ করে দায় চুকিয়ে ফেলতে চাইছিলেন। কিন্তু পরিষদের গ্রীষ্মাবকাশ শেষ হওয়া পর্যন্ত তাঁকে অপেক্ষা করতে হয়—প্রবন্ধটি তিনি পাঠ করেন ২৪ আষাঢ় [মঙ্গল 9 Jul]। তার আগে তিনি প্রবন্ধটি দীনেশচন্দ্র সেনকে পড়ে শোনান। দীনেশচন্দ্র 4 May [শনি ২১ বৈশাখ] মহিমচন্দ্র দেববর্মাকে লিখেছেন : 'রবি বাবু এখানে আছেন। আবার প্রবন্ধ পড়িবেন, আমায় কাল সে প্রবন্ধ শুনিতে হইবে। তিনি আমার সঙ্গে আলোচনা করিতে চাহিয়াছেন। প্রবন্ধে রামায়ণ সম্বন্ধে অনেক কথা আছে।'[৯] রামায়ণ-মহাভারতের কথা ছিল বলেই রবীন্দ্রনাথ প্রথমে প্রবন্ধটির নাম দিয়েছিলেন 'মহাকাব্য'৮ জ্যৈষ্ঠ[বুধ 22 May] তিনি অজিতকুমার চক্রবর্তীকে লেখেন : 'বৈশাখের বঙ্গদর্শনে সৌন্দর্য্য ও সাহিত্য পড়েছ? এটা বোধগম্য হয়েছে কি? তার পরে মহাকাব্য বলে একটা লিখে রেখেছি—সেটা ন্যাশনাল বিদ্যালয় খোলার অপেক্ষায় স্তম্ভিত হয়ে আছে। এইটে পড়া হয়ে গেলেই ঐ বিষয়টা খতম করে দেব মনে করছি। আজকাল আমার আর লিখতে ইচ্ছা করে না।'[১০]

খেয়া-র শেষ কবিতা রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন ২০ আষাঢ় ১৩১৩ [বুধ 4 Jul 1906]—তারপর কয়েকটি গান লেখা ছাড়া তিনি সম্পূর্ণতই গদ্য-লেখক। কিন্তু আবার তাঁকে কবিতার কলম তুলে নিতে হল বাইরের তাগিদে। রাজনারায়ণ বসুর দৌহিত্রী, কৃষ্ণকুমার মিত্রের কন্যা কুমুদিনী মিত্র [বসু] 'সুপ্রভাত' নামে একটি মাসিক পত্রিকা সম্পাদনায় উদ্যোগী হন, তিনি চৈত্র মাসেই একটি চিঠিতে রবীন্দ্রনাথকে অনুরোধ করেন প্রারম্ভিক কবিতাটি লিখে দিতে। বিশেষ যত্নে রাখার জন্য হারিয়ে-ফেলা সেই চিঠির জন্য দুঃখ প্রকাশ করে রবীন্দ্রনাথ ৭ বৈশাখ [শনি 20 Apr] লেখেন :

তোমাদিগকে আমার নিতান্তই আত্মীয় বলিয়া জানি। তোমার মাতামহের সঙ্গে আমাদের যে নিকট-সম্বন্ধ ছিল তাহা তোমরা ঠিক জান না—কেন না শেষ বয়সে দেওঘরে যাপন করিয়া আমাদের পরস্পর সাক্ষাৎ ঘটিত না। কিন্তু আমাদের জীবনরচনার সঙ্গে তাঁহার স্মৃতি চিরদিনের মত জড়িত হইয়া আছে।

অতএব তোমরা আমার কাছে কিছু দাবী করিলে উড়াইয়া দিতে পারি না। ···বীণা বেণু ছাড়িয়া এখন ইস্কুলমাষ্টারিতে ভর্ত্তি হইয়াছি—ছন্দে বন্ধে লিখিবার কথা এখন মনেও উদয় হয় না।—লিখিতে বসিলে বোধ হয় বিভ্রাট ঘটিতে পারে—"বোধ হয়"টুকু তোমাদের কাছে মান বাঁচাইবার জন্য বলিলাম কিন্তু সত্যই মনের মধ্যে কবিতা লেখার কোনো তাড়া নাই তাহার একমাত্র কারণ, ক্ষমতা নাই।···

পুরানো খাতাপত্র খুঁজিলে হয়ত কিছু পাওয়া যাইতে পারে—কিন্তু সে ত তোমার সুপ্রভাতের নবীন কিরণে মানাইবে না—সে সমস্ত অত্যন্ত জীর্ণ। যাই হোক তোমার প্রার্থনা আমি ব্যর্থ করিতে পারিব না। অতএব দুই একদিনের মধ্যেই আবার একবার ছন্দের বেতালটাকে তন্ত্রমন্ত্র পড়িয়া

ডাক দিব। কিন্তু বেশি কিছু আশা করিয়ো না।[১১]

'দুই একদিন' লাগল না—পরের দিন ৮ বৈশাখ [রবি 21 Apr] তিনি লিখলেন 'সুপ্রভাত' ['রুদ্র, তোমার দারুণ দীপ্তি'] নামের দীর্ঘ ৭৫ ছত্রের একটি কবিতা। খেয়া-র দ্বিতীয় পাণ্ডুলিপিতে [Ms. 110 (ii) pp. 25-28] পেনসিলে লেখা কবিতাটিতে দেখা যায়, তিনি প্রথমে ৬০-তম ছত্রে [ভীম আনন্দে ভেসেছে] কবিতাটি শেষ করে স্থান-কাল লিখেছিলেন, পরে আরও ১৫টি ছত্র যোগ করেন। কবিতাটি সুপ্রভাত-এর প্রথম সংখ্যা শ্রাবণ ১৩১৪-এর প্রথমেই মুদ্রিত হয়। এই দীর্ঘ কবিতাটি পূরবী [১৩৩২ : 1925] কাব্যের 'সঞ্চিতা' অংশে গ্রন্থভুক্ত হয়, কিন্তু পরবর্তী সংস্করণে বর্জিত হওয়ায় রবীন্দ্র-রচনাবলী-তে গৃহীত হয়নি। অবশ্য সঞ্চয়িতা-য় কবিতাটি আছে, শতবার্ষিক-সংস্করণ রবীন্দ্ররচনাবলী-তে [৩।৯২১-২৩] ও পশ্চিমবঙ্গ সরকার-প্রকাশিত সাম্প্রতিক সংস্করণে [২।৭১৫-১৭] কবিতাটি মুদ্রিত হয়েছে।

এইরূপ আর একটি কবিতা মুদ্রিত হয় গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী-সম্পাদিত বৈশাখ ১৩১৪-সংখ্যা জাহ্নবী-তে 'স্বদেশ' নামে। বউবাজারের বিখ্যাত দত্তবাড়ির বধূ গিরীন্দ্রমোহিনী স্বর্ণকুমারী দেবীর ঘনিষ্ঠ বান্ধবী ছিলেন, রবীন্দ্রনাথও তাঁকে 'স্বসৃকল্প' বলে মনে করতেন। সুতরাং অনুমান করা যায়, তাঁর তাগিদেই রবীন্দ্রনাথ জাহ্নবী-তে প্রকাশের জন্য কবিতাটি দেন—কিন্তু বলা সম্ভব নয় এটি সমসাময়িক রচনা, না, 'পুরানো খাতাপত্র' খুঁজে বের করা। কবিতাটির কথা তাঁর মনে ছিল, তাই প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ যখন পুরোনো সাময়িকপত্র ঘেঁটে অগ্রন্থিত রচনা খুঁজছেন তখন ৩১ আশ্বিন ১৩২৮ [17 Oct 1921] তিনি নিজেই একটি পত্রে কবিতাটি নকল করে পাঠান, লেখেন : 'পর পৃষ্ঠায় লিখিত কবিতাটি জাহ্নবীতে বেরিয়েছিল—অকিঞ্চিৎকর বলে আমার কোনো বইয়ে স্থান পায়নি। কিন্তু তোমার মত ঐতিহাসিকের দফ্‌তরে এর স্থান থাকতে পারে।'[১২] কবিতাটি জ্যৈষ্ঠ ১৩১৪-সংখ্যা সাহিত্য-তে 'মাসিক সাহিত্য সমালোচনা'য় উদ্ধৃত হয়েছিল, সুরেশচন্দ্র সমাজপতি কবিতাটির অম্ল-মধুর সমালোচনা করেছিলেন। অনুমান করা হয়েছে, কবিতাটি কল্পনা-র 'ভারতলক্ষ্মী' ['অয়ি ভুবনমননামোহিনী'] গানটির পূর্বপাঠ দ্র র°র° ৪ [সুলভ সংস্করণ (১৩৯৪), গ্র. প.]। ৭৩৮-৩৯]।

রবীন্দ্রনাথ ১৩১৩ বঙ্গাব্দে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সহকারী সভাপতি ছিলেন, ২১ বৈশাখ [শনি 4 May] পরিষদের ত্রয়োদশ বার্ষিক অধিবেশনে তিনি বর্তমান বৎসরের জন্যও অন্যতম সহকারী সভাপতি নির্বাচিত হন। এছাড়া তিনি India Research Society Council-এর Buddhist Text & Sanskrit Section-এর সদস্য মনোনীত হন।[১৩] তাঁকে নিয়ে আরও টানাটানি চলছিল। ১৯ বৈশাখ [বৃহ 2 May] তিনি রামেন্দ্রসুন্দরকে লিখেছেন : 'রংপুর আমার প্রতি অত্যন্ত উপদ্রব সুরু করিয়াছেন। আমার সন্দেহ হইতেছে আপনারা এই চক্রান্তের মধ্যে প্রচ্ছন্নভাবে আছেন। দৈব লক্ষণ কি আপনারা একেবারেই মানেন না? ইংরেজি শিখিয়া কি আপনাদের এই দশা হইল? এই বেলা আপনাদের রংপুরের শাখাটিকে সাবধান করিয়া দিন। দোহাই আপনাদের—আমারও আর সভা সমিতি এবং টানাটানি সহ্য হয় না।'[১৪] প্রাদেশিক সাহিত্য সম্মিলনের দায়িত্ব সাহিত্য পরিষদের রংপুর শাখা নিতে চেয়েছিল—দৈবদুর্ঘটনায় বহরমপুরের সম্মিলন পণ্ড হয়ে যাওয়ায় উক্ত শাখা সম্ভবত আবার উৎসাহ প্রকাশ করে। কিন্তু স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে তাঁর নূতন দায়িত্ব গ্রহণ করার নিদর্শনও পত্রটিতে রয়েছে। পরিষদ শতপথ ব্রাহ্মণের একটি বাংলা অনুবাদ প্রস্তুতের সিদ্ধান্ত নিলে

রবীন্দ্রনাথ ব্রহ্মচর্যাশ্রমের শিক্ষক বিধুশেখর শাস্ত্রীকে এই দায়িত্ব অর্পণের প্রস্তাব করেন। রামেন্দ্রসুন্দরকে লেখা অনেকগুলি পত্রেই প্রসঙ্গটি আছে। শিক্ষকদের অতিরিক্ত আয়ের সুযোগ করে দেওয়া ও তাঁদের সুপ্ত গুণাবলীর উন্মেষের জন্য তাঁর অনুরূপ প্রয়াস অনেকের ক্ষেত্রেই দেখা গেছে।

'সাহিত্যসৃষ্টি' প্রবন্ধটি লেখা হয়ে গেছে, এই খবরটি রবীন্দ্রনাথ 'বোলপুর' থেকে রামেন্দ্রসুন্দরকে জানান ১৯ বৈশাখ [বৃহ 2 May]। এইদিনই 'হাওড়া স্টেশন হইতে আসার গাড়িভাড়া' হিসাব থেকে জানা যায় তিনি কলকাতায় চলে এসেছেন। এই বৎসর থেকে তাঁর ক্যাশবহিতে হিসাব লেখার পদ্ধতি পরিবর্তিত হওয়ায় আবার আমরা তাঁর যাতায়াতের খুঁটিনাটি বিবরণ পাওয়ার সুযোগ পেয়েছি। ২০ ও ২১ বৈশাখ দু'দিনই 'বালিগঞ্জ হইতে আসিবার' হিসাব পাওয়া যায়—মনে হয়, মীরা দেবীর বিবাহ-সংক্রান্ত কথাবার্তা বলার জন্যই তিনি বালিগঞ্জ গিয়েছিলেন। দীনেশচন্দ্র সেনের পূর্বোদ্ধৃত পত্র থেকে জানি, তিনি ২২ বৈশাখ [রবি 5 May] তাঁকে 'সাহিত্যসৃষ্টি' প্রবন্ধটি পড়ে শোনান। এদিন তাঁর 'পিপুলপটী' যাতায়াতের হিসাব পাওয়া যায়। ২৩ ও ২৫ বৈশাখ [বুধ 8 May] তিনি যান সুকিয়া স্ট্রীটে। এই ব্যস্ততার ফলে তাঁর মানসিক অবস্থার কথা ২২ বৈশাখ লিখেছেন মীরা দেবীকে :

কাজের টানে দিন তিন চার হল কলকাতায় এসেছি। কতদিনে ছুটি পাব তাও জানি নে। যেদিন বোলপুর ছাড়ছিলুম সেদিন তোর একখানি বেশ বড়সড় ইংরিজি ও বাংলা চিঠি পেয়েছিলুম। এই লক্ষ্মীছাড়া কলকাতায় তার যে ভালরকম একটা জবাব রয়ে বসে লিখ্‌ব তার সম্ভাবনা নেই। এখানে মনটা বড়ই উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে থাকে। একে ত লোকের ভিড়—তার উপরে আবার দিনকতক হল সমরের বড় ছেলেটি (ন্যাড়া) হঠাৎ মারা গেছে। সেজন্যও মৃত্যুর ছায়ায় জোড়াসাঁকো আচ্ছন্ন হয়ে আছে।[১৫]

ছাত্রদের অসুখের কথা বলে তিনি এই চিঠিতেই লিখেছেন : 'এবার একটা হাঁসপাতাল তৈরি করতেই হবে—তারই জোগাড় করচি'—কিন্তু কন্যার জন্য পাত্রের জোগাড়ও যে সম্পূর্ণ হয়ে গেছে সেকথা পাত্রীর কাছে গোপন করে গেছেন। তবে হয়তো মাধুরীলতাকে তিনি খবরটি জানিয়েছিলেন, ২৩ বৈশাখ [সোম 6 May] তাঁকে একটি পত্র লেখার হিসাব পাওয়া যাচ্ছে [যদিও পত্রটি পাওয়া যায়নি]। ২৮ বৈশাখ [শনি 11 May]* সুকুমার হালদারকে তিনি লিখেছেন : 'আমার ছোট মেয়ের বিবাহ ২২শে জ্যৈষ্ঠ [বিবাহ হয় ২৩ জ্যৈষ্ঠ] স্থির হয়েছে। শান্তিনিকেতনেই হবে। তোমাদের আসা কি সম্ভব হতে পারবে?'[১৬] এর আগে ২৫ বৈশাখ [বুধ 8 May] অধিক রাত্রে তিনি শান্তিনিকেতনে ফিরে আসেন। এই দিন তিনি সাতচল্লিশ বৎসর বয়সে পদার্পণ করলেন—কিন্তু জন্মোৎসব পালনের সুযোগ হয়নি, সেই কথাই ২৬ বৈশাখ লিখেছেন শ্রীশচন্দ্র মজুমদারকে :'গৃহিণীকে আমার সাদর অভিবাদন জানিয়ো—বোলো আমার জন্মদিনটা পথেই মারা গেছে—কাল রাত্রি দুপুরের সময় বোলপুরে এসেছি—তখন আর পায়সান্নের অবকাশ ছিল না।'[১৭] ২২ জ্যৈষ্ঠ কন্যার বিবাহ স্থির হওয়ার সংবাদ তিনি এই চিঠিতেও লিখেছেন।

গদ্যগ্রন্থাবলী-সম্পাদনার কাজ রবীন্দ্রনাথ শুরু করেছিলেন গত বৎসরের মাঝামাঝি। নিজ ব্যয়ে মজুমদার লাইব্রেরি থেকে প্রকাশের আয়োজন হয় ১৮ পৌষ ১৩১৩ [2 Jan 1907] নাগাদ। গদ্যগ্রন্থাবলী প্রথম ভাগ বিচিত্র প্রবন্ধ প্রকাশিত হল বর্তমান বৎসরের বৈশাখ মাসে, বেঙ্গল লাইব্রেরির ক্যাটালগ অনুযায়ী প্রকাশের তারিখ 16 Apr1907 [মঙ্গল ৩ বৈশাখ]। কিন্তু এই তারিখ সম্ভবত ঠিক নয়। তবে ১৬ বৈশাখ [সোম 29 Apr] যে গ্রন্থটি প্রকাশযোগ্য হয়ে গেছে, এইদিন 'মজুমদার লাইব্রেরি হইতে "বিচিত্র প্রবন্ধ" আনার মুটে'

ভাড়া থেকে তা বুঝতে পারা যায়। ২৪ বৈশাখ [মঙ্গল 7 May] রবীন্দ্রনাথ লোকেন্দ্রনাথ পালিতকে একটি পত্র ও একখণ্ড বিচিত্র প্রবন্ধ পাঠান, ত্রিপুরার মহারাজার কাছে পাঠান রেজেস্ট্রি-ডাকযোগে। ৩ বৈশাখ [মঙ্গল 16 Apr] তিনি যতীন্দ্রনাথ বসুকে লিখেছিলেন :

আমার গদ্য গ্রন্থাবলীর প্রথম সংখ্যা (বিচিত্র প্রবন্ধ) ছাপা হয়ে গেছে। এই বইয়ের স্বত্ব বিশেষভাবে বোলপুরে দিয়েছি। যদি কিছু বিক্রি হয় তবে আমার কিঞ্চিৎ ভার লাঘব হবে। তুমি যদি মহারাজকে দিয়ে কয়েক খণ্ড কেনাতে পার তবে আমার উপকার হয়। তুমি যে কয়েকখানা তাঁর কেনা সম্ভব মনে করো সেই কয়খানা যদু[নাথ চট্টোপাধ্যায়] কিম্বা শৈলেনের [শৈলেশের] কাছ থেকে একেবারে নিয়ে যেয়ো এবং একখানা বাঁধানো বই আমার উপহার স্বরূপে মহারাজাকে দিয়ো। তোমার জানাশোনা আর কোন লোককেও এই বই বেচবার চেষ্টা করো। বিদ্যালয়ের ভার আজকাল অত্যন্ত গুরুতর হয়ে উঠেছে।[১৮]

উল্লিখিত হিসাব থেকেই জানা যায়, যতীন্দ্রনাথ ত্রিপুরা যাওয়ার সময়ে বই সঙ্গে নিয়ে যেতে পারেননি— ২৭ বৈশাখে 'J. N. Basu নিকট আগরতলা ১০০ খানা বিচিত্র প্রবন্ধ পাঠাবার' হিসাব পাওয়া যায়। ১৭ জ্যৈষ্ঠের [শুক্র 31 May] হিসাব : 'মা° ত্রিপুরার মহারাজ ১০০ খানি গদ্যগ্রন্থাবলীর মূল্য পাওয়া যায় ১২৫্'। এই বই রবীন্দ্রনাথ ৮ জ্যৈষ্ঠ [বুধ 22 May] মনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়কে উপহার পাঠিয়ে লেখেন : 'বুকপোষ্টে গ্রন্থাবলীর প্রথম খণ্ড পাঠাই। শ্রদ্ধার সহিত যদি পড়িয়া দেখেন তবেই আমার মূল্য লাভ হইবে—তার বেশি আর কিছু দিবেন না। সমস্ত খণ্ড শেষ হইতে এক বৎসরেরও উপর লাগিবে অতএব দিব্য অবকাশমত রহিয়া বসিয়া পড়িতে পারিবেন।'[১৯] মনোরঞ্জনবাবু মূল্য দেওয়ার প্রস্তাব করলে ১৫ জ্যৈষ্ঠ [বুধ 29 May] তাঁকে লেখেন : 'গদ্য গ্রন্থাবলী একটি একটি খণ্ডে সুদীর্ঘকালে শেষ হইবে—অতএব যদি ইহার মূল্য উপলক্ষ্য করিয়া বোলপুর বিদ্যালয়কে কিছু দিতে ইচ্ছা করেন তবে যখন খুসি যেমন খুসি দিতে পারেন। তবে কথা এই, বিদ্যালয় হইতে আপনারও ত গুরুদক্ষিণা প্রাপ্য হইয়াছে—বিদ্যালয়ের অতি দুর্ব্বল শিশু অবস্থায় তাহাকে পালন করিয়াছেন এখন অপেক্ষাকৃত সমর্থ অবস্থায় সে যদি আপনাকে কিঞ্চিৎ উপহার দিতে উদ্যত হয় তবে তাহা গ্রহণ করিতে কুণ্ঠিত হইবেন না।'[২০]

পূর্বাহ্নে চাঁদা নিয়ে গ্রাহকদের সুলভ মূল্যে গদ্যগ্রন্থাবলী বিক্রয়ের ব্যবস্থা হয়েছিল। এ-সম্পর্কে প্রবাসী-র কার্তিক ১৩১৪ ও আরও কতকগুলি সংখ্যায় 'প্রকাশক এস, মজুমদার'-প্রদত্ত একটি বিজ্ঞাপন আমরা দেখেছি। অনুমান করা যায়, অন্তত জ্যৈষ্ঠ-সংখ্যা থেকে একই বিজ্ঞাপন মুদ্রিত হয়ে চলছিল। বিজ্ঞাপনটির কিয়দংশ আমরা উদ্ধৃত করছি, এর থেকে গদ্যগ্রন্থাবলী বিষয়ে প্রাথমিক পরিকল্পনার কিছুটা আভাস পাওয়া যাবে :

গদ্যগ্রন্থাবলীর "বিচিত্র প্রবন্ধ" প্রকাশিত হইয়াছে। মূল্য ১।০ বাঁধাই ১॥০। বিচিত্র প্রবন্ধের আকার ডবল ক্রাউন, প্রায় একুশ ফর্ম্মা।···

গদ্য গ্রন্থাবলীর "চারিত্রপূজা" যন্ত্রস্থ; বৈশাখ মাসের মধ্যেই প্রকাশিত হইবে,···গদ্যগ্রন্থাবলী ১৩।১৪ খণ্ডে প্রকাশিত হইবে। রবীন্দ্র বাবুর গত ১৪।১৫ বৎসরের প্রায় সমস্ত প্রবন্ধ, সমালোচনা, ছোটগল্প, উপন্যাস কৌতুকরচনাই এই গদ্যগ্রন্থাবলীতে শৃঙ্খলামত স্থান পাইবে। "বৌ ঠাকুরাণীর হাট" প্রভৃতিও এ সংগ্রহে থাকিবে।

গদ্যগ্রন্থের প্রতি খণ্ডের মূল্য পুস্তকের আকার অনুসারে ধার্য্য হইবে ও প্রতি খণ্ড ধার্য্যমূল্যে পৃথক্ পৃথক্ বিক্রয় হইবে, তবে যাঁহারা এক্ষণে সমগ্র গ্রন্থাবলীর গ্রাহক হইবেন তাঁহারা পুস্তক প্রকাশিত হইলে প্রতিখণ্ডের ধার্য্য মূল্যের ০ মূল্যে সেই খণ্ড পাইবেন। কিন্তু প্রতি টাকায় তাঁহারা যে চারি আনা হিসাবে বাদ পাইবেন এজন্য তাঁহাদিগকে আপাততঃ একটি টাকা অগ্রিম দিতে হইবে, এবং এ টাকা শ্রীযুক্ত যদুনাথ চট্টোপাধ্যায়ের নিকট ৬নং দ্বারকানাথ ঠাকুরের লেন জোড়াসাঁকোয় পাঠাইতে হইবে। গ্রাহকগণ এই টাকার রসিদ পাইবেন। এই গচ্ছিত টাকাটি অবশ্য পরে পুস্তকের মূল্য হইতে বাদ যাইবে। চার পাঁচ খণ্ড পুস্তক প্রকাশের পর গ্রাহকদের আরও ঐ পরিমাণ টাকা গচ্ছিত স্বরূপ এই সর্ত্তে জমা দেওয়ার প্রয়োজন হইতে পারে। এই টাকা গচ্ছিত রাখার অর্থ এই যে, যদি কেহ এই সুবিধার কয়েকখণ্ড পুস্তক লইয়া আর গ্রাহক না থাকেন তবে তাঁহাদের

গচ্ছিতের টাকা হইতে পূর্ব্বের বাদ দেওয়া সিকি মূল্য কাটিয়া লওয়া হইবে। গ্রাহক মহোদয়দিগকে পুস্তক খরিদের সময়, গচ্ছিতের টাকার রসিদ দেখাইয়া পুস্তক লইতে হইবে। রবীন্দ্রবাবু এই গদ্যগ্রন্থাবলীর উপস্বত্ব বোলপুর ব্রহ্মবিদ্যালয়ে দান করিয়াছেন।

বিজ্ঞাপনটিতে বিস্তৃতভাবে অনেক কথাই বলা হয়েছে, কিন্তু ভুল তথ্যও কম নেই। 'চারিত্রপূজা' গদ্যগ্রন্থাবলীর অন্তর্গত হয়ে মুদ্রিত হয়নি, ভট্টাচার্য অ্যাণ্ড সন্স ইতিপূর্বেই গ্রন্থটি প্রকাশ করেছিল তা আমরা আগেই দেখেছি। ছোটগল্প বা 'বৌঠাকুরাণীর হাট' প্রভৃতি উপন্যাসও এই গ্রন্থাবলীর অন্তর্ভুক্ত হয়নি। তাছাড়া কার্তিক মাসের মধ্যে গদ্যগ্রন্থাবলী-র পঞ্চম ভাগ 'আধুনিক সাহিত্য' পর্যন্ত প্রকাশিত হয়ে গেছে, প্রকাশক বিজ্ঞাপনটিকে সংশোধিত করার ব্যাপারে সচেতন ছিলেন না।

গদ্যগ্রন্থাবলী-র অন্তর্গত বিচিত্র প্রবন্ধ-এর সঙ্গে বর্তমান সংস্করণের পার্থক্য সুপ্রচুর—সম্পূর্ণ পঞ্চভূত, গল্পগুচ্ছ-এর দুটি গল্প, য়ুরোপযাত্রীর ডায়ারি, ছিন্নপত্র-এর কয়েকটি চিঠি ইত্যাদি নিয়ে সেটি প্রায় পৃথক গ্রন্থ; পৃষ্ঠাসংখ্যা : ২+২+২ [সূচী]+২ [শুদ্ধিপত্র]+৩২০। গ্রন্থটির আখ্যাপত্রে আছে :

গদ্যগ্রন্থাবলী।/ বিচিত্র প্রবন্ধ।/ শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর / মূল্য ১।০, বাঁধাই ১॥০ টাকা।

[পরপৃষ্ঠায়] : প্রকাশক—শ্রীসুহাসচন্দ্র মজুমদার।/ ২০ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা,/ মজুমদার লাইব্রেরি।/ কলিকাতা, ২০ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্ দিনময়ী প্রেসে/ শ্রীহরিচরণ মান্না দ্বারা মুদ্রিত।

অর্ধ-নামপত্র : <u>গদ্যগ্রন্থাবলী, ১ম ভাগ</u>/ বিচিত্র প্রবন্ধ।/ সন ১৩১৪, বৈশাখ।

চতুর্থ পৃষ্ঠায় : গদ্যগ্রন্থাবলীর উপস্বত্ব বোলপুর/ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমকে উৎসর্গ/করা হইয়াছে।

সূচী :

[১] লাইব্রেরি [বালক, পৌষ ১২৯২]
[২] মাভৈঃ [বঙ্গদর্শন, কার্তিক ১৩০৯]
[৩] পাগল [ঐ , শ্রাবণ ১৩১১]
[৪] রঙ্গমঞ্চ [ঐ, পৌষ ১৩০৯]
[৫] কেকাধ্বনি [ঐ , ভাদ্র ১৩০৮]
[৬] বাজেকথা [ঐ , আশ্বিন ১৩০৯]
[৭] পনেরোআনা [ঐ , মাঘ ১৩০৯]
[৮] নববর্ষা [ঐ , শ্রাবণ ১৩০৮, 'মেঘদূত']
[৯] পরনিন্দা [ঐ , অগ্র° ১৩০৯]
[১০] বসন্তযাপন [ঐ , চৈত্র ১৩০৯]
[১১] অসম্ভবকথা [সাধনা, আষাঢ় ১৩০০]
[১২] রুদ্ধগৃহ [বালক, আশ্বিন-কার্তিক ১২৯২]
[১৩] রাজপথ [নবজীবন, অগ্র° ১২৯১, 'রাজপথের কথা']
[১৪] মন্দির [বঙ্গদর্শন, পৌষ ১৩১০, 'মন্দিরের কথা']
[১৫] ছোটনাগপুর [বালক, আষাঢ় ১২৯২, 'দশদিনের ছুটি']
[১৬] সরোজিনীপ্রয়াণ [ভারতী, শ্রাবণ-ভাদ্র-অগ্র° ১২৯১]
[১৭] য়ুরোপ-যাত্রী [সাধনা, অগ্র° ১২৯৮-কার্তিক ১২৯৯]
[১৮] পঞ্চভূত [সাধনা, ১২৯৯-১৩০২]
[১৯] জলপথে [১৩টি পত্র]
[২০] ঘাটে [১৭টি পত্র]
[২১] স্থলে [৫টি পত্র]
[২২] বন্ধুস্মৃতি/সতীশচন্দ্র রায় [বঙ্গদর্শন, চৈত্র ১৩১০]

মোহিতচন্দ্র সেন [ঐ, শ্রাবণ ১৩১৩]

বৈশাখ ১৩১৪-তে সাময়িকপত্রে রবীন্দ্ররচনার প্রকাশসূচীটিও এখানে সংকলন করা যেতে পারে।

তত্ত্ববোধিনী, বৈশাখ ১৮২৯ শক [৭৬৫ সংখ্যা]:

১-৬ 'শান্তং শিবমদ্বৈতম্' দ্র ধর্ম ১৩।৪১০-১৬

পৌষ ও মাঘোৎসবে পঠিত এই প্রবন্ধটি ইতিপূর্বেই পৌষ ১৩১৩-সংখ্যা বঙ্গদর্শন-এ প্রকাশিত হয়েছিল।

বঙ্গদর্শন, বৈশাখ ১৩১৪ [৭।১]:

১-১০ 'সৌন্দর্য্য ও সাহিত্য' দ্র সাহিত্য ৮।৩৮৭-৯৯

জাহ্নবী, বৈশাখ ১৩১৪ [৩।১] :

৪৪ 'স্বদেশ' ['আমার ভারতভূমি'] দ্র র° র° ৪ [সুলভ সংস্করণ (১৩৯৪), গ্র. প.]। ৭৩৮-৩৯

সঙ্গীত-প্রকাশিকা, বৈশাখ ১৩১৪ [৬।৮] :

১৭৪-৭৬ বেহাগ-চৌতাল। কে যায় অমৃত-ধাম যাত্রী দ্র স্বর ২৪

কাঙালীচরণ সেন গানটির স্বরলিপি করেন।

ক্যাশবহিতে দেখা যায়, ৩১ বৈশাখ [মঙ্গল 14 May] রবীন্দ্রনাথ পুনরায় কলকাতা এসেছেন। ২ জ্যৈষ্ঠ [বৃহ 16 May] তিনি শান্তিনিকেতনে ফিরে যান। এই দিন তিনি বরিশাল ও 'চাট্‌গাং'-এ দুটি পত্র লেখেন—এই আসাযাওয়া ও চিঠিপত্র লেখা সম্ভবত মীরা দেবীর বিবাহের সঙ্গে সম্পর্কিত [চট্টগ্রামে পত্র লেখার কারণটি অবশ্য আলাদা]। কনিষ্ঠা কন্যার জন্য তিনি পাত্রসন্ধান আরম্ভ করেছিলেন সম্ভবত ১৩১২ বঙ্গাব্দের গোড়া থেকে। ঐ বৎসর তিনি ২৩ বৈশাখ মোহিতচন্দ্র সেনকে লিখেছিলেন : 'লাহোরের পাত্রটির কথা শঙ্কর পণ্ডিত আমার কাছে উত্থাপন করেছিলেন কিন্তু আমি তাতে কর্ণপাত করিনি কোনো পাত্রকে আমি বিলেতে পাঠাতে চাইও নে, পার্ব্বও না।' —এর পর থেকে মাঝেমাঝেই বিষয়টি নিয়ে নাড়াচাড়া হয়েছে। এমন কি ফাল্গুন ১৩১৩-তে জ্ঞানদানন্দিনী দেবীরা যখন শান্তিনিকেতনে এসেছিলেন তখনও কী-ধরনের পাত্র নিয়ে কথাবার্তা চলছে তার হদিশ পাওয়া যায় দিদিমা রাজলক্ষ্মী দেবীকে লেখা রথীন্দ্রনাথের একটি তারিখহীন [? চৈত্র ১৩১৩] চিঠিতে : 'মীরার সম্বন্ধের এখনও কিছু কি ঠিক হল? একজন civil service দিতে চায়—একজন medical serviceএ ঢুকতে চায় কোনটাই ত সুবিধে বলে বোধ হয় না।'[২১] রবীন্দ্রনাথ বিলেত-যেতে-চাওয়া পাত্রদের সম্বন্ধে বিমুখ ছিলেন, কিন্তু এই শ্রেণীর পাত্রদেরই সমাগম হয়েছিল বেশি। শেষ পর্যন্ত তিনি যাঁকে নির্বাচন করলেন, সেই নগেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ও [2 Nov 1889-1 Feb 1954] এঁদেরই একজন। বরিশালের সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সভ্য বামনদাস গঙ্গোপাধ্যায় এঁর পিতা। কোন সূত্রে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে এঁদের যোগাযোগ ঘটেছিল বলার মতো তথ্য নেই। রবীন্দ্রজীবনীকার লিখেছেন : 'নগেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলি নামে সাধারণ-ব্রাহ্ম-সমাজের একটি যুবক বিলাত যাইবার অভিপ্রায়ে রবীন্দ্রনাথের সমীপে উপস্থিত হন। কবি এই প্রিয়দর্শন তেজস্বী যুবককে দেখিয়া অত্যন্ত প্রীত হন এবং তাঁহাকেই কনিষ্ঠা কন্যা দানের সংকল্প করেন। বিবাহের পর আমেরিকা যাইবার প্রতিশ্রুতি পাইলে নগেন্দ্রনাথ আদি ব্রাহ্মসমাজের পদ্ধতি মতে বিবাহে সম্মত হন।'[২২] এই ধরনের ঘটনাপ্রবাহে মধ্যমা কন্যা রেণুকার সঙ্গে সত্যেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যের বিবাহ হয়, জামাতা নিয়ে পরে রবীন্দ্রনাথ সর্বাংশে সুখী হননি—কিন্তু আবার একই পদ্ধতিতে তিনি কনিষ্ঠ জামাতাকেও মনোনয়ন

করেন। অবশ্য এক্ষেত্রে আয়োজন চলছিল অনেকদিন ধরে, পাত্রের পিতার সঙ্গে তাঁর পত্রবিনিময়ও হয়েছিল বরিশালে পত্র লেখাই তার প্রমাণ। যাই হোক, এবারে তাঁর কলকাতা ভ্রমণের পরেই বিবাহের আয়োজন পুরোপুরি শুরু হয়ে যায়। ৫ জ্যৈষ্ঠ [রবি 19 May] ক্যাশবহিতে 'জায়' খাতে 'শ্রীমতী মীরা দেবীর বিবাহ হিসাবে ২৬৬লত' ব্যয়ের হিসাব মেলে, এই দিনই 'শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র বাবুর বোলপুর গমন জন্য দেওয়া যায় ৭'- রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতন মন্দির ৬ বা ৭ জ্যৈষ্ঠ তাঁকে আদি ব্রাহ্মসমাজ মতে দীক্ষিত করেন। ৮ জ্যৈষ্ঠ বুধবার [22 May] তিনি নগেন্দ্রনাথকে লিখেছেন :

তোমাকে দীক্ষা দিয়া অবধি আমার মন এই নবজীবনব্রতের প্রতি আবিষ্ট হইয়া আছে। ঈশ্বরের প্রসাদবারিতে তোমার হৃদয় অভিষিক্ত হউক তাঁহার চরণে তোমার সমস্ত অন্তঃকরণ নত করিয়া দাও—আলোককে অমৃতকে জীবন পূর্ণ করিয়া গ্রহণ কর।

তোমার সংসার পথে সমস্ত সুখদুঃখ সমস্ত লাভক্ষতি মঙ্গলের পথপ্রদর্শক হইয়া তোমাকে যেন ঈশ্বরের দিকেই লইয়া যায়।···

আমার সমস্ত মনের প্রার্থনা এই যে ঈশ্বর তোমাকে প্রতিদিনই সত্যে বলিষ্ঠ, মঙ্গলে প্রতিষ্ঠ ও মাধুর্যে মণ্ডিত করিয়া তুলুন।[২৩]

বিবাহের আয়োজন চলতেই থাকে। ৮ জ্যৈষ্ঠ রবীন্দ্রনাথ মনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়কে বিবাহের পরিবর্তিত তারিখ জানিয়ে লেখেন : 'আগামী ২৩শে জ্যৈষ্ঠ মীরার বিবাহ স্থির। স্থান শান্তিনিকেতন। পাত্র শ্রীমান নগেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়।'[২৪] বিবাহের পর জামাতা সম্পর্কে তাঁর পরিকল্পনার কথা জানিয়েছেন ১৫ জ্যৈষ্ঠের [বুধ 29 May] পত্রে : 'নগেন্দ্রকে বিবাহের পরে আমেরিকায় রথীদের কাছে কৃষিবিদ্যা শিখিতেই পাঠাইব। ফিরিয়া আসিলে রথীদের সঙ্গে একসঙ্গে কাজে যোগ দিতে পারিবে।/বিবাহের দিন আসন্ন হইয়া আসাতে আয়োজনে ব্যস্ত আছি। আজ সন্ধ্যার গাড়িতে মজঃফরপুর হইতে শরৎ আসিবেন। বেলা পূর্ব্বেই আসিয়াছে।'[২৫] বিবাহের অন্যান্য সামগ্রীও শান্তিনিকেতনে পাঠানো হয়েছে, ১০ জ্যৈষ্ঠ 'অত্যবাবু মহাশয় দানের খাট আদি রেল রসিদ রেজেষ্ট্রী ডাকে পাঠান'। সত্যপ্রসাদ নিজেও বিবাহোপলক্ষে শান্তিনিকেতনে যান, তাঁর নিজস্ব হিসাবখাতায় ২২ জ্যৈষ্ঠ লেখেন : 'মীরা দেবীর বিবাহে বোলপুর যাতায়াতের খরচ ১৪'।

আত্মীয়স্বজনের মধ্যে আর কারা বিবাহে যোগ দিয়েছিলেন জানা যায়নি, কিন্তু বন্ধুদের অনেকেই আসতে পারেননি। 4 Jun [মঙ্গল ২১ জ্যৈষ্ঠ] লোকেন্দ্রনাথ পালিত গয়া থেকে লিখেছেন : 'ইতিমধ্যে মীরার বিবাহ সম্বাদ সম্বন্ধে, আমার ভালবাসা, সস্নেহ আদর, আর শুভাকাঙ্ক্ষা তাকে জানাবে। এখানে তাকে কিছু আদর চিহ্ন স্বরূপ পাঠাবার জন্য খুঁজেছিলুম। কিন্তু এখানে কিছু পাওয়া যায় না। তাই লিল্‌কে লিখে দিয়েছি তার জন্য একটা শাড়ি কিনে যেন পাঠায়।···আমার নিজের কোনও কাঁচ্চা বাচ্ছা নেই, তাই আমার বন্ধুদের ছেলে-মেয়েরা অনেকটা সেই স্থল অধিকার করে। কিন্তু তারা সহজেই দূরে চলে যায়। আমাদের কাছে তারা যতটা তাদের কাছে আমরা কেউ নই।'[২৬] 7 Jun [শুক্র ২৪ জ্যৈষ্ঠ] মায়াবতী থেকে জগদীশচন্দ্র লেখেন : 'বাড়ীতে চাকরের প্লেগ হওয়াতে পলাতক হইতে হইয়াছিল। তোমার কন্যার শুভবিবাহ উপলক্ষে উপস্থিত হইতে না পারিয়া দুঃখিত হইলাম। ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করি, আমাদের সকলের আদরের কন্যাটি যেন চিরসুখী হয়। আমরা আসিলে জামাতাকে লইয়া একদিন আসিও।'[২৭] কিন্তু বিবাহে খরচ নিতান্ত কম হয়নি, ২০ জ্যৈষ্ঠ ১৩১৫ [2 Jun 1908] রবীন্দ্রনাথের ক্যাশবহিতে লেখা হয় :'শ্রীমতী মীরা দেবীর শুভ বিবাহ ১৩১৪ সালের ২৩শে জ্যৈষ্ঠ তারিখে (বোলপুর শান্তিনিকেতনের বাটীতে হয়) তাহার ব্যয় শোধ···২৯২৩॥৬'। বিবাহের সময় মীরা দেবীর বয়স সাড়ে তেরো ও নগেন্দ্রনাথের বয়স সতেরো বছর সাত মাস।

বিবাহটি পরবর্তীকালে অ-শুভবিবাহে পরিণত হয়, তার ইঙ্গিত বিয়ের দিনেই পাওয়া গিয়েছিল। রবীন্দ্রজীবনী-কার লিখেছেন : 'আদি ব্রাহ্মসমাজীয় রীতি অনুসারে উপবীত ধারণ ব্রাহ্মণের পক্ষে অনিবার্য। নগেন্দ্র গাঙ্গুলি সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের যুবক, তিনি উপবীত-ধারণে অস্বীকৃত হন। শুনিয়াছিলাম, বিবাহসভায় মন্দিরের মধ্যে তাঁহার গল-দেশে যজ্ঞ-সূত্র দিবার চেষ্টা করা হইলে তিনি তাহা লইয়া দূরে নিক্ষেপ করেন।'[২৮] রবীন্দ্রনাথ ভাবী জামাতার এই ধরনের সামাজিক গোঁড়ামির কথা জানতেন। একটি তারিখহীন পত্রে তিনি শিলাইদহ থেকে [আমাদের অনুমান, পত্রটি ১৮-২৪ চৈত্র ১৩১৩-র মধ্যে লেখা] লেখেন :

আমি ব্রাহ্ম, এবং আমাদের পরিবার ব্রাহ্মধর্ম্মে প্রথম দীক্ষিত। অতএব আমি যে ব্রাহ্মসমাজের বিরোধী কোন উপদেশ দিব এমন সন্দেহ মনে স্থান দিয়ো না। বস্তুত উপদেশ দিতেই আমার প্রবৃত্তি নাই। যে সংস্কারের মধ্যে বাল্যকাল হইতে মানুষ হইয়াছ সে সংস্কার যে আমার কথাতেই দূর হইবে এরূপ আশা করাও অসঙ্গত। তুমি radical শোধনের পক্ষপাতী, হিন্দুসমাজের সমস্ত ভাল জিনিষকেও তুমি তাহার, association হইতে ছিন্ন করিয়া ব্রাহ্মসমাজের কাঠামোর মধ্যে পুরিয়া তবে তোমার মন তৃপ্ত হয়, অথচ ইহাও দেখিয়াছি যে সমস্ত ব্যাপার খৃষ্টানী associationএর সঙ্গে জড়িত তাহার প্রতি তোমার কোনো আশঙ্কা নাই—অথচ খৃষ্টান ধর্ম্মও ত্রিত্ববাদ, অবতারবাদের আকর এবং খৃষ্টধর্ম্মের ঈশ্বর মানবগুণে আক্রান্ত। আমি কিন্তু বিজয়ার দিনেই দেশের সকল লোকের সঙ্গে কোলাকুলি করিতে সঙ্কুচিত হওয়াকে সঙ্কীর্ণতা মনে করি—এই দিনের শুভদিনত্ব বহুদিন ও বহুজনের অন্তর হইতে জাগ্রত হইয়াছে ইহা আমার বা কয়েকজনের পরামর্শ করা নূতন সৃষ্টি নহে—এই দেশব্যাপী সদ্ভাবের বন্যাকে যে ব্যক্তি প্রত্যাখ্যান করিতে পারে সে আর যাই করুক ধর্ম্মের দোহাই যেন না দেয়—যে ধর্ম্মের শিক্ষায় এই সমগ্র দেশের আলিঙ্গনকে উপেক্ষা করিতে উৎসাহিত করে তাহার মধ্যে এমন নিশ্চয় কিছু আছে যাহা ধর্ম্ম নহে—যাহা দলীয় দম্ভ।···ঈশ্বর করুন তাঁহার ধর্মের নাম করিয়া আমি যেন কোনো ধর্মের কোনো সম্প্রদায়ের সদ্ভাব বা আনন্দের উৎসব হইতে নিজেকে অনধিকারী করিয়া না রাখি। যদি তাহাদের কোনো অনুষ্ঠানে কোনো মূঢ়তা থাকে আমি যেন নিজের জ্ঞানবিশুদ্ধ চিত্তভাবের দ্বারাই সহজেই তাহার শোধন করিতে থাকি—কোনো মতের উপদ্রবে আমার মনে যেন প্রেমের অভাব না ঘটে।···উপনিষদে বলেন যিনি ঈশ্বরকে অন্তরে গ্রহণ করেন তিনি "সর্ব্বমাবিবেশ" তিনি সকলের মধ্যেই প্রবেশ করেন—তাঁহার হৃদয় কাহাকেও বাধা দেয় না। ব্রাহ্মধর্ম্মও সেই উপনিষদের ব্রহ্মের জ্ঞান—সেই ব্রহ্ম। সঙ্কীর্ণ দেবতা নহেন এইজন্য সকল ধর্ম্মই ব্রাহ্মধর্ম্মকে আশ্রয় করিয়া বৃহৎ হইতে পারে ব্রাহ্মধর্ম্ম কোনো ধর্ম্মের নিকটই সঙ্কুচিত হয় না। আমি তোমাকে নিজের মতে আনিবার জন্য তর্ক করিতেছি না —ব্রাহ্মধর্ম্ম বলিতে আমি কি বুঝি তাহারই কিঞ্চিৎমাত্র আভাস দিতে চেষ্টা করিলাম।···

সিঁদূর বা আলতা পরাকে আমরা বাহ্যসৌন্দর্য্য হিসাবে কেহ দেখি না। কিন্তু মেয়েদের সিঁদূর পরার মধ্যে স্বামীর প্রতি যে মঙ্গল ইচ্ছা চিরদিন এদেশে প্রকাশ পাইয়া আসিয়াছে তাহারই কোমলতা ও কাব্যরস আমাদের মনকে আকর্ষণ করে। আমাদের দেশের স্ত্রীলোকের চিরন্তন আইডিয়ার সঙ্গে ঐ সিঁদূর আলতা পরা জড়িত হইয়া আছে—এইজন্যই দেশের মেয়েদের ভালবাসি বলিয়াই সিঁদূর ও আলতাকে আমরা কুৎসিত বলিয়া মনে করি না।···সিঁদূর প্রায় অন্য কোনো সৌন্দর্য্য আমি দেখি না—কিন্তু না পরায় দেশী মেয়েলিত্বের অভাবে আমাদের মনকে আঘাত দেয়—দেশী মেয়েদের মধ্যে আমরা বরাবর যাহা দেখিয়া আসিয়াছি তাহা না দেখিতে পাইলে একটা রসভঙ্গ ঘটে। কিন্তু দেশের সঙ্গে হৃদয়ের বন্ধন বিচ্ছিন্ন করিলে ঠিক উল্টা হয়। দেখিয়াছি তোমার ছোট ভাইরাও আলতা সিঁদূর দেখিলে উত্তেজিত হইয়া উঠে—ইহাতে বুঝিতে পারি দেশের সমস্ত নিরীহ প্রথার সঙ্গেও নিজেকে বিশ্লিষ্ট করাকে তোমরা যেন কতকটা কর্তব্যের মধ্যে গণ্য কর। ইহা মনে রাখিয়ো, দেশে সর্বাগ্রে আমাদের বাড়ির মেয়েরাই জুতামোজা পরিয়াছিলেন, তখন সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের জন্মই হয় নাই কিন্তু তাই বলিয়া আমরা সিঁদূর আলতা দেখিলেই ব্যস্ত হইয়া উঠিতে শিখি নাই—বিদেশ হইতে সুবিধাগুলি লইব কিন্তু সেইজন্যই বিশেষ করিয়া দেশের জিনিষের উপর হৃদয়ের শ্রদ্ধা রাখিতে হইবে।···বরকে বরণ করাও তাই—গায়ে হলুদও সেইরূপ। এগুলি যুক্তি তর্কের জিনিষ নয়—এগুলি প্রেমের জিনিষ, দেশের জিনিষ, এই অনুষ্ঠানগুলির দ্বারা আমরা দেশের সর্ব্বসাধারণের এবং দেশের প্রাচীনকালের সহিত যুক্ত—এগুলিকে অবজ্ঞা করিয়া পরিত্যাগ করিতে আমাদের হৃদয়ে বেদনা বোধ হয়। আমরা ঠিক কি ভাবে আমাদের হিন্দুপ্রথাকে দেখি এবং প্রেমের সহিত রাখিতে চাই তাহাই তোমাকে জানাইলাম। তুমি এ সকল গ্রহণ করিবে বলিয়া লিখিতেছি তাহা নহে—কারণ সংস্কার বড় কঠিন জিনিষ।[২৯]

নানা কারণেই পত্রটি উল্লেখযোগ্য—সাধারণ ব্রাহ্মসমাজে 'ব্রাহ্মিকতা'র যে বাড়াবাড়ি তিনি প্রত্যক্ষ করেছিলেন, নাম না করে নৌকাডুবি-র অক্ষয় ও গোরা-র পানুবাবুর চরিত্রায়নে তার প্রতি কটাক্ষ করে উক্ত সমাজের সমালোচনাভাজন হয়েছিলেন তিনি—কিন্তু আমরা এটিকে উদ্ধৃত করেছি আদি ব্রাহ্মসমাজভুক্ত পরিবারের কন্যাকে বিবাহ করা সম্বন্ধে নগেন্দ্রনাথের সম্প্রদায়গত মানসিক বিরুদ্ধতার রূপটি স্পষ্ট করার জন্য। নগেন্দ্রনাথ তাঁর ডায়ারিতে লিখেছেন, পারিবারিক উন্নতির আশায় আমেরিকা যাওয়ার জন্য তিনি বিভিন্ন ব্যক্তির কাছে অর্থসাহায্য চেয়ে যখন কোথাও-কোথাও অপমানিতও হচ্ছিলেন তখন এই বিবাহপ্রস্তাব

উত্থাপিত হয় এবং মানসিক বিরোধিতা সত্ত্বেও তিনি বিবাহে স্বীকৃত হন। 14 Sep [শনি ২৮ ভাদ্র] তাঁর ডায়ারিতে আমেরিকা যাবার সাহায্যপ্রার্থী হয়ে বিবাহ করা সম্পর্কে তিনি লিখেছেন : 'লাভের হিসাব গণনা করি নাই বরং ক্ষতিই স্বীকার করিয়াছি। ঐ যে বিবাহপদ্ধতির জন্য আমার মত ও বিশ্বাসকে খাটো করিতে হইয়াছে, যাহা আমি কুসংস্কার ও অনাবশ্যক বলিয়া মনে করি, তাহা করিতে স্বীকৃত হইয়াছি ইহাই কি এক হিসাবে আমার পক্ষে ক্ষতি নয়?' এই মানসিক চাপ কিঞ্চিদধিক সতেরো বছরের একটি তরুণের পক্ষে অনেক বেশি, পরবর্তীকালেও বাক্যে ও ব্যবহারে নগেন্দ্রনাথের চরিত্রে সংযমের অভাব দেখা যায়। সুতরাং বিবাহসভায় অসংগত আচরণ করা তাঁর পক্ষে অস্বাভাবিক নয়। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের পূর্বোদ্ধৃত পত্রই প্রমাণ করে যে, নগেন্দ্রনাথের প্রকৃতি তিনি অনেকটাই বুঝতে পেরেছিলেন। তবু কন্যাদায় থেকে মুক্ত হবার আগ্রহে তিনি তা উপেক্ষা করেন। নিজের এই অন্যায় সম্পর্কে তিনি ক্রমেই সচেতন হয়েছেন—'নগেনের জন্যে আমিই দায়ী এ কথা ত কোনোদিন আমি ভুলতে পারব না', এই বাক্য তাঁর চিঠিতেই আছে। এমন-কি, মীরা দেবীর অত্যন্ত দুঃখের দিনে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন রথীন্দ্রনাথকে : 'ওর জীবনের প্রথম দণ্ড ত আমিই ওকে দিয়েচি—ভাল করে না ভেবে না বুঝে আমিই ওর বিয়ে দিয়েছি। যখন দিচ্ছিলুম তখন মনে খুব একটা উদ্বেগ এসেছিল; —বিয়ের রাত্রে মীরা যখন নাবার ঘরে ঢুক্‌ছিল তখন একটা গোখ্‌রো সাপ ফস্‌ করে ফণা ধরে উঠেছিল—আজ আমার মনে হয় সে সাপ যদি তখনি ওকে কাট্‌ত তাহলে ও পরিত্রাণ পেত।'[৩০] কত দুঃখে রবীন্দ্রনাথের মতো স্নেহশীল পিতা এমন কঠোর বাক্য লিখতে পারেন তা সহজেই অনুমান করা যায়। কিন্তু যে ভুল গোড়াতেই করা হয়েছিল, তাকে ক্রমাগতই বাড়িয়ে যাওয়া হয়েছে—এবং তা উভয়তই।

বিবাহানুষ্ঠানের দু'একদিন পরেই রবীন্দ্রনাথ কন্যা-জামাতাকে নিয়ে কলকাতায় আসেন। তাঁকে ২৬ জ্যৈষ্ঠ [রবি 9 Jun] 'পিপুলপটী'তে ও ২৭ জ্যৈষ্ঠ বালিগঞ্জে যাতায়াত করতে দেখা যায়। সম্ভবত ২৮ জ্যৈষ্ঠ [মঙ্গল 11 Jun] তিনি কন্যাকে তাঁর শ্বশুরবাড়ি বরিশালে নিয়ে যান। এই দিন তিনি শান্তিনিকেতনে ভূপেন্দ্রনাথ সান্যালকে একটি পত্র লেখেন, কিন্তু পত্রটি শনাক্ত করা যায়নি।

বরিশাল থেকে রবীন্দ্রনাথ চট্টগ্রামে যান ২ আষাঢ় [সোম 17Jun] তারিখে। পূর্ণেন্দু দস্তিদার 'স্বাধীনতা সংগ্রামে চট্টগ্রাম' [চট্টগ্রাম, ১৩৭৪] গ্রন্থে এই ভ্রমণের বিস্তারিত বিবরণ লিখেছেন। অধ্যাপক ড প্রতাপচন্দ্র মুখোপাধ্যায় চট্টগ্রামের 'আজাদী' পত্রিকায় [৩, ১০, ১৭ কার্তিক ১৩৯১] 'চট্টগ্রামে রবীন্দ্রনাথ'-শীর্ষক দীর্ঘ গবেষণামূলক প্রবন্ধে এই গ্রন্থটি ও অন্যান্য তথ্যের সমবায়ে রবীন্দ্রনাথের চট্টগ্রাম-ভ্রমণের যে পূর্ণাঙ্গ বিবরণ সংকলন করেন আমরা তার প্রাসঙ্গিক অংশটি উদ্ধৃত করছি :

কনিষ্ঠা কন্যা মীরাকে পাত্রস্থ করে রবীন্দ্রনাথ বরিশালে যাবেন, সম্ভবতঃ এমন কোন সংবাদ পেয়ে চট্টল হিতসাধনী সভার অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ও চট্টগ্রাম জজ কোর্টের তরুণ উকিল উৎসাহী যামিনীকান্ত সেন (১৮৮১-১৯৪৯) কবিকে চট্টগ্রাম যাওয়ার জন্য আমন্ত্রণ জানান।* রবীন্দ্রনাথ সে আমন্ত্রণ গ্রহণ করেন। রবীন্দ্রনাথকে সম্বর্ধনা জানানোর জন্য চট্টগ্রামের উৎসাহী সাহিত্যিক ও জননায়কদের মধ্যে কবি শশাঙ্ক মোহনের পিতা সাহিত্যপ্রাণ ব্রজকুমার সেন ছিলেন অন্যতম। বরিশাল সফর শেষ করে রবীন্দ্রনাথ সদলবলে ১৯০৭ খৃষ্টাব্দের ১৭ই জুন চট্টগ্রাম রেলওয়ে ষ্টেশনে এসে পৌঁছান। শের-এ-চট্টগ্রাম কাজেম আলী, ত্রিপুরাচরণ চৌধুরী প্রমুখ নেতারা ষ্টেশন-কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ করে সমস্ত ষ্টেশনটি ইতিপূর্বেই সজ্জিত করে রেখেছিলেন। ষ্টেশনে কবিকে যথারীতি সম্বর্ধনা জানানোর পর তাঁকে পুষ্প সজ্জিত ঘোড়ার গাড়িতে করে হাসপাতালের পাহাড়ের উত্তর দিকে যামিনীকান্ত সেনের দ্বিতল বাড়ীতে আনা হয়। ঐ বাড়ির সম্মুখস্থ মাঠে রবীন্দ্রনাথকে দেখার জন্য বিভিন্ন সম্প্রদায়ের প্রভূত জনসমাগম হয়। কমলবাবুর থিয়েটার হলে* রবীন্দ্রনাথকে নাগরিক সম্বর্ধনা দানের ব্যবস্থা হয়েছিল। চট্টগ্রামের দেশপ্রেমিক ও সংস্কৃতিমনা অনেক বিশিষ্ট হিন্দু মুসলিম রবীন্দ্রনাথের দেশাত্মবোধক বক্তৃতা শোনার জন্য ঐ সভায় উপস্থিত ছিলেন।···(১৮ জুন, ১৯০৭)···সম্বর্ধনার উত্তরে রবীন্দ্রনাথ দেশের তৎকালীন সঙ্কটজনক অবস্থার বিষয় সংক্ষেপে উল্লেখ করে জানান যে প্রাচীন বা মধ্যপন্থী এবং নবীন বা উগ্রপন্থী কোন দলই প্রকৃত কাজ করছেন না, কেননা দেশের অতি সাধারণ মানুষদের ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে এসে তাদের নিয়ে কাজ কোন পক্ষই করছেন না, অথচ এটাই এখন সবচেয়ে বেশী

জরুরী। ['বন্দেমাতরম, ২০শে জুন ১৯০৭']···কমলবাবুর থিয়েটার হলে সেদিন সভার কার্য শেষ হলে সঙ্গীত রসিক ব্রজকুমার সেন যথারীতি রবীন্দ্রনাথকে একটি গান গাইবার জন্য অনুরোধ করেন। 'তখন কবিভক্তেরা উহাতে মৃদু আপত্তি জানাইলে রবীন্দ্রনাথ বলেন, আমি কবির পিতার আবদার অগ্রাহ্য করিতে পারি না। তৎপর তিনি একটি গান করেন।' ['কবি ভাস্কর শশাঙ্কমোহন স্মারক গ্রন্থ (১৯৭৩) ধৃত ধীরেন্দ্রনাথ বিশ্বাসের প্রবন্ধ শশাঙ্কস্মৃতি, পৃঃ ৯৩'][৩১]

চট্টগ্রামে রবীন্দ্রনাথ শুধু রাজনৈতিক বিষয়েই আলোচনা করেননি, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের শাখা স্থাপন করার জন্যও সাহিত্যমোদীদের উৎসাহিত করেন। ১১ আষাঢ় [বুধ 26 Jun] কলকাতা থেকে তিনি রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীকে লিখেছেন :

আমি এবার বরিশাল ও চট্টগ্রামে গিয়াছিলাম। দুই জায়গাতেই সাহিত্য পরিষদের শাখা স্থাপন করিবার জন্য উপযুক্ত ব্যক্তিদিগকে উৎসাহিত করিয়া আসিয়াছি। তাঁহারা জানিতে চান তাঁহাদের জেলা হইতে কিরূপ তথ্য সংগ্রহ করা আবশ্যক। একটা প্রশ্নের তালিকার মত করিয়া দিলে জেলার নানা স্থান হইতে তাহার উত্তর তাঁহারা আনাইয়া লইতে পারেন। ভিন্ন জেলার উপভাষাগুলির তৌলন ব্যাকরণের উপকরণ সংগ্রহের জন্য কিরূপ ব্যবস্থা করা যাইতে পারে তাহারও বিবরণ চান। একটু ভাল করিয়া চিন্তা করিয়া এই কাজটি সারিয়া ফেলুন।[৩২]

বিষয়টি তাঁর মন অধিকার করে ছিল। ১৭ আষাঢ় [মঙ্গল 2 Jul] তিনি রামেন্দ্রসুন্দরকে শান্তিনিকেতনে আহ্বান করে লেখেন : 'এখানে আসিলে মফস্বল পরিষদের সম্বন্ধেও আলোচনা হইতে পারিবে।' ১৩ শ্রাবণের [সোম 29 Jul] পত্রেও তিনি 'প্রশ্নাবলী'র কথা স্মরণ করিয়ে দেন। চট্টগ্রামের শাখাটি অবশ্য প্রতিষ্ঠিত হয় চার বছর পরে ৩০ শ্রাবণ ১৩১৮ [মঙ্গল 15 Aug 1911] তারিখে।[৩৩]

চট্টগ্রাম থেকে রবীন্দ্রনাথ ৩ আষাঢ় [মঙ্গল 18 Jun] মীরা দেবীকে একটি পত্র লেখেন; এই পত্রে তাঁকে পড়াশুনো চালিয়ে যাওয়ার উপদেশ দিয়ে তিনি লিখেছেন : 'Bride of Lammermoor তোর প্রায় শেষ হয়ে এসেছে শুনে খুসি হলুম—ঐ রকম যতগুলো পারিস্ শেষ করে ফেলিস্। Kenilworth বলে স্কটের একটা বই আছে সেটাও অত্যন্ত দুঃখের—যদি শোকের কাহিনী পড়তে আপত্তি না থাকে তবে সেটা দেখতে পারিস্।'[৩৪] এই চিঠিতেই তিনি কৌতুক করে লিখেছেন : 'মজা দেখেছিস্ মীরা—আমিও চলে এলুম অমনি তোদের ওখানে বৃষ্টির অভাবে হাহাকার পড়ে গেল এখানে অতিবৃষ্টিতে লোকে মাথায় হাত দিয়ে পড়েছিল—আমি আসতেই বৃষ্টি ধরে গেছে। এর থেকে কি প্রমাণ হয় বল দেখি! আমার জীবনচরিত যখন লেখা হবে আশা করি গ্রন্থকর্ত্তা এই বৃত্তান্তটি নিয়ে একটু বিশেষভাবে আলোচনা করে দেখবেন।'

জ্যৈষ্ঠ ১৩১৪-তে সাময়িকপত্রে রবীন্দ্ররচনার প্রকাশসূচীটি নিতান্ত ছোট। জ্যৈষ্ঠ-সংখ্যা বঙ্গদর্শন [৭।২] প্রকাশিত হয় 4 Jul [বৃহ ১৯ আষাঢ়]। এই সংখ্যায় তাঁর একটি মাত্র রচনাই মুদ্রিত হয় :

১১০-১১ 'প্রার্থনা' ['আমার মাথা নত করে দাও হে'] দ্র গীতাঞ্জলি ১১।৫ [১]

গানটি ইতিপূর্বেই ১৩১৩ বঙ্গাব্দের মাঘোৎসবে গীত ও ফাল্গুন ১৮২৮ শক [১৩১৩]-সংখ্যা তত্ত্ববোধিনী-তে [পৃ ১৮০-৮১; ইমন কল্যাণ-তেওরা] মুদ্রিত হয়েছিল। গানটির পাণ্ডুলিপি পাওয়া যায়নি, রচনা-কাল ও -স্থানও জানা যায় না।

সঙ্গীত-প্রকাশিকা, জ্যৈষ্ঠ ১৩১৪ [৬।৯] :

১৭৭-৭৯ ইমন ভূপালী-একতালা। ভুবনেশ্বর হে দ্র স্বর ২৪

১৮৩-৮৫ ভৈরবী-ঝাঁপতাল। কেন এলিরে, ভালবাসিলি দ্র ঐ ৪৮

প্রথম গানটির স্বরলিপি করেন কাঙালীচরণ সেন ও দ্বিতীয় গানটির স্বরলিপিকার ইন্দিরা দেবী।

চট্টগ্রাম থেকে রবীন্দ্রনাথ কলকাতায় ফিরে আসেন ৬ আষাঢ় [শুক্র 21 Jun] —'শ্রীযুক্ত খোদ বাবু মহাশয়ের শিয়ালদহার ষ্টেশন হইতে আসার ও সুখীয়া ষ্ট্রীট যাতায়াতের গাড়ী ভাড়া ৬ আষাঢ়'। তিনি এদিন ছ'টি পত্র প্রেরণ করেন, যাদের একটিরও সন্ধান মেলে না। এই সময়ে নগেন্দ্রনাথের আমেরিকা যাওয়ার আয়োজন চলেছে। ৬ আষাঢ় 'এমেরিকায় গমনের দ্রব্যাদি ক্রয়' করা ১০০ টাকার, ১১ আষাঢ় [বুধ 26 Jun] সত্যপ্রসাদের কাছ থেকে ৭২১ টাকা ৫ আনা 'হাওলাত' করে জাহাজের টিকিট প্রভৃতি কেনা হয়, ১২ আষাঢ় নগেন্দ্রনাথ স্টীমারে জিনিসপত্র রেখে আসেন ও এইদিন মীরা দেবীর একটি ছবিও তোলা হয়—নগেন্দ্রনাথ আমেরিকা যাত্রা করেন ১৩ আষাঢ় [শুক্র 28 Jun]।

রবীন্দ্রনাথও ১৩ আষাঢ় পর্যন্ত কলকাতায় ছিলেন। তাঁকে ৭ আষাঢ় থ্যাকার কোম্পানিতে, ৮ আষাঢ় বালিগঞ্জ এবং ১১ আষাঢ় পার্শিবাগান ও বালিগঞ্জ যেতে দেখা যায়। জগদীশচন্দ্র তাঁর কন্যা-জামাতাকে দেখতে চেয়েছিলেন, পার্শিবাগানে হয়তো সেই কারণেই গিয়েছিলেন—বালিগঞ্জেও হয়তো একই উদ্দেশ্যে যাওয়া হয়েছিল।

এই সময়ে লেখা তাঁর দুটি চিঠি আমরা পেয়েছি। বলেন্দ্রনাথের স্ত্রী সাহানা দেবী পিতৃগৃহ এলাহাবাদ থেকে তাঁকে একটি চিঠি লেখেন, রবীন্দ্রনাথ তাঁর উত্তর দেন ১০ আষাঢ় [মঙ্গল 25 Jun] : 'আমাদের বিদ্যালয়ে science পড়াইবার সুবিধা আছে বটে কিন্তু বিদ্যালয়ের laboratoryতে তোমাকে শিক্ষা দিতে গেলে সকলের সাম্‌নে তোমাকে বাহির হইতে হইবে—সে কি সম্ভব হইবে?'[৩৫] ১১ আষাঢ় তিনি রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীকে যে পত্র লেখেন তার কথা আমরা আগেই উল্লেখ করেছি।

১৩ আষাঢ় [শুক্র 28 Jun] নগেন্দ্রনাথ আমেরিকার পথে ইংলণ্ড রওনা হন। তাঁর যাত্রার পূর্বে উপাসনা করে রবীন্দ্রনাথ যে উপদেশ দেন, নগেন্দ্রনাথ তাঁর ডায়ারিতে তার অনুলেখন রক্ষা করেছেন :

৭টার সময় উপাসনা আরম্ভ হইল। ভক্তিভাজন শ্বশুর মহাশয় আমার হৃদয়ের সকল বেদনা ও বিষাদ দূর করিয়া দিবার নিমিত্ত এক উত্তেজনাপূর্ণ sermon দিলেন। ···তিনি বলিলেন—"বৎস নগেন্দ্র, পাখী যেমন প্রভাতের নবোদিত সূর্য্যের কিরণ রশ্মি দেখিয়া উৎসাহে আনন্দে কলরব করিতে করিতে আপনার নীড় ত্যাগ করিয়া খাদ্যান্বেষণে বাহির হয় তুমি আজ সেইপ্রকার আনন্দিত ও উৎসাহিত চিত্তে আপনার সুখময় গৃহ ছাড়িয়া জ্ঞানান্বেষণে বাহির হও। সুদূর দেশ ও দেশান্ত হইতে তোমার আহ্বান আসিয়াছে। হৃদয় হইতে আজ সকল বিষাদ, নিরাশা ও দুশ্চিন্তা অপসারিত করিয়া তুমি গমন কর। বীরের মত, পুরুষের মত, কর্ম্মক্ষেত্রে আপনার শক্তির উৎকর্ষ সাধন করিয়া বিহঙ্গের ন্যায় কলধ্বনি করিতে করিতে তুমি তোমার গৃহে প্রত্যাগমন কর। বিদায়ের কালে চিত্ত হইতে সকল বিষাদ দূর করিয়া দাও। বিধাতা তোমাকে কর্ম্মক্ষেত্রে ডাকিয়াছেন—সমুদ্র তোমাকে আহ্বান করিতেছে—প্রকৃতির নব নব সৌন্দর্য্য তোমাকে আকর্ষণ করিতে চাহিতেছে। তোমাকে বিভিন্ন জাতি মানবের সঙ্গে মিশিতে হইবে—নূতন দেশ, নূতন দৃশ্য তোমার চিত্তকে আনন্দিত করিবে। আজ তোমাকে আর কি বলিব। নিজকে সুসংযত রাখিয়া বীরের মত সকল অবস্থার সঙ্গে সংগ্রাম করিবে। কর্ম্মক্ষেত্রে অদম্য উৎসাহ ও আশার সঙ্গে কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইবে। কোন প্রকার চিন্তা, ভাব তোমার কর্ম্মে শৈথিল্য না আনিয়া দেয় সেদিকে দৃষ্টি রাখিও। তুমি বিদেশে যাইয়া জ্ঞান, মান, অর্জ্জন করিয়া ধনশালী হও আমি তাহা একমাত্র উদ্দেশ্য মনে করিনা। কিন্তু যাহা "মনুষ্যত্ব" তাহা অর্জ্জন করিয়া জীবন সফল কর এইটুকু চাই। আর ঈশ্বরের দিকে আপনার সমগ্র চিত্তকে উন্মুখ রাখিও। সংসারের হিসাবে সুখদুখ লাভক্ষতি, মান অপমান ঐশ্বর্য্য-দারিদ্রতার [যদ্দৃষ্টং] গণনা করিও না। একমাত্র পূর্ণমঙ্গল ও পূর্ণানন্দের ভিতর দিয়া জীবনের সকল ঘটনার বিচার করিও। কিছুতেই দমিয়া যাইও না—ঈশ্বরের মঙ্গলইচ্ছার অধীন থাকিয়া মানুষের মত সংসারের পথে আগুয়ান হও। পিতামাতা প্রিয়জন ছাড়িয়া যাইতেছ সেইজন্য তোমার নিশ্চয়ই ক্লেশ হইতেছে। আজ তাহা দূর করিতে চেষ্টা কর। সেই প্রেমময় দেবতার ভিতর দিয়া আমাদের স্নেহ, ভালবাসা, ও প্রিয়জনের প্রেম তোমাকে অভিষিক্ত করিবে। তুমি উৎফুল্ল হৃদয়ে আজ আমাদের কাছ হইতে বিদায় লও।

দেশের যে সময় তুমি যাইতেছ তাহা ত দেখিতেই পাইতেছ। মনে২ এই সংকল্প করিয়া যাও যে বিদেশ হইতে এমন কিছু অর্জ্জন করিয়া আনিবে, যাহা তুমি তোমার দেশকে আনিয়া দিতে পার। দেশের প্রতি তোমার কর্ত্তব্য তাহা হইলে পালন করিতে পারিবে। সর্ব্বদা দেশের কথা, স্বজাতির দুর্দ্দশা স্মরণে রাখিও। নির্ভয়ে নির্ভীক পুরুষের মতন সকল প্রলোভন ও পরীক্ষা উত্তীর্ণ করিয়া বিদেশ ও বিভিন্ন জাতির ভাণ্ডার হইতে তোমার জন্মভূমির জন্য একখানি অর্ঘ রচনা করিয়া আনিয়া মায়ের চরণে ঢালিয়া দিবে—এই সংকল্প কর। ঈশ্বর তোমাকে আশীর্ব্বাদ করুন—আমাদের হৃদয়ের সমগ্র প্রার্থনা এই তুমি মনুষ্যত্ব লাভ করিয়া আত্মীয় স্বজন ও দেশের কল্যাণ সাধন কর। যাও, উৎফুল্ল চিত্তে, বিদায় হও।****

উপদেশান্তে অতি সংক্ষেপে একটী প্রার্থনা করিলেন।[৩৬]

এর পরেই নগেন্দ্রনাথ জাহাজ ধরতে যান, রবীন্দ্রনাথও এই দিনই মীরা ও মাধুরীলতাকে নিয়ে শান্তিনিকেতনে ফিরে আসেন।

জাতীয় শিক্ষাপরিষদে পাঠ করার জন্য 'সাহিত্যসৃষ্টি' প্রবন্ধ লেখা হয়েছিল অনেক আগেই, কিন্তু পরিষদের গ্রীষ্মবকাশ ও রবীন্দ্রনাথের ব্যস্ততার জন্য প্রবন্ধটি পড়া হয়নি। এবিষয়ে তাগিদ দিলে তিনি ১৭ আষাঢ় [মঙ্গল 2 Jul] রামেন্দ্রসুন্দরকে লেখেন : 'আমি দীর্ঘকাল এখানে অনুপস্থিত ছিলাম। এখন যে প্রবন্ধ পাঠের জন্য আবার কলিকাতা যাতায়াত করিব এমন সম্ভাবনা বিরল। যদি কোনো জরুরি কাজে নাকে দড়ি দিয়া কলিকাতায় টানিয়া লইয়া যায় তবেই রাজধানীতে আমার শুভাগমন হইবে এবং তদুপলক্ষ্যে প্রবন্ধ পাঠ করাও অসম্ভব নহে।'[৩৭] কিন্তু কয়েকদিন পরেই ২২ আষাঢ় [রবি 7 Jul] কলকাতায় তাঁর 'শুভাগমন' ঘটল। ২৩ আষাঢ় তিনি পার্শিবাগানে জগদীশচন্দ্রের কাছে যান ও ২৪ আষাঢ় [মঙ্গল 9 Jul] সন্ধ্যা ছ'টার সময়ে পরিষদে তাঁর প্রবন্ধটি পাঠ করেন। এই দিনই বেঙ্গলী-তে বিজ্ঞপ্তিটি মুদ্রিত হয় : 'Babu Rabindra Nath Tagore will deliver the fourth of the series of Extension lectures on "Comparative Literature" in the premises of the National College to-day at 6 o'clock in the afternoon.' ভূপেন্দ্রনাথ সান্যালকে রবীন্দ্রনাথ নিজেই খবরটি দিয়েছেন এই দিন : 'আজ বিকালে ন্যাশনাল কলেজে সাহিত্য সম্বন্ধে আমার প্রবন্ধ পড়িতে হইবে।'[৩৮] সুবোধচন্দ্র মল্লিক বিদ্যালয়ের বিল্‌ডিং ফাণ্ডে ৫০ টাকা দিয়েছেন, এই খবরও তিনি জানিয়েছেন চিঠিটিতে।

প্রথম তিনটি ভাষণে রবীন্দ্রনাথ সৌন্দর্যতত্ত্বের আলোচনায় মঙ্গল ও সত্যের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক এবং সাহিত্যের মাধ্যমে তার আস্বাদনের স্বরূপ সম্বন্ধে তাঁর বক্তব্য প্রকাশ করেছিলেন। 'সাহিত্যসৃষ্টি' [দ্র বঙ্গদর্শন, আষাঢ়। ১১৩-২৬; সাহিত্য ৮।৩৯৯-৪১৪] প্রবন্ধে বিষয়টিকে তিনি উপস্থাপিত করলেন দেশ ও কালের পরিপ্রেক্ষিতে। তিনি বললেন, যেমন একটি সুতোকে অবলম্বন করে মিছরির কণাগুলো দানা বেঁধে ওঠে তেমনি আমাদের মনের মধ্যে কোনো-একটি সূত্র অবলম্বন করতে পারলে অনেক বিচ্ছিন্ন ভাব তার চার দিকে দানা বেঁধে আকৃতি লাভ করতে চেষ্টা করে। সাহিত্যজগতেও সেই চেষ্টা আছে। সেই চেষ্টার ফলেই বিক্ষিপ্ত ভাবপুঞ্জ আকার ধারণ করে ওঠে ও এক মনের ভাবনা আর-এক মনের মধ্যে সার্থকতালাভের চেষ্টায় অপরের উপযোগী হয়ে প্রকাশরূপ লাভ করে। তাই 'দাশুরায়ের পাঁচালি দাশরথির ঠিক একলার নহে; যে সমাজ সেই পাঁচালি শুনিতেছে, তাহার সঙ্গে যোগে এই পাঁচালি রচিত।' মানুষের সমাজে কখনও-কখনও ভাবের বাষ্প প্রচুরপরিমাণে বিচরণ করতে থাকে, চৈতন্যের পরে বাংলাদেশ বা ফরাসিবিদ্রোহের সময়ের য়ুরোপ তার উদাহরণ। মানুষের মন যে-সব অব্যক্ত ভাবকে নিরন্তর উচ্ছ্বসিত করে দেয়, এক-এক জন কবির কল্পনা এক-একটি আকর্ষণকেন্দ্র হয়ে তাদেরই এক-এক দলকে কল্পনাসূত্রে গ্রথিত করে সকলের কাছে সুস্পষ্ট করে তোলে। তাতেই আমাদের আনন্দ হয়। কেন-না, আপনাকে আপনি দেখবার যে চেষ্টা সমস্ত মানবমনে কেবলই কাজ করছে এইরূপ ঐক্যের মধ্যে নিজের কোনো-একটা বিকাশকে প্রত্যক্ষ করে মানুষ সেই নিয়তচেষ্টার সার্থকতা উপলব্ধি করে। আর সেই কারণেই সাহিত্যবিচারকের কাজ 'কোন্ কবির কল্পনায় মানুষের হৃদয়ের কোন্ বিশেষ রূপ ঘনীভূত হইয়া আপন অনন্ত বৈচিত্র্যের একটা অপরূপ প্রকাশ সৌন্দর্যের

দ্বারা ফুটাইয়া তুলিল’ তাকেই সমগ্ররূপে দেখানো—কেবল কবির উপমা বা ভাষা ভালো, কোনো সর্গের বর্ণনা সুন্দর বা কোথাও করুণরসের প্রাচুর্য আছে, এই আলোচনা যথেষ্ট নয়। তেমন করে দেখলে সাহিত্যের কেবল ভালোমন্দ বিচার করে ক্ষান্ত থাকা যায় না, তার বিকাশের প্রণালী ও বৃহৎ কার্যকারণ সম্বন্ধে বিচারের আগ্রহ জন্মায়।

‘গ্রাম্যসাহিত্য’ [ভারতী, ফাল্গুন-চৈত্র ১৩০৫] প্রবন্ধে তিনি ইতিপূর্বে যা লিখেছিলেন, তারই জের টেনে এখানে বললেন, দেশের সাধারণ লোকের মধ্যে কতকগুলি ভাব প্রথমে টুকরো কাব্যের আকারে ঝাঁক বেঁধে বেড়ায় পরে একজন কবি একটি বড় কাব্যের সূত্রে তাদের সংহত করেন; তারও পরে একজন রাজসভার কবি সেই গ্রাম্যকথাগুলিকে আত্মসাৎ করে মার্জিত ছন্দে ও গম্ভীর ভাষায় বড়ো করে দাঁড় করিয়ে দেন। মহাকাব্য-চতুষ্টয়ের উৎপত্তি অনেকটা এই পথেই হয়েছে। একজন বড় কবি এদের কাঠামোগুলি গড়ে দিয়েছিলেন, তাতে সন্দেহ নেই। পরে নানা খণ্ডগাথা ক্রমে ক্রমে স্তরে স্তরে জোড়া লেগে এক হয়ে উঠেছে। ‘প্রথমে নানামুখে প্রচলিত খণ্ডগানগুলা একটা কাব্যে বাঁধা পড়িয়া আবার যখন বহুকাল ধরিয়া সর্বসাধারণের কাছে গাওয়া হইতে থাকে, তখন আবার তাহার উপরে নানা দিক হইতে নানা কালের হাত পড়িতে থাকে। সেই কাব্য দেশের সকল দিক হইতেই আপনার পুষ্টি আপনি টানিয়া লয়। এমনি করিয়া ক্রমশই তাহা সমস্ত দেশের জিনিস হইয়া উঠে। তাহাতে সমস্ত দেশের অন্তঃকরণের ইতিহাস, তত্ত্বজ্ঞান, ধর্মবোধ, কর্মনীতি আপনি আসিয়া মিলিত হয়।’ আমাদের দেশে রামায়ণ-মহাভারত, বিশেষত মহাভারত, এর দৃষ্টান্তস্থল। রবীন্দ্রনাথ রামায়ণের বিস্তৃত আলোচনা করে এই বিকাশের ইতিহাসটি বর্ণনা করেছেন।

কিন্তু সেই বিকাশ কেবল প্রাচীন যুগেই সীমাবদ্ধ থাকেনি। মধ্যযুগে কৃত্তিবাস [এবং তুলসীদাস] অবতার রামচন্দ্রকে ভক্তবৎসল করে তুলে তাঁকে যুগোপযোগী মাহাত্ম্য দান করেছিলেন। আধুনিক যুগে মেঘনাদবধকাব্যে তার আরও একটি পরিবর্তন দেখা গেছে। অনেকে বলেন, ইংরেজি শিখে এই যে সাহিত্য রচিত হচ্ছে এ খাঁটি জিনিস নয়, এ সাহিত্য দেশের সাহিত্য বলে গণ্য হত পারে না। রবীন্দ্রনাথ সে-কথা স্বীকার করেননি। তিনি বলেন, ‘মানুষের সমাজে ভাবের সঙ্গে ভাবের মিলন হয়, এবং সে মিলনে নূতন নূতন বৈচিত্র্যের সৃষ্টি হইতে থাকে।’ মুসলমান-শাসনের সময়েও হিন্দুভাবের সঙ্গে সেমেটিক-ভাবের মিশ্রণে শিল্পসাহিত্য বেশভূষা রাগরাগিণী ধর্মকর্ম নূতন রূপ প্রাপ্ত হয়েছে, পাশ্চাত্য ভাবের সংঘাতও তেমনি রামায়ণকথাকে নববৈচিত্র্য দান করেছে মেঘনাদবধকাব্যে। এ কোনো ব্যক্তিবিশেষের খেয়াল নয়, দেশ জুড়ে এর আয়োজন চলছিল। মানুষের সাহিত্য যে ভাবের সৃষ্টি চলছে তার স্থিতিগতির ক্ষেত্র অতি বৃহৎ। তা দেখতে আকস্মিক হলেও ‘সম্মিলিত মানবের বৃহৎ মন, মনের নিগূঢ় এবং অমোঘ নিয়মেই আপনাকে কেবলই প্রকাশ করিয়া অপরূপ মানসসৃষ্টি সমস্ত পৃথিবীতে বিস্তার করিতেছে।’

প্রবন্ধপাঠের পর রবীন্দ্রনাথ কয়েকদিন কলকাতায় ছিলেন—২৫ আষাঢ় [বুধ 10 Jul] যান পার্শিবাগানে জগদীশচন্দ্রের কাছে—তার পরেই শিলাইদহ যাত্রা করেন।

13 Jul [শনি ২৮ আষাঢ়] গদ্যগ্রন্থাবলী-র দ্বিতীয় ভাগ ‘প্রাচীন সাহিত্য’ প্রকাশিত হয়।পৃষ্ঠাসংখ্যা : ২+২+২ [সূচী] +৮৭; মুদ্রণসংখ্যা : ১০৫০।

অর্ধ-নামপত্র : প্রাচীন সাহিত্য।

আখ্যাপত্র : গদ্যগ্রন্থাবলী, ২য় ভাগ/ প্রাচীন সাহিত্য।/ শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।/ মুল্য ৷৷০ আট আনা।

[পরপৃষ্ঠায়] : প্রকাশক—শ্রীসুহাসচন্দ্র মজুমদার।/ মজুমদার লাইব্রেরি, ২০ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা।/ কলিকাতা, ২০ নং কর্ণওয়ালিস্ স্ট্রীট দিনময়ী প্রেসে/ শ্রীহরিচরণ মান্না দ্বারা মুদ্রিত।

সূচী :

'ধম্মপদং' প্রবন্ধটি ইতিপূর্বে ভারতবর্ষ [১৩১২] গ্রন্থে সংকলিত হয়েছিল, কিন্তু গদ্যগ্রন্থাবলী-তে ভারতবর্ষ অন্তর্ভুক্ত না হওয়ায় এটি বর্তমান সংকলনে গৃহীত হয়।

প্রকাশের দিনই 'গদ্যগ্রন্থাবলির ২ ভাগ মজুমদার লাইব্রেরী হইতে ৯৮৫ খানা' জোড়াসাঁকোয় আনানো হয়।একটি পাঠানো হয় লোকেন্দ্রনাথ পালিতকে—ভি পি ডাকে পাঠানো হয় বর্ধমানের উকিল মোহিনীমোহন মিত্র, যতীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য ও বহরমপুরের রাধাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়কে। গদ্যগ্রন্থাবলীর বিভিন্ন ভাগ এই পদ্ধতিতে বিক্রয়ের উদাহরণ আরও আছে।

বঙ্গদর্শন-এর আষাঢ়-সংখ্যা [৭।৩] প্রকাশিত হয় আষাঢ়ের শেষ দিনে [16 Jul]। এই সংখ্যায় রবীন্দ্র-রচনা একটি :

১১৩-২৬ 'সাহিত্যসৃষ্টি' দ্র সাহিত্য ৮।৩৯৯-৪১৪

প্রবাসী, আষাঢ় ১৩১৪ [৭।৩] :

১১৭-২৪ 'মাষ্টার মশায়' [ভূমিকা, ১-৭ পরিচ্ছেদ] দ্র গল্পগুচ্ছ ২২।৩২৪-৩৮

'আগামী সংখ্যায় সমাপ্য' এই গল্পটি রবীন্দ্রনাথ লেখেন প্রবাসী-সম্পাদক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়-প্রদত্ত ৩০০ টাকার বিনিময়ে। ৮ জ্যৈষ্ঠ [বুধ 22 May] তিনি অজিতকুমার চক্রবর্তীকে লেখেন : 'আমাকে [মীরা দেবীর বিবাহের] এই সমস্ত উদ্বেগ ও ব্যস্ততার মধ্যেও প্রবাসীর জন্যে একটা ছোট গল্প লিখতে হয়েছে। সম্পাদক আমাকে তিনশো টাকা আগাম দিয়ে ঋণে আবদ্ধ করে রেখেছেন।'[৩৯] রবীন্দ্রনাথ এই অর্থের বিনিময়ে উক্ত গল্পটি ছাড়াও বৃহদাকার গোরা উপন্যাসটিও লিখে দেন।

রবীন্দ্রনাথ এর আগে গল্প লিখেছিলেন ১৩০৯ বঙ্গাব্দের শেষ দিকে—'দর্পহরণ' [বঙ্গদর্শন, ফাল্গুন], 'মাল্যদান' [ঐ, চৈত্র] ও 'কর্মফল' [কুন্তলীন পুরস্কার ১৩১০]; এর পর নৌকাডুবি উপন্যাস বৈশাখ ১৩১০ থেকে আরম্ভ হয়ে আষাঢ় ১৩১২-তে সমাপ্ত হয়। মধ্যপর্বে লিখেছিলেন একটি ফরমায়েশি গল্প 'গুপ্তধন' [বঙ্গভাষা, কার্তিক ১৩১১]। এর দীর্ঘকাল পরে গদ্যকাহিনী লেখা শুরু হল 'মাস্টারমশায়' গল্পটি দিয়ে। গল্পের ভূমিকা অংশটি কুচবিহারের মহারানী সুনীতি দেবীর ভূতের গল্প শোনবার আগ্রহ মেটাবার উদ্দেশ্যে তাঁর আলিপুর-স্থ Woodlands বাড়িতে মুখে-মুখে বানিয়ে বলা। বিপিনবিহারী গুপ্তের সঙ্গে আলোচনা-প্রসঙ্গে [৭ অগ্র° ১৩১৮]রবীন্দ্রনাথ তাঁকে এই পটভূমিকাটি বিবৃত করেন [দ্র রবিজীবনী ৪।১২২-২৩]। ভূমিকার সঙ্গে

মূল গল্পটি ক্ষীণ সূত্রে আবদ্ধ—ব্রহ্মচর্যাশ্রমের জন্য শিক্ষক সংগ্রহ করতে গিয়ে হরলালের মতো বহু দরিদ্র ছাত্রের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ ঘটেছিল, তাদের জীবনসংগ্রামের ছায়াপাত হয়েছে গল্পটিতে। হরলাল সান্যাল নামক ফেনসিং-জানা এক ড্রয়িং-শিক্ষকের জন্য উমেদারি করেছিলেন সরলা দেবী।

সঙ্গীত-প্রকাশিকা, আষাঢ় ১৩১৪ [৬।১০]:

২১০-১১ মিশ্র-কাওয়ালি। তরী আমার হঠাৎ ডুবে যায় দ্র স্বর ৫১

২১৩-১৫ ইমন কল্যাণ-তেওরা। আমার মাথা নত করে দাও দ্র ঐ ২৩

দ্বিতীয় গানটির স্বরলিপি করেন কাঙালীচরণ সেন, প্রথম গানটির স্বরলিপিকারের নাম অনুল্লেখিত।

গদ্যগ্রন্থাবলী যথাসম্ভব দ্রুত প্রকাশ করার জন্য রবীন্দ্রনাথ ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলেন। ছাপার কাজ শুরু হয়েছিল পৌষ ১৩১৪র মাঝামাঝি, আষাঢ় ১৩১৪র শেষ পর্যন্ত মাত্র দুটি ভাগ মুদ্রিত হওয়ায় তিনি মজুমদার লাইব্রেরির স্বত্বাধিকারী শৈলেশচন্দ্রের উপর বিরক্ত হয়ে সিটি বুক কোম্পানির যোগীন্দ্রনাথ সরকারের সঙ্গে কথাবার্তা শুরু করেন। গদ্যগ্রন্থাবলী-র স্বত্ব তিনি ব্রহ্মচর্যাশ্রমে দান করেছিলেন, সুতরাং ভাগগুলির দ্রুত মুদ্রণ ও বিক্রয় বিদ্যালয়ের পক্ষে আকাঙ্ক্ষিত ছিল। তার অন্যথা হওয়ায় ক্ষুব্ধ হয়ে রবীন্দ্রনাথ ১ শ্রাবণ বুধ 17 Jul] শ্রীশচন্দ্র মজুমদারকে লিখেছেন :

তোমার ভাইয়ের হাত হইতে আমাকে উদ্ধার কর। মনে করিয়াছিলাম পূজার পূর্ব্বে গদ্যগ্রন্থাবলীর অন্তত সাহিত্য-প্রবন্ধ পর্য্যায় ছাপা শেষ হইয়া যাইবে—তাহা হইলে পূজা উপলক্ষ্যে হয়ত গোটাকতক বই বিক্রি হইতে পারিবে। কিন্তু সাতদিন অন্তর এক ফর্মা করিয়া প্রফ পাইলে আমি নিজেকে ধন্য মনে করি। এমন করিয়া ৫।৬ বৎসরেও আমার বই ছাপা শেষ হইবে না। ওদিকে, এই সকল কারণেই আমি যোগীন সরকারের সঙ্গে এই গ্রন্থাবলী প্রকাশের কথা প্রায় পাকা করিয়াছিলাম—ইতিমধ্যে পুনশ্চ আমার দুর্ভাগ্য ও দুর্বুদ্ধিক্রমে শৈলেশেরই পরামর্শ শুনিয়া শিলাইদহে আসিবার পূর্ব্বে যোগীন সরকারকে জবাব দিয়া পত্র লিখিয়াছি। শৈলেশ এ পর্য্যন্ত যতটা ছাপাইয়াছেন কোনোমতে তাহার হিসাব তাঁহার কাছে আদায় করিতে পারিলাম না। ছাপাখানার দেনা আমি ক্রমে ক্রমে শোধ করিয়া চলিব বলিয়া স্থির করিয়াছিলাম—হিসাব না পাইয়া কিছুই করিতে পারিতেছি না।···কাব্যগ্রন্থ গল্পগুচ্ছ প্রভৃতির হিসাব শৈলেশ দেয় নাই এবং দিবেও না তাহা আমি জানি—ঐ সকল গ্রন্থের উপস্বত্ব শৈলেশ সম্পূর্ণ অসঙ্কোচে ও অবাধে ভোগ করিয়া আসিয়াছে···যাহাই হউক্ অন্তত আমার নূতন বইগুলির হিসাব যেন প্রতি মাসের আরম্ভেই শৈলেশ জগন্নাথকে বিনা ওজরে দেয় তুমি সেইরূপ বন্দোবস্ত নিশ্চয় করিয়া দিয়ো।[৪০]

এইসব কারণেই শৈলেশচন্দ্র ও মজুমদার লাইব্রেরির উপর রবীন্দ্রনাথের আস্থা ও নির্ভরতা ক্রমেই কমে আসছিল। তাই এলাহাবাদের ইণ্ডিয়ান প্রেস যখন কলকাতায় ইণ্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস নামে পুস্তক-প্রকাশন ও বিক্রয়কেন্দ্র খোলে [১৩১৫ : 1908], রবীন্দ্রনাথ তাঁর সমস্ত গ্রন্থ প্রকাশ ও বিক্রয়ের ভার ঐ প্রতিষ্ঠানের উপর অর্পণ করেন। বর্তমানেও বিচিত্র,ও প্রাচীন সাহিত্য প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই প্রায় সমস্ত কপি জোড়াসাঁকোয় আনানো হয়েছে, তথ্যটি লক্ষণীয়। কিন্তু আশ্বিন ১৩১৪-র মধ্যে 'অন্তত সাহিত্য-প্রবন্ধ পর্য্যায় ছাপা শেষ' হয়ে গিয়েছিল, এই তথ্যটিও উল্লেখ করা দরকার।

উক্ত পত্রেই রবীন্দ্রনাথ শ্রীশচন্দ্রকে লেখেন :'এখানে আসিয়া ভালই আছি। শিলাইদহে বোধ হয় আরো সপ্তাহ খানেক থাকিব। তারপর কালিগ্রামে রওনা হইব—সেখানে দিন দশেক থাকিয়া ফিরিবার চেষ্টা করিব। প্রবাসীর জন্য একটা গল্প লিখিতে সুরু করিয়াছি।' এই গল্পটি হল রবীন্দ্রনাথের সর্ববৃহৎ উপন্যাস 'গোরা'। উপন্যাসটি প্রবাসী-তে ভাদ্র ১৩১৪-সংখ্যায় আরম্ভ হয়ে ফাল্গুন ১৩১৬-সংখ্যায় শেষ হয়।

নিবেদিতার গল্প শোনার আকাঙক্ষা মেটানোর জন্য ১৫-১৮ পৌষ ১৩১১ [শুক্র-সোম 30 Dec 1904-2 Jan 1905]-এর মধ্যে কোনো এক সময়ে রবীন্দ্রনাথ গোরা উপন্যাসের কাহিনী চুম্বকাকারে শুনিয়েছিলেন, একথা আমরা আগেই বলেছি। সুতরাং গল্পের একটি কাঠামো অস্পষ্ট আকারে হলেও তাঁর মাথায় ছিল, এ-সম্পর্কে কোনো সন্দেহ নেই। কর্তব্যবোধের তাগিদে সেই কাহিনীকে এবার উপন্যাসের আকার দেওয়া শুরু হল। অধ্যাপক প্রিয়রঞ্জন সেন তাঁর *Western Influence in Bengali Literature* গ্রন্থে গোরা-র সঙ্গে George Eliot [Mary Anne Evans, 1819-80]-এর *Felix Holt, the Radical* [1866] উপন্যাসের কিছু বহিরঙ্গ সাদৃশ্যের উল্লেখ করে লেখেন : '...when we come to the Gora (the Prabāsi, 1907) we find some trace of his reading of George Eliot's Felix Holt in the outward appearances as well as the characters of the hero and Mr Lyon, and the attitude that the hero observes towards Esther in their first meeting at the tea-table.'[৪১] তিনি আরও কিছু সাদৃশ্য দেখেছেন Ivan Turgenev [1818-83]-এর *Fathers and Sons* [1862] গ্রন্থের সঙ্গে : 'Turgenev's *Fathers and Children*, however, shows interesting paralles both to the frinds—Gora and Benay'.[৪২] ড. অর্চনা মজুমদার তাঁর গবেষণা-গ্রন্থ 'রবীন্দ্র-উপন্যাস-পরিক্রমা' [1970]-য় *Fathers and Sons*-এর, কোনো উল্লেখ না করলেও *Felix Holt* উপন্যাস থেকে উদ্ধৃতি-সহযোগে গোরার আকৃতি কণ্ঠস্বর ও কিছু আচরণ, গোরা ও সুচরিতার প্রেম-সম্পর্কের কিছু জটিলতা প্রভৃতি 'ছোটোখাটো বহু বিষয়'-এর সাদৃশ্য দেখিয়েছেন।[৪৩] তা সত্ত্বেও উভয়েরই সিদ্ধান্ত, এই প্রভাব বহিরঙ্গেই সীমাবদ্ধ। কিন্তু অধ্যাপক প্রতাপনারায়ণ বিশ্বাস তাঁর 'গোরা : জর্জ এলিয়ট ও রবীন্দ্রনাথ' প্রবন্ধে [দ্র অনুষ্টুপ, শারদীয় সংখ্যা ১৯৮৭।৩৯-৮০] এঁদেরই সূত্র অবলম্বনে আরও কিছু দৃষ্টান্ত আহরণ করে রবীন্দ্রনাথকে পরস্বাপহরণের দায়ে অভিযুক্ত তো করেছেন-ই, উপন্যাস হিসেবে গোরা-র রসমূল্যকেও নস্যাৎ করে দিয়েছেন। উৎসাহী পাঠক প্রবন্ধটি পড়লে অনেক জ্ঞানের সঙ্গে যথেষ্ট কৌতুকেরও খোরাক পাবেন।

একথা অনস্বীকার্য যে, রবীন্দ্রনাথের বিদেশী সাহিত্যপাঠের পরিধি যথেষ্ট বিস্তৃত ছিল। তাই সংস্কৃত সাহিত্য ও বৈষ্ণব পদাবলীর মতো বিদেশী সাহিত্যের উপাদানও তাঁর রচনায় অল্পবিস্তর ব্যবহৃত হয়েছে। কিন্তু মানসী-র 'অহল্যার প্রতি, 'মেঘদূত' প্রভৃতি কবিতা থেকে আরম্ভ করে কথা-র সবগুলি কবিতা, 'চিত্রাঙ্গদা', 'বিদায় অভিশাপ', 'গান্ধারীর আবেদন' প্রভৃতি কাব্যনাট্য, 'মালিনী', রাজা', 'অচলায়তন প্রভৃতি নাটক—এমন-কি, 'বউ-ঠাকুরানীর হাট' ও 'রাজর্ষি' উপন্যাস—রবীন্দ্রনাথের চৌর্যবৃত্তির ফসল বলে কেউ যেমন মনে করেন না, তেমনি তাঁর কয়েকটি উপন্যাসের—যেমন, 'গোরা', 'ঘরে বাইরে' বা 'যোগাযোগ'—সঙ্গে কোনো-কোনো বিদেশী উপন্যাসের কিছু-কিছু মিল দেখলেই তা নিয়ে চীৎকার করারও কোনো অর্থ নেই। বস্তুত অধ্যাপিকা মজুমদার ও অধ্যাপক বিশ্বাস যে সাদৃশ্যগুলি দেখিয়েছেন সেগুলি একান্তই বহিরঙ্গমূলক—উভয়ের মধ্যে পার্থক্য এই যে, অধ্যাপিকা মজুমদার যেখানে তা স্বীকার করে নিয়ে রবীন্দ্রমানসে বিদেশী উপাদানের সহাবস্থান লক্ষ্য করেছেন, অধ্যাপক বিশ্বাস সেখানে সুরেশচন্দ্র সমাজপতি বা দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের মতো রবীন্দ্র-বিদূষণের ক্লেদ-নির্গমনের পথ খনন করেছেন। রবীন্দ্র-চর্চার ইতিহাসে স্থানলাভের এটি এক পরীক্ষিত ফলপ্রদ উপায়—অনেক মহাজ্ঞানী মহাজন এই পথে ভ্রমণ করে চিরস্মরণীয় হয়েছেন!

জর্জ এলিয়টের উপন্যাস রবীন্দ্রনাথের যে ভালো লাগত, তিনি নিজেই তা স্বীকার করেছেন। এই রকম আরো অনেকের লেখা পছন্দ করে তিনি তা অন্যদের পড়বার জন্য উৎসাহ দিয়েছেন। ১৭ কার্তিক ১৩১৩ [3 Nov 1996] তিনি মীরা দেবীকে লিখছেন :'তোর জন্যে David Copperfield বলে একখানা বই আনিয়েছি। এরই বড় বইখানা নিশ্চয় বেলার কাছে আছে—এটা তারই সংক্ষিপ্ত সংস্করণ—তোদের বোঝবার পক্ষে যাতে শক্ত না হয় তেমনি করে লেখা। এটা পড়তে তোর নিশ্চয় ভাল লাগবে।' ২০ কার্তিকের চিঠি · Mil on the Floss (জর্জ এলিয়টের লেখা, 1890] তোর কেমন লাগ্‌চে? ...Dickensএর আরো দুখানা বই তোকে আজ পাঠিয়ে দিচ্ছি।···Alice through the lookingglass কি রকম লাগ্‌ল? ওরি জুড়ি আর একটা বই আছে পাঠাব কি? তার নাম Alice in the wonderland।' 'রবিবার' [১৭ চৈত্র : 31 Mar] তাঁকে লিখেছেন : 'এবার তোর George Eliot হয়ে গেলে কি পড়বি? Scot [যদ্দৃষ্টং, Sir Walter Scott, 1771-1832] পড়ে দেখিস্ Heart of Midlothian [1818] বলে গল্পটা আমার খুবই ভাল লাগ্‌ত সেটা দেখ্‌তে পারিস্।' এই রকম করে নিজের ভালো-লাগা বই পড়ার জন্য তিনি অন্যদের উৎসাহিত করেছেন, কখনও-কখনও অনুবাদও করিয়েছেন তাঁদের দিয়ে। সুতরাং জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে কোনো কাহিনী বা চরিত্র তাঁর নিজের রচনায় প্রভাব ফেললে উত্তেজিত হয়ে ওঠার কোনো মানে নেই। উক্ত কাহিনী বা চরিত্রগুলি তাঁর নিজস্ব ভাবনায় সম্পূর্ণ জারিত হয়ে নবরূপ লাভ করেছে। রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসগুলি ভালো না মন্দ তার বিচার আলাদা করে করা যেতে পারে, বিদেশী উপাদান ব্যবহারের মাত্রাও পরিমাপ করা চলে—কিন্তু দুটিকে ঘুলিয়ে ফেলা কাজের কথা নয়।

কিছু কাজকর্মে ও কিছু আলস্যে রবীন্দ্রনাথ শিলাইদহে বর্ষাযাপন করছিলেন। ৯ শ্রাবণ (বৃহ 25 Jul] সেখান থেকে মীরা দেবীকে লিখেছেন : 'যেখানে বোট রেখেছি সেখানে হঠাৎ আজ কি ভয়ানক ভাঙন লেগেছে। দেখ্‌তে দেখ্‌তে জমি একেবারে স্বপ্নের মত অদৃশ্য হয়ে যাচ্চে।···কি ভাগ্যি আমি যে কদিন আছি তেমন একটানা বাদলা হয়নি—তাহলে বোটে থাকার আরাম চলে যেত।···/ আমি আগামী সোমবার এখান থেকে কালিগ্রাম চলে যাব—সে জায়গাটা আবার অন্যরকম। মাঝে দুদিনের জন্যে জানিপুরে গিয়েছিলুম—সেটা একটা পাড়াগেঁয়ে সহর—ঠেসাঠেসি বাড়িঘর দোকান বাজার লোকজন—তাই দেখে উমাচরণের ভারি পছন্দ হয়েছে।...তোদের কাছে ফিরতে আমার অন্তত দিন পনেরো দেরি আছে।[৪৪]

রবীন্দ্রনাথ ১৩ শ্রাবণ [সোম 29 Jul] পতিসরে যান। কিন্তু বেশিদিন সেখানে থাকতে পারেননি। ১৫ শ্রাবণ 'শ্রীযুক্ত রবীন্দ্র বাবু মহাশয়ের নিকট আত্রাই টেলিগ্রাম' করা হয়। ১৭ শ্রাবণ [শুক্র 2 Aug] 'শ্রীযুক্ত খোদ বাবু মহাশয় ও শ্রীযুক্ত শরৎবাবু মহাশয়ের আহারের ব্যয়' হিসাব দেখে বোঝা যায় তিনি ইতিমধ্যেই কলকাতায় ফিরে এসেছেন। পরদিন শান্তিনিকেতন থেকে তিনি রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীকে লিখেছেন : 'হঠাৎ কন্যার পীড়ার সংবাদে বোলপুরে আসিতে হইয়াছে।'[৪৫] এই কন্যা মীরা দেবী। পীড়া কিছু গুরুতর ছিল—দীর্ঘদিন মীরা দেবী জ্বর ও অন্যান্য উপসর্গে ভোগেন। 'দিদিমা' রাজলক্ষ্মী দেবী ও মাধুরীলতা এই সময়ে শান্তিনিকেতনে থাকলেও রবীন্দ্রনাথকে নার্স সঙ্গে নিয়ে যেতে হয় : 'ব° শ্রীমতী রাধারাণী গুপ্তা নার্স দং শ্রীমতী মীরা দেবীর চিকিৎসার জন্য উক্ত দাইকে ইস্তক ১৮ শ্রাবণ হইতে ২১ ভাদ্র পর্য্যন্ত ৩৬ দিনের বেতন

শোধ’ দীর্ঘকালীন অসুস্থতা ও পেশাদারী সেবার প্রয়োজনীয়তার প্রমাণ, এর পরেও মীরা দেবী অনেকদিন অসুস্থ ছিলেন।

জগদীশচন্দ্রকে শিক্ষাবিভাগ এই সময়ে দু’বছরের ছুটি মঞ্জুর করে। বিদেশে যাবার আগে বন্ধুর সঙ্গে কয়েকটি দিন কাটাবার জন্য তিনি ৩২ শ্রাবণ [শনি 17 Aug] সস্ত্রীক শান্তিনিকেতনে আসেন ও ২ ভাদ্র [সোম 19 Aug] দুপুরের গাড়িতে কলকাতা ফিরে যান, রবীন্দ্রনাথও তাঁর সঙ্গী হন। খবরটি ৪ ভাদ্র রাজলক্ষ্মী দেবী রথীন্দ্রনাথকে জানিয়েছেন : ‘জগদীশবাবু শনিবারের দিন এখানে এসেছিলেন, সোমবারে দুপুরে এখান থেকে গেছেন, বাবাও তাঁর সঙ্গে কল্‌কাতায় গেছেন—বাবা বোধহয় কাল আবার এখানে ফিরবেন।’[৪৬] রবীন্দ্রনাথ কলকাতায় গিয়ে ৩ ভাদ্র ‘থ্যাকার কোম্পানী’, ৪ ভাদ্র সুকিয়া স্ট্রীট পার্শিবাগান প্রভৃতি স্থানে এবং ৫ ভাদ্র [বৃহ 22 Aug] বালিগঞ্জে গিয়ে সেই দিনই শান্তিনিকেতনে প্রত্যাবর্তন করেন। সম্ভবত জমিদারির কাজেই তাঁর কলকাতায় আসার প্রয়োজন ছিল, তাই ৭ ভাদ্র ‘এস্টেটের ক্যাশবহি’তে লেখা হয়েছে : ‘শ্রীযুক্ত রবীন্দ্র বাবু মহাশয়ের সরকারী কার্য্য উপলক্ষে বোলপুর হইতে আসায় বোলপুর গমনের ব্যায় রেলভাড়া ইত্যাদি···’। কী কাজ তা অবশ্য জানার উপায় নেই।

আমাদের আলোচিত সময়ের মধ্যে গদ্যগ্রন্থাবলী-র তৃতীয় ভাগ ‘লোকসাহিত্য’ প্রকাশিত হয় 26 Jul [শুক্র ১০ শ্রাবণ]। বইটি ১০৫০ কপি ছাপা হয় ও পূর্বানুসৃত রীতি অনুযায়ী ১০০০ কপি মজুমদার লাইব্রেরি থেকে ২০ শ্রাবণ জোড়াসাঁকোয় আনানো হয়। গ্রন্থের পৃষ্ঠাসংখ্যা প্রাচীন সাহিত্য-এর মতোই : ২+২+২+৮৭; মূল্য ছ’ আনা।

অর্ধ-নামপত্র : লোকসাহিত্য।

আখ্যাপত্র : গদ্যগ্রন্থাবলী, ৩য় ভাগ/ লোকসাহিত্য।/ শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

[পরপৃষ্ঠায়] : প্রকাশক—শ্রীসুহাসচন্দ্র মজুমদার,/ মজুমদার লাইব্রেরি, ২০ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা।/ কলিকাতা, ২০ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, দিনময়ী প্রেসে/ শ্রীহরিচরণ মান্না দ্বারা মুদ্রিত।

সূচী

[১] ছেলেভুলানো ছড়া [সাধনা, আশ্বিন-কার্তিক ১৩০১]
[২] কবি সঙ্গীত [সাধনা, জ্যৈষ্ঠ ১৩০২]
[৩] গ্রাম্যসাহিত্য [ভারতী, ফাল্গুন-চৈত্র ১৩০৫]

‘ছেলেভুলানো ছড়া’ প্রবন্ধটি ‘মেয়েলি ছড়া’ নামে সাধনা-য় মুদ্রিত হয়েছিল। সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা-র মাঘ ১৩০১সংখ্যায় ‘ছেলেভুলানো ছড়া’ নামে রবীন্দ্রনাথের টীকা-সহ যে ছড়া-সংগ্রহ মুদ্রিত হয়, সেটি বিশ্বভারতী-সংস্করণ লোকসাহিত্য [১৩৪৫] গ্রন্থে ‘ছেলেভুলানো ছড়া : ২’ নামে অন্তর্ভুক্ত হয়। রবীন্দ্র-রচনাবলী-তেও সেইভাবে মুদ্রিত হয়েছে।

শ্রাবণ মাসে রবীন্দ্রনাথের নিম্নলিখিত রচনাগুলি বিভিন্ন সাময়িকপত্রে মুদ্রিত হয় :

প্রবাসী, শ্রাবণ ১৩১৪ [৭।৪] :

১৭৩-৮২ ‘মাষ্টারমশায়’ ৮-১১ দ্র গল্পগুচ্ছ ২২।৩৩৮-৫৩

২৩৫-৪৩ ‘ব্যাধি ও প্রতিকার’ দ্র সমূহ-পরিশিষ্ট ১০।৬২৩-৬৫

‘দেশনায়ক’ [বৈশাখ ১৩১৩] প্রবন্ধ রচনার পর রবীন্দ্রনাথ দীর্ঘকাল পুরোপুরি রাজনৈতিক প্রবন্ধ লেখেননি, কলকাতা কংগ্রেস উপলক্ষে চরমপন্থী ও নরমপন্থী দলের সংঘর্ষ ইত্যাদি দেখেও তিনি মন্তব্য প্রকাশে বিরত ছিলেন। কিন্তু ঘটনাপ্রবাহ যে তিনি সতর্কভাবে অনুধাবন করে যাচ্ছিলেন তার প্রমাণ এই ‘ব্যাধি ও প্রতিকার’ প্রবন্ধ। বঙ্গভঙ্গের প্রতিক্রিয়ায় সমস্ত দেশে যে অভূতপূর্ব আলোড়ন দেখা দিয়েছিল রবীন্দ্রনাথ তার থেকে দূরে থাকতে পারেননি। বিদেশী দ্রব্য ও বিশ্ববিদ্যালয় বয়কট সমর্থন না করলেও জাতীয় শিল্পোন্নয়ন ও জাতীয় শিক্ষার আন্দোলনে তিনি সাগ্রহে অংশ গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু কতকগুলি অশুভ লক্ষণও তাঁর দৃষ্টি এড়ায়নি। তিনি দেখেছেন, নেতা ও জনসাধারণের প্রারম্ভিক উৎসাহ অনেকটা স্তিমিত হয়ে এসেছে, ইংরেজ শাসকেরা ক্রমশই নখদন্ত প্রদর্শন করতে শুরু করেছে এবং দেশের বিভিন্ন স্থানে মুসলমানেরা সামান্য ছুতো অবলম্বন করে হিন্দুদের উপর অত্যাচার আরম্ভ করে দিয়েছে। এই ব্যাধির কারণ নির্ণয় ও তার প্রতিকারের পন্থা নিরূপণ বর্তমান প্রবন্ধের লক্ষ্য।

পূর্বালোচনার সূত্র ধরে তিনি গোড়াতেই বললেন, দেশীয় জনমতকে তুচ্ছ করার সাহস ইংরেজ শাসকগণ পেয়েছে তার কারণ তারা জানে আমরা বিচ্ছিন্ন বিভক্ত। এর প্রত্যাঘাতে ইংরেজের ব্যবসার ক্ষতি করার মানসে যে স্বদেশী উদ্‌যোগ আরম্ভ হয় পূর্ব থেকেই তার ক্ষেত্র কতকটা প্রস্তুত ছিল বলে অল্প দিনের মধ্যেই তা কিছুটা সার্থকতা লাভ করে। কিন্তু ইংরেজের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করলে তারাও যে নির্বেদ অবলম্বন করে থাকবে না এই হিসাবটি মাথায় রাখা হয়নি—ইংরেজের ধৈর্য ও ইংরেজের আইনের উপরেই আমাদের ভরসা ছিল বেশি—ফলে ‘আজ নিম্ন-আদালত হইতে শুরু করিয়া হাইকোর্ট পর্যন্ত স্বদেশী মামলায় ন্যায়ের কাঁটা যে নানা ডিগ্রির কোণ লইয়া হেলিতেছে, ইহাতে আমরা যতই আশ্চর্য হইতেছি ততই দেখা যাইতেছে আমরা হিসাবে ভুল করিয়াছিলাম।’ ইংরেজের প্রতিশোধের আর একটি পথ, হিন্দুর বিরুদ্ধে মুসলমানকে উত্তেজিত করা। রবীন্দ্রনাথ বলেন, মুসলমানকে যে হিন্দুর বিরুদ্ধে লাগানো যেতে পারে এই তথ্যটিই ভেবে দেখা দরকার, কে লাগালো সেটা তত গুরুতর বিষয় নয়। প্রকৃতপক্ষে হিন্দু-মুসলমান সম্পর্কের মধ্যেই একটি বিরোধ আছে—শনি প্রবেশ করেছে সেই ছিদ্র দিয়ে। দীর্ঘকাল পাশাপাশি বাস করেও দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রতিবেশীসুলভ স্বাভাবিক শিষ্টতার বোধ সৃষ্টি হয়নি—এক ফরাশে হিন্দু-মুসলমান বসবে না বলে ঘরে মুসলমান এলে জাজিমের একাংশ তুলে দেওয়া হয়, হুঁকোর জল ফেলে দেওয়া হয় অপবিত্রজ্ঞানে। এর পক্ষে শাস্ত্রের দোহাই দেওয়া হয়। কিন্তু ‘মানুষকে ঘৃণা করা যে দেশে ধর্মের নিয়ম, প্রতিবেশীর হাতে জল খাইলে যাহাদের পরকাল নষ্ট হয়, পরকে অপমান করিয়া যাহাদিগকে জাতিরক্ষা করিতে হইবে, পরের হাতে চিরদিন অপমানিত না হইয়া তাহাদের গতি নাই।’ ‘বয়কট’-যুদ্ধ ঘোষিত হয়েছে ‘দেশধর্মগুরুর নিকট হইতে স্বরাজমন্ত্র’ও নেওয়া হয়েছে—তখন ভাবা হয়েছিল এই সংগ্রাম ও সাধনার যত-কিছু বাধা সবই বাইরে, কিন্তু ভিতরকার বাধা যখন সুকঠোর সুস্পষ্ট আকারে প্রকাশিত হল ‘তখন এই কথাই আমাদিগকে বলিতে হইবে যে, স্বদেশকে উদ্ধার করিতে হইবে, কিন্তু কাহার হাত হইতে? নিজেদের পাপ হইতে।’ এই পাপই ইংরেজের প্রধান বল, এরই সুযোগ নিয়ে ইংরেজ ভারতের ঘাড়ে চেপে বসেছে। ইংরেজ আমাদের ব্যাধির একটা লক্ষণ মাত্র, ‘লক্ষণের দ্বারা ব্যাধির পরিচয় পাইয়া ঠিকমত প্রতিকার করিতে না পারিলে গায়ের জোরে অথবা বন্দেমাতরম্‌ মন্ত্র পড়িয়া সন্নিপাতের হাত এড়াইবার কোনো সহজ পথ নাই।’

রবীন্দ্রনাথের মতে এর প্রতিকারের পথ, জাতিধর্মনির্বিশেষে দেশের মানুষের কাছে যাওয়া, স্বদেশ সম্বন্ধে স্বদেশীর যে দায়িত্ব আছে তা সর্বসাধারণের কাছে স্পষ্টরূপে প্রত্যক্ষ করে তোলা। সেইজন্য দেশের যুবকদের সমস্ত বাইরের উত্তেজনা ও নিস্ফল আস্ফালন ভুলে কর্মের আহ্বান জানিয়ে বলেছেন : 'যে-কোনো একটি পল্লীর মাঝখানে বসিয়া যাহাকে কেহ কোনোদিন ডাকিয়া কথা কহে নাই তাহাকে জ্ঞান দাও, আনন্দ দাও, আশা দাও, তাহার সেবা করো, তাহাকে জানিতে দাও মানুষ বলিয়া তাহার মাহাত্ম্য আছে, সে জগৎসংসারের অবজ্ঞার অধিকারী নহে। অজ্ঞান তাহাকে নিজের ছায়ার কাছেও ত্রস্ত করিয়া রাখিয়াছে; সেইসকল ভয়ের বন্ধন ছিন্ন করিয়া তাহার বক্ষপট প্রশস্ত করিয়া দাও। তাহাকে অন্যায় হইতে, অনশন হইতে, অন্ধসংস্কার হইতে রক্ষা করো। নূতন বা পুরাতন কোনো দলেই তোমার নাম না জানুক, যাহাদের হিতের জন্য আত্মসমর্পণ করিয়াছ প্রতিদিন তাহাদের প্রতি অবজ্ঞা ও অবিশ্বাস ঠেলিয়া এক-পা এক-পা করিয়া সফলতার দিকে অগ্রসর হইতে থাকো।'

হিন্দু-মুসলমান প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ এই প্রবন্ধে যা লিখলেন, বরিশাল-লাখুটিয়ার জমিদার দেবকুমার রায়চৌধুরী সে-বিষয়ে জ্যৈষ্ঠ ১৩১৩-তে প্রকাশিত 'ব্যাধি ও প্রতিকার'* পুস্তিকায় আলোচনা করেছিলেন, তখনও হিন্দুমুসলমানের সংঘর্ষ এমন উৎকট হয়ে দেখা দেয়নি। রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধ পড়ে দেবকুমার সম্ভবত ঐ পুস্তিকার একটি কপি তাঁকে পাঠিয়ে দেন। ২১ শ্রাবণ [মঙ্গল 6 Aug] পুস্তিকাটি পড়ে রবীন্দ্রনাথ ঐ দিনই তাঁকে সাধুবাদ জানান : 'গ্রন্থকার এই গ্রন্থে নিপুণভাবে ও সরল ভাষায় ভারতবর্ষের বর্তমান অবস্থার বিচার করিয়া যে প্রাজ্ঞতা প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে দেশের প্রধানগণের নিকট হইতে তিনি সাধুবাদ লাভ করিয়াছেন;—তাঁহার প্রতি আমার শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করিয়া পাঠকগণকে এই গ্রন্থ পাঠ করিতে অনুরোধ করি।'[৪৭]

কিন্তু দেশের নরমপন্থী ও চরমপন্থী উভয় দলই রবীন্দ্রনাথের পরামর্শ মেনে নাগরিক স্বাচ্ছন্দ্য ও প্রচার ত্যাগ করে গ্রামে যেতে প্রস্তুত হলেন না। এমন-কি বন্ধু রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী 'ব্যাধি ও প্রতিকার' [দ্র প্রবাসী, আশ্বিন। ৩৩৫-৪৭]-শীর্ষক একটি প্রবন্ধ লিখে তাঁর আপত্তিগুলি খণ্ডন করার প্রয়াস করলেন। তাঁর যুক্তিতেও সারবত্তা আছে। গত দু'বছরের আন্দোলনকে তিনি সম্পূর্ণ ব্যর্থ বলে মানতে পারেননি, ইংরেজের প্রত্যক্ষ বিরোধিতা না করে 'অনেষ্ট্ স্বদেশী'র কার্যক্রমের পরামর্শও তাঁর কাছে তাৎপর্যহীন মনে হয়েছে : 'শুধু শিল্প বাণিজ্য কেন, আজ যদি ইংরেজ বলেন, তোমাদের স্থাপিত বিদ্যালয়গুলিতে রাজভক্তি শিখাইবার সম্যক্ ব্যবস্থা নাই, উহা উঠাইয়া দেওয়া হউক; তখন এক অর্ডিনান্সের ধাক্কায় কলিকাতার শিক্ষা-পর্ষৎ ও টেকনিক্যাল ইন্‌স্টিটুট হইতে বোলপুরের ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম পর্য্যন্ত সমস্তই লীলাসংবরণে বাধ্য হইবে।' হিন্দু-মুসলমান বিরোধের কারণ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের বক্তব্যও তিনি স্বীকার করেননি; তাঁর মতে, হিন্দুর ব্যবহার মুসলমানের প্রতি ঘৃণাব্যঞ্জক নয় তার লোকাচারভক্তিরই ফল মাত্র এবং এতদিন মুসলমান সদ্ভাব রক্ষার জন্য সেই ব্যবহারকে স্বীকার করে এসেছে। তাই সরলভাবেই তিনি ভেবেছেন : 'আজ পূর্ববঙ্গে হিন্দু মুসলমান সমাজে যে বিদ্বেষের উৎপাত দৃষ্ট হইতেছে, তাহাতে আতঙ্কিত হইবার তেমন কারণ দেখি না। মুসলমান যে কারণেই হউক ক্ষণেকের জন্য আত্মবিস্মৃত হইয়া হিন্দু প্রতিবাসী ও হিন্দু ভ্রাতার মনে দারুণ ক্লেশ দিয়াছেন, কিন্তু কালে তাঁহারা আপনার ভ্রম বুঝিতে পারিবেন।' ইতিপূর্বে ভাদ্র ১৩০৮-সংখ্যা বঙ্গদর্শন-এ 'রাষ্ট্র ও নেশন্' প্রবন্ধে তিনি রবীন্দ্রনাথের 'নেশন কী' [ঐ, শ্রাবণ ১৩০৮] প্রবন্ধের প্রত্যুত্তরে বলেছিলেন, ভারতবর্ষে নেশনের বীজ আছে এবং তা ফলবান না হওয়ার কারণেই এই দেশকে পরাধীনতা স্বীকার করতে হয়েছে—বর্তমান

প্রবন্ধেও তিনি হিন্দু-মুসলমান-নির্বিশেষে নেশন গড়ে তোলার মধ্যেই ব্যাধির প্রতিকার লক্ষ্য করেছেন। কিন্তু আর্থিক সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে মুসলমানের স্বাধিকার-প্রতিষ্ঠার প্রয়াস ও সম্প্রদায় হিসেবে স্বাতন্ত্র অর্জনের আকাঙক্ষা ইংরেজের কূটনীতিতে জাতীয় আন্দোলনের বিরোধী শক্তি রূপেই বিকৃত পথ অবলম্বন করছে, রামেন্দ্রসুন্দর এ বিষয়ে পুরোপুরি সচেতন ছিলেন বলে মনে হয় না। ধর্মনিরপেক্ষ ভারতীয় নেশন রূপে গড়ে ওঠাই প্রতিকারের পথ, সে-বিষয়ে সন্দেহ নেই; কিন্তু চরমপন্থী নেতারা আন্দোলনের বিভিন্ন স্তরে হিন্দুপ্রতীককে প্রাধান্য দিয়ে মুসলমানের অবিশ্বাস বৃদ্ধিতে সহায়তাই করেছেন। মুসলমান-শাসনকালে হিন্দুসংকীর্ণতা যে ঔদার্যে মুসলমান ক্ষমা করে এসেছে, ইংরেজ-শাসনকালে স্বাতন্ত্রবুদ্ধির তাগিদেই সেই ঔদার্য দেখানো তাদের পক্ষে কঠিন ছিল।

বঙ্গদর্শন, শ্রাবণ ১৩১৪ [৭।৪] :

২০৩-০৪ 'দুর্দ্দিন' ['ঐ আকাশ পরে আঁধার মেলে'] দ্র পূরবী, র°র° [প. ব.] ২।৭১২-১৩

কবিতাটি কোন সময়ে ও কোথায় রচিত বলা শক্ত। পূরবী প্রথম সংস্করণে [১৩৩২] কবিতাটি 'সঞ্চিতা' অংশের অন্তর্গত হয়ে গ্রন্থভুক্ত হয়।

সঙ্গীত-প্রকাশিকা, শ্রাবণ ১৩১৪ [৬।১১]:

২২৯-৩০ মিত্র বিভাষ-আড় খেমটা। কাছে ছিলে, দূরে গেলে দ্র স্বর ৪৮

২৩০-৩১ নট মল্লার-একতালা। মোরে বারে বারে ফিরালে দ্র ঐ ২৪

২৩১-৩৩ বাগেশ্রী-বাহার—ঝাঁপতাল। নিবিড় অন্তরতর বসন্ত এল প্রাণে দ্র ঐ ২৪

প্রথম গানটির স্বরলিপিকারের নাম অনুল্লেখিত, অপর দুটির স্বরলিপি করেন কাঙালীচরণ সেন।

৩০ শ্রাবণ [বৃহ 15 Aug] রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনে বসে যোগীন্দ্রনাথ বসু-সম্পাদিত 'সরল কৃত্তিবাস' গ্রন্থের 'ভূমিকা' রচনা করেন। ইতিপূর্বে তিনি বাল্মীকি রামায়ণ ও ব্যাস-রচিত মহাভারতের সংক্ষিপ্তসার প্রস্তুতের ভার দিয়েছিলেন যথাক্রমে মৃণালিনী দেবী ও সুরেন্দ্রনাথের উপর। বঙ্গানুবাদে মহাভারতের সংক্ষিপ্তসার সুরেন্দ্রনাথ কিছুকাল আগে প্রকাশ করেন। সংস্কৃত রামায়ণের সংক্ষিপ্তসার 'শান্তিনিকেতন—বোলপুরবাসী' রমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য কর্তৃক সংক্ষেপিত হয়ে 1915-এ এলাহাবাদের ইণ্ডিয়ান প্রেস থেকে 'Sankshiptam/ Valmikiya Ramayanam/ Edited by/ Dr. Rabindra Nath Tagore' নামে দেবনাগরী অক্ষরে মুদ্রিত হয়।* কৃত্তিবাসী রামায়ণের বিদ্যালয়পাঠ্য একটি সংক্ষিপ্ত সংস্করণও তিনি প্রস্তুত করার সংকল্প নিয়েছিলেন। এককালে দেশের অক্ষরজ্ঞান-সম্পন্ন মানুষ মাত্রেই কৃত্তিবাসের রামায়ণ ও কাশীরামদাসের মহাভারত পড়ত, যাদের অক্ষরবোধ ছিল না তারা অন্যের মুখ থেকে শুনত। কিন্তু বর্তমানে জনসাধারণের মধ্যে এই দুই গ্রন্থের আদর থাকলেও দেশের শিক্ষিতসম্প্রদায় এই বই পড়ে না—'এমন অবস্থায় সাধারণ লোকের সঙ্গে ইংরাজী বিদ্যালয়ের ছাত্রদের একটা অপরিচয়ের বিচ্ছেদ না ঘটিয়া থাকিতে পারে না। যে শিক্ষায় দেশের লোককে নিজের দেশকে চিনিতে দেয় না, সে যে নিতান্তই অসম্পূর্ণ শিক্ষা, এ কথা অধিক করিয়া বলিবার প্রয়োজন নাই।' রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন :

> এইজন্য আমি কৃত্তিবাসের রামায়ণকে সংক্ষিপ্ত করিয়া লইয়া বিদ্যালয়ের উপযোগী করিয়া তুলিবার চেষ্টায় প্রবৃত্ত হইতেছিলাম। এমন সময় শুনিতে পাইলাম, শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ও এই কার্য্যে নিযুক্ত আছেন।

যোগদ্র বাবুর মত লোক এই কাজের ভার লইয়াছেন শুনিয়া আমি নিজেকে দায়মুক্ত জ্ঞান করিলাম। বঙ্গসাহিত্যে তাঁহার সকল চেষ্টাই সফল হইয়াছে, এ চেষ্টাও ব্যর্থ হইবে না। এখন কেবল অপেক্ষা করিয়া রহিলাম, তিনি, কাশীরামের মহাভারত, কবিকঙ্কণের চণ্ডী প্রভৃতি প্রাচীন কাব্যগুলিকে সংক্ষিপ্ত আকারে পরিণত করিয়া, বাঙ্গালার শিশু-সাহিত্যের পুষ্টিসাধন করিতে থাকিবেন।

অনেকে বলতে পারেন, কৃত্তিবাস ও কাশীরামের রচনায় মূল কাব্যের অনেক বিকার ঘটেছে বলে বিশুদ্ধ মূল কাব্যের অনুবাদই ছাত্রদের পড়ানো উচিত। রবীন্দ্রনাথ এর জবাবে লিখেছেন :

মূল কাব্যের বিশুদ্ধ অনুবাদ ছাত্রেরা পাঠ করে, সে ত ভালই, কিন্তু কৃত্তিবাস ও কাশীরাম দাসের কাব্য কেবল মূল রামায়ণ ও মহাভারতের আখ্যানভাগ জানাইবার জন্যই ব্যবহার্য্য, এমন কথা আমরা বলি না। বাঙ্গালা রামায়ণ, মহাভারত, বাঙ্গলা সাহিত্যের, এবং বিশেষভাবে বাঙ্গালীর সামগ্রী। মূল আখ্যানকে অবলম্বন করিয়া বাঙ্গালীর হাতে তাহারা স্বতন্ত্র মহাকাব্য হইয়া উঠিয়াছে। এই বাঙ্গলা মহাকাব্যে কবি বাল্মীকির বা বেদব্যাসের সময়ের সামাজিক আদর্শ রক্ষিত হয় নাই, ইহার মধ্যে প্রাচীন বাঙ্গলা-সমাজেরই হৃদয় আপনাকে ব্যক্ত করিয়াছে।

বাল্মীকির রামায়ণের সহিত কৃত্তিবাসের রামায়ণের তুলনা করিলে দেখা যাইবে, বাল্মীকি তাঁহার রামচন্দ্রকে বিশেষভাবে মানব মহত্ত্বের আদর্শস্থল করিয়া তুলিয়াছেন। শুধু তাহাই নহে, তাঁহার রাম, সীতা, লক্ষ্মণ, হনুমান প্রভৃতি সকলেই সকল প্রকার মানব সম্বন্ধের মাহাত্ম্যকে উজ্জ্বল করিয়া তুলিয়াছেন। পিতার সহিত পুত্রের, ভ্রাতার সহিত ভ্রাতার, পতির সহিত পত্নীর, প্রভুর সহিত ভৃত্যের, রাজার সহিত প্রজার সম্বন্ধগুলিকে দুর্ব্বহ [?] করিয়া তুলিয়াও, কবি তাঁহার কাব্যের পাত্রগুলিকে সমস্ত বাধার উপর জয়ী করিয়াছেন।

কৃত্তিবাসের রামায়ণে এই মানব-ধর্ম্মের উপরে দেবধর্ম্মই বিশেষরূপে প্রকাশ পাইয়াছে। ভক্তকে লইয়া ভক্তবৎসলের লীলাই বাঙ্গলা রামায়ণে বিশেষ রস সঞ্চার করিয়াছে। সংস্কৃত রামায়ণে কবি বাল্মীকির ও কৃত্তিবাসের রামায়ণে দস্যু-রত্নাকরের রাম-চরিত রচনায় প্রবৃত্ত হইবার যে দুই আখ্যান আছে, তাহা তুলনা করিয়া দেখিলেই দুই রামায়ণের মূলগত ভাবের পার্থক্য স্পষ্ট দেখা যাইবে। করুণাপূর্ণ হৃদয়ের স্বাভাবিক মহত্ত্বে বাল্মীকিকে এবং ভক্তির অলৌকিক শক্তিতে রত্নাকরকে কবি করিয়া তুলিয়াছে। পাপিষ্ঠ রত্নাকর রামচরিত গান করিয়া পরিত্রাণ পাইয়াছে, পুণ্যবান মহর্ষি রাম-চরিত অবলম্বন করিয়া নিজের মহোচ্চ কাব্যশক্তিকে যথার্থভাবে সফল করিয়া তুলিয়াছেন। বাঙ্গলা দেশে যে এক সময়ে সমস্ত জনসাধারণকে একটা ভক্তির প্লাবনে প্লাবিত করিয়া তুলিতেছিল; সেই ভক্তিধারার অভিষেকে উচ্চ নীচ, জ্ঞানী মুখ, ধনী দরিদ্র, সকলেই, এক আনন্দের মহাযজ্ঞে সম্মিলিত হইয়াছিল—বাঙ্গলা রামায়ণ, বিশেষ ভাবে, বাঙ্গলাদেশের সেই ভক্তিযুগের সৃষ্টি। বাঙ্গলাদেশে সেই যে, এক সময়ে, একটি নবোৎসাহের নববসন্ত আসিয়াছিল, সেই উৎসবকালের কাব্যগুলি বাঙ্গালীর ছেলে যদি শ্রদ্ধাপূর্বক: পাঠ করে, তবে দেশের যথার্থ ইতিহাসকে গভীরভাবে উপলব্ধি করিতে পারিবে।

বাঙ্গালী সকল দিক্ হইতে আপন বাঙ্গালিত্বের দ্বারা পরিপুষ্ট হইলেই তবে যথার্থভাবে সার্বজাতীয় মনুষ্যত্ব লাভ করিতে পারিবে। স্বদেশের ভূমি হইতে তাহার হৃদয়ের শিকড়গুলিকে বিচ্ছিন্ন করিলেই সে যে উদার মনুষ্যত্বের অকারী হইবে, তাহা কখনোই নহে। এই জন্য বাঙ্গালীর ছেলেকে বাঙ্গালা সাহিত্য হইতে বঞ্চিত করা কোন মতেই চলিবে না।*

যোগীন্দ্রনাথ বসু বাংলা সাহিত্যের প্রাচীন ধারাকে আধুনিক বিদ্যালয়ের মধ্যে আবাহন করে এনেছেন, 'শিক্ষক' রবীন্দ্রনাথের আশা, তাতে দেশের মৃত শিক্ষা প্রাণ পেয়ে উঠবে।

'সন্ধ্যা' 'যুগান্তর' ও *'Bande Mataram'* পত্রিকা অনেকদিন ধরেই ব্রিটিশ-বিরোধী প্রবন্ধ ছাপিয়ে যাচ্ছিল। সিডিশন আইন বলবৎ থাকা সত্ত্বেও এতদিন বাংলা সরকার পত্রিকাগুলি সম্বন্ধে কোনো দমনমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করেনি। কিন্তু এই সময়ে সরকারের নীতি পরিবর্তিত হল। খড়্গ প্রথম উত্তোলিত হয় যুগান্তর পত্রিকার বিরুদ্ধে, 'নাই ভয়' ও 'লাঠৌষধি' নামে দুটি প্রবন্ধ প্রকাশের [16 Jun রবি ১ আষাঢ়] দায়ে কলকাতার প্রেসিডেন্সি ম্যাজিস্ট্রেট ডি. এইচ. কিংসফোর্ড সম্পাদক ভূপেন্দ্রনাথ দত্তকে ৮ শ্রাবণ [বুধ 24 Jul] এক বছরের সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করেন। অরবিন্দ ঘোষ *Bande Mataram* পত্রিকার অঘোষিত সম্পাদক ও প্রধান লেখক ছিলেন। ভূপেন্দ্রনাথের কারাদণ্ড ঘোষিত হওয়ার পরের দিন তিনি সম্পাদকীয়-প্রবন্ধ প্রকাশ করেন 'One More For the Altar' ও 28 Jul [রবি ১২ শ্রাবণ] যুগান্তর-এর প্রবন্ধ-দুটির ইংরেজি অনুবাদ ছাপিয়ে দেন। ইতিপূর্বে 27 Jun [বৃহ ১২ আষাঢ়] তাঁর 'India for the Indians' প্রবন্ধ বন্দেমাতরম্-এ প্রকাশিত হয়েছিল, যা সরকারের দৃষ্টিতে রাজদ্রোহাত্মক বলে পরিগণিত হয়। এই অপরাধে পুলিশ 16 Aug [শুক্র ৩১ শ্রাবণ] অরবিন্দের নামে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা জারি করলে তিনি ঐদিনই আত্মসমর্পণ করে আড়াই হাজার টাকার জামিনে মুক্ত হন। এই ধরনের কিছু ঘটতে যাচ্ছে জেনেই অরবিন্দ 2 Aug [শুক্র ১৭ শ্রাবণ] জাতীয়

শিক্ষাপরিষদের অধ্যক্ষ পদে ইস্তফা দেন। রবীন্দ্রনাথ 'বন্দেমাতরম' পত্রিকার পাঠক ছিলেন, তাই সংবাদপত্রের মাধ্যমে সমস্ত ঘটনাই জানতেন। ২ ভাদ্র জগদীশচন্দ্রের সঙ্গে কলকাতায় গিয়ে তিনি দেশব্যাপী উত্তেজনার সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে পরিচিত হন। ৫ ভাদ্র [বৃহ 22 Aug] তিনি শান্তিনিকেতনে ফিরে আসেন। এর দু'দিন পরেই ৭ ভাদ্র [শনি 24 Aug] তিনি লিখলেন 'নমস্কার' ['অরবিন্দ, রবীন্দ্রের লহ নমস্কার'] কবিতাটি—দেশের নিরুদ্ধ আবেগ ও আশা এর মধ্যে বাণীমূর্তি লাভ করল। কবিতাটি লিখে তিনি অরবিন্দকে প্রেরণ করেন, ভাদ্র-সংখ্যা বঙ্গদর্শন-এ [বেঙ্গল লাইব্রেরির ক্যাটালগ অনুযায়ী সংখ্যাটি প্রকাশিত হয় 5 Sep : ১৯ ভাদ্র] কবিতাটি মুদ্রিত হয়, গিরিজাশঙ্কর রায়চৌধুরী লিখেছেন : 'রবীন্দ্রনাথের এই কবিতাটি ৭ই সেপ্টেম্বর বন্দেমাতরম্ পত্রিকায় প্রকাশিত হইল।'[৪৮]

রাজনারায়ণ বসুর দৌহিত্র ও বন্ধু মনোমোহন ঘোষের ভাই হিসেবে অরবিন্দকে রবীন্দ্রনাথ বহু পূর্ব থেকেই জানতেন [দ্র রবিজীবনী ৪।৩৬], জাতীয় শিক্ষাপরিষদের সূত্রে তাঁদের যোগাযোগ ঘনিষ্ঠতর হয়। অসাধারণ পাণ্ডিত্য ও ইংরেজি রচনাকুশলতা দিয়ে তিনি রবীন্দ্রনাথের যে শ্রদ্ধা আকর্ষণ করেছিলেন তার অকুণ্ঠ প্রকাশ আছে কবিতাটিতে। ৯ ভাদ্র [সোম 26 Aug] রবীন্দ্রনাথ আমেরিকায় রথীন্দ্রনাথকে লেখেন : 'Statesman কাগজের চাঁদা ফুরলেই আর পাঠাব না। এখন থেকে 'বন্দেমাতরম্' কাগজ পাঠাতে থাক্‌ব। ওটা খুব ভাল কাগজ হয়েছে। কিন্তু অরবিন্দকে যদি জেলে দেয় তাহলে ও কাগজের কি দশা হবে জানিনে। বোধ হয় জেল থেকে সে নিষ্কৃতি পাবে না। আমাদের দেশে জেল খাটাই মনুষ্যত্বের পরিচয় স্বরূপ হয়ে উঠ্‌চে। জেলখানার ভয় না ঘোচাতে পারলে আমাদের কাপুরুষতা দূর হবে না।'[৪৯] অরবিন্দকে এবারে অবশ্য জেল খাটতে হয়নি —বিপিনচন্দ্র পালের আত্মত্যাগে প্রমাণাভাবে তিনি মুক্তি পান।

বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সময় থেকে পুলিশের খাতায় রবীন্দ্রনাথ 'দাগী' হিসেবে চিহ্নিত ছিলেন, 'নমস্কার' কবিতা ব্রহ্মচর্যাশ্রমের প্রতিও পুলিশের নজর আকর্ষণ করল। ১৮ ভাদ্র [বুধ 4 Sep] রাজলক্ষ্মী দেবী রথীন্দ্রনাথকে লিখেছেন:

তোরা জানিস্ তো, রাজভক্ত বলে বাবার কোনো কালেই ইংরেজ মহলে প্রতিপত্তি নেই, "বন্দেমাতরম্" কাগজের Editor অরবিন্দ ঘোষকে prosecute করেছে, সেখবর তোরা অবশ্য জানিস—বাবা সম্প্রতি অরবিন্দ ঘোষকে আশীর্ব্বাদ করে একটা কবিতা লিখেছেন, কলকাতাময় সেটা ছড়িয়ে পড়েছে, এই মাসের (ভাদ্র) বঙ্গদর্শনেও বার হয়েছে,—তাতে তিনি রাজভক্তির খুব পরিচয় দেননি,—কাজেই রাজপুরুষদের খর নজর বাবার উপরে পড়েছে। কাল তাহার একটা উদাহরণ পাওয়া গেছে। হঠাৎ সকালে একটা লোক এসে হাজির—অর্থাৎ কিনা—স্কুল দেখ্‌বো,—প্রথম থেকেই লোকটার উপর বাবার সন্দেহ হয়েছিল—তিনি কোনগতিকে প্রথমে স্কুলের মাষ্টারদের সঙ্গে মিশিয়ে দিয়ে নিতিলাভ করলেন—কিন্তু সে কি তা শোনে,—ঘুরে ফিরে ক্রমাগত খোঁজতল্লাস করতে লাগলো, আমাদের ছেলেরা লাঠি অভ্যেস করে কিনা, বন্দুক ধরে কিনা ইত্যাদি ইত্যাদি। আমাদের এখানকার ছেলেদের মধ্যে একটা Volunteer Band হয়েছে, ১২।১৪টি ছেলে নিয়ে, নানারকম কষ্টকর ও দুঃসাহসের কাজ তারা অভ্যেস করচে,—Bugle বাজিয়ে তাদের চালনা করা হয়ে থাকে,—Bugle-এর শব্দ শুনে লোকটার সন্দেহ আরো প্রবল হয়ে পড়েছিল—শেষে স্কুলের Laboratory থেকে আরম্ভ করে ভাঁড়ার ঘর পর্য্যন্ত সকলি এক একটু উঁকি ঝুঁকি মেরে দেখে নিলো। দুপুরের আহারের পর অনেকক্ষণ ধরে বাবাকে নানা কথা জিজ্ঞেস করেছিল,—ভাণ কতে লাগলো সে যেন আমাদের মত একটা বিদ্যালয় খাড়া করতে চায়সব ভেতরকার খবর যেন আমরা তার কাছে খুলে বলি,বাবা আমাদের বিদ্যালয়ের উদ্দেশ্য বেশ করে বুঝিয়ে দিলেন, কিন্তু সে মূর্খ তা বুঝবে কেন,—আমরা ছেলেদের লাঠিখেলা শেখাচ্ছি কিনা, আর রাজবিদ্রোহক কোন শিক্ষা ছাত্রদের দিচ্ছি কিনা, ঘুরিয়ে ফিরিয়ে কেবল সেই কথাই জান্‌বার চেষ্টা কর্‌তে লাগলো।···সন্ধ্যের সময় যখন বাবা তাকে স্পষ্টাস্পষ্টি বল্লেন, "মহাশয় চলুন আপনাকে আমাদের সব ঘরদুয়ার দেখাচ্ছি,—কোন ঘরেই কামান গোলা বারুদের সন্ধান পাবেন না"—তখন লোকটা থতমত খেয়ে এখান থেকে ঠিক সন্ধ্যের পরেই চলে গেল,—বহু অনুরোধেও থাকলো না।

···আজ কদিন আগে আবোরা একজন ভদ্রলোক এসে দুতিন দিন এখানে ছিলেন, চুপচাপ থেকে সব দেখেশুনে গেছেন। কিন্তু ঐ লোকটা বড় বোকা তাই ধরা পড়ে গিয়েছিল।[৫০]

রাজলক্ষ্মী দেবী যাকে Volunteer Band বলে উল্লেখ করেছেন, 'অভয়ব্রতী' নামে সেই ছাত্রদল সতীশচন্দ্র রায়ের অনুজ ভূপেশচন্দ্রের নেতৃত্বে শান্তিনিকেতনে গড়ে উঠেছিল।* রবীন্দ্রনাথ অথর্ববেদের দুটি মন্ত্র [১৯, ১৫, ৫-৬] অনুবাদ করে এদের জন্য অভয়মন্ত্র লিখে দেন:

অন্তরীক্ষ আমাদের হউক অভয়।
দ্যুলোক ভূলোক উভে হউক অভয়
পশ্চাৎ অভয় হোক্ সম্মুখ অভয়।
ঊর্ধ্ব নিম্ন আমাদের হউক্ অভয়।
বান্ধব অভয় হোক্ শত্রুও অভয়
জ্ঞাত যা অভয় হোক্ অজ্ঞাত অভয়
রজনী অভয় হোক্ দিবস অভয়—
সর্ব্ব দিক আমাদের মিত্র যেন হয়।[৫১]

—গীতাঞ্জলি-র পাণ্ডুলিপিতে লিখিত এই অনুবাদ অবশ্য কিছু পরবর্তীকালের।

রবীন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠ জামাতা শরৎকুমার চক্রবর্তী বিবাহের পূর্ব থেকেই মজঃফরপুর কোর্টে ওকালতি করছিলেন। এই সময়ে তিনি বিলেতে গিয়ে ব্যারিস্টার হয়ে কলকাতা হাইকোর্টে প্র্যাকটিস করার সিদ্ধান্ত নেন। মাধুরীলতাকে শান্তিনিকেতনে রেখে তিনি লণ্ডন যাত্রা করেন 11 Sep [বুধ ২৫ ভাদ্র]। 4 Sep তিনি রথীন্দ্রনাথকে লেখেন : 'আমি ১১ই সেপ্টেম্বর কলকাতা থেকে P & O কোম্পানির "Sumatra" জাহাজে বিলেত রওনা হচ্চি।···এখানে ৮ই পর্য্যন্ত থেকে কলকাতায় যাব।··· দীনু [দিনেন্দ্রনাথ] ৩১এ আগষ্ট বম্বে থেকে বিলেত গেছে। সে আমার জন্যে বাড়ী ঠিক করে রাখবে বলে গেছে।'[৫২] বিলেত থেকে ফিরে তিনি জোড়াসাঁকোর বাড়িতে থেকে প্র্যাকটিস করতে থাকেন। ছড়িয়ে-পড়া পরিবারকে সংহত করার উদ্দেশ্যে রবীন্দ্রনাথ সাগ্রহে এই ব্যবস্থা অনুমোদন করেন, কিন্তু পরিণামে তা তাঁর দুঃখের কারণ হয়েছিল।

কনিষ্ঠ জামাতাকে নিয়ে তিনি এখন থেকেই দুঃখ ভোগ করছিলেন। নগেন্দ্রনাথকে Ceramicsএর পরিবর্তে কৃষিবিদ্যাতেই প্রবৃত্ত করিয়ে দেবার পরামর্শ দিয়ে তিনি ৯ ভাদ্রের পূর্বোল্লিখিত পত্রে রথীন্দ্রনাথকে লেখেন :

নগেন্দ্র যাতে বেশ পুরুষ মানুষের মত শক্তসমর্থ হয়ে ওঠে তার জন্যে বিশেষ চেষ্টা করিস্। ও ওর ভাইকে বেলাকে যে সমস্ত চিঠিপত্র লেখে তাতে কথায় কথায় অশ্রপাতের উল্লেখ দেখ্তে পাই। এটাও সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের একটা লক্ষণ—ওরা মনে করে অশ্রুবর্ষণ ব্যাপারটা বিশেষভাবে গৌরবজনক—এতে মানুষের সহৃদয়তা প্রমাণ হয়। ওটা যে পুরুষমাত্রের পক্ষে লজ্জাকর এবং নিজের হৃদয়ের আবেগ সর্ব্বদা গায়ে পড়ে প্রকাশ করা যে হৃদয়ের পক্ষে অসম্মানকর,তাতে নিজের মর্য্যাদা নষ্ট হয় এবং অভ্যাসগত অত্যুক্তি দ্বারা ক্রমে হৃদয়াবেগ সত্যের সীমানা লঙ্ঘন করে' sentimentalityতে পরিণত হয়ে একটা ব্যাধিবিশেষ হয়ে ওঠে এটা নগেন্দ্রের বোঝা চাই।···আসল কথা ওর বয়সের উপযুক্ত পড়াশুনো যথেষ্ট হয় নি—ওর বুদ্ধির এবং প্রকৃতির অগভীরতা দোষ আছে—ওকে বেশ ভাল করে পড়তে শুন্তে সকল বিষয় আলোচনা করতে চিন্তা করতে হবে।[৫৩]

অবিমৃষ্যকারী ঔদ্ধত্য এবং অহংকারও নগেন্দ্রনাথের চরিত্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল, যা মীরা দেবী ও রবীন্দ্রনাথের অনেক দুঃখের কারণ হয়।

মীরা দেবীর চিকিৎসা ও শরকুমারকে বিদায় দেওয়ার জন্য রবীন্দ্রনাথ সপরিবারে কলকাতা আসেন ২২ ভাদ্র [রবি ৪ Sep]। তার আগে ২০ ভাদ্র [শুক্র 6 Sep] তিনি দক্ষিণারঞ্জন মিত্রমজুমদারের [1877-1957] 'ঠাকুরমার ঝুলি' রূপকথা-সংগ্রহের একটি 'ভূমিকা' রচনা করেন। ভট্টাচার্য অ্যাণ্ড সন্স থেকে গ্রন্থটি আশ্বিনের প্রথম সপ্তাহে প্রকাশিত হয়, বেঙ্গল লাইব্রেরির ক্যাটালগে প্রকাশের তারিখ : 16 Oct [বুধ ২৯ আশ্বিন]।

প্যারী বা শঙ্করী দাসীর কাছে ছেলেবেলায় রূপকথা শোনার আনন্দস্মৃতি রবীন্দ্রনাথ আজীবন স্মরণে রেখেছিলেন—অবনীন্দ্রনাথ, মৃণালিনী দেবী, সরলা রায় প্রভৃতিকে তিনি উৎসাহ দিয়েছেন রূপকথা সংগ্রহের জন্য; দক্ষিণারঞ্জন তাঁর সেই আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করলেন। তিনি লিখেছেন :

ঠাকুরমার ঝুলিটির মত এত বড় স্বদেশী জিনিষ আমাদের দেশে আর কি আছে? কিন্তু হায় এই মোহন ঝুলিটিও ইদানীং ম্যাঞ্চেষ্টারের কল হইতে তৈরী হইয়া আসিতেছিল। এখনকার কালে বিলাতের "Fairy Tales" আমাদের ছেলেদের একমাত্র গতি হইয়া উঠিবার উপক্রম করিয়াছে। স্বদেশের দিদিমা কোম্পানী একেবারে দেউলে'।···

পাল পার্বণ যাত্রা গান কথকতা এ সমস্তও ক্রমে মরানদীর মত শুকাইয়া আসাতে, বাংলা দেশের পল্লীগ্রামে যেখানে রসের প্রবাহ নানা শাখায় বহিত, সেখানে শুষ্ক বালু বাহির হইয়া পড়িয়াছে। ইহাতে বয়স্কলোকদের মন কঠিন স্বার্থপর এবং বিকৃত হইবার উপক্রম হইতেছে। তার পরে দেশের শিশুরাও কোন্ পাপে আনন্দের রস হইতে বঞ্চিত হইল। তাহাদের সায়ংকালীন শয্যাতল এমন নীরব কেন?···

এই যে আমাদের দেশের রূপকথা বহুযুগের বাঙ্গালী বালকের চিত্তক্ষেত্রের উপর দিয়া অশ্রান্ত বহিয়া কত বিপ্লব, কত রাজ্য পরিবর্তনের মাঝখান দিয়া অক্ষুন্ন চলিয়া আসিয়াছে, ইহার উৎস সমস্ত বাংলা দেশের মাতৃস্নেহের মধ্যে। ···অতএব বাঙ্গালীর ছেলে যখন রূপকথা শোনে তখন কেবল যে গল্প শুনিয়া সুখী হয়, তাহা নহে—সমস্ত বাংলা দেশের চিরন্তন স্নেহের। সুরটি তাহার তরুণ চিত্তের মধ্যে প্রবেশ করিয়া, তাহাকে যেন বাংলার রসে রসাইয়া লয়।

দক্ষিণারঞ্জনবাবুর ঠাকুরমা'র ঝুলি বইখানি পাইয়া তাহা খুলিতে ভয় হইতেছিল। আমার সন্দেহ ছিল, আধুনিক কলমের কড়া ইস্পাতের মুখে ঐ সুরটা পাছে বাদ পড়ে। এখনকার কেতাবী ভাষায় ঐ সুরটি বজায় রাখা বড় শক্ত—আমি হইলে ত এ কাজে সাহসই করিতাম না। ইতিপূর্ব্বে কোনো কোনো গল্পকুশলা অথচ শিক্ষিতা মেয়েকে দিয়া আমি রূপকথা লিখাইয়া লইবার চেষ্টা করিয়াছি—কিন্তু হৌক মেয়েলি হাত, তবুও বিলাতী কলমের যাদুতে রূপকথায় কথাটুকু থাকিলেও সেই রূপটি ঠিক থাকে না; সেই চিরকালের সামগ্রী এখনকার কালের হইয়া উঠে।

কিন্তু দক্ষিণাবাবুকে ধন্য! তিনি ঠাকুরমা'র মুখের কথাকে ছাপার অক্ষরে তুলিয়া পুঁতিয়াছেন তবু তাহার পাতাগুলি প্রায় তেমনি সবুজ, তেমনি তাজাই রহিয়াছে। রূপকথার সেই বিশেষ ভাষা, বিশেষ রীতি, তাহার সেই প্রাচীন সরলতাটুকু তিনি যে এতটা দূর রক্ষা করিতে পারিয়াছেন, ইহাতে তাঁহার সূক্ষ্ম রসবোধ ও স্বাভাবিক কলানৈপুণ্য প্রকাশ পাইয়াছে।[৫৪]

পরিশেষে তিনি প্রস্তাব দিয়াছেন, আধুনিক দিদিমাদের জন্য স্কুল খুলে এই বই অবলম্বনে 'শিশু-শয়ন-রাজ্যে' তাঁদের পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করার। তিনি বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের মাধ্যমে এই-সব লুপ্ত রত্ন উদ্ধার করার যে আহ্বান জানিয়েছিলেন, দক্ষিণারঞ্জন অন্তত তার একটি ক্ষেত্র পুনরুদ্ধার করলেন। গ্রন্থকার তাঁর 'নিবেদন'-এ 'শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের কথা 'জ্যোচ্ছনা ফুল ফুটেছে' উদ্ধার করেছেন, এ থেকে মনে হয় আগে থেকেই পত্র বা মৌখিক আলাপে তাঁদের যোগ ঘটেছিল। দক্ষিণারঞ্জন তাঁর 'পুষ্পমালা'র পাণ্ডুলিপি রবীন্দ্রনাথকে প্রেরণ করেন; প্রত্যুত্তরে তিনি ১৪ চৈত্র [শুক্র 27 Mar 1908] লেখেন : 'তোমার পুষ্পমালা পড়িবার সময়ে তোমার বলামত হাতে একটা পেন্‌সিল লইয়া বসিয়াছিলাম—কিন্তু তোমার লেখার গায়ে কোথাও একটা আঁচড় পড়িল না। এ জিনিস বিশেষ উপাদেয় হইয়াছে। বাংলাদেশের মুখে মুখে প্রচলিত লোকসাহিত্যের বিশেষ রস তোমার এই কাহিনীগুলিতে মধুরভাবে রক্ষিত হওয়াতে এইগুলি বাংলা সাহিত্যে অপূর্ব্ব সম্পদরূপে গণ্য হইবে।'[৫৫] 'ঠাকুরদার ঝুলি' উপহার পেয়ে ২ কার্তিক ১৩১৫ [রবি 18 Oct] লেখেন : 'বাংলার এই ঝুলি এবার চিত্রে এবং রসে খুব করিয়া ভরিয়া তুলিয়াছ—তোমার এই রসের ঝুলি অক্ষয় হোক।'[৫৬] রবীন্দ্রনাথের এইসব উৎসাহবাণী নবীন লেখকদের কাছে অমূল্য ছিল, এদের অনেক অংশ বিজ্ঞাপন হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে।

১৯ ভাদ্র [বৃহ 5 Sep] রবীন্দ্রনাথ শ্রীশচন্দ্র মজুমদারকে অনুযোগ জানিয়ে লিখেছিলেন : 'আজও "সাহিত্য" বইখানা বাহির কেন হইলনা শৈলেশকে জিজ্ঞাসা করিয়া আমাকে খবর দিয়ো।'[৫৭] ২৫ ভাদ্র [বুধ 11 Sep] 'মজুমদার লাইব্রেরী হইতে গদ্যগ্রন্থাবলী ৪র্থ ভাগ ৩০০ আনার মুটে ভাড়া'র হিসাব থেকে জানা

যায় ‘সাহিত্য’ প্রকাশিত হয়ে গেছে, রবীন্দ্রনাথের ১৫ ভাদ্রের প্রতিশ্রুতি-মতো পরদিন মনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়কে ‘লোকসাহিত্য’ ও ‘সাহিত্য’ বুকপোস্ট করে পাঠানো হয়। কিন্তু বেঙ্গল লাইব্রেরির ক্যাটালগে ‘সাহিত্য প্রকাশের তারিখ 11 Oct [শুক্র ২৪ আশ্বিন]—গদ্যগ্রন্থাবলী ৫ম ভাগ ‘আধুনিক সাহিত্য’-এরও পরে —যা অবশ্যই ভ্রমাত্মক। গ্রন্থটির পৃষ্ঠাসংখ্যা : ২+২+১৬৩; মূল্য : দশ আনা, মুদ্রণসংখ্যা : ১০৫০। অন্যান্য বিবরণ :

আখ্যাপত্র : গদ্যগ্রন্থাবলী, ৪র্থ ভাগ।/ সাহিত্য।/ শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।/ মূল্য ৷৷০ আনা।

[পরপৃষ্ঠায় :] প্রকাশক—শ্রীসুহাসচন্দ্র মজুমদার,/ মজুমদার লাইব্রেরী, ২০নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট্, কলিকাতা।/
কলিকাতা, ২০ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্, দিনময়ী প্রেসে/ শ্রীহরিচরণ মান্না দ্বারা মুদ্রিত।

সূচী:

রবীন্দ্র-রচনাবলী অষ্টম খণ্ডে [ভাদ্র ১৩৪৮] আরও ৯টি রচনা ‘পরিশিষ্ট’ অংশের অন্তর্ভুক্ত হয়। ১৩৬১-র স্বতন্ত্র বিশ্বভারতী সংস্করণে পরিশিষ্টটি পরিবর্ধিত হয় আরও ১১টি রচনা দ্বারা।

কলকাতায় দিন-চারেক থেকে ২৫ ভাদ্র শরৎকুমারকে জাহাজে রওনা করে দিয়ে পরদিন ২৬ ভাদ্র [বৃহ 12 Sep] রবীন্দ্রনাথ শিলাইদহ রওনা হন—‘শ্রীযুক্ত রবীন্দ্র বাবু মহাশয়ের বিরাহিমপুর ২৬ ভাদ্র গমন করিয়া ৫ আশ্বিন আগমন করার ব্যয়’ হিসাব থেকে তারিখটি নির্ধারিত হয়েছে। ২৮ ভাদ্র তিনি শিলাইদহ থেকে মনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়কে লিখেছেন : ‘মীরাকে নিয়ে কলকাতায় গিয়েছিলুম। সেখানে তার শরীর একটু ভালই আছে। ইতিমধ্যে এইদিক থেকে ডেপুটি বাহাদুরের ভ্রুকুটির অন্তরালে একটুখানি বৈষয়িক মেঘগর্জ্জন শোনা গেল। তাই চলে আসতে হল। ডেপুটির ক্ষোভ শান্ত করে দিয়েই চলে যাব স্থির করেছিলুম ইতিমধ্যে পদ্মা আমার মনোহরণ করে বস্‌ল এখন পড়ে পড়ে জলকল্লোল শুনচি। কর্ম্মের উপলক্ষ্যে আগমন বটে কিন্তু অত্যন্ত অকর্ম্মণ্যভাবে দিনক্ষেপ করচি।’[৫৮] পদ্মার মনোহরণের বর্ণনা তিনি আরও বিস্তারিতভাবে করেছেন পরদিন ভূপেন্দ্রনাথ সান্যালকে লেখা পত্রে, পত্রটি ছিন্নপত্রাবলী-র কথা স্মরণ করিয়ে দেয় : ‘সম্প্রতি পদ্মার অনুনয়ে আবদ্ধ হইয়া কাজের ছুতা খুঁজিয়া এখানকার মেয়াদ বাড়াইয়া লইতেছি। এই ভাদ্রের ভরা নদীর উপরে মেঘরৌদ্রবিচিত্র শরতের সমাগম বড়ই ভাল লাগে—দুই মুগ্ধচক্ষু পরিপূর্ণ করিয়া হৃদয়ের মধ্যে এই অপরূপ সৌন্দর্যের আবির্ভাবকে আমি উপেক্ষা করিতে পারি না। ...আমার মনে হইতেছে যেন ইহার পরে

কোনো একটা মহাদিনে এই সমস্ত সৌন্দর্য অভিষিক্ত দিনগুলির কথা কেহ আমাকে বিশেষ করিয়া মনে করাইয়া দিবে।'[৫৯] মনের এই অবস্থায় কবিতা বা গান লেখা খুবই স্বাভাবিক—হয়তো লিখেছিলেন, কিন্তু সেটিকে শনাক্ত করা সম্ভব হয়নি।

ভাদ্র মাসে সাময়িকপত্রে রবীন্দ্ররচনার প্রকাশসূচী নিম্নে প্রদত্ত হল :

প্রবাসী, ভাদ্র ১৩১৪ [৭।৫] :

২৭৮-৮৮ 'গোরা' ১-৩ দ্র গোরা ৬।১১৩-২৯ [১-৩]

বঙ্গদর্শন, ভাদ্র ১৩১৪ [৭।৫]:

২১৫ 'কামনা' ['বিপদে মোরে রক্ষা কর'] দ্র গীতাঞ্জলি ১১।৭-৮ [৪]; গীত ১।১০০

২২৮-৩০ 'নমস্কার' দ্র অরবিন্দ ঘোষ [১৩৮৬]।৭-১১; র° র° ২ [প. ব.]। ৭১৩-১৫

'বিপদে মোরে রক্ষা করো' গানটি '১৩১৩'-তে লেখা, পাণ্ডুলিপি পাওয়া যায়নি বলে রচনার তারিখ বা স্থান কিছুই জানা যায় না। গানটি বর্তমান বৎসরের মাঘোৎসবে গীত হয় দ্র তত্ত্ব° ফাল্গুন। ১৮১, ইমন কল্যাণ-ঝম্পক; স্বর ২৫।

সঙ্গীত-প্রকাশিকা, ভাদ্র ১৩১৪ [৬।১২] :

২৪৮-৫১ মিশ্র-কাওয়ালী। ঐ বুঝি বাঁশী বাজে (রবীন্দ্রনাথের সুর) দ্র স্বর ২৮

২৫১-৫২ ঐ (থিয়েটারের সুর)

২৬১-৬২ বাহার-চৌতাল। নব নব পল্লবরাজি দ্র স্বর ২৪

তিনটি গানেরই স্বরলিপিকারের নাম উল্লেখিত হয়নি, তবে সম্ভবত কাঙালীচরণ সেন তৃতীয় গানটির স্বরলিপি করেন।

৩১ ভাদ্র [মঙ্গল 17 Sep] রবীন্দ্রনাথ ভূপেন্দ্রনাথকে লিখেছিলেন, 'আমি শীঘ্রই কলিকাতায় ফিরিব'[৬০]—কিন্তু তিনি শিলাইদহ থেকে কলকাতা ফেরেন ৫ আশ্বিন [রবি 22 Sep]। তিনি অবিলম্বে শান্তিনিকেতনে ফিরতে পারেননি। 'মঙ্গলবার' [৭ আশ্বিন : 24 Sep] তিনি ভূপেন্দ্রনাথকে লেখেন : 'সুবোধ দার্জিলিং গেছেন তিনি ফিরিলে মীরার সম্বন্ধে পরামর্শ করিয়া ছুটি পাইব। তিনি দুই একদিনের মধ্যেই ফিরিবেন।'[৬১] মীরা দেবীর জন্য যে নার্স রাখা হয়েছিল তিনি কলকাতাতেও এই কাজে নিযুক্ত ছিলেন—'২২ না° ৩১ ভাদ্র' '১ না° ১৮ আশ্বিন' এইভাবে তাঁর কার্যকাল বাড়িয়ে যাওয়া হয়েছে। ১৫ আশ্বিন [বুধ 2 Oct] 'শ্রীমতী মীরা দেবীকে দেখিবার জন্য ডাক্তার মেম সাহেব আসার' হিসাবও পাওয়া যায়।

১০ আশ্বিন [শুক্র 27 Sep] সিটি কলেজ হলে রবীন্দ্রনাথ রামমোহন রায়ের ৭৪তম মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে বক্তৃতা করেন। এই দিন তিনি ভূপেন্দ্রনাথকে লেখেন : 'ইতিমধ্যে রামমোহন রায়ের স্মরণসভায় বক্তাদের মধ্যে আমার নাম বাহির হইয়া গেছে [দ্র *The Bengalee*' Sep 26] —আজ সেই সভা।···শনিবারে যাইবার কোনো বাধা এখনও দেখিতেছি না। তাই কাল মেলে যাওয়াই ঠিক করা গেল।'[৬২]

বেঙ্গলী পত্রিকার 28 Sep-সংখ্যায় সভাটির একটি দীর্ঘ প্রতিবেদন মুদ্রিত হয় :

The seventy-fourth anniversary meeting in commemoration of the death of Raja Ram Mohan Roy was held last evening in the premises of the City College at 5.30 p.m. under the presidency of Babu Satyendra Nath Tagore. The meeting was largely attended and the hall was packed up to the utmost capacity and another overflow meeting was held on the ground floor which was addressed by Babu Rabindra Nath Tagore and Nagendra Nath Chatterjee. ...Babu Rabindra Nath Tagore also addressed the meeting in his inimitable style and kept the audience spell-bound for some half an hour.

রবীন্দ্রনাথ মৌখিক ভাষণ দিয়েছিলেন, তার বাংলা ভাষায় যথাযথ অনুলেখন আমরা কোথাও দেখিনি। বেঙ্গলী-তেই বক্তৃতাটির একটি ইংরেজি সংক্ষিপ্তসার মুদ্রিত হয়। এরই একটি মোটামুটি ভাবানুবাদ করে দেওয়া হল।

কিছুকাল ধরে প্রতি বৎসরই রাজা রামমোহন রায়ের মৃত্যুবার্ষিকী পালিত হয়ে আসছে। কিন্তু এই পদ্ধতিতে আমার পুরো সায় নেই। রামমোহন কেবল কতিপয় শিক্ষিত মানুষের সম্পত্তি নন, তিনি সমস্ত জাতির। আর সেই কারণেই তাঁর বার্ষিকী পালন করার জন্য আমাদের সমগ্র জাতিকেই সঙ্গে নিতে হবে। যদি আমরা রামমোহনকে সম্পূর্ণ বুঝে ও মূল্য দিয়ে থাকি তবে দেশবাসীর বৃহত্তর অংশের কাছে তাঁকে আমাদের হাজির করতেই হবে। মহাপুরুষদের বার্ষিকী পালনের ক্ষেত্রে আমাদের দেশীয় প্রথাই সর্বাধিক উপযোগী। আমাদের দেশে মহাপুরুষদের জন্মস্থানে বা তাঁদের জীবনের সঙ্গে সম্পর্কিত কোনো জায়গায় তাঁদের স্মরণে মেলা বসে, যেখানে মিলিত হয় সর্বশ্রেণীর মানুষ। কেন্দুবিল্ব গ্রামের জয়দেব মেলার মতো রাধানগরে বা আর কোন জায়গায় আমরা রামোহন মেলা করতে পারি। যদি এই প্রথা গতানুগতিক বলে মনে হয়, তবে আমরা য়ুরোপীয় প্রথায় মহাপুরুষদের নামে সমিতি প্রতিষ্ঠা করে সারা বছর তাঁদের কীর্তি পর্যালোচনা করে তাঁদের স্মৃতিকে অধিকতর স্থায়িত্ব দিতে পারি। বছরে একদিন মিলিত হয়ে কিছু শূন্যগর্ভ অসার বক্তৃতা করার বর্তমান রীতি সেই মহান মৃত ব্যক্তির প্রতি সম্মান ও শ্রদ্ধাজ্ঞাপনের পক্ষে যথেষ্ট নয়। রবীন্দ্রনাথ বলেন, অস্বাস্থ্য ও মানসিক অশান্তি সত্ত্বেও তিনি এই সভায় এসেছেন কারণ তাঁর মনে হয়েছে রামমোহন সম্পর্কে এই কথা বলা দরকার যে তিনি আমাদের জাতির যে মহৎ উপকার করেছেন তার তাৎপর্য আমরা এখনও সম্পূর্ণ বুঝে উঠতে পারিনি। ভারত-ইতিহাসের এক সংকটময় মুহূর্তে রামমোহন জন্মগ্রহণ করেছিলেন। পশ্চিম থেকে আগত নূতন জ্ঞানের বন্যা তখন দেশের চিত্তক্ষেত্রকে প্লাবিত করে স্বভাবতই এক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেছিল। বাইরের প্রভাবকে কাজে লাগাবার ক্ষমতা নির্ভর করে আমাদের অন্তর্নিহিত গ্রহণশক্তির উপর। রামমোহন শিখিয়েছিলেন তাকে কাজে লাগানোর পদ্ধতি। তিনি না থাকলে আমরা পশ্চিমের জোয়ারে ভেসে যেতাম। রামমোহন সত্যই রাজা ছিলেন, তিনি তাঁর অন্তরের ঐশ্বর্য দিয়ে আমাদের ভিক্ষাদশা থেকে উদ্ধার করেছিলেন। রাজা রামমোহন রায়ের জন্যই সেই ক্ষমতামদমত্ত গর্বিত উপকারীর সামনে ভিক্ষুকের মতো দাঁড়ানোর অগৌরব থেকে আমরা রক্ষা পেয়েছি, তিনিই আমাদের প্রাচীন জ্ঞানভাণ্ডারের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হতে শিখিয়েছিলেন। কী শ্রদ্ধার সঙ্গে তিনি আমাদের নিজের সাহিত্যের দিকে ফিরেছিলেন যা ধুলোর তলায় চাপা পড়েছিল, কী গভীর আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে তিনি আমাদের শিশু বাংলা গদ্যকে তৈরি করেছিলেন সর্বোচ্চ চিন্তার বাহন হিসেবে, সে কথা ভাবলে আমরা অবাক না হয়ে পারি না। চোখ-ধাঁধানো পশ্চিমী সভ্যতার আকস্মিক আবির্ভাবের সময়ে মর্যাদা প্রশান্তি ও আত্মনির্ভরতার সঙ্গে জাতীয় জীবনের ঘুমন্ত শক্তিগুলির উন্মেষ ঘটানোর জন্য কতই না বিশ্বাসের জোর থাকা দরকার! বাহির বিশ্বের সমস্ত জ্ঞান তখন বন্যার মতো আমাদের সুপ্ত মনের উপর ঝাঁপিয়ে পড়েছিল—রামমোহন না থাকলে আমরা কি তাকে আত্মস্থ করতে পারতাম, মাথা উঁচুতে তুলে রাখতে পারতাম; রামমোহনই আমাদের সেই শক্তি, আত্মমর্যাদা ও বিশ্বাস দান করেছিলেন যার জোরে আমরা তাকে ব্যবহার করতে পেরেছি। যখন আমরা এই দিক দিয়ে তাঁর দিকে তাকাই তখন তাঁর সুউচ্চ মহিমা দেখতে পাই। সেই মানুষটির মহত্ত্ব ও তাঁর কাজের মাহাত্ম্য অনুভব করি বলেই শাব্দিক শ্রদ্ধা ও ভক্তির এই প্রথাগত বার্ষিক প্রদর্শনে সন্তোষ নেই। রামমোহন এক সংকটের মুহূর্তে আমাদের রক্ষা করেছিলেন। এখন আর একটি সংকটের সময় এসেছে। রামমোহনের সময়ে বাইরের জ্ঞান ভারতবর্ষকে প্লাবিত করেছিল, এখন বাইরের বাহুবল আমাদের গ্রাস করতে উদ্যত। আমাদের সামনে দেখতে পাচ্ছি বিভিন্ন জাতির ইতিহাস ও সাহিত্য এবং একটি বিশেষ জাতির প্রত্যক্ষ সংস্পর্শে তাদের শক্তি ও কর্মকুশলতার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত, তা আমাদের সহজেই অভিভূত করতে পারে। কিন্তু আমরা যেন মনে রাখি, শক্তি ভিতর থেকেই আসে, তাকে ধার করে বা ভিক্ষা করে পাওয়া যায় না। রাজা রামমোহনের দৃষ্টান্ত বর্তমান সংকটের সময়ে আমাদের পথ দেখাতে পারে। দেশে এখন অস্থিরতা বিরাজমান। এই অবস্থায় রামমোহনের আদর্শের প্রতি আমাদের লক্ষ্য স্থির করা দরকার। এক কঠিন পরীক্ষার সময়ে তাঁকে একা কাজ করতে হয়েছে, কেউ সাহায্য করার ছিলেন না, কেউ ছিলেন না উৎসাহ দেওয়ার জন্য। তিনি শক্তি ও প্রেরণা পেয়েছিলেন ঈশ্বরের কাছ থেকে। আমরাও যদি কোনো প্রকৃত কাজ করতে চাই, রামমোহনের পদাঙ্ক অনুসরণ করে আমাদেরও সমস্ত কাজের মাঝখানে ঈশ্বরকে প্রতিষ্ঠা করতে হবে। আমাদের মধ্যে অনেকে দেশপ্রেমকে ঈশ্বরের পরিবর্ত বলে মনে করেন, আমি তাঁদের সঙ্গে একমত নই। ঈশ্বর, সত্য ও সততার উপর দৃঢ় বিশ্বাস ছাড়া আমাদের আরব্ধ কাজ আমরা সম্পন্ন করতে পারব না। রামমোহনের মতোই ধর্মকে আমাদের কাজের লক্ষ্য ও প্রেরণা করতে হবে। বিশ্বাসই ধর্ম, কোনো অব্যবহিত লাভের উদ্দেশ্যে আমরা যেন ধর্মকে বিসর্জন না দিই। ধর্মই আমাদের রক্ষা করতে পারে ও রক্ষা করবে এবং আপনারা যদি মনে করেন ঈশ্বর যাদের আমাদের উপরে স্থাপন করেছেন তারা ধর্মকে লঙ্ঘন করছে—বিশ্বাস রাখুন, ধর্মই তার প্রতিশোধ নেবে এবং সেই প্রতিশোধ আসবে হয়তো আমাদের দুর্বল হাত দিয়েই। ঈশ্বরের উপর সম্পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাস স্থাপন কর, এইটিই রাজা রামমোহন রায়ের উপদেশ।

রবীন্দ্রনাথ পরে এই মৌখিক ভাষণের কোনো কোনো বক্তব্য 'শক্তি' [দ্র বঙ্গদর্শন, মাঘ। ৪৭১-৭৩] প্রবন্ধে লিখিত আকারে প্রকাশ করেছেন।

বক্তৃতার পরদিন ১১ আশ্বিন [শনি 28 Sep] রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনে আসেন। কিন্তু কয়েকদিন পরে ১৮ আশ্বিন [শনি 5 Oct] তিনি পুনরায় কলকাতা প্রত্যাবর্তন করেন। মীরা দেবীর স্বাস্থ্য নিয়ে তিনি বিব্রত ছিলেন। পুজোর ছুটিতে শমীন্দ্রনাথকে কোথায় রাখবেন তা নিয়েও ভাবনা ছিল। তাই 'সোমবার' [* 14 Oct: ২৭ আশ্বিন] শ্রীশচন্দ্র মজুমদারকে লিখেছেন : 'কলিকাতায় শমী আসতে চায় না। বোলপুরেও তার একলা ঠেকচে। এই কারণে, মনে করচি তাকে দুই তিন দিনের মধ্যে মুঙ্গের পাঠিয়ে দেব। অসুবিধা হবেনা ত? জগদানন্দ তাকে পৌঁছে দিয়ে চলে আস্‌বেন। ভেবেছিলুম সুবোধের সঙ্গে তাকে দিল্লী পাঠাব কিন্তু দিল্লীতে ম্যালেরিয়ার প্রাদুর্ভাব শুনে পিছতে হল। শমী এত অল্প জায়গা জোড়ে এবং এত নিরুপদ্রব যে তার আগমনে তোমাদের মুঙ্গের সহরের শান্তিভঙ্গের আশঙ্কা নেই। মীরা সেই রকমই আছে। এক একবার ভাবছি তাকে শিলাইদহে বোটে বেড়াতে [নিয়ে] যাব—কিছুই স্থির হয়নি। আপাতত আগামী কল্য বোলপুরে গিয়ে শমীকে রওনা করে দেবার ব্যবস্থা করব।'[৬৩] ২৮ আশ্বিন [মঙ্গল 15 Oct] ভূপেন্দ্রনাথকে লিখেছেন : 'আমি আজ বোলপুরে যাইতেছি সেখান হইতে জগন্নাথের সঙ্গে শমীকে মুঙ্গেরে পাঠাইব স্থির করিয়াছি তাহার কারণ দেখা হইলে বলিব। ··· বেলা বোধ হয় আগামীকল্য মজঃফরপুরে রওনা হইবে।'[৬৪] সম্ভবত ২৯ আশ্বিন [বুধ 16 Oct] বিজয়াদশমীর দিনে শমীন্দ্রনাথ বন্ধু সরোজচন্দ্র মজুমদারের [ভোলা] মামার বাড়ি মুঙ্গেরে রওনা হন। শমী আর শান্তিনিকেতনে ফিরে আসেননি, কলেরায় আক্রান্ত হয়ে ৭ অগ্র° [রবি 24 Nov] মুঙ্গেরেই তাঁর মৃত্যু হয়।

৩০ আশ্বিন বঙ্গভঙ্গের তৃতীয় বার্ষিকী উপলক্ষে যথারীতি রাখীবন্ধন ও অরন্ধন পালিত হয়। কিন্তু দু' বছর আগে এই অনুষ্ঠানে রবীন্দ্রনাথ যে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন, আজ তার থেকে তিনি অনেক দূরে। 4 Oct [শুক্র ১৭ আশ্বিন] বেঙ্গলী পত্রিকায় 'রাখী বন্ধন'-শীর্ষক যে-বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয় [স্বাক্ষরদাতা ১৫ জনের মধ্যে ৩ জন মুসলমান] তার মধ্যে রবীন্দ্রনাথের নাম নেই, অনুষ্ঠানের আগে-পরে লেখা তাঁর চিঠিতে রাখী প্রেরণের সংবাদও পাওয়া যায় না। অবশ্য শান্তিনিকেতনে অরন্ধন পালিত হয়। সম্ভবত ১ কার্তিক [শুক্র 18 Oct] রবীন্দ্রনাথ মীরা দেবীকে লিখেছেন :

> এখানকার উদার আকাশ নির্ম্মল আলোক এবং উন্মুক্ত বাতাস অনেকদিন পরে পেয়ে ভারি ভাল লাগ্‌চে।...কাল সন্ধ্যাবেলায় জ্যোৎস্নায় বাইরে দোলা চৌকির উপরে আরামে বসে আছি এমন সময় কলকাতা থেকে একজন অতিথি এসে উপস্থিত। ···কাল ভাগ্যি অরন্ধন ছিল তাই আতা ও মুড়কি খাইয়ে তাকে পরিতৃপ্ত করে দিলুম। আজও সেযাবার নাম করচে না। আজ দ্বিপুদের মহলে তাকে চালিয়ে দিয়েছি। সেখানে কমল এবং বৌমা [হেমলতা দেবী] তার যে রকম সৎকার করতে চান করবেন, অন্ত্যেষ্টি সৎকার না করলেই হল। ···আমাকে প্রথমদিন দুর্গা [জগদানন্দ রায়ের কন্যা] রেঁধে খাইয়েছিল, দ্বিতীয়দিন মুড়িমুড়কি ডাল ভিজে—আজ তৃতীয়দিনে বৌমা খাওয়ালেন।···
>
> নির্জ্জনে নিভৃতে সেই গোরা গল্পটা লেখা যাচ্চে। কলকাতায় মুস্কিলে পড়েছিলুম, গল্প কাগজে বের করতে আরম্ভ করে শেষ না করলে ত লজ্জা রক্ষা হবে না। অন্তত তিনমাসের লেখা আগিয়ে থাক্‌লে নিশ্চিন্ত হওয়া যায়।[৬৫]

এই দিন তিনি শ্রীশচন্দ্র মজুমদারকেও লেখেন : 'নির্জ্জনতায় শান্তিনিকেতনের শান্তি ফুটিয়া বাহির হইয়াছে।'[৬৬] কিন্তু বেশিদিন এই শান্তি ভোগ করা সম্ভব হল না—৪ কার্তিক [সোম 21 Oct] তিনি কলকাতায় আসেন।

বেঙ্গল লাইব্রেরির ক্যাটালগ অনুযায়ী গদ্যগ্রন্থাবলী পঞ্চম ভাগ আধুনিক সাহিত্য প্রকাশিত হয় 10 Oct [বৃহ ২৩ আশ্বিন]। আমরা অবশ্য ক্যাশবহিতে তার আগের দিনই 'আধুনীক সাহিত্য পুস্তক ১৮০ খান মজুমদার লাইব্রেরী হইতে আসার' হিসাব পাই, বাকি বই আনা হয় ২ কার্তিক। এটিরও মুদ্রণসংখ্যা ১,০৫০; পৃষ্ঠাসংখ্যা : ২+২+১৬০; মূল্য : দশ আনা। অন্যান্য বিবরণ :

আখ্যাপত্র : গদ্যগ্রন্থাবলী, ৫ম ভাগ।/ আধুনিক-সাহিত্য।/ শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। মূল্য ৷৷০ আনা।

[পরপৃষ্ঠায় :] প্রকাশক—শ্রীসুহাসচন্দ্র মজুমদার,/ মজুমদার লাইব্রেরি, ২০ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা / কলিকাতা, ২০ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, দিনময়ী প্রেসে/ শ্রীহরিচরণ মান্না দ্বারা মুদ্রিত।

সূচী :

[১] বঙ্কিমচন্দ্র [সাধনা, বৈশাখ ১৩০১]
[২] বিহারীলাল [ঐ, আষাঢ় ১৩০১]
[৩] সঞ্জীবচন্দ্র [ঐ, পৌষ ১৩০১]
[৪] বিদ্যাপতির রাধিকা [ঐ, চৈত্র ১২৯৮]
[৫] কৃষ্ণচরিত্র [ঐ, মাঘ-ফাল্গুন ১৩০১]
[৬] রাজসিংহ [ঐ, চৈত্র ১৩০০]
[৭] ফুলজানি [ঐ, অগ্র° ১৩০১]
[৮] যুগান্তর [ঐ, চৈত্র ১৩০১]
[৯] আর্য্য গাথা [ঐ, অগ্র° ১৩০১]
[১০] আষাঢ়ে [ভারতী, অগ্র° ১৩০৫]
[১১] মন্দ্র [বঙ্গদর্শন, কার্তিক ১৩০৯]
[১২] শুভবিবাহ [ঐ, আষাঢ় ১৩১৩]
[১৩] মুসলমান রাজত্বের ইতিহাস [ভারতী, শ্রাবণ ১৩০৫]
[১৪] সাকার ও নিরাকার [ঐ, আশ্বিন ১৩০৫]
[১৫] জুবেয়ার [বঙ্গদর্শন, বৈশাখ ১৩০৮]
[১৬] ডি প্রোফণ্ডিস্ [ভারতী, আশ্বিন-কার্তিক ১২৮৮]

রবীন্দ্র-রচনাবলী-সংস্করণে [১৩৪৮ : 1941] 'ডি প্রোফণ্ডিস' [অচলিত সংগ্রহ দ্বিতীয় খণ্ডে 'সমালোচনা' গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত] বর্জিত এবং 'সিরাজদ্দৌলা ১।২' [ভারতী, জ্যৈষ্ঠ, শ্রাবণ ১৩০৫], 'ঐতিহাসিক চিত্র' [ঐ, ভাদ্র ১৩০৫], 'শোকসভা' [সাধনা, জ্যৈষ্ঠ ১৩০১] ও 'নিরাকার উপাসনা' [ভারতী, মাঘ ১৩০৫] প্রবন্ধগুলি অন্তর্ভুক্ত হয়।

আশ্বিন মাসে রবীন্দ্রনাথের নিমোক্ত রচনাগুলি বিভিন্ন সাময়িকপত্রে মুদ্রিত হয় :

প্রবাসী, আশ্বিন ১৩১৪ [৭।৬] :

৩৪৭ 'ব্যাধি ও প্রতিকার'

৩৫৩-৫৬ 'গোরা' ৪-৫ দ্র গোরা ৬।১২৯-৩৪ [৪]

বঙ্গদর্শন, আশ্বিন ১৩১৪ [৭।৬] :

২৯৮ 'দয়া' ['আমি বহু বাসনায় প্রাণপণে চাই'] দ্র গীতাঞ্জলি ১১।৬ [২]

গানটির পাণ্ডুলিপি পাওয়া যায়নি, মুদ্রিত গ্রন্থে রচনাকাল '১৩১৩' উল্লিখিত হয়েছে। এটি বর্তমান বৎসরের মাঘোৎসবে গীত হয়, রাগ-তাল : কামোদ-একতালা দ্র গীত ১।৯৯, স্বর ২৪।

৪ কার্তিক [সোম 21 Oct] রবীন্দ্রনাথ ভূপেন্দ্রনাথ সান্যালকে লেখেন : 'আজই কলিকাতায় ফিরিতেছি। কয়দিন অর্শের কষ্টও ভোগ করা গেছে।'[৬৭] কার্তিকের মাঝামাঝি তাঁর অন্য কাজ ছিল, কিন্তু শান্তিনিকেতনের নির্জনতার শান্তি ত্যাগ করে এত তাড়াতাড়ি কলকাতা ফেরার কারণ হয়তো অর্শের চিকিৎসা।

এইবার তাঁকে ঘোরাঘুরি কম করতে দেখা গেছে। ৮ কার্তিক 'স্যারকুলার রোড', ১২ কার্তিক 'থ্যাকার কোং' ও ১৩ কার্তিক 'গোলতালাও'—কার্তিকের মাঝামাঝি পর্যন্ত এই হল তাঁর ভ্রমণবৃত্তান্ত। এর মধ্যে ৮ কার্তিক [শুক্র 25 Oct] সারকুলার রোড যাতায়াতের কিছুটা অতিরিক্ত তাৎপর্য থাকতেও পারে। বর্তমান শতাব্দীর গোড়া থেকেই ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়ের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের একটি ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ গড়ে উঠেছিল। ব্রহ্মবান্ধব world-Poet of Bengal বলে তাঁকে যে শ্রদ্ধা জানিয়েছিলেন, নৈবেদ্য প্রকাশের পর তা ঘনীভূত হয়—ব্রহ্মচর্যাশ্রম প্রতিষ্ঠার প্রথম পর্বে ব্রহ্মবান্ধবের সহায়তা রবীন্দ্রনাথের কাজকে অনেক সহজ করে দিয়েছিল। পরে ব্রহ্মবান্ধবের জীবনধারা পরিবর্তিত হয়ে অনেক দূরে সরে গেলেও উভয়ের যোগসূত্র সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়নি। রবীন্দ্রনাথের বহু বক্তৃতাসভায় ব্রহ্মবান্ধব উপস্থিত থেকেছেন, কখনও কখনও ভাষণানন্তর আলোচনাতেও অংশ গ্রহণ করেছেন। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের উত্তাল দিনগুলিতে তাঁর পরিচালিত মেসবাড়ির নীচের তলায় ডন সোসাইটিতে রবীন্দ্রনাথ ছাত্রদের সঙ্গে মিলিত হয়েছেন বহুবার। সুতরাং উভয়ের সাক্ষাৎ ও আলাপেরও সুযোগ হয়েছিল নিশ্চয়ই। এর পর অবশ্য তাঁদের কর্মধারা পৃথক হয়ে যায়। 'সন্ধ্যা' পত্রিকাকে অবলম্বন করে ব্রহ্মবান্ধব এক ভিন্ন মূর্তিতে আবির্ভূত হন—লৌকিক, প্রায় গ্রাম্য, ভাষায় তিনি 'ফিরিঙ্গি'-নিধনে ব্যাপৃত হন। স্পষ্ট প্রমাণ না পাওয়া গেলেও, হয়তো উগ্রপন্থী রাজনীতির সঙ্গেও তাঁর কিছু যোগসূত্র গড়ে উঠেছিল। ড ভূপেন্দ্রনাথ দত্তের মতো বিপ্লবকর্মী এরূপ যোগসূত্রের কথা অস্বীকার করলেও, যিনি কৈশোরে ফিরিঙ্গি-বিতাড়নের উদ্দেশ্যে একাধিকবার সৈন্যদলে ভর্তি হবার চেষ্টা করেছিলেন তাঁর পক্ষে অনুরূপ ভূমিকা গ্রহণ করা অসম্ভব নয়—বিশেষত তিনি সন্ধ্যা-য় খোলাখুলি হিংসাকে সমর্থন করতেন। বিপ্লবী রাজনীতির পটভূমিকায় পরবর্তীকালে রবীন্দ্রনাথ যখন 'চার অধ্যায়' [১৩৪১] উপন্যাস লেখেন, তখন তার ভূমিকা-স্বরূপ 'আভাস'-এ বিশেষ করে ব্রহ্মবান্ধবের প্রসঙ্গ উত্থাপন করেন। তাঁদের পূর্বসম্পর্কের বিস্তৃত বিবরণ দিয়ে শেষে তিনি লেখেন :

> …স্বয়ং বের করলেন "সন্ধ্যা" কাগজ, তীব্র ভাষায় যে মদির রস ঢালতে লাগলেন তাতে সমস্ত দেশের রক্তে অগ্নিজ্বালা বইয়ে দিলে। এই কাগজেই প্রথমে দেখা গেল বাংলাদেশে আভাসে ইঙ্গিতে বিভীষিকাপন্থর সূচনা। বৈদান্তিক সন্ন্যাসীর এতবড়ো প্রচণ্ড পরিবর্তন আমার কল্পনার অতীত ছিল।
>
> এই সময়ে দীর্ঘকাল তাঁর সঙ্গে আমার দেখাসাক্ষাৎ হয় নি। মনে করেছিলুম হয়তো আমার সঙ্গে তাঁর রাষ্ট্র-আন্দোলনপ্রণালীর প্রভেদ অনুভব করে আমার প্রতি তিনি বিমুখ হয়েছিলেন অবজ্ঞাবশতই।
>
> নানাদিকে নানা উৎপাতের উপসর্গ দেখা দিতে লাগল। সেই অন্ধ উন্মত্ততার দিনে একদিন যখন জোড়াসাঁকোয় তেতালার ঘরে একলা বসে ছিলেম হঠাৎ এলেন উপাধ্যায়। কথাবার্তার মধ্যে আমাদের সেই পূর্বকালের আলোচনার প্রসঙ্গও কিছু উঠেছিল। আলাপের শেষে তিনি বিদায় নিয়ে উঠলেন। চৌকাঠ পর্যন্ত গিয়ে একবার মুখ ফিরিয়ে দাঁড়ালেন। বললেন, "রবিবার, আমার খুব পতন হয়েছে।" এই বলেই আর অপেক্ষা করলেন না, গেলেন চলে। স্পষ্ট বুঝতে পারলুম, এই মর্মান্তিক কথাটি বলবার জন্যেই তাঁর আসা। তখন কর্মজাল জড়িয়ে ধরেছে, নিষ্কৃতির উপায় ছিল না।
>
> এই তাঁর সঙ্গে আমার শেষ দেখা ও শেষ কথা।[৬৮]

চার অধ্যায় উপন্যাস ও তার এই 'আভাস' সমকালীন পত্রিকায় কঠোরভাবে সমালোচিত হয়েছিল। যার জন্য রবীন্দ্রনাথ বৈশাখ ১৩৪২-সংখ্যা প্রবাসী-তে 'চার অধ্যায় সম্বন্ধে কৈফিয়ৎ' দিতে ও পরবর্তী সংস্করণে 'আভাস'টি বর্জন করতে বাধ্য হন। কিন্তু মূল ঘটনাটি সত্য হওয়া সম্ভব বলেই আমাদের বিশ্বাস। ব্রহ্মবান্ধব

ঠিক কী অর্থে কথাটি বলেছিলেন সে-সম্বন্ধে বিতর্ক থাকতে পারে, কিন্তু বৈদান্তিক সন্ন্যাসী থেকে রাজনৈতিক নেতায় বিবর্তনকে ব্রহ্মবান্ধব বিশেষ এক মুহূর্তে 'পতন' ['নিজের স্বভাব থেকে ভ্রষ্ট'] বলে মনে করতেই পারেন।

আমরা যে-সময়ের কথা বলছি, সেই সময়ে ব্রহ্মবান্ধব সার্কুলার রোডে ক্যাম্বেল হাসপাতালে [বর্তমান নীলরতন সরকার মেডিক্যাল কলেজ অ্যাণ্ড হসপিটাল] হার্নিয়া-অপারেশনের পর শয্যাশায়ী। সন্ধ্যা-য় প্রকাশিত 'এবার ঠেকে গেছি প্রেমের দায়ে' [২৮ শ্রাবণ : 13 Aug], 'ছিদিসানের হুড়ুম দুড়ুম, ফিরিঙ্গির আক্কেল গুড়ুম' [৩ ভাদ্র : 20 Aug] ও 'বাছা সকল লয়ে যাচ্ছেন শ্রীবৃন্দাবনে' [৬ ভাদ্র : 23 Aug] প্রবন্ধ তিনটিতে রাজদ্রোহ প্রচার করা হয়েছে এই অভিযোগে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়। শুনানীর সময় কাঠগড়ায় দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকার জন্য তাঁর হার্নিয়া বৃদ্ধি হয়। অপারেশনের পর সুস্থ হয়ে ওঠার মুখে ধনুষ্টঙ্কার রোগে তাঁর মৃত্যু হয় ১০ কার্তিক [রবি 27 Oct]। হাসপাতালে যাওয়া সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের মানসিক অস্বস্তি থাকলেও ৮ কার্তিক তিনি ক্যাম্বেল হাসপাতালে ব্রহ্মবান্ধবকে দেখতেও যেতে পারেন। ১২ কার্তিক তিনি জামাতা নগেন্দ্রনাথকে লিখেছেন : 'পরশু ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়ের মৃত্যু হয়েছে। তাঁর মকদ্দমা চলছিল ইতিমধ্যে হার্নিয়ার ব্যামোয় অস্ত্র চিকিৎসা করবার জন্য তিনি ক্যাম্বেল হাসপাতাল আশ্রয় করেছিলেন। সেখানেই তাঁর মৃত্যু হল—রাজা তাঁকে জেলে দিতে চেয়েছিল—তার চেয়ে উপর থেকে তিনি খালাস পেলেন।'[৬৯]—ফিরিঙ্গির কারাগার তাঁকে বন্দী করে রাখতে পারবে না, ব্রহ্মবান্ধব ইতিপূর্বেই তা ঘোষণা করেছিলেন।

উক্ত পত্রে পড়াশুনো সম্পর্কে বিভিন্ন উপদেশ দিয়ে জমিদারির প্রজাদের কাছে দায়বদ্ধতা সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ যা লিখেছেন তাতে জমিদারি সম্পর্কে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় বহন করে :

> এ বৎসরে ত ভারতবর্ষে একটা ভয়ঙ্কর দুর্ভিক্ষ আসন্ন হয়ে এসেছে। ···বাংলা দেশের অবস্থা ভারতবর্ষের অন্যান্য জায়গার মত তত বেশি নৈরাশ্যজনক নয়—কিন্তু তবু এখানেও আমাদের খুব ক্ষতি হয়েছে। উপরি উপরি কয়েক বছর শস্য না পাওয়াতে প্রজারা নিঃসম্বল হয়ে পড়েছে—গেল বছরে প্রজাদের অনেক টাকা ঘর থেকে দিয়ে রক্ষা করতে হয়েছে এবারেও তাই করতে হবে—এতে বাংলার জমিদারদের দুঃসময় উপস্থিত হবে। তোমরা দুর্ভিক্ষপীড়িত প্রজার অন্নগ্রাসের অংশ নিয়ে বিদেশে কৃষি শিখতে গেছ ফিরে এসে এই হতভাগ্যদের অন্নগ্রাস [যদি] কিছু পরিমাণেও বাড়িয়ে দিতে পার তাহলে এই ক্ষতি পূরণ হয়ে মনে সান্ত্বনা পাব। মনে রেখো জমিদারদের টাকা চাষীর টাকা এবং এই চাষীরাই তোমাদের শিক্ষার ব্যয়ভার নিজেরা আধপেটা খেয়ে এবং না খেয়ে বহন করচে—এদের এই ঋণ সম্পূর্ণ শোধ করবার দায় তোমাদের উপর রইল—নিজেদের সাংসারিক উন্নতির চেয়েও এইটেই তোমাদের প্রথম কর্তব্য হবে।

নরমপন্থী ও চরমপন্থী উভয় দলই দেশের অতি সাধারণ মানুষদের ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে এসে তাদের নিয়ে কাজ করছেন না, চট্টগ্রাম-বক্তৃতায় রবীন্দ্রনাথ এইরূপ অভিযোগ করেছিলেন। ভ্রাতুষ্পুত্র সুরেন্দ্রনাথ উগ্রপন্থীদের অর্থ দিয়ে সাহায্য করতেন, হয়তো তাঁর মারফৎ সুড়ঙ্গপথের রাজনীতি সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ কিছুটা অবহিত হয়েছিলেন। কিন্তু এই 'বিভীষিকাপন্থা' তাঁর সমর্থন লাভ করতে পারেনি। তাই উক্ত পত্রে নগেন্দ্রনাথকে লিখেছেন : 'আজকাল যে সমস্ত বিপ্লবের সূচনা দেখা যাচ্চে তা নিয়ে তোমাদের ভাববার দরকার নেই কিন্তু অনাহার থেকে দেশের লোককে যথাসম্ভব বাঁচানোই তোমাদের জীবনের ব্রত হবে। তৃণমূল থেকে দেশকে গড়ে তোলবার সাধনা তাঁর আকাঙ্ক্ষিত ছিল, পুত্র-জামাতাকে আমেরিকায় কৃষিকার্য শিখতে পাঠানো এই উদ্দেশ্যেই। তাঁরা দেশে ফেরার আগেই তিনি বিরাহিমপুরে ও কালীগ্রামে কর্মযজ্ঞের সূচনা করেছিলেন।

মাসখানেক পূর্বে তিনি নগেন্দ্রনাথকে আর-একটি চিঠি লিখেছিলেন, চিঠিটি পাওয়া যায়নি। সেটি পেয়ে নগেন্দ্রনাথ 1 Nov [শুক্র ১৫ কার্তিক] তাঁর ডায়ারিতে লিখেছেন : 'শ্বশুর মহাশয়ের চিঠি পড়লুম। উনি

লিখেছেন "দু বছরের বেশী যাতে সময় দিতে না হয়।" খরচ বন্ধ কত্তে চান করুন'। উভয়ের সম্পর্কে গোড়া থেকেই অসামঞ্জস্য ছিল, যা ক্রমাগতই বেড়ে চলে।

বঙ্গীয় প্রাদেশিক সাহিত্য-সম্মিলন প্রথম আয়োজিত হয়েছিল বৈশাখ ১৩১৩-তে বরিশালে—কিন্তু পুলিশী তাণ্ডবে সেই সম্মিলন শুরু হতেই পারেনি। পরে চৈত্র ১৩১৩-তে মুর্শিদাবাদের কাশিমবাজারে আহূত সম্মিলনও স্থগিত হয়ে যায় মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দীর জ্যেষ্ঠপুত্রের অকালমৃত্যুতে। দু'জায়গাতেই রবীন্দ্রনাথ সভাপতি নির্বাচিত হয়েছিলেন। কাশিমবাজারেই এই সম্মিলন আবার আহূত হয় বর্তমান বৎসরের ১৭-১৮ কার্তিকে [3-4 Nov]। অভ্যর্থনা-সমিতি সম্মিলনের সভাপতি হওয়ার জন্য সারদাচরণ মিত্র, দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, অক্ষয়চন্দ্র সরকার ও কালীপ্রসন্ন ঘোষকে অনুরোধ করেন, কিন্তু 'শারীরিক অস্বাস্থ্য, সামথ্যাভাব বা অপ্রতিবিধেয় অনবসর জন্য' তাঁরা কেউই সম্মত হননি। 'অবশেষে অধ্যক্ষগণের ঐক্যমতানুসারে শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরই মনোনীত হইয়াছিলেন। প্রথম প্রথম সভাপতিত্ব স্বীকারে তিনি কিছুতেই সম্মত হন নাই। তাঁহার কন্যার পীড়া নিবন্ধন তাঁহাকে ব্যস্ত ও উদ্বিগ্ন থাকিতে হইয়াছিল। ভগবৎ-কৃপায় দুহিতা আরোগ্যলাভ করিলে রবীন্দ্র বাবু কাশীমবাজারে আগমন করিয়া সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন।'[৭০] ১২ আশ্বিন [রবি 29 Sep] রবীন্দ্রনাথ মণীন্দ্রচন্দ্রকে লেখেন : 'সম্প্রতি আমার কন্যার শরীর অপেক্ষাকৃত সুস্থ আছে। কিন্তু বহরমপুরে যখন সভা বসিবে সে সময়ে তাহাকে ছাড়িয়া কোথাও যাওয়া আমার পক্ষে সম্ভব হইবে কি না তাহা নিশ্চয় বলা যায় না। যদি তৎপূর্ব্বেই তাহাকে লইয়া কোথাও বায়ুপরিবর্তনে যাত্রা করিতে হয় তাহা হইলেও আমি সভায় উপস্থিত থাকিতে পারিব না। এই জন্য এবারে আমাকে ক্ষমা করিবেন। অন্য সভাপতি স্থির করিবেন—আমি যদি বাধা না পাই তবে শ্রোতারূপে সভায় যোগ দিতে পারিব।'[৭১] এই কৈফিয়তে উদ্যোক্তাগণ নিশ্চয়ই তাঁদের প্রয়াসে বিরত হননি। পরিশেষে রবীন্দ্রনাথ ২৪ আশ্বিন [শুক্র 11 Oct] লেখেন : 'আমার কন্যার শরীর অপেক্ষাকৃত ভাল থাকায় আপনাদের সাহিত্য-সম্মিলনের আমন্ত্রণ আনন্দের সহিত স্বীকার করিয়া লইলাম। ১৭ই। ১৮ই কার্তিকের অধিবেশনে যোগ দিবার জন্য প্রস্তুত হইব।'[৭২] 30 Oct [বুধ ১৩ কার্তিক] বেঙ্গলী-তে সংবাদটি এইভাবে মুদ্রিত হয়: 'The Literary Conference meets at Berhampore on the 3rd November next. The President-elect is Babu Rabindranath Tagore—the most commanding figure in the domain of Bengalee literature to-day.'

ভৃত্য বিপিনকে নিয়ে রবীন্দ্রনাথ ['কাছিমবাজার মুর্শিদাবাদ গমনাগমনের ব্যয় দ্বিতীয় শ্রেণীর টিকিট ৬ল০ বিপিনের তৃতীয় শ্রেণীর টিকিট ১ ৴০']১৬ কার্তিক [শনি 2 Nov] সকাল দশটার ট্রেনে কয়েকজন প্রবীণ সাহিত্যসেবীর সঙ্গে কাশিমবাজার রওনা হন। বেঙ্গলী [3 Nov] লেখে :

The train carrying the president select of the Bengal Literary Conference arrived at Kasimbazar at five p.m. The station presented a unique spectacle. The whole body of volunteers with the members of the Reception and Executive Committees headed by Maharaja of Kasimbazar welcomed the guests at the station with cries of Swagatam. Babu Rabindra Nath with his party was conveyed to the Kasimbazer palace [...] escorted by volunteers on horse back. The Maharaja received the President select and the guests with a few words and songs of welcome were sung at the Rajbari. The Maharaja located them in a quarter set apart for the honoured guests.

১৭ কার্তিক [রবি 3 Nov] দুপুরে একটি বিস্তীর্ণ মণ্ডপে সম্মিলন আরম্ভ হয়। বেঙ্গলী পত্রিকার মতে, প্রতিনিধি ও দর্শক মিলিয়ে দু'হাজারেরও বেশি লোক সভায় উপস্থিত ছিলেন। মঞ্চের উপরে রবীন্দ্রনাথ, লালগোলার রাজা যোগেন্দ্রনারায়ণ রায়, রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী, বৈকুণ্ঠনাথ বসু, বৈকুণ্ঠনাথ সেন, বিজয় সিং ধুদুরিয়া, মহারাজ মণীন্দ্র নন্দী প্রভৃতি বিশিষ্ট ব্যক্তিরা আসন নেন। 'On their head was a small scarlet velvet shamiana richly embroidered with golden and silver filigree work, and supported by from silver pillars was a cushioned chair with rich embroidery work interspersed with diamonds for the President.'

সংগীত ও অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্রের ভাষণ দিয়ে সম্মিলনের কাজ আরম্ভ হয়। মহারাজের প্রস্তাবে ও চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়ের সমর্থনে রবীন্দ্রনাথ সভাপতি নির্বাচিত হয়ে 'সমবেত ব্যক্তিগণের উদ্বেল আনন্দধ্বনির মধ্যে আসন গ্রহণ' করেন। এর আগে তিনি সম্মিলন উপলক্ষে দুটি ভাষণ রচনা করেছিলেন—যার একটি কলকাতায় সারস্বত সম্মিলনে পঠিত ও অপরটি অপঠিত অবস্থাতেই বঙ্গদর্শন-এ মুদ্রিত হয়। সম্ভবত সেই অভিজ্ঞতা স্মরণ করেই রবীন্দ্রনাথ এবারে কোনো লিখিত ভাষণ প্রস্তুত করেননি। তিনি মৌখিকভাবে কিছু বলে সম্মিলনের উদ্বোধন করেন। বিশিষ্ট সাহিত্যসেবী নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত শ্রাবণ ১৩১৫-সংখ্যা জাহ্নবী-তে 'বহরমপুর প্রাদেশিক সাহিত্য-সম্মিলন' [পৃ ১২৫-৪৫] শীর্ষক একটি প্রবন্ধে সম্মিলনের দীর্ঘ বিবরণ প্রকাশ করেন।* তিনি লিখেছেন : 'শত কণ্ঠে হর্ষধ্বনির মধ্যে সভাপতি রবীন্দ্র বাবু দণ্ডায়মান হইয়া সম্মিলনের উদ্বোধন করিলেন। অতি বিনয় ও সৌজন্যের সহিত তিনি সম্মিলনে সভাপতির পদ গ্রহণ বিষয়ে তাঁহার অক্ষমতার কথা জানাইলেন। তাঁহার এ বিনয় ও সৌজন্য তাঁহার মহৎ হৃদয়েরই প্রকৃত পরিচায়ক। তারপর তিনি বেশ সুন্দর ও হৃদয়-গ্রাহীরূপে দেশের বর্ত্তমান জাগরণের কথা, মাতৃভাষার সেবার নিমিত্ত এই সাহিত্য-সম্মিলনের মঙ্গলানুষ্ঠানের বিষয় এবং ইহার কর্ত্তব্য সম্বন্ধে একটী বক্তৃতা করিলেন। এ পর্য্যন্ত অনেক সভা-সমিতিতে তাঁর লিখিত প্রবন্ধ পাঠ করা শুনিয়াছি, কিন্তু তাঁহাকে এমন সুন্দর বক্তৃতা দিতে কখন শুনি নাই।' দুঃখের বিষয়, সম্মিলনের কর্তৃপক্ষেরা অনুলেখনের ব্যবস্থা রাখেননি।

দ্বিতীয় দিন ১৮ কার্তিক [সোম 4 Nov] দুপুরে সম্মিলনের দ্বিতীয় অধিবেশন বসে। আটটি প্রস্তাব নিয়ে আলোচনার পর সভাপতিকে ধন্যবাদজ্ঞাপন এবং মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র ও স্বেচ্ছাসেবকদের সাধুবাদ করা হয়। 'ইহার পরে সভাপতি রবীন্দ্র বাবু একটী সুললিত ও সারগর্ভ বক্তৃতা করিলেন। তিনি বলিলেন—"আনন্দের সহিত নির্ব্বিঘ্নে সম্মিলনের কার্য্য শেষ হইল। মাতৃপূজার এই প্রথম উদ্বোধন আমদের চেষ্টায় ও যত্নে নয়, সেই নিখিল আনন্দময়ের ইচ্ছায় সুসম্পন্ন হইল। জননী বঙ্গভাষার সেবার জন্য তাহার কুটীর-দ্বারে আমরা যেন এমনি করিয়া সকলে মিলিত হইতে—তাঁহার চরণকমলে যেন এমনি করিয়া পুস্পাঞ্জলি দিতে সমর্থ হই। আমাদের সম্মুখে উহার আলোকচ্ছটা দেখা দিয়াছে, সেই আলোক লক্ষ্য করিয়া যেন আমরা উত্তরোত্তর অগ্রসর হই। সকলে মিলিয়া মার মন্দির নির্ম্মাণ করিবার উপকরণ সংগ্রহ করিয়া ধন্য ও কৃতার্থ হই। আজিকার দিনে যাঁহার যতটুকু ক্ষমতা, তিনি সেইভাবে মা'র অলঙ্কারের শোভা বৃদ্ধি করুন।" তিনি আরও অনেক সুন্দর কথা বলিলেন। তাঁর বক্তৃতাকালে বারংবার 'বন্দে মাতরম্' ধ্বনি উচ্চারিত হইল।'

এইদিন সকালে 'কতিপয় সাহিত্যসেবী, মহারাজ বাহাদুর, লালগোলার রাজা এবং সভাপতি রবীন্দ্র বাবুকে লইয়া কাশীমবাজারের যুবকবৃন্দ একটী আলোকচিত্র তুলিয়া লয়।'

১৯ কার্তিক [মঙ্গল 5 Nov] কালীপূজার দিন সকালে রবীন্দ্রনাথ কাশিমবাজার ত্যাগ করেন। নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত লিখেছেন : 'পরদিন প্রাতে গাত্রোত্থান করিয়া কাশীমবাজারে মহারাজ বাহাদুরের প্রাসাদে আসিলাম। তখন রবীন্দ্র বাবু প্রাসাদের একটী দ্বিতল গৃহে স্বেচ্ছাসেবকগণ ও সমাগত যুবকগণকে দুচারিটী সারগর্ভ উপদেশ দিতেছিলেন, তাঁর উপদেশ-বক্তৃতার পর তাহারা তাঁহাকে একখানি গানের জন্য ধরিয়া বসিল। তিনি তাঁহার সর্ব্বজনবিদিত "অয়ি ভুবনমোহিনী" গানখানি গাহিলেন।' এর কিছুক্ষণ পরেই রবীন্দ্রনাথ স্টেশন অভিমুখে রওনা হন। ২০ কার্তিক তিনি ভূপেন্দ্রনাথ সান্যালকে লেখেন : 'বহরমপুরে সাহিত্য সম্মিলনে চারদিন কাটিয়ে কাল ফিরেছি। কদিনের অনিয়মে ও অর্শের প্রচুর রক্তপাতে আজ বড় ক্লান্ত ও দুর্বল আছি।'[৭৩] ২২ কার্তিক শ্রীশচন্দ্র মজুমদারকে লেখেন : 'বহরমপুরের গোলমাল শেষ করিয়া আসিলাম। কথা, কথা, কথা। এ বয়সে আর ত ভাল লাগে না। তবে মহারাজ মণীন্দ্রের সঙ্গে পরিচয় হইয়া সুখী হইয়াছি। এতদিন পরে এমন একজন ধনী দেখিতে পাইলাম যিনি ধনের মর্য্যাদা রক্ষা করিতে শিখিয়াছেন। ইনি যেমন অন্তরের সহিত বিনয়ী তেমনি দেশের সদনুষ্ঠানে ইহার উৎসাহ একান্ত অকৃত্রিম। ···আমি বহরমপুরের অনিয়মে প্রথমে অর্শ পরে সর্দ্দিতে আক্রান্ত। শীঘ্র বোলপুরে পলায়নের চেষ্টায় আছি।'[৭৪]

কিন্তু অসুস্থতা কিছু বাড়ায় তখনই শান্তিনিকেতনে যাওয়া হয়নি। ২৬ কার্তিক [মঙ্গল 12 Nov] তিনি ভূপেন্দ্রনাথকে লেখেন : 'বিদ্যালয় খুলিবার আর ৮ দিন আছে—আপনি এখনো আসিলেন না দেখিয়া চিন্তিত আছি। ···আমি অসুস্থ হইয়া পড়িয়াছি। শীঘ্র আপনার দর্শন পাইবার প্রত্যাশায় উৎসুক রহিলাম।'[৭৫] বিদ্যালয়ের শিক্ষক, পাচক প্রভৃতি নিয়োগ নিয়ে উপর্যুপরি কয়েকটি পত্র তিনি ভূপেন্দ্রনাথকে লিখেছিলেন— বিষয়টি তাঁকে উদ্বিগ্ন করে রেখেছিল, সন্দেহ নেই।

কিন্তু আরও উদ্বেগের খবর এল মুঙ্গের থেকে—সেখানে শমীন্দ্রনাথ কলেরায় আক্রান্ত। ১ অগ্র° [রবি 17 Nov] রবীন্দ্রনাথ একজন ডাক্তার নিয়ে মুঙ্গের রওনা হন; এইদিন ক্যাশবহির হিসাবে লেখা হয়েছে : 'দং শ্রীযুক্ত সমীর বাবু মহাশয়ের পিড়ার জন্য ডাক্তার লইয়া বাবু মহাশয় মুঙ্গের গমন করায় সঙ্গে দেওয়া ১৫০/ ডাক্তার আনিতে যাতায়াতের গাড়ি ভাড়া ও হাওড়ার ষ্টেসেন যাওয়ার গাড়ি ভাড়া ২॥৬/ মুঙ্গের টেলিগ্রাম করন ব্যয় ৪্'। ভূপেন্দ্রনাথকে মুঙ্গেরে আসার আহ্বান জানিয়ে তিনি টেলিগ্রাম করেন। ভূপেন্দ্রনাথ লিখেছেন :

সে সময় আবার ই আই রেলের কর্মচারীরা strike করিয়াছে, ট্রেনগুলির আসিবার যাইবার কোন নির্দিষ্ট সময় নাই। টেলিগ্রাম পাইয়াই আমি বোলপুর রেলওয়ে স্টেশনে চলিয়া আসিলাম এবং সেখানে কয়েকঘণ্টা বসিয়া থাকার পর ট্রেন পাইলাম,পরদিন প্রাতঃকালে মুঙ্গেরে পৌছিলাম। তখন রবীন্দ্রনাথ ওখানে আসিয়া পৌছিয়াছেন, শ্রীশবাবুও আসিয়াছেন। চিকিৎসা ভালই চলিতেছিল। শমী যাঁহাদের বাড়িতে [শ্রীশচন্দ্রের শ্যালক ডাঃ মনমোহন ও ডাঃ সৌরীন্দ্রমোহন গুপ্ত] ছিল তাঁহারা দুই ভাই মুঙ্গেরে প্রতিষ্ঠিত চিকিৎসক। গিয়া দেখিলাম শমী একটু ভালই আছে। শমীকে জিজ্ঞাসা করিলাম—"তুমি কেমন আছ", শমী নিজেই বলিল "ভাল আছি।" শুনিয়া আনন্দ হইল এবং আশাপ্রদ বলিয়া বোধ হইল। ডাক্তাররা কোন আশঙ্কা নাই বলিতেছেন। আমি ডাক্তার সৌরীন্দ্রমোহন গুপ্তকে জিজ্ঞাসা করিলাম, তিনি বলিলেন, "পথ্য না পাওয়া পর্যন্ত কোন বিশ্বাস নাই।" প্রথম রাত্রে রবীন্দ্রনাথ আমাকে বলিলেন, "শমী ২।৩ দিনের মধ্যে একটু সুস্থ হইলেই একটি ২য় শ্রেণীর গাড়ি রিজার্ভ করিয়া তাহাকে লইয়া আপনি ও আমি কলিকাতায় চলিয়া যাইব।" সকলেরই মনে খুব আশা হইল যে, এ যাত্রা শমী রক্ষা পাইল। সেই দিনই শেষরাত্রের দিকে শমীর হঠাৎ পীড়া বৃদ্ধি পাইল। দুই ভাই ডাক্তারকে তখনই ডাকা হইল, তাঁহারা উঠিয়া নূতন ঔষধের ব্যবস্থা করিলেন। ঔষধ ও শুশ্রূষা চলিতে লাগিল, কিন্তু পরদিন প্রাতেও পীড়ার বেগ হ্রাস না পাইয়া বরং বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। আমাদের মনে নূতন আশঙ্কা দেখা দিল। রবীন্দ্রনাথের ইচ্ছা হইল হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হউক। মুঙ্গেরে যে সব হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক ছিলেন, তাঁহাদের সকলকেই ডাকা হইল। সৌভাগ্যবশত সে সময় প্রসিদ্ধ চিকিৎসক নগেন্দ্রনাথ মজুমদার মহাশয় উপস্থিত ছিলেন। তিনি মনমোহনবাবুর সহপাঠী এবং এলোপ্যাথিক ও হোমিওপ্যাথিক উভয় চিকিৎসাতেই সুপণ্ডিত। তিনি দেখিয়া ঔষধের ব্যবস্থা করিতে লাগিলেন। ঔষধের Selection খুব সুন্দর হইতেছে, কারণ ঔষধ প্রয়োগ মাত্রেই বেশ ফল পাওয়া যাইতে লাগিল, কিন্তু আধ ঘণ্টার বেশী তাহা স্থায়ী হয় না দেখিয়া সকলেই হতাশ হইলেন। রবীন্দ্রনাথও

হোমিওপ্যাথিকে সুপণ্ডিত ছিলেন, তাঁহার ইচ্ছানুরূপ রাত্রে ২১ বার ঔষধ বদলাইয়া দেওয়া হইল, কিন্তু কোন ফলই হইল না, ক্রমেই রোগীর অবস্থা আশঙ্কাজনক হইতে লাগিল। আমি সারারাত্রি শমীর পার্শ্বে বসিয়া রহিলাম, রবীন্দ্রনাথ পাশের ঘরেই জাগিয়া বসিয়া রহিলেন। যতই রাত্রি শেষ হইতে লাগিল ততই শমীর জীবন প্রদীপ নির্বাণোন্মুখ হইতেছে বোধ হইতে লাগিল, রাত্রি প্রভাত না হইতেই সব শেষ হইয়া গেল। রবীন্দ্রনাথ পাশের ঘরেই রহিয়াছেন, এ ঘটনা তাঁহাকে শুনাইতে যাইবার সাহস হইল না। তখন তিনি ধ্যানমগ্ন অবস্থায় অবস্থিত। কিছুক্ষণ পরে তিনি আমাকে ডাকিয়া বলিলেন—"এ সময়ের যাহা কিছু কৃত্য আমি করিয়া দিলাম, এখন অবশেষ যাহা কর্তব্য আপনি করুন। ব্রাহ্মণের মতনই* শমীর শেষ কৃত্য যেন হয়, আর আমার কিছু বলিবার নাই।" পরে আমরা কয়েকজনে শমীর শবদেহ শ্মশানে লইয়া আসিলাম। রবীন্দ্রনাথ তখনও প্রস্তরের মত নিশ্চল হইয়া বসিয়া আছেন। কোমল প্রাণ 'শ্রীশবাবু কাঁদিয়া আকুল হইলেন। আমি ও শ্রীশবাবু তখন রবীন্দ্রনাথের গৃহে প্রবেশ করিলাম। শ্রীশবাবু অত্যন্ত ব্যাকুল হইলেন, চক্ষে তাঁহার ধারা আর থামে না, আমারও চক্ষে ধারা বহিতেছিল, এই সময় রবীন্দ্রনাথেরও চক্ষে ধারা বহিতে লাগিল। আমি তাঁহার অশ্রুপাত দেখিয়া যেন একটু আশ্বস্ত হইলাম। তাঁহার সেই নিশ্চল গম্ভীর ভাব ও শোকপূর্ণ অবস্থা দেখিয়া মনে বড় আতঙ্ক জন্মিতেছিল। সেইদিনই গাড়িতে বোলপুর চলিয়া যাওয়া স্থির হইল। আমি তাড়াতাড়ি রন্ধন করিলাম। রবীন্দ্রনাথ ভোজনে বসিলেন মাত্র, দুই এক গ্রাস মুখে দিয়াই তিনি উঠিয়া পড়িলেন। যাবার সমস্ত আয়োজন ঠিক হইতে লাগিল, যথাসময়ে আমরা মুঙ্গের স্টেশনে আসিয়া পৌছিলাম। অনেকগুলি ভদ্রলোক উকিল ও পদস্থ রাজকর্মচারী স্টেশনে আসিয়া তাঁহার সহিত দেখা করিলেন। পূর্বদিনেও রবীন্দ্রনাথের ভোজন হয় নাই, আজও কিছু হইল না, বোলপুরে পৌছিতেও রাত্রি হইবে, এই ভাবিয়া আমি সাহেবগঞ্জে আমার মাতুল শিবচন্দ্র রায় মহাশয়কে রবীন্দ্রনাথের জন্য কিছু খাবার তৈয়ার করিয়া আনিবার জন্য টেলিগ্রাম করিয়াছিলাম। সাহেবগঞ্জে অনেকক্ষণ গাড়ি দাঁড়ায়, গাড়ি সাহেবগঞ্জ স্টেশনে পৌছিতেই মাতুল মহাশয় ট্রেনের নিকট খাবার লইয়া উপস্থিত হইলেন। রবীন্দ্রনাথকে খাবার দেওয়া হইল, তিনি কিছু খাইলেন দেখিয়া আনন্দিত হইলাম। তারপর তিনি মাতুল মহাশয়ের সহিত আলাপ করিতে লাগিলেন। ...কিছুক্ষণ পরে আমি মাতুল মহাশয়কে চুপে চুপে মুঙ্গেরের সমস্ত দুর্ঘটনার কথা জানাইলাম। তিনি শুনিয়া স্তম্ভিত হইয়া গেলেন। তাঁহার সহিত আলাপ করিবার সময় তিনি কিছুই টের পান নাই যে, এত বড় একটা দুর্ঘটনা ঘটিয়া গিয়াছে।[৭৬]

উদ্ধৃতিটি যথেষ্ট দীর্ঘ হল, কিন্তু ভূপেন্দ্রনাথের বর্ণনায় ঘটনাপরম্পরা ও প্রিয়তম পুত্রের মৃত্যুশোকেও রবীন্দ্রনাথের আশ্চর্য স্থৈর্যের যে রূপ জীবন্তভাবে ফুটে উঠেছে তাকে অন্য কোনোভাবে প্রকাশ করা যেত বলে মনে হয় না। বহুকাল পরে দৌহিত্র নীতীন্দ্রনাথের মৃত্যুতে [২২ শ্রাবণ ১৩৩৯ : 7 Aug 1932] মীরা দেবীকে সান্ত্বনা দিয়ে রবীন্দ্রনাথ 28 Aug [রবি ১২ ভাদ্র] যে চিঠি লিখেছিলেন, তার মধ্যে প্রসঙ্গক্রমে শমীন্দ্রনাথের মৃত্যুর কথা স্মরণ করেছেন : 'যে রাত্রে শমী গিয়েছিল সে রাত্রে সমস্ত মন দিয়ে বলেছিলুম বিরাট বিশ্বসত্তার মধ্যে তার অবাধ গতি হোক আমার শোক তাকে একটুও যেন পিছনে না টানে। ...শমী যে রাত্রে গেল তার পরের রাত্রে রেলে আসতে আসতে দেখলুম জ্যোৎস্নায় [রাসপূর্ণিমা—৩ অগ্র° : 19 Nov] আকাশ ভেসে যাচ্ছে, কোথাও কিছু কম পড়েছে তার লক্ষণ নেই। মন বললে কম পড়েনি সমস্তর মধ্যে সবই রয়ে গেছে, আমিও তারি মধ্যে। সমস্তর জন্যে আমার কাজও বাকি রইল। যতদিন আছি সেই কাজের ধারা চলতে থাকবে। সাহস যেন থাকে, অবসাদ যেন না আসে, কোনোখানে কোনো সূত্র যেন ছিন্ন হয়ে না যায়—যা ঘটেছে তাকে যেন সহজে স্বীকার করি, যা কিছু রয়ে গেল তাকেও যেন সম্পূর্ণ সহজ মনে স্বীকার করতে ত্রুটি না ঘটে।'[৭৭] ভাবুকস্বভাব শমীন্দ্রনাথের মধ্যে পিতার অনেক গুণই প্রকাশ পাচ্ছিল, রবি ঠাকুরের মতো 'শমী ঠাকুর' নামে রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং কৌতুক করে পুত্রকে অভিহিত করতেন। আমাদের অনুমান, ডাকঘর [১৩১৮] নাটকের অমল শমীন্দ্রনাথেরই আদলে গড়া। ইন্দিরা দেবী লিখেছেন : 'লোকে বলে যে, রবিকাকার ছোটোছেলে শমীন্দ্রই বেশি তাঁর মত দেখতে ছিল। শমী অল্পবয়সেই বিসর্জনের মতো শক্ত নাটকের কবিতাও অনর্গল মুখস্থ বলতে পারত। দুলে দুলে রবিকাকার উপাসনা করাও নকল করত। হেমলতা বউঠানের কাছে শুনেছি, বাপের টেবিলে বসে নাকি তাঁর মতো লেখক হবার অভিনয় করত।'[৭৮] মীরা দেবীও ছোটো ভাই শমী সম্পর্কে অনুরূপ স্মৃতিচারণ করেছেন।[৭৯] শমীন্দ্রনাথের মৃত্যু হয় ৭ অগ্র° [ইংরেজি মতে রবিবার 24 Nov] শেষ রাতে—তখন তাঁর বয়স মাত্র এগারো বৎসর, আর কুড়ি দিন পরেই তাঁর দ্বাদশতম জন্মদিন [জন্ম : ২৮

অগ্র° ১৩০৩ শনি 12 Dec 1896] পালিত হত। চার বছর আগে এই ৭ অগ্রহায়ণ তারিখেই মৃণালিনী দেবীর জীবনাবসান হয়।

রবীন্দ্রনাথ ৮ অগ্র° রাতে শান্তিনিকেতনে ফিরে আসেন। ভূপেন্দ্রনাথ লিখেছেন :

আমরা যথাসময়ে বোলপুর স্টেশনে নামিয়া শান্তিনিকেতনে আসিয়া উপনীত হইলাম। তখনও মুঙ্গেরের দুর্ঘটনার সংবাদ সেখানে উত্তমরূপে প্রচারিত হয় নাই, টেলিগ্রামে শব্দের কি গোলমাল ছিল। রাত্রিটা কাটিয়া গেল। সেখানে রবীন্দ্রনাথের কন্যারা কেহই ছিলেন না, সকলেই কলিকাতায়। পরদিন বেলা হইলে আমাকে ডাকাইয়া পাঠাইলেন। আমি তাঁহার ঘরে প্রবেশ করিয়া তাঁহার নিকট চুপ করিয়া বসিয়া রহিলাম, সেখানে তখন কেহই ছিল না। তারপর একটু কথা কহিতে গিয়াই তাঁহার নেত্র আর্দ্র হইয়া আসিল, কণ্ঠস্বরও যেন বাহির হইতেছিল না, আমারও সেই অবস্থা। সেইদিনই বোধ হয় সন্ধ্যার সময় এই দুর্ঘটনার সংবাদ পাইয়া সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় শান্তিনিকেতনে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় মধ্যে মধ্যে আসিয়া কিছু বলিতে না পারিয়া কেবল তাঁহার পিঠটিতে হাত বুলাইতে লাগিলেন আর মধ্যে মধ্যে "রবি, রবি" এই শব্দ করিতে লাগিলেন। সে দৃশ্যটি বড় করুণাপূর্ণ। সুরেন্দ্রবাবু আসাতে আমি অনেকটা নিশ্চিন্ত হইলাম। পরদিন রবীন্দ্রনাথকে লইয়া তিনি কলিকাতায় চলিয়া গেলেন।[৮০]*

'শ্রীযুক্ত খোদ বাবু মহাশয়ের ১১ অগ্রহায়ণ হাবড়া ষ্টেসন হইতে বাটী আসার গাড়ীভাড়ার হিসাব থেকে জানা যায়, রবীন্দ্রনাথ ১১ অগ্র° [বুধ 27 Nov] কলকাতায় ফিরে আসেন।

শোকের উচ্ছ্বসিত প্রকাশ রবীন্দ্রনাথের স্বভাববিরুদ্ধ ছিল—ভূপেন্দ্রনাথের লেখাতে তাঁর অন্তর্নিরুদ্ধ শোকের রূপটি মর্ম্মস্পর্শীভাবে চিত্রিত হয়েছে। কয়েকদিন পরে ১৯ অগ্র° [বৃহ 5 Dec] তিনি মনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়কে যে পত্রটি লিখেছেন, সেটিও গূঢ় বেদনায় কম্পমান : 'যে সংবাদ শুনিয়াছেন তাহা মিথ্যা নহে। ভোলা মুঙ্গেরে তাহার মামার বাড়িতে গিয়াছিল শমীও আগ্রহ করিয়া সেখানে বেড়াইতে গেল—তাহার পরে আর ফিরিল না।'[৮১] একই দিনে কাদম্বিনী দত্তের সহানুভূতির উত্তরে লেখেন : 'ঈশ্বর আমাকে বেদনা দিয়াছেন কিন্তু তিনি ত আমাকে পরিত্যাগ করেন নাই—তিনি হরণও করিয়াছেন পূরণও করিবেন। আমি শোক করিব না—আমার জন্যও শোক করিয়ো না।'[৮২] শোক কিছুদিনের মধ্যেই 'প্রার্থনা'য় রূপান্তরিত হয়েছে, ২৭ অগ্র° [শুক্র 13 Dec] শিলাইদহে গান লিখেছেন : 'অন্তর মম বিকশিত করো অন্তরতর হে' [দ্র গীতাঞ্জলি ১১।৮-৯, গীত ১।৫১] সবার সঙ্গে নিজেকে যুক্ত করে মোহের বন্ধদশা থেকে মুক্ত হওয়ার এক সাধনার শুরু এইখানে। অন্যসূত্রে সংবাদ পেয়ে জগদীশচন্দ্র লণ্ডন থেকে তাঁকে সান্ত্বনা জানিয়েছিলেন 19 Dec [৩ পৌষ] তারিখে। রবীন্দ্রনাথ প্রত্যুত্তরে ২৩ পৌষ [বুধ 8 Jan 1908] তাঁকে লেখেন :

আমাদের চারিদিকেই এত দুঃখ এত অভাব এত অপমান পড়িয়া আছে যে নিজের শোক লইয়া অভিভূত হইয়া এবং নিজেকেই বিশেষরূপ দুর্ভাগ্য কল্পনা করিয়া পড়িয়া থাকিতে আমার লজ্জা বোধ হয়। আমি যখনই আমাদের দেশের বর্ত্তমান ও ভবিষ্যতের কথা ভাবিয়া দেখি তখনি আমাকে আমার নিজের দুঃখতাপ হইতে টানিয়া বাহির করিয়া আনে। আমাদের অসহ্য দুর্দ্দশার মূর্ত্তি ঘরে ও বাহিরে আজকাল এমন সুপরিস্ফুট হইয়া দেখা দিয়াছে যে নিজের ব্যক্তিগত ক্ষতি লইয়া পড়িয়া থাকিবার সময় আমাদের আর নাই।[৮৩]

এই পত্র শমীন্দ্রনাথের মৃত্যুর প্রায় দেড়মাস পরে লেখা—দেশের ঘটনাস্রোতের একনিষ্ঠ পর্যালোচক রবীন্দ্রনাথ তখন চিন্তাস্রোতে পুত্রশোক থেকে অনেক দূরবর্তী হয়ে পড়েছেন—তবু তাঁর মানসশক্তি কিভাবে ব্যক্তিগত বেদনার উপর জয়ী হতে তাঁকে সাহায্য করে তার সুস্পষ্ট ইঙ্গিত পত্রটিতে রয়েছে। চিঠিটি পড়ে অবলা বসু 20 Mar [শুক্র ৭ চৈত্র] 'ইহাকেই প্রকৃত ঋষিভাব বলা যায়'[৮৪] বলে শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন।

১১ অগ্র° [বুধ 27 Nov] রবীন্দ্রনাথ কলকাতায় এলেন। মাধুরীলতা ও মীরা দেবী উভয়েই তখন কলকাতায়। মাধুরীলতা কিছুটা অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন— 'ব° শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্র ভূষণ বাগচী দং উহার ফি,

তিন রাত্র থাকায় প্রতি রাত্র ১০ হিঃ···৩০' ১৬ অগ্রহায়ণের এই হিসাব সম্ভবত উক্ত অসুস্থতার সঙ্গে সম্পর্কিত। বেলা এখন অনেকটা সুস্থ হইয়াছে এই খবর দিয়ে ১৯ অগ্র° [বৃহ 5 Dec] রবীন্দ্রনাথ ভূপেন্দ্রনাথ সান্যালকে লেখেন : 'আগামীকল্য আমি একলা শিলাইদহে যাইতেছি। সেখানে গিয়া সমস্ত বন্দোবস্ত করিয়া বেলা মীরাকে ডাকিয়া পাঠাইব।'[৮৫] এর আগে ১৭ অগ্র° বিদ্যালয় সম্পর্কে নানা নির্দেশ দিয়ে তাঁকে একটি পত্র লিখেছিলেন। ব্রহ্মচর্যাশ্রমকে অনেকেই একটি বোর্ডিং স্কুল হিসেবে মনে করতেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের ধারণা ছিল অন্যরকম এবং সাত্ত্বিক ব্রাহ্মণ ভূপেন্দ্রনাথকে তিনি সেই ধারণার অনুব্রতী হিসেবে দেখতেন। অসুস্থ শমীন্দ্রনাথের সেবা ও শোকাহত পিতাকে সহানুভূতিপূর্ণ সঙ্গদানের মধ্য দিয়ে তাঁর চারিত্রিক মহানুভবতাও নিশ্চয়ই রবীন্দ্রনাথকে স্পর্শ করেছিল। তাই এই মানুষটিকে বিদ্যালয়ের বৈষয়িক কাজকর্মের মধ্যে আবদ্ধ রাখতে তিনি মর্মপীড়া অনুভব করেছেন :

আপনার উপর ওখানকার আশ্রম ব্যবস্থার ভার পড়াতে আপনি অত্যন্ত আবদ্ধ হইয়াছেন। আমার অনেক সময় মনে হয়, আপনি এই সকল ঝঞ্জাট হইতে কতক পরিমাণে নিষ্কৃতি পাইলে বিদ্যালয়ের ভিতরকার কাজে হাত দিতে পারেন। সুযোগ ও উপযুক্ত লোক পাইলেই আপনাকে এই সকল বৈষয়িক ব্যাপার হইতে ছুটি দিব। এখন কিছুকাল দুঃখ সহ্য করিবেন। কিন্তু চিত্তকে সঙ্কুচিত হইতে দিবেন না—বিদ্যালয়কে খুব বড় করিয়া দেখিবেন। নিজের জীবনকেও কেবল কাজ করিবার কল করিয়া ফেলিবেন না। আপনার অন্তরাত্মার উদার জ্যোতি যেন অবাধে আপনার চতুর্দিকে বিকীর্ণ হইতে পারে—ধৈর্য্য, ক্ষমা, প্রেমের দ্বারা সকলকে আকর্ষণ করিয়া লইয়া বিদ্যালয়ের মধ্যে মঙ্গলের মূর্তিটিকে আকার দান করিয়া গড়িয়া তুলিবেন, অধ্যাপকদের মনকে সর্বদা মহত্ত্বের অভিমুখে লক্ষ্যবদ্ধ করিয়া রাখিবেন, কাহাকেও কোন দিকে ছোট হইতে দিবেন না—আপনার নিকট হইতে আমি এই প্রত্যাশা করিয়া আছি।[৮৬]

তাঁর নিজের মনও এই বৃহত্ত্বের অভিমুখী—আরও বহু পত্রে তিনি ভূপেন্দ্রনাথের কাছে এই প্রত্যাশা ব্যক্ত করেছেন।

২০ অগ্র° [শুক্র 6 Dec] রবীন্দ্রনাথ ভৃত্য বিপিনকে নিয়ে শিলাইদহ যাত্রা করেন। ২৫ অগ্র° বুধ 11 Dec] মাধুরীলতা, মীরা ও রাজলক্ষ্মী দেবী ভূপেশচন্দ্র রায়ের অভিভাবকত্বে 'অখিল চাকর'কে সঙ্গে নিয়ে শিলাইদহে গিয়ে তাঁর সঙ্গে মিলিত হন। মাঘোৎসবের জন্য কয়েকদিন কলকাতায় আসা ও পাবনা প্রাদেশিক সম্মিলনের জন্য সেখানে যাওয়া ছাড়া রবীন্দ্রনাথ একটানা চার মাস শিলাইদহে কাটান—৭ পৌষ [সোম 23 Dec] শান্তিনিকেতনের সপ্তদশ সাম্বৎসরিক ব্রহ্মোৎসবেও তিনি যোগদান করেননি।

আশ্বিন ১৩১৪-পর্যন্ত সাময়িকপত্রে রবীন্দ্ররচনার প্রকাশসূচী আমরা দিয়ে এসেছি। এখানে কার্তিক থেকে পৌষ পর্যন্ত সূচী সংকলিত হল। এই সময়ে গোরা-র মাসিক কিস্তি ছাড়া তাঁর প্রকাশিত রচনার পরিমাণ খুবই কম। গোরা-ও যে তিনি প্রতি মাসে লিখে পাঠাতেন, তাও নয়—যখনই সুযোগ পেয়েছেন, একসঙ্গে কয়েকমাসে প্রকাশের উপযোগী অনেকগুলি পরিচ্ছেদ লিখে রেখেছেন। ১ কার্তিক [শুক্র 18 Oct] শান্তিনিকেতন থেকে মীরা দেবীকে লিখেছিলেন : 'নির্জ্জনে নিভৃতে সেই গোরা গল্পটা লেখা যাচ্ছে। কলকাতায় মুস্কিলে পড়েছিলুম, গল্প কাগজে বের করতে আরম্ভ করে শেষ না করলে ত লজ্জা রক্ষা হবে না। অন্তত তিন মাসের লেখা আগিয়ে থাকলে নিশ্চিন্ত থাকা যায়।'[৮৭] এইভাবেই তিনি উপন্যাসগুলিকে এগিয়ে রেখেছেন, ফলে পুত্রবিয়োগের মতো দুর্দৈব উপস্থিত হলেও মাসিক কিস্তিতে ছেদ পড়েনি। চিরকুমার সভা, চোখের বালি বা নৌকাডুবি-র ক্ষেত্রেও এরূপই হয়েছে, পরে চতুরঙ্গ, ঘরে বাইরে প্রভৃতির ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম হয়নি। অবশ্য অন্যরূপ ধারণার জন্য দায়ী রবীন্দ্রনাথেরই অসতর্ক উক্তি, তিনি প্রভাতচন্দ্র গুপ্তকে বলেছেন [20 Oct

1936]: “লিখতে বসলুম ‘গোরা’—আড়াই বছর ধরে মাসে মাসে নিয়মিত লিখেছি, কোনো কারণে একবারো ফাঁকি দিইনি। যেমন লিখতুম তেমনি পাঠাতুম।” লিখেই পাঠিয়ে দিয়েছেন এমন ঘটনাও ঘটেছে, কিন্তু সেইটিই নিয়ম ছিল না। এর পরে তিনি বলেছেন : যে সব অংশ বাহুল্য মনে করতুম, কালির রেখায় কেটে দিতুম, সে সব অংশের পরিমাণ অল্প ছিলনা। নিজের লেখার প্রতি অবিচার করা আমার অভ্যাস। তাই ভাবি সেই বর্জিত কপিগুলি আজ যদি পাওয়া যেত, তবে হয়ত সেদিনকার অনাদরের প্রতিকার করতে পারতুম।’[৮৮] গোরা পর্যন্ত কোনো উপন্যাসের পাণ্ডুলিপি পাওয়া যায়নি, কিন্তু গ্রন্থে বর্জিত সাময়িকপত্রে প্রকাশিত পাঠের পরিমাণ ও গুণগত ঔৎকর্ষের পরিচয় নিলে আক্ষেপ জাগে; চতুরঙ্গ থেকে চার অধ্যায় পর্যন্ত পাণ্ডুলিপির বর্জিত পাঠ সম্পর্কে একই কথা প্রযোজ্য।

প্রবাসী, কার্তিক ১৩১৪ [৭।৭] :

৩৫৭-৬৯ ‘গোরা’ ৫-৯ দ্র গোরা ৬।১৩৪-৫১ [৪-৮]

প্রবাসী, অগ্র° ১৩১৪ [৭।৮] :

৪৩৪-৪২ ‘গোরা’ ১০-১১ দ্র গোরা ৬।১৫১-৬৫ [৯-১০]

সঙ্গীত-প্রকাশিকা, অগ্র° ১৩১৪ [৭।৩] :

৫৭-৫৯ ইমন কল্যাণ-ঝম্পক। বিপদে মোরে রক্ষা কর দ্র স্বর ২৫

৬০-৬১ মিশ্র সরফর্দা-একতালা। আমি বহু বাসনায় প্রাণপণে চাই দ্র স্বর ২৪

৬২-৬৪ বেহাগ-লঘু একতালা। অমল কমল সহজে জলের কোলে দ্র স্বর ২৪

সবগুলি গানেরই স্বরলিপিকারের নাম অনুল্লেখিত; ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি গ্রন্থের অন্তর্ভুক্তি দেখে মনে হয় গানগুলির স্বরলিপিকার কাঙালীচরণ সেন।

প্রবাসী, পৌষ ১৩১৪ [৭।৯] :

৫০৫-১৭ ‘গোরা’ ১২-১৪ দ্র গোরা ৬।১৬৫-৮৫ [১১-১৩]

বঙ্গদর্শন, পৌষ ১৩১৪ [৭।৯] :

৪৭০ ‘প্রার্থনা’ [‘অন্তর মম বিকশিত কর’] দ্র গীতাঞ্জলি ১১।৮-৯ [৫]; গীত ১।৫১

সঙ্গীত-প্রকাশিকা, পৌষ ১৩১৪ [৭।৪] :

৬৮-৭০ সিন্ধু কাফি-ঝাঁপতাল। চরণ-ধ্বনি শুনি তব নাথ জীবন-তীরে দ্র স্বর ২৫

৭০-৭১ ভীমপলশ্রী-তেওরা। বিপুল তরঙ্গ রে দ্র স্বর ২৫

৭২ আড়ানা কাওয়ালি। আজি মম জীবনে নামিছে ধীরে দ্র স্বর ২৪

৭৩-৭৪ বাহার-ধামার। মম অঙ্গনে স্বামী আনন্দে হাসে দ্র স্বর ২৫

৭৫ পূরবী-ধামার। বীণা বাজাও হে মম অন্তরে দ্র স্বর ২৫

৭৬-৭৭ ইমন কল্যাণ-আড়া চৌতাল। সংসারে কোন ভয় নাহি দ্র স্বর ২৫

৭৭-৭৮ ভূপালী-সুরফাঁকতাল। প্রচণ্ড গর্জ্জনে আসিল একি দুর্দিন দ্র স্বর ২৫

৮৪-৮৬ আশোয়রী-একতালা। আমি কেমন করিয়া জানাব আমার দ্র স্বর ২৪

৮৭-৮৮ ইমন কল্যাণ [ভূপালী]-ঝম্পক। দুখের বেশে এসেছ বলে দ্র স্বর ২৫

এই গানগুলিরও স্বরলিপিকারের নাম উল্লেখ করা হয়নি, কিন্তু পূর্বোল্লিখিত কারণে মনে করা যায় কাঙালীচরণ সেনই গানগুলির স্বরলিপি করেন। 'প্রচণ্ড গর্জনে' গানটির রচয়িতা হিসেবে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের নাম ছাপা হয়েছিল, পরে 'ভ্রম সংশোধন' করে রবীন্দ্রনাথের নাম করা হয়। প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় এই গানটি সম্পর্কে লিখেছেন : 'কনিষ্ঠ পুত্র শমীন্দ্রের মৃত্যু হয় ১৩১৪ অগ্রহায়ণ মাসে। বোধ হয় তারপরেই গানটি রচিত।'[৮৯] গানটি হিন্দি গান 'প্রচণ্ড গর্জন সজল বরখা ঋতু ভেঙে রচিত [দ্র গবেষণা-গ্রন্থমালা ৩।৩১], শমীন্দ্রনাথের মৃত্যুর পরে দিনদশেক কলকাতা বাসের সময়ে এরূপ গান ভাঙার সুযোগ ছিল বলে মনে হয় না। প্রভাতকুমার 'বিপুল তরঙ্গে রে' গানটি 'একই সময়ে রচিত' বলে মনে করেছেন। এই গানটিও 'নাচত ত্রিভঙ্গ রে' [দ্র গবেষণা-গ্রন্থমালা ৩।৬৪] গানটি ভেঙে রচিত, তাই একই কারণে ১১-২০ অগ্রহায়ণের মধ্যে রচিত হওয়ার সুযোগ অল্প। এই গানগুলির প্রত্যেকটিই ১৩১৪ বঙ্গাব্দের মাঘোৎসব গীত হয়েছিল, যে-উৎসবের প্রস্তুতি চলত কয়েকমাস ধরে। সুতরাং আশ্বিন-কার্তিক মাসে কলকাতা-বাসের সময়ে গানগুলি ভাঙা অসম্ভব নয়। আদি ব্রাহ্মসমাজের প্রাক্তন গায়ক রাধিকাপ্রসাদ গোস্বামী মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দীর সভাগায়ক নিযুক্ত হয়েছিলেন, যাঁর সঙ্গে কাশিমবাজারে রবীন্দ্রনাথের সাক্ষাৎ হয়েছিল। কয়েকটি হিন্দি গান তিনি রাধিকাপ্রসাদের কাছ থেকেও সংগ্রহ করে থাকতে পারেন।

বেঙ্গল লাইব্রেরির ক্যাটালগ অনুযায়ী গদ্যগ্রন্থাবলী ষষ্ঠ ভাগ হাস্য-কৌতুক প্রকাশিত হয় 10 Dec [সোম ২৩ অগ্র°]। এই দিনই ক্যাশবহিতে 'হাসী ও কৌতুক বহি ৮০০ শত মজুমদার লাইব্রেরী হইতে আনার মুটে' ভাড়ার হিসাব পাওয়া যায়। মুদ্রণসংখ্যা: ১০৫০; পৃষ্ঠাসংখ্যা : ২+২+২+৮৫; মূল্য : ছয় আনা। অন্যান্য বিবরণ :

আখ্যাপত্র : গদ্যগ্রন্থাবলী, ৬ষ্ঠ ভাগ/ হাস্য-কৌতুক।/ শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।/ মূল্য।ল০ আনা।

[পরপৃষ্ঠায় :] প্রকাশক—শ্রীসুহাসচন্দ্র মজুমদার,/ মজুমদার লাইব্রেরি, ২০ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট্, কলিকাতা।/ কলিকাতা, ২০ নং কর্ণওয়ালিস্ স্ট্রীট, দিনময়ী প্রেসে/ শ্রীহরিচরণ মান্না দ্বারা মুদ্রিত।

সূচী :

[১] ছাত্রের পরীক্ষা [বালক, শ্রাবণ ১২৯২]
[২] পেটে ও পিঠে [ঐ, আষাঢ় ১২৯২]
[৩] অভ্যর্থনা [ঐ, ভাদ্র ১২৯২]
[৪] রোগের চিকিৎসা [ঐ, জ্যৈষ্ঠ ১২৯২]
[৫] চিন্তাশীল [ঐ, আশ্বিন-কার্তিক ১২৯২]
[৬] ভাব ও অভাব [ঐ, অগ্র° ১২৯২]
[৭] রোগীর বন্ধু [ঐ, পৌষ ১২৯২]
[৮] খ্যাতির বিড়ম্বনা [ঐ, মাঘ ১২৯২]
[৯] আর্য্য ও অনার্য্য [ঐ, চৈত্র ১২৯২]
[১০] একান্নবর্তী [ভারতী ও বালক, বৈশাখ ১২৯৪]
[১১] সূক্ষ্ম বিচার [ঐ, বৈশাখ ১২৯৩]
[১২] আশ্রমপীড়া [ঐ, কার্তিক ১২৯৩]
[১৩] গুরুবাক্য [ঐ, চৈত্র ১২৯৩]

ইণ্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস কর্তৃক প্রকাশিত গদ্যগ্রন্থাবলী ৬ষ্ঠ ভাগে 'অন্ত্যেষ্টি সৎকার' [ভারতী ও বালক, ভাদ্র-আশ্বিন] ও 'রসিক' [ঐ, ফাল্গুন ১২৯৩] রচনা-দুটি সংযোজিত হয়।

এর কিছুদিন পরে সপ্তম ভাগ ব্যঙ্গকৌতুক-ও প্রকাশিত হল, বেঙ্গল লাইব্রেরির ক্যাটালগ অনুযায়ী প্রকাশের তারিখ 28 Dec [শনি ১২ পৌষ]। মুদ্রণসংখ্যা : ১০৫০; পৃষ্ঠাসংখ্যা : ২+২+৯৯; মূল্য : ছয় আনা। অন্যান্য বিবরণ:

আখ্যাপত্র : গদ্যগ্রন্থাবলী, ৭ম ভাগ/ ব্যঙ্গকৌতুক।/ শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।/ মূল্য।ল০ আনা।

[পরপৃষ্ঠায় :] প্রকাশক—শ্রীসুহাসচন্দ্র মজুমদার,/ মজুমদার লাইব্রেরি,/ ২০ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট্, কলিকাতা।/ কলিকাতা, ২০ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট্, দিনময়ী প্রেসে/ শ্রীহরিচরণ মান্না দ্বারা মুদ্রিত।

সূচী :

[১] রসিকতার ফলাফল [ভারতী, বৈশাখ ১২৯২]
[২] ডেঞ্জে পিঁপড়ের মন্তব্য [বালক, চৈত্র ১২৯২]
[৩] প্রত্নতত্ত্ব [সাহিত্য, পৌষ ১২৯৮]
[৪] লেখার নমুনা [সাহিত্য, কার্তিক ১২৯৮]
[৫] সারবান সাহিত্য [?]
[৬] মীমাংসা [সাধনা, ফাল্গুন ১২৯৮]
[৭] পয়সার লাঞ্ছনা [ঐ, জ্যৈষ্ঠ ১৩০০]
[৮] কথামালার নূতন প্রকাশিত গল্প [ঐ, ভাদ্র ১৩০০]
[৯] প্রাচীন দেবতার নূতন বিপদ [ঐ, আষাঢ় ১৩০০]
[১০] বিনি পয়সায় ভোজ [ঐ, পৌষ ১৩০০]
[১১] নূতন অবতার [ঐ, পৌষ ১৩০১]
[১২] অরসিকের স্বর্গপ্রাপ্তি [ঐ, ভাদ্র ১৩০১]
[১৩] স্বর্গীয় প্রহসন [ঐ, আশ্বিন-কার্তিক ১৩০১]
[১৪] বশীকরণ [বঙ্গদর্শন, অগ্র° ১৩০৮]।

কার্তিক ১৩৪৫-এ প্রকাশিত দ্বিতীয় সংস্করণে 'স্বর্গে চক্রটেবিল বৈঠক' রচনাটি সংযোজিত হয়।

শোকাহত অন্তরের উপর প্রকৃতির শুশ্রূষা এবং মাধুরীলতা ও মীরা দেবীর স্বাস্থ্যোদ্ধারের জন্য রবীন্দ্রনাথ দীর্ঘকাল শিলাইদহে পদ্মাতীরে বসবাসের সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। ১৩০৮ বঙ্গাব্দে ব্রহ্মচর্যাশ্রম প্রতিষ্ঠার পর তিনি নিয়মিত জমিদারির কাজ দেখার দায়িত্ব পরিত্যাগ করেন, নানা সংকটের মীমাংসার জন্য মাঝেমাঝে শিলাইদহ ও কালীগ্রামে গিয়েছেন কিন্তু পূর্বের মতো সম্পূর্ণ দায়িত্ব নিজের উপর রাখেননি—জোড়াসাঁকোয় সদর সেরেস্তা দেখার ভার ছিল জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, সুরেন্দ্রনাথ ও সত্যপ্রসাদের উপর, মফস্বলে কাজ দেখতেন প্রধান কর্মচারীরা ও প্রয়োজন হলে সুরেন্দ্রনাথ। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ যখন শিলাইদহে দীর্ঘ বসবাসের জন্য এলেন, তখন স্বাভাবিক কারণেই জমিদারির অপর দুই অংশীদার দ্বিজেন্দ্রনাথ ও সত্যেন্দ্রনাথ তাঁকেই উক্ত কাজের দায়িত্ব অর্পণ করেন এবং সেখানে তাঁর অবস্থানের ব্যয় আনুপাতিকভাবে তিন অংশীদার মিলে বহন করেন—তথ্যটি জানা যায় ক্যাশবহির ৩ বৈশাখ ১৩১৫ তারিখের একটি হিসাব থেকে : 'দং বিরাহিমপুরে শ্রীযুক্ত রবীন্দ্র বাবু মহাশয় জমিদারী কার্য্য দেখিবার জন্য ২৪ অগ্রহায়ণ হইতে ২১ চৈত্র ১৩১৪ সাল পর্য্যন্ত ৪ মাস থাকায় আহারাদির খরচ ৫২২ ল টাকা মোট পড়ায় তাহার তিন অংশের এক অংশ উক্ত বাবু মহাশয়কে দেওয়া যায়

—১৭৪।৮’। সতীশচন্দ্র রায়ের ভাই ভূপেশচন্দ্র শান্তিনিকেতনে শিক্ষকতাকার্যে নিযুক্ত ছিলেন, রবীন্দ্রনাথ তাঁকে শিলাইদহে নিয়ে এসে গ্রামপুনর্গঠন কাজের দায়িত্ব অর্পণ করেন। কিছুকাল পরে ৫ ফাল্গুন [সোম 17 Feb] তিনি জামাতা নগেন্দ্রনাথকে লেখেন : ‘গ্রাম পল্লীকে organise করে তোলবার যে প্রস্তাব আমি আমার [পাবনা] বক্তৃতায় করেছি সেটা আমি কাজে খাটাবার জন্যে পূর্ব হতেই চেষ্টায় প্রবৃত্ত হয়েছি। আমার জমিদারীর মধ্যে এই কাজের জন্যেই আমি ভূপেশকে লাগিয়ে দিয়েছি। আপাতত সে একটা পাড়াকে গড়ে তোলবার বিশেষ ভার নিয়েছে—দেখা যাক্ তোমাদের এই বরিশালের যুবকটির দ্বারা কতটা কাজ হয়। আরো দুটি ছেলেকে এই কাজে ভূপেশের সহকারীরূপে লাগাব বলে স্থির করেছি—তারা আর সপ্তাহখানেক পরে এসেই কাজে যোগ দেবে। যাকে Cottage industries বলে অর্থাৎ ছোটখাট অনতিব্যয়সাধ্য কল নিয়ে গ্রামের লোক যে সমস্ত কাজ করতে পারে এখানকার পল্লীগ্রামে সেই সমস্ত চালানো উচিত বলে আমি স্থির করেছি।’[৯০]

দীর্ঘকালের জন্য বিদ্যালয় ছেড়ে এসেছেন বলে রবীন্দ্রনাথের খুবই চিন্তা ছিল সেখানকার সুষ্ঠু পরিচালনার জন্য। ভূপেন্দ্রনাথের উপর সর্বময় কর্তৃত্ব অর্পিত হয়েছিল, কিন্তু সাধকস্বভাব হৃদয়বান পুরুষ হলেও তাঁর কর্মদক্ষতা সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের উচ্চ ধারণা ছিল না—ভূপেন্দ্রনাথেরও আত্মবিশ্বাস কিছু কম ছিল, যার ফলে রবীন্দ্রনাথ খুঁটিনাটি বিষয়ে পরামর্শ ও নির্দেশ দিয়ে তাঁকে অজস্র পত্র লিখেছেন [কখনও কখনও দিনে দুটিও]। কলকাতায় থাকতেই চিঠি লেখা শুরু হয়েছিল—১৯ অগ্র° [বৃহ 5 Dec] যোগেন্দ্রনাথ সেনগুপ্তকে গণিতের অধ্যাপক নিযুক্ত করার কথা লিখেছেন। ২৩ অগ্র° [সোম 10 Dec] ইংরেজি শিক্ষক নিয়োগ করা সম্বন্ধে শিলাইদহ থেকে লিখেছেন : ‘এমন লোকের আবশ্যক যিনি কেবল ইংরেজি ভাষা নহে ইংরেজি সাহিত্যেও যথার্থ পরিপক্ক যাঁহার কল্পনা শক্তি আছে—যিনি সাহিত্যের রস গ্রহণ ও তাহা সঞ্চার করিয়া দিতে পারেন—ভাবুকতা যাঁহার পক্ষে স্বাভাবিক। অক্ষয়কুমার দত্ত মহাশয়ের পৌত্র সত্যেন্দ্রকে পাইলে আমি এ সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হইতে পারি। শুষ্ক শিক্ষক অনেক পাওয়া যায়—তাঁহারা ইংরেজিও ভাল জানিতে পারেন কিন্তু তাঁহাদের দ্বারা আমাদের বিদ্যালয়ের কাজ ঠিক চলিবে না। সত্যেন্দ্রের বোলপুর আশ্রমে আসিবার সম্ভাবনা আছে কিনা খবর লইয়া আমাকে জানাইবেন।’[৯১] কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত [1882-1922] অবশ্য শিক্ষকরূপে বিদ্যালয়ে যোগদান করেননি। বাংলা ও সংস্কৃত পড়াবার জন্য রবীন্দ্রনাথ শান্তিপুর-বাসী বৈষ্ণবপরিবারের সন্তান ধর্মপিপাসু এক শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণ পণ্ডিতকে নিয়োগ করার প্রস্তাব দিয়ে লিখেছেন : ‘আমাদের বিদ্যালয়ে বাঙলা পড়াইবার লোক নাই—অঙ্ক এবং বাঙলা আমাদের বিদ্যালয়ের কলঙ্ক। আমাদের আর একটি অভাব আমাদের অধ্যাপকেরা তাঁহাদের কর্মকে বৃহৎ করিয়া দেখেন না—তাঁহারা আশ্রমের মধ্যে ধর্মকে, জীবনের মধ্যে ঈশ্বরকে প্রতিষ্ঠা করিবার আকাঙক্ষামাত্রও অনুভব করেন না। সেইজন্য আমি ধর্মবিশ্বাসী ভক্তিমান লোকের সন্ধানে আছি।’ কিন্তু এঁকে বিদ্যালয়ে পাওয়া সম্ভব হয়েছিল বলে মনে হয়না। সতীশচন্দ্র রায়ের সহপাঠী শরৎকুমার রায়কে [1878-1935] ‘ইংরেজি, বাঙলা, অঙ্ক ভালই জানেন—হিতকর্মে উৎসাহী’ —৩০ টাকা বেতনে নিয়োগপত্র দেওয়া হয় ৩ পৌষ [বৃহ 19 Dec][৯২] ইনি বিদ্যালয়ের সর্ববিধ কাজে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিলেন।

২৭ অগ্র° [শুক্র 13 Dec] তিনি ভূপেন্দ্রনাথকে যে পত্র লিখেছেন তার মধ্যেও বিদ্যালয়-সংক্রান্ত নানা খুঁটিনাটি পরামর্শ আছে। তারই সঙ্গে সেই দিন সকালে ভৈরবী সুরে রচিত 'অন্তর মম বিকশিত করো' গানটিও লিখে পাঠিয়েছেন। ভূপেন্দ্রনাথকে তিনি 'ধর্মবিশ্বাসী ভক্তিমান' লোক বলেই মনে করতেন, তাই হৃদয়ের আধ্যাত্মিক আকুলতা থেকে রচিত গানটি তাঁকেই পাঠানো উচিত বলে মনে করেছেন। মুদ্রিত গীতাঞ্জলি-তে [১৩১৭] 'প্রেমে প্রাণে গানে গন্ধে আলোকে পুলকে' [দ্র ঐ ১১।৯ (৬)] ও 'তুমি নব নব রূপে এসো প্রাণে' [দ্র ঐ ১১।৯-১০(৭)] গান-দুটির রচনাকাল 'অগ্রহায়ণ ১৩১৪' বলে উল্লিখিত। শেষোক্ত গানটির প্রাথমিক খসড়া পাওয়া যায় 10 Sep 1894 [২৬ ভাদ্র ১৩০১] পতিসর থেকে ইন্দিরা দেবীকে লেখা একটি পত্রের মধ্যে [দ্র ছিন্নপত্রাবলী। ৩৩২, পত্র ১৫২]; গানটির প্রায়-পূর্ণাঙ্গ রূপ পাওয়া গেছে কল্পনা-র পাণ্ডুলিপিতে [Ms. 274] —সেকথা আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি [দ্র রবিজীবনী ৪।১৩৭-৩৮]। 'অন্তর মম বিকশিত করো' গানটির একটি পাণ্ডুলিপি পাওয়া যায় Ms. 358-এ, কয়েকটি সংশোধনের চিহ্ন থাকলেও এটি নিশ্চয়ই অনুলেখন।

বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার সময় থেকেই রবীন্দ্রনাথ ল্যাবরেটরি ও টেকনিক্যাল বিভাগ খোলার ব্যাপারে আগ্রহী ছিলেন। কিন্তু অর্থ, যন্ত্রপাতি ও উপযুক্ত শিক্ষকের অভাবে তাঁর সেই আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হয়নি। স্বল্পব্যয়সাপেক্ষ ছুতোরের কাজ ও তাঁত বোনার আয়োজন বিদ্যালয়ে ছিল, 1904-এ ত্রিপুরার মহারাজা-প্রতিষ্ঠিত কলেজ বন্ধ হয়ে যাওয়ায়* কিছু বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি উপহার-স্বরূপ বিদ্যালয়ে প্রেরিত হয়েছিল—কিন্তু পুরোদস্তুর টেকনিক্যাল বিভাগের ব্যবস্থা করা সম্ভব হয়নি। আমাদের আলোচ্য সময়ে এইরূপ একটি সম্ভাবনা দেখা দেওয়ায় তাই তিনি উৎসাহী হয়ে উঠেছেন। 'রবিবার' [২৯ অগ্র° : 15 Dec] তিনি ভূপেন্দ্রনাথকে লিখেছেন : 'কাশী সারনাথে ধর্মপাল যে আশ্রম স্থাপন করেছেন সেইখানে কতগুলো যন্ত্রতন্ত্র আছে। ধর্মপাল সেগুলি আমাদের বিদ্যালয়ে দান করেছেন। কিন্তু সে সমস্ত জিনিসপত্র সারনাথে গিয়ে প্যাক করিয়ে আনার ব্যবস্থা কে করবে? ···কাশী শহরে যা কিছু সুবিধা ঘটানো সম্ভব সে আপনার দ্বারা হতে পারবে জেনে আপনার উপরেই এই ভার দিচ্চি। সত্যকে লিখে দিলুম, ধর্মপালের কাছ থেকে আপনার জিনিসপত্র বুঝে দেবার [? নেবার] একটা অনুমতিপত্র সত্বর পাঠাতে। সেই পত্রখানা পেলেই আপনি চলে যেতে পারবেন। আশা করি জিনিস যা পাবেন তাতে আপনার যাতায়াতের খরচ ও কষ্ট পুষিয়ে যাবে।'[৯৩] কয়েকদিন পরে ৪ পৌষ [শুক্র 20 Dec] তাঁকে কাশী যেতে নিষেধ করেছেন, সত্যপ্রসাদই মাঘ মাসে কাশী গিয়ে যন্ত্রাদি পাঠাবার ব্যবস্থা করবেন। কিন্তু ফাল্গুনের প্রথমেও জিনিসগুলি শান্তিনিকেতনে পৌঁছয়নি। ৫ ফাল্গুন [সোম 17 Feb 1908] জামাতা নগেন্দ্রনাথকে তিনি লিখেছেন : 'আমেরিকায় ভারতহিতৈষী যে একটি সভা হয়েছে এ সম্বন্ধে তাঁরা কি আমাদের কোনো পরামর্শ বা সাহায্য করতে পারেন, আমি যদি পারি তবে বোলপুর বিদ্যালয়ে টেক্‌নিকাল বিভাগ খুলে বিশেষভাবে এই সকল cottage industriesএর উপযোগী শিক্ষার আয়োজন করতে ইচ্ছা করি। বৌদ্ধ ভিক্ষু ধর্মপাল আমাকে কতকগুলি আমেরিকান যন্ত্র দেবেন বলেছেন এবং তাঁর ইচ্ছা এই যে বোলপুরের ঐ টেকনিকাল বিভাগের নাম Indo American Industrial institution রাখা হয়, তাহলে তিনি আমেরিকা থেকে সাহায্য যোগাড় করে দিতে পারবেন। সে কতদূর হবে জানিনে—কিন্তু এ সম্বন্ধে সর্বপ্রকার খবর

নেওয়া দরকার। তোমরা ঐ সভার কোনো সভ্যকে এ সম্বন্ধে পত্র লিখে যদি সংবাদ নিতে পার তবে চেষ্টা কোরো।'[৯৪] ধর্মপালের অনুরূপ প্রস্তাবের কথা তিনি উক্ত ৪ পৌষের পত্রেই ভূপেন্দ্রনাথকে জানিয়েছিলেন।

ইতিমধ্যে জগদীশচন্দ্র 19 Dec [বৃহ ৩ পৌষ] লণ্ডন থেকে একটি পত্র লিখে তাঁকে এই ব্যাপারে আরও উৎসাহিত করলেন : 'এখানে নূতন রকমের কল দেখিয়া ইচ্ছা হয় যে তোমার স্কুলে ছোট workshop খোলা হয়। ছোট কেরাসিনের এঞ্জিন (one horse power) ১৫০ টাকা মাত্র, অতি সহজেই চলে। বিদ্যুতের আলোর dynamo তাহার দ্বারা চালান যাইতে পারে, উহার জন্য আর ৫০ টাকা। ···ছোট American Lathe সম্ভবতঃ ২০০ টাকার মধ্যে পাওয়া যাইবে। ৫।৬ শত টাকা হইলে তোমার workshop আরম্ভ করা যাইতে পারে।'[৯৫] রবীন্দ্রনাথ প্রত্যুত্তরে ২৩ পৌষ [বুধ ৪ Jan] ধর্মপালের প্রস্তাবিত সাহায্যের কথা জানিয়ে তাঁকে লেখেন : 'আচ্ছা, তোমাকে যদি হাজার খানেক টাকা সংগ্রহ করিয়া পাঠাই তবে সুরেশকে দিয়া আমার Workshopএর মালমসলা কিনাইয়া পাঠাইয়া দিতে পারিবে কি? এ-সম্বন্ধে তোমার উত্তর পাইলে টাকা জোগাড়ের চেষ্টা দেখিব।'[৯৬] জগদীশচন্দ্র 28 Feb [শুক্র ১৬ ফাল্গুন] তাঁকে লেখেন : 'যদি workshop করিতে চাও তাহা হইলে এখান হইতে সব খবর লইব। ১৫০০ টাকা হইলে বেশ ভাল হয়, ১০০০ হইলেও হইতে পারে।'[৯৭] ১৩ চৈত্র [বৃহ 26 Mar] জামাতা শরৎকুমারের প্রযত্নে জগদীশচন্দ্রের কাছে 'বিলাতে পাঠান যায় কুক এণ্ড সন ব্যাঙ্কের ···১ ড্রাপ্ট ১০০০'। কিন্তু সম্ভবত শিক্ষকাভাবে পরিকল্পনাটি স্থগিত রাখা হয়। 24 Jul 1908 [৯ শ্রাবণ ১৩১৫] তারিখে জগদীশচন্দ্র লণ্ডন থেকে লিখেছেন : 'যদি mechanical laboratory করিবার অসুবিধা হয় তবে এখন তাহা নাই করিলে। ভাল একজন শিক্ষক না পাইলে কল অযত্নে নষ্ট হইয়া যাইবে এই মনে করিয়া আমি এখন পর্য্যন্ত যন্ত্রাদি ক্রয় করি নাই। তোমার সব টাকা তোমার জামাতার নিকট মজুত আছে, আবশ্যক মত তাহাকে ফিরাইয়া পাঠাইতে বলিবে।'[৯৮]

শুধু টেকনিক্যাল বিভাগ নয়, শান্তিনিকেতনে একটি কলেজ বিভাগ খোলার কথাও রবীন্দ্রনাথ মাঝেমাঝে ভেবেছেন। শিলচরের উকিল ও প্রসিদ্ধ জাতীয়তাবাদী নেতা কামিনীকুমার চন্দ [1862-1935] তাঁর পুত্র অপূর্বকুমারকে [1892-1966] ব্রহ্মচর্যাশ্রমে ভর্তি করতে চান; এবিষয়ে রবীন্দ্রনাথ ১২ ফাল্গুন [সোম 24 Feb] ভূপেন্দ্রনাথকে লেখেন :

> কামিনীকুমার চন্দ মহাশয়ের নাম শুনিয়া থাকিবেন। স্বদেশী ব্যাপারে তাঁহার পুত্র এণ্ট্রেন্স ক্লাস হইতে তাড়িত। এক্ষণে তিনি ডিগ্রীর মুখাপেক্ষা না করিয়া উপযুক্ত শিক্ষা দিবার জন্য আমাদের হাতে সমর্পণ করিতে চান। তাঁহার ইচ্ছা এখানে প্রস্তুত করিয়া আমেরিকায় পাঠাইবেন। আমি মাসিক ৬০ টাকা বেতন হাঁকিয়াছি তাহাতে তিনি সম্মত। ···এইরূপ আরো দুই চারিটি ছেলে পাইলে কলেজ করা যাইতে পারে।[৯৯]

এরপরেও 1911-এ রবীন্দ্রনাথ একবার কলেজ স্থাপনের ব্যাপারে উৎসাহ দেখিয়েছিলেন। কিন্তু পরে বিশ্বভারতীর অন্তর্গত শিক্ষাভবন [কলেজ বিভাগ] চালু হলে অর্থাভাব ও অন্যান্য অব্যবস্থায় উৎপীড়িত হয়ে তার অবলুপ্তিই তিনি কামনা করেছেন বারংবার।

পদ্মাতীরে রবীন্দ্রনাথ ও তাঁর কন্যাগণ ভালোই ছিলেন। 'রবিবার' [২৯ অগ্র°: 15 Dec] তিনি ভূপেন্দ্রনাথকে লেখেন : 'মেয়েরা এখানে নির্জন চরের উপরে বেশ আনন্দেই আছে। তাঁবুর উপরে [?] নিজেরাই রাঁধাবাড়া করে। দরমা দিয়ে ঘেরা একটা ঘাট আছে সেইখানেই স্নান হয়। পদ্মার দুই বাহুর ঠিক সঙ্গমস্থলে এটা একটা দ্বীপ—চারিদিকে জল এবং বালি—লোকালয়ের কোন সংস্রব নেই।'[১০০] তাঁর নিজের

স্বাস্থ্যও মোটামুটি ভালো ছিল! অনেকগুলি চিঠিতে এই সুস্বাস্থ্যের উল্লেখ আছে। ১০ ফাল্গুন [শনি 22 Feb] তিনি ভূপেন্দ্রনাথকে লিখেছেন : 'আমার শরীর অনেককাল পরে এখানে আসিয়া সুস্থ আছে। বহুদিন অর্শের কোনো লক্ষণই নাই। পাবনায় ঘোরতর উপদ্রবেও অর্শ শান্ত ছিল। দুধ বেশ যথেষ্ট পরিমাণে খাইয়াও কোনো পরিতাপের কারণ ঘটিতেছে না। আহার পরিপাক হইতেছে। শরীর পূর্বকালের মত প্রায় স্বাভাবিক অবস্থাপ্রাপ্ত হইয়াছে।'[১০১]

এই স্বাস্থ্যলাভকে রবীন্দ্রনাথ কাজে লাগালেন গ্রাম-পুনর্গঠনের পরিকল্পনায়। বহুদিন থেকে তিনি দেশবাসীকে আত্মশক্তি-সাধনায় প্রবৃত্ত হবার জন্য উপদেশ দিয়ে আসছিলেন—গ্রামপ্রধান বাংলাদেশে অবহেলিত পল্লীগুলিই ছিল উপযুক্ত কর্মক্ষেত্র। বঙ্গভঙ্গ ও বয়কট আন্দোলনের জোয়ারে ভেসে অনেক শিক্ষিত যুবক স্বদেশী দ্রব্য প্রচারের উদ্দেশ্যে গ্রামে গ্রামে ঘুরেছিলেন—কিন্তু তাঁদের অনেকেই গ্রামবাসীর সঙ্গে প্রকৃত আত্মীয়তার সম্পর্ক গড়ে তুলতে পারেননি বলে তাঁদের আবেদন তো ব্যর্থ হয়েছিলই, বহু জায়গায় তাঁদের বিরোধিতারও সম্মুখীন হতে হচ্ছিল। এই কারণেই রবীন্দ্রনাথ ডন সোসাইটির দ্বিতীয় বক্তৃতায় তাঁর 'পল্লীসমিতি' পরিকল্পনা ব্যাখ্যা করেছিলেন [দ্র ভাণ্ডার, জ্যৈষ্ঠ ১৩১৩।১১৪]—বক্তৃতাটির প্রাসঙ্গিক অংশ আমরা আগেই উদ্ধৃত করেছি। কিন্তু সেই ভাষণেই তিনি বলেছিলেন : "কিছুদিন হইতে আমি 'পল্লীসমিতি' স্থাপনের চেষ্টা করিতেছি, কিন্তু সে চেষ্টা সফল হয় নাই। যাহার জন্য বাঙালীর কোন কাজ সুসম্পন্ন হয় না—পরস্পরের মধ্যে ছোট ছোট কথা লইয়া মতভেদ, তাহার জন্যই এ চেষ্টাও সফল হইতেছে না।" শিলাইদহ-বাসের সময়ে তিনি পুনরায় এই চেষ্টায় ব্রতী হন। ১২ পৌষ [শনি 28 Dec] তিনি ভূপেন্দ্রনাথকে লেখেন : 'আমি এখানে একটি কাজে হাত দিয়েছি—যদি কিছু করতে পারি আনন্দিত হব।'[১০২] কাজটির কথা বিস্তৃতভাবে ২৯ পৌষ [মঙ্গল 14 Jan] লিখেছেন অজিতকুমার চক্রবর্তীকে : 'এখানকার গ্রাম সম্বন্ধে আমি যে-সব কথা ভাব্চি তা এখনো কাজে লাগাবার সময় হয়নি—এখন কেবল মাত্র অবস্থাটা জানার চেষ্টা কর্‌চি। ভূপেশ প্রধানত তথ্য সংগ্রহ কর্‌চেন সেইগুলো ভাল করে জমে উঠ্‌লে তখন প্ল্যান ঠিক কর্‌তে হবে। আমি গ্রামে গ্রামে যথার্থভাবে স্বরাজস্থাপন করতে চাই—সমস্ত দেশে যা হওয়া উচিত ঠিক তারই ছোট প্রতিকৃতি—খুব শক্ত কাজ অথচ না হ'লে নয়। অনেক ত্যাগের আবশ্যক—সেইজন্যে মনকে প্রস্তুত কর্‌চি রথীকে আমি এই কাজেই লাগাব—তাকেও ত্যাগের জন্য ও কর্ম্মের জন্য প্রস্তুত কর্‌তে হবে। নিজের বন্ধন মোচন করতে না পারলে আর কাউকে মুক্ত করতে পার্‌ব না।'[১০৩] তিনি শিলাইদহ থেকে ফিরে আসেন ২৪ চৈত্র [সোম 6 Apr] তারিখে। এর কয়েকদিন পরে অবলা বসুকে লিখেছেন : 'আমি সম্প্রতি পল্লীসমাজ নিয়ে পড়েছি। আমাদের জমিদারীর মধ্যে পল্লীগঠনকার্য্যের দৃষ্টান্ত দেখাব বলে স্থির করেছি। কাজ আরম্ভ করে দিয়েছি। কয়েক জন পূর্ব্ববঙ্গের ছেলে আমার কাছে ধরা দিয়েছে। তারা পল্লীর মধ্যে থেকে সেখানকার লোকদের সঙ্গে বাস করে তাদের শিক্ষা স্বাস্থ্য বিচার প্রভৃতি সকল কাজের ব্যবস্থা তাদের নিজেদের দিয়ে করাবার চেষ্টা করছে। তাদের দিয়ে রাস্তাঘাট বাঁধান, পুকুর খোঁড়ানো, ড্রেন কাটানো, জঙ্গল সাফ করান, প্রভৃতি সমস্ত কাজের উদ্যোগ হচ্ছে। আমাদের পল্লীর ভিতরে সমস্ত দেশ ব্যাপ্ত করে এমন সুগভীর নিরুদ্যম, যে, সে দেখলে স্বরাজ স্বাতন্ত্র্য প্রভৃতি কথাকে পরিহাস বলে মনে হয়—ও সকল কথা মুখে উচ্চারণ করতে

লজ্জা বোধ হয়।'[১০৪] এই কাজের মনস্তাত্ত্বিক জটিলতা সম্পর্কেও তিনি সচেতন ছিলেন; ১৯ ফাল্গুন [সোম 2 Mar] অজিতকুমারকে লেখেন :

প্রথম ও প্রধান বাধাই হচ্ছে মানুষের প্রতিকূলতা। একবার বিশ্বাস পেলে তারপরে সব কাজই সহজ হবে। অবশ্য অনেকগুলি সুবিধা আছে—আমি জমিদার বলে একটা সুবিধা। আর্থিক সুবিধাও কম নয়। কিন্তু এইরকম বাহ্য সুবিধাগুলো যথার্থ সুবিধা কিনা সন্দেহ। এতে অনেক মিথ্যা ভিতরে থেকে যায়। সত্যকার বাধাকে সত্যকার কষ্ট দিয়ে কাটালে তবেই সত্য ফল পাওয়া যায়। কাজকেও কিছুদূর পর্যন্ত ঠেলে দিয়ে তার পরে একেও আমার বিরুদ্ধে স্বাধীন করে দিতে পারলে তবেই এর জোর বাড়বে। যতদিন পর্যন্ত ভূপেশরা আমাদের লোক ততদিন পর্যন্ত একাজের সম্পূর্ণ শক্তির স্ফূর্তি হবে না। অতএব একদিন গাছে চড়িয়ে দিয়ে এদেরও মই কেড়ে নিতে হবে—নইলে এরা সম্পূর্ণ গাছের হবে না—নীচের দিকে কেবলি দৃষ্টি দেবে। যাই হোক, যেমন করেই হোক, কাজটাকে ঘটিয়ে তুলতে হবে। গ্রামগুলিকে স্বাধীন করে দিয়ে এদের মনুষ্যত্ব জাগাতেই হবে। গ্রামের সমস্ত কাজ গ্রামের লোক এক হয়ে সম্পন্ন করবে তারই উদ্যোগ করা যাচ্ছে। একটি দোকানের পত্তন করা হচ্ছে একটি পাঠশালাও শীঘ্রই হবে। ···আজ থেকে এদের প্রত্যেক গৃহস্থের বাড়িতে একটা করে হাঁড়ি দেওয়া হয়েছে—তারা মুষ্টিভিক্ষা দেবে—সেই মুষ্টিভিক্ষায় ওদের পাঠশালার খরচ চালাতে হবে। যদি ভিক্ষায় দশ টাকা ওঠে এবং আমি পাঁচ টাকা দিই তাহলে ১৫ টাকায় একজন শিক্ষক জোগাড় করা যাবে—এখানকার একজন ভদ্রলোকের বাড়িতে খেয়ে ও থেকে তিনি গ্রামটাকে ভিতর থেকে গড়ে তুলবেন।[১০৫]

রবীন্দ্রনাথ বাস্তব কাজকেও গভীর ভাবের দিক থেকে দেখার চেষ্টা করতেন—তাই এক অনির্দেশ্য আকুলতায় পীড়িত হতেন। হয়তো সেই কারণেই বিদ্যালয়ে ফিরে আসার আহ্বান পেয়ে ১ ফাল্গুন [বৃহ 13 Feb] ভূপেন্দ্রনাথকে লিখেছেন : 'আমার হৃদয়ের মধ্যে একটা ব্যাকুলতা অনুভব করিতেছি—তাহার একটা কিনারা না করিয়া আমি কিছুতে মন দিতে পারিব না। আমার বাহিরের সমস্ত কাজকর্মের ভিতর হইতে অত্যন্ত একটা বেদনার তাগিদ আসিতেছে—আমাকে আমার অন্তরাত্মা ভারি একটা তাড়া লাগাইতেছে। অতএব দয়া করিয়া আপনারা আমার ছুটি বাড়াইয়া দিবেন।'[১০৬] উপর্যুপরি কয়েকটি পত্রে এই ব্যাকুলতার কথা, অন্তর্যামীর সঙ্গে বোঝাপড়ার কথা আছে। এইসময়ে গোরা লেখা ছাড়া তাঁর সত্যকার সাহিত্যকর্ম প্রায় নেই—সুতরাং মনে করা যেতে পারে, কর্মোদ্যোগ থেকেই এই ব্যাকুলতার জন্ম হয়েছে।

রবীন্দ্রনাথ প্রথমে শিলাইদহে গ্রাম-পুনর্গঠনের কর্মযজ্ঞ আরম্ভ করেন। প্রবীণ ম্যানেজার বামাচরণ বসুর স্থানে বিপিনবিহারী বিশ্বাস বি. এল. নিযুক্ত হন বৈশাখ ১৩১৪ থেকে। উৎসাহী ও কর্মদক্ষ এই ম্যানেজারের সাহায্য রবীন্দ্রনাথের কাজ সহজ করে দিয়েছিল। বিরাহিমপুর পরগণার আটটি ডিহি কাছারি ভেঙে শিলাইদহ সদর বাদে চারটি মণ্ডলী (বিভাগীয় কাছারি) গঠন করা হয়—জানিপুর-বনগ্রাম, কুমারখালি-পাঠি, কয়া-কালোয়া ও সদিরাজপুর-রাধাকান্তপুর—অধ্যক্ষ নিযুক্ত হন যথাক্রমে নলিনী চক্রবর্তী, ভূপেশচন্দ্র রায়, রতিকান্ত দাস ও সতীশচন্দ্র ঘোষ। মুষ্টিভিক্ষার পূর্বোল্লিখিত ব্যবস্থা ছাড়া প্রজাদের খাজনার উপর টাকায় তিন পয়সা হিসাবে 'কল্যাণ-বৃত্তি' ধার্য হয়—জমিদার সমপরিমাণ বা তার বেশি টাকা দিতেন। প্রতি মণ্ডলীতে অধ্যক্ষ বাদে দু'জন হিন্দু ও দু'জন মুসলমান সভ্য নিযুক্ত হতেন। প্রথমে সপ্তাহে দু'বার ও পরে একবার করে এঁরা মিলিত হয়ে কর্মবিধি পরিচালনা করতেন।[১০৭] ৩০ আষাঢ় ১৩১৫ [মঙ্গল 14 Jul 1908] রবীন্দ্রনাথ মনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়কে লেখেন :

আমাদের জমিদারির মধ্যে একটা কাজ পত্তন করে এসেছি। বিরাহিমপুর পরগণাকে পাঁচটা মণ্ডলে ভাগ করে প্রত্যেক মণ্ডলে একজন অধ্যক্ষ বসিয়ে এসেছি। এই অধ্যক্ষেরা সেখানে পল্লীসমাজ স্থাপনে নিযুক্ত। যাতে গ্রামের লোকে নিজেদের হিতসাধনে সচেষ্ট হয়ে ওঠে—পথঘাট সংস্কার করে, জল কষ্ট দূর করে, শালিশের বিচারে বিবাদ নিষ্পত্তি করে, বিদ্যালয় স্থাপন করে, জঙ্গল পরিষ্কার করে, দুর্ভিক্ষের জন্য ধর্ম্মগোলা বসায় ইত্যাদি সর্ব্বপ্রকারে গ্রাম্য সমাজের হিতে নিজের চেষ্টা নিয়োগ করতে উৎসাহিত হয় তারই ব্যবস্থা করা গিয়েছে। আমার প্রজাদের মধ্যে যারা মুসলমান তাদের মধ্যে বেশ কাজ অগ্রসর হচ্ছে—হিন্দু পল্লীতে বাধার অন্ত নেই।[১০৮]

মঙ্গলকর্ম সম্বন্ধে হিন্দু ও মুসলমান প্রজাদের মনোভাবের এই পার্থক্যের কথা রবীন্দ্রনাথ শেষজীবন পর্যন্ত স্মরণ রেখেছিলেন [দ্র 'শ্রীনিকেতনের ইতিহাস ও আদর্শ', পল্লীপ্রকৃতি ২৭।৫৫৪]। এই কারণেই হয়তো হিন্দু-প্রধান বিরাহিমপুর অপেক্ষা মুসলমান-প্রধান কালীগ্রামের জমিদারিতে তাঁর কল্যাণপ্রয়াস অধিকতর সাফল্য লাভ করেছিল।

উচ্চাকাঙ্ক্ষী সুবোধচন্দ্র মজুমদারকে রবীন্দ্রনাথ বিদ্যালয় থেকে সরিয়ে এনে শিলাইদহে জমিদারির কাজে নিযুক্ত করেছিলেন। কিন্তু একটি দুর্ঘটনার জন্য তাঁর কর্মসহায়তা থেকে তিনি বঞ্চিত হলেন। ২৪ পৌষ [বৃহ 9 Jan] তিনি ভূপেন্দ্রনাথকে ঘটনাটির বিবরণ দিয়ে লিখেছেন : 'ভূপেশ সর্বদাই একটা পিস্তলে গুলী ভরিয়া বীররসের চর্চা করিয়া এবং নিরীহ চখাচখিগুলিকে ক্ষত ও আহত করিয়া আনন্দ অনুভব করে। সুবোধের এক আত্মীয় [হরিদাস] ভূপেশের হাত হইতে সেই ভরা পিস্তল লইয়া সুবোধের ছেলেমেয়েদের খেলাচ্ছলে ভয় দেখাইতেছিল —তাহারা তখন ভূপেশের কোলে বসিয়াছিল, গুলী ছুটিয়া গিয়া লতুর [লতিকা] কপালের মধ্যে প্রবেশ করে। তখন সুবোধ আমার কাছে বোটে কাজে নিযুক্ত ছিল। ফিরিয়া যাওয়ার অল্পক্ষণ পরেই লতুর মৃত্যু হইয়াছে। সুবোধ সহজেই অধৈর্য প্রকৃতি—সে ত নিজের শোকের কাছে একেবারে আত্মসমর্পণ করিয়া পড়িয়া আছে—বহু চেষ্টায় তাহার চিত্তে বল সঞ্চার করিতে পারিতেছি না।'[১০৯] সুবোধচন্দ্র অনতিবিলম্বে শিলাইদহ ত্যাগ করেন। ২ মাঘ [বৃহ 16 Jan] রবীন্দ্রনাথ শ্রীশচন্দ্র মজুমদারকে লিখছেন : 'সুবোধ অত্যন্ত অশান্ত হইয়া পড়িয়াছে। সে এখানে ফিরিয়া আসিয়া কাজে যোগ দিতে অক্ষম এইরূপ আমাকে জানাইয়াছে—বোধ করি জয়পুরে অথবা দিল্লিতে কোনো কাজের আশা পাইয়া থাকিবে। সুতরাং আমি এখানে অন্যরূপ বন্দোবস্ত করিতে বাধ্য হইতেছি।'[১১০] তিনি ঠিকই সন্দেহ করেছিলেন। ১৪ চৈত্র [শুক্র 27 Mar] তিনি সুবোধচন্দ্রকে জয়পুরে লিখেছেন : 'মহারাজের স্টেটে তুমি কর্মে প্রবেশ করিয়াছ শুনিয়া আমি অত্যন্ত সুখী ও নিরুদ্বিগ্ন হইলাম। সেখানে ক্রমশ উন্নতি লাভ করিয়া তোমার শক্তির ক্ষেত্র বিস্তার করিতে থাক এই আমি কামনা করিতেছি।'[১১১]

এইসব ব্যক্তিগত সংকটের সঙ্গে দেশের রাজনৈতিক ক্ষেত্রেও সংকট ঘনীভূত হচ্ছিল, রবীন্দ্রনাথ তার থেকে সম্পূর্ণ দূরে থাকতে পারলেন না। বঙ্গভঙ্গ ও বয়কট আন্দোলন নিয়ে বাংলাদেশ যখন বিক্ষুব্ধ, তখন জাতীয় কংগ্রেসের অবাঙালি কিছু নেতা দর্শকের ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। এর ফলে বিপিনচন্দ্র পাল-প্রমুখ বাঙালি নেতারা অসন্তুষ্ট ছিলেন। গোপালকৃষ্ণ গোখলে-র সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত 1905-এর বারাণসী কংগ্রেসে এই নেতাদের চাপে পড়েই বঙ্গভঙ্গ ও শাসকদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রস্তাব নেওয়া হয়। 1906-এ কলকাতায় অনুষ্ঠিত দ্বাবিংশ কংগ্রেসে গরমদলের নেতারা বালগঙ্গাধর টিলককে সভাপতি করতে চেয়েছিলেন, নরমদলের নেতারা কৌশলে সর্বজনমান্য দাদাভাই নৌরজী-কে সভাপতি করে সংকটকে পাশ কাটিয়ে যান। নৌরজী সভাপতির ভাষণে 'Swaraj' শব্দ ব্যবহার করে এবং বয়কট ও জাতীয় শিক্ষা বিষয়ে প্রস্তাব গ্রহণ করে শান্তিবারি সেচনের চেষ্টা করলেও অনেকেই খুশি হননি। পরবর্তী কংগ্রেস বসার কথা ছিল নাগপুরে। গরমদলের প্রার্থী লালা লাজপত রায় পিছিয়ে গেলে তাঁরা টিলককেই সভাপতি করতে চেয়ে অভ্যর্থনা সমিতিতে প্রাধান্য বিস্তার করলেন। বোম্বাইয়ের নরমপন্থী নেতারা এই প্রচেষ্টা বানচাল করতে কংগ্রেসের অধিবেশনের স্থান পরিবর্তন করে সুরাটে নিয়ে যান এবং রাসবিহারী ঘোষকে সভাপতি করার ব্যবস্থা পাকা করে ফেলেন। অরবিন্দ ঘোষ-প্রমুখ চরমপন্থী নেতারা দল বেঁধে সুরাটে যান অধিবেশন পণ্ড করে দেওয়ার

সংকল্প নিয়ে। 26 Dec [বৃহ ১০ পৌষ] পূর্ণ অধিবেশনে অম্বালাল দেশাই রাসবিহারী ঘোষের নাম প্রস্তাব করার পর সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সমর্থন করতে উঠলে গোলমাল শুরু ও সভা মুলতুবি রাখা হয়। পরের দিন সভাপতি ভাষণ পড়তে শুরু করলে টিলক তাঁর নির্বাচনের বৈধতা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন; সেই সময় একটি মারাঠী নাগরা মঞ্চে নিক্ষিপ্ত হয় এবং ফিরোজশা মেটার গা ছুঁয়ে সুরেন্দ্রনাথকে আঘাত করে। মারামারি, চেয়ার-ভাঙা, মাথা-ফাটানো প্রভৃতি দক্ষযজ্ঞের পর পুলিশের আবির্ভাবে অধিবেশনের অকাল-সমাপ্তি ঘটে।

রাজনীতি থেকে সরে আসার জন্য রবীন্দ্রনাথ এবারে প্রতিনিধি নির্বাচিত হননি। কিন্তু শিলাইদহে বসে 'বন্দেমাতরম' কাগজ মারফৎ [এই পত্রিকা তাঁর কাছে রোজ প্রেরিত হত] তিনি কংগ্রেসের এই সংকট সম্পর্কে অবহিত ছিলেন। নরমপন্থী constitutional agitation-এর রাজনীতি সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ তাঁর বিতৃষ্ণার কথা বহুবার ব্যক্ত করেছেন, *Bande Mataram* পত্রিকা ও অরবিন্দ ঘোষ সম্পর্কে সপ্রশংস মনোভাব থেকে চরমপন্থী রাজনীতির প্রতি তাঁর সমর্থন স্পষ্ট হয়ে ওঠে। কিন্তু সুরাটের অভব্যতা তাঁর স্পর্শকাতর চিত্তকে পীড়িত করল—টিলক বা লাজপৎ রায়ও অরবিন্দের পাশে ছিলেন না। বীতশ্রদ্ধ রবীন্দ্রনাথ 'যজ্ঞভঙ্গ' [দ্র প্রবাসী, মাঘ। ৫৭৮-৮০; সমূহ-পরিশিষ্ট ১০।৬৩৫-৩৯] নামক একটি প্রবন্ধ লিখে প্রবাসী-তে প্রেরণ করে ১৯ পৌষ শনি 4 Jan] শ্রীশচন্দ্র মজুমদারকে লিখলেন : 'প্রবাসীর জন্য কন্‌গ্রেস ভাঙার উপরে আমার একটা সংক্ষিপ্ত মন্তব্য জারি করিয়াছি।'[১১২] কয়েকদিন পরে ২৩ পৌষ [বুধ 8 Jan] বিদেশ-প্রবাসী বন্ধু জগদীশচন্দ্রকে আরও বিস্তৃত করে তাঁর মনোভাব জানালেন :

> এবারকার কন্‌গ্রেসের যজ্ঞভঙ্গের কথা ত শুনিয়াছই—তাহার পর হইতে দুই পক্ষ পরস্পরের প্রতি দোষারোপ করিতে দিনরাত্রি নিযুক্ত রহিয়াছে। অর্থাৎ বিচ্ছেদের কাটা ঘায়ের উপর নুনের ছিটা লাগাইতে ব্যস্ত হইয়াছে। কেহ ভুলিবে না, কেহ ক্ষমা করিবে না—আত্মীয়কে পর করিয়া তুলিবার যতগুলি উপায় আছে তাহা অবলম্বন করিবে। কিছু দিন হইতে গবর্মেন্টের হাড়ে বাতাস লাগিয়াছে—এখন আর সিডিশনের সময় নাই—যেটুকু উত্তাপ এত দিন আমাদের মধ্যে জমিয়াছিল তাহা নিজেদের ঘরে আগুন দিতেই নিযুক্ত হইয়াছে। বহুদিন ধরিয়া "বন্দেমাতরম্" কাগজে স্বাধীনতার অভয়মন্ত্রপূর্ণ কোনো উদার কথা আর পড়িতে পাই না, এখন কেবলি অন্য পক্ষের সঙ্গে তাহার কলহ চলিতেছে। এখন দেশে দুই পক্ষ হইতে তিন পক্ষ দাঁড়াইয়াছে—চরমপন্থী, মধ্যমপন্থী এবং মুসলমান—চতুর্থ পক্ষটি গবর্মেন্টের প্রাসাদ-বাতায়নে দাঁড়াইয়া মুচ্‌কি হাসিতেছে। ভাগ্যবানের বোঝা ভগবানেই বয়। আমাদিগকে নষ্ট করিবার জন্য আর কারো প্রয়োজন হইবে না—মর্লিরও নয় কিচেনারও নয়—আমরা নিজেরাই পারিব। আমরা "বন্দে মাতরম্" ধ্বনি করিতে করিতে পরস্পরকে ভূমিসাৎ করিতে পারিব।[১১৩]

[ক্যাশবহিতে দেখা যায়, '১ না° ৬ মাঘ বন্দে মাতরম্ কাগজ' পাঠিয়ে মাঘোৎসবের পর থেকে শিলাইদহে *Indian Daily News* কাগজ পাঠানো আরম্ভ হয়েছে।]

'যজ্ঞভঙ্গ' প্রবন্ধে অবশ্য এতটা তিক্ততা প্রকাশ পায়নি। গৃহবিচ্ছেদের জন্য উভয় পক্ষকে দায়ী করলেও তিনি অভিযোগের তর্জনী তুলেছেন প্রধানত নরমপন্থীদের দিকে : 'এবারকার কন্‌গ্রেসের যাঁহার অধ্যক্ষ ছিলেন তাঁহারা অপ্রিয় বা বিরুদ্ধ সত্যকে স্বীকার করিবেন না বলিয়া ঘর হইতে পণ করিয়া আসিয়াছিলেন। ··· চরমপন্থী বলিয়া একটা দল যে কারণেই হউক দেশে জাগিয়া উঠিয়াছে, এ কথা লইয়া আক্ষেপ করিতে পার কিন্তু ইহাকে অস্বীকার করিতে পার না। ···কিন্তু যখন স্বয়ং সভাপতিমহাশয়ের মন্তব্যেও এই দলের প্রতি কটাক্ষপাত করা হইয়াছিল তখন স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে তিনি নিজের বিরক্তিপ্রকাশকেই কর্তব্যসিদ্ধি বলিয়া মনে করিয়াছেন—অবস্থা বিচার করিয়া মার বাঁচাইয়া কন্‌গ্রেসের জাহাজকে কূলে পৌছাইয়া দেওয়া সম্বন্ধে তাঁহার চিন্তা ছিল না। ইহা যে ওকালতি নহে, বিরুদ্ধ পক্ষকে বক্তৃতার গদাঘাতে পাড়িয়া ফেলাই যে এই বৃহৎ কাজের পরিণাম নহে, দেশের সকল মতের লোককে একত্রে টানিয়া সকলেরই শক্তিকে দেশের মঙ্গলসাধনে

নিয়োগ করিতে উৎসাহিত করাই যে ইহার সকলের চেয়ে বড়ো উদ্দেশ্য তাহা সাময়িক উত্তেজনায় তিনি মনে রাখেন নাই।' চরমপন্থীদের হঠকারিতাকেও তিনি নিন্দনীয় মনে করেছেন। কংগ্রেস-সভার মঞ্চ অধিকারকেই দেশের কাজ মনে না করার অনুরোধ জানিয়ে তিনি উভয় দলের উদ্দেশ্যে লিখলেন : 'কন্‌গ্রেসকে সত্য করিয়া তুলিতে গেলে তাহা কনগ্রেসের মঞ্চে বসিয়াই করা যায় না। দেশের ভিতরে সত্য কার্যে প্রবৃত্ত হইলে, সমস্ত দেশের লোককে গ্রামে গ্রামে ঘরে ঘরে গিয়া সত্যমন্ত্রে দীক্ষিত করিয়া তুলিলে, তবেই সমস্ত দেশের যোগে ওই কংগ্রেস সত্য হইয়া উঠিবে—সেই দিকে চেষ্টা নিযুক্ত করিলে চেষ্টা সার্থক হইবে। কন্‌গ্রেসকে দিনে দিনে বর্ষে বর্ষে দেশের ভিতর দিয়া সত্য করিয়া তুলিব এই চেষ্টাই কোনো-এক পন্থীর হউক।' রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং এই কাজে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন, সেকথা আমরা স্মরণ করতে পারি।

এর অনতিকাল পরে তিনি নিজেই রাজনীতির কেন্দ্রস্থলে এসে পড়লেন। গত বৎসর দীপনারায়ণ সিংহের সভাপতিত্বে বহরমপুরে বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এরই সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সভাপতিত্বে সাহিত্য সম্মিলন হওয়ার কথা ছিল, কিন্তু মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দীর জ্যেষ্ঠপুত্রের অকালমৃত্যুতে সাহিত্য সম্মিলন অনুষ্ঠিত হতে পারেনি। বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মেলন রাজনৈতিক ব্যাপার, ইতিপূর্বে 1897-এ নাটোরে ও 1898-এ ঢাকায় অনুষ্ঠিত সম্মেলনে রবীন্দ্রনাথ সক্রিয়ভাবে যোগ দিলেও পরবর্তী অধিবেশনগুলি সম্পর্কে তাঁর উৎসাহের অভাব দেখা গিয়েছিল। বর্তমান বৎসরে পাবনায় সম্মেলন আহূত হয়। অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি ও সম্পাদক হন দুই ভাই যথাক্রমে আশুতোষ ও যোগেশচন্দ্র চৌধুরী। সুরাট কংগ্রেসের দক্ষযজ্ঞের পর সবার পক্ষে গ্রহণযোগ্য সভাপতি নির্বাচন করাই সমস্যা ছিল। বিশেষত সুরাট কংগ্রেসের আগেই অরবিন্দের নেতৃত্বে 7 Dec 1907 [শনি ২১ অগ্র°] মেদিনীপুরে অনুষ্ঠিত শাখা-সম্মেলনেই যজ্ঞভঙ্গের মহড়া হয়েছিল। সংবাদপত্রগুলি এই সময়ে দাবী ও পালটা দাবীতে মুখর হয়ে ওঠে। এই পরিস্থিতিতে চৌধুরী-ভ্রাতৃদ্বয় রবীন্দ্রনাথের শরণাপন্ন হন এবং তিনি রাজনৈতিক লোক নন বলেই হয়তো শান্তিরক্ষায় সমর্থ হবেন ভেবে রাজি হয়ে যান। ৪ মাঘ [শনি 18 Jan] পাবনায় জমিদার জ্ঞানদাগোবিন্দ চৌধুরীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত অভ্যর্থনা সমিতির সভায় কালীচরণ সেন সভাপতিপদের জন্য রবীন্দ্রনাথের নাম প্রস্তাব করেন এবং প্রস্তাবটি গোপালচন্দ্র সাহা কর্তৃক সমর্থিত ও প্রমদাগোবিন্দ চৌধুরী দ্বারা অনুমোদিত হয়। উপস্থিত ৪৫ জনের মধ্যে চার জন সদস্য ভোটদানে বিরত থাকলে 'amidst shouts of Bande Mataram' প্রস্তাবটি সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।[১১৪] রবীন্দ্রনাথ ২৪ মাঘ [শুক্র 7 Feb] মনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়কে লিখেছেন : 'আমি পদ্মার তীরে নিভৃতে আশ্রয় লইয়াছিলাম—আমার ভাগ্যদেবতা সেই সন্ধান পাইয়া এখানেও তাঁহার এই শিকারটির প্রতি লক্ষ্যস্থাপন করিয়াছেন। আমাকে পাবনার শান্তিপ্রিয় লোক কন্‌ফারেন্সের সভাপতি করিয়াছেন। প্রথমে আপত্তি করিয়াছিলাম কিন্তু আপনি জানেন কোনদিন কোনো আপত্তি করিয়া জয়ী হইতে পারি নাই। আমি চূড়ান্ত ভাবে "না" বলিতে আজও শিখি নাই। যাহা হউক সভাপতি হইয়া শান্তিরক্ষা করিতে পারিব কিনা সন্দেহ। দেশে শান্তি যখন নাই তখন তাহাকে রক্ষা করিবে কে? কলহ করিবে স্থির করিয়াই লোকে এখন হইতে অস্ত্রে শান দিতেছে। যদি অক্ষত দেহে ফিরিয়া আসি খবর পাইবেন।'[১১৫] সম্মেলনের পরে ১১ ফাল্গুন [রবি 23 Feb] রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীকে লেখেন : কন্‌ফারেন্সে আমাকে সভাপতির পদে আহ্বান করার সংবাদ পাইবামাত্র নানা পক্ষ হইতে গালিসংযুক্ত এত বিনামী পত্র পাইয়াছি যে, আমি যে কোন্ দলের লোক তাহা স্থির করা আমার পক্ষে কঠিন হইয়াছিল। মনে করিয়াছিলাম কন্‌ফারেন্স মঞ্চে যখন মাথায় কেহ চৌকি ছুঁড়িয়া মারিবে তখন

তাহাকে হাত জোড় করিয়া বলিব—বাবা, তুমি কোন্ পক্ষের লোক আমাকে বলিয়া যাও—তাহা হইলে আমি যে কোন দলে আছি সে সম্বন্ধে আমার সন্দেহ ঘুচিয়া যায়। চৌকি কেহ মারে নাই এবং দুই দলেই আমাকে বেতন চুকাইয়া দিয়াছেন সুতরাং আজও নিষ্পত্তি হইল না।'[১১৬] সভাপতির ভাষণের শুরুতে তিনি প্রকারান্তরে এইসব কথা বলেছিলেন।

রবীন্দ্রনাথের নির্বাচনের সংবাদ ঘোষিত হলে বেঙ্গলী-তে একটি 'Note' প্রকাশিত হয় 22 Jan [বুধ ৮ মাঘ]-সংখ্যায়। এই লেখায় একশ্রেণীর বাঙালির মনোভাব প্রতিফলিত হয়েছে বলে রচনাটি উদ্ধৃত হল:

As a lyric poet and a powerful prose writer, Babu Rabindra Nath Tagore has few rivals among the living literary men. The width of his imagination and the breadth of his sympathies have, however, destined him to be more than a mere poet. He had been an apostle of new ideas, not only in the regions of industry and education, but also in those of poetical thought. He has been one of the Pioneers of the Swadeshi movement. Education on national lines is not merely an idea with him but he has made it the mission of his life. The conception of Swaraj or self-government in its truest sense is to be found in his political writings. When Rabindra Nath writes or sings, he does so as a poet presenting to his people high ideals for working out their own destinies. He has been one of the formost exponents of self-help and self-reliance even in matters political. He has seldom mixed himself up with turmoils of political life or assumed the role of a political partisan. The election of such a man to preside over the Provincial Conference at the present moment has been a very wise step. The great poet is a messenger of love and peace and is an apostle of nationalism in its loftiest sense, and let us hope that [in] his message our people will restore harmony and amity. We cannot sufficiently admire him for his having accepted this function so soon after a sad bereavement. It must have been a call to duty that has weighed with him in the acceptance of the position.

কিন্তু বিরোধীরও অভাব ছিল না। 19 Jan [৫ মাঘ] পাবনা থেকে জনৈক 'K.P.' রবীন্দ্রনাথের নির্বাচনের বিরোধিতা করে অমৃতবাজার পত্রিকা-য় একটি পত্র প্রেরণ করেন ও সেটি 28 Jan [মঙ্গল ১৪ মাঘ] 'Correspondence' বিভাগে মুদ্রিত হয়। এঁর বক্তব্য এই ছিল যে, যেখানে অধিকাংশ জেলাসমিতি অশ্বিনীকুমার দত্তকে সভাপতি করার পক্ষে মত প্রকাশ করেছিল, সেখানে পাবনার মডারেট উকিল-সম্প্রদায় চৌধুরী-ভাইদের সঙ্গে চক্রান্ত করে অভ্যর্থনা সমিতির অধিবেশনের পূর্বেই শিলাইদহে রবীন্দ্রনাথের কাছে গিয়ে তাঁর সম্মতি আদায় করেন। তাঁর রূপ ও গৌরবর্ণের জন্যই একজন তাঁকে সমর্থন করেন, এই নিয়েও পত্রপ্রেরক ঠাট্টা করেছেন। প্রত্যুত্তরে ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন থেকে সুরেন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত 29 Jan একটি দীর্ঘ পত্র বেঙ্গলী-তে প্রেরণ করেন ও সেটি 1 Feb [শনি ১৮ মাঘ] পত্রিকাটিতে মুদ্রিত হয়। ছাত্রাবস্থায় সুরেন্দ্রনাথ দীর্ঘকাল রবীন্দ্রনাথের কাছ থেকে অর্থসাহায্য পেয়েছিলেন। নাম গোপন করার জন্য পত্রলেখককে ধিক্কার দিয়ে তিনি রবীন্দ্রনাথের বহুমুখী প্রতিভার কথা উল্লেখ করে বর্তমান সংকটে তাঁর মতো নিরপেক্ষ ব্যক্তিকে সভাপতি করাটাই সুবুদ্ধির পরিচয় বলে মত প্রকাশ করেন।

রবীন্দ্রনাথ পত্রটি পড়ে ২০ মাঘ [সোম 3 Feb] সুরেন্দ্রনাথ দাসগুপ্তকে লেখেন:

বেঙ্গলি কাগজে তোমার পত্র পড়িয়া দেখিলাম। আমার সম্বন্ধে তুমি যে অত্যুক্তি প্রয়োগ করিয়াছ তাহাতে আমার প্রতি তোমার হৃদয়ের অনুরাগ প্রমাণ হইতেছে;—যাহাতে কালে তোমাদের এই শ্রদ্ধার উপযুক্ত হইতে পারি মনে সেই কামনা রহিল।

সভাপতির যে অভিভাষণ লিখিয়াছি তাহা কাপি করাইয়া পাঠাইবার চেষ্টা করিব। এত অল্প সময়ের মধ্যে তর্জ্জমা করা শক্ত হইবে—উপযুক্ত লোকের দ্বারা ভালরূপ অনুবাদ না হইলে তাহা প্রকাশের যোগ্য হইবেনা। প্রমথের [? চৌধুরী] দ্বারা হইলে কোনো চিন্তা থাকেনা—কিন্তু প্রমথ বড় বিলম্ব করিবে বলিয়া শঙ্কা করি।[১১৭]

রবীন্দ্রনাথ বাংলায় তাঁর ভাষণ লিখেছিলেন—এই চিঠি থেকে বোঝা যাচ্ছে এর আগেই তাঁর লেখা শেষ হয়ে গিয়েছিল। ইতিপূর্বে দুটি অধিবেশনে তিনি সভাপতির অভিভাষণ বঙ্গানুবাদ করে শুনিয়েছিলেন, কিন্তু

এইবারই প্রথম সভাপতির ভাষণ বাংলায় প্রদত্ত হল।

পাবনায় বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় ২৮-২৯ মাঘ [মঙ্গল বুধ 11-12 Feb], আমরা যথাস্থানে সেই প্রসঙ্গ আলোচনা করব।

দ্বিজেন্দ্রলাল রায় এই সময়ে আর একবার রবীন্দ্র-বিরোধিতায় অবতীর্ণ হলেন 'কাব্যের উপভোগ' [বঙ্গদর্শন, মাঘ। ৪৯৬-৫০০] প্রবন্ধ হাতে করে। তিনি প্রবন্ধটি বঙ্গদর্শন-এ প্রকাশের জন্য পাঠালে সম্পাদক শৈলেশচন্দ্র সম্ভবত শ্রীশচন্দ্র মজুমদারের সঙ্গে এ-বিষয়ে যোগাযোগ করেন, শ্রীশচন্দ্র লেখেন রবীন্দ্রনাথকে। প্রত্যুত্তরে ১৯ পৌষ [শনি 4 Jan] রবীন্দ্রনাথ শ্রীশচন্দ্রকে লেখেন : 'দ্বিজেন্দ্রবাবুর প্রবন্ধ সম্বন্ধে তোমাদের যে মন্তব্য সঙ্গত বোধ হয় তাহা দিবে সেই সঙ্গে আমিও একটি সংক্ষিপ্ত মন্তব্য লিখিতে ইচ্ছা করি এইজন্য শৈলেশকে উক্ত প্রবন্ধ আমার নিকট পাঠাইয়া দিবার জন্য লিখিলাম। প্রবন্ধের কোন অংশ বর্জ্জন বা শোধন করা তোমার পক্ষে সঙ্গত হইবে না—প্রবন্ধের দায়িত্ব তোমার নহে।'[১১৮] দ্বিজেন্দ্রলালের প্রবন্ধ পেয়ে রবীন্দ্রনাথ সে-সম্পর্কে তাঁর মন্তব্য লেখেন এবং 'রবীন্দ্রবাবুর বক্তব্য' [পৃ ৫০১-০৫] নামে সেটি মাঘ-সংখ্যা বঙ্গদর্শন-এ দ্বিজেন্দ্রলালের প্রবন্ধের সঙ্গেই মুদ্রিত হয়।

দ্বিজেন্দ্রলালের রচনাটি ঈর্ষাপরায়ণতা ও কুরুচির একটি প্রকৃষ্টতম উদাহরণ। প্রথমেই জড়িত উপভোগ (passive enjoyment) ও প্রবুদ্ধ উপভোগের (active enjoyment, intelligent appreciation) তাত্ত্বিক পার্থক্য নির্ণয় করে তিনি নিজের প্রবুদ্ধ উপভোগের পরিচয় দিয়েছেন রবীন্দ্রনাথের 'যেতে নাহি দিব' কবিতার বহিরঙ্গমূলক স্থূল ব্যাখ্যা দিয়ে; অতঃপর তাঁর মন্তব্য : 'রবীন্দ্রবাবু যদি আর কোন কবিতা না লিখ্‌তেন—কেবল এইটি,—এই "যেতে নাহি দিব" লিখ্‌তেন, তা হলেও তাঁর কবি-প্রতিভা বঙ্গভাষায় চিরদিন জাজ্বল্যমান থাক্‌তো। এরূপ তাঁর অনেক কবিতা আছে। তাই দুঃখ হয়, যে তাঁর চেলাগণ এই সব রত্ন ছেড়ে আবর্জ্জনা ঘেঁটে বেড়াচ্ছেন।' এরপর তিনি ট্র্যাজেডি ও কমেডি বিষয়ে তাত্ত্বিক আলোচনা করে সিদ্ধান্ত করেন : 'যিনি tragedyই দেখান, তাঁর চেয়ে যিনি মানুষকে আনন্দ, সান্ত্বনা, আশা দেন, তিনি মহত্তর কবি।' এই আলোচনা যেমন হঠাৎ আরম্ভ হয়েছিল, তেমনই আকস্মিকভাবে শেষ হল এই মন্তব্য দিয়ে : 'এইটে বলাই আস্পর্দ্ধা, যে পৃথিবীতে কোন কবির কোন কবিতার ভাব এত বৃহৎ, যে মানুষের ভাষায় তা প্রকাশ করা যায় না, বা সাধারণে তা বুঝতে পারেন না। ভাব সবই প্রায় পুরাতন—পাহাড়ের মত পুরাতন।' বক্তব্যবিন্যাসের এই অসংলগ্নতা তাঁর মানসিক স্থৈর্যের অভাবকেই প্রকটিত করে। এবং এই মনোভাব থেকেই তিনি 'কাব্যের অভিব্যক্তি' প্রবন্ধ লেখার জন্য কৈফিয়ৎ দিতে বসলেন : 'রবীন্দ্রবাবু তাঁর আত্মজীবনীতে Inspiration দাবী করে' যখন নিজের কবিতাবলি সমালোচনা কর্ত্তে বসেছিলেন, তখন তাঁর দম্ভ ও অহমিকায় আমি স্তম্ভিত হয়েছিলাম। তাঁরই উক্তি বঙ্গদর্শনে প্রায় তাঁরই ভাষায় পুনরুক্ত দেখে বঙ্গসাহিত্যের মঙ্গলহিসাবে তার প্রতিবাদ কর্ত্তে বসেছিলাম; এবং উদাহরণ-স্বরূপ রবীন্দ্রবাবুরই কবিতা নিয়েছিলাম। কারণ আমি দেখেছি, যে রবীন্দ্রবাবুর জনকতক নগণ্য চেলা তাঁর উত্তম কবিতাগুলি অনুকরণে অসমর্থ হয়ে তাঁর অর্থহীন কবিতাগুলির অন্ধ অনুকরণে ভাবহীন ঝঙ্কার কর্চ্ছেন।' এর আগেই তিনি সেই 'চেলা'দের উদ্দেশে বলে নিয়েছেন : "রবীন্দ্রবাবুর কাব্য আমি যেরূপ উপভোগ করি, সেই চেলাগণ তাহার দশমাংশও করেন কিনা সন্দেহ। তবে রবীন্দ্রবাবু যা'ই লেখেন তা'তেই "তাধিন তাকি ধিন তাকি, ধিন তাকি, ধিন তাকি, ম্যাও এঁও এঁও বলে' কোরাস দিতে পারি

না—রবীন্দ্রবাবুর বন্ধুত্বের খাতিরেও নয়।" সমালোচনামূলক প্রবন্ধ লেখা ও 'হাসির গান' রচনার মধ্যে যে একটা পার্থক্য আছে, দ্বিজেন্দ্রলাল সম্ভবত সেকথা ভুলে গিয়েছিলেন!

স্বভাবতই এই লেখা রবীন্দ্রনাথকে ক্ষুব্ধ করেছিল। তিনি নিজেই তাঁর 'বক্তব্য'-এর শেষে এই ক্ষোভের কথা স্বীকার করেছেন : 'দ্বিজেন্দ্রবাবুর কোনো লেখা বা আচরণ সম্বন্ধে এমন কোনো মন্তব্য প্রকাশ যাহাতে তাঁহার বিরুদ্ধবাদ আছে আমার পক্ষে অপ্রিয়; —আমি এ কাজটাকে যতখানি আমার কর্ত্তব্য বলিয়া নিজেকে ভুলাইতেছি ইহা ঠিক ততটা বিশুদ্ধ কর্ত্তব্য নিশ্চয়ই নহে; —নিশ্চয়ই আমার ব্যক্তিগত ক্ষোভের অধৈর্য্যও ইহার মধ্যে প্রচুর পরিমাণে আছে;—নিজের দুর্ব্বলতায় আঘাত লাগিলে আমাদের কর্ত্তব্যবুদ্ধি হঠাৎ অত্যন্ত তীব্র ও সজাগ হইয়া উঠে তাহাকে বিশ্বাস করা যায় না। কিন্তু দ্বিজেন্দ্রবাবু এ কথা মনে রাখিবেন এই ক্ষোভের দ্বারাতেও আমি তাঁহার বা তাঁহার বন্ধুদের সম্মানহানি করিতে চাহি নাই'।

দ্বিজেন্দ্রলালের খেউড়-সদৃশ সমালোচনার উত্তরে রবীন্দ্রনাথের একমাত্র প্রকাশ্য 'বক্তব্য' ভাষার ও মানসিকতার আভিজাত্যে তুলনাহীন। তিনি লিখলেন : 'আমার কোনো বিশেষ কবিতা ভাল কি মন্দ, তাহা সুবোধ কি দুর্বোধ, সে সম্বন্ধে যদি বা আমার বলিবার কিছু থাকে তাহা না বলিলেও চলে। ভাল কবিতা না লিখিতে পারাকে ঠিক অপরাধ বলিয়া ধরা যায় না। যে ত্রুটি ধর্ম্মবিরুদ্ধ নহে যাহাতে কেবলমাত্র অক্ষমতা প্রকাশ পায় তাহার জন্য কৈফিয়তের চেষ্টা করা অনাবশ্যক।' তবু তিনি বক্তব্য প্রকাশ করতে বসেছেন তার কারণ, 'দ্বিজেন্দ্রবাবুর প্রবন্ধের শেষভাগে তিনি আমার প্রতি যে কলঙ্ক আরোপ করিয়াছেন তাহা সামান্য নহে। কারণ সেটা কবিত্ব লইয়া নয়, চরিত্র লইয়া।'

দ্বিজেন্দ্রলাল ইতিপূর্বে পত্রের মাধ্যমে রবীন্দ্রনাথের আত্মজীবনীতে Inspiration দাবী করার মধ্যে অহমিকার সন্ধান পেয়ে তাঁকে অভিযুক্ত করেছিলেন, 'কাব্যের উপভোগ'-এও একই অভিযোগের পুনরাবৃত্তি করেন। রবীন্দ্রনাথ অধ্যাপক কেয়ার্ডের গ্রন্থ থেকে একটি উদ্ধৃতি দিয়ে লিখলেন : 'যে আইডিয়া সম্বন্ধে আমরা প্রথমে অচেতন ছিলাম তাহাই যে আমাদিগকে বলাইয়াছে ও করাইয়াছে এবং আমাদের অপরিণত অবস্থারও কথা ও কাজকে আমাদের অজ্ঞাতসারে সেই আইডিয়ারই শক্তি প্রবর্ত্তিত করিয়াছে—আমার ক্ষুদ্র আত্মজীবনীতে এই কথাটার উপলব্ধিকে আমি কোনো একরকম করিয়া বলিবার চেষ্টা করিয়াছি। কথাটা সত্য কি মিথ্যা সে কথা স্বতন্ত্র কিন্তু ইহা অহঙ্কার নহে, কারণ, ইহা কাহারো একলার সামগ্রী নহে।' তবু নিজের অজ্ঞাতসারে দুর্বল প্রকৃতির অন্তর্নিহিত অহংকার অসংগত ও অন্যায় আকারে প্রকাশ হয়ে থাকতে পারে, একথা স্বীকার করে নিয়ে তিনি লিখলেন : 'আমার সেইরূপ বিকৃতি যদি লক্ষিত হইয়া থাকে তবে দ্বিজেন্দ্রবাবু তাহার শাস্তি দিতে কিছুমাত্র আলস্য করেন নাই ইহা নিশ্চিত। তিনি প্রবন্ধে ও গানে, সভাস্থলে ও মাসিকপত্রে, এবং যে ব্যঙ্গ ইতিপূর্ব্বে কদাচ কোনো ব্যক্তিবিশেষের মর্ম্মভেদ করিবার জন্য নিক্ষিপ্ত হয় নাই সেই ব্যঙ্গে ও ভর্ৎসনায় অশ্রান্তভাবে আমার লাঞ্ছনা করিতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হন নাই।' দ্বিজেন্দ্রলালের জীবনীকার দেবকুমার রায়চৌধুরী রবীন্দ্রনাথের বক্তব্যের প্রতিবাদ করে লিখেছেন, দ্বিজেন্দ্রলাল সভা-সমিতিতে 'ব্যঙ্গ' বা 'ভর্ৎসনা' প্রভৃতি কিছুই করেননি।[১১৯] কিন্তু সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় লিখেছেন, অমৃতলাল বসুর আহ্বানে স্টার থিয়েটারে অনুষ্ঠিত পূর্ণিমা-মিলনের অধিবেশনে [পঞ্চম অধিবেশন : ৩০ শ্রাবণ ১৩১২ মঙ্গল 15 Aug 1905] দ্বিজেন্দ্রলালই ঘোষণা করেন দেবকুমার রবিঠাকুরের ঢঙে 'সোনার তরী' কবিতা আবৃত্তি করবেন, যার প্রতিবাদে নাট্যকার গিরিশচন্দ্র সভা ত্যাগ করে চলে গিয়েছিলেন।[১২০*] 'হাসির গান' [১৩০৭]-এ মুদ্রিত

‘এখনো তারে চোখে দেখি নি’ বা ‘আমি নিশিদিন তোমায় ভালোবাসি’ গানের প্যারডি নিছকই কৌতুক—‘তোমরা ও আমরা’ কবিতার প্যারডি ‘আমরা ও তোমরা’ রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং সাধনা-য় প্রকাশ করেন—কিন্তু হাসির গান-এর চতুর্থ সংস্করণে [19 Mar 1910: ৫ চৈত্র ১৩১৬] মুদ্রিত ‘কবি’ [‘আমি একটা উচ্চ কবি, এমনই ধারা উচ্চ’] দ্বিজেন্দ্রলাল ব্যঙ্গের উদ্দেশ্যেই রচনা করেছিলেন, কোনো পত্রিকাতে নিশ্চয়ই প্রকাশিতও হয়েছিল। বর্তমানে অপ্রাপ্য কিছু পত্রিকায় যে এইরূপ লেখা ও সংবাদ প্রকাশিত হত তা অনুমান করা যায় সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের লেখা থেকে : “বঙ্গবাসীর ‘অবতার’ হইতে আরম্ভ করিয়া মাসিকে সাপ্তাহিকে, গদ্যে পদ্যে, সভায়, মজলিষে, ব্যক্তিগত আক্রমণের যে ন্যক্কারজনক ধারা আজ পর্য্যন্ত গড়াইয়া আসিয়াছে তাহা আর গড়াইতে দেওয়া উচিত নহে।”[১২১] দ্বিজেন্দ্রলালের গয়া-প্রবাসের সময় যে পূর্ণিমা মিলনের অনুষ্ঠান বন্ধ হয়ে গিয়েছিল, বহুদিন পরে ৩ অগ্র° [মঙ্গল 19 Nov] রাসপূর্ণিমার সন্ধ্যায় ৩০-৩ মদন মিত্র লেনে দীনবন্ধু মিত্রের বাড়িতে তার একটি অধিবেশন বসে[১২২]—আমাদের অনুমান, ‘কাব্যের উপভোগ’-এর প্রেরণা দ্বিজেন্দ্রলাল এই অধিবেশন থেকেই লাভ করেন রবীন্দ্রনাথ তখন মুঙ্গেরে মৃত্যুপথযাত্রী পুত্রের শুশ্রূষায় ব্যস্ত।

রবীন্দ্রনাথ মাসিকপত্রে স্ব-কৃত দ্বিজেন্দ্রলালের কাব্যসমালোচনাগুলির কথা উল্লেখ করে লিখেছেন, সেই ‘অপ্রবুদ্ধ’ উপভোগের বিবরণ পড়ে অনেকেই তাঁকে দ্বিজেন্দ্রলালের অযথা স্তাবক বলে অপবাদ দিয়েছিলেন [বস্তুত প্রিয়নাথ সেনের একটি তারিখহীন পত্রে এইরূপ ইঙ্গিতই আছে দ্র চিঠিপত্র ৮।২৭৪-৭৫]। কিন্তু ‘যেখানে উপভোগ সেখানে স্তব যে আপনি আসে’—উপরন্তু মতান্তরের পটভূমিকায় তিনি পত্রিকায় প্রকাশিত নিন্দার অংশগুলি ‘আধুনিক সাহিত্য’ গ্রন্থে বর্জন করেন। কিন্তু স্তাবকতা তাকেই বলে ‘যেখানে স্তবটা দোকানদারি’, ভালোলাগার আনন্দের স্বাভাবিক প্রকাশকে স্তাবকতা বলে না। ‘তিনি যে কাব্যকে ভালবাসেন না অন্যে যদি সেই কাব্য হইতে রস পাইয়া থাকেন তবে দ্বিজেন্দ্রবাবু তাহাকে অপ্রবুদ্ধ উপভোগ বলিয়া তৃপ্তিলাভ করিতে পারেন কিন্তু অন্য পক্ষকে যদি স্তাবক বা চেলা বলিতে তিনি কোনো সঙ্কোচ বোধ না করেন তবে তাঁহাকে বিদ্বেষক বলিলে তিনি বিরক্ত হন কেন?’

বস্তুত ‘কাব্যের উপভোগ’ প্রবন্ধ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের তথাকথিত ‘চেলা’দেরই ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠা স্বাভাবিক ছিল, কিন্তু স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ ‘বক্তব্য’ প্রকাশে অগ্রসর হওয়ায় তাঁরা ক্ষোভ দমন করেছিলেন। কিন্তু জ্যৈষ্ঠ ১৩১৬-সংখ্যা সাহিত্য-তে ‘কাব্যে নীতি’ প্রবন্ধে দ্বিজেন্দ্রলাল যখন পুনরায় রবীন্দ্র-বিদূষণে অবতীর্ণ হলেন, তখন রবীন্দ্রানুরাগীরা তাঁকে সহজে ছেড়ে দেননি। রবীন্দ্রনাথ অবশ্য এই একবারই প্রকাশ্যে মুখ খুলেছিলেন, পরবর্তী সমস্ত বিষোদ্গারকে তিনি উপেক্ষা করেছেন। তাঁর মনোভাবটি বোঝা যায় ৮ ফাল্গুন [বৃহ 20 Feb 1908] মনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়কে লিখিত পত্রে : ‘ও সব কথা আর তুলবেন না—যা প্রবাহিত হয়ে যাচ্ছে তাকে যেতে দিন—জীবনে কত স্তুতি নিন্দা কত সম্মান অপমানের মধ্যে দিয়ে আজ প্রায় পঞ্চাশের পারে এসে ঠেকেছি—সদ্য যেটাকে অত্যন্ত বড় এবং কঠিন ও দুঃসহ বলে মনে হয়েছে সে সমস্তই ছায়ার মত হয়ে গেছে—এমনি করে একদিন সমস্ত বাদ বিবাদের বাইরে ভেসে চলে যাব তার পরে যা সত্য তাই স্থির হয়ে থাকবে—তাতে আমার ব্যক্তিগত কোনো লাভও থাকবে না কোনো লোকসানও থাকবে না। দ্বিজেন্দ্রবাবু আমাকে কিছু বলে নিয়েছেন আমিও তাঁকে কিছু বলে নিয়েছি। তারপরে এইখানেই খেলাটা শেষ হয়ে গেলেই চুকে যায়—অন্তত আমি ত এইখানেই চুকিয়ে দিলুম।’[১২৩] কিন্তু দ্বিজেন্দ্রলাল ব্যাপারটা চুকিয়ে দেননি, বিতর্ক

একটু থিতিয়ে আসার উপক্রম হলেই তিনি নূতন করে বিতর্কের অবতারণা করেছেন। অজিতকুমার চক্রবর্তীর উপর রবীন্দ্রনাথের কিছু নিয়ন্ত্রণ ছিল, তাঁকে কোনো বিতর্কে দেখা যায়নি—দ্বিজেন্দ্রলালের বিরুদ্ধে যে রবীন্দ্রানুরাগীরা অস্ত্রধারণ করেছিলেন, কলকাতাবাসী সেই ভক্তদের অনেকেই রবীন্দ্রনাথের স্নেহধন্য হলেও তাঁদের মতামতের উপর তাঁর কোনো প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণ ছিল না।

মাঘ মাসে বিভিন্ন মাসিক পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথের অনেকগুলি রচনা মুদ্রিত হয়েছিল। রচনাগুলি হল :

প্রবাসী, মাঘ ১৩১৪ [৭।১০] :

৫৩৫-৪৪ 'গোরা' ১৫-১৬ দ্র গোরা ৬।১৮৫-৯৭ [১৪-১৫]

৫৭৮-৮০ 'যজ্ঞভঙ্গ' দ্র সমূহ-পরিশিষ্ট ১০।৬৩৫-৩৯

বঙ্গদর্শন, মাঘ ১৩১৪ [৭।১০] :

৪৭১-৭৩ 'শক্তি' দ্র ভারতপথিক রামমোহন রায় [১৩৭৯]। ১১৭-১৮ [আংশিক]

৫০১-০৫ 'রবীন্দ্রবাবুর বক্তব্য'

১৯ পৌষ রবীন্দ্রনাথ শ্রীশচন্দ্র মজুমদারকে লিখেছিলেন : 'এবার বঙ্গদর্শনের জন্য একটি ছোট্ট লেখা পাঠাইয়াছি'[১২৪]—সেই লেখাটি হল 'শক্তি', যা আজও বঙ্গদর্শন-এর জীর্ণ পৃষ্ঠার মধ্যেই পড়ে রয়েছে।

রামমোহনের মৃত্যুবার্ষিকীতে রবীন্দ্রনাথ যা বলেছিলেন, এই প্রবন্ধে তারই পুনরাবৃত্তি করে তিনি লিখেছেন, য়ুরোপের জ্ঞানের ঐশ্বর্য যখন দেশের নূতন ইংরেজি শিক্ষিত লোকদের অভিভূত করে দিয়েছিল, তখন রামমোহনই আমাদের স্বজাতির পৈতৃক জ্ঞানভাণ্ডারের দ্বার উন্মুক্ত করে দিয়ে আমাদের নিজের অধিকারের ক্ষেত্র দেখিয়ে দেন। 'এই আমাদের স্বদেশীয় অধিকারের পথেই যাত্রা করিয়া আজ বিবেকানন্দ প্রভৃতি মনস্বী এবং সেই সঙ্গে আমাদের সমস্ত দেশ, ইস্কুলের ছাত্রভাবকে কাটাইয়া পৃথিবীর জ্ঞানিসভায় নিজের গৌরবে প্রবেশ করিতেছে।··· সম্পদকে নিজের মধ্যে অনুভব করিলে কেবল যে গৌরব বৃদ্ধি হয় তাহা নহে, শক্তি বৃদ্ধি হয়।' আজ য়ুরোপ কামান-বন্দুক জাহাজের মাস্তুল উঁচু করে তার শক্তির মূর্তিতে আমাদের অভিভূত করে দিচ্ছে। এই সময়ে আমাদের আর-একজন রামমোহন চাই যিনি আমাদের শক্তির অধিকারকে আত্মগৌরবে উন্মুক্ত করে দেবেন। যিনি বুঝিয়ে দেবেন, কামান-বন্দুক জাহাজ-রেলগাড়ি মানুষের চিত্তসমুদ্রের ফেনা ও বুদ্বুদ মাত্র। সেই মহাপুরুষ এই বিশ্বাস সঞ্চার করিয়ে দেবেন যে, জাতির অন্তঃকরণের মধ্যেই নিজের শক্তি নিহিত আছে—তা ত্যাগ করবার শক্তি, তা প্রাণ দেবার শক্তি, তা বিশ্বাস ও নিষ্ঠা। এই অন্তরতর শক্তিকে উদ্বোধিত করে তুললে তবেই আমরা অন্য প্রবল শক্তির দৃষ্টান্তকে অকুণ্ঠিত পৌরুষের সঙ্গে গ্রহণ করতে পারব, নইলে কেউ দয়া করে দিলেও নিতে পারব না। 'নিজের শক্তিকে না জাগাইয়া অন্যের শক্তির কাছে হাত পাতিতে গেলেই শক্তিকে শুধু যে পাওয়া যায় না তাহা নহে, শক্তির অপমান হয়, শক্তির বিনাশ ঘটে।'

এইরূপ একটি প্রবন্ধ রবীন্দ্রনাথ কেন লিখতে গেলেন, বলা শক্ত। বোমার রাজনীতি ইতিমধ্যেই শুরু হয়ে গিয়েছিল—উল্লাসকর দত্ত [1885-1965] তখন বোমা প্রস্তুতপ্রণালী আয়ত্ত করতে ব্যস্ত—6 Dec 1907 [শুক্র ২০ অগ্র°] মেদিনীপুরে নারায়ণগড়ের কাছে রেললাইনে ডিনামাইট পুঁতে রেখে বাংলার ছোটলাট অ্যান্ড্রু ফ্রেজারের স্পেশাল ট্রেন উড়িয়ে দেবার ব্যর্থ চেষ্টাও হয়ে গেছে। 'যুগান্তর' পত্রিকা খোলাখুলি সশস্ত্র বিপ্লবের

আহ্বান প্রচার করত। জার্মানী, চীন, জাপান প্রভৃতি দেশ থেকে অস্ত্র সংগ্রহ করে বিপ্লব প্রচেষ্টার কথা হাওয়ায় ভেসে বেড়াচ্ছিল। ফরাসী বিপ্লব, ইটালিতে ম্যাৎসিনি-গ্যারিবল্ডির দেশমুক্তির সাধনা, আয়ার্ল্যাণ্ডের স্বাতন্ত্র্য-অর্জনের ইতিবৃত্ত, জাপানের ক্রমোন্নতির ইতিহাস প্রভৃতি তরুণদের ধমনীতে রক্তপ্রবাহ দ্রুতসঞ্চালিত করত। রবীন্দ্রনাথ সম্ভবত এই-সব কথা স্মরণ করেই লিখলেন : 'যেখানেই আমাদের মনুষ্যত্ব, আমাদের নিজের শক্তি প্রচ্ছন্ন হইয়া আছে, শিক্ষার দ্বারা দীক্ষার দ্বারা ধর্মের দ্বারা কর্মের দ্বারা সেইখানেই খনি খনন করিয়া দ্বার মোচন করিয়া প্রবেশ করিতে হইবে। নহিলে অন্যদেশের ইতিহাস আমাদের পক্ষে কেবলমাত্র ইস্কুলের বই এবং অন্য দেশের শক্তি আমাদের পক্ষে কেবল শক্তিশেল হইয়া থাকিবে। এ পথে বিলম্ব হইবে বলিয়া যদি শঙ্কা কর তবে একথা মনে রাখিয়ো, অন্য সকল পথেই ব্যর্থ হইতে হইবে।'

সঙ্গীত-প্রকাশিকা, মাঘ ১৩১৪ [৭।৫] :

৮৯-৯০ ভৈরবী-তেওরা। আজ বুকের বসন ছিঁড়ে ফেলে দ্র স্বর ৫০

৯১-৯৩ কানাড়া-একতালা। যারা কাছে আছে তারা কাছে থাক্ দ্র ঐ ২৫

৯৪-৯৫ ভৈরবী-একতালা। অন্তর মম বিকশিত কর অন্তরতর হে দ্র ঐ ২৪

তিনটি গানেরই স্বরলিপিকারের নাম উল্লেখিত হয়নি; ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি গ্রন্থে অন্তর্ভুক্তির জন্য অনুমান করা যায়, শেষ দুটি গানের স্বরলিপি করেছিলেন কাঙালীচরণ সেন।

৭ পৌষ [সোম 23 Dec 1907] রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনের সপ্তদশ সাম্বৎসরিক ব্রহ্মোৎসবে যোগদান করেননি, কিন্তু ১১ মাঘ [শনি 25 Jan 1908] তিনি কলকাতায় অষ্টসপ্ততিতম সাম্বৎসরিক ব্রাহ্মসমাজের আমন্ত্রণ গ্রহণ করেন। এ ব্যাপারেও তাঁর দ্বিধা ছিল; ১৯ পৌষ শ্রীশচন্দ্র মজুমদারকে লিখেছিলেন : 'আমি এবার ১১ই মাঘে কলিকাতায় যাইব কিনা এখনো সম্পূর্ণ মন স্থির করি নাই। যদি যাই তবে আবার এখানে ফিরিতে হইবে— কারণ অন্তত মাঘের শেষ পর্যন্ত আমাকে এখানে কাটাইতে হইবে—অনেককাল পরে পদ্মার সহিত আমার পুনর্ম্মিলনের দীর্ঘ অবকাশ ঘটিয়াছে, যতদিন পারি এইখানে কাটাইয়া যাইব।ফাল্গুনে বোলপুরে হাজির হইব।'[১২৫] কিন্তু ৪ মাঘ [শনি 18 Jan] অজিতকুমার চক্রবর্তীকে লেখেন : '১১ই মাঘে যদি কলকাতায় যাও তবে আদি ব্রাহ্মসমাজে প্রাতঃকালীন উপাসনায় উপস্থিত থাকিয়ো সেইখানে আমার সঙ্গে দেখা হইবে। আমি একদিন মাত্র কলিকাতায় থাকিব।'[১২৬] কিন্তু এই চিঠি লেখার পরেই তিনি জানতে পারেন, ৯ মাঘ [বৃহ 23 Jan] সত্যপ্রসাদের পুত্র সুপ্রকাশের ও গগনেন্দ্রনাথের পুত্র কনকেন্দ্রনাথের বিবাহ। তার ফলে ঐদিনই ভূপেন্দ্রনাথকে লেখেন : 'আমাকে কলিকাতায় ৮ই মাঘে যাইতে হইবে। পুনশ্চ ১২।১৩ই এখানে ফিরিব।'[১২৭]

৮ মাঘ [বুধ 22 Jan] রবীন্দ্রনাথ কলকাতায় আসেন, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ তাঁর ডায়ারিতে লেখেন : 'রবি এসেছেন।' অল্পবয়স থেকেই জ্যোতিরিন্দ্রনাথের ডায়ারি লেখার অভ্যাস ছিল। কিন্তু পরবর্তীকালে তিনি নিজেই জীর্ণ কীটদষ্ট অনেক ডায়ারি বিনষ্ট করেন।* তিনি সংক্ষেপে স্থূল ঘটনাগুলিই লিখে রাখতেন, কাজেই ডায়ারিগুলির সাহিত্যমূল্য নগণ্য—কিন্তু ঐতিহাসিক মূল্য অপরিসীম। রবীন্দ্রনাথের জীবনকথার দিক দিয়েও এগুলি প্রয়োজনীয় উপকরণ। অনেকে এমন ধারণা প্রচার করেছেন, কাদম্বরী দেবীর মৃত্যুর পর জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্রনাথের সম্পর্ক ক্ষীণ ও তিক্ত হয়ে গিয়েছিল। এই ধারণার বিরুদ্ধে অন্যান্য বহু প্রমাণের সঙ্গে এই

ডায়ারিগুলিকেও সাক্ষী হিসেবে দাঁড় করানো যায়। জ্যোতিরিন্দ্রনাথকে লেখা রবীন্দ্রনাথের সামান্য কয়েকটি চিঠি রক্ষিত হয়েছে—কিন্তু ডায়ারিতে আরও চিঠি পাওয়ার কথা জানা যায়। উভয়ের বিভিন্ন উপলক্ষে সাক্ষাতের বর্ণনাও এগুলিতে আছে। আমরা পরে বিভিন্ন প্রসঙ্গে এই ডায়ারির তথ্য ব্যবহার করার সুযোগ পাব। রবীন্দ্রভবনে এইরূপ বারোটি ডায়ারি রক্ষিত আছে।

৯ মাঘ [বৃহ 23 Jan] সুপ্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায়ের সঙ্গে তনুজা দেবীর বিবাহ হয়। এই 'বিবাহে যৌতুক দিবার জন্য বাবু মহাশয়ের নিকট দেওয়া হয় গিণী ৪ থান।' সুরমা দেবীর সঙ্গে কনকেন্দ্রনাথের বিবাহে 'আইবড় ভাত দিবার ঢাকাই ধুতি···চাদর' প্রভৃতির হিসাব রবীন্দ্রনাথের ক্যাশবহিতে পাওয়া যায়।

১১ মাঘ [শনি 25 Jan] অষ্টসপ্ততিতম সাম্বৎসরিক ব্রাহ্মসমাজ উপলক্ষে আদি ব্রাহ্মসমাজ গৃহে প্রাতঃকালীন উপাসনায় রবীন্দ্রনাথ, প্রিয়নাথ শাস্ত্রী ও জ্ঞানচন্দ্র ভট্টাচার্য বেদী গ্রহণ করেন। সঙ্গীতাদির পর 'স্বাধ্যায়ন্তে শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় তাঁহার স্বাভাবিক সুমধুর কণ্ঠে একটি অতি হৃদয়গ্রাহী সময়োপযোগী বক্তৃতা করেন।' জ্যোতিরিন্দ্রনাথ তাঁর ডায়ারিতে লেখেন : 'সকালে রবির বক্তৃতা বেশ হয়েছিল—"দুঃখের প্রয়োজন" এই বিষয়ে।—গান তেমন ভাল হয় নি।' রবীন্দ্রনাথের বক্তৃতাটি 'দুঃখ' [দ্র বঙ্গদর্শন, ফাল্গুন। ৫৩১-৩৯; তত্ত্ব°, চৈত্র। ১৮৫-৯৩; ধর্ম ১৩।৪০০-১০] নামে মুদ্রিত হয়।

বিশ্বরাজ্যে দুঃখ কেন আছে, জগৎসংসারের বিধান সম্বন্ধে ভাবতে গেলে এই প্রশ্নই আমাদের সর্বাধিক আন্দোলিত করে। মা-বোন-ভাইয়ের অকালমৃত্যুতে ব্যথিত মাধুরীলতা 13 Jul 1914 [২৯ আষাঢ় ১৩২১] বন্ধু অনুরূপা দেবীকে একটি চিঠিতে লিখেছিলেন : 'তাতে সমস্ত হৃদয় জুড়ে একটা তুমুল বিদ্রোহ জেগে উঠেছিল, কেবল মনে প্রশ্ন উঠত, কেন এমন হ'ল? অসময়ে এদের জীবনপ্রদীপ কেন নিভে গেল? কোন্ মহৎ অপরাধের জন্যে এ কঠোর শাস্তি ভোগ করতে হচ্ছে? মায়ের মত এমন পুণ্যবতী সতী কেন এত যন্ত্রণা পেলেন? তবে কি ভগবান্ আনন্দময় মঙ্গলময় নন, তিনি কি শুধু ধ্বংস করবার সুখের জন্য জগৎ সৃজন করেছেন? বাবা কত উপদেশ দিয়েছেন, সঙ্গে নিয়ে কত উপাসনা করেছেন, তবু সব সন্দেহ দ্বিধা দূর করতে পারেন নি'।[১২৮] 'দুঃখ' প্রবন্ধটি হয়তো সেই 'সন্দেহ দ্বিধা'র উত্তর। রবীন্দ্রনাথ বললেন : 'দুঃখের তত্ত্ব আর সৃষ্টির তত্ত্ব যে একেবারে একসঙ্গে বাঁধা। কারণ, অপূর্ণতাই তো দুঃখ এবং সৃষ্টিই যে অপূর্ণ আর 'জগৎ অপূর্ণ বলিয়াই তাহা চঞ্চল, মানবসমাজ অপূর্ণ বলিয়াই তাহা সচেষ্ট, এবং আমাদের আত্মবোধ অপূর্ণ বলিয়াই আমরা আত্মাকে এবং অন্য সমস্তকে বিভিন্ন করিয়াই জানি। কিন্তু সেই চাঞ্চল্যের মধ্যেই শান্তি, দুঃখচেষ্টার মধ্যেই সফলতা এবং বিভেদের মধ্যেই প্রেম।' মানুষ সত্যপদার্থ যা কিছু পায় তা দুঃখের দ্বারা পায় বলেই তার মনুষ্যত্ব। সে শুধু চেয়ে কিছু পায় না, দুঃখ করে পায়। আর সব ধন ঈশ্বরের, কেবল দুঃখের ধনটি মানুষের আপনার—সেইটি ঈশ্বরকে অর্পণ করলে তিনি আনন্দ দিয়ে সমস্ত অপূর্ণকে পূর্ণ করে দেন। দুঃখের এই দর্শন খেয়া-র যুগ থেকে শুরু হয়েছিল—২৮ শ্রাবণ ১৩১২ তারিখে রচিত 'আগমন' [দ্র খেয়া ১০।১০৩-০৫] কবিতায় রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'দুঃখরাতের রাজা'কে শূন্য ঘরে অভ্যর্থনা করেছিলেন— 'শারদোৎসব' 'গীতাঞ্জলি' 'রাজা' প্রভৃতি নাটকে ও কবিতায় এই দুঃখ-দর্শনই বিচিত্ররূপে প্রকাশিত হয়েছে। 'দুঃখ' রচনাটি অবশ্য অনেক আগের লেখা হতে পারে। প্রিয়ম্বদা দেবীর চিঠিতে একটি অকালমৃত্যুর কথা জেনে রবীন্দ্রনাথ ৪ কার্তিক [সোম 21 Oct] ভূপেন্দ্রনাথ সান্যালকে লিখেছিলেন:

দুঃখই আমাদের আপনার ধন—কারণ অপূর্ণতার নিত্য সহচর—আর যাহা কিছু, ঈশ্বর আমাদিগকে দান করিয়াছেন; কেবল দুঃখই আমাদের নিতান্ত স্বকীয় অতএব আমরা বড় জিনিস যাহা কিছু চাই এই দুঃখ দিয়া কিনিতে হইবে। আমাদের ভক্তি প্রীতি ধর্ম ঈশ্বর সমস্তেরই মূল্য দিবার সময় দুঃখ ছাড়া আমাদের আর কোনো যথার্থ নিজস্ব সম্বল নাই। দুঃখ দিয়া আনন্দও কিনিতে হইবে। অতএব ঈশ্বরের দিকে তাকাইয়া দুঃখকে মাথায় করিয়া লইলে তবেই তাঁহাকে কিছু দিতে পারি। তাঁহাকে ফুল দিই সে ত তাঁহারই ফুল—কিন্তু দুঃখ, এ যে আমাদেরই দুঃখ। ···ঈশ্বর তাঁহার পরিপূর্ণতার ধন লইয়া আছেন—আমাদেরও অপূর্ণতার ধন আছে—এই ধনে আমরাও ধনী; ইহাই দুঃখ—এই ধনেরই বিনিময়ে আমরা ঈশ্বরের ধন দাবী করিতে পারি—আমাদের আর কিছুই নাই।[১২৯]

—এই ভাবনাই 'দুঃখ' প্রবন্ধে পূর্ণাঙ্গ রূপ লাভ করেছে, মনে হয়।

মহর্ষিভবনে অনুষ্ঠিত সায়ংকালীন উপাসনায় রবীন্দ্রনাথের কোনো বিশেষ ভূমিকা ছিল না। উভয় অধিবেশন মিলিয়ে মোট একুশটি ব্রহ্মসংগীত গীত হয়, তার মধ্যে রবীন্দ্রনাথের রচনা পনেরোটি। এর মধ্যে পূর্বে মাঘোৎসবে গীত গান ছাড়া, নৈবেদ্য ও খেয়া-র অনেকগুলি কবিতা আছে যেগুলিতে সম্ভবত কার্তিক মাসে সুর যোজনা করা হয়। আবশ্যকীয় তথ্য-সহ গানগুলির তালিকা দেওয়া হল :

[১] ভৈরবী-তেওরা। আজ বুকের বসন ছিঁড়ে ফেলে দ্র গীত ৩।৮৯৬; খেয়া ১০।১৪৪, 'বিকাশ', রচনা : ২৫ মাঘ ১৩১২ [7 Feb 1906] শিলাইদহ; তত্ত্ব°, ফাল্গুন। ১৭৮-৭৯; সঙ্গীত-প্রকাশিকা, মাঘ। ৮৯-৯০; স্বর ৫০

[২] আশোয়রী-একতালা। আমি কেমন করিয়া জানাব দ্র গীত ১।৩৩-৩৪; খেয়া ১০।১৪১-৪২, 'মিলন', রচনা : ২৩ মাঘ ১৩১২ শিলাইদহ; তত্ত্ব°, ফাল্গুন। ১৭৯; সঙ্গীত-প্রকাশিকা, পৌষ। ৮৪-৮৬; স্বর ২৪

[৩] ভৈরবী-একতালা। অন্তর মম বিকশিত কর অন্তরতর হে দ্র গীত ১।৫৩; বঙ্গদর্শন, পৌষ। ৪৭০, 'প্রার্থনা', রচনা : ২৭ অগ্র°, শিলাইদহ তত্ত্ব°, ফাল্গুন। ১৭৯; সঙ্গীত-প্রকাশিকা, মাঘ। ৯৪-৯৫; স্বর ২৪

এই গানগুলি প্রাতঃকালীন উপাসনায় গাওয়া হয়েছিল। বাকি গানগুলি সায়ংকালীন উপাসনায় গীত।

[৪] পূরবী-ধামার। বীণা বাজাও হে মম অন্তরে দ্র গীত ১।১৬৮; তত্ত্ব°, ফাল্গুন। ১৭৯; সঙ্গীত-প্রকাশিকা, পৌষ। ৭৫; স্বর ২৫; মূল গান : বীণ বজায় রে মন লে গয়ে দ্র গবেষণা-গ্রন্থমালা ৩।৪২

[৫] ইমন কল্যাণ-আড়া চৌতাল। সংসারে কোন ভয় নাহি দ্র গীত ১।১৮০; তত্ত্ব°, ফাল্গুন। ১৭৯; সঙ্গীত-প্রকাশিকা, পৌষ। ৭৬-৭৭; স্বর ২৫; মূল গান : শ্যামকো দরশন নহি পায়ো দ্র গবেষণা-গ্রন্থমালা ৩।৫৮-৫৯

[৬] বাহার-ধামার। মম অঙ্গনে স্বামী আনন্দে আসে দ্র গীত ১।২০১; তত্ত্ব°, ফাল্গুন। ১৭৯; সঙ্গীত-প্রকাশিকা, পৌষ। ৭৩-৭৪; স্বর ২৫; মূল গান : আজু ব্রজমেঁ সৈয়াঁ খেলোঁগী হোরি দ্র গবেষণা-গ্রন্থমালা ৩।৩৮

[৭] ইমন কল্যাণ-ঝম্পক। বিপদে মোরে রক্ষা কর দ্র গীত ১।১০০; বঙ্গদর্শন, ভাদ্র। ২১৫, 'কামনা', রচনা : ১৩১৩; তত্ত্ব°, ফাল্গুন। ১৮১; সঙ্গীত-প্রকাশিকা, অগ্র°। ৫৭-৫৯; স্বর ২৫

[৮] সিন্ধু কাফি-ঝাঁপতাল। চরণ-ধ্বনি শুনি তব নাথ জীবন-তীরে দ্র গীত ১।১৬৪; তত্ত্ব°, ফাল্গুন। ১৮১; সঙ্গীত-প্রকাশিকা, পৌষ। ৬৮-৭০; স্বর ২৫; মূল গান : মুরলী ধুনি শুনি অরী মাই যমুনা তীর দ্র গবেষণা-গ্রন্থমালা ৩।৫১

[৯] ভীমপলশ্রী-তেওরা। বিপুল তরঙ্গ রে দ্র গীত ১।১৩৫; তত্ত্ব°, ফাল্গুন। ১৮১; সঙ্গীত-প্রকাশিকা, পৌষ। ৭০-৭১; স্বর ২৫; মূল গান : নাচত ত্রিভঙ্গ য়ে নন্দনন্দন বৃন্দাবন যমুনাতট দ্র গবেষণা-গ্রন্থমালা ৩।৬৪

[১০] আড়ানা-ঢিমাতেতালা। আজি মম জীবনে নামিছে ধীরে দ্র গীত ১।২০১; তত্ত্ব°, ফাল্গুন। ১৮১; সঙ্গীত-প্রকাশিকা, পৌষ। ৭২, আড়ানা কাওয়ালি; স্বর ২৪; মূল গান : অব মোরি পায়েলা বাজনু সোঁ দ্র গবেষণা-

গ্রন্থমালা ৩।৬৮

[১১] ভূপালী-সুরফাঁকতাল। প্রচণ্ড গর্জনে আসিল একি দুর্দিন দ্র গীত ১।৯৯; তত্ত্ব°, ফাল্গুন। ১৮৩-৮৪; সঙ্গীত-প্রকাশিকা, পৌষ। ৭৭-৭৮; স্বর ২৫; মূল গান : প্রচণ্ড গর্জন সজল বরখা ঋতু দ্র গবেষণা-গ্রন্থমালা ৩।৩১

[১২] মিশ্র ইমনকল্যাণ-ঝম্পক। দুখের বেশে এসেছ বলে দ্র গীত ১।১০১; খেয়া ১০। ১০৬; 'দুঃখমূর্তি', রচনা : ৭ শ্রাবণ ১৩১২ [23 Jul 1905] কলিকাতা; সঙ্গীত-প্রকাশিকা, পৌষ। ৮৭-৮৮; স্বর ২৫

[১৩] কামোদ-একতালা। আমি বহু বাসনায় প্রাণপণে চাই দ গীত ১।৯৯; বঙ্গদর্শন, আশ্বিন। ২৯৮, 'দয়া'; তত্ত্ব°, ফাল্গুন। ১৮৪; সঙ্গীত-প্রকাশিকা, অগ্র°। ৫৭-৫৯; স্বর ২৪

[১৪] সাহানা-একতালা। যারা কাছে আছে তারা কাছে থাক্ দ্র গীত ১১৫৩-৫৪; নৈবেদ্য ৮১৪; তত্ত্ব°, ফাল্গুন। ১৮৪; সঙ্গীত-প্রকাশিকা, মাঘ। ৯১-৯৩, কানাড়া-একতালা; স্বর ২৫

[১৫] বেহাগ-লঘু একতালা। অমল কমল সহজে জলের কোলে দ্র গীত ১১৩৬; নৈবেদ্য ৮১৬; তত্ত্ব, ফাল্গুন। ১৮৪; সঙ্গীত-প্রকাশিকা, অগ্র°। ৬২-৬৪; স্বর ২৪।

রবীন্দ্রনাথ এবারে কলকাতায় অবস্থানের সময়ে নববিধান সমাজের একটি অনুষ্ঠানে যোগ দেন। 31 Jan [শুক্র ১৭ মাঘ] মাঘোৎসব শেষ হবার খবর দিয়ে প্রমথলাল সেন মনোরমা চট্টোপাধ্যায়কে লিখেছেন : 'Children's gathering বেলা ৪॥০ টে থেকে রাত্তির ৯॥০ টা পর্য্যন্ত—চুনিবাবু [চুনীলাল মুখোপাধ্যায়] সভাপতি—রবীন্দ্র বাবু কিছু বল্লেন, ময়ূরভঞ্জের রাজা উপস্থিত ছিলেন।'[১৩০] অনুষ্ঠানটি সম্পর্কে এর চেয়ে বেশি কিছু জানা যায়নি। রবীন্দ্রনাথ ১৪ মাঘ [মঙ্গল 28 Jan] শিলাইদহে ফিরে যান।

পাবনায় বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মিলনের অধিবেশন হয় 11-12 Feb 1908 [মঙ্গল-বুধ ২৮-২৯ মাঘ] দু'দিন ধরে। আনুষঙ্গিক অন্যান্য অধিবেশন পরদিন সকালে অনুষ্ঠিত হয়। এই জন্য পাবনা টাউন হলের পিছনের মাঠে একটি বিরাট মণ্ডপ নির্মিত হয়। পাবনায় রেলপথ ছিল না, সুতরাং প্রতিনিধিরা স্টীমারে আসেন। তা সত্ত্বেও ছ'শোর বেশি প্রতিনিধি বৃহত্তর বঙ্গের বিভিন্ন জেলা থেকে পাবনায় সমবেত হন। সুরাটের অশান্তির পুনরাবির্ভাবের আশঙ্কায় ও রাজনৈতিক সম্মিলনের বিবরণী প্রস্তুতের জন্য একটি পুলিশবাহিনীও উপস্থিত ছিল। ২৮ মাঘ (মঙ্গল 11 Feb] সকালে মনোনীত-সভাপতি রবীন্দ্রনাথ তাঁর নিজস্ব বোটে পাবনায় পৌঁছন। বিকেলে সাড়ে তিনটের সময় অধিবেশন শুরু হয়। অমৃতবাজার-এর সংবাদদাতার মতে, কিছু মহিলা-সহ পাঁচ হাজারেরও বেশি ব্যক্তি সভাস্থলে উপস্থিত ছিলেন।

সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও বিশিষ্ট নেতৃবৃন্দ মনোনীত সভাপতি রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে সভাস্থলে প্রবেশ করলে সমবেত জনতা হর্ষধ্বনি করে তাঁদের সংবর্ধিত করেন। অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি আশুতোষ চৌধুরীর স্বাগত ভাষণের পর ব্যারিস্টার এ. রসুল সভাপতি-পদে রবীন্দ্রনাথের নাম প্রস্তাব করলে অরবিন্দ ঘোষ তা সমর্থন করেন ['seconded the proposal in a graceful speech, in course of which he made references to the president-elect's great services to Bengali literature'] —মতিলাল ঘোষ ও ভূপেন্দ্রনাথ বসু বাংলায় বক্তৃতা করে প্রস্তাবটি অনুমোদন করলে তা সর্বসম্মতক্রমে গৃহীত হয়।

এরপর রবীন্দ্রনাথ সভাপতির আসন গ্রহণ করে তাঁর অভিভাষণ পাঠ করেন। ইতিপূর্বে তিনিই নাটোরে [1897] ও ঢাকায় [1898] সভাপতির অভিভাষণ বাংলায় অনুবাদ করে শুনিয়েছিলেন, কিন্তু সভাপতির আসনে থেকে বাংলায় অভিভাষণ পাঠ একটি অভিনব ব্যাপার। এবারকার সম্মিলনে বাংলা ভাষা একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিল, অনেকেই বাংলায় বক্তৃতা করেন।

কোনো দলের সঙ্গে তাঁর যোগ নেই বলেই তাঁকে নিরীহ জ্ঞানে সভাপতির আসনে বসানো হয়েছে, গোড়াতেই সে কথা বলে নিয়ে রবীন্দ্রনাথ তাঁর নিরপেক্ষ ভূমিকাকে প্রতিষ্ঠিত করলেন। সুরাটের যজ্ঞভঙ্গের প্রতি ইঙ্গিত করে তিনি বললেন, এই বিরোধ কংগ্রেসের দুর্বলতার পরিচয় নয়—প্রাণশক্তিরই পরিচায়ক। কিন্তু এই বিরোধ থেকে নেতাদের শিক্ষাও নেওয়া দরকার। 'সমস্ত বৈচিত্র্য ও বিরোধকে একটা বৃহৎ ব্যবস্থার মধ্যে বাঁধিয়া তোলাই আমাদের পক্ষে সকলের চেয়ে বড়ো শিক্ষা। এই শিক্ষা যদি আমাদের অসম্পূর্ণ থাকে তবে স্বায়ত্তশাসন আমাদের পক্ষে অসম্ভব হইবে। যথার্থ স্বায়ত্তশাসনের অধীনে মতবৈচিত্র্য দলিত হয় না, সকল মতই আপনার যথাযোগ্য স্থান অধিকার করিয়া লয় এবং বিরোধের বেগেই পরস্পরের শক্তিকে পরিপূর্ণরূপে সচেতন করিয়া রাখে।' সেই ঐক্য আমরা এতদিন দেখাতে পারিনি, বিরোধ দেখা দেওয়া মাত্রই আমরা মূল জিনিসটাকে হয় নষ্ট নয় পরিত্যাগ করার চেষ্টা করেছি। কিন্তু 'পরের কৃত বিভাগ লইয়া দেশে যে উত্তেজনার সৃষ্টি হইয়াছে শেষে আত্মকৃত বিভাগই যদি তাহার পরিণাম হয়, ভারতের শনিগ্রহ যদি এবার লর্ড কার্জন-মূর্তি পরিহার করিয়া আত্মীয়মূর্তি ধরিয়াই দেখা দেয়, তবে বাহিরের তাড়নায় অস্থির হইয়া ঘরের মধ্যেও আশ্রয় লইবার স্থান পাইব না।'

হিন্দু-মুসলমান বিরোধ সম্পর্কে তিনি বললেন, হিন্দুদের দমিয়ে দেবার জন্য ইংরেজ অসংগত প্রশ্রয়ে মুসলমানকে বাড়িয়ে তোলার চেষ্টা করছে একথা যদি সত্য হয়, তবে সেই প্রশ্রয়ের একটা সীমা আছে—একদিন তা ইংরেজকেও আঘাত করবে। তাঁর মতে, 'আমাদের নিজের ভিতরে যে ভেদবুদ্ধির পাপ আছে তাহাকে নিরস্ত করিতে পারিলেই আমরা পরের কৃত উত্তেজনাকে অতিক্রম করিতে নিশ্চয়ই পারিব।' ইংরেজি-শিক্ষা গ্রহণে অধিকতর আগ্রহী হওয়ায় মুসলমানদের তুলনায় পদমানে হিন্দুরা যে অতিরিক্ত সুযোগ পেয়েছে সেই অসাম্য ঘুচে গেলে উভয়ের মধ্যে কিছুটা সমকক্ষতা স্থাপিত হবে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন, এই রাজপ্রসাদেরও সীমা আছে, 'তাঁহারা যেদিন দেখিবেন বাহিরের ক্ষুদ্র দানে অন্তরের গভীর দৈন্য কিছুতেই ভরিয়া উঠে না, যখন বুঝিবেন শক্তিলাভ ব্যতীত লাভ নাই এবং ঐক্য ব্যতীত সে লাভ অসম্ভব, যখন জানিবেন যে এক দেশে আমরা জন্মিয়াছি সেই দেশের ঐক্যকে খণ্ডিত করিতে থাকিলে ধর্মহানি হয় এবং ধর্মহানি হইলে কখনোই স্বার্থরক্ষা হইতে পারে না, তখনই আমরা উভয় ভ্রাতায় একই সমচেষ্টার' মিলনক্ষেত্রে আসিয়া হাত ধরিয়া দাঁড়াইব।'

Extremist বা চরমপন্থী দলের আবির্ভাবের জন্য রবীন্দ্রনাথ গবর্মেন্টকেই দায়ী করেছেন। দেশের আশা-আকাঙ্ক্ষা-বেদনাকে চরমভাবে অবজ্ঞা করে, তার স্বাভাবিক বিক্ষোভকে দমননীতির সাহায্যে মূক করে দেওয়ার চেষ্টা করে সরকারই চরমপন্থা গ্রহণে প্রজাদের প্ররোচিত করেছে। 'ইতিহাসের শিক্ষায়, যাতায়াত ও আদান-প্রদানের সুযোগে, এক রাজশাসনের ঐক্যে, সাহিত্যের অভ্যুদয়ে এবং কন্‌গ্রেসের চেষ্টায়' সমগ্র দেশ ভিতরে-ভিতরে যে ঐক্য লাভ করেছিল কার্জনের বঙ্গবিভাগ ঘোষণা সেই ঐক্যের চেহারাটিকে প্রত্যক্ষ করে তুলল। সেই কারণেই স্বল্পকালীন আবেদন-নিবেদনের পর বিদেশী পণ্যবর্জনের সংকল্প গ্রহণ সম্ভব হয়েছিল।

সংকীর্ণ উপলক্ষকে অবলম্বন করে এই সংকল্পের প্রকাশ ঘটলেও 'এ যে শক্তি। এ যে সম্পদ। ইহা অন্যকে জব্দ করিবার নহে, ইহা নিজেকে শক্ত করিবার।' এরই ফলে চাকরিপিপাসু দেশে ধনীর ছেলে তাঁত চালানো শেখার জন্য তাঁতির শিষ্যত্ব গ্রহণ করল, ভদ্রঘরের ছেলে মাথায় কাপড়ের মোট নিয়ে দ্বারে দ্বারে ঘুরতে লাগল ও ব্রাহ্মণের ছেলে কৃষিকার্য করাকে গৌরব বলে মনে করল। জাতীয় শিক্ষাপরিষদ প্রতিষ্ঠা ও কাপড়ের মিল স্থাপন করা এই শক্তিরই প্রকাশ।

রবীন্দ্রনাথ পরে বয়কট সম্পর্কে কিছু রূঢ় কথা বললে অনেকে তাঁর এই কথাগুলি উদ্ধৃত করে সমালোচনা করেছেন। কিন্তু তাঁর বয়কট-বিরোধিতার যুক্তি যে ঠিক এর পরের কথাগুলিতেই আছে, সেটি তাঁরা খতিয়ে দেখেননি। সেখানে তিনি দুঃখের সঙ্গে বলেছেন, 'এতবড়ো শক্তিকে বাঁধিয়া তুলিবার কোনো ব্যবস্থা আমাদের মধ্যে নাই।' জাতীয় ভাণ্ডারের আনে 'এই বহুপরিবারভারগ্রস্ত দরিদ্র দেশেও' এক বছরের কম সময়ের মধ্যে [30 Jun 1906 পর্যন্ত] ৭৩,৬৭১।ল৪ পাই চাঁদা উঠেছিল, কিন্তু Feb 1908-এর মধ্যেও তার অধিকাংশই কাজে লাগানো যায়নি, সঞ্চিত অর্থও জমা রাখা হয়েছিল ইংরেজ-পরিচালিত বহুজাতিক ব্যাঙ্কে।[১৩১] 'দেশের লোক যখন ব্যাকুল হইয়া বলিতেছে—আমরা দিতে চাই, আমরা কাজ করিতে চাই—···তখনো যদি দেশের এই উদ্যত ইচ্ছাকে সার্থক করিবার জন্য কোনো-একটা যজ্ঞক্ষেত্র নির্মিত না হয়, তখনো যদি সমস্ত কাজ বিচ্ছিন্ন বিক্ষিপ্ত ভাবেই হইতে থাকে, তবে এমন অবস্থায় এমন খেদে মানুষ আর কিছু না পারিলে ভাইয়ে ভাইয়ে ঝগড়া করিয়া আপনার কর্মভ্রষ্ট উদ্যম ক্ষয় করে।' ঝগড়ার উপলক্ষও তেমনি অসংগত—ইংরেজ যখন অপ্রতিহতভাবে শাসনক্ষমতায় অধিষ্ঠিত, তখন 'ব্রিটিশসাম্রাজ্যভুক্ত স্বায়ত্তশাসন' ও 'সাম্রাজ্যনিরপেক্ষ স্বাতন্ত্র্য' নিয়ে ঝগড়ার সঙ্গে উপস্থিত দায়িত্বের কোনো যোগ নেই। এ নিয়ে আলোচনা অনায়াসেই চলতে পারে, কিন্তু তা নিয়ে ঝগড়া করা শক্তিরই অপব্যয়। 'যখন মাঠে চাষ দেওয়াও হয় নাই তখন কি ফসল ভাগের মামলা তুলিবার বিশেষ প্রয়োজন আছে।'

সেইজন্য রবীন্দ্রনাথ দেশবাসীকে 'যথার্থ বলিষ্ঠমনা ব্যক্তির ন্যায় কথায় ও ব্যবহারে, চিন্তায় ও প্রকাশে পরিমাণরক্ষা' করে কর্ম করার জন্য আহ্বান জানিয়েছেন। 'কর্মের উদ্দেশ্য কেবলমাত্র উপস্থিত একটা কোনো ফললাভ নহে। শক্তিকে খাটাইবার জন্যও কর্মের প্রয়োজন। কর্মের উপযুক্ত সুযোগ পাইলেই এই শক্তি নানা আশ্চর্য ও অভাবনীয় রূপে অভিব্যক্ত হইতে থাকে।' গবর্মেন্টের দান অনেক সময়েই বক্র হয়ে উঠে নানা বিপর্যয় ঘটায়। কিন্তু নিজেদের মধ্যে সতেজ শক্তি থাকলে সেই বিকৃতি ঘটতে পারে না। তখনই সহজে আদান-প্রদান সম্ভব হতে পারে। ***'অতএব আমি যাহা বলিতেছি তাহাতে এ বোঝায় না যে, আমাদের কর্মের কোনো উপকরণ আমরা গবর্মেন্টের নিকট হইতে লইব না, কিন্তু ইহাই বুঝায় যে, নিজের সম্পূর্ণ সাধ্যমত যদি কর্মে প্রবৃত্ত হই তবেই তাহার উপকরণ আমরা সকল স্থান হইতেই অসংকোচে সংগ্রহ করিবার অধিকারী হইব।'*** এই কথাতেই রবীন্দ্রনাথ সাময়িক প্রবণতার বিরোধিতা করেছেন, পরে তিনি মত পরিবর্তন করেছেন এই অভিযোগ ভিত্তিহীন।

আত্মশক্তির সাধনায় বিদেশী শাসক নানাপ্রকার বাধা সৃষ্টি করবে, এ বিষয়েও তিনি সকলকে সতর্ক করে দিয়েছেন। এবং সেইজন্যই ঐক্যের প্রয়োজন বেশি। 'দেশের হিতব্রতে যাঁহারা কর্মযোগী, অত্যাবশ্যক

কণ্টকক্ষত তাঁহাদিগকে পদে পদে সহ্য করিতেই হইবে; কিন্তু শক্তির ঔদ্ধত্য প্রকাশ করিবার জন্য স্বদেশের যাত্রাপথে নিজের চেষ্টায় কাঁটার চাষ করা কি দেশহিতৈষিতা।'

য়ুরোপে শ্রমিক-মালিকের সংঘর্ষের কথা রবীন্দ্রনাথ ভালোভাবেই জানতেন। সেই কথা তুলে তিনি বললেন :'স্বয়ং য়ুরোপেই ধনী আপন ধনবৃদ্ধির পথ অব্যাহত রাখিবার জন্য শ্রমীককে কিরূপ নাগপাশে বেষ্টন করিয়া ফেলিতেছে এবং তাহা লইয়া সেখানে কতই আঘাতপ্রতিঘাত চলিতেছে। আমাদের দেশে সেই ধনী শুধু-ধনী নন, জেলের দারোগা; লিভারপুলের নিমক খাইয়া থাকে। অতএব এ দেশের যে ধন লইয়া পৃথিবীতে তাঁহারা ঐশ্বর্যের চূড়ায় উঠিয়াছেন সেই ধনের রাস্তায় আমরা একটা সামান্য বাধা দিলেও তাঁহারা তো আমাদিগকে সহজে ছাড়িবেন না।' সুতরাং সমস্ত শক্তি ও সহিষ্ণুতা নিয়ে সেই দুঃখের সম্মুখীন হতে হবে—অনাহূত ঔদ্ধত্য ও অনাবশ্যক উষ্ণবাক্য প্রয়োগ করে কর্মের দুরূহতাকে আরও বাড়িয়ে তোলা দেশের কাছে অপরাধ।

কর্মপরিকল্পনার ব্যাপারে রবীন্দ্রনাথ 'স্বদেশী সমাজ'-এর আদর্শকে রাজনৈতিক পটভূমিকায় স্থাপন করলেন। তিনি বললেন, 'আমাদের কর্মশক্তির চূড়াকে ভারতবর্ষের কেন্দ্রস্থলে যদি অভ্রভেদী করিতে চাই তবে প্রত্যেক জেলা হইতে তাহার ভিত-গাঁথার কাজ আরম্ভ করিতে হইবে। ···প্রত্যেক প্রদেশে [জেলায়] একটি করিয়া প্রাদেশিক প্রতিনিধিসভা স্থাপিত হইবে। এই সভা যথাসম্ভব গ্রামে গ্রামে আপনার শাখা বিস্তার করিয়া সমস্ত জেলাকে আচ্ছন্ন করিবে। প্রথমে সমস্ত প্রদেশের সর্বাংশের সকলপ্রকার তথ্য সম্পূর্ণরূপে সংগ্রহ করিবে; কারণ, কর্মের ভূমিকাই জ্ঞান। ···কতকগুলি পল্লী লইয়া এক-একটি মণ্ডলী স্থাপিত হইবে। সেই মণ্ডলীর প্রধানগণ যদি গ্রামের সমস্ত কর্মের এবং অভাবমোচনের ব্যবস্থা করিয়া মণ্ডলীকে নিজের মধ্যে পর্যাপ্ত করিয়া তুলিতে পারে তবেই স্বায়ত্বশাসনের চর্চা দেশের সর্বত্র সত্য হইয়া উঠিবে। নিজের পাঠশালা, শিল্পশিক্ষালয়, ধর্মগোলা, সমবেত পণ্যভাণ্ডার ও ব্যাঙ্ক্ স্থাপনের জন্য ইহাদিগকে শিক্ষা সাহায্য ও উৎসাহ দান করিতে হইবে। প্রত্যেক মণ্ডলীর একটি করিয়া সাধারণ মণ্ডপ থাকিবে, সেখানে কর্মে ও আমোদে সকলে একত্র হইবার স্থান পাইবে এবং সেইখানে ভারপ্রাপ্ত প্রধানেরা মিলিয়া সালিশের দ্বারা গ্রামের বিবাদ ও মামলা মিটাইয়া দিবে।' চাষ, গোপালন প্রভৃতিতে সমবায় প্রথায় যান্ত্রিকীকরণের সুপারিশও তিনি করলেন এই ভাষণে। নিজের জমিদারিতে তিনি যে কর্মপদ্ধতি প্রয়োগ করতে শুরু করেছিলেন, সমগ্র দেশের জন্য তিনি সেই ব্যবস্থাপত্রই দিলেন। লক্ষণীয়, রবীন্দ্রনাথের ভাষণান্তে অধিবেশন মুলতুবি হয়ে যাওয়ার পর সন্ধ্যা সাতটা থেকে মধ্যরাত্রি পর্যন্ত অনুষ্ঠিত বিষয়-নির্বাচনী সমিতির সভায় পরদিন আলোচনার জন্য যে প্রস্তাবগুলি গৃহীত হয় তার মধ্যে অনেকগুলিই এই ব্যবস্থাপত্র অনুসারে রচিত। ভাষণের শেষাংশে তিনি দেশের জমিদারদের পল্লীর মধ্যে প্রাণসঞ্চারের জন্য উদ্‌যোগী হবার আহ্বান জানালেন। পল্লী সচেতন হয়ে উঠলে জমিদারের কর্তৃত্ব ও স্বার্থ ক্ষুন্ন হতে পারে এমন আশঙ্কা তাঁর মতে অনুচিত। নিজে জমিদার হয়েও তিনি বললেন : 'রায়তদিগকে এমনভাবে সবল ও শিক্ষিত করিয়া রাখা উচিত যে, ইচ্ছা করিলেও তাহাদের প্রতি অন্যায় করিবার প্রলোভনমাত্র জমিদারের মনে না উঠিতে পারে। ···দেশের অধিকাংশ লোককেই যদি জমিদার, মহাজন, পুলিস, কানুনগো, আদালতের আমলা, যে ইচ্ছা সে অনায়াসেই মারিয়া যায় ও মারিতে পারে তবে দেশের লোককে মানুষ হইতে না শিখাইয়াই রাজা হইতে শিখাইব কী করিয়া।' কিছুদিন আগে অর্ধোদয়-যোগ [১৯ মাঘ রবি 2 Feb] উপলক্ষে ছাত্র ও যুবকেরা স্বেচ্ছাসেবক-বাহিনী গড়ে বিপুলসংখ্যক স্নানার্থীদের সেবায় যে নিষ্ঠা ও

কর্মতৎপরতা দেখিয়েছিলেন, সেকথা স্মরণ করে রবীন্দ্রনাথ তাঁদের অভিনন্দিত করে বললেন, 'দেশে অর্ধোদয়-যোগ কেবল একদিনের নহে'; তাঁদের তিনি গ্রামে গিয়ে শিক্ষা, কৃষিশিল্প, স্বাস্থ্য প্রভৃতির উন্নতির জন্য গ্রামবাসীকে সমবেত করার প্রয়াস নিতে বললেন— 'ইহাতে কোনো উত্তেজনা নাই, কোনো বিরোধ নাই, কোনো ঘোষণা নাই; কেবল ধৈর্য এবং প্রেম, নিভৃতে তপস্যা—মনের মধ্যে কেবল এই একটিমাত্র পণ যে, দেশের মধ্যে সকলের চেয়ে যাহারা দুঃখী তাহাদের দুঃখের ভাগ লইয়া সেই দুঃখের মূলগত প্রতিকার সাধন করিতে সমস্ত জীবন সমর্পণ করিব।'

সভাপতির ভাষণের পর প্রথম দিনের অধিবেশন শেষ হয়। বিষয়-নির্বাচনী সমিতির [Subjects Committee] কার্য আরম্ভ হয় সন্ধ্যা সাতটায়, মধ্যরাত্রি পর্যন্ত আলোচনা সমাপ্ত না হওয়ায় পরদিন [২৯ মাঘ বুধ 12 Feb] সকালেও সমিতির বৈঠক বসে। স্বাস্থ্য, কৃষি ও সালিশী প্রভৃতি কাজ দেখা শোনার জন্য তিন জন পরিদর্শক নিয়োগের এবং রবীন্দ্রনাথ, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, মতিলাল ঘোষ ও অশ্বিনীকুমার দত্তকে নিয়ে একটি কার্যকরী সমিতি গড়ার প্রস্তাব হয়। বহু বাদানুবাদের পর অশ্বিনীকুমারের পরিবর্তে যোগেশচন্দ্র চৌধুরীকে সমিতিতে গ্রহণ করা হয়, ঠিক হয়, সমিতি আগামী বৎসরের সম্মিলনে কাজের অগ্রগতি বিষয়ে তাঁদের প্রতিবেদন পেশ করবেন। দ্বিতীয় দিনের অধিবেশনে রবীন্দ্রনাথ নিজেই প্রস্তাবটি উত্থাপন করেন ও তা সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

কিন্তু আসল সংকট ছিল স্বরাজ-সংক্রান্ত প্রস্তাবটি নিয়ে। দুপুর দুটোয় দ্বিতীয় দিনের অধিবেশন শুরু হলে রবীন্দ্রনাথ প্রথমেই ঘোষণা করেন, এই প্রস্তাবটি সবশেষে আলোচিত হবে। বিচার ও শাসনব্যবস্থার পৃথকীকরণ, দমননীতির বিরোধিতা, বয়কট ['both as a political weapon and as a measure of economic protection'], স্বদেশী, জাতীয় শিক্ষা, বঙ্গভঙ্গ, সালিশী, ধর্মগোলা, ট্রান্সভালে ভারতীয়-নির্যাতন, বিচারক ও পুলিশ, পথকর, কার্যকরী সমিতি, প্যুনিটিভ পুলিশ, কেন্দ্রীয় সমিতি, নমঃশূদ্র, শারীরচর্চা, স্বেচ্ছাসেবক-বাহিনী, পরবর্তী সম্মিলন, শোকজ্ঞাপন, রাজনৈতিক নিপীড়িতদের সাহায্য ও স্বরাজ—দ্বিতীয় দিনের অধিবেশনে এই একুশটি প্রস্তাব আলোচিত ও গৃহীত হয়। শেষোক্তটি ছাড়া আর সবগুলিই গৃহীত হয় সর্বসম্মতিক্রমে। জাতীয় শিক্ষা-সংক্রান্ত প্রস্তাবটি উত্থাপন করেন অরবিন্দ ঘোষ ও সমর্থন করেন বেচারাম লাহিড়ি, 'and the President, then, called upon Babu Subodh Ch. Mullick to support it, and very gracefully added that he had founded the National University with his gold and had been given the title of Raja by the people.'[১৩২]

ডাঃ প্রাণকৃষ্ণ আচার্য ধন্যবাদজ্ঞাপক প্রস্তাব উত্থাপন করলে সিরাজগঞ্জের কৈলাসচন্দ্র বসু তা সমর্থন করেন। রবীন্দ্রনাথ একটি মৌখিক বক্তৃতা করে অধিবেশনের সমাপ্তি ঘোষণা করেন। অবলা বসু 20 Mar [শুক্র ৭ চৈত্র] লণ্ডন থেকে তাঁকে লেখেন : 'আপনি সভাভঙ্গে কি বলিয়াছিলেন তাহা কোন কাগজেই দেখিলাম না, শুনিতে পাই তাহা খুব মর্ম্মস্পর্শী হইয়াছিল।'[১৩৩] *The Bengalee* [14 Feb]-তে বক্তৃতাটির সংক্ষিপ্তসার প্রকাশিত হয়েছিল:

> The President delivered an *extempore* speech in Bengali and said that the ship had reached the harbour, thanks to the favourable winds sent by God. The delegates also helped it. He was only a mere cause. He eulogised Pabna for its grand achievement and thanked them heartily. He had joined this political meeting for the first time in his life and he gloried himself that the danger he had feared was nowhere. It was a providential act. He was a literary man and by chance he floated

to politics. It was fortunate for him that they were holding Conferences every year, but this year they had shown some progress and improvement and had left off the old track. It was a glory to him that he was its President. They were on the way to gain self-government. Only the dullest people followed in the old groove. The Bengalees could not do that. He asked the people not to dispair but to use their energies to make the Bengalees the greatest people. All attempts at regeneration throughout India should be concentrated by the Bengalees. He referred to the sufferings of Bangalees and said that the sufferers were great men and had shown the power they possessed.

প্রতিবেদক এর পর নিজেই লিখেছেন : 'The President's peroration was a treat to hear and he carried the audience with him'—এর থেকেই বোঝা যায়, রবীন্দ্রনাথের বাংলা বক্তৃতার যথাযথ অনুলেখন নেওয়া ও তার ইংরেজি অনুবাদ কোনোটাই ঠিক হয়নি।

সন্ধ্যা সাতটার সময়ে পাবনা প্রাদেশিক সম্মিলন সমাপ্ত হয়।

১ ফাল্গুন [বৃহ 13 Feb] সকালেও সম্মিলনের জের চলে। পূর্বদিন সকালে শিল্প সম্মিলন [Industrial Conference] বসার কথা ছিল, কিন্তু বিষয়-নির্বাচনী সমিতির বৈঠকের ফলে অনুষ্ঠানটি পরদিন সকাল পর্যন্ত পিছিয়ে দেওয়া হয়। 'At the Industrial Conference, Babu Rabindra Nath's extempore speech on national education was a masterpiece and pindrop silence prevailed.'[১৩৪] এর পরে একই মণ্ডপে অনুষ্ঠিত জাতীয় শিক্ষা সম্মিলনেও রবীন্দ্রনাথ বক্তৃতা করেন। অতঃপর তিনি শিলাইদহে ফিরে যান।

পাবনা প্রাদেশিক সম্মিলনের কাজ শেষ করে রবীন্দ্রনাথ শিলাইদহ যাত্রা করেন ১ ফাল্গুন [বৃহ 13 Feb]। 'বৃহস্পতিবার' ভূপেন্দ্রনাথ সান্যালকে লিখছেন : 'পাবনার কার্য শেষ হইল—শিলাইদহে ফিরিতেছি, সকলে সন্তোষ প্রকাশ করিয়াছেন ইহাতে আমার শ্রম সার্থক হইয়াছে।/ অন্তঃকরণ অত্যন্ত তৃষিত হইয়াছিল—এবার কাজ শেষ হইল—ঘরে ফিরিলাম।'[১৩৫] নরমপন্থী ও চরমপন্থী দলের প্রকাশ্য সংঘর্ষে তাঁর জাতীয়তাবোধ পীড়িত হচ্ছিল। পাবনা কন্‌ফারেন্সে উভয় দলের মধ্যে আপাত-শান্তি স্থাপিত হওয়ায় তিনি যেমন স্বস্তি অনুভব করেছেন, তেমনি নূতন কর্মোদ্দীপনায় সঞ্জীবিত হয়ে উঠেছেন। গ্রাম ও সমাজ পুনর্গঠনের পরামর্শ তিনি দেশবাসীকে বহুদিন ধরেই দিয়ে আসছিলেন, নেতারা সেই পরামর্শে কর্ণপাত না করায় প্রত্যক্ষ রাজনীতির ক্ষেত্র থেকে নিজেকে সরিয়ে নিয়ে স্বীয় সামর্থ্যানুযায়ী নির্বাচিত ক্ষেত্রে তিনি সেই পরিকল্পনাকে কার্যকরী রূপ দেবার জন্য উদ্যোগী হয়েছিলেন। পাবনা কনফারেন্সে সেই পরিকল্পনা সম্পর্কে প্রতিনিধিবর্গ আনুকূল্য প্রদর্শন করলে রবীন্দ্রনাথ নিজ আদর্শের চরিতার্থতার সম্ভাবনায় যে ভাবাবেগ অনুভব করেছেন ভূপেন্দ্রনাথকে লিখিত কয়েকটি পত্রে তা প্রকাশিত হয়েছে। ৫ ফাল্গুন [সোম 17 Feb] জামাতা নগেন্দ্রনাথকে লেখেন :

এখানে এবারকার প্রভিন্‌শ্যাল কন্‌ফারেন্সে আমাকে সভাপতির কাজে আহ্বান করেছিল সে খবর নিশ্চয় পেয়েছ। দেশের যে রকম অবস্থা হয়েছে তাতে কাজটা যে শান্তিরক্ষা করে সুসম্পন্ন হবে এমন আশা কেউ করেনি। এমন কি, আমাকে ভয় দেখিয়ে অনেকে অনেক রকম পত্রও লিখেছিল। নূতন দল পুরাতন দলের বিরুদ্ধে একেবারে কোমর বেঁধে প্রায় প্রস্তুত হয়েই এসেছিল। তাই ঢাকা থেকে স্পেশাল ষ্টীমারে পুলিশের ইন্‌স্পেক্টর জেনেরাল দলবল নিয়ে হাজির ছিল। কিন্তু ঈশ্বরের কৃপায় আমি দুই পক্ষকেই শান্ত ও সন্তুষ্ট করে আমার কাজ সেরে আসতে পেরেছি। এবারকার এই কন্‌ফারেন্স্ থেকে উপকার হবে বলে আশা করা যাচ্চে।[১৩৬]

মজঃফরপুরের বোমার আঘাতে কিছুদিনের মধ্যেই এই আশা চূর্ণ হয়ে ঘটনাস্রোত ভিন্নপথে প্রবাহিত হতে শুরু করে। কিন্তু সে প্রসঙ্গের আলোচনা হবে পরবর্তী অধ্যায়ে।

শিলাইদহে গ্রাম-পুনর্গঠন কাজের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ বিদ্যালয়ের পুনর্গঠনের কাজও আরম্ভ করেছিলেন। পাবনা কনফারেন্সে তিনি পূর্ববঙ্গের বিশিষ্ট রাজনৈতিক কর্মী তরুণ কালীমোহন ঘোষের [1882-1940] সঙ্গে পরিচিত হন। কালীমোহনই তাঁকে ক্ষিতিমোহন সেনের [1880-1960] কথা বলেন। কাশীর কুইন্স্ কলেজ থেকে সংস্কৃতে এম. এ. ক্ষিতিমোহন 'শাস্ত্রী' উপাধি পেয়েছিলেন। স্বদেশী-আন্দোলনের কাজে পূর্ববঙ্গের গ্রামে ভ্রমণের সময়ে রবীন্দ্র-কাব্যানুরক্তির সূত্রে কালীমোহনের সঙ্গে তাঁর অন্তরঙ্গতা হয়। আলোচ্য সময়ে তিনি হিমালয়ের চম্বারাজ্যে শিক্ষাসচিবের পদে অধিষ্ঠিত। বেদ-উপনিষদে পারঙ্গম মধ্যযুগীয় সন্তকবিদের বাণী-সংগ্রহে আগ্রহী এই পণ্ডিত মানুষটির সন্ধান পেয়ে ১ ফাল্গুন [বৃহ 13 Feb] শিলাইদহে ফিরেই রবীন্দ্রনাথ তাঁকে আহ্বান জানালেন :

বোলপুরে আমি কিছুদিন হইতে একটি ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম স্থাপন করিয়া বালকদিগকে শিক্ষা দিতেছি। আপনার সম্বন্ধে আমি যেরূপ সংবাদ পাইয়াছি তাহাতে এখানকার কর্ম্মে আপনাকে আবদ্ধ করিবার জন্য বিশেষ উৎসুক হইয়াছি। যদি অনুগ্রহ করিয়া আমার এই কার্য্যে যোগদান করেন তবে আমি সহায়বান হইব এবং যাহাতে আপনার আর্থিক ক্ষতি না হয় সেইরূপ ব্যবস্থা করিয়া দিব। আমার বিশ্বাস সেখানকার কর্ম্মে আপনি আনন্দলাভ করিতে পারিবেন।[১৩৭]

ক্ষিতিমোহন প্রথমে উচ্চ রাজপদ ত্যাগ করে অনিশ্চিত ভবিষ্যৎকে বরণ করতে আগ্রহী হননি। তখন রবীন্দ্রনাথ ১২ ফাল্গুন [সোম 24 Feb] পুনশ্চ তাঁকে লেখেন :'যে লক্ষ্য ধরিয়া আজ ছয় বৎসরকাল এই বিদ্যালয়কে প্রতিষ্ঠাদান করিবার চেষ্টা করিতেছি তাহা সিদ্ধ করিবার জন্য উপযুক্ত সহায়ের একান্ত আবশ্যক। এই কারণেই আপনার সন্ধান পাইয়া, আপনার অসম্মতি সত্ত্বেও পুনর্ব্বার আপনাকে সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ জানাইতেছি। এই বিদ্যালয়ে আপনি নিজের শক্তিকে সর্ব্বথা প্রয়োগ করিবার সুযোগ পাইবেন—ইহাতে যথার্থই আপনি সৃষ্টি করিয়া তুলিবার আনন্দ পাইবেন এবং ঈশ্বরের প্রসাদে এই সৃষ্টির দ্বারা দেশের একটি স্থায়ী মঙ্গলের প্রতিষ্ঠা হইতে পারে। এই কাজে আপনাদের সহায়তা আমি কেবলমাত্র প্রার্থনা করিব না—দাবী করিব।'[১৩৮] পত্রটি ক্ষিতিমোহনের আদর্শবাদী সত্তাকে স্পর্শ করল, তিনি কিছু আর্থিক নিশ্চয়তা সাপেক্ষে জুলাই মাসে বিদ্যালয়ে যোগ দেওয়ার কথা জানালেন। রবীন্দ্রনাথ ১৯ ফাল্গুন [সোম 2 Mar] 'মাসিক একশত ও প্রতি বৎসরে দশ টাকা করিয়া বৃদ্ধি লইয়া ক্রমে দেড় শত পর্য্যন্ত' বৃত্তি নির্ধারণ করে তাঁকে আহ্বান জানিয়ে লিখলেন : 'জানি না, কি কারণে আপনার সহিত পরিচয় না থাকিলেও আপনাকেই আমার চিত্ত এই কাজে বরণ করিয়া লইতেছে। ঈশ্বর যদি ইচ্ছা করেন তবে নিশ্চয়ই আপনি সমস্ত সঙ্কোচ ও চিন্তা দূর করিয়া দিয়া ধরা দিবেন—আপনি না আসিয়া কোনমতেই থাকিতে পারিবেন না—আপনার পর্ব্বত হইতে আপনি নদীর মত এখানে ছুটিয়া আসিবেন। আমার নিজের কাজ হইলে আমি আপনাকে এমন করিয়া ডাকিতে পারিতাম না। আমি যাহাকে মনে রাখিয়া ডাকিতেছি তাহার কাছে নিষ্কৃতি পাইবেন না।'[১৩৯] রবীন্দ্রনাথের আহ্বান ব্যর্থ হয়নি—ক্ষিতিমোহন Jul 1908-এ বিদ্যালয়ের কাজে যোগ দেন ও তাঁর সব কাজে দক্ষিণহস্ত হয়ে ওঠেন। ক্ষিতিমোহনের কল্পনাশক্তি ছিল, বিদ্যালয়ে ঋতু-উৎসবের সূচনা তিনিই করেন, রবীন্দ্রনাথের এই জাতীয় নাট্যরচনার মূলেও তাঁর প্রেরণা কাজ করেছে। যাঁদের উপর নির্ভর করে তিনি ব্রহ্মচর্যাশ্রমকে বিশ্বভারতীতে পরিণত করেন, ক্ষিতিমোহন তাঁদের মধ্যে অন্যতম।

আর-একজন মানুষকে বিদ্যালয়ের জন্য চেয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ, তিনি হলেন পাবনার পোতাজিয়া স্কুলের প্রধান শিক্ষক বিহারীলাল গোস্বামী। ৫ ফাল্গুন [সোম 17 Feb] এঁকে আহ্বান করে তিনি লেখেন : 'বিদ্যালয়ে

ইংরাজি অধ্যাপনার জন্য শিক্ষকের প্রয়োজন হইয়াছে। বেতন পঞ্চাশ—বিদ্যালয় গৃহেই বাস করিয়া অন্যান্য অধ্যাপকদের সাহায্যে ছাত্রদের পর্য্যবেক্ষণভার লইতে হয়। যদি এ কার্য্যভার গ্রহণ করা আপনার অভিমত হয় তবে কতদিনের মধ্যে কাজে যোগ দিতে পারিবেন জানাইবেন। লোকের অভাবে ক্ষতি হইতেছে অতএব আপনার মতামত জানাইতে বিলম্ব করিবেন না।'[১৪০] বিহারীলাল অবশ্য শেষপর্যন্ত ব্রহ্মচর্যাশ্রমের কার্যে যোগ দিতে পারেননি। কামিনীকুমার চন্দের পুত্র অপূর্বকুমারের উপযুক্ত পড়াশুনো নিয়ে রবীন্দ্রনাথ চিন্তিত ছিলেন, কিন্তু এখনই তার কোনো সমাধান করা যায়নি।

এইসময়ে ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের [1882-1962] পিতামাতা প্রকাশচন্দ্র [1847-1911] ও অঘোরকামিনীর [1856-96] জীবনীমূলক 'অঘোরপ্রকাশ' [১৩১৪]* গ্রন্থটি রবীন্দ্রনাথের হাতে আসে। সম্ভবত নববিধান সমাজের শিশু-উৎসবে যোগ দেওয়ার সময়ে ভাই প্রমথলাল সেনের কাছে তিনি বইটির কথা শোনেন। ৯ ফাল্গুন [শুক্র 21 Feb] বইটি সম্পর্কে তাগিদ দিয়ে তাঁকে লেখেন : কই মহাশয় বই ত এসে পৌঁছয় নি। ভুলেচেন বুঝি? যদি হাতের কাছে থাকে ত পাঠিয়ে দেবেন।'[১৪১] এই দম্পতির পূত জীবনযাত্রার বিবরণ লেখকের নানা অসম্পূর্ণতা সত্ত্বেও রবীন্দ্রনাথকে মুগ্ধ করেছিল। ৩০ ফাল্গুন [শুক্র 13 Mar] তিনি প্রমথলালকে লেখেন : 'এই বইটির কথা যতই ভাবছি ততই এ দম্পতির সাধনার ভিতর থেকে যে শক্তির বিকাশ হয়েছে তার অসামান্যতা ভুলতে পারছি নে। যখন মনে করা যায় এই সাধনার ভিতর দিয়ে না এলে জীবন কতই সামান্য এবং তুচ্ছ আকার ধারণ করত অর্থাৎ সে কোনো আকারই লাভ করতে পারত না তখন বুঝতে পারি এ ব্যাপারটি সামান্য নয়। ···যাই হোক গ্রন্থটি পড়ে আমার যে উপকার হয়েছে—উপকার কথাটা ছোট—আমার যে মঙ্গল হয়েছে—সে জন্য গ্রন্থকর্ত্তার কাছে আমি কৃতজ্ঞ।'[১৪২]

কবি প্রিয়ম্বদা দেবী [1871-1935] অল্পবয়সে স্বামী-পুত্র হারিয়ে কাব্যচর্চা ও সমাজসেবাকে জীবনের অবলম্বন করেন। বন্ধু আশুতোষ চৌধুরীর ভাগিনেয়ী সুশিক্ষিতা এই মেয়েটি রবীন্দ্রনাথের স্নেহভাজন ছিলেন। তিনি তাঁর কবিপ্রতিভাকেও সমাদরের দৃষ্টিতে দেখতেন, স্ব-সম্পাদিত পত্রিকাগুলিতেও তাঁর বহু রচনা প্রকাশ করেছেন। প্রিয়ম্বদাও রবীন্দ্রনাথের কবিতা ও কর্মকাণ্ডের অনুরাগিণী ছিলেন। ঠাকুর কোম্পানিকে তিনি দশ হাজার টাকা ধার দেন, কার্তিক ১৩১৪-তে বোলপুর ব্রহ্মবিদ্যালয়কে তিনি নোট গিনি ইত্যাদি মিলিয়ে ৫০০ টাকা দান করেন। জীবনের বিভিন্ন সংকটমুহূর্তে সান্ত্বনার জন্য তিনি রবীন্দ্রনাথের শরণাপন্ন হয়েছেন। রবীন্দ্রনাথ ২৫ ফাল্গুন [রবি 8 Mar] তাঁকে একটি চিঠিতে লিখেছেন : 'তুমি নিজের মনের মধ্যে একটা বড় রকমের জোর না পেলে বাইরে থেকে কোনো সাহায্যই গ্রহণ করতে পারবে না। একথা খুবই সত্য যে আমাদের দেশের মেয়েদের কাছ থেকে আমরা যে আত্মবিলোপ দাবী করি তাতে অনেকেরই পক্ষে আত্মঘাত ঘটে—সেটাতে কখনই মঙ্গল হয় না। তোমার মধ্যে ঈশ্বর যে শক্তি দিয়েছেন তাকে সম্পূর্ণ বিকশিত করবার পথে কোনো সঙ্কীর্ণ সামাজিক বা পারিবারিক বাধা মানবার কর্ত্তব্যতা নেই। এর পর তিনি 'অঘোরপ্রকাশ' গ্রন্থটির উল্লেখ করে লিখেছেন :

আমাকে নববিধান সমাজের প্রমথ বাবু "অঘোরপ্রকাশ" নামক একটি জীবনচরিত পাঠিয়েছেন—এ বইটি তুমি দোকান থেকে আনিয়ে পোড়ো। এতে একটি দম্পতির জীবনবৃত্তান্ত আছে—তার সমস্ত বিবরণই আমার কাছে যে হৃদ্য বলে বোধ হয়েছে তা নয় কিন্তু মোটের উপর বইটার ভিতর একটা জোর আছে তাতে আমি উপকার অনুভব করেছি—এবং আমার নিশ্চয় বিশ্বাস তুমিও উপকার পাবে। ···আমি বলি আগামী নববর্ষের প্রথম দিনে ঈশ্বরের কাছে একান্তমনে আত্মনিবেদন করে দিয়ে তোমার জীবনের কল্যাণের প্রবাহে নিঃসঙ্কোচে ভাসিয়ে দাও—আগামী বৎসর থেকে

সমস্ত তুচ্ছ শোক হতে মনকে মুক্ত কর—সমস্ত ক্ষুদ্র লজ্জাভয়কে একেবারে পরিত্যাগ কর— একেবারে বিশ্বক্ষেত্রের মাঝখানে দাঁড়িয়ে ঈশ্বরের মুখের দিকে মুখ তুলে চাও। ···আমার অনেকবার মনে হয়েছে—প্রিয় বড় দুর্ব্বলভাবে লালিত হয়ে এসেছে সে কি নিজেকে মঙ্গলের উপরে সুদৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করতে পারবে? আর তা যদি না পারে তাহলে ত কেবলি দুঃখ হতে দুঃখে দুর্ভিক্ষ হতে দুর্ভিক্ষেই সে যাত্রা করবে। কিন্তু ঈশ্বর তোমাকে জাগ্রত করবেন বলেই অনেক দুঃখ দিয়েছেন। এত দুঃখও যদি সার্থক না হয়ে ওঠে। তবে হল কি।[১৪৩]

এইসব কথা রবীন্দ্রনাথ যেমন প্রিয়ম্বদা দেবীকে বলেছেন, তেমনি তাঁকে উপলক্ষ করে সেগুলি নিজের উদ্দেশেও কথিত এবং তার প্রকৃত মূল্য সেইখানেই। ৪ কার্তিক [সোম 21 Oct] তিনি ভূপেন্দ্রনাথকে লিখেছিলেন : '···প্রিয়র চিঠি পাইলাম যে শম্ভুর বোন খেলা করিতে করিতে কাপড়ে আগুন লাগিয়া মরিয়াছে। সেই দৃশ্য দেখিয়া প্রিয় সান্ত্বনার জন্য আমাকে পত্র লিখিয়াছিল। আমি নিজেই তখন বেদনা পাইতেছিলাম। প্রিয়র পত্রের উত্তর দিতে গিয়া আমি নিজের চিত্তকে শান্ত করিতে পারিয়াছি।'[১৪৪] [প্রিয়ম্বদা দেবীকে লেখা এই চিঠিটি আমরা পাইনি, মাঘোৎসবে পঠিত 'দুঃখ' প্রবন্ধের প্রাথমিক ভাবনাগুলি সম্ভবত এই চিঠিতেই ব্যক্ত হয়েছিল।] এই মনোভাব থেকে কর্মের মধ্য দিয়ে জীবনকে গড়ে তোলার উপদেশ দিয়ে ৩০ ফাল্গুন [শুক্র 13 Mar] তিনি প্রিয়ম্বদা দেবীকে লিখলেন :

আমি তোমাকে নিজের দৃষ্টান্ত দিয়ে বলতে পারি—আমি যদি কাজে প্রবৃত্ত না হতুম তাহলে আমার কল্পনাবৃত্তি ও বুদ্ধিকে শেষ পর্য্যন্ত প্রয়োগ করেও নিজেকে জানতে পারতুম না। নিজের হৃদয়গ্রন্থিগুলো হৃদয়েই লুক্কায়িত থাকত সেগুলো কোনোদিনই ছিন্ন হত না। কাজ করতে গিয়ে প্রতিপদে দেখতে পাচ্ছি এখনো আমার মনে আর্থিক ক্ষতির আশঙ্কা অর্থাৎ লোভ রয়েছে—অথচ কাজ করতে করতে ঈশ্বর আমার এই আর্থিক লোভের সূত্রটুকু ক্রমশই ক্ষয় করে আনচেন—তা না করে উপায় নেই—যেখানে ব্যথা সেখানে ক্রমাগতই যে চোখ পড়চে—আমার যে সমস্ত দুর্ব্বলতা ঈশ্বরের সেবার বাধা তাতে যে কেবলই আঘাত পড়চে। সেই আঘাতের বেদনাতেই আমার মনে আশা জেগে উঠছে যে ক্রমে ক্রমে ঈশ্বর আমাকে জয়ী করবেন সেইজন্যেই আমাকে এই বয়সে কর্ম্মক্ষেত্রে নামিয়ে আমার নিজেকে আমার নিজের দৃষ্টির সামনে এমন করে ধরেচেন। শুধু দৃষ্টির সামনে ধরা নয়—অর্থাৎ কেবল জ্ঞানে জানানো নয়, কর্মের অনিবার্য্য সংঘর্ষে স্বার্থের সঙ্কীর্ণতা, স্বার্থের ভীরুতা প্রত্যহই ক্ষয় করা। অন্য কোনো উপায়েই এমনটি হতে পারত না। কর্ম্ম যে আমার অহমিকাকে আমার স্বার্থকে খাতির করে চলে না—সে আমার ক্ষুদ্রতাকে যে ঠিক ক্ষুদ্র করেই দেখিয়ে দেয়—নিজের সম্বন্ধে আমাকে কোনো কাল্পনিক বিভ্রম আঁকড়ে থাকতে দেয় না। এই কারণেই প্রেম যতক্ষণে কর্ম্মের ভিতর দিয়ে পরিশুদ্ধ পরিপূর্ণ হয়ে না যায় ততক্ষণে তা অহঙ্কারবিমুক্ত হয়ে ভোগের অধিকার পায় না।[১৪৫]

এমনি করেই রচনা ও কর্মে রবীন্দ্রনাথ নিজেকে চিনেছেন, আত্মার সংকীর্ণতা থেকে উদ্ধার পাওয়ার সাধনা করেছেন। এই অভিব্যক্তির ইতিহাসই রবীন্দ্রনাথের জীবনের ইতিহাস। কর্ম ও রচনায় স্তরে স্তরে অভিব্যক্ত এই জীবনকে বুঝে নেওয়ার কোনো সংক্ষিপ্ত পথ নেই।

ফাল্গুন-চৈত্র ১৩১৪-তে সাময়িকপত্রে প্রকাশিত রবীন্দ্র-রচনার সূচী :

প্রবাসী, ফাল্গুন ১৩১৪ [৭।১১]:

৬১০-২১ 'গোরা' ১৭-১৮ দ্র গোরা ৬।১৯৭-২১৫ [১৬-১৭]

৬৩৯-৫৬ 'পাবনা প্রাদেশিক সম্মিলনী উপলক্ষে সভাপতির বক্তৃতা' দ্র সমূহ ১০।৪৯৬-৫২২ ['সভাপতির অভিভাষণ']

[৬৩১-৩৫ 'একখানি নূতন গ্রন্থ']

লণ্ডনের লংম্যান, গ্রীন অ্যাণ্ড কোম্পানি কর্তৃক প্রকাশিত জগদীশচন্দ্রের *Comparative Electro-Physiology* [1907] গ্রন্থটির উল্লিখিত সমালোচনাটি জগদানন্দ রায়ের স্বাক্ষরে মুদ্রিত হলেও বক্তব্য ও ভাষার বিচারে এটিকে রবীন্দ্র-রচনা বলে আমাদের মনে হয়। জগদীশচন্দ্র 6 Dec [শুক্র ২০ অগ্র°] লণ্ডন থেকে বইটি রবীন্দ্রনাথকে পাঠিয়ে লেখেন : 'আমার নূতন পুস্তক পাঠাই, গ্রহণ করিয়া সুখী করিবে। তুমি যে বাঙ্গলা প্রবন্ধ

লিখিবে বলিয়াছিলে তাহা কি লিখিয়াছ?’[১৪৬] গ্রন্থটির বিষয়বস্তু নিয়ে তিনি রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে অনেক আলোচনা করেছিলেন, ‘স্মৃতি’ বিষয়ে শেষের অধ্যায়গুলি তাঁর প্রেরণাতেই লিখিত হয়েছিল একথা স্বয়ং জগদীশচন্দ্রই স্বীকার করেছেন। রবীন্দ্রনাথ এই বিষয় নিয়ে ‘বাঙ্গলা প্রবন্ধ’ লিখবেন বলে কথা দিয়েছিলেন, সমালোচনা-সূত্রে তিনি সেই প্রতিশ্রুতি পালন করলেন। রচয়িতা হিসেবে জগদানন্দ রায়ের নাম ব্যবহারে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই—আগে ও পরে অনেক রবীন্দ্র-রচনাই অন্যের নামে মুদ্রিত হয়েছিল। উক্ত শেষের অধ্যায়গুলি সম্বন্ধে প্রবন্ধটিতে লেখা হয়েছে :

পণ্ডিতগণ মনোবিজ্ঞানকে জড়বিজ্ঞান হইতে পৃথক্ করিয়া আলোচনা করিয়া থাকেন, কিন্তু এই দুয়ের মধ্যে যে একটা অতি নিগূঢ় সম্বন্ধ আছে, তাহা সকলেই মনে মনে বুঝেন। নানা কারণে সেই গূঢ় সম্বন্ধ আমাদের অজ্ঞাত রহিয়া গেছে। নূতন আবিষ্কারগুলি দ্বারা আচার্য্য বসু মহাশয় মন ও জড়রাজ্যের মধ্যবর্ত্তী সেই রহস্যকুহেলিকাবৃত সীমান্ত প্রদেশেরও সংবাদ আনিবার উপক্রম করিয়াছেন। সুখ দুঃখ মেধা স্মৃতি প্রভৃতির উৎপত্তিতত্ত্বের আভাস এই আবিষ্কারগুলিতে স্পষ্ট দেখা যাইতেছে। সে মহাশক্তির কণামাত্র পাইয়া বায়ু সঞ্চালিত হয়, সূর্য্য উত্তাপ প্রদান করে, মনোরাজ্যের বিচিত্র কার্য্য যে তাহারি অনন্তলীলার একটি সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম অংশ, আচার্য্য বসু মহাশয়ের আবিষ্কারে আমরা আজ তাহা স্পষ্ট বুঝিতেছি। যে মূলভিত্তির উপর দাঁড়াইয়া প্রকৃতি দেবী অনন্তব্রহ্মাণ্ডে অনন্ত বৈচিত্র্য দেখাইতেছেন, সেই ভিত্তির সন্ধান বিজ্ঞানের চরম লক্ষ্য। আচার্য্য বসু মহাশয় সেই লক্ষ্যকে সাফল্যের দিকে অনেকটা অগ্রসর করিয়াছেন।

এই বক্তব্য ও ভাষা, উপনিষদের মন্ত্রের সাবলীল ব্যবহারের প্রবণতা ও ক্ষমতা, রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব—এমন-কি, স্থূল বক্রাক্ষরে মুদ্রিত ‘রহিয়া গেছে’ প্রয়োগও তাঁর রচনাবৈশিষ্ট্যের চিহ্ন বহন করে। প্রবন্ধটিতে এইরূপ প্রয়োগ আরও আছে : ‘আবার প্রাণীর শারীরযন্ত্র উদ্ভিদ অপেক্ষাও জটিল হইয়া পড়ায় ইহার সাড়া দিবার শক্তি অত্যন্ত বৃদ্ধি ***পাইয়া গেছে*** [পৃ ৬৩৪]; ‘অপর বৈজ্ঞানিকগণ যাহাকে অচলধর্ম্মী ***বলিয়া গেছেন*** [পৃ ৬৩৪]; ‘আচার্য্য বসু মহাশয় উদ্ভিদ দেহেও এই বেদনা পরিবাহন দেখাইয়াছেন, এবং ইহাদের দেহ যে প্রাণীর মতই স্নায়ুজালে আচ্ছন্ন তাহাও প্রতিপন্ন ***হইয়া গেছে*** [পৃ ৬৩৪] ইত্যাদি—জগদানন্দ রায় এই ধরনের প্রয়োগ অভ্যস্ত ছিলেন না।

বঙ্গদর্শন, ফাল্গুন ১৩১৪ [৭।১১] :

৫৩১-৩৯ ‘দুঃখ’ দ্র ধর্ম ১৩।৪০০-১০

৫৭১-৯৩ ‘পাবনা প্রাদেশিক সম্মিলনী উপলক্ষে সভাপতির বক্তৃতা’ দ্র সমূহ ১০।৪৯৬-৫২২ [‘সভাপতির অভিভাষণ’]

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, ফাল্গুন ১৮২৯ শক [৭৭৫ সংখ্যা]:

১৭৮-৮৪ [১৫টি ব্রহ্মসঙ্গীত] দ্র গীতবিতান

প্রবাসী, চৈত্র ১৩২৪ [৭।১২]:

৬৯২-৭০১ ‘গোরা’ ১৯-২০ দ্র গোরা ৬।২১৬-৩১ [১৮-১৯]

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, চৈত্র ১৮২৯ শক [৭৭৬ সংখ্যা]:

১৮৫-৯৩ ‘দুঃখ’ দ্র ধর্ম ১৩।৪০০-১০

গদ্যগ্রন্থাবলী-র অষ্টম ভাগ ‘প্রজাপতির নির্বন্ধ’ প্রকাশিত হয় 26 Feb 1908 [বুধ ১৪ ফাল্গুন]। ২০ ফাল্গুন [মঙ্গল 3 Mar] ক্যাশবহিতে ‘মজুমদার লাইব্রেরী হইতে ৯৫০ খান প্রজাপতির নিবন্ধ পুস্তক’ আসার হিসাব পাওয়া গেলেও বেঙ্গল লাইব্রেরির ক্যাটালগ অনুযায়ী বইটির মুদ্রণসংখ্যা ১০৫০। পৃষ্ঠাসংখ্যা : ২+১৮৯; মূল্য

: বারো আনা। ভারতী-তে বৈশাখ ১৩০৭ থেকে জ্যৈষ্ঠ ১৩০৮ পর্যন্ত রচনাটি 'চিরকুমার সভা' নামে মুদ্রিত হয়, একই নামে গ্রন্থিত হয় 'হিতবাদির উপহার' 'রবীন্দ্র গ্রন্থাবলী'-র [১৩১১] 'রঙ্গচিত্র' বিভাগে; 'প্রজাপতির নির্বন্ধ' নাম ধারণ করল গদ্যগ্রন্থাবলী-তে। বেঙ্গল লাইব্রেরির ক্যাটলগে ভারতী-তে 'চিরকুমার সভা' নামে প্রকাশের কথা উল্লেখিত হলেও গ্রন্থটি প্রথম সংস্করণ বলে অভিহিত হয়েছে। অন্যান্য বিবরণ :

আখ্যাপত্র : গদ্যগ্রন্থাবলী, ৮ম ভাগ/ প্রজাপতির নির্ব্বন্ধ।/ শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।/ মূল্য ০ আনা।

প্রকাশক— শ্রীসুহাসচন্দ্র মজুমদার,/ মজুমদার লাইব্রেরি,/ ২০ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট্, কলিকাতা।/ কলিকাতা, ২০ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, দিনময়ী প্রেসে/ শ্রীহরিচরণ মান্না দ্বারা মুদ্রিত।

পাবনা প্রাদেশিক সম্মেলনে প্রদত্ত সভাপতির অভিভাষণ ফাল্গুন ১৩১৪-সংখ্যা প্রবাসী ও বঙ্গদর্শন-এ প্রকাশিত হলেও স্বতন্ত্র পুস্তিকাকারেও মুদ্রিত হয়। বেঙ্গল লাইব্রেরির ক্যাটালগ অনুযায়ী চার আনা দামের ৫০ পৃষ্ঠার পুস্তিকাটি প্রকাশের তারিখ 11 Apr 1908 [শনি ২৯ চৈত্র]। মূল পুস্তিকাটি আমরা দেখিনি বলে উক্ত ক্যাটালগে প্রদত্ত বিবরণটি উদ্ধৃত করে দিচ্ছি :

349/ Ravindra Nath Thakur.—সভাপতির অভিভাষণ, পাবনা সম্মিলনী, ১৩১৪ সাল। [Sabhapatir Abhibhásan, Pabna Sammilani, 1314. President's Address at the Pabna Conference 1314 B.S. The Speech of the President Babu Ravindra Náth Thákur, at the Pabna Conference held in 1908.] Pages 50. Published by Ranagopál Chakravarti, 55, Upper Chitpur Road, Calcutta. [11th April 1908.] 12°. 1st edition. Price, 4 annas./ Ranagopal Chakravarti, 55, Upper Chitpur Road, Calcutta./ 1,000/.../The author, 6, Dváraká Náth Tagore's Lane, Calcutta.

পুস্তিকাটি কিঞ্চিৎ পূর্বে প্রকাশিত হয়েছিল বলে মনে হয়। ২৭ চৈত্র [বৃহ 9 Apr] ক্যাশবহিতে দেখি : 'পাবনা সম্মিলনীর বক্তৃতা বিক্রয় খাতায় জমা ১৫ মা° শৈলেশচন্দ্র মজুমদার দং উক্ত বক্তৃতা বিক্রয় হওয়ায় মূল্য পাওয়া যায় গুঃ খোদ বাবু মহাশয় ১৫'। এই দিনই 'বাবু জগদীশ চন্দ্র বসুর নিকট, বিলাতে এক বুক পোষ্ট পাঠান ব্যায়'-এর হিসাব পাওয়া যায়—এই পুস্তিকাটিই তাঁকে পাঠানো হয়েছিল।

চৈত্র ১৩১৪-তে কালীমোহন ঘোষ এসে রবীন্দ্রনাথের গ্রাম-পুনর্গঠনের কাজে যোগ দিলেন। ইতিপূর্বে ভূপেশচন্দ্র রায়ের তত্ত্বাবধানে রবীন্দ্রনাথ শিলাইদহের কাছাকাছি গ্রামগুলিতে কাজের সূত্রপাত করছিলেন, কালীমোহনকে তিনি ভার দিলেন কালীগ্রাম পরগণার। কয়েকদিন পরে ১১ চৈত্র [মঙ্গল 24 Mar] তিনি অজিতকুমার চক্রবর্তীকে এঁর সম্বন্ধে লিখেছেন:

লোকপ্রেম বলে একটি জিনিষ আছে সে এক একজনের স্বভাবসিদ্ধ—তার পক্ষে সেটা intellectual নয়, কর্ত্তব্যবুদ্ধিগত নয়, সেটা তার হৃদয়বৃত্তির অন্তর্গত। এরাই সম্পূর্ণ প্রাণ দিয়ে জনহিতের কাজ করতে পারে। ···এইরকম একটি পূর্ব্ববঙ্গের ছেলে আমার কাছে এসেছে—এর পড়াশুনা অল্পই—কিন্তু এর মধ্যে প্রাণের শক্তি ভাবের শক্তি খুব বেশী। এ ছেলেটি এফ্, এ পর্যন্ত পড়ে, পরীক্ষায় পাস্ না দিয়ে পূর্ব্ববঙ্গের সমস্ত গোলমালের মধ্যে ঘুরে বেড়িয়েছে—এর শরীর নিতান্ত দুর্ব্বল ও রুগ্ন। সাংসারিক অবস্থা নিতান্ত শোচনীয়—কিন্তু এর মধ্যে ভাবের উদ্দীপনা অত্যন্ত সত্য—সেইজন্যে একে কিছুতেই প্রতিহত করতে পারে নি এবং সেইজন্যে এর মুখের কথায় চাষাভুষোরা পর্য্যন্ত উৎসাহিত হয়। নিজের শক্তির প্রতি এর একটা বিনম্র বিশ্বাস আছে—"পারব" কথাটা কখনোই ত্যাগ করে না। ঠিক এই type-এর লোক আমি সন্ধান করছিলুম—একে দেখে আমি খুব আশান্বিত হয়েছি। এখন এই ছেলেটিকে পূর্ব্ববঙ্গের কোনো একটা পল্লীকে গড়ে তোলবার জন্যে পাঠাচ্ছি—এখানে তারই একটি অনুবর্ত্তী লোক কাজ করচে।[১৪৭]

কালীমোহন এর পর থেকে তাঁর সমস্ত জীবন রবীন্দ্রনাথের কাজে উৎসর্গ করে দিয়েছিলেন।

এঁরই কাছে ক্ষিতিমোহন সেনের সাহিত্যানুরাগ ও বিদ্যাবুদ্ধি ছাড়াও লোকপ্রেমের সংবাদ পেয়ে রবীন্দ্রনাথ তাঁর সম্পর্কে উৎসাহী হয়ে ওঠেন। তিনি লিখেছেন :

আমি নিজের অন্তরের দৈন্য অনুভব করি বলেই এই সম্পদটির প্রতি আমার লুব্ধতার অন্ত নেই। বিদ্যালয়ে ভাবের প্রবাহ সত্যরূপে জাগ্রত করতে হলেই ভাবুকের প্রয়োজন, বিদ্বানের নয়। ···মাঠের মধ্যে ছেলেদের রেখে শিক্ষা দিচ্চি কিন্তু লোকালয়ের জন্যে ওদের যথার্থভাবে প্রস্তুত করতে হবে ত। ওরা যদি সাধারণ শিক্ষিত বাঙ্গালীর মত বই পড়া ভালমানুষ লোক হয়ে ওঠে—ওদের অন্তঃকরণ যদি সত্যভাবে মানবপ্রেমে অভিষিক্ত না হয়ে ওঠে তাহলে আমাদের চেষ্টা ব্যর্থ হবে। ···আমাদের ছেলেরা আমাদের দেশের ক্ষুধাতৃষ্ণা দূর করবার জন্যেই আমাদের বিদ্যালয়ের নির্জ্জনে সত্যের ও ভাবের ধারায় পরিপুষ্ট হতে এবং ধর্ম্মের বলে উদ্যত বেগ লাভ করতে থাক্‌বে এই আমার ইচ্ছা—সেইজন্যে বিদ্যালয়ের চিত্তের ভিতরে এই Song of the open road জাগিয়ে তুলতে চাই। ···যে সকল লোক যথার্থই পথের পথিক, যাঁরা ঘুরেছেন, দেখেছেন, মিশেছেন, কাজ করে বেড়িয়েছেন, যাঁরা মানুষকে যথার্থই সঙ্গ দিতে পারেন এবং যাঁরা অন্তরের সঙ্গে মানুষের সঙ্গ চান—যাঁরা সমস্ত দীনতার ভিতর থেকেও মানুষকে ভালবাসতে পারেন, কোনো মূঢ়তা ও কুশ্রীতা যাঁদের মানুষের কাছ থেকে প্রত্যাহত করে না সেই লোকই আমাদের মনে মানবতীর্থে যাত্রা করে বেরবার ঠিক উদ্যমটি ধরিয়ে দিতে পারেন। ক্ষিতিমোহন বাবুর সম্বন্ধে আমি হয়ত idealize করচি—সকলেরই সম্বন্ধে আমি ন্যূনাধিক পরিমাণে তাই করে থাকি এবং প্রত্যেকেরই সম্বন্ধে সত্য উপলব্ধি করবার সেই একটা উপায়। ক্ষিতিমোহন বাবুর সম্বন্ধে আর একটি কথা শুনে আমি খুব খুসি হয়েছি। তিনি যদিচ প্রাচীন শাস্ত্রজ্ঞ, তথাপি আচরণে তিনি অত্যন্ত উদার। তিনি বলেন এই ঔদার্য্য তিনি শাস্ত্র হতেই লাভ করেচেন। হিন্দুধর্ম্মকে যাঁরা নিতান্ত সঙ্কীর্ণ করে অপমানিত করেন তাঁদের মধ্যে এঁদের দৃষ্টান্ত হয়ত কাজ করবে। অন্তত ছাত্রদের মনকে সঙ্কীর্ণতা থেকে মুক্ত করবার পক্ষে ইনি অনেকটা সাহায্য করতে পারবেন।

বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার সূচনা থেকেই ব্রাহ্মণ-অব্রাহ্মণের সমস্যা রবীন্দ্রনাথকে পীড়িত করছিল—প্রথম পর্বে বর্ণাশ্রমের ভারতীয় আদর্শের প্রতি অত্যধিক আসক্তির জন্য তিনি তাকে মেনে নিয়েছিলেন। কিন্তু আজন্ম-লালিত ব্রাহ্ম সংস্কারমুক্তির আদর্শ নিশ্চয়ই তাঁর ভিতরে ভিতরে আত্মখণ্ডনের বেদনা জাগিয়ে তুলছিল। ভূপেন্দ্রনাথের ঈশ্বরমুখীনতা ও বিধুশেখরের পাণ্ডিত্যের প্রতি তিনি সশ্রদ্ধ ছিলেন, কিন্তু তাঁদের স্বপাকভোজী আচারনিষ্ঠা নিয়ে মাঝে মাঝে কটাক্ষ করতেও ছাড়েননি। সেইজন্যই ক্ষিতিমোহনের শাস্ত্রজ্ঞতার সঙ্গে আচারের ঔদার্য তাঁকে মুগ্ধ করেছে। মধ্যযুগের সন্ত-সাহিত্য সম্পর্কে জ্ঞানে, অন্তত বাংলাদেশে, ক্ষিতিমোহনের সমকক্ষ কেউ ছিলেন না। এই সাহিত্যে ও জীবনদর্শনে রবীন্দ্রনাথকে ক্ষিতিমোহনই দীক্ষিত করেছিলেন, যা পরবর্তী কয়েক বছরে তাঁর জীবনসাধনায় ও কাব্যরূপে বিপুল পরিবর্তন আনয়ন করেছিল।

সম্ভবত ক্ষিতিমোহনের আগমন-সম্ভাবনা তাঁর মনে যে ভাবের আবেগ সৃষ্টি করেছিল তার ফলেই রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনে ফেরার জন্য ব্যস্ত হয়ে ওঠেন। ইতিপূর্বে পদ্মাতীর থেকে তাঁর শান্তিনিকেতনে ফেরা নানা কারণে পিছিয়ে যাচ্ছিল। শেষে ঠিক করেছিলেন, এই বৎসরটি শিলাইদহে কাটিয়ে আগামী বর্ষের শুরুতে শান্তিনিকেতনে যাবেন; ৯ ফাল্গুন [শুক্র 21 Feb] প্রমথলাল সেনকে লেখেন : 'আমি চৈত্রমাসটা এইখানে কাটিয়ে আগামী নববর্ষে বোলপুরে যাব এইরকম সংকল্প করেছি।'[১৪৮] কিন্তু চৈত্রের মাঝামাঝি তিনি শান্তিনিকেতনে ফেরার ব্যবস্থা করতে থাকেন। অনাবৃষ্টির জন্য তখন শান্তিনিকেতনে অত্যন্ত জলাভাব, জোড়াসাঁকোতেও বসন্ত ইত্যাদি রোগের উপদ্রব। তাই ১৭ চৈত্র [সোম 30 Mar] তিনি ভূপেন্দ্রনাথকে লেখেন : 'বিদ্যালয়ে ফিরিবার জন্য আমার মন ব্যগ্র হইয়াছে। গত বৃহস্পতিবারেই [১৩ চৈত্র : 26 Mar] এখান হইতে রওনা হইব স্থির করিয়াছিলাম কিন্তু বোলপুরে আমরা গিয়া যদি থাকি তবে আমাদের কূপ হইতে আপনারা যেটুকু জলের সাহায্য পাইতেছেন তাহাও ত পাইবেন না। ...কলিকাতায় মেয়েদের রাখিয়া যাইব স্থির করিয়াছিলাম, সত্য লিখিয়াছেন জোড়াসাঁকোর বাড়িসুদ্ধ ছেলের হাম হইতেছে—এ ছাড়া সেখানে পানবসন্ত বসন্ত প্রভৃতির উপদ্রবের কথা শুনা যাইতেছে— এ অবস্থায় বেলা মীরাকে কলিকাতায় রাখিয়া ত

নিশ্চিন্ত হইতে পারিব না। বিশেষ ভাবে এই বাধাতেই আমাকে আপাতত আটক করিয়া রাখিয়াছে। জোড়াসাঁকোর একটু ভাল খবর পাইলেই রওনা হইব।'[১৪৯]

কিন্তু জলকষ্টের জন্য শেষপর্যন্ত বিদ্যালয়ে ছুটি ঘোষণার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। এই খবর জেনে কিছুটা নৈরাশ্যের সঙ্গে ২২ চৈত্র [শনি 4 Apr] তিনি ভূপেন্দ্রনাথকে লেখেন : 'ঈশ্বর ছুটি তাহলে ঘটালেন। ভেবেছিলুম নববর্ষের আরম্ভ থেকে আবার বিদ্যালয়ে প্রবেশ করে নূতন উৎসাহে কাজে প্রবৃত্ত হব—সেটা ঠিক ঘটে উঠ্‌ল না। আরো দুইমাস দেরি হবে।'[১৫০] কিন্তু মীরা দেবীর শরীর আবার খারাপ হওয়াতে তাঁর চিকিৎসার জন্যই কলকাতায় ফেরার দরকার হল। তিনি ঐ চিঠিতেই লিখলেন : 'আমি আজই বোট নিয়ে দামুকদিয়ায় রওনা হব। সোমবার দার্জিলিং মেলে সেখান থেকে কলকাতায় যাত্রা করব। তারপরে আপনাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে যথাকর্তব্য স্থির করা যাবে।'

মাস-চারেক শিলাইদহে বাস করে রবীন্দ্রনাথ কন্যাদ্বয়কে নিয়ে কলকাতায় ফেরেন ২৪ চৈত্র [সোম 6 Apr]। ২৫ চৈত্র 'শ্রীযুক্ত রবীন্দ্র বাবু মহাশয়ের নানা স্থানে যাতায়াতের গাড়ি ভাড়া বালিগঞ্জ', ২৬ চৈত্র কলুটোলা, ২৭ চৈত্র বালিগঞ্জ ও 'বহুবাজার' যাওয়ার হিসাব পাওয়া যায়। '২৮ চৈত্র [শুক্র 10 Apr] সুরেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও বিপিন পাল দিগকে খাওয়ানর' হিসাব থেকে মনে হয়, এরই আয়োজনে রবীন্দ্রনাথ ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলেন। এই দিন তিনি প্রমথলাল সেনকে লিখেছেন : 'দুতিন [দিন] হল কলকাতায় এসেছি। কিন্তু মুহূর্ত্তকাল অবকাশ পাই নি। আজ চিঠি লিখতে বসেছি কিন্তু লোকের আক্রমণ এড়াতে পারিনি। কেবল এই ক'টি কথা বলে রাখছি যে, আগামী কাল বোলপুরে চলে যাচ্চি—দিন দশ বারো সেখানে থাকব। তার পরে আমার গতিবিধির কিছুই স্থিরতা নেই।'[১৫১] এই দিন শ্রীশচন্দ্র মজুমদারকেও একই কথা লিখেছেন। শ্রীশচন্দ্র তাঁকে আবার বঙ্গদর্শন-এর সঙ্গে যুক্ত করতে চাইছিলেন, প্রত্যুত্তরে তাঁকে লেখেন : 'বঙ্গদর্শনের নাগপাশে আমাকে আর জড়াইবার চেষ্টা করিয়োনা। কলম ছুঁইতে আর ভালই লাগেনা। কিছুকাল সকল কাজেই ইস্তাফা দিয়া বিশ্রাম করিতে পারিলে বাঁচিতাম—কিন্তু কাজ বাড়িতেছে বই কমিতেছে না।'[১৫২]

২৯ চৈত্র [শনি 11 Apr] রবীন্দ্রনাথ ভৃত্য উমাচরণকে নিয়ে শান্তিনিকেতনে যান। সেখান থেকে ফিরে তাঁর দার্জিলিং জেলার তিনধরিয়াতে যাওয়ার কথা ছিল। আশুতোষ চৌধুরী সেখানে এক সাহেবের কাছ থেকে একটি একতলা বাংলো-সহ চা-বাগান কেনেন এবং বাড়িটি বাড়িয়ে দোতলা করেন।[১৫৩] তাঁরই আমন্ত্রণে রবীন্দ্রনাথের তিনধরিয়া যাওয়ার কথা হয়। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ৩১ চৈত্র [সোম 13 Apr] তাঁর ডায়ারিতে লেখেন : 'রবির আসাও হবে না—রবি টিণ্ডারিয়ায় যাচ্চেন।' কিন্তু তিনধরিয়াতে তাঁর যাওয়া হয়নি—তিনি সেখানে যান জ্যৈষ্ঠ ১৩১৭ [May 1910]-তে।

প্রাসঙ্গিক তথ্য : ১

বর্তমান বৎসরে জোড়াসাঁকো ঠাকুর পরিবারের প্রথম উল্লেখযোগ্য ঘটনা রবীন্দ্রনাথের কনিষ্ঠা কন্যা মীরা দেবীর সঙ্গে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ-ভুক্ত বরিশালের বামনদাস গঙ্গোপাধ্যায়ের মধ্যম পুত্র নগেন্দ্রনাথের বিবাহ। আদি ব্রাহ্মসমাজ মতে বিবাহটি হয় শান্তিনিকেতনে ২৩ জ্যৈষ্ঠ [বৃহ 6 Jun]। তার আগে ৬ বা ৭ জ্যৈষ্ঠ

[20/21 May] রবীন্দ্রনাথ তাঁকে প্রচলিত প্রথা অনুযায়ী ব্রাহ্মধর্ম দীক্ষা দেন। বিবাহের সময় নগেন্দ্রনাথের বয়স সতেরো বছর সাত মাস, মীরা দেবীর বয়স সাড়ে তেরো। নগেন্দ্রনাথের পরিবারের আর্থিক অবস্থা ভালো ছিল না, তার ফলে তাঁর পিতাকে ঋণ দেওয়া থেকে শুরু করে জ্যেষ্ঠ ও কনিষ্ঠ ভ্রাতা উপেন্দ্র ও ধীরেন্দ্রের থাকা-খাওয়া ইত্যাদি অনেক দায় রবীন্দ্রনাথকে বহন করতে হয়েছে। নগেন্দ্রনাথ দেশে ফিরে আসার পরও এই দায়বহন নিয়ে অনেক অশান্তি সহ্য করতে হয়েছে রবীন্দ্রনাথকেই। নগেন্দ্রনাথের ডায়ারি থেকে জানা যায়, তিনি 9 Aug [শুক্র ২৪ শ্রাবণ] লণ্ডনে, 21 Aug [বুধ ৪ ভাদ্র] নিউ ইয়র্কে ও দু'দিন পরে 23 Aug [শুক্র ৬ ভাদ্র] আরবানায় পৌঁছন।

নগেন্দ্রনাথ আমেরিকা যাত্রা করেন ১৩ আষাঢ় [শুক্র 28 Jun]। এর কয়েকমাস পরে রবীন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠ জামাতা শরৎকুমার চক্রবর্তীও ব্যারিস্টারি পড়ার উদ্দেশ্যে ইংলণ্ড যাত্রা করেন ২৫ ভাদ্র [বুধ 11 Sep]। দীর্ঘকাল মজঃফরপুরে সাফল্যের সঙ্গে ওকালতি ব্যবসা করলেও শরৎকুমারের বিলেতে থাকার খরচ রবীন্দ্রনাথই বহন করেন। প্রতি মাসে ১০ পাউণ্ড [মোটামুটি ১৫০ টাকা] তাঁকে বিলেতে পাঠানো হয়েছে।

দিনেন্দ্রনাথ ব্যারিস্টারি পড়ার জন্য গত বৎসর ইংলণ্ডে গিয়েছিলেন। কিন্তু পড়াশুনোয় মন বসাতে পারেননি বলে কিছুদিন পরেই [২৫ বৈশাখ বুধ 8 May] তিনি দেশে প্রত্যাবর্তন করেন। কিন্তু কেউই এব্যাপারে সন্তুষ্ট হননি। রাজলক্ষ্মী দেবী ১১ ভাদ্র [বুধ 28 Aug] রথীন্দ্রনাথকে লিখেছেন : 'দিনু আবার বিলেত যাচ্ছে, —কাল কলকাতা থেকে Bombay গেছে, —সেখানে গিয়ে জাহাজে উঠ্‌বে। অনেক তর্কবিতর্ক ও ভাবনাচিন্তার পর তাকে বিলেতে পাঠানই ঠিক হ'ল।'[১৫৪] দিনেন্দ্রনাথ 31 Aug [শনি ১৪ ভাদ্র] বোম্বাই থেকে ইংলণ্ড রওনা হন। কিন্তু তিনি এবারেও বেশিদিন সেখানে থাকতে পারেননি, ১৮ অগ্র° [4 Dec] এস্টেটের ক্যাশ থেকে 'দিনু বাবুর আসার জন্য কুক এণ্ড সন ব্যাঙ্কে জমা দেওয়া ৮৫০্ টাকার মধ্যে ৬২৫্' টাকা দ্বিপেন্দ্রনাথকে দেওয়া হয়।

ঠাকুরপরিবারের সঙ্গে সম্পর্কিত আশুতোষ চৌধুরীর পুত্র আর্যকুমারের বিবাহ হয় ৩০ শ্রাবণ [বৃহ 15 Aug] রণেন্দ্রমোহন ঠাকুরের কন্যা লীলাবতী দেবীর সঙ্গে। আশুতোষ পুত্রকে কেম্‌ব্রিজে ভর্তি করে দেবার উদ্দেশ্যে তাঁকে নিয়ে ১২ ভাদ্র [বৃহ 29 Aug] ইংলণ্ড যাত্রা করেন। তাঁর ভ্রাতা ব্যারিস্টার অমিয়নাথ চৌধুরীর বিবাহ হয় স্বর্গত উমেশচন্দ্র বোনার্জির কন্যা প্রমীলাসুন্দরী দেবীর সঙ্গে ২৮ শ্রাবণ [মঙ্গল 13 Aug] তারিখে। ইনি পরবর্তীকালে রবীন্দ্রনাথের অন্যতম উত্তমর্ণ হয়ে উঠেছিলেন।

ঠাকুরপরিবারে আরও কয়েকটি বিবাহ হয় এই বৎসরে। ৯ মাঘ [বৃহ 23 Jan] সত্যপ্রসাদের একমাত্র পুত্র সুপ্রকাশের বিবাহ হয় তনুজা দেবীর সঙ্গে। একই দিনে গগনেন্দ্রনাথের পুত্র কনকেন্দ্রনাথের বিবাহ হয় সুরমা দেবীর সঙ্গে।

ঋতেন্দ্রনাথের প্রথম পুত্র ঋদ্ধিন্দ্রের অন্নপ্রাশন হয় ২৩ অগ্র° [সোম 10 Dec]। সুরেন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠা কন্যা মঞ্জুশ্রীর অন্নপ্রাশনের তারিখ ২৮ পৌষ [সোম 13 Jan], জ্যোতিরিন্দ্রনাথ তাঁর ডায়ারিতে লিখেছেন: 'খুকীর অন্নপ্রাশন হল— [প্রিয়নাথ] শাস্ত্রী বেদীতে বসলেন—"মঞ্জুশ্রী" নাম হল।'

এই বৎসর ঠাকুরপরিবারকে কয়েকটি মৃত্যুর আঘাতও সহ্য করতে হয়। বৈশাখেই সমরেন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠ পুত্র সমীরেন্দ্রনাথের মৃত্যু হয়। পূর্ণিমা দেবী লিখেছেন : 'মেজকাকার বড়ছেলে ন্যাড়াদাদার সঙ্গে ঐ জলধিবাবুর [যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের দৌহিত্র জলধি মুখোপাধ্যায়] মেয়ে প্রকৃতি দেবীর বিয়ের কথা ঠিক ছিল।

কিন্তু তারও যে তারিখে বিয়ের দিন স্থির হয়েছিল তার আগেই খুব জ্বর হয়। জ্বর ছাড়ছে না, বরং বেড়েই যাচ্ছে দেখে বিয়ে বন্ধ করে দেওয়া হয়। ডাক্তার রোগ ধরতে পারলে না। ক্রমশঃ মাথা ফুলতে লাগল। যে তারিখে বিয়ের দিন স্থির ছিল, সেই রাতেই ন্যাড়াদাদা মারা গেল। তখন শুনলাম মাথায় নাকি প্লেগ হয়েছিল।'[১৫৫] রবীন্দ্রনাথ ২২ বৈশাখ [রবি 5 May] মীরা দেবীকে লিখেছেন : 'দিনকতক হল সমরের বড় ছেলেটি (ন্যাড়া) হঠাৎ মারা গেছে। সেজন্যও মৃত্যুর ছায়ায় জোড়াসাঁকো আচ্ছন্ন হয়ে আছে।' ২৬ চৈত্র [বুধ 8 Apr 1908] ক্ষিতীন্দ্রনাথের স্ত্রী ধৃতিময়ী দেবীর মৃত্যু হয়; জ্যোতিরিন্দ্রনাথ তাঁর ডায়ারিতে লেখেন : 'আজ শুনলুম ক্ষিতীর স্ত্রীর হঠাৎ হৃদয়-দৌর্ব্বল্যে মৃত্যু হয়েছে।' ৭ অগ্র° [শনি 23 Nov] রবীন্দ্রনাথের কনিষ্ঠ পুত্র শমীন্দ্রনাথের মৃত্যু হয়, সেকথা আমরা পূর্বেই বলেছি।

পাথুরিয়াঘাটার মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর মহর্ষির পরে এই পরিবারের সর্বাধিক সম্মানিত ব্যক্তি ছিলেন। রবীন্দ্রনাথ বৈশাখের শুরুতে তাঁকে লেখেন : 'আপনার আশীর্ব্বাদীপত্র নানা স্থান ঘুরিয়া অদ্য শান্তিনিকেতনে এইমাত্র আমার হস্তগত হইল। আপনি এক্ষণে আমাদের মান্যশ্রেষ্ঠ কুলপতিরূপে বর্ত্তমান। আপনার আশীর্ব্বাদপত্র আমার নিকট নববর্ষের আশীর্ব্বাদ বহন করিয়া আনিল।'[১৫৬] ৭৮ বছর বয়সে যতীন্দ্রমোহনের মৃত্যু হয় ২৫ পৌষ [শুক্র 10 Jan 1908] তারিখে।

বিবাহের পর মীরা দেবী কিছুদিন বরিশালে শ্বশুরবাড়ি গিয়ে থেকেছিলেন। তিনি সন্তোষচন্দ্র মজুমদারকে একটি পত্রে লিখেছেন : 'আমরা সব নন্দি ভৃঙ্গিরা মিলে ছাতে লুকিয়ে যখন যত তেঁতুল কুল আমের আচার ছোলা ভাজা তেল দিয়ে মাখা ছাতু ইত্যাদি রোগের পথ্যি বড়দের চোখ এড়িয়ে খেতুম তখন তার কি স্বাদই লাগত।'[১৫৭] এর ফল তাঁর পক্ষে ভালো হয়নি। রবীন্দ্রনাথকে উদ্বিগ্ন করে দীর্ঘকাল তিনি রোগশয্যা অবলম্বন করেছিলেন।

বিবাহের পর সরলা দেবী পাঞ্জাবে চলে যাওয়ায় 'ভারতী' পরিচালনায় অত্যন্ত বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। ফলে '১৩১৪ সালের মাষাঢ় মাসেও বৈশাখ সংখ্যা ভারতী বেরুলো না।'[১৫৮] উপযুক্ত ব্যবস্থাপনার জন্য সরলা দেবী কলকাতায় আসেন জ্যৈষ্ঠ মাসের মাঝামাঝি। তাঁর পাঞ্জাবের জীবন সম্পর্কে একটি দীর্ঘ সাক্ষাৎকার মুদ্রিত করে *The Bengalee* 14 Jun [শুক্র ৩১ জ্যৈষ্ঠ] লেখে : 'Sarala Devi had come to Calcutta on a visit to her parents and relatives... The lady ...gave birth to a son nearly a year ago and she herself nurses and sucks the babe.... She will stay in Calcutta for two or three months more or even longer to arrange for the proper management and punctual publication of Bharati.' তিনি তরুণ লেখক সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়ের উপর পরিচালনার দায়িত্ব অর্পণ করেন। সৌরীন্দ্রমোহন ইতিপূর্বে শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের [1876-1938] 'বড়দিদি' গল্পটি সংগ্রহ করেছিলেন। লেখকের নাম না দিয়ে গল্পটির দুটি কিস্তি ভারতী-র বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ-সংখ্যায় মুদ্রিত হলে পত্রিকাটি আবার জনপ্রিয়তা অর্জন করল। অনেকেই গল্পটি রবীন্দ্রনাথের লেখা বলে সন্দেহ করেছিলেন। আষাঢ়-সংখ্যায় গল্পটির শেষ কিস্তির সঙ্গে লেখকের নাম মুদ্রিত হলে বাংলা সাহিত্যে এক শক্তিমান কথাসাহিত্যিকের আবির্ভাবের কথা ঘোষিত হল। কিন্তু সৌরীন্দ্রমোহন অভিযোগ করেছেন, গ্রাহক-চাঁদা ইত্যাদি সরলা দেবী নিজেই গ্রহণ করায় অর্থাভাবে পত্রিকাটি বিপন্ন হয়ে পড়ে, ফলে '১৯০৮ সালের জানুয়ারি মাসে কোনো রকমে আমি বার করলুম···১৩১৪

সালের আশ্বিন-সংখ্যা ভারতী।'[১৫৯] এই ছ'টি সংখ্যাতেই বর্ষশেষ করা হয়, বৈশাখ ১৩১৫-সংখ্যা থেকে স্বর্ণকুমারী দেবী পুনশ্চ ভারতী-সম্পাদনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন।

প্রাসঙ্গিক তথ্য : ২

৩ জ্যৈষ্ঠ [শুক্র 17 May] মহর্ষির একনবতিতম জন্মোৎসব পালিত হবার কথা, কিন্তু তত্ত্ববোধিনী ও অন্যান্য পত্রিকায় এই অনুষ্ঠান সম্পর্কে কোনো উল্লেখ নেই।

নববিধান সমাজের বিনয়েন্দ্রনাথ সেন ব্রহ্মবিদ্যা চর্চার জন্য কলকাতায় একটি প্রতিষ্ঠান স্থাপনের কথা বহুদিন ধরে চিন্তা করছিলেন। রবীন্দ্রনাথ ১৮ জ্যৈষ্ঠ ১৩১৩ [1 Jun 1906] একটি পত্রে তাঁর পরিকল্পনা সমর্থন করেন। বর্তমান বৎসরে ২৩ আষাঢ় [সোম ৪ Jul] বর্ধমানের মহারাজার সভাপতিত্বে অ্যালবার্ট হলে অনুষ্ঠিত একটি সভায় এই ব্রহ্মবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হল; সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর বিদ্যালয়ের সম্পাদক ও বিনয়েন্দ্রনাথ সহযোগী-সম্পাদক হন। রবীন্দ্রনাথ এইদিন কলকাতায় ছিলেন, কিন্তু এই সভায় উপস্থিত ছিলেন কিনা বলা যায় না। বিদ্যালয়ের কাজকর্ম সম্পর্কে তত্ত্ববোধিনী-তে লেখা হয়েছে : 'মনোবিজ্ঞান, তর্কশাস্ত্র, ভারত ইতিহাস, ধর্ম্মতত্ত্ব, ভগবদগীতা, ভারতে ধর্ম্ম-বিকাশ, এবং বিবিধ ধর্ম্ম শাস্ত্রের সারমর্ম্ম ও অন্যান্য বিষয় এই বিদ্যালয়ে শিক্ষা দেওয়া হইবে। শিক্ষা ৩ বৎসরব্যাপী এবং এই প্রথম বৎসরের জন্য ব্রহ্মবাদ, মনোবিজ্ঞান, উপনিষদ ধম্মপদ প্রভৃতি কতকগুলি বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া যাইবে। ছাত্রবৃত্তি মাসিক ১৫৲ টাকা নির্দ্ধারিত করা হইয়াছে; বৃত্তি-ভোগী চারিজন ছাত্র বিদ্যালয়ে থাকিয়া অধ্যয়ন করিতেছেন। বাহিরের আরও কতিপয় ছাত্র উপদেশের সময় উপস্থিত থাকেন।'[১৬০] বর্ধমানরাজ প্রতি মাসে ৩০০ টাকা করে সাহায্য করছিলেন।

১ শ্রাবণ [বুধ 17 Jul] ট্রাস্টীরা আদি ব্রাহ্মসমাজের জন্য কর্মচারী নিয়োগ করেন :

আচার্য ও সভাপতি : দ্বিজেন্দ্রনাথ ও সত্যেন্দ্রনাথ; উপাচার্য : প্রিয়নাথ শাস্ত্রী, চিন্তামণি চট্টোপাধ্যায় ও যোগেন্দ্রনাথ শিরোমণি; সম্পাদক : রবীন্দ্রনাথ; সহকারী সম্পাদক : সত্যপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়; কর্মাধ্যক্ষ ও ধনরক্ষক : প্রসন্নকুমার রায়চৌধুরী; সহকারী কর্মাধ্যক্ষ : যোগেন্দ্রনাথ শিরোমণি; তত্ত্ববোধিনী সম্পাদক : দ্বিজেন্দ্রনাথ; সহকারী সম্পাদক : চিন্তামণি চট্টোপাধ্যায়; গায়ক; রাধিকাপ্রসাদ গোস্বামী ও শ্যামসুন্দর মিশ্র; বাদক : কৃষ্ণধন মুখোপাধ্যায়।

৭ পৌষ [সোম 23 Dec] শান্তিনিকেতনে সপ্তদশ সাম্বৎসরিক ব্রহ্মোৎসব হয়। এক মাস পূর্বে শমীন্দ্রনাথের মৃত্যু হওয়ায় রবীন্দ্রনাথ সপরিবারে এই উৎসবে অনুপস্থিত ছিলেন বলে অনুষ্ঠানটি অনেকটা নিষ্প্রাণ হয়ে পড়েছিল। প্রাতঃকালীন উপাসনায় 'শ্বেতশ্মশ্রু দীর্ঘকলেবর বর্ষীয়ান্ ব্রাহ্ম' ত্রৈলোক্যনাথ সান্যাল ও সায়ংকালীন উপাসনায় প্রিয়নাথ শাস্ত্রী আচার্যের কার্য করেন। 'প্রসিদ্ধ সুগায়ক শ্যামসুন্দরজী [মিশ্র] একাকী দুই বেলা গান করেন।' দ্বিপ্রহরে নীলকণ্ঠ অধিকারীর [মুখোপাধ্যায়] যাত্রা হয়।

সুরাট কংগ্রেসে যজ্ঞভঙ্গ হলেও সেখানে Theistic Conference যথারীতি অনুষ্ঠিত হয়েছিল। ৯ পৌষ সন্ধ্যায় বোম্বাই প্রার্থনাসমাজের স্বামী সত্যানন্দ প্রারম্ভিক উপাসনা করেন। পরদিন প্রাতে উপাসনা ও বক্তৃতা

করেন অবিনাশচন্দ্র মজুমদার। ঐদিনই সন্ধ্যায় স্থানীয় টাউনহলে দামোদর দাসের প্রস্তাবে ও অধ্যাপক রুচিরামের সমর্থনে সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। 'তিনি তথায় যে গবেষণা পূর্ণ ইংরাজি বক্তৃতা পাঠ করেন, তাহাতে ব্রাহ্মধর্ম্মের বিকাশ ও বিশেষত্ব এবং ভারতীয় প্রাচীনত্বের সহিত উহার যোগ ও ঘনিষ্ঠতা অতি সুনিপুণভাবে ও সংক্ষেপে চিত্রিত হইয়াছে।'[১৬১]

৬ মাঘ [সোম 20 Jan 1908] অপরাহ্ণ সাড়ে চারটার সময় মহর্ষিভবনে মহর্ষির তিরোভাবের তৃতীয় সাম্বৎসরিক উপলক্ষে উপাসনা ও সঙ্গীতাদি হয়। রবীন্দ্রনাথ এই অনুষ্ঠানেও উপস্থিত ছিলেন না। শ্রাদ্ধবাসরে সত্যেন্দ্রনাথ, প্রিয়নাথ শাস্ত্রী ও গৌরগোবিন্দ রায় বক্তৃতা করেন।

১১ মাঘ [শনি 25 Jan] অষ্টসপ্ততিতম সাম্বৎসরিক ব্রাহ্মসমাজ অনুষ্ঠিত হয়। আদি ব্রাহ্মসমাজগৃহে প্রাতঃকালীন উপাসনায় রবীন্দ্রনাথ, প্রিয়নাথ শাস্ত্রী ও জ্ঞানচন্দ্র ভট্টাচার্য বেদী গ্রহণ করেন। প্রিয়নাথ শাস্ত্রীর উদ্বোধন, সংগীত ও স্বাধ্যায়দির পর 'শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় তাঁহার স্বাভাবিক সুমধুর কণ্ঠে একটি অতি হৃদয়গ্রাহী সময়োপযোগী বক্তৃতা করেন', 'দুঃখ' শিরোনামে ভাষণটি ফাল্গুন-সংখ্যা বঙ্গদর্শন-এ মুদ্রিত হয়। এই অনুষ্ঠানে পাঁচটি ব্রহ্মসংগীত গীত হয় তার মধ্যে তিনটি রবীন্দ্রনাথের লেখা, অন্য দুটি গান হল :

ভৈরব-কাওয়ালি। বিমল প্রভাতে, মিলি এক সাথে [জ্যোতিরিন্দ্রনাথ]

ভৈরবী-চৌতাল। নিরঞ্জন নিরাকার।

মহর্ষিভবনে সায়ংকালীন উপাসনায় সত্যেন্দ্রনাথ, প্রিয়নাথ শাস্ত্রী ও চিন্তামণি চট্টোপাধ্যায় বেদী গ্রহণ করেন। চিন্তামণিবাবু উদ্বোধন ও সত্যেন্দ্রনাথ বক্তৃতা করেন। এই অনুষ্ঠানে রবীন্দ্রনাথ-রচিত বারোটি ব্রহ্মসংগীত ছাড়া আরও পাঁচটি গান গাওয়া হয়, গানগুলি হল:

বৃন্দাবনী সারঙ্গ-ঝাঁপতাল। তুমি আদি অনাদি অনন্ত অবিনাশী

নটনারায়ণী-কাওয়ালী। ভব-ভয়-হর প্রভু তুমি তারণ-গুরু

মিশ্র বারোয়াঁ-ঢিমাতেতালা। তোমা বিনা কে করে উদ্ধার

দেশ-কাওয়ালী। জীবন বৃথায় চলে গেল রে

নট্‌মল্লার-কাওয়ালী। কতদিন, গতিহীন, অতি দীন ভাবে রহিব হে নাথ।

২০ ফাল্গুন [মঙ্গল 3 Mar 1908] জ্যোতিরিন্দ্রনাথ তাঁর ডায়ারিতে লিখেছেন : 'আদি সমাজে গিয়ে গায়ক সুরেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়কে পরীক্ষা করে নিযুক্ত করা গেল।' সংগীতাচার্য গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়ের অন্যতম ভ্রাতা সুরেন্দ্রনাথ [? 1886-1972] রবীন্দ্রনাথের অনেক গানের স্বরলিপি করেন।

আমরা আগে বহুবার দেখেছি, তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ঠাকুরপরিবারের সংবাদ পরিবেশনে আশ্চর্য কার্পণ্য প্রদর্শন করেছে—সুতরাং নিম্নোদ্ধৃত 'সামাজিক' সংবাদটি প্রকাশ হতে দেখলে বিস্মিত হওয়া স্বাভাবিক : 'কলিকাতা হাইকোর্টের অন্যতম বিচারক শ্রীযুক্ত আশুতোষ মুখোপাধ্যায় সরস্বতী তাঁহার ভবানীপুরস্থ ভবনে নিজ বালবিধবা কন্যার শুভবিবাহ বিগত ১২ই ফাল্গুন [সোম 24 Feb] সম্পন্ন করিয়াছেন। তদুপলক্ষে অনেক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। হিন্দু মতে বিবাহ কার্য্য সম্পাদন হয়।'[১৬২] একসময়ে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের পরিচালনায় তত্ত্ববোধিনী-তে বিধবাবিবাহের সংবাদ প্রকাশিত হচ্ছিল বলে দেবেন্দ্রনাথ তত্ত্ববোধিনী সভার বিলোপসাধন করেন, সেই তত্ত্ববোধিনী-তে শুধু বিধবাবিবাহের সংবাদই প্রকাশিত হল না, কিছুদিনের মধ্যে

তাঁর পরিবারে বিধবাবিবাহও ঘটেছে। আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের বালিকা কন্যা কমলাদেবীর [1895-1923] পুনর্বিবাহ নিয়ে যথেষ্টপরিমাণে সামাজিক ঘোঁট দেখা দিয়েছিল। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ১৫ ফাল্গুন [বৃহ 27 Feb] তাঁর ডায়ারিতে লিখেছেন : 'আশু মুখুয্যের বিধবা মেয়ের পুনর্ব্বিবাহে একদল লোক খড়গহস্ত হয়ে উঠেছে···"সন্ধ্যা" ও "বঙ্গবাসী" বিরুদ্ধ পক্ষ।' বঙ্কিমচন্দ্রের দৌহিত্র শুভেন্দুসুন্দর বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে কমলা দেবীর বিবাহ হয়েছিল। কিন্তু বিয়ের পরেই শুভেন্দুসুন্দরের মৃত্যু হওয়ায় আশুতোষ আদরিণী কন্যার পুনর্বিবাহের আয়োজন করেন। এই বিবাহ বন্ধ করার জন্য তাঁর প্রাক্তন জামাতার আত্মীয়স্বজন কোর্টে মামলাও করেন। কিন্তু সমস্ত বাধা উপেক্ষা করে আশুতোষ কন্যার পুনর্বিবাহ দেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত কমলা দেবীর দ্বিতীয় স্বামীও অকালে মারা যান।

ঘটনাটি হিন্দুসমাজে যে যথেষ্ট আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল, জ্যোতিরিন্দ্রনাথের ডায়ারির উল্লেখ তার অন্যতম প্রমাণ। এ-সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের প্রতিক্রিয়ার কোনো লিখিত উল্লেখ পাওয়া যায়নি বটে, কিন্তু কার্যক্ষেত্রেই তাঁর সমর্থনের প্রমাণ মেলে। বলেন্দ্রনাথের বিধবা পত্নী সাহানা দেবীর পুনর্বিবাহের প্রচেষ্টায় দেবেন্দ্রনাথের নির্দেশে যে-রবীন্দ্রনাথ ১৩০৭ বঙ্গাব্দে বাধা সৃষ্টি করেছিলেন, তিনিই উদ্যোগী হয়ে ৪ আষাঢ় ১৩১৫ [18 Jun 1908] বিপত্নীক মধ্যম জামাতা সত্যেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যের সঙ্গে পাথুরিয়াঘাটার সতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের বিধবা কন্যা ছায়ার বিবাহ দেন। পরের বছর পুত্র রথীন্দ্রনাথের বিবাহ দেন বালবিধবা প্রতিমা দেবীর সঙ্গে।

প্রাসঙ্গিক তথ্য : ৩

বঙ্গভঙ্গকে কেন্দ্র করে যে আন্দোলন শুরু হয়েছিল, তাকে দমন করার জন্য ইংরেজ শাসকগণও সর্বশক্তি নিয়োগ করে। মর্লি-মিন্টোর উদারনীতির উপর যাঁরা আস্থা স্থাপন করেছিলেন, তাঁরা অবাক হয়ে দেখলেন, কার্জন-ফুলারের অপশাসনও এর তুলনায় সহনীয় ছিল। লাজপৎ রায়ের *The Punjabee* পত্রিকার বিরুদ্ধে মামলা ও শাস্তিদান পাঞ্জাবে অশান্তি সৃষ্টি করেছিল, করবৃদ্ধি প্রভৃতির বিরুদ্ধে আন্দোলন সেই অশান্তিকে তীব্র করে তোলে। সরকার এরই প্রতিক্রিয়ায় 9 May [বৃহ ২৬ বৈশাখ] লাজপৎ রায়কে ও পরে তাঁর সহযোগী অজিত সিংকে গ্রেপ্তার ও নির্বাসিত করল। 11 May [শনি ২৮ বৈশাখ] পাঞ্জাব এবং পূর্ববঙ্গ ও আসামে রাজনৈতিক সভা নিষিদ্ধ করে অর্ডিন্যান্স জারী হল। অর্ডিন্যান্সটি Prevention of Seditious Meetings Act নামে বিধিবদ্ধ হয় 2 Nov [শনি ১৬ কার্তিক] তারিখে।

বাংলায় সন্ধ্যা, যুগান্তর, *Bande Mataram* পত্রিকা রাজদ্রোহ প্রচার করে যাচ্ছিল, বৈশাখ মাস থেকে এদের সঙ্গে যোগ দিল মনোরঞ্জন গুহঠাকুরতার সম্পাদনায় 'নবশক্তি' সাপ্তাহিক। অ্যান্ড্রু ফ্রেজারের বাংলা সরকারও চুপ করে ছিল না। ২৪ জ্যৈষ্ঠ [7 Jun] যুগান্তর পত্রিকাকে সতর্ক করে দেওয়া হয়। এর পর ১ আষাঢ় [16 Jun] যুগান্তর-এ মুদ্রিত 'নাই ভয়' ও 'লাঠ্যৌষধি' প্রবন্ধদ্বয়ের জন্য পত্রিকাটির বিরুদ্ধে মামলা আনা হল ১৭ আষাঢ় [2 Jul]। যুগান্তর পত্রিকা পরিচালনা করতেন বারীন্দ্রকুমার ঘোষ, ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত, অবিনাশচন্দ্র ভট্টাচার্য [1882-1962] প্রভৃতি কয়েকজন যুবক মলে—প্রকৃত সম্পাদক বলে কেউ ছিলেন না। কিন্তু 3 Jul যুগান্তর অফিসে খানাতল্লাশির পর 5 Jul ভূপেন্দ্রনাথ দত্তের নামে ভারতীয় দণ্ডবিধির ১২৪-এ

ধারা অনুসারে রাজদ্রোহের মামলা খাড়া করা হল। আদালতে আত্মপক্ষ সমর্থন করতে অস্বীকার করে তিনি বলেন, দেশের প্রতি কর্তব্যবোধে তিনি যা করেছেন তার জন্য বিদেশীর কাছে কৈফিয়ৎ দিতে রাজি নন। 24 Jul [বুধ ৮ শ্রাবণ] চীফ মেট্রোপলিটান ম্যাজিস্ট্রেট কিংসফোর্ড তাঁকে এক বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করেন। পরদিন অরবিন্দ ভূপেন্দ্রনাথকে অভিনন্দিত করে বন্দেমাতরম্-এ 'One More for the Altar' সম্পাদকীয় প্রবন্ধটি মুদ্রিত করেন ও 28 Jul যুগান্তর-এর অভিযুক্ত প্রবন্ধগুলির ইংরেজি অনুবাদ ছেপে দেন।

ছাত্র ও তরুণদের উপর অরবিন্দের প্রভাব সম্পর্কে সরকার সচেতন ছিল। সুতরাং তাঁকে কারারুদ্ধ করার সুযোগের সন্ধানে ছিল কর্তৃপক্ষ। 16 Aug [শুক্র ৩১ শ্রাবণ] পুলিশ তাঁর বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা জারী করল। 27 Jun [বৃহ ১২ আষাঢ়] বন্দে মাতরম্-এ প্রকাশিত 'India for the Indians' প্রবন্ধে রাজদ্রোহ প্রচার ছিল অভিযোগের ভিত্তি। সরকারের উদ্দেশ্যের কথা অরবিন্দও জানতেন। তিনি ছিলেন জাতীয় শিক্ষাপরিষদের অধ্যক্ষ, তাই পরিষদকে পুলিশী হামলা থেকে বাঁচাতে তিনি 2 Aug [শুক্র ১৭ শ্রাবণ] অধ্যক্ষপদে ইস্তফা দেন। গ্রেপ্তারী পরোয়ানা জারী হলে তিনি ঐ দিনই আত্মসমর্পণ করেন ও আড়াই হাজার টাকার জামিনে মুক্ত হন। 26 Aug [সোম ৯ ভাদ্র] কিংসফোর্ডের আদালতে বিচার আরম্ভ হলে বিপিনচন্দ্র পালকে সাক্ষ্য দিতে আহ্বান করা হয়; তিনি বলেন : 'I have conscientious objection against taking part in a prosecution which I believe to be unjust and injurious to the cause of popular freedom and the interests of public peace.' আদালত অবমাননার দায়ে অভিযুক্ত করে কিংসফোর্ড বিপিনচন্দ্রকে রামানুগ্রহনারায়ণ সিংহের এজলাসে প্রেরণ করলে তিনি 10 Sep [মঙ্গল ২৪ ভাদ্র] তাঁকে ছ'মাস বিনাশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করেন। অরবিন্দকে বাঁচাতে গিয়ে ন্যাশানালিস্ট দলের সর্বশ্রেষ্ঠ নেতা ও বক্তা এইভাবে কারান্তরিত হওয়া বাংলার রাজনীতির পক্ষে ক্ষতিকর প্রমাণিত হয়েছিল। জেল থেকে তিনি ফিরে এসেছিলেন পরিবর্তিত মতাদর্শ নিয়ে, যা ধীরে ধীরে তাঁকে রাজনীতির মূল স্রোতের বাইরে নিক্ষিপ্ত করে।

বন্দে মাতরম্-মামলার দ্বিতীয় দিনে [27 Aug] কিংসফোর্ডের আদালতের বাইরে প্রচণ্ড ভিড় হয়। তার মধ্যে চৌদ্দ বছরের বালক সুশীল সেন ইনস্পেক্টর হেনরীকে ঘুসি মারলে কিংসফোর্ডের আদেশে পনেরো ঘা বেত্রদণ্ড লাভ করেন। প্রমাণাভাবে অরবিন্দকে শাস্তি দিতে না পেরে কিংসফোর্ড 23 Sep [সোম ৬ আশ্বিন] তাঁকে মুক্তি দিতে বাধ্য হন, মুদ্রাকর অপূর্বকুমার বসুকে তিনমাস সশ্রম কারাদণ্ড দিয়ে তাঁকে তৃপ্ত থাকতে হয়।

এরই মধ্যে কিংসফোর্ড দ্বিতীয় যুগান্তর-মামলায় 2 sep [সোম ১৬ ভাদ্র] 'মিথ্যা ভয়', 'সিডিসন ও বিদেশী রাজা' [30 Jul:১৪ শ্রাবণ] এবং 'মিথ্যার পূজা' [5 Aug: ২০ শ্রাবণ] প্রবন্ধগুলি প্রকাশের জন্য মুদ্রাকর বসন্তকুমার ভট্টাচার্যকে দু'বৎসরের সশ্রম কারাদণ্ড ও এক হাজার টাকা জরিমানার আদেশ দেন, এক্ষেত্রেও কর্মাধ্যক্ষ অবিনাশচন্দ্র ভট্টাচার্য মুক্তি পান।

পরবর্তী আঘাত পড়ল 'সন্ধ্যা' পত্রিকার উপর। 'এবার ঠেকে গেছি প্রেমের দায়ে' [২৮ শ্রাবণ : 13 Aug], 'ছিদিসানের হুড়ম, দুড়ুম, ফিরিঙ্গির আক্কেল গুড়ুম' [৩ ভাদ্র : 20 Aug] ও 'বাছা সকল লয়ে যাচ্ছেন শ্রীবৃন্দাবনে' [৬ ভাদ্র : 23 Aug] প্রবন্ধ তিনটি রাজদ্রোহমূলক এই অভিযোগে সম্পাদক ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়কে গ্রেপ্তার করা হল ও স্বয়ং কিংসফোর্ড 30 Sep [১৩ আশ্বিন] তাঁর বিরুদ্ধে চার্জ গঠন করেন। ভূপেন্দ্রনাথের মতো ব্রহ্মবান্ধবও প্রবন্ধের দায়িত্ব স্বীকার করে নিয়েও মামলায় অংশ নিতে অস্বীকৃত হন। কিন্তু এক্ষেত্রে সরাসরি শাস্তি না দিয়ে কিংসফোর্ড মামলা চালিয়ে যান। কাঠগড়ায় দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে

ব্রহ্মবান্ধবের হার্নিয়া বৃদ্ধি পায় ও ডাক্তারদের পরামর্শে তাঁর অস্ত্রোপচার হয়। সুস্থ হয়ে ওঠার মুখে ধনুষ্টঙ্কারের আক্রমণে ব্রহ্মবান্ধবের মৃত্যু হয় 27 Oct [রবি ১০ কার্তিক]। কিংসফোর্ডের বিচারে তাঁর দীর্ঘ কারাবাস অবশ্যম্ভাবী ছিল—কিন্তু ফিরিঙ্গির কারাগার তাঁকে আবদ্ধ রাখতে পারেনি। কিংসফোর্ড 18 Nov [২ অগ্র°] সন্ধ্যা-মামলা প্রত্যাহার করে অপর অভিযুক্ত মুদ্রাকর হরিচরণ দাসকেও মুক্তি দিয়ে বলেন : 'You are discharged but do take pains to earn your livelihood by means more respectable than this in future.'[১৬৩]

কিংসফোর্ডের বিচার-প্রহসন ও রায় দেবার সময়ে এই ধরনের উদ্ধত উক্তি, সন্ধ্যা-র ভাষায়, তাঁকে 'কসাই কাজী' নামে অভিহিত করেছিল। তাঁর আচরণের প্রতিশোধ নেবার আকাঙ্ক্ষাও স্বভাবতই গুপ্তসমিতির নেতাদের মনে জাগ্রত হয়। 28 Oct [১১ কার্তিক] যুগান্তর-এর কর্মাধ্যক্ষ অবিনাশচন্দ্র ভট্টাচার্য প্রকাশ্যে বিবৃতি দিয়ে পত্রিকা পরিচালনার দায়িত্ব অন্যদের হস্তে সমর্পণ করে বারীন্দ্রকুমার ঘোষের নেতৃত্বে ৩২ মুরারিপুকুর রোডের বাগানে গুপ্ত বিপ্লবী কেন্দ্র গড়ে তোলেন। বিস্ফোরক-বিদ্যা শিক্ষা করে হেমচন্দ্র কানুনগো [দাস] তখনও প্যারিস থেকে দেশে ফিরে আসেননি, কিন্তু উল্লাসকর দত্ত [1885-1963] বোমা তৈরিতে সাফল্য লাভ করেন। Feb 1908-এ দেওঘরের নিকটবর্তী দিঘিরিয়া পাহাড়ে বোমার পরীক্ষা সফল হল, কিন্তু অন্যতম বিপ্লবী তরুণ প্রফুল্ল চক্রবর্তী এই ঘটনায় নিহত হন। এর আগে 6 Dec 1907 [২০ অগ্র°] মেদিনীপুর জেলার নারায়ণগড়ের কাছে রেললাইনের নীচে ডিনামাইট পুঁতে রেখে ছোটলাট ফ্রেজারের ট্রেন উড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা ব্যর্থ হয়, কয়েকজন নিরীহ কুলি বিভিন্ন মেয়াদের কারাদণ্ড লাভ করে। 10 Dec [২৩ অগ্র°] 'কসাই কাজী' কিংসফোর্ডের মজঃফরপুরের জেলাজজ হিসেবে বদলির নির্দেশ সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। একটি বইয়ের মধ্যে বোমা পুরে তাঁর কাছে পাঠানো হয়, কিন্তু বইটি না খোলায় তিনি বেঁচে যান। বোমার তুলনায় পিস্তল অনেক সহজলভ্য ও সহজে ব্যবহারযোগ্য ছিল—23 Dec [সোম ৭ পৌষ] শিশির গুহ ঢাকার ম্যাজিস্ট্রেট B.C. Allen-কে গোয়ালন্দ স্টেশনে গুলি করে গুরুতরভাবে আহত করেন, কিন্তু আততায়ীকে ধরা সম্ভব হয়নি। অপরপক্ষে 11 Apr 1908 [২৯ চৈত্র] বারীন্দ্রকুমারের নেতৃত্বে চন্দননগরের মেয়র তার্দিভিলের বাড়িতে বোমা ছোঁড়া হলে তা লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়। এরপর 30 Apr [১৭ বৈশাখ ১৩১৫] প্রফুল্ল চাকী ও ক্ষুদিরাম বসু কর্তৃক নিক্ষিপ্ত বোমা মজঃফরপুরে কিংসফোর্ডের পরিবর্তে দু'জন নিরীহ ইংরেজ রমণীকে হত্যা করে বাংলার হিংসাশ্রয়ী বিপ্লবকর্মের প্রথম পর্বের অকালসমাপ্তি ঘটিয়েছিল। অনভ্যস্ততা ও সুশিক্ষার অভাবে পিস্তলের ব্যবহার কোথাও-কোথাও ব্যর্থ হলেও তুলনামূলকভাবে অধিকতর সাফল্য অর্জন করেছিল। কিন্তু নেতাদের দূরদৃষ্টির অভাবে ও উত্তেজনার প্রলোভনে অরবিন্দ-প্রভাবিত বারীন্দ্রকুমারের বিপ্লবসাধনা প্রধানত বোমাকেই প্রধান অস্ত্র-রূপে কল্পনা করেছে। তাছাড়া অন্যান্য আবশ্যিক সতর্কতা অবলম্বন করা হয়নি। মজঃফরপুরে বোমা-বিস্ফোরণের দু'দিনের মধ্যেই বিভিন্ন জায়গায় হানা দিয়ে পুলিশ যেভাবে বিপ্লবীদের গ্রেপ্তার ও অস্ত্রশস্ত্র উদ্ধার করেছে, তাতে বোঝা যায়, প্রথম থেকেই পুলিশ ছায়ার মতো তাঁদের অনুসরণ করছিল—আলিপুর বোমার মামলায় সরকারপক্ষের সাক্ষ্যেও তা প্রমাণিত হয়। দেশপ্রেম ও কষ্টবরণের কারণে এই বিপ্লবীরা অবশ্যই শ্রদ্ধাভাজন, কিন্তু যথার্থ পরিকল্পনা ও সংগঠনের অভাব এবং সুলভ আবেগোচ্ছ্বাস তাঁদের পায়ের তলার মাটিকে পিচ্ছিল করে দিয়েছিল। তাই সরকারী দমননীতির আবির্ভাবেই বিপ্লব-আন্দোলন অনেকাংশে স্থবিরত্ব প্রাপ্ত হয়।

কংগ্রেসের নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনও তখন সংকটের মুখে। বঙ্গভঙ্গকে কেন্দ্র করে বাংলাদেশে যে বয়কট ও জাতীয় শিক্ষার আন্দোলন গড়ে উঠেছিল, কংগ্রেসের বোম্বাই-নেতারা তাকে সুনজরে দেখেননি। তাই বারাণসী [1905] ও কলকাতা [1906] কংগ্রেসে ন্যাশনালিস্ট দলের চাপে পড়ে তাঁরা সমর্থনসূচক কিছু প্রস্তাব গ্রহণ করলেও নানাভাবে সেগুলির বিরোধিতা করে গেছেন। কংগ্রেস রাজনীতিতে টিলক-লাজপৎ প্রমুখের প্রভাব খর্ব করার সঙ্গে সঙ্গে বিপিনচন্দ্র-অরবিন্দ ও সুরেন্দ্রনাথ-ভূপেন্দ্রনাথ বসু প্রভৃতির লড়াই বাধিয়ে দিয়ে সর্বভারতীয় রাজনীতিতে বাংলার আধিপত্য ক্ষুন্ন করার আয়োজনও চলছিল। অপরদিকে বাংলার বিদেশী-বর্জন আন্দোলনকে পণ্য করে বোম্বাই-আমেদাবাদের মিল-মালিকেরা ফুলে-ফেঁপে উঠছিল। মিন্টো এইগুলির পূর্ণ সুযোগ নিলেন। মুসলমানদের ডেপুটেশনকে স্বাগত জানিয়ে তিনি সাধারণভাবে মুসলিম-সম্প্রদায়কে কংগ্রেসের বাইরে নিয়ে যেতে সমর্থ হন, তাঁর আমলারা নানা প্ররোচনা জুগিয়ে বৃহত্তর বাংলার বিভিন্ন স্থানে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বাধিয়ে দেন। অপরপক্ষে শাসনসংস্কারের লোভ দেখিয়ে মিন্টো কংগ্রেসের নরমপন্থী রাজনীতিকদের ব্রিটিশ-বিরোধী মনোভাবকে প্রশমিত করেন। ফলে তাঁরা টিলককে কংগ্রেস-সভাপতির পদ থেকে দূরে রাখার জন্য চক্রান্তজাল বিস্তার করে কংগ্রেসের এয়োবিংশ অধিবেশনের স্থান নাগপুর থেকে সুরাটে স্থানান্তরিত করেন ও নরমপন্থী রাসবিহারী ঘোষকে সভাপতি পদে মনোনয়ন দেন। বিপিনচন্দ্র পাল বন্দে মাতরম্-মামলায় কারাগারে থাকায় ন্যাশানালিস্ট দল তখন কিঞ্চিৎ দুর্বল, দ্বিধাগ্রস্ত লাজপৎ রায় ও কৌশলপন্থী টিলক এই দলকে উপযুক্ত নেতৃত্ব দিতে পারেননি, অরবিন্দের রাজনৈতিক প্রজ্ঞা তত্ত্বের জগতেই আবদ্ধ ছিল—ফলে সুরাটের দক্ষযজ্ঞে কংগ্রেস অধিবেশন পণ্ড হয়ে যাওয়ার পর নরমপন্থী নেতারা কংগ্রেস সংবিধানে আবশ্যকমতো সংশোধন এনে কার্যত ন্যাশনালিস্ট পার্টিকে কংগ্রেস থেকে বহিষ্কার করতে সমর্থ হন।

এই পটভূমিকায় 11-12 Feb 1908 [২৮-২৯ মাঘ]-এ পাবনায় অনুষ্ঠেয় বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মিলনে দুই দলের আর-এক দফা সংঘর্ষ অনিবার্য ছিল। ন্যাশনালিস্ট দল সভাপতি হিসেবে চেয়েছিলেন অশ্বিনীকুমার দত্তকে, কিন্তু নরমপন্থীরা দল-নিরপেক্ষ রবীন্দ্রনাথকে ঐ পদে মনোনীত করে সেই সংঘর্ষ এড়িয়ে যান। রবীন্দ্রনাথও যথাসাধ্য দক্ষতার সঙ্গে পরিস্থিতির মোকাবিলা করে গঠনমূলক আদর্শে উভয়পক্ষকে সম্মিলিত করার প্রয়াস চালান। পরিস্থিতি অনুকূল থাকলে এই প্রয়াস হয়তো কিছুপরিমাণে সফলতা অর্জন করত, কিন্তু বারীন্দ্রকুমারের নেতৃত্বে সন্ত্রাসবাদী বিস্ফোরণে ঘটনাস্রোত আমূল পরিবর্তিত হয়। অন্তত বাংলাদেশে প্রকাশ্য নিয়মতান্ত্রিক রাজনীতি একটি কানাগলিতে আটকে পড়ে, বোমার মামলায় যে বিপ্লবী যুবকেরা ধরা পড়েননি তাঁরাই বিচ্ছিন্ন সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপে উত্তেজনা জাগিয়ে রাখতে চেষ্টা করতে থাকেন।

ন্যাশনালিস্ট নেতাদের মধ্যে কেউ-কেউ বিপ্লবীগোষ্ঠীগুলির সঙ্গে সম্পর্ক রেখে চলতেন। অরবিন্দ তো বটেই—সুবোধচন্দ্র মল্লিক, নীরদচন্দ্র মল্লিক, নাড়াজোলের রাজা রামচন্দ্র খান, গগনেন্দ্রনাথ, সুরেন্দ্রনাথ প্রভৃতি ধনী ব্যক্তিগণ অর্থ ও অস্ত্র দিয়ে এঁদের সাহায্য করেছেন। আরও অর্থের প্রয়োজন মেটানোর জন্য রাজনৈতিক ডাকাতির আশ্রয় গ্রহণ করা হয়। বারীন্দ্রকুমার-গোষ্ঠীর অধিকাংশ চেষ্টাই ব্যর্থ হয়, কিন্তু অন্য কয়েকটি দল—বিশেষত পূর্ববঙ্গে—দুঃসাহসিক সাফল্য অর্জন করে। কিন্তু রাজনৈতিক ডাকাতির দ্বারা লব্ধ অর্থ সব সময়ে সদর্থে ব্যবহৃত হয়নি; ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত লিখেছেন : 'ইহার জন্য নিজেদের মধ্যে দলাদলি হয় এবং দুঃখের বিষয় এই যে, যাঁহাদের নিকট টাকা লুকাইয়া রাখা হইত তাঁহারা গচ্ছিত অর্থ অনেক স্থলে আত্মসাৎ

করিয়াছেন।'[১৬৪] সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপের এই দুর্বলতা ও কলঙ্কময় দিকটির কথা রবীন্দ্রনাথ জানতেন—ঘরে বাইরে [১৩২৩] ও চার অধ্যায় [১৩৪১] উপন্যাসে তাঁর বিরূপতা শিল্পরূপে প্রকাশ পেয়েছে।

প্রাসঙ্গিক তথ্য : ৪

ছাত্রদের উপরে সরকারী দমননীতি ব্রহ্মচর্যাশ্রমের ছাত্রবৃদ্ধির কারণ হয়েছিল, সেকথা আমরা পূর্বেই বলেছি। ৪ বৈশাখ রবীন্দ্রনাথ মনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়কে লিখছেন : 'অনেক ছাত্র বাড়িয়াছে—দায়ও বাড়িতেছে। তাড়াতাড়ি অনেকগুলি ঘরদুয়ার ফাঁদিতে হইতেছে। ল্যাবরেটরি ঘরের উপরে একটি দোতলা হইয়াছে। তাহাতেও কুলাইতেছে না। এখনো নানা কাজের জন্য আরো অনেকগুলি ঘর নির্ম্মাণ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি। অর্থব্যয়ের আশঙ্কা করিবার অবকাশও পাওয়া গেল না—চারিদিকেই মিস্ত্রি লাগাইয়া দেওয়া গেছে।' ৫ বৈশাখই ক্যাশবহিতে 'শান্তিনিকেতন স্কুল বাটী তৈয়ারী' খাতে 'একজিবিসন হইতে···কাট তক্তা ও অন্যান্য জিনীস ক্রয়' বাবদ ৬৪৭।ল ৩ খরচের হিসাব দেখা যায়। ১ শ্রাবণ [17 Jul] রাজলক্ষ্মী দেবী রথীন্দ্রনাথকে লিখছেন : 'ছেলে প্রায় ৮০টি হয়ে দাঁড়িয়েছে—বৃহৎ কাণ্ড,—স্কুলে নতুন অধ্যাপক ছুটির আগে দু'জন [যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ও বঙ্কিমচন্দ্র রায়] এসেছেন, তাঁরাই আছেন, আর নতুন কেহ আসেন নি। প্রায় প্রতিদিনই দু-একজন ক'রে নতুন ছেলে আস্‌চে—আর তাদের রাখবার স্থান নেই। তাই বোধ হচ্চে বাধ্য হয়ে নতুন ছেলে নেওয়া এখন বন্ধ করতে হবে।' এই চিঠিতেই তিনি খবর দিয়েছেন : 'প্রাতে একঘন্টা করে বেলা স্কুলের ছেলেদের পড়াতে আরম্ভ করেছে, —আর শাস্ত্রীমশায়ের কাছে সে নিজেও একঘন্টা সংস্কৃত পড়্চে'।

নতুন ছাত্রদের মধ্যে একজন সরোজরঞ্জন চৌধুরী এই সময়ের স্মৃতিচারণ করে সহপাঠী সুধাকান্ত রায়চৌধুরীকে 8 Feb 1964-এ একটি পত্রে লিখেছেন :

> ১৯০৭ খৃষ্টাব্দে গ্রীষ্মকাশের পর জুলাই মাসে আমি ও আমার দাদা [মনোরঞ্জন চৌধুরী] শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমে প্রবেশ লাভ করার সৌভাগ্য লাভ করি। আমাদের এই সময়েই বিদ্যালয়ের সব চাইতে বেশি ছাত্র ৭২ জনে পৌঁছেছিল। আমার ও আমার দাদার স্থানাভাবে বর্ত্তমান লাইব্রেরী ঘরের উত্তরদিকের বড় হলটায় ল্যাবরেটোরী এবং পশ্চিম দিকের ঘরটায় ঁশাস্ত্রী মহাশয়ের সংস্কৃত অধ্যাপনার ঘর পূর্ব দিকের ঘরটায় বড় পিয়ানো সহ গানের আসর আর দক্ষিণ দিকের ঘেরা বারান্দায় আমাদের ৭।৮টি ছেলের থাকার জন্য অতিরিক্ত খাট দিয়ে বাস করার ব্যবস্থা। এইখানে আগরতলার সত্যরঞ্জন [বসু], সত্যেন ভট্টাচার্য্য (বাচ্চা, লব কুশুর [জিতেন্দ্র ও ব্রজেন্দ্র] দাদা) আমার দাদা ও আমি এবং ধীমু [ধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়] ছিলাম। লাইব্রেরীর দোতলায় তখন বড় ছেলেরা থাক্‌তেন তার মধ্যে সুসাহিত্যিক ঁঅক্ষয় বড়াল মহাশয়ের পুত্র অমর [অময়] বড়াল, জ্যোতির্ম্ময় হালদার (বিপিন হালদার অসিত হালদার মহাশয়ের ভাই), সিদ্ধার্থ রায় ইত্যাদি। লাইনে উচ্চতা অনুসারে দাঁড়াইতে হইত বলিয়া ঐ তিনজনই ছিলেন সবচাইতে উঁচু তাই তাঁদের কথা সব সময়েই মনে হয়।'[১৬৫]

এই চিঠি থেকে অনেক নতুন ছাত্রের নাম পাওয়া যায়।

আরও কিছু নতুন ছাত্রের নাম পাওয়া যায় ব্রহ্মচর্যাশ্রমের ছাত্রদের হস্তলিখিত প্রথম মাসিক পত্রিকা 'শান্তি' থেকে। সতীশচন্দ্র রায় এক সময়ে বিদ্যালয় থেকে একটি পত্রিকা প্রকাশ করতে উদ্যোগী হয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথ ৯ চৈত্র ১৩১০ [22 Mar 1904] মনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়কে লিখেছিলেন : 'আমাদের বিদ্যালয় হইতে পত্রিকা বাহির করিতে সতীশের অত্যন্ত আগ্রহ ছিল—তাহার কতক কতক লেখাও ছিল। তখন সে আমাকে একপ্রকার রাজি করিয়া তুলিয়াছিল'[১৬৬]—কিন্তু সতীশচন্দ্রের অকালমৃত্যুতে পরিচালকের অভাবে ও অর্থসংকটে সেই পরিকল্পনা কার্যকরী হয়নি; ১৩১৮-২১ বঙ্গাব্দে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা-র সম্পাদনা-ভার নিয়ে

রবীন্দ্রনাথ পত্রিকাটিকে বিদ্যালয়ের মুখপত্র করে তুলেছিলেন—প্রকৃত মুদ্রিত মুখপত্র শান্তিনিকেতন পত্রিকা প্রকাশিত হয় বৈশাখ ১৩২৬ থেকে। বর্তমান সময়ে অজিতকুমার চক্রবর্তীর উৎসাহে ছাত্রেরাই অন্যরূপে কাজটি করতে এগিয়ে এসেছিলেন মাঘ ১৩১৪ থেকে মনোরঞ্জন চৌধুরীর সম্পাদনায় হস্তলিখিত 'শান্তি' পত্রিকা প্রকাশ করে। পত্রিকাটির সব সংখ্যা দেখা সম্ভব হয়নি, কিছু-কিছু বিচ্ছিন্ন সংখ্যা রবীন্দ্রভবনে রক্ষিত আছে। রবীন্দ্রনাথ ও শিক্ষকদের রচনা গৃহীত হলেও লেখায় ও চিত্রে ছাত্রেরাই ছিলেন সংখ্যাগুরু। বিদ্যালয়ের পরিবেশে ছাত্রদের শিক্ষা ও কৌতূহল কত বিচিত্রগামী হয়েছিল তার সুনির্দিষ্ট উদাহরণ পাওয়া যায় পত্রিকাটির বিভিন্ন সংখ্যা থেকে। সুধীরচন্দ্র ও সাধনা কর-এর 'শান্তিনিকেতন-প্রসঙ্গ' [1966] গ্রন্থে সংকলিত সাধনা করের 'শান্তিনিকেতনের অপ্রকাশিত অধ্যায়' পুস্তিকায় [পৃ ৭০-১১৮] বিষয়টি নিয়ে দীর্ঘ আলোচনা করা হয়েছে, উৎসাহী পাঠক রচনাটি দেখে নিতে পারেন। আমরা বর্তমান প্রসঙ্গে লেখক ও শিল্পী ছাত্রদের পরিচয় উদ্ধারের কাজে পত্রিকাটিকে ব্যবহার করতে পারি। পরে বিভিন্ন বাসগৃহ থেকে ছাত্রেরা স্বতন্ত্র পত্রিকা প্রকাশে ব্রতী হয়েছিলেন।

> এস শান্তি, বিধাতার কন্যাললাটিকা,
> নিশাচর পিশাচের রক্ত দীপ শিখা
> করিয়া লজ্জিত! তব বিশাল সন্তোষ
> বিশ্বলোক ঈশ্বরের রত্নরাজকোষ!
> তব ধৈর্য্য দৈব বীর্য্য! নম্রতা তোমার
> সমুচ্চ মুকুট শ্রেষ্ঠ, তাঁরি পুরস্কার।

—নৈবেদ্য-এর ৬৮-সংখ্যক কবিতার ছত্রগুলিকে শিরোভূষণ করে প্রথম বর্ষ প্রথম সংখ্যা শান্তি প্রকাশিত হয় মাঘ ১৩১৪-তে। এই সংখ্যায় চিত্রকর ছিলেন তিনজন—ধীরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, নারায়ণ কাশীনাথ দেবল ও প্রমোদনাথ রায়। প্রবন্ধ লিখেছিলেন 'বর্ম্মায় উৎসব'/নারায়ণ কাশীনাথ দেবল, 'ভাষা'/ সরোজচন্দ্র মজুমদার, 'অতীত' | ত্রিগুণানন্দ রায়, 'বিদ্যা'/ রামরেণু গঙ্গোপাধ্যায়, 'পিগমি (হথ্‌রণ্‌ হইতে অনুবাদিত)'/ সরোজচন্দ্র মজুমদার, 'তারার কথা' [সপ্তর্ষির চিত্রসহ]/ ত্রিগুণানন্দ রায়, 'ধাঁধা' দিয়েছিলেন রামরেণু, ত্রিগুণানন্দ ও সোমেন্দ্রচন্দ্র দেববর্মণ—'প্রতি প্রবন্ধই শ্রীযুক্ত অজিতকুমার চক্রবর্ত্তী মহাশয়কে দেখাইয়া সংশোধন করিয়া দেওয়া হয়।' জগদানন্দ রায়ের পুত্র ত্রিগুণানন্দ [পটল] ও শ্রীশচন্দ্র মজুমদারের পুত্র সরোজচন্দ্র [ভোলা] ছিলেন বহুমুখী লেখক—বিচিত্র বিষয়ে লেখা তাঁদের বহু রচনা বিদ্যালয়ের পত্রিকাগুলিকে সমৃদ্ধ করেছে। প্রসিদ্ধ চলচ্চিত্র-পরিচালক প্রমোদনাথ রায় এই বৎসরই [1908] এন্ট্রান্স পরীক্ষা দিয়ে প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হন, অপর ছাত্র প্রণবদেব মুখোপাধ্যায় উত্তীর্ণ হন তৃতীয় বিভাগে। চৈত্র ১৩১৪ [১।৩]-সংখ্যায় নারায়ণ কাশীনাথ দেবলের আঁকা 'ইরাবতীতে তরী' চিত্র ছাড়া প্রবন্ধ লেখেন 'হালখাতা'/ ত্রিগুণানন্দ রায়, 'জৈন সম্প্রদায় ও তাহাদের মন্দির'/ মনোরঞ্জন চৌধুরী, 'গ্রীক পুরাণ'/ গৌরগোপাল ঘোষ, 'কলম্বস–স্পেন দেশে'/ সত্যেন্দ্রচন্দ্র ভট্টাচার্য এবং 'বৈজ্ঞানিক প্রসঙ্গ' বিভাগে 'মাকড়সার জাল'/ অপূর্বকুমার চন্দ, 'শনির কথা' [সচিত্র]/ গৌরগোপাল ঘোষ ও 'মৌচাক'/ সরোজচন্দ্র মজুমদার। প্রকৃতি-পর্যবেক্ষণে ছাত্রদের কীধরনের উৎসাহ দেওয়া হত, হস্তলিখিত পত্রিকাগুলির বহু সংখ্যায় তার সুপ্রচুর উদাহরণ মেলে।

ছাত্র-শিক্ষকেরা অন্যান্য ব্যাপারেও উৎসাহী হয়েছিলেন। বঙ্গভঙ্গ-আন্দোলনের ঋণাত্মক উচ্ছ্বাস থেকে রবীন্দ্রনাথ ব্রহ্মচর্যাশ্রমকে সরিয়ে রাখলেও গঠনাত্মক কাজকর্মে সেই আবেগ আত্মপ্রকাশের পথ খুঁজে

নিয়েছিল। রাজলক্ষ্মী দেবী ১৮ ভাদ্র [4 Sep] রথীন্দ্রনাথকে লেখেন : 'আমাদের এখানকার ছেলেদের মধ্যে একটা volunteer Band হয়েছে, ১২।১৪টি ছেলে নিয়ে, নানারকম কষ্টকর ও দুঃসাহসের কাজ তারা অভ্যেস্ কর্‌চে— Bugle বাজিয়ে তাদের চালনা করা হয়ে থাকে।' অজিতকুমার চক্রবর্তী এই বিষয়ে লিখেছেন : 'প্রত্যহ বৈকালে কয়েকটি স্বেচ্ছাব্রতী বালক ভুবনডাঙা গ্রামে গিয়া সেখানকার ছেলেদের পড়াইত। আর কয়েকজন তাহাদের ঘরে বসিয়া রোগীদের হোমিওপ্যাথি ঔষধ বিতরণ করিত। সন্ধ্যায় অধ্যাপকগণ পালাক্রমে গ্রামবাসীদিগকে একত্র করিয়া মহাভারত রামায়ণ ও ইতিহাসের কথা শুনাইতেন। ···ছেলেরা গ্রামের সকল বিষয়ে স্ট্যাটিস্‌টিক্‌স্ লইয়াছিল, দরিদ্রদের ঘর ছাইয়া দিয়াছিল, সকল গ্রামবাসীর পরিচয় লাভ করিয়াছিল—এজন্য ছেলে এবং অধ্যাপক সকলেরই অভিজ্ঞতা লাভ হইয়াছিল সন্দেহ নাই।'[১৬৭] কিন্তু সমাজসেবার এই কাজ সরকারী গোয়েন্দাদেরও দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। রবীন্দ্রনাথ তাতে ভয় পাননি, কিন্তু কার্যে বিঘ্নকর এধরনের অশান্তিকে আমন্ত্রণ করে আনারও তিনি বিরোধী ছিলেন। সমকালীন শিক্ষক যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় লিখেছেন :

মনে পড়ে একবার শ্রীঅরবিন্দ ঘোষ মহাশয়ের রাজদ্রোহমূলক প্রবন্ধ লেখার অভিযোগ হয়, তাহাতে বিপিনচন্দ্র পাল মহাশয় ইংরেজের আদালতে সাক্ষ্য দিতে অস্বীকার করেন। আদালত অবমাননার অপরাধে বিপিনবাবুর কিছুকালের জন্য জেল হয় [২৪ ভাদ্র : 10 Sep]। কবি তখন আশ্রমে ছিলেন না। ঐ ঘটনার সংবাদ আশ্রমে পৌঁছিবামাত্র বিদ্যালয় ছুটি দেওয়া হইল এবং আমরা ছেলেদের লইয়া একটি মিছিল করিয়া মাদল বাজাইয়া স্বদেশী গান গাহিতে গাহিতে বোলপুর ও পাশ্ববর্তী স্থানের অনেক স্থান ঘুরিয়া আসিলাম। রাস্তায় চলিতে চলিতে উত্তেজনার মাত্রা একটু চড়িয়া গিয়াছিল। এই ব্যাপারের খবর কবির কাছে যায়। তিনি আশ্রমে ফিরিয়া আমাদের ডাকিয়া বলেন "উত্তেজনার জন্য কর্তব্য কাজে শিথিলতা করা মাৎলামির সামিল। এখানকার কাজের গুরুত্বকে তোমরা উপলব্ধি করো। আমি বলে রাখছি যদি গভর্নমেন্ট আমাকেও কোনদিন জেলে দেয় তাহলেও তোমরা উত্তেজিত না হয়ে নিজেদের কর্তব্য কাজ করে যাবে।"[১৬৮]

হেমলতা দেবীর পত্রে উক্ত ঘটনার বিবরণ পেয়ে রবীন্দ্রনাথ ২৯ ভাদ্র [15 Sep] শিলাইদহ থেকে ভূপেন্দ্রনাথ সান্যালকে লেখেন : 'পর্শু বৌমা একটা চিঠিতে লিখিয়াছেন যে ছেলেদের ছুটি কিছু অতিরিক্ত মাত্রায় চলিতেছে। সামনে একটা বড় ছুটি আসিতেছে এ সময়ে এত বার বার ছুটি হওয়া প্রার্থনীয় নহে।'[১৬৯] কিন্তু তাঁর এই আপত্তি রাজনীতির বহিরঙ্গ উত্তেজনা সম্পর্কে, মানুষ-গড়ার সাধনায় কষ্টবরণকে তিনি স্বাগতই জানিয়েছেন তার পরিচয় আছে ৩১ ভাদ্রের পত্রে : 'ছেলেরা যখন রাঁধিবে তখন যাহাতে অগ্নিকাণ্ড না হয় তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখিবেন তাই বলিয়া রান্না বন্ধ করিয়া দেওয়া ঠিক নয়।'[১৭০]

অবশ্য এই কঠোরতার আদর্শে রবীন্দ্রনাথ দীর্ঘদিন অবিচলিত থাকতে পারেননি, তাই 1914-এ গান্ধীজীর ফিনিক্স বিদ্যালয়ের অনুকরণে ছাত্র-শিক্ষকেরা ভৃত্য-পাচককে ছুটি দিয়ে সব কাজ করতে আরম্ভ করলে রবীন্দ্রনাথ তাতে বাধা দেন। অজিতকুমার চক্রবর্তী আলোচ্য সময়ের সাময়িক পথভ্রষ্টতার ছবিটি এঁকেছেন যথাযথভাবে :

উত্তেজনা হইতে বাধা পাইয়া ডিসিপ্লিন জিনিসটাকে মঙ্গলচর্যার স্থানে রাজা বলিয়া আমাদিগকে অভিষিক্ত করিতে হইল। ১৩১৩ হইতে ১৩১৪ ও ১৩১৫-এর আরম্ভ পর্যন্ত এই একটা কঠোরতার পর্ব চলিল। বিধাতার সৃষ্টি যে কী তাহা আমরা জানি নাই—আমরা ছোটোখাটো প্রবালদ্বীপ রচনা করিতে বসিয়া গেলাম।

অধ্যাপকগণের মধ্যে তিনজন অধিনায়ক হইলেন, ছাত্রদের মধ্যেও নায়কতার নির্বাচনপ্রণালী প্রবর্তিত হইল। প্রত্যুষ হইতে রাত্রি পর্যন্ত নিয়ম নিয়ম নিয়ম, বাঁধাবাঁধি কষাকষি বিচার দণ্ডবিধান—সব কড়াক্কড় রকম ব্যবস্থা হইল। সুখ আরাম কোথায় গেল, তাহাকে কঠোরতার চাপে একেবারে পিষিয়া মারিয়া ফেলা হইল।

তখন অধ্যাপকগণ হয় দেশের সেবার ভাবে উদ্‌বোধিত হইয়াছিলেন বলিয়াই কিম্বা ব্যক্তিগত প্রকৃতি অনুসারেই হয়তো সকলেই এই ডিসিপ্লিনের জীবনটাকেই বড়ো জীবন বলিয়া বোধ করিতেন। তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ এমন উগ্র নীতিপরায়ণ ছিলেন যে, ছেলেদের উপর

ক্রমাগত নীতি বাহির হইতে চাপাইয়া দেওয়া এবং তাহার সম্বন্ধে অস্বাস্থ্যকর আলোচনা করা তাঁহারা কর্তব্য বোধ করিয়াছিলেন। ছেলেরাও বাহির হইতেই সব বিষয়ে সাড়া দিত, কিন্তু তখনকার আবহাওয়া যে খুব নির্মল উদার ছিল এমন তো মনে হয় না। একটি কথা তখন ভুলিয়া যাওয়া হইয়াছিল যে, বাহিরের নিয়মে মানুষ গড়ে না, তাহাতে মানুষ বড়জোর নীরস ও আচারপরায়ণ হয়; ভিতরের শক্তির পূর্ণ উদ্‌বোধন না হইলে নিয়মের নিগড় নিগড়ই থাকিয়া যায়, তাহা আনন্দের জিনিস হয় না।[১৭১]

একথা রবীন্দ্রনাথের চেয়ে আর কেই-বা বেশি জানতেন, তাই ১৭ পৌষ [2 Jan 1908] তিনি ভূপেন্দ্রনাথকে লিখেছেন : 'কর্তব্যবায়ুগ্রস্ত লোক জগতে দুর্লভ নয়; কিন্তু যথার্থ ভক্তিরস গভীর অন্তঃকরণের লোকের জন্য আমি হাৎড়ে বেড়াচ্চি—আপনাকে তেমন লোক আর একটি দিতে পারলে আমার বড় পরিতৃপ্তি হত। একবার যে সেই শরৎ চৌধুরী বলেছিলেন এখানে বাজনাবাদ্য দীপমালা সব আছে কিন্তু বর নেই সেকথা আমি ভুলতে পারিনে। ···ভূপেনবাবু মনকে কাজের মধ্যে শুষ্ক হতে দেবেন না—বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের উন্মুক্ত অমৃতসাগরের মধ্যে তাকে ডুবিয়ে নেবেন তাহলে সমস্তই সহজ হয়ে যাবে...অন্তর বাহির সমস্ত প্রসন্ন হবে। সেই প্রসন্নতাই জীবনের শ্রী—তার অভাব যেখানে সেখানে লক্ষ্মী নেই—সেখানে সমস্তই অপরিচ্ছন্ন এবং দরিদ্র—সেখানে কৃতকার্যতাও লাবণ্যহীন।'[১৭২] তিনি কেবল উপদেশ দিয়ে ক্ষান্ত হননি, বৎসরের শেষে শান্তিনিকেতনে এসে এই আনন্দের সাধনায় ব্রতী হয়েছিলেন।

উল্লেখপঞ্জী

১ চিঠিপত্র ৭ [১৩৬৭]। ৮, পত্র ৪

২ রবীন্দ্রনাথ ও ত্রিপুরা। ৩৫১

৩ স্মৃতি। ৬০

৪ রবীন্দ্রভবনে রক্ষিত প্রতিলিপি

৫ সুধীরঞ্জন দাস : আমাদের শান্তিনিকেতন। ২৯

৬ রবীন্দ্রভবনে রক্ষিত হস্তলিখিত মাসিক পত্রিকা 'বীথিকা', অগ্র°-পৌষ ১৩১৮ [১।৪-৫]। ৭৪

৭ রবীন্দ্রবীক্ষা ৪ [১৩৮৪]। ৮১

৮ দেশ, সাহিত্য ১৩৮৫।১১, পত্র ৮

৯ রবীন্দ্র সান্নিধ্যে ত্রিপুরা। ১৭৩

১০ প্রবাসী, ভাদ্র ১৩৩৫।৬৮৬

১১ মাসিক বসুমতী, জ্যৈষ্ঠ ১৩৫৯।১৮৭

১২ দেশ, ৯ জ্যৈষ্ঠ ১৩৮২।২৫৪, পত্র ১১

১৩ দ্র *The Bengalee*, 17 Apr 1907

১৪ দেশ, সাহিত্য ১৩৮৫।১১-১২, পত্র ৮

১৫ রবীন্দ্রভবনে রক্ষিত প্রতিলিপি

১৬ রবীন্দ্রভবনে রক্ষিত মূল পত্র
১৭ বি. ভা. প., মাঘ-চৈত্র ১৩৭৩।১৮৯
১৮ রবীন্দ্রনাথ ও ত্রিপুরা। ৩৫১
১৯ স্মৃতি। ৭০
২০ ঐ। ৬১
২১ রবীন্দ্রভবনে রক্ষিত মূল পত্র
২২ রবীন্দ্রজীবনী ২।২০৮
২৩ দেশ, ১৮ কার্তিক ১৩৬২।১৩
২৪ স্মৃতি। ৭০
২৫ ঐ। ৬১
২৬ রবীন্দ্রভবনে রক্ষিত মূল পত্র
২৭ পত্রাবলী। ১৭৬, পত্র ৬৭
২৮ রবীন্দ্রজীবনী ২।২০৮, পাদটীকা ৪
২৯ দেশ, ১৫ পৌষ ১৩৬২।৬৪১-৪৩
৩০ রবীন্দ্রভবনে রক্ষিত মূল পত্র
৩১ ড প্রতাপচন্দ্র মুখখাপাধ্যায় : 'চট্টগ্রামে রবীন্দ্রনাথ', আজাদী, ১৭ কার্তিক ১৩৯১
৩২ দেশ, সাহিত্য ১৩৮৫।১২, পত্র ১০
৩৩ দ্র আজাদী, ১৭ কার্তিক ১৩৯১
৩৪ রবীন্দ্রভবনে রক্ষিত প্রতিলিপি
৩৫ রবীন্দ্রভবনে রক্ষিত মূল পত্র
৩৬ রবীন্দ্রভবনে রক্ষিত মূল
৩৭ দেশ, সাহিত্য ১৩৮৫।১২, পত্র ১১
৩৮ দেশ, শারদীয়া ১৩৪৯।৪২১, পত্র ৮০
৩৯ প্রবাসী, ভাদ্র ১৩৩৫।৬৮৬
৪০ বি. ভা. প., মাঘ-চৈত্র ১৩৭৩।১৮৯
৪১ *Western Influence in Bengali Literature* [2nd Ed., 1947], pp. 224-25
৪২ Ibid, p. 225
৪৩ দ্র ড অর্চনা মজুমদার : রবীন্দ্র-উপন্যাস-পরিক্রমা [1970]।৮৭-৯৩
৪৪ রবীন্দ্রভবনে রক্ষিত মূল পত্র
৪৫ দেশ, সাহিত্য ১৩৮৫।১২, পত্র ১৩

৪৬ রবীন্দ্রভবনে রক্ষিত মূল পত্র

৪৭ প্রবাসী, আশ্বিন ১৩১৪।৩৪৭

৪৮ গিরিজাশঙ্কর রায়চৌধুরী : শ্রীঅরবিন্দ ও বাঙ্গলায় স্বদেশী যুগ [1956]।৬০৮

৪৯ চিঠিপত্র ২ [১৩৪৯]। ৫, পত্র ২

৫০ রবীন্দ্রভবনে রক্ষিত মূল পত্র

৫১ শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ের শিক্ষাদর্শ [১৩৮৮]। ৩৪৪ [লিপিচিত্র]

৫২ রবীন্দ্রভবনে রক্ষিত মূল পত্র

৫৩ ঐ

৫৪ ঠাকুরমার ঝুলি [১৩শ সং, ১৩৫১]৯-১২

৫৫ মাসিক বসুমতী, ফাল্গুন ১৩৬৩।৭৫৫

৫৬ ঐ। ৭৫৫

৫৭ বি. ভা. প., বৈশাখ-আষাঢ় ১৩৭৪।২৬৭

৫৮ স্মৃতি। ৬৪

৫৯ দেশ, ২৩ শ্রাবণ ১৩৪৯।৩৮-৩৯, পত্র ১০

৬০ দেশ, শারদীয়া ১৩৪৯।৪০৪, পত্র ১১

৬১ ঐ। ৪০৪, পত্র ১২

৬২ দেশ, ২৩ শ্রাবণ ১৩৪৯।৩৯, পত্র ১৩

৬৩ বি. ভা. প., বৈশাখ-আষাঢ় ১৩৭৪।২৬৮

৬৪ দেশ, শারদীয়া ১৩৪৯।৪০৪, পত্র ১৪

৬৫ রবীন্দ্রভবনে রক্ষিত প্রতিলিপি

৬৬ বি. ভা. প., বৈশাখ-আষাঢ় ১৩৭৪।২৬৯

৬৭ দেশ, ২৩ শ্রাবণ ১৩৪৯।৪০, পত্র ১৬

৬৮ চার অধ্যায়-গ্রন্থপরিচয় ১৩।৫৪২-৪৩

৬৯ দেশ, শারদীয়া ১৩৬২।৯, পত্র ১

৭০ বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলনের সম্পূর্ণ বিবরণী [১৩১৪]।৫

৭১ ঐ। ১৬।৷০

৭২ ঐ। ১৬।।লo

৭৩ দেশ, শারদীয়া ১৩৪৯।৪০৪, পত্র ১৭

৭৪ বি. ভা. প., বৈশাখ-আষাঢ় ১৩৭৪।২৬৯

৭৫ দেশ, শারদীয়া ১৩৪৯।৪০৫, পত্র ১৯

৭৬ ‘রবীন্দ্র প্রসঙ্গ’ : দেশ, শারদীয়া ১৩৪৯।৪৩২-৩৭

৭৭ চিঠিপত্র ৪ [১৩৫০]। ১৫২-৫৩, পত্র ৬৬

৭৮ রবীন্দ্রস্মৃতি।৫৬

৭৯ দ্র মীরা দেবী : স্মৃতিকথা। ১৮

৮০ দেশ, শারদীয়া ১৩৪৯।৪৩৭

৮১ স্মৃতি।৬৭

৮২ চিঠিপত্র ৭।১১, পত্র ৫

৮৩ চিঠিপত্র ৬।৫৫, পত্র ২৪

৮৪ দ্র পত্রাবলী। ২১৯, পত্র ৪

৮৫ দেশ, শারদীয়া ১৩৪৯।৪০৫, পত্র ২১

৮৬ ঐ। ৪০৫, পত্র ২০

৮৭ রবীন্দ্রভবনে রক্ষিত প্রতিলিপি

৮৮ প্রভাতচন্দ্র গুপ্ত : রবিচ্ছবি [1982]। ৭৬

৮৯ গীতবিতান : কালানুক্রমিক সূচী ১।১৩৭

৯০ দেশ, শারদীয়া ১৩৬২।৯, পত্র ২

৯১ দেশ, শারদীয়া ১৩৪৯।৪০৫-০৬, পত্র ২২

৯২ ঐ। ৪০৭, পত্র ২৬

৯৩ ঐ। ৪০৬-০৭, পত্র ২৪

৯৪ দেশ, শারদীয়া ১৩৬২।৯, পত্র ২

৯৫ পত্রাবলী। ১৮০-৮১, পত্র ৭১

৯৬ চিঠিপত্র ৬।৫৭, পত্র ২৪

৯৭ পত্রাবলী। ১৮৩, পত্র ৭২

৯৮ ঐ। ১৮৫, পত্র ৭৪

৯৯ দেশ, সাহিত্য ১৩৪৯।৪১৩, পত্র ৪৬

১০০ ঐ। ৪০৭, পত্র ২৪

১০১ ঐ। ৪১২, পত্র ৪৫

১০২ ঐ। ৪০৮, পত্র ২৮

১০৩ প্রবাসী, ভাদ্র ১৩৩৫।৬৮৫, পত্র ৬

১০৪ চিঠিপত্র ৬।৯০-৯১, পত্র ৬

১০৫ অমৃত, 23 Feb 1979/৯, পত্র ৩

১০৬ দেশ, শারদীয়া ১৩৪৯।৪১১, পত্র ৪১

১০৭ দ্র শচীন্দ্রনাথ অধিকারী : শিলাইদহ ও রবীন্দ্রনাথ। [১৩৮০]। ৪২১-২২

১০৮ স্মৃতি। ৭০-৭১

১০৯ দেশ, ২৩ শ্রাবণ ১৩৪৯।৪০, পত্র ৩২

১১০ বি. ভা. প., বৈশাখ-আষাঢ় ১৩৭৪।১৭০

১১১ কথাসাহিত্য, আশ্বিন ১৩৬৮।১৩৩১

১১২ বি. ভা. প., বৈশাখ-আষাঢ় ১৩৭৪।২৭০

১১৩ চিঠিপত্র ৬।৫৫-৫৬, পত্র ২৪

১১৪ দ্র *The Bengalee*, 21 Jan 1908

১১৫ স্মৃতি। ৬৮

১১৬ দেশ, সাহিত্য ১৩৮৫।১৩, পত্র ১৫

১১৭ রবীন্দ্রভবনে রক্ষিত মূল পত্র

১১৮ বি. ভা. প., বৈশাখ-আষাঢ় ১৩৭৪।২৬৯

১১৯ দ্র দ্বিজেন্দ্রলাল। ৫০৭

১২০ দ্র রবীন্দ্র-স্মৃতি [১৩৬৪]। ১১৬-১৭

১২১ 'কাব্যে অপহরণ' : মানসী অগ্র° ১৩১৬।৪৯৯-৫০০

১২২ দ্র *The Bengalee*, 19 Nov 1907

১২৩ স্মৃতি। ৬৮-৬৯

১২৪ বি. ভা. প., বৈশাখ-আষাঢ় ১৩৭৪।২৬৯

১২৫ ঐ। ২৭০

১২৬ অমৃত, 23 Feb 1979/৮, পত্র ২

১২৭ দেশ, শারদীয়া ১৩৪৯।৪১০, পত্র ৩৬

১২৮ অনুরূপা দেবী, 'মাধুরীলতা' : প্রবাসী, জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৮।৩৩৪

১২৯ দেশ, ২৩ শ্রাবণ ১৩৪৯।৪০, পত্র ১৬

১৩০ নালুদা'র চিঠি ২ [1932]। ৮১, পত্র ৩৭

১৩১ দ্র *The Bengalee*, 26 Feb 1908

১৩২ *The Amrita Bazar Patrika*, 14 Feb 1908

১৩৩ পত্রাবলী। ২২০, পত্র ৪

১৩৪ *The Bengalee*, 14 Feb 1908

১৩৫ দেশ, শারদীয়া ১৩৪৯।৪১১, পত্র ৪০

১৩৬ দেশ, শারদীয়া ১৩৬২।৯

১৩৭ দেশ, ১৫ কার্তিক ১৩৯৩।৫৭, পত্র ১

১৩৮ ঐ। ৫৭, পত্র ২

১৩৯ ঐ। ৫৮, পত্র ৪

১৪০ পরিমল গোস্বামী, 'স্মৃতিচিত্রণ' [১৩৬৭]। ২৮

১৪১ রবীন্দ্রভবনে রক্ষিত মূল পত্র

১৪২ রবীন্দ্রভবনে রক্ষিত প্রতিলিপি

১৪৩ ঐ

১৪৪ দেশ, ২৩ শ্রাবণ ১৩৪৯।৪০

১৪৫ রবীন্দ্রভবনে রক্ষিত প্রতিলিপি

১৪৬ পত্রাবলী। ১৭৯, পত্র ৭০

১৪৭ দেশ, ৩ মাঘ ১৩৯৩।৬৫-৬৬, পত্র ৬৯

১৪৮ রবীন্দ্রভবনে রক্ষিত মূল পত্র

১৪৯ দেশ, শারদীয়া ১৩৪৯।৪১৫, পত্র ৫৬

১৫০ ঐ। ৪১৫, পত্র ৫৭

১৫১ রবীন্দ্রভবনে রক্ষিত মূল পত্র

১৫২ বি. ভা. প., বৈশাখ-আষাঢ় ১৩৭৪।২৭১

১৫৩ দ্র রবীন্দ্রস্মৃতি। ৫২

১৫৪ রবীন্দ্রভবনে রক্ষিত মূল পত্র

১৫৫ ঠাকুরবাড়ির গগনঠাকুর। ১১২

১৫৬ বসুমতী, আশ্বিন ১৩৬৩।৯৫৯-৬০

১৫৭ অপ্রকাশিত পত্রটি সৌম্যেন অধিকারীর সৌজন্যে প্রাপ্ত

১৫৮ সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়: রবীন্দ্র-স্মৃতি [১৩৬৪]। ৯৩

১৫৯ ঐ। ৯৮

১৬০ তত্ত্ব°, ভাদ্র। ৭৮

১৬১ ঐ, মাঘ। ১৫৬-৫৭

১৬২ ঐ, চৈত্র। ১৯৮

১৬৩ *The Bengalee*, 19 Nov 1907

১৬৪ ভারতের দ্বিতীয় স্বাধীনতার সংগ্রাম। ২০

১৬৫ অপ্রকাশিত পত্র, দীপেশ রায়চৌধুরীর সৌজন্যে প্রাপ্ত

১৬৬ স্মৃতি। ৪৬

১৬৭ ব্রহ্মবিদ্যালয়। ৩৯-৪০

১৬৮ 'রবীন্দ্র স্মৃতি' : দেশ, ২৩ শ্রাবণ ১৩৪৯।৪৫-৪৬

১৬৯ দেশ, ঐ ৩৮, পত্র ১০

১৭০ ঐ, শারদীয়া ১৩৪৯।৪০৪, পত্র ১১

১৭১ ব্রহ্মবিদ্যালয়। ৩৭-৩৯

১৭২ দেশ, শারদীয়া ১৩৪৯।৪০৯, পত্র ৩০

---

* রবীন্দ্রনাথ তারিখ লিখেছেন ২৯ বৈশাখ, কিন্তু পোস্টমার্ক 11 MY 07.

* আমাদের মনে হয়, আমন্ত্রণটি আগেই জানানো হয়েছিল—২ জ্যৈষ্ঠ [বৃহ 16 May] রবীন্দ্রনাথ 'চাট্গাং'-এ একটি পত্র লেখেন। ২৫ চৈত্র ১৩১২ [8 Apr 1906] একটি পত্রে তিনি মনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়কে চট্টগ্রামের আমন্ত্রণের কথা জানিয়েছিলেন।

* 'চট্টগ্রামের কোয়েপাড়ার বর্ধিষ্ণু জমিদার ও চট্টগ্রামে জজ কোর্টের বিখ্যাত উকিল কমলাকান্ত সেন্ (১৮৪৭-১৯০৬)...সদরঘাট অঞ্চলে একটি সৌখিন রঙ্গমঞ্চ স্থাপন করেন। তাঁর মৃত্যুর পর এটি কমলবাবুর থিয়েটার স্কুল নামে পরিচিত হয়।'

* ব্যাধি ও প্রতিকার।/ শ্রীদেবকুমার রায়চৌধুরী।/ ১৩১৩।
[বরিশাল আদর্শযন্ত্রে মুদ্রিত। মূল্য আট আনা।]
পৃষ্ঠাসংখ্যা : ২+২ [মুখবন্ধ/ অনাথবন্ধু সেন/ প্রকাশক] +২ [উৎসর্গ/ সুরেশচন্দ্র সমাজপতি] +২ [মঙ্গল-গীতি/ তুমি তো মা সেই/ দ্বিজেন্দ্রলাল রায়]+২ [সূচী]+২+৭৪+২+৪ [বিজ্ঞাপন]

* রমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য 'ভূমিকা'য় লিখেছেন : '···মহাকবিনা শ্রীযুক্তরবীন্দ্রনাথঠাকুরেণ দুহিতরমধ্যাপয়িতং ততো দুর্বোধাংশং বিস্তীর্ণবর্ণনং চ বিহায়াপনীয় চ দুরধিগতাম্ সুগমান্ কাশ্চিচ্ছলোকানাদায় কেবলং মূলোপাখ্যানং সংকলয়িতুং কশ্চিৎ সুগমঃ পন্থাঃ প্রদর্শিত উপদিষ্টশ্চ। ত্বমেব পন্থানমনুসৃত্য কিঞ্চিদাপূরণপরিবর্জনেন পরিবর্ত্য পরিদৃশ্য চ···বাল্মীকীয়ান্ শ্লোকানেবাদায় রামায়ণস্য মূলোপাখ্যানং সংক্ষিপ্তরামায়ণমিতি নাম্না পরিকল্প্য সংকলিতমস্মাভিঃ।'

* উদ্ধৃতিগুলি ড বিশ্বনাথ রায়ের প্রকাশিতব্য গবেষণা-গ্রন্থ 'রবীন্দ্রনাথ ও প্রাচীন বাংলা সাহিত্য' থেকে গৃহীত।

* দ্র প্রাসঙ্গিক তথ্য: ৪

* প্রবন্ধটি 'গণকণ্ঠ' পত্রিকার 'বিশেষ [মুর্শিদাবাদ] সংখ্যা' ৮৮'-তে [প অ-৪৫—অ-৬১] পুনর্মুদ্রিত হয়েছে।

* উল্লেখ্য, শমীন্দ্রনাথের উপনয়ন-সংস্কার হয়নি।

* আর-একটি বিবরণের জন্য দ্র যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, 'রবীন্দ্র স্মৃতি' : দেশ, ২৩ শ্রাবণ ১৩৪৯।৪৬

* 'The Maharaja of Trippera is compelled by the Bengal Government's wishes to abolish his highly flourishing Agartala College. The third year was opened in July. The students are thrown overboard. Great distress and consternation prevail.'—*The Bengalee*, 20 Aug 1904, রবীন্দ্র সান্নিধ্যে ত্রিপুরা। ৬৫-তে উদ্ধৃত

* *The Telegraph* পত্রিকায় [16 Aug 1905] দেবকুমারের আবৃত্তি সম্পর্কে লেখা হয়: '...the mimicry by way of recitation by Babu Dev Kumar Roy set the the gathering at roar.'

* ১৮ মাঘ ১৩১৬ [31 Jan 1910] জ্যোতিরিন্দ্রনাথ লিখছেন : 'আর একটা পোকায় কাটা diary পড়ে ছিঁড়ে ফেল্লুম। 1897এ সঙ্গীত সমাজ স্থাপনা 1887-এ আমার জাহাজ বিক্রী হয়।'

* অঘোর-প্রকাশ।/ (স্বর্গীয়া দেবী অঘোরকামিনী রায়ের জীবনকাহিনী)/ শ্রীযুক্ত প্রকাশচন্দ্র রায় কর্তৃক বিবৃত।/ বাঁকিপুর/ অঘোর পরিবার/ ১৯০৭। পৃ ২+২+২+৩২+১০২+৭২।

নির্দেশিকা

ব্যক্তি

গ্রন্থ ও পত্রিকা

[পত্রিকার নাম বক্রাক্ষরে]

শিরোনাম

কবিতা ও গানের প্রথম ছত্র

বিবিধ

সংশোধনী

৩২ পৃষ্ঠায় আমরা লিখেছি : "*New India*-তে রবীন্দ্রনাথের গল্পের ইংরেজি অনুবাদ প্রকাশের বিষয়টির প্রতি আমাদের দৃষ্টি প্রথম আকর্ষণ করেন সমীর রায়চৌধুরী তাঁর 'রবীন্দ্র ছোটগল্পের প্রথম ইংরেজি অনুবাদ [দ্র আজকাল, 18 Dec, 1984] প্রবন্ধে।" কিন্তু এখন জানা যাচ্ছে, চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় বহু পূর্বেই 'নববর্ষ দৈনিক বসুমতী ১৩৬৭'-তে 'বিপিনচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ' [পৃ ৮২-৮৩] প্রবন্ধে এই বিষয়ে আলোচনা করেন। ড অলোক রায় সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা-র অন্তর্গত 'যতীন্দ্রমোহন বাগচী' [শ্রাবণ ১৩৮৮] গ্রন্থেও [পৃ ৯-১০] প্রসঙ্গটির উল্লেখ করেছেন।